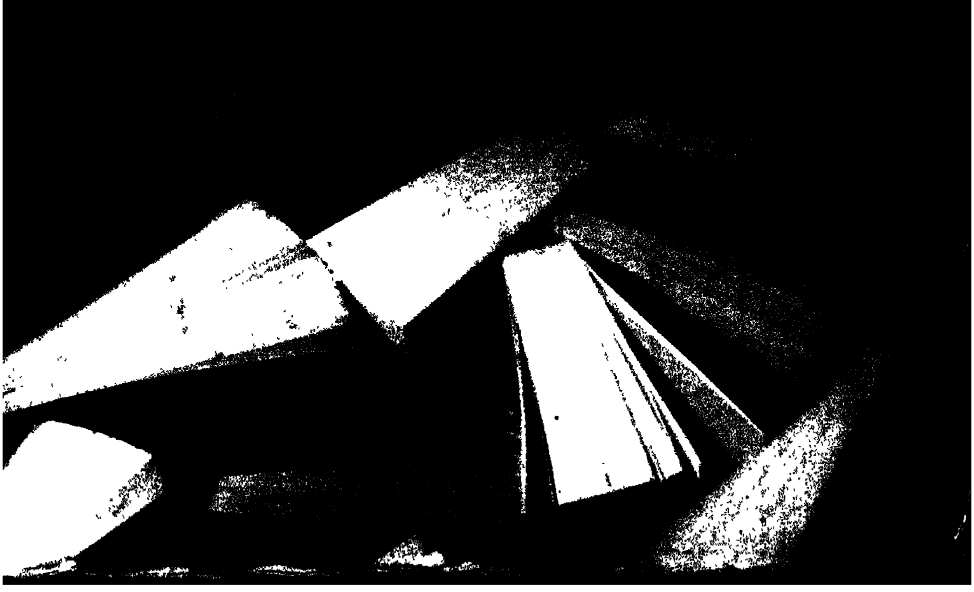
পাশ্চাত্য সাহিত্যতত্ত্ব ও সাহিত্যভাবনা

সম্পাদনা : নরেন্দ্র সেন



পাশ্চাত্য সাহিত্যতত্ত্ব
ও
সাহিত্যভাবনা

সম্পাদনা
নবেন্দু সেন

রত্নাবলী
৫৫ডি, কেশবচন্দ্র সেন স্ট্রিট ❖ কলকাতা ৭০০ ০০৯

PASHCHATYA SAHITYATATTA O SAHITYA BHABNA
A Collection of Essays On Western Literary Theories
Edited by : NABENDU SEN

প্রকাশক
সুমন চট্টোপাধ্যায়
রত্নাবলী
৫৫ডি, কেশবচন্দ্র সেন স্ট্রিট
কলকাতা ৭০০ ০০৯
ফোন : ৯৮৩০২০০৫৮৯
E-mail : purabi_ratnabali47@yahoo.com

প্রচ্ছদ শিল্পী
রাজীব চৌধুরী

মুদ্রক
কালার ইণ্ডিয়া
১/১বি, চাঁপাতলা ফার্স্ট বাই লেন
কলকাতা ৭০০ ০১২

কলেজ স্ট্রিটে প্রাপ্তিস্থান
পুস্তক বিপণি
২৭, বেনিয়াটোলা লেন
কলকাতা ৭০০ ০০৯
দূরভাষ : ২২৪১-৬৯৮৯

❑

জে. এন. ঘোষ অ্যান্ড সন্স
৬, বঙ্কিম চ্যাটার্জি স্ট্রিট
কলকাতা ৭০০ ০৭৩
দূরভাষ : ২২৪১-৭৫১৯

পূর্বলেখ

প্রথম দিনের সূর্য
প্রশ্ন করেছিল
সত্তার নূতন আবির্ভাবে—
কে তুমি?
মেলেনি উত্তর।
... ...
দিবসের শেষ সূর্য
শেষ প্রশ্ন উচ্চারিল
পশ্চিম সাগরতীরে
নিস্তব্ধ সন্ধ্যায়—
কে তুমি?
পেল না উত্তর॥

রবীন্দ্রনাথ যখন সাহিত্যস্বভাব তথা তার ধর্ম প্রসঙ্গে এলিঅট এবং ব্রিজেসের কাব্যের সমালোচনা করেন তখন সহজেই কিন্তু আবিষ্কার করেন "... আজকের দিনে যে-সাহিত্য আধুনিকের ধর্ম মেনেছে, সে সাবেক-কালের কৌলীন্যের লক্ষণ সাবধানে মিলিয়ে জাত বাঁচিয়ে চলাকে অবজ্ঞা করে, তার বাছ বিচার নেই।"— [*সাহিত্যের পথে*/'আধুনিক কাব্য']

অবশ্যই এই আবিষ্কারই আজকের সাহিত্যসমালোচনাতত্ত্ব বিষয়ক সমস্যার উদ্ঘাটক নয়। রবীন্দ্রনাথের সাহিত্যবোধের মূল তথা চরম বোধায়নের শেষ কথা ছিল আনন্দায়ন। যদিও তার বিশ্বে দিব্য এনে দেন বাঘের 'গ্লিসারিন সোপ্' মাখার কল্পিত বাস্তববোধ ; কিংবা 'ওয়েস্টল্যান্ডে'র ধোঁয়াটে দিন, পোড়া বাতি, পোড়া জমি, ছেঁড়া কাগজ, হাজার সস্তা খেয়ালের ছবি সাজিয়ে, সরিয়ে, গ'ড়ে, ভেঙে শেষ পর্যন্ত উচ্চারিত হয় :

"The nation of some infinitely gentle
Infinitely suffering thing."

রবীন্দ্রনাথ অবশ্য অন্তরে এটা মেনে নিতে পারেননি। বহু যুগাশ্রিত আদব ও আব্রু ছারখার হ'তে হলে দীর্ঘকালীন সমাজস্থিতির একান্ত বিশ্বাস ও নিশ্চয়তা দীর্ণ বিদীর্ণ করে দেওয়াকে রবীন্দ্রনাথের সৌন্দর্য ও আনন্দবোধ গ্রহণ করতে পারেনি। ভাঙন, ঝড় ওঠার উদ্দাম সর্বনেশে ক্ষরণের পথ তাঁর ছিল না; যদিও সাহিত্যবোধে তার পদধ্বনি তিনি শুনতে পাচ্ছিলেনও। কিন্তু তাকে স্বাগত জানানো তার পক্ষে সম্ভব ছিল না।

নতুন সাহিত্যসমালোচনাতত্ত্বের আবির্ভাব এখানে। কিন্তু সাহিত্যসমালোচনাতত্ত্বেরও একটা ইতিহাস আছে। তারও একটা শুরু আছে। সে প্রাচ্য পাশ্চাত্য উভয় ক্ষেত্রেরই প্রারম্ভিকতায় দ্রষ্টব্য। বর্তমান প্রসঙ্গে আমাদের আলোচ্য সীমা পাশ্চাত্য সাহিত্যতত্ত্ব ও সে-সম্পর্কিত চিন্তা ভাবনার কেন্দ্রবিন্দু। অনিবার্যতায় তাই উঠে আসছে অ্যারিস্টটল তথা প্লেটোর যুগের সাহিত্যতত্ত্ব - চিন্তা। তাকে স্পর্শ করেই পরবর্তী সাহিত্যতত্ত্বের স্পর্ধিত উচ্চারণ। প্লেটো যখন সক্রেটিসের জ্ঞানসম্ভারের আলোচ্য প্রসঙ্গে চিত্রকল্প, রূপক, নাট্যদৃশ্য, চরিত্রায়ণ, মঞ্চসাজ এবং উচ্চারণভঙ্গির

উল্লেখ করেন তখন ডায়ালেকটিক গতির রূপ, স্বভাবই স্থির করেন। অ্যারিস্টটলের কাব্যতত্ত্ব অংশ সমূহের শৃঙ্খলিত উপস্থাপনার (orderly arrangement of parts) কথাই তুলে আনে। আর সেই শৃঙ্খলাই সৃষ্টি করে "সুন্দর সামগ্রিকতা" অথবা সমগ্রায়ন (organism)। হোরেসের পেলব উচ্চারণেও হবু কবিদের প্রতি মৃদু সতর্কীকরণ শোনা গিয়েছিল "In short be your subject what it will, let it be simple and unified."

কাজেই সাহিত্যের অবয়বত্ব তথা তার সংগঠন বা একতা অথবা শৃঙ্খলার একীকরণের কথা তখন থেকেই উঠে আসছে—এটা বোঝা যায়। একটা ফ্রেমওয়ার্কের কথা কিন্তু তাই অশ্রুত থাকছে না।

এই সাহিত্যতত্ত্বের প্রতিমার ধারণা, যাকে বিভিন্ন সময়ে বিভিন্ন শব্দে *annonization* (প্রণালীকরণ), *Avant-Garde* (আভাঁ-গার্দে) *Ordered structure* (সুশৃঙ্খল সংগঠন), *De construction* (বিনির্মাণ/অধিনির্মাণ) ইত্যাদি ভেঙে, রূদলে, পরিবর্তিত ধারণায়, রূপে দর্শনায়িত করার প্রক্রিয়াও চলতেই থাকে।

তাই সাহিত্যতত্ত্বের ও তার ভাবনার কোনো অন্ত আজও নেই। এই বিষয়ে প্লেটো, অ্যারিস্টটল, হোরেসের যুগ পেরিয়ে তাই শোপেনহাওয়ার আরথার (১৭৮৮—১৮৬০) নিট্‌শে ফ্রেড়রিক উইলহেল্‌ম্ (১৮৪৪—১৯০০), ফ্রয়েড সিগ্‌মাণ্ড (১৮৫৬—১৯৩৯), অটো র‍্যাঙ্ক (১৮৮৪—১৯৩৯) প্রত্যেকেই নিজের নিজের বোধ ও বৌদ্ধিক ব্যাখ্যায় সাহিত্য, সমাজ-জীবনের বিভিন্ন মুখীনতায় তা প্রকাশ করে গেছেন। কখনো তা মনোবিশ্লেষণাত্মক, কখনো পুরাণাত্মক, কখনো আর্থসামাজিকতায় বিধৃত, কখনো সংকেতায়িত, কখনো সৌন্দর্য ও সঞ্চরণের মুক্ত গিদন্তে উদ্ভাসিত। কল্পোক্তিময়তায় (*Pseudo statement*), কখনো নিছক *emotive attitudes* বা আবেগময় ব্যক্তিক অনুভূতিতে স্ফূর্ত হয়ে উঠেছে তা। এসেছেন আই. এ. রিচার্ডস (১৮৯৩—১৯৬২), উইলিয়াম এম্পসন (১৯০৬—১৯৬২) সাংগঠনিকতায়, ব্যঙ্গ ময়তায়, ব্যঙ্গের অবক্ষয় সামাজিক দায়িত্ব ও সমস্যার সঙ্গে সাংস্কৃতিক তথা ঐতিহাসিকতার সম্পর্ক (যেমন উইলিয়ম ফকনার : ১৮৯৭—১৯৬২), যেমন ক্লদে লেভি-স্ত্রস (১৯০৮) সাংগঠনিক তত্ত্বের যৌক্তিক আঙ্গিক ধারণায় সাংস্কৃতিক প্রপঞ্চের এক বিমূর্ত আদর্শে ধরতে চেয়েছেন সাহিত্যতত্ত্বকে,— প্রযুক্তিগত প্রাগ্রসরতার মাধ্যমে সামাজিক বিভাজনে তুলে আনতে চান সাহিত্যবোধকে। রূপ সাংগঠনিক তত্ত্বও এক সময় (যেমন প্লেখানভ ১৮৫৭—১৯১৮) সাহিত্যতত্ত্বের দিক নির্ণয়ে উল্লেখযোগ্য ভূমিকা নিয়েছিল। মার্কসবাদী সাহিত্যতত্ত্বও আমাদের বিভিন্ন সময়ে ভাবিয়েছে। গিওর্গ লুকাস (১৮৮৫—১৯৬২)-এর *History and Class consciousness* (1923) এক সময় বিপুল ঢেউ তুলেছিলেন।

বাংলা সাহিত্যেও এসবের ধাক্কা, ঢেউ লেগেছে। মানিক বন্দ্যোপাধ্যায় পড়তে গিয়ে তাই ফ্রয়েড, মার্কস এসে যায়।— সাহিত্যতত্ত্বের অনুবর্তন তাই প্রতিফলিত হয়। এঁর মধ্যে স্বাভাবিকতাই প্রতিপাদ্য। দেরিদাই (১৯৩০—১৯৬২) হোন আর লাঁকাই (১৯০১—১৯৬২) হোন বিশ্বায়নের স্রোত অব্যাহত। নারীবাদই হোক আর সংস্কৃতিসঞ্চরণই (cultural process) হোক, পারিবারিকতাই হোক আর নগরায়ণই হোক— আধুনিকতাই হোক আর উত্তর-আধুনিকতাই হোক, বাস্তবতা হোক আর পরাবাস্তবতাই হোক কিংবা অধিবাস্তবতাই হোক, তার হয়ে ওঠাটাই খুব জরুরি। তা লিঙ্গজ সীমায় আবদ্ধ নয়, তার দ্বিতীয় লিঙ্গজ ধারণা বা সমকামিতায় উদ্ভূত নতুন অথবা তা বহু প্রাচীন সমস্যারই নব সামাজিক সমস্যার চিহ্নে অবশ্যই সাহিত্যপাঠের চ্যালেঞ্জ তুলে নিয়ে আসতেই পারে। অর্থাৎ বলার অর্থ জোনাথান কুলার (১৯৪৪), থিয়োডোর-

এডোর নো (১৯০৩—১৯৬২), পল দ্যু মান (১৯১৯—১৯৬২), মিখাইল বাখতিন (১৮৯৫—১৯৬২) কিংবা মিশেল ফুকো (১৯২৬—১৯৬২) কিংবা রোলাঁ বার্ত (১৯১৫—
), অথবা মিলেট, মিচেল ব্যারেট— যাঁরাই আসুন, যাঁরাই সাহিত্যতত্ত্বের ক্ষেত্রে কোনো বিশিষ্ট ধারণায় সাহিত্যপাঠের কোনো দিক নির্দেশ করতে চেয়েছেন, যা সময় থেকে সময়ে পাঠকমনকে আন্দোলিত করেছে, ভাবিয়েছে, রচনা সম্পর্কে দৃষ্টিভঙ্গির বদল ঘটিয়েছে, অনুসন্ধিৎসু মানসিকতার বলয়ান্তরণ ঘটিয়েছে— বক্ষ্যমাণ পরিসরে তার বিচিত্র গতি-প্রকৃতির কিছুটা পরিচয় তুলে ধরার চেষ্টা মাত্র করা হয়েছে।

বলা বাহুল্য এই বিপুল প্রয়াস কোন একক বিদ্যায় বিধৃতযোগ্য নয়। আমরা স্বভাবতই সাহায্য চেয়েছি নিজ নিজ ক্ষেত্রের অধিত, সারস্বত ব্যক্তিত্বের নিকট। বিভিন্ন বিশ্ববিদ্যালয়ের স্নাতক স্নাতকোত্তর পর্যায়ের কিংবা গবেষণাগারের সিদ্ধ মেধাবী ব্যক্তিত্বের অকৃপণ সহায়তায় আজ বেশ কিছু সময়ের স্রোত পেরিয়ে, বেশ কিছু ভৌগোলিক দূরত্ব অতিক্রম করে লেখক, প্রকাশক ও সম্পাদকের ত্রিসীমাস্পর্শিত বহু পরিশ্রম, নিষ্ঠা, অধ্যয়ন ও অধ্যাবসায়ের পুঞ্জিত এক সারস্বত-অর্ঘ্যই সুধীজনের নিকট নিবেদিত হল।

সমস্ত প্রবন্ধই যে বিষয়ানুগ সর্বজনগ্রাহ্য হয়ে উঠবে— এমন প্রত্যাশা আমরা করি না। অনেক ক্ষেত্রে বিষয় এক কিন্তু লেখক হয়তো একাধিক হয়েছেন, অথবা একই বিষয় কিন্তু তার ভাবনা স্বতন্ত্র, অথবা লেখক লেখকে তার প্রকাশ ভঙ্গিতে তার স্বাতন্ত্র্য লক্ষিত হতে পারে। আমরা কোন ক্ষেত্রেই তার সমতা সৃষ্টির চেষ্টা করিনি। কারণ বিশ্বাস করেছি—

"...Literature does not always follow the straight path ; when it takes a turn, that turn must be called modern. We call it *adhunik* in Bengali. This modernity depends not upon time but upon temperament"

–R. K. Dusgupta

আমরা বিশ্বাস করি সাহিত্যতত্ত্ব, আজকের বীক্ষণবিশ্বে কবিতার মতোই "...evolution means a bringing out of new powers which lay concealed in the seed ... the simple develops to the more complex..."

–Sri Aurobindo

আধুনিকতারও দিকদর্শন নেই, প্রকৃপতক্ষে অত্যাধুনিকতাও কিছু হয়তো নেই। "purely fragmentary and these fragments, into the bargain, always describe the same thing, which is almost nothing."

— Roland Barthes by Ronald Barthes. A lover's discourse.

হয়তো তাই আমাদেরও এই অন্বেষণ, এই তাত্ত্বিক ভাবনার কেবল মাত্র উপস্থাপনাই আপাতত সাহিত্যের পথপরিক্রমণে সাহায্য করবে। এই রকম একটা প্রত্যয় নিয়েই আমাদের এই যাত্রাপথের শুরু। তা কোনক্রমেই সম্পূর্ণ নয়— সে প্রত্যাশাও আমরা করি না। বিষয়ের মতোই তা অন্তহীনতার পরিক্রমণ মাত্র। তবু যাঁরা ভাবতে চান, ভাবাতে চান পাশ্চাত্যের সাহিত্যতত্ত্বে আমাদের রচনা ও রচয়িতাদের দেখতে চান তাঁদের জন্য কিছু চিন্তা, চিহ্ন, কলাকৃতির পরিচয় হয়তো আমাদের স্বীকার্য সীমাবদ্ধতায় তুলে ধরা গেল— এইটুকুই আমাদের চরিতার্থতা। পাশ্চাত্যতত্ত্ব ও ভাবনার মধ্যেই এই আলোচনা সীমাবদ্ধ থাকছে।

অনেকের সৌজন্য ও সহায়তায় এই গ্রন্থের প্রকাশ সম্ভব হল। এঁদের মধ্যে উল্লেখযোগ্যরা হলেন সুমিতা চক্রবর্তী, হিমাদ্রি লাহিড়ী, কুন্তল চট্টোপাধ্যায়, রাজীব চৌধুরী এবং শুভা চক্রবর্তী দাশগুপ্ত প্রমুখ। এঁরা নিজেরা লিখেছেন আবার বিভিন্ন লেখকের সঙ্গে যোগাযোগও করিয়ে দিয়েছেন। এঁদের সহায়তা ছাড়া বইটি যতটা সম্পূর্ণতা পেয়েছে তাও সম্ভব হত না। এঁদের সকলকে ধন্যবাদ জানাচ্ছি এবং আশা করছি ভবিষ্যতে বইটিকে আরও সম্পূর্ণতর করার প্রয়াসে এঁদের সহায়তা থেকে বঞ্চিত হব না।

পরিশেষে সমস্ত সংশ্লিষ্ট লেখক-লেখিকা, প্রকাশক ও অনুসন্ধিৎসু ব্যক্তিকে আমাদের সশ্রদ্ধ কৃতজ্ঞতা জানাই। গ্রন্থের যা কিছু প্রশংসনীয় এঁদেরই প্রাপ্য। যা কিছু ত্রুটি তার দায় ও অপরাধ আমার এবং তার জন্য আমি ক্ষমাপ্রার্থী—

বিনীত সম্পাদক

নবেন্দু সেন

সূচিপত্র

(১)

পাশ্চাত্য সাহিত্যতত্ত্ব সম্পর্কিত প্রথম প্রাপ্ত গ্রন্থটি লিখেছিলেন আরিস্টটল— এই তথ্য সর্বজনজ্ঞাত। এ কথাও আমাদের অজানা নয় যে, শিল্পতত্ত্ব ও কাব্যতত্ত্ব সম্পর্কিত কোনো স্বতন্ত্র গ্রন্থ না লিখলেও আরিস্টটল-এর শিক্ষক প্লেটো তাঁর বিভিন্ন গ্রন্থে শিল্পতত্ত্ব ও কাব্যতত্ত্ব সম্পর্কে বিভিন্ন মন্তব্য লিখে গেছেন। এই দুটি বিষয়েই তাঁর ছিল নির্দিষ্ট অভিমত। সেই অভিমতকেও আমরা মূল্যহীন বলতে পারি না কারণ প্রথমত, আরিস্টটল-এর অব্যবহিত পূর্বে এবং তাঁর সমকালেও প্লেটোর অভিমত নিশ্চিত ভাবেই অনেকটা মান্যতা পেয়েছিল। আরিস্টটল-এর তত্ত্বের, বিশেষ করে শিল্পতত্ত্বের সূত্রপাতে প্লেটো-র মত খণ্ডন করবার যে অভিপ্রায় ছিল সে-কথা মনে রেখেও আমরা প্লেটো-র ভাবনাকে গুরুত্ব দিতে বাধ্য থাকি। কাজেই শিল্পতত্ত্ব এবং কাব্যতত্ত্বের আলোচনায় আমরা প্লেটো এবং আরিস্টটল—উভয়ের অভিমতই অনুধাবন করবার চেষ্টা করব। তার ফলে গ্রিস-এর শিল্পতত্ত্ব ও কাব্যতত্ত্ব সম্পর্কিত ধারাবাহিকতাও যেমন স্পষ্ট হবে, তেমনই প্লেটো এবং আরিস্টটল-এর ভাবনার তুলনামূলক আলোচনার মধ্যে দিয়ে আরিস্টটল-এর অভিমত স্পষ্টতরভাবে প্রতিভাত হবে।

প্লেটো-র শিল্পচিন্তা

গ্রিস-এই প্রথম দার্শনিক চিন্তার শৃঙ্খলাবদ্ধ পরম্পরা গড়ে ওঠে। শিল্পচিন্তা ছিল সেই পরম্পরারই অন্তর্গত। মানব-জীবন ও মানব-সমাজ সম্পর্কে কিছু মৌল প্রশ্ন এবং নীতির প্রসঙ্গ তুলেছিলেন সক্রেটিস (৪৭০—৩৯৯ খ্রিস্টপূর্বাব্দ)। তার পরেই আমরা প্লেটো (৪২৭—৩৪৭ খ্রিস্টপূর্বাব্দ)-র নাম করতে পারি। সক্রেটিস-এর প্রভাব তাঁর উপরে ছিল কিন্তু প্লেটো ছিলেন অনেক বেশি অ্যাকাডেমিক। বিভিন্ন গ্রন্থে তিনি তাঁর বহু ধরনের চিন্তা সুশৃঙ্খলভাবে লিপিবদ্ধ করে গেছেন। পরবর্তী কালে সমগ্র বিশ্বে এবং বিশেষ করে ইউরোপ-এ তাঁর দর্শন-ভাবনা বহু চিন্তন-ধারার উৎসভূমি রূপে গণ্য হয়েছে। তাঁর লেখাতেই শিল্প ও সাহিত্য সম্পর্কে প্রাচীন ইউরোপীয় সভ্যতার প্রাথমিক অভিমতগুলির সন্ধান পাওয়া যায়।

প্লেটো এবং আরিস্টটল
শিল্পতত্ত্ব ও কাব্যতত্ত্ব
সুমিতা চক্রবর্তী

প্লেটো-র জন্ম হয়েছিল আনুমানিক ৪২৭ খ্রিস্টপূর্বাব্দে এথেন্স-এর এক ধনী অভিজাত পরিবারে। নিজস্ব প্রতিভায় ও পাণ্ডিত্যে তিনি এথেন্স-এর অন্যতম শিক্ষাবিদ হয়ে ওঠেন এবং স্থাপন করেন আকাদেমি নামক শিক্ষায়তন। আরিস্টটল (৩৮৪—৩২২ খ্রিস্টপূর্বাব্দ) প্রায় কুড়ি বছর তাঁর ছাত্র ছিলেন। শিল্পভাবনা ও সাহিত্যভাবনা সম্পর্কে আরিস্টটল যা ভেবেছিলেন, আলোচনা করেছিলেন এবং সিদ্ধান্তে পৌঁছেছিলেন তার মূলে প্লেটো-র কাছ থেকে যে শিক্ষা তিনি পেয়েছিলেন তার বিশেষ ভূমিকা ছিল। এটি খুবই কৌতূহল-উদ্দীপক ঘটনা যে শিল্প-সাহিত্য বিষয়ে প্লেটো-র অভিমতের সঙ্গে আরিস্টটল-এর অভিমতের মিল নেই। অনেক ক্ষেত্রে তাঁদের শিল্প-সাহিত্য সম্পর্কে অভিমত প্রায় বিপরীত। কারণ এই দুই দর্শনবিদের মনের চরিত্র ছিল পৃথক।

আমরা প্রথমে প্লেটো-র লিখিত গ্রন্থগুলির উল্লেখ করব। প্লেটো বহু স্থানে ভ্রমণ করেছিলেন। গ্রিস-এর প্রভাবশালী প্রশাসকেরা তাঁর শিষ্য ছিলেন। প্লেটো-র অভিমতের মধ্যে নগর-শাসকদের প্রতি পক্ষপাতে অনুভব করা যায়। তাঁর সমগ্র রচনাকর্মকে চারটি পর্যায়ে বিন্যস্ত করা হয়েছে।

১. ৩৮৭ খ্রিস্টপূর্বাব্দের আগের রচনা। এগুলিকে বলা হয় প্রাথমিক দ্বিরালাপ (Early Dialogue) । এর মধ্যে আছে *অ্যাপোলজি* (*Apology*), ইঅন *Ion*, *লাইসিস* (*Lysis*), *রিপাবলিক*, *বুক ওয়ান* [*Republic* Book-1]

২. ৩৮৭ থেকে ৩৮০ খ্রিস্টপূর্বাব্দের মধ্যবর্তী রচনা। এগুলিকে বলা হয়েছে 'প্রথম পর্বের পরিবর্তনমুখী দ্বিরালাপ' (Early transitional Dialogue) । এই পর্বের কয়েকটি রচনা পরবর্তী কালে তেমন গুরুত্ব পায়নি।

৩. ৩৮০ থেকে ৩৬০ খ্রিস্টপূর্বাব্দ। এই পর্বের রচনাকে বলা হয়েছে 'মধ্যবর্তী দ্বিরালাপ' (Middle Dialogue) । তাঁর এই পর্বের রচনাগুলিকেই সর্বাধিক গুরুত্বপূর্ণ মনে করা হয়। এই পর্বের মধ্যে আছে *ফিদো* (*Phaedo*), *ফিদ্রুরাস্* (*Phaedrus*), *রিপাবলিক*, বুক টু— বুক টেন (*Republic*, Book 2–Book 10), *সিম্পোসিয়াম* (*Symposium*) ইত্যাদি।

৪. শেষ পর্বের দ্বিরালাপ, ৩৬০ থেকে ৩৪৭ খ্রিস্টপূর্বাব্দ। এই পর্বের মধ্যে তিনি লিখেছিলেন 'অন্তিম দ্বিরালাপ' (Late Diologues) নামে ছ-টি খণ্ড। তাঁর শেষ ডায়ালগ-এর নাম *দ্য ল-জ*। [*The Laws*]

অ্যাপোলজি থেকে শুরু করে শেষ পর্যন্তই প্লেটো-র বিভিন্ন লেখায় শিল্প, সাহিত্য এবং কবিদের সম্পর্কে বিভিন্ন অভিমত ও সিদ্ধান্ত ছড়িয়ে আছে। যত দূর সম্ভব সংক্ষেপে আমরা প্রথমে প্লেটো-র ধারণা বুঝে নেবার চেষ্টা করব। *দ্য রিপাবলিক এবং দ্য লজ*—এই দুটি গ্রন্থেই প্লেটো শিল্প-সাহিত্য সম্পর্কে আলোচনা করেছেন। তিনি শিল্প, সাহিত্য এবং সাহিত্যিকদের বিরূপ সমালোচক ছিলেন। তা সত্ত্বেও তাঁর চিন্তাভাবনা থেকে শিল্প-সাহিত্যের মননক্ষেত্র কর্ষিত হয়েছে।

শিল্প কী— এই প্রশ্নের সমাধান আমাদের আগে করে নিতে হবে। এ-বিষয়ে আরিস্টটল যেভাবে সুশৃঙ্খল আলোচনা করেছেন, প্লেটো তা করেননি। তাঁর বিক্ষিপ্ত ভাবনার পরিচয় আমরা এখন গ্রহণ করছি। প্লেটো প্রধানত আলোচনা করেছেন নীতিশাস্ত্র, রাষ্ট্রনীতি, শিক্ষানীতি এবং দর্শনের প্রসঙ্গ। এগুলি আলোচনা করতে গিয়ে প্রসঙ্গত তিনি কবি ও কাব্য সম্পর্কে তাঁর অভিমত ব্যক্ত করেছেন। কবি, কবিতা এবং কাব্যনির্মাণ প্রসঙ্গে প্লেটো-র আগে কোনো লিখিত অভিমত ইউরোপীয় ভাষায় পাওয়া যায় না। প্লেটোর সময় ছিল খ্রিস্টপূর্ব চতুর্থ শতাব্দের প্রথম অর্ধ।

প্লেটো-র চিন্তাসূত্রগুলি তাঁর বিভিন্ন গ্রন্থে ও বিভিন্ন প্রসঙ্গে বিন্যস্ত। একটি ভাগে কবি ও কাব্য সম্পর্কে প্লেটো-র ধারণার পরিচয় পাওয়া যাবে; অন্য ভাগে আছে সামগ্রিক শিল্পতত্ত্ব, অর্থাৎ শিল্প কাকে বলে— সে-সম্পর্কে তাঁর ভাবনা। শিল্পের মূল সূত্র এবং কাব্যের গ্রহণযোগ্যতা— এই নিয়েই প্লেটো কিছু কিছু কথা বলেছেন।

প্রথমে আমরা দেখব কবি ও কবিতা বিষয়ে প্লেটো কী বলেছেন। সকলেই জানেন যে, প্লেটো কবি ও কাব্যকে আক্রমণ করেছেন এবং তাঁর আদর্শ রাষ্ট্রে কবিদের স্থান দেননি কিন্তু দেখা যায় যে, এই আক্রমণের ভাষা বিশেষ কারণে এবং বিশেষ প্রসঙ্গে উচ্চারিত হয়েছিল। তিনি নিজে কবিতা লিখতেন এবং তাঁর গদ্যরচনাগুলিও কাব্যময় ভাষায় প্রায়শই স্পন্দিত। কবিতা তিনি ভালোবাসতেন, যদিও তাঁর সমকালে গ্রিস-এ যে ধরনের কবিতা রচিত হত তার অনেক কিছুই তাঁর পছন্দ হত না।

দ্য রিপাবলিক গ্রন্থে তিনি কবি ও কাব্যের বিরুদ্ধে সর্বাধিক তীব্র আপত্তি ব্যক্ত করেছেন। কিন্তু সেখানে তাঁর আপত্তির কারণ হল রাষ্ট্রনৈতিক, শৈল্পিক নয়। তিনি প্রথমে বলেছেন, সাহিত্য ও শিল্প শ্রোতা, পাঠক ও উপভোক্তাদের মধ্যে এমন প্রভাব ছড়িয়ে দিতে পারে যার পরিণাম একটি আদর্শ রাষ্ট্রের নিয়ম-নীতি বজায় রাখার পক্ষে বাধাজনক হতে পারে। এমন সমস্ত আবেগ এবং অনুভূতিকে শিল্পে-সাহিত্যে উজ্জ্বল করে দেখানো হয় যার ফলে রাষ্ট্রবিধানের বিরুদ্ধে চলে যেতে পারে মানুষের মন। প্লেটো-র এই অভিমতে কিন্তু শিল্পী ও সাহিত্যিকদের প্রতি শ্রদ্ধাই প্রকাশ পেয়েছে। তাঁদের শক্তি এবং প্রভাব বিস্তার করার ক্ষমতাকে তিনি পরিপূর্ণ স্বীকৃতি জানিয়েছেন। রাষ্ট্রনৈতিক কারণে তাঁদের তিনি নির্বাসিত করেছেন; কিন্তু এই নির্বাসনের মধ্যে দিয়েই তিনি তাঁদের প্রভূত স্বীকৃতি ও সম্মান জানিয়েছেন। কবিদের নির্বাসন দেবার আগে প্লেটো তাঁদের মাথায় পরিয়ে দিয়েছিলেন মর্যাদার মুকুট; স্বীকার করেছিলেন তাঁদের জনচিত্ত জয়ের বিপুল ক্ষমতা।

ভেবে দেখতে গেলে প্লেটো-র ধারণা একেবারে অমূলক ছিল না। রাষ্ট্রের পরিচালকদের কাছে নাগরিকদের অসন্তোষ এবং বিদ্রোহ সর্বদাই বিপজ্জনক। সাহিত্য সেই বিদ্রোহের জাগরণে সহায়তা করতে পারে। পৃথিবীর ইতিহাসে রাষ্ট্রদ্রোহিতার অভিযোগে রাষ্ট্রীয় প্রশাসন বারবার নিষিদ্ধ করেছে সাহিত্য এবং নির্বাসিত বা কারারুদ্ধ করেছে সাহিত্যিককে। ভারতের ইতিহাসে বঙ্কিমচন্দ্রের *আনন্দমঠ* এমনই একটি উপন্যাস যার প্রভাব ব্রিটিশ-শাসিত ভারতের রাষ্ট্রব্যবস্থার পক্ষে বিপজ্জনক হয়েছিল।

কাব্য-সম্পর্কিত প্লেটোর আলোচনা সন্নিবিষ্ট হয়েছে তাঁর রচিত *রিপাবলিক গ্রন্থের* দ্বিতীয়, তৃতীয় এবং দশম খণ্ডে। সেখানে তিনি ছাত্রদের অভিভাবকদের শিক্ষার বিষয়ে বলেছেন এবং সেই সূত্রে ছাত্রদের শিক্ষার কথাও এসেছে। তিনি বলেছেন—সাহিত্যে দেবতাদের সম্পর্কে অনেক সমালোচনা থাকে, দেবতাদের দোষত্রুটিকে তুলে ধরা হয়। সাহিত্য পাঠ করলে তরুণদের দেবতাদের প্রতি শ্রদ্ধা ব্যাহত হবে। এই ধর্মীয় কারণে সাহিত্য পাঠ না করা উচিত।

সাহিত্যে অনেক সময়ই দেবতাদের এবং নায়কদের চারিত্রিক দুর্বলতাকে দেখাবার পরেও সেই চরিত্রগুলিকে সমুজ্জ্বল ও মহৎ রূপে প্রতিষ্ঠিত করা হয়। তার ফলে তরুণদের মনে নৈতিক দুর্বলতা সম্পর্কে শৈথিল্যের ভাব দেখা দিতে পারে।

রিপাবলিক গ্রন্থের তৃতীয় খণ্ডে আমরা শিল্পের রূপ নির্মাণ প্রসঙ্গে 'মাইমেসিস' (Mimesis) বা 'ইমিটেশন' (Imitation) অর্থাৎ 'অনুকরণ' শব্দটি প্রথম পাই। এই অনুকরণ শব্দটি

এরপর *রিপাবলিক*-এর দশম খণ্ডে এবং আরিস্টটল-এর *কাব্যতত্ত্ব* গ্রন্থে বিস্তৃতভাবে ব্যাখ্যাত হয়েছে। ইউরোপীয় নন্দনতত্ত্বে অনুকরণ একটি মূল সূত্র।

রিপাবলিক-এর তৃতীয় খণ্ডে প্লেটো 'মাইমেসিস' শব্দে যা বোঝাতে চেয়েছেন তার যথার্থ ইংরেজি অনুবাদ হওয়া উচিত ' ইমপারসোনেশন' (Impersonation)। এক ব্যক্তি যখন অন্য এক ব্যক্তির আচরণ, বাগভঙ্গি এবং ব্যক্তিত্বের অনুকরণাত্মক ক্রিয়া প্রদর্শন করে তখন তাকে, ইমপারসোনেশন বলে। লিরিক বা ব্যক্তিগত কবিতায় কবি সরাসরি বলেন নিজের কথা। কিন্তু নাটকে কবির রচনাতে দেখা যায় তিনি নিজেকে ছাড়া অন্য চরিত্রের মুখে ভাষা বসিয়েছেন; অন্য চরিত্রের আচরণ বর্ণনা করেছেন। নাটক অভিনয়ের কালে এক ব্যক্তিকে অন্য ব্যক্তির চেহারায় দেখা যায়। এর ফলে দুই ধরনের অবাঞ্ছিত প্রতিক্রিয়া দেখা দিতে পারে। প্রথমত, একটি রাষ্ট্রের প্রত্যেক মানুষের নিজের কথাই বলা উচিত। অন্য ব্যক্তির অভিমত এবং আচরণকে নির্ধারিত করে দেবার চেষ্টা অনুচিত। প্রত্যেক নাগরিককে নিজের ভূমিকা পালন করতে শিখতে হবে; অন্যের ভূমিকা নির্ধারণ করে দেবার চেষ্টা করলে তা হবে অনধিকার। তার ফলে রাষ্ট্রে গোলোযোগ দেখা দিতে পারে।

রিপাবলিক -এর দশম খণ্ডে প্লেটো প্রধানত আলোচনা করেছেন সাহিত্য ও শিল্পের অনুকরণ প্রক্রিয়া নিয়ে। এই বিষয়টিকে কেন্দ্র করেই প্লেটো এবং আরিস্টটল-এর চিন্তনের মধ্যে প্রধান পার্থক্য দেখা যায়। প্লেটো-র মতে কোনো অনুকরণই সত্য নয়। সব অনুকরণই হল সত্যকে নকল করবার চেষ্টা। অনুকৃত বিষয়গুলি সবই 'ইলিউশন' বা দৃশ্যমায়া। সাহিত্যে জীবনের যথাযথ রূপ পুনঃ প্রকাশ করবার চেষ্টা করা হয়। কিন্তু এই চেষ্টাকে প্লেটো একেবারেই সমর্থন করতে পারেননি। তিনি যে যুক্তির দ্বারা তাঁর অ-সমর্থন ব্যক্ত করেছেন তা হল তাঁর 'থিয়োরি অব আইডিয়াজ' (Theory of Ideas) । এই তত্ত্বের মূল কথা হল— আমাদের বাস্তব এবং ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য পৃথিবী অতিক্রম করে এক আইডিয়া বা আর্দশ ধারণার জগৎ আছে। সেই আদর্শ ধারণার জগতে প্রতীয়মান হয় সমস্ত অস্তিত্ব (Existence)-র নিখুঁত ও যথার্থ অবয়ব। আমাদের পার্থিব জগতের সব কিছুই সেই আদর্শ ধারণার অসম্পূর্ণ নকল (Imperfect Copy)। আবার কবি ও শিল্পীরা পৃথিবীর সেই অসম্পূর্ণ নকল অস্তিত্বের প্রতিরূপ নির্মাণ করেন। এবং সেগুলিও হয় জাগতিক অস্তিত্বের পুনশ্চ অসম্পূর্ণ নকল। ফলে কবি এবং শিল্পীদের সৃষ্টি জাগতিক অসম্পূর্ণ এবং দৃশ্যমায়াময় অস্তিত্বের অসম্পূর্ণ নকল করবার প্রয়াস; তা আদর্শ ধারণাময় সত্য জগতের তৃতীয় হাতের নকল (Third Hand Copy)। অতএব কবি এবং শিল্পীদের সৃষ্টি অ-সত্য। জীবনের প্রকৃত সত্য সম্পর্কে তা আমাদের কিছুই শেখাতে পারে না।

প্লেটো-র এই ধারণা বর্তমান যুগে আমাদের কাছে আর গ্রহণযোগ্য নয়। কিন্তু প্রাচীন কালে বিশ্বের সর্বত্রই পার্থিব বাস্তব জগতের তুলনায় অ-পার্থিব, অতীন্দ্রিয় এক অলৌকিক জগতের অস্তিত্ব ছিল সত্যতর। তার ফলে মানুষের মনে স্বর্গ এবং পরলোকের ধারণা এত দৃঢ় হতে পেরেছিল। ভারতীয় ধর্মীয় দর্শনের 'ব্রহ্ম সত্য জগৎ মিথ্যা' ধারণাটিও এই তত্ত্বেরই অনুরূপ। এখান থেকেই শুরু হয়েছিল প্লেটো-র সঙ্গে আরিস্টটল-এর চিন্তার প্রথম সংঘাত। প্লেটো ছিলেন ভাববাদী, আরিস্টটল ছিলেন বিজ্ঞানী। আরিস্টটল আদর্শ ধারণার জগৎ সম্পর্কে কিছুই বলেননি। তাঁর কাছে জাগতিক বাস্তবের জগৎই ছিল সত্য।

প্লেটো এই খণ্ডে একাধিক বার বলেছেন যে, কাব্য যে-আবেগ জাগ্রত করে তা মানুষের যৌক্তিক নিয়ন্ত্রণবিহীন এবং আবেগময়। তা মানব স্বভাবের নিম্নতর দিকগুলিকে উদ্‌বেজিত করে। যুক্তির পরিবর্তে মনের হীন প্রবৃত্তিগুলিকে জাগ্রত করে।

প্লেটো-র অন্যান্য গ্রন্থ থেওে কাব্য, কবিতা এবং অনুকরণ সম্পর্কে তাঁর আরও কিছু কিছু অভিমত বেরিয়ে আসে। *রিপাবলিক*-এর তৃতীয় খণ্ডে তিনি লিখেছেন নাটকীয় কবিতা যাঁরা দেখেন এবং শোনেন তাঁদের মনের উপর এ-জাতীয় জীবন-অনুকরণের নৈতিক প্রভাব পড়ে। তাঁরা নাট্যসাহিত্যের চরিত্রগুলির দ্বারা আকৃষ্ট হন এবং সেই চরিত্রগুলির ভ্রান্তি ও দুর্বলতাও অনুকরণ করতে সচেষ্টা হন।

সংগতভাবেই বলা যায় যে, প্লেটো সাহিত্যের নেতিবাচক প্রভাবগুলিকেই বড়ো করে দেখিয়েছেন। জীবনের বহু মহান দিককেও যে সাহিত্য রূপায়িত করে তার উল্লেখ তিনি করেননি। আগেই বলা হয়েছে যে, প্লেটো রাষ্ট্রনৈতিক ভালো-মন্দের দিকটিকেই গুরুত্ব দিয়েছেন। নাগরিকদের মনের উপর কাব্য যে মোহময় আর্কষণী প্রভাব বিস্তার করে— তিনি ছিলেন তার বিরুদ্ধে। তিনি সেই কবিদের তাঁর আদর্শ রাষ্ট্রে থাকবার ব্যাপারটি সমর্থন করেছিলেন যাঁদের লেখায় আছে দেবতাদের প্রশস্তি এবং মানুষের সদ্‌গুণাবলির রূপায়ণ। তাঁর কাছে অবশ্য মানুষের সদগুণ বলতে রাষ্ট্রীয় আনুগত্যের আওতার মধ্যে থাকাই বোঝাত।

দ্য ল-জ বা *আইন* গ্রন্থে প্লেটো আবার সাহিত্য, নাগরিক এবং অনুকরণের প্রসঙ্গটি এনেছেন। তিনি বলেছেন— নাগরিকদের অবশ্যই সৎ এবং সুন্দর শিল্প সম্পর্কে শিক্ষিত হতে হবে। শিল্প যেহেতু মূলত অনুকরণ তাই যে বিষয়বস্তু বা ব্যক্তির অনুকরণ করা হবে তাকেও হতে হবে ভালো এবং সুন্দর। এই অংশে আমরা একটু সংকুচিতভাবে হলেও প্লেটো-র মতে শিল্পের কিছুটা গ্রহণযোগ্যতার পরিচয় পাই।

তাঁর অন্যান্য গ্রন্থে শিল্প, সাহিত্য ও শিল্পস্রষ্টাদের সম্পর্কে তাঁর অসমর্থনের ভাবটি স্পষ্টতর। *প্রোটাগোরাস* (*Protagorus*) গ্রন্থে প্রোটাগোরাস চরিত্রটি কবিদের সম্পর্কে বলেছে— হোমার-এর কাল থেকে কবিরা শিক্ষক রূপেই স্বীকৃত এবং তাঁদের শিক্ষা সুনাগরিক গড়ে তোলবার পক্ষে সহায়ক। *লাইসিস* (*Lysis*) গ্রন্থে কবিদের বলা হয়েছে জ্ঞানের প্রবক্তা। কিন্তু প্লেটো স্পষ্টভাবেই নিজের বিশ্বাস ব্যক্ত করে বলেছেন যে, কবিদের সম্পর্কে এই প্রশস্তিমূলক ধারণা কুসংস্কার মাত্র।

মানুষের আচরণ এবং নৈতিকতা সম্পর্কে কবিদের বিচার বিশ্বাসযোগ্য নয়। *অ্যাপোলজি* (*Apology*) গ্রন্থে প্লেটো বলেছেন - কবিরা জ্ঞানচর্চা এবং বিস্তারের উদ্দেশ্য নিয়ে সাহিত্যরচনা করেন না। তাঁরা যৌক্তিকতা-বর্জিত সৃষ্টি-আবেগের উদ্দীপনা (Non-rational inspiration) এবং স্বভাবগত অনুভূতির চালনায় শিল্প সৃষ্টি করেন। প্লেটো-র এই ধারণা, অর্থাৎ কবিরা যুক্তিবিচারবিহীন মানুষ— পরবর্তী রচনা *ফিদ্‌রাস্‌* (*Phaedrus*) এবং *ইঅন* (*Ion*) গ্রন্থে আরও বর্ধিত হয়েছে। সেখানে কবিদের বলা হয়েছে উন্মাদ। তাঁরা কলা দেবীদের (Muse) প্রভাবে ভাবোন্মত্ত অবস্থায় সৃষ্টি করেন। কবিদের রচনার রূপকার্থ সম্পর্কেও প্লেটোর কোনো আকর্ষণ ছিল না। এসবের পরেও বলা যায়— প্লেটো মাঝে মাঝে কবিদের অনুকরণাত্মক শিল্প সম্পর্কে সমর্থন-বাক্য উচ্চারণ করেছেন যেখানে তিনি বলেছেন যে, মহাকাব্য এবং নাটকে শিল্পীদের উচিত 'ভালো' বিষয়গুলির অনুকরণ করা। অবশ্যই 'ভালো' বিষয় বলতে তিনি রাষ্ট্র এবং নাগরিকদের পক্ষে যা প্রশাসনের দিক থেকে ভালো তাকেই বুঝিয়েছেন।

ফিদ্‌রাস্‌ গ্রন্থে তিনি আবেগ-উদ্দীপনা সম্পর্কে একটি ধর্মীয় ব্যাখ্যাও দিয়েছেন। বলেছেন গভীর আবেগের প্রকাশ মানুষের আত্মাকে প্রচলিত রীতি ও বিধানের বন্ধন থেকে স্বর্গীয় মুক্তি দান করে (Divine release of the soul)।

'ফিদ্‌রাস্' গ্রন্থে কিন্তু প্লেটো শিল্প সম্পর্কে এমন কয়েকটি কথা বলেছেন যেগুলি পরবর্তী কালে বহু প্রচলিত হয়ে গেছে বলে আমরা মনে রাখি না যে, প্লেটো সেই অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ শিল্প-ধারণাগুলির প্রথম উদ্‌গাতা। শিল্পের ধারণায় জীবদেহের মতো সমগ্রতা (Organic unity) থাকা যে প্রয়োজনীয় সে-কথা তিনিই প্রথম বলেন। এছাড়া *দ্য রিপাবলিক* গ্রন্থে তিনি ব্যাখ্যা করেছেন যে, বিভিন্ন ধরনের শিল্প-রূপবন্ধ— যেমন এপিক, লিরিক এবং নাটক— এগুলির মধ্যে পার্থক্য ঘটে উপস্থাপনার ধরন অনুসারে (manner of presentation)। *দ্য ল-জ* গ্রন্থে তিনি বলেছেন প্রকৃত ট্র্যাজেডি জীবনের গভীরতম এবং মহত্তম স্বরূপকে তুলে ধরে। এই ধারণাই পরে আরিস্টটল এবং রেনেসাঁস-পর্বের আলোচকেরা বিশদ করেছিলেন। *দ্য রিপাবলিক* এবং *ফিদ্‌রাস্*— দুটি গ্রন্থেই প্লেটো লিখেছেন ট্র্যাজেডির দ্বারা বিশেষভাবে করুণা এবং ভয়ের অনুভূতি জাগ্রত হয়। *ফিলেবাস* (Philebus) গ্রন্থে তিনি এ-কথাও বলেছেন যে, একটি ভালো ট্র্যাজেডি দেখে আমরা যে আনন্দ পাই তা এক বিশেষ ধরনের আনন্দ যাকে 'ট্র্যাজিক প্লেজার' (Tragic pleasure) বলে অভিহিত করা হয়েছে।

ফিলেবাস গ্রন্থে প্লেটো কমেডি সম্পর্কে দু-একটি কথা বলেছেন। সেই সঙ্গে সমকালীন ট্র্যাজেডি লেখকেরা যে নিম্ন ধরনের উত্তেজনাকে (Sensation) জাগাতে চান— সেই প্রবণতাকেও প্লেটো সমালোচনার করেছেন।

আমরা দেখতে পাচ্ছি—প্লেটো এমন অনেক ধারণারই প্রথম প্রবক্তা যেগুলি তাঁর ছাত্র ও পরবর্তী মনীষী শিল্পতত্ত্ববিদ আরিস্টটল-এর ভাবনায় ও লেখায় বিকশিত হয়েছে। অনেক ধারণার ক্ষেত্রেই দেখা যায় প্লেটো যে-দিক থেকে শিল্প, কবি ও কাব্য সম্পর্কিত বিষয়কে ব্যাখ্যা করেছেন এবং সে-বিষয়ে মন্তব্য করেছেন— আরিস্টটল-এর ব্যাখ্যা হয়েছে তার থেকে পৃথক এবং কোথাও বিপরীত। তার কারণ এই যে— প্লেটো ছিলেন ভাববাদী এবং অলৌকিকতায় বিশ্বাসী। তিনি বাস্তব জগৎ অতিক্রমী এক অতীন্দ্রিয় লোকের অস্তিত্বে পূর্ণ বিশ্বাস করতেন। কিন্তু আরিস্টটল ছিলেন বিজ্ঞাননিষ্ঠ মনের মানুষ। ভাবজগৎ এবং অতীন্দ্রিয়লোক সম্পর্কে তিনি খোলাখুলি অবিশ্বাস ব্যক্ত না করলেও— এই বিষয়গুলিকে তাঁর শিল্প-ধারণায় এবং *কাব্যতত্ত্ব*-এ কোনো গুরুত্ব দেননি। বাস্তব জগৎ এবং বাস্তবের মানুষই ছিল তাঁর অবলম্বন। ট্র্যাজেডিগুলিতে যে দেবদেবীর প্রসঙ্গ থাকে তাকে তিনি পুরাণ-কথিত এবং মানব-কল্পনা সৃষ্ট অ্যাখ্যান বলেই গ্রহণ করেছেন।

(প্লেটো এবং আরিস্টটল-এর অভিমতের অত্যন্ত স্পষ্ট একটি পার্থক্যের জায়গা হল অনুকরণের গ্রহণযোগ্যতা) প্রধানত এই ক্ষেত্রেই শিল্প এবং সাহিত্য-সম্পর্কিত ধারণায় গুরু ও শিষ্য দাঁড়িয়ে ছিলেন পরস্পরের বিপরীতে। প্লেটো ছিলেন অনুকরণ সম্পর্কে বিমুখ, সে কারণেই শিল্প-সাহিত্যের গ্রহণযোগ্যতা সম্পর্কেও সংশয়ী। আরিস্টটল ছিলেন অনুকরণের গুরুত্ব সম্পর্কে পূর্ণ অবহিত এবং শিল্প সাহিত্যের অনুরাগী।

আমরা এখন প্লেটো এবং আরিস্টটল-এর মতবাদ এবং মনোভাবের সর্বাত্মক তুলনায় বিষয়টি উপস্থাপিত করব। এই তুলনা প্রধানত অনুকরণ এবং শিল্প— এই দুটি বিষয়কে অবলম্বন করেই আবর্তিত হবে। কারণ অনুকরণের বিষয় ও প্রকৃতি এবং শিল্পের ভালো-মন্দ বিষয়েই প্লেটো এবং আরিস্টটল-এর ভাবনায় প্রধান পার্থক্য দেখা গিয়েছে।

প্লেটো এবং আরিস্টটল দু-জনেই বলেছেন শিল্প হল অনুকরণ। কিন্তু শিল্প কীসের অনুকরণ— এই প্রশ্নেই দুজনের মতভেদ সীমাহীন। প্লেটো-র মতে যে বাস্তব এবং ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য পৃথিবীতে আমরা বাস করি সেই পৃথিবী সত্য নয়। এই পৃথিবীর সব কিছুই অনুকরণ। সেই

অনুকরণ করেছেন ঈশ্বর। কিন্তু অনুকরণ করতে গেলে একটি মূল বিষয় বা বিষয়সমূহের প্রয়োজন হয়। সেই মূল হল একটি ধারণার জগৎ। এই 'ধারণা' শব্দটি ইংরেজি 'আইডিয়া' এবং বাংলা 'ভাবাদর্শ' শব্দে যা বোঝায় সেই অর্থের প্রায় কাছাকাছি। প্লেটো-র মতে—এই ভাবাদর্শের জগৎটিই সত্য যার অস্তিত্ব আছে ঈশ্বরের চিত্তে। এই ভাবাদর্শের জগতের অনুকরণে ঈশ্বর যে পার্থিব জগৎ সৃষ্টি করেছেন তা ওই আদর্শ জগৎটির মতো নিখুঁত ও সম্পূর্ণ নয়। কারণ অনুকরণ করতে গেলেই তা মূল থেকে কিছুটা বিচ্যুত হবে। অনুকরণ কখনই মূলের মতো পূর্ণ সত্য হয় না।

এখানেই আরিস্টটল সম্পূর্ণ সরে আসেন প্লেটো-র অভিমত থেকে। আরিস্টটল-এর তত্ত্বে ভাবাদর্শের জগতের অস্তিত্ব, সেই জগতের সত্যতার স্বীকৃতি এবং ঈশ্বর ইত্যাদি প্রসঙ্গের কোনো উল্লেখই নেই। অ-পার্থিব ভাবজগতের আদর্শে ঈশ্বর এই বাস্তব জগৎকে অনুকরণাত্মকভাবে সৃষ্টি করেছেন—এরকম কোনো কথাই আরিস্টটল বলেননি। আরিস্টটল-এর কাছে বাস্তব জগৎই সত্য। এবং সেখান থেকেই শিল্পীরা অনুকরণ করে থাকেন বস্তুকে, মানুষকে, ঘটনাকে এবং অনুভূতিকেও। একজন ভববাদী ঈশ্বরবিশ্বাসীর সঙ্গে একজন বাস্তববাদী বিজ্ঞানীর মনের যে পার্থক্য থাকে তা-ই ছিল প্লেটো এবং আরিস্টটল-এর মধ্যে।

দ্বিতীয়ত প্লেটো-র মতে অনুকরণ ব্যাপারটাই ত্রুটিযুক্ত, অসম্পূর্ণ এবং মিথ্যাচার। তাঁর মতে অনুকরণ কখনই মূলের মতো যথাযথ হতে পারে না। স্বয়ং ঈশ্বর ভাবাদর্শের পৃথিবীর যে বাস্তব প্রতিরূপ নির্মাণ করেছেন সেখানেও আছে অসম্পূর্ণতা। বাস্তব জগৎটি-ই প্রকৃত সত্যের জগৎ থেকে এক ধাপ সরে গেছে। অতঃপর যখন কবি ও শিল্পীরা বাস্তব জগৎ থেকে আবার কিছু অংশ নির্বাচন করে নিয়ে অনুকরণ করেন তখন তা সত্য থেকে দুই ধাপ দূরে সরে গেল। *রিপাবলিক* গ্রন্থের দশম অধ্যায়ে প্লেটো একথা বলেছেন। এজন্য কবি ও শিল্পীদের সৃষ্টি অসম্পূর্ণ এবং মিথ্যা।

প্রসঙ্গত আমরা প্লেটো-র অভিমতের মধ্যেই একটি অসংগতি লক্ষ করি। *রিপাবলিক* গ্রন্থের ওই দশম অধ্যায়ে-ই ট্র্যাজেডির কথা বলতে গিয়ে প্লেটো আবার বলেছেন ট্র্যাজিক কবিরা অন্যান্য অনুকারকদের মতোই সত্য থেকে তিন ধাপ দূরে অবস্থিত। একবার দুই ধাপ এবং একবার তিন ধাপ বলবার কারণ খুব স্পষ্টভাবে ব্যাখ্যা করা হয়নি। এ-বিষয়ে আমরা একটি অনুমান করতে পারি। কবিরা বা শিল্পীরা যে অনুকরণ করেন তার অবলম্বন হতে পারে দুই প্রকার— প্রাকৃতিক এবং মনুষ্য-সৃষ্ট। প্রকৃতিতে যে বৃক্ষ, পর্বত, সমুদ্র ইত্যাদি আছে সেগুলি হল ঈশ্বরের হাতে গড়া অনুকরণ। সেখান থেকে শিল্পী যখন অনুকরণ করেন তখন তা আদর্শ সত্য থেকে দুই ধাপ দূরে। কিন্তু মানুষ পৃথিবীতে অনেক কিছু নিজে তৈরি করে— যেমন চেয়ার-টেবিল, খাট এবং মানব-সম্পর্কজনিত আচরণ। এগুলি স্বরূপতই সত্য থেকে দুই ধাপ দূরে এবং মানুষের পরিকল্পিত। খাটের উদাহরণটি বারবার প্লেটো এনেছেন। আদর্শ খাটের একটি ধারণা ; ঈশ্বরের তৈরি কোনো খাট হয়তো বা কোথাও আছে। মানুষ সেই ধারণাকে অবলম্বন করে খাট তৈরি করেছে পাথর, কাঠ অথবা ধাতু দিয়ে। কবি এবং শিল্পী আবার সেই খাটকে বর্ণনা করেছেন বা চিত্রকলায় রূপ দিয়েছেন। খাট এবং গাছ এক জাতীয় বস্তু নয়। এখান থেকেই হয়তো একবার মানুষের অনুকরণ সত্য থেকে দুই ধাপ সরে এসেছে, আর একবার তিন ধাপ সরে এসেছে এরকম বলেছেন প্লেটো। শিল্পীরা এবং কবিরা অনেক সময়েই মানবীয় আচরণের অনুকরণ করেন। নাটক হল সেই জাতীয় অনুকরণ। সেই জন্য নাটকলেখকেরা সত্য থেকে তিন ধাপ সরে গেছেন।

প্লেটো-র বিপরীতে আছেন আরিস্টটল। আমরা আগেই বলেছি আরিস্টটল-এর কাছে ভাবাদর্শের জগতের কোনো অস্তিত্ব ছিল না। তাকে তিনি সত্য বলেও স্বীকার করেননি। কবি ও শিল্পীরা যা সৃষ্টি করেন তাকে তিনি অসম্পূর্ণ, ত্রুটিযুক্ত বা মিথ্যা— কিছুই বলেননি। তাঁর মতে কবি-শিল্পীদের সৃষ্টিও এক ধরনের সত্য। তা সম্ভাব্য সত্য এবং তা-ই প্রকৃত সংগতিপূর্ণ যথার্থ সত্য।

অনুকরণ সম্পর্কে প্লেটো এবং আরিস্টটল-এর মানসিকতায় একটি মৌল পার্থক্য ছিল। প্লেটো প্রথম থেকেই অনুকরণকে ত্রুটিযুক্ত এবং মিথ্যাচারী বলে ধরে নিয়েছেন। প্রাচীন গ্রিক মনীষীরা অনেকেই কবিদের মিথ্যাচারী বলে মনে করতেন। বিশেষ করে নাটককার এবং অভিনেতাদের ভয়ংকর মিথ্যাচারী বলে মনে করতেন তাঁরা। কারণ তারা অন্যের ভূমিকায় কথা বলে, অন্যের রূপসজ্জা ধারণা করে। বোঝা যায় যে, শিল্পের সত্য এবং নান্দনিক সত্য সম্পর্কিত কোনো ধারণা তখনও গড়ে ওঠেনি। বস্তুত শিল্পের সত্য সম্পর্কিত ধরণার প্রবক্তা হিসেবেও আমরা আরিস্টটলকে মর্যাদা দিতে পারি।

আরিস্টটল অনুকরণ সম্পর্কে হীনার্থক ধরণা একেবারেই পোষণ করতেন না। *পোয়েটিকস* গ্রন্থের চতুর্থ অধ্যায়ে এই নিয়ে স্বচ্ছ আলোচনা করেছেন। তিনি যা বলেছেন তা সূত্রাকারে এরকম—

ক. "শৈশব থেকেই অনুকরণ মানুষের স্বাভাবিক (বৃত্তি)"। (অনুবাদ শিশির কুমার দাশ) অনুকরণকে তিনি মানুষের সহজাত বৃত্তি বলেছেন যা প্রকৃতই মনস্তত্ত্বসম্মত।

খ. আরিস্টটল বলেছেন —"অন্য পশুর থেকে মানুষের সুবিধে হল এই যে সে পৃথিবীর সবচেয়ে বেশি অনুকরণকারী জীব, অনুকরণের মধ্যেই তার শিক্ষার শুরু।" [পূর্বোক্ত]

আরিস্টটল-এর এই পর্যবেক্ষণও নৃবিজ্ঞান এবং মানব-মনস্তত্ত্ব-সম্মত। মানুষের মস্তিষ্ক উন্নত বলেই যে মানুষ এইভাবে অনুকরণ করতে পারে— যা মানুষের শিক্ষার সোপান— তা আরিস্টটল নির্দেশ করেছেন।

আরিস্টটল সুন্দরভাবে বলেছেন— "আর অনুকরণ থেকে আনন্দ পাওয়াও আমাদের স্বভাব, এই উক্তির সারবত্তা আমাদের অভিজ্ঞতার দ্বারা পরীক্ষিত।" (পূর্বোক্ত) আরিস্টটল-এর কথার মধ্যেই নিহিত আছে সেই সত্য— শিল্প মাত্রেই অনুকরণ এবং শিল্প মাত্রেই আনন্দদায়ক। তিনি ওই অংশেই এই দৃষ্টান্ত দিয়েছেন যে শবদেহের দৃশ্য সুন্দর নয় কিন্তু শিল্পে যখন তার অতি নিখুঁত প্রতিরূপ দেখা যায় তখন আমরা আনন্দ পাই। অতএব অনুকরণ হল শিক্ষার উৎস এবং আনন্দদায়ক ক্রিয়া।

অনুকরণ সম্পর্কে প্লেটো এবং আরিস্টটল-এর এই মৌলিক পার্থক্য আমাদের মনে রাখতে হবে।

তৃতীয়ত প্লেটো-র সঙ্গে আরিস্টটল-এর শিল্প সম্পর্কিত অভিমতের আর একটি পার্থক্য ছিল শিল্পীদের মিথ্যাচারের ধারণা। প্লেটো যথার্থই লক্ষ করেছিলেন যে, কবি ও শিল্পীদের অনুকরণ বাস্তবের মানুষ ও ঘটনাবলি থেকে কিছু কিছু সরে আসে। এই সরে আসা তিনি কিছুতেই অনুমোদন করতে পারেননি তাই কবিদের মিথ্যাচারী বলেছেন। তাঁর সমকালীন দর্শনবিদরাও এরকমই ভাবতেন। কিন্তু আরিস্টটল-এর কাছে শিল্প যথাযথ অনুকরণ বলে প্রতিভাত ছিল না। বিভিন্নভাবে *কাব্যতত্ত্ব* গ্রন্থে সেই প্রসঙ্গ আছে। প্রথমেই দেখি *কাব্যতত্ত্ব*-এর দ্বিতীয় পরিচ্ছেদে আরিস্টটল বলেছেন কোথাও কোথাও বাস্তব মানুষের চেয়ে সুন্দরতর ও

মহত্তর করে কাব্যে বা চিত্রে মানুষকে আঁকা হয়। আবার কোথাও তাদের দেখানো হয় বাস্তব মানুষের চেয়ে 'হীনতর' করে। ট্র্যাজেডিতে মানুষের মহৎ রূপের প্রকাশ প্রত্যাশিত। কমেডিতে তার অসুন্দর এবং নিম্নতর রূপটি অনেক সময় ফুটে ওঠে। তা ছাড়াও ট্র্যাজেডির কাহিনিকে আদি-মধ্য-অন্ত যুক্ত সুসংহতি দান করতে গিয়ে বাস্তবের ঘটনাকে কিছুটা ভিন্নভাবে বিন্যস্ত করে নিতে হয়। ইতিহাসে যেমন সব ঘটনাকেই স্থান দিতে হয়, ট্র্যাজেডিতে তেমন দেবার প্রয়োজন নেই। অভিপ্রায় অনুসারে কিছু ঘটনা বর্জন করা যেতে পারে আবার যা বাস্তবে ঘটেনি কিন্তু ঘটতে পারে এবং ঘটা সম্ভব তাকেও কাব্যে স্থান দেওয়া যেতে পারে। অর্থাৎ আরিস্টটল অনুকরণকে মিথ্যাচার বলে ভাবতেই পারেননি। উপরন্তু তাকে সৃষ্টিকর্মেরই মর্যাদা দিয়েছেন। *কাব্যতত্ত্ব* গ্রন্থের নবম পরিচ্ছেদে তিনি এভাবেই কাব্যকে ব্যাখ্যা করেছেন—"................কাব্য ইতিহাসের চেয়ে বেশি দার্শনিক এবং বেশি গভীর, কারণ ইতিহাস বলে নির্দিষ্ট তথ্যের কথা কাব্য বলে সার্বজনীন সত্য।" (অনুবাদ শিশিরকুমার দাশ) প্লেটো-র সঙ্গে আরিস্টটল-এর অনুকরণ সম্পর্কিত মত-পার্থক্যের দিকটি এভাবেই সুস্পষ্ট হয়ে যায়।

চতুর্থত শিল্প বিষয়ে প্লেটো-র গুরুতর একটি অভিযোগ ছিল নীতি সম্পর্কিত। তিনি বলেছিলেন, কাব্যে দেবতাদের চরিত্রকে হীন মনোভাব-সম্পন্ন দেখানো হয়। দেবতাদের নিষ্ঠুরতা, আধিপত্যকামিতা এবং ব্যভিচার সর্বদাই কবিরা দেখিয়ে থাকেন। রাষ্ট্রশাসকেরা দেবতাদের প্রতিনিধি। দেবতাদের প্রতি আনুগত্য হ্রাস পেলে রাষ্ট্র-নেতাদেরও দেশের তরুণ সমাজ মান্য করবে না। যেহেতু প্রাচীন গ্রিস-এ রাষ্ট্রীয় আনুগত্যই নাগরিকদের অন্যতম কর্তব্য ও নীতি রূপে বিবেচিত হত তাই নাগরিকদের মনে বিদ্রোহের ভাবকে অ-নৈতিক মনে করেছেন প্লেটো।

এছাড়াও প্লেটো অনুভব করেছিলেন যে, কাব্যে কবিরা মানুষের কামনা, বাসনা, উচ্চাকাঙ্ক্ষা, ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্য ইত্যাদি অনুভূতিগুলিকে অত্যন্ত উজ্জ্বল ভাবে প্রতিষ্ঠিত করেন। এক ব্যক্তি মহান হয়ে উঠছেন এবং কোথাও কোথাও রাষ্ট্রীয় বিধানকে অমান্য করছেন এমন প্রায়ই দেখা যায় ট্র্যাজেডিতে। মানুষের মনে এই সব প্রবৃত্তির অনুশাসনবিহীন প্রকাশ সমাজে স্বেচ্ছাচারকে প্রশ্রয় দেবে। আমরা আগেই বলেছি প্লেটো-র এই অভিমত একেবারে ভিত্তিহীন নয়। পৃথিবীর সব দেশেই এই যুক্তির বলে রাষ্ট্রশাসক ও সমাজবিধায়কেরা সাহিত্য, নাট্যকলা এবং চলচ্চিত্রকে সমালোচনা করেছেন।

প্লেটো-র এই আপত্তিও আরিস্টটল খণ্ডন করেছিলেন। আরিস্টটল-এর যুক্তিতে শিল্পে এক গভীরতর সত্য প্রতিষ্ঠিত হয়। তিনি বলেছেন শিল্প জাগতিক বাস্তবে প্রতিষ্ঠিত কোনো বস্তু নয়। শিল্প হল শিল্পীর নিজস্ব সৃষ্টি। কাজেই বাস্তব সংসারের নৈতিকতার আদর্শ সব সময়ে শিল্পের জগতের নৈতিকতার সম মাত্রায় বিবেচিত হতে পারে না। স্পষ্ট করে না বললেও আরিস্টটল-এর কথা থেকে বোঝা যায়, সাধারণ মানুষ বাস্তবের নীতি আর শিল্পের নীতিকে এক মানদণ্ডে গ্রহণ করে না। এই ভাবে শিল্পের ক্ষেত্রে এক স্বতন্ত্র শৈল্পিক মানদণ্ডের প্রতিষ্ঠা নন্দনতত্ত্বের ক্ষেত্রে চিন্তনের নতুন দিগন্ত উন্মোচন করেছেন আরিস্টটল।

কাব্যতত্ত্ব গ্রন্থের চতুর্থ অধ্যায়ে আরিস্টটল বলেছেন—অনুকরণ মানুষের পক্ষে স্বাভাবিক, শিক্ষণীয় এবং আনন্দদায়ক। সেই সঙ্গে তিনি বলেছেন ট্র্যাজেডি-দর্শনে দর্শকের চিত্তে কোনো অনৈতিক ভাবের উদ্‌বোধন ঘটে না। বরং ট্র্যাজেডির চরিত্রগুলির ভাগ্যবিড়ম্বিত এবং শোকাবহ পরিণামে দর্শকদের মনে করুণা এবং ভয়ের অনুভতির আলোড়ন জাগে। এই দুটি অনুভূতির আতিশয্যজনিত মোক্ষণ ঘটে দর্শকদের চিত্তে। তার ফলে মনের মধ্যে যে প্রশান্তি

ও ভারসাম্য আসে তাকেই ক্যাথারসিস বলে উল্লেখ করেছেন আরিস্টটল। ক্যাথারসিস শিল্পের শ্রোতা ও দর্শকদের পক্ষে আনন্দদায়ক। অনেকেই বলেন কাব্য সম্পর্কে প্লেটো-র অভিযোগের উত্তর হল আরিস্টটল-কথিত ক্যাথারসিস।

এখানেই আমাদের প্লেটো এবং আরিস্টটল-এর শিল্পতত্ত্ব তথা অনুকরণ-তত্ত্বসম্পর্কিত তুলনাত্মক আলাচনা সম্পূর্ণ হয়। আমরা দুজনেরই অবস্থান স্পষ্টভাবে বুঝতে পারি।

শিল্পের অনুকরণতত্ত্ব বিষয়ে আরিস্টটল-এর আরও একটি চিন্তা-শৃঙ্খলা আমাদের মুগ্ধ করে। শিল্প যে অনুকরণ— এই ধারণা আরিস্টটল-পূর্ববর্তী গ্রিক চিন্তাবিদদের ছিল। প্লেটো-র লেখার মধ্যেই আমরা তার নিদর্শন পেয়েছি। কিন্তু সেই ধারণা ছিল ভাববাদী এবং অতীন্দ্রিয় জগৎ সম্পর্কিত বিশ্বাস-সংলগ্ন। আরিস্টটল-এর অনুকরণ-তত্ত্ব তুলনায় অনেক বেশি বিজ্ঞান-সম্মত, বাস্তব এবং সর্বজনগ্রাহ্য। এছাড়াও আরিস্টটল একটি মৌল প্রশ্নের উত্তর দিয়ে অসাধারণ মনীষার স্বাক্ষর রেখেছেন। সব শিল্পই অনুকরণ— একথা বলার পর বিভিন্ন শিল্পের মধ্যে পার্থক্য কীভাবে করা হবে তা তিনি নির্দেশ করে দিয়েছেন। তাঁর লেখা থেকে আমরা বুঝতে পারি যে, বিভিন্ন শিল্পের মধ্যে পৃথকত্ব নির্ণয় করা হয় অনুকরণের বিষয়, অনুকরণের মাধ্যম এবং অনুকরণের পদ্ধতির পার্থক্য দ্বারা। যদিও আরিস্টটল বিষয়টির ব্যাখ্যা খুব সংক্ষেপেই সেরেছেন তবু তাঁর ওই শ্রেণি-বিভাজনের যৌক্তিকতা এতই গভীর যে এখনও আমরা তা অনায়াসেই অনুকরণ করে থাকি।

কাব্যতত্ত্ব গ্রন্থের প্রথম পরিচ্ছেদেই আরিস্টটল কয়েকটি বাক্যে বলে দিয়েছেন যে, কাব্যের তথা শিল্পের বিভিন্ন শ্রেণি-বিভাগ আছে এবং বিভিন্ন শ্রেণির মধ্যে পার্থক্যের প্রকৃতি নিয়ে তিনি আলোচনা করবেন। তারপরেই তিনি বলেছেন সব ধরনের শিল্পই অনুকরণ— "মহাকাব্য, ট্রাজেডি, কমেডি এবং দিথুরামব কাব্য, বাঁশি বাজানো, কিথারা বাজানো— এই সব কিছুকেই সাধারণভাবে বলা চলে অনুকরণ। এরা (অবশ্য) পরস্পরের থেকে তিন ভাবে পৃথক, হয় তাদের মাধ্যমে, কিংবা বিষয়বস্তুতে কিংবা অনুকরণের রীতিতে।" (প্রথম পরিচ্ছেদ, অনুবাদ শিশিরকুমার দাশ) আরিস্টটল-এর এই বিশ্লেষণেই আমরা প্রথম বিভিন্ন শিল্পের মধ্যে সুনির্দিষ্ট পৃথকীকরণের ধারণা পাই। অনুকরণের বিষয় সম্পর্কে তিনি *কাব্যতত্ত্ব* গ্রন্থের দ্বিতীয় পরিচ্ছেদে বলেছেন—'অনুকরণের বিষয় হল মানুষ ও তার ক্রিয়াকর্লাপ।' এই সংক্ষিপ্ত উক্তিটিতে এই সত্যই প্রতিষ্ঠিত হয় যে, মানুষ ছাড়া শিল্পের অন্য কোনো অবলম্বন নেই'। আরিস্টটল মাত্র এটুকুই বলেছেন। আমরা বিষয়টিকে আরও একটু ব্যাখ্যা করতে পারি। ভাষাশিল্পে, চিত্রকলায় এবং মূর্তিকলায় সরাসরি মানুষকে প্রতিরূপায়িত করা হয়। কিন্তু যখন ছবি বা ভাস্কর্যে কোনো প্রাকৃতিক বস্তু, যেমন— বৃক্ষলতা, নদী, পর্বত ইত্যাদি অনুকরণ করা হয়, তখনও তা মানুষেরই দৃষ্টিকোণ থেকে উপস্থাপিত বলে এবং মানুষেরই ক্রিয়া রূপে উপস্থাপিত বলে মানুষই সেখানে বিষয়— এমনই মনে করেছেন আরিস্টটল। পশু-পাখির অনুকরণ সম্পর্কেও সে কথাই প্রযোজ্য।

এরপরে আরিস্টটল অনুকরণের বিষয় সম্পর্কে একটি বৈশিষ্ট্যের উল্লেখ করেছেন। তিনি বলেছেন— মানুষ হয় দুই শ্রেণির, ভালো এবং মন্দ। সাধুতা এবং নীচতার মানদণ্ডে মানুষের নৈতিক চরিত্রের বিচার হয়। শিল্পে এই ভালো এবং মন্দ উভয় শ্রেণিকেই বিষয় হিসেবে গণ্য করা হয়। কাব্য, চিত্রকলা, সংগীত—সব শিল্প সম্পর্কেই এই উক্তি প্রযোজ্য।

প্রথম পরিচ্ছেদে আরিস্টটল অনুকরণের মাধ্যম প্রসঙ্গে আলোচনা করেছেন। মোটের উপর বিশদভাবেই তিনি বলেছেন—অনুকরণ করা হয় "কখনও রং ও রূপের সাহায্যে, কখনও কণ্ঠস্বরের সাহায্যে।"

স্পষ্টতই এখানে তিনি চিত্রশিল্প এবং কণ্ঠসংগীত বা আবৃত্তির কথা বলেছেন। আবার তাঁর মতে অনুকরণ করা হয়—"কখনও শুধু ছন্দে, কখনও শুধু ভাষায়, কিংবা সুরে, আর কখনও এদের সমাহারে।" তিনি কেবল ছন্দে অনুকরণের উদাহরণ হিসেবে নৃত্যের উল্লেখ করেছেন। "আবার নাচের সময় নর্তকেরা সুর নয়, শুধু ছন্দের উপর নির্ভরশীল, ছন্দোময় দেহভঙ্গির সাহায্যে তাঁরা অনুকরণ করেন চরিত্র অভিজ্ঞতা এবং ঘটনা।" যদিও নৃত্যের সময় নর্তকের দেহ হল প্রধান মাধ্যম—একথা মনে রাখতে হবে। কেবল সুর এবং ছন্দ ব্যবহার করে অনুকরণ করা হয় বাঁশি, কিথারা, পাইপ এবং অন্যান্য যন্ত্রসংগীতে।

এরপরে আরিস্টটল সাহিত্যের প্রসঙ্গে এসেছেন। সাহিত্য শব্দটির তখনও প্রচলন হয়নি। আরিস্টটল লিখেছেন—"আর একটি শিল্প আছে, যেখানে অনুকরণ করা হয় কখনও পদ্যে, কখনও গদ্যে। কখনও বা এক ধরনের ছন্দে, কখনও বা একাধিক ছন্দে সেই শিল্প গঠিত হয়। এই শিল্পটির এখনও পর্যন্ত নামকরণ করা হয়নি..............।" (প্রথম পরিচ্ছেদ) আরিস্টটল এখানে ভাষা-মাধ্যমের শিল্পের কথাই বলেছেন। উদাহরণ হিসেবে মহাকাব্য, এলিজি নোম কবিতা, ট্র্যাজেডি এবং কমেডি ইত্যাদির উল্লেখ করেছেন।

এই পরিচ্ছেদেই অত্যন্ত সতর্কভাবে আরিস্টটল বলে দিয়েছেন—যেন মাধ্যম ও পদ্ধতিগত সাদৃশ্য দেখে বিষয়ের পার্থক্য ভুলে যাওয়া না হয়। বিজ্ঞানের বইও ছন্দোবদ্ধভাবে লেখা যায়। কিন্তু সেই লেখককে কবি আখ্যা না দেওয়াই ভালো। আরিস্টটল বলেননি কিন্তু আমরা বুঝতে পারব যে, অবলম্বিত বিষয় যদি মানুষ ও তার ক্রিয়াকলাপ না হয় তাহলে তাকে শিল্প বলা যায় না। আরিস্টটল-এর ভাষায়—".......তাঁরা ছন্দে পদ্য লেখেন বলে তাঁদের কবি বলা হয়। এমনকি চিকিৎসাবিদ্যা কিংবা প্রাকৃতিক বিজ্ঞান সম্বন্ধেও পদ্যে বই লিখলেই লোকে প্রথাবশত তার রচয়িতাকে কবি আখ্যা দেয়। অথচ হোমার (হোমের) আর এমপেদোক্লেস-এর (রচনার) মধ্যে ছন্দ ছাড়া আর কোন মিল নেই। এদের একজনকে কবি ও অন্যজনকে বিজ্ঞানী বলাই সঙ্গত।" [প্রথম পরিচ্ছেদ]

অনুকরণের পদ্ধতি সম্পর্কে আরিস্টটল প্রধানত *কাব্যতত্ত্ব* গ্রন্থের তৃতীয় পরিচ্ছেদে কিছু কথা বলেছেন। প্রথম ও দ্বিতীয় পরিচ্ছেদেও অনুকরণের পদ্ধতি সম্পর্কে কিছু কিছু কথা আছে। পদ্ধতির আলোচনা করতে গিয়ে আরিস্টটল কেবল ভাষাশিল্পের প্রসঙ্গেই সীমাবদ্ধ থেকেছেন। প্রথমেই তিনি লিখেছেন—"যেমন একই বিষয় একই পদ্ধতিতে রচনা করার সময় এটা খুবই সম্ভব যে কিছুটা বর্ণনার মধ্য দিয়ে বলা যায়, আর কিছুটা, যেমন হোমার করেছেন, লেখক যেন একটি চরিত্রের ভূমিকা নিয়েছেন, কিংবা সোজাসুজি নিজেই বলা যায়, কিংবা চরিত্রগুলিই যেন জীবন্ত, তারাই সব ঘটাচ্ছে এমন ভাবেও বর্ণনা করা সম্ভব।" (তৃতীয় পরিচ্ছেদ) বোঝাই যায় যে আরিস্টটল এখানে অনুকরণের পদ্ধতির পার্থক্যের দিক থেকে মহাকাব্য এবং ট্র্যাজেডি তথা নাটককে ভিন্ন ভিন্ন গোত্রে রেখেছেন। লেখক সরাসরি বর্ণনা করছেন সব কিছু, অথবা একটি চরিত্রের দৃষ্টিকোণ অবলম্বন করে বর্ণনা করছেন তার বিষয়—এটি হল মহাকাব্যের অনুকরণ পদ্ধতি। আবার যেখানে চরিত্রগুলিই জীবন্ত এবং সবকিছু ঘটাচ্ছে—এই পদ্ধতিতে অনুকরণ-করা হয়, তখন তা হবে নাটক।

পদ্ধতি সম্পর্কে মাত্র এটুকুই কথা আছে তৃতীয় পরিচ্ছেদে। কিন্তু যখন দ্বিতীয় পরিচ্ছেদে আরিস্টটল বলেন বাস্তবের চেয়ে মহত্তর, বাস্তবের চেয়ে হীনতর এবং যথাযথ বাস্তব—এভাবেও কোনো মানুষের অনুকরণ করা যায় তখন সেখানেও একটি পদ্ধতির পার্থক্য অনুভূত হয়। বাস্তবের চেয়ে মহত্তর পদ্ধতিতে ট্র্যাজেডিতে মানুষের অনুকরণ করা

হয়; বাস্তবের চেয়ে হীনতর করে মানুষকে দেখানো হয় কমেডিতে—একথা আরিস্টটল বলেছেন।

আরিস্টটল অনুকরণের এই বিশ্লেষণ এবং বিভাজন যেভাবে করেছেন তা তাঁর সময়ের পক্ষে ছিল বিস্ময়কর প্রতিভার পরিচায়ক। অনেক কাল পরে অষ্টাদশ শতকের জার্মান শিল্পতত্ত্ববিদ জি. ই. লেসিং এই শিল্পতত্ত্বে একটি সুচিন্তিত নতুন ধারণা যোগ করেন। তিনি বলেছিলেন যে, অনেক সময়ে বিষয়ের ভিন্নতার কারণেও পদ্ধতির পার্থক্য ঘটে থাকে। এজন্য চিত্রকলা এবং সংগীতের অনুকরণ-রীতির সঙ্গে সাহিত্যের অনুকরণ-রীতি সব সময় একই মানদণ্ডে বিচার্য নয়।

সকল শিল্পই যে অনুকরণ—এই ধারণা আরিস্টটল-এর আগেও চিন্তাবিদরা অর্জন করেছিলেন। কিন্তু এই অনুকরণ কীসের অনুকরণ সে-সম্পর্কে তাঁদের ধারণা ছিল অবাস্তব। তাঁদের ধারণায় অস্তিত্ব ছিল এক অ-লৌকিক বিশ্বের। তাঁদের মতে পৃথিবী সেই অ-লৌকিক বিশ্বের আদর্শে ঈশ্বরের হাতে গড়া প্রথম অনুকরণ এবং তা-ও অসম্পূর্ণ। এই ধরনের অ-প্রমাণসাপেক্ষ আধ্যাত্মিক বিশ্বাসের স্তর থেকে বিজ্ঞানমনস্ক বাস্তববাদী আরিস্টটল অনুকরণকে একটি জাগতিক সত্য রূপে প্রতিষ্ঠিত করেন। তাঁর মতে এই পৃথিবী সম্পূর্ণ বাস্তব এবং তাকেই শিল্পীরা অনুকরণ করেন। সেই অনুকরণই শিল্প। আজ পর্যন্ত এই ধারণার কোনো বিকল্প প্রতিষ্ঠিত হয়নি।

আরিস্টটল অনুকরণকে প্রভূত মর্যাদা দিয়েছেন। তাঁর সুচিন্তিত উক্তি— অনুকরণ মানুষের স্বাভাবিক ক্রিয়া, অনুকরণ মানুষের সর্বপ্রকার শিক্ষার সোপান, অনুকরণ আনন্দদায়ক, এবং অনুকরণই মানুষের সৃষ্টিকর্মের উৎস। এ-কথাগুলির কোনোটিই ভুল নয়। এত স্পষ্টভাবে তাঁর আগে অনুকরণকে এভাবে কেউ ব্যাখ্যা করেননি।

আরিস্টটল-এর সর্বাধিক কৃতিত্ব শিল্প হিসেবে অনুকরণের যথার্থ ব্যাখ্যা দান। আরিস্টটল-এর পূর্ববর্তী চিন্তাবিদরা লক্ষ করেছিলেন যে, অনুকরণ একেবারে যথাযথ প্রতিরূপ হয় না। এ জন্য প্লেটো অনুকরণকে ত্রুটিযুক্ত, অসম্পূর্ণ এবং মিথ্যাচার বলে মত প্রকাশ করেছিলেন। কিন্তু আরিস্টটল-ই প্রথম ঘোষণা করেন যে যথাযথ প্রতিরূপ হয়ে ওঠা অনুকরণের কাজ নয়। যা ঘটেছে, যা ঘটে থাকে, যা ঘটা সম্ভব এবং যা ঘটা উচিত— এই সব কিছুর সমন্বয়ে মানুষ তার অনুকরণ-ক্রিয়াকে সৃষ্টির পর্যায়ে তুলে নিয়ে যেতে পারে। তা-ই হল প্রকৃত শিল্প। এজন্য আরিস্টটল-এর অনুকরণতত্ত্ব শিল্পতত্ত্ব হিসেবে আজও সমানভাবে গ্রহণযোগ্য হয়ে আছে।

আরিস্টটল-বিবৃত অনুকরণতত্ত্ব প্রকৃতপক্ষে প্রথম পূর্ণাঙ্গ শিল্পতত্ত্ব যার সাহায্যে সাহিত্য-শিল্পের যথার্থ রূপ বিচার করা হয়। সৃষ্টিশীল শিল্প আর প্রয়োজনাত্মক শিল্পের প্রভেদ প্রথম স্পষ্টভাবে করেছেন তিনি। তিনিই প্রথম যিনি স্বচ্ছ করে দেন সাহিত্য, শিল্পের প্রয়োজনীয়তা, রাজনীতি, ধর্ম আর অন্য সব বিষয়ে প্রয়োজনীয়তা থেকে স্বতন্ত্র। আরিস্টটল-ই সবার আগে ব্যাখ্যা করে দেন নির্দিষ্ট বিষয়ের মধ্যে সর্বজনীনতার প্রকাশ— শিল্প-সাহিত্যের এই প্রাথমিক লক্ষণটি। এভাবেই তিনি শিল্পের মধ্যে জীবনের গভীর উপলব্ধি ও জীবনের সত্যকে অনুভব করেছেন। শিল্প-সাহিত্যের যে সংজ্ঞা তিনি নির্দেশ করেছেন তাঁর অনুকরণতত্ত্বে, দ্বি-সহস্রাধিক বর্ষ ব্যাপ্ত সময়স্রোতে তা আলোচিত হয়েছে এবং হয়ে চলেছে। তথাপি এখনও সে-তত্ত্বের অনতিক্রম্যতা প্রতিষ্ঠিত সত্য। তাই বলা যায় আরিস্টটল-বিবৃত অনুকরণতত্ত্ব যথার্থই সাহিত্য-সম্পর্কিত একটি ক্লাসিক তত্ত্ব।

[২]

আরিস্টটল-এর কাব্যতত্ত্ব

প্রস্তাবনা

পাশ্চাত্য মননচর্চায় ট্র্যাজেডি সম্পর্কে প্রথম যে লিখিত রচনা আমাদের হাতে এসেছে তার লেখক হলেন প্রখ্যাত গ্রিক মনীষী আরিস্টটল। কেবল ট্র্যাজেডি নয়, শিল্প সম্পর্কে; দর্শন, রাষ্ট্রনীতি, বিজ্ঞান ইত্যাদি বিভিন্ন বিষয় নিয়ে আলোচনা করেছেন তিনি। প্রাচীন কালের মনীষীরা প্রায়শই বিভিন্ন বিষয়ে তাঁদের ভাবনার পরিধিকে বিস্তৃত করে দিতেন। কিন্তু একাল পর্যন্ত আরিস্টটল-এর যে আদি ভাবনাগুলি বারবার বিভিন্ন আলোচনায় উঠে আসে এবং গুরত্বপূর্ণভাবে প্রাসঙ্গিক হয়ে ওঠে, ট্র্যাজেডিতত্ত্ব তার অন্যতম। বিভিন্ন দিক থেকে আমরা তাঁর ট্র্যাজেডি-ভাবনাকে বিশ্লেষণ করব। প্রথমেই তাঁর জীবন সম্পর্কে সামান্য কয়েকটি কথা জেনে নেওয়া প্রয়োজন।

ম্যাসিদনিয়া-র স্ট্যাগিরা নামক অঞ্চলে ৩৮৪ খ্রিস্টপূর্বাব্দে আরিস্টটল-এর জন্ম। তাঁর জননীর দ্বিতীয় স্বামীর কাছেই পুত্র নির্বিশেষে তিনি পালিত হয়েছিলেন। সেই পালক-পিতা ছিলেন ম্যাসিদনিয়া-র রাজ-পরিবারের চিকিৎসক। সতেরো বছর বয়সে তিনি এথেন্স-এ চলে আসেন এবং তাঁর পূর্বসূরি, প্রখ্যাত দর্শনবিদ প্লেটো-র শিক্ষায়তনে ছাত্র হিসেবে প্রবেশ করেন। তিনিই ছিলেন প্লেটো-র আকাদেমি-র উজ্জ্বলতম শিক্ষার্থী। মোটামুটি কুড়ি বছর প্লেটো-র সান্নিধ্যে থেকে, প্লেটো-র মৃত্যুর পর আরিস্টটল এথেন্স ছেড়ে নিজের অঞ্চলে ফিরে আসেন। ম্যাসিদনিয়া-র রাজা ফিলিপ ওই সময়ে তাঁর তরুণ পুত্র আলেকজাণ্ডার-এর শিক্ষক নিযুক্ত করেন আরিস্টটলকে। আরিস্টটল সেই সময় জ্ঞানচর্চায় বিশিষ্ট ব্যক্তিত্ব ছিলেন। তাঁর আগ্রহ ছিল বহু বিষয়ে— যেমন রাষ্ট্রবিজ্ঞান, শিল্পতত্ত্ব ও সাহিত্য, ইতিহাস, তর্কশাস্ত্র, বিজ্ঞান, প্রাণীবিদ্যা ও চিকিৎসাবিদ্যা, গণিত ও ভাষণকলা। আলেকজাণ্ডার ৩৩৫ খ্রিস্টপূর্বাব্দে সিংহাসনে আরোহণ করলে আরিস্টটল আবার এথেন্স-এ ফিরে যান এবং লাইসিয়াম বা লাইসিয়ুম (Lyceum) নামক এক শিক্ষায়তনের পরিচালক নিযুক্ত হন। তাঁর আকর্ষণে বহু ছাত্র লাইসিয়াম-এ যোগদান করেন। এই লাইসিয়াম-এ শিক্ষক থাকাকালীনই আরিস্টটল তাঁর বিখ্যাত গ্রন্থগুলি এবং সম্ভবত *কাব্যতত্ত্ব*-ও লিখেছিলেন। এই *কাব্যতত্ত্ব*-র মধ্যেই আলোচিত হয়েছে ট্র্যাজেডির বিভিন্ন দিক। কিন্তু আলেকজাণ্ডার-এর মৃত্যুর পর আরিস্টটল সম্পর্কে কিছু বিরুদ্ধতা দেখা দেয়। অনেক বিষয়ে তিনি রক্ষণশীল ধারণাকে আঘাত করেছিলেন বলেই এই বিরুদ্ধতা। আরিস্টটল এথেন্স ছেড়ে ৩২২ খ্রিস্টপূর্বাব্দে ইউবিয়া (Euboea)-তে কলকিস (Chalcis) নামক স্থানে চলে যেতে বাধ্য হন। সেখানেই তাঁর মৃত্যু হয় ৩২২ খ্রিস্টপূর্বাব্দে।

আরিস্টটল যখন শিল্প ও কাব্যতত্ত্ব বিষয়ে চিন্তা-ভাবনা করছিলেন তখন গ্রিস-এ নাটকচর্চার বহুল জনপ্রিয়তা ছিল। রাষ্ট্রীয় পৃষ্ঠপোষকতায় হত নাট্য-প্রতিযোগিতা। ট্র্যাজেডি ও কমেডি— দুইয়েরই অভূতপূর্ব সমুন্নতি দেখা গিয়েছিল প্রাক-খ্রিস্টীয় পঞ্চম-চতুর্থ শতকের গ্রিস-এ। সুবিখ্যাত এবং কালোত্তীর্ণ তিনজন গ্রিক ট্র্যাজেডি-রচয়িতা— ইস্কাইলাস, (Aeschylus : 525-456 B.C), সোফোক্লিস (Sophocles : 496-405 B.C) এবং ইউরিপিডিস (Euripides : 484-406 B.C) এই সময়েই আর্বিভূত হন। কমেডি-লেখকদের মধ্যে প্রায় অবিসংবাদিতভাবে সর্বোত্তম আরিস্টোফানিস (Aristophanes : 448?-380 B.C)-ও প্রায় এই সময়কালেই আবির্ভূত হয়েছিলেন। যদিও কমেডি তখন যথেষ্ট জনপ্রিয় ছিল তবু ট্র্যাজেডি-র জনপ্রিয়তার

সঙ্গে সেই সময় অন্য কিছুরই তুলনা করা যেত না। আরিস্টটল নিজে সোফোক্লিস-এর ট্র্যাজেডির অত্যন্ত অনুরাগী ছিলেন।

এই সব ট্র্যাজেডি এবং কমেডিকে সামনে রেখেই শুরু হয় আরিস্টটল-এর নাটক-বিষয়ক ভাবনা। তিনি আলোচনা করেছেন নাটকের উদ্ভব ও ক্রমবিকাশ নিয়ে; ট্র্যাজেডির সংজ্ঞা নিয়ে; বৃত্ত বা প্লট বা কাহিনি, ট্র্যাজেডির বিভিন্ন উপাদান, চরিত্র এবং পরিণামী উপলব্ধি নিয়ে। নাটকের ভাষাও তাঁর আলোচনার মধ্যে স্থান পেয়েছে। আমরা এরপর ক্রমান্বয়ে এই বিষয়গুলি সম্পর্কে আলোচনা করব।

ট্র্যাজেডির উদ্ভব ও বিকাশ

আরিস্টটল ট্র্যাজেডির উদ্ভব সম্পর্কে খুব অল্প কয়েকটি কথা বলেছেন তাঁর *কাব্যতত্ত্ব* গ্রন্থে। তবে মনে রাখতে হবে এই বইটি অত্যন্ত সংক্ষিপ্ত এবং যথেষ্ট সুবিন্যস্তও নয়। ছাব্বিশটি পরিচ্ছেদে আরিস্টটল শিল্প-সম্পর্কিত অনুকরণতত্ত্ব, ট্র্যাজেডি ও কমেডির বিভিন্ন দিক, ইতিহাস ও মহাকাব্য সম্পর্কিত কিছু কথা এবং ভাষা সম্পর্কিত কিছু বিশ্লেষণ করেছেন। তাঁর মন্তব্যগুলি অতিশয় মূল্যবান কিন্তু আলোচনার বিষয় সম্পর্কে সম্পূর্ণ ধারণা করতে গেলে আমাদের অন্যান্য গবেষকের সন্ধানসূত্রে প্রাপ্ত আরও কয়েকটি কথা ট্র্যাজেডির উদ্ভব সম্পর্কে বলতে হবে।

ট্র্যাজেডি শব্দটির প্রয়োগ আরিয়ন নামক এক কবির লেখায় প্রথম পাওয়া যায়। তিনি ছিলেন ডিথির‍্যাম্ব বা দিথুরাম্ব (Dithyramb) গীতির রচয়িতা। ট্র্যাজেডি শব্দটি তাঁর ভাষা-প্রয়োগ থেকে গৃহীত হলেও পরবর্তী কালে ট্র্যাজেডির গঠন সম্পর্কে যে-সব লক্ষণ স্থিরীকৃত হয়েছে— তা তাঁর রচনায় ছিল না। সুতরাং এখন আর সেই লেখাগুলিকে ট্র্যাজেডি বলা যাবে না। আরিয়ন-এর কালে এক ধরনের ডিথির‍্যাম্ব-গীতিকেই ট্র্যাজেডি বলো হত।

ট্র্যাজেডি শব্দটির অর্থ 'ছাগ-সংগীত' এবং শব্দটির উৎস গ্রিক শব্দ 'ট্রাগোডিয়া' (Tragoedeia)। এই সম্মেলক-সংগীত গাওয়া হত দেবতার উৎসবে। সেই উৎসবে বলি দেওয়া হত ছাগল। গ্রিক সংস্কৃতিতে ছাগল পবিত্র প্রাণী বলে স্বীকৃত। আবার কারও কারও মতে দেবতা ডায়োনিসাস (Dionysus)-এর পূজা উপলক্ষেই মূলত এই সংগীতমুখর শোভাযাত্রা অনুষ্ঠিত হত। এই ডায়োনিসাস-এর অনুচর ছিল 'সাতুর' (Satyr) নামক একদল প্রাণী। তাদের মাথা ও শরীরের উর্ধ্বাঙ্গ মানুষের মতো, কিন্তু নিম্নাঙ্গ ছাগলের মতো এবং খুরসহ চারটি পা আছে। এরা আমোদপ্রিয়, সুরাপ্রিয়, ভীরু স্বভাব এবং কামুক। যে ব্যক্তিরা শোভাযাত্রা করে গান করতেন তাঁদের কেউ কেউ 'সাতুর'-এর রূপসজ্জা গ্রহণ করতেন। এইখান থেকেই 'সাতুর'-এর গান বা 'ছাগসংগীত' শব্দটির উৎপত্তি। ডায়োনিসাস ছিলেন শস্য, সুরা আর উর্বরতার দেবতা। শস্যের উৎসবে সাধারণ মানুষ নৃত্যগীতসহ শোভাযাত্রা করে দেবতার মন্দিরে যেত। আরিস্টটল বলেছেন ডিথির‍্যাম্ব গীতির সূচনা-অংশ থেকে ট্র্যাজেডির জন্ম হয়েছে।

প্রথমে কেবলই শোভাযাত্রা হত। তারপর গান শুরু হবার আগে এক ব্যক্তি একটি গল্পের সূচনা করতেন। কোরাস বা সম্মেলক গীতিসহ শোভাযাত্রার ফাঁকে ফাঁকে সেই গল্পটি বিবৃত হত। বর্ণনাকারী ব্যক্তি অভিনেতা বা নটের মতো সাজপোশাকও করতেন। এইভাবে সম্মেলক গীতিতে নাট্যধর্মের সূচনা হল। খ্রিস্টপূর্ব ষষ্ঠ শতাব্দীতে থেসপিস নামক এক কবি এইভাবে একজন অভিনেতা ও তাঁর বিবৃত আখ্যানকে শোভাযাত্রার সঙ্গে যুক্ত করেন। এবং তাঁকেই

ট্র্যাজেডির প্রতিষ্ঠাতা বলা হয়। ম্যারাথন-এর কাছে আইকেরিয়া অঞ্চলে তাঁর জন্ম। তিনি-ই ট্র্যাজেডির প্রথম অভিনেতা। গল্পটি বলবার সময় তিনি চরিত্রের সংলাপ ব্যবহার করতেন। খ্রিস্টপূর্ব ষষ্ঠ শতাব্দী থেকেই এথেন্স-এ রাষ্ট্রীয় পৃষ্ঠপোষকতায় নাট্য-প্রতিযোগিতা অনুষ্ঠিত হতে থাকে। থেসপিস তাতেও অংশ গ্রহণ করেছিলেন খ্রিস্টপূর্ব ৫৩৫ অব্দে।

ক্রমে এই নাট্য প্রতিযোগিতা গ্রিস-এ একটি জাতীয় উৎসবে পরিণত হয়। খ্রিস্টপূর্ব ষষ্ঠ শতাব্দীতে বেশ কয়েকজন গ্রিক নাটককারের নাম পাওয়া যায় যাঁরা প্রধানত ট্র্যাজেডি লিখেছেন কিন্তু তাঁদের নাটকগুলি লুপ্ত হয়ে গেছে। এই ভাবে ট্র্যাজেডির নাট্যরূপটি ধীরে ধীরে স্পষ্ট হয়ে উঠতে থাকে। শোভাযাত্রার সম্মেলক গায়ক ও নর্তকদের বলা হত কোরাস এবং সেই সংগীতকে বলা হত ডিথিরাম্ব। ক্রমে এই ডিথিরাম্ব গীতিমূলক ও নাট্যমূলক—এই দুটি ভাগে ভাগ হয়ে যায়; এদের মধ্যে নাট্যমুলক অংশটিই ট্র্যাজেডির পূর্বরূপ। থেসপিস এই নাট্য-অংশে একজন নটের অঙ্গভঙ্গি সহ কাহিনি কথনের যে রীতি প্রবর্তন করেন সেখানে তিনি মুখোশেরও ব্যবহার করতেন।

থেসপিস-এর পর ট্র্যাজেডির বিবর্তনে প্রধান ভূমিকা ছিল ইসকাইলাস-এর। খ্রিস্টপূর্ব ষষ্ঠ শতাব্দীর শেষ ভাগে অবির্ভূত এবং পঞ্চম শতাব্দের প্রথমার্ধে সৃষ্টিশীল নাটককার ইসকাইলাসই প্রথম গ্রিক ট্র্যাজেডিকে তার নির্দিষ্ট রূপটি দিয়েছিলেন। আরিস্টটল-এর ভাষায়—'ইস্কাইলাসই প্রথম যিনি অভিনেতার সংখ্যা এক থেকে দুইতে বাড়ালেন। তাঁর হাতেই কোরাস-এর স্থান সংকুচিত হল। সংলাপ পেল প্রাধান্য।" (অনুবাদক শিশিরকুমার দাশ *কাব্যতত্ত্ব*, পরিচ্ছেদ চার, প্যাপিরাস, ১৯৮৬) প্রকৃতপক্ষে দুই নয়, কোরাস ব্যতীত তিন বা চার জন অভিনেতাকে আখ্যানভুক্ত করেছিলেন ইস্কাইলাস; কিন্তু মঞ্চে একত্রে কোরাস ছাড়া দুজন অভিনেতাই উপস্থিত থাকতেন। ইস্কাইলাস রচিত ট্র্যাজেডিগুলিতে গ্রিক জীবনবোধের গম্ভীর, মহান, নৈতিকতা সমৃদ্ধ ও বীরোচিত দিকগুলি গুরুত্ব পেয়েছে। এথেন্স-এর গৌরবের কালে ইস্কাইলাস-এর আবির্ভাব। ম্যারাথন ও সালামিস-এর যুদ্ধে পারস্যের শক্তি তখন খর্ব হয়েছে। ইস্কাইলাস নিজে অনেকগুলি যুদ্ধেই অংশগ্রহণ করেছিলেন। গ্রিক ট্র্যাজেডির যে বিষয়বস্তু তা হল কোনো মহৎ ও শক্তিধর বীর চরিত্রের শোচনীয় পরিণাম। এই পরিণামের কারণ চরিত্রটির নিজস্ব কোনো ভ্রান্তি যা অজ্ঞানকৃত। কিন্তু কখনও কখনও সজ্ঞানে দেবতার রোষের মুখোমুখি হবার ফলেও বীর চরিত্রের শোকাবহ পরিণাম ঘটেছে। তাতে চরিত্রের মহত্ত্ব ক্ষুন্ন হয়নি। ইস্কাইলাস-এর রচিত ট্র্যাজেডিতে এই দুই ধারারই দৃষ্টান্ত পাওয়া যায়। গ্রিক ট্র্যাজেডিতে এই দুটি আদর্শই গৃহীত হয়েছে। গ্রিক ট্র্যাজেডির গঠনে যে প্রগাঢ় সংহতি এবং কেন্দ্রীয় দ্বান্দ্বিক উৎকণ্ঠার পরিচয় পাওয়া যায় তা-ও ইসকাইলাস-এর লেখাতেই প্রথম পরিস্ফুট হয়। পরে অন্যরাও তাঁকে অনুসরণ করেন। ইসকাইলাস-এর হাতেই গ্রিক ট্র্যাজেডির আকার এবং প্রকার নির্দিষ্ট হয়ে গিয়েছিল। কিন্তু খ্রিস্ট-পূর্ব পঞ্চম শতাব্দীতে আবির্ভূত সোফোক্লিস এবং ইউরিপিডিস-এর হাতে গ্রিক ট্র্যাজেডির বহু বৈচিত্র্য ও সমৃদ্ধি সাধিত হয়। এই তিন নাটককারের ট্র্যাজেডি নিয়ে গ্রিক ট্র্যাজেডির সমৃদ্ধিতম ক্লাসিকাল-পর্ব। সোফোক্লিস এবং ইউরিপিডিস চরিত্রের সংখ্যা দুই থেকে বাড়িয়ে তিন ও তার বেশি করেন। তবে একসঙ্গে তিনটির বেশি চরিত্রের উপস্থিতি বিশেষ দেখা যায় না। নাটক প্রতিযোগিতার উন্মাদনায় খ্রিস্টপূর্ব পঞ্চম ও চতুর্থ শতাব্দীতে গ্রিস-এ বহু ট্র্যাজেডি রচিত হয়েছিল এবং ট্র্যাজেডি সংরূপটি হয়ে উঠেছিল অত্যন্ত জনপ্রিয়। আরিস্টটল ট্র্যাজেডিকেই সর্বোত্তম ভাবাশিল্প-সংরূপ

বলে মনে করতেন। আমরা অতঃপর আরিস্টটল-এর ট্রাজেডি-তত্ত্ব উপস্থিত করব যেটি তিনি রচনা করেছিলেন খ্রিস্টপূর্ব চতুর্থ শতাব্দীর দ্বিতীয়ার্ধে।

কয়েকটি বিখ্যাত ট্র্যাজেডির সংক্ষিপ্ত কাহিনি

আরিস্টটল-এর ট্র্যাজেডিতত্ত্বের অবলম্বন ছিল বিখ্যাত তিন নাটককারের ট্র্যাজেডি যেগুলি রচিত হয়েছিল তাঁর তাত্ত্বিক আলোচনার আগেই। নিজের তত্ত্ব প্রতিষ্ঠিত করতে গিয়ে আরিস্টটল দৃষ্টান্ত হিসেবে এই তিন নাটককারের ট্র্যাজেডির কথাই মনে রেখেছিলেন। কাজেই আগে আমরা ইসকাইলাস, সোফোক্লিস এবং ইউরিপিডিস-এর দুটি করে বিখ্যাত ট্র্যাজেডির সারাংশ উপস্থিত করব, যাতে উদাহরণের সাহায্যে আরিস্টটল-এর ট্র্যাজেডি-বিষয়ক তত্ত্বটি বোঝার সুবিধা হয়।

ইসকাইলাস : ইসকাইলাস-এর জন্ম ৫২৫ খ্রিস্টপূর্বাব্দে, ৪৫৬ খ্রিস্টপূর্বাব্দ পর্যন্ত তিনি জীবিত ছিলেন। তাঁর জন্মস্থান এলিউসিস। অল্প বয়স থেকেই তিনি নাটক লেখেন এবং ৪৯৯ খ্রিস্টপূর্বাব্দে প্রথম নাট্য-প্রতিযোগিতায় যোগ দেন। প্রথম পুরস্কার লাভ করেন ৪৮৪ খ্রিস্ট-পূর্বাব্দে, তরপরে অনেকবারই তিনি পুরস্কার পেয়েছেন। তিনি দেশপ্রেমিক ছিলেন; গ্রিস ও পারস্যের যুদ্ধে অংশ গ্রহণ করেছিলেন। তাঁর সময়ে এথেন্স সব দিক থেকেই সমৃদ্ধ হয়ে উঠেছিল। ইসকাইলাস নব্বইটি নাটক রচনা করেছিলেন বলে কথিত আছে, তার মধ্যে পাওয়া যায় মাত্র সাতটি। তবে এর মধ্যে আছে তাঁর বিখ্যাত 'অরেস্তিয়া'-ত্রয়ী। ধারাবাহিক আখ্যান নিয়ে তখন তিনটি করে নাটক লেখার বিশেষ প্রচলন ছিল গ্রিক সাহিত্যে। এগুলিকে বলা হয় ট্রিলজি (Triology) বা ত্রয়ী। ইসকাইলাস-এর দুটি সুপরিচিত ট্র্যাজেডির কাহিনি-সংক্ষেপ প্রদত্ত হল।

আগামেমনন (Agamemnon): গ্রিক ট্র্যাজেডির বিষয়বস্তু গৃহীত হত গ্রিক পুরাণ ও মহাকাব্যের কাহিনি থেকে। গ্রিস ও ট্রয়-এর মধ্যে যে বিশাল যুদ্ধ হয়েছিল তার বিভিন্ন কথা-বৃত্ত নিয়ে বহু গ্রিক নাটক রচিত হয়েছে। আগামেমনন ছিলেন ট্রয়-এর বিরুদ্ধে যুদ্ধে গ্রিক বাহিনীর অধিনায়ক। যুদ্ধযাত্রাকালে সহসা সামুদ্রিক হাওয়া বন্ধ হয়ে যায় এবং পালতোলা জাহজগুলি অচল হয়ে পড়ে। তখন পুরোহিত শোনান দেবতার আদেশ। আগামেমনন যদি দেবতার উদ্দেশে তাঁর কন্যা ইফিগেনেইয়া-কে উৎসর্গ করেন তবেই দেবতা সন্তুষ্ট হবেন। আগামেমনন পত্নী ক্লাইতেমনেস্ত্রা-কে কিছু না জানিয়েই কন্যাকে বলি দেন। অতঃপর দশ বছর পরে যুদ্ধ জয় করে রাজা স্বদেশে ফেরেন এবং ফেরা মাত্রই পত্নীর হাতে নিহত হন। যুদ্ধজয়ী রাজার প্রত্যাবর্তনের এই শোচনীয় পরিণামই এই নাটকের ট্র্যাজেডি। স্বামীহত্যার কারণ হিসেবে ক্লাইতেমনেস্ত্রা জানিয়েছেন যে, জননী হিসেবে তাঁকে কিছুমাত্র গুরুত্ব না দিয়ে কন্যাকে বলি দেবার কারণেই তিনি ক্ষুব্ধ ও প্রতিশোধপরায়ণ হয়ে আগামেমননকে হত্যা করেছেন। কিন্তু বাস্তবে দেখা যায় ইগিসথাস নামক এক প্রণয়ীকে তিনি গ্রহণ করেছেন প্রকাশ্যেই। আগামেমনন ট্রয়-রাজকন্যা এবং সর্বনাশা ভবিষ্যৎ দেখতে পাওয়া ক্যাসান্ড্রা-কে রক্ষিতা রূপে নিজের রাজ্যে, রানির কাছে কুণ্ঠাহীনভাবে নিয়ে এসেছেন—এ-ও ক্লাইতেমনেস্ত্রা-র ক্রোধ ও প্রতিশোধ গ্রহণের কারণ। আগামেমনন-এর ট্র্যাজেডি-ই এই নাটকের উপজীব্য, কিন্তু কাহিনির ভেতর থেকে বেরিয়ে আসে নারী ও পুরুষের মধ্যে আধিপত্যের সংঘাতের দিকটি। রাজাকে দেখানো হয়েছে অহংকারী রূপে। গ্রিক পুরাকাহিনিতে মানুষের অহংকারকে দেবতারা কিছুতেই সহ্য

করতেন না এবং মাথা উঁচু করে দাঁড়ানো গর্বিত মানুষকে ধ্বংস করতে চেষ্টা করতেন। এই ভাববস্তু *আগামেম্নন* নাটক থেকে উঠে আসে।

বন্দি প্রমিথিউস : এই ট্র্যাজেডি মহান নৈতিক আদর্শে সমুজ্জ্বল। ট্র্যাজেডির প্রধান দুই চরিত্র দেবরাজ জিউস এবং টাইটান প্রমিথিউস। গ্রিক পুরাণে ভারতীয় পুরাণের দেবতা আর দৈত্যদের মধ্যে নিত্য সংঘর্ষের মতোই দেবতার সঙ্গে মানুষ ও টাইটানদের সংঘাত দেখানো হত। দেবতারা ছিল অলিম্পাস পর্বতবাসী এবং তাদের পিতা দেবরাজ ক্রোনস; মাতা কোনো-না-কোনো দেবী। মানুষেরা ছিল পৃথিবীর অধিবাসী মানব পিতামাতার সন্তান। কিন্তু এদের মধ্যবর্তী স্তরে ছিল ধরিত্রী ও ক্রোনস-এর মিলনজাত টাইটান গোষ্ঠী। এই টাইটানরা ছিল বলশালী, ন্যায়পরায়ণ এবং মানুষের প্রতি সহানুভূতিশীল। টাইটানদের অন্যতম নেতা ছিলেন প্রমিথিউস। দেবরাজ ক্রোনস অত্যাচারী হয়ে উঠলে তাঁর পুত্র জিউস প্রমিথিউস-এর সহায়তায় পিতাকে অপসৃত করে দেবতাদের রাজা হলেন। কিন্তু ক্রমে জিউস-ও অত্যাচারী হয়ে ওঠেন এবং পৃথিবীর মানুষদের ধ্বংস করার পরিকল্পনা করেন। তখন প্রতিবাদী হয়ে ওঠেন প্রমিথিউস। মানুষের শক্তি বৃদ্ধি করবার জন্য স্বর্গ থেকে আগুন হরণ করে তিনি মানুষকে দান করেন। এজন্য জিউস তাঁকে পর্বতশীর্ষে শৃঙ্খলাবদ্ধ করে রাখেন। প্রতি দিন শকুনেরা তাঁর যকৃৎ ও হৃৎপিণ্ড ঠুকরে খেয়ে যেত এবং প্রতি রাত্রে আবার নতুন যকৃৎ ও হৃৎপিণ্ড উদ্ভূত হত। প্রমিথিউস জানতেন জিউস-এর মৃত্যু কীভাবে হবে। সেই গোপন খবরটি বলে দিলে জিউস তাঁকে মুক্তি দেবেন বলে জানান। কিন্তু তীব্র শারীরিক যন্ত্রণা সহ্য করেও সে-তথ্য প্রকাশ করেননি প্রমিথিউস। মানুষের কল্যাণের জন্য এইভাবে মহান আত্মত্যাগ করেছিলেন তিনি। প্রমিথিউস-এর এই মহত্ত্ব এবং কষ্টই এই ট্র্যাজেডির ভাববস্তু। সূক্ষ্মভাবে অনুধাবন করলে দেখা যায় প্রমিথিউস-এর মধ্যেও আছে সেই প্রবল অহংকার যা দেবতাদের কাছে অসহ্য বোধ হয়।

সোফোক্লিস : তিন জন প্রাচীন গ্রিক নাটককারের মধ্যে সোফোক্লিস-কেই শিল্প-আঙ্গিকের বিচারে অনেকে প্রথম স্থান দেন। আরিস্টটল-এরও প্রিয়তম নাটককার ছিলেন সোফোক্লিস। অনেকে এমন কথাও বলে থাকেন যে, সোফোক্লিস-এর ট্র্যাজেডির প্রেক্ষিতেই আরিস্টটল তাঁর নাট্যতত্ত্ব প্রস্তুত করেন।

সোফোক্লিস জন্মগ্রহণ করেন খ্রিস্টপূর্ব ৪৯৭ অব্দে এথেন্স-এর কাছে কোলোনাস নগরে। তিনি নাট্য-প্রতিযোগিতায় প্রথম আবির্ভূত হন খ্রিস্টপূর্ব ৪৬৮ অব্দে এবং সেই আবির্ভাবেই ইসকাইলাস-কে পরাজিত করে সকলের দৃষ্টি আকর্ষণ করেন। সোফোক্লিস নাটকে তৃতীয় অভিনেতার স্থান করে দেন। মঞ্চে একত্রে তিন অভিনেতার সংলাপ ও সক্রিয়তার ফলে নাট্যদ্বন্দ্ব অনেক বেশি প্রকট হয় নাটক নির্মাণে। স্থান, কাল এবং ঘটনার অ-বিচ্ছেদ্য সমন্বয় তাঁর নাটকে দেখা যায়। দীর্ঘ নব্বই বছর তিনি জীবিত ছিলেন। তিনি ছিলেন এথেন্স-এর বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ নাগরিক। যুদ্ধে সেনাপতির দায়িত্ব পালন করেছেন, পরবর্তী কালে রাষ্ট্রদূতের কাজ করেছেন এবং কখনও কখনও মন্দিরের পৌরোহিত্যও করেছেন। তাঁর রচিত দুটি বিখ্যাত ট্র্যাজেডির কাহিনি-সংক্ষেপে দেওয়া হল।

রাজা ইডিপাস : অনেকে *রাজা ইডিপাস* নাটকটিকে সোফোক্লিস-এর শ্রেষ্ঠ রচনা বলে মনে করেন। নাটকটি বিশ্ব-সাহিত্যের একটি অবিস্মরণীয় ট্র্যাজেডি তাতে কোনো সন্দেহ নেই। নাটকটির মুল নাম *ইডিপাস রেক্স*—রেক্স শব্দের অর্থ রাজা।

থিবিস প্রদেশের রাজা ও রানি ছিলেন লাইয়ুস ও য়োকাস্তা। তাঁদের পুত্রসন্তান জাত হলে মন্দিরের পুরোহিতের কাছ থেকে শোনা যায় ভবিষ্যদ্বাণী— এই পুত্র পিতৃহন্তা এবং মাতৃগামী হবে। যদিও পরবর্তী কালে আবিষ্কৃত হয়েছিল যে, কে বা কারা দেবতা অ্যাপোলো-র নাম করে এই ভবিষ্যদ্বাণী রাজপ্রাসাদে পৌঁছে দিয়েছিল তা নির্দিষ্টভাবে জানা যাচ্ছে না। দৈববাণী জেনে সন্ত্রস্ত রাজা ও রানি এক পরিচারককে ডেকে শিশুটিকে অরণ্যে নিয়ে গিয়ে হত্যা করতে আদেশ দেন। সেই পরিচারক কিন্তু শিশুটিকে হত্যা না করে এক মেষপালককে দিয়ে দেয়। তার আগে অরণ্যে নিয়ে যাবার সময় শিশুটির পা বেঁধে দেবার ফলে তার পায়ের পাতায় দাগ হয়ে গিয়েছিল ও পা ফুলে গিয়েছিল। ইডিপাস শব্দের একটি অর্থ স্ফীতপদ— আর একটি অর্থ আঘাতের চিহ্ন-অঙ্কিত পদ। সেই মেষপালক শিশুটিকে নিয়ে যায় কোরিন্‌থ্ রাজ্যের রাজা-রানির কাছে। এই রাজদম্পতি ছিলেন নিঃসন্তান। তাঁরা পুত্র হিসেবে শিশুটিকে গ্রহণ করেন এবং নাম দেন ইডিপাস। ইডিপাস নিজেকে কোরিন্‌থ্-এর রাজপুত্র বলেই জেনেছিলেন। ইডিপাস-এর তরুণ বয়সে এক ভোজসভায় এক ব্যক্তি ইডিপাস-কে তার সম্পর্কিত অ্যাপোলো-র এই দৈববাণীর কথা জানায়। তখন ইডিপাস এই ভয়ংকর সম্ভাবনায় ভীত হয়ে কোরিন্‌থ্ ত্যাগ করে। ঘুরতে ঘুরতে সে এসে পৌঁছোয় থিবিস-এর সীমানায়। একটি তিন রাস্তার মোড়ে রথে আরূঢ় এক ব্যক্তিকে পথ ছেড়ে দেওয়া নিয়ে বচসা বাধলে আকস্মিক ক্রোধে ইডিপাস সেই ব্যক্তিকে হত্যা করে। পরে জানা যায়, সেই নিহত ব্যক্তি ইডিপাস-এর পিতা এবং থিবিস-এর রাজা লাইয়ুস। ইডিপাস জীবনে বারবার অহংকার ও হঠকারিতার পরিচয় দিয়েছে। যদিও প্রধানত দেবতা অ্যাপোলো-র বিরুদ্ধতাতেই তাব পতন, তবু তার চরিত্রের এই দুটি ত্রুটিও নাটককার সচেতনভাবে নির্দেশ করেছেন।

ইডিপাস থিবিস-এ প্রবেশ করলে নিরুদ্দিষ্ট রাজার সিংহাসনে থিবিস-বাসী রাজলক্ষণ যুক্ত এই যুবককে রাজা হিসেবে নির্বাচন করে এবং প্রচলিত প্রথা অনুসারে রানির সঙ্গে তার বিবাহ সম্পন্ন হয়। এইভাবে দৈববাণী রূপে কথিত অ্যাপোলো-র অভিপ্রায় কার্যকর হল।

সোফোক্লিস-এর নাটকটি যেখানে শুরু হচ্ছে সেখানে দেখি রাজসভায় ইডিপাস রাজ্যে মড়কের প্রাদুর্ভাব দেখে চিন্তিত এবং নির্দেশ দিচ্ছে মড়কের কারণ অনুসন্ধান করবার জন্য। দেবতার নির্দেশ জানবার জন্য দেলফি-তে অবস্থিত অ্যাপোলো-র মন্দিরে লোক পাঠিয়ে জানা যায় যে, নিহত রাজার হত্যাকারীর এখনও কোনো শাস্তি হয়নি। সেই অপরাধেই এই মড়ক। ইডিপাস এই কারণকে যুক্তিযুক্ত মেনে রাজার হত্যাকারীর সন্ধানের নির্দেশ দেয়। এরপর অতীতের বহু ঘটনা পর্যালোচনা করে বহু অনুসন্ধানে বেরিয়ে আসে সত্য। তখন লজ্জায় ও পাপবোধে আত্মহত্যা করেন রানি য়োকাস্তা; ইডিপাস সেই দুর্ভাগ্যের সামনে দাঁড়িয়ে মহিমান্বিত ব্যক্তির মতোই আচরণ করে। রাজ্য অর্পণ করে য়োকাস্তার ভাই ক্রেয়ন-এর হাতে। নিজের দুই পুত্র ও দুই কন্যাকেও রক্ষণাবেক্ষণের দায়িত্ব দিয়ে যায় ক্রেয়ন-কেই। অজ্ঞানকৃত পাপের প্রায়শ্চিত্ত হিসেবে নিজের হাতে সোনার কাঁটা বিদ্ধ করে অন্ধ করে দেয় নিজের দুই চোখ; এবং স্বেচ্ছানির্বাসন গ্রহণ করে থিবিস থেকে। এই হল *রাজা ইডিপাস*-এর ট্র্যাজেডি। এই নাটকে প্রাচীন দর্শনের একটি মূল সূত্র প্রতিফলিত হয়েছে। তা হল মানুষ যখনই নিজের ব্যক্তিত্ব এবং চরিত্রের শক্তিতে হয়ে উঠবে সমুজ্জ্বল তখনই তার বিরুদ্ধে সক্রিয় হবে দৈবশক্তি। সব কিছুই দৈব-নির্দেশিত বলে ইডিপাস-এর জন্ম-মুহূর্ত থেকে দৈব অভিশাপ শুরু হয়েছে। সেই সঙ্গে এই সত্যও পরিস্ফুট যে, যে-চরিত্রের ট্র্যাজিক পতন ঘটবে সেই চরিত্র কোনো-না-কোনো দিক

থেকে, জেনে বা না-জেনে কোনো নীতি লঙ্ঘন করবে এবং অহংকারের পরিচয় দেবে। আগামেমনন-এর পতনের মূলেও অহংকার ছিল।

আন্তিগোনে : *আন্তিগোনে* নাটকের কাহিনি ইডিপাস-এর বা লাইয়ুস বংশের পরবর্তী অধ্যায়ের গল্প। এইভাবে পরম্পরা-বাহিত কাহিনির অংশ নির্বাচন করে নিয়ে গ্রিক ট্র্যাজেডি লিখিত হত।

ইডিপাস-এর পুত্রকন্যারা ক্রেয়ন-এর আশ্রয়ে বর্ধিত হয়েছে। দুই পুত্রের মধ্যে একজন বড়ো হয়ে দাবি করে তার পিতার সিংহাসন। ক্রেয়ন তা দিতে অস্বীকার করলে সে থিবিস ছেড়ে চলে যায় এবং আরও কয়েকজন রাজার সাহায্য নিয়ে সৈন্য সংগ্রহ করে আক্রমণ করে থিবিস। তার ভাই, ইডিপাস-এর অপর পুত্র থাকে থিবিস-এর পক্ষেই। দুই ভাইয়ের যুদ্ধ হয় এবং দুজনেই প্রাণ হারায়। *আন্তিগোনে* নাটকের মূল ঘটনার সূত্রপাত এখান থেকেই। রাজা ক্রেয়ন আদেশ দিয়েছে যে, থিবিস-এর পক্ষে যুদ্ধ করে নিহত ছেলেটির যথাবিধি সৎকার হবে কিন্তু ইডিপাস-এর যে পুত্র থিবিস-এর বিরুদ্ধে গিয়েছে তার মৃতদেহ পড়ে থাকবে যুদ্ধক্ষেত্রেই; খাদ্য হবে শেয়াল কুকুরের। এই রাজ-আদেশ প্রচারিত হলে প্রতিবাদী হয়ে ওঠে ইডিপাস-এর কনিষ্ঠা কন্যা চতুর্দশ বর্ষীয় আন্তিগোনে। গ্রিস-এর পারিবারিক আদর্শে রক্তের সম্পর্ক অমোঘ ও অনতিক্রম্য বলে গণ্য হত। সেখানে ভাইয়ের মৃতদেহ থেকে যাবে সৎকারবিহীন— এই ভাবনা অসহনীয় হয়ে উঠল আন্তিগোনে-র কাছে। সে স্থির করল গোপনে যুদ্ধক্ষেত্রে গিয়ে ভাইয়ের অন্ত্যেষ্টিক্রিয়া সম্পন্ন করবে— কোনোভাবে মাটি দেবে শবের শরীরে। তার দিদি ইসমেনে দ্বিধাগ্রস্ত হওয়ায় সে একাই কাজটি করবে মনস্থ করে। গভীর রাত্রে যুদ্ধক্ষেত্রে গিয়ে আঙুলের নখ দিয়ে মাটি তুলে ভাইয়ের শবদেহে সে ছড়িয়ে দেয় কিন্তু ধরা পড়ে যুদ্ধক্ষেত্রের প্রহরীর হাতে। এইখানে নাট্যদ্বন্দ্বের দ্বিতীয় পর্যায় শুরু হয়। রাজা আন্তিগোনে-কে মৃত্যুদণ্ডে দণ্ডিত করেছেন। এই আদেশে রাজ্যের মানুষ দুঃখিত। তারা মনে করে রাজার আদেশ লঙ্ঘন করলেও আন্তিগোনে ধর্ম-নির্দেশিত সৎকার্যই সাধন করেছে। প্রজা-সাধারণের এই মনোভাব শোনা যায় কোরাস-এর সম্মিলিত কণ্ঠে। কিন্তু প্রজারা এবং তাদের প্রতিনিধি কোরাস বিদ্রোহী হতে পারে না–– তারা কেবল রাজার কাছে আবেদন জানায় এবং রাজাকে সিদ্ধান্ত পুনর্বিবেচনা করতে বলে। ক্রোধান্ধ ও গর্বোদ্ধত রাজা ক্রেয়ন সে-সব কথায় কর্ণপাত করেন না। এরপর প্রতিবাদ আসে ক্রেয়ন-এর পুত্র হায়মোন-এর কাছ থেকে। হায়মোন রাষ্ট্রীয় স্বৈরতন্ত্রের বিরুদ্ধে রাজাকে তথা পিতাকে সচেতন করবার চেষ্টা করে। আন্তিগোনে ছিল হায়মোন-এর বাগদত্তা। কিন্তু ক্রেয়ন কোনো কথাই না শুনলে আন্তিগোনে-র প্রাণদণ্ড হয়, হায়মোন মৃত্যু বরণ করে এবং হায়মোন-এর মা, ক্রেয়ন-এর পত্নী শোকে প্রাণ বিসর্জন দেন। ট্র্যাজেডি-র শেষে থাকেন কেবল ক্রেয়ন। তাঁর ঔদ্ধত্য এবং গর্বের ফলে তিনি নিঃসঙ্গ হয়ে পড়েন এবং সকলের কাছে অপরাধী রূপে বাকি জীবন কাটাতে হয় তাঁকে ; অপরাধ ক্ষালনের কোনো সুযোগ তিনি পাননা। কারণ, তখন অনেক দেরি হয়ে গেছে এই নাটক 'আন্তিগোনে'-র নামে নামাঙ্কিত হলেও আন্তিগোনে এবং ক্রেয়ন— দুটি চরিত্রেরই ট্র্যাজেডি ঘটেছে।

ইউরিপিডিস : সম্ভ্রান্ত ও ধনী পরিবারের সন্তান ইউরিপিডিস খ্রিস্টপূর্ব ৪৮০ অব্দে গ্রিস-এর সালামিস নগরে জন্ম গ্রহণ করেন। নাটক উৎসবে তিনি প্রথম অংশ গ্রহণ করেন ৪৫৫ খ্রিস্টপূর্বাব্দে। ট্র্যাজেডি নির্মাণের কলাকৌশলে তিনি ইসকাইলাস এবং সোফোক্লিস-এর মতো সর্তক ও নিপুণ ছিলেন না— এমন বলা হয়। প্রকৃতপক্ষে ইউরিপিডিস ট্র্যাজেডির ভাববস্তু

'এবং' সাধারণ মানুষের দুঃখ-বেদনা-সংকটকে তারা ধরতে যতটা আগ্রহী ছিলেন, ততটা ছিলেন না নাটক নির্মাণের নির্দেশাবলি পালনে এবং প্রযোজনার আঙ্গিক-সম্পর্কিত ভাবনায়। নাট্য-সংলাপে সংগীতকে তিনি বিশেষ গুরুত্ব দিয়েছিলেন। খ্রিস্টপূর্ব ৪০৫ অব্দে তিনি প্রয়াত হন। ইউরিপিডিস বিরানব্বইটি নাটক লিখেছিলেন বলে কথিত আছে, তার মধ্যে উনিশটি পাওয়া গেছে।

মেদেয়া : গ্রিক বীর জেসন-এর কাকা তার পিতার মৃত্যুর পর সিংহাসনে বসেন এই শর্তে যে বালক জেসন বয়ঃপ্রাপ্ত হলে তাকে সিংহাসন প্রত্যর্পণ করা হবে। কিন্তু জেসন-এর উপযুক্ত বয়স হলে তার কাকা শর্ত দেন যে, তাকে নিয়ে আসতে হবে স্বর্ণনির্মিত মেষলোম। জেসন তখন কোলখিস নগরে রক্ষিত সেই মেষলোম নিয়ে আসে। এই কঠিন কাজে তাকে সাহায্য করেছিল কোলখিস-এর রাজকন্যা জাদুকরী মেদেয়া। জেসন-এর সঙ্গে মেদেয়া দেশ ত্যাগ করে চলে আসে এবং তাদের দুই পুত্র জন্মায়। কিন্তু তাদের বিবাহ হয়নি। এরপরেও জেসন-কে রাজ্য ফিরিয়ে দিতে অস্বীকার করেন তার পিতৃব্য। সে নির্বাসিত হয়ে কোরিন্থ-এ আশ্রয় গ্রহণ করে। স্বজাতি-কন্যা বিবাহ না করলে গ্রিস-এ তখন রাজ-সিংহাসনে অধিষ্ঠিত হওয়া যেত না। এজন্য জেসন কোরিন্থ-এর রাজকন্যাকে বিবাহ করে। ক্ষুব্ধ মেদেয়া প্রতিশোধ গ্রহণের জন্য সেই নববধূকে হত্যা করে এবং সেই সঙ্গে হত্যা করে নিজের গর্ভজাত জেসন-এর দুই পুত্রকেও। মেদেয়া নির্বাসিত হয় এবং সর্বস্ব হারায় জেসন-ও। এই ট্র্যাজেডি জেসন এবং মেদেয়া— উভয়েরই আখ্যান। ট্র্যাজেডির ধারণা অনুসারে জেসন-কেই প্রধান চরিত্র বলে মনে হয়। কারণ পিতৃরাজ্যের সিংহাসনে বসবার আকাঙ্ক্ষায় সে উপেক্ষা করেছে মেদেয়া-র একনিষ্ঠ প্রেম। ফল স্বরূপ সর্বস্ব হারিয়েছে। কিন্তু ইউরিপিডিস-এর ট্র্যাজেডি মেদেয়া-র নামাঙ্কিত। ভালোবাসায় ঐকান্তিক এবং প্রেমের অধিকারবোধে একলক্ষ্য মেদেয়া জেসনকে পাওয়ার আকাঙ্ক্ষায় মানবীয় নীতিবোধ লঙ্ঘন করেছে। কিন্তু ইউরিপিডিস মেদেয়া-কে তার কাজের জন্য অপরাধিনী করেননি। তার প্রতিশোধ-স্পৃহা এবং হিংস্রতা— দুই-ই তার বঞ্চনা-বোধের প্রতিক্রিয়া। তার একাগ্র প্রেম এখানে বিবেচ্য হয়েছে। তাই ইউরিপিডিস-এর নাটকের শেষে মেদেয়া-কে স্বর্গে নিয়ে যাবার জন্য নেমে এসেছে রথ।

ইফিগেনেইয়া : এই নাটকে গৃহীত হয়েছে ট্রয়-যুদ্ধের আখ্যানের একটি অংশ। গ্রিক বাহিনীর নেতা আগামেম্নন যখন যুদ্ধ যাত্রা করেছিলেন তখন সহসা দৈব বিরূপতায় বাতাস বন্ধ হয়ে যাওয়ায় রুদ্ধ হয় জাহাজের গতি। দেবতাকে সন্তুষ্ট করবার জন্য বলি দিতে হবে চতুর্দশী কন্যা ইফিগেনেইয়াকে। আগামেম্নন পত্নীকে কিছু না জানিয়ে কন্যাকে উৎসর্গ করতে উদ্যত হলেন। ইফিগেনেইয়া-র জীবন-আকাঙ্ক্ষা, তার প্রণয়ী অ্যাকিলিস-এর প্রতিরোধ যখন ব্যর্থ হতে চলেছে তখনই দেখা গেল উৎসর্গ-বেদিতে ইফিগেনেইয়া-র পরিবর্তে এক হরিণী। বলি দেওয়া হল সেই হরিণীকে। ইফিগেনেইয়া-কে তখন নিয়ে গেছেন দেবতারা মন্দিরে পূজারিনি হবার জন্য। সরাসরি ইফিগেনেইয়া-র মৃত্যু হয়নি এ-নাটকে। ট্র্যাজিক-সংঘাত গড়ে উঠেছে নির্দোষ ইফিগেনেইয়া-র জীবনের দাবি আর রণবাহিনীর নেতা আগামেম্নন-এর কর্তব্যবোধের সংঘাতে। শেষে ইফিগেনেইয়া-র পূজারিনি হয়ে যাওয়াও স্বাভাবিক জীবন থেকে একরকম বাধ্যতামূলক অপসরণ। ট্র্যাজেডি হিসেবে খুবই তাৎপর্যময় এই নাটক।

আরিস্টটল-এর ট্র্যাজেডিতত্ত্ব গড়ে উঠেছিল এইসব বিখ্যাত ট্র্যাজেডির দৃষ্টান্ত সামনে রেখে।

[৩]

ট্র্যাজেডির সংজ্ঞা ও স্বরূপ

আরিস্টট্‌ল্‌-এর মিতকায় *কাব্যতত্ত্ব* গ্রন্থটি ছাব্বিশটি পরিচ্ছেদে সম্পূর্ণ। ষষ্ঠ থেকে উনবিংশ পর্যন্ত চোদ্দোটি পরিচ্ছেদে আরিস্টটল ট্র্যাজেডির বিভিন্ন লক্ষণ ও বৈশিষ্ট্য নিয়ে আলোচনা করেছেন। বিংশ পরিচ্ছেদে এবং দ্বাবিংশ পরিচ্ছেদে যথাক্রমে আলোচিত হয়েছে ভাষার ব্যাকরণ এবং রচনার রীতি বা স্টাইল। যদিও স্পষ্টত ট্র্যাজেডি শব্দটি উল্লিখিত হয়নি, কিন্তু এই ভাষা এবং রচনাশৈলী ট্র্যাজেডিরই ভাষা এবং স্টাইল। সর্বশেষ ছাব্বিশ সংখ্যক পরিচ্ছেদে আরিস্টটল মহাকাব্য ও ট্র্যাজেডির মধ্যে তুলনা করেছেন। সুতরাং বলা যায়, *পোয়েটিক্‌স* গ্রন্থের তিন-চতুর্থাংশেই আছে ট্র্যাজেডি-সম্পর্কিত আলোচনা।

আরিস্টটল ট্র্যাজেডির একটি সুস্পস্ট সংজ্ঞা দিয়েছেন ষষ্ঠ পরিচ্ছেদে। সেই সংজ্ঞা বহু শতাব্দী পার হয়ে এসে এখন আর সর্বাংশেই গৃহীত না-ও হতে পারে। অথবা বলা যেতে পারে বিংশ শতাব্দীতে ট্র্যাজেডির এত বৈচিত্র্য দেখা গেছে যে তা কোথাও কোথাও কিছুটা ছাপিয়ে গেছে আরিস্টটল-এর সংজ্ঞা। তা সত্ত্বেও আরিস্টল-প্রদত্ত সংজ্ঞাটিই আজও ট্র্যাজেডির ভাবগত ও রূপগত মৌল লক্ষণের ধারক হয়ে আছে। এই সংজ্ঞা দিয়েই আজও ট্র্যাজেডি চেনা যায়। আমরা আরিস্টটল-এর সংজ্ঞাটির একটি বাংলা অনুবাদ এবং একটি ইংরেজি অনুবাদ উদ্ধৃত করছি।

> ট্র্যাজেডি হল একটি গম্ভীর, সম্পূর্ণ ও বিশেষ আয়তন বিশিষ্ট ক্রিয়ার অনুকরণ, ভাষার সৌন্দর্যে তার প্রতিটি অঙ্গ স্বতন্ত্র, এই ক্রিয়াটির প্রকাশরীতি বর্ণনাত্মক নয়, নাটকীয়, আর এই ক্রিয়া ভীতি ও করুণার উদ্রেক করে এবং তার মধ্য দিয়ে অনুরূপ অনুভূতিগুলির পরিশুদ্ধি ঘটায়।

[*কাব্যতত্ত্ব* : আরিস্টটল, অনুবাদ শিশিরকুমার দাশ, প্যাপিরাস, প্রথম প্রকাশ ১৯৭৭, প্রথম প্যাপিরাস সংস্করণ ১৯৮৬, পৃ. ১৫]

> Tragedy, then, is an imitation of an action that is serious and complete in itself, having certain magnitude, not in a narrative form but in action, with pleasurable accessories, arousing pity and fear, and herewith it accomplishes to Cathersis. [Bywater, *Aristotle on the Art of Poetry*, Oxford University Press, 1909]

ট্র্যাজেডির এই সংজ্ঞাটিতে আরিস্টটল যা বলেছেন সেগুলিকে সূত্রাকারে সাজিয়ে বুঝে নেওয়া যেতে পারে।

(ক) ট্র্যাজেডি 'সিরিয়াস' বা গুরুগম্ভীর ঘটনার অনুকরণ হবে। গুরুগম্ভীর বলতে বোঝায় জীবনের উপরিতলের কোনো তরল, লঘু, কৌতুকজনক ঘটনা ট্র্যাজেডির বিষয়বস্তু হবে না। মানব-অস্তিত্বের গভীর কোনো সংঘাত— যা বহির্জীবনে ঘটতে পারে অথবা অন্তর্জীবনে; ঔচিত্যবোধের ও নৈতিকতার সংঘর্ষ; ভাগ্যের প্রতিকূলতায় মানুষের শোকাবহ পরিণাম— এইসব নিয়েই ট্র্যাজেডি নির্মিত হবে, যেমন আমরা পূর্বে উল্লিখিত ছয়টি ট্র্যাজেডির মধ্যেই দেখেছি। সর্বদা মৃত্যুই ট্র্যাজেডির পরিণাম হবে এমন নয়। অনেক সময় নিশ্চিত মৃত্যুর হাত থেকে পরিত্রাণও থাকতে পারে। যেমন ঘটেছে *ইফিগেনেইয়া*-তে এবং *ওরিস্টিস*-এ (ইসকাইলাস)। কিন্তু জীবনের অন্তর্গত বিপন্নতার রূপায়ণ থাকে বলেই ট্র্যাজেডি-র বিষয়বস্তু হবে গুরুগম্ভীর।

(খ) ট্র্যাজেডির ঘটনা হবে স্বয়ংসম্পূর্ণ এবং নির্দিষ্ট আয়তন-বিশিষ্ট। প্রদত্ত সংজ্ঞাটির পর আরিস্টটল-এর ব্যাখ্যা অনুসরণ করলে এই লক্ষণটির অর্থ স্পষ্ট বোঝা যায়। নির্দিষ্ট আয়তন বলতে আরিস্টটল বুঝিয়েছেন যে, ট্র্যাজেডির ঘটনা-বিস্তার এত বড়ো হবে না যে তা দর্শক-পাঠকের স্মৃতিতে একত্রে বিধৃত থাকতে পারবে না। আবার তা এত ছোটো হবে না যে, যথাযোগ্য বিশ্লেষণে ট্র্যাজেডির দ্বন্দ্ব পরিস্ফুট হবার অবকাশ পেল না। পঞ্চম পরিচ্ছেদে আরিস্টটল কিছুটা আকস্মিকভাবে মহাকাব্য ও ট্র্যাজেডি সম্পর্কে একটি তুলনা করেছেন যেখানে ট্র্যাজেডির আয়তন সম্পর্কে কিছুটা ধারণা পাওয়া যায়। তিনি লিখেছেন—"দৈর্ঘ্যেও পার্থক্য রয়েছে : ট্র্যাজেডির কালসীমা সূর্যের একটি আবর্তনের বা ঐ পরিমাণ সময়ের মধ্যে আবদ্ধ আর মহাকাব্যের কালসীমা অনির্দিষ্ট।" (*কাব্যতত্ত্ব* আরিস্টটল, অনুবাদ শিশিরকুমার দাশ, প্যাপিরাস সংস্করণ ১৯৮৬, পৃ. ১৭) যদিও এই ব্যাক্যটিতেও খুব নির্দিষ্টভাবে বোঝা যাচ্ছে না—'সূর্যের একটি আবর্তন' বলতে সূর্যোদয় থেকে সূর্যাস্ত অথবা সূর্যোদয় থেকে পরবর্তী সূর্যোদয় বোঝানো হয়েছে। আবার এ-ও বোঝা যাচ্ছে না যে, আরিস্টটল 'কালসীমা' বলতে ট্র্যাজেডির অন্তর্গত ঘটনাবিস্তারের কালসীমা বুঝিয়েছেন কিনা। অথবা বুঝিয়েছেন অভিনয়ের সময়-সীমা। সে যাই হোক, মোটের উপর বোঝা যায় যে আরিস্টটল-এর মতে ট্র্যাজেডির নাতিদীর্ঘ এবং নাতিহ্রস্ব হওয়াই বাঞ্ছিত।

আরিস্টটল বলেছেন ট্র্যাজেডির ঘটনা হবে স্বয়ংসম্পূর্ণ। স্বয়ংসম্পূর্ণ অর্থে তিনি বলেছেন ট্র্যাজেডিতে থাকবে একটি সূত্রপাত-অংশ বা প্রথম অংশ, একটি শেষ বা পরিণামী-অংশ এবং এই দুইয়ের মধ্যবর্তী অংশ। তিনি বলেছেন যে, প্রথম অংশ হল তা-ই যার পূর্ববর্তী ঘটনাংশ একটি ট্র্যাজেডির ক্ষেত্রে প্রয়োজন নেই। শেষ অংশ হল তা-ই যার পরবর্তী ঘটনাংশ নিষ্প্রয়োজন। মধ্য অংশ হল তা-ই, একটি ট্র্যাজেডির ক্ষেত্রে যার পূর্ববর্তী অংশ এবং পরবর্তী অংশের প্রয়োজন আছে।

আরিস্টটল-এর এই মন্তব্যের অর্থ অনুধাবন করতে গেলে গ্রিক ট্র্যাজেডির বিষয়বস্তুর দিকে দৃষ্টি দিতে হবে। পুরাণ-কাহিনির দীর্ঘ পরম্পরা থেকে অংশ বাছাই করে নিয়ে নির্মিত হত গ্রিক নাটক। সেজন্য কেবল কাহিনির দিক থেকে দেখলে সব সময়ই নাট্য বিষয়ের ঘটনাংশের আগে এবং পরে বহু ঘটনার সমাবেশ থাকত পুরাণে। কিন্তু নাট্যকার যখন সেই ঘটনাধারা থেকে একটি অংশ তাঁর অভিপ্রেত ট্র্যাজেডির জন্য নির্বাচন করে নেবেন তখন সেই বিশেষ ট্র্যাজেডির ক্ষেত্রে যেটুকু ঘটনাংশ নির্বাচিত হয়েছে তার আগের এবং পরের ঘটনা গুরুত্বপূর্ণ নয়।

একটি উদাহরণ দিলে বিষয়টি বোঝা যাবে। *রাজা ইডিপাস* নাটকে ইডিপাস-এর জন্মের আগে তার পিতা, থিবিস-এর রাজা লাইয়ুস-এর বংশে ঘটে গিয়েছিল অনেক ঘটনা। আবার থিবিস থেকে ইডিপাস নিজেকে অন্ধ করে স্বেচ্ছা-নির্বাসন নেবার পরেও তার পরিবারে বহু ঘটনা ঘটে। কিন্তু *রাজা ইডিপাস* নাটকটির ক্ষেত্রে সেই পূর্বের ঘটনা আর পরবর্তী ঘটনা জানবার কোনো প্রয়োজন হয় না। এভাবেই আরিস্টটল ঘটনার স্বয়ংসম্পূর্ণতাকে ব্যাখ্যা করেছেন।

(গ) ট্র্যাজেডির রচনারীতি বিবৃতিমূলক নয়, এই রচনারীতি ক্রিয়াত্মক বা নাটকীয়। ট্র্যাজেডি এবং যে-কোনো নাটক নির্মাণের রীতি নাটক সৃষ্টির ক্ষেত্রে সর্বাধিক গুরুত্বপূর্ণ। কারণ বিষয়বস্তু, রস-পরিণাম এবং নির্দিষ্ট আয়তন ট্র্যাজেডির মতোই অন্যান্য ভাষাশিল্প-সংরূপেও থাকে। একটি উপন্যাসের এবং একটি নাটকের বিষয়বস্তু ও রস-পরিণাম সম গোত্রের হলেও কোনো ক্ষতি নেই। কিন্তু রচনারীতির পার্থক্যেই উপন্যাস ও নাটকের ভিন্নতা নির্দিষ্ট হয়ে যায়।

ট্র্যাজেডি ভাষার দ্বারাই নির্মিত হয় কিন্তু সেই ভাষা প্রবন্ধ বা কবিতা বা কথাসাহিত্যের মতো বিবৃতিমূলক (ন্যারেটিভ) হবে না। লেখকের নিজের ভাবনা, দৃষ্টিকোণ এবং ব্যাখ্যা সংযুক্ত করবার অবকাশ প্রত্যক্ষভাবে নাটকে থাকে না। নাটককার কেবল চরিত্রগুলির ক্রিয়া, আচরণ এবং সংলাপকে লিপিবদ্ধ করতে পারেন। এমনকি চরিত্রগুলির অভিব্যক্তিও তিনি নির্দেশ করতে পারেন না। এ জন্যই ট্র্যাজেডি এবং যে-কোনো নাটকের রচনারীতি হয় ক্রিয়াত্মক; বিবৃতিমূলক বা ভাষ্যমূলক নয়। নাটক মঞ্চস্থ হওয়াই অভিপ্রেত কিন্তু যদি তা না-ও হয়, নাটক পাঠ করলেও সেটিকে পৃথক এক শিল্প-সংরূপ বলে চেনা যায় রচনারীতির এই বৈশিষ্ট্যের কারণেই।

(ঘ) আরিস্টটল বলেছেন ট্র্যাজেডিতে থাকবে ভাষার সৌন্দর্য এবং প্রতিটি অঙ্গ অনুভূত হবে স্বতন্ত্রভাবে। প্রসঙ্গত উল্লেখ্য, পূর্বে প্রদত্ত ইংরেজি সংজ্ঞাটিতে প্রতিটি অঙ্গের স্বাতন্ত্র্যের কথা নেই। সংজ্ঞাটি মূল গ্রিক থেকে যথাযথ অনুবাদ করা হয়েছে। আরিস্টটল-এর সংজ্ঞাটিতে এই যে প্রতিটি অঙ্গের কথা বলা হল তার ব্যাখ্যা পরে প্রদত্ত হয়েছে যেখানে আরিস্টটল ট্র্যাজেডির ছ-টি অঙ্গ নির্দেশ করেছেন। সংজ্ঞাটিতে তিনি কেবল 'প্রতিটি অঙ্গ'— এই অভিব্যক্তির মধ্য দিয়েই বুঝিয়ে দিয়েছেন যে ট্র্যাজেডিতে থাকবে বিভিন্ন অঙ্গ। ভাষার সৌন্দর্য বলতে আরিস্টটল সুচিন্তিত এবং সুনির্মিত বাক্য, ছন্দ, সংগীত ইত্যাদির উল্লেখ করেছেন। পরে তিনি এ-বিষয়ে আরও কিছু ব্যাখ্যা প্রদান করেছেন।

(ঙ) ট্র্যাজেডির পরিণামে দর্শক এবং পাঠকের চিত্তে জাগবে করুণা এবং ভয়। ট্র্যাজিক কাহিনির অন্যতম আবশ্যিক লক্ষণই হল এই করুণা ও ভয় উদ্রেক করবার সামর্থ্য। মহৎ শক্তিধর মানুষের শোচনীয় পতন— কখনও দৈব বিমুখতায়, কখনও স্বভাবগত ঔদ্ধত্য বা অহংকারের ফলে, কখনও অজ্ঞানকৃত কোনো পাপের ফলে এই পতন ঘটে। অনেক সময় এই পতনকে ভাগ্যের নির্দেশও বলা যায়। করুণা এবং ভয়ের এই অনুভূতি পৃথক পৃথকভাবে নয়, একত্রে জাগবে দর্শক ও পাঠকের চিত্তে। ট্র্যাজেডির অন্যতম পরিচায়ক কাহিনি-পরিণামে করুণা ও ভয়ের এই মিশ্রিত উপলব্ধি। আমরা পূর্বে যে ট্র্যাজেডিগুলির সারসংক্ষেপ দিয়েছি সেখানে ইসকাইলাস-এর *আগামেমনন*, সোফোক্লিস-এর *রাজা ইডিপাস*, ইউরিপিডিস-এর *ইফিগেনেইয়া* প্রভৃতি ট্র্যাজেডিতে এভাবেই দর্শক ও পাঠকের চিত্তে করুণা ও ভয়ের সঞ্চার হয়।

(চ) ট্র্যাজেডির সংজ্ঞায় আরিস্টটল 'ক্যাথারসিস' শব্দটির উল্লেখ করেছেন। কিন্তু *কাব্যতত্ত্ব* গ্রন্থে কোথাও এই শব্দটির ব্যাখ্যা দেওয়া হয়নি। 'ক্যাথারসিস' শব্দটিকে বাংলায় অনেকে 'ভাবমোক্ষণ' বলে থাকেন। অনেক নাট্যতত্ত্ববিদ পরবর্তী সময়ে এই শব্দটির বিভিন্ন ব্যাখ্যা দিয়েছেন। সেগুলি আমরা যথাস্থানে আলোচনা করব। সাধারণভাবে বলা যায় ট্র্যাজেডি দর্শক ও পাঠকের চিত্তে করুণা ও ভয়ের উপলব্ধির সাযুজ্যমূলক প্রতিক্রিয়া জাগ্রত করবে— এখানেই ট্র্যাজেডির শিল্পোত্তীর্ণতা।

এই ছ-টি লক্ষণ আমরা নিষ্কাশন করে নিতে পারি আরিস্টটল-প্রদত্ত ট্র্যাজেডির সংজ্ঞা থেকে।

ট্যাজেডির উদ্ভব সম্পর্কে আরিস্টটল-এর বিচ্ছিন্ন উক্তি

আমরা আগেই বলেছি যে, ট্র্যাজেডির উদ্ভব সম্পর্কে আরিস্টটল বিশেষ কিছুই বলেননি। সংক্ষিপ্ত যে দু-একটি উক্তি তিনি করেছেন সেগুলি এখানে উল্লেখ করছি।

কাব্যতত্ত্ব গ্রন্থের চতুর্থ পরিচ্ছেদে আরিস্টটল বলেছেন : "স্পষ্টতই কাব্যের উদ্ভবের মূলে আছে দুটি কারণ। এই দুটি কারণের একটি হল মানুষের অনুকরণ প্রবৃত্তি— যা মানুষের জন্মগত এবং যা মানুষের কাছে একই সঙ্গে শিক্ষামূলক ও আনন্দদায়ক।" দ্বিতীয়ত, আরিস্টটল বলেছেন অনুকরণ প্রবৃত্তি যেমন,— "ঠিক সেইরকম স্বভাবগত হল সুষমা ও ছন্দের বোধ।" আরিস্টটল বলেছেন "এই সব স্বভাবিক প্রবৃত্তি ক্রমশই পরিণত হয়েছে এবং নানা পরীক্ষার মধ্য দিয়ে জন্ম নিয়েছে কাব্য।"

দেখা যাচ্ছে দেবতার উৎসবের শোভাযাত্রা, একক ভাষকের বিবৃতি ও অঙ্গভঙ্গি, অভিনেতার সংযোজন এবং কাহিনির প্রবর্তন— ইত্যাদি বিষয়ে আরিস্টটল কোনো কথাই বলেননি।

অতঃপর ওই চতুর্থ পরিচ্ছেদেই আরিস্টটল বলেছেন, কবিদের স্বভাব অনুসারে কাব্যের শ্রেণি দু-রকম : "যাঁরা গভীর প্রকৃতির তাঁরা প্রকাশ করেন মহৎ বা উন্নত ক্রিয়া, এবং প্রকাশ করেন উন্নত বা মহৎ চরিত্র, আর যাঁরা লঘু প্রকৃতির তাঁরা প্রকাশ করেন লঘু চরিত্রের লঘু কার্যকলাপ। দ্বিতীয় শ্রেণির কবিদের হাতে সৃষ্টি হয়েছে ব্যঙ্গাত্মক রচনা, আর প্রথম শ্রেণির কবিদের হাতে সৃষ্টি হয়েছে প্রার্থনা এবং স্তোত্র।" এখানে স্পষ্টই বোঝা যায় যে, গভীর প্রকৃতির কবিদের হাতেই ট্র্যাজেডির সৃষ্টি হয়েছিল। আরিস্টটল স্পষ্টই বলেছেন মহাকাব্যের পরিবর্তেই ট্র্যাজেডির সৃষ্টি হয়েছে। [অনুবাদ শিশিরকুমার দাশ, প্যাপিরাস ১৯৮৬, পৃ. ৯]

আরিস্টটল উল্লেখ করেছেন যে, ট্র্যাজেডির ভাষায় ছন্দের প্রয়োগ ছিল। আয়াম্‌বিক এবং হেক্সামিটার (ষট্‌পদী ছন্দ) ছন্দে গ্রিক ট্র্যাজেডি লেখা হত।

আরিস্টটল ওই চতুর্থ পরিচ্ছেদেই অবশ্য দেবতার উৎসবের উল্লেখ খুব সংক্ষেপে করেছেন। তাঁর উক্তি—"মূল কথাটা হল ট্র্যাজেডি এবং সেই সঙ্গে কমেডিরও সূচনা হয়েছিল পরিকল্পনাহীন ভাবেই। একটির জন্ম হয়েছিল দিথুরাম্‌ব-গীতির নান্দীমুখ থেকে, অন্যটির ফাল্লিক-গীতির নান্দীমুখ থেকে— ফাল্লিক-গীতি এখনও নানা শহরেই আনুষ্ঠানিক ভাবে গাওয়া হয়।" [পূর্বোক্ত গ্রন্থ, পৃ, ১০-১১]

ট্র্যাজেডির ক্রমবিকাশ সম্পর্কেও আরিস্টটল কিছু মন্তব্য করেছেন। কিন্তু ঐতিহাসিক দিক থেকে দেখলে সেগুলিকে খুব যথাযথ বলা যায় না। পরবর্তীকালের গবেষণায় যেসব তথ্য আবিষ্কৃত হয়েছে তার উল্লেখ আমরা পূর্ববর্তী, 'ট্র্যাজেডির উদ্ভব' শীর্ষক অংশে করেছি। আরিস্টটল যেটুকু বলেছেন তা হল— 'ইস্কিলাস (আয়সখুলস)-ই প্রথম ব্যক্তি যিনি অভিনেতার সংখ্যা এক থেকে দুই-তে বাড়ালেন। তাঁর হাতেই কোরাসের স্থান সংকুচিত হল। সংলাপ পেল (অধিকতর) প্রাধান্য। (তারপর) তৃতীয় অভিনেতা আর চিত্রিত দৃশ্যের সূচনা করলেন সোফোক্লেস। তারপর প্রসারিত হল ট্র্যাজেডির আয়তন।" (পূর্বোক্ত গ্রন্থ, পৃ ১১-১২) আরিস্টটল বলেছেন যে—"ট্র্যাজেডির পূর্বসূত্র ছিল সাতুর নাটকে। সেই ছোট কাহিনী, লঘু রচনারীতির থেকে বেরিয়ে এসে ট্র্যাজেডি অর্জন করল বিশেষ মহিমা ও ভাবগাম্ভীর্য। ত্রোখাইক (ট্রোকী) ত্রিপদীর পরিবর্তে ব্যবহৃত হল আয়াম্‌বিক।" [পূর্বোক্ত গ্রন্থ, পৃ.১২]

কাব্যতত্ত্ব গ্রন্থের এই চতুর্থ পরিচ্ছেদেই আরিস্টটল ট্র্যাজেডির উদ্ভব ও বিকাশ সম্পর্কে কয়েকটি কথা বলেছেন। এই বিকাশের শেষ স্তর সম্বন্ধে উল্লিখিত তাঁর মন্তব্য দিয়ে আমরা এই প্রসঙ্গটি শেষ করছি। 'ট্র্যাজেডি ধীরে ধীরে বিকশিত হয়েছে, লোকে যখনই তার কোন একটি বিশিষ্ট উপাদান লক্ষ করেছে, তাকে উন্নততর করার চেষ্টা করেছে। ট্র্যাজেডির ক্রমবিকাশে তার নানা পরিবর্তন ঘটেছে, তারপর যখন তার প্রকৃত স্বভাবটি বোঝা গেছে তখনই পরিবর্তনের গতি স্তব্ধ হয়েছে।" [পূর্বোক্ত গ্রন্থ, পৃ.১১]

ট্র্যাজেডির ষড়ঙ্গ

কাব্যতত্ত্ব গ্রন্থের ষষ্ঠ অধ্যায়ে আরিস্টটল প্রথমে ট্র্যাজেডির সংজ্ঞা দেবার পর ট্র্যাজেডিতে কী কী থাকবে তার উল্লেখ করেছেন। তাঁর স্পষ্ট উক্তি—"তাহলে ট্র্যাজেডি গঠিত হয় ছটি উপাদানে : কাহিনী, চরিত্র, রচনারীতি, অভিপ্রায়, দৃশ্য আর সঙ্গীত।" [পূর্বোক্ত গ্রন্থ, পৃ. ১৮] ওই পরিচ্ছেদেই এরপরে আরিস্টটল এই ছয়টি উপাদানের আপেক্ষিক গুরুত্ব ব্যাখ্যা করেছেন। তিনি যেভাবে এই ছয়টি উপাদানের ব্যাখ্যা দিয়েছেন এবং গুরুত্বের পরিমাপ করেছেন— সেই ক্রম অনুসারে আমরা এই ছয়টি উপাদানকে বিশ্লেষণ করে দেখব। এই উপবিভাগে ট্র্যাজেডির এই ছয়টি অঙ্গ সম্পর্কে সংক্ষিপ্ত বিবরণ দিয়ে পরের উপবিভাগগুলিতে এক একটি উপাদানের বিস্তৃততর বিশ্লেষণে আমরা প্রবেশ করব।

(ক) "কাহিনী বলতে বোঝাচ্ছি ঘটনার সজ্জা (বা সমন্বয়), ..." ইংরেজিতে 'প্লট' শব্দটির দ্বারা যা বোঝায় তাকেই আরিস্টটল কাহিনি বলেছেন। গ্রিক শব্দটি হল 'মুথোস'। 'প্লট' শব্দটি ইংরেজি ছাড়াও অন্যান্য ভাষায় এবং বাংলাতেও বহুল ব্যবহৃত। বাংলায় কাহিনি এবং বৃত্ত এই দুটি প্রতিশব্দও ব্যবহৃত হয়। আমরা প্লট এবং কাহিনি— এই দুটি শব্দই ব্যবহার করব। আরিস্টটল স্পষ্টই বলেছেন— "এই সব উপাদানের মধ্যে সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ হল ঘটনার সজ্জা। কারণ ট্র্যাজেডি মানুষের অনুকরণ নয়, ট্র্যাজেডি একটি ক্রিয়ার অনুকরণ, জীবনের সুখ দুঃখের অনুকরণ— আর এই সবকিছুই ক্রিয়ার অন্তর্গত ;........." (পূর্বোক্ত গ্রন্থ, পৃ. ১৮) পরে তিনি এ-বিষয়ে বিস্তৃততর ব্যাখ্যা দিয়েছেন। এই উক্তি থেকে বোঝা যাচ্ছে— ট্র্যাজেডির বিষয়বস্তু যে আখ্যানের মধ্য দিয়ে প্রতিষ্ঠিত হবে সেই আখ্যানকেই ট্র্যাজেডির সর্বাধিক গুরুত্বপূর্ণ উপাদান বলে মনে করেছেন আরিস্টটল।

(খ) এরপরেই আসে চরিত্র। ট্র্যাজেডির কাহিনিতে যে-সব ঘটনার বিন্যাস থাকে সেইসব ঘটনা বা ক্রিয়া ঘটিয়ে তোলে মানুষ। সেই মানুষ যখন ট্র্যাজেডিতে অনুকৃত হয় তখন তারাই হয়ে ওঠে চরিত্র। ক্রিয়াকে পরিস্ফুট করার জন্য চরিত্রের প্রয়োজন। কাহিনি এবং চরিত্র বস্তুতই অবিচ্ছিন্ন। কিন্তু আরিস্টটল এখানে একটি বিতর্কমূলক উক্তি করেছেন—"ক্রিয়া বাদ দিলে ট্রাজেডি অসম্ভব, কিন্তু চরিত্র বাদ দিয়ে ট্র্যাজেডি সম্ভব।" বস্তুতপক্ষে চরিত্র বাদ দিয়েও ট্র্যাজেডি সম্ভব নয় কারণ চরিত্র বাদ দিয়ে ক্রিয়ার পরিস্ফুটন অসম্ভব। তা সত্ত্বেও আরিস্টটল একথাটি কেন বললেন তা আমরা পরে ব্যাখ্যা করব।

(গ) গুরুত্বের বিচারে আরিস্টটল অভিপ্রায়কে তৃতীয় স্থানে রেখেছেন। কিন্তু অভিপ্রায়ের গুরুত্ব অপরিসীম। নাটককার যা বলতে চান তা-ই হল অভিপ্রায়। যে-কোনো শিল্পী যখন তাঁর শিল্প-অবয়বটি নির্মাণ করেন তখন তার মধ্যে দিয়ে তিনি জীবন সম্পর্কে তাঁর উপলব্ধিকে ব্যক্ত করতে চান। কোনো কোনো ক্ষেত্রে তিনি স্পষ্টত ঔচিত্য নির্দেশ করতেও চান, কিন্তু যেখানে স্পষ্ট নির্দেশ থাকে না সেখানে স্রষ্টার নিজস্ব উপলব্ধি তাঁর সৃষ্টিকর্মকে তাৎপর্য দান করে।

নাটকে যেহেতু নাটককারের নিজের ব্যাখ্যা প্রদান করবার অবকাশ থাকে না— সে জন্য ঘটনা-বিন্যাসের পরিকল্পনায়, চরিত্রগুলির রূপায়ণে এবং চরিত্রগুলির সংলাপের মধ্য দিয়েই নাটককারকে তাঁর অভিপ্রায় ব্যক্ত করতে হয়। ভাষার উপর যথেষ্ট দখল অর্থাৎ ভাষণকলার নৈপুণ্য অভিপ্রায়কে স্পষ্ট করে তোলে। আরিস্টটল লিখেছেন—"যেখানে কিছু প্রতিপন্ন বা অপ্রমাণিত করা হচ্ছে কিংবা কোন বিষয়ে সাধারণ অভিমত প্রকাশ করা হচ্ছে সেখানেই অভিপ্রায়ের উপস্থিতি।" আমরা অবশ্য একথা বলব যে, যে-কোনো উত্তীর্ণ শিল্প সৃষ্টির মূলে শিল্পীর জীবন-উপলব্ধি তথা অভিপ্রায়ের অস্তিত্ব থাকা আবশ্যিক।

(ঘ) আরিস্টটল-এর মতে ট্র্যাজেডির চতুর্থ উপাদান হল রীতি। রীতি শব্দটির পরে তিনি বন্ধনীর মধ্যে 'বা ভাষা' শব্দ দুটি যোগ করেছেন। অর্থাৎ ট্র্যাজেডির ভাষার বৈশিষ্ট্যকেই তিনি রচনারীতি বলেছেন। এই রীতির অন্তর্গত হল ছন্দের ব্যবহার, ব্যাকরণের নিয়ম, গদ্য এবং ছন্দোময় রচনার বিভিন্ন লক্ষণ, ভাষার কারুকার্য, উপমার বিন্যাস ইত্যাদি। যদিও ভাষাকে গুরুত্বের দিক থেকে আরিস্টটল চতুর্থ স্থানে রেখেছেন তবু বলা যেতে পারে যে ভাষা একটি আবশ্যিক উপাদান যা ব্যতিরেকে ট্র্যাজেডির রূপ নির্মাণ সম্ভব নয়। আসলে এ পর্যন্ত ট্র্যাজেডির যে চারটি অঙ্গের কথা বলা হল তার প্রত্যেকটিই এমনভাবে পরস্পরের সঙ্গে অন্বিত যে, কোনোটিকেই বাদ দিয়ে ট্র্যাজেডির পরিকল্পনা করা সম্ভব নয়।

(ঙ) সবশেষে আরিস্টটল যে-দুটি উপাদানের কথা বলেছেন সেখানে প্রথমে দৃশ্য এবং পরে সংগীত উল্লিখিত হলেও গুরুত্বের বিচারে আরিস্টটল সম্ভবত এই দুটিকে একই গুরুত্ব দিয়েছেন। এই ষষ্ঠ পরিচ্ছেদে সংগীত সম্পর্কে শেষের দিকে তিনি কিছুই বলেননি। দৃশ্য সম্পর্কে যা বলেছেন তা এই— "দৃশ্য যদিও খুব আকর্ষণীয়, অন্যান্য উপাদানের তুলনায় সবচেয়ে কম শিল্পগুণান্বিত, আর কাব্যশিল্পের সঙ্গে এর যোগ যৎসামান্য। অভিনয় ও প্রযোজনা বাদ দিয়েও ট্রাজিক অনুভূতির (প্রতিবেদনের) সৃষ্টি খুবই সম্ভব, তাছাড়া দৃশ্যসজ্জার ব্যাপারটা কবির নয়, অলঙ্করণকারীর।" [পূর্বোক্ত গ্রন্থ, পৃ. ২১]

ষষ্ঠ পরিচ্ছেদটি এখানেই শেষ হয়ে গেছে। এই পরিচ্ছেদের মধ্যে সংগীত সম্পর্কে তিনটি টুকরো মন্তব্য আছে। যেগুলি হল —

- প্রতিটি অঙ্গ স্বতন্ত্র কথাটির দ্বারা বলতে চাই যে, কোনো অংশে ব্যবহৃত হবে মিত ছন্দ, কোনো অংশে গান।
- .....ট্র্যাজেডির একটি আবশ্যিক উপাদান হল দৃশ্যসজ্জা। তারপর ওঠে সঙ্গীত এবং রচনারীতির প্রসঙ্গ, কারণ এগুলি হল অনুকরণের মাধ্যম। ....সঙ্গীতের আবেদন সম্বন্ধে কিছু বলাই বাহুল্য।
- অন্যান্য উপাদানের মধ্যে ট্র্যাজেডির সবচেয়ে প্রীতিকর উপাদান হল সঙ্গীত।

এছাড়া সংগীত সম্পর্কে আর কোনো মন্তব্য আরিস্টটল করেননি বলে মনে হওয়া সম্ভব যে সংগীতকে তিনি প্রীতিকর কিন্তু বাড়তি উপাদান বলে মনে করেছেন। অপরপক্ষে দৃশ্যসজ্জাকে একবার বলেছেন আবশ্যিক, কিন্তু শেষে বলেছেন এই উপাদানটি 'কম শিল্পগুণান্বিত,' কাব্যশিল্পের সঙ্গে তার যোগ সামান্য এবং দৃশ্যসজ্জা কবির ব্যাপার নয়, তা অলংকরণকারীর ভাবনার বিষয়।

দৃশ্য এবং সংগীত বিষয়ে আরিস্টটল কিছুটা সংক্ষিপ্ত এবং অ-গভীর মন্তব্য করেছেন বলে মনে হয়। নাটক যদি মঞ্চস্থ করা হয় তাহলে তা দৃশ্যসজ্জা বাদ দিয়ে কখনই করা সম্ভব নয়। যে স্থানে নাটক অভিনীত হচ্ছে সেই স্থানের প্রাকৃতিক পরিবেশও দৃশ্যের মধ্যে পড়ে। তা ছাড়াও গ্রিক নাটকে অভিনেতৃবর্গের পোশাক, উঁচু কাঠের জুতো এবং মুখোশ ছিল আপরিহার্য দৃশ্যসজ্জা। ঠিক তেমনই 'সংগীত' শব্দেও নির্দিষ্টভাবে গান বোঝায় না। ধ্বনির নিয়ন্ত্রিত বিন্যাসকেই বলতে হবে সংগীত। সেখানে রণ-কোলাহল, বাদ্যযন্ত্রের শব্দ ইত্যাদিও থাকে। তা ছাড়াও 'কোরাস'-এর সম্মিলিত আবৃত্তির নির্দিষ্ট সুর ছিল। এ জন্যই ইংরেজি অনুবাদে সংগীতের অনুবাদ-শব্দ 'সঙ' (Song) নয়, যথার্থভাবেই করা হয়েছে 'মেলডি' (Melody) বা সুর-সমন্বয়।

আরিস্টটল কেন দৃশ্য এবং সংগীতকে খুব বেশি গুরুত্বপূর্ণ বলে মনে করেননি তা ষষ্ঠ পরিচ্ছেদের শেষের দিকে করা তাঁর একটি মন্তব্য থেকে বোঝা যায়। তিনি বলেছেন— "অভিনয় ও প্রযোজনা বাদ দিয়েও ট্র্যাজিক অনুভূতির (প্রতিবেদনের) সৃষ্টি খুবই সম্ভব, ...।"

এই উক্তিটি বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ এজন্যই যে, অভিনীত না হলেও কেবলমাত্র পাঠের সাহায্যে ট্র্যাজেডির রস-পরিণাম উপলব্ধি-গোচর হওয়া সম্ভব— একথা আরিস্টটল এখানে স্বীকার করেছেন। মঞ্চস্থ না হলে সেখানে দৃশ্য বা সংগীতও দেখা বা শোনা যাবে না মনে করেই সম্ভবত আরিস্টটল কথাগুলি বলেছেন। কিন্তু আমরা বলব যে, পাঠক যখন একটি নাটক পাঠ করেন তখনও কল্পনার দৃষ্টিতে নাটকের দৃশ্যসজ্জা তাঁকে দেখতেই হবে। স্মৃতির সাহায্যে সংগীতগুণও তিনি অনুভব করবেন। তা না হলে ট্র্যাজেডির পাঠও থাকবে অসম্পূর্ণ।

কাহিনি, বৃত্ত বা প্লট

আরিস্টটল-কথিত 'মুথোস' শব্দটির অর্থ ট্র্যাজেডির ঘটনার সজ্জা অর্থাৎ ট্র্যাজেডির সম্পূর্ণ ক্রিয়া— যা ট্র্যাজেডির বিষয়বস্তু। ক্রিয়া বলতে এখানে একটি মাত্র ক্রিয়া নয়, একাধিক ক্রিয়ার সমন্বয়ে গড়ে ওঠা একটি সম্পূর্ণ ক্রিয়া। ইংরেজিতে প্লট এবং বাংলায় বৃত্ত শব্দটিও একই অর্থবাচক। আমরা আমাদের আলোচনায় কাহিনি শব্দটি এবং কখনও কখনও প্লট শব্দটি ব্যবহার করব।

কাহিনি সম্পর্কে আরিস্টটল সর্বাধিক আলোচনা করেছেন। তাঁর মতে ট্র্যাজেডির ছয়টি উপাদানের মধ্যে কাহিনি-ই হল সর্বাপেক্ষা প্রয়োজনীয়। ষষ্ঠ পরিচ্ছেদে তিনি স্পষ্ট করে বলেছেন—"এইসব উপাদানের মধ্যে সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ হল ঘটনার সজ্জা কারণ ট্র্যাজেডি মানুষের অনুকরণ নয়, ট্র্যাজেডি একটি ক্রিয়ার অনুকরণ, জীবনের সুখদুঃখের অনুকরণ— আর এই সব কিছুই ক্রিয়ার অন্তর্গত; আর জীবনের লক্ষ্য তো বিশেষ ধরনের কার্যকলাপ বা ক্রিয়া, চরিত্রের বিশেষ ধর্ম (অর্জন) নয়।" [*কাব্যতত্ত্ব* আরিস্টটল, অনুবাদ শিশিরকুমার দাশ, প্যাপিরাস ১৯৮৬, পৃ. ১৮]

অতঃপর সপ্তম পরিচ্ছেদে আরিস্টটল এই কাহিনির গঠন সম্পর্কে বিস্তৃত ব্যাখ্যা দিয়েছেন। কাহিনির বিভিন্ন বৈশিষ্ট্য সম্পর্কে তিনি যা যা বলেছেন তা আমরা সুশৃঙ্খল ভাবে ক্রম-বিন্যস্ত করে উপস্থিত করছি।

(ক) আয়তন : প্রথমেই তিনি বলেছেন কাহিনির একটি বিশেষ আয়তন আছে। এই আয়তন অতি ক্ষুদ্র বা অতি বৃহৎ হওয়া উচিত নয় কারণ আরিস্টটল আমাদের আগেই বলেছেন যে, মানুষের স্বভাবগত সৌষম্যবোধ, যার উপর সৌন্দর্য নির্ভরশীল তা ট্র্যাজেডির উদ্ভবের অন্যতম কারণ। অতি ক্ষুদ্র বা অতি বৃহৎ কোনো জন্তু সুন্দর নয়। কারণ অতি ক্ষুদ্র বস্তু আমাদের দৃষ্টির বিভ্রান্তি ঘটায়, আবার অতিশয় বৃহৎ, ধরা যাক 'হাজার মাইল লম্বা একটি জন্তু' একবারে সম্পূর্ণভাবে দেখা যায় না, ফলে হারিয়ে যায় সমগ্রতার আবেদন। আরিস্টটল বারবার কাহিনি-প্রসঙ্গে জীবদেহের উপমা নিয়ে এসেছেন। তাঁর উক্তি—"কাজেই জীবজন্তু এবং অন্যান্য জৈব গঠনের থাকা দরকার একটি বিশেষ আয়তন সহজেই যেন তা আমাদের দৃষ্টিপথের আয়ত্ত হয়। কাহিনি সম্পর্কেও সেই কথা : তার দৈর্ঘ্য থাকবে অবশ্যই, কিন্তু তা যেন স্মৃতির আয়ত্তাধীন হয় (যেন সহজেই মনে রাখা যায়)।" [সপ্তম পরিচ্ছেদ]

আরিস্টটল সংগতভাবেই বলেছেন একটি কাহিনি পাঠক বা দর্শকের স্বাভাবিক স্মৃতিধার্য হবার মতো আয়তনের পরিসীমার মধ্যে থাকা উচিত। আয়তনের দৈর্ঘ্য নিয়ে তাঁর কোনো আপত্তি ছিল না। তিনি বলেছেন— কাহিনির আয়তন দীর্ঘ হওয়াই ভালো। তার মধ্যে সমগ্রের ঐক্যবোধের উপলব্ধি থাকতে হবে। নাট্য-কাহিনির উপযোগী ঘটনা পরম্পরা যথাবিধি অভিব্যক্ত হবে এবং সে জন্য যে আয়তন প্রয়োজন তা ট্র্যাজেডিতে থাকতে হবে—এমনই বলেছেন আরিস্টটল। তাঁর উক্তি — "এর সহজ এবং সাধারণ নিয়ম হল: যে দৈর্ঘ্যের মধ্যে সম্ভাব্য এবং প্রয়োজনীয় ঘটনা পরম্পরার মধ্য দিয়ে দুঃখ থেকে সুখ অথবা সুখ থেকে দুঃখের পরিবর্তন দেখানো যায়, সেই দৈর্ঘ্যই আয়তনের যথার্থ সীমা।" [সপ্তম পরিচ্ছেদ]

(খ) সমগ্রতা : আরিস্টটল কাহিনির গঠন সম্পর্কে বিশেষভাবে বলেছেন যে এই গঠন হবে সমগ্র। "সমগ্র হল সেই জিনিস যার আদি আছে, মধ্য আছে আর আছে শেষ, যা কোন কিছুর পরবর্তী নয়, কিন্তু স্বাভাবিক ভাবেই যার পরে কিছু আছে তা হল আদি। আবার যা অনিবার্যভাবে কোন কিছুর পরবর্তী, কিন্তু তারপরে আর কিছু নেই, তা হল শেষ। আর মধ্য হল যা কোন কিছুর পরবর্তী এবং তারপরেও কিছু আছে। সুতরাং সুনির্মিত কাহিনীর আদি ও অবসান এলোমেলো ভাবে হবে না।" [সপ্তম পরিচ্ছেদ]

কাহিনির আদি, মধ্য এবং অন্ত বলতে কী বোঝায় তার দৃষ্টান্ত আমরা আগে একবার ব্যাখ্যা করেছি। এখানে অপর একটি ট্র্যাজেডির উদহরণ দিয়ে তা পুনর্বার স্পষ্ট করা হল। যে কোনো দেশেরই মহাকাব্য ও পুরাণের কাহিনিমালা হয় দীর্ঘ এবং পরস্পর-অন্বিত। আখ্যানের চরিত্রগুলি প্রজন্মের পর প্রজন্ম ধরে গল্পমালায় প্রবাহিত হতে থাকে। আবার, ক্ষীণ সম্পর্কসূত্রে গ্রথিত থাকে বহু স্বতন্ত্র আখ্যান। ট্র্যাজেডিতে এই প্রবাহিত আখ্যানমালা থেকে নির্বাচিত করে নিতে হয় যে-কোনো একটি ঘটনাংশ। ট্র্যাজেডি-লেখকের অভিপ্রায়-অনুসারে সেই ঘটনাটি সম্পূর্ণ এবং সমগ্র আকারে ট্র্যাজেডিতে ব্যবহৃত হবে। সেই বিশিষ্ট ট্র্যাজেডির ক্ষেত্রে পুরাণ আখ্যানের আগের ও পরের ঘটনাগুলির আর প্রয়োজন থাকবে না। যেমন ইসকাইলাস-এর ট্র্যাজেডি *আগামেম্‌নন*। ট্রয়-যুদ্ধের অবসানে বিজয়ী রাজা স্বরাজ্যে প্রত্যাবর্তন করছেন। এই ঘটনা থেকে নাটকটির শুরু। তার আগে ঘটে গেছে গ্রিক রাজবধূ হেলেন-কে নিয়ে ট্রয়-এর রাজপুত্র প্যারিস-এর চলে যাওয়া। এই সূত্রেই গ্রিস ও ট্রয়-এর যুদ্ধ আসন্ন হয় এবং গ্রিক বাহিনীর নেতা রূপে আগামেম্‌নন অভিযান করেন। কিন্তু সেই সব ঘটনার কোনো উল্লেখ এই ট্র্যাজেডিতে নেই কারণ এটি বিজয়ী রাজার শোকাবহ ভাগ্য বিপর্যয়ের কাহিনি। নাটকের মধ্যবর্তী অংশে রানি কর্তৃক রাজার বিনাশের পর রানি, তাঁর প্রণয়ী এবং রাজ্যের প্রবীণ ব্যক্তিদের নিয়ে গঠিত কোরাস দলের উক্তি-প্রত্যুক্তিময় অংশটি হল প্লট-এর মধ্যভাগ। এখানে যেমন আগের অংশটি জানবার প্রয়োজন হচ্ছে, তেমনই শেষে কী হল তা-ও জানবার কৌতূহল থেকে যাচ্ছে। ট্র্যাজেডির শেষ অংশে সদর্পে রানি মঞ্চত্যাগ করলে নাটকের অন্তর্গত অভিপ্রায় সম্পূর্ণ হয়। সেই অভিপ্রায়টি হল— যে রাজা এক মুহূর্তে ছিলেন ভাগ্যলক্ষ্মীর বরপুত্র তিনিই পরমুহূর্তে ভাগ্যের বিড়ম্বনায় এক পরাস্ত ব্যক্তি রূপে মৃত্যু বরণ করেন। অহংকারের আত্মগর্ব ছাড়া আর কোনো অপরাধ তাঁর ছিল না। গ্রিক ট্র্যাজেডিতে আমরা সর্বত্রই ট্র্যাজেডির কারণ রূপে এই অহংকারের লক্ষণটিকে প্রধান চরিত্রের মর্মমূলে প্রোথিত দেখতে পাই।

আগামেম্‌নন-এর মৃত্যুর পরেও ঘটেছিল অনেক কিছু। তাঁর পুত্রকন্যারা পিতৃহত্যার প্রতিশোধ নেবার জন্য প্রতিজ্ঞাবদ্ধ হয়েছিল এবং পুত্র ওরিসটিস-এর হাতে নিহত হয়েছিলেন

স্বামীহন্ত্রী রানি ক্লাইটেমনেস্ট্রা। আবার সেই মাতৃহত্যার ফল ভোগ করতে হয়েছিল ওরিসটিসকে। কিন্তু এসব ঘটনার কিছুই প্রয়োজনীয় নয় *আগামেমনন* ট্র্যাজেডিতে। কাজেই সেগুলির উল্লেখ এই নাটকে করা হয়নি। এইভাবে আরিস্টটল ট্র্যাজেডির আদি, মধ্য এবং শেষভাগ ব্যাখ্যা করতে চেয়েছেন।

(গ) ঐক্য : কাহিনি বা প্লট-এর আরও কয়েকটি দিক আরিস্টটল পরবর্তী পরিচ্ছেদগুলিতে ব্যাখ্যা করেছেন। অষ্টম পরিচ্ছেদে তাঁর আলোচনার বিষয় হল কাহিনির ঐক্য যা ট্র্যাজেডির প্লট-এর ক্ষেত্রে অত্যন্ত উল্লেখযোগ্য এবং আবশ্যিক একটি বিধি। ইংরেজিতে একে বলা হয় 'ইউনিটি অব অ্যাকশন'। আরিস্টটল বলেছেন যে, বহু ঘটনার মধ্যে থেকে নাটককার তাঁর অভিপ্রায় অনুসারে ট্র্যাজেডির প্লট-এর জন্য কিছু ঘটনা বা ক্রিয়া নির্বাচন করে নেবেন। তিনি কেবল সেই ঘটনাগুলিই গ্রহণ করবেন এবং তাদের সজ্জিত করবেন যা তাঁর ট্র্যাজেডির অভিপ্রায়ের পক্ষে অপরিহার্য। তার ফলে সবগুলি ক্রিয়া মিলে একটি ক্রিয়া গড়ে উঠবে। আরিস্টটল-এর উক্তি এখানে খুবই স্বচ্ছ। ট্র্যাজেডির কাহিনি-ঐক্য সম্পর্কে তাঁর কথা হল— "....এটি একটি ক্রিয়ার অনুকরণ— সেই ক্রিয়াটি হবে একক এবং সমগ্র, তার অন্যান্য অংশগুলি এমনভাবে সাজানো হবে যে, তাদের একটিকেও যদি পরিবর্তিত করা হয়, বা পরিত্যাগ করা হয়, তাহলে সমস্ত কাহিনীটিই হবে বিচ্যুত ও বিধ্বস্ত, কারণ যদি কোনো ঘটনার উপস্থিতি বা অনুপস্থিতি কাহিনীর মধ্যে পার্থক্য সৃষ্টি না করে, তা হলে বুঝতে হবে তা কাহিনীর সমগ্রতার যথার্থ অঙ্গ নয়।" [অষ্টম পরিচ্ছেদ]

ট্র্যাজেডি সম্পর্কে ত্রি-ঐক্য প্রসঙ্গটি বারবার শোনা যায়। এই ত্রি-ঐক্য বলতে বোঝায় ঘটনার ঐক্য, স্থানের ঐক্য এবং কালের ঐক্য। ইংরেজিতে বলা হয় ইউনিটি অব্ অ্যাকশন, ইউনিটি অব্ প্লেস এবং ইউনিটি অব্ টাইম। এখানে স্পষ্টভাবেই বলা যেতে পারে যে, আরিস্টটল ঘটনার ঐক্য সম্পর্কে যথেষ্ট গুরুত্ব দিয়ে নিজের ব্যাখ্যা ও বিশ্লেষণ উপস্থিত করেছেন। স্থানের ঐক্য সম্পর্কে সমগ্র *কাব্যতত্ত্ব* গ্রন্থে একটি কথাও ব্যয়িত হয়নি। কালের ঐক্য সম্পর্কে আরিস্টটল একবার মাত্র বলেছেন যে, একটি সূর্যাবর্তনের মধ্যে ট্র্যাজেডির কালসীমা থাকা উচিত— "দৈর্ঘ্যের পার্থক্য রয়েছে : ট্র্যাজেডির কালসীমা সূর্যের একটি আবর্তনের বা ঐ পরিমাণ সময়ের মধ্যে আবদ্ধ আর মহাকাব্যের কালসীমা অনির্দিষ্ট।"

[পঞ্চম পরিচ্ছেদ]

এখানে কিন্তু আরিস্টটল এই বাক্যটিকে বিস্তৃতভাবে বুঝিয়ে বলেননি। কাজেই আমরা বুঝতে পারি না এক সূর্যাবর্তন বলতে সূর্যোদয় থেকে সূর্যাস্ত অথবা এক সূর্যোদয় থেকে পরবর্তী সূর্যোদয় বোঝানো হয়েছে। আরিস্টটল-এর বাক্যে এই বিষয়টিও স্পষ্ট নয় যে, ট্র্যাজেডির কালসীমা বলতে একটি ট্র্যাজেডির অভিনয়-সময় বোঝানো হয়েছে অথবা ট্র্যাজেডির অন্তর্গত আখ্যানের কালগত বিস্তৃতি বোঝানো হয়েছে। সাধারণভাবে গ্রিক ট্র্যাজেডিগুলিতে আখ্যানের কালগত বিস্তৃতি থাকত চব্বিশ ঘন্টা সময়সীমার মধ্যেই। অতীতের ঘটনা বিবৃত হত স্মৃতি-সূত্রে।

আরিস্টটল ট্র্যাজেডির প্লট-এর ঐক্য সম্পর্কে যা বলেছেন তা এটুকুই। ট্র্যাজেডির তত্ত্বে এ-বিষয়ে অন্য নাট্যসমালোচকেরা কী বলেছেন তা আমরা যথাস্থানে আলোচনা করব।

(ঘ) বিপ্রতীপতা ও উদ্‌ঘাটন : ট্র্যাজেডির কাহিনিতে, এবং বৃহত্তর অর্থে যে-কোনো নাটকের কাহিনিতে দুটি লক্ষণ অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। সে-দুটি হল বিপ্রতীপতা এবং উদ্‌ঘাটন।

বিপ্রতীপতা শব্দটির গ্রিক পরিভাষা হল 'পেরিপেতি' (Peripetia) যার অর্থ পরিস্থিতি বিপর্যয়। সহজভাবে বিষয়টিকে 'কাহিনির ভিন্নমুখী গতি' বলা যেতে পারে। আরিস্টটল তাঁর *রেটোরিব* গ্রন্থে বলেছেন—আকস্মিকভাবে ভাগ্যের পরিবর্তন হল পেরিপেতি। ট্র্যাজেডির কাহিনিতে দেখা যায় কাহিনি এক মুখে প্রবাহিত হতে হতে কোনো ঘটনার ফলে ভিন্ন মুখে প্রবাহিত হয়। সেখানে সুখের পরিস্থিতি থেকে ঘটনা-ধারা দুর্ভাগ্যের অভিমুখে পরিবর্তিত গতিতে অগ্রসর হবে। একেই বলা হয় কাহিনির বিপ্রতীপতা। ট্র্যাজেডিতে এই বিপ্রতীপতাই ট্র্যাজিক পরিণতির সূচক। বিপ্রতীপতা ছাড়া ট্র্যাজেডি ঘটা সম্ভব নয়। আপাতদৃষ্টিতে বিপ্রতীপতার মূলে একটি আকস্মিক ঘটনা থাকলেও ট্র্যাজেডির প্লট অনুসরণে দেখা যায় যে, সেখানে সেই পরিবর্তন বা বিপ্রতীপতার বীজ ছিল অনিবার্য এবং সম্ভাব্য।

রাজা ইডিপাস নাটকে যখন সিংহাসনে সুপ্রতিষ্ঠিত ইডিপাস দেশে মড়ক লাগল কেন তার সন্ধান সূত্রে রাজার হত্যাকারী কে—এই অনুসন্ধানে প্রবৃত্ত হল তখনই সূচিত হল কাহিনির বিপরীত গতি। *মেদেয়া* নাটকে জেসন যখন রাজসিংহাসনে অধিষ্ঠিত হবার জন্য করিন্থ-এর রাজকন্যাকে বিবাহের সিদ্ধান্ত নিল তখনই মেদেয়া-র প্রতিহিংসা-পরায়ণতায় জেসন-এর দুর্ভাগ্যের সূচনা। এখানে থেকেই কাহিনির বিপ্রতীপতার সূত্রপাত।

উদ্‌ঘাটন—যাকে ইংরেজিতে বলা হয়েছে 'ডিসকভারি' তা হল অজ্ঞান অবস্থা থেকে জ্ঞাত অবস্থায় উপনীত হওয়া। ট্র্যাজেডির প্লট-এ প্রায়শই দেখা যায়— কোনো একটি তথ্য আছে গোপন। সেই গোপন তথ্যটি এত গুরুত্বপূর্ণ যে প্লট-এর গতিমুখ নির্ভর করছে তার উপর। এক সময় গোপন তথ্যটি উদ্‌ঘাটিত হয়। এই উদ্‌ঘাটনের ফলেই সুনিশ্চিত হয়ে যায় ট্র্যাজেডির পরিণাম। অবশ্য সব ট্র্যাজেডিতেই যে উদ্‌ঘাটন অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ হয় এমন নয়।

রাজা ইডিপাস নাটকে উদ্‌ঘাটনের সুনিপুণ বিন্যাস আছে। কে রাজার হত্যাকারী— এই অজ্ঞাত তথ্যটি গোচরে আসার সঙ্গে সঙ্গে ইডিপাস-এর দুর্ভাগ্যের বৃত্ত সম্পূর্ণ হয়। ইউরিপিডিস-এর *ইফিগেনেইয়া* নাটকে ইফিগেনেইয়া তার বিবাহের সম্ভাবনা-প্রত্যাশায় আনন্দিত হয়ে পিতার কাছে আসে। কিন্তু এসে জানতে পারে পিতা তাকে বলি দিতে চান। আবার এই নাটকে প্রকৃত উদ্‌ঘাটন ঘটে গেছে তার আগেই। যুদ্ধযাত্রা-পথে সমুদ্রে বায়ু বন্ধ হয়ে যাওয়ার কারণ অনুসন্ধানে যখন জানা গেল বংশের কন্যাকে উৎসর্গ করলে তবেই প্রসন্ন হবেন দেবতা— তখনই এই উদ্‌ঘাটন সম্পন্ন হয়েছে।

আরিস্টটল *কাব্যতত্ত্ব* গ্রন্থের একাদশ অধ্যায়ে বিপ্রতীপতা এবং উদ্‌ঘাটন সম্পর্কে সংক্ষিপ্ত আলোচনা করেছেন। সেখানে তিনি দেখিয়েছেন যে বিভিন্ন ধরনের উদ্‌ঘাটন থাকতে পারে। বিষয়টি তিনি যথেষ্ট বিস্তৃতভাবে ব্যাখ্যা করেছেন *কাব্যতত্ত্ব* গ্রন্থের ষোড়শ অধ্যায়ে। এই অধ্যায়টির নামই হল 'উদঘাটনের শ্রেণিবিভাগ'। প্রথমত বাইরের কোনো চিহ্নের সাহায্যে উদ্‌ঘাটন হতে পারে। যেমন চিঠি, কোনো অলংকার— যেখানে কিছু খোদিত আছে, দেহের কোনো চিহ্ন ইত্যাদি। এ-জাতীয় উদ্‌ঘাটন বিশ্ব সাহিত্যের সর্বত্র আখ্যানমূলক সাহিত্যে দেখতে পাওয়া যায়।

দ্বিতীয়ত, কোনো চরিত্র নিজেই নিজের পরিচয় কথাসূত্রে উদঘাটিত করতে পারে— যে পরিচয় আগে জানা ছিল না। *ওরিস্‌টিস* নাটকে মন্দিরের পূজারিনি ইলেক্ট্রা দেবীর কাছে উৎসর্গের জন্য নির্দিষ্ট যুবকের সঙ্গে সংলাপ-সূত্রে জানতে পারে যে ওরিস্‌টিস তারই ভাই।

তৃতীয়ত, স্মৃতির সাহায্যে উদ্‌ঘাটন। একটি ছবি দেখে বা একটি গান শুনে স্মৃতি জাগ্রত হতে পারে। আরিস্টটল এই প্রসঙ্গে *কুপ্রিয়া* নামে একটি নাটকের উল্লেখ করেছেন। স্মৃতিরোমন্থন-

সূত্রে সত্য উদ্‌ঘাটনের বিবরণ আছে *রাজা ইডিপাস* নাটকে। সেখানে বিভিন্ন প্রশ্নের উত্তরে থিবিস রাজ-পরিবারের প্রাচীন ভৃত্য এবং মেষপালকের স্মৃতি রোমন্থন সূত্রে সত্যের উদ্‌ঘাটন হয়েছে।

অনুমান এবং যুক্তি-বিন্যাস-নির্ভর উদঘাটননের কথাও আরিস্টটল বলেছেন। এমন দৃষ্টান্ত গ্রিক নাটকে বিশেষ পাওয়া যায়নি। তবে রোমক যুগে এবং রেনেসাঁস-পর্বে এ-জাতীয় ট্র্যাজেডি আছে। আরিস্টটল-এর মতে সর্বোত্তম উদ্‌ঘাটন হল কাহিনির নিজস্ব ধারা থেকে ঘটনা বিন্যাসের ফলে উদ্ভূত তথ্যের আবিষ্কার। সোফোক্লিস-এর *রাজা ইডিপাস* এ-জাতীয় উদ্‌ঘাটনের সুন্দর দৃষ্টান্ত। আরিস্টটল ষোড়শ পরিচ্ছেদে বলেছেন— "সমস্ত উদ্‌ঘাটনের মধ্যে শ্রেষ্ঠ হল সেই পদ্ধতি যা ঘটনার মধ্য থেকে উদ্‌ভূত, যেখানে সম্ভাব্য ঘটনার মধ্য দিয়ে বিস্ময় ও চমৎকারিত্বের সৃষ্টি হয়, যেমন সোফোক্লেসের ওয়দিপৌসে ... ...। এগুলি উদ্‌ঘাটনের একমাত্র দৃশ্য যেখানে কৃত্রিম বা বানানো অভিজ্ঞানের— যেমন হার ইত্যাদি—প্রয়োজন নেই।" [ষোড়শ পরিচ্ছেদ]

আরিস্টটল একথাও বলেছেন যে— "উদ্‌ঘাটন তখনই খুব ফলপ্রসূ হয়, যখন তা বিপ্রতীপতার সঙ্গে সঙ্গে ঘটে।" (একাদশ পরিচ্ছেদ) সেই সঙ্গে আরিস্টটল বলেছেন কাহিনির বিন্যাসের মধ্যে দিয়ে যে-উদ্‌ঘাটন ঘটে সেই উদ্‌ঘাটন শ্রেষ্ঠ। কারণ—"....... ঐ রকম উদ্‌ঘাটন এবং ভাগ্যের পরিবর্তন করুণা কিংবা ভয় জাগিয়ে তোলে। আর আমাদের বিবেচনায় এইরকম ঘটনার বর্ণনাই ট্র্যাজেডির লক্ষ্য। তাছাড়া (উদ্‌ঘাটনের ফলেই) কাহিনীর সমাপ্তি সম্ভব সুখে কিংবা দুঃখে।" [একাদশ পরিচ্ছেদ]

(ঙ) **গ্রন্থিবন্ধন ও গ্রন্থিমোচন** : আরিস্টটল বলেছেন— সব ট্র্যাজেডিতেই থাকে গ্রন্থিবন্ধন। তাঁর উক্তি হল— "আমি বলতে চাই, কাহিনীর শুরু থেকে ভাগ্য-পরিবর্তনের সূচনা পর্যন্ত, অর্থাৎ সৌভাগ্য থেকে দুর্ভাগ্য বা দুর্ভাগ্য থেকে সৌভাগ্যের সূচনা পর্যন্ত হল গ্রন্থিবন্ধনের পর্ব। আর ভাগ্য-পরিবর্তনের সূচনা থেকে শেষ পর্যন্ত হল গ্রন্থিমোচনের পালা।" (অষ্টাদশ অধ্যায়) কাহিনির সূত্রপাত থেকে শুরু করে, যখন থেকে প্লট-এর ঘটনা-গতি শুরু হয়েছে— সেই অংশ পর্যন্ত গ্রন্থিবন্ধন। অর্থাৎ নাটকের ক্রিয়া শুরু হবার আগে পর্যন্ত নাট্য-কাহিনিতে যা কিছু ঘটেছে এবং চরিত্রগুলির সম্পর্ক নির্ণীত হয়ে গেছে— তা-ই হল গ্রন্থিবন্ধন। যেখান থেকে নাট্যকাহিনিতে গতি পরিবর্তনের সূচনা সেখান থেকে শুরু করে নাটকের পরিণাম পর্যন্ত হল গ্রন্থিমোচন।

ইসকাইলাস-এর *আগামেমনন* নাটকে যুদ্ধজয়ী রাজার নগরে প্রবেশ, প্রজাবৃন্দ কর্তৃক সংবর্ধনা, রাজার তৃপ্তি ও গর্বিত উক্তি ইত্যাদি নিয়ে গ্রন্থিবন্ধন অংশ নির্মিত হয়েছে। তারপর রাজার হত্যাকাণ্ড থেকে শুরু করে নাটকের পরিণাম পর্যন্ত হল গ্রন্থিমোচন। সোফোক্লিস-এর *রাজা ইডিপাস* নাটকে ইডিপাস থিবিস-এর রাজা হওয়া পর্যন্ত গ্রন্থিবন্ধন; রাজা হবার পর যখন বাজ্যে মড়ক লাগে এবং পরিস্থিতির পরিবর্তনের দিকে নাট্যঘটনার গতি প্রবাহিত হতে শুরু করে তখন থেকে গ্রন্থিমোচন-পর্ব শুরু হয় যা শেষ হয় ইডিপাস-এর অন্ধত্ব ও আত্ম-নির্বাসনের করুণ ও ভয়ংকর ঘটনায়। গ্রন্থিমোচনের জন্য অলৌকিকতার আশ্রয় নেওয়া আরিস্টটল-এর সায় ছিল না। *মেদেয়া* নাটকে যেমন মেদেয়া-র জন্য স্বর্গ থেকে রথ নেমে আসার ব্যাপারটি নিপুণ গ্রন্থিমোচনের দৃষ্টান্ত নয় বলে তিনি মনে করতেন। ঘটনার ঘাত-প্রতিঘাতের মধ্য দিয়ে যে-গ্রন্থিমোচন স্বাভাবিকভাবে সূচিত হয় তা-ই তাঁর মতে যথার্থ গ্রন্থিমোচন। ভালো ট্র্যাজেডিতে গ্রন্থিবন্ধন এবং গ্রন্থিমোচন দুই-ই নিপুণভাবে

বিন্যস্ত হওয়া দরকার। আরিস্টটল বলেছেন—"কেউ কেউ গ্রন্থিবন্ধনে সিদ্ধ, কিন্তু গ্রন্থিমোচনে কাঁচা। দুই রীতিই আয়ত্ত করতে হবে।" [অষ্টাদশ অধ্যায়]

(চ) কাহিনি ও উপকাহিনি : আরিস্টটল কাহিনির আলোচনা করতে গিয়ে উপকাহিনির প্রসঙ্গ এনেছেন এবং তার সঙ্গে কাহিনির সম্পর্ক নির্ণয় করেছেন। কাহিনি বা প্লট হল নাট্যকারের অভিপ্রেত বিষয়টি যে মূল ঘটনার আধারে প্রকাশ করা হচ্ছে সেই ঘটনা। উপকাহিনি হল মূল ঘটনা নয়—এমন সংক্ষিপ্ত কথাবৃত্ত বা এপিসোড (Episode)। আরিস্টটল বলেছেন প্রথমে নাট্যকারের অভিপ্রেত কাহিনির মূল রূপরেখাটি চিহ্নিত করে নিতে হবে। তারপর তাকে বিস্তৃত ও পূর্ণতা দান করতে হবে উপকাহিনি দিয়ে। আরিস্টটল-এর মতে নাটকের উপকাহিনি হবে ছোটো ছোটো, উপকাহিনিগুলি কাহিনির সঙ্গে যুক্ত হবে এবং উপকাহিনি কোনো ভাবেই মূল কাহিনিকে ছাপিয়ে যাবে না। দৃষ্টান্ত হিসেবে বলা যায় *আগামেম্‌নন* নাটকে বিজয়ী রাজার নগরে প্রবেশ, তাঁর হত্যা এবং পরিণামী করুণা ও ভয়ের উদ্রেক হল মূল কাহিনি। রানির সঙ্গে তাঁর প্রণয়ীর সম্পর্কটি উপকাহিনি। *রাজা ইডিপাস* নাটকে ইডিপাস রাজা হবার পর তার পরিচয়ের উদ্‌ঘাটন ও তার নির্বাসন হল মূল কাহিনি। তার পূর্বে ইডিপাস-এর করিন্‌থ-এর জীবন এবং রাজা লাইয়ুস-এর সঙ্গে তার সংঘাতের কাহিনি হল উপকাহিনি।

(ছ) সরল কাহিনি ও জটিল কাহিনি : আরিস্টটল ট্র্যাজেডির প্লটকে সরল ও জটিল—এই দুই ভাগে ভাগ করেছেন। প্রথমে বলেছেন, যে-কাহিনি সরল ক্রিয়ার অনুসরণ করে তা হল সরল প্লট। জটিল ক্রিয়ার অনুসরণ করলে তাকে বলা হবে জটিল প্লট। তারপর তিনি ব্যাখ্যা করে বলেছেন— যে-ক্রিয়া একক এবং অবিচ্ছিন্ন; "যার মধ্যে অবস্থার পরিবর্তন ঘটে বিপ্রতীপতা এবং উদঘাটন ছাড়াই"— তাকেই সরল ক্রিয়া বলা যায়। তারপরে তিনি বলেছেন—"আর জটিল ক্রিয়া হল যেখানে অবস্থার পরিবর্তন এবং বিপ্রতীপতা বা উদ্‌ঘাটন, কিংবা উভয়েই উপস্থিত।" তা হলে সরল প্লট ও জটিল প্লটের পার্থক্যের বিষয়টি স্পষ্ট বোঝা গেল। যে ট্র্যাজেডির প্লট-এ ঘটনা-বিন্যাসের মধ্যে থাকবে অনিবার্য বিপ্রতীপতা এবং গুরুত্বপূর্ণ উদঘাটন তা-ই হল জটিল প্লট। অন্যদিকে কেবল একটি কাহিনির বিবরণ থেকে সরল প্লট নির্মিত হতে পারে। আরিস্টটল বলেছেন যে, জটিল প্লট থেকেই উৎকৃষ্ট ট্র্যাজেডি সৃষ্টি হতে পারে। এসব কথা তিনি বলেছেন *কাব্যতত্ত্ব* গ্রন্থের দশম পরিচ্ছেদে।

নবম পরিচ্ছেদের শেষের দিকে তিনি দুটি বাক্য লিখেছেন—"সমস্ত রকম সরল কাহিনী ও ক্রিয়ার মধ্যে সবচেয়ে নিকৃষ্ট হল উপকাহিনীতে ভরা কাহিনী। উপকাহিনীতে ভরা কাহিনী বলতে বোঝাচ্ছি যেখানে উপকাহিনীগুলির মধ্যে কোন সম্ভাব্য বা অনিবার্য যোগসূত্র নেই।" প্রসঙ্গত অষ্টাদশ পরিচ্ছেদের শেষের দিকে আরিস্টটল বলেছেন মহাকাব্যের কাহিনি সরল হতে পারে। সেখানে ঘটনা ধারার মধ্যে অনিবার্য যোগসূত্র, বিপ্রতীপতা বা উদ্‌ঘাটন না-ও থাকতে পারে। কিন্তু সেভাবে সমগ্র কাহিনি নিয়ে নাটক লিখতে গেলে তা ভালো নাটক হয় না। সম্পূর্ণ কাহিনির পরিবর্তে কাহিনির অংশবিশেষ নিয়ে বিপ্রতীপতা ও উদ্‌ঘাটন সহ বিন্যস্ত করে তবেই ভালো ট্র্যাজেডি হতে পারে। এখানে দৃষ্টান্ত হিসেবে উল্লেখ করা যায় *আগামেম্‌নন, রাজা ইডিপাস, মেদেয়া* ইত্যাদি নাটক সবই জটিল প্লটকে নাট্যায়িত করেছে।

(জ) কোরাস : গ্রিক ট্র্যাজেডিতে কোরাস প্লট-এর অন্যতম এবং অবিচ্ছেদ্য অঙ্গ ছিল। কোরাস-এর ধারণা এবং সংযোজন গ্রিস-এ নাটককার এবং দর্শকদের কাছে এতই স্বতঃসিদ্ধ ছিল যে আরিস্টটল কোরাস সম্পর্কে বিশেষ বাক্য ব্যয় করেননি। অষ্টাদশ পরিচ্ছেদের

একেবারে শেষে কয়েকটি বাক্যে কোরাস সম্পর্কে সামান্য কয়েকটি কথা তিনি বলেছেন। এখানে আমরা আরিস্টটল যা বলেছেন কেবল সেটকুই বলব।

আরিস্টটল-এর বাক্যগুলির অর্থ বুঝতে গেলেও আমাদের কোরাস বলতে যা বোঝায় তা জানতে হবে। কোরাস হল গ্রিক নাটকের আদি উৎস। আমরা ট্র্যাজেডির উদ্ভব আলোচনায় জেনেছি দেবতার উৎসবে অনেক ব্যক্তি একযোগে নৃত্যগীত করত এবং মুখোশ পরে নৃত্যগীত সহ শোভাযাত্রা করত। এই সম্মেলক নৃত্যগীতের শিল্পীরাই ট্র্যাজেডিতে কোরাস-এ পরিণত হয়েছিল। প্রত্যেক গ্রিক ট্র্যাজেডিতেই প্রধান সক্রিয় চরিত্রগুলি ছাড়াও থাকত একদল মানুষ যারা নাট্যক্রিয়ার মাঝে মাঝে সমবেতভাবে নাটকের মূল ভাবটি ব্যাখ্যা করে দিত। অবশ্যই এই ব্যাখ্যা হত নাটককারের অভিপ্রায় অনুসারে। কখনও কখনও কোরাস সংলাপেও অংশ গ্রহণ করত। ইসকাইলাস ও সোফোক্লিস-এর ট্র্যাজেডিতে নগরের প্রবীণেরা থাকত কোরাস-এর ভূমিকায়। ইউরিপিডিস-এর *মেদেয়া*-তে নগরের নারীরা কোরাস-এর ভূমিকা পালন করেছে। সাধারণত কোরাস-দলের থাকত নির্দিষ্ট পোশাক এবং মুখোশ। মঞ্চে তাদের পদচারণার ধরনও হত নির্দিষ্ট। দুটি বা তিনটি দলে ভাগ হয়ে তারা সমবেত গানের স্বরে নিজেদের কথা উপস্থাপিত করত।

আরিস্টটল কোরাস সম্পর্কে দুটি গুরুত্বপূর্ণ বাক্য লিখেছেন।—"কোরাসকে একজন অভিনেতা হিসেবে গণ্য করতে হবে।" (অষ্টাদশ পরিচ্ছেদ) "কোরাস হবে সমগ্র নাটকের একটি উপাদান, নাটকের ক্রিয়াতে অংশ গ্রহণ করবে— এউরিপিদেসের নাটকের মতো নয়, সোফোক্লিসের নাটকের মতো।" (তদেব) এখানে বোঝা যায় যে, কোরাস-এর ভূমিকায় পরম্পরা-বাহী ধরনটিই আরিস্টটল-এর পছন্দ ছিল। *মেদেয়া* নাটকের বৈচিত্র্য তিনি পছন্দ করেননি।

নাটকের গঠনের দিক থেকে আরিস্টটল কোরাসকে খানিকটা প্রাকরণিক ভূমিকাও দিয়েছেন। দ্বাদশ পরিচ্ছেদে তিনি বলেছেন ট্র্যাজেডির প্লট বিভক্ত হবে তিনটি অংশে— প্রোলোগ, এপেইসোদ এবং এক্সোদ। প্রোলোগ হল তাই যা কোরাস-এর পূর্বে থাকে। দুই কোরাস-এর মধ্যবর্তী অংশ হল এপেইসোদ। এক্সোদ হল ট্র্যাজেডির শেষ অংশ যার পরে আর কোনো কোরাস থাকে না। এ ছাড়াও আরিস্টটল এই পরিচ্ছেদে বলেছেন যে, প্রথম কোরাস-এর নাম হল প্যারোদ এবং স্তাসিমোন হল—"ত্রোখী বা আনাপায়েস্তে লেখা নয় এমন কোরাসের গান। আর কোম্‌মোস (কোম্‌মোই) হল এক শোকসংগীত, সেই সংগীত অভিনেতারা এবং কোরাসের দল সকলে মিলেই গায়।" [দ্বাদশ পরিচ্ছেদ]

কোরাস সম্পর্কে আরিস্টটল-এর কথা এইটুকুই। গ্রিক নাটকের যুগের পরে কোরাস-এর ভূমিকায় প্রথাসিদ্ধ ধরন বদ্‌লে যায়। রেনেসাঁস-পর্বের নাটকে বহু বিচিত্র উপায়ে কোরাস-এর কাজ সম্পন্ন হয়েছে। আবার কেউ কেউ কোথাও কোথাও কোরাস পরেও ব্যবহার করেছেন যেমন শেলি, এলিয়ট।

ট্র্যাজেডির ষড়ঙ্গের প্রথম অঙ্গ হল প্লট। এই প্লটকে আরিস্টটল যথেষ্ট গুরুত্ব দিয়েছেন এবং প্লটকেই বলেছেন ট্র্যাজেডির সর্বাধিক গুরুত্বপূর্ণ অঙ্গ। তিনি প্লট সম্পর্কে যে-সব কথা বলেছেন তা আমরা আলোচনা করলাম। অতঃপর আমরা আরিস্টটল-এর আলোচনায় ট্র্যাজেডির অপরাপর অঙ্গগুলি বিষয়ে আলোচনা করব।

ট্র্যাজেডি-র চরিত্র[1]

ট্র্যাজেডি তথা যে-কোনো নাটকের অন্যতম এবং আবশ্যিক উপাদান হল চরিত্র। ট্র্যাজেডি যেহেতু একটি সম্পূর্ণ ক্রিয়ার অনুকরণ, এবং সেই ক্রিয়া সংঘটিত হয় ব্যক্তির দ্বারা, তাই ব্যক্তির অনুকরণ ট্র্যাজেডিতে আবশ্যিক। ট্র্যাজেডিতে যে ব্যক্তিদের অনুকরণ করা হয় তাদেরই বলা হয় চরিত্র।

ট্র্যাজেডির কাহিনির কেন্দ্রে থাকেন একজন বা দুজন মানুষ। সাধারণ ভাবে নায়ক কথাটি বারবার ব্যবহৃত হয় এবং আরিস্টটলও তাই করেছেন। কিন্তু আরিস্টটল যে কালপর্বের গ্রিক নাটকগুলির অবলম্বনে তাঁর ট্র্যাজেডি-তত্ত্ব বিবৃত করেছিলেন সেই নাটকগুলিতে প্রায়শই দেখা যায়—ভাগ্যের বিড়ম্বনায় বা কৃতকর্মের ফলে শোচনীয় ও শোকান্তক পরিণাম ঘটেছে একটি নয়, দুটি চরিত্রের ক্ষেত্রে। *রাজা ইডিপাস* নাটকে যেমন ইডিপাস ও রানি য়োকাস্তা, *আন্তিগোনে* নাটকে আন্তিগোনে ও ক্রেয়ন, *মেদেয়া* নাটকে মেদেয়া ও জেসন।

আরও একটি কথা আগেই বলে নেওয়া যায়। আরিস্টটল-এর আলোচনা থেকে মনে হয় যে, ট্র্যাজেডির নায়ক বা কেন্দ্রীয় চরিত্র হবার ক্ষেত্রে পুরুষ চরিত্রের নির্বাচনই স্বাভাবিক, কিন্তু উল্লিখিত গ্রিক ট্র্যাজেডিগুলিতে দেখা যাচ্ছে পুরুষের মতোই নারীচরিত্রও কেন্দ্রীয় বা প্রধান চরিত্রের ভূমিকা পালন করেছে। আন্তিগোনে, মেদেয়া, ইফিগেনেইয়া তার উদাহরণ।

অতঃপর আমরা ট্র্যাজেডির চরিত্র তথা নায়করা কেন্দ্রীয় চরিত্র সম্পর্কে আরিস্টটল-এর বক্তব্য বিশ্লেষণ করব। চরিত্র অর্থে প্রধান বা কেন্দ্রীয় চরিত্রের কথাই আরিস্টটল বলেছেন এবং *কাব্যতত্ত্ব* গ্রন্থের পঞ্চদশ পরিচ্ছেদে তার আলোচনা করেছেন।

প্রথমেই তিনি বলেছেন—"চরিত্র রচনায় চারটি ব্যাপারে লক্ষ দিতে হবে।"

প্রথমত, তাঁর মতে চরিত্রের সর্বাধিক গুরুত্বপূর্ণ লক্ষণ হল চরিত্রটি ভালো হওয়া চাই। আরিস্টটল খুব সংক্ষেপে বললেও এই ভালো শব্দটির যথার্থ ব্যঞ্জনা সতর্কভাবে বুঝে নিতে হবে। প্রথমত—এই ভালো অর্থে অত্যন্ত ধার্মিক এবং সজ্জন ব্যক্তি হবে না যার কোনো রকম ভ্রান্তি বা অজ্ঞানকৃত অপরাধ নেই। কারণ সে-রকম নিষ্পাপ চরিত্রের দুর্ভোগ ও পতন মানুষের মন সহজে মেনে নিতে পারে না এবং তার মধ্যে কোনো সংগতি দেখতে পায় না। তবে ট্র্যাজেডির চরিত্র নৈতিক দিক থেকে এবং মনের দিক থেকে নীচ স্বভাবসম্পন্ন মন্দ ব্যক্তিও হবেনা। শয়তান ধরনের ব্যক্তির পতনে ট্র্যাজেডির দর্শকের মনে কোনো করুণা ও ভীতি জাগে না।

আবার ট্র্যাজেডির প্রধান চরিত্র নৈতিক দিক থেকে মহৎ এবং উচ্চতাসম্পন্ন হওয়া বাঞ্ছনীয়। এই নীতি অবশ্য গ্রিস-এর সমকালীন মানসিকতা ও সংস্কৃতি অনুসারে নির্ধারিত হয়েছে। যেমন যুদ্ধ জয় করবার জন্য কন্যাকে বলিদান দেবার ঘটনাকে নৈতিক দিক থেকে সেই যুগে অপরাধের ছিল না (নাটক *ইফিগেনেইয়া*)। আবার যুদ্ধজয়ী রাজা রক্ষিতা সহ স্বদেশে ফিরবেন— এটাও তৎকালীন নীতিতে খুব বড়ো কোনো অপরাধ নয়। অন্যদিকে নায়ক চরিত্রের যে পতন ঘটছে তার কারণ হিসেবে ঔদ্ধত্য, অহংকার এবং অজ্ঞানকৃত কোনো ভ্রান্তি চরিত্রটির থাকতে হবে। এখানেই থাকবে তার পতনের বীজ। অথচ এই অহংকার চরিত্রটির নিহিত মহত্ত্ব ও বিশালতাকেও আবৃত করবে না। আরিস্টটল এভাবেই প্রধান চরিত্রের 'ভালো' বিশেষণটিকে বোঝাবার চেষ্টা করেছেন।

এখানে তিনি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ একটি কথা বলেছেন যা শিল্পের বিচারে তাঁর অনন্য প্রতিভার প্রমাণ—"..................চরিত্র পরিস্ফুট হবে কথায় এবং কাজে, এবং তার মধ্যে

থাকবে একটি সিদ্ধান্ত যদি সিদ্ধান্তটি উৎকৃষ্ট হয়, চরিত্রও উৎকৃষ্ট হবে। এটি অবশ্য আপেক্ষিক ব্যাপার, একজন লোকের পক্ষে এক এক রকম।" (*কাব্যতত্ত্ব*, আরিস্টটল, অনুবাদ শিশির কুমার দাশ, প্যাপিরাস, ১৯৮৬, পৃ.৩৮) ভাষাশিল্পে গড়ে তোলা চরিত্রের ক্ষেত্রে ভালো মন্দের বিচারে এই যে আপেক্ষিকতার প্রসঙ্গটি স্মরণ করিয়ে দিয়েছেন আরিস্টটল তা তাঁর গভীর শিল্পবোধের প্রমাণ। এজন্যই ট্র্যাজেডির চরিত্রকে একমাত্রিকভাবে ভালো বা মন্দ বলে নির্দেশ করা অনেক সময়েই কঠিন হয়ে পড়ে। *আগামেম্‌নন* নাটকের আগামেমনন, *মেদেয়া* নাটকের মেদেয়া-কে প্রচলিত অর্থে ভালো না-ও বলা যায়। কিন্তু চরিত্রগুলির হৃদয়ের বিশালতা এবং নিজস্ব নৈতিকতার শক্তিতে উপেক্ষা করাও সম্ভব নয়। এই বিশালতা এবং অন্য দিকে মনের মহত্ত্বের শক্তিকে একটি চরিত্র যথাযথভাবে ট্র্যাজিক হয়ে ওঠে। তখনই তার পতনে পাঠক ও দর্শকের মনে জাগে করুণা ও ভয়ের অনুভূতি।

আরিস্টটল-এর লেখা থেকে বোঝা যায় যে তিনি পুরুষ চরিত্রকে ট্র্যাজেডির নায়ক হিসেবে প্রাধান্য দিয়েছেন। উন্নত মনের ব্যক্তিই ট্র্যাজেডির নায়ক চরিত্র হতে পারে। এই সিদ্ধান্তটি ব্যক্ত করবার পরেই তিনি লেখেন—"একটি স্ত্রী চরিত্র কিংবা ক্রীতদাস চরিত্রও উন্নত হতে পারে—যদিও বলা হয়ে থাকে যে স্ত্রীলোক (পুরুষের চেয়ে) নিকৃষ্টতর এবং ক্রীতদাস সম্পূর্ণভাবেই নিকৃষ্ট।" [পঞ্চদশ পরিচ্ছেদ]

আরিস্টটল-এর এই উক্তি সমকালীন গ্রিক সমাজের ভাবনার এক দ্বান্দ্বিকতাকে তুলে ধরে। বিশ্বের যে-কোনো প্রাচীন সমাজের মতোই গ্রিক সমাজেও স্বীকৃত ছিল পুরুষের প্রাধান্য। কিন্তু ইউরোপীয় সমাজে প্রাচীন কাল থেকে নারীর ব্যক্তিত্বও সুপরিস্ফুট, বিশেষ করে সমাজের উচ্চ বর্গের মধ্যে। যে-সময়ে আরিস্টটল এই কাব্যতত্ত্ব রচনা করেছেন তার কিছুকাল আগে থেকেই, অর্থাৎ গ্রিক নাটকগুলি রচিত হবার সময় থেকেই নারীর ব্যক্তিত্বের অধিকার প্রতিষ্ঠার দাবি যে প্রবল হয়ে উঠতে শুরু করেছিল, গ্রিক নাটকের প্রধান নারী চরিত্রগুলি তার সমুজ্জ্বল দৃষ্টান্ত। যেমন— আন্তিগোনে, ইফিগেনেইয়া মেদেয়া প্রমুখ। আরিস্টটলও সেই কারণেই ট্র্যাজেডির নায়ক হিসেবে প্রধানত পুরুষের কথা ভাবলেও নারীচরিত্রের দাবি অস্বীকার করতে পারেননি।

ট্র্যাজেডির প্রধান চরিত্রের দাবিদার হিসেবে ক্রীতদাস চরিত্রের সম্ভাবনাকে নস্যাৎ করতেই চেয়েছিলেন আরিস্টটল। সেজন্যই তিনি একবার ক্রীতদাসদের সম্পূর্ণ ভাবেই নিকৃষ্ট বলেছেন। এ হল সমকালীন গ্রিস-এর সামাজিক স্বর। কিন্তু এখানেও একটি মানবীয় আত্ম-জিজ্ঞাসার সম্মুখীন হয়েছিলেন আরিস্টটল, তাই কিছুটা স্ববিরোধী ভাবেই একথাও বলেছেন— ক্রীতদাস চরিত্রও উন্নত হতে পারে। এ-হল-তাঁর ব্যক্তিগত উপলব্ধি। এজন্যই তিনি একজন কালোত্তীর্ণ প্রতিভা যিনি সামাজিক রক্ষণশীলতার চেয়ে কিছুটা অগ্রসর হয়ে ভাবতে পেরেছেন।

এই একই ধারণা আমরা ভারতীয় নাট্যশাস্ত্রেও দেখতে পাই। সেখানেও মহত্ত্বসম্পন্ন উচ্চবংশীয় পুরুষকে নাটকের নায়কের মর্যাদা দেওয়া হয়েছে লিখিতভাবে। কিন্তু সেখানেও মহৎ নারী চরিত্রের ব্যক্তিত্বকে অস্বীকার করা যায়নি বলেই লেখা হয়েছে *স্বপ্নবাসবদত্তা*, (ভাস) এবং *অভিজ্ঞান শকুন্তলম্* (কালিদাস)-এর মতো নাটক।

নাট্যচরিত্রের দ্বিতীয় লক্ষণ হিসেবে আরিস্টটল লিখেছেন—"চরিত্রটি হবে স্বাভাবিক (বা যথাযথ)।" এই বাক্যটিও কিছুটা ব্যাখ্যার অপেক্ষা রাখে কারণ তারপরেই আরিস্টটল লিখেছেন—"পৌরুষদৃপ্ত চরিত্র (খুবই) সম্ভব, কিন্তু একটি নারী চরিত্রের পক্ষে পুরুষোচিত ভাব বা বাক্ চতুরালি যথাযথ নয়।" (পঞ্চদশ পরিচ্ছেদ) এ থেকে বোঝা যায় যে, কোন্ শ্রেণির চরিত্রের কেমন আচরণ হবে— সে-সম্পর্কে সমাজের কিছু নির্দিষ্ট অনুশাসন ছিল।

নারীর পক্ষে পৌরুষদৃপ্ত ভাব এবং বাক্-চাতুর্য যথাযথ নয় বলবার সময় আরিস্টটল *আগামেম্নন* নাটকের ক্লাইটেম্নেস্ট্রা-র কথা মনে রেখেছিলেন কিনা তাতে সংশয় থাকে। তবে সাধারণভাবে তাঁর এই উক্তি মেনে নেওয়া যায় এবং তার মধ্যে বিশেষ অসংগতিও নেই। নাটকের চরিত্র হিসেবে ভৃত্যের আচরণ ভৃত্যের মতোই হবে, রাজার মতো নয়; এমনকি রাজার আচরণ মন্ত্রীর মতোও হবে না— একেই শিল্পের ঔচিত্যবোধ বলা হয়।

চরিত্রের তৃতীয় লক্ষণ হিসেবে আরিস্টটল বলেছেন— 'চরিত্র হবে অনুগত'। এই 'অনুগত' শব্দটিকে নাট্যতত্ত্ববিদরা যথার্থভাবেই ব্যাখ্যা করেছেন যে অনুগত অর্থে প্রথার 'অনুগত' অর্থাৎ প্রথাসিদ্ধ। এই ধারণা প্রাচীন নাটকের ক্ষেত্রে সংগত এই জন্যই যে প্রাচীন নাটকের আখ্যানভাগ গৃহীত হত পুরাণ ও মহাকাব্য থেকে। পুরাণ ও মহাকাব্যে কিছু কিছু চরিত্র এবং ঘটনা দীর্ঘকাল ধরে শ্রুতিবাহিত হয়ে আসার ফলে মানুষের মনে সংস্কারসিদ্ধ হয়ে যেত। ট্র্যাজেডিতে সেই সংস্কার অমান্য করা অনুচিত। যেমন বীর অ্যাকিলিস-কে ভীরু বলে ট্র্যাজেডি-তে দেখানো যাবে না; তেমনই মেদেয়াকে দেখানো যাবে না অন্য পুরুষের প্রতি আসক্ত বলে। যদিও গ্রিক পুরাণে আছে নির্বাসিত মেদেয়া এথেন্স-এর রাজাকে বিবাহ করেছিল। কিন্তু সেই বিবাহ প্রেমের আকর্ষণে নয়, আশ্রয়ের ভরসায়।

আরিস্টটল বলেছেন চরিত্রের চতুর্থ লক্ষণ হল সংগতি। অর্থাৎ একটি চরিত্র একটি নাটকে যে আচরণ করবে সেখানে শুরু থেকে শেষ পর্যন্ত একটি সংগতি ও সম্ভাব্যতা যেন থাকে। আরিস্টটল-এর উক্তি—"ঘটনাবিন্যাসের মতোই চরিত্র রচনাতেও লক্ষ্য হওয়া উচিত, যা সম্ভাব্য, যা অনিবার্য; যাতে করে বোঝা যায় একটি চরিত্রের পক্ষে এইসব বলা বা করা সম্ভব, (কিংবা) এই ঘটনার পরে ওই ঘটনার অবির্ভাব সম্ভব বা অনিবার্য।" (পঞ্চদশ পরিচ্ছেদ) সাধারণভাবে আরিস্টটল-এর এই উক্তি আমরা সকলেই মেনে নিতে পারি কিন্তু যেখানে আরিস্টটল চরিত্রের আচরণের অসংগতির দৃষ্টান্ত হিসেবে ইফিগেনেইয়া-র কথা বলেছেন সেখানে তাঁর সঙ্গে অনেক নাট্যসমালোচকের মতের অমিল ঘটে। আরিস্টটল বলেছেন— "আর অসঙ্গত চরিত্রের উদাহরণ হল ইফিগেনেইয়া আউলিদি নাটকের ইফিগেনেইয়া, কারণ তার প্রথম দিকের বিনীত ভাবের সঙ্গে পরবর্তী আচরণের মিল নেই।" [পঞ্চদশ পরিচ্ছেদ]

আরিস্টটল-এর এই মন্তব্যের সূত্রে শিশিরকুমার দাশ বিস্তৃতভাবে যা বলেছেন তা উদ্ধৃত হল : "এখানে আরিস্টটলের সঙ্গে একমত হওয়া কঠিন। যখন ইফিগেনেইয়াকে বলি দেবার প্রস্তাব এল তখন সে অসহায়া বালিকার মতো কেঁদেছে, প্রার্থনা করেছে। কিন্তু যখন আখিল্লেস তার জন্য যুদ্ধ করতে, প্রাণ দিতে প্রস্তুত হয়েছে তখন তার মধ্যে এসেছে পরিবর্তন। সে অনুভব করেছে তার শক্তি, সে বলেছে আখিল্লেসের জীবন অনেক মূল্যবান, সে গ্রীসের জন মৃত্যুর জন্য প্রস্তুত। যদি তাকে বলি দিলে গ্রীসের মঙ্গল তাহলে সে বলি দেবে নিজেকে ইফিগেনেইয়ার এই মহত্ত্বের কাছে আখিল্লেসের মহত্ত্বও ম্লান হয়ে যায়।" (*কাব্যতত্ত্ব*, আরিস্টটল, অনুবাদ শিশিরকুমার দাশ, পূর্বোক্ত সংস্করণ, পাদটীকা ২, পৃ. ৩৯) গিলবার্ট মা আরিস্টটল সম্পর্কে দুঃখ করে লিখেছেন : "Aristotle—such are the pitfalls in the wa of human critics takes her as a type of inconsistency. [*A History of Ancien Greek Literature*, London, 1897, 4th impression 1907, p. 256]

আরিস্টটল *কাব্যতত্ত্ব* গ্রন্থের বিভিন্ন স্থানে চরিত্র সম্পর্কে আরও কিছু মন্তব্য করেছেন তিনি বলেছেন ক্রিয়াকে পরিস্ফুট করবার জন্যই চরিত্রের প্রয়োজন হয়। ত্রয়োদশ পরিচ্ছে

তিনি এই কথাগুলি বলেছিলেন যে, অত্যন্ত উৎকৃষ্ট কোনো মানুষ এবং অত্যন্ত খারাপ কোনো লোক ট্র্যাজেডির প্রধান চরিত্র হবে না। এই বিষয়টি আগে আমরা উল্লেখ করেছি।

ত্রয়োদশ পরিচ্ছেদেই আরিস্টটল বলেছেন— সম্ভ্রান্ত কুলের এবং নিজে সম্ভ্রান্ত, খ্যাতনামা ব্যক্তির ট্র্যাজেডির নায়ক হওয়া বাঞ্ছনীয়, যেমন আগামেম্‌নন, রাজা ইডিপাস।

ত্রয়োদশ পরিচ্ছেদে ট্র্যাজিক চরিত্রের অন্যতম একটি বৈশিষ্ট্যের উল্লেখ করেছেন আরিস্টটল— এমন একজন লোককে নিতে হবে যে ন্যায়নিষ্ঠা ও ধার্মিকতায় একেবারে নিষ্কলঙ্ক নয় আবার কোনো অন্যায় বা অসাধুতার জন্য তার পতন হয়নি, তার পতন হয়েছে কোনো একটি ত্রুটির ফলে। যে ত্রুটির উল্লেখ করেছেন আরিস্টটল তাকে তিনি বলেছেন 'হামারতিয়া'। এই হামারতিয়া-র চরিত্রটি বুঝে নেবার উপরই ট্র্যাজিক চরিত্রকে অনুভব করা নির্ভর করছে। এই হামারতিয়া সজ্ঞানে করা দুরভিসন্ধিমূলক কোনো অপরাধ নয়। হামারতিয়া শব্দটির দ্বারা কিছুটা বিভিন্ন ধরনের অর্থও বোঝায়। এর মধ্যে পড়ে অজ্ঞানকৃত পাপ। যেমন জননীর সঙ্গে ইডিপাস-এর শারীরিক সম্পর্ক, কিন্তু এই পাপের মূলে ছিল ভাগ্যের বিরূপতা। হামারতিয়া অনেক সময় বাধ্যতামূলক অপরাধও বোঝায়। যেমন আগামেম্‌নন-এর ইফিগেনেইয়াকে বলি দেওয়া। এখানেও দৈব-বিমুখতায় পরিস্থিতি এমন হয়েছিল যে একাজ না করে তাঁর উপায় ছিল না। অনেক সময় সিদ্ধান্ত গ্রহণে ভ্রান্তি চরিত্রটির ত্রুটির কারণ। যেমন পথের মোড়ে দাঁড়িয়ে বচসা-সূত্রে ইডিপাস-এর লাইয়ুস-কে বধ করা। যেমন ক্রেয়ন-এর সিদ্ধান্ত যে, বিদ্রোহী ইডিপাস-পুত্রের সৎকার হবে না। অনেক সময় প্রচলিত সমাজবিধি লঙ্ঘন করার ফলে চরিত্রের শোকাবহ পরিণাম ঘটে। যেমন রাজার আদেশ লঙ্ঘন করেছিল আন্তিগোনে। একে কিন্তু কোনো অর্থেই ত্রুটি বলা যায় না।

হামারতিয়া শব্দের সঙ্গে মিশে আছে গর্ব, অহংকার এবং ঔদ্ধত্যের অনুষঙ্গ। কোনো দিক থেকেই অপরাধী না হলেও প্রমিথিয়ুস, আগামেম্‌নন, ইডিপাস ছিল গর্বিত এবং হঠকারী। তবে এজাতীয় অহংকারেরও বিন্দু-মাত্র পাওয়া যায় না ইফিগেনেইয়ার চরিত্রে। মনে রাখতে হবে আরিস্টটল ইউরিপিডিসকে তেমন গুরুত্ব দিতেন না। চরিত্র সম্পর্কে আরিস্টটল স্বতন্ত্রভাবে যে-সব কথা বলেছেন তা এখানেই সম্পূর্ণ হল। কিন্তু কাহিনি ও চরিত্রের আপেক্ষিক গুরুত্ব নিয়ে তাঁর উক্তি বহু-আলোচিত। এই প্রসঙ্গ আমরা এর পরে আলোচনা করছি।

কাহিনি ও চরিত্র : আপেক্ষিক গুরুত্ব

কাব্যতত্ত্ব গ্রন্থের ষষ্ঠ অধ্যায়ে যেখানে ট্র্যাজেডির ছয়টি অঙ্গ নিয়ে আলোচনা করেছেন আরিস্টটল সেখানেই তিনি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ এবং কিছুটা বিতর্কমূলক একটি উক্তি করেছেন— "তা ছাড়া ক্রিয়া বাদ দিলে ট্রাজেডি অসম্ভব, কিন্তু চরিত্র বাদ দিয়ে ট্রাজেডি সম্ভব।" এই অংশে এ-বিষয়ে কয়েকটি কথা বলবার পর যেখানে আরিস্টটল কাহিনি এবং চরিত্র সম্পর্কে বিস্তৃততর বিশ্লেষণ করেছেন সেখানেও বিভিন্ন উক্তিতে কাহিনি এবং চরিত্রের মধ্যে গুরুত্ব বিচারের ব্যাপারটি চলে এসেছে।

ট্র্যাজেডির যে সংজ্ঞা আরিস্টটল দিয়েছেন সেখানেই দেখা যায় যে, তিনি স্পষ্ট বলেছেন—ট্র্যাজেডি-হল একটি ক্রিয়ার অনুকরণ। আরিস্টটল ট্র্যাজেডিকে চরিত্রের অনুকরণ বলেননি। নাটককার একটি সম্পূর্ণ ঘটনাকে তার ঘাত-প্রতিঘাত, দ্বন্দ্ব, বিপ্রতীপতা এবং পরিণাম সহ জীবদেহের মতো ঐক্য সমন্বিত রূপেই তুলে ধরেন। কোনো চরিত্রকে ফুটিয়ে তোলবার প্রধান উদ্দেশ্য নিয়ে ট্র্যাজেডি রচিত হয় না। তাই তিনি স্পষ্টই বলেছেন 'ঘটনার

সজ্জা' অর্থাৎ কাহিনি বা প্লটই হল সর্বাধিক গুরুত্বপূর্ণ। তাঁর উক্তি—"ট্র্যাজেডি মানুষের অনুকরণ নয়, ট্র্যাজেডি একটি ক্রিয়ার অনুকরণ, জীবনের সুখ দুঃখের অনুকরণ— আর এই সবকিছুই ক্রিয়ার অন্তর্গত"........................।

অবশ্যই আরিস্টটল-এর উক্তিটিকে আক্ষরিক অর্থে গ্রহণ করা চলবে না। কারণ চরিত্র এবং ঘটনা সর্বদাই অঙ্গাঙ্গী সম্পর্কযুক্ত। যেমন দীপশিখা এবং আলো। আরিস্টটল-এর উক্তিকে অবশ্যই গ্রহণ করতে হবে গুরুত্বের আপেক্ষিক বিচারে। যে-ক্রিয়াকে বাদ দিয়ে ট্র্যাজেডি সম্ভব নয় বলেছেন আরিস্টটল— সেই ক্রিয়া সংঘটিত হয় চরিত্রের দ্বারাই। চরিত্র না থাকলে ক্রিয়া হবে না। কিন্তু যদি চরিত্র উপস্থিত থাকে অথচ পারস্পরিক ঐক্য সমন্বিত ঘটনা-সমবায় না থাকে তা হলে ট্র্যাজেডি নির্মিত হবে না। চরিত্রগুলি ক্রিয়া-সমবায় গড়ে তুললে তবেই হবে নাটক। কাজেই চরিত্র এবং ক্রিয়া-সমবায় সব কিছু নিয়ে ট্রাজেডি গঠিত হলেও আপেক্ষিক বিচারে ক্রিয়া বা কাহিনিই যে সর্বাধিক গুরুত্বপূর্ণ তাতে কোনো সংশয় নেই। এই অর্থেই আরিস্টটল উদ্ধৃত বাক্যটি বলেছিলেন।

আরিস্টটল আরও যুক্তি দেখিয়ে বলেছেন যে, ট্র্যাজেডির সর্বাধিক শক্তিশালী এবং আকর্ষক দুটি উপাদান বিপ্রতীপতা এবং উদ্‌ঘাটন কাহিনিরই অঙ্গ। প্লট-এর বিন্যাসেই এই দুইয়ের অবস্থান। কাজেই প্লট-ই যে ট্রাজেডির ক্ষেত্রে সর্বপ্রথম বিবেচ্য তাতে সন্দেহ নেই। আরিস্টটল জোর দিয়ে বলেছেন— *"কাজেই, কাহিনীই ট্র্যাজেডিতে প্রধান, কাহিনীই ট্র্যাজেডির আত্মা, চরিত্রের স্থান তার পরে।" [ষষ্ঠ পরিচ্ছেদ]*

আরিস্টটল একটি চমৎকার সমান্তরাল দৃষ্টান্ত দিয়েছেন। তিনি চিত্রকলার প্রসঙ্গ এনে বলেছেন—*যদি ছবিটিতে সামঞ্জস্য না থাকে তা হলে সুন্দর রং ব্যবহার করলেও ছবি সুন্দর হবে না। সাধারণ সাদা-কালো রঙে আঁকা ছবিও অনেক বেশি তৃপ্তিকর— যদি তা সামঞ্জস্যপূর্ণ ভাবে আঁকা হয়।*

আরিস্টটল আরও বলেছেন যে, অনেক নাটকে একটি দুটি সুন্দর চরিত্র থাকলেও প্লট-এর বাঁধুনির অভাবে ট্র্যাজেডি ব্যর্থ হয়েছে— এমন দেখা যায়। আবার তেমন কোনো দৃষ্টি-আকর্ষণকারী চরিত্র নেই, তা সত্ত্বেও ঘটনার বিন্যাস সুশৃঙ্খল এবং উদঘাটন ও বিপ্রতীপতার যোগে যথার্থ দ্বন্দ্ব ও উৎকণ্ঠা সৃষ্টিতে সমর্থ— এমন সফল নাটক অনেক আছে।

আরিস্টটল-এর এই যুক্তিগুলি আমাদের মানতেই হয়। যে-কোনো কমেডি নাটকে আমরা দেখি চরিত্রের মহত্ত্ব বা বিশালতা কোনো দিক থেকেই উল্লেখযোগ্য নয়। সমগ্র নাটকটি দাঁড়ায় ঘটনা বিন্যাসের কৌশলে। শেকসপিয়র-এর *রোমিয়ো জুলিয়েট* ট্রাজেডিতে চরিত্রগুলি সাধারণ মাপের। কিন্তু ট্র্যাজেডি হিসেবে এটি সার্থক সৃষ্টি হয়ে উঠেছে প্লট রচনার নৈপুণ্যে। উজ্জ্বল চরিত্র থাকলেও ট্র্যাজেডি হিসেবে ব্যর্থ হয়েছে একটি নাটক— এমন দৃষ্টান্ত বাংলায় অনেক আছে। যেমন গিরিশচন্দ্র ঘোষের *প্রফুল্ল*, কিংবা দীনবন্ধু মিত্রের *নীল-দর্পণ*। পাশ্চাত্য সাহিত্যেও অপ্রধান ট্র্যাজেডিগুলিতে এমন উদাহরণ পাওয়া যায়। আরিস্টটল যথার্থই বলেছেন— *"একজন হয়তো রীতি ও অভিপ্রায়ের দিক থেকে অপূর্ব নৈপুণ্যের সঙ্গে বক্তৃতার মালা গেঁথে চরিত্র ফুটিয়ে তুলেও সত্যিকারের ট্র্যাজেডির প্রতিবেদন সৃষ্টিতে ব্যর্থ হতে পারেন। কিন্তু একজন হয়তো এইসব ব্যাপারে অনেক দুর্বল হয়েও, শুধু কাহিনীর জোরেই ট্র্যাজেডি রচনায় অনেক বেশি সফল হতে পারেন।" [ষষ্ঠ পরিচ্ছেদ]*

কাহিনি এবং চরিত্রের মধ্যে কোনটির গুরুত্ব বেশি তা নিয়ে বিতর্ক নিষ্প্রয়োজন। আমাদের মনে হয়, কাহিনি ও চরিত্র— এই দুটি অঙ্গ এমনভাবে অবিচ্ছিন্ন যে একটিকে বাদ দিয়ে আর

একটির অস্তিত্বই সম্ভব নয়। কাজেই দুটি-ই প্রায় সমগুরুত্ব সম্পন্ন। তবে আরিস্টটল যে কাহিনিকে অধিকতর গুরুত্বপূর্ণ মনে করতেন তাতে সংশয় নেই। তাঁর এই যুক্তিটিও আমরা অস্বীকার করতে পারি না যে, একটি-দুটি আকর্ষক চরিত্র থাকলেও ঘটনাবিন্যাস দুর্বল হলে ট্র্যাজেডি সার্থক হবে না। সে দিক থেকে প্লটকেই ট্র্যাজেডির প্রধান উপাদান হিসেবে গণ্য করতে হবে।

অভিপ্রায় বা চিন্তন

'ট্র্যাজেডি ষড়ঙ্গ শিল্প'— একথা বলবার সময় ছয়টি উপাদানের তৃতীয় স্থানে আরিস্টটল যে শব্দটি ব্যবহার করেছেন তার বাংলা অর্থ হিসেবে শিশিরকুমার দাশ লিখেছেন—"শব্দটির নানা অর্থ, 'চিন্তা, উদ্দেশ্য, বুদ্ধি, তাৎপর্য, অভিপ্রায়'।" (*কাব্যতত্ত্ব*, অনুবাদ, পূর্বোক্ত সংস্করণ ১৯৮৬, পৃ ১৭]

বাঙালি নাট্যতত্ত্ববিদরা এই গ্রিক 'দিয়ানোইয়া' শব্দটির পরিভাষা হিসেবে অভিপ্রায় এবং চিন্তন— এই দুটি শব্দই ব্যবহার করেন। ইংরেজিতে থট (Thought) শব্দটি ব্যবহৃত হয়। আমরা 'অভিপ্রায়' শব্দটি শিশিরকুমার দাশের অনুসরণে ব্যবহার করছি।

ষষ্ঠ পরিচ্ছেদের শুরুতে ট্র্যাজেডির সংজ্ঞা প্রদান করবার পরেই দ্বিতীয় অনুচ্ছেদে আরিস্টটল লিখেছেন—"ট্র্যাজেডিতে ক্রিয়া অভিনীত হয়, আর অভিনেতাদের চরিত্র এবং অভিপ্রায়ের বিশিষ্টতা অবশ্যই থাকা প্রয়োজন, কারণ তার দ্বারাই একটি ক্রিয়ার গুণ নির্ণীত হয়। কাজেই চরিত্র এবং অভিপ্রায় হল ক্রিয়ার দুটি স্বাভাবিক কারণ, তার ওপরেই নির্ভর করে মানুষের সাফল্য কিংবা ব্যর্থতা।.........................তারা (চরিত্ররা) কোন কিছু প্রমাণ করার জন্য যা কিছু বলে, বা কোন বিষয়ে যে মতামত দেয়, সেই ব্যাপারটি হল অভিপ্রায়।" (ষষ্ঠ পরিচ্ছেদ) সহজেই বোঝা যায় যে, একটি ট্র্যাজেডিতে যে উপলব্ধি প্রকাশিত হয়েছে, প্লট-এর বিন্যাস, চরিত্রের পরিকল্পনা এবং সংলাপের মধ্য দিয়ে নাটককারের যে ভাবনা প্রকাশিত হয়েছে তাকেই আরিস্টটল অভিপ্রায় বলেছেন।

ষষ্ঠ পরিচ্ছেদ কাহিনি এবং চরিত্র সম্পর্কে বলবার পরে আরিস্টটল লিখেছেন— "অভিপ্রায়ের স্থান তারপর। অভিপ্রায় হল সম্ভাব্য এবং উপযুক্ত ভাব প্রকাশের সামর্থ্য। ট্র্যাজেডির সংলাপে এর প্রকাশ : এটি মূলত রাষ্ট্রতত্ত্ব ও ভাষণ কলাশাস্ত্রের অন্তগর্ত।"

সহজ কথায় বলা যায় ট্র্যাজেডির বক্তব্য বিষয়টিই হল অভিপ্রায়। যে হেতু নাটককারের নিজের বিবৃতি ও ব্যাখ্যা দানের অবকাশ নেই, সেজন্য চরিত্রের সংলাপের মধ্যে দিয়েই তা প্রকাশ করতে হয়। সুচিন্তিত বাগ্-বিন্যাসের দ্বারাই অভিপ্রায় যথাযথভাবে ব্যক্ত হতে পারে বলে আরিস্টটল এই উপাদানটিকে ভাষণ-কলাশাস্ত্রের অন্তর্গত বলেছেন। অভিপ্রায় রাষ্ট্রতত্ত্ব সম্পর্কিত হবে— এই সিদ্ধান্ত কিন্তু আবশ্যিক নয়। প্রাচীন গ্রিস-এ নাগরিকদের রাষ্ট্রীয় আনুগত্যকে সর্বাধিক গুরুত্বপূর্ণ মনে করা হত বলে সাহিত্য-আলোচকরা শিল্পের অভিপ্রায়ের মধ্যে রাষ্ট্রতত্ত্ব-বিষয়ক ভাবনাকেই প্রধান রূপে প্রত্যাশা করতেন। কিন্তু বস্তুত একটি ট্র্যাজেডিতে জীবনের যে-কোনো গভীর উপলব্ধিই হতে পারে অভিপ্রায়। আরিস্টটল লিখেছেন— "যেখানে কিছু প্রতিপন্ন বা অপ্রমাণিত করা হচ্ছে কিংবা কোনো বিষয়ে সাধারণ অভিমত প্রকাশ করা হচ্ছে সেখানেই অভিপ্রায়ের উপস্থিতি।"

কাব্যতত্ত্ব গ্রন্থের উনবিংশ পরিচ্ছেদে আবার আরিস্টটল ট্র্যাজেডির রীতি এবং অভিপ্রায় সম্পর্কে কয়েকটি কথা বলেছেন। পূর্ববর্তী পরিচ্ছেদের বক্তব্যের সঙ্গে উনবিংশ পরিচ্ছেদের বক্তব্যের পার্থক্য নেই। অভিপ্রায় বলতে কী বোঝায় তাকেই আরও একটু স্পষ্ট

আরিস্টটল বলেছেন—"ভাষার দ্বারা সৃষ্ট ও উৎপন্ন সমস্ত প্রতিবেদনই অভিপ্রায়ের অন্তর্গত— এর কিছু হল প্রমাণ, (যুক্তি-ও) যুক্তি খণ্ডন, করুণা-ভয়-ক্রোধ ইত্যাদি অনুভূতির জাগরণ, বক্তব্যের অতিরঞ্জন বা লঘুকরণ।"— মোটের উপর স্পষ্টভাবেই বোঝা যায় যে ট্র্যাজেডির বক্তব্য বিষয় এবং বিষয়গত জীবন-উপলব্ধিকেই অভিপ্রায় বলে নির্দেশ করেছেন আরিস্টটল।

আগে ষষ্ঠ পরিচ্ছেদে আমরা দেখেছি অভিপ্রায়কে তিনি ভাষণ-কলাশাস্ত্রের অন্তগর্ত বলে উল্লেখ করেছেন। প্রকৃতপক্ষে অভিপ্রায় ভাষণ-কলাশাস্ত্রের অন্তগর্ত নয়, কিন্তু অভিপ্রায়কে যে ভাবে ব্যক্ত করতে হবে সেখানে ভাষণ-কলাশাস্ত্রের আশ্রয় নেওয়া ছাড়া নাটককারের কোনো উপায় নেই। প্রাচীন গ্রিস-এ এবং রোম-এ ভাষণ-কলা ছিল অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ এবং শিক্ষণীয় একটি বিষয়। রাষ্ট্র-পরিচালকেরা সুচিন্তিত এবং নিপুণ ভাষণের সাহায্যেই তাঁদের উদ্দেশ্য সিদ্ধ করতেন। উনবিংশ পরিচ্ছেদে আরিস্টটল আবার বলেছেন অভিপ্রায়কে ভাষণ-কলা বিষয়ক গ্রন্থের অন্তর্ভুক্ত করা সংগত। কারণ—" একথা স্পষ্ট যে নাটকের ক্রিয়াতে যখন করুণা বা ভয় বা অতিরঞ্জনের ভাব সৃষ্টি করতে হবে, তখন (ভাষণ-কলাশাস্ত্রের) নিয়মানুসারেই তা সম্পন্ন করতে হবে। পার্থক্য শুধু এই যে, অভিনয় ব্যবস্থা ছাড়াই অভিপ্রায় স্পষ্ট হয়, আর ভাষণের সময় বক্তাকে ভাষার সাহায্যে সেই স্পষ্টতা অর্জন করতে হয়।" (উনবিংশ পরিচ্ছেদ) এই উক্তিতে আরিস্টটলকে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ একটি কথা বলতে শুনি। তিনি বলেছেন অভিনয়-ব্যবস্থা ছাড়াই অভিপ্রায় স্পষ্ট হয়, অর্থাৎ অভিনীত না হলেও নাটক পাঠেও অভিপ্রায় ব্যক্ত হতে পারে। কিন্তু ভাষার নৈপুণ্য বা সামর্থ্য থাকা দরকার যাতে অভিপ্রায় যথার্থ ভাবে ব্যক্ত হয়।

বিশ্বের সমস্ত সার্থক ট্র্যাজেডি থেকেই আমরা আরিস্টটল-এর এই বক্তব্যের দৃষ্টান্ত পেতে পারি। *রাজা ইডিপাস*-এ ট্র্যাজেডির শেষে কোরাস-এর যে শেষ সংলাপ তাতে স্পষ্টভাবে নাটকের অভিপ্রায় ব্যক্ত হয়েছে। আবার শেকসপিয়র-এর *ম্যাকবেথ* নাটকে উচ্চাকাঙ্ক্ষা এবং তার দ্বারা চালিত হয়ে মানুষ যদি মৌল নীতিবোধকে বিসর্জন দেয় তা হলে কী পরিণাম হতে পারে এই বক্তব্য স্পষ্টভাবে উঠে এসেছে। দুর্বল সংলাপ হলে ট্র্যাজেডির অভিপ্রায় যথাযথভাবে পাঠকের এবং দর্শকের চিত্তকে স্পর্শ করতে পারে না তার দৃষ্টান্ত আমরা বাংলায় গিরিশচন্দ্র ঘোষের *প্রফুল্ল* এবং দীনবন্ধু মিত্রের *নীল-দর্পণ* নাটকে দেখেছি। ভাষণ-কলার উপর দক্ষতা থাকলে অত্যন্ত শান্ত সুরে কথিত সংলাপের সাহায্যেও ট্র্যাজেডির অভিপ্রায় কীভাবে ঘনীভূত হতে পারে তার দৃষ্টান্ত রবীন্দ্রনাথের *ডাকঘর*।

বাচন বা রচনারীতি

'ট্র্যাজেডির চতুর্থ উপাদান হল রীতি বা ভাষা। রীতি বলতে, আগেই বলেছি, বোঝাচ্ছে শব্দের মাধ্যমে অর্থ প্রকাশ।" [ষষ্ঠ পরিচ্ছেদ]

আগে, এই পরিচ্ছেদেরই গোড়ার দিকে আরিস্টটল বলেছেন—"রচনারীতি বলতে বোঝাচ্ছি মিত ছন্দে শব্দসজ্জা।" রচনারীতি প্রসঙ্গে বিশেষ বাক্যব্যয় করেননি অ্যারিস্টটল। বলা বাহুল্য, রচনারীতি বা ভাষাকে গুরুত্বের বিচারে চতুর্থ স্থানে রাখলেও ভাষা হল ট্র্যাজেডির মাধ্যম। ভাষার ব্যবহার ছাড়া এই শিল্প সংরূপের সৃষ্টিই সম্ভব নয়। প্রসঙ্গত উল্লেখ্য *কাব্যতত্ত্ব* গ্রন্থের বিংশ এবং একবিংশ পরিচ্ছেদে আরিস্টটল ভাষার ব্যাকরণ নিয়ে আলোচনা করেছেন। বিংশ পরিচ্ছেদে আলোচিত ভাষা স্বাভাবিকভাবেই গ্রিক ভাষা। কাজেই সেই ব্যাকরণ আলোচনা

আমাদের তেমন কোনো কাজে আসবে না। একবিংশ পরিচ্ছেদেও ভাষার ব্যাকরণ সম্পর্কে কিছু কিছু কথা বলেছেন আরিস্টটল। যেমন—(ক) বিশেষ্য দু-রকমের সরল এবং যুক্ত।

(খ) বিশেষ্যগুলি হতে পারে পরিচিত শব্দ, অপরিচিত শব্দ, রূপক, অলংকৃত, সৃষ্ট দীর্ঘীকৃত, সংক্ষেপিত অথবা পরিবর্তিত।

(গ) রূপক প্রসঙ্গে আরিস্টটল নানা ধরনের সাদৃশ্যবাচক উপমার কথা বলেছেন।

এই পরিচ্ছেদে এটুকুই বোঝা যায় যে, গ্রিক ভাষার প্রকৃতি অনুযায়ী আরিস্টটল একথাই বলতে চেয়েছেন যে ভাষাকে যত্নের সঙ্গে ব্যবহার করতে হবে।

ভাষা সম্পর্কে কিছু গুরুত্বপূর্ণ কথা আরিস্টটল বলেছেন দ্বাবিংশ পরিচ্ছেদে। সর্বত্র খুব ভালোভাবে বিশ্লেষণ করা হয়নি, কিন্তু ট্র্যাজেডির উপযুক্ত বাচন বা রচনারীতি বলতে আরিস্টটল কী বলতে চেয়েছেন—তা এই পরিচ্ছেদে কিছুটা বোঝা যায়।

দ্বাবিংশ পরিচ্ছেদে প্রথমেই বক্তব্যটি উপস্থাপিত করেছেন তিনি।—"রচনার (প্রথম) গুণই হল স্পষ্টতা, কিন্তু বিশিষ্টতাহীনতা নয়। স্পষ্ট রীতি গড়ে ওঠে পরিচিত শব্দের ব্যবহারে আর পরিচিত শব্দ মানেই বিশিষ্টতাহীন শব্দ।

......................নিতান্তই প্রাত্যহিক শব্দ যেগুলি নয়, যেগুলি কিছুটা অ-পরিচিত, সেই শব্দগুলি রচনায় আনে আভিজাত্য। অ-পরিচিত শব্দ বলতে বোঝচ্ছি স্বল্প ব্যবহৃত শব্দ, রূপক, দীর্ঘীকৃত শব্দ ও পরিচিত শব্দের অতিরিক্ত শব্দ। কিন্তু কোন কবি যদি শুধু এই ধরনের শব্দই ব্যবহার করেন তার ফল হবে প্রহেলিকা কিংবা শব্দের আড়ম্বর।" [দ্বাবিংশ পরিচ্ছেদ]

আরিস্টটল যা বলতে চেয়েছেন তা হল ট্র্যাজেডির ভাষা সাধারণভাবে প্রাঞ্জল এবং স্পষ্ট হবে। কিন্তু তা একান্ত সরল, সাধারণ বাক্যালাপের মতো হবে না। সাহিত্যের পাঠক মাত্রেই বিষয়টি অনুভব করতে পারবেন। প্রাঞ্জলতা থাকলেও সুচিন্তিত, শিল্প-গুণান্বিত এবং বৈশিষ্ট্যপূর্ণ শৈলী অর্থাৎ লেখকের স্টাইল থাকতে হবে সাহিত্যের ভাষায়। কেবল অপ্রচলিত শব্দ থাকলে অকারণ বাগাড়ম্বরের সৃষ্টি হবে; কেবলই প্রচলিত শব্দ থাকলে তা সাধারণত্বের ঊর্ধ্বে উঠতে পারবে না। রচনারীতিতে সেজন্য একটি সমন্বয় বাঞ্ছনীয় মনে করেছেন আরিস্টটল।

প্রসঙ্গত তিনি রচনারীতিতে রূপকের ব্যবহারের দিকে দৃষ্টি আকর্ষণ করেছেন। উপমা, রূপক এবং চিত্রকল্প সাহিত্যের ভাষার অন্যতম শক্তি রূপে একান্ত আধুনিক কাল পর্যন্তও অত্যন্ত তাৎপর্যপূর্ণ বলে বিবেচিত হয়। এই সচেতনতা বিশ্বের প্রাচীনতম এই শিল্পতত্ত্বের গ্রন্থটিতে আরিস্টটল-এর লেখায় দেখে আমরা বিস্মিত হই।—"রূপকের ব্যবহার হল সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ। রূপক ব্যবহারে লাগে সহজাত প্রতিভা কেউ কারো কাছে তা শিখতে পারে না। যথার্থ রূপক ব্যবহারের জন্য চাই সাদৃশ্য আবিষ্কারের চোখ।" [দ্বাবিংশ পরিচ্ছেদ]

অতএব রচনারীতি সম্পর্কে আরিস্টটল যে খুবই সচেতন ছিলেন এবং সঠিকভাবেই নির্দেশ করেছিলেন যে ট্র্যাজেডির বাগ্‌ভঙ্গিতে থাকবে ভাষার সমন্বয়, তা বোঝা যায় তাঁর অন্য একটি উক্তিতে "কাজেই চাই একটি মিশ্রিত রচনারীতি। একদিকে অচলিত, রূপক, অলঙ্কৃত শব্দ ইত্যাদির ব্যবহারের ফলে রচনা প্রাত্যহিকতা এবং সাধারণত্বের ঊর্ধ্বে উঠতে পারবে, অন্যদিকে, প্রচলিত শব্দাবলী দিতে পারবে স্পষ্টতা।" [দ্বাবিংশ পরিচ্ছেদ]

দৃশ্য

ট্র্যাজেডি যেহেতু অভিনয়যোগ্য শিল্প তাই তার একটি আবশ্যিক উপাদান 'দৃশ্য-সজ্জা'। দৃশ্য-সজ্জাকে আবশ্যিক উপাদান বলে ষষ্ঠ পরিচ্ছেদে আরিস্টটল উল্লেখ করেছেন। এখানে

অবশ্য আমাদের একটি প্রশ্ন থাকে। আমরা আগে দেখেছি, ট্র্যাজেডি যদি অভিনীত না-ও হয় তাহলেও পঠন অথবা শ্রুতির মাধ্যমেও ট্র্যাজিক অনুভূতির সৃষ্টি সম্ভব বলে উল্লেখ করেছেন আরিস্টটল ওই ষষ্ঠ পরিচ্ছেদেই। তা হলে দৃশ্য কীভাবে ট্র্যাজেডির আবশ্যিক উপাদান হতে পারে? মনে হয়, আরিস্টটল এখানে সাধারণভাবে অভিনীত নাটকের কথাই বলেছেন। ট্র্যাজেডি যখন অভিনীত হত তখন তা প্রত্যক্ষভাবে দর্শকদের চোখের সামনে মূর্ত হত। চরিত্রগুলির আঙ্গিক অভিনয়ের সেই প্রত্যক্ষতা অবশ্যই দৃশ্য। তা ছাড়াও গ্রিক নাটকের যে পোশাক, জুতো এবং মুখোশ ব্যবহৃত হত তা-ও দৃশ্যের অন্তর্গত। আরিস্টটল ষষ্ঠ পরিচ্ছেদের শেষ অংশে লিখেছেন—"দৃশ্য যদিও খুব আকর্ষণীয়, অন্যান্য উপাদানের তুলনায় সবচেয়ে কম শিল্পগুণান্বিত আর কাব্যশিল্পের সঙ্গে এর যোগ যৎসামান্য। অভিনয় ও প্রযোজনা বাদ দিয়েও ট্র্যাজিক অনুভূতির (প্রতিবেদনের) সৃষ্টি খুবই সম্ভব, তাছাড়া দৃশ্যসজ্জার ব্যাপারটা কবির নয়, অলঙ্করণকারীর।"

আরিস্টটল যখন এই *কাব্যতত্ত্ব* রচনা করেছেন তখন যেহেতু অভিনয়ের জন্য কোনো প্রেক্ষাগার ছিল না এবং তিন দিক বা দু দিকে দেওয়াল আছে এমন কোনো মঞ্চও ছিল না তাই পশ্চাৎপট এবং মঞ্চসজ্জায় কোনো জিনিসপত্র ব্যবহার করবারও সুযোগ ছিল না। যবনিকাও ছিল না, ফলে মঞ্চসজ্জার পরিবর্তনও ছিল অসম্ভব। বলা বাহুল্য, আরিস্টটল দৃশ্য-সজ্জার প্রতি যে গুরুত্ব আরোপ করেছেন, পরবর্তী কালে যখন প্রেক্ষাগার এবং স্থায়ী মঞ্চ নির্মিত হয়েছে তখন তার গুরুত্ব অনেক বেড়ে গেছে। যখন প্রতীকী নাটক, সাংকেতিক নাটকের প্রচলন হয়েছে তখন তৈরি হয়েছে মঞ্চে আলোক-সম্পাত এবং দৃশ্য-সজ্জারও স্বতন্ত্র ভাষা। রবীন্দ্রনাথের *রক্তকরবী* নাটক বিশেষ ধরনের দৃশ্য-সজ্জা ছাড়া ফুটিয়ে তোলা খুবই কঠিন। কিন্তু এ-জাতীয় নাটকের কোনো কল্পনা আরিস্টটল-এর ভাবনায় ছিল না। তিনি দৃশ্য সম্পর্কে যে কথাগুলি বলেছেন তা প্রাচীন গ্রিক ট্র্যাজেডির ক্ষেত্রে প্রযোজ্য।

সংগীত

আরিস্টটল সংগীত-এর সমার্থক যে-শব্দটি ব্যবহার করেছেন তার ইংরেজি অনুবাদ রূপে পাশ্চাত্য গবেষকেরা 'মেলডি' বা 'হারমনি' শব্দটি ব্যবহার করেছেন। সংগীত বলতে রেনেসাঁস-পর্বের নাটকে যেভাবে গান ব্যবহৃত হত তার কথা বলা হয়নি। কারণ সে-জাতীয় গান গ্রিক ট্র্যাজেডির রচনারীতির মধ্যে সংযুক্ত হত না। তা সত্ত্বেও ট্র্যাজেডির আবশ্যিক ছয়টি অঙ্গের অন্যতম বলে সংগীত-এর উল্লেখ আরিস্টটল করেছেন তার কারণ গ্রিক ট্র্যাজেডিতে কোরাস ছিল আবশ্যিক। কোরাস-এ যদিও টুকরো সংলাপ মাঝে মাঝে থাকত, তবু কোরাস-এর মূল ভূমিকা ছিল সম্মিলিত গায়ক দলের গান। এই গায়কেরা নাটকের কোনো কোনো জায়গায়, প্রায়শই শেষের দিকে সম্মেলক স্বরে, সুরের বিস্তার সহযোগে নাটকের সারমর্ম দর্শক-শ্রোতার সামনে উপস্থিত করতেন।

এছাড়াও সংগীত বলতে আরিস্টটল আবহ-ধ্বনি বুঝিয়ে থাকতে পারেন। যেমন— ঢাক, তূর্য, বাঁশি ইত্যাদি। আরিস্টটল লিখেছেন—'ট্র্যাজেডির সবচেয়ে প্রীতিকর উপাদান হল সংগীত।" (ষষ্ঠ পরিচ্ছেদ) কোরাস-এর সম্মেলক সংগীত অবশ্য কেবলই প্রীতিকর ছিল না, ছিল আবশ্যিক।

ট্র্যাজেডির ছয়টি অঙ্গ সম্পর্কে আরিস্টটল যা বলেছেন তার আলোচনা এখানেই শেষ হল।

কাব্যতত্ত্ব বিষয়ে আরিস্টট্‌ল-উত্থাপিত অন্যান্য প্রসঙ্গ : কোরাস

'কোরাস' শব্দের অর্থ সমবেত স্বর। গ্রিক নাটকে কোরাস অনেকটা বিশিষ্ট পারিভাষিক অর্থ পেয়েছে। বিশেষ কারণে এবং বিশেষ ধরনে গ্রিক নাটকে কোরাস ব্যবহৃত হত। বস্তুত কোরাস থেকেই নাটকের উদ্ভব। ধর্মীয় উৎসবে নৃত্যগীতবহুল সমবেত শোভাযাত্রায় গায়ক ও নর্তকের দলকেই বলা হত কোরাস। ক্রমে এই কোরাস-দল থেকে স্বতন্ত্র হয়ে একজন ব্যক্তি অঙ্গ-ভঙ্গি সহকারে কোনো একটি কাহিনি বিবৃত করতেন। ক্রমে বিবৃতিকারের সংখ্যা বাড়ল এবং সংলাপের সৃষ্টি হল। আবার ছাগল, বিশেষত কাল্পনিক প্রাণী সাতুর-এর মুখোশ ও রূপসজ্জাও ব্যবহৃত হত। পরে যখন পূর্ণাঙ্গ গ্রিক নাটক রচিত হল তখনও কোরাস-এর ভূমিকা থেকে গেল গায়কদের সম্মেলক গান রূপে। গ্রিক ট্র্যাজেডিতে কোরাস-এর পরিধানে থাকত লম্বা, ঢোলা পোশাক, উঁচু কাঠের জুতো এবং মুখোশ। আরিস্টটল কোরাস সম্পর্কে লিখেছেন— কোরাসকে একজন অভিনেতা হিসেবে গণ্য করতে হবে। কোরাস হবে সমগ্র নাটকের একটি উপাদান, নাটকের ক্রিয়াতে অংশ গ্রহণ করবে—ইউরিপিডিস-এর নাটকের মতো নয়, সোফোক্লিস-এর নাটকের মতো। [অষ্টাদশ পরিচ্ছেদ]

আরিস্টটল যদিও কোরাস সম্পর্কে আর বিশেষ কিছু বলেননি। কেবল এটুকুই বলেছেন যে, কোরাস একটি সম্পূর্ণ নাট্যচরিত্র। সেই চরিত্রের অবস্থান ও গুরুত্ব কী তা আমাদের একটু বিস্তৃতভাবে বুঝে নিতে হবে কারণ আরিস্টটল যে গ্রিক নাটকগুলি অবলম্বনে তাঁর নাট্যতত্ত্ব রচনা করেছেন সেই নাটকগুলিতে কোরাস-এর ভূমিকা গভীরভাবে তাৎপর্যপূর্ণ। নাটক এক মঞ্চশিল্প। শিল্পী তথা অভিনেতারা এবং দর্শকেরা এখানে শারীরিকভাবেই সমস্থান ও সমকালবর্তী। একদিকে এই সামীপ্য, অপর দিকে কোথাও নেই নাটককারের উপস্থিতি। গানে, ভাষণে, কাব্যপাঠে, কোরাস-এর আদি নৃত্যগীতে সর্বদাই শ্রোতা ও দর্শকের সরাসরি সংযোগ স্থাপিত হয় শিল্পীদের সঙ্গে। প্রয়োগশিল্পীরাই সেখানে প্রত্যক্ষ, এবং প্রয়োগ-শিল্পীরাই শিল্পস্রষ্টাও। নাটককার তাঁর অভিপ্রায় নিয়ে আছেন অন্তরালে। মঞ্চে একটি কাহিনিকে রূপদান করছেন অভিনেতৃবর্গ। সেই কল্পিত চরিত্রগুলির সঙ্গে, নাট্যকাহিনির সঙ্গে দর্শকের মনের সংযোগ ঘটিয়ে দেন কোরাস-এর অভিনেতারা। চরিত্রগুলি বলে আখ্যানটির নির্দিষ্ট সংলাপ। সেই চরিত্রগুলির ব্যাখ্যা দেয় কোরাস। বলে চরিত্রগুলির ও সমকালীন সমাজের নীতি-আদর্শ-সমস্যা-সংঘাতের কথা। এই দিক থেকে সে যেন নাট্যদৃশ্যের দর্শকদেরই একজন। কোরাস-এর এমনই এক দ্বিমুখী অবস্থান আছে। সে নাট্যকাহিনির অন্তর্ভুক্ত, আবার নাট্যকাহিনি থেকে একটু দূরত্বও বজায় রেখে চলে। সে নাট্যচরিত্রদের মধ্যে আছে, আবার একটু দূরে দাঁড়ানো দর্শকের ভূমিকাতেও আছে। কোরাস অনেক সময়ে নাটকের প্রোলোগ আর এপিলোগ ঘোষণা করে; প্রতিটি অঙ্কের সূচনায় নাটকের ধারাবাহিকতা ব্যাখ্যা করে দেয়। কোরাস-এর কণ্ঠে কখনও শ্রুত হয় নাটককারের স্বর, কখনও সমাজের স্বর। কখনও কোরাস যেন ব্যক্ত করে দর্শকদেরই দ্বিধা-দ্বন্দ্ব-জিজ্ঞাসাকে।

আরিস্টটল কোরাস সম্পর্কে বলতে গিয়ে একটি উক্তি করেছেন—'ইউরিপিদেস-এর নাটকের মতো নয়, সোফোক্লিস-এর নাটকের মতো।" বোঝা যায় যে, সোফোক্লিস যেভাবে কোরাসের ব্যবহার করেছেন তাই আরিস্টটল-এর মনঃপুত ছিল। সোফোক্লিস-এর ট্র্যাজেডিতে নগরীর প্রধানেরা, নাগরিকদের প্রতিনিধিরা কোরাস দলের অন্তর্ভুক্ত হতেন। তাঁরা রাজ্যের সম্ভ্রান্ত শ্রেণির অন্তর্ভুক্ত এবং পুরুষ। কিন্তু ইউরিপিডিস-এর নাটকে প্রায়শই দেখা যায় কোরাস

গঠিত হয়েছে নারীদের দ্বারা। ট্রয়-এর নারীরা তাঁর একটি নাটকের কোরাস হিসেবে ব্যবহৃত। তাঁর বিখ্যাত *মেদেয়া* নাটকেও করিন্থ-এর মেয়েরা কোরাস-এর ভূমিকা পালন করেছে। আরিস্টটল সম্ভবত নারীর কোরাস-ভূমিকা পছন্দ করেননি।

ইউরিপিডিস-এর নাটকে কোরাস-এর সংগীতে সুরেরও বৈচিত্র্য ছিল বলে মনে হয়। কারণ কোনো কোনো আলোচনায় বলা হয়েছে ইউরিপিডিস-এর পর থেকে কোরাস প্রধানত সাংগীতিক ভূমিকাই গ্রহণ করেছে।

কিন্তু ইউরিপিডিস-এর নাটকে নারীদের কোরাস-এর গাম্ভীর্যও কিছু কম নয়। ইসকাইলাস তাঁর *বন্দী প্রমিথিউস* নাটকে সমুদ্রকন্যাদের কোরাস রূপে কল্পনা করেছেন। সোফোক্লিস-এর *রাজা ইডিপাস* নাটকে কোরাস-এর সম্মেলক গানের অতল গাম্ভীর্য এবং নাটকের সারমর্ম উদ্‌ঘাটনকারী শেষ সংগীত আরিস্টটল-এর বিবেচনায় সর্বোত্তম কোরাস-এর উদাহরণ ছিল।

ক্যাথারসিস বা ভাবমোক্ষণ

আরিস্টটল ট্র্যাজেডির যে সংজ্ঞা দিয়েছেন তারই অন্তর্গত একটি বাক্য হল—"এই ক্রিয়া ভীতি ও করুণার উদ্রেক করে এবং তার মধ্যে দিয়ে অনুরূপ অনুভূতিগুলির পরিশুদ্ধি ঘটায়।"

(ষষ্ঠ পরিচ্ছেদ)

এখানে পরিশুদ্ধি শব্দটিতে অনুবাদক শিশিরকুমার দাশ যা বোঝাতে চেয়েছেন তারই গ্রিক প্রতিশব্দটি হল ক্যাথারসিস (Katharsis)। ওই পরিচ্ছেদেই টীকা অংশে ক্যাথারসিস শব্দটি ব্যাখ্যা করতে গিয়ে শিশিরকুমার দাশ ব্যবহার করেছেন তিনটি শব্দ—মোক্ষণ, পবিত্রীকরণ, পরিশুদ্ধি। এরপরে ক্যাথারসিস শব্দটি আর একবার ব্যবহৃত হয়েছে সপ্তদশ পরিচ্ছেদে। সেখানে বাক্যটি হল : "............ওরেস্‌তেসের পাগলামির ফলে সে বন্দী হল, তার ফলেই কিন্তু সে মুক্তি পেল, কারণ বন্দীকে পরিমার্জিত করতে হবে।" এখানে পরিমার্জিত শব্দটির ক্ষেত্রে মূল গ্রিক শব্দটি হল 'ক্যাথারসিস'। এ ছাড়া ক্যাথারসিস শব্দটি আর কোথাও *কাব্যতত্ত্ব* গ্রন্থে ব্যবহৃত হয়নি। এই পারিভাষিক শব্দটির কোনো ব্যাখ্যাও আরিস্টটল দেননি।

ক্যাথারসিস বলতে ঠিক কী বোঝানো হয়েছে তা নিয়ে পরবর্তী কালে ব্যাখ্যাতাদের মধ্যে গড়ে উঠেছে মতভেদ। মোটের উপর তিনটি অভিমতের সন্ধান পাওয়া যায়। সে আলোচনায় যাবার আগে বলে নেওয়া যায় যে, আরিস্টটল-এর কালে গ্রিক ভাষায় ব্যবহৃত 'ক্যাথারসিস' শব্দটির দুটি অর্থ প্রচলিত ছিল। একটি অর্থ হল ধর্মীয়—যার অর্থ নৈতিক বা হৃদয়গত পবিত্রীকরণ এবং শুদ্ধিকরণ। ইংরেজিতে একে বলা যেতে পারে 'পিউরিফিকেশন'। দ্বিতীয় প্রচলিত অর্থটি ছিল চিকিৎসা শাস্ত্রের একটি পরিভাষা। আরিস্টটল-এর পিতা চিকিৎসক ছিলেন। আরিস্টটল-এরও চিকিৎসাশাস্ত্রে যথেষ্ট জ্ঞান ছিল। মানবদেহের ক্ষেত্রে দেখা যায়—শরীরে আছে অনেক জলীয় পদার্থ। সেই জলীয় পদার্থগুলির ভারসাম্যের উপর দৈহিক সুস্থতা নির্ভর করে। যদি কোনো জলীয় পদার্থের পরিমাণ বেড়ে যায় তাহলে সেই জল শরীর থেকে বার করে দিলে শারীরিক সুস্থতা আবার ফিরে আসে। এই ভাবে শরীর থেকে জল এবং রক্ত বার করে দেবার প্রক্রিয়া আধুনিক কালেও চিকিৎসাশাস্ত্রসম্মত। এই দুটি অর্থকে অবলম্বন করেই ক্যাথারসিস শব্দটির ট্র্যাজেডি সংক্রান্ত অর্থেরও দুটি ধারা উদ্ভূত হয়েছে।

আরিস্টটল অবশ্য তাঁর 'নগরনীতি' বা 'রাজনীতি' (মূল নাম *পোলিতেইয়া*) গ্রন্থে ক্যাথারসিস শব্দটির যে প্রয়োগ করেছেন তাতে অর্থের কিছুটা ইঙ্গিত পাওয়া যায়। শিশিরকুমার দাশ এই প্রসঙ্গটি কিছুটা বিস্তৃতভাবে উল্লেখ করেছেন—'ইতিপূর্বে অবশ্য তাঁর

'নগরনীতি/রাজনীতি' গ্রন্থে (৮/৭) কাথারসিসের কথা ছিল। সঙ্গীত সম্পর্কে বলতে গিয়ে তিনি বলেছেন যে দেখা যায় অনেক ব্যক্তি ধর্মীয় উন্মাদনার মধ্যে কাটান, এই উন্মাদনাকে জোর করে রুদ্ধ করা ঠিক নয়, তাতে রুদ্ধ আবেগ আরো শক্তিশালী হয়ে ওঠে, দরকার হল এই উন্মাদনার বহির্গমন তার ফলে আবেগ পরিমিত হতে পারে এবং ধর্মীয় অনুষ্ঠান এবং ধর্মীয় সঙ্গীত মনের এইসব আবেগের নিষ্ক্রমণে সাহায্য করে। প্রবল উন্মাদনার নিবৃত্তি ঘটে প্রচণ্ড সঙ্গীতে। ....রেনেসাঁসের সময় এই ছিল কাথারসিসের ব্যাখ্যা। এই ব্যাখ্যাই মিল্‌টন গ্রহণ করেছিলেন। দ্র. *স্যামসন অ্যাগনিস্টেস*-এর ভূমিকা এবং উনবিংশ শতাব্দীতে ওয়েল্ (Weil) এবং বার্নেস (Bernays) এই ব্যাখ্যা প্রচার করেছিলেন। (আরিস্টটল, *কাব্যতত্ত্ব*, অনুবাদ ও সম্পাদনা শিশিরকুমার দাশ, প্যাপিরাস সংস্করণ ১৯৮৬, ভূমিকা পৃ.—X X X)। এই অংশ থেকে মনে হয় ভাবাবেগের তীব্রতার নিষ্ক্রমণ এবং তার ফলে মনের সমতা বিধান অর্থাৎ অনেকটা চিকিৎসাশাস্ত্রীয় অর্থেই আরিস্টটল শব্দটিকে ব্যবহার করেছেন।

এখন আমরা ক্যাথারসিস প্রসঙ্গে বিভিন্ন ব্যাখ্যা উপস্থিত করব।

অষ্টাদশ শতকের সুপ্রসিদ্ধ জার্মান নন্দনতত্ত্ববিদ এবং নাটককার ই.জি. লেসিং ক্যাথারসিস শব্দটির অর্থ বিশুদ্ধিকরণ বলে সিদ্ধান্ত করেছেন। শ্রোতা ও দর্শকের চিত্তে করুণা ও ভয়ের যে ভাব জেগে ওঠে তা ট্র্যাজেডি-দর্শনের ফলে অধিক পরিমাণে জাগ্রত হয় এবং মনের ভেতরে সঞ্চিত থাকা সেই ভাবগুলির আধিক্যের পরিমাণ হ্রাস পায়। মনের মধ্যে বেদনা, অনুকম্পা এবং বিদ্রোহের ভাব থাকলে নাগরিকদের মন হয়ে ওঠে রাষ্ট্র-বিধান সম্পর্কে অসহিষ্ণু এবং দ্বিধাগ্রস্ত। নাগরিকদের মনের এই অবস্থা প্রাচীন গ্রিক ও রোমক দর্শনবিদদের মতে অপরাধ। ট্র্যাজেডি দেখার ফলে এই সঞ্চিত দুর্বল আবেগগুলি আলোড়িত হয় এবং নির্গত হয়। তার ফলে নাগরিকদের মন হয়ে ওঠে বিশুদ্ধ। নাগরিকদের মনের মধ্যে সঞ্চিত অনুভূতিগুলিও অনেকটা শুদ্ধিকৃত হয়। নাট্যদর্শকের মনকে করে তুলতে পারে স্বাভাবিক। রোম-এ প্রতি পাঁচ বছরের শেষে নাগরিকদের শুদ্ধিকরণের একটি অনুষ্ঠান হত। তাকে বলা হত লাস্‌ট্রেশন (Lustration)। লেসিং-এর ব্যাখ্যাত বিশুদ্ধিকরণ অনেকটা তারই অনুরূপ। লেসিং ছাড়াও পরবর্তী কালে নাট্য-আলোচক গিলবার্ট মারে এই তত্ত্বের সমর্থক এই তত্ত্বটির সঙ্গে ধর্মীয় বিশ্বাসের কিছুটা সম্পর্ক আছে।

আবার কেউ কেউ ক্যাথারসিসকে নাগরিক কর্তব্য এবং সমাজকল্যাণের বোধের সঙ্গে যুক্ত করেছেন। ইতালি-তে রেনেসাঁস-পর্বে আবির্ভূত বিশিষ্ট নাট্যতত্ত্ববিদ রবারতেল্লি (Robertelli) মনে করেছিলেন ট্র্যাজেডির ভয়ংকরত্ব মানুষের মনকে সবল করে তোলে এবং তার ফলে মানুষ জীবনের সংকটের মুখোমুখি হবার প্রেরণা পায়।

লেসিং-এর এই বিশুদ্ধিকরণ বা পবিত্রীকরণের তত্ত্ব অনেকেই গ্রহণ করেননি। বিশেষ করে পরবর্তী যুগের অর্থাৎ বিংশ শতাব্দীর নাট্যতত্ত্ববিদরা ক্যাথারসিস শব্দের অর্থকে চিকিৎসাবিজ্ঞান- সম্মত ভাবমোক্ষণ বা 'পারগেশন' (Purgation) বলে মনে করেছেন। এঁদের মধ্যে প্রধান হলেন আরিস্টটল-অনুবাদক বুচার, বাইওয়াটার এবং এফ. এল. লুকাস্। তাঁদের মতে চিকিৎসাশাস্ত্রে শরীর থেকে জলীয় পদার্থের ক্ষরণ এবং তার ফলে শরীরের যে সুস্থতা— এই বিজ্ঞানসম্মত পদ্ধতিকেই আরিস্টটল ট্র্যাজেডির ক্ষেত্রে ব্যবহার করেছেন। বাইওয়াটার-এর মতে আরিস্টটল বলতে চেয়েছেন— মানুষের প্রকৃতির মধ্যে করুণা, ভীতি এবং সমজাতীয় আবেগের বাহুল্য অনেক সময়েই অস্বস্তিকর এবং ক্ষতিকর হয়ে ওঠে। ট্র্যাজেডির পরিণামের মানসিক আলোড়ন সেই পুঞ্জিত আবেগের মোক্ষণ ঘটায়। তার ফলে চিত্ত ভারমুক্ত হয় এবং

স্বস্তি পায়। মনের সুস্থতার জন্য এই স্বস্তি প্রার্থিত। তাই ক্যাথারসিস-এর কাজ অনেকটা ওষুধের মতো। লুকাসও এই মতেরই সমর্থক কিন্তু তিনি এইভাবে ট্র্যাজেডিতে ক্যাথারসিস-এর তত্ত্ব আরোপ করার জন্য আরিস্টটল-এর সমালোচনা করেছেন। তিনি বলেছেন— নাট্যশালা হাসপাতাল নয়।

বাইওয়াটার কিন্তু এই ভাবমোক্ষণ তত্ত্বকে সমর্থন করেছেন। আবেগকে প্রশ্রয় দিয়ে মানুষ যদি নিজেকে সংযত করতে সক্ষম না হয় তা হলে তা বহু দিক থেকে ক্ষতিকারক হতে পারে। মাঝে মাঝে ওই অনুভূতিগুলি যদি নিষ্ক্রান্ত হয় তা হলে মানুষের মনের সমতা রক্ষিত হয়। বাইওয়াটার চিত্তের বিশুদ্ধিকরণ তত্ত্বটিকে অগ্রাহ্য করে বলেছেন—'নাট্যশালা শিক্ষায়তন নয়'।

জি. এফ. এলস (G. F. Ells) নামক আর এক ব্যাখ্যাকার এবং তাঁর সমর্থক জি. গোল্ডস্টিন (G. Goldstein)-এর মতে ক্যাথারসিস দর্শকচিত্তের নয়, হয় ঘটনাগুলির ক্ষেত্রে অর্থাৎ প্লটের ক্ষেত্রে। প্লটের বাড়তি এবং বিশৃঙ্খল অংশগুলিকে বর্জন করে ট্র্যাজেডি-তে যে সুশৃঙ্খল ঘটনা সমন্বয় নির্দিষ্ট শোকাবহ পরিণামকে স্পষ্ট করে তোলে— তা-ই হল ক্যাথারসিস। তবে এই অভিমতটি খুব বেশি গৃহীত হয়নি।

আমরা ক্যাথারসিস-সম্পর্কিত যে-দুটি ব্যাখ্যার উল্লেখ করলাম সে-দুটির মধ্যে খুব বড়ো পার্থক্য আছে এমন নয়। দুটি অভিমতেই বলা হয়েছে যে, মানুষের মনের ভেতরে জমে থাকা আবেগ ক্যাথারসিস-এর ফলে আলোড়িত ও নিষ্ক্রান্ত হয় এবং তার ফলে মানবচিত্ত ভারমুক্ত ও শান্ত হয়। দুটি মতেই স্বীকার করে নেওয়া হয়েছে যে, মনের মধ্যে জমে থাকা আবেগসমূহ হল করুণা, ভয় এবং সমরূপ সম্পন্ন কিছু কষ্টদায়ক এবং ভয়ংকর অনুভব। ক্যাথারসিস তা থেকে মানুষের মনকে স্বস্তির অবস্থায় উত্তীর্ণ করে। দুটি অভিমতের প্রধান পার্থক্য হচ্ছে প্রবণতায়। একটি তত্ত্বে ধর্মীয় পবিত্রীকরণের (পিউরিফিকেশন) উপর জোর দেওয়া হয়েছে। অপর তত্ত্বটিতে মানসিক স্বাস্থ্যের ভারসাম্য রক্ষার কথা বলা হয়েছে। আমরা এই দ্বিবিধ মতামত মনে রেখেও একটি অন্য কথা বলতে পারি। ট্র্যাজেডি পাঠ অথবা দর্শন ধর্মীয় আচরণও নয় এবং চিকিৎসাও নয়। তা হল শিল্প আস্বাদনের একটি প্রক্রিয়া। ট্র্যাজেডিতে মানব জীবনের ভীষণ ও শোকাবহ পরিণাম মানুষ প্রত্যক্ষ করে। সেই সঙ্গে মানুষের মহত্ত্ব, উদারতা এবং ন্যায়বোধের শক্তিকেও অনুভব করে। দুর্ভাগ্য এবং উৎপীড়নের সামনেও মানুষের মাথা তুলে দাঁড়াবার ক্ষমতা ট্র্যাজেডি-দর্শককে সশ্রদ্ধ করে। কাজেই ট্র্যাজেডির ক্যাথারসিস কেবল ভয়, করুণা ও সমরূপ আবেগের জাগরণ ও নিষ্ক্রমণ নয়, তা আনন্দও দান করে। এখানেই কাব্যের তথা শিল্পের ক্ষেত্রে ক্যাথারসিস-এর বিশেষ ভূমিকা। ভারতীয় রসবাদী কাব্যতত্ত্বের সঙ্গে আরিস্টটল উল্লিখিত ক্যাথারসিস-এর খানিকটা সাদৃশ্যও দেখা যায়। যে করুণ, ভয়ংকর এবং দ্বন্দ্বময় অনুভূতিগুলি ট্র্যাজেডির চরিত্রগুলিকে আলোড়িত করে, সেই অনুভূতিগুলির অনুরূপ যে ভাব দর্শকের চিত্তে সঞ্চিত আছে তা জাগ্রত হয়ে সকলের সঙ্গে এবং নাটকের পাত্রপাত্রীর সঙ্গে একাত্মতা লাভ করে। তার ফলে জীবন-সম্পর্কিত উপলব্ধির প্রগাঢ়তা জাগে এবং জাগ্রত হয় বিশেষ ধরনের শৈল্পিক নান্দনিকতার বোধ। পবিত্রীকরণ বা শুদ্ধিকরণের তুলনায় এটি ভাবমোক্ষণের বেশি কাছাকাছি। কিন্তু চিকিৎসাশাস্ত্রের অর্থে নয়, শিল্প আস্বাদনজনিত নান্দনিকতা বোধের প্রাসঙ্গিকতায় আরিস্টটল-কথিত ক্যাথারসিসকে বুঝতে হবে।

ট্র্যাজেডি এবং ইতিহাস

'ইতিহাস ও কাব্য'— এই শিরোনামে *পোয়েটিকস* গ্রন্থের নবম পরিচ্ছেদটি রচনা করেছেন আরিস্টল। প্রাচীন যুগের গ্রিস-এ আধুনিক কালের মতো জ্ঞানচর্চার বিশেষীকৃত ক্ষেত্র নির্দিষ্ট হয়ে যায়নি। ইতিহাস, দর্শন, কাব্য প্রায়শই একই মনীষীর অধ্যয়ন ও বিশ্লেষণের ক্ষেত্র ছিল। আরিস্টটলও ইতিহাসচর্চা এবং কাব্যচর্চাকে সম্পূর্ণ পৃথকভাবে না দেখে এই দুই-এর মধ্যে একটি সমান্তরাল আলোচনা অপ্রাসঙ্গিক মনে করেননি।

প্রথমেই তিনি বলেছেন—" কবির আর ঐতিহাসিকের পার্থক্য এই নয় যে একজন পদ্যে লেখেন আর একজন লেখেন গদ্যে......................।" (অনুবাদ শিশিরকুমার দাশ, নবম পরিচ্ছেদ) এখান থেকে বোঝা যায় ইতিহাস গদ্যে লেখা হয় আর কাব্য লেখা হত নিরূপিত ছন্দে। কাব্যের মধ্যেই পড়ত ট্র্যাজেডি এবং কমেডি। যথার্থভাবেই আরিস্টটল নির্দেশ করেছেন যে ভাষাভঙ্গি বিষয়গত পার্থক্যের ক্ষেত্রে কোনো মানদণ্ড নয়।

ইতিহাস ও কাব্যের প্রধান পার্থক্য আরিস্টটল নির্দেশ করেছেন নবম পরিচ্ছেদের প্রথমেই—"......... যা সত্যি সত্যি ঘটেছে তা বর্ণনা করাই কবির কাজ নয়, বরং যা ঘটা সম্ভব বা অনিবার্য তার বর্ণনা করাই কবির কাজ। [পূর্বোক্ত]

পুনশ্চ আরিস্টটল কয়েক ছত্র পরেই আরও বিশদ করে বলেছেন—"আসল পার্থক্য হল যে একজন বলেন যা ঘটে গেছে তার কথা, আর একজন বলেন তার কথা যা ঘটা সম্ভব।" [পূর্বোক্ত]

আরিস্টটল-এর দুটি বাক্যেই স্পষ্ট হয়ে ওঠে যে, ইতিহাস কেবল ঘটে যাওয়া বাস্তব সত্যকেই বর্ণনা করতে পারে এবং নথিবদ্ধ রাখতে পারে। কিন্তু কাব্য সে-জাতীয় কোনো নির্দিষ্ট ঘটনা বা ঘটনাধারা বর্ণনা করে না। সর্ব মানবের জীবনের যা সাধারণ সত্য; যা যে-কোনো সময়েই ঘটা সম্ভব এবং ঘটতে পারে— কবি তাকেই অবলম্বন করেন। ইডিপাস নামক কোনো ব্যক্তির জীবনে যা যা ঘটেছে সোফোক্লিস-এর নাটকে তা প্রকৃতপক্ষে ঘটেছে বলে প্রমাণ পাওয়া যায় না। কিন্তু গ্রিস-এর রাষ্ট্রনীতিতে এবং সামাজিক পরিবেশে তেমন ঘটনা ঘটতে পারে। কাজেই এই কাহিনি কাব্যের অবলম্বন, ইতিহাসের নয়। আরিস্টটল যথার্থই বলেছেন— "ইতিহাস বলে নির্দিষ্ট তথ্যের কথা, আর কাব্য বলে সার্বজনীন সত্য।" (পূর্বোক্ত) পরে তিনি কথাটিকে আরও একটু ব্যাখ্যা করেছেন একজন ঐতিহাসিক ব্যক্তির প্রসঙ্গ উল্লেখের সাহায্যে। আলকিবিয়াদেস ছিলেন খ্রিস্টপূর্ব পঞ্চম শতাব্দে এথেন্স-এর এক সেনাপতি। স্পার্টা-র সেনাবাহিনীর সঙ্গে তাঁর যুদ্ধ হয়েছিল। তিনি বিশেষ একজন ব্যক্তি। বিশেষভাবে তিনি যা যা করেছিলেন, তারই বিবরণ হল ইতিহাস। কাব্যে কিন্তু যদিও চরিত্রগুলির বিশেষ নাম ব্যবহার করা হয়, তারা নির্দিষ্ট কোনো ঐতিহাসিক ব্যক্তি নয়, তারা সর্ব মানবের প্রতিনিধি। বিশেষ পরিস্থিতিতে নিজস্ব চারিত্রিক বৈশিষ্ট্য সমন্বিত কোনো ব্যক্তি যে আচরণ করতে পারে তারই শিল্পসৌন্দর্যময় বর্ণনা হল কাব্য। অনেক মানুষ সম্পর্কেই কাব্যের সত্য প্রযোজ্য বলে আরিস্টটল কাব্যের সত্যকে বলেছেন সর্বজনীন সত্য।

কাব্য ও ইতিহাসের মধ্যে প্রধান পার্থক্যের জায়গাটি হল— ইতিহাসের সত্য নির্দিষ্ট এবং কাব্যের সত্য সম্ভাব্য। কিন্তু সম্ভাব্য বলে তা কখনই অসত্য নয়। বিশেষ পরিস্থিতিতে মানুষের যে স্বাভাবিক অনুভূতি এবং আচরণ যা জীবনে সর্বদাই পরিলক্ষিত হয় তাই কাব্যের অবলম্বন বলে আরিস্টটল কাব্যের সত্যকে সর্বজনীন সত্য বলেছেন।

ইতিহাসবিদ এবং কবির মধ্যে আর একটি গুরুত্বপূর্ণ পার্থক্য হল ব্যক্তি, স্থান, কাল ও ঘটনার সমন্বয়ে যা ঘটেছে ইতিহাস কেবল তাকেই বর্ণনা করে। নিছক তথ্য নিয়েই তার কাজ, তার বাইরে যাবার কোনো স্বাধীনতা ইতিহাসবিদের নেই। কিন্তু কবি তাঁর সৃষ্টিকে স্থান-কাল-ঘটনার নির্দিষ্টতায় সীমাবদ্ধ করেন না। সেখানে তাঁর নিজস্ব কল্পনার প্রয়োগ তিনি করতে পারেন। বাস্তবের অবিকল সত্যকে উপস্থাপিত করাও তাঁর কাজ নয়। যদিও তাঁর কল্পনার ক্ষেত্র সব সময়েই সম্ভাব্য, প্রধান লক্ষ্য হচ্ছে মানুষের অভিজ্ঞতা ও উপলব্ধির মধ্যে দিয়ে জীবনের সত্যকে প্রকাশ করা। তা কোনো নির্দিষ্ট দেশ-কালের ব্যাপার নয়। রাজা ইডিপাস-এর মর্মান্তিক অনুশোচনা, আন্তিগোনের হৃদয়ে সহোদরের অন্ত্যেষ্টি ক্রিয়ার মধ্য দিয়ে রক্তের ঋণ শোধ করার ব্যাকুল আবেগ— যদিও প্রাচীন গ্রিক কাহিনিতে আমরা পাই, তবু তা যে-কোনো দেশ ও কালের যে-কোনো মানুষ সম্পর্কেই সত্য। কেবল ট্র্যাজেডি বা কমেডি নয়, সাহিত্যে ও শিল্পে এই সর্বজনীনতা ও চিরন্তনত্ব সর্বত্রই দেখা যায়। এজন্যই আরিস্টটল-এর কাছে ইতিহাসের তুলনায় কাব্য অধিকতর সত্য বলে প্রতিভাত হয়েছে। তাকে তিনি গভীরতর এবং নির্বিশেষ সত্য বলেও মনে করেছেন। সেজন্যই তাঁর কাছে ইতিহাসের তুলনায় কাব্য শ্রেয়োতর।

আরিস্টটল-এর লেখার যে ইংরেজি অনুবাদ করেছেন বুচার (Butcher) সেখান থেকে ইতিহাস ও কাব্যের পার্থ্যকের দিকটি উদ্ধৃত হল—"It is not function of the poet to relate what has happened, but what may happen—what is possible according of the laws of probability of necessity. The poet and the historian differ not by writing in prose or in verse. The true difference is that one relates what has happened, the other what may happen."

কাব্যে যেহেতু কবির কল্পনার সংযোজন ও সমন্বয়ের পরিসর থাকে তাই জীবনের নিছক বাস্তব চিত্রকে ছাপিয়ে কবি তাঁর বোধ ও উপলব্ধি অনুসারে জীবনের আদর্শায়িত এবং ন্যায়বোধ সমন্বিত অনুভবকেও প্রকাশ করতে পারেন। এ-কারণেও আরিস্টটল ইতিহাসের তুলনায় কাব্যকে অধিকতর গুরুত্ব দিয়েছেন। ইতিহাস হল বাস্তবের বিবরণ; কাব্য হল চিরন্তন সত্যের অভিব্যক্তি। অনেক শতাব্দী পরে রোমান্টিক কবি শেলি-ও *ডিফেন্স অব পোয়েট্রি* শীর্ষক রচনাটিতে এ-কথারই পুনরুক্তি করেছেন—Poetry is the very image of life expressed in its eternal truth.

ট্র্যাজেডি এবং মহাকাব্য (Epic)

আরিস্টটল *পোয়েটিকস* গ্রন্থের ত্রয়োবিংশ ও চতুর্বিংশ পরিচ্ছেদে মহাকাব্য কাকে বলে, মহাকাব্যের শ্রেণিবিভাগ ও ছন্দ ইত্যাদি প্রসঙ্গ আলোচনার সঙ্গে ট্র্যাজেডি ও মহাকাব্যের মধ্যে কোনটি উন্নততর শিল্প তাই নিয়ে আলোচনা করেছেন।

এই তুলনামূলক আলোচনা করবার কারণ খুবই স্বাভাবিক । কারণ ট্র্যাজেডি যখন গ্রিস-এ অত্যন্ত জনপ্রিয় হয়ে উঠেছে তখন তার কাছাকাছি জনপ্রিয়তা কেবল মহাকাব্যই দাবি করতে পারত। ট্র্যাজেডি ও কমেডি উদ্ভূত হবার আগে গ্রিক সাহিত্যে দুই ধরনের ভাষাশিল্প-সংরূপ প্রচলিত ছিল দীর্ঘ কাব্য এবং ক্ষুদ্র কবিতা। দীর্ঘ কাব্যের দুটি ভাগ— মহাকাব্য এবং আখ্যানকাব্য। মহাকাব্যে রাজন্যবর্গের ক্রিয়াকলাপ এবং সংঘাতের বর্ণনা থাকত। তৎকালীন প্রচলিত অভিজাততন্ত্রের মূল্যবোধ সেখানে প্রকাশ পেলেও জীবন সম্পর্কে গভীর উপলব্ধি

মহাকাব্যে প্রতিভাত হত। দীর্ঘ কাল ধরে গড়ে ওঠা মহাকাব্যগুলি কোনো একক কবির রচনা নয়। কিন্তু কোনো এক সময় প্রতিভাধর কোনো এক কবি-লিপিকর সেগুলিকে একটি সূত্রে গেঁথে পূর্ণ কাব্যরূপ দিতেন। তাঁর নামেই সেই কাব্য পরিচিত হত। গ্রিক মহাকাব্য *ইলিয়াড* এবং *ওডিসি* সে-ভাবেই হোমার-এর নামে এবং প্রাচীন ভারতীয় দুটি মহাকাব্য যথাক্রমে ব্যাসদেব (*মহাভারত*) ও বাল্মীকির (*রামায়ণ*) নামে প্রচলিত আছে।

আখ্যানকাব্য কিছুটা মহাকাব্যের মতোই, কিন্তু মহাকাব্যের মতো গভীর জীবনবোধ এবং জাতীয় জীবনের সমগ্র ইতিহাস তাতে বিধৃত থাকত না। গ্রিক সাহিত্যে হেসিওড্-এর নামে প্রচলিত *থিওগনি* নামে আখ্যানকাব্য পাওয়া যায়। সেটি কৃষকজীবন-কেন্দ্রিক। এক গোপালক যুবক তার নায়ক।

ট্র্যাজেডি রচিত হবার আগে ও সমকালে গ্রিক সাহিত্যে প্রচলিত ও জনপ্রিয় ছিল ক্ষুদ্র কবিতা। সেই ক্ষুদ্র কবিতাগুলি সবই ছিল গান। লায়ার (Lyre) অর্থাৎ বীণা জাতীয় বাদ্যযন্ত্র সহযোগে গাওয়া হত বলে সেগুলিকে লিরিক বলা হয়। প্রাচীন যুগে কোথাও-ই পাঠ্য কবিতা ছিল না। সব কবিতাই ছিল গীতিকবিতা। পাঠ্য কবিতা মুদ্রণ-যুগের সৃষ্টি। প্রাচীন গ্রিক লিরিক-এর রচয়িতা রূপে মহিলা কবি সাপ্‌ফো (Sappho)-র নাম জগৎ-বিখ্যাত। তা ছাড়া গভীরতা ব্যঞ্জক পৌরাণিক বিষয় নিয়ে রচিত কবিতায় বিশেষ পরিচিত ছিলেন পিন্‌ডার (Pindar)।

খ্রিস্টপূর্ব ষষ্ঠ শতাব্দী পর্যন্ত গ্রিস-এ মহাকাব্য এবং কবিতাই ছিল জনপ্রিয় সাহিত্য। কিন্তু খ্রিস্টপূর্ব পঞ্চম শতক থেকে নাটক, বিশেষ করে ট্র্যাজেডি-র জনপ্রিয়তা তুমুল হয়ে ওঠে। তখন মাঝে মাঝে এরকম প্রশ্ন শিল্পরসিক মহলে উঠতে শুরু করে যে, এতখানি জনপ্রিয়তা সৎ শিল্পের পরিচায়ক কিনা। অতিরিক্ত জনপ্রিয় সাহিত্য সর্বসাধারণের রুচি অনুসারে কিছুটা নিম্ন মার্গের কিনা— এই প্রশ্নের সামনে দাঁড়িয়ে আরিস্টটল মহাকাব্য ও ট্র্যাজেডির মধ্যে একটি তুলনাত্মক আলোচনা করা যুক্তিযুক্ত বলে মনে করেছিলেন। প্রথমে তিনি ট্র্যাজেডি ও মহাকাব্যের মধ্যে সাদৃশ্য ও বৈসাদৃশ্যের দিকগুলি দেখিয়েছেন।

সাদৃশ্য

(ক) মহাকাব্য এবং ট্র্যাজেডি— দুই-ই গঠিত হয় এমন একটি স্বয়ংসম্পূর্ণ ঘটনাকে অবলম্বন করে— যার থাকবে আদি, মধ্য ও অন্ত ভাগ। আদি, মধ্য এবং অন্ত বলতে কী বোঝায় তা ট্র্যাজেডি আলোচনা প্রসঙ্গে পূর্বে বলা হয়েছে।

(খ) ইতিহাসের সঙ্গে মহাকাব্য এবং ট্র্যাজেডি উভয়েরই পার্থক্য দেখিয়ে তিনি বলেছেন— ইতিহাসে বর্ণনা করা হয় একটি বিশেষ কাল খণ্ড। সেই সময়ের মধ্যে যত ঘটনা ঘটেছে সেই সব ঘটনারই বর্ণনা থাকে ইতিহাসে, সেগুলির মধ্যে পারস্পরিক কোনো সংযোগ না থাকলেও। কিন্তু মহাকাব্য ও ট্র্যাজেডি— দুইয়ের-ই কাহিনির মধ্যে থাকবে এমন এক ঐক্য— যেন তা জীবদেহের মতো অখণ্ড। প্রত্যেকটি কথাবৃত্তের সঙ্গে প্রতিটি কথাবৃত্তের থাকবে সংযোগ।

(গ) মহাকাব্য ও ট্র্যাজেডি— দুটিতেই উপকাহিনি থাকতে পারে এবং থাকে।

(ঘ) মহাকাব্য এবং ট্র্যাজেডি উভয় ক্ষেত্রেই কবিরা বহু ঘটনার মধ্য থেকে কিছু ঘটনা নির্বাচন করে নেন। তারপর সেগুলি যথাযথভাবে বিন্যস্ত করে কাহিনির মধ্যে অখণ্ডতা সৃষ্টি করেন। অত্যন্ত সুনির্মিত মহাকাব্য হিসেবে আরিস্টটল হোমার-এর *ইলিয়াড* এবং *ওডিসি*-র উল্লেখ করেছেন। সেখানে তিনি লিখেছেন— "কিন্তু হোমার সমগ্র ট্রয় যুদ্ধের কাহিনীকে তাঁর (কাব্যের) বিষয়বস্তু করেননি, কারণ (তিনি জানেন যে) বিষয়টি অত্যন্ত বড়, তার অখণ্ডতা সৃষ্টি করা সহজ নয়, আর যদি তা সম্ভবও হয় তাহলেও অসংখ্য ছোটো ছোটো ঘটনার ভারে

তা অত্যন্ত জটিল হয়ে যাবে। সেজন্য তিনি এই (বিরাট কাহিনি থেকে) একটি অংশ বেছে নিয়েছেন, যদিও অন্যান্য বহু ঘটনাকে তিনি উপকাহিনী হিসেবে ব্যবহার করেছেন, ...''
[অনুবাদ শিশিরকুমার দাশ, ত্রয়োবিংশ পরিচ্ছেদ]

ত্রয়োবিংশ পরিচ্ছেদেই আরিস্টটল বলেছেন যে, মহাকাব্য এবং ট্র্যাজেডি উপভোগের যে আনন্দ তা হবে বিশেষ ধরনের। ভয় এবং করুণা জাগায় এমন অনুভব থেকে শিল্প উপভোগের যে চরিতার্থতার বোধ জাগে তাই-ই মহাকাব্য এবং ট্র্যাজেডি উভয়ের ক্ষেত্রেই প্রযোজ্য।

ট্র্যাজেডির মতোই মহাকাব্যের বিভিন্ন শ্রেণি হতে পারে। আরিস্টটল-এর মতে মহাকাব্য এবং ট্র্যাজেডির প্লট নির্মাণের ক্ষেত্রে যথেষ্ট সাদৃশ্য আছে। হোমার-এর মহাকাব্যের উল্লেখ করে তিনি বিষয়টি যথেষ্ট ভালোভাবে বুঝিয়েছেন—"ট্র্যাজেডির মতোই মহাকাব্যেরও নানা শ্রেণী। মহাকাব্য হতে পারে সরল বা জটিল, হতে পারে চরিত্রনির্ভর বা বিপর্যয়ের কাহিনী। গান আর দৃশ্যের কথা বাদ দিলে মহাকাব্যেও ট্র্যাজেডির মতোই বিপ্রতীপতা ও উদ্‌ঘাটন ও বিপর্যয়ের প্রয়োজন, প্রয়োজন অভিপ্রায় এবং ভাষা-রীতির। হোমারই এইসব উপাদান প্রথম ব্যবহার করেছিলেন এবং সার্থক ভাবে ব্যবহার করেছিলেন। তাঁর ইলিয়াদ হল সরল কাহিনী, তার শেষ বিপর্যয়ে। আর ওদিসি একটি জটিল কাহিনী এবং চরিত্র-নির্ভর। [পূর্বোক্ত, চতুর্বিংশ পরি.]

বৈসাদৃশ্য

(ক) ট্র্যাজেডি এবং মহাকাব্যের মধ্যে প্রধান পার্থক্য আরিস্টটল-এর মতে কাহিনির দৈর্ঘ্যে। ট্র্যাজেডির আয়তন হয় নির্দিষ্ট এবং সুসংবদ্ধ। কাহিনির আরম্ভ ও শেষ যেন একই সঙ্গে (শ্রোতা ও দর্শকের) গোচরীভূত হয়। মহাকাব্যে কাহিনি সেই তুলনায় অনেক দীর্ঘ হতে পারে। তার কারণ নাটকে সমকালে সংঘটিত অনেক ঘটনা একই সঙ্গে দেখানো সম্ভব নয়। কারণ রঙ্গমঞ্চে এককালে একটি ঘটনার অভিনয়ই সম্ভব। কিন্তু মহাকাব্য যেহেতু বর্ণনাত্মক, সে জন্য-একই সময়ে ঘটেছে এমন অনেক ঘটনা সেখানে বর্ণিত হতে পারে। তার ফলে কাহিনির আয়তনে আসে বিস্তৃতি।

(খ) মহাকাব্য ও ট্র্যাজেডির মধ্যে দ্বিতীয় গুরুত্বপূর্ণ পার্থক্যের ক্ষেত্রটি হল ছন্দের ব্যবহার। মহাকাব্যের ছন্দ হবে 'শূরছন্দ' বা 'ষট্‌পদী'। ইংরেজিতে একে হিরোয়িক কাপলেট বলা হয়। আরিস্টটল বলেছেন— "যদি অন্য কোন এক বা একাধিক ছন্দে কেউ মহাকাব্য রচনা করতে চান তার ফল তৃপ্তিকর হবে না। শূরছন্দই সবচেয়ে গম্ভীর, সবচেয়ে রাজকীয়, এর মধ্যেই অপরিচিত শব্দ ও রূপক ব্যবহারের স্বাচ্ছন্দ্য সবচেয়ে বেশী— আর এই ব্যাপারে বর্ণনাত্মক কাব্য অন্য সব কাব্যের চেয়ে অনেক বেশী ব্যাপক।" (পূর্বোক্ত, চতুর্বিংশ পরিচ্ছেদ) অপরপক্ষে ট্র্যাজেডিতে একাধিক ছন্দ প্রযুক্ত হয়। কারণ সেখানে থাকে ভিন্ন ভিন্ন পরিস্থিতিতে ভিন্ন ভিন্ন ব্যক্তির সংলাপ।

(গ) ট্র্যাজেডি ও মহাকাব্যের ক্ষেত্রে আর একটি পার্থক্য হল অলৌকিক এবং অসম্ভাব্য ব্যাপার— যাকে আরিস্টটল চমৎকার বলে উল্লেখ করেছেন, তা ট্র্যাজেডির ক্ষেত্রে অবাঞ্ছিত কিন্তু মহাকাব্যের ক্ষেত্রে নয়।

(ঘ) ট্র্যাজেডি এবং মহাকাব্যের অপর পার্থক্য হল— মহাকাব্য বর্ণনামূলক এবং শ্রব্য ভাষাশিল্প। ট্র্যাজেডি হল ক্রিয়ামূলক এবং দৃশ্যশিল্প যেখানে ভাষা এবং অঙ্গ-সঞ্চালন এক সঙ্গে প্রযুক্ত হয়।

মহাকাব্য ও ট্র্যাজেডি : তুলনাত্মক শ্রেষ্ঠত্বের বিচার

ট্র্যাজেডি ও মহাকাব্যের তুলনাটি নিয়ে আরিস্টটল যথেষ্টই ভেবেছিলেন। তার প্রমাণ *কাব্যতত্ত্ব* গ্রন্থের পঞ্চবিংশ পরিচ্ছেদে ভাষা, শব্দ ইত্যাদি নিয়ে আলোচনার শেষে শেষ ও ছাব্বিশতম পরিচ্ছেদে আবার তিনি ফিরে এসেছেন মহাকাব্য ও ট্র্যাজেডির তুলনাত্মক বিচারে।

প্রথমেই তিনি জনপ্রিয়তার প্রশ্নটি তুলেছেন। যে-বাক্যটি তিনি ব্যবহার করেছেন তা এই— "উন্নততর শিল্প যদি কম জনপ্রিয় হয় এবং কম জনপ্রিয় শিল্প যদি সর্বদাই উন্নততর দর্শকের কাছে আবেদন করে তাহলে অবশ্যই যে শিল্পের অবারিত জনপ্রিয়তা তা বিশেষ ভাবেই নিকৃষ্ট। (পূর্বোক্ত, ষড়বিংশতি পরিচ্ছেদ) আরিস্টটল-এর এই বাক্যটি থেকে বোঝা যায় যে, সমকালীন গ্রিস-এ এমন একটি ধারণা প্রচলিত ছিল— যা খুব বেশি জনপ্রিয় তা উন্নত মানের শিল্প নয়। এই ধারণাকে খুব অযৌক্তিক বলা যায় না। কারণ বিশ্বের সর্বত্রই শিল্পের জগতে আমরা এ-জিনিস দেখে থাকি। যে শিল্প গড়পরতা মানুষের রুচিকে তৃপ্ত করতে পারে তা-ই হয় সর্বাধিক জনপ্রিয়। নতুন ধরনের এবং অত্যন্ত উন্নত মান-সম্পন্ন শিল্প সমুন্নত রুচির উপভোক্তাদের কাছেই আস্বাদ্য হয়। সমুন্নত রুচির মানুষ কিন্তু সংখ্যায় কম। এই সিদ্ধান্তের যৌক্তিকতা আরিস্টটল অস্বীকার করতে পারেননি।

অতঃপর তাঁর সমস্যা হয়েছিল এই যে তাঁর সমকালে গ্রিস-এ মহাকাব্যের তুলনায় ট্র্যাজেডির জনপ্রিয়তা ছিল অনেক বেশি। ফলে এই সিদ্ধান্ত প্রায় স্বতঃসিদ্ধ হয়ে ওঠে যে মহাকাব্যের তুলনায় ট্র্যাজেডি নিকৃষ্টতর শিল্প। এই ধারণারই বিপক্ষে নিজের অভিমত ব্যক্ত করার চেষ্টা করেছিলন আরিস্টটল।

প্রথমেই তিনি বলেছিলেন যে, ট্র্যাজেডি সাধারণের কাছে অধিক জনপ্রিয় তার কারণ ট্র্যাজেডির নির্মাণ-শিল্প নয়, তার কারণ নিকৃষ্ট ধরনের অভিনয়রীতি ; অভিনেতারা অনেক সময় যে ধরনের অঙ্গভঙ্গি করেন তা নিম্ন মানের দর্শকদের মনোরঞ্জন করে। তার ফলে ট্র্যাজেডির জনপ্রিয়তাও নিম্ন মানের বলে মনে হয়। মহাকাব্যের যেহেতু অভিনয়ের প্রয়োজন হয় না, তাই অভিনেতাদের অঙ্গভঙ্গিরও প্রয়োজন হয় না। আরিস্টটল এ-বিষয়ে বেশ মজার একটি দৃষ্টান্ত দিয়েছেন—"বাস্তবিকই অভিনেতারা ভাবেন যে তাঁরা নিজস্ব কিছু না দেখালে দর্শকেরা বুঝবেন না, সেইজন্য তাঁরা নানারকম ব্যাপারের আমদানী করেন। আপনারা দেখে থাকবেন যে নিকৃষ্ট বাঁশীবাদকেরা কী ভাবে রঙ্গমঞ্চে ঘুরে বেড়াচ্ছেন. যেন তাঁরা সব 'ডিস্‌কাস্' ছুঁড়ছেন কিংবা— স্কুল্লা নাটকে— তাঁরা যেন কোরাসের দলপতিকে প্রায় মেরেই ফেলবেন।" (ষড়বিংশ পরিচ্ছেদ) এর পরেই আরিস্টটল স্মরণ করিয়ে দিয়েছেন যে, প্রকৃত ট্র্যাজেডির রস বা নিহিত উপলব্ধি আস্বাদন করবার জন্য ট্র্যাজেডি অভিনীত হবার কোনো প্রয়োজন নেই। মহাকাব্যের মতোই পাঠ করে অথবা শ্রবণ করেও তা করা যায়। কাজেই জনপ্রিয়তার নিরিখে ট্র্যাজেডিকে মহাকাব্যের তুলনায় নিম্ন মানের বলা উচিত নয়। আরিস্টটল স্পষ্টই বলেছেন— তাছাড়া মহাকাব্যের মতোই ট্র্যাজেডিও অভিনয়-নিরপেক্ষ ভাবেই তার লক্ষ্যে পৌঁছতে সমর্থ, আবৃত্তি করলেও ট্র্যাজেডির ধর্ম অনুভব করা যায় কাজেই যদি অন্য সব ব্যাপারে ট্র্যাজেডি উন্নত হয়, (অভিনয়জনিত) নিকৃষ্টতা ট্র্যাজেডির অন্তর্নিহিত স্বভাব নয়।"

[ষড়বিংশ পরিচ্ছেদ]

আরিস্টটল ট্র্যাজেডিকে মহাকাব্যের তুলনায় উন্নততর বলবার পক্ষে প্রধান যে যুক্তিটি দেখিয়েছেন তা হল ট্র্যাজেডিতে মহাকাব্যের সব উপাদানই আছে কিন্তু ট্র্যাজেডির দুটি উপাদান

মহাকাব্যে নেই। কাহিনি, চরিত্র, বাচন এবং অভিপ্রায় মহাকাব্য ও ট্র্যাজেডি দুইয়েরই অঙ্গ কিন্তু সংগীত এবং দৃশ্য মহাকাব্যে থাকে না। উল্লিখিত দুটি উপাদানের উপস্থিতির ফলে মহাকাব্যের চেয়ে ট্র্যাজেডির আনন্দ আরও ঘনীভূত হয়।

ছন্দের বৈচিত্র্য যেহেতু ট্র্যাজেডিতে থাকে সে-জন্য, আরিস্টটল-এর মতে মহাকাব্যে ব্যবহৃত একই ধরনের ছন্দের বৈচিত্র্যহীনতার তুলনায় ট্র্যাজেডির আকর্ষণ বেশি।

আরিস্টটল-এর মতে মহাকাব্যের বিস্তার বেশি হবার কারণে তার কাহিনি-ঐক্য অপেক্ষাকৃত শিথিল। আরিস্টটল-এর মতে—"যা বিস্তারিত এবং বিচ্ছুরিত তার চেয়ে যা সংহত এবং ঘনীভূত তার আবেদন অনেক বেশি।" (ষড়বিংশ পরিচ্ছেদ) অবশ্য আরিস্টটল হোমার-এর উল্লেখ করে লিখেছেন—"..................হোমারের কাহিনীর গঠন এত নিখুঁত যে সমস্ত ক্রিয়ার (সমন্বয়ের ফলে) তাকে একটি ক্রিয়া বলে মনে হয়।" (তদেব) তবে যা কিছু সংহত, শিল্পের ক্ষেত্রে তারই আবেদন বেশি— আরিস্টটল-এর এই সিদ্ধান্তের সঙ্গে সকলে একমত হতে না-ও পারেন।

আরিস্টটল শিল্পের ক্ষেত্রে বাস্তবতার অনুসারী ছিলেন। অলৌকিকত্বকে তিনি পরিহার করে চলাই পছন্দ করতেন। কিন্তু মহাকাব্যে অলৌকিক ঘটনার বিবরণ বহুল পরিমাণে থাকে। ট্র্যাজেডিকে বাস্তবতার অনুসারী-শিল্প রূপে গণ্য করেছেন বলে আরিস্টটল ট্র্যাজেডিকেই মহাকাব্যের তুলনায় উন্নততর শিল্প বলেছেন।

আমরা কিন্তু আরিস্টটল-এর এই সিদ্ধান্তের সঙ্গে একমত হতে পারি না। কাব্যশিল্পের অনুরাগী কেউ-ই বলতে পারবেন না যে হোমার-এর কাব্য ইস্কাইলাস, সোফোক্লিস, ইউরিপিডিস-এর ট্র্যাজেডির তুলনায় নিকৃষ্ট। ট্র্যাজেডিকে অত্যন্ত পছন্দ করতেন বলে এই বিষয়ে আরিস্টটল প্রথম থেকেই এক ভ্রান্তির সম্মুখীন হয়েছেন। তিনি মনে রাখেননি যে, শিল্পের বিভিন্ন সংরূপের মধ্যে শ্রেষ্ঠত্বের কোনো বিচার করা নিষ্প্রয়োজন। প্রতিটি সংরূপ তার নিজস্ব ক্ষেত্রে অনন্য। মন্ময় কবিতায় কাহিনি-ক্রিয়া-চরিত্র-দৃশ্য-সংগীত কিছুই থাকে না। কেবল থাকে বাচন এবং অভিপ্রায়। কিন্তু সে-জন্য মন্ময় কবিতা ট্র্যাজেডি বা মহাকাব্যের চেয়ে নিকৃষ্ট— একথাও বলা যায় না। প্রত্যেকটি শিল্প-সংরূপের ভালো-মন্দের বিচার হওয়া উচিত তার নিজস্ব শ্রেণিগত ক্ষেত্রে। মহাকাব্যের সঙ্গে ট্র্যাজেডির তুলনার ক্ষেত্রে একটি অপরটির চেয়ে ভালো— এজাতীয় কোনো বিচারের প্রয়োজনই নেই। উভয়েই নিজস্ব ক্ষেত্রে স্বরাট। প্রতিটি শিল্প সংরূপের স্বধর্ম আলাদা। মহাকাব্যের যে চারটি লক্ষণ আছে সেই চারটিরই তার ক্ষেত্রে প্রয়োজন। সেখানে আরও দুটি লক্ষণ ঢোকাতে গেলে। তা হবে বাহুল্য এবং ক্ষতিকারক। কাজেই ট্র্যাজেডি এবং মহাকাব্যের শ্রেষ্ঠত্বের এই তুলনাই আমাদের কাছে বাহুল্য মনে হয়।

আরিস্টটল-এর মতো মনীষা-সম্পন্ন ব্যক্তির এই ভ্রান্তির কারণ হল তাঁর সমকালে ট্র্যাজেডি ছিল জনপ্রিয়তার শীর্ষে। ট্র্যাজেডি মহাকাব্যের তুলনায় নবীনতর শিল্প-সংরূপ। সেই কারণে সম্ভবত সমকালের রক্ষণশীল কোনো কোনো শিল্প-সমালোচক ট্র্যাজেডির জনপ্রিয়তাকে কটাক্ষ করতেন আরিস্টটল ছিলেন ট্র্যাজেডির গভীর অনুরাগী। তিনি তাঁর প্রিয় শিল্প-সংরূপটির পক্ষে দাঁড়াবার দায়িত্ব অনুভব করেছিলেন। সে-কারণেই তিনি প্রবৃত্ত হয়েছিলেন এই তুলনাত্মক শ্রেষ্ঠত্বের বিচারে।

পরিশেষে আমরা আবারও বলি যে, এই তুলনা সম্পূর্ণ নিষ্প্রয়োজন। মহাকাব্য এবং ট্র্যাজেডি— নিজ নিজ ক্ষেত্রে উভয়েই স্বরাট। তবে এই তুলনা করতে গিয়ে আরিস্টটল

ট্র্যাজেডির পাশাপাশি মহাকাব্যের লক্ষণগুলিকেও স্পষ্ট করে দিয়েছেন। তার ফলে মহাকাব্য সম্পর্কেও আমাদের ধারণা স্পষ্ট হয়েছে।

আরিস্টটল-এর কমেডি-ভাবনা

প্রাচীন গ্রিক নাটক প্রথম থেকেই ছিল দুই গোত্রের— ট্র্যাজেডি এবং কমেডি। ট্র্যাজেডির বৈশিষ্ট্য মানবজীবনের বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ ক্রিয়াসমূহের বা সিরিয়াস অ্যাকশন-এর অনুকরণ। ট্র্যাজেডিতে মানুষের উন্নত ও মহৎ চরিত্র প্রকাশ পায়। ভাগ্য-বিড়ম্বনায় বা সুগভীর নৈতিক প্রণোদনায় মহান মানুষের শোকাবহ পতন রূপায়িত হয়। দর্শক ও পাঠকের চিত্তে জাগে করুণা এবং ভয়। কিন্তু কমেডি হল ব্যঙ্গাত্মক রচনা। সেখানে সমাজের এবং ব্যক্তির দোষ-ত্রুটি, স্খলন, নির্বুদ্ধিতা, অসৌন্দর্য ইত্যাদি নিয়ে কখনও আক্রমণাত্মক বিদ্রুপ, কখনও অবজ্ঞাসূচক হাস্য-পরিহাস প্রধান হয়ে ওঠে।

আরিস্টটল তাঁর *কাব্যতত্ত্ব* গ্রন্থে ট্র্যাজেডির পাশাপাশি কমেডি সম্পর্কেও তাঁর বক্তব্য উপস্থিত করেছেন। যদিও ট্র্যাজেডির তুলনায় তাঁর কমেডি সম্পর্কিত আলোচনা সংক্ষিপ্ত। কমেডির উদ্ভব নিয়ে তিনি *কাব্যতত্ত্ব*-এর চতুর্থ অধ্যায়ে তাঁর অভিমত ব্যক্ত করেছেন। প্রথমে তিনি কমেডির উদ্ভবের কারণ নির্দেশ করেছেন। তারপরে তিনি কমেডির উদ্ভবের প্রক্রিয়া নির্দেশ করেছেন।

কারণ হিসেবে তিনি বলেছেন যে, মানুষের স্বাভাবিক প্রবৃত্তিবশে অনুভূতি, ভাষা এবং সৌন্দর্যবোধ ও ছন্দবোধের সমন্বয়ে প্রাচীন কালেই কাব্যের সৃষ্টি হয়েছে। কবিদের স্বভাব অনুসারে কাব্যের শ্রেণি দু-রকম। এরপরে তাঁর মন্তব্য হল—"যাঁরা গভীর প্রকৃতির তাঁরা প্রকাশ করেন মহৎ বা উন্নত ক্রিয়া এবং প্রকাশ করেন উন্নত বা মহৎ চরিত্র; আর যাঁরা লঘু প্রকৃতির তাঁরা প্রকাশ করেন লঘু চরিত্রের লঘু কার্যকলাপ। দ্বিতীয় শ্রেণীর কবিদের হাতে সৃষ্টি হয়েছে ব্যঙ্গাত্মক রচনা, আর প্রথম শ্রেণীর কবিদের হাতে সৃষ্টি হয়েছে প্রার্থনা এবং স্তোত্র।"

[অনুবাদ শিশিরকুমার দাশ, চতুর্থ পরিচ্ছেদ]

আমরা কিন্তু আরিস্টটল-এর এই অভিমতের সঙ্গে সম্পূর্ণ একমত হতে পারি না। ট্র্যাজেডি এবং কমেডি রচনার জন্য কবিদের বিভিন্ন স্বভাববিশিষ্ট হতে হবে— এই সিদ্ধান্ত কিছুটা অস্বাভাবিক। একই কবির পক্ষে ট্র্যাজেডি এবং কমেডি দুই-ই রচনা করা মোটেই অস্বাভাবিক নয়। বিশ্বসাহিত্যে এমন ঘটনা প্রচুর আছে। কাব্যসৃষ্টির বিষয়বস্তু এবং সেই বিষয়বস্তুকে কী ভাবে উপস্থাপিত করবেন সে-সম্পর্কে কবির অভিপ্রায় অনুসারেই কাব্যের প্রকৃতি স্থিরীকৃত হয়। সে কারণেই কবি বা নাটককার যদি জীবনের গভীর, গম্ভীর, সমুন্নত ও মহান পরিচয় তুলে ধরতে চান তাহলে তিনি গভীর রসের কাব্য রচনা করবেন; যদি কবি লঘু কৌতুকময় ভঙ্গিতে কোনো বিষয়কে উপস্থিত করতে চান বা ব্যঙ্গ-বিদ্রুপের দ্বারা কোনো কিছুকে বিদ্ধ করতে চান তাহলে তিনি সরস ব্যঙ্গাত্মক কাব্য সৃষ্টি করবেন। এজন্যই শেক্সপিয়র যেমন *ম্যাকবেথ* আর *হ্যামলেট লেখেন*, তেমনই লেখেন *কমেডি অফ এররস*। যেমন রবীন্দ্রনাথ 'বসুন্ধরা', 'পৃথিবী', 'ভারততীর্থ', 'বলাকা' ইত্যাদি কবিতার মতোই রচনা করেন 'জুতা আবিষ্কার' এবং 'হিংটিং ছট'-এর মতো কবিতা।

আরিস্টটল-এর কালে কবিমানসের বিভিন্ন প্রবণতা বিষয়ে চিন্তা-ভাবনা হয়তো বা ততটা স্পষ্ট হয়নি। আরিস্টটল-এর অভিমতটি আমরা এখানে উল্লেখ করলাম। প্রথমে আরিস্টটল কাব্যের কথা বলেছেন, তারপরে বলেছেন— যখন পরবর্তী কালে নাটকের উদ্ভব ঘটল তখন

ওই দুই ধারায় সৃষ্ট হল ট্র্যাজেডি এবং কমেডি। আরিস্টটল-এর ভাষায়—"যখন ট্র্যাজেডি ও কমেডির সৃষ্টি হল, কবিরা তাঁদের স্বাভাবিক প্রবণতাবশত এককেটির প্রতি আকৃষ্ট হলেন। কেউ কেউ নিছক আক্রমণাত্মক রঙ্গব্যঙ্গ রচনার পরিবর্তে লিখলেন কমেডি, আর কেউ কেউ মহাকাব্যের পরিবর্তে ট্রাজেডি।" [চতুর্থ পরিচ্ছেদ]।

অতঃপর আরিস্টটল ট্রাজেডির উদ্ভবের মতোই কমেডির উদ্ভব সম্পর্কে কিছু আলোচনা করেছেন। প্রথমেই তিনি বলেছেন—"মূল কথাটা হল ট্র্যাজেডি এবং সেই সঙ্গে কমেডিরও সূচনা হয়েছিল পরিকল্পনাহীন ভাবেই।" [চতুর্থ পরিচ্ছেদ]

পরিকল্পনাহীন বলতে তিনি বোঝাতে চেয়েছেন—কমেডির রীতিপদ্ধতি চিন্তা করে নিয়ে কেউ কমেডি লিখতে বসেনি। যেমন উৎসবকালে উর্বরতার দেবতার মন্দিরে সম্মেলক নৃত্যগীতময় শোভাযাত্রা থেকে ট্রাজেডির উদ্ভব ঘটেছে, তেমনই রঙ্গরসময়, কিছুটা শ্লীলতাবর্জিত, উদ্দাম হাস্যপরিহাসমুখর শোভাযাত্রা থেকে কমেডির উদ্ভব ঘটেছে। আরিস্টটল বলেছেন—ট্র্যাজেডির উদ্ভব দিথুরাম্ব-গীতির নান্দীমুখ থেকে এবং কমেডির উদ্ভব ফাল্লিক গীতির নান্দীমুখ থেকে। লোকায়ত উৎসবগুলিতে গ্রামের মানুষ যখন অংশগ্রহণ করেন, তখন উৎসবের আমেজে সাময়িকভাবে সামাজিক অনুশাসনবিহীন এই ধরনের উদ্দাম রঙ্গব্যঙ্গ পৃথিবীর সব দেশেই দেখতে পাওয়া যায়। পাশ্চাত্য সাহিত্যে এই বিষয়টির উপর ভিত্তি করেই উৎসবায়িত সাহিত্যতত্ত্ব এবং কার্নিভ্যাল লিটারেচার-এর বহুমুখীনতা প্রতিষ্ঠিত হয়েছে। ভারতে গাজনের সং এবং হোলি উৎসবের মিছিলে এই ধরনের রঙ্গব্যঙ্গের উদ্দাম অভিব্যক্তি দেখা যায়। এই ব্যঙ্গবিদ্রুপ সমাজের নিম্নবর্গীয় মানুষের পক্ষ থেকে নিক্ষিপ্ত হয় উচ্চতর বর্গের প্রতি। গ্রিস-এর শীতকালীন উৎসবে, যেহেতু উর্বরতার দেবতাকে ঘিরে উৎসব, তাই শোভাযাত্রাকারীরা একটি বিশাল লিঙ্গ নির্মাণ করে তা উৎসব প্রাঙ্গণে বহন করে নিয়ে যেত এবং যাবার পথে যে রঙ্গ-ব্যঙ্গ পরিহাসমূলক নাচ-গান এবং অভিনয় প্রদর্শন করত সেখান থেকেই কমেডির উৎপত্তি। এই শোভাযাত্রাকে বলা হত 'কোমাস'(Comus) যার থেকে কমেডি শব্দটি এসেছে বলে অনেকে মনে করেন।

ট্র্যাজেডির উদ্ভব যেমন 'সাতুর' নাটক থেকে হয়েছে বলে আরিস্টটল বলেছেন, কমেডির উদ্ভবের মূলেও 'সাতুর' নাটক ছিল। ডয়োনিসাস দেবতার সঙ্গী হিসেবে পুরাণে কাল্পনিক প্রাণী 'সাতুর'-এর বর্ণনা পাওয়া যায়। তাদের দেহ ঘোড়া বা ছাগল এবং মানুষের সংযোগে গঠিত। স্বভাবে তারা ভীরু, কামুক, প্রাণোচ্ছল এবং আমুদে। তারা সুরাসক্ত। এই সাতুরদের মতো পোশাক পরে যে আমোদমূলক নৃত্যগীত করা হত সেখানেও কমেডির পূর্বাভাস পাওয়া যায়। সাতুর-নাটক রচিত হয়েছিল অনেক কিন্তু 'সাইক্লপ্স্' (Cyclops) নামক ইউরিপিডিস রচিত একটি সাতুর-নাটক ছাড়া আর সবই লুপ্ত হয়ে গেছে।

আরিস্টটল প্রথম কমেডির আলোচনা করেছেন কিন্তু লোকনাট্য হিসেবে কমেডির উদ্ভব ঘটেছিল অনেকদিন আগেই। স্বভাবতই তা খুবই জনপ্রিয় ছিল। গ্রিস-এর রাষ্ট্রীয় নাট্য-উৎসবে ক্রমশ কমেডি স্বীকৃত হয়ে যায়। খ্রিস্টপূর্ব ৪৮৬ অব্দে নাট্য-উৎসবে কমেডি নাটকের প্রতিযোগিতা হয়েছিল বলে জানা যায়। গ্রিস-এর বিখ্যাত কমেডি রচয়িতা আরিস্টোফানিস (খ্রিস্টপূর্ব ৪৪৮-৩৮০) অনেক কমেডি রচনা করেছিলেন। তাঁর এগারোটি কমেডি পাওয়া গেছে। কিন্তু তাঁর আগেও কমেডির প্রতিযোগিতা হত এবং ক্রানিতাস নামে এক পুরস্কারবিজয়ীর উল্লেখ পাওয়া যায়।

কমেডির উদ্ভাবক কারা এবং কোথায় কমেডির উদ্ভব, তা নিয়ে খুব নির্দিষ্ট কোনো সিদ্ধান্তে উপনীত হওয়া যায়নি। এই বিষয়ে আরিস্টটল তৃতীয় পরিচ্ছেদে কয়েকটি সংক্ষিপ্ত বাক্য লিখেছেন। তা থেকে জানা যায় :

(ক) " দোরিয়ানরা ট্রাজেডি এবং কমেডি দুয়েরই উদ্ভাবনের (কৃতিত্ব) দাবি করে।" এই বাক্য থেকে কেবল এটুকুই বোঝা যায় যে একটি বিশেষ জনগোষ্ঠীতে কমেডি সৃষ্ট হয়েছিল বলে কেউ কেউ মনে করেছেন কিন্তু লোকায়ত নাট্যরীতি থেকে যার উদ্ভব তা কোনো একটি অঞ্চলে সীমাবদ্ধ থাকার সম্ভাবনা কম।

(খ) "কমেডির ওপরে অবশ্য গ্রীসে মেগারীয়দের দাবি আছে : তারা বলে যে তারাই এদের উদ্ভাবক, গ্রীসে তাদের গণতন্ত্রের সময়েই এর জন্ম—" আরিস্টটল মেগারা প্রদেশের অধিবাসী মেগারীয়দের কথা এখানে বলেছেন। কিন্তু তিনি মেগারীয়দের দাবি সমর্থন করেছেন এমন নয়। দোরীয় এবং মেগারীয়—এই দুই জনগোষ্ঠীর দাবি সম্পর্কে বলতে গিয়ে আরিস্টটল— তারা দাবি করে, তারা বলে— এজাতীয় উক্তি ব্যবহার করেছেন বলে মনে হয় যে তিনি এই দাবির পুরোপুরি সমর্থক ছিলেন না।

(গ) কমেডি প্রসঙ্গে আরিস্টটল সিসিলি-র কথাও বলেছেন—"সিসিলি থেকে কবি এপিকারমুস এসেছিলেন তিনি থিওনিদেস এবং মাগ্‌নেসের-ও আগের লোক।" এই বাক্যটি সম্পর্কে শিশিরকুমার দাশ যে টীকা দিয়েছেন তা উদ্ধৃত হল— "এপিকারমুস সিসিলির লোক। প্রাত্যহিক জীবনের কথা নিয়ে কিছু লঘু রচনা লিখেছিলেন। থিওনিদেস এবং মাগ্‌নেস প্রাচীন কালের কমেডি রচয়িতা। সম্ভবত খ্রীস্টপূর্ব পঞ্চম শতাব্দীর লোক। প্লেটো কমেডি রচয়িতা হিসেবে এপিকারমুসকে উচ্চস্থান দিয়েছেন।" [আরিস্টটল *কাব্যতত্ত্ব*, ভূমিকা অনুবাদ টীকা শিশিরকুমার দাশ, প্যাপিরাস সংস্করণ ১৯৮৬, পৃ. ৭]

এ-বিষয়ে আরিস্টটল পঞ্চম পরিচ্ছেদে লিখেছেন—"কমেডির কাহিনী নির্মাণের সূচনা হয়েছিল সিসিলিতে, এপিখারমস ও ফোরমিসের হাতে, এথেন্সে সর্বপ্রথম ক্রাতেস আক্রমণাত্মক লঘু রচনা পরিত্যাগ করে শুরু করেছিলেন হাস্যরসাত্মক কাহিনী ও কথোপকথন রচনা।"

(ঘ) আরিস্টল পুনশ্চ বলেছেন— "কমেডির ওপরেও পেলেপনেশীয়দেরও দাবি আছে। তাদের স্বপক্ষে যুক্তি হল দুটি শব্দ। তারা বলে, তাদের ভাষায় গ্রামের প্রান্তবর্তী অঞ্চলকে বলে 'কোমাই', আথেনীয়রা বলে দেমোই'......তাদের বক্তব্য হল যে কোমাজেইন..........'অর্থাৎ আনন্দে মাতোয়ারা হওয়া' শব্দ থেকে কমেডির লেখকদের নাম হয়নি, হয়েছে 'কোমাই' শব্দ থেকে কারণ তারা শহর থেকে বিতাড়িত হয়ে গ্রামের প্রান্তে ঘুরে বেড়াত।" [তৃতীয় পরিচ্ছেদ]

কমেডির উদ্ভব কোথায় এবং কাদের দ্বারা হয়েছিল— এই প্রশ্নের উত্তরে খুব নির্দিষ্ট এবং অ-সংশয় কোনো উত্তর আমরা পেলাম না। আরিস্টটলও এ-বিষয়ে কোনো গবেষণার প্রয়োজন অনুভব করেননি। তিনি কেবল প্রচলিত কিছু কিছু মত উদ্ধার করে দিয়েছেন। ভাষাশিল্প সংরূপ হিসেবে কমেডির মনোধর্ম বিশ্লেষণের দিকেই তিনি নজর দিয়েছেন। উদ্ভবের ইতিহাস সম্পর্কে তাঁর খুব বেশি আগ্রহ দেখা যায়নি।

কমেডির মনোধর্ম বিষয়ে এতক্ষণ আমরা যা আলোচনা করেছি, আরিস্টটল পঞ্চম পরিচ্ছেদের প্রথমেই সংক্ষিপ্ত ভাবে হলেও তা সুন্দরভাবেই ব্যাখ্যা করে দিয়েছেন—"কমেডি, আগেই বলেছি, নিম্নতর নরনারীর জীবনের অনুকরণ। নিম্নতর বলতে অবশ্য হীন বা খারাপ বোঝাচ্ছে না। কিন্তু হাস্যকর হল নিম্ন বা অসুন্দরের শ্রেণীভুক্ত। এ হল একধরনের ত্রুটি বা

অসুন্দরতা, তবে তা আমাদের বেদনা দেয় না, বা আহত করে না। একটি স্পষ্ট উদাহরণ হল মজাদার মুখোস, (নিঃসন্দেহে) অসুন্দর এবং বিকৃত, কিন্তু বেদনাদায়ক নয়।"

[প্রথম পরিচ্ছেদ]

আরিস্টটল-এর বক্তব্যের মধ্যেই আমরা দেখতে পাই পাচ্ছি যে, আরিস্টটল কমেডিতে যে নিম্নতর মানুষের অনুকরণের কথা বলেছেন তা হীনার্থক নয়, হাস্যকর এবং অসুন্দর। তিনি যে শব্দটি ব্যবহার করেছেন তাতে শারীরিক ত্রুটিও বোঝায়, কিন্তু তা খুব বেশি ক্ষতিকারক বা অন্যের কাছে কষ্টদায়ক নয়। তবে খুব স্পষ্টভাবে আরিস্টটল না বললেও আমরা গ্রিক কমেডিতে আরিস্টটল-এর সমকালের সামাজিক স্খলন ও দোষ ত্রুটিকে পরিহাস ও ব্যঙ্গ করা হয়েছে— এমন দৃষ্টান্ত দেখতে পাই। আরিস্তোফানেস রাষ্ট্রীয় নীতিকেও পরিহাসের ভঙ্গিতে আঘাত করতে চেয়েছেন। তাঁর কোনো কোনো নাটকে যুদ্ধনীতির বিরুদ্ধে বক্তব্য উপস্থাপিত হয়েছে।

কাব্যতত্ত্ব গ্রন্থে আরিস্টটল কমেডি সম্পর্কে যে-সব কথা বলেছেন তার বিশদ আলোচনা আমরা এতক্ষণ করলাম। কমেডি কিন্তু আরিস্টটল-এর সময়েই থেমে যায়নি। আরিস্টটল যখন কাব্যতত্ত্ব লিখেছেন এবং কোনো কোনো কমেডি-রচয়িতার নাম উল্লেখ করেছেন সেখানেই বলে দিয়েছেন যে কমেডি অনেক দিন আগে থেকেই প্রচলিত ছিল এবং তাঁর সময়কালে তা একটু নির্দিষ্ট রূপ পরিগ্রহ করেছে। আরিস্টটল-এর মতে "কিন্তু কমেডিকে লোকে খুব গুরুত্ব দেয়নি, সেজন্য তার বিবর্তনের ইতিহাস খুব স্পষ্ট নয়।" [পঞ্চম পরিচ্ছেদ]

কমেডিকে গুরুত্ব দেওয়া হয়নি এই ধারণা যথার্থ নয়। সমাজের দৃষ্টিকোণ থেকে কমেডির গুরুত্ব অনেক সময় ট্রাজেডির চেয়ে বেশি বলেই প্রতিভাত হয়। কারণ ট্র্যাজেডি ব্যক্তির দুর্ভাগ্যের কাহিনি, কিন্তু কমেডি সামগ্রিক ভাবেই সমাজচিত্রকে পরিস্ফুট করে। কমেডির বিবর্তন আরিস্টটল-পরিবর্তীকালে খুবই লক্ষণীয়ভাবে ঘটেছে। খ্রিস্টপূর্ব চতুর্থ অব্দে আরিস্টটল যে কমেডি দেখেছিলেন তাকে 'মধ্য কমেডি' বলা যেতে পারে। ক্রমেই সমকালীন সামাজিক ও রাজনৈতিক সমস্যার তুলনায় কেবলই রঙ্গরস, প্রহসন ভাঁড়ামি প্রধান হয়ে উঠতে লাগল কমেডিতে। তারপর সৃষ্ট হল নতুন কমেডি। এই নতুন কমেডিতে কৌতুকজনক ঘটনাসমূহ ট্র্যাজেডির মতোই পঞ্চসন্ধি সমন্বিত প্লটের সাহায্যে রূপায়িত হত। সেখানে নির্দিষ্ট কোনো ব্যক্তির প্রতি কোনো আক্রমণ থাকত না। এই জাতীয় কমেডির বিশিষ্ট রচয়িতা ছিলেন মিনান্দর। আরিস্টটল তাঁর নাটক দেখার সুযোগ পাননি।

আরিস্টটল-পরবর্তী কালে রেনেসাঁস-পর্বে ষোড়শ-সপ্তদশ শতকের ইউরোপ-এ কমেডির সর্বাধিক বিবর্তন ঘটেছিল। অন্তত তিন ধরনের কমেডির সন্ধান সেই সময়ে পাওয়া যায়। সমাজ ও ব্যক্তির স্খলন নিয়ে রচিত ব্যঙ্গ-বিদ্রুপবহুল আক্রমণাত্মক কমেডি— যা লিখেছিলেন বেন জনসন। দ্বিতীয়ত, কৌতুক-সরস ঘটনাপ্রধান মিলনাত্মক কমেডি— যেমন শেকসপিয়র-এর *কমেডি অব এররস্*। তৃতীয়ত। প্রধানত শেকস্পিয়র-এর কলমে রচিত বিষাদ-মধুর ট্র্যাজি-কমেডি বা সিরিও কমেডি। এজাতীয় নাটকে জীবনের দুঃখ-শোকের পরিচয় থাকে এবং গভীর জীবনোপলব্ধি উদ্ঘাটিত হয়। শেষ পর্যন্ত নাটক হয় মিলনান্তক। শেকসপিয়র-এর অ্যাজ ইউ *লাইক ইট, উইন্টার-স টেল* ইত্যাদি এজাতীয় কমেডির উদাহরণ। তারও পরে কমেডি অব ম্যানারস জাতীয় লঘু সামাজিক পরিহাসমূলক নাটক ইউরোপ-এ রচিত হয়েছে।

আরিস্টটল-এর *কাব্যতত্ত্ব* গ্রন্থে আমরা সর্বপ্রথম সামগ্রিকভাবে শিল্প সম্পর্কে এবং নির্দিষ্ট শিল্প সম্পর্কে পরিচ্ছন্ন জ্ঞান লাভ করেছি। তাঁর অনুকরণতত্ত্ব এবং প্লেটোর সঙ্গে তাঁর

াতানৈক্যের ফলেই শিল্পতত্ত্বের মূল কাঠামোটি নির্দিষ্ট হয়ে গিয়েছিল যা এখনও শিল্পতত্ত্ব ও ন্দনতত্ত্বের ভিত্তিভূমি।

ভাষাশিল্প সম্পর্কেও আরিস্টটল-এর এই গ্রন্থই আমাদের প্রাথমিক ধারণা দিয়েছে। াহাকাব্য, ট্র্যাজেডি, কমেডি, ইতিহাস, অভিনয়শিল্প ইত্যাদি সম্পর্কে শৃঙ্খলাবদ্ধ অনুভব-গভীর মালোচনার প্রথম প্রবক্তা রূপে আরিস্টটল স্মরণীয় হয়ে আছেন। তাঁর মনীষাদীপ্ত মন্তব্য এবং াস্তবধর্মী যুক্তিগ্রাহ্য সিদ্ধান্তের অনেক অংশই এখনও আমাদের কাছে গ্রহণযোগ্য।

আরিস্টটল-এর কাব্যতত্ত্ব গ্রন্থে ভাষাভাবনা

কাব্যতত্ত্ব ভাষা-সম্পর্কিত গ্রন্থ নয়। সে-কারণে ভাষা-সম্পর্কিত কোনো বিশ্লেষণী চিন্তা বা ়তন্ত্র কোনো আলোচনা এ-গ্রন্থে প্রত্যাশা করা যায় না। তা সত্ত্বেও আরিস্টটল *কাব্যতত্ত্ব* গ্রন্থে ভাষা নিয়ে যথেষ্ট আলোচনা করেছেন। তার কারণ নাটক তথা ট্র্যাজেডি নির্মাণের ক্ষেত্রে মাবশ্যিক উপাদানগুলির অন্যতম হল ভাষা যা ট্র্যাজেডির প্রধান ছয়টি অঙ্গের একটি।

উনবিংশ পরিচ্ছেদে প্রথম ট্র্যাজেডির রীতি ও অভিপ্রায় সম্পর্কে আলোচনা করতে গিয়ে মারিস্টটল ভাষার প্রসঙ্গটি উল্লেখ করেছেন। ট্র্যাজেডির বাচন এবং অভিপ্রায়— এই দুটি বিষয় ়য পরস্পর অবিচ্ছিন্ন তা আরিস্টটল-এর উক্তি থেকে বোঝা যায়। এ-বিষয়ে তাঁর প্রস্তাবনা ়ল—"ভাষার দ্বারা সৃষ্ট ও উৎপন্ন সমস্ত প্রতিবেদনই অভিপ্রায়ের অন্তর্গত— এর কিছু হল প্রমাণ, (যুক্তিও) যুক্তি খণ্ডন, করুণা ভয় ক্রোধ ইত্যাদি অনুভূতির জাগরণ, বক্তব্যের মতিরঞ্জন বা লঘুকরণ। একথা স্পষ্ট যে নাটকের ক্রিয়াতে যখন করুণা ভয় বা অতিরঞ্জনের ভাব সৃষ্টি করতে হবে, তখন (ভাষণ-কলাশাস্ত্রের) নিয়মানুসারেই তা সম্পন্ন করতে হবে। পার্থক্য শুধু এই যে, অভিনয় ব্যবস্থা ছাড়াই অভিপ্রায় স্পষ্ট হয়, আর ভাষণের সময় বক্তাকে ভাষার সাহায্যে সেই স্পষ্টতা অর্জন করতে হয়।" (উনবিংশ পরিচ্ছেদ, অনুবাদ শিশিরকুমার াশ) এখানে দেখা যাচ্ছে আরিস্টটল বলেছেন যে, যেহেতু ট্র্যাজেডির অভিপ্রায় ব্যক্ত করতে গেলে ভাষার সাহায্যেই তা করতে হবে সেজন্য ভাষা স্পষ্ট হওয়া প্রয়োজন।

অতঃপর তিনি ভাষা ব্যবহারে যে-সব বৈচিত্র্য সৃষ্টি করেন লেখকেরা সেই দিকটি মালোচনার প্রয়োজনীয়তার কথা বলেছেন।

এটুকু বলেই আরিস্টটল চলে এসেছেন বিংশ পরিচ্ছেদে, যেখানে আমরা দেখি তাঁর মালোচনা একান্তই ব্যাকরণের ধ্বনিতত্ত্ব এবং রূপতত্ত্বের আলোচনায় পর্যবসিত হয়েছে। তিনি মবশ্য এই পরিচ্ছেদের শিরোনাম দিয়েছেন 'ভাষা বিচারের প্রাথমিক সূত্র'। আমরা খুব সংক্ষেপে এই পরিচ্ছেদে আরিস্টটল-এর বক্তব্য লিপিবদ্ধ করছি।

(ক) প্রথমে তিনি ভাষারীতির অঙ্গ হিসেবে কয়েকটি ভাষা-বস্তুর উল্লেখ করেছেন। সেগুলি ়ল— বর্ণ-দল, সংযোজক, আর্‌থ্রোন, বিশেষ্য, ক্রিয়া, কারক এবং পদগুচ্ছ। শিশিরকুমার দাশ তাঁর টীকায় জানিয়েছেন— সংযোজক বলতে সংযোজক অব্যয় এবং অনুসর্গ দুটিই বোঝায়। মার্‌থ্রোন শব্দের অর্থ নির্দিষ্টতাবাচক অব্যয় যাকে ইংরেজিতে কেউ কেউ 'আর্টিকল' শব্দে মনুবাদ করেছেন। পদগুচ্ছ বলতে বাক্য বা বাক্যাংশ বোঝানো হয়েছে। অন্য শব্দগুলির অর্থ বর্তমান অর্থের সঙ্গে অভিন্ন।

(খ) আরিস্টটল-এর মতে বর্ণ হল অবিভাজ্য ধ্বনি। কিন্তু সব ধ্বনিকেই বর্ণ বলা যাবে না। যে ধ্বনিগুলি মিশে গিয়ে একটি সম্পূর্ণ অর্থময় ধ্বনি তৈরি করে সে-গুলিই বর্ণ। মনে ়য় আরিস্টটল একটি শব্দের অন্তর্গত অবিভাজ্য ধ্বনিগুলিকে বর্ণ বলেছেন।

(গ) আরিস্টটল ধ্বনিকে তিন শ্রেণিতে ভাগ করেছেন। স্বর— যার সঙ্গে অন্য কিছু যুক্ত না হলেও তাকে উচ্চারণ করা যায়; অর্ধস্বর—যার সঙ্গে একটি বর্ণ যোগ করে উচ্চারণ করতে হয়, এবং ব্যঞ্জন যা নিজস্ব ধ্বনিযুক্ত বর্ণ যুক্ত হলে তখনই উচ্চারিত হয়। এই সব উচ্চারণ অবশ্যই গ্রিক ভাষার ধর্ম অনুযায়ী ছিল।

(ঘ) আরিস্টটল-এর কথায়—"দল হল অর্থহীন ধ্বনি, একটি ব্যঞ্জন এবং একটি ধ্বনি বিশিষ্ট বর্ণের সমষ্টি।

(ঙ) সংযোজক হল অর্থহীন ধ্বনি যা এককভাবে ব্যবহৃত হলে ভাষা গঠনে কোনো সাহায্যে করে না বা বাধাও সৃষ্টি করে না। কিন্তু কোনো কোনো সময় এই ধ্বনিগুলি অর্থময় ধ্বনি এবং পদগুচ্ছ গঠনে যুক্ত হয়ে সহায়ক হতে পারে।

(চ) আরিস্টটল-এর মতে —"'আরথ্রোন' হল সেই অর্থহীন ধ্বনি যারা একটি বাক্যের আদি, অন্ত অথবা বিভিন্ন অংশগুলিকে চিহ্নিত করে। এদের স্বাভাবিক অবস্থান হল পদগুচ্ছের আদি, মধ্য এবং অন্তে।" [বিংশ পরিচ্ছেদ, অনুবাদ শিশিরকুমার দাশ]

(ছ) বিশেষ্যকে আরিস্টটল বলেছেন 'অর্থহীন ধ্বনির অর্থময় সম্মিলিত রূপ' যার মধ্যে 'কালের কোনো নির্দেশ' থাকে না। কোনো বস্তু বা বিষয়ের নামকেই তিনি বুঝিয়েছেন।

(জ) ক্রিয়াকে আরিস্টটল কালবাচক ধ্বনি সমাহার বলেছেন— যা অতীত ও বর্তমান কালের পরিচয় দেয়। সংজ্ঞাটিতে ক্রিয়ার অর্থ ঠিক পরিস্ফুট না হলেও আরিস্টটল যখন উদাহরণ দিয়েছেন তখন ক্রিয়ার স্বরূপ বোঝা যায়।

(ঝ) কারককে তিনি বলেছেন ক্রিয়ার বিভক্তিযুক্ত রূপ।

(ঞ) পদগুচ্ছকে আরিস্টটল বলেছেন 'ধ্বনির অর্থময় সমাহার'। অতঃপর তিনি পদগুচ্ছ বা বাক্যের গঠন সম্পর্কে কয়েকটি কথা বলেছেন।

আরিস্টটল একবিংশ পরিচ্ছেদে 'কবিভাষা' শিরোনামে যে আলোচনা করেছেন তাকেই বলা যায় ট্র্যাজেডি তথা সাহিত্যের ভাষার আলোচনা। প্রথমেই তিনি বলেছেন— বিশেষ্য দু-রকমের সরল এবং যুক্ত। সরল বিশেষ্য হল সাধারণ নাম শব্দ; যুক্ত বিশেষ্য হল— যখন একটি বিশেষ্য পদের দুটি অংশ থাকে এবং দুটি অংশ যুক্ত হয়ে একটি নতুন অর্থযুক্ত বিশেষ্য তৈরি হয়— অনেকটা ভারতীয় ব্যাকরণের সমাসবদ্ধ পদের মতো। দুই বা ততোধিক নামশব্দের সমযোগে যুক্ত বিশেষ্য নির্মিত হয়।

আরিস্টটল-এর মতে যুক্ত বিশেষ্য বিভিন্ন ধরনের হতে পারে—পরিচিত, অপরিচিত, রূপক অথবা অলংকৃত অথবা সৃষ্ট, দীর্ঘীকৃত, সংক্ষেপিত, পরিবর্তিত। সবগুলির সম্পূর্ণ ব্যাখ্যা তিনি দেননি। পরিচিত শব্দ বলতে সর্বজনবোধ্য সাধারণ কথ্য শব্দ বুঝিয়েছেন তিনি। অপরিচিত শব্দ অর্থে বুঝিয়েছেন ততটা প্রচলিত নয় এমন শব্দ। সতর্কভাবে তিনি মনে করিয়ে দিয়েছেন যে, একই শব্দ কারও কারও কাছে পরিচিত এবং কারও কারও কাছে অপরিচিত হতে পারে।

আরিস্টটল-এর আলোচনা আমাদের মূল্যবান মনে হয় যখন তিনি রূপক শব্দ ব্যাখ্যা করেন। আমরা ভারতীয়রা যাকে শব্দের 'লক্ষণা' শক্তি, ব্যঞ্জনাগুণ বলে থাকি তারই পূর্বাভাস আরিস্টটল-এর আলাচনায় পাওয়া যায়।

আরিস্টটল বলেছেন রূপক শব্দ বলতে একটি শ্রেণি বোঝাতে পারে, কোনো উপশ্রেণি বোঝাতে পারে এবং সাদৃশ্যও বোঝাতে পারে । রূপক শব্দে এক শ্রেণি থেকে অন্য শ্রেণিতে শব্দের অর্থান্তরও বোঝাতে পারে। তাঁর প্রদত্ত উদাহরণগুলি অত্যন্ত সুবোধ্য। তিনি

দেখিয়েছেন 'জাহাজ দাঁড়িয়ে আছে' এই বাক্যে দাঁড়িয়ে থাকার অর্থ নোঙর ফেলে রাখা। আবার অধিকাংশ ক্ষেত্রেই 'হাজার হাজার শব্দে অনেক বোঝায়। এখানে সহজেই রূপক শব্দ এক শ্রেণি থেকে অন্য শ্রেণিতে গতিশীল।

আমরা যাকে সাদৃশ্যবাচক উপমা বলি রূপক শব্দ বলতে আরিস্টটল অনেক ক্ষেত্রে তা-ও বুঝিয়েছেন। উদাহরণ হিসেবে 'দিনের বার্ধক্য', 'জীবনসন্ধ্যা', 'জীবনের সূর্যাস্ত', 'সূর্যের আলো ছড়ানো' ইত্যাদি শব্দ প্রয়োগের উল্লেখ করেছেন। তিনি দেখিয়েছেন যে, এজাতীয় প্রয়োগে একটির পরিবর্তে আর একটি শব্দ ব্যবহার করা যেতে পারে। পরবর্তী পরিচ্ছেদে তিনি কাব্যভাষা এবং রূপক শব্দ প্রয়োগের ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধের উল্লেখ করেছেন।

দীর্ঘীকৃত শব্দ বলতে তিনি বুঝিয়েছেন যেখানে শব্দের হ্রস্ব স্বরধ্বনিকে দীর্ঘ করা হয় অথবা অতিরিক্ত একটি ধ্বনি বা দল শব্দের মধ্যে ঢুকিয়ে দেওয়া হয়। হ্রস্ব শব্দ হল— কিছু অংশ বাদ দিয়ে গঠিত শব্দ। যাকে আমরা শব্দের সংকোচন বলে থাকি। পরিবর্তিত শব্দ হল যখন শব্দের একটি অংশ অপরিবর্তিত এবং আর একটি অংশ পরিবর্তিত হয়।

অতঃপর তিনি এই পরিচ্ছেদে বিশেষ্য শব্দের পুংলিঙ্গ এবং স্ত্রীলিঙ্গ কীভাবে স্থিরীকৃত এবং নির্মিত হবে তার আলোচনা করেছেন। বলা বাহুল্য এগুলি গ্রিক ভাষার ধর্ম অনুসারে আলোচিত।

দ্বাবিংশ পরিচ্ছেদে আরিস্টটল বিশেষ করে সাহিত্যের ভাষা সম্পর্কেই আলোচনা করেছেন।

(ক) প্রথমেই তিনি বলেছেন, যে-কোনো রচনার প্রধান গুণ হল স্পষ্টতা।

(খ) আরিস্টটল সতর্ক করে দিয়েছেন যে, স্পষ্টতার অর্থ বিশিষ্টতা-হীনতা নয়। সাধারণত পরিচিত শব্দের ব্যবহারেই স্পষ্ট রীতি গড়ে ওঠে। কিন্তু অত্যন্ত পরিচিত শব্দ মানেই বিশিষ্টতা-হীন শব্দ। কাজেই একদিকে আরিস্টটল রচনারীতির স্পষ্টতা চাইছেন, অন্য দিকে সর্বদাই অত্যন্ত পরিচিত কথ্য শব্দের দ্বারা গড়ে ওঠা রচনারীতি চাইছেন না। তাঁর মতে, তেমন হলে রচনারীতি বিশিষ্টতাহীন হয়ে পড়বে।

(গ) আরিস্টটল স্পষ্টই বলেছেন—"নিতান্তই প্রাত্যহিক শব্দ যেগুলি নয়, যেগুলি কিছুটা অপরিচিত, সেই শব্দগুলি রচনায় আনে আভিজাত্য।" দেখা যাচ্ছে, আরিস্টটল সাহিত্যের রচনারীতিতে 'আভিজাত্য' কাম্য বলে মনে করেছেন। আমরা প্রাচীন গ্রিক ট্র্যাজেডির ভাষা অনুসরণ করলেই বুঝতে পারি এই আভিজাত্য বলতে তিনি কী বুঝিয়েছেন।

(ঘ) এরপর আরিস্টটল অপরিচিত শব্দ বলতে যা বুঝিয়েছেন তা ব্যাখ্যা করেছেন এইভাবে—

"অ-পরিচিত শব্দ বলতে বোঝাচ্ছি স্বল্প ব্যবহৃত শব্দ, রূপক, দীর্ঘীকৃত শব্দ ও পরিচিত শব্দের অতিরিক্ত শব্দ।" কাজেই স্পষ্টতা কাঙ্ক্ষিত হলেও আরিস্টটল মঝে মাঝে কিছু স্বল্প ব্যবহৃত শব্দ, কিছু সৌন্দর্যব্যঞ্জক শব্দের সংযোজন (অতিরিক্ত শব্দ), সমাসবদ্ধ ও কাব্যময় (দীর্ঘীকৃত) শব্দ, রূপক অর্থাৎ উপমা-গুণ-সমন্বিত শব্দের সংযোজন সাহিত্যের রচনারীতির পক্ষে উপযোগী মনে করেছেন।

(ঙ) আবার সঙ্গে সঙ্গেই তিনি সতর্ক করে দিয়ে বলেছেন—"কিন্তু কোনো কবি যদি শুধু এই ধরনের শব্দই ব্যবহার করেন তার ফল হবে প্রহেলিকা কিংবা শব্দের আড়ম্বর।"

(চ) প্রহেলিকাকে কিন্তু আরিস্টটল সর্বদা বর্জনযোগ্য মনে করেননি। গ্রিক ট্র্যাজেডিতে আমরা মাঝে মাঝেই প্রহেলিকা জাতীয় ভাষাবন্ধনের সঙ্গে পরিচিত হই। এই প্রহেলিকাগুলি

নাটকের কাহিনিকে যথেষ্ট তাৎপর্য দেয়। *রাজা ইডিপাস* (সোফোক্লিস) এবং *মেদেয়া* (ইউরিপিডিস) নাটকে আমরা এগুলির দৃষ্টান্ত পেয়েছি। আরিস্টটল-এর মতে— "প্রহেলিকার বৈশিষ্ট্য হল শব্দের অদ্ভুত সমাহারের মধ্য দিয়ে একটা ব্যাপার বলা, শুধু শব্দসজ্জার মধ্য দিয়ে তা হয় না, তার জন্য চাই রূপকের ব্যবহার।

এতক্ষণে আমারা বুঝে নিতে পারি যে আরিস্টটল একই সঙ্গে সাহিত্যের রচনারীতির ক্ষেত্রে ভাষার স্বাচ্ছন্দ্য ও স্পষ্টতা চাইছেন; আবার অন্য দিকে চাইছেন ভাষার আভিজাত্য যা একান্ত প্রাত্যহিকতার সংযোগে অতি সাধারণত্বে পর্যবসিত হয়নি। একটি মিশ্রিত রচনারীতির কথাই তিনি স্পষ্টভাবে বলেছেন।

(ছ) "কাজেই চাই একটি মিশ্রিত রচনা রীতি। একদিকে অচলিত, রূপক, অলঙ্কৃত শব্দ ইত্যাদির ব্যবহারের ফলে রচনা প্রাত্যহিকতা এবং সাধারণত্বের ঊর্ধ্বে উঠতে পারবে, অন্যদিকে, প্রচলিত শব্দবলী দিতে পারবে স্পষ্টতা।" [দ্বাবিংশ পরিচ্ছেদ, অনুবাদ শিশিরকুমার দাশ]

(জ) সাহিত্যের ভাষার পক্ষে লেখকের সংযম ও নিয়ন্ত্রণ প্রয়োজন তা তিনি যথেষ্ট জোর দিয়েই বলেছেন। যে আরিস্টটল যে-কোনো কথারই ব্যাখ্যার ব্যাপারে অত্যন্ত কম শব্দ প্রয়োগ করেন তিনি সাহিত্যের ভাষার যাথার্থ্য সম্পর্কে কতটা সচেতন ছিলেন তা তাঁর এই বিষয়টির আলোচনায় বোঝা যায়। —"আর যে-কোনো রচনার পক্ষেই প্রয়োজন আতিশয্যহীনতা। একই ধরনের হাস্যকরতার সৃষ্টি হয় রূপক, অচলিত শব্দ ইত্যাদির ব্যবহারের চরম আতিশয্যের ফলে। কিন্তু শব্দের যথার্থ ব্যবহারের ফলে (কাব্য যে কী সার্থকতা লাভ করে) তা বুঝতে পারব যদি মহাকাব্যের মধ্যে বিশেষত্বহীন সাধারণ শব্দগুলি বসিয়ে দিই। যে-কোন একটি অচলিত শব্দ বা রূপক বা অন্য ধরনের শব্দ তার পরিবর্তে একটি পরিচিত সাধারণ শব্দ বসিয়ে দাও, তখনই আমাদের বক্তব্যের সত্যতা বোঝা যাবে।" [তদেব]

(ঝ) ভাষা নির্মাণের প্রত্যেকটি কৌশল যথার্থভাবে প্রয়োগ করতে হবে একথা আরিস্টটল বারবার বলেছেন। এই প্রসঙ্গে রূপক শব্দের দিকে তিনি বিশেষভাবে দৃষ্টি আকর্ষণ করেছেন— রূপকের ব্যবহার হল সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ। রূপক ব্যবহারে লাগে সহজাত প্রতিভা, কেউই কারো কাছে তা শিখতে পারে না। যর্থাথ রূপক ব্যবহারের জন্য চাই আবিষ্কারের চোখ।"(তদেব) আরিস্টটল-এর এই পর্যবেক্ষণ আমাদের খুবই বিস্মিত করে। কারণ রূপক শব্দ বলতে তিনি উপমাবাচক শব্দের কথাই বলেছেন। কাব্যভাষার ক্ষেত্রে উপমার গুরুত্ব কতটা তা— একান্ত আধুনিক কাল পর্যন্তই ভাষাশিল্পের ক্ষেত্রে একটি প্রাসঙ্গিক বিষয়। আজকের সাহিত্যের ভাষায় চিত্রকল্পের যে গুরুত্ব, আরিস্টটল আড়াই হাজার বছর আগে তা অনুধাবন করে বলেছিলেন— কবির 'সাদৃশ্য আবিষ্কারের চোখ,' অর্থাৎ জীবনানন্দের ভাষায় 'কল্পনা প্রতিভা'-র স্বাতন্ত্র্য থাকলে তবেই যথার্থ কবি আবির্ভূত হন এবং যথার্থ কাব্যভাষা গড়ে ওঠে।

পঞ্চবিংশ পরিচ্ছেদে আবার 'কাব্যের সমালোচনা' শিরোনামে সাহিত্যের ভাষা সম্পর্কে কিছু কিছু কথা বলেছেন আরিস্টটল। খুব নতুন কথা অবশ্য নয়। আমরা সূত্রাকারে সেগুলি উদ্ধৃত করছি। দু-একটি নতুন কথাও তিনি এখানে বলেছেন।

(ঞ) ".......... ভাষায় অপ্রচলিত শব্দ থাকতে পারে, রূপক থাকতে পারে, আবার না-ও থাকতে পারে।

(ট) "শব্দেরও নানা পরিবর্তনের স্বাধীনতা কবিতায় থাকে। (মনে রাখতে হবে) নির্ভুলতার মানদণ্ড কাব্যশিল্পে এবং সমাজব্যবহারে বা অন্যান্য শিল্পে আলাদা।" আরিস্টটল-এর এই

বাক্যটিকে আমরা অসামান্য জ্ঞান করি। সমাজব্যবহারে ভাষার বাচিক অর্থই প্রধান, অর্থাৎ বাচ্যার্থ। কিন্তু কাব্যশিল্পে ভাষার ব্যঞ্জনা-গুণই প্রধান। 'পদ্মের মতো মুখ' বাক্যটি বৈজ্ঞানিক বিচারের ভাষায় ভ্রান্ত। কিন্তু কাব্যভাষার উপমা-গুণের দিক থেকে নির্ভুল।

(ঠ) কখনও কখনও একটি শব্দের দ্বারা অন্য শব্দার্থ কাব্যভাষায় ব্যবহৃত হতে পারে। আরিস্টটল উদাহরণ দিয়েছেন— মদ ও জল দুটির ক্ষেত্রেই কখনও কখনও কেবল মদ শব্দ ব্যবহৃত হতে পারে।

(ড) আর একটি অসাধারণ মন্তব্য আমরা এই পরিচ্ছেদে পাই।—"যখন কোন শব্দের ব্যবহারের ফলে অর্থের বিরোধিতা দেখা যায়, তখন দেখতে হবে অংশটির কত রকম অর্থ হতে পারে।" হোমার-ব্যবহৃত—"ব্রোঞ্জের বর্শা সেখানে আটকে গেল" বাক্যে 'আটকে গেল' শব্দ দুটির প্রতিটি সম্ভাব্য অর্থ বিচার করে দেখতে হবে কোন অর্থটি গ্রহণ করা উচিত। অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ আরও একটি পর্যবেক্ষণ এই প্রসঙ্গেই তিনি করেছেন। ভাষায় যদি কোনো অসংগতি কেউ লক্ষ করেন তা হলে কিন্তু দেখতে হবে কবি কোন্ অর্থে শব্দটিকে ব্যবহার করতে চেয়েছেন।—"যে পদ্ধতিতে, বিরোধী পক্ষের যুক্তিতর্ক খণ্ডন করা হয় কবিভাষায় অসঙ্গতির অভিযোগ বিচার করতে হবে সেই পদ্ধতিতে, দেখতে হবে কবি কি একই শব্দ একই ক্ষেত্রে একই অর্থে প্রয়োগ করেছেন, দেখতে হবে তাঁর পূর্ব অভিপ্রেত অর্থের সঙ্গে তার কোথাও বিরোধিতা হচ্ছে কিনা।" [পঞ্চবিংশ পরিচ্ছেদ, অনুবাদ শিশিরকুমার দাশ]

এখানে দেখি আরিস্টটল সমালোচকদেরই সতর্ক করে দিচ্ছেন যাতে তাঁরা শব্দ প্রয়োগের সমালোচনা করবার আগে কবি কোন্ অর্থে শব্দটি ব্যবহার করেছেন তা বুঝে নেবার দিকে মনযোগী হন।

(ঢ) আরও একটি প্রয়োজনীয় কথা আরিস্টটল এই পঞ্চবিংশ পরিচ্ছেদে বলেছেন। শব্দের যে একাধিক অর্থ হতে পারে সে-বিষয়ে তিনি সচেতন ছিলেন। তার সমাধান-সূত্র হিসেবে তিনি লিখেছেন—"কখনও কখনও সমস্যার সমাধান হতে পারে স্বরভঙ্গির পার্থক্য/........ অন্যান্য সমস্যার সমাধান হতে পারে যতির ব্যবহারে।"...........আবার কখনও বা ভাষার প্রচলিত নিয়মের দ্বারা,.........." অর্থাৎ কাব্যভাষার সাফল্য ও শক্তি নিরূপণ করবার জন্য শ্রোতা এবং পাঠককেও তৎপর থাকতে হবে; শব্দের অর্থ ঠিক ঠিক বুঝতে হবে।

আরিস্টটল ভাষা সম্পর্কে আর একটি গ্রন্থ লিখেছিলেন যার নাম—*রেটোরিক* (RHETO-RIC)। ভাষা এবং ছন্দ নিয়ে রচিত এই গ্রন্থে অ্যারিস্টটল এই কথা বলেছেন যে, মানুষের মন যখন গভীর আবেগে আলোড়িত হয় তখন স্বাভাবিক মুখের ভাষাতেই তা ব্যক্ত হতে চায়। আবার সেই সঙ্গেই সেখানেও বলেছেন আবেগময় ভাষার অভিব্যক্তির জন্য উপরযোগী শব্দ হল সমাসবদ্ধ পদ, সুন্দর বিশেষণ এবং অপরিচিত শব্দ।

কাব্যভাষা সম্পর্কে আরিস্টটল-এর মন্তব্যগুলি একটু বিক্ষিপ্ত হলেও এই মন্তব্যগুলির সাহায্যে আমরা সাহিত্যের ভাষা সম্পর্কে তিনটি মৌলিক শিক্ষা কিন্তু সেই প্রাচীন যুগেই তাঁর লেখা থেকে গ্রহণ করতে পারি।

প্রথমত, ভাষার যাথার্থ্য, বিশেষ করে কাব্যভাষার সৌন্দর্য অনুধাবন করতে গেলে প্রতিটি শব্দের ঠিক ঠিক অর্থ শ্রোতা ও পাঠককে বুঝে নিতে হবে। দেখতে হবে কবির অভিপ্রেত অর্থটি কী ছিল। কবির দৃষ্টিভঙ্গি অনুধাবন করে তবেই ভাষার সঙ্গতি বিচার করতে হবে।

দ্বিতীয়ত, কোনো একটি নির্দিষ্ট ভাষা-প্রয়োগগত কৌশল সাহিত্যে যথার্থ রচনার রীতি হতে পারে না। কাব্য ভাষাকে যেমন স্পষ্ট হতে হবে; সেই সঙ্গে মাঝে মাঝে অতি পরিচিত

কথ্য শব্দের পরিবর্তে 'অপরিচিত' শব্দ, সুন্দর বিশেষণ, কাব্যময় বা দীর্ঘীকৃত শব্দ, রূপক শব্দ ইত্যাদির প্রয়োগে কাব্যভাষায় সঞ্চারিত করতে হবে আভিজাত্য। এর ফলেই কবির স্বাতন্ত্র্য ফুটে উঠবে। এই মিশ্রিত রচনারীতি-ই কাব্যের উপযোগী।

তৃতীয়ত, কাব্য সৃষ্টি সম্পর্কে যে আদি কথাটি আরিস্টটল ভাষা প্রসঙ্গের আলোচনায় রূপক ব্যবহার সম্পর্কে বলতে গিয়ে বলেছেন— তা-ই হল শিল্পসৃষ্টির শেষ কথা। তিনি বলেছেন— "কেউ কারো কাছে তা শিখতে পারে না।" (চতুর্বিংশ পরিচ্ছেদ) আরিস্টট্‌ল-এর এই উপলব্ধিকেই রবীন্দ্রনাথ নিজের ভাষায ব্যক্ত করেছেন—"যে পারে সে আপনি পারে/পারে সে ফুল ফোটাতে।"

ধ্রুপদিয়ানার দুই প্রবক্তা হোরেস ও লন্‌জাইনাস

শুভেন্দু দাশমুন্সী

হোরেস

১.

আরিস্টটল-পরবর্তী সাহিত্যচিন্তক ও কবি হোরেসের গুরুত্বপূর্ণ অথচ কৃশকায় কাব্যগ্রন্থ *আর্স পোয়েটিকা* বা *দ্য আর্ট অফ পোয়েট্রি*-র শুরুতে রয়েছে এক শিল্পীর কথা আর তার শেষে রয়েছে এক কবির কথা। এই শিল্পী ছবি আঁকতে বসে এঁকেছিলেন এমন এক কিম্ভুতদর্শন জানোয়ারের ছবি, যার চেহারাটা ঘোড়ার মতো হলেও, মুখখানা তার মানুষের আর তার পিছনদিকে ল্যাজের বদলে রয়েছে পাখির মতো রংবেরংয়ের পালক। হোরেস লিখলেন, কেউ কেউ বলে বটে, কবিতা লিখিয়ে আর ছবি-আঁকিয়েদের এই ধরনের উল্টোপাল্টা করে ছবি আঁকার কিংবা আবোল তাবোল কবিতা লেখার একটা অধিকার আছে। কিন্তু এসব সত্ত্বেও হোরেসের মনে হয়েছিল, এই ধরনের উদ্ভট আর মাথামুণ্ডুহীন ভাবনাগুলো নেহাতই অলস মস্তিষ্কের উদ্দেশ্যহীন কল্পনাবিলাস, যা অসুস্থ মানুষের স্বপ্নের মধ্যে একটা চেহারা পায়। প্রশ্ন হল : এই গন্তব্যহীন কাল্পনিকতাকে আমরা শিল্পসৃষ্টির ক্ষেত্রে ছাড় দেব কিনা? এই ছাড়-ছুটের প্রসঙ্গে হোরেস শোনালেন একটু নতুন কথা : বললেন, কবি-শিল্পীরা এই রকম ছাড়পত্র চাইলে কখনো সখনো পেতেও পারেন ; কিন্তু তারও একটা সীমা সরহদ্দ থাকবে। কবি শিল্পীকেও লক্ষ রাখতে হবে সেখানে বন্য জন্তুর সঙ্গে গৃহপালিত পোষমানা জীবদেহটির যেন মিলন না ঘটে, কিংবা সাপের সঙ্গে যেন না মেলে পাখি আর বাঘে-ভেড়ায় মিলন ঘটানোটা সেখানে কোনো কাজের কথা নয়। অসম্ভব-কল্পনাবিলাসকে প্রত্যাখ্যান করে হোরেসের যে-পত্রকাব্যের শুরুয়াত, তার বয়ান যে সুসমঞ্জসভাবে, সমস্ত রীতিপদ্ধতিকে ঠিকঠাক মেনে-মেপে চলা সাহিত্য সৃষ্টির পক্ষে সওয়াল করবে সে কথা বলার অপেক্ষা রাখে না। জিজ্ঞাসা কেবল, তিনি কীভাবে, কোনদিক থেকে এই মান্যতার মাপকাঠিটিকে নির্দেশ করবেন, তা নিয়ে। এবার চলা যাক পত্রকাব্যের বিপ্রতীপে।

আগেই বলে নিয়েছিলাম হোরেসের এই *আর্স পোয়েটিকা*-র অন্যপ্রান্তে রয়েছে এক কবির— সত্যি বলতে কি এক খ্যাপাটে ছদ্ম-কবির কথা। যে কবি কাব্যসাধনার চেয়েও হয়তো কবি-কবি ভাব প্রকাশ করতে

বেশি কৌতূহলী আর কবিজনোচিত ব্যবহারবিধি জাহের করতে চেয়ে যে রাস্তায় রাস্তায় এলোমেলো ঘুরে বেড়ায়, আকাশের দিকে চোখ তুলে চিৎকার করে কবিতা আওড়াতে আওড়াতে হেঁটে চলে আর আকাশে উড়ন্ত একটি কালোপাখি দেখে তার মাংস খাবে ভেবে তাকে তাড়া করে গভীর রাস্তায় পপাত চ হয়ে থাকে। এই কবি-কবি ভাবওয়ালা কবিটি যখন রাস্তার ওপরে ছিল, তখন তাকে নিয়ে ঠাট্টাতামাশা করেছে বাচ্চারাও আর যখন সে ওই গর্তের মধ্যে পড়ে রইল, তখন তার শত চিৎকারেও কান করল না কোনো সহনাগরিক।

হোরেসের *আর্স পোয়েটিকা*-র অন্যতম অনুবাদক এইচ. রাশটন ফেয়ারক্লফ তাঁর অনুবাদের মুখবন্ধে লিখেছেন, হোরেসের এই পত্রকাব্য যে ওই কিম্ভুত জন্তুর বর্ণনা আর এই অদ্ভুত কবির কীর্তিকলাপ দিয়ে শেষ হল, তা নেহাত আকস্মিক নয়। আসলে এদের প্রতি কবি ও সাহিত্যচিন্তক হোরেসের প্রত্যাখানের মধ্যেই রয়েছে কাব্যশিল্পের নির্মিত প্রসঙ্গে হোরেসের মতামত। ফেয়ারক্লফ লিখছেন :

> Both painter and poet are used to impress upon readers the lesson that in poetry as in other arts the main principle to be followed is propriety. The idea of literary propriety, which runs through the whole epistle, is illustrated in many ways, and may be said to give *Ars Poetica* an artistic unity.

অর্থাৎ স্রষ্টা হিসেবে, সে তিনি কবি হোন বা শিল্পী, উভয়েই পাঠক বা দর্শকের কাছে গৃহীত বা প্রতিষ্ঠিত হন 'প্রপ্রাইটি' বা 'সমীচীনতা'-র জোরে। এই সাহিত্যিক সমীচীনতা বা শিল্পগত সমীচীনতার বহুপথগামী রূপের উন্মোচনই বস্তুত *আর্স পোয়েটিকা*-র মূল উপজীব্য। তবে সেই পথে এগোনোর আগে সংক্ষেপে প্রথাগতভাবে দেখা দরকার *আর্স পোয়েটিকা*-র পশ্চাদ্‌পটটি। দেখা দরকার খ্রিস্টপূর্ব প্রথম শতকে লেখা এই পত্রকাব্যটির বা এপিসলটির পটভূমিতে কোনোভাবে রয়েছে কিনা খ্রিস্টপূর্ব তৃতীয় ও দ্বিতীয় শতাব্দীর রোমক সাহিত্যের ইতিবৃত্তান্ত। জানা দরকার হোরেসের কথাও।

২.

আরিস্টটল ও হোরেসের মধ্যবর্তী দুশো বছরের কালপর্বে গ্রিক সভ্যতার পতন ও আলেকজান্দ্রীয় সভ্যতার সংগঠন সময়। এই সন্ধিক্ষণে স্বাভাবিকভাবেই কোনো ধরনের সাহিত্যতাত্ত্বিকআলোচনা যে তৈরি হয়ে উঠল না তার অন্যতম প্রধান কারণ নির্দেশ করতে গিয়ে সাহিত্য সমালোচনার ইতিবৃত্তকারেরা বললেন : "The reason is, in one sense, simply that the writings have disappeared." এই সময়ের মধ্যে জ্ঞানবিদ্যা-বিজ্ঞানবিদ্যার চর্চা হলেও সাহিত্যচর্চার তেমন কোনো নমুনা নেই। প্রাগুক্ত সাহিত্য সমালোচনার দুই ইতিবৃত্তকার, উইলিয়ম ডব্লিউ উইমস্যাট আর ক্লিন্‌থ ব্রুকস জানাচ্ছেন : "it was the heyday not only of the grammarian, the seholiast, the philologist, but also the epigrammatist, the idyllist, the 'Asiatic' rhetorician." ভাষাবিদ্যার আলোচনার পাশাপাশি পূর্বতন সৃষ্টির উদ্ধার ও সম্পাদনাবিষয়ক কাজকর্ম হয়েছে কিন্তু কালজয়ী কোনো সাহিত্যসৃষ্টির সময় এটি নয়। ছোটোখাটো চটুল কিছু জনমনোরঞ্জনী নাটিকা, কিছু স্তুতিমূলক, গাথামূলক, শোকবিষয়ক কাব্য বিচ্ছিন্নভাবে লেখালেখি হলেও, মহৎ কোনো ট্রাজেডি বা কমেডির সৃষ্টি এই সময়ে হয়নি। ফলে নিজে কবি হলেও, সম্রাট অগাস্টাসের পরম বন্ধু হোরেসের পাশে ছিল গ্রিক সাহিত্যের এক অনুর্বর সময় আর তার পশ্চাদ্‌পটে ছিল গ্রিসীয়, মূলত হোমারীয়, ঐতিহ্যের বর্ণময় ঐতিহ্য।

সমকালীন গ্রিক সাহিত্যের ইতিবৃত্তগত এই *প্রেক্ষাপটটিকে* স্মৃতিধার্য করলে বোঝা সম্ভব কোন্ পটভূমিতে দাঁড়িয়ে হোরেসকে এক তথাকথিত রক্ষণশীল অথবা কারো ভাষান্তরে এক ধ্রুপদি পথের সন্ধান দিতে হয়েছিল তাঁর *আর্স পোয়েটিকা*-র ছত্রে ছত্রে। *আর্স পোয়েটিকা* প্রচলিত অর্থে ঠিক যুক্তিতর্ক সমন্বিত প্রবন্ধগ্রন্থ নয় বা আরিস্টটলের *পোয়েটিক্স*-এর মতো কোনো বক্তৃতার অনুলিপিও এটি নয়। এটি পত্রকাব্য, যে পত্রকাব্যের একজন বা একাধিক নির্দিষ্ট প্রাপক রয়েছেন। প্রায় পৌনে পাঁচশো (৪৭৬) চরণ সম্বলিত সুদীর্ঘ এই পত্রকাব্যের প্রাপক পিসোরা। কিন্তু কারা ছিল এই পিসো, সে কথার স্পষ্ট সন্ধান আজ আর পাওয়া যায় না। কিন্তু তাদের প্রতি সম্বোধনে বহুবচনের ব্যবহার স্পষ্ট করে এখানে একই পদবিধারী, হয়তো একই পরিবারভুক্ত, একাধিক চরিত্র রয়েছেন। অনুবাদক ফেয়ারক্লফ তাঁর সূচনায় লিখছেন :

> There are a father and two sons of the Piso family, but nobody knows with certainty what particular Pisos— and there are many on record— they are.

আর্স পোয়েটিকা-র পাঠ্যান্তর্গত অভ্যন্তরীণ সাক্ষ্য থেকে অনুমান করা যায় এই তিনজনের একজন হালফিলের উঠতি নাট্যকার, আরেকজনের মধ্যে রয়েছে হোমারীয় শিল্পরীতির প্রতি অকুণ্ঠ আনুগত্য আর তৃতীয়জনের পরিচয় তিনি সমকালীন চটুল গ্রিক নাট্যচর্চার শরিক। পত্রকাব্যের প্রাপক এই তিনটি চরিত্রের বিশেষ আগ্রহও কখনো নির্দিষ্ট করেছে হোরেসের কাব্যবিষয়। সেক্ষেত্রে, সেই বিশেষ প্রাপকের (বা প্রাপকদের) উদ্দেশে হোরেসের যে পরামর্শ-পরিবাদ তাকে কতখানি নির্বিশেষ উচ্চারণ হিসেবে গ্রহণ কবা সঙ্গত, বিচার্য সে-কথাও।

এই পত্রকাব্যের মূল তিনটি বিষয়কে নির্দেশ করে এর অনুবাদক ও ভাষ্যকার ফেয়ারক্লফ তাঁর ভূমিকায় জানিয়েছিলেন :

প্রথম দেড়শো চরণে হোরেস আলোচনা করেছেন কাব্যবিষয় ও তার উপস্থাপনার সুসামঞ্জস্যময় একটি সমগ্রতা বা ঐক্য নিয়ে। ভাষা ব্যবহার ও ছন্দ নির্বাচনের সতর্কতা যে ঐক্য প্রস্তুতির একটি মাধ্যম।

দ্বিতীয় দেড়শো চরণে তাঁর লক্ষ্য নাটক। তিনি জানান, নাটকের ক্ষেত্রে আবার বিশেষ ভাবে যত্নশীল হতে হয় চরিত্রনির্মাণ ও যথাযথ উপস্থাপনার প্রতি। যথাযথ উপস্থাপনা বলতে চরিত্রের সংখ্যা, নাট্যদৈর্ঘ্য, কোরাস ও সংগীতের ব্যবহার ইত্যাদি সম্পর্কে সচেতন থাকার পরামর্শ তিনি দিয়েছেন।

তৃতীয়ত, অন্তিম পৌনে দুশো চরণে তিনি আলোচনা করেছেন কবির যোগ্যতা ও পারঙ্গমতা নিয়ে। তার একদিকে যেমন রয়েছে কবির বিষয় ও মানবচরিত্র সম্পর্কে সাধারণ জ্ঞান : উচ্চতর জীবনাদর্শের প্রতি বিশ্বস্ততা, তেমনই অন্যদিকে রয়েছে নিরপেক্ষ সমালোচনা শুনতে পারার ও তা থেকে নিজেকে শুদ্ধতর করার লক্ষ্যে নিজেকে প্রস্তুতির মনোভঙ্গি।

অর্থাৎ, সংক্ষেপে হোরেসের *আর্স পোয়েটিকা*-য় আলোচিত বিষয়ত্রয়ী হল :

(১) কাব্য বিষয়ের সমীচীনতা

(২) বিষয় উপস্থাপনার সমীচীনতা এবং

(৩) কবিচরিত্রের সমীচীনতা।

হোরেস তাঁর কাব্যবিষয় সম্পর্কিত আলোচনায় আরিস্টটলীয় অনুকৃতিবাদ বা মাইমেসিসের নতুনতর একটি দিকে সরিয়ে নিয়েছেন তাঁর আলোচনা। আরিস্টটল তাঁর কাব্যতত্ত্বে বিষয়গত

অনুকরণ বলতে বুঝিয়েছিলেন একটি ক্রিয়া বা অ্যাকশনের অনুকরণ। এর সঙ্গে সেই ক্রিয়াটি যার দ্বারা সম্পন্ন হয় সেই মানব চরিত্র বা মানব প্রকৃতিও সমানভাবে তাঁর কাব্যতত্ত্বের অনুকৃতির বিষয়। কিন্তু হোরেস তাঁর কাব্যচিন্তায় বললেন : "হয় ঐতিহ্যকে অনুসরণ করো অথবা এমন কিছু আবিষ্কার করো যা স্বয়ংসম্পূর্ণ ও সঙ্গতিপূর্ণ।" হোরেস-কথিত এই ঐতিহ্যানুসরণের প্রস্তাবটিকে আপাতদৃষ্টিতে ভুল বোঝার প্রবল সম্ভাবনা আছে। বিশেষত এই বইয়েরই অন্যত্র যখন তিনি দিনের বেলায় হোমারের কাব্যপাঠ ও রাত্রে তাঁর অনুধ্যানের পরামর্শ দেবেন কিংবা স্পষ্টত যখন তিনি সাহিত্যে নতুন নতুন শব্দ ব্যবহারের পক্ষে সওয়াল করতে গিয়ে বলবেন, সাহিত্যে ব্যবহৃত আনকোরা নতুন শব্দ একমাত্র তখনই ছাড়পত্র পাবে "ইফ দে স্প্রিং ফ্রম আ গ্রিক ফাউন্ট" সেইসময়ে এই সকল প্রসঙ্গে তিনি ঐতিহ্যানুসরণ বলতে বেশ স্থির একটি ধারণার কথা বলেছেন বলেই মনে হয়। বিশেষত তিনি ঐতিহ্যানুগত বিষয় বলতে শুধু গ্রিক পুরাণ থেকে মেদেয়া-ইনো-ইক্সিয়ন আর ইয়ো চরিতাবলির উল্লেখ করেন বলে, তাঁর দৃষ্টিকোণকে রক্ষণশীল মনে হতেও পারে। কিন্তু *আর্স পোয়েটিকা*-র ওই একটিমাত্র পঙ্‌ক্তি থেকে তাঁর ঐতিহ্য-ধারণার ব্যাখ্যা সম্পূর্ণ না করে অন্যতর পঙ্‌ক্তিগুলিতে এর তাৎপর্যগত সমর্থন সন্ধান করা দরকার। সেক্ষেত্রে দেখা যাবে একদিকে যেমন তিনি স্বোদ্ভাবিত কাহিনিতে আদি-অন্তের সামঞ্জস্য রক্ষার নির্দেশ দেবেন, তেমনই অন্যদিকে তিনি বলবেন গ্রিক আদর্শকে অনুসরণ করেও নিজস্বতা রক্ষার কথা। মূল গ্রিক আদর্শস্থলটিকে কখনো তিনি "গ্রাউন্ড ওপন টু অল" বা কখনো তাকে "হোয়াট ইজ্ কমন" বলে চিহ্নিত করে বলবেন, যদিও "it is hard to treat in your own way what is common", এতদসত্ত্বেও "in ground open to all you will win private right." এখন কীভাবে সম্ভব পুরাণরূপ সর্বজনীন ময়দানে নিজের স্বত্ব স্থাপন? তিনি এই স্বত্বাধিকার অর্জন প্রসঙ্গে তিনটি সাবধানতার কথা বলেছেন। প্রথমত, আর পাঁচজনের মতো খোলা আর সোজা পথে চললে চলবে না ; দ্বিতীয়ত, প্রতি শব্দ ধরে ধরে পুচ্ছানুসারী অনুবাদ করলে চলবে না; তৃতীয়ত, অনুকৃতি সর্বদাই প্রসারিত করবে মূলকে, কিছুতেই মূলকে অনুকৃতিতে সংকীর্ণ করা চলবে না।

সূত্র-ত্রয়ীর প্রথম বিষয়টি সহজ সরল হলেও দ্বিতীয় আর তৃতীয় সূত্রটি তাৎপর্যপূর্ণ। কারণ, দ্বিতীয় সূত্রটিতেই অস্বীকার করা হয়েছে পুরাণ-পুনর্কথনের নামে, কার্যত তার হুবহু ধারাবিবৃতিকে। আর তৃতীয় সূত্রে প্রতিষ্ঠিত হয়েছে পুরাণের পুনর্মূল্যায়ন বা নবায়নের সম্ভাবনা। এই দিক থেকে চিন্তা করলে কখনোই, গ্রিক মডেল অনুসরণ করার পরামর্শ দিয়েছেন বলেই, হোরেসকে রক্ষণশীল বলা যুক্তিযুক্ত হয় না। তাঁর পুরাণভাবনায় যথেষ্ট ঔদার্যের অবকাশও রয়েছে।

এর উল্টোদিকে কোনো লেখক যদি এমন বিষয় নির্বাচন করেন, যা তিনি আদৌ পুরাণাশ্রয়ী ঐতিহ্য থেকে গ্রহণ করেননি, সেক্ষেত্রেও হোরেসের মতে সুনির্দিষ্ট সামঞ্জস্য বিধানের কথা তিনি বলছেন। তাঁর মতে :

> If it is an untried theme you entrust to the stage, and if you boldly fashion a fresh character, have it kept to the end even as it came forth at the first, and have it self-consistent.

নবসৃষ্ট কাহিনির আদাবন্তে একটি নতুন চরিত্রকে একদিকে 'ফ্রেশ' আর অন্যদিকে 'সেলফ কনসিসটেন্ট' রাখতে বলার কারণটি ব্যাখ্যাসাপেক্ষ। পুরাণাগত চরিত্রের পরিণাম ও কার্যবিধি

তো অনেকাংশেই পাঠক বা শ্রোতার আগে-থেকে জানা। সেইক্ষেত্রে না হয় তার ক্রিয়াকলাপ পূর্বনির্ধারিত পথকেই অনুসরণ করে চলতে পারে; কিন্তু নতুন বা সদ্য-সৃষ্ট একটি চরিত্রের কাছে তো নাট্যান্তর্গত প্রতিটি পরিস্থিতিই এক অর্থে অভিনব। এই নতুনত্ব অপটু শিল্পীর হাতে পড়লে প্রথমে তা যে বিশ্বাসযোগ্যতা নিয়ে আরম্ভ হয়, ক্রমশ সেই চরিত্র হারিয়ে ফেলতে পারে তার বিশ্বাসযোগ্যতা। তা কখনো হয় পুরোনো কোনো আর্কেটাইপকে, নয়তো কাহিনিগত ক্রিয়ার বা পরিণতির দিকে তার দুর্নিবার আকর্ষণে হারিয়ে ফেলতে পারে নিজেকে বিশ্বাসযোগ্য রাখার যুক্তি। এই উভয় সংকট থেকে নবসৃষ্ট চরিত্রগুলিকে তাদের প্রাণধর্মে প্রতিষ্ঠিত করার জন্যই হোরেসের সলাহ তাদের 'সেল্‌ফ কনসিসটেন্ট' রাখা।

প্রসঙ্গত, চরিত্রের এই কনসিসটেন্সির কথা ইতিপূর্বে আরিস্টটলও বলেছিলেন। ট্রাজেডির নায়ক চরিত্রের চারটি লক্ষণ নির্দেশ করে তিনি বলেছিলেন :

1. They shall be good.
2. make them appropriate.
3. make them like the reality.

এবং, তার চতুর্থটি ছিল এরকম :

> make them consistent and the same throughout ; even if inconsistency be part of the man before one for imitation as presenting that form of the character, he should still be consistently inconsistent.

চরিত্রগত সংগতির যুক্তি এখানে সম্পূর্ণত শিল্প রূপগত। আরিস্টটল জানিয়েছিলেন লোকজীবনে (বা মূলপুরাণের) যদি চরিত্রের মধ্যে কোথাও অসংগতি থেকেও থাকে তাহলে সৃষ্ট নাটকে বা কাব্যে তার সেই অসংগতিকেও সুসংগতভাবে উপস্থাপিত করা প্রয়োজন। আরিস্টটলের "consistent and same throughout" এবং "consistently inconsistent"-এর হোরেসীয় পরিভাষা হল "self-consistent"।

আমরা আলোচনার আরম্ভে বলেছিলাম সমীচীনতাই হল *আর্স পোয়েটিকা*-র মূলশব্দ। চরিত্র নির্মাণের ক্ষেত্রে এই স্বয়ংসম্পূণ সংগতির ধারণাটিই হল চরিত্রনির্মাণগত সমীচীনতা। অর্থাৎ, হোরেসের মতে চরিত্র নির্মাণ তখনই সমীচীন হবে, যখন সেখানে তার পৌর্বাপর্যের সংগতি তৈরি হবে।

৪.

কাব্যবিষয়ের সঙ্গে তার উপস্থাপনাগত সামঞ্জস্য রক্ষার বিধানকে যে ধরনের কয়েকটি বাঁধাবাঁধির নিয়মের নিগড়ে উপস্থিত করছেন হোরেস, তা থেকে তাঁর মতকে অসম্ভব রকমের দৃঢ় আর অনুজ্ঞাবাচক মনে হওয়া স্বাভাবিক। তিনি নাটকের পঞ্চাঙ্ক দৈর্ঘ্যের সীমা, একইসঙ্গে নাট্যমঞ্চে তিনের অধিক চরিত্র না-রাখার নিষেধ, নাট্যমঞ্চের বাইরে হত্যাদৃশ্য দেখানোর নির্দেশ ইত্যাদি দিয়েছেন। এমনকি কোরাস ব্যবহার ও শব্দ ব্যবহার সম্পর্কেও তাঁর নির্দেশ দৃঢ়বদ্ধ। এই দৃঢ় নির্দেশাবলি থেকে কারো পক্ষে মনে করা সম্ভব যে, হোরেসের কাব্যতত্ত্বও বহিরঙ্গ সম্পর্কে যতখানি যত্নশীল, তা ততখানি আন্তরিক নয় অন্তর্বিষয় প্রসঙ্গে। কিন্তু সত্যই এহো বাহ্য।

আসল কথা হল, হোরেসের মতে শিল্পসৃষ্টিকে হতে হবে সহজ-সরল ও সামঞ্জস্যপূর্ণ। তিনি নিজে কবি বলেই, কাব্যরচনার সমস্যাকে আত্মসমালোচনার স্বরভঙ্গিতেই স্পষ্ট করে বলেছেন : "আমরা কবিরা কখনো সত্যের আপাতরূপেই বিভ্রান্ত হই। পরিমিত হতে গিয়ে অস্পষ্ট হয়ে পড়ি আবার কখনো প্রাঞ্জল বা মসৃণ করতে গিয়ে হারিয়ে ফেলি শক্তি আর উদ্দীপনা। কখনো

বাগাড়ম্বের আতিশয্যে মেতে উঠি আবার কখনো পাছে কেউ হাসে সেই ভয়ে আর অতি সতর্কতায় কথা বলি মাটি ঘেঁষে।"

এখানে লক্ষণীয় যথাযথ ভাষা ব্যবহারের যৌক্তিকতাই তৈরি করেছে সমীচীনতার নতুন একটি রূপ। শুধু কাব্যবিষয়ের ও বিষয় উপস্থাপনার রীতি পদ্ধতির বিধি-নির্দেশেই শেষ হয়নি হোরেসের *আর্স পোয়েটিকা*। এর অন্তভাগে আলোচিত হয়েছে কবি চরিত্রের পারঙ্গমতা বা যোগ্যতাও। একদিক থেকে হোরেসও 'সকলেই কবি নয়, কেউ কেউ কবি' এই কথাটি বোঝাতে গিয়ে প্রথমেই সেই সকল নকল-কবিদের উল্লেখ করেছেন, যাঁরা কবি বলতে শুধু বোঝেন কবির কিছু বাহ্য ভাবহাবমাত্র। হোরেস জানাচ্ছেন, এইসব কবি-কবি ভাবওয়ালা লেখককুল হাবেভাবে নিজেদের 'কবিত্ব' প্রকাশ করতে চেয়ে, না কাটে হাতের নখ, না ছাঁটে মাথার চুল, স্নানের বালাই না রেখে আর নির্জন স্থান খুঁজেই তাঁদের ধারণা তাঁরা কবিপদবাচ্য হয়ে সমাজে গভীরভাবে শ্রদ্ধার পাত্র হয়ে উঠবেন। কিন্তু এই সকল বাহ্যলক্ষণের আড়ম্বর বা দেখনদারিকে খারিজ করে হোরেস জোর দিলেন কবির আত্মমূল্যায়ন এবং সাধারণ জ্ঞানের ওপর। কবির প্রথম কাজ নিজের প্রকৃতি অনুসারী কাব্যবিষয় ও কাব্যাঙ্গিক নির্বাচন। তিনি লিখলেন :

> Take a subject, ye writers, equal to your strength ; and ponder long what your shoulders refuse, and what they are able to bear, whoever shall choose a theme within his range, neither speech will fail him, nor clearness of order.

অর্থাৎ, স্বভাবত যিনি মহাকবি, তাঁর হাতে যেমন গীতিকাব্যের বিষয় আঁর আঙ্গিকগত মাধুর্য তার পূর্ণ স্বরূপটিকে প্রকাশ করতে পারে না, তেমনই যিনি স্বভাবত গীতিকবি— তাঁর মহাকাব্য রচনার প্রয়াস বা সংকল্প কখনোই সমীচীন নয়।

কবিদের এই আত্মসমীক্ষার পাশাপাশি হোরেস গুরুত্ব দিয়েছেন কবির বাস্তববুদ্ধি ও তাঁর মানবজীবন ও মনুষ্যচরিত্র সম্পর্কিত জ্ঞানের ওপরেও। আগে যেমন তিনি মডেল বা আদর্শ বলতে শুধু গ্রিক, বিশেষত হোমারীয় সাহিত্য বুঝিয়েছিলেন : এখন সেই ভরবিন্দু থেকে সরে এসে তিনি বললেন :

> I would advise one who has learned the imitative art to look to life and manners for a model, and draw from thence living words.

লেখকের বাস্তবজীবন সম্পর্কে এবং মানবচরিত্র বিষয়ে জ্ঞান ও অভিজ্ঞতার প্রতিফলন কখনো ভাবের দিক থেকে বা বিষয়ের দিক থেকে সামান্য কাব্যবিষয়কেও প্রকাশগুণে সার্থক করে তুলতে পারে। আবার উল্টো দিক থেকে দেখলে, তাঁর মতে, বিষয়ের মহনীয়তা ও ভাবের গুরুত্ব থাকলেও লেখকের বাস্তবজীবন বোধের অনভিজ্ঞতায় সৃষ্টি হারাতে পারে তার যোগ্যতা। এই বাস্তববুদ্ধি ও মানবচরিত্রজ্ঞান ব্যক্তিমানুষের কাছে কি অনুশীলন বা চর্চাসাপেক্ষ? না কি তা প্রতিভানির্দিষ্ট? এই প্রশ্নের উত্তরে তিনি চর্চার গুরুত্ব স্বীকার করেও প্রতিভাকে স্বীকৃতি জানিয়েছেন জাতিগত সত্তার উপাদানে। বিষয়টি আপাতদৃষ্টিতে বেশ বিতর্কিত। কারণ তিনি গ্রিক আর রোমানদের জাতিসত্তার চারিত্র্য সম্পর্কে দুটি পৃথক শব্দ ব্যবহার করেছেন। গ্রিকরা সাহিত্যসৃষ্টির ক্ষেত্রে প্রতিভাবান ও রোমানরা নাকি বিশিষ্ট তাদের ব্যবহারিক জীবনে। ফলে জাতিচরিত্রগত এই স্বাতন্ত্র্য থেকেই তাদের সাহিত্যসৃষ্টিগত প্রতিভার তারতম্য নির্ধারিত হয়ে আছে।

অবশ্য প্রতিভাধর মাত্রেই তো লেখক হিসেবে তাঁর গ্রহণযোগ্যতা আর কবিখ্যাতি অর্জন করেন না। প্রতিভাবান লেখকের কোনো রচনা কোন্ গুণে যুগোত্তীর্ণ হয়ে ওঠে? হোরেস জানাচ্ছেন :

> Poets aim either to benefit, or to amuse or to utter words at once both pleasing and helpful to life.

অর্থাৎ, এমন নয় যে হোরেস বলছেন, রচনাকে কেবলমাত্র কাজে লাগার মতো প্রয়োজনীয় হতে হবে ; তিনি জানাচ্ছেন কোনো রচনা যদি মনোরঞ্জনের কাজটুকুও করে তাহলে তাকেও তিনি যোগ্যতার মানদণ্ডে উত্তীর্ণ করবেন। আর আবশ্যই এই দুইয়ের সঙ্গে স্বভাবতই তিনি রচনার তৃতীয় উদ্দেশ্য হিসেবে যুগপৎ আনন্দদায়ক ও জীবনের পক্ষে প্রয়োজনীয়তার কথা এনেছেন।

সাহিত্যের এই উদ্দেশ্যটিকে অব্যর্থ করে তোলার জন্য তাঁর নির্দেশ যাথাযথ্যের দিকে। এই লেখার মূলশব্দ বা ধ্রুব-পদ হিসেবে আমরা ইতিপূর্বে সমীচীনতার কথা বলছিলাম, এই যাথাযথ্য তারই রূপভেদমাত্র। হোরেস বলছেন :

> be brief, so that what is quickly said the mind may rapidly grasp and faithfully hold : every word in excess flows away from the full mind. Fictions meant to please should be close to the real, so that your play must not ask for belief in anything it choses.

এই তাহলে যাথাযথ্যের আরো দুটি দিক নির্দেশ করলেন হোরেস। প্রথমত, অকারণ বাগ্‌বিস্তারের তুলনায় সংক্ষিপ্ত অথচ সম্পূর্ণ ভাষা ব্যবহারের যাথাযাথ্য এবং দ্বিতীয়ত কাহিনিনির্ভর সাহিত্যিক বিষয়ের ক্ষেত্রে বাস্তবতার যাথাযাথ্য। বাগবিস্তারের বাহুল্য পাঠকের মনকে ঠিক জায়গায় স্থির হতে দেয় না আর বাস্তবতার যথাযথ উপস্থিতি না থাকলে পাঠকমনে লেখাটি সম্পর্কে বিশ্বাসযোগ্যতা তৈরি হয় না। হোরেস-কথিত এই বাস্তবতার সঙ্গে প্রচলিত রিয়ালিজম্‌কে মেলানো ঠিক হবে না। কারণ এখানে তিনি পৌরাণিক কাহিনির প্রতি আনুগত্যের কথা ইতিপূর্বে বলেছেন। আসলে এই বাস্তবতা হল উপস্থাপিত বিষয়টিকে পাঠকের কাছে বিশ্বাসযোগ্য করে তোলা। অপ্রকৃত বা অতিপ্রকৃত বিষয়াবলিও এই বাস্তবতার গুণে প্রকৃতের প্রতীতি তৈরি করতে পারে।

এখন কে নির্দিষ্ট করে লেখককে জানাবেন লেখাটির যাথাযাথ্য সম্পর্কে। হোরেস ঠিক এই জায়গায় এসে উল্লেখ করলেন সাহিত্যসৃষ্টি সম্পর্কে সমালোচকের ভূমিকা। হোরেসের মতে, যথার্থ সমালোচক লেখাটির দিকে তাকাবেন একটি ছবির প্রতি যেভাবে তাকান তিনি, সেইভাবে। কখনো খুব সামনে থেকে তিনি লক্ষ করবেন ছবি তৈরির বিভিন্ন রং-রেখা আর টানটোনকে আর কখনো দূর থেকে দাঁড়িয়ে তাঁকে দেখতে হবে ছবিটির সমগ্রতা। তিনি জানেন কবিদের প্রতি তোষামোদকারী-পিঠ চাপড়ানিয়া সমালোচকের সংখ্যাই বেশি তবে সমালোচকের যথার্থ কাজ হল সংশোধন। তিনিই সৃষ্টির বিশেষ বিশেষ অংশগুলিকে আর তার সামগ্রিক বিষয়ের উপস্থাপনাকে সমান গুরুত্ব দিয়ে পর্যালোচনা করেন। তিনিই যথাযথ পরামর্শ ও সমালোচনার মাধ্যমে লেখকের সংস্কারকর্মে সহায়ক হয়ে ওঠেন। তবে যথার্থ সমালোচকের মন্তব্য আর সলাহ্‌কে গ্রহণ করতে পরার ক্ষমতা আর তাকে নিজের প্রাণাধিক প্রিয় লেখার ওপর প্রয়োগ করতে পারার মানসিকতাও লেখকের অন্যতম গুণ। সমালোচকের উদ্দেশে হোরেসের পরামর্শটিও বেশ তাৎপর্যপূর্ণ। তিনি বলছেন :

> If, after two or three vain trials, you [কবি] said you could not do better, he would bid you blot it out and return the ill shaped verses to the anvil. If you

> *preferred defending your mistake to amending it, he would waste not a word more, would spend no fruitless toil, to prevent your loving yourself and your work alone without a rival.*

হোরেসের এই মতামত একাধারে যেমন কবির প্রতি পরামর্শ, তেমনই এটি সমালোচকের উদ্দেশেও বলা। সমালোচকের পাঠপদ্ধতি যেমন বিষয়গত, আত্মগত নয়, ঠিক তেমনই নিজের বিশ্লেষণের প্রতিও নির্মোহ তাঁর সংলগ্নতা।

লনজাইনাস

১.

হোরেসের সাহিত্যতাত্ত্বিক প্রস্থানের মূল শব্দ যদি হয় সমীচীনতা, তাহলে লনজাইনাসের সাহিত্যভাবনার ধ্রুবপদ হল ঊর্ধ্বায়ন। ইতিহাস হোরেসের ব্যক্তিপরিচয় ও তাঁর গ্রন্থের সম্পূর্ণতা সম্পর্কে অবগত ; কিন্তু ইতিহাস যথাযথভাবে না মনে রেখেছে লনজাইনাসের স্থান-কাল আর ব্যক্তিসত্তার পরিচয়, না অক্ষত রাখতে পেরেছে তাঁর লেখা বইটিকে। ফলত লনজাইনাসের কালপর্ব নিয়ে যেমন বহুমত, তেমনই মতপার্থক্য তাঁর লেখা বইয়ের শিরোনাম নিয়েও। সর্বোপরি তাঁর রচনার পাণ্ডুলিপিটি অক্ষত না হওয়ায় মাঝেমধ্যেই হারিয়ে গিয়েছে কোনো প্রসঙ্গসূত্র। কারো মতে তিনি খ্রিস্টীয় তৃতীয় শতকের ব্যক্তিত্ব আবার কারো মতে খ্রিস্টীয় প্রথম শতাব্দীর মানুষ তিনি। প্রাচীনকালে লনজাইনাসের লেখা সে-অর্থে বহুলপঠিত রচনা ছিল না। খ্রিস্টীয় ষোড়শ শতাব্দীর মাঝামাঝি সময়ে, ১৫৫৪ খ্রিস্টাব্দে, লনজাইনাসের গ্রিক পাণ্ডুলিপির সঠিক অনুবাদ প্রথম প্রকাশ করেন রবার্তেল্লো। এরপরে ইতালি-সুইটজারল্যান্ড আর ইংল্যান্ডে পরবর্তী একশো বছরে এই নিবন্ধ বহুবার মুদ্রিত ও অনূদিত হয়েছে। অবশ্য প্রকাশের পরেও মুষ্টিমেয় বুদ্ধিজীবীর মধ্যেই মুখ্যত সীমাবদ্ধ ছিলেন তিনি। লনজাইনাসের বইয়ের নাম *অন দ্য সাবলাইম* বা 'হাইট অফ এলোকোয়েন্স'। হোরেসের *আর্স পোয়েটিকা*-র মতো এটিও পত্র— অবশ্যই পত্রকাব্য নয়, গদ্যে লেখা। হোরেস যেমন তাঁর পত্রকাব্য লিখেছিলেন সমকালীন তিন পিসেরোদের উদ্দেশে, উপদেশ দেওয়ার ভঙ্গিতে লনজাইনাসের রচনাভঙ্গি ঠিক সেই রকম নয়। তিনি এই পত্রটি লিখেছেন তার সতীর্থ বন্ধু পসতুমিয়াস টেরেনটিয়ানসের প্রতি। তাই তাঁর পত্র শুরুই হচ্ছে তাঁদের ছাত্রজীবনে অধীত একটি বইয়ের কথা পেড়ে। লনজাইনাস শুরুতেই জানাচ্ছেন তাঁর বর্তমান রচনার উদ্দেশ্য ছাত্রজীবন পড়া সিসিলিয়াসের লেখা কোনো একটি বইয়ের সংশোধনী আর সংস্কার। লনজাইনাস লিখছেন :

> You know my dear Postumius Terentianus, that when we were studying together Cecilus's little treatise on the sublime we found it was too trivial to satisfy the full demands of the subject and omitted altogether to touch upon the main points, and that consequently it does not render to its readers very much of that assistance which should be an author's chief aim.

তিনি মনে করেন, প্রতিটি সুগঠিত প্রবন্ধের দুটি অত্যাবশ্যকীয় অংশ থাকে। এর মধ্যে প্রথম অংশে লেখক সুস্পষ্ট করেন নিজের বিষয়টিকে এবং দ্বিতীয় অংশে বিশদীভূত করা হয় সেই বিষয়ের লক্ষ্যে কীভাবে পৌঁছোনো সম্ভব। বলা বাহুল্য, এই দ্বিতীয় অংশটিকে বেশি গুরুত্বপূর্ণ বলে মনে করেছেন লনজাইনাস। তিনি সিসিলিয়াসের এই বইটি সম্পর্কে অনুযোগের স্বরে বলেছেন, এই বইটিতে যথেষ্ট উদাহরণ আর ব্যাখ্যা সহযোগে "nature of sublime" বা

সাহিত্যিক উর্ধ্বায়নের প্রকৃতি সম্পর্কে আলোচনা করলেও "apparently thought it unnecessary to deal with the means by which we may be enabled to educate our natures to the proper pitch of elevation." ফলে তাঁর আলোচনার মূলজীব্য : এই সাহিত্যগত উর্ধ্বায়নের প্রকৃতি ও পদ্ধতি। এই সাহিত্যগত উর্ধ্বায়নের প্রকৃতি ব্যাখ্যা করতে নেমে লনজাইনাস একদিকে যেমন প্রকৃত উর্ধ্বায়নের লক্ষণগুলি সম্পর্কে আলোচনা করেছেন, তেমনই তিনি তাঁর পাঠকের সামনে ব্যাখ্যা করেছেন মিথ্যা-উর্ধ্বায়নের প্রকৃতিগত দোষগুলি সম্পর্কেও। সাহিত্যগত এই উর্ধ্বায়ন সৃষ্টি, স্রষ্টার প্রতিভাসঞ্জাত নাকি তা অনুশীলনসাধ্য বুঝতে আর বোঝাতে চেয়েছেন তাও। লনজাইনাসের মতানুসারে, সাহিত্যগত এই উর্ধ্বায়ন মুখ্যত নির্ভর করে লেখকদের ভাষা ব্যবহারের বিশিষ্টতা ও উৎকর্ষের উপর।

প্রসঙ্গত, আরিস্টটলও তাঁর কাব্যতত্ত্বে ট্র্যাজেডির যে ষড়ঙ্গের কথা বলেছিলেন ; সেই ছয়ের মধ্যে অন্যতম ছিল ভাষা ব্যবহার। সেই ভাষা ব্যবহার বিষয়ক আলোচনার প্রাথমিক স্তরে ছিল ব্যাকরণগত বিশুদ্ধতার কথা, কিন্তু পরবর্তী স্তরে তিনি কবিতার ভাষা ও রচনারীতি প্রসঙ্গে প্রসারিত করেছিলেন তাঁর ভাষাভাবনাকে। কাব্যভাষার রচনারীতিগত বৈশিষ্ট্য সম্পর্কে আলোচনা করতে গিয়ে আরিস্টটল জানালেন :

> রচনার [প্রথম] গুণই হল স্পষ্টতা। কিন্তু বিশিষ্টতাহীনতা নয়। স্পষ্ট রীতি গড়ে ওঠা পরিচিত শব্দের ব্যবহারে আর পরিচিত শব্দ মানেই বিশিষ্টতাহীন শব্দ।.....নিতান্তই প্রাত্যহিক শব্দ যেগুলি নয়, যেগুলি কিছুটা অপরিচিত, সেই শব্দগুলি রচনায় আনে আভিজাত্য।

কিন্তু আরিস্টটল সাবধানী। তিনি জানেন ওই ধরনের আভিজাত্য জবরদস্তি করে বানাতে হলে তাও রচনার পক্ষে সমান বিপজ্জনক। তাই তিনি বলেন, "কোন কবি যদি শুধু এই ধরনের শব্দই ব্যবহার করেন, তার ফল হবে প্রহেলিকা কিংবা শব্দের আড়ম্বর।" ফলে একদিকে বৈশিষ্ট্যহীনতা, অন্যদিকে প্রহেলিকা তৈরির মাঝামাঝি তিনি নতুন একটি ভাষা পথের সন্ধান দিয়ে আরিস্টটল জানালেন : "চাই একটি মিশ্র রচনারীতি। একদিকে অচলিত, রূপক, অলংকৃত শব্দ ইত্যাদির ব্যবহারের ফলে রচনা প্রাত্যহিকতা এবং সাধারণত্বের উর্ধ্বে উঠতে পারবে। অন্যদিকে প্রচলিত শব্দাবলি দিতে পারবে স্পষ্টতা।" কাব্যভাষার সপক্ষে সেইজন্য তিনি জনৈক আরিফ্রাদেস নামক কোনো সমালোচককে বেশ এক হাত নিয়ে লিখেছিলেন : "আরিফ্রাদেস ট্রাজেডি রচয়িতাদের ব্যঙ্গ করে বলেছেন যে তাঁরা এমন সব শব্দ ব্যবহার করেন যা কেউ কখনও কথাবার্তায় ব্যবহার করে না।" কিন্তু কবিতার ভাষা যে আসলে প্রাত্যহিকের ভাষা বন্ধনের বাইরে নিয়ে যায় ভাষাকে "আরিফ্রাদেস এই ব্যাপারটাই বুঝতে পারেননি।"

লনজাইনাসও ভাষা ব্যবহারের মাধ্যমে প্রকাশের উৎকর্ষ সাধনের পক্ষপাতী। সেই আলোচনা শুরু হয়েছে ছদ্ম-উর্ধ্বায়ন-এর বিষয় থেকে। এই ছদ্ম-উর্ধ্বায়নের তিনটি দৃষ্টান্ত সম্পর্কে সচেতন করে লনজাইনাস জানালেন এই ত্রিবিধ ছদ্ম উর্ধ্বায়নের উৎস কিন্তু অভিন্ন "....all these impropieties in literature are weeds sprung from the same seed, namely that passion for novel ideas which is prevalent araze of the present day." অর্থাৎ, একেবারে অভিনব কোনো ধারণাকে প্রকাশ করার উদগ্র আকাঙ্ক্ষা থেকে এই ধরনের অসংগতি তৈরি হয়ে থাকে। লক্ষণীয় novel ideas-কে তিনি এর উৎস বলে কিন্তু চিহ্নিত করেননি। তাঁর লক্ষ্য "passion for novel ideas"। সেখানেই নষ্ট হয় প্রকাশরীতির ভারসাম্য, অন্তত তাঁর মতে। এই বারে লক্ষ করা যেতে পারে, ছদ্ম-উর্ধ্বায়নের সেই ত্রিবিধ নিদর্শনের দিকে। এই তিনটি হল :

১. Misplaced Tumidity অর্থাৎ প্রকাশরীতির অস্থানোচিত বাগ্‌বাহুল্য বা বাগাড়ম্বর।
২. Puerility বা Frigidity অর্থাৎ শিশুসুলভ বা জড়বৎ ভাষা প্রকাশ।
৩. Parenthyrson অর্থাৎ ভাবাবেগের অসংগত উৎসার।

এই তিনটি বিষয়কে এবার লনজাইনাসের ব্যাখ্যা অনুযায়ী একটু বিশদ করা যাক। প্রথমত, ওই 'misplace tumidity' সম্পর্কে তিনি লিখেছেন :

> Speeking generally, tumidity seems one of the hardest faults to guard against. For all who aim to grandeur, in trying to avoid the charge of being feeble and arid, fall somehow into this fault, pinning their faith to the maxim that "to miss a high aim is to fall without shame." Tumours are bad things whether in books or bodies.

অর্থাৎ, অন্য কারো কাছে পাছে লেখাটিকে দুর্বল আর শুকনো মনে হয় এই আশঙ্কায় লেখক যদি ভাষার মধ্যে অকারণে বাগবাহুল্য করেন, ভাষার ঐশ্বর্য বৃদ্ধি ঘটাতে চেয়ে, তাকে ভাবগম্ভীর করতে চেয়ে সামঞ্জস্যহীনভাবে অপ্রচলিত শব্দ বা কঠিনতর শব্দ সমাহার ঘটান তো লেখার ক্ষেত্রে তা নিন্দনীয়। আমাদের সাহিত্যের ক্ষেত্রে তৎসম শব্দ ব্যবহারের প্রাবল্য বা কখনো অকারণে জটিলতর বাক্য রচনার কসরত, লনজাইনাসের মতে, ছদ্ম-উর্ধ্বায়নেরই নমুনা।

দ্বিতীয়ত, আলোচ্য puerility বা frigidity বা যাকে আমরা বলছি শিশুসুলভ জড়বৎ প্রকাশ। লনজাইনাসের মতে :

> Puerility, on the other hand, is the exact opposite to grandeur, utterly abject, mean-spirited, and in fact the most ignoble of faults.

অর্থাৎ, ভাষার শিশুসুলভ জড়িমা ওই ভাষা বৈভব প্রকাশের একেবারে বিপরীত বিন্দুর একটি দোষ। ছদ্ম উর্ধ্বায়নের প্রচেষ্টা হিসেবে এর প্রতি বেশ কঠোর লনজাইনাসের মন্তব্য। তিনি সরাসরি একে নীচ, সংকীর্ণ আর ঘৃণ্য বলে চিহ্নিত করেছেন। লেখকের এই দোষটি সংজ্ঞায়িত করতে গিয়ে তিনি বললেন : "Is it not obviously the academic attitude, where over elaboration ends in frigid failure?" আসলে শিশুসুলভ ভাষা ব্যবহারের একটি দোষ এখানে পরিমাণে বেশি— বেশি কথা বলা, যে কথাগুলির সামগ্রিকভাবে তেমন গুরুত্ব কিছু নেই, সেগুলি ফলপ্রসূ নয় তেমন।

তৃতীয়ত, আলোচ্য : parenthyrson অর্থাৎ ভাবাবেগের অসংগত উৎসার। লনজাইনাস এই শব্দটিকে ব্যাখ্যা করতে গিয়ে বলেছেন : "This is emotion misplaced and pointless where none is needed, or unrestrained where restraint is required." অর্থাৎ, এটি হল লেখকের এমন এক ধরনের উদ্দেশ্যহীন ভাবাবেগের উৎসার, যার হয় প্রয়োজন নেই। সামান্য মজা করে লনজাইনাস এরপরেই বলবেন, এ যেন মাতালের মতো অবিশ্রান্ত অসংলগ্ন বাক্যস্রোত, যার সঙ্গে বক্তব্য বিষয়ের কোনো সংশ্রবমাত্র নেই। লেখক যেন এখানে যা-মনে আসে তাই একঘেয়ে বকে চলেন ক্লান্তিহীনভাবে।

এই ছদ্ম-উর্ধ্বায়নের আলোচনা শেষ করে তিনি প্রকৃত উর্ধ্বায়নের স্বরূপ সন্ধানে নেমেছেন। "What is really sublime" সে সম্পর্কে "Clear knowledge and appreciation" অর্জন করতে নেমে সাহিত্যগত উর্ধ্বায়নের পাঁচটি উৎসকে প্রথমেই চিহ্নিত করেছেন লনজাইনাস। সেই পাঁচটি উৎস তাঁর ভাষায় হল :

1. the command of full blooded ideas.
2. the inspiration of vehement emotion.
3. the proper construction of figures.
4. nobility of phrase.
5. general effect of dignity and elevation.

অর্থাৎ,

১. সুদৃঢ় ভাবনা এবং চিন্তাজগৎ-এর নির্দেশ।
২. প্রবল আবেগগত প্রেরণা।
৩. যথাযথ রূপকলা নির্মাণ।
৪. প্রকাশরীতির আভিজাত্য প্রকাশ।
৫. শোভনতা ও উত্তরণের সামগ্রিক প্রভাব।

এই পাঁচটি প্রেরণার প্রথম দুটি লনজাইনাসের মতে প্রতিভাগত বা জন্মসূত্রে লব্ধ শিল্পীর নিজস্ব সম্পদ। কিন্তু বাকি তিনটি উৎস অনুশীলনসাধ্য বা চর্চাসাপেক্ষ। এই পাঁচটির মধ্যে সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ প্রথমটি। একে প্রতিভার বিষয় বলেও লনজাইনাস জানিয়েছেন আমাদের লেখকরা উর্ধ্বায়নের এই পরম উৎসটি অর্জন করার চেষ্টা করতে পারেন। কীভাবে সেই অর্জন সম্ভব?

লনজাইনাস সে সম্পর্কেও সুস্পষ্ট দুটি উপায় বাতলে দিয়েছেন। প্রথমত, লেখকের জীবন চর্যায় মহত্ত্ব যুক্ত করতে পারলে এবং দ্বিতীয়ত, প্রাচীন সাহিত্যের নিরন্তর চর্চায় ক্রমশ লেখকের ভাবনার জগতে সমৃদ্ধি সম্ভব। এই দ্বিতীয় বিষয়টির কথা হোরেসীয় কাব্যতত্ত্বের অন্যতম মৌলিক প্রস্তাব ছিল, সে কথা নিশ্চয় স্মরণে রয়েছে আমাদের। হোরেসও কবিদের পরামর্শ দিয়ে বলেছিলেন, দিনের বেলায় হোমারের লেখা পড়ে রাত্রে সেই পঠিত বিষয়টি নিয়ে অনুধ্যানে ব্রতী হতে। তিনিও তাঁর পত্রকাব্যের একটি পর্যায়ে অনুকরণীয় আদর্শ বলতে প্রাচীন গ্রিক সাহিত্যকেই চূড়ান্ত বিবেচনা করেছিলেন। লনজাইনাসও সেই প্রাচীনকালের মহৎ সৃষ্টির আন্তরিক অনুকরণের কথাই বলেছেন।

প্রতিভার আরো একটি দিক প্রবল আবেগগত প্রেরণা। ছদ্ম-উর্ধ্বায়নের মধ্যে রয়েছে আবেগ প্রকাশের অসংগত উৎসারের কথা আর এর বিপরীতে তীব্র আবেগকে সুসমঞ্জসভাবে প্রকাশ করার ক্ষমতা তো প্রতিভার বিষয়। উভয়ত্রই আবেগ এবং তার প্রকাশ রয়েছে ঠিকই, শুধু তাদের মধ্যে পার্থক্য গুণগত বা প্রকৃতিগত। কারণ প্রথম ক্ষেত্রে আবেগটি ভাবাবেগমাত্র আর দ্বিতীয় ক্ষেত্রে আবেগ তাঁর ব্যক্তিত্বের ও চিন্তাশীলতার অঙ্গ। এবং এই যুক্তিতেই প্রথমক্ষেত্রে সেই ভাবাবেগের প্রকাশ অসংগত বাগাড়ম্বরে পরিণত আর দ্বিতীয়ক্ষেত্রের সুসামঞ্জস্যে তার স্বরূপে যুক্ত হয় ওজস্বিতা। প্রবল আবেগকে রূপদান করার লক্ষ্যেই লেখক তাকে মূর্ত করে তুলতে চান। কবিভাষায় এই মূর্তি গড়বার সূত্রেই যুক্ত হয় সাহিত্যগত প্রকৃত-উর্ধ্বায়নের বাকি তিনটি উৎস।

যেমন, তৃতীয় উৎস হিসেবে নির্দিষ্ট 'যথাযথ রূপকলা নির্মাণ'-এর দুটি অংশ রয়েছে বলে জানান লনজাইনাস। সেই দুটি অংশ হল : ১. ভাবনার রূপকলা নির্মাণ এবং ২. ভাষাগত রূপকলা নির্মাণ। অর্থাৎ প্রথমে যে চিন্তাজগতের নির্দেশচালিত হয়ে সৃষ্টিপ্রক্রিয়ার আরম্ভ, সেই নির্দেশে প্রথমত অন্তর্নিহিত ভাবলোককে প্রকাশের জন্য প্রস্তুত করা দরকার : দ্বিতীয়ত, প্রকাশযোগ্য ভাবলোকটিকে যথাযথ শব্দের বিন্যাসে ও প্রসাধনে বর্ণমালায় প্রকাশ করতে হয়।

এই ভাষাগত প্রকাশের বা ভাষাগত রূপকলা নির্মাণের সূত্রেই চতুর্থ বিষয়টি যুক্ত হয় লনজাইনাসের আলোচনায়। অর্থাৎ এইবারে আলোচ্য তাঁর-বলা 'nobility of phrase'— *যাকে আমরা ইতিপূর্বে বলেছি 'প্রকাশরীতির অভিজাত্য প্রকাশ'। ভাষা প্রকাশের এই চারুত্ববিধান বা আভিজাত্য প্রকাশের উপাদান হিসেবে লনজাইনাস আবার ত্রিবিধ পন্থার কথা জানিয়েছেন। ১. শব্দ নির্বাচন, ২. যথাযথ* বাকপ্রতিমা আর অলংকার প্রয়োগ এবং ৩. কাব্যভাষা-র ব্যবহার ও প্রয়োগগত প্রসারতা। এই সূত্রেই অনেক সময় সমালোচকরা মনোযোগী হয়েছেন লনজাইনাসের মেটাফর প্রবণতার দিকে। লনজাইনাস চমৎকার ভাবে বলেছেন : "art is only perfect when it looks like nature and nature succeeds only by concealing art about her person". পৃথকভাবে অলংকার ব্যবহারের তুলনায় লনজাইনাস জোর দিয়েছেন সেই ধরনের অলংকার প্রয়োগে, যা সমগ্র কবিতাটিকেই উন্নীত করবে উচ্চতর এক মাত্রায়। লনজাইনাস খুব স্পষ্টত জানিয়েছেন :

> We find that figure is always most effective when it conceals the very fact of its being a figure. The sublimity and the effect on the emotions are a wonderfully helpful antidote against the suspicion that accompanies the use of figures. The effrantery of the artifice is somehow lost in its brilliant setting of beauty and grandeur.

তাৎপর্যপূর্ণ উদ্ধৃতাংশের শেষ পঙ্ক্তিটি। অলংকার ব্যবহারের সমস্ত ঔদ্ধত্যকে তিনি যথাযথ কাব্যসৌন্দর্য ও কাব্যৈশ্বর্যের মধ্যে বিসর্জিত করেন। লক্ষণীয় সেখানে কিন্তু তিনি কবিকে তাঁর অলংকার নির্মিতির পথ থেকে সরে আসতে বলেননি ; বলেছেন সেই অলংকার ব্যবহারের চারুত্ব নিয়ে স্বতন্ত্র কোনো আত্মগর্ব যেন তৈরি না হয় তাঁর অন্তরে। কারণ কবিতার সঙ্গে এই প্রকাশরীতির যাবতীয় উপকরণকে অন্তরায়িত করার মধ্যে কবি প্রকৃতির সার্থকতা।

শেষ কথা

বৈশ্বিক সমালোচনা সাহিত্যের ইতিবৃত্ত হোরেস আর লনজাইনাস রোমক ক্লাসিসিজ্‌মের দুই প্রবক্তা রূপে চিহ্নিত। ক্লাসিসিজ্‌ম-এর শুরুয়াত তো আরিস্টটলের হাতে : ইতিহাসের কালক্রমে এঁরা তাঁর সার্থক উত্তরসূরি। উভয়েই কবিপ্রতিভার স্বীকৃতি দিয়েছেন এবং পাশাপাশি অনুশীলন সাপেক্ষ বা চর্চাসাধ্য রচনাশক্তির কথাও বলেছেন। উভয়েই সেই চর্চার উপকরণ হিসেবে প্রাচীন সাহিত্যের আন্তরিক ও ধারাবাহিক অনুধ্যানের বিষয়ে গুরুত্ব দিয়েছেন। কোনো কোনো সমালোচক এঁদের লেখায় কাব্যসৃষ্টির জন্য দৈবী অনুপ্রেরণা অপেক্ষা ব্যক্তিক উদ্যোগের প্রসঙ্গ আলোচনা করেছেন বলে; কিংবা এঁরা ভাষার চারুত্ববিধানের প্রসঙ্গ গুরুত্বের সঙ্গে আলোচনা করেছেন বলে তাঁদের রোমান্টিক সাহিত্যতত্ত্বের আদিপুরুষ বলে চিহ্নিত করতে চেয়েছেন। এই অভিধা সংগত নয় বলেই মনে হয়। কারণ, রোমান্টিক সাহিত্যতত্ত্বের মৌলিক অনুপ্রেরণাগুলি স্বাভাবিকভাবেই অনুপস্থিত তাঁদের লেখায়। শিল্প বিপ্লবোত্তর ইউরোপীয় সাহিত্যে রোমান্টিসিজ্‌ম একটি অনিবার্য ঐতিহাসিক ঘটনা— সেই প্রেরণা খ্রিস্টীয় প্রথম বা তৃতীয় শতকে কোথা থেকে আসবে?

বরং, হোরেসকে ক্লাসিসিজমের প্রবক্তা রূপে আর লনজাইনাসকে নিওক্লাসিসিজমের আদি কথাকার বলে চিহ্নিত করা যায় কি? হোরেস যে সমীচীনতার কথা বিশ্লেষণ করেছেন, সেই সমীচীনতার বা লনজাইনাস যে ঊর্ধ্বায়নের কথা তাঁর অভিসন্দর্ভে বিশদীভূত করেছেন, সেই

উধর্বায়নের চূড়ান্ত রূপ, প্রাচীন সাহিত্যে বর্তমান বলেই তাঁদের স্থির বিশ্বাস। এদিক থেকে এবং সাহিত্যসৃষ্টির ক্ষেত্রে রীতি-পদ্ধতির স্থিরীকৃত মানদণ্ডে উত্তীর্ণ হওয়ার প্রস্তাবে তাঁরা উভয়েই ধ্রুপদিয়ানার ব্যাখ্যাকার। শুধু লনজাইনাস যেখানে কবিপ্রতিভার প্রয়াসসাধ্য অর্জনকে ব্যাখ্যা করেন কিংবা যেখানে তিনি কবিতার বিশেষ একটি অংশের যথাযথ সৃষ্টিকেও কখনো শিল্পসৃষ্টির চমৎকৃতি হিসেবে চিহ্নিত করেন, সেই সকল ক্ষেত্রে তিনি প্রচলিত ক্লাসিসিজম থেকে সামান্য সরে আসেন, সেখান থেকে পরবর্তীকালে ঘোষিত নিওক্লাসিক ড্রাইডেন বা পোপের সাহিত্যচিন্তার যাত্রা রম্ভ।

স্বীকৃতি বা স্বীকারোক্তি

হোরেস এবং লনজাইনাসের দুটি মূলগ্রন্থ আজ থেকে বছর দশেক আগে সস্নেহ প্রযত্নে আমাকে পড়িয়েছিলেন যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়ের বঙ্গভাষা ও সাহিত্য বিভাগের অধ্যাপক তপোব্রত ঘোষ। এই লেখার চৌদ্দ আনাই সেই সময়ে তাঁর কাছে পড়ে-পাওয়ার স্মৃতি। আমার এই সংক্ষিপ্ত আলোচনায় কোথাও তাঁর শব্দ আত্মসাৎ করেছি কোথাও তাঁর পড়ানোর ধরন-ভাবনার সাজানোকে অনেক কসরত করেও এড়াতে পারিনি। শুধু দুটি বিষয় বিশেষভাবে এখানে বলা দরকার ; মনে আছে পড়ানোর সময় তিনি হোরেসের 'প্রপ্রাইটি'-র প্রতিশব্দ হিসেবে সচেতনভাবে ব্যবহার করেছিলেন 'ঔচিত্য'—দেখিয়েছিলেন ভারতীয় কাব্যতত্ত্বের পরিভাষা 'ঔচিত্য'-র সঙ্গে তার সামান্যলক্ষণ ও স্বাতন্ত্র্য। অনুরূপভাবে তাঁর আলোচনায় এসেছিল লনজাইনাসের সূত্রে ভারতীয় অলংকারবাদের কথা। এই দুই অভিনব প্রস্তাব তাঁর নিজস্ব।

এই অভিনব প্রস্তাব দুটি কোনোদিন তিনিই সম্পূর্ণত লিখবেন এই আশায় সে প্রসঙ্গের অবতারণা আমি এখানে করিনি।

শেষ পর্যন্ত, বলা বাহুল্য এই লেখাটির দায়িত্ব বর্তমান নিবন্ধকারেরই।

ধ্রুপদি সাহিত্যতাত্ত্বিক
আরিস্টটল • হোরেস লঙ্গাইনাস

দিলীপকুমার বসু

[প্রথমেই স্বীকার করে নেওয়া ভালো যে আমি প্রাচীন গ্রিকভাষা জানি না। নিচের সমস্ত আলোচনাটুকু দু-একটি ভাষায় আলোচ্য মূল গ্রন্থাদির অনুবাদ-আশ্রিত এবং *সুবোধচন্দ্র সেনগুপ্তের কাছে পড়ার সময় সাধ্যমতো যা বুঝেছিলাম আলোচ্য নিবন্ধটি তারই ফল*]

প্রাচীনতম পাশ্চাত্য সাহিত্যতত্ত্ব-রচয়িতা বলতে আমরা যে-সব লেখকদের জানি তাঁদের মধ্যে যেমন আছেন প্লেটো, আরিস্টটল, হোরেস, সিসেরো, লঙ্গাইনাস (এই নামটিই সব পণ্ডিতরা স্বীকার করে নিয়েছেন খানিক দোনামনার পর), তেমনি ডিমেট্রিয়াস, পিণ্ডার, আরও কয়েকটি নামও স্মর্তব্য; এমন কি আরিস্টোফানেসের কথাও ওঠা উচিত, যাঁর নাটক থেকে নানা পঙ্‌ক্তি সংগ্রহ করে একটা মোটামুটি নাট্যতত্ত্ব অন্তত দাঁড় করানো যেতে পারে। এতসংখ্যক লেখকের বিষয়ে এখানে আলোচনা করার সুযোগ নেই, বর্তমান লেখকের সে ক্ষমতাও নেই; এবং হয়তো তার জরুরি কোনো প্রয়োজনও নেই।— এরকম নানা কারণে আমাদের এই আলোচনা প্রধানত আরিস্টটল ও লঙ্গাইনাসের ক্ষেত্রে সীমাবদ্ধ থাকবে ও সামান্য কিছু কথা প্লেটো এবং হোরেস সম্পর্কেও উঠবে। এই আলোচনায় আমাদের উদ্দেশ্য হবে এইসব প্রাচীন তাত্ত্বিকশ্রেষ্ঠদের রচনাগুলি আমাদের বিবেচনায় আজ কতটুকু কাজে লাগে বা লাগতে পারে তার অনুসন্ধান।

যদিও সমস্ত বিষয়টাই অতি সংক্ষেপে উপস্থাপিত হচ্ছে— প্লেটো এবং হোরেসের পর্যালোচনা তার মধ্যে বিশেষ সংক্ষিপ্ত হতে যাচ্ছে দুই ভিন্ন ধরনের কারণে : প্লেটো তাঁর বিভিন্ন গ্রন্থে কাব্য-সাহিত্য নিয়ে যা বলেছেন তার মধ্যে বাহ্যত পরস্পরবিরোধী কথা আছে, আবার ওঁর বয়োবৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে সাহিত্যচিন্তার পরিবর্তন, কেউ-বা বলবেন বিকাশ, যে হয়েছে তারও অঙ্গীকার রয়ে গেছে। গোটা বিষয়টি আলোচনা করতে গেলে শুধু প্লেটোকে নিয়েই প্রবন্ধ ফাঁদতে হয় যা আমাদের বর্তমান পরিকল্পনার অংশ নয়। তাই, কবি ও কবিতা সম্বন্ধে প্লেটোর সর্বাধিক পরিচিত কথাগুলোই শুধু এখানে ওঠানো হবে।— হোরেসের সম্পর্কে কথা অতি-সংক্ষিপ্ত হওয়ার কারণ অংশত এই যে, আমাদের মনে হয়েছে ওঁর সাহিত্যতত্ত্ব থেকে আমাদের আজ খুব একটা কিছু গ্রহণ করার মতো নেই, আবার অংশত কারণ

এটাও যে উনি যে-কথাটা সবচেয়ে জোর দিয়ে এবং অন্যদের চেয়ে পরিষ্কার করে প্রথম বলেছেন— সাহিত্যের আনন্দ পরিবেশনের সঙ্গে শিক্ষার আলোকদানের কথাটা— তা অন্যান্য তাত্ত্বিকদের বক্তব্যেও অনেক সময় নিহিত ছিল। হোরেসের বক্তব্যটি যে জোরালো ভাবে প্রকাশ পেয়েছে এবং তার যে প্রচার হয়েছে এর কারণ উনি কবিতার পঙ্‌ক্তির মাধ্যমে এটি বলায় তাঁর বক্তব্যের একটি স্পষ্ট পরিচ্ছন্ন রূপ পাঠকমানসে সহজেই মুদ্রিত হয়েছে। আনন্দ ও আলোকদানের এই তত্ত্বটি নিয়ে যুগে যুগে এতই আলোচনা হয়েছে, এতপ্রকার ভিন্ন মত এ-সম্পর্কে প্রকাশ পেয়েছে যে আমরা খুব খানিকটা আলোচনা-তর্ক করে কিছু একটা বললেও সে পূর্বে-বলা নানা মতের আরও একটি উদাহরণ হয়ে থাকবে, এবং এক হিসেবে তেমন নতুন কোনো কথাও হবে না। অথচ, অন্যদিকে, বিষয়টা গুরুত্বপূর্ণ এবং সে-কারণে অন্য তাত্ত্বিকদের কথা আলোচনাকালে এ-প্রসঙ্গে একাধিকবার এসে পড়বার কথা। আপাতত হোরেসের বক্তব্য প্রসঙ্গে এই কথাটি বলেই এখানে থামছি।

প্লেটোর কবি ও কবিতা সম্পর্কে বক্তব্য প্রায় আড়াই হাজার বছর ধরে মানুষের চিন্তায় আলোড়ন তুলছে। এর মধ্যে যে-অংশটুকু তাঁর আদর্শ রাষ্ট্র থেকে কবিকে বহিষ্কারের কথা বলে, সেখানে এই ফতোয়াটি গল্প-গুজবের বিষয় হলেও যে-যুক্তিপরম্পরায় তিনি এই নির্দেশের কারণ প্রতিষ্ঠা করেছেন সেটি কাব্যের প্রকৃতি ও মূল্য আলোচনার ক্ষেত্রে আজও অত্যন্ত প্রাসঙ্গিক।

প্লেটো বিশ্বাস করতেন idea-র এক সম্পূর্ণ জগৎকে যেখানে তাবৎ idea-রা আছে, আমাদের চেনা বাস্তবে। চারপাশের বাস্তবে, phenomena-র জগৎব্যাপী তার অনুকরণমাত্র হয়। এই অনুকরণগুলি সহস্র চেষ্টায়ও idea-র নিখুঁত রূপগুলি ছুঁতে পারে না, তুলে ধরতে পারে না, অল্প বিস্তর কাছাকাছি যেতে পারে মাত্র। আমরা যদি idea-র জন্য 'ভাব' শব্দটি ব্যবহার করি এবং world of phenomena-র জন্য 'বস্তুজগৎ' তাহলে বলতে পারি বস্তুজগতে নির্মিত বস্তুগুলি ভাবগুলির কিছু পরিমাণ অক্ষম অনুকরণ। *রিপাব্লিক* গ্রন্থের বাইরে অন্যত্র এবং *রিপাব্লিক*-এর দ্বিতীয় ও তৃতীয় অধ্যায়ে প্লেটো অবশ্য অনুকরণযোগ্য ও অনুকরণের অযোগ্য ভাব ও বস্তুর পার্থক্য করেছেন, সুচারু ও অক্ষম অনুকরণের মধ্যে পার্থক্য দেখেছেন। কিন্তু শেষ অবধি ধীরে ধীরে যুক্তিজাল বিস্তার করে দশম অধ্যায়ে পৌঁছে বলেছেন সত্য ও অসত্যের মধ্যে পার্থক্যের কথা— দার্শনিক তথা বিজ্ঞানী সত্যের সাধক এবং কবি আর রাজনৈতিক বক্তা অসত্যের প্ররোচক।

সাহিত্য-আলোচনায় 'অনুকরণবাদ'-এর জন্মদাতা প্লেটোর অবদান অসীম, যদিও প্লেটো-কথিত ঐ 'ভাবজগৎ'-এ আজ কেউই প্রায় বিশ্বাস করেন না। প্লেটো নিজে *রিপাব্লিক*-এর দশম অধ্যায়ে বলেছেন কবি অনুকরণের অনুকরণ করেন— একটি পালঙ্কের উদাহরণ দিয়ে তিনি বলেছেন পালঙ্কের ভাবটিকে যেটি শাশ্বত, কাঠের কাজ করেন যে-মিস্ত্রি অনুকরণ করেন; আর কবি অনুকরণ করেন সেই পালঙ্ক বস্তুটিকে। তাই কবির রচনা সত্যভাব থেকে দুই ধাপ সরে গিয়ে যথেষ্ট অসত্য একটি বস্তু রচনা করে। এই অসত্যের পসারি কবির সত্যে পৌঁছোতে চাওয়া আদর্শ রাষ্ট্রে কোনো জায়গা হতে পারে না— মিথ্যা বা অর্ধসত্য সেখানে বিভ্রান্তি তৈরি করে জনমানসের সত্যের পথ-যাত্রা পর্যুদস্ত করবে। প্লেটোর এই উক্তিই বিপুল প্রসিদ্ধি লাভ করেছে, এবং পরবর্তী সাহিত্যচিন্তার প্রধানত দুটি দিকের আদিবীজও হয়তো এখানেই দেখা যাবে। এই দুটি দিকের একটি দিক অনুকরণ তত্ত্ব-আশ্রিত, যা পরবর্তী কালখণ্ডগুলিতে হয় নানাভাবে বিনা প্রশ্নে স্বীকার করে নেওয়া হয়েছে, নয়তো এই তত্ত্বের নানাবিধ ব্যাখ্যা একে

খানিকটা মোচড় দিয়ে বদলে নিয়ে অন্যান্য তত্ত্বপ্রস্থানে পৌঁছেছে। বিংশ শতাব্দীতে Aurebach-এর বিখ্যাত গ্রন্থ *Mimesis* এর অন্যতম উদাহরণ। উপন্যাস-আলোচনায় 'verisimilitude'-এর এককালীন গুরুত্ব (উপন্যাসের ঘটনাপ্রবাহ, চরিত্র ইত্যাদির সর্বদাই উপন্যাসের বাইরে *আমাদের অভিজ্ঞতা-লব্ধ বাস্তবের সঙ্গে সঙ্গতি রেখে চলবার বাধ্যবাধকতা থাকবে, এই চিন্তা), সাহিত্য সমাজের দর্পণ, গীতিকাব্য মনের দর্পণ— এই ধরনের সব চিন্তার শাখা-প্রশাখাও এই বীজের সঙ্গে জড়িত, যদিও সমাজ-দর্পণের উপমাটির একমাত্র উদ্ভব প্লেটোতেই হয়েছে একথা কিছুতেই বলা যাবে না।— দ্বিতীয় যে দিকটি এই আদিবীজে ছিল তা হল নীতিগত প্রশ্নের সঙ্গে* সাহিত্যের প্রকৃতি ও মূল্যবোধকে জড়িয়ে দেওয়া হয়েছিল; কবি আদর্শ রাষ্ট্রে থাকবেন না মিথ্যের বেসাতি করেন বলে, অর্থাৎ নৈতিক কারণে। কাব্যের যেহেতু প্রভাব বিস্তারের অবিসংবাদী ক্ষমতা আছে, মিথ্যা-অর্ধসত্য-ছায়ার ছায়া নিয়ে তাঁর নগর ভ্রমণ বিশেষ করেই আপত্তিকর। এই দিকটি নিয়ে বিভিন্ন দেশে-কালে নানা ধরনের বিতর্কের সূত্রপাত হয়েছিল। নিকটতর কাল থেকে এ-ব্যাপারে দু-একটি উদাহরণ দেওয়া যেতে পারে 'Art for art's sake. 'শিল্পের জন্যই শিল্প' এই তত্ত্বে প্লেটোর অধিষ্ঠানকে আক্রমণ, এবং সেই আক্রমণের বিরুদ্ধে প্রতিরোধের কাহিনি Wilde–Pater–Bradley-র রচনায় পাওয়া যায়। আক্রমণ ও প্রতিরোধের ব্যাপারটি শেষ উনবিংশ শতাব্দী ও বিংশ শতাব্দীর প্রথম দুই দশক ধরে তুমুল ছিল (তবে দ্বন্দ্বের ধারাটি এই সময়েই সীমিত ছিল না এটাও মনে রাখতে হবে)। সাধারণ অজস্র মানুষের কথা সাহিত্যে-কাব্যে-নাটকে আসা প্রয়োজন— যখন এমন ভাবা হয়েছে তার মধ্যেও নতুন গণতান্ত্রিক নৈতিকতার কথাটা নিহিত ছিল। একরকম শিল্প-সাহিত্যের চর্চা করার জন্য যখন শিল্পী-সাহিত্যিকদের নিন্দিত-তিরস্কৃত হতে হয়েছে, জেলে যেতে হয়েছে, দেশ হতে বিতাড়িত হ'তে হয়েছে, মৃত্যুবরণ পর্যন্ত করতে হয়েছে, আত্মহত্যা করতে হয়েছে— সে আমেরিকা-রাশিয়া-ভারত-বাংলাদেশ যেখানেই হোক্— এই ভাবধারার মূল রয়ে গেছে ঐখানে। একটি বই নিষিদ্ধ-বাজেয়াপ্ত যে হয় তা-ও ঐ কারণেই, এবং এই সমস্ত বই-পত্রের সবকটি প্রবন্ধপুস্তক নয়, বিস্তর পরিমাণে কাব্য-সাহিত্য-নাটক-গ্রন্থ। দেশে-দেশে Censor Board-গুলি ঐ কারণেই আছে।

বুদ্ধদেব বসু যখন জীবনানন্দ-আলোচনা করতে গিয়ে, 'সে কেন জলের মতো ঘুরে ঘুরে একা কথা কয়' পংক্তিটি আলোচনা করার সূত্রে বলেন যে 'কবিতা কী? একটি সুর, আর কিছুই না।' তখন তিনি আড়াই হাজার বছর আগেকার এক বাদী সুরের বিপরীতে একটি বিবাদী সুর যোজনা করছেন। আর অন্যমহলে এর প্রতিবাদ শুরু হয় ; এভাবে এ-বিষয়ে সমাজে বিবাদ চলতেই থাকে। অনুকরণবাদের কথাটা আপাতত আমরা চাপা দিয়ে রেখেছি, আরিস্টটল-সম্পর্কিত আলোচনায় তাঁকে আবার ফিরিয়ে আনা হবে, কিন্তু এই দ্বিতীয় দিকটি, *রিপাব্লিক* গ্রন্থের দশম অধ্যায়ের ভাববীজ থেকে যা উদ্ভূত হয়েছে সে-সম্পর্কে এই প্রবন্ধে কথাবার্তা এখানেই শেষ করা যেতে পারে।

এই দু'টি দিক ছাড়া আরেকটি তৃতীয় চিন্তার ধরন প্লেটোর ঐ বই থেকেই শুরু হয়েছে যা দর্শনশাস্ত্রের আলোচনায় ইদানীং গুরুত্বপূর্ণ জায়গা নিয়েছে জাক দেরিদার লেখা বইগুলির পর। বহুদিন প্লেটোর থেকে সংকেত পেয়ে নির্দ্বিধায় নির্বিচারে আমরা এই কথাটা মেনে নিয়েছিলাম যে দর্শন (বা বিজ্ঞান)-এর ভাষার প্রকৃতি এক, কবিতা বা রাজনৈতিক বক্তৃতার ভাষার প্রকৃতি অন্য। প্রথমটি সত্য অনুসন্ধান-প্রকাশে ইচ্ছুক; দ্বিতীয়টির কাম্য অভিভূতি, সেখানে সত্য-মিথ্যার চিন্তা নেই, সেখানে সাধারণত মিথ্যার বিস্তার। দেরিদা বিভিন্ন দার্শনিকের

লেখার ঘনিষ্ঠ বিশ্লেষণ করে দেখাতে চেয়েছেন যে, ওঁদের তত্ত্বগুলিও কোনো কেন্দ্রীয় ও মৌলিক জায়গায় উৎপ্রেক্ষা-নির্ভর, সমস্ত তাত্ত্বিক কাঠামোটাই দাঁড়িয়ে আছে ঐ উৎপ্রেক্ষা-সমৃদ্ধ বাক্যের উপর, এবং তাই আদতেই দর্শনের ভাষা ও কাব্যসাহিত্যের ভাষায় কোনো তফাৎ নেই। এ-কথা যদি একবার মেনে নেওয়া হয় তাহলে দর্শন ও কবিতার মাঝে প্লেটোর তৈরি সত্য-মিথ্যা বিভাজনের দেয়ালটি ধ্বসে পড়বে।

২.

প্রাচীন গ্রিক পণ্ডিতরা ভিন্নতর প্রসঙ্গে সাহিত্য সম্পর্কে তাঁদের চিন্তার বিস্তার ঘটিয়েছেন, কিন্তু আরিস্টটল (খ্রি. পূ. ৩৮৪-৩২২) তার *পোয়েটিক্স*-এ প্রথম সাহিত্যতত্ত্ব আলোচনার বিশুদ্ধ উদ্দেশ্য নিয়ে এগোলেন এবং দেখা গেল যে, কাব্যসাহিত্য সম্পর্কে তিনি তাঁর গুরু প্লেটোর বিভিন্ন মত খণ্ডনে আগ্রহী। প্লেটো, সর্বতোভাবে না হলেও, প্রধানত নৈতিকতার ফ্রেমে সাহিত্য নিয়ে চিন্তা করেছেন, আরিস্টটল সেখান থেকে সরে এসে সাহিত্যের প্রকৃতির উপরেই দৃষ্টি নিবদ্ধ রাখলেন। এই প্রথম একজন সাহিত্যের ইতিহাসকে আলোচনায় টানলেন, অল্প ব্যাকরণের কথাও এলো তাঁর লেখায়। গুরুর কাছে যে শিক্ষা পেয়েছিলেন তার থেকেই তাঁর চিন্তা প্রবাহিত হয় ঠিকই কিন্তু বড়ো প্রতিবাদও এল তাঁর কাছ থেকে। 'অনুকরণ'-এর তত্ত্বটি তিনি স্বীকার করে নিলেন, কিন্তু কাব্যে বস্তুজগতের অনুকরণ দেখলেন না, দেখলেন ভাবজগতের প্রত্যক্ষ অনুকরণ। এবং এই কথাটিকেই বিশদ করতে গিয়ে বললেন (ইতিহাস ও কাব্যের তুলনাপ্রসঙ্গে) যেটি 'ভাব', যা 'বিশ্বজনীন' তাকেই কাব্য অনুকরণ করে, ইতিহাস করে বস্তুজগতের তথ্যাবলী মাত্রকে—এবং এজন্যই কাব্য ইতিহাসের চেয়ে শ্রেয়োতর। তথ্য, যা বাইরের জিনিস, আর সত্য, যা ভিতরের কথা বা নিয়ম তার পার্থক্য মানবচিন্তায় সংযোজিত হল এবার। রবীন্দ্রনাথ যখন কবিতায় ভারতের আদিকবিদের একজন বাল্মীকির রচনা সম্বন্ধে অন্য চরিত্রের মাধ্যমে জানান 'সেই সত্য, যা রচিবে তুমি/কবি, তব মনোভূমি অযোধ্যার চেয়ে সত্য জেনো', কথাটা অনেকটা অ্যারিস্টটলীয় ধরনেরই হয়, যদিও এতে কান্ট কোলরিজ-বাহিত চিন্তারধারাও খেয়াল করা যেতে পারে। তথ্যের চেয়ে সত্য বড় একথা আজ নানা দর্শনে (অনেক সময় প্রতিস্পর্ধী দর্শনে) বিশ্বাসী লোকেরা একরকম মেনেই নিয়েছেন। বিংশ শতাব্দীর হাঙ্গেরীয় তাত্ত্বিক লুকাচ যখন বলেন একটা যুগের প্রতিনিধি গড়পড়তা মানুষ হতে পারেন না, এগিয়ে থাকা সেই মানুষই হতে পারেন যিনি ইতিহাসের একটি অনিবার্য গতি সেই মুহূর্তে স্তিমিত থাকলেও আপন চিত্তে ও কর্মে ধারণ করে আছেন, তখন তাঁর বক্তব্যেও আরিস্টটলীয় ঐতিহ্য আমাদের চোখে পড়ে। তথ্যের দিক থেকে সমাজবিপ্লবের ধারা স্তিমিত এটা ঘটনা, মানবেতিহাসের প্রবাহের দিক থেকে বড়ো সত্য এর অন্তরালে আছে। বড়ো কবি এই সত্যকে রূপায়িত করেন। মানবজীবনের ধারার বিশ্বজনীনকে এভাবেই কবি অনুকরণ করেন। এই এগিয়ে থাকা মানুষটিই তাঁর নায়ক।

এই নায়ক-নির্বাচনে বাইরের মাঝারিমাপের মানুষের বাস্তবকে বাদ দিয়ে আদর্শায়িত চরিত্র খুঁজবার যে ঝোঁক আছে, তার পিছনেও আরিস্টটল আছেন, হয়তো অনুকরণযোগ্যের সন্ধানী প্লেটোও আছেন। মুখ্যত অবশ্য আছেন আরিস্টটল। ট্র্যাজেডির উপযুক্ত নায়ক খুঁজতে তিনিও সাধারণ মাপের মানুষের চেয়ে মহত্তর চরিত্র খুঁজতেই উপদেশ দিয়েছেন।

আরিস্টটল ছিলেন একজন আইসোপ্যাথের (হোমিওপ্যাথির একটি আদিরূপ বলা যেতে পারে) সন্তান। হয়তো সেই কারণে, তেমনটি না-ও হতে পারে হয়তো, ওঁর 'ক্যাথারসিস'-এর তত্ত্ব, যার নানা ব্যাখ্যার একটা হল করুণা ও ত্রাসের অনুভূতি দু'টিকে উদ্বেজিত করে

মন থেকে আবেগের সাময়িক নিষ্কাশনের সামর্থ্য রাখে ট্র্যাজেডি। সমরাঙ্গনে পুরুষোচিত বীর্যও তাতে অবারিত হবে, এই কেজো কথাটিও এতে নিহিত আছে এমনও কোনো কোনো সমালোচক বলেছেন, যদিও কথাটা আরিস্টটল ওঠান নি। (এখানে মনে করিয়ে দেওয়া ভাল, যেভাবে সমস্ত গ্রিসের প্রাচীন তত্ত্ব-আলোচনাগুলি নানা বিষয়ে হয়েছে, তাতে আজ আমাদের বড়ো অস্বস্তির কারণ আছে; স্ত্রীলোকেরা যে আছে, মানব এবং মানবী মিলেই যে মানবসমগ্র ইউরিপাইদিসের বাইরে তার আভাসমাত্র পাওয়াও সেখানে দুরূহ। স্যাফোর কবিতার কয়েকটি বেঁচে না থাকলে আমাদের পক্ষে সম্পূর্ণ হতবাক হয়ে থাকা ভিন্ন কোনো গত্যন্তর ছিল না। মেয়েদের জীবনধারা ও আকাঙ্ক্ষার স্বাতন্ত্র্য শুধু ইউরিপাইদিস-এই পাওয়া যায়। ক্যাথারসিস-এর আলোচনায় আমরা পরে আসছি, আমরা শুধু এখানে এটুকু লক্ষ করতে চাই যে প্লেটো যে কবিরা মত্ত, দায়িত্ববোধহীন অনুভূতির উৎস রচনা করেন শ্রোতা/পাঠকের মনে এমন অভিযোগও আরিস্টটল ওঁর ক্যাথারসিস-এর তত্ত্বের সাহায্যেও খণ্ডন করার চেষ্টা করেছেন। নৈতিকতার ফ্রেম থেকে খুলে নিয়ে এসে কবিতাকে-নাটক কে তিনি পুনর্বিচার ঠিকই করেন, কিন্তু সর্বত্র একেবারে তাকে বাদ দিতে পারেননি। ওঁর ছাত্র পড়াবার জন্য তৈরি খসড়া থেকে গঠন করা হয়েছে *পোয়েটিক্‌স্* গ্রন্থটিকে, কাজে কাজেই পূর্ণতর ব্যাখ্যায় তিনি আর কী বলতেন তা আজ আর জানা সম্ভব নয়। কিন্তু এটা অনুমান করা যায় যে teleological 'why'-কে সক্রেটিসের পরে আর চিন্তা থেকে বাদ দেওয়া সম্ভব ছিল না। প্রশ্নের উদ্দেশ যখন 'জীবন কী জন্য?' 'একাজ করব, ভালবাসব একে মূল্য দেব কেন?' এই অভিমুখে ধাবিত হয় তখন আর নৈতিকতার ফ্রেমটিকে সম্পূর্ণ বিসর্জন দেওয়া চলে না। ইদানীং বাঙালি আধুনিকতাবাদী কবিদের সঙ্গে উত্তর-আধুনিক চেতনার ('উত্তর-আধুনিক' 'পোস্ট-মডার্ন'-এর বাংলা প্রতিশব্দ আদৌ নয়, এটা পাঠক জানেন ধরে নিচ্ছি) ধারক-বাহকদের যে সংগ্রাম চলছে তার পশ্চাৎপটেও আমাদের এই প্রশ্ন : 'কবিতা কি মত্ত, দায়িত্বহীন অনুভূতিমালার উৎসব হওয়া কাম্য?' প্রশ্ন যখন এভাবে করা হয় তখন যদি তাকে গুরুমশায়ের তর্জনী বা বেত উঁচিয়ে জিজ্ঞাসার মতো মনে করা হয় তা হলে ভুল হবে। উচ্চারণটিও প্রকৃত প্রস্তাবে মানবজীবন, মানবভবিষ্যৎ সম্পর্কে চিন্তামগ্ন মানুষের নিজেকে ও অপরকে প্রশ্ন। প্রায় পাঁচশ বছর আগে প্রকাশিত উত্তর-আধুনিক কবিতার প্রথম সঙ্কলনটির শেষে দীর্ঘ এক প্রবন্ধের শেষ কয় পাতা জুড়ে ধূয়ার মতো বার বার ফিরে আসা যে প্রশ্নটি সঙ্কলক-সম্পাদক কবি অমিতাভ গুপ্ত করেছিলেন : 'তরুণ কবি, আপনি কোনদিকে?' তার আর্তিও মূলত এই দায়িত্ব নেওয়া না-নেওয়ার মধ্যে একটিকে বেছে নেয়ার প্রশ্নটি আশ্রিত ছিল। এই প্রশ্নটি ঠিক কবিতার ভাষা, শৈলী, গঠন কেমন হওয়া কাম্য সে-বিষয়ে কোনো অনুজ্ঞা নয়, যে-ধরনের ভাব প্রাচীন গ্রিক তাত্ত্বিকরা সম্পূর্ণ এড়াতে পারেন নি— প্লেটো কবিতার বিষয়বস্তুর কথা বলতে গিয়ে, আরিস্টটল ট্র্যাজেডির আদর্শ গড়নের আলোচনায়।

আরিস্টটলের আলোচনায় সবচেয়ে মূল্যবান ও মৌলিক জিনিস বোধহয় ট্র্যাজেডির অঙ্গ-বিশ্লেষণ করে সংজ্ঞা দান। Ingram Bywater-এর অনুবাদ থেকে আমি ঐ সংজ্ঞাটি উদ্ধৃত করছি :

> A tragedy then, is the imitation that is serious and also, as having magnitude. complete in itself ; in language with pleasurable accessories, each kind brought in separately in the parts of the work : in a dramatic, not in a narrative form ;

with incidents arousing pity and fear, wherewith to accomplish its catharsis of such emotions...There are six parts...of every tragedy, as a whole,...a Fable or Plot, Characters, Diction, Thought, Spectacle and Melody ;...The most important of the six is the comtbination of the incidents of the story. Tragedy is an *imitation* not of persons but of *action and life* [বাঁকা হরফগুলি আমার], of happiness and misery. the most powerful elements of attraction in Tragedy, the Peripeties and Discoveries, are parts of the plot.

প্লটেরই যে প্রাথমিক গুরুত্ব ট্র্যাজেডিতে একথাটা জোর দিয়ে বলতে গিয়ে উনি ঘটনাক্রম যে laws of necessity and probability' দ্বারা বাঁধা থাকবে, নিয়ন্ত্রিত হবে আদর্শ প্লটে একথা বলেছেন। Probability বা সম্ভাব্যতার কথাটা ব্যবহার করার পর তিনি সেটা যেখানে এগিয়ে নিয়ে গেছেন সেখানে সত্য তথ্যকে অতিক্রম করে, কাব্য তথ্যের নথিবদ্ধ ইতিহাসের চেয়ে উচ্চতর পর্যায়ে নিয়ে যায় (এটা অবশ্য ইতিহাস রচনা সম্বন্ধে ওঁর সেকেলে ধারণা; শুধু ঐতিহাসিকরা নয়, অন্যরাও আজ স্বীকার করবেন না যে ইতিহাসের একটি গ্রন্থ শুধুমাত্র তথ্যের ভাণ্ডার। ঐতিহাসিকেরও তাঁদের গ্রন্থে একটা দৃষ্টিভঙ্গি/জীবনদর্শনের প্রকাশ ঘটান, আর সেই কারণেই বিভিন্ন ঐতিহাসিক গ্রন্থ যা একই যুগের বিষয়ে লেখা তা অনেক পৃথক হয়ে যায়)।

আরিস্টটলের আলোচনায় অনেক বেশি গুরুত্বপূর্ণ 'necessity.' কথাটা। ঘটনা থেকে ঘটনায় ট্র্যাজেডি যখন পথ-অতিক্রম করে, তখন অবশ্যম্ভাবিতার, অনিবার্যতার একটি বোধ পাঠক / দর্শকের মনে সঞ্চারিত না হলে, আরিস্টটল বলছেন, সে ট্র্যাজেডি রচনায় কিছু ব্যর্থতা থাকে । এটাকেই তিনি 'Unity of Action' বলতে চেয়েছেন। ঘটনাক্রম একটি এমন সূত্রে বদ্ধ হয়েই ঐক্য অর্জন করে, শিল্প-গুণান্বিত হয়ে ওঠে, একটি বিশেষ মানুষের ভাগ্যকে খানিক কৌতূহলে অবলোকনের পরিবর্তে ট্র্যাজেডি পাঠ বা দর্শনের অভিজ্ঞতা হয়ে ওঠে আপন অস্তিত্ব ও বিশ্বের সঙ্গে তার সম্পর্কের সম্বন্ধ আবিষ্কার, একটি নিয়ামক বিধির অনুধাবন। সেখানেই কেন্দ্রীয় ট্র্যাজিক চরিত্রের সঙ্গে আমরা একাত্ম হয়ে বিশ্বনিয়মের একটা বড়ো দিককে অনুভব করি। গুরু প্লেটোকে এভাবে অ্যারিস্টটল জবাব দিলেন ট্র্যাজিক কাব্যের মহিমাকে তুঙ্গে উপস্থাপনা করে।

এই Unity of Action শুধু ট্র্যাজেডি-রচনায় নয় এপিক-এও প্রয়োজন। পরবর্তীকালে যে-কোনো আখ্যান-নির্মাণ সম্পর্কে, তা পদ্যে রচিত হোক্ বা গদ্যে এই Unity of Action-এর বিষয়টি তাত্ত্বিকের কাছে সবচেয়ে বেশি প্রাধান্য পেয়েছে। বিংশ শতাব্দীর মধ্যভাগের আগে সকলেই এ-সম্পর্কে নির্দ্বিধ ছিলেন, এভাবেই সাহিত্যপাঠ ও সাহিত্যের মূল্যায়ন হত। তবে আখ্যানের এই আদর্শ মূলত পাশ্চাত্য জগতের, ও : ঔপনিবেশিক সময়কাল থেকে তার প্রভাবে অন্যান্য দেশের সঙ্গে ভারতবর্ষেও আখ্যান রচনায় এই রীতি প্রচলিত ছিল।

পরবর্তী যুগে পাশ্চাত্যে আরিস্টটলের বক্তব্য বলে কথিত 'unity of time' এবং 'unity of place' (আসলে আরিস্টটলের বক্তব্য নয়)-- এই শব্দবন্ধ দুটিকে নিও-ক্ল্যাসিক্যাল সমালোচকরা অ্যারিস্টটলের বক্তব্যের ভুল ব্যাখ্যা করে 'হাইলাইট' করেছেন। আরিস্টটলের *পোয়েটিক্স*-এ unity of place সম্বন্ধে কিছুই বলা হয় নি। আসলে গ্রিক নাটক যেভাবে মঞ্চস্থ হত, তাতে প্রধান চরিত্রদের একই স্থানে স্থিত থাকা ছাড়া কোনো উপায় ছিল না, কারণ Chorus-দের দল বেঁধে নাটকের চরিত্রদের পিছনে যত্র-তত্র যাওয়া হাস্যকরভাবে অবিশ্বাস্য

হ'ত। Unity of time সম্বন্ধে এক জায়গায় আরিস্টটল শুধু বলেছেন যে প্লটে ঐক্য বজায় রাখতে একটু বেশি সুবিধা হবে যদি সূর্যের পৃথিবীকে একবার আবর্তন কালের মধ্যে কাহিনীকে সীমাবদ্ধ রাখা যায়। অবশ্য 'One diurnal rotation of the sun' শুনে গ্যালিলিও-পরবর্তীকালের মানুষের একটু হাসি পাবে, বিজ্ঞান এগিয়েছে মহাবিশ্বের গতি-প্রকৃতি জানার ব্যাপারে। কিন্তু হাসির ব্যাপার শুধু সেটা নয়, হাসি ও দুঃখের ব্যাপার হল কিছু পণ্ডিত বেশ অনেকটা সময় ধরে এটাকে একটা অলঙ্ঘ্যনীয় নিয়ম হিসেবে চালু রেখে সকলকে বিভ্রান্ত করা চেষ্টা করেছেন। সপ্তদশ শতকের দ্বিতীয়ার্ধে Racine-এর মতো বিখ্যাত ফরাসি নাট্যকার একে যদি নিগড় হিসেবে অনুভব করে থাকেন (আমরা জানিনা উনি এমন ভেবেছিলেন কিনা), যদি তাঁর নাট্যরচনায় এটা এক প্রতিবন্ধক হয়ে দাঁড়িয়ে থেকে থাকে, তাতে অবাক হবার কিছু নেই, আপশোশ থাকতেই পারে। সুখের বিষয় ইংল্যন্ডে এসব নিয়মকানুন তেমনভাবে কোনদিনই চলেনি, এবং *অ্যান্টনি অ্যান্ড ক্লিওপেট্রা* নাটকে তিনটি মহাদেশে ছড়ানো স্থান, আবার কালসীমাও আঠারো বছরের মতো।

তত্ত্বের দিক থেকে unity of action-এর ধারণাকে ধাক্কা দিলেন ব্রেখট। বের্টেল্ট ব্রেখ্‌ট্‌ নিয়ে এলেন তার 'এপিক থিয়েটার-'এর তত্ত্ব, 'narration' নানারূপে তাঁর বিভিন্ন নাটকের উপাদান হয়ে উঠল, দর্শক এবং অভিনেতাকে তিনি ক্ষণে ক্ষণে বিচ্ছিন্ন করলেন চরিত্রে ডুবে মগ্ন থাকা হ'তে, এবং সব মিলিয়ে 'অনিবার্যতা'র বোধ হতে সরিয়ে দর্শক/পাঠককে 'নিবার্যতা'র বোধে জাগ্রত করতে তিনি চেষ্টিত হলেন। 'Episodic' কথাটা আরিস্টটল অবজ্ঞায় ব্যবহার করেছিলেন, ব্রেখ্‌ট্‌ উচ্চকণ্ঠে ঘোষণা করলেন তাঁর নাটক episodic। মানুষের কাছে সবসময়েই অন্য পথ খোলা ছিল, সেটা সে বেছে নেয়নি এবং তার ফলেই পৃথিবী আজও অসুন্দর, একথা তাঁর নাটকগুলি বলল; এবং দর্শক/ পাঠককে নিজের জীবন সম্পর্কে ভালভাবে চিন্তা করে জীবনের সঠিক পথ বেছে নিতে উদ্দীপিত করার জন্য যত্ন করল। জীবনের ট্র্যাজিক সত্য দেখানোর কারণে যে অসহায়তার বোধ সৃষ্টি হয় মানবমনে তা থেকে মুক্তি দেবার জন্য তাঁর এই চেষ্টা।

বিংশ শতাব্দীর শুরু থেকেই বাস্তববাদ-বিরোধী একরকম নাট্যরচনা অনেকে শুরু করেছিলেন। তাঁরা আবার প্রায়ই নিজেদের 'বুর্জোয়া মূল্যাবোধ-বিরোধী' শিল্পী বলে নিজেদের চিহ্নিত করতেন। প্রথম কয়েক দশকে এটা ছিল একটা বিরোধী স্বর, অনেক কণ্ঠের, কিন্তু অগোছালো এই স্বর শতাব্দীর মধ্যভাগে পৌঁছোতে পৌঁছোতে এটা হয়ে উঠল নাটক লেখার, কবিতা ইত্যাদি লেখারও একটা প্রচলিত ধারা ও রীতি। নানা পণ্ডিত নানা নাম দিয়েছেন তাকে, তবে সবচেয়ে প্রচলিত নাম, অন্তত আমাদের দেশে, নাটক চিহ্নিত করার ক্ষেত্রে, উদ্ভট বা কিমিতিবাদী নাটক। এ-ধরনের রচনাও Unity of Action-এর, সহজবোধ্য কারণেই, কোনো পরোয়া করল না।

এরকম একটা সময়েই আরো নানাভাবে, বিশেষ করে উপন্যাসরচনার ক্ষেত্রে, নানা নিরীক্ষা ঐ Unity of Action-কে তাদের নির্মাণ থেকে সরিয়ে দিল। এরকম সময়েই 'melodrama' শব্দটি, নিন্দাসূচক একটি শব্দ থেকে এক ধরনের রচনারীতির একটি নিন্দা-প্রশংসার বাইরে দার্শনিক দৃষ্টিতে দেখা সংজ্ঞা হয়ে উঠল, এবং শিল্পী-সাহিত্যিকদের এক অংশ তাঁদের নিজস্ব প্রয়োজনে এই রীতির প্রয়োগ অকুণ্ঠভাবেই করতে লাগলেন। চলচ্চিত্রকার ঋত্বিক ঘটক এইরকম শিল্পীদের এক উদাহরণ। ঘটনাগুলির পারম্পর্যকে বিত্রস্ত করে আকস্মিকের আমদানিই মেলোড্রামার যে একটা বড় লক্ষণ সে কথা উল্লেখ করে একদা এর নিন্দা করা

হত এবং মেলোড্রামাকে নিচুস্তরের শিল্প বলেই গণ্য করা হত। কিন্তু ক্রমে আরিস্টটল-কথিত ঘটনা-শৃঙ্খলার অনিবার্যতা সাহিত্যরচনার প্রধান সূত্র হিসেবে স্থানচ্যুত হলে মেলোড্রামা সেই স্থান অধিকার করল।

এতসব সত্ত্বেও Unity of Action-এর ধারণাটির গুরুত্ব সাহিত্যভাবনার ইতিহাসে রয়েই গেছে, এবং বেশির ভাগ আখ্যান-রচয়িতা এখনও এটিকেই সুষম রচনার নির্দেশিকা বলেই মনে করেন। আরিস্টটল অবশ্য শুধু ট্র্যাজেডি ও এপিকের কথাই বলেছিলেন, কিন্তু যে-কোনো আখ্যানেরই সংবদ্ধতা এ-ধরনের এক নিয়মের দাবি করে, যদিও সংবদ্ধতা অন্যভাবেও আসার রাস্তা খোলা আছে। বিনির্মাণের অধুনা চলতি তত্ত্ব (Deconstruction) নির্মাণের ফাটল খুঁজে গভীর অর্থ বার করে; নির্মাণের, স্থাপত্যের কোনো আভাসমাত্র সেখানে না থাকলে বিনির্মাণের সম্পূর্ণ চেষ্টাটা শুরুই হতে পারে না।

আরিস্টটল- প্রদত্ত সংজ্ঞাটির প্রতিটি বাক্যাংশে নানা গভীর আলোচনার বিষয় লুকিয়ে আছে তার সবকিছু নিয়ে আলোচনা একটি ছোট প্রবন্ধে সম্ভব নয়। তবে যেহেতু আমরা এখানে প্রাচীন গ্রিক সাহিত্যতত্ত্বের প্রাসঙ্গিকতার ব্যাপারেই প্রধানত আলোচনা করছি, সেক্ষেত্রে দু-একটা জিনিস সবার জানা হলেও একবার অন্তত উল্লেখ করতেই হয়। প্লটকে আরিস্টটল যে প্রাধান্য দিয়েছেন তা মূলত পিছন ফিরে দেখা দুই শতাব্দীর গ্রিক নাটককে দেখার ফলশ্রুতি। আমরা জানি, পরবর্তীকালে, বিশেষত শেক্স্পিয়রের নাটকে প্লটের চেয়ে অনেক বেশি গুরুত্বপূর্ণ জায়গা নেবে চরিত্র। এবং সেই সূত্রে উঠে পড়বে hamartia বা ট্র্যাজিক ভ্রান্তির কথাটা। আরিস্টটলের খ্যাতি ও সীমাবদ্ধতা দুই-ই লক্ষ করতে গিয়ে পরবর্তী তাত্ত্বিক ও সমালোচকরা বলেছেন উনি খুঁটিয়ে অঙ্গপ্রত্যঙ্গ পরীক্ষা করেছেন প্রাচীন গ্রিক নাটকের— যার গুণ ও বৈচিত্র্য এযাবৎকালের যে-কোনো যুগের রচনার তুলনায় মহত্তর ও বিপুলতর। কিন্তু যিনি এমন করেছেন বলে খ্যাত তাঁর ব্যবহৃত hamartia কথাটিকে আমরা ঠিক কী অর্থে বুঝব? অভিধানে hamartia মানে নানা ছায়া-প্রচ্ছায়া। উনি কি বলতে চাইছেন ওটা আমাদের চেয়ে উঁচুমানের এক ব্যক্তির হঠাৎ হয়ে-যাওয়া একটা ভুল পদক্ষেপ, a chance mistake? না একটা ভুল বিচারধারাকে সাময়িক আমন্ত্রণ, যা অন্যায়ের পর্যায়ে গিয়ে পড়ে? প্রথমটি *রাজা ইডিপাস* সম্পর্কে সত্য, দ্বিতীয়টি *আন্টিগোনে* সম্পর্কে (রাজা ক্রেয়ন যখন ক্রোধের বশবর্তী হয়ে পলিনিবেস-এর মৃতদেহ সমাধিস্থ করতে বারণ করে আজ্ঞা জারি করেন) সত্য। কিন্তু প্রশ্ন তো এ-ও দাঁড়াবে যে আন্টিগোনে তার ভাইয়ের মৃতদেহের প্রতি সম্মান জানানোর আবেগে ঐ রাজাজ্ঞা, যা অন্যায়ের পর্যায়ে পড়ে, তা উল্লঙ্ঘন করেন— তাঁর কী দোষ? তবে কি hamartia-র ধারণায় এই প্রশ্নের উত্তর নেই, উত্তর খুঁজতে বহুশতাব্দী পেরিয়ে আমাদের অনুসন্ধান করতে হবে হেগেলের ব্যাখ্যায়? 'Undeserved suffering'-এর কথা আরিস্টটল বলেছেন, কিন্তু ভুলের কথাটা বাদ দেন নি, আন্টিগোনের ভুল ঠিক কী? সোফোক্লেসের আজাক্সের ট্র্যাজেডিও hamartia-র ধারণায় ব্যাখ্যা করা যাবে না, সেখানে তাঁর গুণের প্রাচুর্যই কি তাঁর জগতে দোষ হয়ে দাঁড়ায়? পরবর্তীকালের নাটকে মাঝে মাঝেই একটি গুণ অতিরিক্ত মাত্রায় থাকলে তার জীবনের ট্র্যাজিক ক্ষয় আমরা দেখতে পাই। বাংলা নাটক *প্রফুল্ল* কিছু পৃথিবীর মহত্তম নাটকের মধ্যে পড়ে না, কিন্তু সেখানেই বা যোগেশের ট্র্যাজেডির আমরা কী ব্যাখ্যা দেব? তাঁর বিশ্বাস-ভালবাসার আধিক্যই কি তাহলে হ্যামারশিয়া? একইভাবে *হ্যামলেট, কিং লিয়র, ওথেলো, অ্যান্টনি অ্যান্ড ক্লিওপেট্রা রোমিও জুলিয়েট*-এর এরকম ব্যাখ্যা করা চলে। আর যদি ওথেলোর ভালবাসার সঙ্গে মেশানো সন্দেহবাতিকের খাদ. বিদগ্ধ হ্যামলেটের হিংসার প্রতি অনীহার সঙ্গে

আশু প্রয়োজনীয় কাজ স্থগিত রাখার প্রবণতার মিশেল বা দোনামনা করার প্রবৃত্তির মিশেলকে আমরা লক্ষ করি, লীয়রের সন্তানস্নেহের মধ্যে মূঢ় অন্ধত্বের মিশেল দেখি তাহলে চরিত্রপ্রধান এই নাটকগুলিতে hamartia হয়ে দাঁড়ায় a vital flaw in character. ঐ দৌর্বল্য চরিত্রের মহৎ গুণগুলির সঙ্গে এমন যৌগিক রসায়নে মিশে আছে যে তা আলাদা করার, সংশোধন করে নেওয়ার কোনো উপায়ই নেই। ওথেলোর স্ত্রীকে ভালবাসা এমনই অসম্ভব এক মাত্রায় যে ঐ ছোট গৌরবর্ণা সুন্দরী কিন্তু সামাজিক বিচারে সাধারণ আরেকটি মেয়ে মাত্র যে তাঁর মতো রাষ্ট্রে বন্দিত বিপুলকীর্তিমান কালো মানুষটিকে ভালবাসতে পারে একথা তাঁর সবসময়েই অবিশ্বাস্য ঠেকে। সব মিলিয়ে তাহলে ঘটনা এমন দাঁড়ায় যে আরিস্টটলের আগে লেখা নাটক এবং ওঁর সময়ের পরে লেখা নাটকগুলি বিচার করে যদি আমরা hamartia-র তত্ত্বের যাথার্থ্য খুঁজি তাহলে ঐ শব্দের অর্থ বা সঙ্কেতের একটা বর্ণালী মেনে নিয়েই আমাদের চলতে হবে, একটা কোনো অতি-নির্দিষ্ট মানেতে আমাদের কাজ চলবে না। এর সঙ্গে এ-ও সত্য যে hamartia-র কোনো এক অর্থ প্রয়োগ করতে হবেই বা কেন, সে এক অকারণ ঝামেলা, মৃত স্পন্দনহীন এক ধারণাকে কাঁধে বয়ে বেড়ানো, এমন কথা প্রবল, প্রবলভাবেই অসত্য। এমনকি আরিস্টটলের চিন্তার বাইরে দাঁড়ানো অনেক প্রাচীন সংস্কৃত নাটক, বা ঐ চিন্তার বিরোধী হয়ে দাঁড়ানো ব্রেখ্‌টের নাটকেও কেন্দ্রীয় চরিত্রের ভুলের মাশুল গোনার কথাটা সবসময়েই আসে।

ডিসকভারির— আবিষ্কারের যে আলোচনা ট্র্যাজিক প্লটের বিশ্লেষণে আরিস্টটল করেছেন, তার মধ্যে বিজ্ঞানের মাস্টারমশাইয়ের পরিচ্ছন্ন চিন্তার ধরন আছে। কিন্তু বিভিন্ন প্রকার আবিষ্কারের তালিকায় যেটি নেই— প্রাচীন গ্রিক নাটকের ধরনধারণ যেরকম তাতে তা সম্ভবও ছিল না— সে হ'ল আত্ম-আবিষ্কার, নিজের কাছেই নিজের যে পরিচয় গোপন ছিল ট্র্যাজিক ঘটনাক্রম শুরু হবার আগে। চরিত্রের উপর ঝোঁক আসার পর এটাই অবশ্য প্রধান 'ডিসকভারি' হয়ে উঠেছে আজকের ট্র্যাজিক সাহিত্যে, এবং এখানে ঐ সাহিত্য বলতে আমরা আরিস্টটলকে অস্বীকার করে উপন্যাস-ছোটগল্পের কথাও ভাবছি (উনি বলেছিলেন, 'in a dramatic, not in a narrative form' ট্র্যাজেডি রচিত হয়)। এটা আশ্চর্যের কথা যে যিনি সাহিত্যের ইতিহাসকে অল্প হলেও আলোচনায় এনে ফেলছেন সাহিত্যতত্ত্ব-আলোচনায়, বলছেন ট্র্যাজিক মিটারে (ছন্দে) লেখা হলেই কাব্য ট্র্যাজেডি হয়ে ওঠে না, তিনিই ভেবেছেন যে ঐ form বা genre গুলি পূর্ণ গঠিত হয়ে গেছে, অগ্রগতি, পরিবর্তন, নতুন উদ্ভাবনের সম্ভাবনা দেখতে পান নি। এটা ওঁর তত্ত্বকে বড় বেশি সীমিত করে ফেলেছে।

আরিস্টটল-প্রসঙ্গে ইতি টানার আগে আরও কয়েকটি কথা সংক্ষেপে হলেও বলে নেওয়া দরকার। ওঁর 'universal'-এর উপর এক ধরনের আত্যন্তিক ঝোঁক আজ অনেকেই মেনে নিতে চান না, পরিবর্তনশীলতার বোধ আজ জীবনদর্শনকে অনেক বেশি প্রভাবিত করেছে। প্রবাহই একমাত্র সত্য, নানাভাবে মানুষকে দেখার দৃষ্টিভঙ্গি এই কথাকে আজ স্বীকার করে। Genre-এ ঝোঁক দিয়ে আলোচনায় কতদূর লাভ ('ট্র্যাজেডি কেমন হয়', এইসব) সে-সম্পর্কেও নানা প্রশ্ন উঠেছে। বিংশ শতাব্দীতে Raymond Williams-রা এ নিয়ে অন্যরকম চিন্তা করেছেন, ট্র্যাজেডির উদাহরণ দিয়ে। অন্যরা genre, literary kinds নিয়ে ভেবেছেন। বারো লাইনের 'সনেট' লেখা হয়েছে, হেরাক্লিসের (হারকিউলিসের) অভিযানগুলির 'রোমান্স'-এর সঙ্গে, রাজা আর্থারের Knight-দের কাহিনী-সম্পৃক্ত 'রোমান্স'-এর সঙ্গে আত্মীয়তা খুঁজে আজকের যুগের মেয়েদের 'রোমান্স' গুলির প্রকৃতি সম্বন্ধে কী এমন একটা বড় আবিষ্কার হবে এ-কথা সঙ্গতভাবেই উঠেছে।

Nature ও Art-এর মধ্যে কোনটি শিল্পী-সাহিত্যিক হতে প্রধানত সহায়ক এনিয়ে কথা উঠে পড়ে প্রথমে প্লেটোর লেখা থেকে। 'কল্পনা' বস্তুটি যে আছে, এবং কল্পনার সিঁড়ি বেয়ে ধীরে ধীরে Reason-এর, সত্যের দিকে অনেকটা পৌঁছোনো যায় এ-কথাও প্লেটোই প্রথম স্বীকৃতি দিয়েছেন, যদিও শেষ বিচারে ওঁর কল্পনার উপরে অন্তিম ভরসা নেই (প্লেটো 'ফ্যান্টাসি' শব্দটি কল্পনার জন্য ব্যবহার করেছেন)। এই কল্পনাতত্ত্বের কথা, তার প্রথম বিকাশের কথা, তাতে আস্থা রাখার কথা এসব Longinus-এর প্রসঙ্গে পূর্ণতর আলোচনা করতেই হবে। তবে এখানে এটুকু বলা যেতে পারে যে আরিস্টটল প্লেটোর বিপরীতে দাঁড়িয়ে ভাবজগৎ আর বস্তুজগতের মধ্যের অমেয় ব্যবধানকে তাঁর লেখায় অস্বীকার করে তাঁর প্রয়োগবাদী মনোভাবের কারণে বস্তুযুক্ত ও আইডিয়াকে একই জগতের অন্তর্ভুক্ত করে নিয়েছিলেন। তফাৎ 'অনুকরণ'কে স্বপ্ন-কল্পনা-চিত্রকল্পের সঙ্গে যুক্ত না করে বাস্তবের মধ্যে যা বিশ্বজনীন তার সঙ্গে যুক্ত করেছিলেন, 'উৎপ্রেক্ষা-রচনা কাউকে শেখানো যায় না' ইত্যাদি হঠাৎ একটি বা দুটি বাক্য ছাড়া কল্পনার গুরুত্ব তিনি *পোয়েটিক্স্*-এ কখনই দেন নি। নানা গ্রিক লেখকের রচনায় র‍্যাপসোডিস্ট জাতীয় লোকদের যে দৈবী উন্মাদনার কথা শোনা যায় তা তাঁর চিন্তায় তেমন স্থান পায়নি। কাব্যের সত্য প্রতিষ্ঠায় তন্ময় আরিস্টটল, সাজিয়ে নির্মাণ করার যে পথ লেখকদের সামনে এঁকেছেন, সেখানে মত্ততার কোনো স্থান নেই; অন্য পথে পা দিলে অযৌক্তিকতার, যথাযথতার, মিথ্যার সঙ্গে সত্যদৃষ্টি মিশে যাবার সমস্ত সম্ভাবনা আছে একথা নিশ্চয় তিনি ভেবে থাকবেন। উৎপ্রেক্ষা-রচনা যে শেখানো যায় না এই কথাটি ছাড়া একবারই শুধু চরিত্রায়ণ ও ঘটনাক্রমের অভ্যন্তরীণ প্রবাহে প্রবেশক্ষমতার ব্যাপারে কবির পক্ষে প্রয়োজনীয় 'বিশেষ গুণ' বা 'উন্মত্ততার অল্প ছোঁয়া'র কথা বলেছেন। Nature-এর সপক্ষে ও Art-এর অক্ষমতার ব্যাপারে এইখানে একটি বক্তব্যের আভাস আছে, যদিও এইসব বাক্য এত আংশিক সংক্ষিপ্ত যে এ-থেকে তাঁর পূর্ণাঙ্গ মত জানা মুশ্‌কিল।

এখন ক্যাথারসিস প্রসঙ্গ দু-এক কথা বলে নেওয়া যাক। সাধারণভাবে ক্যাথারসিস সম্পর্কে দুটি ব্যাখ্যা আছে—'অনুভূতির শুদ্ধিকরণ' ও 'অনুভূতির সাময়িক নিষ্কাশন'। কেউ কেউ 'অনুভূতিগুলিকে উত্তেজনা হতে নিবৃত্তি দিয়ে সুছন্দ সুষমা দেওয়া' এমন ব্যাখ্যার কথাও ভেবেছেন। সবদিক থেকেই ব্যাপারটার মধ্যে নীতিবোধের ছোঁয়া আছে, আগেই বলেছি নীতিবোধের ফ্রেমটি থেকে আরিস্টটল অনেকটা হলেও সম্পূর্ণ মুক্ত করতে পারেন নি বা করেন নি নিজের সাহিত্যভাবনাকে। এও বলেছি সক্রেটিস-পরবর্তী যুগে জীবনের উদ্দেশ্য নিয়ে ভাবনা গ্রিক মানবমনকে অধিকৃত করেছিল। আমাদের এযুগে এ-প্রশ্নের উত্তর দেওয়ার পথ অনেক জটিল হয়ে গেছে। এথেন্সের নগররাষ্ট্রের যা আয়তন ও প্রকৃতি ছিল, যেভাবে সমস্ত নাগরিক একজায়গায় একত্র হয়ে রাষ্ট্রের হয়ে গুরুতর সিদ্ধান্তগুলি সব নিত (যদিও লোকসংখ্যার এক-তৃতীয়াংশ যে দাসেরা তাদের কথা তারা ভুলেই থাকত), তা থেকে আমরা অনেক দূরে সরে এসেছি। এখন আমরা নির্বাচন করে সেনেটে— পার্লামেন্টে— সেন্ট্রাল কমিটিতে প্রতিনিধি পাঠাই, তাঁরাই রাষ্ট্রনীতি নির্ধারণ করেন। যেহেতু এইসব নির্বাচন স্বাধীন নয়, স্বচ্ছতার অভাবে, প্রচারের প্রাচুর্যে, অর্থের খেলায় ভারাক্রান্ত অন্ধ নির্বাচন, এবং যেহেতু রাষ্ট্রগুলি যথেষ্ট বৃহদাকার, অতএব একস্থানে বসে অতদূরের ব্যাপার স্বভাবতই ঝাপ্‌সা হয়ে যায় ; বস্তুত এই দূরত্বের কারণে সমাজ ও রাষ্ট্রে একটা বড়ো বিচ্ছেদ ঘটে গেছে, অনেক সময়ে অনেক জায়গায় তারা পরস্পরবিরোধী স্বার্থের দ্বন্দ্বে লিপ্ত। এক্ষেত্রে প্লেটোর, এমনকি আরিস্টটল-এর যে নৈতিকতার ফ্রেমটি আছে তা আমাদের আর কাজে লাগে না। মানুষের মঙ্গল রাষ্ট্রের

মঙ্গলের সঙ্গে যুক্ত একথাটা আর আজ সহজে মানুষকে বিশ্বাস করানো যাবে না। সকল মানুষের মঙ্গল যদি রাষ্ট্রের অভিপ্রেত না হয়, তাহলে কীভাবে সকলে শ্রেষ্ঠ নাগরিক হয়ে উঠবে এ সম্বন্ধে তত্ত্বের ছায়া যে-ধরনের সাহিত্যতত্ত্বে পড়বে তাকে আমরা অনেকটা দূরে ঠেলে রাখি, এবং আদর্শায়নের যে চেষ্টা আরিস্টটল নায়ক চরিত্র নির্বাচনে বা মানুষের জীবনে যা বিশ্বজনীন (universal) তার অনুকরণের কথা বলেন, তা আমাদের আর কাজে লাগে না। বুদ্ধদেব বসু তাঁর কন্যাকে চিঠি লিখতে গিয়ে কোনো ঘটনায় উল্লসিত হয়ে যেভাবে আমাদের দেশ এবার প্রতীচির আরও কাছে আসবে বলে উল্লাস জানান, ঠিক ঐ কাছে আসার ব্যাপারেই বিশালসংখ্যক মানুষ আতঙ্কে ভোগেন। আসলে সমাজের আদর্শগুলো আজ ভিন্ন ভিন্ন হয়ে গেছে। তাই পরিবর্তিত সময়ে প্রাচীন গ্রিক চিন্তার এই সূত্রগুলি আমাদের জীবনে আর কাজে লাগে না।

শেষ যে কথাটা বলে লঙ্গাইনাসের কথায় আসব তা হ'ল আরিস্টটল যখন সাহিত্যে-কাব্যে-নাটকে বেদনার প্রতিফলনও (বা, অনুকরণও) পাঠক/শ্রোতা/দর্শক চিত্তে আনন্দের সঙ্গে অনুভূত হয় এই কথাটা মনে করিয়ে দেন, তখন এর কারণ ও পরিপ্রেক্ষিত *পোয়েটিক্‌স্‌* কীভাবে তুলে ধরছে সাহিত্যতত্ত্বের সন্ধানী হিসাবে আমাদের ভেবে দেখা উচিত। ভারতীয় 'রসতত্ত্ব' অভিনবগুপ্ত-আনন্দবর্ধন ইত্যাদি পরিবাহিত হয়ে আমাদের হাতে যেভাবে পৌঁছেছে, তাতে আমরা লক্ষ করি বিভিন্ন ভাব, যার সবকটিই মনোহর নয়, তা রসে পরিণত হয়ে আমাদের আস্বাদনের আনন্দ দেয়। আনন্দের কথা গ্রিক ও ভারতীয় মনীষীরা সকলেই খেয়াল করিয়ে দিয়েছেন—কেন আদৌ কাব্য পড়ব এই প্রশ্নের একটা জবাব অন্তত আছে (Horace-এর 'delight' 'Instruction'-এর কথা এর মধ্যে কোথাও লুকিয়ে আছে কিনা তা অনুসন্ধানযোগ্য) ; তফাৎ রয়ে যায় শুধু হয়তো এই প্রশ্নের উত্তরে, যে বেদনা বা বিরক্তি-ভীতি ইত্যাদি কোন্ প্রক্রিয়ায় আনন্দ পরিবেশনের আধার হয়ে ওঠে।

৩.

গীতিকবিতা-সম্পর্কে প্রাচীন গ্রিক সাহিত্যতত্ত্বে আলোচনার অভাব সহজেই চোখে পড়বে। লঙ্গইনাস তাঁর *On the Sublime*-এ যেভাবে আলোচনা সাজিয়েছেন (প্রথম খ্রিস্টীয় শতকে) তাতে মনে হয় স্বচ্ছন্দে এবার ওঁর বিবেচনাগুলি গীতিকবিতা সম্পর্কেও প্রয়োগ করা চলে। প্লেটো ও অন্যান্য দু'-একজন প্রাচীন গ্রিক চিন্তাবিদের রচনায় এ-বিষয়ে কিছু আভাস-ইঙ্গিত থাকলেও (বিশেষ করে প্লেটোতো, হয়তো পিণ্ডার-এ) অনেক পূর্ণাঙ্গ একটা পরিচয় দেবার আগ্রহ আমরা দেখতে পাই লঙ্গাইনাসে। পাশ্চাত্যে Theory of imagination-এর জন্মদাতা তিনি। কল্পনাকে তিনি কবিতার জন্মের ব্যাপারে একটি মুখ্য এবং সম্পূর্ণ সদর্থক চেহারায় দেখেছেন। বিশেষ একটি কাব্যের কবিতা হিসেবে দোষ-গুণ থাকতে পারে যা বিশ্লেষণযোগ্যও, কিন্তু কবিতাকে নৈতিক সমর্থন দেওয়া যে দরকার, তার উপকারিতার কথা তর্ক করে প্রমাণ করা দরকার, এসব কথা তার মনে স্থানও পায়নি বলে বোধহয়, নৈতিকতার ছায়া শুধু *সেখানেই পড়েছে যেখানে তিনি শ্রেষ্ঠ কবিতা কীভাবে রচিত হতে পারে তা বলেছেন।*

ওঁর রচনার একটা বড় অংশ জুড়ে অবশ্য আছে শৈলীর, *শৈলী-শিক্ষার আলোচনা।* লঙ্গাইনাসের পরবর্তী প্রাচীন গ্রিক তাত্ত্বিকদের আলোচনা অবশ্য শুধুমাত্র শৈলী (style)-র আলোচনায় পর্যবসিত হয়। সেই পুরোনো দিনগুলিতে আরিস্টটলের পরে লঙ্গাইনাসই একমাত্র *যিনি কবিতার ভিত্তি নিয়ে মৌলিক কথা বললেন।*

নৈতিকতার কথা যখন একবার উঠেই পড়েছে, তখন শ্রেষ্ঠ কবিতা কীভাবে রচিত হতে পারে বলছেন লঙ্গাইনাস সে কথাটা একটু আলোচনা করে নেওয়াই ভাল। এত নতুন কথা

বলেছেন লঙ্গাইনাস যে কবি ও কবিতার সম্পর্ক বিষয়ে ওঁর উক্তি, যা আজও বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ, তা একটু বিস্তারিত আলোচনার দাবি রাখে। প্রথমে T.S Domsch-এর ইংরাজি অনুবাদ থেকে (পেঙ্গুয়িন, ১৯৬৫) একটু উদ্ধৃতি দিই :

> for I would maintain ...nothing contributes to grand styles [শ্রেষ্ঠ কবিতা রচনার অন্যতম আয়ুধ] as a *noble emotion* in the right setting, when it forces its way to the surfaces in a gust of frenzy, and breathes a kind of divine inspiration onto the speaker's words [বাঁকা হরফ আমার]

বারবার তিনি 'Elevation'-এর গুরুত্বের কথা বলেছেন, এবং ওঁর আগের গ্রিক সমালোচকেরা যেখানে আত্মাকে নাড়া দেয় মহৎ কবিতা একথা বলেছেন, সেখানে উনি বললেন মহৎ ক্ষমতা আত্মাকে উন্নীত করে, তার সীমাবদ্ধতাকে অতিক্রম করায়। এই elevation, এই noble emotion-এর প্রকাশ সম্ভব হয়, এর সম্ভাব্যতাও বাড়ানো যায়।

লঙ্গাইনাস আসলে শ্রেষ্ঠ কাব্যের একটি নৈতিক শিকড় যে আছে তা মানতেন। এবং তাঁর লেখায় এই নিয়ে চিন্তা-আলোচনা করেছেন। এমনকী যে-সময়ে উনি ওঁর তত্ত্ব লিখছেন সে যুগে সাহিত্যের মান অবনত হচ্ছিল। তিনি একে সমাজের নৈতিক অবনয়নের সঙ্গে যুক্ত করে দেখেছেন। আত্মার মহিমা— অর্জিত বা প্রকৃতিগত কবিতাকে মহিমা দেয় একথাই লঙ্গাইনাস বলতে চেয়েছেন। পাঠকদের কথা চিন্তা করলে, এই প্রথম বলা হচ্ছে যে সমাজকে উন্নততর করে তুলতে কবিতা সক্ষম, যেন কবিতাপাঠ এক ধর্মাচরণ— কবিতা সম্বন্ধে মনোভাব এখানে প্লেটো থেকে সম্পূর্ণ বদলে গেছে।

লঙ্গাইনাসের সাহিত্যতত্ত্বে প্রধান অবদানগুলি আরো আলোচনার আগে কয়েকটি বিষয়ে কথাবার্তা সেরে নেওয়া যায়। ওঁর সময় অবধি পৌঁছে পদ্যের সঙ্গে গদ্যের আলোচনাও শুরু হয়ে গেছে, বিশেষ করে বক্তৃতাশিল্পের। গদ্যে-গদ্যে যে গুণটির আকাঙ্ক্ষার কথা বার বার উচ্চারিত হচ্ছে তা উদ্বেজিত (persuade) করার কথা। উনি কিন্তু বললেন অন্য কথা, সদর্থকভাবে 'সম্মোহন' ('entrance') করার কথা— যাকে আমরা হয়তো অন্যভাবে বলতে পারি এক উচ্চকোটির ধ্যানমগ্নতা দান; এক বিস্ময় সৃষ্টির অভিঘাতে অন্য, উঁচু স্তরে ভাবনার উত্তরণ। যাকে পাশ্চাত্যে 'রোমান্টিক সমালোচনা ও সাহিত্যতত্ত্বের ধারা' বলা হয় তার প্রথম বীজ এখানে রোপিত হ'ল। প্লেটো-কথিত 'অনুপ্রেরণা'র কথাটা এর আগেই অবশ্য ছিল, কিন্তু সে বস্তুটির উপর প্লেটো এমন দ্বিধাহীন বিশ্বাস-নির্ভরতা তাত্ত্বিক হিসেবে রাখতে পারেন নি। লঙ্গাইনাসে বারবার ফিরে এসেছে প্রবল আবেগের স্রোতের জয়গান। Dorsch-এর অনুবাদ থেকে একটু উদ্ধৃতি দিচ্ছি :

> The timely expression of violent emotions, *together with true sublimity* [বাঁকা হরফ আমার] as the appropriate antidote for the number and boldness of metaphors. For the onward rush of passion has the propensity of sweeping everything before it, or rather of requring bold imagery as something altogether indispensible.

লক্ষ করলেই দেখা যাবে *On the Sublime*-এর ৩২-তম অধ্যায়ে উৎপ্রেক্ষার আলোচনা করতে গিয়ে এই যে কথাগুলি লেখক বললেন তার মধ্যেই প্রতিষ্ঠা পেল (মহৎ) আবেগের বিরাট তাড়নায় কীভাবে রোজকার ব্যবহৃত ভাষা দুমড়ে-মুচড়ে ভেঙে নতুন উৎপ্রেক্ষা-চিত্রকল্প অবশ্যম্ভাবী কারণে তৈরি হয়, তার স্রোতের বাঁকে বাঁকে তৈরি করে অলৌকিক ভাষার

দ্বীপপুঞ্জ। যেখানে উৎপ্রেক্ষা তৈরির পিছনে কোনো সত্যিকারের মহৎ আবেগস্রোত নেই, সেখানে উৎপ্রেক্ষাগুলি বাইরের গয়না মাত্র; বিষয়ের দেহমনের কোনো সৌন্দর্য সেখানে ফুটে ওঠে না, জমকালো সাজে সেজেছি— এই কথাটুকুই মনে হয়। হয়তো খানিকটা অপ্রাসঙ্গিক হবে, তবু বুদ্ধদেব বসুর 'কবিতার সাত সিঁড়ি' নামে একটি আলোচনায় একটি কথা লিখেছিলেন মনে পড়ছে। উনি বলেছিলেন যতক্ষণ রবীন্দ্রনাথ লিখছেন 'তোমায় সাজাব যতনে/কুসুমে রতনে/ কুঙ্কুমে-চন্দনে/সাজাব' ততক্ষণ কবিতাটি/গানটি একস্তরে আছে, যেই পরের পঙ্‌ক্তিতে যুক্ত হ'ল 'সখিরে সাজাব সখার প্রেমে' এই বাক্যাংশ, তখনই চলে এল 'elevation' বা উত্তরণের কথা, উন্নীত হবার কথা। কিন্তু আমার মনে হয় সমস্ত গানটির পিছনে আছে এমন এক মহৎ আবেগ যার তাড়নায় প্রেম দিয়ে একটি মেয়েকে সাজানোর কথা এসে পড়ে—এক অদ্ভুত নতুন ভাষা এবং ঐ পঙ্‌ক্তির পরবর্তী বাক্যাংশে 'সখিরে সাজাব মুকুতা-হেসে' আর একটু আগের কুঙ্কুম-চন্দনের মতো শ্রীবর্ধক মাত্র থাকেনা, সমস্ত সোনা-মুক্তা কোনো এক আদরে গলে গিয়ে বধূটির বাহুতে-শরীরে-হৃদয়ে একটি আশ্চর্য প্রভা দিতে থাকে।

'Comparisons and Similies' নামের তেত্রিশতম অধ্যায়ের শুরু হতে না হতে দু'টি পাতা পাণ্ডুলিপি থেকে হারিয়ে গেছে, নতুবা হয়তো আমরা এ-ব্যাপারে লঙ্গাইনাসের মত সম্বন্ধে আরো দু-একটি কথা বিশদভাবে জানতে পারতাম। 'Imagery and the power of the Imagination' নামে পঞ্চদশ অধ্যায়ে উনি চিত্রকল্প (image)-র গুরুত্ব আলোচনা করতে গিয়ে বক্তৃতাকারী ও কবির image ব্যবহারের কাজে ভিন্নতার দিকে দৃষ্টি নির্দেশ করেছেন। ইমেজের ব্যবহারেই যে অনেকখানি সম্মানযোগ্য উজ্জ্বল মহত্ত্ব বাক্যে সঞ্চারিত হয়, মানুষকে উদ্দীপিত করতে পারে এই দুই ধরনের ব্যক্তিই, একথার স্বীকৃতি দেবার পর তিনি বলছেন যদিও অনুভূতিকে দুজনেই নাড়া দেবায় আগ্রহী, কবি অনুভূতিকে লক্ষ করেই তার 'imagery' নিয়ে এগোন, বক্তৃতাশিল্পী imagery ব্যবহার করেন শ্রোতার মনে কতকগুলি অত্যন্ত স্পষ্ট ছবি আঁকতে যাতে মানসিক কিছু ধারণা চোখে-দেখা বাস্তবের মধ্যে হয়ে ওঠে। যতটুকু এ থেকে বুঝতে পারা যায় তফাৎটা উদ্দিষ্ট মানুষের মনে কতকগুলি মোটামুটি পরিচিত মত ও ধারণাকে শ্রোতার কাছে চাক্ষুষ-দেখা বাস্তবে পরিণত করে সেগুলোকেও আপন চোখে সত্য করে তোলা আর অনুভূতিকে আলোড়িত-আন্দোলিত করে অন্যস্তরের অনুভূতিতে নিয়ে যাওয়ার মধ্যে। ফলত, এই দু'টি একেবারে দুই ভিন্ন জাতীয় জিনিস। এখানে প্লেটোর বক্তৃতাশিল্পী ও কবিকে একগোত্রীয় করে দেখার প্রবৃত্তির বিরুদ্ধে একটি প্রতিবাদী কণ্ঠস্বর উচ্চকিত হ'ল।

এবারে Longinus-এর প্রথম বড়ো কথাটির আলোচনা করে এই প্রসঙ্গ ও প্রকল্প শেষ করব। আমার প্রকল্পটি এই ধরনের হওয়ার কারণ আমার ধারণায় বর্তমান যুগের বাংলা কবিতার নানা গন্তব্য নিয়ে যে তর্ক-বিতর্ক চলছে তার সঙ্গে গভীর যোগাযোগ আছে লঙ্গাইনিসের ভাবনার।

৪.

Bypros,–'sublimity' বলে যে-কথাটির ইংরেজিতে অনুবাদ হয়েছে— তার বর্তমান ইংরেজিতে ঠিক অনুবাদ হওয়া শক্ত বলে সমস্ত ইংরেজ অনুবাদকই জানিয়েছেন। অভিব্যক্তির বিশিষ্টতা ও চমৎকারিত্বই সেখানে তার অর্থ হওয়া উচিত,— অর্থাৎ অভিব্যক্তিই, সেই সব বাক্য বা বাক্যাংশের চমৎকারিত্বের উপরেই সেখানে ঝোঁক। আমরা কি অনুমান করতে পারি 'আলোকছায়া শিব-শিবানী সাগর জলে দোলে' বা 'উটের গ্রীবার মতো নিস্তব্ধতা এসে' ইত্যাদি এর উদাহরণ হতে পারে?

এই 'sublimity' দু'ভাবে কবির হতে পারে, তার মধ্যে একটি তার মহৎ প্রকৃতি হতে উদ্ভূত, একথা আগে বলা হয়েছে। এবারে দ্বিতীয়টির কথা বলা হবে। এই মহত্ত্ব অর্জনে সহায়তা করতে পারে প্রাচীন মহৎ কবিদের কবিতার নিবিষ্ট পাঠ, যে-সব কবি কালের বিচারে যশস্বী হয়েছেন, মহত্ত্ব-অর্জন যেভাবে পরীক্ষিত হয়েছে তার বর্ণনায় আমাদের পরিচিত 'নিরবধি কাল' 'বিপুলা পৃথিবী'র আভাস আছে (সপ্তম অধ্যায়ে তা পাওয়া যাবে)। এই দ্বিতীয় মহত্ত্বের শিকড় গভীরতর করার শিক্ষার উপর তিনি অনেক জোর দিয়েছেন, এ-সম্বন্ধে অনেক কথা বলেছেন। নবম অধ্যায়ে বলছেন 'We should do all we can to train our minds towards the production with a noble inspiration'. যাঁরা রবীন্দ্রনাথকে বাধা বলে একদা ভেবেছিলেন, বা যাঁরা আজ তাঁকে সেকেলে এবং অপ্রাসঙ্গিক ভেবে অবজ্ঞা করেন তাঁদের ভাবনা-চিন্তা থেকে এ বহুদূরের কথা। উত্তর-আধুনিক কবিতা আন্দোলনের সঙ্গে যেসব কবি ও কবিতার নাম যুক্ত হয়ে গেছে তাতে দেখা যাবে অমিতাভ গুপ্ত তরুণ কবিদেরকে বালি খুঁড়ে পেয় জল নিয়ে আসতে বলছেন, যে জলের ব্যঞ্জনা বাংলা কবিতার ব্যাপ্ত দেহে আছে, প্রবহমান বাংলা সাহিত্য-শিল্প-সংস্কৃতি এবং সমাজে আছে। এই জলের কথা নানা ধরনের চিন্তামুখী কবিতাতে আছে, রামপ্রসাদের কবিতা সম্বন্ধে কিছু লেখালেখি— ভাষণাদি হয়েছে, গৌতম বসু তাঁর *অন্নপূর্ণা ও শুভকাল* কাব্যগ্রন্থে কয়েক দশক আগে এমন পঙ্‌ক্তি লিখেছিলেন : 'এই জল রামপ্রসাদ সেন', যে পঙ্‌ক্তি অনেকের মুখে মুখে ঘোরে। এ সেই রামপ্রসাদ যিনি অনেকসময়ে 'ছড়ার ছন্দ' বলি যাকে, তাতেই ধ্যানগম্ভীর, আবেগ-আপ্লুত নানারকম কবিতা লিখেছেন। কাব্যের প্রাচীন ঐতিহ্য থেকে বিংশ শতাব্দীর প্রথমার্ধের 'আধুনিক' কবিরা মহৎ উক্তি ও চারিত্র্য অর্জন করতে চেষ্টা করেছিলেন— তাঁদের বিশেষত্ব অবশ্য ছিল পাশ্চাত্য কবিদের থেকেই প্রধানত আহরণ, এবং অন্তত বর্তমান লেখকের মতে তাদের চেষ্টায় একটা মৃদু যান্ত্রিকতা ছিল, একটা 'ব্যবহার' করবার চেষ্টা। আমার ধারণায় লঙ্গাইনাস যেভাবে প্রাচীন মহৎ কবিদের রচনা থেকে শিক্ষা অর্জন করতে বলছেন, তাতে একটা তদগত শ্রদ্ধাভক্তির ভাব শিক্ষার্থীর থাকতে হয়, মহতের কাছে থাকতে হয় বিনীত। আজ সবাইকে লঙ্গাইনিসের কথা মানতেই হবে তা বলা অবাস্তব, এ-ও কেউ বলবেন সে অন্যায় হবে, প্রেসক্রিপশন দিয়ে কবিতা লেখানো যায় না। অন্যদিকে যাঁরা বলছেন বিশেষ করে বর্তমান 'আধুনিকতাবাদী'দের ভাষা, (এবং অতি অবশ্যই তাত্ত্বিকভাবেই ঘোষিত 'আধুনিকোত্তরবাদী'দের (Post-modern-ists- দের) ভাষায় কোনো 'intertextuality'-র আভাসমাত্র নেই, এক প্লাস্টিক ভাষা তা যাতে মহৎ প্রাচীনের কাছ হ'তে শিক্ষার কোনো পরিচয় নেই, তখন আমাদের কারুর বা মনে পড়তেই পারে যে লঙ্গাইনাস যখন তাঁর সময়ের কবিতার মান-অবনতির সঙ্গে সমাজে এক 'subtle moral decline'-এর যোগসূত্রের কথা ভেবেছিলেন। অনেক বাঙালি বিখ্যাত কবি আছেন যাঁরা ছন্দে-মিলে অত্যন্ত পারদর্শী, এতটাই যে, মুগ্ধ হতে হয়। লঙ্গাইনাস বলছেন 'The writer who does everything well is not as good as the one who can ocassionally flash into sublimity', এবং বিদ্যুৎ চমকের বজ্রপাতের উপমা দিয়ে এক উদ্ভাসনের কথা বলেছেন তাকে প্রণতি জানাতে : 'a well-timed stroke of sublimity scatters everything before it like a thunderbolt, and in a flash reveals the full power of the speaker.' তিনি এই যাকে আজ আমরা intertextuality বলি, প্রায় তাকেই তিনি বলছেন : 'Now this procedure is not plagiarism ; rather it is like taking impressions from beautiful pictures or statues or other works of art. (ত্রয়োদশ

অধ্যায়ের শেষ অংশে আছে কথাগুলি) সব মিলিয়ে 'persuasion' না খুঁজে 'ecstasy', প্রায় তুরীয় আনন্দ যা লঙ্গাইনাস কবিতায় খুঁজেছেন, তাতে চরিত্রের মহিমার, নাকি বলা উচিত ব্যক্তিত্বের মহিমার উপর বেশ ঝোঁক এসে পড়েছে। এমনকী শিক্ষার যে-অংশটুকুর কথা বলা হয়েছে, তাতেও সত্যিকারের অসাধারণ মানুষের মধ্যে একজায়গায় যে গভীর বিনয় থাকে, পৃথিবীর অন্যান্য মানুষের প্রতি শ্রদ্ধা থাকে তাই প্রতিফলিত হয়। এই বিনয়ের অভাব হ'লে শিক্ষায় আর কোনো আগ্রহ থাকে না। তাই নান্দনিকতায় আগ্রহী ওঁর•সমালোচনা, অভিব্যক্তি কীভাবে শ্রেয় হয়ে ওঠে তার জন্য যাঁর এত চিন্তা তা কবির এবং সামাজিক পাঠকের উপর তার প্রভাবের ব্যাপারে একটা নৈতিক উন্নয়নের কথার সঙ্গে জড়িয়ে থাকে।

সেজন্যই sublimity-র পাঁচটি উৎসের কথা বলতে গিয়ে তিনি বলছেন প্রথম ও প্রধানতম হ'ল 'grandeur of thought, the ability to form grand conceptions' (আরিস্টটল ট্র্যাজেডির সংজ্ঞা দিতে গিয়ে তাকে 'serious' কাহিনী হ'তে হবে বলেছেন, কিন্তু Longinus আরো বড় কথা বললেন), দ্বিতীয়ত 'vehemant and inspired passion'। বাকি তিনটি উৎসের মধ্যে অলঙ্কার প্রয়োগের কুশলতা, মহৎ ভাষা, শব্দ ব্যবহারের কুশলতা ইত্যাদির কথা আছে— কিন্তু প্রথম দু'টি উৎসই আসল কথা, এবং নতুন কথা বাকি তিনটি উৎসের সম্পর্কে যে বাক্যাদি আছে, তার মধ্যে 'organic unity'-র কথাটা আরিস্টটলের পরে ইতিমধ্যেই ধ্রুবপদের মর্যাদা পেয়েছিল। আর তৃতীয় সূত্রের কথা বলতে গিয়ে লেখক একটি এমন ইঙ্গিত করলেন যা মূল্যবান; আজ আমরা ঐ কথাটাকে অনেক সময় এই আপ্তবাক্যে বলবার চেষ্টা করি : Art lies in concealing art. অলঙ্কার যেন নিজের দিকে দৃষ্টি আকর্ষণ না করে এটাই তাঁর বক্তব্য। এইভাবে লঙ্গাইনাসের বক্তব্য একদিকে প্রাচীন শ্রেষ্ঠ সাহিত্যপাঠের প্রতি ঝোঁক 'classics'-এর একটি সংজ্ঞা যেমন তৈরি করল, তেমনি অন্যদিকে অনুভূতি-আবেগের উপর ঝোঁক পরবর্তী রোমান্টিক সাহিত্যতত্ত্বের বীজ বপন করল। হয়তো কেউ এ-ও বলতে পারেন ফিলিপ সিডনি সাহিত্যতত্ত্বে আরিস্টটলকে মোটামুটি অনুসরণ করলেও হঠাৎ দু-এক পঙ্ক্তিতে এমন একটা ইশারাও করে ফেললেন যাতে অভিব্যক্তিবাদের (expressionism-এর) বহুকাল আগে একটি বীজ উপ্ত হয়, তারও পিছনে আছে লঙ্গাইনাসের চিন্তার একটি আভাস।

শেষ একটি কথা : সাহিত্যে আধার ও আধেয়র মধ্যে যে বিবাহের কথা আজ আমরা বলি তার প্রথম সূচনা দেখা যাবে ওঁর লেখায়। এর সঙ্গে লঙ্গাইনাসে যা মন্ত্রোচ্চারণের জায়গা নিয়েছে, কবিব্যক্তিত্বের প্রভাব কথাটাও জোড়া আছে অবশ্য।

'The magic of literature is not the *sum of its ingredients*...something over and above the figures and artifices. There must be an intimate marriage of form and matter, *and there must be the glow of personality*.'

'নিও-ক্ল্যাসিসিজ্‌ম'
নব্য-ধ্রুপদি ভাবনার চালচিত্র
কুন্তল চট্টোপাধ্যায়

প্রাচীন গ্রিস ও রোমে জ্ঞানচর্চার স্বর্ণযুগ থেকে একালের অধুনান্তিক ভাবুকতার তুমুল ডিসকোর্সের সময়-সরণিতে যে বইগুলি জেগে আছে অতন্দ্র মাইল-ফলকের নিষ্ঠায়, দার্শনিক প্রবর অ্যারিস্টট্‌ল্ (খ্রিস্টপূর্ব ৩৮৪-৩২২)-এর *পোয়েটিক্‌স্* তাদের মধ্যে চিরজীবী ফিনিক্‌স্ পাখির মতো। আথেন্সে প্লেটোর কাছে কুড়ি বছর পাঠ নিয়েছিলেন অ্যারিস্টট্‌ল্। ম্যাসিডোনিয়ার রাজা ফিলিপ তাঁর বালক-পুত্র আলেকজান্ডারের শিক্ষক হিসাবে নিয়োগ করেছিলেন তাঁকে। পরে আথেন্সে ফিরে তাঁর নিজের পাঠদানকেন্দ্র খুলেছিলেন অ্যারিস্টট্‌ল্। তর্কশাস্ত্র, অধিবিদ্যা, জ্যোতির্বিজ্ঞান, জীববিদ্যা, রাষ্ট্রনীতি, সাহিত্যতত্ত্ব ইত্যাদি নানা বিষয়ে তাঁর সন্দর্ভগুলি মানুষের যুক্তি-বুদ্ধি-জ্ঞানের ইতিহাসে চিরস্মরণীয় হয়ে আছে। ইংরেজি তথা ইউরোপীয় সাহিত্যের তত্ত্ববিশ্বে 'নিও-ক্ল্যাসিক্যাল' ঘরানার অনুসন্ধানে কেন অ্যারিস্টট্‌ল? খুব সহজ উত্তর, কানু বিনা গীত হয় না বলে। ফরাসি সাহিত্যে সপ্তদশ ও অষ্টাদশ শতকে ক্ল্যাসিসিজ্‌ম্-এর যেসব তত্ত্বসূত্র বিশেষ প্রভাব বিস্তার করেছিল, ১৬৬০-এ ইংল্যান্ডে রাজতন্ত্রের পুনরাগমন থেকে রোমান্টিকতার পুনর্জাগরণ পর্যন্ত যুক্তি-তর্ক-শৃঙ্খলা-সংযম-সুমিতি-নিয়মনিষ্ঠার যে দিশা 'Age of Reason'-এর বিশ্বদৃষ্টি তথা মূল্যাঙ্কন প্রণালীর প্রতিনিধিত্ব করেছিল, তার উৎসে ছিল প্রাচীন গ্রিক ও রোমক কাব্য-কবিতা-নাটক-সাহিত্য সন্দর্শন। আর সেই দূরাতীত সৃজন-ভাবুকতার সর্বাপেক্ষা ধীমান ভাষ্যকার ছিলেন অ্যারিস্টট্‌ল্। মূলত ট্র্যাজেডি ও অংশত কমেডি আর এপিকের দৃষ্টান্ত আশ্রয় করে কাব্য নির্মাণ কলা বিষয়ে তাঁর পর্যালোচনা লিপিবদ্ধ হয়েছিল *পোয়েটিক্‌স্*-এ। 'মাইমেসিস' বা অনুকৃতি-তত্ত্বের প্রতিষ্ঠায়, ট্র্যাজেডিতে 'ক্যাথারসিস' বা আবেগমোচন প্রক্রিয়ার ব্যাখ্যায়, 'hamartia'–'hubris'–'anagnorisis'–'peripety' প্রভৃতি ধারণার যুক্তিসিদ্ধ বিশ্লেষণে, নাটকে স্থান-কাল-ঘটনার ঐক্যসূত্র নির্ধারণে অ্যারিস্টট্‌ল্ ছিলেন আলোর পথযাত্রী। নিও-ক্ল্যাসিসিজ্‌ম্-এর উদ্ভব হয়েছিল অ্যারিস্টট্‌ল্-এর সাহিত্য-নির্মাণ ভাবনার পুনরাবিষ্কার থেকে জাত চিন্তনের বাতাবরণে। তাই অ্যারিস্টট্‌ল্-এর কথা দিয়েই উপক্রমণিকা।

পোয়েটিক্‌স্-এ আলোচিত অ্যারিস্টটলীয় তত্ত্বভাবনা ও নির্দেশ বিশেষভাবে পুনরাবিষ্কৃত হয়েছিল ষোড়শ শতকে। এই পুনরাবিষ্কার কাণ্ডের অন্যতম সক্রিয় শরিক ছিলেন ফরাসি পণ্ডিত জুলিয়াস সিজার স্ক্যালিজার (১৪৮৫-১৫৫৮) যাঁর মরণোত্তর প্রকাশনা *Poetices Libri Septem* (১৫৬১)-এ অ্যারিস্টট্‌ল্‌-এর স্থান-কাল-ঘটনার ত্রিবিধ ঐক্য বিষয়ক ধারণাকে প্রবল ও নিরঙ্কুশ প্রতিষ্ঠা দেওয়া হয়েছিল। J. E. Spingarn তাঁর *A History of Literary Criticism in the Renaissance* গ্রন্থে মন্তব্য করেছেন যে 'Scaliger was the first to regard Aristotle as the perpetual lawgiver of poetry.' সপ্তদশ শতকের ফরাসি নাটকে 'unites Scaligeriennes' অ্যারিস্টট্‌ল্‌-এর ভাবনা তথা প্রস্তাবনাকে প্রতিষ্ঠিত করেছিল অনমনীয় বদ্ধমূল নির্দেশে। স্ক্যালিজারের অভিমত আরো জোরালো ভাবে উপস্থাপিত করেছিলেন ইতালীয় তত্ত্বকার ক্যাস্‌টেল্‌ভেট্রো তাঁর *Poetica D' Aristostele Vulgarizzata et Sposta* (1570) গ্রন্থে। এভাবেই ইওরোপের নাট্যতত্ত্বচিন্তায় অ্যারিস্টট্‌ল্‌ প্রত্যাবর্তন করেছিলেন নিয়ম-শৃঙ্খলার কঠোর অনুশাসনে। নিও-ক্ল্যাসিক্যাল বা নব্য-ধ্রুপদি সাহিত্যভাবনার বীজ ওই অনুশাসনবাদেই নিহিত ছিল।

নিও-ক্ল্যাসিক্যাল শিল্প-সাহিত্য তত্ত্বের প্রভাবশালী বিবৃতি ছিল ফরাসি কবি ও সমালোচক Nicolas Boileau (1636-1711)-র 'L' art Poetique' (1674) নামক সন্দর্ভে। চিন্তার স্বচ্ছতা ও যুক্তির সর্বময় গুরুত্বকে কবিতায় সবার উপরে স্থান দিয়েছিলেন তিনি। শিল্পসম্মত আঙ্গিক ও প্রাকরণিক উৎকর্ষ ছিল তাঁর কাছে বিশেষ অভিপ্রেত। অ্যারিস্টট্‌ল্‌-এর *পোয়েটিক্‌স্* ছাড়াও লাতিন ভাষার পুরোধা-কবি হোরেস্‌-এর *Ars Poetica* (20 B. C.)-র সূত্রাবলী ছিলো Boileau -র তত্ত্বায়নের মূল প্রেক্ষিত।

অ্যারিস্টট্‌ল্‌ থেকে কয়েক শো বছর এগিয়ে এসে এবার স্মরণ করা যেতে পারে প্রাচীন রোমক কবি কুইনটাস্‌ হোরেসিয়াস্‌ ফ্ল্যাকাস্‌ (খ্রিস্টপূর্ব ৬৫-৮)-কে। অ্যারিস্টট্‌ল্‌-এর *পোয়েটিক্‌স্*-এর মতো হোরেস্‌-এর *আর্স পোয়েটিকা* ছিল নিও-ক্ল্যাসিসিজ্‌ম্‌-এর তত্ত্বভাবনার অন্যতম মূল ভিত্তি। যদিও হোরেস্‌ তাঁর *আর্স পোয়েটিকা*-য় বিশেষ জোর দিয়েছিলেন শৃঙ্খলা ও সংগঠনের ওপর, পত্রাকারে রচিত এই ভাষ্য কিন্তু আদৌ কোনো সুসংবদ্ধ সন্দর্ভ নয়। খ্রিস্টপূর্ব তৃতীয় শতকের একটি গ্রিক পুস্তিকা অবলম্বনে সাধারণ বিচার-বুদ্ধির নিরিখে হোরেস্‌ কবি ও কবিতা নিয়ে কথা বলেছিলেন বেশ কিছুটা এলোমেলোভাবে। মানবজীবন থেকে কবি রসদ সংগ্রহ করবেন এবং তা প্রকাশ করবেন বিশ্বস্তভাবে, এ-কথা স্বীকার করেছিলেন হোরেস্‌। বলেছিলেন কবিকে অনুশীলন ও অনুকরণ করতে হবে হোমার ও অপরাপর ধ্রুপদি কবি-নাট্যকারদের রচনা। অভিনবত্বের সন্ধান করতে গিয়ে কবি যেন তাঁর স্বচ্ছতা ও সুমিতি হারিয়ে না ফেলেন। হোরেস্‌ বলেছিলেন উপযুক্ত বিষয় নির্বাচন ও তার অতিরেক-বর্জিত প্রকাশ, সঠিক ভাষা-ছন্দ-রীতি বেছে নেওয়ার প্রয়োজনীয়তা, সকল প্রকার আতিশয্য— অসংগতি-স্থূলতা বর্জন ইত্যাদির কথা। এ সব কিছুর জন্য তাঁর পরামর্শ ছিলো 'Study the Greek masterpieces : pore over them night and day.'[১২]

স্বকীয়তা ও স্বতঃস্ফূর্ততার বদলে শিল্পদক্ষতা ও ভারসাম্য ছিল হোরেসের বিশেষ অভিপ্রেত। কবিতা-শিল্পে বিষয় ও প্রকরণের যথাযথ সামঞ্জস্য, ভাষাভঙ্গি, স্বর ও ছন্দের নিখুঁত প্রয়োগ, সমগ্রের ঐক্য ও শৃঙ্খলা— এ-সব কিছুর পক্ষে সওয়াল করেছিলেন হোরেস। ধ্রুপদি/নব্য-ধ্রুপদি সাহিত্যতত্ত্বের আলোচনায় হোরেসকে এই সামঞ্জস্য-শৃঙ্খলা তথা 'decorum'-এর অন্যতম

প্রধান উদগাতা হিসাবে স্মরণ করা হয়ে থাকে। অ্যারিস্টট্ল্-এর থেকেও এ-বিষয়ে হোরেস-এর অবস্থান অনেক বেশি স্পষ্ট ও সুনিশ্চিত। 'The secret of all good writing is sound judgment', বলেছিলেন হোরেস ; ঘোষণা করেছিলেন, 'The poets' aim is either to profit or to please, or to blend in one the delightful and the useful'. আনন্দবিধান ও উপযোগিতা, এ-দুয়ের সার্থক সমন্বয় ছিল হোরেস-এর কাব্যচিন্তার কেন্দ্র। তাঁর *আর্স পোয়েটিকা*-র শেষ অংশে হোরেস ব্যঙ্গ করেছিলেন সেই উন্মাদনাগ্রস্ত কবিকে নিয়ে, যে-কবিকে প্লেটো নির্বাসিত করতে চেয়েছিলেন তাঁর আদর্শ রাষ্ট্র বা রিপাব্লিক থেকে। হোরেস-এর বিচারে কবি প্লেটোর হাতে দণ্ডাজ্ঞাপ্রাপ্ত, অতি-লৌকিক উন্মাদনা/ প্রেরণা-তাড়িত, স্বতস্ফূর্ত নির্মাতা নন। তিনি যুক্তিনিষ্ঠ ও বিচক্ষণ; নিয়ম-শৃঙ্খলা-দৃষ্টান্ত মেনে চলেন; আনন্দবিধানের সঙ্গে সঙ্গে শিক্ষাদানও তাঁর শিল্পের উদ্দেশ্য। সামাজিক-সাংস্কৃতিক নানা প্রশ্ন ও সমাজকল্যাণের ভাবনার সঙ্গে কবিতা তথা সাহিত্যের তত্ত্বভাবনাকে যুক্ত করার যে প্রবণতা হোরেস-এ দেখা যায় নব-জাগরণ ও তার উত্তরকালে ইউরোপের সাহিত্য-সমালোচনায় তার গুরুত্ব অনস্বীকার্য।

* * * * *

প্লেটো-অ্যারিস্টট্ল্-হোরেস-এর সাহিত্যতত্ত্ব/সমালোচনা ইংল্যান্ডে এসে পৌঁছেছিল ষোড়শ শতকের সাত-এর দশকে। কবিতা, বিশেষত নাটকের অপকর্ষ-বিষয়ক এক বিতর্ককে আশ্রয় করে। সমকালীন থিয়েটারে নৈতিকতা ও সামাজিক মূল্যবোধের সমস্যা নিয়ে Stephen Gosson (1554-1624) খুবই আক্রমণাত্মক সন্দর্ভ রচনা করেছিলেন—*The Schoole of Abuse* (1579)। তারই জবাবে ফিলিপ সিড্‌নি (১৫৫৪—১৫৮৬) লিখলেন *The Defence of Poesy / An Apologie for Poetrie* (রচনা কাল ১৫৮০, যদিও প্রকাশিত হয়েছিল ১৫৯৫-এ); গসন তাঁর সন্দর্ভটি উৎসর্গ করেছিলেন সিড্‌নিকেই।

প্লেটো থেকে শুরু করে যাঁরা কবি ও কবিতার বিরুদ্ধে সরব হয়েছিলেন তাঁদের সকলের উদ্দেশ্যেই সিড্‌নির এই জবাবদিহি। এক স্বচ্ছন্দ, আবেগময়, সতর্ক গদ্যে কবিতার বিরুদ্ধে উচ্চারিত মিথ্যাচার ও অনৈতিকতার অভিযোগ খণ্ডন করে তাকে দর্শন ও ইতিহাসের থেকে উচ্চতর অবস্থানে প্রতিষ্ঠিত করাই ছিল তাঁর লক্ষ্য। সিড্‌নি তাঁর এই 'Defence'/'Apologie' নির্মাণে ভরসা স্থাপন করেছিলেন অ্যারিস্টট্ল্-এর 'Imitation' বা অনুকৃতি তত্ত্বের ওপর—"Poesy therefore is an art of imitation, for so Aristotle termeth it in his word Mimesis, that is to say, representing, counterfeiting, or figuring forth; to speak metaphorically, a speaking picture, with this end, to teach and delight." লক্ষণীয় যে এখানে সিড্‌নি অ্যারিস্টট্ল্ পেরিয়ে চলে গিয়েছিলেন হোরেসের কাছে—'....with this end, to teach and delight'। কবিতা বাস্তব জগতের অবিকল যান্ত্রিক প্রতিরূপ নির্মাণ করে না, নির্মাণ করে এক উচ্চতর প্রতিচ্ছবি—"Nature never set forth the earth in so rich tapestry as divers poets have done;......her world is brazen, the poets deliver only a golden."

কেবলমাত্র ছন্দে ধৃত পদ রচনা কবিতা নয়, বলেছিলেন সিড্‌নি। হোরেস-নির্দেশিত 'delightful teaching'-কেই সিড্‌নি কবিতার সঠিক উদ্দেশ্য বলে উল্লেখ করেছিলেন। দর্শন ও ইতিহাসের থেকে কবিতার শিক্ষাদানের যোগ্যতা ও কার্যকারিতার উৎকর্ষ সম্বন্ধে নিঃসন্দেহ ছিলেন সিড্‌নি। দর্শন কেবল ধারণা শেখায়, দৃষ্টান্ত ছাড়া; ইতিহাস কেবল দৃষ্টান্ত/তথ্য দিয়ে

শেখাতে চায়; কবিতা শেখায় ধারণা ও দৃষ্টান্ত—precept ও example— দুটিরই সাহায্যে। কবি 'বিশেষ' বা 'particutar'-কে উত্তীর্ণ করেন 'নির্বিশেষ' বা 'universal'-এ। কবিতার পৃথিবীতে তাই ভালো-র পুরস্কার ও মন্দ-র শাস্তি অর্থাৎ 'Poetic Justice' সম্ভব। এভাবেই অ্যারিস্টট্‌ল্‌ ও হোরেসকে অনুসরণ করে রেনেসাঁর ইংল্যান্ডে কবিতা তথা সাহিত্যের তত্ত্বভাবনাকে গড়ে তুলেছিলেন সিড্‌নি। অবশ্য ইউরোপের বিস্তৃততর পরিধিতে দেখলে সিড্‌নি কোনো বিচ্ছিন্ন, একক কণ্ঠস্বর ছিলেন না। অ্যারিস্টট্‌ল্‌-হোরেসকে আশ্রয় করে কবিতার উন্নত অবস্থান ও তার মূল্য/উপযোগিতা নিয়ে ষোড়শ শতকের ইউরোপে বেশ কিছু বই লেখা হয়েছিল। এই সব বইয়ের লেখকদের মধ্যে আগে বলা হয়েছে স্ক্যালিজার ও ক্যাস্‌টেল্‌ভেট্রো-র কথা। এ ছাড়া বলা যেতে পারে Antonio Minturno-র *De Poeta* (1559), *L Arte Poetica* (1564)-র কথা।

* * * * *

ফিলিপ সিউনির 'Defence'/'Apologie'-র ভিত্তি ছিল অ্যারিস্টট্‌ল্‌-হোরেস্‌-এর 'ক্ল্যাসিসিজ্‌ম্‌', কিন্তু সিড্‌নির ভাষা-ভঙ্গি-স্বরে ধ্রুপদি তত্ত্ববাগীশের কঠিন দার্ঢ্য ছিল না, ছিল এক ধরনের কল্পনা-উচ্ছ্বাস। সেই কাঠিন্য ও বস্তুনিষ্ঠা পাওয়া গেল প্রাচীন ধ্রুপদি ঐতিহ্য ও ভাবুকতায় পরিণত, পাণ্ডিত্যপূর্ণ ও স্থিতপ্রজ্ঞ কবি ও নাট্যকার বেন জনসন (১৫৭২-১৬৩৭)-এর রচনাবলীতে। জনসনের ধ্রুপদি নাট্যাদর্শে রচিত ট্রাজেডিনাটক *Sejanus, His Fall* (1603) ও *Catiline His Conspiracy* (1611), তাঁর 'কমেডি অব হিউমারস'-এর দৃষ্টান্তস্বরূপ *Every man in His Humour* (1598), *Every man out of His Humour* (1599), *Volpone* (1605), *Bartholomew Fair* (1614), প্রভৃতি নাটকে 'নিও-ক্ল্যাসিসিজ্‌ম্‌'-এর আদর্শ ও আঙ্গিক নিশ্চিত প্রতিষ্ঠা পেয়েছিল লন্ডনের সমসাময়িক সমাজ-বাস্তবতার উপভোগ্য ও চমকপ্রদ চিত্রণে।

রোমক সম্রাট টাইবেরিয়াসের প্রিয়প্রাত্র সিজেনাসের উচ্চাকাঙ্ক্ষা ও পতনের কাহিনি অবলম্বনে রচিত *Sejanus, His Fall* প্রথম অভিনীত হয়েছিল গ্লোব থিয়েটারে ১৬০৩-এ। এই নাটকের 'ভূমিকা'-য় কৈফিয়ত দিতে গিয়ে জনসন বলেছিলেন যে প্রাচীন ধ্রুপদি নাট্যকারদের 'কালিক ঐক্য' (Unity of time) ও 'কোরাস' (Chorus) ব্যবহারের প্রথা যথাযথভাবে পালন না করলেও অনেকগুলি ক্ষেত্রে তিনি ঐতিহ্যানুগত্য প্রদর্শন করেছেন, যথা, 'truth of Argument, dignity of Persons, gravity and height of Elocution, fullness and frequency of Sentence'. রোমের ইতিহাসের আর এক অধ্যায় ৬৩ খ্রিস্টপূর্বাব্দের Lucius Sergius Catilina-র ষড়যন্ত্র অবলম্বনে লেখা জনসনের ট্র্যাজেডিনাটক *Catiline His Conspiracy* অভিনীত ও প্রকাশিত হয়েছিল ১৬১১-তে।

ইংল্যান্ডে রেনেসাঁর কবি-নাট্যকারদের মধ্যে বেন জনসনের মত্যে আর কেউ প্রাচীন রোমের কাব্য-নাটক-সাহিত্যাদর্শকে তাঁর সমসময়ের সমাজচিত্রণ ও শিল্পাঙ্গিকে এত সার্থক-সমান্তরালভাবে প্রয়োগ করতে পেরেছিলেন বলে মনে হয় না। হোরেস্‌-এর কাব্য-কবিতাকে অগাস্টাসের রোমের দ্বন্দ্ব-বৈষম্যের সঙ্গে সম্পর্কিত করা অথবা সিজেনাস-ক্যাটিলিনাদের কার্যকলাপের নাট্যায়নের মধ্য দিয়ে সমসাময়িক ইংল্যান্ডে অভিজাতবর্গের চরিত্রচিত্রণ— বেন জনসনের কবিতা, মাস্ক, ট্র্যাজেডি, কমেডি এভাবেই নব্য-ধ্রুপদি সৃজন ও ভাষ্যের উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত হয়ে উঠেছিল।

মধ্যযুগের শারীরবিদ্যার তত্ত্বভিত্তিকে আশ্রয় করে জনসন তাঁর কমেডি নাটকে চরিত্রায়ণে যে 'humour'-এর ধারণা প্রয়োগ করেছিলেন তারও প্রকৃত উৎস ছিল প্রাচীন রোমক কমেডি,

প্লটাসের প্রহসনধর্মী নাটক। চতুর ভৃত্য, ঈর্ষাকাতর স্বামী, মাতব্বর অভিভাবক, গ্রাম্য নির্বোধের মতো বিশেষ উৎকেন্দ্রিকতা-চিহ্নিত টাইপ চরিত্রগুলি ছিল জনসনের ব্যঙ্গ-বিদ্রুপপূর্ণ সমাজবাস্তবতার চিত্রণে চমকপ্রদ হাতিয়ার। প্লটাস ছাড়াও জনসন এ ব্যাপারে প্রভাবিত হয়েছিলেন তৃতীয় খ্রিস্টপূর্বাব্দের গ্রিক লেখক থিওফ্র্যাস্টাসের 'Characteri-এর দ্বারা। থিওফ্র্যাস্টীয় রীতিতে জনসনের সমকালে জোসেফ হল লিখেছিলেন *Characterisms* (1608) এবং টমাস ওভারবেরি লিখেছিলেন *Characters* (1614)।

মধ্যযুগীয় ধারণা ও অন্বেষণের ভিত্তিতে এবং প্রাচীন রোমের কমেডি নাটকের আদলে জনসন 'কমেডি অব হিউমারস্' নামে যে নাট্য-আঙ্গিক প্রচলন করেছিলেন, নিও-ক্ল্যাসিক লেখক ও চিন্তাবিদ রূপে তা' ছিল জনসনের বিশিষ্ট পরিচয়-পত্র। প্রাচীন ধ্রুপদি নাট্যাদর্শে নিষিক্ত জনসনের সৃজন-মানস সমকালীন এলিজাবেথীয় সমাজজীবনের ব্যঙ্গ-বিদ্রুপপূর্ণ উন্মোচন ও সংস্কারমনস্ক নৈতিক অভিঘাত চিহ্নিত করার কাজে সক্রিয় হয়েছিল। চরিত্রনির্মাণ ও প্লটের সুশৃঙ্খল বিন্যাসে জনসন ছিলেন অত্যন্ত যত্নবান ও নিয়মনিষ্ঠ। সামাজিক পর্যবেক্ষণ, বিশ্লেষণ তথা ভাষ্যনির্মাণে কবির দায়বদ্ধতা সম্পর্কে সজাগ জনসন তাঁর *Volpone* (1607) নাটকের উৎসর্গপত্রে এই দায়বদ্ধতা স্বীকার করে নিয়ে তাঁর ব্যঙ্গ-প্রহসনধর্মী নাটকের উদ্দেশ্যের পক্ষে সওয়াল করেছিলেন। ভালো মানুষ না হলে ভালো কবি হওয়া যায় না, এমন কথাই বলেছিলেন জনসন : "For if men will impartially, and not a-squint, look toward the offices and function of a Poet, they will easily conclude to themselves the impossibility, of any man's being the good Poet, without first being a good Man." শঠতা, দুর্নীতিপরায়ণতা, স্বেচ্ছাচার, স্থূলতার বিপরীতে ভালো তথা সামাজিক মানুষ রূপে কবির এই স্বাতন্ত্র্য জনসনের ক্ল্যাসিসিজম্ লালিত মানসিক-নৈতিক ভারসাম্যের পরিচায়ক।

১৬২০ থেকে ১৬৩৫-এর মধ্যে রচিত *Timber, or Discoveries* নামের *commonplace book*-এ যেন জনসনের স্বচ্ছ, প্রত্যয়ী ও বিচক্ষণ যে কণ্ঠস্বর শুনতে পাওয়া গিয়েছিল তাতেও সিসেরো, কুইনটিলিয়ান, সেনেকা থেকে ম্যাকিয়াভেলি ও বেকনের চিন্তনের প্রভাব সহজলক্ষ্য—'The true Artificer will not run away from Nature, as he were afraid of her, or depart from life and the likeness of Truth, but speak to the capacity of his hearers." কবির দায়িত্ব ও ভূমিকা, কবিতার মূল্যায়ন, কবিতার শৈলী ইত্যাদি নানা বিষয়ে অত্যন্ত স্পষ্টভাষায় তাঁর মতামত ব্যক্ত করেছিলেন জনসন। এও তাঁর 'নিও-ক্ল্যাসিক্যাল' ঐতিহ্যের সাহসী অনুবর্তন বলে মনে হয়। কাব্য-কবিতা-নাটকের অনুশীলনে জনসনের অবদান সম্পর্কে উইম্স্যাট ও ব্রুক্স্-এর অভিমত প্রসঙ্গত স্মরণ করা যেতে পারে :

> Jonson wrote a kind of native classicism....obscene yet moralizing, caustic, thorny, vulgar, immediate. Londonian and topical It was Roman satiric technique applied to London vice, and a solid instance of the Augustan pinciple of 'imitation' or recreation of the classic model.....The epigram, little known in the West since the time of Martial and imperial Rome, was not cultivated again, and so was Juvenalian satire. As Sophocles and Aristophanes had been followed by Theophrastus and his pupil Menander, Shakespeare was followed by Jonson and by Hall.[৩]

* * * * * *

'Restoration' তথা রাজতন্ত্র পুনঃপ্রতিষ্ঠার যুগে কবি-নাট্যকার-সমালোচক জন ড্রাইডেন (১৬৩১-১৭০০) ছিলেন ইংরেজি সাহিত্য/সাহিত্যতত্ত্বের প্রাঙ্গণে নিও-ক্ল্যাসিসিজ্‌ম্‌'-এর প্রধান কাণ্ডারী। চার বন্ধু-Eugenius, Crites, Lisideius, Neander-এর আলোচনার কল্প-কাঠামোয় রচিত, ১৬৬৮-তে প্রকাশিত তাঁর দীর্ঘ প্রবন্ধ 'Essay of Dramatic Poesy' ছিল সাহিত্যতত্ত্ব বিষয়ক ড্রাইডেনের এক সুসংহত বিশ্লেষণী দলিল। ১৬৬৫-তে প্লেগ-এ আক্রান্ত লন্ডন শহর ছেড়ে উইল্‌ট্‌শায়ারে চলে গিয়েছিলেন ড্রাইডেন এবং সেখানেই কথোপকথনের আঙ্গিকে লেখা হয়েছিল তাঁর এই দীর্ঘতম গদ্য-নিদর্শন— Charles Sackville, Robert Howard, Charles Sedley এবং John Dryden-এর পারস্পরিক আলোচনার সূত্র ধরে। প্রাচীন ও সমকালীন নাটক, ফরাসি ও ইংরেজি নাটকের তুলনামূলক পর্যালোচনা ছিল এই 'dialogue'-ধর্মী রচনার বিষয়। নাটকে নিরূপিত ছন্দ অথবা ব্ল্যাঙ্ক ভার্স কোন্‌টি গ্রহণযোগ্য, প্রাচীন নাটকে স্থান-কাল-কর্মবৃত্তের ঐক্য এবং ইংরেজি নাটকে এই ত্রিবিধ ঐক্যসূত্র প্রয়োগের ব্যাপারে নাট্যকারদের দৃষ্টিভঙ্গি ইত্যাদি বিষয় ছাড়াও এই বই-এ শেক্‌স্‌পিয়র ও তাঁর এলিজাবেথীয় সতীর্থদের রচনার মূল্যায়ন ছিল বিশেষ উল্লেখযোগ্য।

ফ্রান্সে নির্বাসিত দ্বিতীয় চার্লসের রাজ-সিংহাসনে অধিষ্ঠানের কারণে রেস্টোরেশন ইংল্যান্ডের দরবারি সাহিত্যানুশীলনের বৃত্তে ফরাসি ক্ল্যাসিসিজ্‌ম্‌-এর প্রভাব ছিল যথেষ্ট— বিশেষত নাটক ও নাট্যতত্ত্বচর্চায় Corneille ও Racine -এর রচনার উল্লেখযোগ্য প্রভাব পড়েছিল। পূর্ববর্তী ইতালীয় ক্ল্যাসিসিজ্‌ম্‌-এর তুলনায় ফরাসি ক্ল্যাসিসিজ্‌ম্‌-এর উদ্দীপনা ও বাতাবরণে কবিতা তথা নাটকে অনুশাসন ও শৃঙ্খলার বাধ্যতা ছিল অনেক বেশি সক্রিয় ও গতিশীল। প্রসঙ্গত Corneille-এর বিশেষভাবে ধ্রুপদি আঙ্গিকে লেখা নাটক *Le cid* (1637)-এর কথা মনে করা যেতে পারে। ড্রাইডেন তাঁর প্রবন্ধে বারবার Corneille-কৃত নব্য-ধ্রুপদি সমালোচনার প্রসঙ্গ উল্লেখ করেছেন— বেশিরভাগ ক্ষেত্রেই ১৬৬০-এ প্রকাশিত তাঁর নাট্যসংগ্রহে সংকলিত তিনটি ডিসকোর্সের অন্যতম 'Discours des Trois Unites'-এর প্রসঙ্গ।

টেম্‌স্‌ নদীতে ভাসমান এক জলযানে চার ধীমান দরবারি চরিত্র। ক্লিভল্যান্ড ও উইদারের কবিতা নিয়ে হাল্‌কা চালে কথা বলতে বলতে এক আনুষ্ঠানিক যুক্তিতর্কের প্রস্তাবনা। নাট্যরচনায় ড্রাইডেনের সহযোগী রবার্ট হাওয়ার্ড ইতোপূর্বেই অন্যত্র নাটকে ছন্দের মিল এবং প্রাচীন ধ্রুপদি ঐক্যসূত্রগুলি নিয়ে তাঁর অভিমত ব্যক্ত করেছিলেন। ড্রাইডেনের প্রবন্ধে সেই হাওয়ার্ডের প্রতিরূপ Crites চূড়ান্ত ধ্রুপদি অবস্থান নির্দেশ করেছেন— প্রাচীন গ্রিক ও রোমক রচয়িতারা যে-সব নিয়মনীতি নির্ধারণ ও প্রতিষ্ঠা করেছিলেন সমকালীন নাটক যেন সেসব কিছু মান্য করে। তাঁর বিচারে আধুনিকদের তুলনায় প্রাচীন, সমকালীনদের তুলনায় এলিজাবেথীয় কবি-নাট্যরচয়িতারা অনস্বীকার্যভাবে উচ্চতর মার্গের অভিযাত্রী। Crites-এর প্রতিপক্ষ Eugenius-'Goboduc'-এর অন্যতম নাট্যকার Thomas Sackville-এর উত্তরসূরি Charles Sackerlle -এর প্রতিরূপ। তাঁর মতে প্রাচীন কবিলেখকেরা নিয়ম-নীতি যথাযথভাবে পালন করতে পারেননি; বরং আধুনিক কালের রচয়িতারাই যথার্থ নিয়মনিষ্ঠ। আলোচনার তৃতীয় অংশগ্রহণকারী তুলনায় কমবয়সি চার্লস সেডলির প্রতিরূপ Lisideius। পূর্ববর্তী দুই বক্তার সঙ্গে সেও সহমত যে নাট্যরচনায় প্রাচীন ধ্রুপদি নিয়ম-শৃঙ্খলা অবশ্য পালনীয় ভিত্তি, যদিও তাঁর মতে সমকালীন ইংরেজি নাটকে নয়, ফরাসি নাটকের দৃষ্টান্তেই সেসব নিয়ম-কানুনের সার্থক রূপায়ণ দেখতে পাওয়া যায়। সবশেষে আলোচনায় যোগদান Neander-এর— নতুন মানুষ যে প্রবন্ধকার

ড্রাইডেনের কণ্ঠস্বরস্বরূপ। ফরাসি নাটকে প্লটের অধিকতর সংহতি ও মঞ্চসৌষ্ঠবের যথার্থতা মেনে নিলেও ইংরেজি নাটক ফরাসি নাটকের তুলনায় শ্রীহীন বলে মনে করেন না ড্রাইডেন বা Neander। নাটকের কাজ 'lively imitation of nature' ; এদিক থেকে দেখলে ফরাসি নাটকের যাবতীয় সৌন্দর্য মনুষ্যত্বের সজীবতায় প্রাণময় হয়ে ওঠে না; চরিত্রচিত্রণে জীবনধর্মী স্বাতন্ত্র্য ও আবেগ-সংবেগের বিশিষ্টতা নজরে পড়ে না— '...Those beauties of the French poesy are such as will raise perfection higher where it is, but are not sufficient to give it where it is not : they are indeed the beauties of a statue, but not of a man, because not animated with the soul of Poesy, which is imitation of humour and passions.' বেন জনসনের যে-কোনো নাটকে মানবজীবনের সারবস্তু ও বৈচিত্র্য যেভাবে মূর্ত হয়ে ওঠে সমকালীন ফরাসি নাটকের সমগ্র ধারাতেও তার সন্ধান মেলে না। Neander-এর এই মত বেন জনসনের প্রতি ড্রাইডেনের সশ্রদ্ধ ঋণস্বীকারেরই নামান্তর। 'কমেডি' ও 'ট্র্যাজেডি'—এ-দুয়ের মিশ্রণকে এর পর সমর্থন করেন Neander ; মনে করেন চাপল্য ও গাম্ভীর্যের এই বৈপরীত্য নাটককে দেয় বাস্তবসম্মত গতি। ফরাসি নাটকের প্লটে তিনি বৈচিত্র্য ও বৈশদ্যের সন্ধান পান না। ইংরেজি নাটকে মূল কাহিনিবৃত্তের সঙ্গে পার্শ্ব-কাহিনি (Sub-plot) যুক্ত হয়ে প্লটকে ক্লান্তিকর একমুখী বিন্যাসের হাত থেকে রক্ষা করে। এ ছাড়া ফরাসি নাটকের সংলাপ দীর্ঘ, একঘেয়ে অভিভাষণের মতো। Corneille-এর *Cinna* ও *Pompey*-র মতো নাটক প্রকৃতপক্ষে 'long discourses of reason of state.' ফরাসিরা স্বভাবতই চপল এবং নাটকের মাধ্যমে তাদের সংযত করার চেষ্টা হতে পারে; কিন্তু ইংরেজরা স্বভাব-গম্ভীর এবং নাটকের কাছে তারা বিনোদন ও উদ্দীপনা প্রত্যাশা করে।

* * * * * *

রেস্টোরেশন-পরবর্তী অষ্টাদশ শতক তথা 'অগাস্টান যুগ'-এর দুই প্রধান সাহিত্য-ব্যক্তিত্ব আলেকজান্ডার পোপ (১৬৮৮–১৭৪৪) ও স্যামুয়েল জনসন (১৭০৯-১৭৮৪)। তাঁর একুশ বছর বয়সে লেখা ও ১৭১১-তে প্রকাশিত *An Essay on Criticism* ছিল পোপের হোরেসের *আর্স পোয়েটিকা*-র ঘরানায় ও অনুপ্রেরণায় রচিত, হিরোয়িক কাপলেটের প্রকরণ দক্ষতায় মণ্ডিত এক সন্দর্ভ-কাব্য। চিন্তায় স্বকীয়তা ও অভিনবত্ব অপেক্ষা প্রাচীন ধ্রুপদি ভাবুকতার নিয়ম-নীতি-শৃঙ্খলা-সূত্রায়ণকে পুনর্স্থাপিত করাই ছিল পোপের উদ্দেশ্য। 'উইট' (wit)-এর প্রখর দীপ্তি ও 'এপিগ্রাম' (epigram)-এর চমকপ্রদ, লক্ষ্যভেদী সংক্ষিপ্ত বাচনিক উৎকর্ষে মণ্ডিত পোপের মন্তব্যগুলি প্রবাদের মর্যাদা অর্জন করেছিল 'A little learning is a dangerous thing .' অথবা 'To err is human : to forgive, divine' অথবা 'Some praise at morning what they blame at night;/But always think the last option right'.

পোপের এই সুখপাঠ্য ভার্স-ডিসকোর্স কেবলমাত্র প্রাচীন ধ্রুপদি ঐতিহ্যের প্রভাব এবং সেই ঐতিহ্য বিষয়ক একটি বয়ান মাত্র নয়; পোপ তাঁর *An Essay on Criticism*-কে গড়ে তুলতে চেয়েছিলেন ধ্রুপদি কাব্যের একটি দৃষ্টান্ত রূপে, হোরেসীয় 'Ars'-এর অনবদ্য নমুনা হিসাবে। ষোড়শ শতকে Vida হোরেসের *আর্স পোয়েটিকা*-র পুনর্নির্মাণে রচনা করেছিলেন অ্যারিস্টট্ল্ ও হোরেসের বক্তব্যের সম্প্রসারিত প্রকাশ; সে-সব কিছুকেই ছাপিয়ে গিয়েছিলেন পোপ তাঁর ছন্দে ধৃত ও বাচনিক ঔজ্জ্বল্যে দীপ্যমান এই ডিসকোর্সে। সাহিত্য-রুচির লক্ষণ ও মূল্যায়ন/সমালোচনার নীতি-নিয়ম 'wit' ও rhetoric'-এর চমৎকার প্রয়োগে তুলে ধরেছিলেন

পোপ। তাঁর বিচারে সমালোচনা সাধারণ জ্ঞান-বুদ্ধি, চিন্তার স্বচ্ছতা ও শোভনসুন্দর আচরণের শৃঙ্খলা-শাসিত সম্প্রসারণ।

তাঁর সন্দর্ভ-কাব্য শুরুতেই সমালোচকের দায়িত্ব সম্পর্কে পাঠককে সচেতন করে তুলেছিল পোপের বাচনভঙ্গির অনন্য সরসতায়—'Tis hard to say, if greater want of skill/ Appear in writing or in judging ill.' এরপর পোপ ব্যাখ্যা করেছিলেন অপ-সমালোচনার কারণগুলি যার মধ্যে বেশিরভাগই সমালোচকের নৈতিক ও মনস্তাত্ত্বিক প্রবণতা জনিত — অহমিকা, পক্ষপাত, উন্নাসিকতা ইত্যাদি। সেই সঙ্গে পোপ উল্লেখ করেছিলেন কাব্য-কৃতিত্বের সামগ্রিক বিচার না করে শব্দ প্রয়োগ অথবা ছন্দ জাতীয় একক অনুপুঙ্খ নিয়ে বিক্ষিপ্ত বিচারের বদ অভ্যাস। তাঁর ডিসকোর্সের পরবর্তী অংশে সমালোচনার ইতিহাস থেকে স্মরণীয় সব নাম উল্লেখ করে পোপ তুলে ধরেছিলেন মূল্যাঙ্কনের নিরিখগুলি। অ্যারিস্টট্‌ল্‌, হোরেস, কুইনটিলিয়ান, লনজাইনাস প্রমুখ প্রাচীন ধ্রুপদি ভাবুকদের প্রদর্শিত পথ ধরে।

শীলিত সমিল দ্বিপদীর আশ্রয়ে লেখা পোপের এই ভার্স-ডিসকোর্স হয়তো সমালোচনা-তত্ত্বের ইতিহাসে কোনো স্বকীয় যোগদান বলে চিহ্নিত হবে না। তবে তাঁর সমসময়ের সাহিত্যভাবনায় শিল্প (art) ও প্রকৃতি (nature)-র পারস্পরিক সম্পর্কে রুচি (taste)-র অবস্থান, নির্মাণ ও মূল্যায়নের নিয়মনীতি, প্রাচীন ধ্রুপদি ভাবুক ও ভাষ্যকারদের গুরুত্ব ইত্যাদি বিষয়/প্রসঙ্গে পোপের এই বাকচাতুর্যমণ্ডিত বয়ান নিও-ক্ল্যাসিক্যাল ঐতিহ্যের এক মনোজ্ঞ কীর্তি।

যুক্তি ও গদ্যের যুগ অষ্টাদশ শতকের মধ্যভাগে স্যামুয়েল জনসন (১৭০৯-১৭৮৪) তাঁর বিচার ও মূল্যায়নে নিও-ক্ল্যাসিসিজ্‌মের সর্বাধিক গুরুত্বপূর্ণ কণ্ঠস্বর, যদিও কোনো একটি সুসংবদ্ধ তাত্ত্বিক অবস্থানের উদ্গাতা রূপে জনসনকে চিহ্নিত করা যাবে বলে মনে হয় না। ড্রাইডেনের Neander যে বৈচিত্র্য বা 'variety'-র কথা বলেছিল, জোর দিয়েছিল 'local intensities'-এর মূল্যের ওপর, জনসনেও আমরা পেয়েছিলাম তার প্রতিধ্বনি— '....the great source of pleasure is variety. Unifomity must tire at last, though it be uniformity of excellence'.[৪] অতীতকালের সাহিত্যকর্মের অনুকরণের বদলে জনসনের বাঞ্ছিত ছিল বাস্তব জীবনের অনুকরণ; কেবলমাত্র নব্য-ধ্রুপদি নিয়ম-শৃঙ্খলার নিরঙ্কুশ অনুসরণ নয়— 'there is always an appeal open from criticism to nature.'[৫] এই 'nature' বা 'প্রকৃতি' হল মানব-প্রকৃতি, রোমান্টিক কবি-লেখকদের আকাশ-অরণ্য-নদী-পাহাড়-নক্ষত্রের প্রকৃতিজগৎ নয়। পোপও তার *An Essay on Criticism*-এ বলেছিলেন এই 'প্রকৃতি'-র নব্য-ধ্রুপদি ধারণার কথা— 'First follow Nature'. 'Nature' অর্থে মানব-প্রকৃতির সমাজবদ্ধ পরিশীলিত রূপ। এই মানব-প্রকৃতির ভালো-মন্দ, সাদা-কালো, আলো-অন্ধকারকে তাঁর নাটকে তুলে ধরেছিলেন শেকস্‌পিয়র এবং ট্র্যাজেডি-কমেডির সংমিশ্রণ ঘটিয়েছিলেন প্রাচীন ধ্রুপদি তত্ত্বনির্দেশ লঙ্ঘন করে। জনসন কিন্তু সেই আঙ্গিক-মিশ্রণ অনুমোদন করেছিলেন তাঁর *Preface to Shakespeare*-এ—'Shakespeare exhibits the real state of sublunary nature which partakes of good and evil, joy and sorow, mingled with endless variety of proportion and innumerable modes of combination.'

নব্য-ধ্রুপদি সাহিত্যতত্ত্বের ভাবনা ও জিজ্ঞাসায় একটি সাধারণ (General), সার্বজনীন (Universal) ও চিরন্তন (Eternal) প্রত্যয়ের খোঁজ বিশেষভাবে নজরে পড়বে স্যামুয়েল জনসনের বিচার/প্রতর্কে। রেনেসাঁ-উত্তর বিজ্ঞানচর্চার সঙ্গে সংগতিপূর্ণভাবে নব্য-ধ্রুপদি সাহিত্

সমালোচনা 'বিশেষ' (Particular) থেকে 'নির্বিশেষ' (Universal)-এ উত্তীর্ণ হবার প্রয়াসে চালিত হয়েছে। জনসনের 'Rasselas'-এ দার্শনিক চরিত্র ইম্‌ল্যাকের বয়ানে কবির কর্তব্য প্রসঙ্গে সেই 'Classic Universal'-এর বার্তা— 'The business of the poet.....is to examine, not the individual, but the species; to remark general properties and large appearances; he does not number the streaks of the tulip, or describe the different shades in the verdure of the forest; he must disregard present laws and opinions, and rise to general and transcendent truths, which will always be the same."[৬] শেকসপিয়রের চরিত্রেরা বিশেষ স্থান-কালের স্বাতন্ত্র্যে চিহ্নিত ব্যক্তিসত্তা নয়; সময়-নির্দিষ্ট রীতি-নীতি মতামত অতিক্রম করে তারা সর্বকালীন, সাধারণ মানবতার প্রতিনিধি স্বরূপ "(Shakespeare's) characters are not modified by the customs of particular places, unpractised by the rest of the world...they are the genuine progeny of common humanity, such as the world will always supply, and observation will always find. His persons act and speak by the influence of those gereral passions and principles by which all minds are agitated, and the whole system of life is continued in motion." [*Preface to Shakespeare*] তাঁর *The Lives of the Poets* গ্রন্থের অ্যাব্রাহাম কাউলে-বিষয়ক অংশে কাউলে সহ সব 'মেটাফিজিক্যাল' কবিদের সম্পর্কে জনসনের অভিযোগ এ-প্রসঙ্গে স্মরণযোগ্য। বুদ্ধিবৃত্তির সূক্ষ্ম অনুপুঙ্খের সন্ধান করতে করতে এই কবিরা হারিয়েছিলেন 'grandeur of generality'।

নিও-ক্ল্যাসিক্যাল সাহিত্যাদর্শে 'true to life' বা 'verisimilitude' বলতে যে জীবননিষ্ঠ রূপায়ণের কথা বোঝাত, জনসন কিন্তু তা থেকে সরে গিয়েছিলেন বাস্তববাদ (realism) - এর আরো আধুনিক ধারণার দিকে। তিনি জোর দিয়েছিলেন সাহিত্যের নৈতিক উদ্দেশ্যের উপর। বলেছিলেন যে লেখককে তাঁর নৈতিক উদ্দেশ্য বজায় রেখে 'প্রকৃতি' ('nature') থেকে বেছে নিতে হবে তাঁর বিষয়। কোনো পূর্ব ধারণা অথবা কোনো কর্তৃত্বের দ্বারা চালিত না হয়ে লেখক হয়ে উঠবেন সাধারণ মানুষের কণ্ঠস্বর- 'Common voice of the multitude uninstructed by precept and unprejudiced by authority".

* * * * *

অষ্টাদশ শতকের ইংল্যাণ্ডে নাগরিক মধ্য শ্রেণির উত্থানের পরিপ্রেক্ষিতে সাহিত্যের স্বরূপ ও রুচি বদলাতে শুরু করেছিল। নতুন পাঠক-গোষ্ঠীর চাহিদা ছিল স্বতন্ত্র। শ্রেণি ও লিঙ্গ সচেতনতা, বই পড়ার জন্য প্রয়োজনীয় অবসর, সার্কুলেটিং লাইব্রেরির মাধ্যমে বইয়ের নতুন বাজারের প্রসার, অভিজাতবর্গের পৃষ্ঠপোষকতার বদলে গ্রন্থস্বত্ব ব্যবস্থা— এ-সব কিছুর ফলে সাহিত্যচর্চা ও তত্ত্বায়নের ক্ষেত্রে ১৭৫০-এর পর থেকে নতুন হাওয়া বইতে শুরু করেছিল। এক ধরনের জাতীয়তাবাদী স্পৃহা এবং প্রাক্-নিও ক্ল্যাসিক্যাল ইংরেজি সাহিত্যের গৌরব এই সময় থেকে পাঠক-সমালোচকদের প্রভাবিত করছিলো। নিয়ম-কানুন-তত্ত্বনির্দেশের নিগড়ে বাঁধা যায়নি এমন প্রতিভারূপে শেক্‌পিয়রকে—হয়তো বা স্পেনসার ও মিলটনকেও— নতুন করে দেখা হচ্ছিল। এই সময় থেকেই নব্য-ধ্রুপদি সাহিত্যাদর্শের মূল নীতিসূত্রগুলি একে একে আক্রান্ত হচ্ছিল।

যদিও মোটের ওপর স্যামুয়েল জনসনকে নব্য-ধ্রুপদি নিয়মনিষ্ঠার কান্ডারি বলেই গণ্য করা হয়, তবু সেই জনসনই ছিলেন নিও-ক্ল্যাসিসিজ্‌মের ঘোর আক্রমণকারী। প্রাচীন কাল থেকে আলোচিত স্থান ও কালের ঐক্যসূত্র খারিজ করেছিলেন জনসন। ক্যাস্‌টেলভেট্রো থেকে

এই দুই ঐক্যসূত্রকে আবশ্যক মনে করা হয়েছিল নাটককে বিশ্বাসযোগ্যতা দানের নিরিখে 'the supposed necessity of making the drama credible.'[৭] জনসন সেই বিশ্বাসযোগ্যতার যুক্তি বাতিল করে দিয়ে লিখেছিলেন "The spectators are always in their senses, and know, from the first act to last, that the stage is only a stage, and that the players are only players."[৮]

১৭৫০ থেকে শুরু করে ১৭৯৮-এ দুই নবীন কবি-প্রতিভা ওয়ার্ডস্‌ওয়ার্থ ও কোলরিজের *লিরিক্যাল ব্যালাড্‌স্* প্রকাশিত হওয়া পর্যন্ত ইংরেজি কাব্য-কবিতা-গথিক আখ্যানে নিও-ক্ল্যাসিসিজ্‌ম বিরোধী এক আবহাওয়া— প্রাচীন ধ্রুপদি আঙ্গিক তথা প্রকরণের নিয়মনিষ্ঠ অনুসরণের পরিবর্তে মন্ময়তা-স্বতঃস্ফূর্ততা-রহস্য-রোমাঞ্চ-আবেশময়তার নতুন মাত্রাচিহ্নিত বেদ্যমানতা-সমাজ-মানুষ-প্রকৃতি-সাহিত্য ইত্যাদি বিষয়ে নিও-ক্ল্যাসিসিজ্‌মের বিকল্প প্রবণতা সমূহের অনুসন্ধানকে নতুন এক অভিমুখ দানে সমর্থ হয়। এডওয়ার্ড ইয়ং তাঁর *Conjectures On Original Composition*-এ প্রতিভার স্বকীয়তার দাবি তোলেন : 'There is something in poetry beyond prose-reason.' অনুরূপ ভাষ্য ফুটে ওঠে জোসেফ ওয়ারটনের *Essay on the Genius and Writings of Pope*-এ। লন্‌জাইনাস-এর 'Sublime'-এর ধারণাকে সৌন্দর্যের ধারণার সঙ্গে প্রতিস্পর্ধী সম্পর্কে যুক্ত করে এডমন্ড বার্ক তাঁর *A Philosophical Enquiry into the Origin of Our Ideas of the Sublime and Beautiful*-এ নান্দনিক অভিজ্ঞতার সুন্দর ও ভীতিপ্রদ, দুটি প্রকারভেদকে চিহ্নিত করেন। তাঁর অভিমত '....dark, confused, uncrtain images have a greater power on the fancy to form the grander passions than those have which are more clear and determinate.'[৯] নিও-ক্ল্যাসিসিজম-এর যৌক্তিকতা ও স্বচ্ছতার দীর্ঘলালিত গরিমাকে খর্ব করে 'সাবলাইম'-এর এক ভিন্ন রহস্যালোকের অস্পষ্টতা ও দুরধিগম্যতার ইঙ্গিত দেয়

উল্লেখপঞ্জি :

১. Blamiers Harry, *A History of Literary Criticism*, 1991, p. 58.
২. Gilbert Allen H., *Literary Criticism, Plato to Dryden*, p. 136.
৩. Wimsatt William K. JR. & Brooks Cleanth, *Literary Criticism, A short History*,
৪. Johnson Samuel, *Lives of the English Poets, Vol. I*, Oxford University Press, 1905,
৫. Johmson Samuel, *Preface to Shakespeare*, Yale University Press, 1968, p. 67.
৬. Johnson Samuel, *The History of Rasselas*, Oxford University Press, 1977, pp. 28-29.
৭. Johnson Samuel, 'Preface to Shakespeare', quoted in Richard Haeland, *Literary Theorey from Plato to Barthes*, London, 1990, p. 50.
৮. Ibid, p.50.
৯. Burke Edmund, *A Philosophical Enquiry into the Origin of our Ideas of the Sublime and Beautiful*, Vol II, 4, London, 1958 p. 62.

রোমান্টিসিজম্ : এক কূলভাঙা সাহিত্যতত্ত্ব

সুমিতা চক্রবর্তী

গবেষকরা রোমান্টিসিজম্-এর সাহিত্যতত্ত্বকে 'প্রবল বিতর্কমূলক' (highly controversial) বলে অভিহিত করেছেন।[1] এফ. এল. লুকাস তাঁর *দ্য ডিক্লাইন অ্যান্ড ফল্ অফ্ দ্য রোমান্টিক আইডিয়াল* (১৯৪৮) গ্রন্থে রোমান্টিসিজম্-এর এগারো হাজার তিনশো ছিয়ানব্বই (১১,৩৯৬)-টি সংজ্ঞা গণনা করেছেন। লুকাস-এর এই হিসেবের মধ্যে অবশ্যই আছে সকৌতুক আতিশয্য। কিন্তু এর মূলে আছে এই সত্য— রোমান্টিকতার কোনো সুনির্দিষ্ট এবং প্রাঞ্জল সংজ্ঞা দেওয়া যায় না। রোমান্টিকতার ধারণা স্বরূপতই কিছুটা অনির্দিষ্ট, বিভিন্ন ধরনের লক্ষণের সমন্বয়। তার কারণ এই সাহিত্যতত্ত্ব অত্যন্ত নিবিড়ভাবে ব্যক্তি-মানস নির্ভর। ব্যক্তি-মনের অনুভবকে খুব নির্দিষ্ট লক্ষণে বাঁধাই যায় না।

রোমান্টিকতার ধারণা কবে এবং কোথায় প্রথম দেখা গিয়েছিল এবং কোন্ সময় কোথায় কীভাবে ছড়িয়ে পড়েছিল তা নিয়েও দীর্ঘকাল ধরে মতভেদ চলে এসেছে। বহু বিতর্কের মধ্য দিয়ে বর্তমানে সাধারণভাবে যে ধারণাটি মান্যতা পেয়েছে তা এখানে প্রদত্ত হল। কিন্তু তার আগে আমাদের গ্রহণ করতে হবে কাজ চালানোর মতো একটি সংজ্ঞা। আমরা সংজ্ঞাটি গ্রহণ করছি *দি অক্স্ফোর্ড কম্প্যানিয়ন টু ইংলিশ লিটারেচার*-এর পঞ্চম সংস্করণ থেকে।—

"A literary movement, and profound shift in sensibility, which took place in Britain and throughout Europe roughly between 1770 and 1848. Intellectually it marked a violent reaction to the enlightenment. Politically it was inspired by the revolutions in America and France.....Emotionally it expressed an extreme assertion of the self and the value of individual experience.....together with the sense of the infinite and the transcendental. Socially it championed progressive causes....The stylistic keynote of Romanticism is intensity, and its watchword is 'Imagination.' "

[সংস্করণ ১৯৮৫, পৃ. ৮৪২ - ৪৩]

উদ্ধৃত সংজ্ঞাটি আমরা প্রায় পরিপূর্ণভাবে গ্রহণ করতে পারি কিন্তু একটি ক্ষেত্রে সামান্য ভিন্ন মতের অবকাশ আছে। সংজ্ঞাটিতে বলা হয়েছে— রোমান্টিসিজম্ ১৭৭০ এবং ১৮৪৮ খ্রিস্টাব্দের মধ্যবর্তীকালে ব্রিটেন এবং ইউরোপ-এর সর্বত্র উদ্ভূত হয়েছিল। ব্রিটেন-কে এখানে যে বিশেষ গুরুত্ব দেওয়া হয়েছে তা যে-কোনো ব্রিটিশ কোশ-গ্রন্থের অন্যতম প্রবণতা। এখান থেকে মনে হতে পারে, এই নব্য চিন্তনধারা সর্বপ্রথম ব্রিটেন-এই দেখা দিয়েছিল। কিন্তু বাস্তবে ঘটনাটি সেরকম নয়। একথা সত্য যে, কম-বেশি সম সময়ে জার্মানি, ফ্রান্স এবং ইংল্যান্ড-এ রোমান্টিকতার ধারণা জেগে উঠতে শুরু করেছিল, কিন্তু এ ব্যাপারে জার্মানি-র দাবি সম্ভবত সামান্য হলেও অগ্রগণ্য। তবে এ-বিষয়ে কোনো সন্দেহ নেই যে বাঙালি শিল্পী, সাহিত্যিক ও চিন্তাবিদ্‌দের রোমান্টিকতার ধারণা উন্মেষিত হয়েছিল ব্রিটিশ ইংরেজি সাহিত্যের প্রত্যক্ষ সংস্পর্শ থেকেই, উনবিংশ শতাব্দীর মধ্যবিন্দু থেকে দ্বিতীয় অর্ধের কাল পরিসরে।

রোমান্টিকতার উদ্ভব ও বিস্তার সম্পর্কে পরবর্তী ধারণায় যাবার আগে আমরা এ-বিষয়ে তিনটি দিক প্রথমেই স্পষ্ট করে নেব। প্রথমত, রোমান্টিসিজম্ শব্দটি বিশ্বের সর্বত্রই ঠিক একই এবং সমার্থক ব্যঞ্জনা বহন করে না। দ্বিতীয়ত, রোমান্টিকতার আন্দোলন ইউরোপীয় শিল্পচিন্তায় এবং সাহিত্যে সর্বত্র একই সময়ে জাগ্রত হয়নি। তৃতীয়ত, বিভিন্ন দেশে রোমান্টিকতার ধারণা সেই দেশের নিজস্ব সংস্কৃতির সঙ্গে মিলে কিছু কিছু নিজস্ব রূপ প্রাপ্ত হয়েছে।

যাঁরা বলেন আমেরিকা-র স্বাধীনতাযুদ্ধ (১৭৭৬) এবং ফরাসি বিপ্লব (১৭৮৯) রোমান্টিকতার ঐতিহাসিক ভিত্তিভূমি প্রস্তুত করেছিল, তাঁরা এই অর্থেই বলেন— এই দুটি বিপ্লবে রাষ্ট্রীয় প্রশাসনের বহুকাল প্রচলিত, বিধিবদ্ধ ও যান্ত্রিক নিয়মাবলির শৃঙ্খল ভেঙে দেশের সমগ্র জনতার ক্ষোভ, প্রত্যাশা, স্বপ্ন ও সংগ্রাম বাস্তবায়িত হয়েছিল। এই সমগ্র জনতা গড়ে উঠেছিল এক-এক জন ব্যক্তিমানুষকে নিয়ে। প্রতিটি সাধারণ মানুষ যে পূর্ব-নির্ধারিত প্রশাসন-বিধির অধীনে বাধ্যতামূলক নিপীড়িত জীবন-যাপন করছিল, সেই বৃত্ত ভেঙে বেরিয়ে এসে নিজের পৃথিবী গড়ে নিয়ে সেখানে স্বাধীন পদক্ষেপ রাখতে চেয়েছিল সাধারণ মানুষ। যে-কোনো দেশেই যে-কোনো বিপ্লব তখনই সফল হয়, যখন এইভাবে প্রত্যেক স্বতন্ত্র ব্যক্তির মনের তরঙ্গগুলি একস্রোতে বাহিত হয়ে সৃষ্টি করে জনসমুদ্র। এই যে রাজা তথা প্রশাসক ব্যক্তি-নাগরিককে মূল্য দিতে বাধ্য হল — এখানেই নিহিত আছে রোমান্টিকতার বীজ— ব্যক্তি-অনুভবের মুক্তি এবং স্বাতন্ত্র্য।

যদিও ইউরোপ-এর বিভিন্ন দেশে, বিশেষত জার্মানি, ফ্রান্স এবং ইংল্যান্ড-এ একই সঙ্গে রোমান্টিকতার প্রথম ধারণা অনুভূত হতে শুরু করেছিল তবু এ ব্যাপারে জার্মান দর্শনবিদ্‌দের কথা বলতে হবে প্রথমে। অষ্টাদশ শতাব্দীর দ্বিতীয়ার্ধে, যখন শিল্প-সাহিত্যের ক্ষেত্রে গ্রিক শিল্প-ধারণার ধ্রুপদি লক্ষণ সমূহ তথা ক্লাসিসিজম্ ছিল সর্বতোস্বীকৃত তখনও কিন্তু ক্লাসিসিজিম্-এর সঙ্গে রোমান্টিসিজম্-এর মিলনক্ষেত্র একেবারে অসম্ভব হয়নি। এ বিষয়ে জার্মান দার্শনিক ফ্রিডরিশ নিট্‌শে (Friederich Nietzsche : ১৮৪৪-১৯০০) প্রায় একশো বছর পরে ১৮৭২ খ্রিস্টাব্দে 'ট্র্যাজেডির জন্ম' নামক একটি গ্রন্থ রচনা করলেন। এই গ্রন্থে তিনি দুজন গ্রিক দেবতার প্রতীক ব্যবহার করলেন— অ্যাপোলো এবং ডায়োনিসাস। দেবতা অ্যাপোলো এক সুন্দর ভুবন সৃষ্টির জন্য কবিকে প্রেরণা দিলেন। সেই সৌন্দর্য হবে প্রাঞ্জল এবং স্বচ্ছভাবে বোধগম্য। রূপাবয়বের সৌষম্য হবে সেই সুন্দরের মানদণ্ড। অপরপক্ষে গ্রেস দেশের দেবতা ডায়োনিসাস-কে নিট্‌শে কবির সংগীত সম্পর্কিত সংবেদনা (সেন্‌স্ অফ মিউজিক) প্রকাশ

করবার জন্য ব্যবহার করলেন। এখানে সংগীত শব্দটির ব্যঞ্জনা দাঁড়াল বৌদ্ধিক বিশ্লেষণ এবং যৌক্তিকতার উর্ধ্বে যে যন্ত্রণা এবং বেদনা থেকে ডায়োনিসাস্-এর আরাধনায় প্রবল সম্মিলিত নৃত্য অনুষ্ঠিত হয়— সেই তীব্র ও বিচার-বর্জিত উপলব্ধি। অ্যাপোলোনীয় এবং ডায়োনিসীয়— উভয় ক্ষেত্রেই কবির নিজস্ব বিচার-বিতর্ক যুক্তি ছাপিয়ে ওঠা এক মৌল প্রেরণা থেকেই এই দুই শিল্পভাবনার উৎপত্তি। পার্থক্য এই— অ্যাপোলোনীয় শিল্প এক সুষম, সংহত, প্রত্যক্ষ সৌন্দর্যময় রূপাবয়বের জগৎ নির্মাণ করে। অন্যদিকে ডায়োনিসীয় ভাবাবেগ সাংগীতিক উচ্ছ্বাসের মতো পরিব্যাপ্ত হয়, যা অবয়বের সুষমবিন্যাস-নির্ভর সংহতির উপর নির্ভর করে না। একটি হল রূপাবয়বের বিন্যাসগত সৃষ্টি ; অপরটি হল যুক্তি- বন্ধন-বিহীন প্রবল ভাবাবেগের অনিয়ন্ত্রিত উচ্ছ্বাস। এখান থেকেই ক্লাসিক-এর ধারণার রূপগত এবং সংহতি-ঘন প্রাঞ্জল সৌন্দর্যের সৃষ্টি-জগৎ ভেঙে অবয়ব-সংগতি বর্জিত তীব্র হৃদয়াবেগের শৈল্পিক অস্তিত্ব স্বীকার করে নেওয়া হল। আত্মস্থ ক্লাসিক নির্মাণ ভেঙে দেখা দিল রোমান্টিকের মর্মছেঁড়া যন্ত্রণা। নিটশে-র মতে চিরকালই ছিল এই সংযোগের পরিসর।

ক্লাসিসিজ্‌ম্ এবং রোমান্টিসিজ্‌ম্— এর মধ্যে একটি দ্বন্দ্বের সম্পর্ক প্রথম বিশেষভাবে অনুভব করলেন জার্মান শিল্পতত্ত্ববিদ্। ফ্রিডরিশ ভন শ্লেগেল (Friedrich von Schlegel ১৭৭২-১৮২৯। *ডাস্ এথেনিয়াম* ('Das Athenaeum') নামক গ্রন্থে ১৭৯৮ খ্রিস্টাব্দে শ্লেগেল ক্লাসিক্যাল সাহিত্যতত্ত্ব সম্পর্কে যে আলোচনা করেন তাতে তিনি লিখেছিলেন— ক্লাসিসিজ্‌ম্ হল অসীমের ভাবাদর্শ এবং ভাবাবেগকে সীমানির্দিষ্ট অবয়বের মধ্যে ব্যক্ত করবার প্রয়াস। ক্লাসিক বা ধ্রুপদি সাহিত্যতত্ত্ব রোমান্টিকতার ধারণার সঙ্গে সহাবস্থান করে বলে শ্লেগেল অনুভব করলেন। তিনি রোমান্টিসিজ্‌ম্-কে এইভাবে ব্যাখ্যা করলেন— রোমান্টিসিজ্‌ম্ হল এমন এক কাব্যপ্রেরণা, যেখানে কবি স্বয়ং নিজের কাছে নিজের সৃষ্টি সম্পর্কিত নিয়মাবলি তুলে ধরেন। কোনো প্রথাসিদ্ধ এবং পরম্পরাবাহী শিল্প-করণ-কৌশল মেনে চলবার কোনো দায় তাঁর ক্ষেত্রে থাকে না।

যে সময়ে জার্মানিতে নব্য ধ্রুপদিবাদ-এর প্রচলন সত্ত্বেও ক্লাসিসিজ্‌ম্-এর কাব্য ধারণা যথেষ্টই প্রতিষ্ঠিত সেই সময়েই শ্লেগেল কথিত ক্লাসিসিজ্‌ম্ ও রোমান্টিসিজ্‌ম্-এর ওই সহাবস্থান বা সমন্বয়ের তত্ত্ব রোমান্টিকতার ধারণাকে বেশ খানিকটা আলোয় এনে দেয়। জার্মানি-তে অষ্টাদশ শতকের দ্বিতীয়ার্ধে গ্যেটে, শিলার প্রমুখ কবি ও চিন্তাবিদ্‌দের ধারণায় ও সৃষ্টিতে অস্ফুটভাবে যে সাহিত্যবোধ এবং শিল্পসৃষ্টির মনোধর্ম জেগে উঠেছিল তাকেই যেন স্পষ্টতর এক ভাষ্য দিলেন শ্লেগেল।

রোমান্টিসিজ্‌ম্-এর আলোচনা প্রসঙ্গে নব্যধ্রুপদি বা নিওক্লাসিক্যাল চিন্তাতরঙ্গ সম্পর্কেও আমাদের অবহিত হতে হবে। কারণ ক্লাসিক এবং রোমান্টিক— এই দুটি চিন্তন পদ্ধতির মধ্যবর্তী স্তরে যে নব্য ধ্রুপদি মননশীলতা ইউরোপ-এ বিস্তৃত হয়েছিল তাকে কিছুটা রোমান্টিকতার বীজতলা বলা যায়।

প্রাচীন ক্লাসিক ধারণা— যা গ্রিক এবং রোমক সভ্যতার সাংস্কৃতিক অবলম্বন ছিল তা বিশেষভাবে বিবর্তিত হয়েছিল সপ্তদশ শতাব্দীর মাঝামাঝি সময়ে। শিক্ষার বিস্তার এবং দর্শন ও রাষ্ট্রনীতির ক্ষেত্রে নতুন চিন্তার উন্মেষের ফলে সপ্তদশ এবং অষ্টাদশ শতকে যে যুক্তি, বিচার-বিশ্লেষণ এবং বিভিন্ন রাষ্ট্রিক, সামাজিক ও দার্শনিক তত্ত্বের উদ্ভব ঘটেছিল তাকেই সম্মিলিতভাবে নিওক্লাসিক্যাল বা নব্যধ্রুপদি যুগের চিন্তা বলা যায়। মোটামুটিভাবে ১৬৫০ খ্রিস্টাব্দ থেকে ১৮০০ খ্রিস্টাব্দ পর্যন্ত এই যুগের বিস্তার। বহু মনীষীর চিন্তন-মননের

ফলে সমগ্র ইউরোপ-এ এসেছিল যে যুক্তিনির্ভর ও বুদ্ধিদীপ্ত মানস-বিবর্তন সেখানে একটি বা দুটি নয় সমাহার ঘটেছিল অনেক লক্ষণের। জার্মানি, ফ্রান্স এবং ইংল্যান্ড-এর বহু মনীষীর চিন্তাধারা এই যুগকে সমৃদ্ধ করেছিল। বিশেষভাবে গড়ে উঠেছিল এক নব্যধ্রুপদি সাহিত্যতত্ত্ব।

এই সাহিত্যতত্ত্বের লক্ষণ হিসেবে প্রধানত বলা যায় শিল্পের স্বরূপ, উদ্দেশ্য এবং প্রভাব সম্পর্কে বিভিন্ন ধারণা সমাহৃত হয়েছিল এখানে। সাহিত্যস্রষ্টার ক্ষমতা এবং সৃষ্টি প্রক্রিয়া সম্পর্কেও এই সাহিত্যতত্ত্বে গুরুত্ব আরোপ করা হয়েছিল।

নব্যধ্রুপদি সাহিত্যতত্ত্বে সংজ্ঞা ও লক্ষণ নির্ণয়ের উপর বিশেষ জোর দেওয়া হত। যে কোনো সৃষ্টির ক্ষেত্রে একটি স্বীকৃত মানদণ্ড এবং আদর্শ স্থাপন করবার আগ্রহ এই তত্ত্বের বৈশিষ্ট্য।

প্রাচীন ক্লাসিক্যাল শিল্প ও সাহিত্যের দৃষ্টান্তগুলিকে নব্যক্লাসিক্যাল চিন্তাবিদরা একেবারেই অগ্রাহ্য করেননি; কিন্তু নতুন যুগের বিচার, বিতর্ক মানবতাবাদ এবং বিজ্ঞানমনস্কতার দ্বারা তাকে নতুনভাবে গ্রহণ করতে চেয়েছিলেন তাঁরা।

নব্যধ্রুপদি সাহিত্যতত্ত্বে সাহিত্যস্রষ্টার কল্পনা এবং প্রতিভার সঙ্গেই থাকতে হবে জ্ঞান, যুক্তিবোধ এবং বিচারক্ষমতা— এমনই প্রত্যাশা করা হয়েছে। যিনি স্রষ্টা তাঁর অভিমত, সিদ্ধান্ত এবং তাঁর দায়িত্ববোধ সম্পর্কে নব্যধ্রুপদি চিন্তায় গুরুত্ব আরোপ করা হয়েছে।

শিল্পের যাঁরা উপভোক্তা তাঁদের উপর শিল্প তথা সাহিত্য কী প্রভাব বিস্তার করতে পারে এই প্রশ্নটি র উপরেও যথেষ্ট গুরুত্ব আরোপ করা হয়েছে নব্যধ্রুপদি সাহিত্যতত্ত্বে। দেশ, সমাজ এবং মানবসভ্যতা সম্পর্কে নির্দিষ্ট ও সমুচ্চ মূল্যবোধ এবং আদর্শকে প্রতিষ্ঠা করার ব্যাপারে নব্যধ্রুপদি সাহিত্যতত্ত্বের বিশেষ ভূমিকা আছে। অনেক দিক থেকেই প্রাচীন ক্লাসিক্যাল ধারণার অনড়তা এই নিওক্লাসিক্যাল ধারণা ভেঙে দিতে এবং শিথিল করে দিতে সক্ষম হয়েছিল। নতুন যুগের মানুষের রুচি, আদর্শ, নৈতিকতা এবং ঔচিত্যবোধকে প্রতিষ্ঠা করতে সক্ষম হয়েছিল। কোনো সন্দেহ নেই যে এই পথ ধরেই রোমান্টিকতার আবির্ভাব। নব্যধ্রুপদিবাদ এবং রোমান্টিকতার প্রধান পার্থক্যটি হল এই জায়গায়— নব্যধ্রুপদিবাদ বা নিওক্লাসিসিজম্ সামাজিক মনকে এবং মানবসমাজকে প্রধান গুরুত্ব দিয়েছিল। অপরপক্ষে রোমান্টিসিজম্-এর তত্ত্বে সামগ্রিক গুরুত্বই ছিল ব্যক্তিমনের প্রতি। স্রষ্টার হৃদয় এবং শ্রোতা বা পাঠকের হৃদয়ের মধ্যে ব্যক্তিগত সেতু বন্ধনই সেখানে মূল লক্ষ্য। কোনো নীতিবোধ, ঔচিত্যবোধ বা সামাজিক আদর্শের সেখানে কোনো ভূমিকা নেই।

জার্মানি-তে শ্লেগেল-এর এই ভাবনার সমান্তরাল সমকালেই ফ্রান্স এবং ইংল্যান্ডেও জেগে উঠেছিল সৃষ্টি-আবেগের একই ধরনের প্রেরণা। পরম্পরাসিদ্ধ ক্ল্যাসিক্যাল রীতি-পদ্ধতি সাহিত্য-সৃষ্টির ক্ষেত্রে যেভাবে স্বীকৃত ছিল— বিষয়বস্তুর নির্বাচনে, কাব্যশরীরের প্রথাসিদ্ধ বিধানে, যথাযোগ্য ভাষা সম্পর্কিত প্রত্যাশায়, ছন্দ এবং অলংকারবিন্যাসের আভ্যাসিকতায়— এ সবই কাব্যস্রষ্টার মনকে কিছুটা বাধাগ্রস্ত করে তুলতে শুরু করেছিল। ব্যক্তির যে মুক্তির বাণী সমুত্থিত হয়েছিল রাষ্ট্রীয় বিপ্লবের তরঙ্গাভিঘাতে, সেই মুক্তির উদ্দীপনা যেন আঘাত করতে শুরু করেছিল কাব্যস্রষ্টার চিত্ততলের সমস্ত প্রাচীরগুলিতে। শ্লেগেল-এর তত্ত্ব কবি-কল্পনার সেই হৃদয়-দুয়ার খুলে দেবার পথে প্রথম করাঘাত। অচিরেই তার আরও অভিব্যক্তি দেখা দিল ফ্রান্স এবং ইংল্যান্ড-এ। বলা বাহুল্য ইউরোপ-এর ওই দুই প্রান্তেও মনের মধ্যে কবির ব্যক্তিমনের মুক্তিপথ সন্ধানের ব্যাকুলতাও জেগে উঠেছিল আগেই।

আমরা এ বিষয়ে ফরাসি লেখিকা মাদাম দ্য স্তায়ে (mede Staël : (৭৬৬-১৮১৭)-এর উল্লেখ করতে পারি। তাঁর রচনা 'দ্য ল্য'লেমন' (De l'Allemagne, ১৮১৩) বিশেষভাবে ফরাসি এবং ব্রিটিশ আলোচকদের দৃষ্টি আকর্ষণ করেছিল। তিনি কঠোরভাবে ক্লাসিসিজম্-কে প্রত্যাখ্যান করেছিলেন। তিনি বলেছিলেন ক্লাসিসিজম্ হল এক তথাকথিত বিশুদ্ধ কিন্তু নিষ্প্রাণ সাহিত্যসৃষ্টি পদ্ধতি। গ্রিসীয় এবং রোমক শিল্পাদর্শকে গাণিতিকভাবে দেখা এবং পূর্বনির্দিষ্ট নিয়মাবলি অনুসারে তার যান্ত্রিক অনুকরণ ছাড়া ক্লাসিসিজম্ আর কিছুই নয়। শ্লেগেল যেমন ক্লাসিসিজম্ এবং রোমান্টিসিজম্-এর এক সহাবস্থানের সূত্র অনুভব করেছিলেন, মাদাম দ্য স্তায়ে তা না করে আক্রমণ করেছিলেন অষ্টাদশ শতাব্দীর অধিকাংশ সাহিত্যতত্ত্ববিদের ভাষ্যকে। মাদাম দ্য স্তায়ে-র এই ধারণা উনবিংশ শতাব্দীতে বেশ কিছুটা প্রভাব বিস্তার করেছিল। উনিশ শতকে অনেকেই ক্লাসিসিজম্ এবং রোমান্টিসিজম্-এর অবস্থানকে বিপরীত বিন্দুতে প্রতিস্থাপন করেছিলেন। ক্লাসিসিজম্ বনাম রোমান্টিসিজম্ হয়ে দাঁড়িয়েছিল রক্ষণশীল বনাম বিপ্লবী ; নিষ্প্রাণ নিয়মতন্ত্র-শাসিত বিধি বনাম মৌলিক সৃষ্টি প্রতিভা-সম্পন্ন শিল্পের ও সাহিত্যের সংঘাত।

সংক্ষেপে এবং হয়তো কিছুটা সরলভাবে বলা যায়, রোমান্টিসিজম্ হল অষ্টাদশ শতাব্দীর শেষ লগ্নে ইউরোপ-এর মানসিকতায় ও মননে জেগে ওঠা এক পরিবর্তন— যা প্রধানত সাহিত্যে এনেছিল দিক বদল। যে মানসিকতা স্রষ্টার ব্যক্তিমনের অনুভব আবেগ এবং উপলব্ধিকে প্রধানত অবলম্বন করে ; যে-উপলব্ধি কবির কল্পনার বিস্তারকে অ-পার্থিব লোকেও সঞ্চারিত করে দেয় এবং যে উপলব্ধির উৎস হল জগৎ ও জীবন সম্পর্কে বিস্ময়মুগ্ধতার অনুভব। ইউরোপ-এর সর্বত্র রোমান্টিসিজম্-এর সাহিত্য-লক্ষণ রূপে স্বীকৃত হয়েছে সৃষ্টি প্রক্রিয়ার সম্পূর্ণ স্বাধীনতা, স্বতঃস্ফূর্ততা, ঐকান্তিক অকৃত্রিমতা এবং বর্ণনীয় আবেগ তথা বিষয় বস্তুর সঙ্গে কবি-চিত্তের প্রগাঢ় সংলগ্নতা। রোমান্টিক সাহিত্যতত্ত্ব সাধারণভাবে যুক্তিবাদের প্রতি আগ্রহী হয় না এবং নির্দিষ্ট কোনো শিল্প-আঙ্গিক এবং শৈল্পিক রূপাবয়ব বা জঁর (Genres)-কে স্বীকার করে না। ক্ল্যাসিক্যাল এবং নব্য-ক্লাসিক্যাল সাহিত্যতত্ত্বে প্রাধান্য দেওয়া হয় বিষয়মুখ্যতা, সাবয়বতা, প্রাঞ্জলতা, অনুকরণ, নব্য-আবিষ্কার এবং গদ্য ও কবিতার পৃথকীকরণের উপর। রোমান্টিসিজম্-এ প্রাধান্য দেওয়া হয় কল্পনার মৌলিকত্ব, কাব্যব্যঞ্জনার সঙ্গে অবিচ্ছেদ্য চিত্রকল্প, গদ্য এবং কাব্যময়তার মিলনের উপর। রোমান্টিসিজম্ মিথ, প্রতীক, স্বজ্ঞা এবং অবচেতনাকে গুরুত্ব দেয়। রোমান্টিসিজম্-এ রহস্যময়তা এবং কিছুটা দুর্বোধ্যতাকেও স্বীকার করা হয়। রোমান্টিক ধারণায় মানবতা, প্রগতিশীলতা, বন্ধন-অসহিষ্ণুতা, প্রাচীন ইতিহাসের পরিমণ্ডল, দেশপ্রেম, প্রগাঢ় সৌন্দর্যচেতনা, আদর্শবাদ, পরিপূর্ণ আনন্দ এবং নিবিড় বিষাদ, সেই সঙ্গে আধ্যাত্মিকতারও স্বীকরণ আছে। কিন্তু সর্বাধিক গুরুত্বপূর্ণ লক্ষণ হল স্রষ্টার নিজস্ব উপলব্ধির অভিব্যক্তি— তা যে-কোনো বিষয়কে অবলম্বন করতে পারে এবং যে-কোনো অনুভবের পথ ধরে মুক্তি পেতে পারে।

ইউরোপ-এর শিল্পমননে এবং চেতনালোকে রোমান্টিসিজম্ যেভাবে বিস্তৃত হয়েছে তাকে আলোচকেরা দুটি পর্বে বিন্যস্ত করেছেন— উন্মেষপর্ব এবং বিকাশপর্ব।

উন্মেষপর্ব (১৭৯৮-১৮০৫) : জার্মানি, ইংল্যান্ড এবং ফ্রান্স-এর মধ্যে ১৭৯৮ খ্রিস্টাব্দের কাছাকাছি সময় জার্মানি-তে সর্বাধিক স্পষ্টভাবে রোমান্টিসিজম্-এর ধারণা গৃহীত হতে শুরু করেছিল। বিভিন্ন কবি ও গদ্যকারের লেখায় প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল রোমান্টিসিজম্-এর দর্শন, নন্দনতত্ত্ব এবং শিল্পধারণা। কোনো কোনো লেখায় ইতিহাস এবং খ্রিস্টীয় মিথকে নতুন

কল্পনার আলোয় অনুভব করবার চেষ্টা চলছিল। শ্লেগেল ভ্রাতৃদ্বয়— এ. ডবল্যু-শ্লেগেল (১৭৬৭-১৮৪৫) এবং তাঁর ভাই ফ্রিডরিশ শ্লেগেল (১৭৭২-১৮২৯)-কে কেন্দ্র করে যে গোষ্ঠী গড়ে ওঠে তাঁদের লেখায় রোমান্টিসিজ্‌ম্-এর বিভিন্ন লক্ষণ ফুটে উঠতে লাগল। বিশেষ করে কল্পনার বাধা-বন্ধনহীন বিস্তার এবং অসীমের প্রতি অভিযাত্রা, সেইসঙ্গে স্বতঃস্ফূর্ত উপলব্ধির পূর্ণতাবোধ দেখা যেতে লাগল তাঁদের লেখায়।

জার্মানি-তে এই পর্বে নব্যধ্রুপদি বা নিওক্লাসিক্যালদের সঙ্গে রোমান্টিক চিন্তাবিদ্‌দের কিছুটা দ্বন্দ্ব ছিল। এই পর্বে ফ্রান্স-এ ক্লাসিসিজ্‌ম্ ও রোমান্টিসিজ্‌ম্-এর ধারণাকে প্রায় দুটি বিপরীত অবস্থানে দাঁড় করানো হয়েছিল তা আমরা আগেই দেখেছি। এই পর্বে ইংল্যান্ড-এ রোমান্টিক ধারণার এবং রোমান্টিসিজ্‌ম্-এর লক্ষণসমন্বিত সাহিত্যের যে বিস্তার ঘটেছিল তা রোমান্টিকতার আন্দোলনে বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ। তাঁরা এসব দ্বন্দ্বের কথা না ভেবে স্বাভাবিক প্রবণতাবশেই রোমান্টিক কাব্যতত্ত্বকে যেন আবাহন করে নিলেন। কিছুটা বিস্তৃতভাবে আমরা এই পর্বের রোমান্টিকতার আন্দোলনকে বিবৃত করব।

দুজন কবি, যাঁরা পুরোপুরি ব্রিটিশ নন কিন্তু ইংরেজি সাহিত্যের বিশিষ্ট প্রতিভা, এই পর্বে উল্লেখযোগ্য। স্কটল্যান্ড-এর আঞ্চলিক কবি রবার্ট বার্নস ১৭৫৯—১৭৯৬) এবং আয়ারল্যান্ড-এর উইলিয়ম ব্লেক (১৭৫৭— ১৮২৭)। বার্নস-এর কবিতায় সাধারণ মানুষের জীবনের কথা রূপায়িত হল স্বতঃস্ফূর্ত একাত্মতার অভিব্যক্তি নিয়ে। তাঁর অনেক কবিতায় স্কটল্যান্ড-এর আঞ্চলিক ভাষার প্রয়োগ ছিল। তিনি তাঁর পারিপার্শ্বিক জীবন— গ্রাম, প্রকৃতি, প্রেম এবং অত্যন্ত সাধারণ মানুষের প্রাত্যহিকতাকে সহজ এবং আনন্দময় স্বাভাবিকতাকে লেখায় প্রকাশ করলেন। তাঁর কবিতার গঠনে এক ধরনের প্রত্যক্ষ প্রাঞ্জলতা ছিল কিন্তু তা প্রথাসিদ্ধ, বৈদগ্ধ্যমণ্ডিত ক্লাসিসিজ্‌ম্ নয়। পরিচিত জীবনকে সহজ আন্তরিকতায় জীবন্ত করে তোলবার যে ক্ষমতা— তাকে ঠিক রোমান্টিকতা না বললেও তা প্রাতিষ্ঠানিক ক্লাসিসিজ্‌ম্-এর প্রাচীরে কিছুটা ফাটল ধরিয়েছিল— একথা অস্বীকার করা যায় না।

ইংল্যান্ড-এ রোমান্টিসিজ্‌ম্-এর আন্দোলন প্রত্যক্ষ গতি পেয়েছিল ওয়র্ডস্‌ওয়র্থ ও কোলরিজ-এর যুগ্ম কবিতা-সংকলন *লিরিক্যাল ব্যালাড্‌স্*-এর প্রকাশ থেকে। একথা সকলেরই জানা। তার দুবছর আগেই ১৭৯৬-তে প্রয়াত হয়েছিলেন বার্নস। কিন্তু তাঁর লেখাতেই ইংরেজি ভাষার কবিতা-পাঠক সহজ জীবনকে উপভোগ করবার যে স্বাদ পেয়েছিলেন তাকে রোমান্টিকতার পূর্বাভাস অবশ্যই বলা যায়।

দ্বিতীয় কবি ছিলেন উইলিয়ম ব্লেক— আয়ারল্যান্ড-এর মানুষ। স্পষ্টতই রোমান্টিসিজ্‌ম্-এর লক্ষণ ফুটে উঠেছিল তাঁর কবিতায়। তাঁর কবিতা-সংকলনগুলির প্রকাশকাল যথাক্রমে— *পোয়েটিক্যাল স্কেচেস* (১৭৮৩), *সঙ্‌স্ অফ ইনোসেন্স* (১৭৮৯), *সঙ্‌স্ অফ এ'পিরিয়েন্স্* (১৭৯৪)। তাঁর কবিতায় সেই বিস্ময়বোধের উদ্ভাসন ঘটল যা মানুষ তার চারিদিকে চেয়ে পার্থিব অস্তিত্বের মধ্যে কখনও কখনও অনুভব করে। তাঁর কবিতা যেন হৃদয় থেকে উৎসারিত, নিবিড় ব্যক্তিগত দৃষ্টি ও অনুভবের পরম আভাসমণ্ডিত। সকলেই স্বীকার করেছেন ইংরেজি সাহিত্যে রোমান্টিকতার সূত্রপাত তাঁর কবিতাতেই ঘটেছিল। প্রখ্যাত সাহিত্যের ইতিহাসকারের মতে—"The essence of Romanticism is here in these short poems, whether the main subject be love and happiness, as in the Poetical Sketches and the Songs of Innocence, or the note of grief and rebellion against a world given over to evil be more pronounced, as in the Songs of Experience. The

universe here is seen through the eyes of a child, felt through its senses, judged through its heart ; and this child is the symbol of the most delicate and courageous intuitions in the human mind, just like the soul of a peasant in those moments of sober exaltation which will be to Wordsworth the very source and inner substance of poetry."[২]

রবীন্দ্রনাথ যে অনুভবকে প্রকাশ করেছেন তাঁর কবিতায়—"শিশু পুষ্প আঁখি মেলি হেরিল এ ধরা/শ্যামল, সুন্দর, স্নিগ্ধ গীত গন্ধভরা।"— সেই উপলব্ধিই প্রকাশ পেয়েছিল ব্লেক-এর কবিতায়। সেই সঙ্গে ব্লেক-এর ছিল এক অধ্যাত্ম-দৃষ্টি। পার্থিব জীবনকে ছাড়িয়ে আছে কোনো এক অ-পার্থিব লোক— তার সঙ্গে চিত্তের সংযোগ অনুভব করতেন ব্লেক। এই মিস্টিসিজম্‌ও রোমান্টিকতার অন্যতম লক্ষণ যা পরবর্তীকালে ওয়র্ডসওয়র্থ-এর লেখায় পূর্ণ বিকশিত হয়েছিল।

ইংল্যান্ড-এ রোমান্টিসিজম্-এর আলোড়ন প্রত্যক্ষদৃষ্ট হয়ে উঠল দুই তরুণ কবি উইলিয়ম ওয়র্ডওয়র্থ (১৭৭০-১৮৫০) এবং স্যামুয়েল টেলর কোলরিজ-এর (১৭৭২-১৮৩৪) যুগ্ম কবিতা-সংকলন *লিরিক্যাল ব্যালাড্স্*-এর প্রকাশ থেকে। প্রথম সংস্করণ ১৭৯৮, দ্বিতীয় সংস্করণ ১৮০০, তৃতীয় সংস্করণ ১৮০২। কবিতাগুলির নতুনত্ব প্রথমেই সচকিত করে তুলল পাঠককে। প্রকৃতি, সাধারণ মানুষের জীবন-যাপন, অতি তুচ্ছ বিষয় অবলম্বন করে কবিচিত্তের আনন্দ, বিষাদ, বিস্ময়ের অভিব্যক্তি অতীন্দ্রিয় অনুভবের নিবিড় স্পর্শ ; কোনোরকম নীতি, তত্ত্ব, উপদেশ, আভিজাত্য ইত্যাদি সম্পর্কে কোনোরকম প্রথাসিদ্ধ আনুগত্যের চিহ্নমাত্র না থাকা, সমস্ত কিছুকেই হৃদয়ানুভবের আত্মমগ্ন, সরল চরিতার্থতা বোধের উপলব্ধির মধ্যে দিয়ে প্রকাশ করা অথবা বিষণ্ণ, করুণ, মধুর অনুভবে নিজেকে বিস্তীর্ণ করে দেওয়া, স্বগতোক্তির ভঙ্গিতে মৃদু উচ্চারণ এবং অভিব্যক্তির সম্পূর্ণ আয়তনে একান্ত ব্যক্তিগত অনুভবের ঘনত্ব— এই নিয়েই ওয়র্ডসওয়র্থ-এর কবিতা। পরেও তিনি যা লিখেছেন তা এই বৈশিষ্ট্যগুলিতে মণ্ডিত থেকেছে চিরকাল।

লিরিক্যাল ব্যালাড্স্-এর অন্তর্ভুক্ত কোলরিজ-এর কবিতাগুলিতে প্রাত্যহিকতার স্পর্শের তুলনায় কল্পনার অবাধ বিস্তার, অলৌকিক জগতে মানস-পরিক্রমা, বিস্ময়বোধের সঙ্গে কিছুটা অলৌকিক রহস্য এবং আতঙ্কেরও মিশ্রণ তাঁকে ওয়র্ডসওয়র্থ-এর জগৎ থেকে স্বতন্ত্র কাব্য-বিশ্বের অধিবাসী করেছে। কিন্তু সেখানেও সর্বত্র বিকীর্ণ হয়ে আছে কবির ব্যক্তিমনের নিবিড় আত্মিক অনুভূতি। কবির নিজের কল্পনা আর নিজের উপলব্ধির এত নিবিড় সম্মিলন *লিরিক্যাল ব্যালাড্স্*-এর পূর্ববর্তী কবিতায় দেখা যায়নি।

এই *লিরিক্যাল ব্যালাড্স্*-এর দ্বিতীয় সংস্করণের সঙ্গে ওয়র্ডসওয়র্থ যুক্ত করেছিলেন এক ভূমিকা-লিখন। কাব্যপ্রেরণা এবং কবিতার উৎস সম্পর্কে তিনি সেখানে যা বলেছিলেন তা সংক্ষিপ্ত হলেও তাকেই বলা যেতে পারে— আরিস্টট্ল-এর *কাব্যতত্ত্ব* থেকে প্রবাহিত হয়ে আসা কাব্যধারণার সমান্তরালে এক ভিন্ন কাব্যধারণার প্রতিষ্ঠা। আরিস্টট্ল বলেছিলেন শিল্প হল অনুকরণ। প্রাক্-খ্রিস্টীয় যুগ থেকে শুরু করে অষ্টাদশ শতাব্দীর শেষ লগ্ন পর্যন্ত এই অনুকরণ-প্রধান কাব্যতত্ত্বই ছিল স্বীকৃত। এই অনুকরণের অর্থ নকলনবিশি নয় ; জগৎ ও জীবনের বাস্তবতাকে বর্ণময়তা এবং নিবিড় সত্যবোধের সঙ্গে রূপায়িত করা। এই হল ক্লাসিসিজম্-এর কাব্যতত্ত্বের নির্যাস। কিন্তু ওয়র্ডসওয়র্থ বললেন কবিতা হল—"....the sponteneous overflow of powerful feelings, ..."; সেই সঙ্গেই তিনি বললেন

কবিতার সৃষ্টি হয় উপলব্ধির গভীর থেকে— "....... emotion recollected in tranquillity."— বাংলায় বলা যেতে পারে— কবিতা হল 'প্রবল আবেগের স্বতঃস্ফূর্ত উৎসারণ' এবং ভাবাবেগ যখন স্মৃতির প্রশান্তিতে সঞ্চিত হয় তখনই তার পরিপূর্ণতা থেকে কবিতার জন্ম হয়। সেই সঙ্গে ওয়র্ডসওয়র্থ প্রাত্যহিকের ভাষা, সরল ও সুরেলা ছন্দের কথাও বললেন। ওয়র্ডসওয়র্থ বললেন কবিতার বিষয় কোনো বিশাল, গম্ভীর, মহিমময় বক্তব্য কিংবা গৌরবময় ইতিহাস, স্বর্গ, মর্ত্য পাতাল ব্যাপী কোনো আখ্যান, অলৌকিক বীরত্ব ইত্যাদি হবার কোনো প্রয়োজন নেই। ঠিক এই কথাগুলিই স্পষ্ট ভাষায় বলেননি ওয়র্ডসওয়র্থ কিন্তু যা বলেছেন তার ব্যঞ্জনা এ রকমই। তিনি বলেছেন— কবিতার বিষয় হবে সরল এবং অ-সজ্জিত সাধারণ গ্রাম্যজীবন। অর্থাৎ এতাবৎকাল কবিতার বিষয় হিসেবে যা ছিল তুচ্ছ এবং উপেক্ষিত— তা-ই রোমান্টিক কবিতায় কাব্যের অবলম্বন হয়ে দাঁড়াল। আবারও আমরা বাংলা সাহিত্যের প্রধান রোমান্টিক কবি রবীন্দ্রনাথের সেই ক্ষুদ্র কবিতাটি স্মরণ করতে পারি— প্রাচীরের ছিদ্রে ফুটে ওঠা নামগোত্রহীন ছোটো ফুলটিকে আর সকলে তুচ্ছ করলেও দিনমণি সূর্য তাকে জানালেন প্রসন্ন সম্ভাষণ। আপাত তুচ্ছকেই মহিমা-মণ্ডিত করা রোমান্টিক সাহিত্যতত্ত্বের অন্যতম লক্ষণ।

ওয়র্ডসওয়র্থ-এর উক্তিতে আমরা কোথাও অনুকরণাত্মক শিল্প-সৃষ্টির কথা পাই না। এমন নয় যে, তিনি সরাসরি ক্লাসিসিজম্-এর তত্ত্ব অস্বীকার করেছেন। সে-প্রসঙ্গে তিনি কিছুই বলেননি। তিনি কেবল কাব্যসৃষ্টি-সম্পর্কিত একটি সমান্তরাল নবীন তত্ত্ব উপস্থাপিত করেছেন ; যেখানে কাব্যের সৃষ্টি-উৎস হল কবির প্রাণের অন্তর্গত আবেগের স্বতঃস্ফূর্ত উৎসার। সেই আবেগ যখন পরিপূর্ণ উপলব্ধিতে পরিণত হবে তখনই কবিতার জন্ম হবে। একেই বলা যেতে পারে সংক্ষেপে রোমান্টিকতার কাব্যতত্ত্ব।

লিরিক্যাল ব্যালাড্স্-এর তৃতীয় সংস্করণটি প্রকাশিত হয়েছিল ১৮০২ খ্রিস্টাব্দে এবং চতুর্থ সংস্করণ প্রকাশিত হয় ১৮০৫ খ্রিস্টাব্দে। ওয়র্ডস্ওয়র্থ-এর ভূমিকাটি কিছু কিছু পরিমার্জিত হলেও মূল বক্তব্য ছিল একই রকম।

বিকাশ পর্ব : সাহিত্যের আলোচকেরা রোমান্টিসিজম্-এর দ্বিতীয় পর্যায় নির্দিষ্ট করেছেন ১৮০৬ খ্রিস্টাব্দের পর থেকে। তাঁরা কোনো শেষ সীমা নির্দিষ্ট করেননি। করা দুরূহ কারণ কবিতা যে কবির ব্যক্তিহৃদয়ের উৎসারণ এই সারসত্যটি এর পরে আর কখনও অস্বীকৃত হয়নি। তবু বলা যেতে পারে প্রথম মহাযুদ্ধের উত্তরকালে রোমান্টিসিজম্-এর তৎকাল পর্যন্ত প্রচলিত ধারণায় কিছু পরিবর্তন এসেছিল। সে-ধারণার প্রবক্তা ছিলেন এলিঅট। উপসংহারের আমরা সে প্রসঙ্গটি স্পর্শ করব।

রোমান্টিসিজম্-এর তত্ত্বের বিকাশ-পর্বে অন্যতম এক তাত্ত্বিক প্রয়াস হল কোলরিজ-এর লেখা সুপরিসর গ্রন্থ *বায়োগ্রাফিয়া লিটেরেরিয়া* (প্রকাশ ১৮১৭), রোমান্টিকতার ধারণাকে সুদৃঢ় এক দার্শনিক তত্ত্বভিত্তি দিলেন তিনি। এক দিকে কবির আত্মিক সত্তা, সেই সত্তা ও জাগতিক অস্তিত্বের সসীমতা ও অসীমতা (ফাইনাইট ও ইনফাইনাইট), জাগতিকতায় মানব-দ্রষ্টা ও কাব্যস্রষ্টার মধ্যে এক অলৌকিক সংযোগের দিক প্রতিষ্ঠা করবার চেষ্টা করলেন তিনি। অন্যদিকে 'কল্পনা'— এই মনোধর্মকে অনুপুঙ্খভাবে বিশ্লেষণ করলেন। কল্পনাই, তাঁর মতে কাব্যসৃষ্টির মূল শক্তি। কল্পনার আছে একাধিক স্তর। মৌল কল্পনা (প্রাইমারি ইম্যাজিনেশন), সহায়ক কল্পনা (সেকেন্ডারি ইম্যাজিনেশন) এবং লঘু কল্পনা (ফ্যান্‌সি) নিয়ে যে শিল্পবোধ-নন্দিত ব্যাখ্যা ও দৃষ্টান্ত তিনি দিয়েছেন তার সাহায্যে আমরা এখনও বিভিন্ন ধরনের রোমান্টিক

কবিতা এবং রোমান্টিকতার বৈচিত্র্য ও সূক্ষ্মাতিসূক্ষ্ম স্তরান্তর সম্পর্কে অবহিত হতে পারি। সেই সঙ্গে নিজের কবিতায় অ-পার্থিব কল্পলোকের যে ভীতি-শিহরণ-জাগানো চিত্র এঁকেছেন তিনি, সেই সঙ্গে ব্যবহার করেছেন লুপ্ত ইতিহাসের রহস্যঘন আলো-আঁধারি প্রেক্ষাপট— তা রোমান্টিক কল্পনার আরও একটি দরজা খুলে দিয়েছে যেন। তাঁর সঙ্গে ওয়র্ডসওয়র্থ-এর সরল সুন্দর নিসর্গ-নিবিড়, আস্তিক্যবোধ নিষিক্ত পরিমণ্ডলের পার্থক্য আছে। কিন্তু এই দুই-এ মিলেই রোমান্টিকতার কাব্যজগতের প্রতিষ্ঠা। সেই কাব্যতত্ত্বের সারাৎসার হল কবির কল্পনা, কবির নিজস্ব দৃষ্টিকোণ এবং কবির একান্ত ব্যক্তিগত অনুভবের নির্যাস থেকেই কবিতা জাগবে— অন্য কোনো উৎস থেকে নয়। এই তত্ত্বের আর একটি দিক হল— যদিও মানবীয় নৈতিকতা মোটের উপর অস্বীকৃত হবে না, তবু প্রথাসিদ্ধ নৈতিকতা নয়। কবি এবং কবিতা পাঠকের হৃদয়-সংযোগ স্থাপনেই কাব্যের উদ্দেশ্য চরিতার্থ হয় অলৌকিক ভীতি-শিহরণ ও তা থেকে মুক্ত হওয়া প্রশান্তির যে অসামান্য কাব্যরূপ তিনি 'দ্য রাইম অফ দি এনশিয়েন্ট মেরিনার' কবিতায় প্রকাশ করেছেন তা রোমান্টিক অনুভবলোকের এক অজানা তলকে তুলে এনেছে। বাংলা কবিতায় রোমান্টিক অনুভবের পরিসরে রবীন্দ্রনাথ এবং জীবনানন্দকে আমরা যে স্বচ্ছন্দে প্রতিষ্ঠিত করতে পারি তার কারণ পাশ্চাত্য রোমান্টিক আন্দোলনের সূত্রপাত পর্বেই সহাবস্থান ঘটেছিল ওয়র্ডস্ওয়র্থ-এর সঙ্গে কোল্রিজ-এর।

অতঃপর ইংল্যান্ড-এর রোমান্টিক কাব্যের গতিপথে প্রধান তিন অভিযাত্রীর নাম বায়রন, শেলি এবং কিট্স্।

একদিকে জীবনবাসনা, অন্যদিকে প্রবল আকাঙ্ক্ষা ও শক্তিমত্তার সঙ্গে, সেই জীবনকে আঁকড়ে থাকার প্রয়াসের সঙ্গে জীবনবোধ-নিহিত এক বিষাদ-ঔদাসীন্যও যেন মিশে আছে বায়রন-এর কবিচরিত্রে। বহির্বিশ্বকে, বহির্জীবনকে হাতের মুঠোয় পেতে চান তিনি ; বিচিত্র জগৎ-সৌন্দর্য ও পার্থিব ভোগের পেয়ালা পান করতে চান আকণ্ঠ, কবিকল্পনা সঞ্চারিত করে দিতে চান ঐতিহাসিক অতীতে। আবার কোথাও আছে অপরাধবোধেরও ইঙ্গিত। তাঁর দুটি বিখ্যাত কাব্যগ্রন্থ *চাইল্ড্ হেরল্ড* এবং *ডন জুয়ান*-এ এই উপলব্ধিসমূহ সম্মিলিত হয়েছে। রোমান্টিক কাব্য আন্দোলনে কবির মনের আভ্যন্তর সর্বতোস্বচ্ছতায়, সার্বিক আবেগে এবং সুগভীর সততায় উন্মোচিত হবে— এই প্রত্যাশাই পূর্ণতা পায়। বায়রন-এর সৃষ্টিতে আমরা সেই সত্যেরই উদ্ঘাটন পাই।

শেলি-র কবিতায় জীবনকে পূর্ণ রূপে পাবার আর্তি রোমান্টিকতার আর একটি লক্ষণকে তুলে ধরেছে। তা হল একদিকে মননশীলতার সঙ্গে আবেগের সংযোগ ; অন্যদিকে আকাঙ্ক্ষার তীব্রতা ও বিশালতা যে অপূর্ণতার বিষাদ-বোধ জাগায়— তার ভাষাকে ব্যঞ্জিত করে তোলা। রোমান্টিকতার সঙ্গে যে 'ডিভাইন ডিসকনটেন্ট' অর্থাৎ অমর্ত্য অতৃপ্তির অনুভবকে আমরা যুক্ত করি সেই 'মেলান্কলি' বা বিষাদকে তাঁর মতো করে আর কেউই ব্যক্ত করতে পারেননি। তাঁর কবিকল্পনায় অসীমের প্রসৃতিতে পক্ষ বিস্তার এবং জীর্ণ পুরাতনকে উড়িয়ে দিয়ে নব-নবীনের আগমনী উচ্চারণের প্রবণতা রোমান্টিক অনুভূতির বিস্তারের এবং নব-জায়মানতার দিকটিকে প্রকাশ করেছে। আমরা রবীন্দ্রনাথের মানসব্যাপ্তির সঙ্গে তাঁরই সর্বাধিক সাদৃশ্য খুঁজে পাই।

কিট্স্ (১৭৯৫-১৮২১)-এর কবিতারও অন্যতম মনোধর্ম এই অ-পার্থিব, অতীন্দ্রিয়-লোকের প্রতি স্বপ্ন-জড়ানো দৃষ্টিপাত। মর্ত্যের মানুষকে মুগ্ধ করে, সম্মোহিত করে অমর্ত্য সৌন্দর্যের কল্প-স্পর্শ। তারপর সে আর তার চেনা পৃথিবীকে আগের মতো খুঁজে পায় না। এই উপলব্ধির

সঙ্গেই কিট্‌স্‌-এর প্রগাঢ়, সংহত, আত্মমগ্ন সৌন্দর্য-সংবেদন রোমান্টিকতার ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য রূপতৃষ্ণা এবং তার চরিতার্থতার দিকটিকে তুলে ধরে। জীবনানন্দের প্রকৃতি-মুগ্ধতার কবিতা বাঙালি পাঠকের মনে কিট্‌স্‌ পাঠের অনুভব সঞ্চারিত করে।

রোমান্টিকতার এই কাব্যতত্ত্ব যা রোমান্টিক কবিতার উপলব্ধি থেকে বিচ্ছিন্ন করে ভাবাই যায় না— তা বিশ্বে সর্বব্যাপ্ত হয়েছে খানিকটা যুগধর্মে। অষ্টাদশ-উনবিংশ শতকে ইংরেজি এবং ফরাসিভাষী সংস্কৃতি ঔপনিবেশিক সাম্রাজ্যবাদের পথ ধরে বিশ্বের বহু দেশে ছড়িয়ে পড়েছিল। সেই সঙ্গে এ-কথাটিও কম গুরুত্বপূর্ণ নয় যে, এই কাব্যতত্ত্বে ব্যক্তি-হৃদয়ের নিজস্বতা এবং একান্ততাই সৃষ্টি মূলের প্রধান উৎস-কেন্দ্র রূপে স্বীকৃত। তার ফলে উনিশ ও বিশ শতকের সাধারণ মানুষ— শিক্ষা এবং গণতন্ত্রীয়তার পরিমণ্ডলে যখন আত্মব্যক্তিত্বের মূল্য বুঝেছে— তখন এই কাব্যতত্ত্বই তার কাছে সর্বাধিক গ্রহণযোগ্য মনে হয়েছে। আজকের মানুষের মনকে আর কোনো দিন আরোপিত অনুশাসনের শেকলে বাঁধা যাবে না।

রোমান্টিক কাব্যতত্ত্বের গ্রহণযোগ্যতা এতটাই যে, পরে যখন ইম্‌প্রেশনিজ্‌ম্‌, সিম্‌বলিজ্‌ম্‌, এক্সপ্রেশনিজ্‌ম্‌, ডাডাইজ্‌ম্‌, সুররিয়াজিলম ইত্যাদি শিল্পতত্ত্ব ও কাব্যতত্ত্বের বিকাশ ঘটেছে তখন তার কোনোটিই রোমান্টিক কাব্যতত্ত্বের বিরুদ্ধতা করেনি। কারণ সবগুলি তত্ত্বেই স্রষ্টার ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্যের স্বাক্ষরই গণ্য হয়েছে সর্বাধিক গুরুত্বপূর্ণ লক্ষণ রূপে।

প্রথম মহাযুদ্ধ-উত্তরকালে আর এক বিশিষ্ট ইংরেজিভাষী কবি টি.এস. এলিয়ট (১৮৮৮-১৯০৫) প্রথম প্রথাসিদ্ধ রোমান্টিক কাব্যতত্ত্বকে একটি প্রশ্নের সামনে দাঁড় করালেন। প্রথম মহাযুদ্ধের বিপর্যয়ে তখন জীবনের প্রতি, সৌন্দর্য-প্রেম-নিসর্গ প্রীতির প্রতি মানুষের আবেগের উচ্ছ্বাস-গতি কিছুটা থমকে গেছে। মানবতাবাদী আস্তিক্যবোধের প্রতি মানুষের আস্থা হয়েছে বিচলিত। সুন্দরের ভুবনে প্রবেশ করতে মানুষ তখন দ্বিধাগ্রস্ত। তার পার্থিব জীবন এতই উৎপীড়িত যে অতীন্দ্রিয়লোকের অসীমতায় নিজের মনকে বিস্তীর্ণ করে দেবার আকাঙ্ক্ষা তার কাছে আর কোনো চরিতার্থতাবোধের প্রত্যাশা বহন করে আনছে না।

তখন এলিয়ট নিয়ে এলেন এক নৈর্ব্যক্তিকতার তত্ত্ব। কবি এবং কবিতার মধ্যে যে অবিচ্ছিন্ন সংশ্লেষ সাধারণত রোমান্টিক কাব্যভাবনায় স্বীকৃত ছিল এলিয়ট বললেন তার বিপরীত কথা। তিনি বললেন— কবি তাঁর স্রষ্টার মন ও মনন নিয়ে দাঁড়াবেন তাঁর সৃষ্টিকর্ম থেকে কিছুটা দূরত্বে। সৃজনী প্রক্রিয়াকে উচ্ছ্বসিত আবেগের স্রোত থেকে যথাসম্ভব বিচ্ছিন্ন রাখতে হবে। তবেই যথার্থ শিল্পরূপ সৃষ্টি সম্ভব। —"Poetry is not a turning loose of emotion, but the escape from emotion ; it is not the expression of personality, but an escape from personality."[৩]

কিন্তু এলিয়ট-এর এই উক্তিকেও আমরা বলব না রোমান্টিক কাব্যতত্ত্বের বিরোধী। এলিয়ট কেবল কবিতার প্রকাশভঙ্গির উচ্ছ্বসিত তারল্যকে সংবৃত রাখতে চেয়েছিলেন। তিনি চেয়েছিলেন, কবির ব্যক্তিগত আবেগের উৎসারণ যেন পর্যবসিত না হয় পুনরুক্তিবহুল আতিশয্যে। তিনি চেয়েছিলেন কবির মননশীলতাজাত প্রশ্নগুলিও যেন বিধৃত থাকে কাব্য-শরীরে ; তা যেন না হয়, কেবলই মুগ্ধতা-সমুত্থিত আবেগ-বচন।

প্রকৃত রোমান্টিক কাব্যতত্ত্বের কবির মননশীলতাকে অস্বীকার করা হয়নি কোথাও। কারণ, শেলি, কিট্‌স্‌-এর কবিতায় তাঁদের বৈদগ্ধ্য, ক্ল্যাসিকাল সাহিত্যপাঠের পরিচয় খুবই চিহ্নিত। আর, এলিয়ট কবিচিত্তের যে নৈর্ব্যক্তিকতার কথা বলেছেন তা-ও প্রকৃত অর্থে নৈর্ব্যক্তিক উদাসীনতা নয়। অনুভবের প্রগাঢ়তা গভীর হলে মানুষের উপলব্ধিতে এক সংবৃত সংহতি

জাগে। তা সর্বদা উচ্ছ্বাসে ভেঙে পড়ে প্রবাহিত হয়ে চলে না। এলিয়ট চেয়েছিলেন— উচ্ছ্বাসের সেই বাঁধবাঙা তরঙ্গে মননশীলতার প্রকৃত অভিজ্ঞতার কিছুটা বিচার-বুদ্ধির বাঁধ থাকুক। তাতে শিল্প রূপের লক্ষ্যভেদ করবার ক্ষমতাই পরিবর্ধিত হবে। এলিয়ট-এর কবিতা রোমান্টিক কাব্যধারার বিশ শতকীয় বিবর্তনেরই অন্যতম দৃষ্টান্ত। তা রোমান্টিক কাব্যতত্ত্বকেই প্রতিষ্ঠিত করে। কারণ এলিঅট-এর কবিতাও বহন করে কবির ব্যক্তি-মনের নিজস্বতার স্বাক্ষর। নিজস্ব বাগ্‌ভঙ্গিও নির্মাণ করে নেয় তাঁর কবিতা। এভাবেই রোমান্টিসিজ্‌ম্-এর ধারণা এবং রোমান্টিক কাব্যতত্ত্ব থেকে যায় অনেকটাই সর্বকালে সর্বস্তরে গ্রহণযোগ্য।

উল্লেখসূত্র :

১. *Princeton Encyclopedia of Poetry & Poetics*; Editor : Alex Preminger; Macmillan *Press Ltd* ; Princeton University Press ; Ed. 1974 ; P. 717.

২. Emile Legouis and Louis Cazamian, *A History of English Literature*, London, I. M. Dent and Sons Ltd., Revised edition 1964. P. 991.

৩. T. S. Eliot ; Essay : Traditon and Individal Talent ; *The Sacred Wood*, London, Methuen and Company Ltd. ; 1920 (1st Ed.)

দ্য স্টাডি অফ্ পোয়েট্রি ম্যাথু আর্নল্ডের কাব্যাদর্শ

অমিত কুমার

আশ্চর্য কথা বটে। একজন মানুষ এই জঞ্জালের পৃথিবীতে বসে প্রত্যয়ী বাক্যে সোজা-সাপটা মন্তব্য করে গেলেন যে সভ্যতা যত এগোবে সামনের দিকে তত মানুষের জীবনে কবিতার প্রয়োজন বাড়বে। জীবনকে আমাদের কাছে আরও সহনীয় করে তুলতে, আমাদের যন্ত্রণায় ঠাণ্ডা প্রলেপ লাগাতে কবিতাই হবে একমাত্র ভরসা। বিজ্ঞানও কবিতার ছোঁয়া ছাড়া অসম্পূর্ণ হয়ে পড়বে। এমনকি ধর্ম্ম ও দর্শনকে তাদের সিংহাসন থেকে সরিয়ে দিয়ে একচেটিয়া রাজত্ব করবে কবিতা। না— এটা কোনো কল্পনাবিলাসী লিট্‌ল ম্যাগাজিনের সম্পাদকের আবেগপ্রবণ সম্পাদকীয় থেকে নেওয়া উদ্ধৃতি নয়। এ হল ভিক্টোরিয়ান যুগের স্বনামধন্য কবি ও সমালোচক ম্যাথু আর্নল্ডের (Matthew Arnold) উচ্চারণ। ভিক্টোরীয় যুগের রক্ষণশীল সামাজিক পটভূমিতে অবস্থান করেও আর্নল্ড ছিলেন চিরব্যতিক্রমী। তিনি সেই বিশেষ শ্রেণীর সমালোচকদের মধ্যে পড়েন যাঁরা কাব্যের সৌন্দর্য এবং সমাজচেতনার মধ্যে একটা আপস করে চলার মানসে কলম চালিয়ে গেছেন।

আর্নল্ডের কথায় কবিতা হল জীবনের বিশ্লেষণ (Criticism of life) । উঁচু দরের কবিতা মাত্রেই তা পাঠকের কাছে তুলে ধরবে এক আদর্শ জীবনের জলছবি। তা মানুষকে অনুপ্রাণিত করবে এক সৎ, সুন্দর জীবন যাপন করতে, নিজেদের ভ্রম-প্রমাদ সংশোধন করে নিতে। গ্রিক তাত্ত্বিক অ্যারিস্টটলের বিচার অনুযায়ী যখন কোনো পর্বতসদৃশ চরিত্র তার মুহূর্তের স্খলনের জন্য ট্র্যাজিক পরিণতির শিকার হয় তখন তার এই পরিণতি পাঠকের মনে শুধু 'pity' ও 'terror'-ই সৃষ্টি করেনা— পাশাপাশি একটা সাবধানবাণীও যেন দিয়ে যায় যে স্খলন যত ছোটই হোকনা কেন, ভ্রান্তি যতই অকিঞ্চিৎকর হোক্ না কেন—তা ডেকে আনতে পারে ভয়াবহ পরিণতি। অর্থাৎ সাহিত্য জীবননিরপেক্ষ কখনও নয়। তার একটা পথনির্দেশকারী চরিত্র রয়েছে। প্লেটোর আইডিয়ালিজমের কথাও এ-প্রসঙ্গে স্মরণযোগ্য। প্লেটো বলেছেন এই জগতের সব কিছুই কোনো এক আইডিয়াল জগতের নকল। ফোটোকপির মতো। আসল গয়নাগুলো যেন রাখা আছে ব্যাঙ্কের লকারে আর গিল্টি করাগুলো ব্যবহার হচ্ছে। দেখতে যদিও দুটোই হুবহু এক কিন্তু আসলে আর নকলে কি

তুলনা চলে? তাই প্লেটো তাঁর আইডিয়াল রিপাবলিক-এর মধ্যে কবিদের রাখেননি কারণ কবিরা নকলের নকল, এবং তারও নকল করে সত্য থেকে বহু দূরে চলে যান। কিন্তু যদি কবিতার social commitment বা সামাজিক দায়বদ্ধতার কথা বলি তাহলে বোধহয় কবিদের দোষ স্খালন হয়; কারণ কবিতা আদর্শ জীবনের বার্তা নিয়ে আসবে এটাই ম্যাথু আর্নল্ডের মত। বিশুদ্ধ কবিতার একটা আইডিয়াল থাকবে। কবি যা লিখবেন তাই কবিতা নয়। সে লেখা হবে একদম খাঁটি। জহুরির চোখ যেন এক নজরেই চিনে নিতে পারে কোন্‌টা খাঁটি রত্ন— 'ল্যাপিস ল্যাজুলি'। শুদ্ধ কবিতাকে চেনা যাবে তার ভঙ্গিমা দেখে, আর্নল্ডের ভাষায় যা হল 'Grand Style'। সেই সঙ্গে বিষয়বস্তুতেও তা ছুঁয়ে যাবে চেতনার উঁচু স্তর।

> We must also set our standard for poetry high, since poetry, to be capable of fulfilling such high destinies, must be poetry of a high order of excellence. We must accustom ourselves to a high standard and to a strict judgement.

যে কবির কবিতা এই উচ্চতাকে ছুঁয়ে যেতে পারবে আর্নল্ডের বিচারে তিনিই হবেন যথার্থ classic গোত্রীয়, এ ব্যাপারে চসার, মিলটন ও শেক্সপীয়র আর্নল্ডের পছন্দের প্রথম তালিকায়। জার্মান কবি গ্যেটেকেও এই দলে রাখা যেতে পারে। ক্লাসিক কবিতার চরিত্র লক্ষণ যথাযথ বোঝাটাও দরকার। জানা প্রয়োজন কোনটি প্রকৃত ক্লাসিক আর কোনটি নিছক ক্লাসিকের মতো।

> Everything depends on the reality of a poet's classic character. If he is a dubious classic, let us shift him, if he is a false classic, let us explode him. But if he is a real classic, if his work belongs to the class of the very best (for this is the true and right meaning of the word classic, classical), then the great thing for us is to feel and enjoy his work as deeply as ever we can, and to appreciate the wide difference between it and all work which has not the same high character.

কিন্তু classic-এর রসাস্বাদন করা বড় সহজ কাজ নয়। তার জন্য পাঠককেও তৈরি হতে হয় নিজের মতো করে। আধুনিক কবিতা দুর্বোধ্য এই অভিযোগের জবাবে কবি সুনীল গঙ্গোপাধ্যায় একবার বলেছিলেন যে কবিতা বুঝতে হলে পাঠককেও দীক্ষিত হতে হবে। আর্নল্ডের লেখাতেও যেন সেই একই কথা—

> .... the case here is much the same as the case with the Greek and Latin studies of our school boys. The elaborate philological groundwork which we require them to lay is in theory an admirable preparation for appreciating Greek and Latin authors worthily. The more thoroughly we lay the groundwork, the better we shall be able, it may be said, to enjoy the authors.

এই অবধি পড়ে একটা ধারণা জন্মাতে পারে যে আর্নল্ড বোধ হয় শুধু প্রাচীনের ভক্ত ছিলেন। Classic-এর নাম নিয়ে কেবল মাটির তলার চোরা কুঠুরির সোঁদা গন্ধওয়ালা, পোকায় কাটা পুঁথিপত্রের জয় জয়কার করে গেছেন। ব্যাপারটা মোটেও তা নয়। ঐতিহাসিক দিক থেকে মূল্যবান লেখা মানেই তা ক্লাসিক নয়। কোনো কবিতা ক্লাসিক হয়ে ওঠে তার মধ্যে নিহিত কাব্যগুণের নিরিখেই। আর্নল্ড বিস্তারিত উদাহরণ দিয়ে একথা বুঝিয়েছেন। দ্বাদশ শতাব্দীর ফরাসি হিরোয়িক এপিক *Chanson de Roland* সম্পর্কে সে দেশেরই সমালোচক M. Vitet এর মন্তব্যের উদ্ধৃতি দিয়ে এবং তারপর হোমার-এর কবিতার উদ্ধৃতি দিয়ে তিনি দেখিয়েছেন *Chanson de Roland* হোমারের রচনার poetie quality বা কাব্যিক মূল্যের

ধারেকাছে দাঁড়াতে পারে না। এর ব্যাখ্যা করতে গিয়ে তিনি ভাষা ও বিষয়বস্তুর সামঞ্জস্য ও উপযুক্ততার কথা বলেছেন। উলুবনে মুক্তো ছড়ানো কোনো কাজের কথা নয়।

> If our words are to have any meaning, if our judgements are to have any solidity, we must not heap that supreme praise upon poetry of an order immeasurably inferior.

এখন প্রশ্ন হল, পাঠক এই তুল্যমূল্য বিচার করবেন কী করে? কেমন করে মেপে নেবেন, ইতিহাস, ঐতিহ্য, কাব্যগুণের ভারসাম্যকে ? তার জন্য আর্নল্ড একটা পদ্ধতির কথা বলেছেন যার নাম touchstone পদ্ধতি। স্বর্ণকার যেমন কষ্টিপাথরে ঘষে যাচাই করে নেন খাঁটি সোনা তেমনি একজন পাঠকও তাঁর নিত্য দিনের পাঠাভ্যাস থেকে নিজের মনে গড়ে তুলতে পারেন নিজস্ব একটি touchstone। বিশ্বসাহিত্যের অবিসংবাদিত কীর্তিগুলির সঙ্গে যদি একজন পাঠক ভালোভাবে পরিচিত থাকেন তবে তাঁর মনে আপনা থেকেই জন্ম নেবে এক ধরনের অন্তর্দৃষ্টি, যার ফলে ভালো লেখাকে ভালো বলে চিনে নিতে তাঁর অসুবিধা হবে না। যেহেতু তাঁর মনে ভালো লেখার দিকচিহ্নগুলি আঁকা হয়ে গেছে আগে থেকেই তাই সেই দিকচিহ্নগুলি ধরে তিনি সহজেই সিদ্ধান্ত পৌঁছোতে পারবেন, কোন্ লেখাটি কাব্যগুণে সমৃদ্ধ আর কোন্‌টি নয়। আর্নল্ড নিজে হোমার, দান্তে, মিলটন, শেক্সপীয়র প্রমুখ লেখকদের উদ্ধৃতি দিয়ে বুঝিয়ে দেবার চেষ্টা করেছেন কাব্যমূল্য বা poetic value বলতে তিনি ঠিক কী বলতে চান। এমনটা নয় যে ভালো কাব্য মাত্রেই তাদের একই রকম মানদণ্ড মেনে চলতে হবে, কিন্তু স্বীকৃতি পেতে হলে তাকে অন্তত কিছু যোগ্যতা অর্জন করতেই হবে যাতে শ্রেষ্ঠদের পাশে তাকে বসার আসন দেওয়া যায়।

> Of course we are not to require this other poetry to resemble them (the classics); it may be very dissimilar. But if we have any tact we shall find them, when we have lodged them well in our minds, an infallible touchstone for detecting the presence or absence of high poetic quality, and also the degree of high quality in all other poetry which we may place beside them.

আর্নল্ডের মতে এটাই হল ভাল কাব্যকে চিনে নেওয়ার শ্রেষ্ঠ এবং ত্রুটিমুক্ত পদ্ধতি। একজন সমালোচক যদি তাঁর ব্যক্তিগত দৃষ্টিভঙ্গি থেকে বিচার করতে নামেন তাহলে সেখানে অনেক ভুলভ্রান্তি থাকতে পারে, পক্ষপাত ঘটতে পারে।

কিন্তু কবিতাতো কোনো জড়বস্তু নয়, তারও নিজস্ব জীবন আছে। সমালোক যদি সেই স্পন্দনকে চিনতে না পারেন তাহলে আর সমালোচনার সার্থকতা কোথায়? তাই সমালোচকের একটা নৈর্ব্যক্তিক (objective) দৃষ্টিভঙ্গি দরকার। দরকার দায়িত্বশীল হবারও। একজন সমালোচক নিজে যদি না ভালো পাঠক হন, তাহলে এই নৈর্ব্যক্তিক বিচারবোধ এবং উঁচুমানের লেখার প্রতি দায়বদ্ধতা তাঁর আসবে না কখনো।

'The Function of Criticism at the Present Time' প্রবন্ধে ম্যাথু আর্নল্ড সমালোচকের ভূমিকা, দায়িত্ব এবং সমালোচনা কীভাবে সাহিত্যে তথা জীবনে গুরুত্বপূর্ণ হয়ে উঠতে পারে সেই বিষয়ে তাঁর ভাবনা ব্যক্ত করেছেন—"I am really concerned with the criticism which alone can much help as for the future." জীবন তার প্রতিটি মোড়ে দাঁড় করিয়ে আমাদের চিনিয়ে দিতে থাকে হাজারো পথ। দিশাহারা হওয়া স্বাভাবিক। ভালো সাহিত্য এই বিভ্রান্তিতে হাল ধরতে পারে, আর সাহিত্যের হাল ধরতে পারে ভালো সমালোচনা। "একজন

সমালোচকের হয়তো সব সময় ভালো কবি হওয়ার দরকার নেই, কিন্তু তাঁর খারাপ কবি হওয়াও চলবেনা”— একথা জি. কে. চেস্টারটনের। আর্নল্ডও প্রায় একই ঢঙে সমালোচকের সৃষ্টিশীল সত্তার কথা তুলে এনেছেন—

> To have the sense of creative activity is the great happiness and the great proof of being alive, and it is not denied to criticism to have it, but then criticism must be sincere, simple, flexible, ardent, ever widening its knowledge.

ম্যাথু আর্নল্ড নিজে একজন কবি ও সমালোচক। তাঁর কাব্যভাবনা এবং সমালোচনা সাহিত্য সম্পর্কিত ভাবনার মধ্যে মিল হল তাঁর ইতিবাচক মনোভাব। অর্থাৎ এমন কিছু লেখা যার একটা positive output আছে। তিনি কবিতাকে বলেন ‘the breath and fair spirit of all knowledge’ সকল জ্ঞানের সারাৎসার। আর হিতকারী চেতনাকে বাদ দিয়ে কোনো জ্ঞান হয়না। হলে, তার পরিণতি হয় ধ্বংসাত্মক,—ফাউস্টের মতো। সাহিত্যিক শীর্ষেন্দু মুখোপাধ্যায় একটি সাক্ষাৎকারে মন্তব্য করেছিলেন—“লেখকের মধ্যে যদি হিতকারী প্ররোচনা না থাকে তবে সাহিত্য প্রাণবান হয়না। ভাবো, এই ভাষা আবিষ্কার করতে মানুষ কী কষ্ট করেছে। গুহাগাত্রে লিখে সে নিজেকে বোঝবার চেষ্টা করেছে। কত পরিশ্রমের পর লিপি এল। আমি যখন লিখতে বসি তখন ওই হেরিটেজ কলমের সামনে এসে দাঁড়ায়। আমার ভীষণ অনুভূতি হয়, এমন কিছু লিখতে হবে, যা মানুষের মঙ্গল আনে। একটাই জীবন আমরা বারবার বিচার করে চলেছি সাহিত্যে। মঙ্গলাকাঙ্ক্ষা যুক্ত না হলে লেখাটা নিত্যদিনের রিপোর্টিং হয়ে যাবে।” ম্যাথু আর্নল্ডের poetic ideal-ও সেই কথাই বলে। যা চিরন্তন, সত্য, স্বচ্ছ,— যা হিতকারী তাই ভালো সাহিত্যে।

শিল্প সাহিত্যে মার্কসীয় বীক্ষণ

সুজিৎ ঘোষ

সাহিত্যের সঙ্গে সমাজের সম্পর্ক সব সময় প্রত্যক্ষ নয়। মানুষের জীবনাচরণে অর্থনীতির প্রভাবও বহু ক্ষেত্রেই প্রচ্ছন্ন। অ্যাডাম স্মিথ-এর *দি ওয়েলথ অব নেশনস্* প্রকাশের পর থেকেই বিষয় হিসেবে অর্থনীতির গুরুত্ব ক্রমেই বেড়ে চলেছে। অর্থনীতি বর্তমানে আন্তর্জাতিক গুরুত্বের স্তরে পৌঁছেছে। বাজার থেকে ক্রয় ও ব্যবহার্য পণ্যসমূহের ক্রমাগত দাম বেড়ে-চলা ছাড়া সাধারণ মানুষের কাছে অর্থনীতির কোনো মূর্ত রূপ নেই। কিন্তু অর্থনীতির বিধি-বিধান নির্ণয়ে নানা তত্ত্ব সৃষ্টি হচ্ছে, কোনো তত্ত্ব অচল হয়ে যাচ্ছে, আবার কোনো অচল হয়ে-যাওয়া তত্ত্ব পুনরায় প্রাণ ফিরে পাচ্ছে। সাধারণ মানুষ অর্থনীতির কোনো কোনো সূত্র হয়তো কিছুটা বুঝছে। যাঁরা একটি দেশ বা জাতির অর্থনৈতিক জীবন পরিচালিত করতে চান, তাঁরাও চিন্তায় থাকেন— কোন্ নিয়ম বা নীতি অর্থনৈতিক নির্মাণে যথাযথ হবে। জোয়ান রবিনসন অবশ্য মনে করেছেন, অর্থনীতির এই দৃঢ় অপরিবর্তিত মতাদর্শের ভাবনার মূলে কাজ করে জাতীয়তাবাদ,— স্বতঃসিদ্ধের মতোই জাতীয়তাবাদের উপস্থিতি বিভিন্ন দেশের আর্থিক দিক-নির্দেশক। রবিনসন বলেছিলেন, "Marxism also, though theoretically universalist, had to be poured into national moulds when revolutionary administrations were set up."[১]

ধরা হয়, জাতীয় আন্তর্জাতিক বাজারে পণ্যের হাত বদলে জিনিসের দাম তার মূল্যের সমানুপাতিক। কিন্তু মূল্য (value) কীভাবে স্থিরীকৃত হবে? মার্কস-এর বক্তব্য আমাদের জানা : তাঁর মতে, শ্রমশক্তি (labour power) হল সেই মূল্য। নির্দিষ্ট একটি শ্রম-সময় ব্যয় করে শ্রমিক তার মূল্য উপার্জন করে, কিন্তু তার দাম (price) ঠিক করে নিয়োগকর্তা। এবং শ্রমের মূল্য পরিমাণের চেয়ে শ্রমিককে শ্রমের কম দাম দেওয়া হয়। শ্রমিকের দামের পরিমাণ তার জীবনধারণের জন্য যে মজুরিটুকু প্রয়োজন, ঠিক ততটুকু। শ্রমিকের উৎপাদিত মূল্যের একটা অংশ নিয়োগকর্তা নিজে রেখে দেয়। এই সূত্রেই মার্কস ধনতন্ত্রবাদকে ব্যাখ্যা করতে চেয়েছেন। এই ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণে শুধু অর্থনীতিই আলোচিত নয়, এই প্রসঙ্গে মার্কস একটি নৈতিকতার প্রশ্নও উত্থাপন করেছেন। তা হল শ্রম ও শ্রমজীবী মানুষকে শোষণের নৈতিকতার প্রশ্ন, এবং তার উত্তরে শোষণের বিরোধিতার প্রসঙ্গ ও প্রস্তাব।

মার্কস মূলত কয়েকটি দর্শনের প্রশ্নের মীমাংসা চেয়েছিলেন। চেয়েছিলেন হেগেল ও ফয়েরবাখ-এর যথাক্রমে ভাববাদ ও বস্তুবাদের সিদ্ধান্ত সমূহের বিশ্লেষণ ও পুনর্বিবেচনা। কিন্তু দর্শনের পরিসরে দাঁড়িয়ে সেই অবলোকন যথার্থ হয় না। কোনো কিছু দেখতে হলে তার মধ্যে থেকে তাকে দেখা যায় না, বিষয় বা বস্তুটির বাইরে এসে তাকে দেখতে হয়। মার্কস বস্তুবাদের ভূমিটি থেকে দর্শনকে দেখতে চাইলেন। কিন্তু তাঁর অবস্থান পুরোনো বস্তুবাদের অবস্থান থেকে সরে গেল। তাঁর অবস্থানভূমি হল মানব সমাজ বা সামাজিকী মানবতা। মানবতার এই সামাজিক রূপ অন্বেষণ করতে গিয়ে অর্থনীতির ক্ষেত্রটিকে সিভিল সোসাইটি বা নাগরিক সমাজকে বিচার-বিশ্লেষণ করার ভিত্তিভূমি হিসেবে স্থির করলেন মার্কস।[২]

কিন্তু সামাজিকী মানবকে দেখতে ও বিশ্লেষণ করতে গিয়েও যে-সীমার মধ্যে সামগ্রিক ভাবে মানবসমাজকে থাকতে হয়, মার্কসকেও সেই সীমার মধ্যেই থাকতে হয়েছে। মানুষ বেড়ে উঠেছে প্রকৃতির মধ্যে, তার বিকাশ প্রকৃতির মধ্যে থেকেই। কেননা, শুরুতে মানুষ ছিল প্রকৃতিরই এক অবিভাজ্য অংশ। প্রকৃতির নিয়মসমূহ (laws) পূর্বনির্ধারিত। মানুষ তার চৈতন্য দিয়ে সেই নিয়মসমূহ জেনেছে, বুঝেছে, অনুধাবন করেছে। এবং অনুধাবন করেছে বলেই প্রকৃতিকে সঙ্গে নিয়ে বাঁচার জন্য সংগ্রাম করেছে, প্রকৃতির বিরুদ্ধেও সংগ্রাম করেছে। আপন প্রয়োজনে মানুষ প্রকৃতির ওপর আধিপত্য করেছে এবং প্রকৃতিকে পরিবর্তিত করেছে। মানুষ একদিকে প্রকৃতির সহযোগী, অন্যদিকে প্রকৃতির প্রতিযোগী। এই প্রক্রিয়ায় প্রাকৃতিক মানুষ নিজেকেও পরিবর্তিত করেছে। সচেতন প্রাণী হিসেবে অন্যান্য প্রাণী ও প্রাকৃতিক মানুষের থেকে মানব স্বাতন্ত্র্য লাভ করেছে। সচেতন ভাবে মানব পার্থিব বস্তুর ও ভূমির উৎপাদনশীলতা ও আপন সৃজনশীলতা উদ্ভাবন করেই, মানুষ প্রাকৃতিক বন্ধন থেকে বেরিয়ে আসতে চেয়েছে। ভাবনার এই ধারার জন্যেই শুধু অনুমান, তাত্ত্বিক বিশ্লেষণ প্রকল্পভিত্তিক বক্তব্যে মার্কস থেমে থাকেননি। মানুষ যেহেতু উৎপাদনশীল ও সৃজনশীল, সেহেতু বিশ্বকে ব্যাখ্যা করেই মার্কস থেমে থাকতে চাননি, বিশ্বকে বদলাতেও চেয়েছেন।[৩]

মার্কস মানুষের অন্তর্গত সৃজনশীলতা অন্য অনেক দার্শনিকের মতোই লক্ষ করেছেন। মার্কস-এর নিজের সময়ে যেমন মানুষের সৃজনশীলতা ছিল, তাঁর আগেও পৃথিবীব্যাপী মানবিক সৃজনশীলতা ছিল— তার বাস্তব রূপ কলকারখানা-শিল্পের (industry) ইতিহাসে রয়ে গেছে। সেই ইতিহাসই মানুষের ক্ষমতার সারাৎসারের সাক্ষ্য। এই প্রসঙ্গে মার্কস মানবমনস্তত্ত্বের কথা বললেন, বর্তমান মানবিক মনস্তত্ত্বের ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য সংবেদনশীলতা ('The perceptibly existing human psychology')। এর আগে মানুষের এই ক্ষমতাকে মানবিক অস্তিত্বের অঙ্গীভূত বা সারাৎসারের অন্তর্গত ভাবা হয় নি। কিন্তু শ্রমশক্তির বিক্রেতা এবং ক্রেতার মধ্যে মানুষের প্রজাতিগত অস্তিত্ব বিভাজিত হয়েছে বহুদিনই। মানুষে মানুষে এই বিচ্ছিন্নতার মধ্যে বাস্তব সারাৎসার রাজনীতি, শিল্পসাহিত্যে বিমূর্ত-সাধারণ রূপে বিরাজ করে। কিন্তু সৃজনের পরে মানুষের ক্ষমতার সারাৎসারের বস্তুরূপ (objectified) ইন্দ্রিয়গত, বিচ্ছিন্ন, প্রয়োজনের বস্তুরূপ মানুষ গ্রহণ করে।

শ্রেণিসমাজে মানুষে মানুষে বিচ্ছেদ ঘটলেও মূলত একটি নৃগোষ্ঠীর ভাষা একই থেকে যায়। ভাষার মধ্যেই মানুষের সামাজিক অস্তিত্ব নিহিত থাকে। ভাষার মধ্যেই রয়েছে তার সামাজিক চরিত্র। মানুষের ভাব-ভাবনা তার ভাষা থেকে আলাদা-ভাবে থাকতে পারে না, ভাষাই তার ভাবনা ও ভাবপ্রকাশের আধার ও আঁধেয়। একক ব্যক্তির কোনো ভাষা থাকতে

পারে না। ভাষা মানেই একাধিক ব্যক্তির পরস্পরের সঙ্গে ভাবের আদান-প্রদান। বিশেষ নৃগোষ্ঠীর ভাষা থেকেই সেই ভাষার সাহিত্যের ভাষারীতি গড়ে ওঠে। লোকশিল্পও ধীরে ধীরে তার মাধ্যমগুলির (মাটি, পাথর ধাতু ইত্যাদি) মধ্যে দিয়ে একটি বহুজনগ্রাহ্য রীতি খুঁজে নেয়— যেখান থেকে সৃষ্টি হয় শিল্পের 'ভাষা'।

অন্যান্য উৎপাদনের মতো শিল্প-সাহিত্যের উৎপাদনও চাহিদা ও তৃপ্তির উপাদান জোগায় কিন্তু একই সঙ্গে সৃষ্ট উপাদানের চাহিদাও জোগায়— একটি ছবি বা ভাস্কর্য তৃপ্তির উপাদান হিসেবে শিল্পীর হাত থেকে অন্যের কাছে পৌঁছোলে একজনের চাহিদার তৃপ্তি অন্য অনেকের কাছে সেই শিল্প-উপাদানের চাহিদা সৃষ্টি করে। শিল্পবস্তু শৈল্পিক রুচিসম্পন্ন, বোদ্ধা জনগণও তৈরি করে, যারা শিল্পের সৌন্দর্য উপভোগ করতে সক্ষম। অন্য উপাদানের মতোই শিল্প সৃষ্টি শুধু বিষয়ী বা শিল্পবোদ্ধার জন্যে একটি বিষয়ের (object) সৃষ্টিই করে না, একই সঙ্গে শিল্প বা বিষয়টির জন্যে বিষয়ী বা বোদ্ধাও সৃষ্টি করে।[৫]

একটি বিশেষ দেশের বিশেষ সমাজব্যবস্থার সমাজ, রাজনীতি ও বৌদ্ধিক জীবনের সাধারণ ভিত্তি হল সেই সমাজের উৎপাদন পদ্ধতি। মানুষ সচেতন ভাবে আকাঙ্ক্ষা করলেই তার অস্তিত্বকে নির্ধারণ বা পরিচালিত করতে পারে না। বরং তার অস্তিত্বই তার চিন্তা চেতনাকে নিয়ন্ত্রণ করে। প্রকৃতির উপরে মানুষের অস্তিত্বের ভিত্তি হল উৎপাদনের অর্থনৈতিক অবস্থার ক্রমরূপান্তর। আইনি, রাজনৈতিক, ধর্মীয়, শৈল্পিক, দার্শনিক মতাদর্শগুলি বাস্তব জীবনের বিরোধগুলি সম্পর্কে আমাদের সচেতন করে তোলে[৬] এবং উপরিকাঠামোগুলি আবার পরস্পরকে প্রভাবিত করে।

জীবজগতে বাবুই পাখি বা মৌমাছি তাদের সুন্দর বাসা বানায়। কিন্তু তা বংশ পরম্পরা ধরে একই রকম বানানো। নিজেদের এবং তাদের শাবকদের জন্যেই নির্মিত— যে প্রজাতির জীব, তার নিজস্ব প্রাকৃতিক চাহিদা ও মান (Standard) অনুসারে বানানো, "Whilst man knows how to produce in accordance with the standard of every species, and knows how to apply everywhere the inherent standard to the object. Man therefore also forms things in accordance to the laws of beauty."[৭] মার্কস বা এঙ্গেলস অবশ্য স্বতন্ত্রভাবে, সুনির্দিষ্ট করে সৌন্দর্যের সূত্রগুলি লিপিবদ্ধ করেননি।

উনিশ শতকের শেষ ভাগে ইউরোপে একটি শিল্প সাহিত্য আন্দোলন ছড়িয়ে পড়ে। সে-আন্দোলনের বক্তব্য ছিল যে সৌন্দর্যের জন্যেই শুধু শিল্পের অস্তিত্ব। তৎকালে প্রচলিত উপযোগিতাবাদী (Utilitarian) সামাজিক দর্শনের প্রতিক্রিয়ায় এই মতবাদের সৃষ্টি,— শিল্প-কারখানার যুগে সৃষ্ট শিল্পকে এঁরা মনে করতেন কুৎসিত ও হঠাৎ-গজানো। এই আন্দোলন ইসথেটিসিজম (Aestheticism) নামে প্রসার লাভ করে। আঠারো শতকে দার্শনিক ইমানুয়েল কান্ট-এর দর্শনে এই আন্দোলনের ভিত্তি নিহিত। কান্ট সৌন্দর্যতত্ত্বের স্বাধীন স্বশাসিত মানদণ্ডের কথা বলেছিলেন, যে মানদণ্ডে সাহিত্য শিল্পের বিচারে নৈতিকতা, উপযোগিতা বা সুখানুভূতি বিচার্য নয়। এই ভাবনা গ্যোয়েটে-এর মতো কবি-নাট্যকারকে প্রভাবিত করেছিল। ইংল্যান্ড-এর টমাস কার্লাইল, স্যামুয়েল টেলর কোলরিজ, ফ্রান্সে তেয়োফিল গোতিয়ে, মাদাম দ্য স্টেইল (Madame de Stael) এবং ১৯১৮ সালে ফরাসি দার্শনিক ভিকতোর ক্যুঁসি (Victor Cousin) 'l' art pour l' art'— Art for art's Sake শব্দবন্ধটি চয়ন করেন। ইংরেজি সাহিত্যে ১৮৪৮ সাল থেকে প্রির‍্যাফেলাইট ব্রাদারহুড-এর কবি-শিল্পী ইসথেটিসিজম-এর প্রসারের ক্ষেত্র প্রস্তুত করেন। দান্তে, গাব্রিয়েল রসেটি, এডওয়ার্ড বার্নস-জোনস, চার্লস সুইনবার্ন প্রভৃতি কবিরা

তাদের রচনায় সচেতন ভাবে এই সৌন্দর্য-তৃষার সঙ্গে মধ্যযুগীয়তাকে (medievalism) মেশালেন। অসকার ওয়াইলড্ এবং ওয়ালটার পেটার-এর রচনাতেও এই দৃষ্টিভঙ্গি দেখা যায়। বাঙ্লা সাহিত্যে art for art's sake কথাটি কলাকৈবল্যবাদ নামে বিশ শতকের তৃতীয় দশকের পরে প্রচলিত হয়। অবশ্য সমকালে এই মত সমালোচনার মুখেও পড়েছিল—উইলিয়াম মরিস এবং জন রাসকিন ছিলেন এই মতের বিরোধী। বিখ্যাত রুশ ঔপন্যাসিক লিও টলস্টয়ও কলাকৈবল্যবাদের বিরোধী ছিলেন— নৈতিকতা থেকে বিচ্ছিন্ন সাহিত্যসৃষ্টিকে তিনি স্বীকার করেননি।

ইসথেটিক (Aesthetic) কথাটি ইংরেজিসহ ইউরোপীয় ভাষাগুলিতে শিল্প সাহিত্যের সৌন্দর্যবিচারের তত্ত্ব হিসেবে গৃহীত হয়েছে, শব্দটি এসেছে গ্রিক ভাষা থেকে, মূল শব্দটি AISTH$\overline{\text{E}}$ TIKOS— যার গৃহীত ইংরেজি অর্থ : concerned, with beauty or the appreciation of beauty.*

এই বিষয়টি ভারতীয় শিল্পসাহিত্য সমালোচনায় অলংকারশাস্ত্র নামে অভিহিত হয়েছে। এ-ছাড়া কাব্যলোক, ধ্বন্যালোক, কাব্যজিজ্ঞাসা, কাব্যমীমাংসা রসতত্ত্ব, সৌন্দর্যতত্ত্ব প্রভৃতি নামেও সাহিত্যতত্ত্বের আলোচনা চলেছে— তা নাটক, কাব্য বা অন্য সুকুমার শিল্পের ক্ষেত্রে আলোচনায় বিস্তৃতি লাভ করেছে। সৌন্দর্যতত্ত্বকে নন্দনতত্ত্ব নামে আখ্যায়িত করার ঝোঁক বাংলা সমালোচনা সাহিত্যে বেশি দিনের নয়। রবীন্দ্রনাথও সাহিত্য সমালোচনায় 'সৌন্দর্যবোধ' 'সৌন্দর্য' শব্দই ব্যবহার করেছেন। সৌন্দর্যবোধের বিষয়ে আলোচনায় রবীন্দ্রনাথ লিখেছিলেন "আমাদের সৌন্দর্যবোধও সেইরূপ ইন্দ্রিয়ের সুখকর ও অসুখকর, জীবনের মঙ্গলকর ও অমঙ্গলকর। এই দুয়ের ঘর্ষণের দ্বন্দ্ব স্ফুলিঙ্গ বিক্ষেপ করিতে করিতে একদিন যদি পূর্ণভাবে জ্বলিয়া উঠে তবে তাহার সমস্ত আংশিকতা ও আলোড়ন নিরস্ত হয়।

"তখন কী হয়? তখন দ্বন্দ্ব ঘুচিয়া গিয়া সমস্তই সুন্দর হয়, তখন সত্য ও সুন্দর একই কথা হইয়া উঠে। তখনই বুঝিতে পারি, সত্যের যথার্থ উপলব্ধিমাত্রই আনন্দ, তাহাই চরম সৌন্দর্য .... এইরূপে বুঝিলে সত্যের অনুভূতি ও সৌন্দর্যের অনুভূতি এক হইয়া দাঁড়ায়।" ['*সৌন্দর্যবোধ*,' *পৌষ* ১৩১৩, *সাহিত্য* পৃ. ৫০-৫১]

রবীন্দ্রনাথ তাঁর সাহিত্যভাবনায় মঙ্গল, সত্য এবং সুন্দর শব্দ তিনটির অর্থকে একাকার করে এক সামগ্রিক অর্থব্যঞ্জনা আনতে চেয়েছেন। তাই তিনি কবি কিট্স-এর 'Ode tn a Grecian Urn' কবিতার প্রবাদপ্রতিম চরণটি ('Beautry is truth, truth beauty') নিজের উপলব্ধি মতো 'Truth is beauty, beauty truth' রূপে অদলবদল করে নেন, জোর দিতে

* Aesthetics শব্দের গ্রিক শব্দটির প্রতিশব্দ—*Anaesthetic* (মূল: ANAISTH E TOS অর্থ: Unconscious, অচেতন। বাংলা ভাষায় 'সৌন্দর্যবিজ্ঞান' নামে বিষয়টি নামাঙ্কিত ছিল। ১৩২০ বঙ্গাব্দে 'প্রবাসী' পত্রিকায় 'সৌন্দর্য্যতত্ত্বশাস্ত্র' শব্দটি ব্যবহৃত হয়। ঢাকা থেকে প্রকাশিত (১৯১৬ খ্রি.) চারুচন্দ্র গুহ-র *The Modern Anglo Bengali Dictionary*-তে Aesthetics শব্দের বাংলা অর্থে 'নন্দনতত্ত্ব' শব্দের প্রয়োগ করা হয়নি। হরিচরণ বন্দ্যোপাধ্যায়ের *বঙ্গীয় শব্দকোষ* (১৯৩৪ খ্রি.)-এ শব্দটি গৃহীত হয়নি। জ্ঞানেন্দ্রমোহন দাসের *বাঙ্গালাভাষার অভিধান* (১৯৩৭ খ্রি.) গ্রন্থেও শব্দটি নেই। ১৯৯৯-এ গৌরীপ্রসাদ ঘোষ সম্পাদিত *Everyman's Dictionary*-তে Aesthetic-এর প্রতিশব্দ সৌন্দর্যর সঙ্গে নিত্যত্ত্ব শব্দটি যুক্ত হয়েছিল।

চান সত্যের, 'truth'-এর উপলব্ধিতে যা মূলত সাহিত্যের মঙ্গলবোধ বা হিতবোধের সঙ্গে যুক্ত।

শিল্পসাহিত্যকে শুধুই দর্শক-শ্রোতা-ভোক্তার আনন্দদায়ী সামগ্রী ও মনোরঞ্জনের উপকরণ হিসেবে প্রাচীন ভারতের সাহিত্য সমালোচকরা দেখেন নি। সাহিত্যে শুধু সুন্দরের অনুসন্ধানও তাঁদের কাছে কাঙ্ক্ষিত ছিল না। "কাব্যের কাজ যে সত্যকে সুন্দরের মূর্তি দেওয়া— এটা উনবিংশ শতাব্দীর আবিষ্কার এবং ঐ শতাব্দীর বৈজ্ঞানিক আবিষ্কারগুলির একটা গৌণ ফল। ...কবি কীটস সত্য ও সুন্দরের যে অদ্বৈতবাদ প্রতিষ্ঠা করেছেন, সে এই বৈজ্ঞানিক যুগের কবিপ্রতিনিধি হিসেবে। নইলে শুদ্ধ কবির চোখ থেকে এ-সত্য কিছুতেই গোপন থাকে না যে, সত্য কাব্যের লক্ষ্য নয়, কাব্যের উপাদান। বস্তুনিরপেক্ষ রস নেই, এবং বস্তুকে সত্য দৃষ্টিতে দেখার উপর রসের সৃষ্টি অনেকটা নির্ভর করে।"[৮] অতুলচন্দ্র গুপ্ত তাঁর এ-বক্তব্যে রবীন্দ্রনাথের মতোই কিটস-এর সুন্দর-সত্যের দ্বৈত-অদ্বৈততার বিপর্যাস ঘটিয়েছেন। কিন্তু শিল্প-সাহিত্য যে সৌন্দর্য সৃষ্টি করে, ভালো লাগায়, তা শুধুই কল্পনার হাতে তিনি ছেড়ে দেননি, বলেছেন 'বস্তু নিরপেক্ষ রস নেই'। কিন্তু রস বা আনন্দকে বস্তুসাপেক্ষ রেখেও অতুলচন্দ্র কাব্য সাহিত্য শিল্পের লক্ষ্য হিসেবে মঙ্গলবোধকেই রবীন্দ্রনাথের মতোই গুরুত্ব দিয়েছেন, "হিতকে মনোহারী করাই কাব্য সাহিত্যের লক্ষ্য।...এই হিতবাদ যাঁদের বলে প্রাচীনপন্থী তাঁদের মধ্যেই আবদ্ধ নয়। হিতবাদী যদি সামাজিক ব্যাপারে হন স্থিতির পক্ষপাতী, তাঁর আদর্শ সাহিত্যের নাম সৎ-সাহিত্য আর তিনি যদি হন পরিবর্তন বা গতির পক্ষে, তাঁর আদর্শ সাহিত্যের নাম প্রগতি-সাহিত্য। কিন্তু স্থিতিবাদী ও গতিবাদী সাহিত্য বিচারে দু-জনার দৃষ্টিভঙ্গি এক—যার লক্ষ্য ও ফল সামাজিক মঙ্গল নয়, তা যথার্থ সাহিত্য নয়।"[৯] মনে রাখতে হবে, অতুলচন্দ্রের *কাব্য জিজ্ঞাসা*-র প্রবন্ধগুলি ১৩৩৩ বঙ্গাব্দ অর্থাৎ ১৯২৬ খ্রিস্টাব্দে রচিত। সমকালীন বিশ্বে ও বঙ্গদেশে সাহিত্য বিচারের যে মতগুলি প্রকাশিত হচ্ছিল, সেই মতামতের কিছু কিছু উত্তরও অতুলচন্দ্র স্বতঃস্ফূর্তভাবে এই প্রবন্ধগুলিতে উপস্থিত করেছেন, কখনও কখনও কল্পিত পক্ষের উদ্দেশ্যে বক্তব্য রেখেছেন। যেমন, অবসরবিনোদনের সাহিত্য প্রসঙ্গে বলতে গিয়ে তিনি বলেছেন, "অবসর বস্তুটা কেন খারাপ, আর তার বিনোদন কেন দোষের, কাজের লোকের সে প্রশ্ন মনে আসে না। মার্কসপন্থীরা হয়তো বলবে, নিচু শ্রেণী যাতে অসূয়া না করে উঁচু শ্রেণীর জন্য ভূতের বেগার খেটে যায়, তার অনুকূলেই এই মনোভাবের সৃষ্টি।"[১০]

কিন্তু শিল্প-সামগ্রীর একটি বস্তুসাপেক্ষ রূপ আছে— কাব্য-উপন্যাস-চিত্রশিল্প প্রভৃতি সব কিছুর এক বা একাধিক ভোক্তা ও উপভোক্তা থাকে— চিত্রশিল্পের ক্ষেত্রে কোনো শিল্পীর একটি বিশেষ চিত্রের সৌন্দর্য বহু দর্শক উপভোগ করতে পারেন— শিল্পসংগ্রহশালাগুলি যে শিল্প-নমুনাগুলি দর্শকের জন্যে গ্যালারিতে বিন্যস্ত করে সেগুলি বিনা খরচে বা সামান্য ব্যয়ে, প্রবেশমূল্য দিয়ে দর্শকসাধারণ দেখার সুযোগ পান। ছাপাখানার যুগে ও গণশিক্ষার প্রসারের যুগে কাব্য কথাসাহিত্যও তুলনায় সুলভ হয়ে গেছে। নাটক ও চলচ্চিত্র সম্পর্কেও এ-কথা

* প্রসঙ্গত, রবীন্দ্রনাথ 'নন্দনতত্ত্ব' শব্দটি ১৯৩২ সালে *সাহিত্যের পথে* গ্রন্থের অন্তর্গত 'আধুনিক কাব্য' প্রবন্ধে ব্যবহার করেছিলেন। ... প্রবন্ধটি প্রথম প্রকাশিত হয় পরিচয় পত্রিকার বৈশাখ, ১৩৩৯ বঙ্গাব্দে। নন্দনতত্ত্ব (Aesthetics) সম্বন্ধে এজরা পাউণ্ডের একটি কবিতা আছে। Ezra Pound-এর আলোচিত কবিতাটির নাম "The Study in Aesthetics."

সত্য। কিন্তু শিল্প-সৌন্দর্যবোধের বিষয়টি সর্বদা সরলরৈখিক বিভাজনে নিয়ন্ত্রিত হয় না। অতুলচন্দ্র 'উঁচু শ্রেণী' ও নিচু শ্রেণীর কথা বলেছেন। সমগ্র পৃথিবীতে বর্তমানে বিদ্যমান সমাজ সমূহে এই দুই শ্রেণীর অস্তিত্ব তর্কাতীত। কিন্তু বহুক্ষেত্রেই দেখা যাবে 'নিচু শ্রেণী'র মানুষই তার অপূর্ণ ইচ্ছাপূরণের বাসনায় তার কাছে অলীক, মায়াময় 'উঁচু শ্রেণী'র জীবনের ছবিতে তন্ময়।

"রবীন্দ্রনাথ সৌন্দর্যবোধ সম্বন্ধে যে সমস্ত প্রবন্ধ লিখিয়াছেন তাহাতে বিনা প্রয়োজনের যে আনন্দ তাহাকেই সৌন্দর্যের স্বরূপ বলিয়া বর্ণনা করিয়াছেন। এই সত্যটি এতই সুগৃহীত যে, এ সম্বন্ধে বেশী আলোচনা করা অনাবশ্যক। সৌন্দর্য যে কেবলমাত্র প্রয়োজনবিহীন তাহা নহে, এক হিসাবে তাহা সত্যবিহীন ও ভালমন্দ মর্যাদাবিহীনও বটে। সাধারণত আমরা যাহাকে জ্ঞান বলি, যেমন বৃক্ষলতাদির জ্ঞান বা কোন বৈজ্ঞানিক সত্যের জ্ঞান, সৌন্দর্যের মধ্যে তাদৃশ কোনও জ্ঞান উদ্ভাসিত হয় না। ন্যায়-অন্যায় বলিতে যে ভালমন্দ আমরা বুঝি তাহাও সৌন্দর্যের মধ্যে উদ্ভাসিত হয় না অথচ কোনও জ্ঞান বা কোনও ন্যায়-অন্যায়বোধ যেরূপ স্বানুভব সৌন্দর্যবোধও সেইরূপ স্বতন্ত্রভাবে স্বানুভববেদ্য।...সৌন্দর্যের সহিত আনন্দ অত্যন্ত ঘনিষ্ঠভাবে সংশ্লিষ্ট, অথচ এ আনন্দ সাধারণ প্রয়োজনসিদ্ধির আনন্দ নয়।"[১১]— অতুলচন্দ্র কাব্যের একটি বস্তুসাপেক্ষ রূপের কথা ভেবেছিলেন, রবীন্দ্রনাথও সম্পূর্ণরূপে বাস্তবনিরপেক্ষ কাব্য সাহিত্য এবং তৎজাত সৌন্দর্যের কথা ভাবেননি, বরং বাস্তবের 'বর্ণভেদে'র মধ্যে যে সত্যটা 'প্রত্যক্ষের উপরেই' ভেসে বেড়াচ্ছে, তার সঙ্গে যে সত্য 'অপ্রত্যক্ষের মধ্যেই' ডুবে আছে— উভয় মিলে কাব্যের সত্যকে বোঝাতে চেয়েছেন।[১২] সুরেন্দ্রনাথ সৌন্দর্যকে a-moral নীতিসংসর্গহীন ভেবেছেন। কিন্তু, সমাজে প্রচল সবকিছুরই রূপের দুটি দিক আছে— একটি দুর্লভ চিত্রকলার ক্রেতা শুধু বিশুদ্ধ সৌন্দর্যের উপভোক্তা-পৃষ্ঠপোষক নন, একদিকে তাঁর সৌন্দর্যবোধের ব্যবহার-মূল্য (use-value) যেমন রয়েছে, শিল্পসম্পদটি নিজের অধিকারে আনার জন্য তাঁকে একটি সুনির্দিষ্ট পরিমাণে বিনিময়-মূল্যও (change value) দিতে হচ্ছে। সৌন্দর্যের বিশুদ্ধ স্রষ্টা হয়ে যান বিক্রেতা, শিল্প সাহিত্য রূপ পায় পণ্যে, রূপান্তরিত হয় পণ্যে। শিল্পীসাহিত্যিক যতক্ষণ সৃষ্টি করছিলেন, সৃষ্টির জন্য যে প্রয়োজনীয় শ্রম তিনি ব্যবহার করেছেন— তা তাঁর মেধা, মনন, হাত এবং মস্তিষ্কের সহযোগে কাগজ, কালি, কলম ধাতু, মাটি, পাথর— ইত্যাদি বাস্তব উপাদানের সহায়তায় সৃষ্টি হয়েও তা হয়ে উঠতে পারে অনুৎপাদক শ্রম (Unproductive labour)। মিলটন তাঁর *প্যারাডাইস লস্ট* কাব্যটি লিখেছিলেন, পেয়েছিলেন মাত্র পাঁচ পাউন্ড পরিমাণ অর্থ— মিলটন-এর এই শ্রম 'অনুৎপাদক শ্রম'। কিন্তু প্রকাশকের নির্দেশে বা তত্ত্বাবধান-পৃষ্ঠপোষকতায় দিস্তা দিস্তা সাহিত্য কারখানা-উৎপাদনের ধরনে যিনি লিখে যান, তাঁর 'শ্রম উৎপাদক শ্রম' (Productive labour)। একটি গুটিপোকা তার নিজের চারপাশে রেশম বোনে— এই বুনন তার স্বভাবের কাজ। মিলটনও গুটিপোকার মতো কবিস্বভাবের অনিবার্যতায় *প্যারাডাইস লস্ট* লিখেছিলেন এবং নিজের শ্রমের এই উৎপন্নটি পাঁচ পাউন্ডে বিক্রি করেছিলেন। একজন যখন নিজের জন্য গান বিক্রি করছে, নিজে গান গেয়ে পয়সা চাইছে, তখন তার শ্রম অনুৎপাদক শ্রম, কিন্তু কোনো প্রযোজক বা কোম্পানির উদ্যোগপতির ব্যবস্থায় টাকা করার জন্যে যখন সে গান গাইছে, তখন তা উৎপাদক শ্রমের অন্তর্ভুক্ত— যদি লক্ষ্য হয় মূলধন বাড়ানো—তা উৎপাদক শ্রম।[১৩] উৎপাদক শ্রম শিল্প-সাহিত্যের ক্ষেত্রে শিল্পী-সাহিত্যিকের শিল্পের বাজারে মূলধন বাড়ানোর ক্ষমতার নির্দেশক। রবীন্দ্রনাথ তাঁর সমগ্র উপন্যাসগুলি রচনায় যে শ্রম করেছিলেন তা অনুৎপাদক শ্রম, কিন্তু প্রতিষ্ঠান যখন তাঁর

সৃষ্টিকে বাজারজাত করল, তখন তা উৎপাদক শ্রমের নমুনা হয়ে গেল। রবীন্দ্রনাথের জীবৎকালেই বেশ কয়েকজন কথাসাহিত্যিকের, বাংলা সাহিত্যের ক্ষেত্রে, জনপ্রিয়তা তথা বিক্রি রবীন্দ্রনাথের বহু উপন্যাসের চেয়ে বেশি ছিল। সেই সব উৎপাদক-শ্রমে সৃষ্ট কথাসাহিত্য সে-সময়ে বইবাজারের মূলধন গঠনের ঐতিহাসিক ভূমিকা পালন করে অবসিত হয়েছে। শিল্প-সাহিত্যের ক্ষেত্রে মরণোত্তর খ্যাতি লাভের বহু উদাহরণ রয়েছে। কিন্তু জীবৎকালে তাঁর শিল্পসৃজন অনুৎপাদক শ্রমেই সীমাবদ্ধ থেকেছে— শিল্পীকে কোনো বস্তুগত স্বাচ্ছন্দ্য বা নিরাপত্তা দেয় নি। শিল্পী-সাহিত্যিকের সৃজনশীলতা, প্রতিভা এবং জনপ্রিয়তা অধিকাংশ ক্ষেত্রেই সমার্থক নয়।

যে-কোনো উৎপাদন শুধু আমাদের চাহিদা পূরণের উপাদান (material) জোগায় না, একই সঙ্গে সেই উপাদানের চাহিদাও সৃষ্টি করে। উৎপাদন আদিম মৌলিক অসংস্কৃত এবং তাৎক্ষণিক ভোগের থেকে বেরিয়ে এল। এই অবস্থা বেশ কিছুদিন বহালও ছিল, যেহেতু উৎপাদন তখনও ছিল আদিম অসংস্কৃত,— বিষয়ের (Object) ইচ্ছেতেই যেন উৎপাদন হল। বিষয়ের জন্য চাহিদার প্রয়োজনীয়তা উপলব্ধি বিষয়ীর ইন্দ্রিয়চেতনার দ্বারা আবিষ্ট হল। একটি শিল্পবস্তু এমন জনগোষ্ঠী সৃষ্টি করে, যারা শিল্পকে আস্বাদ করতে ও সৌন্দর্যকে উপভোগ করতে সক্ষম। শিল্পসৃষ্টি শুধু শিল্পবোদ্ধার জন্য একটি শৈল্পিক বিষয় বা শিল্পবস্তুই সৃষ্টি করে না, শিল্প-বিষয়ের জন্যও বিষয়ী (subject) তথা শিল্পবোদ্ধাদের সৃষ্টি করে।[১৪]

মানবের হাত শুধু শ্রমের জন্য ব্যবহার্য প্রত্যঙ্গ নয়, শ্রম থেকেই মানুষের হাতের এই বিকাশ— শ্রমের জটিল কর্মকাণ্ডের মধ্যে দিয়েই মানবের হাত অতি উঁচু স্তরের উৎকর্ষে উপনীত হয়েছে। যে মানবিক হাত র‍্যাফায়েল (১৪৮৩-১৫২০)-এর মতো চিত্রশিল্পী, পেগানিনির (১৭৮২-১৮৪০) মতো একজন বেহালাবাদক ও সুরকারের সৃষ্টি করেছে।[১৫]

সৌন্দর্যের সূত্রগুলি (Laws of Beauty) অনুসরণ করতে পারলেই সৌন্দর্য উপভোগের প্রয়াস সম্ভব। অবশ্য সৌন্দর্য-উপভোক্তার রুচি ও ঐতিহ্যের উপর নির্ভরশীল। রুচি ব্যক্তির নিজস্ব অর্জন। সৌন্দর্যের ঐতিহ্য গোষ্ঠীর চেতন-অবচেতনের দীর্ঘকালব্যাপী ক্ষয়-বিলয়ের অবশেষে সঞ্চিত রিক্থ, যা উক্ত গোষ্ঠীভুক্ত ব্যক্তিতে অর্শায়। কিন্তু সৌন্দর্যের লক্ষণ বিচারে নানা মত প্রাপ্তব্য। ভারতীয় অলংকারশাস্ত্রের মত বিচারে বিষ্ণুপদ ভট্টাচার্য লিখেছেন, "সৌন্দর্যমলংকারঃ।—কাব্য অলংকারবশতই গ্রহণীয় হইয়া থাকে, এবং সৌন্দর্যই অলংকার— কিন্তু সৌন্দর্যের লক্ষণ কি? সৌন্দর্য (beauty) এমন এক প্রকার তত্ত্ব যাহাকে কোনও রূপ সুস্পষ্ট লক্ষণের দ্বারা চিহ্নিত করা অত্যন্ত দুরূহ ব্যাপার। সৌন্দর্য দেশভেদে কালভেদে অবস্থাভেদে রুচিভেদে বিভিন্ন প্রকৃতি ধারণ করে। সৌন্দর্যের কোনও শাশ্বত স্বরূপ নির্দেশ করা একরূপ অসম্ভব বলিলেই চলে।"[১৬]

এ-বিষয়ে প্লেখানভ-এর উক্তি প্রাসঙ্গিক "...an absolute criterion of beauty, there is no such criterion. Everything is in movement, everything is changing. And men's conception of beauty change too...Men's conception of beauty undoubtedly change in the course of history. But while there is no absolute criterion of beauty, and while all criteria are relative, this is far from implying that we have no objective possibility of judging whether or not a given artistic conception is well realised. ...The more the realisation of a concept— or to put it in more general terms— the more the form of a work of art corresponds to its idea, the more successful it is. There is your objective

criterion. ...When Leonardo da Vinci drew an old man with a beard, for example it did turn out an old man with a beard. And how well he succeeded ! ...To draw an old man with a beard beautifully does not mean to draw something which is beautiful, i.e. a handsome old man. The field of art is far wider than the sphere of 'the beautiful'. The criterion I have given, that of the correspondence of the form to the idea, may be used with equal facility throughout this broad field."[১৭] বোসাঙ্কি-র মতে সমস্ত সুন্দরই ইন্দ্রিয়গত বা কল্পনার (All beauty is in perception or imagination) । যখন প্রকৃতি ও শিল্পের মধ্যে সৌন্দর্যের এলাকাটির পার্থক্য দেখাতে চাই তখন মানবিক ইন্দ্রিয়গ্রাহ্যতা থেকে সৌন্দর্যকে স্বতন্ত্র স্বাধীনভাবে দেখি না। অচেতনভাবে হলেও সৌন্দর্যতাত্ত্বিক সমাজদায়িত্বের এক স্বাভাবিক বা গড়পড়তা ক্ষমতার দ্বারা প্রাকৃতিক সৌন্দর্যের ধারণা আমরা পেয়ে থাকি। কিন্তু যদিও প্রকৃতি ও শিল্প—উভয়ই মানুষের ইন্দ্রিয় বা কল্পনার মাধ্যমে অনুভববেদ্য, কিন্তু প্রকৃতি ও শিল্পের মধ্যে পার্থক্য রয়েছে। প্রাকৃতিক সৌন্দর্য অচিরস্থায়ী, সাধারণভাবে উপস্থিত বা গড় মানুষের ভাবনাজাত, কিন্তু শিল্পের সৌন্দর্য, বোসাঙ্কি-র মতে স্থির এবং প্রতিভার উচ্চতর স্বজ্ঞায় সৃষ্ট, যে প্রতিভা নিদর্শন সৃষ্টি করতে পারে ও ব্যাখ্যা করতে পারে।[১৮] কিন্তু এ প্রসঙ্গে মানুষের সংবেদন বা বাস্তবকে পরিবর্তনের কথা বোসাঙ্কি বলেন নি। এবং স্বজ্ঞা বা intuition-এর ওপর জোর দেওয়ায় শিল্পীর সামাজিক সত্তাটি যথার্থ গুরুত্ব পায় না।

সান্টায়ানা সৌন্দর্যকে সংজ্ঞায়িত করতে চেয়েছেন, "...beauty is value postive, inrtinsic and objectified,...Beauty is pleasure regarded as the quality of a thing...it is an emotion, an affection of our volitional and appreciative nature. An object cannot be beautiful if it can give pleasure to nobody : a beauty to which all men were, forever indifferent is a contradiction in terms."[১৯]

সান্টায়ানা-র বক্তব্যে সৌন্দর্যের বিষয়গত (objectified) ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য বস্তুরূপের স্বীকৃতি রয়েছে।

বাঙালি দর্শনবেত্তা ভাববাদী দর্শনের দৃষ্টিভঙ্গি থেকে শিল্প বিচার করেছেন, তিনি লিখেছেন, "রূপ কখনো আকার বা আকৃতি, কখনো প্রকার বা জাতি অর্থে ব্যবহৃত। দৃশ্য বা অদৃশ্য সব কিছুরই একটি বা একাধিক রূপ আছে। রূপ-এর নিকটতম ইংরেজি প্রতিশব্দ 'ফর্ম'। রূপ কখনো ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য, কখনো বুদ্ধিগ্রাহ্য। অধিকাংশ সময়ে রূপ উভয় বৃত্তিগ্রাহ্য; শিল্পকর্মের ক্ষেত্রে তো বটেই। রূপের ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য দিকটি শিল্পবস্তুর মুখ্যত বিষয়সত্তাকেই প্রকাশ করে এবং গৌণত তার অর্থের, তাৎপর্যের বা ব্যঞ্জনার দিকটিকে অস্ফুটভাবে প্রকাশ করে। বস্তুত দুটি দিক একই সঙ্গে আমাদের মনের কাছে উপস্থিত হয়।"[২০] এবং সৌন্দর্য রুচি ও ঐতিহ্যের দ্বারা প্রবর্তনা পায়। রুচি ব্যক্তিগত, একক মানুষের স্বভাবের অন্তর্গত হয়েও ঐতিহ্যের দ্বারা সীমায়িত। ঐতিহ্য অবস্থাবিশেষে উভয়ত ধনাত্মক ও ঋণাত্মক হতে পারে—ঐতিহ্যের আধারেই শিল্পরূপের বিভিন্ন রূপগুলি (Forms) গড়ে ওঠে। আবার স্থিতিবাদের দিক থেকে ঐতিহ্যের বন্ধনের আবশ্যকতার ওপর গুরুত্ব আরোপ বেশি করে করা হয়। ফলে নিরন্তর গতির চলিষ্ণুতার পথে তা বাধা হয়ে দাঁড়ায়। একই শিল্পরূপের ইতিহাসে তাই বারে বারে ঐতিহ্য ভাঙার প্রয়াসও দেখা যায়। সৃষ্টি হয় একটা এলোমেলো বিশৃঙ্খলা, যা সৃষ্টিরই পূর্ব শর্ত।

শিল্পীর কাছে সত্য বা সুন্দর কোনো প্রবর্তনা (persuasion) বা শুধু প্রতীতি নয়, বরং শিল্পের মধ্যে সত্য বা সুন্দরকে রূপায়ণ শিল্পীর কাজের সৃষ্টির পথপ্রদর্শক। প্রবর্তনা পথ দেখায় না, তা সৃষ্টিকর্মে প্রবর্তনা দিতে পারে, শিল্পের হয়ে ওঠা বা ভিন্নভাবে গড়ার জন্যে চাপ তৈরি করতে পারে। বিজ্ঞান ও শিল্পকলাকে ভাষার দুটি মেরু বলে গণ্য করলে, ভাষার অন্যতম কাজ হল প্রবর্তনা। আমাদের আবেগসমূহের বিন্যাসের সামাজিক বিশ্বজনীনতার তীব্র হৃদয়দ্রাবী সংবেদনাই সৌন্দর্য।[২১] সুতরাং, শিল্পীর কাছে সৌন্দর্য শুধু কতকগুলি বিমূর্ত আকার বা ব্যাখ্যা নয়। বরং প্রকৃতি ও মানবকে হৃদয়ঙ্গম করে, শিল্প-মাধ্যমে প্রকৃতি ও মানব—উভয়কেই পরিবর্তিত করা। শিল্পীর এই স্ব-ক্ষমতার দিকটিই প্রকাশিত ক্লাইভ বেল-এর কথায়, "For art is the one religion that is always shaping its form to fit the spirit, the one religion that will never for long be fettered in dogmas. It is a religion without priesthood ; and it is well that the new spirit should not be committed to the hands of priest. The new spirit is in the hands of artists ; that is well"[২২] এই চৈতন্য বা প্রাণসত্তাকে (spirit) মার্কসই সর্বপ্রথম স্পষ্ট ধারণায় সূত্রাবদ্ধ করলেন। প্রাণসত্তাগত মূল্যসমূহ (spiritnual values) আসলে রাজনৈতিক হাতিয়ার। প্রতিটি চৈতন্যগত সৃষ্টি, প্রতিটি বৈজ্ঞানিক ধারণা, বাস্তবের প্রতিটি চিত্রায়ণ সত্যের একটি বিশেষ দিক থেকেই প্রাপ্ত হওয়া যায়, সামাজিক স্বার্থের একটি প্রেক্ষিত থেকেই দেখা সম্ভব। এবং সেকারণেই তা সীমাবদ্ধ ও বিকৃত।[২৩] শিল্প সাহিত্যে 'বাস্তববাদ' (Realism) 'সিভিল' সমাজের এই সীমাবদ্ধতা ও রাজনৈতিক উদ্দেশ্যে শিল্পসাহিত্যকে বিকৃতরূপ দেওয়ার বিরুদ্ধতা করেছিল। এঙ্গেলস মনে করেছিলেন, বাস্তববাদ বলতে সূক্ষ্ম বিবরণগত যথার্থতা ছাড়াও বিশেষ অবস্থার মধ্যে প্রতিভূ স্থানীয় চরিত্রগুলি যথাযথ সৃষ্টি করা। শিল্পীর চৈতন্যের অবস্থান তার শ্রেণি অবস্থানের সঙ্গে নাও মিলতে পারে। যে শিল্পীর বড়ো সার্থক বাস্তবধর্মী শিল্পীমন আছে, তিনি শ্রেণি সমাজের খণ্ডিত চৈতন্যকে অতিক্রম করে যেতে পারেন। এঙ্গেলস সেই শৈল্পিক ক্ষমতা দেখেছিলেন বালজাক-এর মধ্যে।[২৪] আপন কাল-সহ আগামী কালের মানুষগুলিকেও দেখতে পাওয়ার ক্ষমতার মধ্যেই শিল্পীর বাস্তববোধের পরিচয় নিহিত থাকে। তারাশঙ্কর-এর একাধিক গল্পে-উপন্যাসেও আমরা এই শৈল্পিক বাস্তবতার প্রকাশ দেখি। তাই, লেখকের মতামত যতই চাপা থাকে, শিল্পকৃতির দিক থেকে ততই ভালো। সে বাস্তবতা, লেখকের মতামত যাই হোক না কেন— তবুও আত্মপ্রকাশ করতে পারে। ["The more the opinions of the author remain hidden, the better for the work of art. The realism I allude to may crop out even in spite of author's opinion—Engels"]

যে-কোনো শিল্প বাস্তববাদী হয়েও তা বস্তু বা বাস্তবের শুধু অনুকরণ নয়। শিল্পীর প্রেক্ষণ ও সৃজনশীল কর্ম বাস্তবের রূপায়ণকে শৈল্পিক সৃজনসূত্রে স্বশাসিত, autonomus করে তোলে। উপকরণ হিসেবে প্রকৃতি ও সমাজ থেকেই শিল্পের রসদ শিল্পীর কাছে আসে। শিল্পের একটি বড়ো ক্ষেত্র হল মানুষ, নরনারী। বহু ক্ষেত্রে নারীর সৌন্দর্য। নরনারীর দৈহিক রূপের প্রতি পারস্পরিক আকর্ষণ তার প্রবৃত্তির অন্তর্গত। কিন্তু যে-কোনো জৈব সৌন্দর্য, যা প্রত্যক্ষ, তা অচিরস্থায়ী—-উপন্যাসে বর্ণিত কোনো সুন্দরী নায়িকা সেক্ষেত্রে চিরস্থায়ী এবং শিল্পী যখন মানবকে নিয়ে সুন্দর বা সুন্দরী রূপে ফুটিয়ে তোলেন, তখন সেই মানব বা মানবী আদর্শের (model) কালে কালে ক্ষয়-লয়-বিলয়ের ঊর্ধ্বে। কোনো শিল্পীর হাতে যে অ-সাধারণ সুন্দরীর

পোর্ট্রেট আঁকা হয়, কালে কালে সে-নারী জরাগ্রস্ত গতাসু।* নরনারীর মিলনের ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য তাৎক্ষণিক আনন্দ যখন ভাস্কর্যে প্রতিফলিত তা এক চিরস্থায়ী বৌদ্ধিক আনন্দের উৎস হয়ে উঠতে পারে।** "লোলচর্ম বৃদ্ধা ইন্দির ঠাকরুণ তাঁর সমস্ত মানবিক সংবেদন নিয়ে উপন্যাসে চলচ্চিত্রে চিরস্থায়ী রূপে থেকে যান। প্রতিটি মানুষ একাধারে ব্যক্তি এবং প্রজাতি বা গোষ্ঠীর প্রতিভূ। শিল্পী যখন মানব-সৌন্দর্য ফোটাতে চান তখন তাঁর কালে স্থিত সমাজবাস্তবের গোষ্ঠীগত সৌন্দর্যের 'ভাষা'র সারাৎসারকেই ফুটিয়ে তুলতে পারলেই তা চিরস্থায়ী হয়ে ওঠে।

সিভিল সোসাইটি, তা নাগরিক সমাজ বা সুশীল সমাজ— যে অভিধায় পরিচিত হোক, সিভিল সমাজ নতুন মানবসমাজ ('human society or socialised humanity') নয়। সেখানে বাস্তব মানব-প্রজাতি শাসক-শাসিত, শোষক-শোষিতে ভাগ হয়ে গেছে। অবাধ বাণিজ্যিক (laissez faire) প্রতিযোগিতা সব কিছুকেই পণ্যে পরিণত করে। রাষ্ট্র তার ক্ষমতা সুদৃঢ় করার জন্যে মতাদর্শের সমগ্র উপরিকাঠামোটিকে ব্যবহার করতে চায়। কিন্তু সব কিছুর মধ্যেই অন্তর্নিহিত বিরোধের দ্বান্দ্বিকতায় স্থিতাবস্থার প্রতিবাদী রূপও অবয়ব লাভ করে। বস্তুল, ধনতান্ত্রিক শ্রেণি-আধিপত্য দুর্বলতর জাতি-গোষ্ঠীকে ছোটো করে দেখাতে চায়। গল্পে উপন্যাসে চিত্রায়ণের ক্ষেত্রেও বিজয়ী জাতি বুদ্ধিতে, চেতনায় শ্রেষ্ঠতর বলে চিত্রিত হয় এবং একই ভাবে প্রতিযোগিতা ও ক্ষমতায়নের মাৎস্যন্যায়ে বেশি শক্তিধর তুলনামূলকভাবে অবস্থিত দুর্বলের ওপর আধিপত্যবাদী হয়ে ওঠে—মানব সমাজের সামগ্রিকতার অর্ধেক যে নারী— তাকেও শুধু দুর্বল, ভোগ্য ও সন্তান-উৎপাদক হিসেবে চিত্রিত হতে দেখি। যা কেবল ব্যক্তিগত, তার ওপরেই পবিত্রতার মোহর এঁকে দেওয়া হয়। ব্যক্তিগত সম্পত্তির অলঙ্ঘ্য পবিত্রতার ধারণার সঙ্গেই আসে নারীকে সম্পত্তি হিসেবে দেখার প্রবণতা। সম্পদ ও সম্পত্তি ঘটিত বিরোধ থেকে সংঘটিত হয় অসংখ্য ধরনের অপরাধ— তৈরি হয় 'অপরাধ-আশ্রয়ী সাহিত্য', অপরাধ জগতের ভাষা। কিন্তু, এতৎসত্ত্বেও যে-সব শিল্পীর সংবেদনা বাস্তববোধে আজ ও আগামীকে উপলব্ধি করে সৃজনের কর্মকাণ্ড চালিয়ে যেতে পারেন, তাঁরাই শোষক-শোষিতে বিচ্ছিন্ন মানবতার নকল সীমান্ত অগ্রাহ্য করে গড়ে তোলেন এক একটি স্থায়ী সৌন্দর্যের রূপ— দামিনীতে, শ্রীবিলাসে, এলায়।

১৯১৭-র নভেম্বরে লেনিন বলশেভিক পার্টির নামে রাশিয়ার রাষ্ট্রক্ষমতা কার্যত বিনা রক্তপাতে হাতে তুলে নিলেন। রয়টার খবর দিয়েছিল জারকে সরিয়ে বলশেভিকদের ক্ষমতা দখল পর্যন্ত মাত্র একজনের মৃত্যু হয়েছিল।[২৫] কিন্তু, গৃহযুদ্ধ ও বাইরের আক্রমণ, 'নিউ ইকনমিক পলিসি' ধীরে ধীরে লেনিনীয় রাষ্ট্রব্যবস্থাকে জাতি-রাষ্ট্রের (national state) দিকে ঠেলে দিয়েছিল— যে লেনিন প্রথম বিশ্বযুদ্ধে জাতি-রাষ্ট্রকে সহায়তা না দিতে প্রলেতারিয়েতদের ডাক দিয়েছিলেন ও তৃতীয় আন্তর্জাতিক গড়ে তুলেছিলেন! দুনিয়া-কাঁপানো দশদিনের উত্তেজিত উদ্দীপনার দিনগুলিতে বলশেভিক পার্টি ও প্রলেতারিয়েত শ্রেণির সমীকরণ ঘটেছে বলে ভাবা হল। সোভিয়েত রাষ্ট্রের উপর ভেতর ও বাইরে থেকে সশস্ত্র ও মতাদর্শগত চাপ শোষিত শ্রেণির ওপরে আঘাত বলে মনে করা হল, রাষ্ট্রের নেতৃত্বে লেখক-শিল্পীদের সংঘবদ্ধ করা হল— প্রথমে প্রলেট-কাল্ট, পরে ১৯৩৪ সালে সমাজতান্ত্রিক বাস্তবতার (socialist realism)

* অতুল বসু অঙ্কিত রাণু মুখোপাধ্যায়ের পোর্ট্রেট স্মরণ করা যেতে পারে।

** পাথর মৈথুনে অপারগ। খাজুরাহর ভাস্কর্য দেখে বৌদ্ধিক নয়, যারা শরীরী উত্তেজনা বোধ করে, তারা চিকিৎস্য,— কীটপতঙ্গ পশুপাখির মিলনও তাদের উত্তেজিত করতে পারে।

কথা বলা হল।[২৬] শ্রমজীবী মানুষের কথা বলতে গিয়ে অ্যাজিট-প্রপ (agitation-propaganda)-এর ক্ষেত্র হিসেবে সাহিত্যকে দেখতে চাওয়া হল। অথচ সাহিত্যের ক্ষেত্রে, কাব্যের ক্ষেত্রে, কিছু কবি-সাহিত্যিক এই নতুন পরিবর্তনকে প্রায় প্রথম থেকেই মেনে নিতে পারেননি। যেমন কবি আন্না আখমাতোভা ১৯১৯ সালে সোভিয়েত দেশে থেকেই লিখলেন :

Why is this Age worse...?

Why is this age worse than earlier ages?
In a stupor of grief and dread
have we not fingered the foulest wounds
and left them unhealed by our hands?

In the west the falling light still glows
and the clustered housetops glitter in the sun,
but here Death is already chalking the doors with crosses,
and calling the ravens, and the ravens are flying in.
[Anna Akhmatova, *Selected Pomes*, 1992, Harvill]

১৯১৯ সালের রাশিয়ায় উদ্দীপনাময় কর্মকাণ্ডের মধ্যে আখমাতোভা পশ্চিম ইউরোপকে সূর্যালোকে ঝকমক করতে দেখেন এবং সেই সময়ের রাশিয়ায় ক্ষুধার্ত কুচকুচে দাঁড়কাক উড়তে দেখেন। পশ্চিম ইউরোপে-ও টি.এস. এলিঅট-এর মতো কবি তাঁর বিখ্যাত 'The Waste Land' কবিতায় লিখলেন—

There is not even solitude in the mountains
But red sullen faces sneer and snarl
From the door of mudcracked houses...
Who are those hooded hordes swarming
Over endless plains, stumbling in cracked earth
Ringed by the flat horizon only
What is the city over the mountains
Cracks and reforms and bursts in the violetair
[The Waste Land : sec v, 'What the Thunder said,' pp.72-73
The Complete Poems and Plays, T.S. Eliot Faber, 1982]

এবং এই কবিতার কবিকৃত টীকায় এলিঅট এই কাব্য পঙ্‌ক্তিগুলিতে পূর্ব ইওরোপ তথা রুশ বিপ্লবের বিশৃঙ্খলার (chaos) কথাই বললেন।[২৭] 'The Waste Land' রচিত হল ১৯২১ সালের শেষ থেকে ১৯২২ সালের বসন্তকালে এবং The Criterion পত্রিকায় ১৯২২ সালের অক্টোবর মাসে প্রকাশিত হয়।

আন্তর্জাতিক ভাবে 'The Waste Land' এলিঅট-কে কবি হিসেবে সাফল্যের শিখরে পৌঁছে দিয়েছিল। কিন্তু আখমাতোভা-র কবিতাটি এবং এলিঅটে-র উদ্ধৃত কাব্য পঙ্‌ক্তিগুলি কাব্য-ব্যঞ্জনার চেয়ে বক্তব্যে সোচ্চার। ১৯৩৪ সালের অনুষ্ঠিত সোভিয়েত লেখক সম্মেলনে রাডেক এলিঅট-এর এবং ঝানভ আখমাতোভা-র সমালোচনা করেন। রুশ বিপ্লব ইউরোপ তথা সমগ্র পৃথিবীর বুদ্ধিজীবী শিল্পী-সাহিত্যিকদের মধ্যে বিপ্লবের পক্ষে বিপক্ষে এক স্পষ্ট বিভাজন-রেখা টেনে দিয়েছিল এবং সেই বিভাজনরেখার একপারে প্রগতিপন্থীরা অনেকেই

এঙ্গেলস-এর "Realism, to my mind, implies, besides truth of detail, the truthful reproduction of typical characters under typical circumstances...The more the opinions of the authors remain hidden, the better for the work of art."[২৮] কথাগুলি স্মরণে রাখেননি বা সাহিত্য শিল্পে বাস্তবায়িত করতে পারেননি, লেখকের মতামত চাপা থাকার (remain hiddin) শিল্পোৎকর্ষের বিষয়টি বিস্মৃত হয়েছিলেন।

কিন্তু সকলেই যে বিষয়টি বিস্মৃত হয়েছিলেন, তা নয়। পূর্বোক্ত ১৯৩৪ সালের রুশ লেখক সম্মেলনে নিকোলাই বুখারিন তাঁর বক্তৃতায় বলেন, "...it is obviously necessary somehow to differentiate the special properties of poetic speech, of poetic language and of the corresponding poetic thought, because thought is firmly and indissolubly linked up with language. Ancient Hindu poetics had already developed the Anandavardhana doctrine (tenth century B. C.) of the twofold, 'hidden' meaning of poetic speech. According to this doctrine, language in which words are used solely and exclusively in their direct, 'customary' sense cannot be called poetic speech whatever such speech may convey, it will be prose..Only when the words, by various associations evoke other 'picture, images, feelings', when 'poetic thoughts glimmer, radiate as it were, through the words of the poet, but are not expressed directly by him', do we have authentic poetry such is the doctrine of the 'dhvana',* of the poetic innuendo of the hidden meaning of poetic speech."[২৯]— কাব্যের সাহিত্যের শিল্পের ভাবপ্রকাশে এই "hidden meaning" তথা ব্যঞ্জনার গুরুত্ব শিল্প-প্রবক্তারা সাধারণ ভাবে বুঝতে চান নি। বিশেষ করে স্পেন-এর গৃহযুদ্ধের মধ্যে দিয়ে দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের সমাগত মুহূর্তে সমগ্র ইউরোপ-এর সাহিত্যেও শিল্পভাবনায় আসে জটিলতা, বিষয় ও আঙ্গিকে নানা নিরীক্ষা, প্রকাশে নানা দ্বিধা, তাৎক্ষণিকতা। সিভিল সমাজ নয়, মানব সমাজ সৃষ্টির প্রয়াসে স্পেন-এ আন্তর্জাতিক বাহিনীতে পৃথিবীর নানা দেশ থেকে আগত সচেতন গণতন্ত্রী ও কমিউনিস্টদের সমাবেশ ঘটেছিল। যথার্থ মানব সমাজ গঠনের প্রয়াসকে বাস্তবায়িত করতে গিয়ে বহু মানুষের মতো প্রাণ উৎসর্গ করেন ক্রিস্টোফার কডওয়েল। এবং স্পেন-এ গণতন্ত্রের জন্যে যুদ্ধে যাবার আগে তাঁর গুরুত্বপূর্ণ রচনাগুলির মধ্যে লিখিত হয়েছিল 'Beauty' নামে প্রবন্ধ, যার উপশিরোনাম ছিল 'A Study in Bourgeois Aesthetics'— সে প্রবন্ধ কডওয়েল এই ভাবনায় শেষ করেছিলেন "In a society which is based on co-operation not on compulsion, and which is conscious, not ignorant of, necessity, desires as well as cognitions can be socially manipulated as part of the social process. Beauty will then return again, to enter consciously into every part of the social process. It is not a dream that labour will no longer be ugly, and the products of labour once again beautiful."[৩০]

স্পেন-এর গৃহযুদ্ধের সঙ্গেই ইউরোপ-এ ফ্যাসিবাদের উত্থানে রাশিয়াকেও, জোন রবিনসন-এর ভাষায়, 'revolutionary-administration'-কেও বাধ্য করল শুধু রাজনৈতিক ক্ষেত্রে

* অতুলচন্দ্র গুপ্ত লিখেছেন "আনন্দবর্ধন সম্ভবত খ্রীষ্টীয় নবম শতকের মধ্যভাগের লোক।" *কাব্যজিজ্ঞাসা*, পৃ. ৪। এবং শব্দটি 'dhvana' মুদ্রণের ভুল মনে হয়, হবে 'dhvani' ধ্বনি।

নয়, অর্থনৈতিক ক্ষেত্র এবং অন্যান্য মতাদর্শের ক্ষেত্রেও জাতীয়তাবাদী ছাঁচে চলতে। শিল্প-সাহিত্যও শেষ বিচারে এই ছাঁচেই ঢালাই হতে থাকে। এবং যুদ্ধোত্তর পৃথিবীর চলতে থাকা বিশ্বব্যাপী সাম্রাজ্যবাদ বিরোধী আন্দোলন ও মুক্তিসংগ্রামগুলি অনিবার্যভাবে জাতীয়তাবাদের দিকে ঝুঁকতে থাকে, যা দেশে দেশে সিভিল সমাজ গড়ে ধনতন্ত্রের দিকে আগুয়ান। শুধু মার্কস-এর নয়, রোমা রোলাঁ, রবীন্দ্রনাথের কাঙ্ক্ষিত জাতীয়তাবাদী নয়, আন্তর্জাতিকতাবাদী মানবসমাজ এবং সেই সমাজের সৌন্দর্যতত্ত্ব অপেক্ষিত এখনও।

তথ্যসূত্র :

১. Robinson, Joan : *Economic Philosophy,* p. 117.
২. "The standpoint of the old materialism is 'civil' society, the standpoint of the new is human society or socialised humanity." Marx, 'Theses on Feuerbach,'– *The Basic Writings on Politics and Philosophy,* K. Marx and F. Engels Ed : L. S. Feuer. p. 245.
৩. "The philosophers have only interpreted the world, in various ways ; the point, however, is to change it." Marx : *Theess on Feuerbach XI.*
৪. Marx-Engels : *Collected Works,* Vol-3, pp. 302-03.
৫. K. Marx, *A Contribution to the Critique of Political Economy,* p. 197.
৬. K. Marx, *A Contribution to the Critique of Political Economy* p. 21.
৭. K. Marx : *The Economic & Philosophic Manuscripts of 1844,* Ed : Dirk J. Struik, pp. 113-114
৮. অতুলচন্দ্র গুপ্ত : *কাব্যজিজ্ঞাসা,* পৃ: ৬৮।
৯. অতুলচন্দ্র গুপ্ত : *কাব্যজিজ্ঞাসা,* পৃ. ৭৫।
১০. অতুলচন্দ্র গুপ্ত : *কাব্যজিজ্ঞাসা,* পৃ. ৭৭।
১১. সুরেন্দ্রনাথ দাশগুপ্ত : *সৌন্দর্য্যতত্ত্ব,* পৃ. ৫-৬।
১২. রবীন্দ্রনাথ : সৌন্দর্যবোধ, *সাহিত্য,* পৃ. ৩৬।
১৩. Marx, Karl : *Theories of Surplus Value,* pt I, p. 401
১৪. Marx, Karl : *A Contribution to the Critique* of *Political Economy* p. 197
১৫. Engels. F : *Dialectics of Nature,* p. 171-172.
১৬. বিষ্ণুপদ ভট্টাচার্য, *কাব্যমীমাংসা,* পৃ. ২৭
১৭. Plekhanov, G.V. , *Art and Social Life,* pp. 240–242.
১৮. Bosanquet, Bernard : *A History of Aesthetic,* p.3.
১৯. Santayana, George : *The Sense of Beauty,* p.43.
২০. দেবীপ্রসাদ চট্টোপাধ্যায় : *রূপ, রস ও সুন্দর,* পৃ. ১৮৩।
২১. Caudwell, C. : *Illusion and Reality,* p. 157.
২২. Bell, Clive ; *Art,* p. 278.
২৩. House-, Arnold : *The Philosophy of Art History,* p. 7.
২৪. Engels to Margaret Harkness, April. 1888, Marx and Engels : *Selected Correspondence,* Moscow.

২৫. Hill, Christopher : *Lenin and the Russian Revolution.*

২৬. (A) 'Soviet Writers' Congress, 1934. *The Debate on Socialist Realism and Modernism.* Gorky, Radek, Bukharin, Zinoviev and Others, 1977, Lawrence And wishart. London.

(B) Zhdanov A.A. : *On Literature, Music and Philosophy,* 1950, Lawrence and Wishart, London.

২৭. Morton A. L . *The Matters of Britain,* T. S. Eliot, p. 155-166.

২৮. পূর্বোক্ত মার্গারেট হার্কনেসকে এঙ্গেলস-এর পত্র ১৮৮৮ সাল।

২৯. Bukharin, Nikolai : *Poetry, Poetics and the Problems of Poetry in the U.S.S.R. in the Soviet Writers' Congress.* 1934. p. 188, Lawrence and Wishart. London 1977.

৩০. Caudwell, Christopher, 'Beauty', *Further Studies in a Dying Culture,* P. 115, The Bodley Head, London. 1949.

মার্কসীয় সাহিত্যতত্ত্ব

রবিন পাল

এক অর্থে সাহিত্য আলোচনা সাহিত্য সৃজনেরই অংশ, দুটোই পরস্পরের প্রভাবে নবজন্ম লাভ করে। সাহিত্য আলোচনা করতে গিয়ে আমরা কোনো এক সাহিত্যের সংজ্ঞায়ন, শ্রেণি বিভাগ, ব্যাখ্যান, মূল্যায়নে নামি। তখন নানা তত্ত্ব আমাদের নানামুখী বিচারে প্রবৃত্ত করে। মনস্তাত্ত্বিক, নারীবাদী, ঐতিহাসিক, সাংস্কৃতিক, ঔপনিবেশিক, আবার, আঙ্গিকগত, গঠনগত, বিনির্মাণগত প্রভৃতি— বিচারের নানান ধাঁচ চলিত আছে। মার্কসীয় সাহিত্যতত্ত্ব তার মধ্যে একটি। অন্য সাহিত্য তত্ত্বের সঙ্গে মার্কসীয় সাহিত্যতত্ত্বের একটা বড়ো তফাত আছে। সেটি হল— মার্কসীয় তত্ত্ব সমাজ পরিবর্তন ও সে-সম্পর্কিত আন্দোলন এবং সাহিত্য রচনা দুটিকেই পরস্পর সম্পৃক্ত বলে মনে করে। অন্য সাহিত্যতত্ত্ব শুধু সাহিত্যের, মার্কসীয় সাহিত্যতত্ত্ব, রাজনীতি ও সাহিত্যের নীতি-প্রকৃতি নির্ধারণে প্রযুক্ত হয়। মার্কস এঙ্গেলস, লেনিন, স্ট্যালিন প্রমুখ ব্যক্তিত্ব মুখ্যত রাজনৈতিক আন্দোলনের নায়ক, সেই কাজের ফাঁকে ফাঁকে সাহিত্য সংস্কৃতি নিয়ে কিছু কম বেশি আলোচনা করে গেছেন। সেই অপেক্ষায় তাঁরা বলেছেন সাহিত্য দরকার সামাজিক কর্মে কারণ দ্বিতীয়টি ঢেউ তোলে প্রথমটিতে।

সে-কারণে মার্কসীয় সাহিত্যতত্ত্বের আলোচনার শুরুতে মার্কসীয় তত্ত্বের কিছু কথা বলে নিতে হবে। মার্কস বলেছিলেন : (ক) দার্শনিকরা বিশ্বজগৎকে নানা ভাবে ব্যাখ্যা করে গেছেন, এবার কিন্তু বিশ্বজগৎকে বদলাতে হবে। (খ) মানুষের চেতনা তার সত্তাকে নির্ধারণ করে না, বরং মানুষের সামাজিক সত্তাই তার চেতনাকে নির্ধারণ করে। (গ) মানুষের যাবতীয় মননগত, আদর্শগত প্রণালী হল বাস্তব সামাজিক ও অর্থনৈতিক অবস্থানের ফসল। এই তিনটি কথাই কিন্তু এঁদের মতে সামাজিক কার্যে, সাহিত্য সংস্কৃতি বিচারে ব্যবহার করার কথা। আরও দু-একটি কথা বলে নেওয়া দরকার। (ক) ভিত্তি ও উপরিসৌধের কথা— যুগে যুগে উৎপাদন ক্ষেত্রে মানুষে মানুষে সামাজিক সম্পর্কের ক্ষেত্রে থাকে একটা অর্থনৈতিক কাঠামো, যাকে বলা হয় ভিত্তি। যেমন, একটা কালে দাসের সঙ্গে প্রভুর ছিল এক ধরনের সামাজিক সম্পর্ক, যা হল সামন্ততান্ত্রিক কাঠামো, সেটাই সে যুগের ভিত্তি। এই অর্থনৈতিক কাঠামোর ভিত্তির উপরে গড়ে

ওঠে উপরিসৌধ। যেমন, সামন্ততান্ত্রিক অর্থনৈতিক কাঠামোর উপর ভিত্তি করে গড়ে ওঠে সামন্ততান্ত্রিক সাহিত্য, সংস্কৃতি, ধর্মীয়ভাবনা, নৈতিকতা। (খ) ভিত্তি ও উপরিসৌধের পরিবর্তনে অর্থনৈতিক উপাদানই একমাত্র নির্ধারক উপাদান। মার্কসীয় তত্ত্ব প্রণেতাদের অনেকে একসময় এ-কথায় বিশ্বাসী ছিলেন। কিন্তু অপেক্ষাকৃত আধুনিক কালে অনেক তাত্ত্বিক 'একমাত্র' কথায় আপত্তি তুলেছেন। (গ) সাহিত্য মাত্রেই মতাদর্শ-নির্ভর— প্লেখানভ এরকম মনে করতেন কিন্তু তাঁর আগেকার তাত্ত্বিক এঙ্গেলস মনে করতেন মতাদর্শের সঙ্গে রাজনৈতিক তত্ত্বের যেমন ঘনিষ্ঠ যোগ, যে তত্ত্ব শাসক-স্বার্থবাহী, শিল্পের ক্ষেত্রে ব্যাপারটা অতটা সোজা নয়, সেখানে মতাদর্শ ও শিল্পের সম্পর্ক বেশ জটিল। (ঘ) মার্ক্সবাদীরা মনে করে সাহিত্য মাত্রেই শ্রেণিসাহিত্য— সমাজ বিচারে শাসক ও শাসিত শ্রেণির সম্পর্ক যেমন জরুরি বিচার্য, সাহিত্য বিচারেও তা জরুরি। সেক্ষেত্রে লেখকের শ্রেণি অবস্থানটাও খেয়াল করা দরকার। এই হল মার্কসীয় সাহিত্যতত্ত্ব প্রসঙ্গের আলোচনার গোড়ার কথা।

এবার আমরা মার্কসীয় সাহিত্যতত্ত্ব বিকাশের ধারার মধ্যে যাব এবং প্রসঙ্গত প্রধান তাত্ত্বিকদের চিন্তাভাবনার সঙ্গে পরিচয় করব।

প্রথমে আসে মার্কস এবং এঙ্গেলস-এর কথা। এই দুজনের রাজনৈতিক এবং অর্থনৈতিক রচনার সংখ্যাই বেশি। তার মানে কিন্তু এই নয় সাহিত্য সংস্কৃতিকে তাঁরা তুচ্ছ মনে করতেন। মার্কস কিছু কবিতা এবং নাটক লিখেছেন। তিনি বিশ্বসাহিত্য যে পরিমাণ পাঠ করেছিলেন তার পরিমাপ করার চেষ্টা করেছেন কোনো কোনো পণ্ডিত (*Karl Marx and World Literature*, S. S. Prawer, Oxford University Press, 1977 এবং *Marx, Engels and the Poets*, P. Demetz, Chicago, 1967), তাতে বিস্মিত ও স্তম্ভিত হতে হয়। তাঁর ১৮৪২ সালের রচনা পড়লেই বোঝা যায় মার্কস রোমান্টিক ধ্যান-ধারণা থেকে মুক্তি পেতে সচেষ্ট। মর্কসীয় সাহিত্য সংস্কৃতি-বিষয়ক প্রশ্নে প্রথম গুরুত্বপূর্ণ কথাবার্তা এল ১৮৪৪ সালে লেখা *Economic and Philosophical Manuscripts* বইটির সময় থেকে। এই বইতে তিনি হেগেলীয় আদর্শবাদ থেকে সরে এলেন ফয়েরবাখ-কথিত মানবতাভিত্তিক বাস্তববাদে। এখানেই বলা হল— মানব-সমাজ এবং মানব-চেতনার মূল ব্যাপারগুলি মানব সক্রিয়তা থেকেই আসে, মানব সমাজের বাইরের কোনো কিছু থেকে নয়। বলা হল সৌন্দর্যবোধ, শিল্পপ্রয়াস এই দুটি ব্যাপার মানুষকে অন্য প্রাণীদের থেকে পৃথক করে দিয়েছে। মার্কস প্রসঙ্গত বলেন (শেকসপিয়র এবং গ্যেটের উদ্ধৃতি দিয়ে) পঞ্চেন্দ্রিয়ের বিকাশ মুদ্রা প্রাধান্যের মধ্যে সম্ভব নয়। ১৮৪৪-এই এঙ্গেলস্ Rapid progress of Communism in Germany প্রবন্ধে Hubner অঙ্কিত The Silesian Weavers ছবিটি নিয়ে আলোচনা প্রসঙ্গে বললেন কয়েকশো পুস্তিকার থেকে এমন ছবি বরং মানুষকে বেশিমাত্রায় সঠিকভাবে উদ্‌বুদ্ধ করতে পারে। ১৮৪৫-এ মার্কস ও এঙ্গেলস-এর যৌথ রচনা *The Holy Family*-তে একটি সাহিত্য-আলোচনাও ছিল, যাতে Eugene Sue রচিত *Mysteries of Paris* নামে একটি উপন্যাসে নিম্নবর্গীয় মানুষের চিত্রের আলোচনা ছিল। তাতে দুজনে বললেন ঔপন্যাসিক এবং তার আলোচনা বুর্জোয়া রোমান্টিকতার দ্বারা চালিত হয়ে এই মেলোড্রামাটিক উপন্যাসের বাস্তবতাকে নিয়ন্ত্রণ করেছে। তাঁরা দেখান উপন্যাসের নায়ক রুডলফ বুর্জোয়া নৈতিকতা-প্রাণিত, সে আইনি জগতে তর্ক চালাচ্ছে শাস্তির পরিবর্তে শাস্তির প্রণালী নিয়ে। *The Holy Family* অবশ্য তর্কপ্রিয় রাজনৈতিক বই, নন্দনতত্ত্বের বই নয়। তবে প্রসঙ্গত এখানে শিল্প এবং কর্তৃত্বকারী আদর্শের সম্পর্কের কথা আছে, যা মার্কস-এঙ্গেলস-এর পরবর্তী কালের রচনায় পুনরায় উত্থাপিত হবে। এই বইটির গুরুত্ব হল—

ঐতিহাসিক বাস্তববাদের প্রাথমিক কথাবার্তা এল, চেতনা নির্ধারিত হয় জীবন যাপনে একথাও এল। আর বলা হল, প্রতি যুগের শাসকশ্রেণির ধারণাই হয়ে ওঠে প্রধান ধারণা, যা সাহিত্যে প্রতিফলিত হয়। এই বই সূত্রেই স্পষ্ট হল শ্রেণি বিভক্ত সমাজে শ্রমবিভাজনের ব্যাপারটা। আর সাম্যবাদের একটা লক্ষ্য তো শ্রেণি বিভাজন লোপ। ১৮৪৭-এর দুটি রচনায় (German Socialism in Verse and Prose বিষয়ক আলোচনা এবং ফরাসি রাজনীতিবিদ Lamartine বিষয়ক আলোচনা) এঙ্গেলস দেখালেন জার্মান সমাজে গ্যেটের দ্বিমুখী সম্পর্কের কথা, রক্ষণশীল সমাজ ও শিল্প প্রতিভার বিভাজনের কথা, অন্য লেখাটিতে ব্যক্তির শ্রেণি বিশ্লেষণ নির্ণয়ের কথা। ১৮৫২ সালে প্রকাশিত *The Eighteenth Brumaire of Louis Bonaparte* বইটিতে এল মতাদর্শ ও শ্রেণি সম্পর্কের কথা। ১৮৫৭ সালের *Introduction to the Critique of Political* Economy বইতে মার্ক্স বললেন শিল্প ও সমাজ সম্পর্কের কথা। এই বইয়ের ভূমিকায় এবং *Capital and Theories of Surplus Value* বইতে সাধারণভাবে উৎপাদনের নানা শাখার একটি শাখা হিসাবে শিল্প উৎপাদনের কথা বললেন। এখানেই পাঠক দেখবেন লেখককে উৎপাদনের মজুর বলা হচ্ছে, কারণ লেখক প্রকাশকের অর্থ উপার্জনে সাহায্য করছে। মার্কসের মৃত্যুর পর (১৮৮৩) এঙ্গেলস এই তত্ত্বায়ন চালিয়ে গেলেন। সেখানে দুটি বৈশিষ্ট্য চোখে পড়ে। প্রথমটি হল— অর্থনীতির একমাত্র নিয়ন্ত্রণ-বিষয়ক প্রশ্ন নিয়ে কিঞ্চিৎ ভিন্নতা। এঙ্গেলস বলতে চেয়েছিলেন 'ভিত্তি'র নিয়ন্ত্রণ ক্ষমতা থাকলেও উপরিসৌধের মধ্যে থাকে 'আপেক্ষিক স্বয়ংকর্তৃত্বের' বৈশিষ্ট্য। দ্বিতীয় ব্যাপারটি হল, মিনা কাউটস্কি ও মার্গারেট হার্কনেস-কে লেখা দুটি চিঠিতে উপন্যাসে বাস্তবতার স্বরূপ নিয়ে কিছু মন্তব্য। হার্কনেসকে লেখা চিঠিতে ছিল বালজাক প্রসঙ্গ। বালজাক-এর অভ্যস্ত প্রশ্রয় ছিল নিশ্চিহ্ন হতে থাকা শ্রেণির দিকে রাজতন্ত্রের দিকে, কিন্তু উপন্যাসে তিনি চলে গেলেন ভিন্নপন্থীদের পক্ষে, যারা ভবিষ্যতের মানুষ, তাদের প্রশংসায়। এ-ব্যাপারটাকে এঙ্গেলস বললেন—বাস্তববাদের বিজয়।

উনিশ শতকের শেষের দিকে নানা দেশে গড়ে উঠল মার্কসবাদী পার্টি, ফলে বেশ কিছু মার্কসবাদী বুদ্ধিজীবীকেও আমরা পেয়ে গেলাম। এমনই একজন রোম বিশ্ববিদ্যালয়ের দর্শনের অধ্যাপক লাব্রিওলা যিনি তাঁর *Essays on the Materiatlist Conception of History* (১৮৯৫-৯৬) বইতে উপরিসৌধের ব্যাপারটিকে যথোচিত গুরুত্ব দিলেন।

এর পরেই আমরা নাম করব প্লেখানভ-এর, যিনি রুশ সোস্যাল ডেমোক্রেটিক পার্টির প্রতিষ্ঠাতা, যাঁকে বলা হত রুশ মার্কসবাদের জনক। লেনিনের উঠে আসা এবং বলশেভিক ও মেনশেভিকদের আলাদা হয়ে যাওয়ার আগে পর্যন্ত প্লেখানভকে রুশ সাম্যবাদের তাত্ত্বিক নেতা গণ্য করা হত। রাশিয়ার বাইরে তিনি অবশ্য *Art and Social Life* (১৯১২-১৩) বইটির জন্য, নন্দনতাত্ত্বিক হিসেবে সুপরিচিত। এই বইতে সৌন্দর্য প্রসঙ্গে বলা হল, একটা বিশেষ কালে সৌন্দর্য সম্পর্কে ধারণা সুন্দরের আভ্যন্তর (biological) ও ইতিহাসগত পরিস্থিতি— এই দুয়ের ওপর নির্ভরশীল। *শিল্প এবং সমাজজীবন* বইটিতে তিনি ব্যাখ্যা করলেন শিল্পের জন্য শিল্প মতবাদটিকে, বললেন, এই মতবাদ বড়ো হয়ে ওঠে তখনই যখন শিল্পী এবং শিল্পাগ্রহী মানুষ সমাজ পরিবেশে আশা করার মতো কিছু খুঁজে পায় না। শিল্পের জন্য শিল্পের পরিবর্ত হল উপযোগী শিল্প, যা রাজনৈতিক কর্তৃত্ব পছন্দ করে, আর এই উপযোগী শিল্প দিয়ে অন্য সব আদর্শকে নিয়ন্ত্রণ করা হয়। উপযোগী শিল্প বিষয়ক ধারণাটি সব সময় যে বিপ্লবী মানসিকতা কিংবা অগ্রসর চিন্তাপ্রসূত তা কিন্তু বলা যায় না। শিল্পের জন্য শিল্প মতটিকে আক্রমণ করলেন প্লেখানভ তার বিষয় (Content)-হীনতার জন্য। প্লেখানভের মতে সকল

শৈল্পিক প্রয়াসেই থাকে ধ্যান ধারণা, বিষয়গত উচ্চতার উপরই শিল্পের উৎকর্ষ নির্ভরশীল। এভাবে, প্লেখানভ গড়ে তুললেন মার্কসীয় সমাজমনস্ক শিল্প ধারণা, তার সঙ্গে আলোচনা করা হল বিভিন্ন শৈল্পিক আদর্শের, আলোচনা সমাজ প্রেক্ষিত মাথায় রেখেই। জার্মানি-তে মার্কস-এর জীবনী-রচয়িতা ফ্রাঞ্জ মেহরিং পার্টির কাগজে লিখে চলেছিলেন সাহিত্য ও শিল্প প্রসঙ্গে নানা কিছু। সেখানে তিনি শ্রমজীবী মানুষকে ধ্রুপদি জার্মান সাহিত্যের ঐতিহ্যে আগ্রহী করে তুলতে চাইলেন। মেহরিং-এর মতে শিল্প হল a peculiar and aboriginal capacity of mankind— যে-ধারণাটি ১৯৩০-এ স্ট্যালিন জমানায় নিন্দিত হয়।

এই হল মার্কসীয় সাহিত্যতত্ত্ব বিকাশের প্রথম পর্ব। এ-পর্বে আমরা পেলাম— সাহিত্য সংস্কৃতির সঙ্গে রাজনীতির অনিবার্য যোগের কথা, অর্থনীতির ভিত্তি এবং সংস্কৃতির উপরিসৌধের কথা, সাহিত্যের বিচারে শ্রেণির কথা, বাস্তবতা বিচারের পদ্ধতির কথা, শিল্পের জন্য এবং উপযোগবাদী শিল্পের সমালোচনার কথা, রাষ্ট্র কর্তৃক শিল্প নিয়ন্ত্রণের কথা। এই পর্বের তাত্ত্বিকবৃন্দ প্রায় সবাই ছিলেন চিন্তাবিদ, সমাজতন্ত্র প্রতিষ্ঠার সংগ্রামে শিল্প-প্রক্রিয়ার প্রণালীবদ্ধ মূল্যায়নের সমস্যার মুখোমুখি হননি তাঁরা। সমাজবাস্তবের সঙ্গে শিল্প সাহিত্যের সম্পর্ক নির্ণয়ই ছিল মুখ্য ব্যাপার। কিন্তু ১৯১৭-তে যখন রুশ বিপ্লব সংঘটিত হল তখন প্রয়োজন হয়ে পড়ল নতুন সমাজে তার উপযুক্ত প্রয়োগ ও সমালোচনার ব্যাপার। এক্ষেত্রে লেনিনের ভূমিকা ছিল গুরুত্বপূর্ণ। তবে রুশ পার্টি ১৯২০-র আগে সাংস্কৃতিক কর্মসূচি নিয়ে তৎপর হয়ে ওঠেনি।

লেনিনের দু-তিনটি লেখা বিশেষ করে এ-প্রসঙ্গে উল্লেখ করা দরকার। সেগুলি হল— 'Party Organisation and Party Literature', 'Leo Tolstoy as the Mirror of the Russan Revolution', 'L. N. Tolstoy, Tolstoy and the Proletarian Struggle' প্রভৃতি। [টলস্টয় নিয়ে লেনিনের প্রবন্ধ সাতটি, সাধারণভাবে সাহিত্য সংস্কৃতির অন্য প্রসঙ্গেও লেখা আছে]

প্রথম প্রবন্ধে 'পার্টিজান' কথাটি গুরুত্ব পেতে শুরু করে। লেনিনের মতে, সাহিত্যকে হতে হবে সর্বহারা ভাবাদর্শের অংশ, শ্রমিক শ্রেণির রাজনীতির নাট ও বল্টু। সাহিত্যকে হতে হবে সংগঠিত, পরিকল্পিত, সুসংহত সোস্যাল ডেমোক্রেটিক পার্টি কর্মসূচির একটি উপাদান। সাহিত্যকে অবশ্যই পার্টি সাহিত্য হতে হবে, বুর্জোয়া রাজনীতি, মুনাফাসন্ধানী বুর্জোয়া প্রকাশনা, বুর্জোয়া কেরিয়ারবাদ, ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্যবাদ, অভিজাততান্ত্রিক নৈরাজ্যবাদ, মুনাফার লোভ প্রভৃতি থেকে সাহিত্য ও সাহিত্যিককে দূরে থাকতে ও রাখতে হবে। এই প্রবন্ধটি নিয়ে কিছু বিতর্ক ওঠে পরবর্তীকালে। বলা হয়, এ-প্রবন্ধের নির্দেশ তো ১৯০৫-এর রাশিয়াতেই সীমাবদ্ধ, তাই অন্যত্র ব্যবহার করা অনুচিত। দ্বিতীয় কথা, এ-প্রবন্ধে শুধু রাজনৈতিক ও তাত্ত্বিক বিষয় নিয়ে লেখার কথা বলা হচ্ছে, অন্য সাহিত্য বিষয়ে নয়। দ্বিতীয় প্রবন্ধে লেনিন দেখালেন— টলস্টয়ে মতামতের মধ্যে যে বিপরীতমূলকতা, তা আসলে সেই সময়ের বিপরীত মূলকতার প্রতিফলন, এই বৈপরীত্য নিয়েই কৃষকরা বিপ্লবে অংশ নিয়েছে। টলস্টয় মহান শিল্পী হিসেবে রুশ জীবনের অতুলনীয় চিত্রাবলি এঁকেছেন, কিন্তু তিনি খ্রিস্ট-এর আবেশে উদভ্রান্ত। একদিকে সামাজিক মিথ্যাচার ও কপটতার বিরুদ্ধে তিনি আশ্চর্য শক্তিশালী, স্পষ্টবাক ও অকপট প্রতিবাদী, অন্যদিকে তাঁর বুক চাপড়ে হাহাকার। একদিকে প্রগাঢ়তম বাস্তববোধ, অন্যদিকে ধর্মের প্রচার। এই স্ববিরোধের কারণেই টলস্টয় শ্রমিক শ্রেণির আন্দোলন, রুশ বিপ্লব প্রভৃতিকে ঠিকঠাক বুঝতে পারেন নি। তৃতীয় প্রবন্ধে লেনিনের কথা হল— টলস্টয় তাঁর শিল্পোত্তীর্ণ রচনাবলিতে বর্তমান ব্যবস্থার দ্বারা অত্যাচারিত বিপুল জনগণের বিভিন্ন মেজাজকে আশ্চর্য শক্তিতে ফুটিয়ে তুলতে, তাদের প্রতিবাদ ও ক্রোধের স্বতঃস্ফূর্ত অনুভবগুলিকে ভাষা দিতে চেয়েছেন। ১৮৬১

থেকে ১৯০৪-এর কালের মানুষ হিসেবে শিল্পী ও চিন্তাবিদ হিসেবে প্রথম রুশ বিপ্লবের বিশেষ বিশেষ চরিত্র লক্ষণগুলিকে, তার সবলতা ও দুর্বলতাকে বিস্ময়কর তীক্ষ্ণতায় তিনি মূর্ত করে তোলেন। লেনিন মনে করতেন টলস্টয়ের সঠিক মূল্যায়ন সেই ঠিকমতো করতে পারবে যার দৃষ্টিকোণ ও রাজনৈতিকভাবনা সোস্যাল ডেমোক্রেটিক প্রলেতারিয়েত শ্রেণির।

বিপ্লবের পর লেনিন আর একটি দিকে নজর দিয়েছিলেন। তা হল— জনশিক্ষা। ১৯২৩-এর এক প্রবন্ধে তিনি বললেন, একটা সময় আমরা প্রলেতারীয় এবং বুর্জোয়া সংস্কৃতির কথা বলেছি। তথ্যসূত্রে জানা যাচ্ছে আমরা সার্বজনীন শিক্ষা প্রসার করতে পারিনি, সে-কারণে প্রলেতারীয় সংস্কৃতির মান এখনও উন্নত নয়। প্রলেতারীয় সংস্কৃতি নিয়ে বাড়াবাড়ি শুরু করেছিল প্রলেটকালট গোষ্ঠী, বগদানভ-এর নেতৃত্বে। এই গোষ্ঠী অপ্রলেতারীয় বুদ্ধিজীবীদের সঙ্গে কোনো সম্পর্ক রাখতে চায় নি, বুর্জোয়া সমাজসৃষ্ট অতীত শিল্প ঐতিহ্যকে তারা পুরোপুরি বাতিল করতে চেয়েছিল। লেনিন এই গোষ্ঠীর বিরোধিতা করে বলেন— সংস্কৃতির ক্ষেত্রে কমিউনিস্ট বিপ্লব বিবর্তনের পথ বেয়েই এসেছে। পূর্বকালের ভালোকে বেছে নিতে হবে, জনগণের কাছে সেসব রাখতে হবে, আর তৈরি করতে হবে আগামী কালের সংস্কৃতি। এ-হল কর্মকৌশলগত প্রশ্ন। বুদ্ধিজীবী হিসেবে প্রাণশক্তিপূর্ণ ট্রটস্কি লেনিনের মত অনুসারে গড়ে তুললেন শক্তপোক্ত তাত্ত্বিক অবস্থান তাঁর *Literature and Revolution* (১৯২৩) বইতে। এতে সোভিয়েত সংস্কৃতির যাবতীয় প্রবণতাগুলি পার্টি ও শ্রমিকশ্রেণির দৃষ্টিকোণ থেকে তুলে ধরা হয়, সমাজতন্ত্রে শিল্পকর্মের স্বরূপ ও চরিত্র কেমন হবে সেটাও আলোচিত হয়। বইটির আলোচনা পদ্ধতিতে প্লেখানভ-এর প্রভাব ছিল। এই বিশের দশকেই উদ্ভূত হয়েছিল আঙ্গিকবাদী গোষ্ঠী, যাঁরা ভাষাতত্ত্ব গবেষণার নতুনত্ব নিয়ে অত্যাধুনিক নিরীক্ষামুখ্য কবিতাকে, ভবিষ্যবাদী কবিতাকে নিয়ে হইচই শুরু করে দেয়। তাঁরাও, সংগঠনবাদী গোষ্ঠীর মতো বিপ্লবকার্যে সঙ্গী হল এবং সনাতনী শিল্প, সনাতনী সমাজকে বর্জনীয় মনে করল। আঙ্গিকবাদীরা একসময় সাহিত্যের সমাজতাত্ত্বিক বিচারেরও বিরুদ্ধে চলে যায়, প্লেখানভ প্রভৃতির মতামত রক্ষণশীল বলে গণ্য করে। মার্কসবাদী লেখকরা, বিশেষত ট্রটস্কি আঙ্গিকবাদীদের তীব্র বিরোধিতা করে বললেন, শিল্প শুধু বিশ্বের দর্পণ নয়, শিল্প বাস্তবের রূপান্তরণও বটে। কলাকৌশল যদি মুখ্য আলোচ্য হয়ে যায় তাহলে তা প্রতিক্রিয়াশীল হয়ে পড়বে। লেনিন যখন ১৯০৫ নাগাদ নব্য শিল্পতত্ত্ব নিয়ে ভাবছেন তখন আমরা পাই হের্জেন বেলিনস্কি, চের্নিশেভস্কি, দব্রোল্যুবভ প্রভৃতির রচনাসমূহ, এককথায় যা প্লেখানভ-কথিত শিল্পের উপযোগিতা-সম্পর্কিত দৃষ্টিভঙ্গিকে বিশদ করতে প্রয়াসী হয়। লেনিনের সাহিত্যশিল্প-সংক্রান্ত মতামত ও পথনির্দেশ পূর্বোক্ত রচনাগুলি ছাড়াও ক্লারা জেটকিন-এর সঙ্গে কথোপকথন থেকেও আন্দাজ করা চলে।

১৯৩৪-এ সোভিয়েত লেখক সংঘের প্রথম কংগ্রেস অনুষ্ঠিত হল। মুখ্য বক্তা ছিলেন— গোর্কি, বুখারিন, ঝানভ। গোর্কি-র মঞ্চে ওঠা ছিল যথেষ্ট গুরুত্বপূর্ণ। তিনি ছিলেন বিপ্লবপূর্ব যুগের বাস্তববাদী কথাসাহিত্যিক ও নাট্যকার, উনিশ শতকের বিপ্লবী গণতন্ত্রীদের বাস্তবতা এবং নতুন সমাজতন্ত্রী লেখকদের যোগসূত্র-রচয়িতা। গোর্কি বিচারী-বাস্তবতার ব্যাখ্যা করলেন, যা ছিল গত শতাব্দীর ব্যবসায়ী শ্রেণির টিকিয়ে রাখা সামন্ততন্ত্রী সংরক্ষণশীলতার বিরুদ্ধে লড়াইয়ের নমুনা। তিনি চাইলেন, শ্রমকে নায়ক করে বই লেখা হোক, জন্ম নিক বিপ্লবী রোমান্টিকতা। তিনি জোর দিলেন মিথ, লোককথা প্রভৃতির উপর। মার্কস-এর ১৮৫৭ সালের গ্রিকশিল্প-বিষয়ক আলোচনা উল্লেখ করে আদিবাসী সমাজে শিল্পের ভূমিকা, রিচ্যুয়াল এবং ম্যাজিক হিসেবে তার কার্যকারিতাকে তিনি গুরুত্ব দিলেন। এই কংগ্রেস থেকেই প্রচারিত হল—

সমাজতান্ত্রিক বাস্তবতার সূত্রসমূহ। বুখারিন, যিনি একদা ছিলেন সোভিয়েত পার্টির তাত্ত্বিক, স্ট্যালিন কর্তৃক দক্ষিণপন্থী হিসেবে পরাস্ত হলেও, সোভিয়েত সংস্কৃতির বিবর্তনকামী চরিত্র সম্পর্কে লেনিনীয় পথের বিরোধিতা করেও'৩৪ সালের কংগ্রেসে বক্তা হিসেবে দেখা দিলেন। তিনি বিজ্ঞানকে শিল্প অপেক্ষা গুরুত্ব দিলেন, আঙ্গিকবাদীদের কলাকৌশল-দক্ষতার স্বীকৃতি দিলেন, ভাষার সমাজতাত্ত্বিক বিশ্লেষণের কথা বললেন, ভাষা বিষয়ে মার্কসীয় তত্ত্ব নির্মাণের কথা বললেন। তাঁর বক্তৃতায় উঠে এল শিল্পের সমাজ কর্মগত ভূমিকার দীর্ঘ ইতিহাস।

মার্কসীয় সাহিত্যতত্ত্বের ইতিহাসে স্ট্যালিনের গুরুত্বপূর্ণ অবদান ভাষা-বিষয়ক বিতর্কে কিছু গুরুত্বপূর্ণ কথা বলা। তাঁর বক্তব্যের সংক্ষিপ্তসার হল — (ক) ভাষা ভিত্তির উপর উপরিসৌধ নয়। (খ) ভাব বিনিময়ের উপায় হিসেবে ভাষা সব সময়ে ছিল এবং এখনও (বিপ্লবের পরে) সমাজের একটিই অভিন্ন ভাষা। (গ) উপভাষা ও বুলি সর্বজনীন ভাষার অস্তিত্বকে অস্বীকার করে না (ঘ) ভাষার শ্রেণি চরিত্রের সূত্র ভ্রান্ত এবং অ-মার্কসীয় (ঙ) সমাজের উদ্ভব ও বিকাশের সঙ্গে ভাষার উদ্ভব ও বিকাশ ঘটে। শব্দভাণ্ডার ভাষা নয়, ভাষার নির্মাণ সামগ্রী। ভাষার পুরোনো গুণমান থেকে নতুন গুণমানে অতিক্রমণ, বিবিধ উপাদানের ক্রমিক সঞ্চয়ন, পুরোনো গুণমানের বিবিধ উপাদানের ক্রমিক অবক্ষয়ের পথে ঘটে। এই হল মার্কসীয় সাহিত্যতত্ত্বের দ্বিতীয় পর্ব বা রুশপর্ব। এখানে আমরা পেলাম যে-সব কথা, তাহল— (ক) সাহিত্য ও সাহিত্যিকের পার্টিজান সত্তার কথা (খ) পুরোনো মহান লেখক টলস্টয়ের মূল্যায়ন পদ্ধতি সেই সূত্রে অন্য সাহিত্যিকের বিচার (যেমন, আমরা করতে পারি তারাশঙ্করের বিচার) (গ) সাহিত্য ঐতিহ্য সম্পর্কে দৃষ্টিভঙ্গি (ঘ) বিচারী ও সমাজতান্ত্রিক বাস্তবতার কথা (ঙ) ভাষা সম্পর্কে কিছু ভ্রান্তি নিরসন ও স্পষ্ট ধারণা ইত্যাদি।

তৃতীয় পর্যায়ে আমরা বেছে নিচ্ছি দুজন ব্যক্তিত্বকে—মাও সে তুং এবং গেয়র্গ লুকাচ। পার্টির সাংস্কৃতিক কর্মীদের শিক্ষা শিবির উপলক্ষে ১৯৪২ সালে রচিত হয়— 'Talks at the Yenan Forum on Art and Literature.' এই দীর্ঘ রচনায় মাও বিপ্লবী সংগ্রামে শিল্পের গুরুত্বের কথা উল্লেখ করেন। তিনি মনে করতেন শিল্প-সংগ্রামের গুরুত্ব রাজনৈতিক-সংগ্রামের অপেক্ষা কম হলেও সংগ্রামীদের ঐক্যবদ্ধ করতে, শত্রুপক্ষকে পরাস্ত করতে শিল্প ও সাহিত্যের প্রয়োজনীয়তা অস্বীকার করা যায় না। বিপ্লবী শিল্প ও সাহিত্যের উচিত নানা ধরনের চরিত্র সৃষ্টি করা প্রাত্যহিক জীবন থেকে, তাহলে জনগণ ইতিহাসকে এগিয়ে নিয়ে যেতে পারবে। তাঁর মতে, মার্কসবাদী শিল্পীর (তিনি মার্কসবাদী কথাটি রাখেননি, কিন্তু বোঝা যায়) অবস্থান হবে প্রলেতারিয়েতের অবস্থান। শিল্পী সাহিত্যিককে মনে রাখতে হবে তিন রকমের মানুষ আছে— শত্রু, যুক্তফ্রন্ট-এ অন্তর্ভুক্ত মিত্র এবং নিজেদের লোক অর্থাৎ জনসাধারণ ও তার মধ্যে এগিয়ে থাকা অংশ। এই তিন ধরনের মানুষের সম্পর্কে অবলম্বিত হবে তিন ভিন্ন ভিন্ন দৃষ্টিভঙ্গি। সৃজিত শিল্প সাহিত্যের উদ্দিষ্ট শ্রমিক, কৃষক, সৈনিক। তাই এই তিন ধরনের মানুষকে ভালোভাবে জানতে হবে। সৃজিত শিল্পে জনগণের সদর্থক দিকগুলির সঙ্গে জনবিরোধীদের নঞর্থক দিকগুলির দিকেও নজর দিতে হবে। এর পর আলোচিত হয়— সৃজিত শিল্প সমুন্নত করা এবং জনপ্রিয় করার সমস্যা নিয়ে। এদুটো ব্যাপার পরস্পর সম্বন্ধযুক্ত। যেহেতু বিপ্লবের বিকাশ দেশের সব জায়গায় এক প্রকার নয়, তাই সংস্কৃতির ধরনও এক প্রকার হয় না। সূক্ষ্ম উন্নতমানের শিল্প ভালো, কিন্তু কোথায় কেমন প্রয়োজন তা খেয়াল রাখতে হবে। আর সমুন্নয়ন ও জনপ্রিয়করণ— শিল্পী সাহিত্যিক এবং উপভোক্তা জনসাধারণ দুপক্ষকেই সচেতনভাবে অগ্রণী হতে হয়। তাঁর তত্ত্ব অনুযায়ী জগতের সমস্ত সংস্কৃতি শ্রেণিসংস্কৃতি, বিশেষ বিশেষ

রাজনৈতিক লাইনের অনুবর্তী। শিল্প সাহিত্য সমালোচনার দুটি মাপকাঠির কথা তিনি বলেন— রাজনীতিগত এবং শিল্পগত। আলোচ্য রচনায় এমন কয়েকটি জরুরি প্রসঙ্গ আছে যা ইতোপূর্বে অনালোচিত, এমন প্রাঞ্জল ভাষায় উপস্থাপিত যে বোধ্যতায় বাধা তৈরি হয় না।

এবার গেয়ার্গ লুকাচ-এর কথা। তাঁর কর্মজীবনকে বটোমোর পাঁচটি পর্যায়ে ভাগ করেছেন— ১ম, ১৯১৯—১৯২৯, ২য়, ১৯৩০—১৯৪৫, ৩য়, ১৯৪৫—১৯৪৯, ৪র্থ, ১৯৫০—১৯৫৬, ৫ম, ১৯৫৭—১৯৭১। প্রতি পর্যায়েই তাঁর রাজনৈতিক সক্রিয়তা যেমন আছে, দর্শন, সমাজতত্ত্ব, সাহিত্য সংস্কৃতিগত চিন্তারও পরিচয় আছে। প্রতি পর্বেই তিনি একাংশের দ্বারা নিন্দিত, অপরাংশের দ্বারা নন্দিত হয়েছেন। তাঁর অবদান বহুমুখী— নন্দনতত্ত্ব থেকে সাহিত্য সমালোচনা, দর্শন, সমাজতত্ত্ব থেকে, রাজনীতি পর্যন্ত বিস্তৃত। নন্দনতত্ত্বের ক্ষেত্রে মার্কসীয়তত্ত্বের দিক থেকে তিনি বাস্তববাদী চিন্তার বিকাশ ঘটিয়েছেন। দর্শনে তিনি পশ্চিমি মর্কসবাদের অন্যতম প্রবক্তা, বারংবার দ্বান্দ্বিকতাকে তুলে ধরেছেন, নানা ধাঁচের অযৌক্তিকতা, যান্ত্রিক বাস্তববাদ, মতান্ধতার বিরুদ্ধে, অ্যালিয়েনেশন বিষয়ে নতুন তত্ত্বকথা বলেছেন (History and Class Consciousness), সামাজিক ontology নিয়ে নতুন কথা বলেছেন। সমাজতত্ত্বে তাঁর শ্রেণিচেতনাতত্ত্ব জ্ঞানের সমাজতত্ত্ব-বিষয়ক চর্চায় এবং ফ্র্যাঙ্কফুর্ট স্কুল ও অন্য তত্ত্ববিশ্বে প্রভাব ফেলেছে। রাজনীতি ক্ষেত্রে তিনি প্রধানত স্মরণে আসেন সাংগঠনিক প্রশ্নে ও পরামর্শে, পপুলার ফ্রন্ট-বিষয়ক চিন্তায়, পিপলস ডেমোক্রেসি-তে জনভিত্তি বিষয়ক প্রশ্নে।

তাঁর সাহিত্যবিষয়ক রচনাবলিতে মনোনিবেশ করা যাক। G. H. R. Parkinson বলেছেন— বাস্তববাদ সম্পর্কে ধারণা, সাহিত্য 'টাইপ' বিষয়ে ধারণা তাঁর সাহিত্যবিষয়ক রচনার অন্যতম বিষয়। লেখককে সমাজ প্রকৃতি সম্বন্ধে জানতে হবে, সমাজকে দেখতে, দেখাতে হবে সামগ্রিক ভাবে, তবে লেখক সমাজ, তার নিয়মকানুন বিমূর্তভাবে না দেখিয়ে চরিত্র ও পরিস্থিতি মারফত দেখাবেন এবং সেখানেও খেয়াল রাখা দরকার সে ক্ষেত্রগুলি যেন নিছক উদাহরণ না হয়ে ওঠে। একমাত্র বাস্তববাদী লেখকই ধরতে পারেন সমাজের সমগ্রতা, কারণ তিনি সেই সমাজের চিত্ররচক এবং নিজেও সেই সমাজের অংশীদার। লুকাচ-এর মতে বাস্তববাদী সাহিত্য রচনা করেছে— বুর্জোয়া এবং সমাজতন্ত্রী লেখক— দুপক্ষই। তিনি ১৮৪৮ সালকে বুর্জোয়া ইতিহাসের বিভাজন রেখা মনে করেন, সাহিত্যও আগে পরে কিছুটা পৃথক হয়ে যায়। এর আগের ইতিহাস বিভাজন রেখা ফরাসি বিপ্লব। গ্যেটে বিষয়ক আলোচনায় সমাজ ও রাজনৈতিক পরিস্থিতির সংশ্লেষ (ফরাসি বিপ্লবকালীন) যেমন, তিনি তা লক্ষণীয় মনে করেন স্কট-এর ঐতিহাসিক উপন্যাসে। স্কট থেকেই ঐতিহাসিক উপন্যাসের যাত্রা শুরু। সেখান থেকেই ফুটে উঠতে থাকে জীবন সম্পর্কে ঐতিহাসিক দৃষ্টিভঙ্গি। তাতে থাকা চাই সমাজের উচ্চ ও নীচ সম্প্রদায়ের চিত্রণ। *The Historical Novel* এবং *The Theory of the Novel*— এই দুটি বইতেই তিনি উপন্যাসকে এক ধরনের মহাকাব্য আখ্যা দেন। শেষোক্ত বইতে পার্থক্য করা হয় বিস্তারী (extensive) এবং অন্তর্নিবিষ্ট (intensive) সমগ্রতার। বালজাক থেকে বাস্তববাদের নবপর্যায় শুরু। বালজাক রোমান্টিক নন, পুঁজিবাদের অগ্রসারী ভূমিকা সম্পর্কে যেমন, পুঁজিবাদ সম্পর্কে রোমান্টিকদের সমালোচনা সম্পর্কে তেমনই গ্যেটে সচেতন। বালজাক, স্তাঁদাল বাস্তবের স্বরূপ বুঝেছিলেন, কারণ তাঁরা তিনজনেই জনজীবনে সক্রিয় ছিলেন। ১৮৪৮-এর শেষে বাস্তববাদের পর জেগে ওঠে যথাস্থিতবাদ (Naturalism), যা সমগ্রতার ধারণা পোষণ করে না, Particulars-কে General laws-এর সঙ্গে যুক্ত করে দেখতে চায় না, তাই জোলা কিন্তু বালজাক-এর মতো মহান শিল্পী নন। লুকাচ avant-garde সাহিত্য আন্দোলন, অভিব্যক্তিবাদী (expressionism) আন্দোলন

প্রভৃতিকে সমালোচনা করেন কারণ এগুলি অবক্ষয়ী (decadent) সাহিত্য। এদের মনোযোগ অধুনা (immediacy) নিয়ে। যারা আধুনিকবাদী, তাদের দৃষ্টিভঙ্গি আত্মনিষ্ঠ। টমাসমান 'আধুনিক' হলেও, interior monologue ব্যবহার করলেও সমাজ-ইতিহাসগত পরিস্থিতি বিষয়ে উদাসীন নন। আধুনিকদের সঙ্গে এখানে তাঁর তফাত। লুকাচ সমাজতান্ত্রিক বাস্তববাদের পক্ষে, কারণ এই মতাদর্শী লেখকদের মধ্যে বাস্তবতার সমগ্রতা রচনায় কোনো দ্বন্দ্ব, সংশয় নেই। রুশ সাহিত্যের প্রখ্যাত বাস্তববাদী লেখকদের— ডস্টয়েভস্কি, টলস্টয়, গোর্কি, শলোকভ, সোলঝেনিৎসিন সম্পর্কে তিনি নানা প্রবন্ধে, পুস্তকে আলোচনা করেছেন। 'টলস্টয় এবং বাস্তববাদের বিকাশ' নামক দীর্ঘ প্রবন্ধে তিনি মন্তব্য করেন— যাঁরা শুধু উপর উপর দেখে যান (on looker) তাঁরা যথার্থ বাস্তববাদী হতে পারেন না। যথার্থ বাস্তববাদীকে অগ্রসরণমুখী সমাজ আন্দোলনে অংশগ্রহণ করতেই হয়। টলস্ট য়কে বিপ্লবী কৃষক আন্দোলনের দর্পণ হিসেবে লেনিন-এর মন্তব্য সমর্থন করেন তিনি। ফ্লোবেয়র-এর *L ' Education Sentimentale* উপন্যাসকে novels of disillusionment আখ্যা দিয়েছেন কেউ কেউ, কিন্তু লুকাচ-এর কথা হল— ফ্লোবেয়র তো পুঁজিবাদী সমাজের কোনো লড়াইয়ের সঙ্গেই যুক্ত ছিলেন না, আর তিনি পুঁজিবাদী সমাজের অর্থহীনতা দেখেও, বুর্জোয়া মতাদর্শের ভ্রান্তি দেখেও, এর থেকে পরিত্রাণের কথা ভাবেননি। লুকাচ-এর মতে টলস্টয় হলেন রুশ বুর্জোয়া বাস্তববাদের শেষ মহান ধ্রুপদি লেখক এবং ম্যাক্সিম গোর্কি সমাজতান্ত্রিক বাস্তববাদের প্রথম মহান ধ্রুপদি লেখক। গোর্কি-র কথাসাহিত্যও 'হিউমান কমেডি' কারণ সেখানে আছে নানা চরিত্র ও তাদের ভাগ্যের সঙ্গে গভীর ঐতিহাসিক ও সামাজিক সম্পর্ক। গোর্কির শিকড় ছিল প্রলেতারিয়েত ও দরিদ্র কৃষকের মধ্যে। তবে, গোর্কির শিল্পস্বরূপ সর্বদাই বাস্তববাদী, যদিও তাঁর বাস্তববাদ সবসময় সমাজতান্ত্রিক বাস্তববাদ নয়। টলস্টয়ই, রুশ সাহিত্যে, উপন্যাসকে, মহাকাব্যের স্তরে নিয়ে যান, শোলোকভ যেমন *ধীরে বহে ডন* উপন্যাসে পরিবর্তমান কালের মহাকাব্য রচনা করেছেন। স্ট্যালিনবাদী সাহিত্যে স্ট্যালিনবাদের প্রভাব সম্পর্কে লুকাচ রাজনৈতিক কারণেই স্পষ্টবাক ছিলেন না। তবে দেখা যাবে, যাকে সোভিয়েত যুগের সাহিত্য বলা হয়, তার সম্পর্কে তিনি যথেষ্ট মাত্রায় সমালোচক। স্ট্যালিনবাদের প্রভাবে বাস্তবের যথাযথ চিত্রণ সম্ভব না হয়ে, সাহিত্য হয়েছে যথাস্থিতিবাদের উদাহরণ, যথার্থ কবিতা শুকিয়ে গদ্য হয়ে গেছে। তাছাড়া তাৎক্ষণিক রাজনৈতিক নির্দেশ, জেহাদ, প্রচারমনস্কতা সাহিত্যের ক্ষতি করেছে। সোলঝিনিৎসিন বিষয়ক বইটিতে বলতে চেয়েছেন *ইভান দেনিসোভিচের জীবনের এক দিন* বইটিতে নব্য বাস্তবের, স্ট্যালিনোত্তর সোভিয়েত সমাজের প্রথম উন্মোচন ঘটছিল। তিনি প্রশ্ন রেখেছেন, সোলঝিনিৎসিন-এর হাতেই সমাজতান্ত্রিক বাস্তববাদের নবজন্ম ঘটবে কি না এ বিষয়ে। এইখানে আমরা শুধুমাত্র উল্লেখ করব যে জীবন সায়াহ্নে লুকাচ দুটি বড়ো মাপের মার্কসীয় নন্দনতত্ত্ব বিষয়ক রচনায় হাত দিয়েছিলেন, যার প্রথমটি *The Specific Nature of the Aesthetic* প্রকাশরূপ লাভ করেছিল ১৯৬৩-তে। অপর রচনাটি হল— *The Work of Art and Aesthetic Beheviour.* এই অপ্রকাশিত রচনাটির সূত্রে জানা যায় আর একটি এই রচনার পরিকল্পনার কথা। তা হল— Art as a Socio-historical Phenomenon.

এই তৃতীয় পর্যায় থেকে আমরা শিখছি— শিল্প ও রাজনীতির অঙ্গাঙ্গী সম্পর্কের কথা, শিল্পীর জনসংগ্রামে অংশীদারিত্বের কথা, সমাজে নানা ধরনের মানুষ সম্পর্কে লেখকের ভিন্ন ভিন্ন দৃষ্টিভঙ্গির কথা, শিল্পের মানোন্নয়ন, জনপ্রিয়করণে শিল্প ও পাঠকদর্শকের সচেতন সক্রিয়তার কথা। অপর পক্ষে, লুকাচ থেকে আমরা শিখি বাস্তববাদের বৈচিত্র্য, বিচারী বাস্তব, সমাজতান্ত্রিক

বাস্তবের কথা, রচনায় সমাজ-সমগ্রতার কথা, উপন্যাসের মহাকাব্যত্বের কথা, আভাগার্দ ও আধুনিক সাহিত্য প্রসঙ্গে মার্কসবাদী সমালোচনার কথা।

বাস্তববাদ নিয়ে লুকাচ-এর সঙ্গে বিরোধ বেধেছে ব্রেখট-এর। সমাজতান্ত্রিক বাস্তববাদ যা বাস্তবপন্থী ইলিউশন রচনার পক্ষে, ব্রেখট তার বদলে অ্যালিয়েনেশন এফেক্ট কথাটা আনতে চান। ব্রেখট এপিক থিয়েটার রীতির স্রষ্টা, যাতে থাকে শিথিল নানা এপিসোড, যার প্রেরণা শেকসপীয়র-এর ঐতিহাসিক নাটক, অষ্টাদশ শতাব্দীর পিকারেস্ক উপন্যাস, চ্যাপলিন, বাস্টার কিটন, আইজেনস্টাইন-এর সিনেমা। ব্রেখট মনে করেন সমাজতান্ত্রিক বাস্তববাদেই একমাত্র আস্থাশীল থাকা অনুচিত। নব্য রীতি নিরীক্ষার পক্ষপাতী হলেও তাঁর রাজনৈতিক দায়বদ্ধতা ছিল, কিন্তু পার্টিকর্তারা তাঁকে পছন্দ করেননি। ব্রেখট এবং লুকাচ বাস্তব সম্পর্কে বিবদমান দৃষ্টিভঙ্গি পোষণ করতেন, আর ফ্র্যাঙ্কফুর্ট স্কুলের মার্কসীয় নন্দন তাত্ত্বিকরা বাস্তববাদকেই বাতিল করতে চাইলেন। রামন শেলডানের মতে এঁরা যে সমাজ বিশ্লেষণের পথ নিলেন তাতে মার্ক্সবাদ ও ফ্রয়েডবাদের মিশ্রণ ছিল। এদের প্রধান প্রবক্তা—হর্কহেইমার, আডর্নো, মার্কুস। আডর্নোর মতে সাহিত্যের সঙ্গে বাস্তবের সংস্পর্শ সরাসরি নয়, এই দূরত্বই শিল্পকে তাৎপর্যময় ও শক্তিমান করে তোলে। এ পথেই বাস্তব সম্পর্কে তাঁর বিচার সংযুক্ত হয়। আডর্নোর সমালোচক বেঞ্জামিন, তাঁর মার্কসবাদও ভিন্ন গোত্রের। বেঞ্জামিন-এর মতে, আধুনিক শিল্পপ্রযুক্তি (চলচ্চিত্র, রেডিও, টেলিফোন, গ্রামোফোন) শিল্পের স্বরূপকে পালটে দিয়েছে, সমাজতন্ত্রী লেখকদের এসব দিকে খেয়াল রাখা উচিত। যথার্থ টেকনিক গড়ে উঠবে সমাজ ও শিল্পপ্রযুক্তির সহযোগে জটিল ঐতিহাসিকতায়। ১৯৬০-এর দশকে এসে গেল Structural Marxism। লুসিয়েন গোল্ডম্যান বললেন কোনো টেক্সট ঠিক ব্যক্তিক প্রতিভার রচনা নয়, বরং তার ভিত্তিতে আছে trans-individual mental structures. আর তার বিশ্বদৃষ্টিভঙ্গি প্রতিনিয়ত বদলাচ্ছে। গোল্ডম্যান ভিত্তি ও উপরিসৌধ ধারণায় বিশ্বাসী এবং সাহিত্য ও অর্থনীতির সম্পর্ক ঘনিষ্ঠতায় বিশ্বাসী। আলথুসের Structural Marxist L. Jackson-এর ভাষায় তাঁর ভাবনায় স্ট্রাক চারালিস্ট, সমালোচক ফ্রয়েডীয় এবং মার্কসিস্ট ধ্যান ধারণার বিপ্লবী সংশ্লেষ ঘটেছে। তাঁর Idoeology and Ideological State Apparatuses বইটি তত্ত্ব সংস্কৃতি ও সাহিত্যগত চিন্তাকে নানা ভাবে প্রভাবিত করেছে। ইংরেজি ভাষাভাষী পাণ্ডিত্যের জগতে আছেন ঈগলটন ও জেমসন। ঈগলটন মার্কসবাদের সঙ্গে লাকাঁর ফ্রয়েডীয় তত্ত্ব এবং দেরিদার বিনির্মাণবাদী তত্ত্ব মেশাতে চান, কখনও আলথুসের, কখনও লেনিনপন্থী হয়ে যান। জেমসন post-industrial world of monopoly Capitalism-এর যুগে হেগেলীয় দর্শন প্রভাবিত মার্কসবাদ মারফত অংশ ও সমগ্রের সম্পর্ক, মূর্ত ও অমূর্তের বৈপরীত্য, appearance ও essence এর দ্বান্দ্বিকতা, Subject ও Object-এর পরস্পর ক্রিয়ার প্রয়োজনের কথা তোলেন। (Sheldon)

মার্কসীয় সাহিত্যতত্ত্বের মুখ্য ব্যক্তিত্বদের কিছু কিছু মতামতের উল্লেখ করা গেল। গৌণ ব্যক্তিত্ব অসংখ্য। লুকাচ-পরবর্তী ব্যক্তিবর্গের চিন্তার মধ্যে মার্কস, এঙ্গেলস লেনিন সহ নানা তাত্ত্বিকের মতবাদের মিশ্রণ ঘটেছে। মার্কসবাদ শুরু হয়েছিল সংগ্রামের হাতিয়ার হিসেবে শোষিত মানুষের জন্য, ফলে তা ছিল অপেক্ষাকৃত সুবোধ্য। কিন্তু ষাটের দশক থেকে মার্কসীয় চিন্তা অপেক্ষাকৃত জটিল এবং পণ্ডিতবর্গের মধ্যে সীমাবদ্ধ হয়ে গেল। সাম্প্রতিক মত হল, মার্কসবাদের দিন শেষ, এ-হল Post-Marxism-এর যুগ, অর্থাৎ "abandonment of the essentialist aspects of Marxism and means 'other than' or 'more than' Marxism". [Rupert Woodfin এবং Oscar Zarate]

মানবিক বিশ্বভাবনায় প্রায় সমস্ত দিকগুলি সম্পর্কেই কার্ল মার্কস (১৮১৮—১৮৮৩) এবং তাঁর সহযোগী বন্ধু ফ্রেডারিক এঙ্গেলস (১৮২০—১৮৯৫) তাঁদের চিন্তা-ভাবনা এবং জ্ঞানের স্বাক্ষর তাঁদের রচনাসমূহে রেখে গেছেন। বহু বিচিত্র বিষয়ে তাঁদের ভাবনার ক্ষেত্র প্রসারিত। তার ফলে জ্ঞান ও ভাবনার সর্বক্ষেত্রে স্বাভাবিক ভাবেই সম-গুরুত্বে তাঁরা আলোচনা করতে পারেন নি।

কিন্তু মার্কস-এঙ্গেলসের তত্ত্বভাবনা একটি বিশ্ববীক্ষা (Weltausc-hauung)। এই বিশ্ববীক্ষার তত্ত্ব-রূপ শুধু জ্ঞানের, বিশুদ্ধ জ্ঞানের আধারে সীমাবদ্ধ থাকতে চায় নি, বরং বিজ্ঞানের মতো এই জ্ঞানের একটি ব্যবহারিক দিক, প্রয়োগের দিক, কর্মের দিক মার্কসীয় দর্শনকে এক অনন্যতা দিয়েছে। যে-কোনও ধর্মীয় মতবাদেরও সৃষ্টিতত্ত্ব-ইহ-পরলৌকিক ভাবনা নিয়ে একটি বিশ্ববীক্ষা থাকে এবং তার প্রয়োগের কিছু রীত-করণও (Rituals) উক্ত ধর্ম বিশ্বাসে পালনীয় বলে নির্দিষ্ট থাকে, কিন্তু সেখানে গোষ্ঠীবদ্ধতা সত্ত্বেও তার লক্ষ্য ব্যক্তির মোক্ষ, ব্যক্তির মুক্তি। দুর্গত অশান্তচিত্ত ব্যক্তি মানুষের কাছে এ-ধরনের বিশ্বাস ও নির্ভরতা-জনিত তাৎক্ষণিক শান্তি লাভের দিকটি মার্কস যথেষ্ট গুরুত্ব দিয়েই চিন্তাভাবনা করেছিলেন, বলেছিলেন, ধর্ম হৃদয়হীন পৃথিবীর হৃদয় (heart of a heartless world)।

কিন্তু মার্কস-এঙ্গেলস ভাবতে চেয়েছিলেন সমগ্র মানব প্রজাতির সমষ্টিগত সামূহিক মুক্তির কথা এবং বিশেষভাব শ্রমজীবী মানুষের মুক্তির কথা। এই মুক্তি শুধু ধনতন্ত্র শাসিত মূলধনের শাসন থেকে নয়, মানুষের প্রজাতিগত বিচ্ছিন্নতা থেকেও — যে বিচ্ছিন্নতা মানুষের পূর্ণ মানব হয়ে ওঠার পথে অন্তরায়।

মার্কস-এঙ্গেলস সাহিত্যভাবনা ও সৌন্দর্যতত্ত্বের ওপর পূর্ণাঙ্গ কোনও তাত্ত্বিক গ্রন্থ রচনা করেন নি। কিন্তু, তাঁদের বিভিন্ন রচনার মধ্যে শিল্পসাহিত্যের নানা প্রসঙ্গ ও মূল্যায়ন আছে। দুই বন্ধুর পত্রালাপের মধ্যে আছে বহু সূক্ষ্ম, সংক্ষিপ্ত তীক্ষ্ণ পর্যবেক্ষণ— যা থেকে তাঁদের শিল্প-সাহিত্য-ভাবনার সঙ্গে তাঁদের মতাদর্শের তত্ত্ব-কাঠামোটির অদ্বৈত লক্ষ করা যায়। একই সঙ্গে, সমগ্র পাশ্চাত্য সাহিত্যের অতীত ও সমকালীন সৃষ্টি পাঠে

মার্কসীয় সৌন্দর্যতত্ত্ব
উত্তরকাল
সুজিৎ ঘোষ

তাঁদের ব্যাপকতা ও গভীরতা বিস্ময়কর। কিন্তু, প্রাচ্যের সাহিত্য বা সাহিত্যতত্ত্ব সম্পর্কে তাঁদের অধ্যয়নের কোনও তথ্য আমরা পাই না। যদিও প্রাচ্য দেশগুলি ও আমেরিকার ইতিহাস-অর্থনীতির সম্পর্কে নিরন্তর চর্চা তাঁরা করেছেন।

মার্কসের সাহিত্য-সম্পর্কিত চিন্তভাবনার সূচনা তাঁর মৃত্যুর পরে প্রকাশিত গ্রুন্‌ডিস এর ভূমিকা অংশে পাওয়া যায়, যেখানে মার্কস লিখেছেন যে শিল্পের কোনও কোনও স্বর্ণযুগের সঙ্গে সমকালীন সমাজের বিকাশের সঙ্গে সমপর্যায়ের নয়, সমাজের বাস্তব ভিত্তির সঙ্গেও সামঞ্জস্যপূর্ণ নয়। এ-বিষয়ে উদাহরণ হিসাবে গ্রিক শিল্পের কথা বলেছেন। — যে গ্রিক শিল্প কোনও কোনও দিকে শিল্পের মান এবং অ-আয়ত্তসাধ্য (unattainalele) আর্দশ।

১৮৮৫ সালের ২৬শে নভেম্বর মিন্না কাউটস্কিকে লেখা এবং ১৮৮৮ সালে মারগারেট হারকনেসকে লেখা এঙ্গেলসের দুটি চিঠি মার্কসবাদী সাহিত্য সমালোচনার অন্যতম ভিত্তি। এই দুই চিঠির মূল এই যে সাহিত্যে বাণী বা বক্তব্য বা message (Tendenz) উঠে আসবে অবশ্যই পরিস্থিতি এবং ক্রিয়া (action) থেকে। প্রত্যক্ষ বিশ্বজনীন প্রকাশ পাবে প্রতিভূ (type) চরিত্রের মধ্যে দিয়ে, যে নমুনা-চরিত্র একই সঙ্গে সুনির্দিষ্ট ব্যক্তি-চরিত্রও (Specific individual)। সাহিত্যের মাধ্যমে স্পষ্ট মতাদর্শের প্রচার সাহিত্যের ক্ষতি করে— একথা এঙ্গেলস বলেছেন। বালজাকের উদাহরণ দিয়ে এঙ্গেলস বলেছেন যে, বালজাক অভিজাত সমাজের প্রতিনিধি হয়েও তাঁর উপন্যাসগুলিতে তিনি আগামী দিনের সাচ্চা মানুষদের চিত্রিত করেছেন এবং স্বীয় সমাজের প্রতি তীব্র বিদ্রুপ করেছেন। অভিজাত সমাজের প্রতি তাঁর সহানুভূতি ও রাজনৈতিক সংস্কারের বিরুদ্ধে তিনি যেতে বাধ্য হয়েছেন, বালজাকের ক্ষেত্রে এটাই বাস্তবতার মহত্তম বিজয়। এঙ্গেলসের চিঠিগুলি থেকে মার্কসীয় সাহিত্য সমালোচনার তিনটি অনুসিদ্ধান্ত পাওয়া যায় :

১. সাহিত্যে বাস্তববাদের তত্ত্ব মার্কসবাদে সমর্থিত হল,

২. প্রতিভূ শিল্প সাহিত্য একই সঙ্গে বিশ্বজনীন ও সুনির্দিষ্ট হতে হবে;

৩. লেখকের, শিল্পীর প্রকাশ্য মত, ইচ্ছা ও রচনা এবং অন্তর্গত বোধ ও ক্রিয়ার মধ্যে বিরোধ বা দ্বন্দ্বের সম্ভাবনা নিহিত থাকতে পারে।

মার্কস-এঙ্গেলসের সাহিত্য-সংস্কৃতি ভাবনার বিস্তার লক্ষণীয়। তাঁদের ভাবনার সূত্রগুলি পরবর্তী কালে মার্কসীয় শিল্প সংস্কৃতি ভাবনার একাধিক শাখা প্রশাখায় বিস্তৃত হয়েছে। যদিও শাখাগুলির মধ্যে আন্তঃসম্পর্ক রয়েছে। মার্কস-এঙ্গেলসের সাহিত্যভাবনা থেকে সাহিত্য সংস্কৃতি সম্পর্কিত নিচের সূত্র-গুলি আমরা লক্ষ করতে পারি।

১. **নৃতাত্ত্বিক** : আদিম মানুষের জীবনে চিত্রশিল্প-লোককথা-শ্রমসংগীত কোন্‌ ভূমিকা পালন করেছে।

২. **সমাজতাত্ত্বিক** : কী ধরনের সমাজব্যবস্থায় কোন্‌ ধরনের সাহিত্য-শিল্প সৃষ্টি হয়;

৩. **ঐতিহাসিক** : বিশেষ এক ঐতিহাসিক-পর্বে শিল্প-সাহিত্যের মধ্যে যুগের ইতিহাস কীভাবে প্রতিফলিত হয়েছে ;

৪. **নৈতিক** : শোষণপীড়নের বিরুদ্ধে পরশ্রমজীবী শ্রেণীগুলির বিরুদ্ধে শ্রমজীবী মানুষের পক্ষে শিল্পসাহিত্য সোচ্চার কিনা;

৫. **প্রচারমূলক** : আগামী বিপ্লবের ও বিপ্লবী শ্রেণীগুলির পক্ষে আশাবাদ জ্ঞাপন করে শিল্পসাহিত্য হাতিয়ার হিসাবে কাজ করছে কি না;

৬. **মতাদর্শগত** : উপরিকাঠামোর স্তরে মতাদর্শগুলির (Ideologies) মধ্যে সংগ্রাম চলছে, শিল্পসাহিত্যও মতাদর্শগত সংগ্রামের একটি ক্ষেত্র;

৭. **পাঠগত** : সাহিত্যের পাঠটিতে (Text) লেখকের উদ্দিষ্ট বক্তব্য ও নিহিত বক্তব্যের মধ্যে বিরোধ আছে কি না, এবং নিহিত বক্তব্য ও উদ্দিষ্ট বক্তব্য যথাক্রমে শ্রমজীবী ও পরশ্রমজীবী— এই যুযুধান দুই শ্রেণীর কার পক্ষে;

৮. **অর্থনৈতিক** : শিল্প-সংস্কৃতির ব্যবহার ও সামাজিক মূল্য এবং ধনতন্ত্রী সমাজে তার পণ্যমূল্যর বিচার, শিল্প-সাহিত্যিকের উৎপাদী শ্রমিক ও অনুৎপাদী শ্রমিক হিসাবে বিচার, বিনিময় মূল্যের দ্বারা সাহিত্য-শিল্প কোন্ পরিস্থিতিতে উদবৃত্ত মূল্য সৃষ্টি করতে থাকে;

৯. **অচেতন যূথ মানসক্রিয়া** : প্রকৃতপক্ষে বাস্তবের দুটি রূপ, বহির্বাস্তব ও অন্তর্বাস্তব। শিল্প-সাহিত্যে সমকালীন মানুষ বা মানবগোষ্ঠির অন্তর্বাস্তব কীভাবে প্রতিফলিত হয়;

১০. **বিচ্ছিন্নতা** : ব্যক্তিগত সম্পত্তির আর্বিভাব ও শ্রমবিভাজনের (division of labour) ফলে সৃষ্ট বৈরিতামূলক সম্পর্কে মানবের প্রজাতিসত্তা দীর্ণ, মানুষ মানব প্রজাতি থেকে বিচ্ছিন্ন (alienated) কিন্তু প্রজাতিসত্তায় থেকেই মানব সৌন্দর্যের নিয়ম অনুসারে বস্তুর রূপ দেয়। মানুষের বিচ্ছিন্নতার রূপ ব্যক্তিগত সম্পত্তি ও বৈরিতামূলক শ্রম-বিভাজনে নিয়ন্ত্রিত অবস্থায় শিল্প সাহিত্য কীভাবে রূপ লাভ করেছে।

মার্কসবাদের সূচনা থেকে রুশ বিপ্লবের আগে পর্যন্ত মার্কসবাদ ছিল শোষিত শাসিতের বিশ্ববীক্ষা। ১৯০৫ খ্রিস্টাব্দের আগে থেকেই পশ্চিম ইউরোপে বিভিন্ন সমাজতান্ত্রিক দল তাঁদের নিজস্ব মার্কসবাদের ব্যাখ্যা অনুসারে মার্কসবাদের রাজনৈতিক প্রয়োগও করতে সচেষ্ট হয়। দ্বিতীয় কমিউনিস্ট আন্তর্জাতিকের পরে মার্কসবাদের তাত্ত্বিক ও সাংগঠনিক কেন্দ্র পশ্চিম ইউরোপ থেকে রাশিয়ায় সরে যায়। ১৯০৫-এর রুশ বিপ্লবের প্রয়াসের পর থেকে দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের কাল পর্যন্ত রুশ-কমিউনিস্ট পার্টির শোধনবাদ-বিরোধী বলশেভিক নেতৃত্বের সাহিত্য সংস্কৃতির 'পন্থা' সম্পর্কে কোনও সিদ্ধান্ত দেখা যায় না। বিশেষভাবে ১৯১৭ সালে রুশ বিপ্লবের সাফল্যে নতুন শ্রেণীহীন সমাজ গড়ে তোলার উপায় এবং লক্ষ্য নিয়ে যে অস্পষ্টতা ও বিতর্ক তা সাহিত্য সংস্কৃতির ভাবনার ক্ষেত্রেও লক্ষ করা যাবে। ১৯১৭-র রুশ বিপ্লবের পরে লেনিন ও স্তালিনের আমলে রুশ ধ্রুপদি সংগীত, সাহিত্যও শিল্পবস্তুকে সযত্নে রক্ষা করার কাজ শুরু হয়। কিন্তু তার আগে ১৯০৫ সালে লেখা লেনিনের 'পার্টি সংগঠন ও পার্টি সাহিত্য' প্রবন্ধে সাহিত্যকে সর্বহারার লক্ষ্যাদর্শের সহায়ক নাট-বলটু ('a cog and a screw') হিসেবে দেখা হয়েছে।

১৯১৭-র রুশ বিপ্লবের পরবর্তী পর্বে ম্যাকসিম গোর্কির (১৮৬৮-১৯৩৬) সাহিত্যভাবনা এক ধরনের রাষ্ট্রীয় সাহিত্য সংস্কৃতি ভাবনার মর্যাদা পায়। গোষ্ঠীর নিজস্ব সাহিত্য সৃষ্টি বাস্তববাদী সাহিত্যের শ্রেণীভুক্ত। সোভিয়েত দেশের সৌন্দর্যতত্ত্বের ক্ষেত্রে তার অবদান গুরুত্বপূর্ণ। রুশ ধ্রুপদি সাহিত্যধারায় গোষ্ঠীর সাহিত্যে যে বাস্তববাদ লক্ষ করা যায় সেই বাস্তববাদী চেতনা গোষ্ঠীর সাহিত্যবিষয়ক আলোচনাতেও প্রকাশ পেয়েছে।

রুশ বিপ্লবের নেতাদের মধ্যে ত্রোতস্কির সাহিত্য সংস্কৃতি বিষয়ে *Literature and Revolution* গ্রন্থটি ১৯২২-২৩-এর বিপ্লবী ঘূর্ণির মধ্যে রচনা করেন, তাঁর মতে অর্থনৈতিক প্রয়োজনে শিল্পের সৃষ্টি নয়। মার্কসবাদের নীতি সমূহ অনুসরণ করে সর্বদা কোনও শিল্প-কর্মকে গ্রহণ বা বর্জনের সিদ্ধান্ত নেওয়া যায় না। শিল্পকে প্রথমত শিল্পের নিয়মে বিচার করতে হবে। মনে হয় তিনি ঔচিত্যের দিকটিই বড় করে দেখেছেন। শিল্প-সাহিত্য-সংস্কৃতির প্রচারধর্মী নীতিমূলক মৌল উদ্দেশ্যের সঙ্গে তিনি শিল্পের সৌন্দর্যতত্ত্বের দিকটির সমন্বয়, করতে চেয়েছেন, কিন্তু সোভিয়েত রাষ্ট্রের পরবর্তী পর্যায়ে তাঁর ভাবনা গৃহীত হয়নি।

সমাজতান্ত্রিক বিপ্লবের অগ্রগতির সঙ্গে রাশিয়ার বাইরে তৃতীয় কমিউনিস্ট আন্তর্জাতিক ও কমিনফর্মের আওতাভুক্ত দেশগুলির কমিউনিস্ট পার্টিগুলি নিজেদের দেশের প্রলেতরীয় শিল্প-সংস্কৃতি বিকাশে সমাজতান্ত্রিক বাস্তবতার তত্ত্ব সরকারিভাবে (officially) মেনে নেয়। তবে রুশ বিপ্লবের পথ-পদ্ধতি সম্পর্কে পরবর্তী সময়ে যখন প্রশ্ন উঠতে থাকে তখন সমাজতান্ত্রিক বাস্তবতার তত্ত্ব সম্পর্কেও সংশয় ও অনিশ্চয়তা দেখা দেয় ।

চীনের অন্যতম শ্রেষ্ঠ সাহিত্যিক লু সুন (১৮৮১-১৯৩৬) ১৯২৭ সালে Literature of a Revolutionary Period নামে প্রবন্ধে সাহিত্যে মহান বিপ্লবগুলির প্রভাব বিশ্লেষণ করে বিপ্লব-পর্বের সাহিত্যকে তিনটি পর্বে ভাগ করলেন, যে-কোনও মহাবিপ্লব-পূর্ব সাহিত্যে অসন্তোষ ও ক্ষোভের প্রকাশ যা বিদ্রোহের বাহন হতে পারে। বিপ্লবের সময় সাহিত্য অদৃশ্য হয়ে যায়। শুধু দারিদ্র্য ও যন্ত্রণার মধ্যে সাহিত্য সৃষ্টি হয় না। আর, বিপ্লবের বিজয়ের পরে সাহিত্যের সূচনায় দু-ধরনের সাহিত্য রচিত হয়— এক ধরনের সাহিত্যে বিপ্লবের প্রশংসা ও সমর্থন, অন্য ধরনের সাহিত্যে প্রাচীনের ধ্বংসের জন্য মনস্তাপ ব্যক্ত হয়।

লু সুনের সাহিত্যদৃষ্টির সঙ্গে চীনা বিপ্লবের নেতা মাও-সে-তুঙের (১৮৯৩-১৯৭৬) ভাবনার মৌল পার্থক্য নেই। মাও বলেছিলেন যে, সাহিত্য ও শিল্পকলা সমালোচনার দুটি মানদণ্ড আছে, একটি রাজনৈতিক, অপরটি শৈল্পিক। এ দুয়ের সম্পর্ক বিচার করে তিনি লিখেছিলেন যে রাজনীতি এবং শিল্পকলা সমার্থক বলা চলবে না, কোনও একটি সাধারণ বিশ্ববীক্ষা ও শিল্পকলা সৃষ্টি পদ্ধতি ও শিল্প সমালোচনা পদ্ধতি সমার্থক নয়। শুধু বিমূর্ত ও সম্পূর্ণরূপে অপরিবর্তনীয় রাজনৈতিক মানদণ্ড স্বীকার্য নয়, বিমূর্ত অপরিবর্তনীয় শৈল্পিক মানদণ্ডও স্বীকার্য নয়। শ্রেণী সমাজে বিভিন্ন শ্রেণী ভিন্ন ভিন্ন রাজনৈতিক এবং শৈল্পিক মানদণ্ড আছে। শিল্পের যথাসম্ভব নিখুঁত শিল্প আঙ্গিক না থাকলে রাজনৈতিক প্রগতিশীলতা শিল্পকে উত্তীর্ণ করতে পারে না।

সমাজতান্ত্রিক বিপ্লব প্রসারিত হবার সঙ্গে সঙ্গে বিপ্লবের তত্ত্ব প্রয়োগ-পদ্ধতি নিয়ে একাধিক ভাবনা সমাজতন্ত্রীদের মধ্যে বিকাশিত হতে থাকে। সোভিয়েত লেখক সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয় ১৯৩৪ সালে। লু সুনের মৃত্যুর দু-বছর আগে এবং মাও-এর শিল্প-সাহিত্য সম্পর্কিত বক্তব্য প্রকাশিত হয় ১৯৪২ সালে ইয়েনানের মুক্ত অঞ্চলে। সোভিয়েতে প্রবর্তিত সমাজতান্ত্রিক বাস্তবতার তত্ত্বের উল্লেখ কিন্তু লু সুন বা মাও-এর লেখায় নেই। ১৯৫৭ সালে তা চৌ ইয়াঙের লেখা 'A Great Debate on the Literary Front' বক্তৃতায় বেশ কয়েকবার সমাজতান্ত্রিক বাস্তববাদের কথা বলা হয়েছে এবং একথাও বলা হল যে বিপ্লবী রোমান্টিকবাদ (Revolutionary Romanticism) সমাজতান্ত্রিক বাস্তবতার অপরিহার্য দিক।

ইতালিতে আন্তনিও ল্যাব্রিওলা (১৮৪৩-১৯০৪) তাঁর তত্ত্ব-ভাবনার দ্বারা আন্তনিও গ্রামশিকে (১৮৯১-১৯৩৭) বিশেষভাবে প্রভাবিত করেছিলেন। সাহিত্য-শিল্প বিচারে গ্রামশি মতাদর্শের (Ideology) ধারণাটিকে গুরুত্ব দিয়েছেন। গুরুত্ব অনুসারে মতাদর্শের চারটি স্তর : দর্শন, ধর্ম, সাধারণজ্ঞান ও লোককথা। তাঁর মতে মতাদর্শের ধারণা শিল্প, আইন, অর্থনৈতিক কাজকর্মে, ব্যক্তির ও সমষ্টিগত জীবনের সমস্ত প্রকাশের মধ্যে রয়ে গেছে। উপারিকাঠামো প্রসঙ্গে এবং সমগ্র বিশ্বসংস্কৃতির ওপরে পশ্চিমি সংস্কৃতির কর্তৃত্ব সম্পর্কে গ্রামশির বক্তব্য পরবর্তী মার্কসবাদী আলোচনার সূত্র হিসাবে নতুন দিশা এনেছে।

ইতালির মার্কসবাদী সাহিত্যতত্ত্ব প্রসঙ্গে পরবর্তী নাম গ্যালভানো ভেল্লা ভোলপে (১৮৯৫-১৯৮৬)। মার্কসবাদের নবব্যাখ্যাতা হিসাবে যেমন গেয়র্গ লুকাচের ঝোঁক হেগেলীয় দর্শনের দিকে। বৃহত্তর মার্কসীয় দর্শনের বৃত্তে থেকেও ভেল্লা ভোলপের ঝোঁক প্রত্যক্ষবাদের (Positivisn) দিকে। তাঁর *Critique of Taste* গ্রন্থে ঐতিহাসিক বস্তুবাদী সৌন্দর্যতত্ত্বের এক নিয়মানুগ-ব্যাখ্যা দিতে চেয়েছেন। যার দ্বারা সাধারণভাবে শিল্প ও কবিতার একটি সুসংবদ্ধ পাঠ গড়ে তোলা যাবে — চিত্রকল্প, ভাষা, দৃশ্যগ্রাহ্য শিল্পগুলির সম্পর্ক তাঁর আলোচ্য।

মার্কসবাদী 'দার্শনিক'রা, যাঁরা রাজনৈতিক কর্মকাণ্ডে প্রত্যক্ষভাবে যুক্ত থাকেননি, তাঁদের সাহিত্য-সংস্কৃতি আলোচনা জটিল, কখনও বা বিমূর্ত, এবং বিস্তার বৃদ্ধি পেলেও, তা একান্তই ইউরো-কেন্দ্রিক।

বিশশতকের চল্লিশের দশক থেকে সাহিত্য-সংস্কৃতি বিতর্কগুলিও মার্কসবাদবিরোধী সাহিত্য-দর্শনগুলির সঙ্গে নয়, বরং সেগুলি মার্কসবাদীদের বিভিন্ন আন্তঃইয়োরোপীয় 'স্কুলে'র মধ্যে থেকে উঠে এসেছিল। সাহিত্য-সংস্কৃতির আলোচনার ক্ষেত্রটি মতাদর্শের আলোচনাক্ষেত্রের মধ্যে একটি স্বশাসিত (autonomous) এলাকায় পরিণত হয়েছে।

ত্রিশের দশকে সাহিত্য-সংস্কৃতি বিষয়ক তাত্ত্বিক বা তার্কিকদের অনেকে নিজেরাই ছিলেন কবি, নাট্যকার, ঔপন্যাসিক। কিন্তু চল্লিশের দশকের ইয়োরোপীয় মার্কসবাদী দার্শনিকেরা শুধুই তাত্ত্বিক।

ফ্রান্স দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের সময় অল্প কিছুকাল জার্মানির অধীন ছিল। সে-পর্বটুকু (মে, ১৯৪০ থেকে জুন, ১৯৪৪) বাদ দিলে, শতাব্দীব্যাপী উদার গণতান্ত্রিকতার পরিমণ্ডলে যে কোনো মতবাদই নিপীড়ন ছাড়াই ফ্রান্সে বেড়ে উঠতে পেরেছে। জার্মান-অধিকারের পর্বে দেশপ্রেমিকদের সঙ্গে কমিউনিস্টরা প্রতিরোধযুদ্ধে শামিল হয়েছেন। মুক্তির পরে ফ্রান্সের খ্যাতনামা কবি, সাহিত্যিক, চিত্রশিল্পী, বিজ্ঞানী, বুদ্ধিজীবীরা হয় কমিউনিস্ট পার্টির সভ্য হয়েছেন অথবা কমিউনিস্টদের সহযাত্রী।

লুই আরাগঁ-র মতো প্রতিষ্ঠিত কবি ১৯২৭ সালেই পার্টি-সভ্য এবং ১৯৩০-এ সোভিয়েতে ঘুরে আসার পরে সুররিয়ালিস্ট আন্দোলন সঙ্গে তাঁর সম্পর্ক ছিন্ন করেন। পরবর্তীকালে সোভিয়েতের অনেক রাষ্ট্রনীতির তীব্র সমালোচক। কিন্তু প্রতিরোধ-পর্বের এলসা কবিতাগুচ্ছের পরে তিনি ঐতিহ্য-আগত কাব্যআঙ্গিকে ফিরে গেছেন ('জাতীয় আঙ্গিক, আন্তর্জাতিক বিষয়')। উপন্যাসের ক্ষেত্রে তিনি কথক হিসেবে অত্যন্ত সফল এবং মার্কসীয় দৃষ্টিভঙ্গিতেই কলুষিত বুর্জোয়াদের ধীরে ধীরে পতন ও প্রলেতারিয়েতের আশা-আকাঙ্ক্ষা ব্যক্ত করেছেন। সাহিত্যে 'পার্টি লাইন'-এর প্রয়োগ নিয়ে অন্যতম ফরাসি কমিউনিস্ট তাত্ত্বিক রজের গারোদির সঙ্গে বিতর্কে অবতীর্ণ হয়েছেন। কিন্তু তিনিও ভেবেছেন, 'কাব্যের স্বকীয় ডায়ালেকটিক খুঁজতে হয় তার নিহিত থেকে প্রকাশিতের অভিযানের মধ্যে, রূপহীন থেকে রূপায়িতের প্রক্রিয়ায়'। ('আরাগঁ', *সাহিত্যের ভবিষ্যৎ*, বিষ্ণু দে)— মার্কসীয় সাহিত্য আলোচনায় সাধারণভাবে আধারের চেয়ে আধেয়, আঙ্গিকের চেয়ে বিষয়ের ওপর গুরুত্ব দেওয়া হয়, কিন্তু আরাগঁ আধেয়ের মধ্যে নিহিত থেকে, আধারক্কে প্রত্যক্ষ করে তুলতে চেয়েছেন।

ঐতিহাসিক বস্তুবাদের সমাজবিকাশের যে পাঁচটি স্তরায়ণ তা সমগ্র মানবসমাজের ক্ষেত্রে 'চরম ও পরিপূর্ণ সত্য' বলে মনে করে প্রয়োগ করার কঠিন চেষ্টায় মার্কসবাদ কার্যকরতা হারিয়েছে বলে রজের গারোদি মনে করেছেন।

১৯৪৮ সালে প্রকাশিত *Literature of the Graveyard* বইতে গারোদি সাহিত্য-সংস্কৃতিকেও মানবমুক্তির মূল সমস্যার সঙ্গে সম্পর্কিত ভেবেছেন। শিল্পী কী বেছে নিচ্ছেন, তার একটি শ্রেণীবৈশিষ্ট্য আছে, তা সাহিত্যিক বা প্রকৌশলগত কারণগুলির দ্বারা নিয়ন্ত্রিত নয়। বাস্তবের কোনো একটি ক্ষেত্রে (aspect) তাঁর বিশ্বাসকে তিনি প্রকাশ করেন— যা কলুষিত ও মুমূর্ষু হয়ে যাচ্ছে অথবা যা জন্মলাভ করে বিকশিত হচ্ছে, যে-কোনো দিকে বিশ্বাস রাখতে পারেন। যিনি ক্ষয়ের দিকে, তিনি ক্ষয়েরই কমবেশি বর্ণসজ্জিত জটিল (sophisticated) চিত্র তৈরি করবেন। যেহেতু বর্তমান শিক্ষাপদ্ধতি শ্রেণীগত পদ্ধতি, তাই সংস্কৃতিও তার দ্বারা শ্রেণীগত বিশেষ অধিকারে। ভালো বই, সেই বই যা আমাদের কীভাবে বাঁচতে হবে এবং কীভাবে মরতে হবে শেখায়।— গারোদির এসব বক্তব্যে শ্রেণী-অবস্থান থাকলেও আঙ্গিক বা শিল্প-সাহিত্যে প্রকাশের রূপরীতি নিয়ে কোনো বক্তব্য নেই।

তার আগে, ১৯৪৬ সালে রজের গারোদি লিখেছিলেন, "কমিউনিস্ট পার্টির কোনো শিল্পতত্ত্ব নেই। কথাটা বলতেই হবে। আমরা আর ঐ 'ফর্মালিজম-রিয়ালিজমের' ঝগড়ায় কানে তালা লাগাতে চাই না।................কমিউনিস্ট শিল্পীদের কোনো উর্দি নেই। অন্য কোনো কমিউনিস্টের চেয়ে বেশি বা স্বতন্ত্র কিছু নেই। ফ্যাসিস্তরাই এক উর্দি পরে— খাকি বা কালো, এবং একভাবে হাত পা তোলে। আমরা, আমরা চলি মানুষের দিকে। কোন্ মানুষ? এমন কোনো মানুষ নয়, যার মুখে চরম মার্কামারা ছাপ। ....মার্ক্সিসম কারাগার নয়। সে শুধু বিশ্ব বোঝার এক উপায় বা যন্ত্র। বহু লক্ষ লক্ষ লোক বুঝতে পারে একই ধরনে কিন্তু প্রকাশ করে ভিন্নভাবে। যে বলে আমরা আমাদের শিল্পীদের বা সঙ্গীতকারদের বা যে-কোনো লোকের উপর উর্দি বা ব্যাজ চাপাই, সে হয় আমাদের শত্রু, না হয় গণ্ডমূর্খ। [অনুবাদ : বিষ্ণু দে, সাহিত্য-পত্র, অষ্টম বর্ষ, চতুর্থ সংখ্যা, ১৩৬৪]

ফরাসি দেশের আবহাওয়ায়, যেখানে প্রতি বছরেই প্রায় একটি নতুন তত্ত্ব বা 'ইজম' সৃষ্টি হয়, সেখানে মার্কসবাদীদের সাহিত্যতত্ত্ব এবং সংগঠনতত্ত্ব, বিনির্মাণতত্ত্ব, নব ইতিহাসবাদ, চিহ্নতত্ত্ব ইত্যাদি (Structuralism, Deconstruction, New Historicism, Semiotics etc.) তত্ত্ব পাশাপাশি পরস্পরকে অংশত আবৃত (overlap) করেছে। সাধারণভাবে একথাও বলা যায়, উল্লিখিত বহু তত্ত্বই বেড়ে উঠেছে মার্কসবাদের পক্ষে, বিপক্ষে বা মার্কসবাদ ও অন্য মতবাদের মধ্যে থেকে কিছু কিছু নিয়ে সমন্বয়ের চেষ্টায়।

এই তাত্ত্বিকদের মধ্যে যাঁদের প্রধান ঝোঁক মার্কসবাদের দিকে, তাঁরা হলেন :

লুইসিঅঁ গোল্ডম্যান (Lucien Goldmann : ১৯১৩—১৯৭০)
রলাঁ বার্ত (Roland Barthes : ১৯১৫—১৯৮০)
লুই আলতুসের (Louis Althusser : ১৯১৮—১৯৯০)
পিয়ের মাশারি (Pierre Machery : >)
জুলিয়া ক্রিস্তেভা (Julia Kristeva : >)

বর্তমানের এই সাহিত্যবিতর্কের মূল বিষয় হল নিরীক্ষাধর্মী (avant-garde) ও নব নব আঙ্গিক-নির্মাতাদের সঙ্গে ঐতিহ্য-আগত কাহিনিনির্ভর সাহিত্য ও নাটক বা শিল্পের প্রতিতুলনা। নিরীক্ষাধর্মীদের বক্তব্য ও বিরোধিতার যুক্তি হল ঐতিহ্য অনুসারী সৃষ্টির বিষয় যতই বিপ্লবী হোক-না-কেন, তা শিল্প-সাহিত্যের ক্ষেত্রে সক্রিয়তা ও সমালোচনামূলক বীক্ষাকে নিরুৎসাহিত করে। এই যুক্তির ওপরে ভিত্তি করেই বাস্তববাদের ওপর আঘাত হানা হয়। বলা হচ্ছে যে ঐতিহ্য-অনুসারী বাস্তববাদ, এক ঐক্যবদ্ধ ও সামঞ্জস্যপূর্ণ কাহিনি-বিবৃতির (narrative) ওপর

যার ভিত, তা বাস্তব বিরোধগুলিকে এবং বিরোধীগুলিকে (oppositions) প্রতিফলিত করতে গিয়ে অস্পষ্ট করে তোলে এবং বিশ্বকে তুলে ধরতে গিয়ে এক কৃত্রিম ঐক্যকে অভিক্ষেপ করে। বিপরীতে, আধুনিকতাবাদী পাঠে বিরোধের নানা দিক ধরতে সক্ষম, যা নিহিত বা নির্বাক, তা-ও প্রকাশ করতে পারে—পাঠকে (text) টুকরো টুকরো করে বা তার মধ্যে বিরতির কৌশলগুলি অবলম্বন করে তা করা সম্ভব।

গোল্ডম্যানের প্রদর্শিত মার্কসীয় সমালোচনার রূপটিকে তিনি 'সংগঠনবাদী প্রজ্ঞাত' (Structuralisme genetique) নাম দিয়েছেন। তিনি সমাজতত্ত্বের পদ্ধতিগুলিকে যেমন ব্যবহার করেছেন, তেমন তিনি লুকাচের ভাবনা ও রচনাবলির দ্বারাও প্রভাবিত হয়েছেন। মার্কবাদীরা এর আগে সাধারণত সাহিত্যের বিষয়ের মধ্যেই সমাজ ও সামাজিক সত্যের সম্পর্কটি প্রকাশিত হয় বলে মনে করেছেন। কিন্তু গোল্ডম্যান মনে করেছেন যে সমাজ ও সাহিত্যের মধ্যেকার সম্পর্ক সাহিত্যের বিষয়ে (content) নয়, সংগঠনে (structure) প্রকাশিত হয়।

সমালোচক হিসেবে রলাঁ বার্ত-এর প্রভাব প্রধানত ১৯৫৩ সাল থেকে বিস্তৃত হতে থাকে। ওই বছরই তিনি Theatre populaire নামক পত্রিকা প্রকাশে সাহায্য করেন। বার্তের ওপর ফ্রয়েডের মনোবিশ্লেষণের তুল্য প্রভাব মার্কসবাদের। শুধু এই দুই মতবাদ নয়, তার সঙ্গে অস্তিত্ববাদী ও সংগঠনবাদ মতবাদের দ্বারাও তিনি প্রভাবিত। বার্তের মতে মানবিক সংযোগ (communication) সবসময়ই সংকেত বা চিহ্নের পদ্ধতির দ্যোতক— এর থেকেই চিহ্নতত্ত্বের ওপর তাঁর একাধিক আলোচনা-গ্রন্থ রচিত হয়েছে।

আলতুসের-এর বৈশিষ্ট্য হল তিনি মার্কসবাদের 'মানবতাবাদী' ও 'হেগেলীয়' ব্যাখ্যার বিরোধিতা করলেন। গ্রামশির মতোই 'মতাদর্শের' ওপর জোর দিয়েছেন। কিন্তু গ্রামশির মতে শাসকশ্রেণী মতাদর্শগত প্রভুত্বের দ্বারাই অন্য শ্রেণীগুলির ওপর প্রধানত কর্তৃত্ব করে। সাহিত্য ও মতাদর্শের সম্পর্কটি মার্কসবাদে বিতর্কিত বিষয়। কেউ কেউ শিল্প-সাহিত্যকে প্রভুত্বকারী মতাদর্শের প্রকাশরূপে ভেবেছেন— লেখকরা মতাদর্শের অনৃত চৈতন্যে (false consciousness) যেহেতু আবদ্ধ, সে কারণে তাঁরা তাঁদের সামাজিক সত্যকে দেখতে পান না। আলতুস-এর বক্তব্য হল, আমরা সকলেই মতাদর্শের বিষয়ী (subjects), সমাজকাঠামোয় তার দ্বারাই আমাদের স্থান গ্রহণের ডাক আসে। প্রতিটি সমাজেই মতাদর্শ পুনরুৎপাদিত হচ্ছে। মতাদর্শ হল ব্যক্তিদের বাস্তব অস্তিত্বের অবস্থার পারস্পরিক সম্পর্কের কাল্পনিক প্রতিরূপ। এই কাল্পনিক চৈতন্য বা চেতনা বিশ্বের অর্থবোধে আমাদের সহায়তা করে, কিন্তু একইসঙ্গে বিশ্বের সঙ্গে আমাদের বাস্তব সম্পর্কটি মুখোশে ঢেকে দেয়, বা অবদমিত করে। 'স্বাধীনতা'র (freedom) ধারণা যেমন শ্রমজীবী সহ সকলের মুক্তির বিশ্বাস এগিয়ে দেয়, কিন্তু এই মুখোশে ঢাকা রয়েছে আসল সম্পর্ক, তা হল উদারনৈতিক ধনতন্ত্রী অর্থনৈতিক সম্পর্ক। প্রভুত্বকারী মতাদর্শকে পদানত শ্রেণীগুলি সাধারণ জ্ঞান (common sense) হিসেবে মেনে নেয় এবং তাতে প্রভুত্বকারী শ্রেণীগুলির স্বার্থ সুরক্ষিত হয়। আলতুসের-এর মতে শিল্প শুধু মতাদর্শের প্রকাশ নয়, শিল্প যেহেতু যে মতাদর্শ থেকে পুষ্টিলাভ করেছে, তার থেকে পিছিয়ে এসে, কাহিনিগত দূরত্ব তৈরি করতে সক্ষম, সেই কারণে জ্ঞান (knowledge) এবং মতাদর্শের মধ্যবর্তী একটি এলাকায় শিল্পের অবস্থান ['I do not rank real art among ideologies, although art does have a quite particular and specific relationship with ideology': Lenin and Philosophy.]

মাশারি তাঁর *A Theory of Literary Production* (1966) গ্রন্থে নিজের বক্তব্যগুলি ব্যাখ্যা করেছেন। তাঁর মতে মানসিক চেতনার যে অবস্থাকে আমরা মতাদর্শ বলি, সেই মতাদর্শ সাহিত্যিক পাঠের (text) অন্তর্গত হওয়ার পরে অন্য একটি রূপ পরিগ্রহ করে। মতাদর্শ এমনভাবে সাধারণত থাকে যেন তা সামগ্রিকভাবে প্রাকৃতিক, স্বাভাবিক ; যেন তার 'কাল্পনিক' (imaginary) আলোচনা বাস্তবের নিখুঁত ব্যাখ্যা প্রদান করে। এতৎসত্ত্বেও সাহিত্যের পাঠের মধ্যে মতাদর্শ কার্যকর যখনই হয়, মতাদর্শের মধ্যে স্থিত সমস্ত বিরোধ ও ফাঁক প্রকাশ হয়ে পড়ে। সমালোচককে মনোবিশ্লেষকের মতো কাজ করতে হবে এবং পাঠে না-বলা বক্তব্যটি ধরতে হবে, পাঠে যে অচেতন অবদমন তা পাঠটি লাক্ষণিকভাবে (symptomatically) পড়ে বুঝতে হবে। মাশারি আলতুসের সঙ্গে একমত যে সাহিত্যিক পাঠগুলি কোনো-একটি মতাদর্শকে উত্তীর্ণ হয়ে যেতে সক্ষম, সাহিত্য মতাদর্শের শুধু প্রকাশকে ছাড়িয়ে যাওয়ার ক্ষমতা রাখে। সাহিত্যের পাঠ (text) মতাদর্শগত নির্ধারিত চিত্ররূপ নির্মাণ করে, পাঠের মধ্যে প্রাণবন্ত, রূপে না হয়ে বরং একটি বিষয় (object) হিসেবে তাকে উন্মোচিত করে। মতাদর্শ তো স্বতই স্বীয় অস্তিত্ব নিয়েই অদৃশ্য, মতাদর্শ বোধগম্য হয়েও অদৃশ্য, শিল্প আমাদের সেই অদৃশ্য মতাদর্শকে দৃষ্টিগ্রাহ্য করে তুলতে সহায়তা করে। সাহিত্যিক রূপ-আঙ্গিকের মাধ্যমে সাহিত্য এই দূরত্বায়ন (distantiation) সফল করতে সক্ষম হয়। ক্রিস্তেভা সমালোচনার সাধারণ ধারা থেকে কবিতাকে অব্যাহতি দেওয়ার জন্য মনোবিশ্লেষণের তত্ত্ব ব্যবহার করেছেন। তাঁর মতে পশ্চিমি ভাবনা এক ঐক্যবদ্ধ বিষয়ের (subject) প্রয়োজনীয়তা ধরে নিয়ে চালু থাকছে, যা পদবিন্যাসের (syntax) সুস্থিতায়ন মাধ্যমে সহজতর ও সুনিশ্চিত হয়েছে। এতৎসত্ত্বেও যুক্তি কোনো সময়েই একাধিপত্য করতে পারেনি, সুখ এবং আকাঙ্ক্ষা যুক্তির স্বচ্ছ রেখাকে ভাঙচুর করে চলে। একটি মানব একটি স্থান বা দেশ (space), যার মধ্য দিয়ে অনিয়মিত শারীরিক ও মানবিক তাড়নার প্রবাহ প্রবাহিত ও পুনঃপ্রবাহিত হয়ে চলেছে। এই প্রবাহ শৈশব থেকে পরিবার ও সমাজের বাধাগুলি দ্বারা ধীরে ধীরে নিয়ন্ত্রিত হয়। পরিণত প্রাপ্তবয়স্কের নিয়ন্ত্রিত ভাষাবিজ্ঞান ও সামাজিক ক্রিয়া-কলাপের গভীরে প্রাক-ভাষাবিজ্ঞান প্রবাহ সক্রিয় থাকে। ক্রিস্তেভা এই বস্তুকেই চিহ্নবিজ্ঞান (semiotic) বলেছেন, কারণ তা অসংগঠিত নিশানাদায়ী, মর্মার্থজ্ঞাপক প্রণালী। চিহ্নবিজ্ঞানগত প্রবাহের নিয়ন্ত্রণে যুক্তি, পদবিন্যাস, এবং যুক্তিবাদ উৎপন্ন হয়, যেগুলি প্রতীকী। কবিতা, বিশেষভাবে আধুনিকতাবাদী কবিতা চিহ্নবিজ্ঞানগত আকাঙ্ক্ষা তাড়নাকে জন্ম দিতে সুযোগ দেয় এবং 'প্রতীকী'র ক্ষেত্রে বিপদের কারণ হয়ে দাঁড়ায়। নিরীক্ষাধর্মী শিল্পী ও কবিরা অবদমনমূলক কাঠামোর মধ্য দিয়ে শৃঙ্খলা আরোপের ঝোঁকের প্রতিস্পর্ধী। কিন্তু ক্রিস্তেভা অস্বাচ্ছন্দ্যের সঙ্গে এটাও লক্ষ করেছেন যে নিরীক্ষাধর্মী অনেক শিল্পী, যেমন, লরেন বা পাউন্ড ফ্যাসিবাদের প্রতি আকৃষ্ট হয়েছেন। ক্রিস্তেভার চিহ্নবিজ্ঞানের তত্ত্ব 'ঐতিহ্য' 'প্রভাব' ইত্যাদি ধারণাগুলির প্রতিস্পর্ধী। ক্রিস্তেভার তত্ত্বে প্রচলিত সাহিত্যতত্ত্বে মাত্র কয়েকটি পরিচিত বর্গই অবশিষ্ট থাকছে, যেমন, সাহিত্যকর্ম, ঐতিহ্য, উৎস ইত্যাদি।

দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের পরে রাশিয়া, চীন এবং পূর্ব-ইয়োরোপের পার্টিগুলি ছাড়াও সমগ্র বিশ্বের ৬৭টি দেশে কমিউনিস্ট পার্টি সক্রিয় ছিল। এর মধ্যে লাতিন আমেরিকার তেরোটি দেশে কমিউনিস্ট পার্টি সক্রিয় ছিল। এসব দেশেও শিল্প-সাহিত্যের সমস্যা নিয়ে মার্কসবাদীরা অল্প স্বল্প ভেবেছেন।

মেকসিকোর সিকেরস (David Alfaro Siqueros : ১৮৯৬-১৯৭৪) আধুনিক চিত্রশিল্পী হিসেবে খ্যাতি লাভ করেছেন, মেকসিকোর বিশাল ম্যুরাল চিত্রগুলির জন্য তাঁর খ্যাতি। ছাত্র

আন্দোলনের মধ্যে দিয়েই চিত্র-আন্দোলনে তাঁর দীক্ষা। স্পেনে ফ্যাসিবিরোধী যুদ্ধে যোগ দেন। তাঁর রাজনৈতিক সক্রিয়তা ও শৈল্পিক কাজ অবিচ্ছিন্নভাবে চলেছে। শিল্প সম্পর্কে ১৯২০ সাল থেকে আমৃত্যু নানা প্রবন্ধ লিখেছেন। চিত্রশিল্প ও ভাস্কর্যের সঙ্গে বাস্তবাদের সম্পর্ক ও সমস্যাগুলি তাঁর রচনার অন্যতম বিষয়, 'বাস্তববাদ বলতে আমরা বুঝি (যে ক্ষেত্রে শব্দটিকে ব্যবহারের ফলে যা কিছু প্রচলিত অর্থ গ্রহণ করেছে) : যুক্তি, কাণ্ডজ্ঞান, প্রমাণিত তথ্যের প্রতি এবং ভাস্কর্য ও চিত্রকলার ক্ষেত্রে পার্থিব নিয়ন্ত্রক গুলির আবিষ্কার (ভৌগোলিক, আবহাওয়া-বিষয়ক ইত্যাদি) এবং বিষয়, আঙ্গিক ও শৈলীর নির্ধারকগুলিও আবিষ্কার করা........ চিত্র-ভাস্কর্যের প্রসঙ্গে বাস্তববাদ বলতে আমাদের বুঝতে হবে সমস্ত প্রকার পূর্ব-সিদ্ধ (a priori) তাড়নার এবং সমস্ত প্রকার খামখেয়ালি উদভাবন দমন করা' (Art & Revolution)। সিকেরস তাঁর রাজনৈতিক চেতনা ও শিল্পচেতনার দ্বারাই চালিত হয়েছেন, সমাজতান্ত্রিক বাস্তববাদের তত্ত্ব অনুসরণ করেননি।

ভাসকেজের (Adolfo Sanchez Vazquez : ১৯১৫—) আলজেরিয়ায় জন্ম, স্পেনের গৃহযুদ্ধে যোগ দিয়ে জে. এস. ইউ. (Juventud Socialista Unificada)-এর মুখপাত্রের কর্মকর্তা হন এবং মুক্তিবাহিনীতেও যোগ দেন। যুদ্ধের পরে মেকসিকোর স্থায়ী বাসিন্দা এবং সেখানে Universidad Autonoma-র সৌন্দর্যতত্ত্বের অধ্যাপক। ভাসকেজ দেখিয়েছেন যে মার্কস-কথিত ধনতান্ত্রিক উৎপাদনব্যবস্থায় শিল্পের প্রতি বিরূপতা রয়েছে তিনটি স্তরে : (১) উৎপাদন বা সৃষ্টির স্তরে, (২) ভোগ বা উপভোগের স্তরে, (৩) সামাজিক শ্রম-বিভাজনের স্তরে। শিল্প ও ধনতন্ত্রের মধ্যে বিরোধ মৌলিক, অপরিহার্য। তার শিকড় রয়েছে মানবজাতি এবং ধনতন্ত্রের মধ্যে বিরোধ, এবং যেহেতু শিল্প মানবসমাজের পক্ষে অপরিহার্য সারাৎসারের ক্ষেত্র, তা ধনতন্ত্রের মারমুখি বিরোধিতায় অত্যন্ত ক্ষতিগ্রস্ত হয়। [Art and Society]

ত্রিশের দশকে মারকিন যুক্তরাষ্ট্র শিল্প-সাহিত্য-সংগীতের জগতের মার্কসবাদের প্রভাব বিস্তৃত হয়। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের ম্যাকার্থি রাজের সন্ত্রাসে ও রুশ কমিউনিস্ট পার্টির বিংশ কংগ্রেসের রিপোর্টের পরে সে দেশে মার্কসবাদীদের সংখ্যা হ্রাস পায় ও মার্কসতাত্ত্বিকদের (Marxologists) সংখ্যা বৃদ্ধি পেয়েছে।

কিন্তু শিল্প-সাহিত্যের বিশ্লেষক ও ব্যাখ্যাতা হিসেবে অনেক মূল্যবান কাজ সেখানে হয়েছে। এখানে সংক্ষেপে সামান্য কিছু উল্লেখ করা হল :

ফাস্ট (Howard Fast) ঔপন্যাসিক হিসেবে বিখ্যাত। বিংশ কংগ্রেসের পরে তিনি কমিউনিজমের সঙ্গে সম্পর্ক ছেদ করেন। কিন্তু ১৯৫০-এ তাঁর সাহিত্যতত্ত্ব সম্পর্কিত গ্রন্থে (*Literature and Reality*) তিনি দেখেছিলেন, বাস্তবের সঙ্গে লেখকের সম্পর্ক সাহিত্যে প্রতিফলিত হয়। সমাজ থেকেই সাহিত্যের সৃষ্টি এবং সমাজের সবচেয়ে যথার্থ প্রতিফলন সাহিত্যেই ঘটে— এই দৃষ্টিভঙ্গি থেকেই তিনি প্রগতিশীল মারকিন সাহিত্যের পরিচয় রেখেছেন।

ফনার (Philip S. Foner) মূলত মারকিন সমাজ-ইতিহাসের ওপর বহু গ্রন্থ লিখেছেন। দুই মারকিন প্রগতিবাদী সাহিত্যিকের জীবন ও সাহিত্য নিয়ে লিখেছেন, একজন মার্ক টোয়েন, অন্যজন জ্যাক লণ্ডন— এই দুজন সম্পর্কে ফনারের আলোচনা সামাজিক-ঐতিহাসিক বিশ্লেষণে গভীর ও গুরুত্বপূর্ণ। মার্ক টোয়েনের ক্ষেত্রে অপ্রকাশিত পাণ্ডুলিপির সাহায্যে তিনি টোয়েনের জীবন ও ভাবনার নানা দিক দেখিয়েছেন।

ফিনকেলস্টেইনের (Sidney Finkelstein) প্রথম আলোচনা-গ্রন্থ সমাজ ও শিল্প-বিষয়ক। তাঁর *Realism in Art* গ্রন্থে শ্রমের পদ্ধতির সঙ্গে সৌন্দর্যের সম্পর্ক, শ্রেণীসমাজে শিল্প, গ্রিক

শিল্পে বাস্তবতা ও প্রকৃতিবাদ, শিল্পের সঙ্গে ধর্ম ও শ্রেণীসংগ্রামের সম্পর্ক,শিল্পের সমাজ-ইতিহাস এবং শিল্পে বাস্তববাদ বিশ্লেষণ করেছেন। তাঁর *How Music Expresses Ideas* গ্রন্থে পাশ্চাত্য সংগীতের অন্তর্গত মানবিক রূপ ও সৌন্দর্যের প্রকাশকে ব্যাখ্যা করতে চেয়েছেন— শ্রেণীসমাজে সৃষ্টি হয়েও শ্রেষ্ঠ সংগীত কীভাবে শ্রেণীকে অতিক্রম করে যায়, তা দেখাতে চেয়েছেন। *Sense and Nonsense* গ্রন্থে মারকিন প্রচারমাধ্যম, বিশেষভাবে টেলিভিশন-প্রচারমাধ্যমে কীভাবে মননহীন এক জনগণকে গড়ে তোলা হচ্ছে, যারা রাষ্ট্রের যে-কোনো অপপ্রচারকে মেনে নিতে প্রস্তুত থাকবে— তা তথ্য সহ ফিনকেলস্টেইন বিশ্লেষণ করেছেন। *Who Needs Shakespeare?* গ্রন্থে শেকসপিয়ারের সামাজিক ভাবনার মহনীয়তা, লেখক হিসেবে গভীরতম অর্থে শেকসপিয়ারের রাজনীতি ভাবনা ও সাহিত্যে সে ভাবনার প্রকাশ এবং সামাজিক নৈতিকতার ধারণা বিশ্লেষণ করে শেকসপিয়ারের কাব্যের অতুলনীয় সৌন্দর্য ব্যাখ্যা করেছেন। মারকিন সাহিত্যে বিচ্ছিন্নতার প্রভাব ও রূপও তিনি বিশ্লেষণ করেছেন।

জেরোম (V. J. Jerome) তাঁর *Culture in a Changing World*-এ মারকিন সংস্কৃতির প্রতিক্রিয়াশীল মতাদর্শ, সে মতাদর্শের প্রত্যক্ষ রাজনৈতিক প্রকাশ, জনগণের গণতান্ত্রিক সৃজনশীলতা কীভাবে সাংস্কৃতিক কাজে প্রকাশ পায়, মার্কসবাদী সংস্কৃতিকর্মীদের ভূমিকা নিয়ে আলোচনা করেছেন।

সিলেন (Samuel Sillen) তাঁর *Walt Whitman*-এ হুইটম্যানের কাব্যে মারকিন গণতন্ত্রের ভাবনার খাঁটি রূপটির বিশ্লেষণ করেছেন।

রুবিনস্টেইন (Annette T. Rubinstein) তাঁর *From Shakespeare to Shaw* নামক দু-খণ্ডের বিশাল গ্রন্থে ইংরেজি সাহিত্যের বাইশজন প্রধান কবি নাট্যকার ঔপন্যাসিকের জীবন ও সাহিত্য এবং তাঁদের সময়ের রাজনীতি ও সমাজের সঙ্গে সংযোগসূত্রটি বিশ্লেষণ করেছেন।

মারগোলিয়েস (David N. Margolies) *The Function of Literature*-এ কডওয়েলের সৌন্দর্যতত্ত্বের নতুন ব্যাখ্যা উপস্থিত করেছেন এবং জীবন ও সমাজে সাহিত্যের ভূমিকা ব্যাখ্যা করতে চেয়েছেন এবং এ কথাও বলেছেন যে কডওয়েলের তত্ত্বে ভুল নেই, সেই তত্ত্ব সাহিত্য বিচারের প্রয়োগে ভুল থেকে গেছে।

সিয়েগেল (Paul N. Siegel) ত্রোতস্কির *On Literature and Art* গ্রন্থটি সম্পাদনা ছাড়াও তাঁর *Revolution and the 20th-Century Novel*-এ বিশ শতকের দশটি খ্যাতনামা উপন্যাসের ত্রোতস্কিবাদী বিচার করেছেন ও আমাদের নতুনভাবে ভাবাতে চেয়েছেন। রোজমন্ট (Frandlin Rosemwnt) সুররেয়ালিস্ট আন্দোলনের প্রধান দলিলগুলি অতি দক্ষতায় সম্পাদনা করেছেন।

সুলিভান (Robert Sullivan) কডওয়েলের ওপর একটি পূর্ণাঙ্গ গ্রন্থ রচনা করে বলেছেন যে বাস্তবধর্মী মনস্তত্ত্বের অনুসন্ধান, যা 'চিহ্নে'র সামাজিক প্রকৃতির ওপর ভিত্তি করে গড়ে ওঠে এবং জীববিদ্যা, শারীরবিদ্যা, মনস্তত্ত্ব ইত্যাদির এক অতি চমৎকার সমন্বয় কডওয়েল করেছেন। উত্তর-সংগঠনবাদী যুগেও কডওয়েলের প্রাসঙ্গিকতা রয়েছে।

আমেরিকার ত্রিশের দশকে বামপন্থী ও তাঁদের সহযাত্রীদের হাতে যথেষ্ট এবং উন্নত মানের মৌলিক সাহিত্য ও আলোচনা রচিত হয়েছে। সে সময়ের বামপন্থী সাহিত্য পত্রিকা 'নিউ মাসেস'-এর সম্পাদকমণ্ডলীর সদস্য ও পরে কমিউনিস্ট-বিরোধী গ্র্যানভিল হিক্স দশকটির পর্যালোচনা করে লিখেছেন, 'কিন্তু এখন (১৭৬৭) আমরা, আমাদের মধ্যে যারা ওই পর্বের সংগ্রামে ও বিতর্কে জড়িত ছিলাম— শান্তদৃষ্টিতে সময়টাকে দেখতে পারি। আমরা যা দেখি,

আমি যেটা দেখাতে চেয়েছি যে দশকটি ছিল উৎসাহব্যঞ্জক দশক এবং সাহিত্যের বিচারে বন্ধ্যা বা সৃষ্টিহীন নয়।' [As We Saw the Thirties]

সাম্প্রতিক কালে মার্কসীয় ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণের সঙ্গে সাহিত্যের তত্ত্বও আমেরিকায় তৈরি হচ্ছে। এঁদের অনেকের ওপরেই তথাকথিত ফ্রাঙ্কফুট স্কুলের প্রভাব পড়েছে। ফলে, সাহিত্য আলোচনায় মার্কসীয় বৃত্তের মধ্যেই হেগেলীয় ঝোঁক লক্ষ করা যেতে পারে। আমেরিকায় মার্কসীয় সাহিত্যতত্ত্বের প্রতিভূ হিসেবে জেমসন (Fredric Jameson)-এর নাম করা যেতে পারে। জেমসন বহু বিষয়ের ওপর লিখছেন এবং অতি দ্রুত লিখছেন। তাঁর *Marxism and Form* গ্রন্থে আডোর্নো, বেনিয়ামিন, মারকুজ, ব্লখ, লুকাচ ও সার্ত্র-এর ওপর আলোচনা করেছেন, গোল্ডম্যান দেখেছিলেন, সমাজ ও সাহিত্যের সম্পর্ক— বিষয়ে নয়, সংগঠনে প্রকাশিত হয়। জেমসন দেখালেন যে, যে সুনির্দিষ্ট সামাজিক মুহূর্তের মধ্যে সাহিত্যিক বা শৈল্পিক সৃষ্টির মূল নিহিত, সেই অবস্থার সঙ্গে শিল্প-সাহিত্যের দ্বান্দ্বিক সম্পর্ক বোঝার মূল দিশাটি থাকে শিল্প-সাহিত্যের আঙ্গিকে, বিষয়ে নয়। *The Prison House of Language*-এ সংগঠনবাদ ও রুশ আঙ্গিকবাদের ওপর আলোচনা করে সংগঠনবাদী ও আঙ্গিকবাদীদের প্রণালীতত্ত্বের (methodology) সমালোচনা করেছেন।

জেমসনের *The Political Unconscious* নামে গ্রন্থটি নানা কারণে উল্লেখযোগ্য। কাহিনির (উপান্যাস) মধ্যে সমাজের প্রতিফলন ঘটে, কিন্তু কাহিনিই সামাজিকভাবে প্রতীকী ক্রিয়া। সে কারণে রাজনৈতিক প্রসঙ্গ (context) বা ক্ষেত্র থেকে বিচ্ছিন্ন থেকে সাহিত্য সৃজন হতে পারে না। সাহিত্যের ব্যাখ্যায় সৌন্দর্যতত্ত্বের সহযোগী হিসেবে শুধু রাজনৈতিক ব্যাখ্যা ঠিক নয়, সাহিত্যের সমস্ত অধ্যয়ন ও উপলব্ধির কেন্দ্রে রয়েছে পাঠের (text) রাজনৈতিক ব্যাখ্যা। তাঁর মতে, "It is only at this price— that of the simultaneous recognition of the ideological and Utopian functions of the artistic text— that a Marxist cultural study can hope to play its part in political praxis, which remains, of course, what Marxism is all about." জেমসনের *Postmodernism* গ্রন্থেও ইয়োরোপের উর্ত্তীণ আধুনিকতার তত্ত্ব ও প্রয়োগ প্রসঙ্গে আলোচনা করেছেন "The postmodern has, however, reached a later stage than that : unlike the delight of the modern in its projection of wonder-working machinery at the critical point is subject to the gravest misunderstanding if we do not realise that this is precisely how postmodern technology consumes and celebrates itsesf."

জেমসনের রচনাগুলির প্রধান দিক হল, মারকিন ভূমিতে থেকেও উনিশ শতকী ইয়োরোপীয় সাহিত্য এবং নব্য মার্কসবাদ এবং তার সাহিত্যতত্ত্ব তাঁর ভাবনার উপজীব্য। আলতুস-এর মতো, জেমসনও মনে হয় তাত্ত্বিক কর্ম ও প্রয়োগের একটি রূপ ধরে ইয়োরোপীয় ক্ষেত্রকে তাত্ত্বিক প্রয়োগের ক্ষেত্র হিসেবে গ্রহণ করেছেন, আমেরিকা ও লাতিন আমেরিকার রাজনৈতিক প্রয়োগের (Political praxis) সমকালীন রূপ বা লাতিন আমেরিকার নতুন সাহিত্য ও তার মতাদর্শগত ভিত্তিভূমি নিয়ে কিছু ভাবেননি।

ত্রিশের দশকের সূচনার আগেই ইয়োরোপীয় ভূখণ্ডে আর-এক বিশ্বযুদ্ধের প্রস্তুতি স্পষ্ট হয়ে ওঠে। ধনতন্ত্রী বিশ্বে অভূতপূর্ব অর্থনৈতিক মন্দা, স্পেনের গৃহযুদ্ধ ফ্যাসিবাদের উত্থান ইতালির আবিসিনিয়া দখল ইত্যাদি এক সামগ্রিক সংকট সৃষ্টি করে। সেই সংকট পৃথিবীর সমস্ত মানুষকে প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষভাবে স্পর্শ করলেও মার্কসবাদীদের কাছে

সময়টি নিরালোক নিরাশার মনে হয়নি। জায়মান সোভিয়েত রাষ্ট্র তাঁদের আশাবাদী হওয়ার সুযোগ দিয়েছে।

ত্রিশের দশকে ইংল্যান্ডেও অনেক কবি সাহিত্যিক বুদ্ধিজীবী মার্কসবাদের আদর্শের প্রতি ঝুঁকে পড়েন। সেই সময়ে প্রকাশিত সাহিত্যতত্ত্বের ক্ষেত্রেও অন্তত তিনটি গ্রন্থে সাহিত্যাদর্শের বিচার-বিশ্লেষণ তত্ত্ব লক্ষ করা যাবে। তিনটি গ্রন্থই প্রকাশিত হয় ১৯৩৭ সালে।

১. *নভেল অ্যাণ্ড দ্য পিপ্‌ল* গ্রন্থে র‍্যালফ ফক্‌স উপন্যাসের সাহিত্যতত্ত্ব,— তার বাস্তবতা , নায়কের বিবর্তন, কাহিনির গুরুত্ব, ইত্যাদি নিয়ে আলোচনা করলেন।

২. এলিক ওয়েস্ট তাঁর *ক্রাইসিস অ্যাণ্ড ক্রিটিসিজম*-এ বুর্জোয়া সাহিত্য-সমালোচনার সংকট, বিশেষভাবে এলিয়টকে প্রাসঙ্গিক করে সে সংকটের বিশ্লেষণ করে মার্কসবাদী সাহিত্য-সমালোচনার লক্ষ্য নির্দেশ করতে চেয়েছেন।

৩. ক্রিসটোফার কডওয়েলের *ইলিউশান অ্যাণ্ড রিয়ালিটি*তে কবিতার জন্ম ও বিকাশের বিষয়টি আলোচিত হয়ে প্রথম যুগ থেকে সমকালীন ইংরেজি কবিতার শ্রেণী উৎস নির্দেশের চেষ্টা করেছেন।

যুদ্ধের বছরগুলিতে সাহিত্য ও তাত্ত্বিক বির্তক কিছু পরিমাণে স্তিমিত হয়েছে স্বাভাবিকভাবেই। কিন্তু যুদ্ধের পরে, ১৯৫১ সালে ইংল্যান্ডের মর্ডান কোয়ার্টালি পত্রিকায় কডওয়েলের *ইলিউশন অ্যান্ড রিয়ালিটি* সহ সমগ্র রচনা নিয়েই ব্রিটিশ কমিউনিস্ট পার্টির বুদ্ধিজীবীদের মধ্যে তীব্র বিতর্ক হয়। ইংল্যান্ডের অন্য পত্রিকা, কমিউনিস্ট রিভিয়্যু-ও এই বিতর্কে যোগ দেয়। বির্তকের এক পক্ষের বক্তব্য : কডওয়েলের চিন্তা মার্কসবাদ-বিরোধী, তিনি ফ্রয়েডীয় উপাদানকে ব্যবহার করেছেন, যা মার্কসবাদের সঙ্গে সংগতিপূর্ণ নয়। অন্য পক্ষের বক্তব্য, কডওয়েলের চিন্তা মার্কসবাদী সাহিত্য-সংস্কৃতি ভাবনায় গুরুত্বপূর্ণ সংযোজন, যদিও সে বক্তব্য কোনো কোনো ক্ষেত্রে রূপরেখামাত্র এবং কিছুটা অস্পষ্ট। ষাটের দশকে কডওয়েল নিয়ে নতুন বির্তক ও ভাবনার সূচনা হয়েছে এবং চলছে।

প্রসঙ্গত মনে রাখা দরকার যে উল্লিখিত বিতর্কে কডওয়েলের কোনো জবাবি-ভূমিকা থাকেনি। কেননা, তাঁর তত্ত্বভাবনাকে প্রয়োগে রূপায়িত করার প্রয়াসে তিনি স্পেনের গৃহযুদ্ধে গণতন্ত্রীদের পক্ষে যোগ দিয়েছিলেন। ফর্ক, কর্নফোড, ডেভিড গেস্ট এবং আরও অনেকের মতোই, সে যুদ্ধে ১৯৩৭ সালে কডওয়েলের মাত্র উনত্রিশ বছর বয়সে মৃত্যু হয়। পশ্চিম ইয়োরোপের সাহিত্যতাত্ত্বিকদের পাশে প্রথম উল্লেখযোগ্য ইংরেজ সাহিত্যতাত্ত্বিক ক্রিস্টোফার কডওয়েল। পরবর্তী সময়ে অনেকে তাঁকে নিন্দার্থে 'স্তালিনবাদী' বলেছেন, আবার কডওয়েলের ফ্রয়েডীয় যন্ত্র (স্বপ্ন ক্রিয়া) ব্যবহার করার ও সমাজতান্ত্রিক বাস্তববাদ না-মানার অভিযোগ তাঁর বিরুদ্ধে অনেকে এনেছেন। নিস্তালিনীকরণের আগে, বিশেষত, ১৯৩৭ সালে 'সমাজতান্ত্রিক বাস্তবাবাদে'র তত্ত্ব অস্বীকার করে 'স্তালিনপন্থী' হওয়া সম্ভব ছিল না। সুতরাং কডওয়েলের তত্ত্বভাবনা, যে ভাবনায় তিনিও মার্কসের মতো এক বিশ্ববীক্ষায় (Weltanschauung) পৌঁছোতে চেয়েছিলেন, সে তত্ত্ব এবং তাঁর ওপর ভাবনা-বিতর্ক পূর্ণ দৈর্ঘ্যের আলোচনার দাবি রাখে।

প্রসঙ্গত স্মরণে রাখা যেতে পারে, কডওয়েল নিজে ছিলেন কবি, ঔপন্যাসিক ও ছোটোগল্পকার, ফকস্ ছিলেন ঔপন্যাসিক এবং লিনসে লিখেছেন উপন্যাস, এঁদের হাত দিয়ে যখন কোনো তত্ত্ব লিখিত হয়েছে তখন তা সৃজনশীল শিল্পীর উপলব্ধিতে সমন্বিত। কডওয়েলের অনেক ভাবনার সঙ্গে গ্রামশির ভাবনার সাদৃশ্য আছে।

কডওয়েলের *Romance and Realism* গ্রন্থটি অনেক পরে পকাশিত হয়েছে। ইংরেজি বুর্জোয়া সাহিত্যের 'বিশেষ' ধারাটি সম্পর্কে বিশ্লেষণ এই গ্রন্থেই করেছিলেন এবং সেই অধ্যয়নের সাধারণীকৃত রূপটি গভীর অন্তর্দৃষ্টি নিয়ে তিনি *Illusion and Reality* রচনা করলেন। প্রকৃতপক্ষে *Romance and Realism* গ্রন্থটি *Illusion and Reality*-র ভূমিকা হিসেবে পাঠ করলে কডওয়েলের তত্ত্ব বোঝার সুবিধা হয়। *Studies in a Dying Culture*-এ সমসময়ের বুর্জোয়া সংস্কৃতির পাঁচ প্রধান (শ, টি, ই, এবং ডি. এইচ. লরেন্স, এচ. জি. ওয়েলস ফ্রয়েড) ও তিন মূল্যবোধ (প্রেম, নৈতিকতা, স্বাধীনতা) প্রসঙ্গে মার্কসীয় ভাবনার দিশা দেখালেন। *Further Studies in a Dying Culture*-এ বুর্জোয়া সৌন্দর্যতত্ত্ব ধর্মচেতনা, ইতিহাসবোধ, মনস্তত্ত্ব ও দর্শন সম্পর্কে সমালোচনামূলক বিশ্লেষণ করলেন।

এলিক ওয়েস্ট তাঁর *Crisis and Criticism* গ্রন্থের পরে লিখেছেন বার্নাড শ প্রসঙ্গে গ্রন্থ, *A Good Man Fallen among Fabians*, — এ-গ্রন্থ কডওয়েলের ভাবনা দ্বারা গভীরভাবে প্রভাবিত। ওয়েস্ট-এর তৃতীয় গ্রন্থ *Mountain in the Sunlight*-এ ইংরেজি সাহিত্যের ছ-জন ব্যক্তিত্ব, বুনিয়ান, ডিফো, পেটার, ওয়াইল্ড, প্রিস্টলে ও জ্যাক লিনসের সাহিত্যকর্ম বিশ্লেষণ করে তাঁদের মহত্ত্বকে চিহ্নিত করেছেন।

লিনসের *After the 'Thirties'*-এ ত্রিশের দশকের পরে ইংরেজি উপন্যাসের গতি-প্রকৃতির প্রসঙ্গে শিল্পের উদ্ভব-ক্রিয়া, সৃষ্টির যন্ত্রণা ও নিজেকে পালটাতে লেখকের যে সমস্যা, নায়ক ও প্রতিভূ চরিত্রের পার্থক্য, ভাষার ছন্দ, চিত্ররূপ, বুনন, ভাষা ও সৃষ্টিশীলতা নিয়ে আলোচনা করেছেন।

মর্টন (A.L.Morton)-এর মূল পরিচয় ইতিহাসবিদ হিসেবে তবু সাহিত্য-সংস্কৃতি প্রসঙ্গে তাঁর প্রবন্ধগুলি ইতিহাসের প্রেক্ষায় বিশ্লেষিত ও আলোকদায়ী। তাঁর *The Everlasting Gospel* -এ কবি উইলিয়াম ব্লেক সম্পর্কে আলোচনা এবং *The Matters of Britain* গ্রন্থে ইংরেজি সংস্কৃতির নানা দিক, — বেকন, শেকসপিয়ারের ইতিহাসচেতনা, ই.এম. ফর্স্টার, রাসকিন এবং এলিয়টের (এক অন্তরঙ্গ রূপ) সম্পর্কে লিখেছেন।

স্লোচাওয়ার (Harry Slochower) তাঁর *No Voice is Wholly Lost* গ্রন্থে দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের পূর্ববর্তী পঁচিশ বছরে ইয়োরোপ ও আমেরিকার প্রধান সাহিত্যিক ও চিন্তকদের সৃজনের শক্তি ও দুর্বলতা বিশ্লেষণ করেছেন।

টমসন (George Thomson) *Aeschylus and Athens* গ্রন্থে ঐতিহাসিক বস্তুবাদের রীতিতে গ্রিক নাটকের সামাজিক উৎস বিশ্লেষণ করলেন এবং সেই ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণ আরও গভীরতর হয়েছে তাঁর পরবর্তী দু-খণ্ডের বিশাল গ্রন্থ *Studies in Ancient Greek Society* -তে। টমসনের বহুপঠিত বই *Marxism and Poetry* — যে বইতে কবিতার সামাজিক উৎস — শ্রমের ধ্বনির সঙ্গে ছন্দের সম্পর্ক আলোচিত। তাঁর শেষ গ্রন্থ *The Human Essence*-এ-*মার্কসিজম অ্যান্ড পোয়েট্রির* বিষয়টিকে আরও প্রসারিত করে বিজ্ঞান ও শিল্পের উৎস ব্যাখ্যা করেছেন। ই.পি.টমসন (E.P Thompson)-এর খ্যাতি প্রধানত তাঁর লেখা ইংল্যান্ডের শ্রমিকশ্রেণীর উদ্ভবের ও বিকাশের ইতিহাসটির জন্য (*Making of the English Working class*), কিন্তু ইতিহাসের প্রেক্ষায় ইংরেজ কবি ও লেখক উইলিয়াম মরিসের রোমান্টিকতা থেকে যাত্রা শুরু করে বিপ্লবী ভাবনায় উপনীত হওয়ার ওপর তাঁর বিশাল গবেষণা *William Morris* শীর্ষ গ্রন্থ। ১৯৭৭-এ তাঁর 'Caudwell' নামক দীর্ঘ প্রবন্ধে কডওয়েলের সমালোচনা সত্ত্বেও তাঁর কাজের উজ্জ্বল দিকগুলি তুলে ধরেছেন। রবীন্দ্র-জীবনীর অন্যতম লেখক Edward.J.

Thompson-এর পুত্র ই.পি.এবং এখানে উল্লেখ অপ্রাসঙ্গিক হবে না যে তাঁর শেষ গ্রন্থ তাঁর পিতা ও রবীন্দ্রনাথের সম্পর্ক-বিষয়ক, *Alien Homage*.

জ্যাকসন (T.A.Jackson) ব্রিটিশ কমিউনিস্ট পার্টির প্রতিষ্ঠাপর্ব থেকে কেন্দ্রীয় কমিটির সভ্য,দ্বান্দ্বিকতার তত্ত্ব সম্পর্কে গ্রন্থ ও ইতিহাস-বিষয়ক গ্রন্থের প্রণেতা, কিন্তু সাহিত্য সম্পর্কে তাঁর বোধের ও ইংল্যাণ্ডের শ্রমজীবী মানুষের কাছে ইংরেজি সাহিত্যের ঐতিহ্য তুলে ধরার প্রয়াস তাঁর Charles Dickens Old Friends to Keep নামে ছোটো ছোটো বাইশটি প্রবন্ধে ইংরেজি উপন্যাস ও ঔপন্যাসিকদের প্রসঙ্গে আলোচনা করেছেন— যে প্রবন্ধগুলি তথাকথিত 'জনপ্রিয়' প্রবন্ধের আদর্শ হিসেবে বিবেচিত হতে পারে।

কেট্‌ল (Arnold Kettle) দু-খণ্ডে রচিত তাঁর *An Introduction to the English Novels*-এ ইংরেজি উপন্যাসের সূচনা থেকে ১৯৫০ সাল পর্যন্ত প্রধান ঔপন্যাসিকদের শক্তি ও দুর্বলতার দিকগুলি ধারাবাহিকভাবে আলোচনা করেছেন। তাঁর আর একটি কাজ *Shakespeare in A Changing World* গ্রন্থের সম্পাদনা।

প্রাওয়ারের (S.S.Prwer) গ্রন্থ *Karl Marx and World Literature*-এ আলোচনার প্রেক্ষিত স্বতন্ত্র—মার্কসের নিজের রচনার মধ্যে সাহিত্যপাঠের যে বিপুল উদাহরণ ছড়ানো সেই উল্লেখগুলির উৎস থেকে মার্কসের সাহিত্যবোধ ও ধারণাকে প্রাওয়ার ছেঁকে তুলেছেন। অবশ্য 'World Literature' মানে ইয়োরোপীয় সাহিত্য।

গ্রামশির তত্ত্ব সম্পর্কে দুটি গ্রন্থ আলোকপাত করে— ডেভিডসন (Alastair Davidson) ও সাইমন (Roger Simon)-এর যথাক্রমে *Antonio Gramsci* এবং *Gramsci's Political Thought*— যা গ্রামশির সংস্কৃতির অনুধাবনে সহায়ক।

হথর্নের (Jeremy Hawthorn) *Identity And Relationship* গ্রন্থটি সত্তরের দশকে ইংরেজি মার্কসবাদী সাহিত্য-সমালোচনার একটি উল্লেখযোগ্য তাত্ত্বিক গ্রন্থ, মনে হয়, গ্রন্থটি প্রাপ্য গুরুত্ব পায়নি। হথর্ন গভীর বিশ্লেষণে যা বলতে চেয়েছেন, "...............I would suggest that it is only when the work of literature is seen in as full and as dynamic a series of context as is possible that its identity, its 'thisness' as literature, can really be released and perceived. A great work of literature will only reveal its greatness if it is allowed to live in as many different context as are possible, if it really feeds on and is fed by richness of the life and experiece of those who read it." শিল্প সাহিত্যে পাঠক বা ভোক্তার সঙ্গে সম্পর্কের দিকটি হথর্নের গ্রন্থে বিশ্লেষিত হয়েছে।

সাউথহল (Raymond Sauthhall) *Literature and the Rise of Capitalism* গ্রন্থে ইংল্যাণ্ডে ধনতন্ত্রের সূচনা ও বিকাশের পাশাপাশি টমাস মুরের (১৪৭৭-১৫৩৫) *Utopia* থেকে শেকসপিয়ার (১৫৬৪-১৬১৬) ও মিলটন (১৬০৮-১৬৭৪) পর্যন্ত মানবিক সম্পর্ক ও মূল্যবোধের বিবর্তন এবং স্যামুয়েল জনসনের (১৭০৯-১৭৮৪) শেকসপিয়ারের সমালোচনায় বিজয়ী শ্রেণীর সন্তোষ ও আত্মতুষ্টির প্রকাশ লক্ষ করেছেন। তাঁর পরের বই *Literature, the Individual and Society*-তে সুইফট, স্মলেট, গ্রে, গোল্ডস্মিথ, ওয়ার্ডস্‌ওয়ার্থ, কোলরিজ, জেন অস্টেন জর্জ এলিয়ট প্রভৃতিদের সম্পর্কে পূর্ববর্তী গ্রন্থের ধারায় আলোচনা করেছেন।

মিচেল (Jack Mitchell) তাঁর *The Essential O'casey* গ্রন্থে সিন ও'কেসির প্রধান বারোটি নাটকের কল্পনা, ক্ষুদ্র উপদেশাত্মক কাহিনির প্রয়োগ, প্রতীক ও হাস্যরসের সঙ্গে অবিচ্ছেদ্যভাবে এক গভীর মানবিক অর্থবোধযুক্ত বলে বিশ্লেষণ করেছেন।

ক্লিনগেনডার (F.D.Klingender) তাঁর ক্ষীণকায় গ্রন্থ *Marxism And Modern Art*-এ আধুনিক চিত্রশিল্প বিচারের মার্কসীয় দিশা দেখিয়েছেন। মার্কসীয় শিল্প-সমালোচনায় প্রতিটি শৈলীর অন্তর্গত সুনির্দিষ্ট ভার আবিষ্কার করতে হবে, প্রতিটি শিল্পীর এবং প্রতিটি চিত্রে কীভাবে শক্তিশালী ও বিশ্বাসযোগ্যভাবে চিত্ররূপের মধ্যে বাস্তব (objective) সত্য প্রতিফলিত তার আবিষ্কার প্রয়োজন। কিন্তু শিল্প বিজ্ঞানের মতো বাস্তবকে ফর্মূলা বা ব্লু প্রিন্টের মতো বাস্তবকে ছোটো করে আনে না, শিল্পের চিত্ররূপ বাস্তবকে অসীম বৈচিত্র্যে বহুমুখী ঐশ্বর্যে প্রকাশ করে। এই অসীম বৈচিত্র্যে ও বহুমুখী ঐশ্বর্যেই শিল্পকে উপভোগ করতে হবে। ক্লিনগেনডারের মতে, যেসব শিল্পী, জীবন যেসব সমস্যা উপস্থিত করেছে তার মুখোমুখি হয়ে বাস্তবের অবশ্য প্রয়োজনীয় কতকগুলি দিককে আঁকতে চান, তাঁদের দৃষ্টিভঙ্গিই বাস্তববাদ। বই-এর শিরোনামের পরে উপনাম মুদ্রিত 'An Approach to Social Realism' কিন্তু লেখক কোথাও 'Socialist Realism' শব্দবন্ধ ব্যবহার করেননি। চেন (Jack Chen) ১৯২৭ সালে সোভিয়েতে গিয়ে সে দেশে শিল্প ও শিল্পীদের প্রসঙ্গে আলোচনা করেছেন তাঁর *Soviet Art and Artists* বইতে। সমাজতান্ত্রিক বাস্তববাদ অনুসরণে শিল্প-সাহিত্য বিকাশের নানা সরকারি উদ্যোগ এবং ১৯৪৩ সাল পর্যন্ত শিল্পী-সাহিত্যিকদের মধ্যে উদ্দীপনার দলিল তাঁর বইটি।

বার্জার (John Berger)-এর *Art and Revolution* গ্রন্থে চিত্র ও ভাস্কর্যের ক্ষেত্রে সমাজতান্ত্রিক বাস্তববাদের তত্ত্বের সমস্যা ও সীমাবদ্ধতা আলোচিত হয়েছে। বার্জারের মতে ওই তত্ত্ব সমাজতান্ত্রিক প্রকৃতিবাদের (naturalism) ছদ্মবেশ-মাত্র। ত্রিশের দশকের সঙ্গে ষাটের দশকের সোভিয়েত চিত্র-ভাস্কর্যের কোনো উল্লেখযোগ্য পার্থক্য নেই।

রোজ-এর (Margaret A. Rose) *Marx's Lost Aesthetic* গ্রন্থে চিত্র ও ভাস্কর্য এবং সৌন্দর্যতত্ত্ব সম্পর্কে মার্কসের আগ্রহ ও ভাবনা প্রথম অংশে আলোচিত হয়েছে এবং গ্রিক শিল্পে মার্কসের মুগ্ধতার প্রসঙ্গ রোজ এনেছেন, কিন্তু সেই শাশ্বত মুগ্ধতার গ্রহণযোগ্য ব্যাখ্যায় তিনি সফল বলে মনে হয় না।

উইলিয়ামস (Raymond Williams) : ইংরেজি সমালোচনা-সাহিত্যে যাঁদের বাম-লিভিসাইট (Left Leaviste : Frank Raymond 1895-1978) বলে তাঁদের মতোই সমাজ সংস্কৃতি ভাবনার অবস্থান থেকে উইলিয়ামস ধীরে ধীরে মার্কসবাদের দিকে সরে আসেন এবং সাহিত্য ও সমাজের সম্পর্কে অনুসন্ধান করেন। ১৯২১ সালে তাঁর জন্ম এবং ১৯৮৮-তে মৃত্যু। ১৯৫৮ সালে প্রকাশিত তাঁর *Culture & Society*-তে সংস্কৃতি সম্পর্কে তাঁর যে ধারণা, ষাটের দশকের সূচনায় সে অবস্থান তিনি পাল্টান। *Marxism And Literature* (১৯৭৭) -এ মতাদর্শ ও কর্তৃত্ব সম্পর্কিত গ্রামশির ধারণাগুলি তিনি এনেছেন, কিন্তু একটু ভিন্নভাবে ভেবেছেন। এই ভাবনারই আরও তাত্ত্বিক রূপ দিলেন *Culture*-এ (১৯৮১) সালে। উইলিয়ামসের মৃত্যুর পরে প্রকাশিত *Resources of Hope* গ্রন্থে সংস্কৃতি, গণতন্ত্র ও সমাজতন্ত্র নিয়ে আলোচনাগুলি সংগৃহীত। ইংরেজি সংস্কৃতি সম্পর্কে এলিয়ট এবং লিভিসের ধারণার বিরোধী বামপন্থী ভাবনার পরিচয় উইলিয়ামসের গ্রন্থগুলিতে পাওয়া যাবে।

ইগল্‌টন (Terry Eagleton) রেমন্ড উইলিয়ামস, গ্রামশি, আলতুসের, ফুকো, লাকাঁ, দেরিদা, বেনিয়ামিন, মাশারি প্রভৃতি সকলের তত্ত্বকে মেলাতে চান। মার্কসবাদের পরে আধুনিক

তত্ত্বগুলি— সংগঠনবাদী, উত্তর-সংগঠনবাদী, আধুনিকতাবাদী, উত্তীর্ণ-আধুনিকতাবাদী তত্ত্ব ও তাত্ত্বিকদের ওপরেই প্রধানত তাঁর তাত্ত্বিক রচনা। ত্রিশের দশকের ইংরেজি সাহিত্য সমালোচনা সুনির্দিষ্ট (Specific) সাহিত্য-আলোচনা ও শ্রেষ্ঠ সাহিত্যকে সমালোচনার মাধ্যমে পাঠকের কাছে পৌঁছে দেওয়ার ঐতিহ্য তিনি ত্যাগ করেছেন। তাঁর অন্যতম প্রধান বই হল *Walter Benjamin* (১৯৮১), *Criticism and Ideology* (১৯৭৬), *Against the Grain* (১৯৮৬) প্রভৃতি।

ত্রিশের দশকের সমাজ-ইতিহাসমূলক বিশ্লেষণ-পদ্ধতিতে মার্কসীয় সাহিত্য সমালোচনায় সত্তরের দশকের শেষ ভাগে শ্রেষ্ঠ কাজ বিখ্যাত ঐতিহাসিক হিলের (Christopher Hill) *Milton and the English Revolution* (১৯৭৭)— এই গ্রন্থ উভয়ত গভীরতা ও বিস্তার, যুগপৎ ইতিহাস ও সাহিত্যবিচারে একটি বিরল মার্কসীয় সাহিত্য-সমালোচনা।

১৯৩৮ সালে জার্মানিতে আর্নস্ট ব্লখ, গেয়র্গ লুকাচ বের্টল্ট ব্রেশট, ভাল্টের বেনিয়ামিন ও থিয়োডোর আডোর্নো-র মধ্যে সাহিত্য বিতর্ক চলে। সেই বিতর্কের ক্ষেত্রে প্রকৃতপক্ষে একদিকে লুকাচ এবং অন্যরা পরস্পরের সঙ্গে একমত না-হলেও সামগ্রিকভাবে লুকাচের মতের বিরোধী ছিলেন। ব্লখরা সমস্ত রকম সাহিত্যিক সাংস্কৃতিক বিদ্রোহের মধ্যে সত্যকারের প্রতিবাদের উপাদান খুঁজতে চাইছিলেন,— তাঁদের মতে প্রকাশ অযৌক্তিক বিশৃঙ্খল হলেও, সে প্রকাশের আড়ালে শিল্প-সাহিত্যে জার্মান মধ্যবিত্ত বা পাতিবুর্জোয়াদের বিদ্রোহ। ক্রমশ বিত্তহীন হয়ে-পড়া মধ্যবিত্তদের শ্রমিকশ্রেণীর পক্ষে জয় করে নেওয়ার কাজটা জার্মানির বিপ্লবের পক্ষে রুশ শ্রমিক শ্রেণীর বিপ্লবে কৃষকসমাজকে জয় করে সঙ্গে পাওয়ার তুল্য গুরুত্বপূর্ণ। জার্মান মধ্যবিত্ত সমাজ, যার একটা বড়ো অংশ ফ্যাসিবাদের সঙ্গে জড়িয়ে পড়ছে, তাদের ফ্যাসিবাদের প্রভাবমুক্ত করে তোলা জার্মানির বিপ্লবের স্বার্থে গুরুত্বপূর্ণ। এঁদের সৃজনশীল পদ্ধতি হল রীতি বা আঙ্গিকবাদ ও বিমূর্ততার মধ্য দিয়ে বিষয় বা সারাৎসারের (essence) অনুসন্ধান।

উল্লিখিতদের মধ্যে ব্রেশট, বেনিয়ামিন ও ব্লখ (Bertolt Bercht : ১৮৯৮-১৯৫৬, Walter Benjamin : ১৮৯২-১৯৪০, Ernst Bloch : ১৮৮৫-১৯৭৭) একই রকম ভাবনার শরিক।

আডোর্নো (Theodor Adorno : ১৯০৩-১৯৬৯) এবং হর্খেইমার (Max Horkheimer; ১৮৯৫-১৯৭৩) একই ভাবনাবৃত্তের অন্তর্গত। এঁরা ফ্রাঙ্কফুর্ট স্কুল নামে পরিচিত। লুকাচই (Georg Lukacs : ১৮৮৫-১৯৭১) আলোচ্য 'মার্কসবাদী'দের মধ্যে সবচেয়ে প্রভাবশালী। পশ্চিম ইয়োরোপে মার্কসীয় আলোচনায় লুকাচ অপরিহার্য। কেননা যারা মার্কসবাদ সম্পর্কে কিছু বলতে চান, হয় লুকাচের পক্ষে বা বিপক্ষে তাঁদের অবস্থান নিতে হয়।

হাঙ্গারিতে জন্ম হলেও, লুকাচ জার্মানি, অস্ট্রিয়া ও স্তালিনপর্বে রাশিয়াতে বাস করেছেন। কমিনটার্নের ও রুশ নীতির সঙ্গে মতামতের মিল অমিলের জোয়ার-ভাটায় তাঁর ভাগ্য ও মতবাদ স্থিরীকৃত হয়েছে। এবং সে মতবাদের পরিবর্তনও কখনও কখনও নির্ধারিত হয়েছে। ব্রেশটের গোষ্ঠীও লুকাচের মসকো থেকে সাহিত্যিক রাজনৈতিক ছড়ি ঘোরানো পছন্দ করেননি। ভাবনার নানা পরিবর্তন সত্ত্বেও মার্কসবাদী তাত্ত্বিকদের মধ্যে হেগেলের দর্শনের দিকে লুকাচের ঝোঁক, মার্কসবাদী তাত্ত্বিক হিসেবে তিনি মানববাদী মার্কসবাদী (Humanist Marxist) এবং সাধারণভাবে সাহিত্যে তাঁর টান উনিশ শতকের বাস্তববাদ ও বিশ শতকের সমালোচনামূলক বাস্তববাদের (Critical realism) প্রতি। ফলে, লুকাচের সাহিত্য আলোচনার মূলাধার উপন্যাস, ঐতিহাসিক উপন্যাস, *Studies in European Realism, Historical Novel, Essays on Thomas Mann, Theory of Novel, The Meaning of Contemporary Realism,*

Goethe and His Age, Solzhenitsyn প্রভৃতি। সাহিত্যের অন্যান্য রূপ,কবিতা, নাটক বা চিত্রশিল্প, সংগীত সম্পর্কে তাঁর কোনো সম্পূর্ণ গবেষণা নেই। মার্কসের অপ্রকাশিত *Economic and Philosophic Manuscripts of 1844* প্রকাশ-পূর্বে অধ্যয়নের সুযোগে বিচ্ছিন্নতার তত্ত্ব সম্পর্কে লুকাচ অবহিত হন এবং মানবতাবাদের (Humanism) প্রতি তাঁর ঝোঁকের সূত্রপাত সেখান থেকেই বলে অনেকে মনে করেন।

সাহিত্য-বিতর্কে লুকাচের বক্তব্য :

১ আলোকপ্রাপ্তির (Enlightenment) যুগের যা কিছু উত্তরাধিকার, তার প্রতি সশ্রদ্ধ থাকতে হবে ;

২ সে উত্তরাধিকারের কোনোরকম যুক্তিহীন দূষণ বাতিল করতে হবে ;

৩ আধুনিক ধারা বা ঝোঁকগুলির সম্মিলন ঘটাতে হবে ;

৪ যুক্তিহীনতা (irrationalism) এবং ফ্যাসিবাদ সমার্থক ;

৫ ব্লখদের একসপ্রেশনিজমের সমর্থনে যে যুক্তি— বাস্তবতার শাঁসের (kernel) স্থানটিতে পৌঁছোতে হবে— তা বিষয়বাদী হিসেবে ব্লখদের নিজেদের আবগের (passions) বহিঃপ্রকাশ ঘটানো ;

৬ ধনতন্ত্র একটি ঐক্যবদ্ধ সমগ্রতায় রূপায়িত এবং সংকটের মুহূর্তগুলিতে ধনতন্ত্রের প্রকাশকে খণ্ড করে দেখানো অযৌক্তিক ;

৭ যথার্থ জনপ্রিয় শিল্প জাতির সবচেয়ে প্রগতিশীল অভিজ্ঞতাকে সদর্থক করে তোলে এবং বাস্তবতার সঙ্গে ঘনিষ্ঠ সম্পর্কের দ্বারা এমন একটি সৌন্দর্যতত্ত্বের আঙ্গিক নির্মাণ করে, যা জনগণের কাছে সত্যি পৌঁছোতে পারে।

আডোর্নো মনে করেছেন, ব্যক্তি অতীতের বস্তু হয়ে গেছে, কেন্দ্রীভূত ধনতন্ত্রের যুগে পরিকল্পনা ও গণ (mass)-সংস্কৃতি ব্যক্তিগত স্বাধীনতাকে ধ্বংস করেছে। খুঁটিয়ে বা সমালোচনার দৃষ্টিভঙ্গিতে ভাবার ক্ষমতা লুপ্ত। হেগেলীয় ভাববাদ ও গোঁড়া মার্কসবাদ ব্যর্থ। হর্খেইমারের সঙ্গে আডোর্নোও মনে করেছেন, সভ্যতার প্রগতির প্রতিটি পদক্ষেপ মানব মানবীর মুক্ত ও সামগ্রিক জীবন নির্বাহের ক্ষমতার ওপর দমন নেমে আসে, সভ্যতার প্রগতির পদক্ষেপ দমনের সঙ্গে অবিভাজ্য। তিনি এসবের মধ্য থেকে এক নিজস্ব বস্তুবাদী দ্বান্দ্বিক দৃষ্টিভঙ্গি গড়ে তুলেছেন। সংগীত ও সৌন্দর্যতত্ত্ব সম্পর্কে তাঁর কাজ অনেক, তার মধ্যে In Search of Wagner-এ সুর সৃষ্টির কলাকৌশল, সমবেত সংগীত ও তার মঞ্চায়ন এবং ভাগনারের সংগীতের সামাজিক চরিত্র বিশ্লেষণ করেছেন। তাঁর *Aesthetic Theory*-তে আঙ্গিক, সুন্দর ট্রাজিডি-কমেডি ইত্যাদি শিল্পগত শ্রেণী, বাস্তবায়ন, আধেয়, সত্য ইত্যাদি প্রচলিত বর্গগুলির বিচার করেছেন। আডোর্নো যদিও মনে করেছেন যে শিল্পের মূল সমাজেই নিহিত, তবু তিনি সমাজতাত্ত্বিক বা আঙ্গিকবাদী বিশ্লেষণ শিল্পের ক্ষেত্রে মেনে নেননি। তাঁর কাছে শিল্প স্বয়ংভর, স্বায়ত্ত।

হর্খেইমার সমাজ সম্পর্কে বিচারমূলক তত্ত্বের বিকাশ ঘটালেন। তিনি মতাদর্শের সমালোচনার (Critique of Idology) বিকাশ ঘটালেন, গবেষণার দ্বারা নানা বিষয়ের মধ্যে অন্তর্গত ঐক্য প্রতিষ্ঠার প্রয়োজনীয়তার কথা বললেন, এবং প্রয়োগের ভূমিকা কেন্দ্রীয় বলে মনে করলেন। তাঁর বোধ্য গ্রন্থটি আডোর্নোর সঙ্গে লেখা,— *Dialectic of Enlightenment*।—সমাজপ্রগতি ব্যক্তির স্বাধীনতা হরণ করে— এ ধারণা নতুন নয়, রুশো থেকে প্রবাহিত। এঁদের নানা বিষয়ের ঐক্য প্রতিষ্ঠার কথা মার্কসের Weltanschauung থেকে ভিন্ন। এঁদের প্রয়োগ, বিশেষ করে ইয়োরোপে চরম রাজনৈতিক সংকটকালে, সামাজিক-রাজনৈতিক প্রত্যক্ষ প্রয়োগের ক্ষেত্রে

দেখা যায়নি। কিন্তু তত্ত্বের কার্যকরতার প্রমাণ প্রয়োগে (Praxis)— প্রয়োগের ওপর এই বিশেষ জোর ভালো, কিন্তু নতুন নয়।

ব্রখের বহু রচনাই এখনও অনূদিত হয়নি। বেনিয়ামিনের মতো তাঁকেও হিটলারের উত্থানের ফলে দেশছাড়া হতে হয়। ১৯৬১ সালে পূর্ব জার্মানিতে বাস করার জন্যে ফিরে এলেও তাঁর নিজস্ব মার্কসবাদী ভাবনার ফলে অদৌ সরকারি উৎসাহ পাননি। কমিনটার্ন প্রভাবিত সাহিত্যভাবনার বিরুদ্ধে ব্রখের মত স্মরণযোগ্য. "But abstract methods of thought which seek to skim over recent decades of our cultural history, ignoring everything which is not purely proletarian, are hardly likely to provide these solutions." বেনিয়ামিনকেও নাজি উত্থানের ফলে দেশ ছেড়ে ফ্রান্সে পালাতে হয়। হিটলার ফ্রান্স দখল করলে তিনি স্পেনে পালাবার চেষ্টা করে ব্যর্থ হন এবং আত্মহত্যা করেন। কিন্তু, তার আগে ১৯২৬-২৭-এ তাঁর মস্কো ভ্রমণ সোভিয়েতের সাংস্কৃতিক জীবন সম্পর্কে এবং সাধারণভাবে সংস্কৃতি সম্পর্কে তাঁকে আগ্রহী করে তোলে। কিন্তু প্রচলিত মার্কসবাদী ভাবনায় তিনি তুষ্ট ছিলেন না। তাঁর ওপরে ফ্রয়েডের প্রভাও পড়েছে। ব্রেশট্, বোদলেয়ার প্রসঙ্গে বেনিয়ামিনের প্রবন্ধগুলি অত্যন্ত মূল্যবান। এ ছাড়াও, তিনটি প্রবন্ধ বিশেষ উল্লেখের যোগ্য : The Work of Art in the Age of Mechanical Reproduction, The Author as Producer, Surrealism.

বোদলেয়ার সম্পর্কে বেনিয়ামিন দেখালেন, বোদলেয়ারের কবিতায় ঈশ্বর-নিন্দার সঙ্গেই তাঁর শয়তান-সম্পর্কিত ভাবনা যুক্ত হয়েছে, সে ভাবনাকে অতিরিক্ত গুরুত্ব দেওয়ার প্রয়োজন নেই। ধনতান্ত্রিক সভ্যতার রাজধানী প্যারিতে বাস করে বোদলেয়ার নির্জনতা চেয়েছেন, কিন্তু নির্জনতা খুঁজেছেন ভিড়ের মধ্যেই। বোদলেয়ারের কলাকৈবল্যবাদের পরিণতিতেই মালার্মের বিশুদ্ধ কাব্যের বিকাশ বুঝতে হবে। "Baudelair's poetic output is assigned a mission. He envisioned blank spaces which he filled in with his poems. His work cannot merely be categorised as historical, like anyone else's, but it intended to be so and understood itself as such."

ব্রেশটের সাধারণ নীতি প্রসঙ্গে বেনিয়ামিন বললেন, বিগত ভালো দিয়ে শুরু নয়, খারাপ নতুন দিয়ে শুরু করো। ব্রেশটের প্রথম দিকের নাট্যপ্রচেষ্টাগুলি 'শেষ পর্যন্ত ব্রেশটীয় নাট্যভিনয়ের সুনির্দিষ্ট ও সুদৃঢ় মান জোগান দিয়েছে। এই নাট্যাভিনয় নিজেকে মহাকাব্য বলে সংজ্ঞায়িত করেছে এবং এই সংজ্ঞার দ্বারা সেই নাটকীয় অভিনয়ের বিরুদ্ধে নিজেকে দাঁড় করিয়েছে যে অভিনয়ের তত্ত্ব অ্যারিস্টটলের দ্বারাই প্রথম সূত্রায়িত হয়েছিল। এই কারণেই ব্রেশট তাঁর তত্ত্বটি অ-অ্যারিস্টটলীয় বলে পরিচিত করান.......এই নতুন নাটকে যা পরিত্যক্ত হল, তা হল অ-অ্যারিস্টটলীয় মোক্ষণ (ক্যাথারসিস), নায়কের আবর্তসংকুল ভাগ্যের সঙ্গে একাত্মতার মধ্যে দিয়ে আবেগসমূহের মোক্ষণ, যে ভাগ্য আবর্তসংকুল করা হয়েছে এক আবর্তের গতিবেগ যা দর্শককেও একই সঙ্গে ভাসিয়ে নিয়ে যায়।'

ব্রেশটের মার্কসবাদ, স্টার্নবেগ' কার্ল করশ, বেনিয়ামিনদের সংস্পর্শে আকার পায়— এঁদের কেউই সোভিয়েত—মার্কসবাদের সমর্থক নন। ফ্রাঙ্কফুর্ট স্কুল সম্পর্কেও ব্রেশটদের মন্তব্য, তাঁরা বুর্জোয়া যুগের সভাপণ্ডিত (court intellectuals for the bourgeois era)। লুকাচের সাহিত্যিক বাস্তবতার তত্ত্বও ব্রেশটের কাছে গ্রহণযোগ্য মনে হয়নি। সোভিয়েতেও তাঁর বিশেষ প্রভাব পড়েনি। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের শেষে জার্মানিতে ফিরে এসে তাঁর 'এপিক'

নাটক শুরু করেন, যেখানে মূল কৌশল হল অভিনয়ে, পরিচালনা এবং রচনায় দুরত্বায়ন সৃষ্টি হবে।

'পুরোনো ভালো'র প্রতি ব্রেশটের দৃষ্টিভঙ্গি লুকাচের থেকে সম্পূর্ণ ভিন্ন। লুকাচ শুধু ধ্রুপদি লেখকদের (oldmasters) রচনাতে শ্রেষ্ঠত্ব লক্ষ করেছেন। ব্রেশট বলেছেন, জনগণের বাইরে বেরিয়ে এস মানুষ মনুষ্যত্ব ফিরে পাবে না, বরং তা পাবে জনগণের মধ্যে ফিরে গিয়ে। ধনতন্ত্রের ফ্যাসিবাদি পর্যায়ে মানুষকে অমানুষে পরিণত করার বিরুদ্ধে সমস্ত কিছু মূল্যবান ও মানবিক ব্যাপারে সাহিত্যকে পন্থা গ্রহণ করতে হবে। লুকাচের মধ্যে ব্রেশট লক্ষ করেছেন নিজেকে গুটিয়ে নেওয়া আত্মসমর্পণের লক্ষণ ও ইউটোপীয় ভাববাদ। ব্রেশটের নাট্যতত্ত্ব ভাবনা *Brecht on Theatre*-এ সংগৃহীত।

ব্রেশট তাঁর নাট্যকর্মে সংগীতশিল্পী হানস এইসলার (Hanns Eisler)-কে সহযোগী হিসেবে পেয়েছিলেন।

হাউসার (Arnold Hauser) লুকাচের বন্ধু, কিন্তু রাজনৈতিক মতাদর্শের বিতর্কে জড়িত না-হয়ে চিত্র-ভাস্কর্য ও শিল্প-সম্পর্কিত তিনটি গ্রন্থ রচনা করেছেন, যাকে ইংরেজিতে বলতে হয় মনুমেন্টাল। প্রথম গ্রন্থ *Social Histoty of Art*— চার খণ্ডে, আদিম মানুষের চিত্রশিল্প থেকে ইমপ্রেশনিজম ও চলচ্চিত্রের যুগ পর্যন্ত। দ্বিতীয় গ্রন্থ *The Philosophy of Art History*— শিল্প বিচারের পদ্ধতিগত আলোচনা। তার পরে *The Sociology of Art*— শিল্পের এক সামগ্রিক আলোচনা, যা ইতিপূর্বে হয়নি।

ফিশার (Ernst Fischer)-এর *The Necessity of Art*-এ শিল্পের ভূমিকা, শিল্পের উৎপত্তি, ধনতন্ত্রের যুগে শিল্প-সাহিত্য এবং আঙ্গিক ও বিষয় নিয়ে সহজভাবে আলোচনা করা হয়েছে। ফিশার যথেষ্ট ঔদার্য সহ বিষয়টি ব্যাখ্যা করতে চেয়েছেন, "A new art, does not come out of doctrines, but out of works." ভেইমান-এর (Robert Weimann) *Structure and Society in Literary History* গ্রন্থে পশ্চিমি সমালোচনা-সাহিত্যের আঙ্গিকবাদ-বিরোধী ঐতিহাসিক ধারাটি মার্কসীয় মূল্যায়ন করেছেন।

শ্রেণীসমাজে শিল্প-সংস্কৃতির সাধারণ সমস্যার কতকগুলি দিক স্মরণে রাখা প্রয়োজন।

মার্কসবাদ শ্রমিকশ্রেণীর দর্শন। কিন্তু সেই দর্শন শ্রমিকশ্রেণী তথা শ্রমজীবী মানুষকে শিখে নিতে হয়। সমাজতান্ত্রিক দেশ ছাড়া শ্রমজীবী মানুষের শিক্ষার হার এবং মান নির্দিষ্ট করে দেয় শাসক বা বুর্জোয়াশ্রেণী। সেই শিক্ষার বিষয়বস্তুগত মতাদর্শও শাসকই সাধারণভাবে স্থির করে দেয়। ফলে শিক্ষিত হয়ে-ওঠা শ্রমজীবী মানুষ শ্রেণীসমাজের শিক্ষিত 'অহং' লাভ করে। সে-ও যে শিক্ষিত— এই আত্মপ্রসাদ পায়। সেই শিক্ষা যে তাকে সমগ্র শিল্প সংস্কৃতি সম্পর্কে আগ্রহী করে তুলবে, এমন নিশ্চয়তা বুর্জোয়া মতাদর্শ ও গণ (mass) সংস্কৃতিতে থাকে না। শ্রমিকশ্রেণীর সংগঠন সতত সতর্ক প্রচেষ্টায় সে দিকে শ্রমজীবী মানুষের একটি অংশকে অগ্রসর করে নিয়ে যেতে পারে। পরশ্রমজীবী সংস্কৃতির সঙ্গে সেখানে শ্রমিকশ্রেণীর সংগঠনের সাংস্কৃতিক মানের প্রতিযোগিতা তীব্র হতে বাধ্য। কিন্তু সে প্রতিযোগিতা বস্তুগতভাবে শ্রেণীসংগ্রামের তীব্রতার ওপরে নির্ভরশীল।

'সমাজতান্ত্রিক বাস্তববাদ' আঙ্গিক না বিষয়? ফর্ম না কন্‌টেন্ট? রুশ বিপ্লবের পরে সমাজতান্ত্রিক গঠনপর্বের উদ্যমে যেসব শিল্পী-সাহিত্যিক সে নির্মাণে একাত্ম হতে পেরেছিলেন, তাঁদের কাছে 'সমাজতান্ত্রিক বাস্তববাদ' একই সঙ্গে বিষয় ও আঙ্গিক। সোভিয়েতের বাইরে যেসব দেশে শ্রমিকশ্রেণী বিপ্লব সম্পন্ন করেননি, সোভিয়েতের উদাহরণগুলি তাঁদের কাছে

বিষয় নয়, আঙ্গিক। শ্রমিকশ্রেণী ও তার রাষ্ট্র আদর্শ বলে ধরে নিলে (assume), এবং শুধু সেই শ্রেণী ও রাষ্ট্রের রূপ প্রতিফলিত করার আহ্বান জানালে, তাতে যে অনুকরণ (mimesis) ফুটে উঠবে, তাতে স্বভাবতই বাস্তবকে প্রতিফলিত করা যাবে না। প্রলেতারিয়েতের মধ্যেই শুধু আর্দশ মান রয়েছে— এই আদর্শ মান ধরে শিল্প রচনার ভাবনার মধ্যে প্লেটোর আদর্শ জগৎ, প্লেটোর আইডিয়ার জগতের ভাববাদের চোরাবালিতে শিল্পী সাহিত্যিককে পড়তে হতে পারে।

শিল্প-সাহিত্যর সৃষ্টি এবং উপভোগ করার ক্ষমতায় জীবজগতে মানুষ অনন্য— যেমন অনন্য তার নিজের প্রজাতিকে ধ্বংস করার জন্য নানা মারণাস্ত্র আবিষ্কারে। মানুষের এই সৃষ্টি আর ধ্বংসের ধারাবাহিতায়ই তার পার্থিব সম্পদের সৃজন। কিন্তু পার্থিব সম্পদ তৈরি করেই মানুষের আকাঙ্ক্ষা মেটে না, সৃষ্টি হয় তার মানস সম্পদ— সাহিত্যে-সুরে রঙে রেখায়।

কিন্তু কোথায় তার সূচনা? নিজের বাস্তব অভিজ্ঞতা কিছু মানুষ বলতে চেয়েছে, কিছু মানুষ শুনতে চেয়েছে, প্রকৃতির নান ধ্বনি-সুর-শব্দ অনুকরণ করতে চেয়েছে, দৃশ্যমান জগতে তার অনুভবের অভিঘাত ফুটিয়ে তুলতে চেয়েছে রেখায়-রঙে।

শিল্প সাহিত্য সৃষ্টির পরেই সেই সৃষ্টি-প্রক্রিয়া এবং ঔচিত্য-অনৌচিত্য সম্পর্কে আলোচনা-সমালোচনা শুরু। 'যা কিছু শিল্প ও মানবিক বিষয়, তা দোষের হোক বা গুণের এবং স্বর্গীয় বিষয়সমূহও একজন কবি সে বিষয় যদি না জানেন তা হলে তিনি কাব্য রচনায় সমর্থ হবেন না।'— এ রকমই ভেবেছিলেন গ্রীক দার্শনিক প্লেটো। তিনি মনে করতেন, অনুকরণকারীর (imitator) সত্যের থেকে অনেক দূরে অবস্থান। একজন শিল্পী যখন এক মুচি বা ছুতোরকে আঁকছে, তখন কিন্তু মুচি বা ছুতোরের পেশার শিল্পজ্ঞান চিত্রকরের নেই এবং চিত্রকর যদি ভালো শিল্পী হন, তিনি শিশু এবং সরল মানুষকে তাঁর আঁকা ছবি একটু দূর থেকে দেখিয়ে ঠকাতে পারেন, দর্শকরা মনে করতে পারে তাঁরা এক বাস্তব ছুতোরকেই দেখছে। শিল্পীও অনুকরণকারীর দ্বারা ঠকতে পারেন। সত্যের জ্ঞান ব্যতিরেকে তার প্রতিভাসে যা রচিত তা সত্য থেকে তিন ধাপ দূরে, যা সত্যের জ্ঞান ছাড়াই সহজেই রচনা করা যায়। [Plato : *The Republic*, Book-10]

শিল্প-সাহিত্যে বাস্তবের প্রতিফলন সম্পর্কে, প্রকৃতি ও সমাজকে চিত্রণের ক্ষেত্রে প্লেটোর এই মত সাহিত্যের আলেচনায় মুলত নঙর্থক। কিন্তু প্লেটোর ছাত্র অ্যারিসট্টল সাহিত্য আলোচনায় কাব্য সাহিত্যের উপস্থাপনায় এই অনুকরণ বা mimesis-কে বিশেষ গুরুত্ব দিলেন। তিনি বলেছেন 'অবিশ্বাস্য সম্ভাব্যতার চেয়ে ঘটতে পারে এরকম অসম্ভাব্যতা কাব্যে সবসময় কাম্য।'

অনুকারক হিসাবে কবিকে, চিত্রকরের ও অন্য অন্য সাদৃশ্য রচনাকারীদের মতোই, প্রতিটি ক্ষেত্রেই অবশ্যই বিষয়টি একটি অথবা তিনটি ক্ষেত্রের (aspect).উপস্থাপনা করবে, হয় বিষয়টি যা ছিল, অথবা বিষয়টি বর্তমানে যেমন, অথবা বিষয়টি সম্পর্কে যা বলা বা ভাবা হয়েছে, হচ্ছে বা যা হওয়া উচিত। এ সব কিছুই কবি ভাষায় সৃষ্টি করেন, হয়তো বা আশ্চর্য কিছু শব্দ ও অলংকারের সংমিশ্রণে, বিভিন্ন ধরনের পরিবর্তিত শব্দের রূপসমূহ ব্যবহার করে— যেহেতু এ ধরনের ব্যবহার কাব্যের ক্ষেত্রে স্বীকৃত। একথাও মনে রাখতে হবে যে রাজনীতির তুল্য নির্ভুলতা কবিতায়, বা অন্য কোনও শিল্পেও থাকে না। [*Poetics* : Aristotle, Ingram Bywater]

উনিশ শতক থেকে ইউরোপীয় সাহিত্যে ও শিল্পে বাস্তবের রূপ কি হবে সে বিষয়ে নতুন নতুন মতবাদের সৃষ্টি হয়ে চলেছে : প্রকৃতিবাদ (Naturalism),বাস্তববাদ (Realism)

সমালোচনামূলক বাস্তববাদ (Critical Realism), পরাবাস্তববাদ (Surrealism) সমাজতান্ত্রিক বাস্তববাদ (Socialist Realism) এবং অতি সম্প্রতি লাতিন আমেরিকার সাহিত্যে জাদুবাস্তববাদ (Magic Realism) — সমাজ ও সাহিত্যে নতুন ধারার আত্মপ্রকাশের সঙ্গে সঙ্গেই সমালোচনার ছাঁদ-ছাঁচ-কাঠামো-নামরূপ পরিবর্তিত হচ্ছে। এই পরিবর্তন অবশ্য একথাই প্রমাণ করে যে, সমাজবাস্তবের যেমন দ্রুত পরিবর্তন ঘটছে, তেমনই সৃজনশীল সাহিত্যেও ক্রমশই পুরোনো *রূপাঙ্গিককে ভেঙে ফেলে, অতিক্রম করে 'যা ভাবা হয়েছে হচ্ছে বা হওয়া উচিত' তার 'নতুন* শিল্পরূপকে' ধরতে চাইছে ফুটিয়ে তুলতে চাইছে। এভাবে সমকালীন বাস্তবকে ফুটিয়ে তোলার মধ্যে নিহিত রয়েছে অনুকরণ, যেখানে 'ঘটতে পারে এরকম সম্ভাব্যতা'কে শিল্পী সাহিত্যিকেরা রূপাবয়ব দিতে চাইছেন।

উনিশ শতকের এমিল জোলা যেমন বলেছিলেন, "Naturalism in letters is equally the return to nature and to man, direct observation, exact anatomy, the accptance and depicting of what is..........Instead of imagining an adventure, of complicating it, of arranging stage effects. which scene by scene will lead to a final conclusion, you simply take the life study of a person or a group of persons whose action you faithfully depict." [Emile Zola, Naturalism on the stage, 1880]

আমরা স্মরণ রাখতে পারি, অ্যারিসট্‌টল পালিত হয়েছিলেন জনৈক গ্রিক চিকিৎসকের কাছে— চিকিৎসকের প্রত্যক্ষ বাস্তব অনুসন্ধানী দৃষ্টিভঙ্গি ছাড়াও, কাব্যতত্ত্ব ব্যাখ্যার ক্ষেত্রে অ্যারিস্‌ট্‌টল গ্রিক চিকিৎসাশাস্ত্র থেকে কিছু শব্দও গ্রহণ করেছিলেন। এমিল জোলাও, অ্যারিস্‌টটলের বহু বছর পরে ক্লদ ব্যারনার (Claude Bernard) সমর্থিত চিকিৎসাশাস্ত্রের তত্ত্বের নিরীক্ষামূলক পদ্ধতি নিজেই সাহিত্য সৃষ্টির ক্ষেত্রে প্রয়োগ করেছিলেন। সাহিত্য সমালোচনায় গেয়র্গ লুকাচ অবশ্য জোলার বক্তব্য থেকে সরে এসেছেন। তিনি ভেবেছিলেন, জীবনের সুনির্দিষ্টতার (Particularity) প্রত্যক্ষ অনুকরণের মধ্যে অসুবিধে ও শৈল্পিক দুর্বলতা রয়েছে, তা আরও বেশি করে বিষয়ীগত ভাববাদকে (subjective idealism) বিষয়বস্তু ছাড়াই প্রবল করে তুলতে পারে, বিকশিত করতে পারে যেক্ষেত্রে বুর্জোয়াদের সাধারণ মতাদর্শগত ও দর্শনগত বিকাশ এ ধরনের বাস্তবের শৈল্পিক অনুকরণের দার্শনিক বস্তুবাদী ভিত্তিকে অজ্ঞেয়বাদী ভাববাদে রূপান্তরিত করে। তিনি মনে করেছেন, বাস্তবের শিল্পীর সৃজ্য বিষয়ের বিশদ অবশ্যই নির্বাচিত করতে হবে এবং প্রথমাবধিই এমন ভাবে চিত্রিত করতে হবে যাতে সমগ্রের (totality) সঙ্গে তার সম্পর্ক জীবন্ত ও গতিময় হয়। এই রকম নির্বাচন এবং বিশদের দিকগুলি সজ্জিত করাটা বাস্তবের প্রত্যক্ষ প্রতিফলনের ওপর নির্ভরশীল। [George Lukacs : *Writers and Critic, 'Art and Objective Truth*, pp. 34-43]

একজন সমালোচক 'বাস্তবতার সংজ্ঞা যেভাবে নির্দেশ করেন, একজন সাহিত্যিক শিল্পীর বাস্তবকে দেখার রূপ ভিন্নতর হয়ে যেতে পারে, বাস্তবের মধ্যে রয়েছে প্রকৃতি এবং মানুষ। মানুষের বাস্তবতার মধ্যেও আবার দুটি দিক।—সমাজ ও ব্যক্তি, সমষ্টি ও ব্যষ্টি। ব্যক্তির বাস্তবতার মধ্যেও আবার রয়েছে সমাজ এবং প্রকৃতি সম্পর্কে অভিজ্ঞতার বহির্জগত ও তার চেতন-অবচেতন মানসজগত। সমাজের মধ্যেও ঐতিহ্য, পুরাণ, রীতিনীতি, প্রত্নপ্রতিমা বা আদিকল্পের (archetype) যৌথ অবচেতনার এক বিশাল জগত। — এই সমস্ত কিছুর মধ্যে থেকেই শিল্পীর 'বাস্তব' সৃষ্টি হয়, এই বাস্তবকে অনুসরণ অনুকরণের মধ্যে সচেতন-অচেতন

নির্বাচন প্রক্রিয়াটি শিল্পীর মনে চলতে থাকে। তাই, বাস্তববাদ এবং বাস্তববাদের বিভিন্ন বিচিত্র রূপের প্রকাশ ঘটছে। 'বাস্তববাদ' শব্দটি তাই যথেষ্ট পুরোনো। বেরটোল্ট ব্রেশট বাস্তববাদ সম্পর্কে বিশ্লেষণ করেছেন। তাঁর ভাবনায় সাহিত্যকর্ম কলকারখানার মতো যেমন দখল নেওয়া যায় না, সাহিত্যিক প্রকাশের রূপগুলিও শিল্পকারখানার পদ্ধতিতে ব্যবহার করা যায় না। বাস্তববাদী সাহিত্য কি ভাবে, কখন এবং কোন শ্রেণীর দ্বারা সে রচনা ব্যবহৃত হচ্ছে— এগুলি বিশদ অনুপুঙ্খের শর্তাধীন। ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য রচনা স্বতঃস্ফূর্ত ভাবে বাস্তববাদী রচনা বলা চলে না, কেননা ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য রচনা সব সময় বাস্তববাদী রচনা নয়, বাস্তববাদী রচনাও পাওয়া যাবে যা ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য (sensuous) রচনা নয়। বিদ্যমান বাস্তবতাকেই সাহিত্যে শিল্পে বাস্তববাদ বলা যাবে না। প্রতিটি স্বতন্ত্র ক্ষেত্রে, জীবনের যে চিত্র আঁকা হয়েছে, তা অন্য কোনও চিত্রের সঙ্গে তুলনা না করে, অঙ্কিত প্রকৃত জীবনের সঙ্গে তুলনা করে দেখতে হবে। [Bertholt Brecht : *Brecht on Theatre*, p. 108-112]

লুকাচ বাস্তববাদ তথা সমাজতান্ত্রিক বাস্তববাদের একটা স্থায়ী ছাঁচের কথা ভেবেছিলেন। ব্রেশট দেখেছেন প্রতিমুহূর্তে বাস্তব পালটে যাচ্ছে, কালকের বাস্তব আজকে বিবর্তিত, ভবিষ্যতের বাস্তবের রূপ আবার আজকের বাস্তব থেকে ভিন্ন। বাস্তব নিয়ত পরিবর্তনশীল। একারণেই একটি মাত্র বিশেষ সাহিত্য আঙ্গিককে বাস্তবের চিত্ররূপ দেবার আদর্শ আঙ্গিক রূপে ব্রেশট মানতে চান নি।

রতি, হাস, শোক, ক্রোধ, উৎসাহ, ভয়, জুগুপ্সা বিস্ময় ও শমের মতো মানব মনের অন্তর্গত স্থায়ী ভাব বা আবেগসমূহ 'স্থায়ী' হিসেবে অবস্থান করেও বাস্তবের পরিবর্তনের সঙ্গে সঙ্গে তার প্রকাশের রূপও পরিবর্তিত হতে থাকে। শিল্প-সাহিত্য এই নিত্য প্রকাশমান রূপগুলিকে ধরে রাখতে চায়, যেখানে সমালোচক বিশেষ একটি সময়ের নির্মাণ ও সৃষ্টির রূপটি আমাদের দেখাতে চান, একটা নির্দিষ্ট কালে বাস্তবকে এ-ভাবে বোঝাতে গেলে বাস্তবের আগে একটা উপসর্গ হয়তো অনিবার্য হয়ে দাঁড়ায়— সমালোচনামূলক, সমাজতান্ত্রিক, পরা বা জাদু শব্দের উপসর্গ যোগ করে বাস্তবকে বেদ্য তোলার চেষ্টা হয়— ভবিষ্যতেও তা হবে।

মার্কসীয় সাহিত্য ভাবনার অন্যতম আলোচ্য বিষয় মার্কসের বিচ্ছিন্নতাবাদের তত্ত্ব ভাবনা। এই ভাবনা মার্কসীয় সাহিত্য ভাবনার প্রেক্ষিতে আধুনিক মনস্তাত্ত্বিক ভাবনা ধারার সঙ্গেও সংযুক্ত করেছে। মার্কসের এই বিচ্ছিন্নতা ধারণটা কী? মার্কসের বিচ্ছিন্নতার (alienation) ধারণা নিয়ে মার্কসবাদীদের নিজেদের মধ্যেই বির্তকের শেষ নেই এবং যাঁরা মার্কসবাদী নন, তাঁরাও নানা প্রকারের ব্যাখ্যা হাজির করেছেন।

মার্কসের ভাবনায় 'বিচ্ছিন্নতা' বা অ্যালিয়েনেশনের (alienation) তত্ত্বের গুরুত্ব সম্পর্কে বিতর্ক প্রায় অর্ধ শতাব্দীর। অনেকেই মনে করেছেন মার্কসের সমগ্র তত্ত্ব কাঠামোর ভিত্তিতে রয়েছে 'বিচ্ছিন্নতা'র ভাবনা। অন্য অনেকের মতো, 'মার্কসবাদী' হিসেবে মার্কসের নিজস্ব মত প্রতিষ্ঠার পুর্বে একটি পর্বে মার্কস সে-ভাবনাকে আর গুরুত্ব দেন নি। অনেকের বক্তব্য, মার্কসবাদকে মানবতাবাদের নানা রূপের স্বগোত্রের করে তোলার জন্যেই 'বিচ্ছিন্নতা'র তত্ত্বটি মার্কসবাদের মধ্যে প্রকট করে তোলা হচ্ছে। মার্কসবাদ সম্পর্কে গুরুত্বপূর্ণ ও গুরুভার কোনও আলোচনা পাওয়া যাবে না বর্তমানে, যেখানে 'বিচ্ছিন্নতা'র তত্ত্ব প্রাসঙ্গিক করে তোলা হয়।

মার্কসের যে পাণ্ডুলিপি গ্রন্থাকারে প্রকাশের পর উপরি-উক্ত বিতর্কের সূচনা সে গ্রন্থের নাম "১৮৪৪ সালের অর্থনৈতিক ও দার্শনিক পাণ্ডুলিপি"। [The Econonic and Philosophic Manuscript of 1844]

এই পাণ্ডুলিপি লেখা হয় মার্চ-আগস্ট ১৯৪৪ সালে, মার্কস তখন ছাব্বিশ বছরের যুবক এবং জেনা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে পি.এইচ.ডি. ডিগ্রিও পেয়েছেন, কিন্তু চাকরি কোথাও পান নি।

১৮৪৪ সালে লেখা এই পাণ্ডুলিপি প্রকাশিত হয় ১৯৩২ সালে, জার্মান ভাষায়। মার্কসের আমৃত্যু সহযোগী বন্ধু এঙ্গেলেসের মৃত্যুর পরে মার্কস এঙ্গেলসের অপ্রকাশিত সমস্ত পাণ্ডুলিপি জার্মান কমিউনিস্টদের তৎকালীন অন্যতম প্রধান নেতা কার্ল কাউটস্কির কাছেই গচ্ছিত থাকে।

রাশিয়ার ১৯১৭ সালের বিপ্লবের পরে মার্কস-এঙ্গেলস-লেনিন ইনসটিটিউট প্রতিষ্ঠিত হয়। উক্ত প্রতিষ্ঠানের পরিচালক ডি. রিয়াজানভ কাউটস্কির কাছ থেকে মার্কস এঙ্গেলসের অপ্রকাশিত পাণ্ডুলিপি সংগ্রহ করে মসকোয় নিয়ে আসেন।

রিয়াজানভ ১৯২৯-৩১ সালের মধ্যে মার্কসের ১৮৪৪ সালের পাণ্ডলিপিটি অপ্রকাশিত অবস্থায় গেয়র্গ লুকাচকে দেখান। সম্ভবত রিয়াজানভ ছাড়া লুকাচই উল্লেখযোগ্য মার্কসবাদী যিনি এই পাণ্ডুলিপি অপ্রকাশিত অবস্থায় প্রথম পাঠ করেন। এবং এর ফলে লুকাচের বৌদ্ধিক বিকাশ গভীরভাবে প্রভাবিত হয়।

শুধু লুকাচ নন, পরবর্তীকালের মার্কসের পক্ষে বিপক্ষে সমস্ত চিন্তাবিদই এই 'পাণ্ডুলিপি'টি নানাভাবে ব্যাখ্যা করেছেন। যদিও 'পাণ্ডুলিপি'টি সম্পূর্ণ নয়, কোনও কোনও জায়গায় পাতা নষ্ট হয়ে গেছে।

'বিচ্ছিন্নতা' এই শব্দটি মার্কস ফয়েরবাখের নৃতত্ত্ব থেকে গ্রহণ করেছিনেল, যেখানে ফয়েরবাখ মানুষের সারসত্তাকে শুধু এক ঈশ্বরের রূপে বিকৃত হয়ে উপস্থিত বলে চিহ্নিত করেছিলেন; যদিও মানুষ তার আপন সারসত্তার (essence) প্রতি রূপেই (প্রজাতি-সত্তায়) ঈশ্বরকে সৃষ্টি করেছে। কিন্তু ঈশ্বর মানুষের বাইরে, পূর্ব-অস্তিত্ব (pre-existing) সৃষ্টিকর্তারূপে প্রতিভাত হচ্ছে। রাষ্ট্র ও অর্থনীতি মানুষের বাস্তব আত্মনিয়ন্ত্রিত শ্রমকে অনুরূপভাবে বাজেয়াপ্ত করছে— এই কারণে রাষ্ট্র ও অর্থনীতির সমালোচনায় মার্কস 'বিচ্ছিন্নতা'র ধারণাটি (concept) ব্যবহার করেন। তাঁর পরবর্তী, রচনায় যদিও, এই শব্দটি কদাচিৎ ব্যবহৃত হয়েছে, এবং সেক্ষেত্রেও হয় ব্যঙ্গাত্মক ভাবে অথবা অন্য ধ্বনের ভাবনার বাহন হিসেবে।— এ-রকম ভেবেছিলেন অন্যতম আধুনিক মার্কসীয় তাত্ত্বিক আলথুসার।

মার্কস ফয়েরবাখের বিচ্ছিন্নতার সম্পর্কিত ধারণার সপক্ষে ব্যাখ্যা করেছেন— মানুষ নিজেরা যে অবস্থায় বাঁচছে, সেই অবস্থায় বাঁচার মধ্যে যে অতৃপ্তি বা শূন্যতাবোধ তার মধ্যে নিজেদের বাস্তব থেকে বিচ্ছিন্ন কল্পজগৎ সৃষ্টি করে; কারণ তার বেঁচে থাকার শর্ত বা অবস্থাটাই তাকে প্রজাতি সত্তা থেকে বিচ্ছিন্ন করে ফেলছে। ব্যক্তি থেকে সমাজ বিচ্ছিন্ন হচ্ছে। তার অর্থ সমাজ থেকেও ব্যক্তি বিচ্ছিন্ন হচ্ছে। সেক্ষেত্রে সমাজই সমগ্রভাবে বিচ্ছিন্ন সমাজ হয়ে পড়ছে। এই বিচ্ছিন্নতার অবস্থা সমূহে বিচ্ছিন্ন সমাজের সারসত্তার আধিপত্য— এর ভিত্তিতেই আবার মার্কস শ্রমের বিচ্ছেদ বা "বিচ্ছেদ-ঘটা" (alienated) শ্রম-সম্পর্কিত ভাবনায় উপনীত হয়েছেন।

মার্কসের আলোচ্য "১৮৪৪ সালের পাণ্ডুলিপি"র ভাষা জটিল, বিষয় বিন্যাস কিছুটা এলোমোলা। কিন্তু কয়েকটি স্থানে বক্তব্য খুবই সম্পূর্ণ ও স্বচ্ছ। বিশেষভাবে, যেখানে 'বিচ্ছিন্নতা' প্রসঙ্গে হেগেলের সঙ্গে মার্কস নিজের বক্তব্যের তুলনা করেছেন। এখানে হেগেলের সঙ্গে তাঁর

মত পার্থক্য স্পষ্ট করে বলেছেন। আবার হেগেলের কাছে তাঁর ঋণের কথাও স্বীকার করেছেন। *হেগেল ভেবেছিলেন বাস্তব হল চিদাত্মার (spurit) স্বয়ং বাস্তবায়ন। এই পদ্ধতিতে চিদাত্মা এমন এক বিশ্ব সৃজন করল যা চিদাত্মার ভাবনায় প্রথমত বাহ্যিক ; এবং পরবর্তী কোনও* সময়ই শুধু চিদাত্মা উপলব্ধি করে যে এই বিশ্ব তার স্বীয় সৃষ্টি। চিদাত্মা এবং বিশ্ব সৃজনের প্রক্রিয়া কোনও আলাদা ব্যাপার নয়। চিদাত্মার অস্তিত্ব এই সৃজন প্রক্রিয়ার মধ্যে ও মাধ্যমেই। এই প্রক্রিয়ার সূচনায় চিদাত্মা নিজেকেই বহিঃস্থ (externalize) বা বিচ্ছিন্ন করছে নিজের থেকে। ক্রমশ ক্রমেই শুধু চিদাত্মা উপলব্ধি করতে পারে যে বিশ্ব তার নিজের থেকে বাহ্যিক বা স্বতন্ত্র নয়। হেগেলের কাছে, চিদাত্মার এই আত্মউপলব্ধির ব্যর্থতার মধ্যেই বিচ্ছিন্নতা নিহিত এই বিচ্ছিন্নতা লুপ্ত হবে যখন মানব সম্পূর্ণ আত্মসচেতন হয়ে তার পরিবেশ ও তার সংস্কৃতি যে চিদাত্মা থেকে উদ্‌গত— এই উপলব্ধিতে উপনীত হবে। স্বাধীনতা বা মুক্তি এই উপলব্ধিতেই নিহিত এবং ইতিহাসের লক্ষ্য মুক্তি।

মার্কস লিখেছেন, "The great thing in Hegel's phenomenology and its final result–the dialectic of negativity as the moving and productive principle–is simply that Hegel grasps the self develoment of man as a process, objectification as loss of the object, as alienation and transcendence of this alienation; that he thus grasps the nature of work and comprehends objective man authentic because actual, as the rseult of his work."

মার্কস এই পাণ্ডুলিপিতে মোটামুটিভাবে যা করলেন, তাহল তিনি হেগেলের চিদাত্মার ধারণাকে খারিজ করে দিলেন এবং শুধু শান্ত, সসীম ব্যক্তি সত্তাকে স্বীকার করে নিলেন। এর ফলে হেগেলীয় ধারণায় চিদাত্মা ও বিশ্বের আন্তঃসম্পর্ক মার্কসীয় ভাবনায় মানব ও তার সামাজিক সত্তার সম্পর্কের রূপ পেল। মার্কসের মনে হয়েছে হেগেল শুধু মানুষের মানসক্রিয়া বা মানসিক কার্যকলাপের কথাই ভেবেছেন। অর্থাৎ, মানুষের ভাবজগৎ সম্পর্কে ভেবেছেন। মানুষের ভাবজগৎ যদিও গুরুত্বপূর্ণ, কিন্তু শুধু ভাবজগতের দ্বারা সামাজিক ও সাংস্কৃতিক পরিবর্তনের পর্যাপ্ত ব্যাখ্যা পাওয়া সম্ভব নয়।

১৮৪৪ সালের পাণ্ডুলিপিতেই মার্কস তাঁর দার্শনিক অর্থনৈতিক ভাবনার ভিত্তিভূমি নির্মাণ করেছেন। পরবর্তী কালে মার্কসের 'বিচ্ছিন্নতার তত্ত্ব' নিয়ে অন্তহীন বিতর্কের ভিত্তিও এই গ্রন্থে।

ফয়েরবাখের নৃতত্ত্বের ধারণা থেকে হেগেলীয় চিদাত্মার বিশ্বসৃষ্টি ও বিচ্ছিন্নতার ভাববাদী ধারণাকে খারিজ করে, মার্কস কিন্তু নিজের বস্তুবাদী মতবাদকে এখানে উপস্থাপন করেছেন। এই পাণ্ডুলিপিতে তিনি বললেন, বিশ্বের অন্যান্য প্রাণীদের মধ্যে মানুষ এমন এক প্রাণীর প্রজাতি (species) , যে প্রজাতি জগতকে তৈরি করে নিতে নিজেকে সচেতন প্রজাতি বলে প্রমাণ করে। মানুষ আপন সারাসত্তার প্রতি যে আচরণ করে, প্রজাতির প্রতিও তেমনই আচরণ করে। জীব জন্তুও কিছু কিছু উৎপাদন করে, কিন্তু জীবজন্তু উৎপাদন করে আশু প্রয়োজন বা চাহিদা মেটায়— নিজেদের এবং শাবকদের প্রয়োজনে। কিন্তু এই উৎপাদন তাৎক্ষণিক, একদেশদর্শী (one-sided) । আশু, দৈহিক প্রয়োজনে থেকে মুক্ত হয়ে মানুষ বাস্তবিক স্বাধীনভাবে উৎপাদন করে। প্রজাতিকে উৎপাদন করে। প্রজাতির সঙ্গে সমগ্র প্রকৃতিকে পুনরুৎপাদিত করে। মৌমাছি বা এ ধরনের অনেক প্রাণীর বাসা তৈরি সূক্ষ্ম কৌশল ও চমৎকারিত্ব অনেক স্থপতিকেও লজ্জা দিতে পারে, কিন্তু ও ধরনের প্রাণীরা প্রকৃতির অন্ধ নিয়মে যুগ যুগ ধরে একই কাজ অচেতন ভাবেই করে চলেছে। মানুষ কিছু সৃষ্টি করার আগে তার চেতনায় সেটা রূপ লাভ করে এবং

তার পরে বাস্তবে জিনিসটি তৈরি করে। "জীবজন্তুর উৎপাদন প্রত্যক্ষভাবে তাদের দৈহিক সত্তারই অন্তর্গত কিন্তু মানুষ স্বাধীনভাবে তার উৎপন্নের সম্মুখীন হয়। জীবজন্তু যে প্রজাতির অন্তর্গত, তাদের প্রয়োজন ও মান অনুসারে সৃজন করে, কিন্তু প্রত্যেক প্রজাতির মান অনুসারে কীভাবে তৈরি করতে হয়, মানুষ তা জানে এবং এ-ও জানে যে কীভাবে ওই অন্তর্নিহিত মান সর্বত্র বস্তুতে প্রয়োগ করতে হয়। সুতরাং মানুষ সৌন্দর্যের নিয়ম অনুসারেও বস্তুর রূপ দেয়।" [মার্কস]

মার্কস হেগেলের চিদাত্মার ভাববাদী ধারণাকে খারিজ করলেন। জীবজগতের অন্ধ নিয়তিবাদকেও তিনি মেনে নিলেন না। মানুষের চেতনার জগতের গুরুত্ব মার্কসের বক্তব্যে স্বীকৃত হল। কিন্তু সেই চেতনার জগৎ মানুষের প্রজাতিগত অস্তিত্ব,— তার সমাজের ওপর নির্ভরশীল বলে নির্দিষ্ট করলেন। সমাজ বা প্রজাতির অস্তিত্ব, সমাজের পরিবর্তন, সংস্কৃতির অগ্রগতির একটি বাস্তব শর্ত হিসেবে 'কাজ করা' বা 'শ্রম'কে দার্শনিক' তত্ত্বভাবনার অন্তর্ভুক্ত করলেন। মার্কসই প্রথম এবং এক অর্থে শেষ দার্শনিক যিনি মানবিক শ্রমকে দর্শনের বিভাগগুলির অন্তর্ভুক্ত করলেন। এর ফলে ভাব জগৎ বা মানস-জগতের স্বীকৃতি মার্কসবাদে তো থাকলই, কিন্তু শ্রম বা ক্রিয়া তার সঙ্গে যুক্ত হল। এর ফলে, প্রকৃতির অন্ধ অপরিবর্তনীয় নিয়মের প্রতি আনুগত্যের যান্ত্রিক বস্তুবাদী ধারণা থেকে বস্তুবাদ হিসেবে মার্কসের দর্শন স্বতন্ত্র হল। বস্তু ও বিশ্বের আদ্যত্ব (priority) মেনে নেওয়ার জন্যে মার্কসবাদ বস্তুবাদ, কিন্তু মানব-চেতনা ও মানব শ্রমকে তত্ত্বভাবনার অঙ্গীভূত করে যান্ত্রিক বস্তুবাদ ও ভাববাদ থেকে মার্কস পৃথক এক বিশ্ববীক্ষা হিসেবে নিজের মতবাদকে প্রতিষ্ঠিত করলেন।

প্রকৃতপক্ষে, ১৮৪৪ সালের পাণ্ডুলিপিতে মার্কস নিজের তত্ত্বগত অবস্থান নিজের কাছেই স্বচ্ছ করে তুলেছেন। 'বিচ্ছিন্নতা'র ধারণা থেকে মানব ও সমাজের সম্পর্কের একটি তত্ত্বগত আর্দশ অনুসন্ধান করেছেন। সেই তত্ত্বগত আদর্শের ক্ষেত্র হিসেবে সেই যুগের ধনতন্ত্রের রূপায়বয়ব ও তত্ত্বভাবনাগুলি রয়ে গেছে। কেননা, মার্কসও এক সুনির্দিষ্ট সমাজ-দেশ কালের মধ্যেই জন্মলাভ করেছেন এবং তাঁর আপনকাল— সমসময়কে সচেতনভাবেই তিনি উপলব্ধি করতে চেয়েছেন 'বিচ্ছিন্নতা'র তত্ত্বগত আদর্শের ক্ষেত্রে সুনির্দিষ্টভাবে সমকালীন জার্মান ভাববাদী দর্শন ও ইংরেজি অর্থনীতির চিন্তার মধ্যে। কিন্তু 'বিচ্ছিন্নতা'র বক্তব্য,বিশেষত '১৮৪৪ সালের পাণ্ডুলিপি'তে মার্কসেরই আত্মবীক্ষণ, উপলব্ধি— যা তিনি প্রকাশযোগ্য রূপে রচনা করেন নি। ফলে, 'বিচ্ছিন্নতা'র তত্ত্বগত আদর্শ (model) কিছু পরিমাণে বিমূর্ত রয়ে গেছে— সুনির্দিষ্ট রাষ্ট্র কাঠামোয় শ্রেণীশাসিত সমাজে শ্রমজীবী মানুষের শ্রম কিভাবে তার থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে যাচ্ছে— সে-বিষয়ে এই 'পাণ্ডুলিপি'তে আলোচনার সূত্রপাত। কিন্তু আমাদের মনে হয়, শ্রমের বিচ্ছেদ সম্পর্কিত আলোচনার মধ্যে এখানে যে বিমূর্ততা পরবর্তীকালে মার্কসের 'বিচ্ছিন্নতা'র তত্ত্ব নিয়ে যে বিতর্ক, তার মূল এখানেই নিহিত।

এক অর্থে, এই বিমূর্ততা পরবর্তী বহু ভাবনা চিন্তার সম্ভাবনা খুলে দিয়েছে। মার্কসকে অবলম্বন করেও যে দুই পক্ষ বিচ্ছিন্নতার ব্যাখ্যাতা, তাঁদের মধ্যে মিলনের সেতু হয়তো অদূর ভবিষ্যতে খুঁজে পাওয়া যাবে না, কিন্তু চিন্তাশীল মানুষকে দু'পক্ষের ভাবনাই নানা বিষয়ে ভাবনায় উদ্দীপ্ত করে।

'বিচ্ছিন্নতা'র তত্ত্ব শুধু সামাজিক শ্রম উৎপাদন এবং সেই শ্রমের আত্মসাৎ-কে বা কোন্ শ্রেণী করছে— সে আলোচনাতে সীমাবদ্ধ থাকে নি, এই ভাবনার শাখা-প্রশাখা নানা স্তরে বহুদিকে বিস্তৃত হয়েছে শ্রমিক-মালিক, ব্যক্তি-সমাজ, জাতিতে জাতিতে সম্প্রদায়, নারীপুরুষ,

মানুষ-প্রকৃতি, শিল্প-শিল্পী, বিষয়-আঙ্গিক ইত্যাদি নানা বিষয়ের আন্তঃসম্পর্কের প্রশ্নে প্রাসঙ্গিক হয়ে পড়েছে।

১৯১৩ সালে লেনিন তাঁর "মার্কসবাদের তিনটি উৎস এবং তিনটি উপাদান"(The Three Sources and Three Component Parts of Marxism) প্রবন্ধে মার্কসবাদের ব্যাখ্যা করেন।

লেনিন লিখেছেন, মার্কসবাদের তিনটি উৎস হল : জার্মান দর্শন, ইংরেজি রাজনৈতিক অর্থনীতি (political economy) এবং ফরাসি সাম্যবাদ।

তিনটি উপাদানকে লেনিন এভাবে সুনির্দিষ্ট করেছেন :

(ক) মার্কসের দর্শন হল পরিপূর্ণ দার্শনিক বস্তুবাদ, যা মানবজাতিকে এবং বিশেষভাবে শ্রমিকশ্রেণীকে, জ্ঞানের শক্তিশালী হাতিয়ার যোগান দিয়েছে।

(খ) সমগ্র পৃথিবীতে ধনতন্ত্র জয়লাভ করেছে, কিন্তু এই বিজয় মূলধনের ওপর শ্রমের বিজয়ের পূর্বসূচনা।

(গ) মার্কসের প্রতিভা এখানেই যে বাস্তবে তিনি অন্য কোনও ব্যক্তির আগে এর থেকে সিদ্ধান্ত টানতে সক্ষম হয়েছিলেন এবং বিশ্ব ইতিহাস যে শিক্ষা দেয় সেই সিদ্ধান্তটি এই সামঞ্জস্যপূর্ণভাবে প্রয়োগ করেছিলেন। এই সিদ্ধান্তটি হল শ্রেণী সংগ্রামের তত্ত্ব।

১৯১৭ সালে রাশিয়ার সমাজতান্ত্রিক বিপ্লবের ফলে লেনিনকৃত মার্কসবাদ সম্পর্কিত ব্যাখ্যা বিশেষ মর্যাদা পায়। এবং একথাও বলা চলে, মার্কসবাদের জ্ঞানতত্ত্বের চেয়ে প্রয়োগতত্ত্বের ওপরে এই পর্বে ঝোঁক বেশি পড়েছে। রাশিয়ার কমিউনিস্ট পার্টিও সারা পৃথিবীর কমিউনিস্ট পার্টিগুলির ওপর কম বেশি কর্তৃত্ব করেছে। কিন্তু সোভিয়েত পার্টির বিংশতি কংগ্রেসের পর স্তালিন যুগ নামে চিহ্নিত ঐতিহাসিক কালটির ব্যক্তি স্তালিনসহ বহু কাজকর্মে তত্ত্বভাবনা নিয়ে প্রশ্ন দেখা দেয়। বিশ্বব্যাপী কমিউনিস্ট পার্টিগুলির মধ্যে বিপ্লবী লাল রঙের গাঢ়তা বহু ক্ষেত্রেই ফিকে হয়ে যেতে থাকে। অন্যদিকে, সারা পৃথিবীতেই কলেজ বিশ্ববিদ্যালয় নির্বাসিত দারিদ্র্যের সঙ্গে সংগ্রামী বিপ্লবী মার্কস গবেষণার অন্যতম উপজীব্য বিষয় হিসেবে স্বীকৃত হয়। ফলে, কমিউনিস্ট পার্টিগুলির মধ্যে নানা রঙের পার্থক্যের মতোই নানা মতবাদের মার্কসবাদীদের যেমন দেখা গেল, তেমন মার্কসবাদে বিশ্বাসী নন, কমিউনিস্ট পার্টির সভ্যও নন, এ-রকম একদল মার্কসতাত্ত্বিকেরও (Marxologist) সৃষ্টি হয়েছে। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধোত্তর ইউরোপে 'ঠাণ্ডা লড়াই' এর (Coldwar) যুগে কিছু স্পর্শকাতর বুদ্ধিজীবী বিশ্বশান্তির চিন্তায় মার্কসবাদ ও ধনতান্ত্রিক মতবাদগুলির মধ্যে ঐক্য সূত্র সন্ধানেও ব্যাপৃত হয়েছেন।

ফলে মার্কসবাদকে শ্রমিক শ্রেণীর হাতে শ্রেণী সংগ্রামের হাতিয়ার হিসেবে ব্যবহারের লেনিনীয় ব্যাখ্যাও আর সকলের কাছে গ্রহণযোগ্য থাকে না। বরং মার্কস অষ্টাদশ-ঊনবিংশ শতাব্দীর মানবতাবাদেরই উত্তরসূরি— এ রকম বক্তব্য অনেকের লেখাতে প্রকাশিত হল। অন্যপক্ষের বক্তব্য : মানবতাবাদ কার্যত বুর্জোয়া মতবাদ— সে কারণে তা মার্কসবাদ বিরোধী। কিন্তু মানবতাবাদের এক অখণ্ড বিশেষ রূপ নেই। মানবতাবাদেরও একটি দক্ষিণপন্থী ও একটি বামপন্থী রূপ আছে। বামপন্থী মানবতাবাদ শ্রমজীবীদেরই মানবসত্তার 'আধার' বলে চিহ্নিত করেছে। শ্রমজীবী মানুষের কর্মের মধ্যেই প্রকাশ পায় মানবজাতির প্রজাতি চেতনা। সেই অর্থে মানব-সারসত্তার প্রচারকও শ্রমজীবী। শ্রম ও মূলধনের বিচ্ছেদের মধ্যে দিয়ে মানব প্রজাতির মধ্যে এসেছে বিচ্ছিন্নতা। এই বিচ্ছিন্নতা থেকে মানব প্রজাতিকে মুক্ত করার ঐতিহাসিক ভূমিকাই হল শ্রমজীবীদের ঐতিহাসিক নিয়তি। যদিও প্রতিটি দেশেই মানব-সারসত্তার নেতির চরম শিকার শ্রমজীবী মানুষেরাই— তাদেরই সবচেয়ে বেশি, 'অমানবিক' অবস্থায় কাজ করতে

হয়, জীবন নির্বাহ করতে হয়। বস্তুগতভাবে 'বিচ্ছিন্নতা'র তত্ত্ব ব্যক্তিগত সম্পত্তি সম্পর্কের অমানবিক চরিত্রের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ। কিন্তু মনে রাখতে হবে, হেগেল ও অন্যান্য জার্মান ভাববাদী চিন্তাবিদদের ভাবনাতেও সমস্যার এই দিকটি প্রতিফলিত হয়েছিল, যদিও তাঁরা, মার্কস যে দিকটিতে জোর দিয়েছেন, সেদিকে দেন নি। মার্কস 'বিচ্ছিন্নতা'র জন্মকে ব্যক্তিগত সম্পত্তির আর্বিভাবের সঙ্গে এবং বৈরিতামূলক শ্রম-বিভাজনের (division of labour) সঙ্গে সম্পৃক্ত বা যুক্ত করে দেখেছেন। সে-বিচারে 'বিচ্ছিন্নতার পরিধির মধ্যে সমস্ত মানবিক ক্রিয়াই অন্তর্ভুক্ত হয়ে পড়ে। কেননা বিশেষ ধরনের কাজগুলির বিচ্ছিন্ন এক একটি গোষ্ঠীর একচেটিয়া হয়ে পড়ে শ্রমবিভাজনে, এক গোষ্ঠীর কাছ থেকে অন্য গোষ্ঠীরা— সমাজের অন্য সব মানুষেরা বিচ্ছিন্ন। মার্কসের ঝোঁক কেন্দ্রিত হয়েছে শ্রমের বিচ্ছিন্নতার ওপরে। বিচ্ছিন্নতার সাহায্যে তিনি ধনতান্ত্রিক সম্পর্কের পদ্ধতিগত চরিত্র বৈশিষ্ট্য এবং সেই উৎপাদন ব্যবস্থায় শ্রমজীবী বা প্রলেতারিয়েতের অবস্থান ব্যাখ্যা করতে চেয়েছেন। সেই অবস্থান যথাক্রমে :

(১) শ্রমিকের সঙ্গে অ-শ্রমিকের সম্পর্ক ;
(২) শ্রমিকের সঙ্গে তার শ্রমের সম্পর্ক ;
(৩) শ্রমিকের সঙ্গে তার উৎপাদিত পণ্যের সম্পর্ক ;
(৪) সামাজিক সম্পর্কের বাস্তব চরিত্র ;
(৫) সমাজে 'অমানবিক' সম্পর্কের (যেমন টাকার) আধিপত্য ;
(৬) শ্রমজীবী মানুষের নৈতিক ও শারীরিক অবনয়ন;—ইত্যাদি।

এবং উপসিদ্ধান্ত হিসেবে, ধনতান্ত্রিক সম্পত্তির বিলোপেই 'বিচ্ছিন্নতার বিলোপের উপায় বলে মার্কস চিহ্নিত করেছেন।

উক্ত উপসিদ্ধান্ত থেকে আমরা এই উপসিদ্ধান্তও টানতে পারি যে, শ্রমজীবী মানুষই যেহেতু নৈতিক ভাবে ও শারীরিক ভাবে অবনমিত হয়েছে, অথচ তাদের ওপরেই মানব সমাজের মুক্তির দায়িত্ব ঐতিহাসিক নিয়তি, সেই ভূমিকা পালনে তাদের সক্ষম করে তোলা ও সচেতন করে তোলার জন্যেই প্রয়োজন হয়ে পড়ে শ্রমজীবী বা শ্রমিকশ্রেণীর সংগঠন।

"১৮৪৪ সালের পাণ্ডুলিপি" রচনার পর্বে মার্কস ভেবেছিলেন, সাম্যবাদের বাস্তবায়নে মানুষের সংহতি পুনরায় ফিরে আসবে, মানুষ নিজের মধ্যে ফিরে আসবে, দমিত হবে মানুষের আত্ম-বিচ্ছিন্নতা-ও, ব্যক্তিগত সম্পত্তির সুপষ্ট বিলোপে মানবিক আত্মবিচ্ছিন্নতার বিলোপ ঘটবে এবং সে-কারণে মানুষের মধ্য দিয়ে এবং মানুষের জন্যেই মানব-প্রকৃতির সত্যকারের অধিকার প্রতিষ্ঠিত হবে। ["The re-integration of man, his return to himself, the suppression of man's self–alienation.......as the positive abolition of private property, of human self-alienation, and thus the reappropriation of human nature through and for man."]

আগেই বলা হয়েছে মার্কসের পরবর্তী বিচ্ছিন্নতা এবং অ-বিচ্ছিন্নতা (de-alienation) বিশেষ ব্যবহৃত হয় নি। কিন্তু তাঁর সবচেয়ে খ্যাত গ্রন্থ *ক্যাপিটাল* এবং অন্যান্য রচনায় বর্তমানকে বিচ্ছিন্ন মানবের এবং সমাজের সমালোচনা ও অবিচ্ছিন্নতার অবস্থা সৃষ্টির ডাক দিয়েছেন মার্কস। মার্কসের অন্য আর একটি পাণ্ডুলিপি যেটি জার্মান ভাষায় ১৯৩৯ সালে প্রথম প্রকাশিত হয়, ইংরেজি ভাষায়, পাঠকদের হাতে পৌঁছোয় ১৯৫৩ সালে, 'গ্রুনড্রিস' নামে পরিচিত (Grundrisse der kritik der Politischen Okonomie) এই পাণ্ডুলিপিটিকে *ক্যাপিটাল* গ্রন্থের রচনার প্রস্তুতিও বলা যেতে পারে। সেখানেও মার্কস 'বিচ্ছিন্নতা' অভিধাটি ব্যাপক

ভাবে ব্যবহার করেছেন। কিন্তু ১৮৫০ থেকে ১৮৬০-এর দশকে রচিত মার্কসের সেরা গ্রন্থগুলিতে ধনতন্ত্রের বাস্তব চরিত্র লক্ষণগুলি প্রকাশ করতে যে ভাবনার (concept) সামগ্রিক পদ্ধতি গড়ে তুললেন, সেখানে বিচ্ছিন্নতার ভাবনা থাকলেও তা মার্কসের Fetishism of Commodities* (পণ্যের বস্তুকামিতা) ভাবনার অঙ্গীভূত হয়ে গেছে— অনেকের মতে এই পরবর্তী ভাবনার দ্বারা মার্কস ধনতন্ত্রের চরিত্রকে আরও যথাযথ ভাবে বিশ্লেষণে সক্ষম হয়েছেন।

মার্কস 'বিচ্ছিন্নতা'কে সমাজ জীবনের শাশ্বত ও চিরকালীন বাস্তব সত্য বলে মনে করেন নি। সমাজে কতকগুলি স্বয়ংস্বতন্ত্র ও পারস্পরিক বিরোধী ক্ষেত্রে বিভাজিত হয়ে গেছে। যেমন, অর্থনীতি, রাজনীতি, মনস্তত্ত্ব, আইন, শিল্প-সাহিত্য, নৈতিকতা, ধর্ম, জাতি, সম্প্রদায় প্রভৃতি। এবং আত্ম-বিচ্ছিন্ন সমাজের বৈশিষ্ট্য হল, উপরিক্ত সব ক্ষেত্রগুলিতেই অর্থনৈতিক ক্ষেত্রটিরই একাধিপত্য। তাই, 'অবিচ্ছিন্ন' সমাজ গড়ে তোলা অসম্ভব যতক্ষণ না মানবিক কাজকর্মগুলির ভেতর 'বিচ্ছিন্নতা'র সৃষ্ট পার্থক্য নির্মূল হয়।

কিন্তু অনেক লেখকই দেখালেন যে রাশিয়ার সোভিয়েত সমাজ প্রতিষ্ঠার পরে ব্যক্তিগত সম্পত্তির বিলোপ ঘটানো হল। কিন্তু শুধু ব্যক্তিগত সম্পত্তির বিলোপেই সমাজের অর্থনৈতিক জীবনের 'বিচ্ছিন্নতা'র সমস্যার সমাধান হয় নি। ব্যক্তিগত সম্পত্তিকে রাষ্ট্রীয় সম্পত্তিতে রূপান্তরিত করলেই শ্রমিকের কোনও মৌলিক পরিবর্তন হয় না। উৎপাদক হিসেবে ভিন্ন ভিন্ন পেশায় নিযুক্ত শ্রমিকদের মধ্যে যে 'বিচ্ছিন্নতা'— তাও লোপ পায় না।

সোভিয়েত রাষ্ট্র ব্যবস্থায় উৎপাদনের উপাদান ও সম্পত্তির ব্যক্তিগত মালিকানা রাষ্ট্রীয় মালিকানায় রূপান্তরিত হয়েছিল। কিন্তু রাষ্ট্রীয় মালিকানাও সম্পত্তির সমাজিক মালিকানা তৈরি করতে পারে না— কেননা, রাষ্ট্রীয় মালিকানাও এক দমনমূলক ব্যবস্থার মধ্যেই থেকে যাচ্ছে। কারণ, মার্কসের মতে, রাষ্ট্রের ধারণা মাত্রেই তা চূড়ান্ত বিচারে দমন পীড়নের যন্ত্র। সম্পদের রাষ্ট্রীয়করণ বা জাতীয়করণ এবং সামাজিকীকরণ সমার্থক নয়। মানুষের অর্থনৈতিক জীবনে 'অ-বিচ্ছিন্নতা' আনার জন্যে রাষ্ট্রীয় মালিকানারও উচ্ছেদ প্রয়োজন। সোভিয়েত সমাজতন্ত্রের পরীক্ষা নিরীক্ষার যে আপাত ব্যর্থতা তার ফলে কি ভাবে সমাজের অর্থনৈতিক জীবনে 'বিচ্ছিন্নতা'র বিলোপ ঘটানো যাবে— সে সম্পর্কে পদ্ধতি এবং পন্থাগুলি এখনও স্পষ্ট, সহজ, সমাধানযোগ্য না হলেও, 'বিচ্ছিন্নতা'র তত্ত্বের প্রাসঙ্গিকতা এবং সে-তত্ত্বের আরও ব্যাপকভাবে বিশ্লেষণ জরুরি হয়ে দেখা দিয়েছে। উৎপন্নের ভোগ ও বন্টন ও স্বতঃস্ফূর্ত ভাবে উৎপাদনের ক্ষেত্রে বিচ্ছিন্নতা দূর করতে সক্ষম নয়। আধুনিক উৎপাদনব্যবস্থা বহুক্ষেত্রে বিচ্ছিন্নতা হ্রাস না করে বরং এই মুহূর্তে বাড়িয়ে তুলেছে। যেমন, খনিজতেল পেট্রল উৎপাদনের আধুনিক কারিগরির সঙ্গে মধ্য প্রাচ্যের সেকেলে রাষ্ট্রব্যবস্থা যুক্ত হয়ে সাধারণ মানুষের বিচ্ছিন্নতা আরও বাড়িয়েছে। শুধু তাই নয়, সেই বিচ্ছিন্নতার ফল সারা বিশ্বে (Global) রাষ্ট্রে রাষ্ট্রে জাতিতে জাতিতে, এমন কি একই ধর্মীয় সম্প্রদায়ের মধ্যে (কুয়েত-ইরাক) বিচ্ছিন্নতা বাড়িয়ে বিপদজনক সশস্ত্র সংঘর্ষে ঠেলে দিয়েছে। এর শিকার ও বলি সাধারণ শ্রমজীবী মানুষেরাই।

সোভিয়েত এবং ইউরোপের সম্পর্ক, সাবেক সোভিয়েত ও পূর্ব ইউরোপের দেশগুলির মধ্যে অধুনা জাতিদাঙ্গা, পৃথিবীর বিভিন্ন রাষ্ট্রের মধ্যে সম্পর্ক ইত্যাদি এবং আন্তর্জাতিক সম্পর্কের ক্ষেত্রে তাই 'বিচ্ছিন্নতা'র তত্ত্ব নতুন ভাবনা'র সূত্র হিসেবে স্বীকৃতি পাচ্ছে।

* Feith—ভক্তিবস্তু; Festishism—বস্তুকাম, বস্তুভক্তি, বস্তুরতি ; Fetishist—বস্তুকামী।

পরিবেশ ও মানুষের মধ্যে 'বিচ্ছিন্নতা' ও মানুষের অস্তিত্বের ক্ষেত্রে আজ নতুন করে মানুষকে আত্ম-সচেতন করে তুলেছে।

দাঙ্গা, দুর্ভিক্ষ, রাজনৈতিক অস্থিরতা, অর্থনৈতিক মন্দা— প্রতিটি দেশেই কোনও না কোনও রূপে মানুষে মানুষে বিচ্ছিন্নতার প্রকাশ ঘটে চলেছে। এবং অনুভব করা যাচ্ছে যে বিচ্ছিন্নতা থেকে মানুষ আত্মসচেতন ভাবে মুক্ত না হলেও, মানবসত্তার বাস্তবায়ন সম্ভব নয়, ভূপৃষ্ঠে মানুষ হিসেবে টিকে থাকাও কঠিন।

মার্কসের 'বিচ্ছিন্নতা' তত্ত্বের ভাবনায় শ্রম বা উৎপাদন-ক্রিয়াই সামগ্রিক ভাবনার প্রথম ও একমাত্র 'পরম' উপাদান (factor) । শ্রম থেকে শ্রমের বিভাজন, তার থেকে ব্যক্তিগত সম্পত্তি ব্যক্তিগত সম্পত্তি থেকে বিনিময় প্রথা। (শ্রম-শ্রম বিভাজন ব্যক্তিগত সম্পত্তি — বিনিময়) শ্রমকে পরম বা absolute মনে করার কারণ এই যে মানুষের অস্তিত্বের পদ্ধতি বা রূপটি এমনই যে, প্রকৃতিকে উৎপাদন-ক্রিয়ার মাধ্যমে রূপান্তরিত না করে মানুষ বেঁচে থাকতে পারে না।

কিন্তু শ্রম-বিভাজন শুধু ব্যক্তিগত সম্পত্তি তৈরি করে নি, ব্যক্তিগত সম্পত্তির সঙ্গে যুক্ত করে অহংকে (egoism) । ব্যক্তিগত সম্পত্তির সঙ্গেই আবার চালু হয় পণ্য বিনিময়।

শ্রমজীবী মানুষ, যাঁরা মানুষের প্রজাতিগতভাবে বেঁচে থাকার 'পরম' ক্রিয়ার অর্থাৎ শ্রমে নিয়োজিত, শ্রম-বিভাজনের ফলে সে সম্পূর্ণ মানব থাকতে পারে না — কেননা, শ্রমিক প্রথমত, যন্ত্রের ভূমিকা নিচ্ছে, যন্ত্রেরাই একটি সঞ্চালক অংশে পরিণত হচ্ছে; দ্বিতীয়ত, শ্রমিক ব্যক্তিগত সম্পত্তির অধিকারীর কাছে নিজের শ্রম বিক্রি করতে বাধ্য হচ্ছে, ফলে শ্রমও পণ্যে পরিণত হচ্ছে। যে-কোনো পণ্যের যেমন দাম নির্দিষ্ট করা হচ্ছে, আট ঘন্টা বা দশ ঘন্টা শ্রমের দামও অনুরূপ ভাবে স্থিরীকৃত হচ্ছে। তা হলে, মানুষ তার প্রজাতি রক্ষার জন্য শ্রম করে প্রকৃতিকে নিজ প্রয়োজন অনুসারে পরিবর্তিত করে। মানুষ শ্রম করে, তাই মানুষ শ্রমিক। কিন্তু, শ্রম বিভাজনের ফলে কোনো বিশেষ মানুষ বা শ্রেণীর হাতে মূলধন সঞ্চিত হতে থাকে। সঞ্চিত মূলধনের (accumulation of capital) মালিকরা শ্রমিককে তখন কাজে নিযুক্ত করছে। তখনও শ্রমিক শ্রমের দ্বারা প্রকৃতি বা প্রাকৃতিক সম্পদকে রূপান্তরিত করেছে। কিন্তু, সেই রূপান্তর-প্রক্রিয়া তখন আর প্রজাতির নির্বিশেষ প্রয়োজনে হচ্ছে না,— বরং সঞ্চিত মূলধনের মালিকের প্রয়োজন— উদ্দেশ্য অনুসারে শ্রমিক উৎপাদন-প্রক্রিয়ায় শ্রম করছে। শ্রমিক মানুষ বা মানবসত্তায় না থেকে একই সঙ্গে হয়ে যাচ্ছে যন্ত্র ও পণ্য— মানবসত্তা থেকে বিচ্যুত।

শ্রম করেই মানুষ নিজ প্রয়োজনে প্রকৃতিকে পরিবর্তিত করে নিয়েছে। শ্রমের মধ্যে দিয়েই পশুজগৎ থেকে মানুষ আত্ম-সচেতন হয়েছে। আত্ম-সচেতনতাই তাকে মুক্তির দিকে এগিয়ে দিচ্ছে। মানুষকে শ্রম করেই মানুষ থাকতে হয়। কিন্তু যখন মানুষ শ্রমের মধ্যে দিয়ে শ্রমিকে পরিণত হচ্ছে, তখন তাকে মজুরি-শ্রমে (wage-labour) বাঁধা পড়তে হচ্ছে— এটাই শ্রমিকের মজুরি-দাসত্ব, মজুরি-দাসত্বের মধ্যে শ্রমজীবী মানুষের একই সঙ্গে মানুষ থেকে পণ্য ও যন্ত্রে রূপান্তরে মানব থেকে তার 'বিচ্ছিন্নতা' তৈরি হচ্ছে। যদিও শ্রমিক যন্ত্র ও পণ্য হিসেবে জীবন্ত, মানব-আকার বিশিষ্ট। শ্রমজীবী মানুষের এই যে মানব প্রজাতিগত-সত্তা থেকে বিচ্ছেদ, সেই বিচ্ছেদ মানব-অস্তিত্বকেই বিকৃত ক্ষুন্ন করে। তাই, মার্কস জেহাদ ঘোষণা করেছেন মজুরি-শ্রমের বিরুদ্ধে, শ্রমজীবী মানুষের মজুরি-দাসত্বের বিরুদ্ধে। সাধারণভাবে মানুষের কল্যাণের কথা অনেক মহাপুরুষই বলেছেন ও বলছেন। কিন্তু মানব-প্রজাতির পরিপূর্ণ মানব-

সত্তার অস্তিত্ব নিয়ে মার্কসের এই সুনির্দিষ্ট বীক্ষণের আর দ্বিতীয় তুলনীয় কোনও উদাহরণ নেই। শ্রমজীবী মানুষকে যন্ত্র-পণ্যের রূপ থেকে মুক্ত করার ভাবনার মধ্যে মার্কসের উদার-ধর্মীয় মানব-দরদি দরদিয়াহিয়ার আবেগ-আপ্লুত ভাবনা নেই। অথচ মানুষকে যন্ত্র ও পণ্যের রূপ থেকে 'মানুষ'-এ ফিরিয়ে আনার চেয়ে মহত্তম মানবিক ভাবনা আর কি হতে পারে! এবং যন্ত্র-পণ্যে পরিণত মানুষকে মানব-রূপে ফিরিয়ে আনার প্রয়াসে মার্কস শুধু মানসিক সদিচ্ছার ওপর নির্ভরশীল নন। মূলধনের মালিকও জড় মূলধনের অন্ধ নিয়মের অধীন— মূলধনের মালিককে মূলধনকে মূলধনরূপে (as-capital) বাঁচিয়ে রাখতে গেলে, মূলধনের চক্রে পণ্য উৎপাদন করতে হবে, যে পণ্য বিনিময়ের পর আরও মূলধন সৃষ্টি করবে। টাকা—পণ্য—আরও টাকা (Money-Commodity-More Money-M-C-M) —এই অন্ধ চক্রের পরিসমাপ্তি না ঘটাতে পারলে শ্রমজীবী মানুষের যন্ত্র-পণ্য-রূপে মানব-প্রজাতি থেকে বিচ্ছিন্নতার অবসান ঘটবে না।

মূলধনের সৃষ্টিও শ্রম থেকে। সঞ্চিত শ্রমই মূলধনমৃত শ্রমের সঞ্চয় হল মূলধন। বিচ্ছিন্নতার ফলে সেই মৃত শ্রম অর্থাৎ মূলধন জীবিত শ্রম অথাৎ শ্রমজীবী মানুষের ওপর আধিপত্য করে তাকে যন্ত্র-পণ্যে পরিণত করেছে। যেহেতু জড় মূলধন অন্ধ নিয়মের অধীন। তাই মূলধনের কোনও 'হৃদয়' নেই। ফলে শ্রমজীবী মানুষের কিছু তাৎক্ষণিক 'উন্নতি' (যেমন, সামান্য মজুরি বৃদ্ধি, মহার্ঘ-ভাতা, মজুরিরই দেরিতে পাওয়া— যার নাম বোনাস) আবেদন-নিবেদন, এবং লড়াই করে পাওয়া যেতে পারে। কিন্তু মূলধনের 'হৃদয়ের কাছে আবেদন' করে মজুরি দাসত্বের অবসান ঘটানো যায় না। মজুরি-শ্রম থেকে মুক্তি পেলে শ্রমজীবীর যন্ত্র-পণ্য রূপ থেকে মানবিক রূপান্তর— চূড়ান্ত মুক্তি আসবে। সে-কারণে সমাজের ওপর মূলধনের রাজ, ব্যক্তিগত (এবং রাষ্ট্রীয়) সম্পত্তির উচ্ছেদ প্রয়োজন। ব্যক্তিগত সম্পত্তির বিরুদ্ধে এই যৌক্তিক ভাবনা মার্কসের কোনও ব্যক্তিগত বিদ্বেষ বা আক্রোশের বহিঃপ্রকাশ মনে করা সেকারণে বাতুলতা। ভোগবাদী সুখের-জায়গায় নয়, মার্কস শ্রমজীবী মানুষকে এবং তৎসহ সমগ্র মানব সমাজকেই মানব-সত্তায় স্থিত করতে চেয়েছেন।

মানুষকে 'অমানবিক' করে তুলে, প্রজাতিসত্তা থেকে বিচ্ছিন্ন করেও ব্যক্তিগত সম্পত্তি নিয়ন্ত্রিত সমাজের চূড়ান্ত রূপ হিসেবে ধনতন্ত্র টিকে থাকে কিসের জোরে? রাষ্ট্র ব্যবস্থা (পুলিশ, মিলিটারি, আইন ইত্যাদি ইত্যাদি) এবং মতাদর্শ (ধর্ম-শিক্ষা, দর্শন, নীতিমালা, যেমন, "শুধু তা-ই পবিত্র, বা ব্যক্তিগত"— ইত্যাদি) কয়েক হাজার বছরে পৃথিবীর প্রায় সর্বত্র ব্যক্তিগত সম্পত্তির রাজ কায়েম করেছে। তবু, পৃথিবীর নানা প্রান্তে কিছু আদিবাসী মানব সমাজে এখনও ব্যক্তিগত সম্পত্তির 'রাজ' কায়েম হয় নি।

মূলধনী আধিপত্যকে টিকিয়ে রাখার জন্যে রাষ্ট্র ব্যবস্থা ও মতাদর্শ ছাড়াও পণ্যের বস্তুকামিতা বা বস্তুভক্তি (Fetishism of Commodities) ধনতন্ত্রের অধীন মানুষকে চলতি সমাজ ব্যবস্থার সঙ্গে বেঁধে রাখে। বেশি বেশি করে জড়িয়ে ফেলতে চায়।

সামাজিক উৎপাদনে মানুষ মানুষের সঙ্গে সম্পর্কিত হয়ে পড়ে। ব্যক্তিগত সম্পত্তির ওপর নির্ভর সমাজ-ব্যবস্থায় মানুষে মানুষে সম্পর্ক সরাসরি বা প্রত্যক্ষ নয়, বরং সে-সম্পর্ক স্থাপিত হয় পরোক্ষে— বাজারে জিনিসের বিনিময়ের মাধ্যমে। ভোক্তা এবং উৎপাদক সরাসরি যোগাযোগ ছাড়াই পণ্য বিক্রি ও কেনার মাধ্যমে মানুষে মানুষে সম্পর্কের প্রকাশ ঘটে। এই বিনিময়ের ফলেই বস্তু বা জিনিস 'পণ্যে' পরিণত হয়। এর ফলে, মানবিক সম্পর্ক দু'টি বস্তুর সম্পর্কের রূপ পরিগ্রহ করে। মানুষ যে বস্তু ও পণ্য উৎপাদন করেছে সেই বস্তু সম্পর্কের রূপ

মানুষের ওপর আধিপত্য করতে থাকে। উৎপাদন সম্পর্কের এই বাস্তব, রূপ, বস্তু ও পণ্যের স্বতঃস্ফূর্ত (Spontaneous) গতির ওপর মানুষের নির্ভরতাই পণ্যের বস্তু-কামিতার বিষয়গত ভিত্তি গড়ে তোলে। বস্তু বা পণ্যের যেন তাদের অন্তর্গত প্রকৃতির মধ্যেই কোনও গুপ্ত বা ধর্ম (property) আছে— মানুষ এরকম মায়ায় (illusion) ভুগতে থাকে— যা কার্যত পণ্যের নেই। প্রকৃতির উপাদানই মানুষের প্রয়োজনে ও শ্রমে বস্তু জিনিস বা পণ্যে পরিণত হয়। পণ্যের বস্তুকামিতা বাস্তব অবস্থাটি গোপন করে। মানুষের ওপর পণ্যের আধিপত্য আসলে মূলধনের কাছে শ্রমের অধীনতা— তার অর্থ শ্রমিক শ্রেণীর শোষণ। সম্পর্কের উপরিতলে মনে হয় মালিক ও শ্রমিক দু'জন সমান পণ্যের অধিকারীর পারস্পরিক সম্পর্ক— একজনের আছে মূলধন, অন্য জনের আছে শ্রম। ধনতন্ত্রের সাম্য ও স্বাধীনতা — মূলধন ও শ্রম— এই অর্থনৈতিক বর্গদুটির রূপান্তরিত অবয়বের ওপর দাঁড়িয়ে আছে। মানুষের প্রজাতি -সত্তা থেকে শ্রমের বিচ্ছেদ ঘটানোর ফলেই এই পণ্যের বস্তুকামিতার এই রহস্যময় রূপের ওপর নির্ভর করেই অনেক অপ্রয়োজনীয় বস্তুকেও ক্রেতার কাছে বিজ্ঞাপন মারফৎ অপরিহার্য পণ্য করে তুলেছে। এর ভিত্তিতেই তথাকথিত 'ভোগবাদী' (consumerist) ধনতন্ত্রী সমাজ গড়ে উঠেছে।

মানব সমাজের শ্রমের বিচ্ছিন্নতার অবসান হলে, এবং বিচ্ছিন্নতার অতীত-বর্তমান সম্পর্কে সচেতন হলেই, অবিচ্ছিন্ন নতুন সমাজে পণ্যের বস্তুকামিতার প্রভাব ও অবশেষের বিরুদ্ধে সচেতন ভাবে সংগ্রাম করেই মানুষ আবার মানব-সত্তায় ফিরতে পারবে। প্রকৃতি ও মানুষের মধ্যে 'বিচ্ছিন্নতা'জাত বিপদের আশঙ্কা দেখা দিয়েছে— যেমন, প্রকৃতি থেকে আহৃত ইউরোনিয়ামের মতো তেজস্ক্রিয় পদার্থ— যা শ্রমজীবী মানুষের শ্রমেই নিষ্কাষিত হয়েছে এবং রাষ্ট্র ও রাষ্ট্রীয় মূলধনের নির্দেশেই তৈরি হয়েছে, তা মানব-প্রজাতির সামগ্রিক বিপদ ডেকে আনছে। অথচ সাধারণ শ্রমজীবী মানুষের প্রজাতিগত অস্তিত্ব ও সাংস্কৃতির অগ্রগতিতে ইউরেনিয়ামের কোনও প্রয়োজন নেই। 'বিচ্ছিন্নতা'র অবসানে মানব-প্রজাতি ও প্রকৃতি আজ যে বৈরিতামূলক বিরোধের মুখোমুখি দাঁড়িয়ে আছে, তারও অবসান হবে।

শিল্প সৃষ্টি ও সৌন্দর্যতত্ত্বের আলোচনায় মার্কসীয় 'বিচ্ছিন্নতা'র তত্ত্ব নতুন দিক খুলে দিয়েছে। সে-সম্পর্কেও দীর্ঘ আলোচনার অবকাশ রয়েছে।

সাহিত্যে বাস্তবতা

সুমিতা চক্রবর্তী

বহু আলোচিত এবং বহুকাল ধরে আলোচিত 'সাহিত্যে বাস্তবতা' বিষয়টি সম্পর্কে সত্যিই নতুন করে আর কিই-বা বলবার আছে। জীবন ছাড়িয়ে যেমন কোনো মানবীয় অভিজ্ঞতা হওয়া সম্ভব নয় বলে নির্দেশ করেছিলেন জীবনানন্দ[১] তেমনই বাস্তব উপাদানবিহীন কোনো মানবিক কল্পনাও যে সম্ভব নয় সে-কথা একান্তই তর্কাতীত।

ভাষা-শিল্পে বাস্তবতার দাবি যতটা জোরালো ততটা যেন নয় ভিন্নতর শিল্পমাধ্যমের ক্ষেত্রে। আধুনিক চিত্রকলা সম্পর্কে তো কোনো প্রশ্নই ওঠে না, প্রাচীন কালেও ছবি অনেক সময়েই চোখে দেখা বাস্তবতার আনুগত্য করে নি। নৃত্যশিল্পের বা সঙ্গীতশিল্পের কাছে আমাদের বাস্তবতাজনিত কোনো দাবিই নেই যেন। আর ভাষা-শিল্পেও কথাসাহিত্যই যেন আমাদের কাছে সেই বাস্তবতার প্রকৃত আধার—কবিতা নয়।

হয়তো এটাই কারণ যে কথাসাহিত্যের উৎসলগ্নে ছিল অভিজ্ঞতাকে পুনঃবর্ণনা করবার ইচ্ছা। অপরপক্ষে নৃত্য ও সঙ্গীত, অধিকাংশ ক্ষেত্রেই, জাদুবিদ্যায় ও মন্ত্রবলে অতিপ্রাকৃত শক্তিকে প্রসন্ন করবার প্রয়াসজাত। চিত্রকলারও প্রাচীন ব্যবহার ঘটেছে পূজাবিধির আবশ্যিক অলংকরণ রূপে। আবার গুহার গায়ে অভিজ্ঞতার প্রতিরূপায়ণ হিসেবেও পাওয়া গেছে বর্শাবিদ্ধ পশুর রেখাচিত্র। ফলত, ছবির ক্ষেত্রে 'রিয়েলিজম্' রীতি হিসেবে অনেকদিন ধরে প্রতিষ্ঠা পেয়ে এসেছে। আবার রিয়েলিজম্-এর সীমা ছাড়ানোর ব্যাপারেও তার অধিকার প্রতিষ্ঠিত হয়েছে অনেকদিন। কিন্তু কথাসাহিত্যকে যেন আমরা বস্তুকে ছাড়িয়ে যাবার অধিকার সহজে দিতে চাই না। আমাদের মন নানা প্রশ্ন তুলে তার প্রতিরোধ করতে চায়।

কারণটা বোধহয় এখানেই। আগুনজ্বলা আরণ্য সন্ধ্যায় গোষ্ঠী প্রবীণেরা বর্ণনা করত তাদের জীবনের অভিজ্ঞতা—দৈনন্দিন ব্যবহার্য ভাষায়। তা মন্ত্র নয়, জাদু নয়, ভয়-ভক্তি-শোক-করুণা-উল্লাস-জয়াশা-স্পন্দিত আবেগী উচ্চারণ নয়—তা বাস্তব অভিজ্ঞতা বিনিময়ের সহজ ভাষা। তার উদ্দেশ্য কিভাবে এই পৃথিবীতে বাঁচতে হবে তারই পারস্পরিক পর্যালোচনা। তাই জীবনের বাস্তব সমস্যাবলি, গদ্যভাষা আর কথাসাহিত্য পরস্পর-অচ্ছেদ্য সম্পর্কে আবদ্ধ। কথাসাহিত্যের কাছে তাই জীবন-বাস্তবের প্রত্যাশাও আমাদের বেশি।

অতিপ্রাকৃত সাহিত্য আর রূপকথার জগৎও বোধহয় কোনো ব্যতিক্রম নয়। অতিপ্রাকৃতে বিশ্বাসীর কাছে পোড়ো ভিটের পাশের বেলগাছে ব্রহ্মদৈত্যের বসবাস আর শিশুর মনে পক্ষীরাজে চড়া রাজপুত্র—সবই বাস্তব। শালগ্রাম শিলা যে ভোগের পরমান্ন গ্রহণ করে তা নিয়ে ভক্তের মনে বহুকাল কোনো সংশয় ছিল না। মধ্যযুগীয় কথাসাহিত্যে অ-বাস্তবের অঙ্গীকার তাই মধ্যযুগীয় জীবন-বাস্তবতারই একটি ছবি যেন। যে-কালে আমরা এই মধ্যযুগীয় সংস্কারগুলিকে অ-বাস্তব বলে জেনেছি—সেই আধুনিক কালের মনোবিজ্ঞান-চর্চা আমাদের নিঃসংশয়ে বুঝিয়ে দিয়েছে যে স্বপ্ন, কল্পনা, দিবাস্বপ্ন—সব কিছুই মানসিকভাবে বাস্তব। কাজেই সাহিত্যে বাস্তবতাকে অস্বীকার করা আমাদের সাধ্যাতীত। আমরা কেবল দেখতে পারি—কিভাবে এই বাস্তবতার বিভিন্ন আকার প্রতিবিম্বিত হয় কথাসাহিত্যে।

বিচার-বিশ্লেষণ-সমালোচনা এ-সবই রেনেসাঁস-উত্তর আধুনিক মনের ফসল। যে-আধুনিকতা বাংলার সমাজ ও সাহিত্যকে বদলাতে শুরু করেছে আঠারো শতাব্দের একেবারে শেষ ভাগ থেকে। ইউরোপে তারও তিনশো বছর আগে থেকে। অবশ্য প্রাক্-রেনেসাঁস পর্বে গ্রিস, ইতালি ও মধ্যপ্রাচ্যে; চীন, জাপান ও ভারতে জ্ঞান-বুদ্ধি-শাস্ত্রচর্চা যথেষ্টই ছিল। কিন্তু ধর্মীয় অনুশাসন ও রাজতন্ত্রশাসিত সমাজে জনসাধারণের বাস্তব জীবনের সংকট-সমস্যাকে সেইসব মস্তিষ্কচর্চার আওতায় আনার প্রথা ছিল না। ছিল না কথাসাহিত্য।

সে-কারণে মধ্যযুগের সাহিত্য বাস্তবতার উপাদানে প্রভূত সমৃদ্ধ হওয়া সত্ত্বেও বাস্তবতার বিশ্লেষণী মানদণ্ডটি সেখানে ব্যবহৃত হয় না। বিশ্বাসের ভিত্তিভূমি হয়ে দাঁড়ায় বাধা। আজকের সাহিত্যরসিক কিন্তু মধ্যযুগের বাস্তবতার পুনর্নির্মাণ প্রয়াসে সন্ধান করেন সেই সময়ের সাহিত্যের পৃষ্ঠা। চর্যাগীতির তত্ত্বকথার ফাঁকে ফাঁকে টিলার উপরে বাঁধা ঘরে দরিদ্র গৃহস্থের বিলাপটুকু তুলে নেন বাস্তবসন্ধানী—'হাঁড়িতে নেই ভাত, নিত্য উপোসি থাকি'। কবি মুকুন্দের চণ্ডীমঙ্গল কাব্যের কালকেতু উপাখ্যানে দেবীর সাত ঘড়া মোহর প্রদানের গল্প ছেড়ে ফুল্লরার দেখানো ঘরের দাওয়ায় আমানি খাবার গর্তটি তাঁর কাছে বিকল্পহীন বাস্তবতার দৃশ্য হয়ে ওঠে।

ইউরোপীয় সাহিত্য অলৌকিক আলোছায়ার ঘেরাটোপ ছেড়ে যাবার প্রবণতা দেখিয়েছে অনেকদিন আগে। চতুর্দশ শতাব্দের ইতালিতে বোক্কাচ্চিও এবং ইংল্যাণ্ডে চসার যথাক্রমে তাঁদের গল্প-সংকলন ও কাব্যাকারে গ্রথিত জীবন অভিজ্ঞতার চিত্রমালায় সাধারণ মানুষের বাস্তব জীবনকেই প্রাধান্য দিয়েছেন। ধর্মীয় অলৌকিক সেখানে প্রবেশাধিকার পায় নি শুধু নয়—তার প্রতি কটাক্ষ বেশ স্পষ্টই। বোক্কাচিও তো কখনো কখনো খুবই কঠোর সমালোচক হয়ে উঠেছেন ব্যভিচারী চার্চ এবং তার প্রতিনিধিবৃন্দের। ত্রয়োদশ/চতুর্দশ শতাব্দ থেকেই ইউরোপের সাধারণ মানুষ যাজকতন্ত্র-শাসিত ব্যবস্থাটিকে আর আত্মার আশ্রয় বলে গ্রহণ করছে না—সেই সত্যই উঠে আসে এইসব লেখা থেকে।

সংস্কৃত সাহিত্যের প্রাচীন গল্পমালা কিন্তু বাস্তব জীবনের চিত্র, চরিত্র ও ঘটনায় পরিপূর্ণ হলেও অতিপ্রাকৃত সেখানে মিশে আছে পরতে পরতে। দেবদেবী, সিদ্ধপুরুষ, দৈববাণী, অভিশাপ, বরদান, পুনর্জন্ম, মন্ত্রশক্তি, ভবিষ্যৎ-গণনা, যক্ষ, রাক্ষস, অপ্সরা, গন্ধর্বরা সবসময়েই সেখানে সহাবস্থান করে মানুষের সঙ্গে। ফলে একালের অর্থে যাকে বলা যেতে পারে বাস্তবের চাপ ও আততি—প্রেশার ও টেনশন—তা অনুভব করা যায় না সেখানে। প্রাচীন ভারতীয় গল্পে দৈবশক্তি ও ব্রাহ্মণ্যশক্তির যে স্পর্ধিত প্রতিষ্ঠা তাকে অস্বীকার করবার ক্ষমতা ছিল না বর্ণভেদ-শাসিত সমাজ-ব্যবস্থায় চির-অভ্যস্ত জনসাধারণের পক্ষে। ফলে সমাজ-বাস্তবতার চিত্রগুলি এই গল্পমালায় এসেছে ; আসে নি তার সূত্রগুলি, আসে নি তার সচল প্রবণতা-

প্রবাহের বিরোধী স্রোতসমূহের আবর্তময় জটিলতা। ইউরোপের বোক্কাচ্চিও, চসার বা [ফ্রান্সের] র‍্যাবলে-র ক্ষেত্রে এরকম কোনো সমাজ-মানসিকতাগত সংকট দেখা দেয় নি। র‍্যাবলে-র বইটিতে (গার গাঁতুয়া ও পাঁতাগ্রুয়েল—ষোড়শ শতকের প্রথমার্ধ) অবশ্য দৈত্যবংশ, স্বর্গ-নরক ইত্যাদি অ-বাস্তবের বিবরণ আছে কিন্তু সে-সবই ব্যঙ্গ-কটাক্ষের উদাহরণ হিসেবে ব্যবহৃত। আমরা জানি, ব্যঙ্গদৃষ্টিই সেই অমোঘ শিল্প-কৌশল যার সাহায্যে আপাত-অবাস্তব ও অতিপ্রাকৃতকে করে তোলা যায় বাস্তবধর্মী শিল্প নির্মাণের উপাদান।

সাহিত্যে বাস্তবতাগুণের উপস্থিতিজনিত এই দীর্ঘ ঐতিহ্যের ফলে ইউরোপের কথাসাহিত্য প্রথমাবধি বাস্তব-অনুসারী। আঠারো শতকের প্রথমে ড্যানিয়েল ডিফো-র *রবিনসন ক্রুসো*-কে প্রথম ইংরেজি উপন্যাসের গৌরব দিয়েছেন অনেকেই। আলেকজাণ্ডার সেলকার্ক নামক দ্বীপবন্দি এক নাবিকের আত্মকথা থেকেই এই উপন্যাসের উপাদান পেয়েছিলেন ডিফো। কিন্তু *রবিনসন ক্রুসো* উপন্যাস হয়ে উঠেছে এই উপাদানের জোরে নয়, উপন্যাস হয়েছে এ কারণেই যে ডিফো এখানে তিল তিল করে গড়েছেন এক বাস্তবকে। সমুদ্রঘেরা নির্জন দ্বীপটিকে রবিনসন ক্রুসো প্রতিদিন একটু একটু করে বাসযোগ্য করে তোলে। কি নিপুণ, কি অনুপুঙ্খ সেই গড়ে তোলা! ঘরের ছাদ, দেয়াল,জানলা কেবল নয়, রবিনসন একে একে বানায় তার জুতো, ছাতা, স্যুপের পাত্র, পোশাক টাঙাবার হুক, চর্বি জ্বালবার বাতিদান, ব্রেকফাস্ট-এর টেবিল। গড়ে ওঠে ইংলিশম্যানের 'হোম'। খোলা আকাশ, অচেনা প্রকৃতি, অকুল সাগর, অনন্ত নির্জনতায় এক অদ্ভুত দেয়ালহীন বন্দিত্ব—এরই মধ্যে একটি চেনা ঘর, একটি অভ্যস্ত গৃহজীবন গড়ে তোলার সযত্ন ব্যাকুলতা—এই বাস্তবতার আকাঙ্ক্ষাই রচনাটিকে করে তুলেছে উপন্যাস। বাক্‌ভঙ্গির ডায়রিধর্মী স্বাভাবিকতাও মনে রাখতে হবে। উপাদানে, আকারে ও আকাঙ্ক্ষায়—*রবিনসন ক্রুসো* আঁকড়ে আছে এক পরিচিত, বাস্তব, সংসার-জীবনকে।

ঔপন্যাসিকের কাছে, বস্তুত, এই বাস্তবতার নির্যাসটিকে ছেঁকে নেওয়ার সমস্যাই সবচেয়ে প্রাসঙ্গিক। ছোটগল্পকারের সঙ্গে ঔপন্যাসিকের একটি মৌল পার্থক্য এখানেই। ছোটগল্পের শেষ পরীক্ষা যদি ঐক্য-প্রতীতির উদ্ভাসনে, উপন্যাসের শেষ বিচার জীবন সত্যের সমগ্রতার প্রতিষ্ঠায়—তাকেই বলি প্রকৃত অর্থে, মহৎ অর্থে বাস্তব।

এখানেই সম্মুখীন হই আর একটি সমস্যার। 'বাস্তব' আর 'সত্য'—'রিয়েলিটি' আর 'ট্রুথ'—দুই যে ঠিক এক নয়—এই উপলব্ধি থেকেই 'রিয়েলিটি' শব্দটি একটি বিশিষ্ট শৈল্পিক ধারণায় ব্যবহৃত হতে শুরু করে উনিশ শতকের মধ্যভাগে ফ্রান্সে। উনিশ শতকের প্রথমার্ধে শিল্প-সাহিত্যে প্রচলিত রোমান্টিকতার স্রোত প্রথম দিক বদল করেছিল ফ্রান্সেই। আমরা বোদল্যের-এর নাম সকলেই জানি। কিন্তু 'রিয়েলিজ্‌ম্' শব্দটির প্রথম পারিভাষিক প্রয়োগ করেছিলেন ফরাসি চিত্রশিল্পী কুর্বে (Courbet) ১৮৫৫-য় চিত্রকলার একটি বিশেষ ধরনের কথা বলতে গিয়ে।

তত্ত্বরূপে উপস্থাপিত না হলেও বাস্তবতা বা রিয়েলিজ্‌ম্-এর উপস্থাপনা সম্পর্কেও ঔপন্যাসিকদের সচেতনতা দেখা গেছে তার বহুকাল আগে থেকেই। একালের সমালোচকরা বিভিন্ন সময়ে উচ্চারণ করেছেন এ-জাতীয় বাক্য—'Reality is an impossible hypothesis'; 'Reality means different things in different contexts', —এমনকি—'Realism is a corruption of reality.'[২] —এসবই প্রতিফলিত হয়েছিল ঔপন্যাসিকদের চেতনায়। 'রিয়েলিটি' বলতে বস্তুগত অর্থে যে-বাস্তবতাকে বোঝানো হচ্ছে তার অভিজ্ঞতা আপেক্ষিক—ব্যক্তিভেদে, শ্রেণীভেদে, কাল এবং অবস্থান ভেদে সেই বাস্তবতার চেহারা বিপুল ভাবে

পাশ্টায়। এই বিশ্লেষণী মনোভঙ্গি ছিল বলেই *রবিনসন ক্রুসো*-র ঠিক পরে-পরেই জোনাথন সুইফট্ তাঁর গালিভার-এর ভ্রমণবৃত্তান্তটি সেইভাবে দেখাতে চেয়েছেন। কখনো 'গালিভার ছোটো মানুষদের দেশে এক বিরাট মানুষ, কখনো বিশালদেহীদের দেশে সে ক্ষুদ্রাতিক্ষুদ্র। অথচ *গালিভার্স ট্রাভেল্‌স্*-এর প্রথম দুটি খণ্ডেই (পরের গুলিতে ততটা নয়) দেখা যায়—বাস্তবতার খুঁটিনাটির অজস্র অনুপ্রবেশ। লিলিপুট এবং ব্রবডিংনাগ-দের দুটি দেশই—খাওয়া, শোওয়া, পরিচ্ছদ, আসবাব, গৃহস্থাপত্য নগর-স্থাপত্য, রাজসভা, সেনাবাহিনী সবকিছু নিয়ে নিখুঁতভাবে সুইফট্-এর সাম্রাজ্যবাদী স্বদেশকে মূর্ত করেছে। ডিফো যে 'ইংলিশ' জীবনাচরণকে দেখেছেন সানুরাগে, সুইফট্ তাকেই দেখেছেন তির্যক-কটাক্ষময় নৈর্ব্যক্তিকতায়।

কিন্তু তারপর আঠারো শতকের দ্বিতীয়ার্ধ জুড়ে এক দীর্ঘ সময় গেছে ইংরেজি উপন্যাসে—যেখানে সাহিত্যের বাস্তবতা কখনই তার সমাজ পরিবেশ ও চরিত্র-রূপায়ণে সাধারণ বাস্তবতাকে পরিহার না করলেও ঘটনা-নির্বাচনে, কাহিনী-রূপায়ণে এবং ভাষা-বিন্যাসে লেখক-মানসিকতার অভিক্ষেপণে মনে হয় কিছুটা ইচ্ছাপূরক ধরনের, কিছুটা স্পষ্টভাবে নৈতিক আদর্শ প্রতিষ্ঠায় উদ্যত। সে নীতিবাদ ততটা জীবন-নীতি নয় যতটা আঠারো শতকীয় ইংরেজ মধ্যবিত্তের গৃহীত নৈতিকতা। তাই রিচার্ডসন, ফিল্ডিং, স্মলেট ও স্টার্ন-এর উপন্যাসে আমরা বাস্তবের উপাদান ও আকার, চরিত্র ও পরিবেশ চিত্রণ পেলেও পাই না বাস্তবতার সেই কামড়—যাকে আগে বলেছি প্রেশার ও টেনশন। এই ধারাই চলে এসেছে ওয়াল্টার স্কট এবং জেন অস্টেন-এর উপন্যাসে ভিন্ন ভিন্ন ভাবে; বহমান থেকেছে থ্যাকারে, ডিকেন্স, জর্জ এলিয়ট-এর উপন্যাসে। রোমান্টিক ও ভিকটোরীয় যুগের ইংল্যাণ্ডের পাঠক সর্বতোভাবে এই দৃষ্টিভঙ্গিটি গ্রহণ করেছিলেন। তা প্রকৃত অর্থেই বাস্তব কিন্তু সেখানে আদর্শ-ন্যায়-নীতির বর্ণলেপন প্রায়শই আরোপিত। যেন ব্রাউনিং-এর সেই বিখ্যাত পঙ্‌ক্তির নিদর্শনই হল জীবন—'God's in his heaven/All's right with the world.' এর মধ্যে যদি একজন কিছুটা ব্যতিক্রম থেকে থাকেন তিনি সেই শহরতলী-বাসিনী আত্মস্থ রহস্যময়ী জেন অস্টেন। কখনো কখনো তাঁর লেখায় আদর্শের ঘেরাটোপ সরিয়ে মুখ দেখিয়েছে জীবনের অনাবরণ সত্য। মৃত্যুর পর প্রকাশিত তাঁর অবহেলিত লেখা *লেডি সুজান* এদিক থেকে এক স্মরণীয় উপন্যাস। ডিফো-র অপরিণত সৃষ্টি *মোল ফ্ল্যাণ্ডার্স*-কে বাদ দিলে ইংরেজি সাহিত্যে 'লেডি সুজান'-ই সম্ভবত প্রথম অ্যান্টিহিরোইন।

এই আদর্শবাদী বাস্তবতার রূপায়ণের বিরুদ্ধেই ফ্রান্সে গড়ে উঠল রিয়েলিজ্‌ম্- এর আন্দোলন। ফ্রান্সের কথাসাহিত্যের মধ্যেই নিহিত ছিল এর বীজ। স্তাঁদাল, বালজাক, জর্জ সাঁদ, ফ্লবের উনিশ শতকের প্রথম ভাগ ও মধ্যভাগে যে ফরাসি উপন্যাসের ভাণ্ডার ভরে তুলেছিলেন সেখানে রিয়েলিজ্‌ম্ সম্পর্কে নৈর্ব্যক্তিক ও অবজেকটিভ দৃষ্টিকোণেরই ছিল প্রাধান্য। ফরাসিরা ভিকটোরীয় ভদ্রতাকে আদর্শ বলে মানেনি কোনোদিনই। তেইন যখন ফরাসি ভাষায় ইংরেজি সাহিত্যের ইতিহাস লিখলেন উনিশ শতকের সপ্তম দশকে তখন সাহিত্য সৃজনক্রিয়ার মূলে একটি যুক্তিবাদী, বস্তুগত পরিমণ্ডলের অস্তিত্বের দিকেই অঙ্গুলিসঙ্কেত করলেন। বিজ্ঞান পরীক্ষিত অ-বিকল্প অবশ্যম্ভাবিতায় জন্ম নেয় সাহিত্য—এমনই বললেন তিনি। স্বাভাবিকভাবেই এরপর ফ্রান্সে 'রিয়েলিজ্‌ম্' এগিয়ে গেল 'ন্যাচারালিজ্‌ম্'-এর দিকে। নির্বিচার ও নিরাসক্তভাবে সব কিছু গ্রহণ করবার বৈজ্ঞানিক-সুলভ বস্তুবাদিতাই ন্যাচারালিজ্‌ম্। জোলা ১৮৯০-তে লেখা প্রবন্ধে ন্যাচারালিজম্-কেসমর্থন করলেন জোরালো ভাবে। তার অনেক আগে থেকেই বিষয়টি নিয়ে তিনি ভাবছিলেন। ১৮৫৭-তে *মাদাম বোভারি*-র একটি প্রশংসাসূচক সমালোচনায় তিনি

এই সর্বাত্মক গ্রহণের ইঙ্গিত দিয়েছিলেন। এই দশকেই বোদল্যের-এর কাব্যে এই ন্যাচারালিজ্‌ম্-ধারণার সুন্দরতম প্রকাশ ঘটেছিল।

উনিশ শতকের দ্বিতীয়ার্ধ বাংলা উপন্যাসের আবির্ভাবকাল। বাঙালি পাঠক কিন্তু ন্যাচারালিজ্‌ম্ নিয়ে ভাবিত ছিল না। লেখকেরাও ছিলেন না। স্কট ও ডিকেন্স থেকেই প্রধানত বাঙালির উপন্যাস-আকাঙ্ক্ষার জন্ম। রিচার্ডসন প্রমুখ ঔপন্যাসিকেরাও কিছু পরিচিত ছিলেন। ফলে বাংলা উপন্যাসে বঙ্কিমচন্দ্রীয় বাস্তবতার ধারণাটি থেকেই গেল বেশ কিছুটা রোমান্টিক। আর, নীতিবাদী তো বটেই। তার ওপর বাংলার সাহিত্য-ঐতিহ্যে যেহেতু আঠারো শতক পর্যন্তও অটুট ছিল ধর্মীয় বিশ্বাসের ভিত—বাংলা উপন্যাসেও বঙ্কিমী পর্বে থেকে গেল তার একটু চিহ্ন। বঙ্কিমচন্দ্রের উপন্যাসগুলিতে জ্যোতিষীর গণনার প্রসঙ্গে, সন্ন্যাসীর উপস্থিতিতে তার ছাপ রয়েছে। বঙ্কিমচন্দ্রের কিছু আগে যাঁরা উপন্যাস লিখেছেন বাংলায়— যেমন প্যারীচাঁদ মিত্র, ভূদেব মুখোপাধ্যায়, স্বর্ণকুমারী দেবী, রমেশচন্দ্র দত্ত, হরপ্রসাদ শাস্ত্রী— এঁদের লেখায় হস্তরেখা-বিচার, জ্যোতিষীর গণনা, সন্ন্যাসীর উপস্থিতি তন্ত্রাচারের ব্যবহার করা হয়েছে অনেক সময়েই। অবশ্য এই লেখাগুলির কোনোটিই শিল্পোত্তীর্ণ হয়নি। এই ধারার সর্বাধুনিক নিদর্শন বিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায়ের *দেবযান*। আধুনিক পাঠকের কাছে উপন্যাসটি তেমন আস্বাদ্য মনে হবে কি না সন্দেহ।

বাংলা সাহিত্য ন্যাচারালিজম্-এর দ্বারা বোধহয় কখনই তেমনভাবে আকৃষ্ট হয়নি। কচিৎ তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায়ের কোনো কোনো ছোটগল্পে ধারণাটির একটু সাদৃশ্য চোখে পড়ে। কিন্তু তারাশঙ্করও যেহেতু মূলত আদর্শবাদী সাহিত্যবাদের একজন— তাই পদ্ধতিটি নিজস্ব মূল্যে স্থান পায় না তাঁর লেখায়। কিন্তু ন্যাচারালিজ্‌ম্-এর এক অসামান্য উত্তরসাধক আছেন বাংলা সাহিত্যে—তিনি কমলকুমার মজুমদার। ন্যাচারালিজ্‌ম-এর পদ্ধতির সঙ্গে কমলকুমার তাঁর সুগভীর সৌন্দর্য-ধারণার মিশ্রণ ঘটিয়েছেন। ফলে তা ফরাসি ন্যাচারালিজ্‌ম্ আর থাকেনি, হয়ে উঠেছে কমলকুমারের নিজস্ব এক দর্শন-প্রত্যয় সিদ্ধ বাক্‌রীতি।

ন্যাচারালিজ্‌ম্ কিন্তু কোনো সময়েই কথাসাহিত্যে তেমন সর্বজনগ্রাহ্য হয়নি। শিল্প থেকে শিল্পের ম্যাজিকটুকু বাদ দিতে মন চায়নি অনেকেরই। ঐ একই সময়ে পারনাশিয়ান কবিগোষ্ঠীর উপর ন্যাচারালিজম্-এর কিছু প্রভাব পড়েছিল বলে কেউ কেউ মনে করেন, কিন্তু পারনাশিয়ানদের রূপের প্রতি পক্ষপাত ন্যাচারালিজ্‌ম্-এর তত্ত্বের সঙ্গে মেলে না। ঐ সময়েই সিম্‌বলিজ্‌ম্ ফরাসি কবিতার প্রধান প্রবণতা হয়ে উঠেছে যার নিমগ্নতা বাস্তবের মধ্যে রহস্যসন্ধানে। মোপাঁসা অবশ্যই অনেকটাই ন্যাচারালিস্ট ছিলেন কিন্তু ছিলেন না অপর দুই সমকালীন ফরাসি সাহিত্যিক আলফাঁস দোদে এবং আনাতোল ফ্রাঁস।

আমেরিকান কথাসাহিত্যও উনিশ শতকে ন্যাচারালিজ্‌ম্-এর কথা ভাবেনি। বরং বাস্তবের মধ্যে রহস্য-সন্ধানেই এবং বাস্তবকে ছাড়িয়ে অনুপুঙ্খ বাস্তব-কে উত্তীর্ণ হয়ে যাওয়া এক জীবনসত্যের উপলব্ধিতেই যেন পৌঁছোতে চেয়েছিলেন আমেরিকান কথাসাহিত্যিকেরা। এডগার অ্যালান পো জোর দিয়েছিলেন অদ্ভুত আবহ রচনার উপর। সেই সঙ্গে বার করে এনেছিলেন মানব-মনের অপরাধ-ভয়-সংশয় মিশ্রিত জটিল শঙ্কাতুরতা। ডিটেলের কাজে অসম্ভব দক্ষতা সত্ত্বেও পো-র গল্পের জটিল দিনানুদিনের বাস্তবতা ফুটিয়ে তোলবার কাজে ব্যবহৃত হয়নি। তবু তাঁর রচনাকে আন-রিয়েলও বলা চলে না। বাস্তবতার আছে নানা দৃষ্টিকোণ। আছে বহির্জগত ও অন্তর্জগতের বাস্তবতা। এডগার অ্যালান পো মনস্তাত্ত্বিক বাস্তবতার প্রথম কালোত্তীর্ণ শিল্পী।

বিবরণকে বাস্তব থেকে বিচ্যুত না করেও কি ভাবে জীবনসত্যের অনির্বচনীয় ব্যঞ্জনায় পৌঁছে দেওয়া যায় তার অন্যতম শ্রেষ্ঠ উদাহরণ উনিশ শতকেই রেখে গেছেন আমেরিকান ঔপন্যাসিক মেলভিল তাঁর *মবি ডিক* উপন্যাসে। সুবিশাল শ্বেতবর্ণের অপরাজেয় তিমি-মাছটিকে কেন্দ্র করে মানুষের বিজয়-প্রয়াসের চূড়ান্ত সীমা স্পর্শ করা সংঘর্ষের কাহিনীটির স্তরে স্তরে জীবনের অনন্ত উপলব্ধি-বৈচিত্র্যের যে বর্ণাভা উদ্ভাসিত হয়েছে তাকে রিয়েলিজ্‌ম্ বললে প্রায় কিছুই বলা হয় না। এই উপন্যাসে রিয়েলিটি স্পর্শ করেছে ট্রুথ-কে। বাস্তব উত্তীর্ণ হয়েছে এক মহিমাময় জীবন-সত্যে। মেলভিল-এর মতো এত বিশদ ও গভীরভাবে না হলেও মার্ক টোয়েন-এর *হাক্‌ল্‌বেরি ফিন*-এ মিসিসিপি নদীটি সেরকমই এক জীবন-সত্যের প্রতীক হয়ে দাঁড়ায়। অনেক উপন্যাসেই অশেষ-আলোড়িত সমুদ্র এবং নিত্য-বহতা নদী এইভাবে এক প্রতীকিত সত্তা পেয়ে যায়। যেমন সমুদ্রকে অনুভব করি কনরাড বা হেমিংওয়ের উপন্যাসে। নদীকে পেয়েছি মার্ক টোয়েন, হেরমান হেসে, মিখাইল শলোকভ্-এর লেখায়। বাংলা উপন্যাসেও ইছামতী, পদ্মা, গঙ্গা কিছুটা এভাবে ব্যবহৃত হয়েছে। তবে বাংলা উপন্যাসে জীবনাকাঙ্ক্ষার দুরন্ত বিস্তারের উপলব্ধিই কিছু কম। প্রজন্ম-বাহিত জীবন-চর্যার পার্থক্যই তার কারণ।

উনিশ শতক শেষ হতে হতেই রিয়েলিজ্‌ম্-এর 'ন্যাচারালিজ্‌ম্'-সম্মত রূপটি অনেকটাই বর্জিত হল উপন্যাস-সাহিত্য থেকে। উনিশ-বিশ শতকের সন্ধিক্ষণ ও বিশ শতকের প্রথম ভাগে ইংরেজি উপন্যাসে গল্‌স্‌ওয়র্দি, হার্ডি ও কনরাড, জার্মান উপন্যাসে টোমাসমান ও হেরমান হেসে বাস্তবতাকে দেখলেন অন্যভাবে। বাস্তবতার বহিরাবরণ রইল কিন্তু উপন্যাসিকদের সন্ধেয় হল বাস্তবতার অন্তর-সত্য। রিয়েলিটি থেকে ট্রুথ্-এর দিকে যাত্রা। এঁদের প্রত্যেকেরই লেখায় বাস্তবতার আকার ও সত্যের উপলব্ধি— দুই-ই দেখা দিল প্রত্যেকের শিল্পীচেতনার স্বতন্ত্রতায়। গল্‌স্‌ওয়র্দির উপন্যাসে সময় ও সমাজের গতিশীল, বিবর্তনশীল বাস্তবতার সঙ্গে ব্যক্তির অস্তিত্বের সংঘাতের মধ্যে দিয়ে এক নৈর্ব্যক্তিক জীবন-সত্যের নিয়ম প্রতিষ্ঠিত হল। হার্ডি আঞ্চলিক বাস্তবতার বহিরবয়ব নির্মাণ করে তার অন্তরে মানুষের দুরন্ত প্যাশন ও অমোঘ নিয়তির সংঘর্ষের রক্তরেখায় হৃদয়ের সত্যের ছবি আঁকলেন। সমুদ্র-জীবনের বাস্তবতার প্রেক্ষাপটে ব্যক্তিমানুষের প্রশ্নসঙ্কুল, দায়িত্ব-সচেতন, স্পর্শকাতর হৃদয় কিভাবে আত্মিক সত্যের ও শান্তির সন্ধানে ফেরে তারই ব্যঞ্জনা কনরাড-এর লেখায়। টোমাসমান আর হেরমান হেসের উপন্যাসসমূহে রিয়েলিজ্‌ম্-এর পদ্ধতির নিজস্ব কোনো মূল্য আছে বলে তেমন অনুভব করা যায় না। মান-এর নায়কেরা জীবনের নানা ঘাটে ও আঘাটায় বিচরণ করে। লোভ, কাম, বিকার, নৈঃসঙ্গবোধ, পাপবোধের মধ্যে দিয়ে তাদের প্রাণযাত্রা। এভাবেই মান জীবনের সত্যকে দেখেন। হেসে-র অনুভবেও জীবনের অর্থ সন্ধান এক দার্শনিক উপলব্ধিময় চরিতার্থতায় গিয়ে পৌঁছয়। তাঁর *সিদ্ধার্থ* উপন্যাসটির সঙ্গে ভারতীয় পাঠকেরা পরিচিত। কিন্তু হেসে-র বাস্তবতাবোধের ধারণাটি সবচেয়ে ভালভাবে বোঝা যাবে তাঁর মহত্তম উপন্যাস *কাচের পুঁতির খেলা*-তে। সমস্ত উপন্যাসটি এক কাল্পনিক ভবিষ্যৎ কালে, অনির্দিষ্ট এক স্থানিক পরিমণ্ডলে, এক অদ্ভুত সম্প্রদায়ের মধ্যে প্রচলিত পরমাশ্চর্য কাচের পুঁতির খেলার প্রতীকের মধ্যে বিন্যস্ত। এই খেলায় বিশ্বের সমস্ত শিল্প ও মানসিকতায় অর্জিত মনোসম্পদসমূহ ব্যবহৃত হয়। তবু এ- খেলা প্রতিদিনের জীবন থেকে বিচ্ছিন্ন। উপন্যাসের নায়ক শেষ পর্যন্ত অত্যাশ্চর্য রূপময় এবং মেধা-সমুজ্জ্বল কুশলতার লীলাভূমি এই খেলার জগৎ থেকে নিজেকে ছাড়িয়ে নিয়ে খোলা জীবনের দিকে চলে যায়। শিল্পের পরমাশ্চর্য সুন্দর জগৎ-ও পরিত্যাজ্য— হয়তো বা কাচখণ্ডের মতোই ভঙ্গুর— যদি না তা জীবনবাস্তবতার সঙ্গে পা মিলিয়ে চলতে পারে— এই অত্যন্ত বাস্তব প্রতিপাদ্য বিষয়টিকেই

প্রতিষ্ঠা দিয়েছেন হেসে তাঁর কল্প-বাস্তবতার ধরনে নির্মিত উপন্যাসটিতে। রিয়েলিজম্-এর রীতি এ-উপন্যাসে নেই, কিন্তু রিয়েলিটি-র নির্যাসটি আছে। সমসময়ে এই উপন্যাসগুচ্ছের সমান্তরাল বাংলা উপন্যাস লিখেছিলেন খানিকটা রবীন্দ্রনাথ। কিছুটা কাছাকাছি আসে *গোরা যোগাযোগ* ও *চতুরঙ্গ*।

বিংশ শতাব্দের প্রথমার্ধ থেকেই রিয়েলিজম্-এর বস্তুবাদী চেহারা ভেঙে পড়তে থাকে। এর মূলে একদিকে যেমন আছে পাথুরে বাস্তবতার বাঁধা সড়ক ধরে চলতে শিল্পীদের অতৃপ্তি; অন্যদিকে আছে ফ্রয়েড, অ্যাডলার, যুং-এর মনোবিজ্ঞানের পরীক্ষা ও তার ফলাফলনির্ভর অভিঘাত। মনের মধ্যে জলমগ্ন হিমবাহের গোপন বিপুলতা, নিয়ন্ত্রণ-বহির্ভূত আবৃত কামনা আর স-গোত্র পূর্বপুরুষদের রক্তধারার মতোই স্বপ্ন-সংস্কার-বাসনার পুঞ্জিত প্রবাহ আমাদের হৃদয়কে আমাদের অধীন করে রাখেনি—এই উপলব্ধির উন্মেষের সঙ্গে সঙ্গে অভিনব এক অন্তর্বাস্তবতার জগৎ উন্মোচিত হয়ে গেল ঔপন্যাসিকদের সামনে। চিত্ততলের গহনতাকে ভাষায় ধরবার দুরূহ কাজে নেমে পড়লেন কোনো কোনো লেখক। বহির্বাস্তবকে তাঁরা অস্বীকার করেননি কখনো কিন্তু আলো ফেলেছেন মনের ভেতরে। জন্ম নিয়েছে বহু-আলোচিত 'স্ট্রীম অব্ কনশাসনেস' পদ্ধতি। প্রুস্ত, ডরোথি রিচার্ডসন, জয়েস-এর নাম সকলেরই পরিচিত। ভার্জিনিয়া উল্ফ্ কেবল উপন্যাস লিখে নয়, প্রবন্ধ লিখেও পদ্ধতিটিকে বোঝার ও বোঝবার চেষ্টা করেছেন। এই লেখকদের লেখার শৈলী সম্পর্কেও বাঙালি পাঠকের কম বেশি ধারণা আছে। কারণ সেই ধূর্জটিপ্রসাদের *অন্তঃশীলা* আর গোপাল হালদারের *একদা* থেকেই এঁদের কথা আমরা শুনে এসেছি। মাঝে মাঝে কি মনে হয় না—ন্যাচারালিজম্ পদ্ধতিরই একটা রূপান্তরিত চেহারা আমরা এই রীতির উপন্যাসে দেখতে পাই! জোলা-র ন্যাচারালিজম্ যদি বাস্তবের বহিরবয়বের খুঁটিনাটি-কে স্তূপাকৃতি করে তাহলে মনঃসমীক্ষণ-রীতি প্রায় একইভাবে দেখায় মনের অভ্যন্তরের প্রতিটি স্পন্দন। তবু ঠিক একরকম নয়। অন্তত জয়েস অনেকটাই আলাদা। তবে *ইউলিসিস* ঠিক 'স্ট্রীম অব্ কনশাসনেস' নভেল হয়েই শেষ হয়ে যায় নি। হতে চেয়েছে প্রথম মহাযুদ্ধ-পরবর্তী ঘর-ভাঙা মানুষের পথে ঘুরে ফেরা-র মহাকাব্য। তাই এই উপন্যাসের রূপাবয়বে স্বপ্ন, ফ্যান্টাসি, মিথ প্রলাপ ও সংলাপ, পুরাণ ও ডাবলিন সব মিলে মিশে একটি আকার পায়। তাকে প্রচলিত অর্থে রিয়েলিজম বলা চলে না কিছুতেই।

প্রচলিত অর্থে রিয়েলিজম্-এর অনুশাসন না ভেঙেই মনস্তাত্ত্বিক বাস্তবতাকে অসামান্য সত্যরূপ দিয়েছেন লরেন্স তাঁর উপন্যাসে। বাংলা সাহিত্যে প্রকৃত মনঃসমীক্ষণ রীতির উপন্যাসের উদাহরণ প্রায় নেই বলা যায়। ধূর্জটিপ্রসাদের *অন্তঃশীলা*-র শরীর থেকে বিদেশী গন্ধ কখনই মোছেনি। বরং গোপাল হালদার *একদা*-তে পদ্ধতিটি নিজস্ব প্রয়োগে খানিকটা মৌলিকতা এনেছেন। আর লরেন্স-এর পাশে রাখার মতো নাম নিঃসন্দেহেই মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়। একাধিক ঔপন্যাসেই মনস্তাত্ত্বিক বাস্তবতার চমকপ্রদ বিশ্লেষণ করে দেখিয়েছেন তিনি।

ভার্জিনিয়া উল্ফ্ তাঁর একাধিক প্রবন্ধে রুশ ঔপন্যাসিকদের সপ্রশংস উল্লেখ করেছিলেন। সম্ভবত ইউরোপীয় কোনো বিশিষ্ট সমালোচক ও সাহিত্যিক সেই প্রথম রুশ কথাসাহিত্যিকদের দিলেন প্রাপ্য মর্যাদা। একটি কথাই ঘুরিয়ে ফিরিয়ে বলেছিলেন ভার্জিনিয়া উল্ফ্। আর্নল্ড বেনেট্ প্রমুখ বাস্তববাদী ঔপন্যাসিকদের আংশিকতা দেখিয়ে তিনি মন্তব্য করেছিলেন যে রুশ ঔপন্যাসিকেরা কাহিনী বা চরিত্রের নিটোল ও বাস্তব রূপ এবং পরিণাম দেখাতে আগ্রহী নন। তাঁরা স্পর্শ করতে চান এবং নিংড়ে নিতে চান মানুসের 'সোল'-কে। Soul শব্দটি বারবার ব্যবহার করেন উল্ফ্। বস্তুত এই একটি শব্দেই হয়তো উদ্ভাসিত হয়ে ওঠেন উনিশ শতকের

তিন রুশ ঔপন্যাসিক— টলস্টয়, টুর্গেনিভ, ডস্টয়েভস্কি। বিশ শতকের তৃতীয় দশকের আগে ইউরোপীয় সাহিত্যরসিকেরা রুশ কথাসাহিত্যের বিশালতা ও মহত্ত্ব সম্পর্কে সম্যক উপলব্ধিতে পৌঁছোতে পেরেছিলেন বলে মনে হয় না। রুশ উপন্যাসে বাস্তবতার রূপায়ণে এমন এক ধরনের সম্পূর্ণতা অনুভব করা যায় যা ইউরোপের অন্যত্র বিরল। সামাজিক অবস্থার চিত্রণে তাঁরা সিদ্ধহস্ত, কাহিনী-বয়নে অনায়াস, সব ধরনের চরিত্রকে সর্বাঙ্গীণ স্বাভাবিকতা দিতে সুনিপুণ। এই শেষ গুণটিতে টলস্টয়-এর তুলনা নেই। আর ডস্টয়েভস্কি-র কলমে স্বাভাবিকের পাশাপাশি একটু অ-স্বাভাবিক চরিত্ররা কিভাবে প্রাণ পায় তা-ও জানা আছে আমাদের সকলেরই। তবু এই সব কিছুর মধ্যে দিয়ে রুশ সাহিত্যিকদের লক্ষ্য যেন শেষ পর্যন্ত সেই 'সোল'-কে বার করে আনারই সাধনা। দৈনন্দিন জীবনের কঠোরতার সঙ্গে প্রাচ্যের আত্মিক সন্ধানের একটা রহস্যময় মিশ্রণ যেন ঘটে গিয়েছিল সেখানে। রুশ সমাজ-ব্যবস্থায় উনিশ শতকের একেবারে শেষ পর্যন্তই সামন্ততন্ত্রের যে সর্বাত্মকতা ছিল তাতে মানুষের ব্যবহারিক জীবনের স্বাধীন বিকাশ ছিল ব্যাহত। মানবাত্মা আশ্রয় খুঁজেছে নিজেরই মধ্যে, বাঁচতে চেষ্টা করেছে নিজেকে নিংড়ে। এই সমস্ত চালচিত্র এবং প্রাণ-প্রবাহ একত্রে সত্য হয়ে উঠেছে রুশ উপন্যাসে।

সাহিত্যে বাস্তবতার ধারণায় নতুন করে গুণগত এক মাত্রা সংযোজিত হল বিশ শতকের ত্রিশের দশকে। এই সংযোজন ঘটালেন সমাজতন্ত্রবাদী সমালোচকেরা। মার্ক্সবাদ যেহেতু বস্তুবাদী দর্শন, সাহিত্যের মার্ক্সবাদী বিচারে এই বাস্তবতার বিষয়টি খুবই গুরুত্ব পেয়েছে। মার্ক্স, এঙ্গেল্‌স্ এবং তারপর প্লেখানভ ও লেনিন নানা প্রসঙ্গে বাস্তবতা-বিষয়ক মন্তব্য করলেও তাঁরা যেহেতু স্বতন্ত্রভাবে কোনো সাহিত্য-সমালোচনা করেননি তাই তাঁদের লেখায় বিষয়টি কোনো তাত্ত্বিক সমগ্রতাও পায়নি। ১৯৩৪ সালেই অবশ্য সমাজতন্ত্রবাদীদের ধারণায় সাহিত্যে বাস্তবতার বিষয়টি বেশ স্পষ্ট চেহারা পেয়ে গেছে। গোর্কি, র‍্যালফ ফক্স, লুকাচ, কডওয়েল, বোরিস্ সুচকভ (Suchkov), ফিলিপ রাভ (Rahv) প্রমুখ ইউরোপীয় ও রুশ সাহিত্য-সমালোচকদের বহু আলোচনা ও লেখা থেকে সমাজতন্ত্রবাদীদের মতে বাস্তবতার দুটি শ্রেণী-বিভেদের নির্দেশ পরিষ্কারভাবে বোঝা যায়। তাঁরা সমালোচনামূলক বাস্তবতা এবং সমাজতান্ত্রিক বাস্তবতা বলে দুটি বিভাগ নির্দেশ করেছেন। প্রথমটি হল— বাস্তবের রূপ যেমন আছে তাকেই তুলে ধরা। এর মধ্যে লেখকের কোনো পক্ষপাত বা নৈর্ব্যক্তিক মনোভঙ্গি— যা-ই থাক না কেন মূলগতভাবে এই বাস্তবদৃষ্টি সামাজিক স্থিতাবস্থা বজায় রাখতে চায় বলে সমাজতন্ত্রবাদীরা মনে করেন। তাবৎ ইউরোপীয় উপন্যাসের বাস্তবতা-চিত্রণকে তাঁরা মোটামুটিভাবে সমালোচনামূলক বাস্তবতা বলে ব্যাখ্যা করেছেন। অপরপক্ষে সমাজতান্ত্রিক বাস্তবতা প্রসঙ্গে বারবার বলা হয়েছে দুটি কথা। এক, মানুষকে এবং সমাজকে এই বাস্তবতার পদ্ধতি ধরবার চেষ্টা করবে তার দ্বান্দ্বিকতা এবং বিবর্তনের সূত্র অনুসারী পরিপূর্ণ বিকশিত রূপে অথবা বিকাশোন্মুখ প্রক্রিয়ায়। মানুষ বা সমাজ কোনো কিছুকেই খণ্ডিতভাবে তা দেখবে না। দুই, সমাজতান্ত্রিক বাস্তবতায় জনগণের সামূহিক কল্যাণের আদর্শ প্রচারিত হবে। তা হবে আন্তর্জাতিকতাবোধ সম্পন্ন, বৈপ্লবিক এবং আশাবাদী।

এই শ্রেণীভেদ কিন্তু বেশিদিন বজায় রাখা যায়নি। মার্ক্সবাদী সমালোচকেরাই ক্রমে এই তত্ত্বের অসম্পূর্ণতা অনুভব করেন। প্রথমত, ইউরোপের বহু মহৎ উপন্যাসকে এই সংজ্ঞার ছকে ফেলে বিচার করা যায় না। দ্বিতীয়ত, আদর্শ প্রচার এবং আশাবাদ-কে প্রাধান্য দিতে গেলে বাস্তবতা তার ধর্ম থেকে বিচ্যুত হয়। সংজ্ঞার্থেই তা বেশ কিছুটা খণ্ডিত এবং লেখকের পক্ষপাতস্পৃষ্ট হয়ে পড়ে। তৃতীয়ত, সমাজতান্ত্রিক বাস্তবতার শিল্পরূপ একপেশে, বৈচিত্র্যহীন

এবং প্রচারধর্মী হয়ে পড়বার সম্ভাবনা প্রবল। সমাজতান্ত্রিক বাস্তবতার আদর্শ যে-লেখকেরা এবং সমালোচকরা পুরোপুরি মান্য করতে গেছেন তাঁরা সকলেই সাহিত্য-বিচারে ভ্রান্তির সম্মুখীন হয়েছেন। পরবর্তী সমাজতন্ত্রবাদী সমালোচকেরা অনেকটা দূর করতে চেষ্টা করেছেন এই ধারণার সীমাবদ্ধতা। তবে ব্যক্তিমানুষকে যে তার সামাজিক প্রেক্ষাপটে, শ্রেণী-সংঘর্ষের নিরন্তর প্রবাহের মধ্যে এবং দ্বন্দ্বময় বিকাশশীলতায় সমগ্রভাবে দেখা দরকার— এই বক্তব্যের মধ্যে বাস্তবতা-ধারণার একটি যথার্থ দিক ধরা পড়ে। সমাজতান্ত্রিক সাহিত্যতত্ত্ববিদরা এই সত্যটি তুলে ধরে সাহিত্যে বাস্তবতার বিষয়টিকে একটি সম্পূর্ণতা দান করেছেন। পুঁজিবাদী সভ্যতায় ব্যক্তি-মানুষের বিচ্ছিন্নতাবোধ এবং নৈরাশ্যপীড়িত নৈঃসঙ্গের চাপে এই সম্পূর্ণতা অনেকেরই লেখা থেকে হারিয়ে যাচ্ছিল। প্রতিভার উজ্জ্বলতা সত্ত্বেও কাফকা বা কামু-র উপন্যাসে এই খণ্ডিত বাস্তবের চিত্রই রূপায়িত হয়েছে— তা অস্বীকার করা যায় না।

বিংশ শতাব্দের মধ্যভাগে দাঁড়িয়ে আমরা দেখেছি— সাহিত্যে বাস্তবতার ধারণাটি বহুমুখী এবং বহুমাত্রিক। বাস্তবের অনুকরণ বা অনুসরণ মাত্রই সাহিত্যের বাস্তবতা নয়। একদিকে যেমন ফ্যান্টাসিও সাহিত্যে বাস্তবতার সহায়ক হতে পারে, অন্যদিকে বাস্তবতার অনুপুঙ্খতার মধ্যে দিয়েও ব্যঞ্জিত হতে পারে এক রহস্যের দ্যোতনা। যেমন হয়েছে মেলভিল-এর *মবি ডিক*-এ। তিমি সম্পর্কিত সহস্র খুঁটিনাটি লিপিবদ্ধ করবার পর, তিমি-শিকার সংক্রান্ত সব তথ্য বিবৃত করবার পরও সেই অতিকায় এবং অ-ধরা শ্বেত তিমি এক অনন্ত জিজ্ঞাসার মতোই পাঠককে আপ্লুত করে দেয় এক অব্যাখ্যাত শক্তির রহস্যময়তার অনুভবে।

পৃথিবীর ইতিহাসে কোথাও কোথাও এই সময়টিতে বিক্ষুব্ধ বাঁক নিয়েছে খুব দ্রুত। বিশ শতকের মধ্যবিন্দুটি পার হয়ে আসার পরও মানব-সভ্যতার শরীরে অসংখ্য ক্ষতের লাঞ্ছনা। এই ইতিহাস মন্থন করেই যেন আবির্ভূত হয়েছে আজকের যুগের সাহিত্যের নতুন বাস্তবতা। সমালোচনার পরিভাষায় যার নাম দেওয়া হয়েছে 'ম্যাজিক রিয়েলিজ্‌ম্'— ঐন্দ্রজালিক বাস্তবতা।

কিন্তু 'ম্যাজিক রিয়েলিজ্‌ম্' সম্পর্কিত আলোচনার আগে আমরা প্রায় সম সময়ে স্পষ্ট হয়ে ওঠা ফ্রান্সের 'নতুন নভেল' (Nouveau Roman) আন্দোলনের কথা একটু বলে নিতে পারি। ১৯৫৫-৫৬-তে ফ্রান্সের ঔপন্যাসিকদের কয়েকজন এই আন্দোলন শুরু করেন। প্রধান লেখক ও প্রবক্তা ছিলেন আলা হ্রোব-গ্রিয়ে, নাতালি সারোৎ ও ক্লোদ সিমঁ। এই আন্দোলনের মূল সূত্রটি বাস্তবতার স্বীকৃতি বা অস্বীকৃতি সংক্রান্ত কোনো ভাবনার সঙ্গে জড়িত নয়। ঔপন্যাসিকের দৃষ্টিকোণ কী হবে—এই ছিল তাঁদের প্রধান প্রশ্ন। সর্বজ্ঞ লেখক তাঁর সৃষ্ট চরিত্রদের নিয়ন্ত্রণ করবেন— এই পদ্ধতি এরা মানতে চাইলেন না, বর্জন করতে চাইলেন উপন্যাসে সার্ত্র প্রমুখ লেখকদের দার্শনিক দৃষ্টিভঙ্গি। আর মনস্তাত্ত্বিক বিশ্লেষণের খুঁটিনাটিও তাঁরা মনে করলেন উপন্যাসে অ-প্রয়োজন। এক কথায়— ফরাসি উপন্যাসে ন্যাচারালিজ্‌ম্ উদ্ভূত যে বহির্বাস্তব, মনোবিশ্লেষণ জনিত যে অন্তর্বাস্তব এবং এগজিসটেনশিয়ালিস্টদের দার্শনিক প্রত্যয়সিদ্ধ বাস্তবের রূপায়ণ—এসবই তাঁরা বর্জন করতে চাইলেন। তাঁদের কাছে প্রধান হয়ে দেখা দিল মানুষ। তার ভিতর ও বাহির, স্মৃতি ও সত্তা, তার অভিজ্ঞতা নিংড়ে বার করা অনুভবপ্রবাহ। সেই মানুষকেই তাঁরা তুলে ধরলেন প্রত্যক্ষ উপাদানের মতো। কোনো গল্প নির্মাণ তো নয়ই, চরিত্রগুলিরও কোনো বিকাশ, বা পরিণতি দানে তাঁদের আগ্রহ দেখা গেল না। মানুষের শ্রেণীচরিত্রকে নয়, সর্বত্রই তার স্বাতন্ত্র্যচিহ্নিত ব্যক্তিত্ব তাঁদের কাছে মনোযোগের বিষয় হল। অনেক সমালোচক 'নতুন নভেল' আন্দোলনের ধারায় রচিত উপন্যাসগুলিকে 'ডু-ইট-ইয়োরসেল্‌ফ্' বা 'নিজে তৈরি কর' উপন্যাস বলেছেন। অর্থাৎ ঔপন্যাসিক পাঠকের হাতে তুলে দেবেন

কয়েকটি চরিত্র ও আবশ্যিক পরিবেশটুকু। উপন্যাসের প্লটটি তাঁকে গড়ে নিতে হবে নিজেই। বাস্তবতাকে কোনোভাবেই অস্বীকার করা এই নতুন ফরাসি ঔপন্যাসিকদের উদ্দেশ্য ছিল না। আবার উদ্দেশ্য ছিল না বাস্তবতাকে প্রধান করে তোলাও। মানব-চরিত্রের এক ধরনের সমগ্রতাই তাঁরা প্রতিষ্ঠিত করতে চেয়েছেন কিন্তু যেহেতু ব্যক্তির আত্মার সংকট; তার স্বপ্ন, কল্পনা, ভ্রান্তি, মনের মধ্যে কাল-স্তরের অনবরত মিশ্রণ—এসবই তাঁরা যথাযথভাবে ধরতে চেয়েছেন—সে-কারণে উপন্যাসে বাস্তবতা প্রতিনির্মাণের চিরাচরিত পদ্ধতিটির অনুসরণ তাঁদের লেখায় দেখা যায় না।

ফরাসি 'নতুন নভেল' আন্দোলন এবং লাতিন আমেরিকার 'ঐন্দ্রজালিক বাস্তবতা'-র মধ্যে পার্থক্যটি একেবারে মৌলিক। 'নতুন নভেল' ধারণায় ব্যক্তি মানুষই একমাত্র লক্ষ্য; ম্যাজিক রিয়েলিজ্‌ম্-এ মানুষকে তার দেশজ সমাজ-পটভূমি থেকে বিচ্ছিন্ন করে দেখাই যায় না।

'ম্যাজিক রিয়েলিজ্‌ম্' যে হঠাৎ একটি বিশেষ সময়ের রচিত সাহিত্যে দেখা গেল তা নয়। বেশ কিছুকার ধরে ধীরে ধীরে গড়ে ওঠা একটি বাস্তবতা প্রতিনির্মাণ-পদ্ধতিকে ১৯৫৫-র কাছাকাছি সময় থেকে 'ম্যাজিক রিয়েলিজ্‌ম্' নামে আখ্যাত করা শুরু হল লাতিন আমেরিকায় এবং ক্রমে সর্বত্রই।

লাতিন আমেরিকান সাহিত্যের উপাদানগুলি প্রথমাবধি অত্যন্ত মিশ্রিত ধরনের। সেখানকার সমাজ গড়ে উঠেছে এক সঙ্কর জনগোষ্ঠীর দ্বারা। দেশীয় আদিবাসী আর স্পেনীয় বিজেতা, আফ্রিকা থেকে আনিত দাসেরা, শ্বেত ইউরোপের ঔপনিবেশিক ও বাণিজ্যিক আগ্রাসনের ফলে আগত মানুষজন মিলিয়ে লাতিন আমেরিকার অধিবাসী। বহু প্রাচীন সংস্কার ও বিশ্বাস সেই জনগোষ্ঠীতে গৃহীত। অতিপ্রাকৃতে বিশ্বাস জনগোষ্ঠীর বৃহদংশে প্রত্যক্ষবৎ। মৌখিক গল্প বলার রীতি একেবারে সাম্প্রতিক কাল পর্যন্তও অক্ষুণ্ণ। লোককথার নায়ক সাধারণভাবেই বিশ্বের সর্বত্রই অতিনায়ক সদৃশ। তার ওপর লাতিন আমেরিকায় বিজিত-বিজয়ী সম্পর্ক প্রথম থেকেই এত তীক্ষ্ণ যে বিজিত জনগোষ্ঠীর মধ্যে প্রচলিত লোককথার নায়ক হয়ে ওঠে তাদের আকাঙ্ক্ষা ও স্বপ্নের সম্মিলিত রূপ, সব অসম্ভব সম্ভব করতে পারা বীর নায়ক। পুরাণ, অতিকথা, রূপক কাহিনী, জাতীয় বীরগাথা—এই সব কিছুর সংমিশ্রণে গঠিত লাতিন আমেরিকার সাহিত্যে প্রথম থেকেই ফ্যান্টাসি ও বাস্তবতার একটি অবাধ মিলন লক্ষ করা যায়। এই ঐতিহ্যের ভিতের উপরই দাঁড়িয়ে আছে 'ম্যাজিক রিয়েলিজ্‌ম্'।

একাধিক সাহিত্য ধারণার মতোই এই শব্দযুগলও প্রথম ব্যবহৃত হয়েছিল চিত্রকলার আলোচনায়। জার্মান কলা-সমালোচক ফ্রানৎস রোহ্ (Franz Roh) পোস্ট-এক্সপ্রেশনিস্ট ছবি সম্পর্কে শব্দবন্ধটি প্রথম ব্যবহার করেন ১৯২৫ সালে। তাঁর রচনাটির নাম ইংরেজি অনুবাদে—'আফটার এক্সপ্রেশনিজ্‌ম্ : ম্যাজিক রিয়েলিজ্‌ম্ : প্রবলেম্‌স্ অভ দ্য নিউয়েস্ট ইউরোপিয়ান পেন্টিং'। কিন্তু রোহ্ এই শব্দগুচ্ছটি বাস্তব ও ফ্যান্টাসি-র মিশ্রণ অর্থে ব্যবহার করেননি। বাস্তবের মধ্যে রহস্যময়তার নিহিত ব্যঞ্জনা অর্থেই ব্যবহার করেছেন। অনেকটা সুর-রিয়েলিজ্‌ম্-এর সমার্থক তাঁর ব্যাখ্যা। সুর-রিয়েলিজ্‌ম্ সম্পর্কে লেখালেখিও ঐ সময়েই শুরু করেছিলেন আঁদ্রে ব্রেতঁ।

প্রথম যে লাতিন আমেরিকান লেখক সাহিত্য বিষয়ে এই অভিধাটি ব্যবহার করেন তিনি ভেনেজুয়েলা-র সাহিত্যিক আর্তুরো পিক্‌ত্রি (Arturo Pictri) ১৯৪৮-এ প্রকাশিত তাঁর *মেন অ্যান্ড লেটার্‌স্ অফ্ ভেনেজুয়েলা (Hombres y letras de Venezuela)* গ্রন্থে তিনি ভেনেজুয়েলার ছোটগল্প সম্পর্কে আলোচনা করতে গিয়ে কথাটি বলেন। মোটের উপর রোহ্

এর অর্থেই কথাটি ব্যাখ্যা করলেও আর্তুরো জীবনের যথাযথ বাস্তব পরিমণ্ডলের মধ্যে অদ্ভুত আপাত অ-বাস্তব বিষয় ও চরিত্র এনে ফেলার ব্যাপারটি সমর্থন করেন এবং তার সাহিত্যিক তাৎপর্য স্বীকার করেন। অল্পকাল পরেই কিউবা-র ঔপন্যাসিক আলেজো কার্পেন্তিয়ের (Alejo Carpentier) 'মার্ভেলাস রিয়েলিটি' শব্দবন্ধটি ব্যবহার করে উপন্যাসে ফ্যান্টাসি ও মিরাকল্-এর সংযোজন সমর্থন করেন। আর্তুরো পিক্ত্রি এবং কার্পেন্তিয়ের-কে আধুনিক অর্থে সাহিত্যে 'ম্যাজিক রিয়েলিজ্‌ম্'-এর প্রথম প্রবক্তা বলা যেতে পারে।

তবে যথার্থভাবে প্রকৃত আধুনিক অর্থটিতে তখনও পৌঁছোনো যায়নি। একেবারে একালীন তাৎপর্যে শব্দবন্ধটির ব্যাখ্যা করলেন অ্যাঞ্জেল ফ্লোরেস (Angel Flores) তাঁর বিস্তৃত প্রবন্ধ 'ম্যাজিকাল রিয়েলিজ্‌ম্ ইন স্প্যানিশ অ্যামেরিকান ফিকশন' (১৯৫৫)-এ। জর্জে লুই বর্হেজ, মিগুয়েল এঞ্জেল প্রমুখ ঔপন্যাসিকদের রচনা-পদ্ধতি ব্যাখ্যা করে তিনি তাঁর বক্তব্য প্রতিষ্ঠা করলেন। হুয়ান রুলফো, গ্যাব্রিয়েল গার্শিয়া মার্কেজ-এর মতো শক্তিমান ঔপন্যাসিকদের রচনার নিদর্শন থাকায় ম্যাজিক রিয়েলিজ্‌ম এখন সাহিত্যে বাস্তবতারই ভিন্ন নাম।

ম্যাজিক রিয়েলিজ্‌ম-এর মূল কথাই হল— তাতে আপাত অ-বাস্তব কল্পনা বা ফ্যান্টাসি-র মিশ্রণ যতই থাক— তার লক্ষ্য সম্পূর্ণ বাস্তব। কঠিন, কুৎসিত, শ্বাসরুদ্ধ বাস্তব। লাতিন আমেরিকা-র ইতিহাস যে কঠোর অত্যাচারী প্রশাসক ও রক্তবহা বৈপ্লবিক অভ্যুত্থান-জনিত ধারাবাহিক সংকট-সময়ের মধ্যে দিয়ে গড়ে উঠছে সেই সংকট, সংগ্রাম, নৈরাশ্য, ভয়ঙ্করতাকে ফুটিয়ে তোলাই তার উদ্দেশ্য। ভয়ার্ত পরিবেশ, নির্জন ও পরিত্যক্ত প্রান্তর, ভুতুড়ে শহর, মৃতের কণ্ঠস্বর, অশরীরীর উপস্থিতির আভাস এসবই মিশে থাকে এই রীতির উপন্যাসে। সেই সঙ্গেই থাকে বাস্তবের নির্মম বিবৃতি ও চিত্রণ, থাকে ব্যক্তির আত্মগত স্তরের অসহায়তা, বিভ্রান্তি এবং মরিয়া প্রয়াসের উদ্‌ঘাটন। ধরনটা দার্শনিক নয়, সব সময়েই টেনশন-আক্রান্ত। ব্যক্তির বিপন্নতাকে প্রধান করে দেখাতে হয় বলে একক চরিত্রের প্রাধান্য পাবার সম্ভাবনা থাকে এ-জাতীয় উপন্যাসে। একটি মানুষের ভাবনা-সমগ্রতাকে ঠিকমতো প্রকাশ করবার জন্য লেখক ব্যক্তির আত্মগত বা কাল্পনিক সংলাপ, অলৌকিকত্বের অভিজ্ঞতা, স্বপ্ন ও দিবাস্বপ্ন, অতীত-বর্তমান মিশ্রিত হয়ে যাওয়া বিভ্রান্তি, এবং মূকাভিনয়-ভঙ্গি নিয়ে আসেন।

'ম্যাজিক রিয়েলিজ্‌ম্' শব্দ-বন্ধটি বিশেষভাবে লাতিন আমেরিকার একালের উপন্যাস সম্পর্কে প্রযুক্ত হলেও তা কিন্তু ইউরোপীয় সাহিত্যের সমকালীন ধারা থেকে সম্পূর্ণ বিচ্ছিন্ন বলা যায় না। আমরা লক্ষ করেছি যে বিংশ শতাব্দের প্রথম থেকেই ইউরোপীয় উপন্যাস প্রথাসিদ্ধ বাস্তবতার চিত্রণ-পদ্ধতি বহুল পরিমাণে বর্জন করেছে। জার্মানিতে টোমাসমান, হেরমান হেসে এবং কাফিকা ও গুটার গ্রাস ; ফ্রান্সে প্রুস্ত, আঁদ্রে জীদ, আঁদ্রে মালরো এবং সার্ত্র; অতঃপর ফ্রান্সের নতুন নভেল আন্দোলনের পুরোধা-রা; ইংল্যাণ্ডে ডরোথি রিচার্ডসন, জেম্‌স্ জয়েস, ভার্জিনিয়া উলফ্; আমেরিকায় ম্যাজিক রিয়েলিস্টদের অব্যবহিত পূর্ববর্তী ফক্‌নার— যিনি দক্ষিণ আমেরিকার আধা সামন্ততান্ত্রিক অভিজাত শ্রেণীর পতনের বিষয়টিকে রচনার উপজীব্য করেছিলেন— এদের কারোরই লেখায় প্রথাসিদ্ধ বাস্তবতার অনুসরণ নেই। ধারাবাহিক কাহিনী বয়নের অভিলাষও বর্জিত। পরিত্যক্ত চরিত্রের ক্রমিক বিকাশের রীতি, সময়-মিশ্রণ সকলের হাতেই স্বাভাবিক হয়ে এসেছে। আপাত অদ্ভুত এবং অলৌকিক-কেও স্থান দিতে তাঁরা দ্বিধাবোধ করেন না। ফিউচারিজ্‌ম্, সুর-রিয়েলিজ্‌ম্, এক্সপ্রেশনিজ্‌ম্— এই সব তত্ত্বই বিশ শতকের প্রথমার্ধে শিল্পীদের মানসিক ঐতিহ্যভুক্ত হয়ে গেছে। কোথাওই ট্র্যাডিশনাল রিয়েলিজম্-কে বিশেষ মূল্য দেওয়া হয়নি। লাতিন আমেরিকার সাহিত্যিকেরা সকলেই ইউরোপীয়

আধুনিকতার সঙ্গে পরিচিত। সকলেই প্রায় ইউরোপে উচ্চশিক্ষাপ্রাপ্ত এবং ইংরেজি, ফরাসি, জার্মান সাহিত্যের আধুনিক ধারার বিষয়ে ওয়াকিবহাল। এই সম্মিলিত ঐতিহ্য তাঁদের হাতে একটি বিশিষ্ট রূপ পেয়েছে— একথা বলা অন্যায় হবে না।

কিন্তু ম্যাজিক রিয়েলিজম্-এ একটি অঞ্চলের আঞ্চলিক বিশিষ্টতাগুলি বিশেষভাবে রক্ষিত হয়। লাতিন আমেরিকার দেশজ পটভূমিটি জানা ও বোঝা এই মুহূর্তে এই জাতীয় উপন্যাস অনুধাবন করবার বিশেষ শর্ত। লাতিন আমেরিকার ভৌগোলিক বৈশিষ্ট্যও লেখকেরা ব্যবহার করেছেন। কাল্পনিক কোনো শহরের বর্ণনায় লেখকদের জন্মভূমি বা শৈশবের আবাস ছায়া ফেলেছে বারবার। বৈপ্লবিকতা ও প্রতিক্রিয়াশীলতার যে জটিল মিশ্রণ লাতিন আমেরিকা উপন্যাসগুলির বাস্তবতা-চিত্রণও তা থেকে মুক্ত নয়। সব মিলিয়ে 'ম্যাজিক রিয়েলিজম্' সাহিত্যিক বাস্তবতার একটি নতুন চেহারা। ইউরোপের উপন্যাস-ঐতিহ্য থেকে লাতিন আমেরিকার সাহিত্য যে নিজেকে কিছুটা সরিয়ে এক স্বতন্ত্র সত্তায় দেখতে চায়— সেই বাসনারও অভিপ্রকাশ এই ম্যাজিক রিয়েলিজম্।

প্রকৃতিবাদ
[NATURALISM]
শুভঙ্কর ঘোষ

বাস্তববাদ ও প্রকৃতিবাদ সমার্থক কোনো মতবাদ নয়। বরং প্রকৃতিবাদ বা "Naturalism is the logical result of realism. One is a process and other is the aim." এই দুটি মতবাদের অভিন্নতার বিভ্রান্তিকর অনুসন্ধান এখনও অব্যাহত বলেই দামিয়েন গ্রান্টের সতর্ক বিশ্লেষণ— "realism' derives from philosophy and describes an objective, the attainment of the real; 'Naturalism' derives from natural philosophy or science and describes a method which shall conduce to the attainmnt of real. Admittedly usage does not always make this clear ; realism is spoken of as a techuique and naturalism as a tendeney." বাস্তববাদ থেকে প্রকৃতিবাদের ভিন্নতা বৈজ্ঞানিক নিমিত্তবাদ বা মনোবিজ্ঞানের পরিভাষায় নিয়তিবাদের পরিগ্রহণে, যা কিনা প্রকৃতিবাদী লেখককে মানুষের নৈতিক বা মানসিক গুণাবলী অপেক্ষা মনস্তাত্ত্বিক প্রকৃতি নির্ধারণে প্রণোদিত করে।

এই প্রকৃতিবাদকে কেউ কেউ যথাযথবাদ বা পরিবেশবাদ বলেও আখ্যা দিয়েছেন। এই অভিধার নিহিতার্থ অস্পষ্ট নয়। পরিস্থিতি বা পরিবেশের ফটোগ্রাফি প্রকৃতিবাদের বৈশিষ্ট্য। জীবন ও শিল্পের সম্বন্ধ বা দূরত্ব নিয়ে প্রকৃতিবাদী ভাবিত নন। হয়তো সচেতন নন। জীবন ও সমাজের প্রতিমূর্তি রচনায় প্রকৃতিবাদীর স্বস্তি ও তৃপ্তি।

সাধারণভাবে বাস্তববাদ, স্বভাবত মনস্তাত্ত্বিক বা psychological realism (স্তাঁদাল) ও সামাজিক-অর্থনৈতিক বাস্তবতা বা 'Socio-economic realism' (বালজাক) রোমাণ্টিকতা বা ভাববাদের আতিশয্য-জনিত প্রতিক্রিয়ায় সৃষ্ট। অন্যদিকে এই রোমান্টিকতা-বিরোধী মানসতা থেকে এবং ডারউইন জীবতত্ত্ব ও বস্তুতান্ত্রিক জীবনদর্শনের সমীকরণে প্রকৃতিবাদের প্রতিষ্ঠা। তাহলে বোঝা গেল 'পরিবেশবাদ, বংশগতিতত্ত্ব এবং বৈজ্ঞানিক অভিব্যক্তিবাদ' যেমন প্রকৃতিবাদের ধারণা, মানুষ নিয়তির কাছে অসহায়, ব্যক্তিচরিত্রসমূহ 'helpless products of heredity and environment', জড় বিশ্বের ফাঁদে সে বন্দি, নিয়তিনির্ধারিত তার দেহের দাবি, "পঞ্চভূতের ফাঁদে মানবমন চিরশৃঙ্খলিত। রক্তমাংসের দেহের কামনা, আকাঙ্ক্ষা ও তার জড়বিধান মানুষের জীবনে একমাত্র

নিয়ন্ত্রণকারী শক্তি।" বাস্তববাদের যে পরিণতি প্রকৃতিবাদে অথবা যে প্রকৃতিবাদ 'পরিণত বাস্তবতাবাদ'— শিল্পসাহিত্যে সেই প্রকৃতিবাদের প্রথম প্রবক্তা দার্শনিক মনোবিজ্ঞানী হিপোলাইট টেইন-এর বিশ্লেষণ প্রভাবসঞ্চারী ভূমিকা নিয়েছে; তাঁর মতে মনকে আধ্যাত্মিক রহস্যময়তার মোড়কে বাঁধা বলে ধরা যায় না। বরং মানতে হয় ইন্দ্রিয়ানুভূতির প্রভাব মনের ওপর ক্রিয়াশীল। টেইনের ধারণা এই মহাবিশ্ব বস্তুত একটি 'Great mechanism', মানুষ, মানুষের নৈতিক-জীবন এবং কর্মকাণ্ডসমূহ—এই সব কিছুই বোঝা যেতে পারে কার্য ও কারণের সম্বন্ধসূত্রে। এখানে অলৌকিকতার স্থান নেই। এভাবেই গড়ে উঠছে বৈজ্ঞানিক দৃষ্টিভঙ্গি। মনোবিজ্ঞানী টেইনের বিশ্লেষণ চিকিৎসাবিজ্ঞানী লুকাসের বংশগতিতত্ত্বের দ্বারা প্রভাবিত হয়েছে। সাহিত্যক্ষেত্রে জোলা-র ' The Experimental Novel' (১৮৮০) শীর্ষক রচনাটি প্রকৃতিবাদের ম্যানিফেস্টো হিসেবে গৃহীত হয়েছে, যেখানে তিনি বোঝাতে চান প্রকৃতিবাদী ঔপন্যাসিক কেবল জগৎ ও জীবনকে পর্যবেক্ষণ করবে না, সমস্ত অনুপুঙ্খের রেকর্ড সংকলন করবে, চরিত্রসমূহের রুচি, আবেগ, সংবেদনশীলতা নিয়ে রাসায়নিকের মতো বস্তুর কারবারি হবে।

ফরাসি উপন্যাসক্ষেত্রেই, ১৮৫০ সালে প্রকৃতিবাদের প্রথম প্রকাশ ও প্রতিষ্ঠা। বাস্তববাদী আন্দোলনের চূড়ান্ত পরিণতিতেই এই প্রকৃতিবাদের 'উদ্গাতা' হয়তো ফ্লোবেয়ার, কিন্তু তিনি যে 'রিয়ালিজম' বা বাস্তববাদের 'গুরু' এবিষয়ে সন্দেহ নেই। তাঁর *মাদাম বোভারি* যেমন বিশ্বসাহিত্যে আলোড়ন সৃষ্টি করেছে, অশ্লীলতার দায়ে অভিযুক্ত হয়েছে, অভিযোগ থেকে মুক্তও হয়েছে, তেমনি চিন্তাজগতে প্রবল নাড়া দিয়েছে। রোমান্টিকতার প্লাবন যখন অসহ্য ও একঘেয়েমিতে বৈচিত্র্যহীন ও ক্লান্তিকর মনে হয়েছে, তখনই প্রতিবাদী ফসল *মাদাম বোভারি*-র মতন বাস্তববাদী উপন্যাস; যদিও সেখানে সমাজ ও জীবনের প্রেক্ষাপটে তীব্র আশাবাদের বিচ্ছুরণ হয়তো লক্ষ করা যায় না, সমকালীন নেপোলিয়নের স্বৈরশাসনের বিরুদ্ধে জেহাদও শোনা যায় না, কিন্তু পাওয়া যায় একধরনের বাস্তবধর্মী নির্মোহ দৃষ্টিভঙ্গি। মানব-ইতিহাসেব স্তর বিভাজন সূত্রে 'শূকরধর্মী' স্তরে ফ্লোবেয়ার এর বেশি অগ্রসর হতে পারেন নি। তাই তাঁর কাছ থেকে শোনা গেল— 'Human life is a sad show, undoubtedhy ugly, heavy and complex : *মাদাম বোভারি* 'ফরাসি উপন্যাসের গতিপথে নিঃসন্দেহে এক দুঃসাহসিক যাত্রাবদল— সে যাত্রা অকুণ্ঠ বাস্তবধর্মিতায়', যার চুলচেরা বিশ্লেষণে লাভ করা যায় অবশ্যই প্রকৃতিবাদের স্বাদ।

প্রকৃতিবাদী ঔপন্যাসিক হিসেবে জোলা-কে 'অথরিটি' গণ্য করা হলেও গঁকুর ভ্রাতৃদ্বয়ের সৃষ্টিকর্মে প্রকৃতিবাদী দৃষ্টিভঙ্গিই প্রতিফলিত। প্রকৃতিবাদী লেখক সাধারণভাবে জনসাধারণের মৌলিক আশা-আকাঙ্ক্ষা, দাবি, চাহিদা তুলে ধরেন না, বরং অবক্ষয়িত সমাজের ফোটোগ্রাফিতে যেন আশ্বস্ত বোধ করেন। এই ধরনের ঔপন্যাসিক তাঁদের সৃষ্টিতে গুরুত্ব দেন— ১. Sociological enquiry; ২. Extra Psychological Investigation; ৩. Methods of Scientific Workmanship। এই কারণে এডমণ্ড গকুঁরের হাতে জন্ম নেয় *Woman of Paris*—প্যারিসের গণিকাজীবন, গণিকাপল্লীর অবিকল প্রতিলিপি। এখানে প্রকৃতিবাদীদের প্রত্যাশিত 'frankress' ও 'documentation' দুর্লভ নয়। কিন্তু তদতিরিক্ত কিছু পাওয়া কঠিন, কেননা এডমণ্ড গঁকুর ও তাঁর ভাইয়ের বক্তব্যই ছিল— "The novel today is made with documents narrated or selected from nature as history is based on written documents."

টেইনের দর্শনচিন্তা বা লুকাসের বংশগতিতত্ত্বই নয়, ডারউইনের জীবতত্ত্ব (Origin of Species, ১৮৫৯) বিষয়ক যুগান্তকারী ব্যাখ্যা ও অগাস্ট কোম্‌টের ঐহিকতাবাদ (Postivism) -এর প্রসারও ফরাসি কথাসাহিত্যে প্রভাবসঞ্চারী হয়েছে, যার ফলশ্রুতি জোলা-র সৃষ্টিকর্ম, বিশেষত ২০ খণ্ডে সম্পূর্ণ *Rongon Macquart* (১৮৭১-১৮৯৩) উপন্যাসমালা। এখানে মানবিক অধিকারে বিশ্বাসী জোলা আধ্যাত্মিক সত্তাকে অস্বীকার করেছেন। অস্বীকার করেননি রক্তমাংসের দেহকে কেন্দ্র করে মানবমনের আশা-আকাঙ্ক্ষা-আসক্তি, বেশ্যাসক্তি, 'অন্তর্লীন পাশবিকতা', কামনা ও যৌনবুভুক্ষা, মদ্যাসক্তি, সর্বোপরি বেদনা ও আর্তনাদ। 'পজিটিভিস্ট, এভলুসনিস্ট ও মেটিরিয়ালিস্ট,'-রূপে যেমন জোলার আত্মঘোষণা ছিল, তেমনি আকাঙ্ক্ষা ছিল 'to be naturalist'। তাই বৈজ্ঞানিক অনুসন্ধান ছিল তাঁর অন্বিষ্ট। তথাপি সামগ্রিক অর্থে জর্জ লুকাসের তীক্ষ্ণ বিশ্লেষণে ধরা পড়ে, প্রকৃতিবাদী 'পরীক্ষামূলক' উপন্যাসে জোলা 'Writer' থেকে 'mere Spectator '-এ অবনমিত হয়েছিলেন। মার্কস-এঙ্গেলসের চিন্তাধারায় উদ্বুদ্ধ লাফার্গ ও বালজাকের প্রতিতুলনায়, আক্রমণাত্মক ভঙ্গিতে এই সিদ্ধান্তে এসেছেন, বাস্তবতা সম্বন্ধে জোলার দৃষ্টিভঙ্গি 'newspaper reporter' সদৃশ হয়ে গেছে। লুকাস ও লাফার্গের সমালোচনার অন্তঃসার অস্বীকার করা না গেলেও এবং জোলা সমালোচিত হলেও তাঁর লেখা *Germinal* (১৮৮৫) উপন্যাসে তাঁর শিল্পীসত্তার সততাকে প্রশংসা না করে পারা যায় না। এই উপন্যাস কয়লাখনির অভ্যন্তরে খনিশ্রমিকদের কীরূপ কর্মধারা, কীভাবে কয়লা কাটা হয়, কীভাবে খনির রন্ধ্রপথে জলের অনুপ্রবেশ ঘটে, ধ্বস নামে, যেমন পুঙ্খানুপুঙ্খ বর্ণিত হয়েছে, তেমনি রক্তাক্ত খনিশ্রমিকের ধর্মঘটের পূর্ণাঙ্গ চিত্রায়ণ ঘটেছে। শ্রেণীসমাজে যা স্বাভাবিক, তাই প্রতিফলিত হয়েছে সেকালের পটভূমিকায়, পরিস্ফুট হয়েছে একটি রাজনৈতিক প্রগতিবাদী দৃষ্টিভঙ্গি। তিনি ধনবাদী সমাজব্যবস্থার শোষণে পিষ্ট খনিশ্রমিকদের বঞ্চনা ও আর্তনাদের অবিকল প্রতিচ্ছবি এঁকেছেন, অগ্নিগর্ভ প্রতিবাদী খনিশ্রমিকদের প্রতিবাদী মিছিলের রুদ্ধশ্বাস বিবরণ দিয়েছেন, পাশাপাশি মালিকশ্রেণীর অভ্যন্তরে একটা 'মানুষ'কে খুঁজেছেন। এক্ষেত্রে পরিবেশবাদ বা যথাযথবাদ অর্থাৎ আলোচ্য প্রকৃতিবাদের বৈশিষ্ট্যে অন্বিত উপন্যাসে বাস্তববাদের ডাইমেনশন বেড়েছে, তাও অগ্রাহ্য করা যায় না।

লাফার্গ বা লুকাসের সমালোচনা সত্ত্বেও জোলার উপন্যাসে অন্তর্নিহিত রোমান্টিকতা, যা মূলত প্রকৃতিবাদী জোলারই স্ববিরোধিতা, তা তাঁর স্বীকারোক্তিতে সুস্পষ্ট। রোমান্টিকতার বাড়াবাড়ির প্রতিক্রিয়ায় বাস্তববাদ এবং সেই সূত্রে প্রকৃতিবাদের আত্মপ্রকাশ, একথা সত্য, কিন্তু প্রকৃতিবাদী সাহিত্যেও ক্লান্তিকর একঘেয়েমি দুর্লক্ষ্য নয়। জর্জ লুকাস দেখিয়েছেন, একদিকে পতনোন্মুখ ধনতান্ত্রিক সমাজের প্রতিমূর্তি অঙ্কন অপরদিকে তা থেকে শিল্পসম্মত উত্তরণের স্বপ্নে আবিষ্ট হওয়া— একটি অদ্ভুত রোমান্টিক দ্বৈততায় আক্রান্ত হতে হয়েছে ফরাসি প্রকৃতিবাদী সাহিত্যকে।

জোলা যেমন প্রকৃতিবাদী সাহিত্যের অগ্রনায়ক তেমনি এই পথের ভ্যানগার্ড বলা যায় মোপাসাঁকে। তাঁর *Une Vie* (১৮৮৩), *Bel-Ami* (১৮৮৫), *Pierre Jeam* (১৮৮৮), *Fort Comme la mort* (১৮৮৯) ইত্যাদি উপন্যাস ও দু'শ পাঁচশটিরও বেশি গল্পে প্রকৃতিবাদের অজস্র উপাদান ছড়িয়ে রয়েছে। 'স্বোপার্জিত, ব্যাধি ও Melancholia'-য় অভিশপ্ত ব্যক্তিজীবন; ফলে নারী সম্পর্কে, সমাজের নানাস্তরের মানুষ সম্পর্কে, জীবনের সর্ববিষয়ে রূঢ় সত্য উন্মোচনই ছিল তাঁর লক্ষ্য। তাঁর *Bel-Ami*-তে যেমন ফ্রান্সের 'অভিজাত সম্প্রদায়ের নৈতিক অধঃপাত' পূর্ণাঙ্গ রূপ পরিগ্রহ করেছে, তেমনি তাঁর যন্ত্রণাদগ্ধ হৃদয়ের রক্তাক্ত প্রতিবিম্বন ঘটেছে 'চর্বির গোলা' (Boul de Suit) গল্পে। তাঁর অসংখ্য গল্পের মধ্যে একটি আনুবীক্ষণিক

প্রক্রিয়ায় চরিত্রের উন্মোচনে বা রূপায়ণে মোপাসাঁর প্রকৃতিবাদী ভূমিকা নির্ধারিত হয়ে গেছে। তাঁর গল্পে অবলীলায় গণিকাপল্লী, গণিকাজীবন, নীচুতলার সমাজ স্থান পেয়েছে। কিন্তু ফ্লোবেয়ার বা জোলার মধ্যে রোমান্টিক মানসতা প্রত্যক্ষ বা প্রচ্ছন্নরূপে যদি বা পাওয়া যায়, মোপাসাঁর মধ্যে তা একান্তই দুর্লভ। 'অবক্ষয়িত নাগরিকতা' ও 'মনোব্যাধির আচ্ছন্নতা' হয়তো মোপাসাঁর গল্পকে প্রকৃতিবাদের অন্তঃসারে নিষিক্ত করে নেয়, তথাপি ছোটগল্পে তাঁর শিল্পচরিতার্থতা তলস্তয়ের দৃষ্টিতে মুগ্ধতা সঞ্চারিত করেছে।

ফ্লোবেয়ার, গঁকুর ভ্রাতৃদ্বয়, জোলা, মোপাসাঁই নয়, মার্কিন সাহিত্যেও প্রকৃতিবাদ বিলম্বে হলেও বিকাশ ঘটেছে হ্যামলিন গ্যারল্যণ্ড, স্টিফেন ক্রেন, ফ্রাঙ্কনরিস এবং জ্যাক লণ্ডন-এর এবং সাহিত্যকর্মে জার্মান সাহিত্যে ইমারমান, গুস্তাফ ফ্রিস্টাকের উপন্যাসে কিংবা রুশি বুনিনের *The Vigil* শীর্ষক ব্যতিক্রমী উপন্যাসে।

এভাবেই সমাজবিকাশের ধারায় পুরোনো ও নতুন সমাজব্যবস্থার দ্বন্দ্বে, ব্যবস্থার অন্তর্গত শ্রেণীদ্বন্দ্বে, যুদ্ধ ও অর্থনৈতিক সংকটে, মূল্যবোধের রূপান্তরে, অতীন্দ্রিয়তায় ঋদ্ধ রোমান্টিক রবীন্দ্রসাহিত্যের বিরোধিতায় বাংলা গল্প-উপন্যাসে দখল নিল বাস্তবতা, অনিবার্য সূত্রে প্রকৃতিবাদ, যান্ত্রিক-প্রকৃতিবাদ ও বিষণ্ন-বাস্তবতা। 'রিয়ালিটির কারিপাউডার' ছড়িয়ে দেওয়া হল সাহিত্যের আঙিনায়। গোগোল্-পুশকিন-তলস্তয় থেকে গোর্কি যেমন স্বীকৃত হল, তেমনি বালজাক ফ্লে াবেয়ার-জোলা-মোপাসাঁ সাদরে গৃহীত হল। নুট হামসুনও বাদ গেলেন না। যুদ্ধোত্তর কালের অর্থনৈতিক বিপর্যয় ও সমস্যা, আশাহীনতা, জীবন সম্পর্কে প্রচলিত দৃষ্টিভঙ্গির প্রতি বিদ্রোহ দ্রুত গ্রাস করতে থাকে প্রকৃতিবাদী সাহিত্য-রচয়িতাদের সৃষ্টিসমূহ। এমিল জোলার ঘোষণাই যেন ঘুরে ফিরে বেজে উঠতে থাকে, "The metaphysical man is dead ; our whole demand is transformed with the coming of the Physiological man." রচিত হতে থাকে— *বেদে, বিবাহের চেয়ে বড়ো, প্রাচীর ও প্রান্তর* (অচিন্ত্যকুমার); *রতি ও বিরতি, অসাধু সিদ্ধার্থ* (জোগদীশ গুপ্ত); *এরা ওরা আরও অনেকে, রাত ভো'রে বৃষ্টি* (বুদ্ধদেব বসু) ; কিংবা কারও ভাবনায় তারাশঙ্করের *হাঁসুলী বাঁকের উপকথা;* মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়ের *পদ্মানদীর মাঝি, পুতুল নাচের ইতিকথা* বা কোনো সন্ধানী দৃষ্টিতে বিভূতিভূষণের *অশনি সংকেত;* প্রেমেন্দ্র মিত্রের বিকৃত ক্ষুধার ফাঁদে, সংসার সীমান্তে, অপগত; নারায়ণ গঙ্গে াপাধ্যায়ের '*টোপ*', '*হাড়*', গল্প বা উপনিবেশ-এর আখ্যান; সমরেশ বসুর *প্রজাপতি, বিবর;* সর্বোপরি শৈলজানন্দ মুখোপাধ্যায়ের কয়লাকুঠির গল্পগুলি। শৈলজানন্দর কয়লাকুঠি পাঠে জোলা ও তাঁর *জার্মিনাল* মনে পড়া স্বাভাবিক।

যৌনমনস্কতা, নৈরাশ্য, তিক্ততা, ঘৃণা, নারী-সম্পর্কিত ভাবনার রূপান্তর, জৈব তাড়না, 'পাপের দিকটার চিত্রণ'— সব মিলিয়ে বাংলা সাহিত্যে প্রকৃতিবাদী সাহিত্যের প্রভাব অস্পষ্ট রইল না। জোলা প্রমুখের এ-ধরনের প্রভাব রবীন্দ্রনাথ অথবা শরৎচন্দ্রের আকাঙ্ক্ষিত ছিল না। 'প্রকৃতি বা স্বভাবের হুবহু নকল করা photography হতে পারে, কিন্তু সে কি ছবি?' শরৎচন্দ্রের এ প্রশ্ন সংগত কারণেই তাঁর মনোধর্ম অনুযায়ী উচ্চারিত হয়েছে, কেননা তিনি মানতেন 'Art জিনিসটা মানুষের সৃষ্টি, সে Nature নয়।' রবীন্দ্রনাথ— শরৎচন্দ্রের বিরোধিতার জন্যই নয়, সাহিত্য ও সমাজসম্পর্ক, দেশকাল-পরিবেশের কার্যকারণেই এ অবস্থা বেশিদিন বাংলা সাহিত্যে বিরাজ করেনি। শুধু বাংলা সাহিত্যে নয়, সামগ্রিক অর্থেই প্রকৃতিবাদী সাহিত্য-আন্দোলন আন্তর্জাতিক স্তরেও দীর্ঘজীবী হতে পারেনি। তবে এই ঐতিহাসিক সাহিত্য-আন্দোলন আমাদের চিন্তাজগতে প্রভূত আলোড়ন সৃষ্টি করেছে, সমৃদ্ধ করেছে শিল্পের দিক থেকেই বাস্তববাদকে।

সমাজতান্ত্রিক বাস্তবতা

বাস্তবতার এক অন্য উদ্ভাস

সংলাপ সরকার

'সমাজতান্ত্রিক বাস্তবতা (Socialist Realism) একটি বিশেষ সাহিত্যবিধি। এর উদ্ভব ঘটেছিল বিশ শতকের তিনের দশকে সোভিয়েত ইউনিয়ন রাষ্ট্রে। 'বাস্তবতা'-র যে বিশেষ ধারায় নিম্নবিত্তের দুর্দশাসঙ্কুল জীবনের অবিকল উপস্থাপনার পাশে তাদের সংহত জীবনসংগ্রাম ও সুনিশ্চিত বিজয়ের অঙ্গীকার ঘোষিত হয়েছিল, তা-ই 'সমাজতান্ত্রিক বাস্তবতা' নামক বিশেষ সাহিত্যবিধির সূচনা করে। সাহিত্যে বাস্তবতা-র যে ধারণা প্রচলিত, তার থেকে পৃথক একটি পথের সন্ধান দেওয়াই এই শিল্পাদর্শের লক্ষ্য। 'বাস্তবতা' (Realism) শব্দটি দর্শনশাস্ত্রে প্রথম ব্যবহৃত হয়। প্লেটোর *রিপাবলিক* গ্রন্থে বাস্তবতার বিষয়টি আলোচিত হয়েছে। 'বাস্তবতা' বলতে সাধারণভাবে জীবন ও প্রকৃতির যথাযথ ও বিশ্বস্ত উপস্থাপনকেই বোঝানো হয়ে থাকে। কথাসাহিত্য, বিশেষত উপন্যাস তার জন্মলগ্ন থেকেই বাস্তবতাকে উপস্থাপিত করার প্রবণতা দেখিয়েছে। অষ্টাদশ শতকের ইংরেজ ঔপন্যাসিকেরা (ডিফো, রিচার্ডসন, ফিল্ডিং, স্টার্ন, অস্টেন প্রমুখ) এবং উনিশ শতকে রুশ কথাসাহিত্যিকেরা (তুর্গেনেভ, দস্তয়েভস্কি, তলস্তয়, চেকভ প্রমুখ) বাস্তবতাবাদী উপন্যাস রচনা করতে থাকেন। ফরাসি কথাসাহিত্যিক স্তাঁদাল এবং বালজাক-এর দ্বারা চর্চিত হতে হতে ফ্রান্সে উনিশ শতকের মধ্যভাগে জন্ম নেয় বাস্তবতাবাদী আন্দোলন। ১৮৫৫-তে চিত্রকর গুস্তভ কুরবে তাঁর চিত্রপ্রদর্শনীর প্রবেশপথের উপর লিখে দেন 'Du Re'alisme' শব্দটি। ১৮৫৬ থেকে প্রকাশিত হতে থাকে গুস্তভ ফ্লবেয়ারের বিখ্যাত বাস্তবতাবাদী উপন্যাস *মাদাম বোভারি*। 'বাস্তবতাবাদ' নামক বিশেষ আন্দোলনটি দীর্ঘায়ু হয়নি। কিন্তু সাহিত্যে বাস্তবতার দাবি কোনোদিনই নিঃশেষিত হয়নি। পরিবর্তমান সময়ের প্রেক্ষিতে শুধু তার প্রকাশভঙ্গির বদল ঘটেছে মাত্র। 'সমাজতান্ত্রিক বাস্তবতা' বাস্তবতারই একটি বিশেষ রূপের প্রকাশ।

'সমাজতান্ত্রিক বাস্তবতা'-র সঙ্গে 'সমাজতন্ত্র' ধারণাটির (Socialism) ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক রয়েছে। সমাজতন্ত্রবাদ-এর কোনো সর্বজনগ্রাহ্য সংজ্ঞা নির্ধারণ করা দুরূহ[১]। এর মূল উদ্দেশ্য হল দারিদ্র্য দূরীকরণ তথা শ্রেণিবৈষম্যের বিনাশসাধন। এর জন্য সর্বাগ্রে প্রয়োজন ব্যক্তিগত সম্পত্তির বিলুপ্তি। উৎপাদনে ব্যক্তিগত স্বত্ব

থাকবে না। তা হবে সামাজিক এবং রাষ্ট্রীয় কর্তৃত্বাধীন। সমাজতন্ত্রের প্রবক্তারা মনে করতেন, সমাজের সার্বিক উন্নতি শুধুমাত্র আইনগত সাম্য এবং রাজনৈতিক অধিকার লাভ করলেই হয় না। এরজন্য প্রয়োজন আর্থিক সমতা। অর্থনীতি এমনভাবে সংগঠিত করতে হবে, যাতে সকলের জন্য সমান সুযোগ উন্মুক্ত হয়।

অতএব 'সমাজতান্ত্রিক বাস্তবতা', বাস্তবের অবিকল প্রতিরূপ নয়। এটি স্পষ্ট করে তুলতে চায় প্রতিবন্ধ-অপসরণকারী মানুষের ক্রমবিকাশকে, মানবপ্রগতিকে। মূলত কার্ল মার্কস (১৮১৮-১৮৮৩)-এর সমাজতন্ত্র সম্পর্কিত মতবাদের উপর ভিত্তি করে এই সাহিত্যবিধি গড়ে উঠেছে। মার্কস বলেছিলেন, মানবসমাজের ইতিহাস হল শ্রেণিসংগ্রামের ইতিহাস। এই সংগ্রামের পরিণতিতে সর্বহারা শ্রেণি পুঁজিবাদের পতন ঘটাবে এবং সর্বহারার একনায়কত্ব প্রতিষ্ঠা করবে। শ্রমিকবিপ্লব পূর্ণতা পেলে শ্রেণিহীন সমাজ গড়ে উঠবে এবং রাষ্ট্রের বিলুপ্তি ঘটবে। সমাজতান্ত্রিক সমাজে নিয়ত ঘটমান বৈপ্লবিক ক্রমবিকাশ যে কার্যকারিতার মধ্য দিয়ে সত্য হয়ে ওঠে, তাকেই প্রতিষ্ঠিত করার দায়িত্ব নিয়েছে 'সমাজতান্ত্রিক বাস্তবতা'।

১৯২৪-এ সোভিয়েত ইউনিয়নের জন্ম হয়। সফল রুশ বিপ্লব (১৯১৭)-এর মধ্যে দিয়েই সেখানে সমাজতন্ত্র প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল। দেশের সমাজতন্ত্রকে গড়ে তোলার প্রশ্নে সাহিত্যিকদের দায়বদ্ধতা নিয়ে ভাবনাচিন্তাও শুরু হয়েছিল। ১৯৩০ থেকেই 'সমাজতান্ত্রিক বাস্তবতা' বিষয়টি পার্টির বুদ্ধিজীবীদের দ্বারা আলোচিত হতে থাকে। এইসব আলোচনাগুলিকে একটি সংঘবদ্ধ ও সার্থক প্রয়াসে রূপান্তরিত করার প্রত্যাশা নিয়ে ১৯৩২ সালের এপ্রিল মাসে গঠিত হয় 'সোভিয়েত লেখক সংঘ'। বলা হয়, দেশের সমস্ত লেখক এই সঙ্ঘের অন্তর্ভুক্ত হবেন। এঁরা বাস্তবতার উপস্থাপন ঘটাবেন সঠিক ঐতিহাসিক দৃষ্টিকোণ থেকে এবং এঁদের অভিপ্রায় চালিত হবে ভবিষ্যতের দিকে। তার বৈপ্লবিক বিকাশের স্তরগুলিকে এক নিরন্তর সমগ্রতায় ও কুণ্ঠাহীন সদর্থক উপলব্ধির মধ্যে ধারণ করতে প্রবুদ্ধ হবেন এঁরা। ১৯৩২-এ সোভিয়েত সংবাদমাধ্যম 'সমাজতান্ত্রিক বাস্তবতা' বিষয়টি জনসমক্ষে আনে (Literaturnia Gazeta, May 23)। ১৯৩৪ সালের ১৭ অগস্ট 'সোভিয়েত লেখক সংঘ'-র প্রথম সম্মেলনে রাষ্ট্রীয় তত্ত্ব রূপে 'সমাজতান্ত্রিক বাস্তু বতা' গৃহীত হল। সম্মেলনে 'সমাজতান্ত্রিক বাস্তবতা'-র সংজ্ঞা দিতে গিয়ে বলা হয় "as a method aimed at giving a truthful reflection of reality in its constant revolutionary development"[২] সম্মেলনে স্বাগত ভাষণ দিয়েছিলেন সোভিয়েত কমিউনিস্ট পার্টির কেন্দ্রীয় কমিটি র সম্পাদক এ. এ. ঝানভ। সভাপতিরূপে মাক্সিম গোর্কি (১৮৬৮-১৯৩৬) 'সোভিয়েত সাহিত্য' শীর্ষক বক্তৃতা দেন। সেই বক্তৃতা থেকেই এই সাহিত্যতত্ত্বের লক্ষণগুলি স্পষ্ট হয়। তাঁর মতে 'সমাজতান্ত্রিক বাস্তবতা' হল পৃথিবী পুনর্গঠনকারী জনগণের 'বাস্তবতা'। তা করতে গিয়ে লেখক কেবল ঐতিহ্যবাহী বাস্তবতাবাদীদের মতো 'প্রকৃতি ও মানবের নিরীক্ষক' অথবা 'জীবনের সমালোচক' মাত্র হবেন না। তাঁর দায়িত্ব হবে "to participate directly in the construction of a new life, in the process of changing the World।"[৩] গোর্কি বলেছিলেন বুর্জোয়াদের মধ্যে দুধরনের লেখক রয়েছেন। এঁদের অধিকাংশই নিজেদের শ্রেণির প্রশংসক ও পরিপোষক। কিন্তু স্বল্প কিছুর রচনা জন্ম দিয়েছে বিচারী (critical) বাস্তবতার। এঁরা নিজেদের শ্রেণির শ্বাসরোধী অবস্থাটি উপলব্ধি করেছেন এবং শ্রেণিচ্যুত হবার প্রয়োজনীয়তাও বুঝেছেন। কিন্তু কোনো পথের সন্ধান দিতে পারেন নি। কারণ এঁদের মধ্যে সমাজতান্ত্রিক চেতনার স্ফুরণ ঘটেনি। আসলে প্রতি মুহূর্তের

প্রত্যক্ষটাই পরিপূর্ণ বাস্তব নয়। তার আগে থাকে অতীত। পরে ভবিষ্যৎ। গোর্কি বুর্জোয়াদের অতীতপ্রীতির সমালোচনা করেন। কিন্তু সঙ্গে সঙ্গে এ-ও বলেন সোভিয়েত লেখকদেরও অতীত জানতে হবে। তবে সেই জানাটা হবে মার্কস-লেনিন-স্তালিনের শিক্ষাসম্মত উপায়ে। সেই শিক্ষা জানায়, মানবসমাজের ভিত হচ্ছে তার উৎপাদন সম্পর্কসমূহের সামগ্রিক যোগফল, অর্থাৎ অর্থনৈতিক ব্যবস্থা। প্রত্যেক উৎপাদন ব্যবস্থাই অস্থায়ী এবং স্তর থেকে স্তরে সংঘর্ষের মধ্য দিয়ে তা উন্নততর হয়। এই বিরোধ ও সংঘর্ষগুলিই ইতিহাসকে পরিবর্তিত করে। ইতিহাসের বাস্তববাদী ব্যাখ্যা দেখিয়ে দেয় উৎপাদন ব্যবস্থার পরির্তনের মধ্য দিয়েই ইতিহাসের অগ্রগমন ঘটে। সমাজ আমূল বদলায়। সাহিত্যিক ও শিল্পীর কাজ হবে ইতিহাসকে এগিয়ে দেওয়ার কাজে সাহায্য করা। কারণ অর্থনেতিক বুনিয়াদের উপর ভিত্তি করেই গড়ে ওঠে আইনগত, রাজনৈতিক আর নন্দনতাত্ত্বিক মতাদর্শ— যাদের একসঙ্গে বলা হয় উপরিকাঠামো। এই উপরিকাঠামো তার অর্থনৈতিক অবস্থানের উপর নির্ভরশীল ঠিকই, কিন্তু নিষ্ক্রিয় এবং উদাসীন নয়। উপরিকাঠামোর কাজ হল অর্থনৈতিক ভিতকে শক্ত করা এবং গতপ্রায় বুনিয়াদের বিনাশকে অনিবার্য করা। তাই শাসকশ্রেণির বিরুদ্ধে শ্রেণিসংগ্রামের পরেই তাকে স্থায়িত্ব দিতে প্রয়োজন সাংস্কৃতিক বিপ্লব— নতুন যুগের মতাদর্শ। 'সমাজতান্ত্রিক বাস্তবতা' সেই নবযুগের শিল্পাদর্শ। আর বুনিয়াদের বিপ্লবী পরিবর্তনসাধনের প্রয়াসের সমান্তরালেই এই শিল্পাদর্শটি প্রযুক্ত হতে পারে। কারণ বুনিয়াদ গঠনের সংগ্রামের সঙ্গে সঙ্গে সংস্কৃতির সংগ্রাম প্রয়োজনীয়, সংগ্রামী সংগঠনটিকে শক্তিশালী করে তোলার জন্য। তাই 'সমাজতান্ত্রিক বাস্তবতা' নতুন সমাজব্যবস্থা গড়ে তোলার সংগ্রামে এক পরিপূরক সমাজভাবনা। সুতরাং অতীতকে ভুলে না গিয়ে বৈজ্ঞানিক যুক্তি-বিচারের সাহায্যে লেখক ভবিষ্যতের দিশা দেবেন। এই সবটা নিয়েই 'সমাজতান্ত্রিক বাস্তবতা'। এখানে 'খণ্ডিত' বর্তমানের কোনো দাম নেই।

'সমাজতান্ত্রিক বাস্তবতা'-র কোনো নির্দিষ্ট সংজ্ঞা নেই। ১৯৩৪-এর সম্মেলনে গোর্কির সহকারী বক্তা এবং পার্টির লেনিনীয় প্রচার বিভাগের কার্যনির্বাহী এ আই স্টেটস্কি বলেন, "....Socialist Realism is not some set of tools that are handed out to the writer for him to make a work of art with."[৪] আসলে গোর্কি প্রমুখের দ্বারা এই তত্ত্বের কোনো আকস্মিক উদ্ভব ঘটেনি। উনিশ শতকের তিনের দশকে ব্রিটেনের চার্টিস্ট 'আন্দোলন', সাতের দশকে ফ্রান্সের 'পারি কমিউন'-এর বিপ্লবী কবিদের কাব্যে, বেলিনস্কি, প্লেখানভ, দোব্রোলিউবভ, ভরনস্কি প্রমুখ দার্শনিকের রচনায় এবং সর্বহারা সাহিত্যধারা-য় ও বিশ শতকে রাশিয়ার প্রোলেট-কাল্ট আন্দোলনে এই সাহিত্যবিধির বহু প্রবণতা অসংবদ্ধভাবে নিহিত ছিল। 'সর্বহারা' সাহিত্যে বুর্জোয়া সমাজে শ্রমজীবী শ্রেণির দুঃখদুর্দশা এবং তাদের মধ্যে বৈপ্লবিক জয়যাত্রার কথা প্রচারের সুরে বলা হত। মার্কসীয় চিন্তাধারায় উদ্বুদ্ধ এই সাহিত্যিকদের প্রধান কাজ ছিল শ্রমিক শ্রেণিকে সংহত করে তাদের মধ্যে বিপ্লবের চেতনা জাগিয়ে তোলা। পরবর্তীকালে রাশিয়া যখন গণ্য হতে লাগল সমাজতান্ত্রিক বিপ্লবের পীঠস্থান রূপে, তখনই 'সর্বহারা' সাহিত্যধারাটিকেই আরও পরিকল্পিতভাবে জীবনের বিস্তৃত বাস্তবতায় রোপণ করে দেওয়া হল তত্ত্বের আকারে। বিপ্লবের অগ্রগতির সঙ্গে সঙ্গে সুন্দর সমাজতান্ত্রিক ভবিষ্যতের স্পষ্ট সোপানগুলির আশাবাদে দীপ্ত চিত্রণ এই সাহিত্যবিধির অভীষ্ট। বাঙালি বুদ্ধিজীবী এই তত্ত্বটিকে সংজ্ঞায়িত করতে গিয়ে বলেছেন "সমাজতন্ত্রী বাস্তবতা শিল্পীর থেকে দাবী করে বৈপ্লবিক বিকাশে বিকাশমান বাস্তবের সত্যভাবে ও ঐতিহাসিকভাবে প্রত্যক্ষ প্রকাশ। তদুপরি সেই প্রকাশের সত্যতা ও ঐতিহাসিক পূর্ণতার সঙ্গে চাই শ্রমজীবী মানুষকে সমাজতন্ত্রী চেতনায়

শিক্ষাদানের ও মতাদর্শগত রূপান্তরের দায়িত্ব পালন।"[৫] এর লক্ষণগুলি ব্যাখ্যা করতে গিয়ে বলা হয়েছে "এক, মানুষকে এবং সমাজকে এই বাস্তবতার পদ্ধতি ধরবার চেষ্টা করবে তার দ্বান্দ্বিকতা এবং বিবর্তনের সূত্র অনুযায়ী পরিপূর্ণ বিকশিত রূপে অথবা বিকাশোন্মুখ প্রক্রিয়ায়। মানুষ বা সমাজ কোনো কিছুকেই খণ্ডিতভাবে তা দেখবে না। দুই, সমাজতান্ত্রিক বাস্তবতায় জনগণের সামূহিক কল্যাণের আদর্শ প্রচারিত হবে। তা হবে আন্তর্জাতিকতাবোধসম্পন্ন, বৈপ্লবিক এবং আশাবাদী।"[৬] এবং "গোর্কির ভাষণটি থেকে 'সমাজতান্ত্রিক বাস্তবতা'র অভিমুখী সাহিত্যের আরো যে-সব লক্ষণ পাওয়া যায় তা হল— জীবনের প্রতি বিশ্বস্ততা, আঙ্গিক সম্পর্কে পরীক্ষানিরীক্ষার প্রতি অনীহা, ধর্মীয় ভাবাবেগ, যৌন বিষয় এবং ব্যক্তিগত অনুভূতির মধ্যে মগ্নতার প্রবণতা পরিহার, সমাজের সংঘর্ষগুলিকে অগ্রসরতার সোপান রূপে দেখানো, সুন্দর আশাবাদী ভবিষ্যৎ পৃথিবীর চিত্রাঙ্কন, সামাজিক ক্ষেত্রে এক প্রগতিমূলক বিশ্বাসকে ধরে রাখা।"[৭] সমাজতান্ত্রিক বাস্তবতা-র দার্শনিক ভিত্তিটি দুটি মৌলিক তত্ত্বের উপর ভিত্তি করে গড়ে উঠেছে। প্রথমটি দার্শনিক লুডউইগ-ফয়েরবাখ-এর উপর মার্কস-এর 'একাদশ সন্দর্ভ'। মার্কস-এর বক্তব্য ছিল : দার্শনিকেরা কেবল বিশ্বকে বিভিন্ন উপায়ে ব্যাখ্যা করতে পারেন। কিন্তু প্রয়োজনীয় বিষয়টি হল এর পরিবর্তনের উপায় অনুসন্ধান। অর্থাৎ বাস্তবতাকে প্রতিষ্ঠিত করতে হবে বৈপ্লবিক ক্রমবিকাশের মধ্য দিয়ে। দ্বিতীয়টি হল লেনিনের 'প্রতিফলনতত্ত্ব'। লেনিন-এর তত্ত্বে বাস্তবতার নৈর্ব্যক্তিক উপস্থাপনের মাধ্যমে জীবনের সত্য রূপের (Life as it is) প্রতিফলন ঘটানোর কথা বলা হয়েছে। এই সত্য রূপটিকে ব্যাখ্যা করতে গিয়ে তিনি বলেছিলেন, এটি বস্তু পৃথিবীর হুবহু প্রতিফলন নয়। কারণ, মানুষ একটি সক্রিয় কারক— সে প্রকৃতিকে নিজের সক্রিয়তা দ্বারা পরিবর্তিত করার ক্ষমতা ধরে। সেইসঙ্গে একটু একটু করে বদলাতে থাকে তার চৈতন্যও। শিল্প তাই ব্যক্তির উপরে বস্তুর প্রভাব শুধু নয়, নয় কেবল ব্যক্তিমানসের সর্বগ্রাসী আত্মপ্রকাশ। বস্তু ও ইন্দ্রিয়ের দ্বান্দ্বিক সমন্বয়ে শিল্প ক্রমশ সাবয়ব হয়ে ওঠে। তাই 'সমাজতান্ত্রিক বাস্তবতা' 'বাস্তব' বলতে কোনো জড় বস্তুজগৎকে বোঝায়নি। এর 'বাস্তব' অহরহ পরিবর্তনশীল তৎপরতায় ক্রমবিকাশমান। তার উদ্দেশ্য হল সাবেক সমাজবাস্তবের পরিবর্তন ঘটিয়ে জীবনযাত্রার অভীষ্ট রূপদান (Life as it should be)।

'সমাজতান্ত্রিক বাস্তবতা'-র সর্বোত্তম দৃষ্টান্ত রূপে বিবেচিত হয়েছে গোর্কি-র *মাদার* (১৯০৭) উপন্যাসটি। নন্দনতাত্ত্বিক পদ্ধতি হিসেবে তত্ত্বটি গৃহীত হওয়ার অনেক আগেই এটি তার একটি ফলিত নিদর্শন। ১৯০৫-এর রুশ বিপ্লবের প্রেক্ষাপটে এর কাহিনি গড়ে উঠেছে। এতে দেখানো হয়েছে কেবলমাত্র বৈপ্লবিক শ্রেণিসংগ্রামের পথেই শ্রমিক-কৃষক শ্রেণির দুর্দশা দূর হতে পারে। মা পেলাগেয়া নিলভনা ভ্লাসভা প্রথমে ছিলেন মাতাল স্বামীর শঙ্কিত স্ত্রী। কিন্তু তার পরে এই ঘৃণ্য জীবনধারা ত্যাগ করে তিনি বেছে নিলেন বিপ্লবের পথ। মা-এর এই পুনরুজ্জীবন বিপ্লবের অবশ্যম্ভাবী জয়যাত্রার ঘোষণা। কার্যত এই পথেই আরও দশ বছর পরে ১৯১৭-তে বিপ্লব জয়যুক্ত হয়েছিল। একই দৃষ্টিভঙ্গি নিয়ে লেখা গোর্কির অন্য দুটি উপন্যাস *আর্তামানভস বিজনেস* (১৯২৫) এবং *ক্লিম সামঘিন* (১৯২৫-৩৬)। অন্যান্য উল্লেখযোগ্য কীর্তিগুলির মধ্যে রয়েছে দ্মিত্রি ফুরমানভ-এর *চাপায়েভ* (১৯২৩) উপন্যাসটি। এটি *চাপায়েভ* নামক এক গেরিলা নেতার বীরত্বব্যঞ্জক কাহিনি। ফিওদর গ্লাদকভ-এর *সিমেন্ট* (১৯২৫) উপন্যাসে সমাজতন্ত্রী সোভিয়েতের পুনর্গঠনের রূপরেখা আভাসিত হয়েছে। বহিরাক্রমণ এবং অন্তর্ঘাত থেমে যাওয়ার পরে লেনিন নতুন অর্থনৈতিক নীতির মাধ্যমে বলশেভিক রাষ্ট্রটিকে পুনরুজ্জীবিত

করে তুলতে চেয়েছিলেন। সেই উদ্যোগেরই কথারূপ হল *সিমেন্ট*। আলেকজাণ্ডার ফাদিভ-এর *দা রুট* (১৯২৭) উপন্যাসটিতেও প্রাণবন্ত হয়ে উঠেছিল 'সমাজতান্ত্রিক বাস্তবতা'। এর কথাবস্তু সত্য ঘটনাশ্রিত। দূর প্রাচ্যে লাল ফৌজের একটি দল শ্বেত-কসাক ও জাপানিদের দ্বারা অবরুদ্ধ হয়ে পড়ে। কিন্তু মনোবল না হারিয়ে তারা প্রাণপণে সংগ্রাম করে। শেষ পর্যন্ত লেভিনসন-এর নেতৃত্বে উনিশজন শত্রুপক্ষের আবেষ্টন ভেদ করতে সক্ষম হয়। এই উনিশটি মানুষের বীরত্ব-দুর্বলতা, আশা-নিরাশাকে বাস্তব দৃষ্টিতে উপস্থাপিত করেছেন ঔপন্যাসিক। শেষপর্যন্ত স্থির লক্ষ্যে ও অবিচল প্রেরণায় তারা সাফল্য অর্জন করে। 'সমাজতান্ত্রিক বাস্তবতা'-র আর একটি গুরুত্বপূর্ণ উদাহরণ হল নিকোলাই অস্ত্রোভস্কি-র বিখ্যাত উপন্যাস *হাউ দ্য স্টিল ওঅজ টেমপার্ড* (১৯৩৫)। শ্রমিকসন্তান অস্ত্রোভস্কি ছিলেন যুদ্ধক্ষেত্র-ফেরৎ দৃষ্টিহীন প্রতিবন্ধী যুবক। তাঁর আত্মজীবনীমূলক উপন্যাসটির নায়ক পাভেল কর্চাগিন-ও একজন প্রতিবন্ধী। অক্টোবর বিপ্লবে আহত এই নায়ক প্রতিবন্ধকতা অতিক্রম করে লেখার কাজ বেছে নেয় এবং তার রচনার মধ্য দিয়ে দেশের পুনর্নির্মাণে অংশভাক্ হয়। কর্চাগিনের মধ্যে সোভিয়েত বিবেক সংহত এবং শিল্পিত রূপ ধারণ করেছিল। ভিতরে-বাইরে অস্থিরতা, বিশ্বাসঘাত-বহিরাক্রমণ মোকাবিলা করে যেমন মাথা তুলেছিল সমাজতন্ত্রের মহীরুহটি, কর্চাপিনও তেমন অফুরন্ত প্রাণশক্তিতে উদ্দীপ্ত। পরিপূর্ণ বিশ্বাসের জোরে শারীরিক ও মানসিক বাধাকে সে অতিক্রম করতে সক্ষম হয়। বহু বছর ধরে এই বইটি সোভিয়েতের পুনর্গঠনে প্রেরণা জুগিয়েছিল। উপন্যাস বাদে ভ্লাদিমির মায়াকোভস্কির কাব্য 'ভ্লাদিমির ইলিচ লেনিন' এই ধারার অন্যতম একটি দৃষ্টান্ত।

সোভিয়েত এবং পূর্ব ইউরোপের শ্লাভ দেশগুলিতে সাহিত্যের পাশাপাশি সঙ্গীত এবং চিত্রকলার ক্ষেত্রেও সরকার-অনুমোদিত নন্দনতত্ত্ব রূপে 'সমাজতান্ত্রিক বাস্তবতা' গৃহীত হয়েছিল। অন্যান্য সমকালীনদের মধ্যে ফরাসি কবি-ঔপন্যাসিক লুই আরাগঁ ছিলেন 'সমাজতান্ত্রিক বাস্তবতা'-র উৎসাহী সমর্থক। ১৯৩৫-এ প্রকাশিত *Pourum re'alisme Socialiste* (For socialist realism) বইতে 'সমাজতান্ত্রিক বাস্তবতা'-র প্রতি আরাগঁ তাঁর সমর্থন জ্ঞাপন করেন। শ্রেণিসংগ্রামের মধ্য দিয়ে সর্বহারার জয়লাভের তত্ত্বটি প্রকাশিত হয়েছে তাঁর চারখণ্ডের উপন্যাস *Le Monde re'el* (১৯৩৩-৪৪)-এ। তাঁর ছয়পর্বের উপন্যাসমালা *Les communistes* (১৯৪৯-৫১)-এ রয়েছে পার্টির অভিভাবকত্বে 'সমাজতান্ত্রিক বাস্তবতা' বিকাশের একটি তাৎপর্যময় বিশ্লেষণ। মার্কিন ঔপন্যাসিক হাওয়ার্ড ফাস্ট তাঁর *ফ্রিডম রোড* (১৯৪৪) এবং *স্পার্টাকাস* (১৯৫১) উপন্যাস দুটিতে মূর্ত করে তুলেছিলেন 'সমাজতান্ত্রিক বাস্তবতা'। *ফ্রিডম রোড* উপন্যাসটিতে দক্ষিণ-আমেরিকার কৃষ্ণাঙ্গদের স্বাধীনতাসংগ্রাম বর্ণিত হয়েছে। খ্রিস্টপূর্ব প্রথম শতকে রোমান সাম্রাজ্যে সংগঠিত ক্রীতদাস বিদ্রোহ হল *স্পার্টাকাস* উপন্যাসের বিষয়। ১৯৫৪ সালে উপন্যাসটি 'স্তালিন পুরস্কার' লাভ করে। ডেনমার্কের লেখক মার্টিন আন্ডারসন নেক্সো বিশ্বাস করতেন 'সমাজতান্ত্রিক বাস্তবতা' হল ফ্যাসিবাদের বিরুদ্ধে সংগ্রামে একটি গুরুত্বপূর্ণ আয়ুধ। সোভিয়েতের সমাজতান্ত্রিক পুনর্গঠনের প্রতি নেক্সোর ছিল গভীর শ্রদ্ধা। তাঁর চারখণ্ডের উপন্যাস *পেলে দা কনকারার* (১৯০৬-১০), পেলে নামক এক শ্রমিকসন্তানের ক্রমবিকাশের কাহিনি। অবশেষে সে একজন বিপ্লবী শ্রমিকনেতায় পরিণত হয়। জার্মান নাট্যকার বের্টল্ট ব্রেশট তাঁর নাটকগুলিতে সমাজতন্ত্রের জয়লাভকে অনিবার্য করে তুলেছিলেন। এদিক থেকে তাঁর উল্লেখযোগ্য নাট্যকীর্তিগুলির মধ্যে রয়েছে *সেন্ট জন অফ দ্য স্টকইয়ার্ডস* (১৯৩১), *মাদার কারেজ অ্যান্ড হার চিলড্রেন*, (১৯৪১), *দ্য ককেশিয়ান চকসার্কল* (১৯৪৮)

এবং *দ্য গুড উওম্যান অফ সেন্টজুয়ান* (১৯৪৮)। ব্রাজিলীয় ঔপন্যাসিক জর্জ আমাডো এবং বুলগেরীয় কথাকার গিয়র্গি কারাশ্লাভভ উদ্বুদ্ধ হয়েছিলেন 'সমাজতান্ত্রিক বাস্তবতা'-র বাণীমন্ত্রে। পরবর্তীকালে নানা আলোচনা ও বিতর্কে তত্ত্বটিকে আরও সমৃদ্ধ করেন আনাতোলি লুনাচারস্কি, র‍্যালফ ফক্স, গিওর্গে লুকাচ, ক্রিস্টোফার কডওয়েল, বোরিস সুচকভ, ফিলিপ রাভ, গ্যালভোনো ডেল্লা ভোলপে, আর্নেস্ট ফিশার প্রমুখ।

'সমাজতান্ত্রিক বাস্তবতা' ছয়টি মূলনীতির উপর নির্মিত হয়েছিল। এগুলি হল (১) দলানুগত্য (Partynost) (২) গণমুখিতা ও জাতীয়তাবোধ (Narodnost) (৩) বিশুদ্ধি (Typicality) (৪) নতুন/কৃতসংকল্প নায়ক (Positive Hero) (৫) ঐতিহাসিকতা (Historicism) (৬) বৈপ্লবিক রোমান্টিকতা (Revolutionary Romanticism)। নতুন দিনের সাহিত্যের মূল্যায়ন করতে গিয়ে লেনিন 'পার্টিনস্ট'-এর উপর গুরুত্ব আরোপ করেন। সমাজতান্ত্রিক সমাজ গড়ার প্রশ্নে শিল্পী-সাহিত্যিকদের যে মৌলিক দায়বদ্ধতা— তাই হল 'পার্টিনস্ট'। 'নারোদনস্ট' বোঝাতে চেয়েছে গণমুখী কার্যক্রমের কথা। এর দুটি ভাগ। প্রথমত, শিল্পের দায় হল মানবপ্রগতির সঙ্গে অন্বিত গুরুত্বপূর্ণ বার্তাগুলিকে পাঠকের কাছে পৌঁছে দেওয়া। দ্বিতীয়ত, সেই কারণেই তাকে (শিল্প) হতে হবে জনগণের সঙ্গে সংযোগস্থাপনে ইচ্ছুক; সুতরাং শিল্পকে সহজবোধ্য করে তুলতে হবে। এই সমস্ত কার্যকলাপের মধ্য দিয়ে এই সাহিত্যতত্ত্বটি এমন এক জাতীয়তাবোধের জন্ম দেবে যা সীমাতিক্রমী আন্তর্জাতিক সাহিত্যান্দোলনে পরিণত হবে। 'টিপিকালিটি' দাবি করে সাহিত্যিক আদর্শ সামাজিক পরিবেশে আদর্শ চরিত্র সৃষ্টি করবেন। চরিত্রনির্মাণের এই পরিকল্পনাই জন্ম দিয়েছিল 'নতুন নায়ক'-এর। "...কর্মী, উদ্যোগী, যৌথমঙ্গলে আত্মদানে উন্মুখ, আবার কামনা বাসনায় মানবিকতায় সহজ, সুস্থ, স্বচ্ছন্দ— অন্যায়ের বিরোধী, অসংযমের বিরোধী, বিকৃতির শত্রু— এমনকি আত্মাভিমানের ও অন্তর্মুখিতার নামগন্ধ যার নেই— এমন নায়ক চাই। .....চাই সার্থক নায়ক, সদর্থক বা 'পজিটিভ হিরো'।"[৮] ১৯৩৪-এর বক্তৃতায় গোর্কি এই নায়ক-এর রূপরেখা দিয়ে বলেন 'As the principal hero of our books we should choose labour, i. e. a person, organised by the process of labour, who in our country is armed with the full might of modern technique, a person who, in his turn, so organizes labour that it becomes easier and more productive raising it to the level of an art।"[৯] প্রথম সোভিয়েত লেখক সম্মেলনে ঝানভ বলেছিলেন, নতুন সোভিয়েত সাহিত্যের নায়ক সবাই—যৌথ খামারচাষি, যুব কমিউনিস্ট, এঞ্জিনিয়র— যারা নতুন সমাজতন্ত্রকে গঠন করছে— সকলেই। এমন নায়কের প্রথম ধ্রুপদি উদাহরণটি হল গোর্কির *মাদার* উপন্যাসের পাভেল ভ্লাসভ। অন্যান্য কয়েকটি দৃষ্টান্ত হল ফাদিভ-এর *দ্য রুট*-এর লেভিনসন, অস্ত্রোভ্স্কির *হাউ দ্য স্টিল ওঅজ টেম্পা রড*-এর কর্চাগিন, শোলোকভ-এর *ভার্জিন সয়েল আপটার্নড*-এর দাভিদভ এবং *কোয়ায়েট ফ্লোজ দ্য ডন*-এর মেলেখভ এবং গ্লাদ্কভ-এর *সিমেন্ট* উপন্যাসের গ্লেব সুমালেভ।

ঐতিহাসিকতা, 'সমাজতান্ত্রিক বাস্তবতা'-র গুরুত্বপূর্ণ বৈশিষ্ট্য। ইতিহাস কেবল অতীতে সংঘটিত ঘটনাবলী মাত্র নয়। ঘটনাগুলি পরস্পরের থেকে বিচ্ছিন্নও নয়। অবিরাম দ্বান্দ্বিকতার মধ্যে দিয়ে তা বিকাশমান। এই ইতিহাসের গতি অতীত থেকে বর্তমানের মধ্য দিয়ে সম্ভাব্য ভবিষ্যতের দিকে। "সুতরাং এই মুহূর্তে যা দেখছি তার একটি অতীত বা ঐতিহ্য আছে এবং একটি অবশ্যম্ভাবী ভবিষ্যৎ আছে— যা বর্তমানের মতো প্রত্যক্ষ নয়— এই প্রত্যক্ষ এবং অপ্রত্যক্ষ সবটা নিয়েই পূর্ণাঙ্গ বাস্তব।"[১০] ইতিহাসের গতিতে যে তাৎপর্যমণ্ডিত আস্থা স্থাপিত

হয়েছে, তা 'ঐতিহাসিক আশাবাদ'-এর জন্ম দিয়েছে। তাই কোনো পরাজয় এবং ক্ষতিকেই তা খণ্ডিতভাবে দেখে না। ইতিহাসের শিক্ষা (দ্বান্দ্বিক ক্রমবিকাশ) ও তাৎপর্যকে গ্রহণ করে এটি পরম্পরা ও লোকশ্রুতিকে যথাযথ মর্যাদা দিয়েছে। গোর্কির মতে এই 'বাস্তবতা' হল দেশীয় তথা বিশ্বসংস্কৃতির প্রকৃষ্ট ঐতিহ্যগুলির উত্তরাধিকার। 'বৈজ্ঞানিক সমাজতন্ত্রবাদ' সমাজ পরিবর্তনের যে মূলসূত্র ও নিয়মগুলির নির্দেশ দেয় সেগুলির সাহায্যেই বর্তমান জীবনের পরিপ্রেক্ষিতে শিল্পী ফুটিয়ে তোলেন ভবিষ্যতের প্রভা। পুনর্গঠিত পৃথিবীর আশাবাদী চিত্রায়ণ রোমান্টিকতার জন্ম দেয়। ঝানভ একেই বলেছেন বৈপ্লবিক রোমান্টিকতা। সাধারণ রোমান্টিকতার সঙ্গে এর পার্থক্য নির্দেশ করে তিনি বলেছিলেন : "rupture with romanticism of old type, which depicted a non-existent life and non-existent heroes, leading the reader away from the antagonisms and opperssion of real life into world of utopian dreams. Our literature, which stands with both feet firmly planted on a materialist basis, cannot be hostile to romanticism, but it must be a romanticism of a new type, revolutionary romanticism."[১১] অনাগত দিনের এই সৃষ্টিশীল ভাষ্য রচনাকেই গোর্কি বলতে চেয়েছিলেন 'দ্য থার্ড রিয়ালিটি - দ্য রিয়ালিটি অফ দ্য ফিউচার'। এই রোমান্টিকতা কোনো অলীক স্বপ্নের অধরা ভুবনের আশায় বিভোর নয়। 'সমাজতান্ত্রিক বাস্তবতা'-র অন্যতম ভিত্তি হল এর বৈপ্লবিক এবং সক্রিয় 'সমাজতান্ত্রিক মানবতা'। কারণ এই 'বাস্তবতা' কাজ করে জীবনের পূর্ণ বিকাশের জন্য। তার জন্য প্রয়োজন প্রতিটি ব্যক্তিমানুষের অবাধ জীবনযাপনের পূর্ণ অধিকার অর্জন। 'সমাজতান্ত্রিক বাস্তবতা' প্রতিটি মানুষের এই অবিরাম বিকাশের অধিকারকে পরিপুষ্টি দেয়। মায়াকভ্স্কি একে বলেছিলেন 'পরিপূর্ণ মানবতা'। লুকাচ বলেছিলেন 'সমাজতান্ত্রিক মানবতা'। স্তালিন তাই বলতেন এই ধারার সাহিত্যকে আঙ্গিকে জাতীয় হলেও, বিষয়ে আন্তর্জাতিক হতে হবে। কারণ সারা বিশ্বের নিগৃহীত মানুষের সপক্ষে বলার দায়বদ্ধতা রয়েছে এই শিল্পাদর্শের, "Socialist humanism fosters the harmonious development of the individual, the full realization of each individuals, moral and spiritual potentialities, and a truly human attitude among people toward one another and toward nature and society."[১২] এই মহৎ দায়ভার লেখকদের উপর বর্তেছে বলেই স্তালিন তাঁদের বলতেন মানবাত্মার স্থপতি [Engineer of human souls]।

বাঙালি লেখক সমাজতান্ত্রিক রাষ্ট্রের নাগরিক ছিলেন না কোনোদিন। তাঁরা কোনও প্রকৃত সমাজতান্ত্রিক বিপ্লবের অংশভাক্ও হননি। ইউরোপীয়দের মতো ফ্যাসিবাদী নিপীড়নের চূড়ান্ত পাশবিকতা তাঁদের প্রত্যক্ষভাবে সহ্য করতে হয়নি। এদেশে ছিল না কোনো 'সর্বহারা' সাহিত্যের ঐতিহ্য। 'সমাজতান্ত্রিক বাস্তবতা'-র অনুশাসন মেনে সাহিত্যচর্চার বাধ্যবাধকতাও ছিল না তাঁদের। কিন্তু মনে রাখা প্রয়োজন 'সমাজতান্ত্রিক বাস্তবতা' আকস্মিকভাবে উদ্ভূত হয়নি। সমাজতন্ত্রে আস্থাশীল লেখক জ্ঞাতে-অজ্ঞাতে অনুসরণ করতে পারেন 'সমাজতান্ত্রিক বাস্তবতা'-র সাহিত্যতত্ত্ব। বাস্তবেও গোর্কির *মাদার* লেখা হয়েছিল ১৯৩৪-এর অনেক আগেই—এমনকী সফল রুশ বিপ্লব (১৯১৭)-এরও আগে। ভারতীয় সমাজও অদ্যাবধি শ্রেণিবিভক্ত। সেখানেও শোষণ একটি চিরকালীন ঘটমান সত্য। অষ্টাদশ শতকে ব্রিটিশ অধিকারে আসার পরে দীর্ঘকাল ধরে স্থাণু সামন্ততান্ত্রিক ভারতে শোষণের প্রকৃতি বদলাল কেবল। কারণ ভারত তখন পরিণত হয়েছে পুঁজিবাদী ব্রিটেনের উপনিবেশে। সামন্ততন্ত্রের জায়গায় এসেছে নব্য-

ধনতন্ত্র। উনিশ শতকে নবজিজ্ঞাসায় প্রবুদ্ধ বাঙালি বুদ্ধিজীবী স্থিতাবস্থা ভাঙতে চাননি। আবার ঔপনিবেশিক দেশে ঔপনিবেশিক প্রভুত্ব স্বীকার করেও তাঁরা সামাজিক ও অর্থনৈতিক অসাম্যের বিষয়ে বিলক্ষণ সচেতন ছিলেন। আন্তর্জাতিক কর্মকাণ্ড সম্পর্কে এঁরা যথেষ্ট ওয়াকিবহালও ছিলেন। এর প্রমাণ বঙ্কিমচন্দ্রের 'সাম্য' ও 'বিড়াল' প্রবন্ধ। কৃষক-শ্রমিক শ্রেণির দুঃখদুর্দশা এবং তাদের দাবিদাওয়া নিয়ে উনিশ শতকেই সরব হয়ে ওঠেন 'ইয়ং বেঙ্গল' ও 'ব্রাহ্ম' সম্প্রদায়। কিন্তু এগুলির সঙ্গে সমাজতান্ত্রিক সচেতনতার কোনো সংস্রব ছিল না।

বিশ শতকের দুইয়ের দশকে বাংলায় রাজনৈতিকভাবে মার্কসবাদ-এর চর্চা শুরু হয়েছিল। কিন্তু ঐ সময় থেকে মার্কসীয় তত্ত্বশাসিত কোনো সৃজনশীল লেখকগোষ্ঠীর আবির্ভাব ঘটেনি। শুরু হয়নি মার্কসীয় নন্দনতত্ত্বের আলোয় শিল্পসাহিত্যের বিচার। 'পরিচয়' পত্রিকায় সরোজ আচার্য লিখেছিলেন "বলশেভিজ্‌ম, বলশেভিক বিপ্লব, কমুনিজ্‌ম এসব বিষয় নিয়ে পড়াশোনা ভাবনা ১৯২১-২২ সন পর্যন্ত করিনি, করবার তাগিদ বোধ করিনি।.....তখন মোটামুটি এইটুকু মাত্র বুঝেছি স্বাধীনতার লড়াই-এ মজুর-চাষীকে টেনে আনা দরকার। বুঝিনি বলশেভিক বিপ্লব, বলশেভিজ্‌ম, কমুনিজ্‌মের তাৎপর্য তার চেয়ে অনেক বেশি।"[১৩] এই সময়ে ভারতবর্ষে মার্কসীয় চেতনাসংক্রান্ত যে-কোনো রকম সক্রিয়তার মূলেই ছিল আন্তর্জাতিক মননপ্রবাহের সঙ্গে সাযুজ্যে পৌঁছোনোর প্রেরণা। তাই রুশ বিপ্লব (১৯১৭)-এর তিন বছরের মধ্যেই তাসখন্দ-এ এবং ১৯২৫-এ ভারতের মাটিতে ভারতীয় কমিউনিস্ট পার্টি গঠিত হয়। মিরাট ষড়যন্ত্র মামলা (১৯১৯), কৃষকসভা (১৯৩৪) প্রতিষ্ঠা প্রভৃতির মধ্য দিয়ে কমিউনিস্ট পার্টি তার পরিচিতি বাড়াতে শুরু করে।

সুতরাং যে দ্বন্দ্বমূলক বস্তুবাদী দর্শন এর মৌল মানক, অতীত ইতিহাসের শিক্ষাকে সমকালের জীবন বাস্তবতায় সঞ্চারিত করে যা নিয়োজিত থাকে সংঘাতময় ভবিষ্যৎ জীবনের রূপরেখা রূপায়ণে— এই পারম্পর্যময় সুপরিকল্পিত সাহিত্য এই সময়পর্বে (দুইয়ের দশক) অবশ্যই রচিত হয়নি। কিন্তু 'নবযুগ' (১৯২০), 'ধূমকেতু' (১৯২২), 'সংহতি' (১৯২৩), 'কল্লোল' (১৯২৩), 'বিজলী' (১৯২৪), 'লাঙল' (১৯২৫), 'গণবাণী' (১৯২৬) 'কালিকলম' (১৯২৬) প্রভৃতি পত্রিকায় রুশ বিপ্লব, বলশেভিকবাদ, গোর্কি-লেনিনের জীবনী এবং নিম্নবিত্তের প্রতি সহানুভূতিব্যঞ্জক বহু গল্প-কবিতা-প্রবন্ধ প্রকাশিত হয়েছিল। এই দশকের দ্বিতীয়ার্ধ থেকে কেউ কেউ মার্কসীয় নন্দনতত্ত্বের স্বরূপ ব্যাখ্যাতে প্রবৃত্ত হন। এঁদেরই অগ্রণী ভূপেন্দ্রনাথ দত্ত। তাঁর প্রবন্ধগুলি ১৯৩২-৩৩-এ 'দেশ' ও 'আনন্দবাজার পত্রিকা'য় প্রকাশিত হয়েছিল। ১৯৩২-এ প্রকাশিত 'পরিচয়' পত্রিকা মার্কসবাদীদের সাহিত্য আলোচনার কেন্দ্র হয়ে উঠল। এখানে লিখতেন নীরেন্দ্রনাথ রায়, ধূর্জটিপ্রসাদ মুখোপাধ্যায়, সুশোভন সরকার, হিরণকুমার সান্যাল, হীরেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়, বিষ্ণু দে প্রমুখ।

১৯৩৬-এ বিশ্বব্যাপী ফ্যাসিবাদী আগ্রাসনের প্রতিবাদে গঠিত হয় 'ভারতীয় প্রগতি লেখক সংঘ'। ১৯৩৭-এ এঁরা প্রকাশ করেন 'প্রগতি' নামক সংকলন। ত্রিশের দশকে 'আনন্দবাজার পত্রিকা'কে কেন্দ্র করে গড়ে ওঠে মার্কসীয় সাহিত্যচর্চার অন্যতম কেন্দ্র 'অনামীচক্র'। এখানে লিখতেন সত্যেন্দ্রনাথ মজুমদার, অরুণ মিত্র, স্বর্ণকমল ভট্টাচার্য, বিনয় ঘোষ প্রমুখ। ১৯৩৯ সালে প্রকাশিত হয় কমিউনিস্ট পার্টি পরিচালিত প্রথম বাংলা পত্রিকা 'অগ্রণী'। তিনের দশকের শেষভাগ থেকেই বাংলা সাহিত্যের সৃজনশীল ধারায় সচেতনভাবে 'সমাজতান্ত্রিক বাস্তবতা' প্রয়োগের চেষ্টা করা হচ্ছিল। কৃষক-আন্দোলন এবং কৃষক জীবনকে ভিত্তি করে মনোরঞ্জন হাজরার *পলিমাটির ফসল* এবং *নোঙরহীন নৌকো* প্রকাশিত হয়। ১৯৩৯ সাল থেকে ট্রেড-

ইউনিয়ন নিয়ে লেখা বিশ্ব বিশ্বাসের মজদুর উপন্যাসটি 'অগ্রণী'-তে প্রকাশিত হতে থাকে। ১৯৩৯-এই প্রকাশিত হয় *গোপাল হালদারের একদা* উপন্যাস। এই উপন্যাসের নায়ক অমিতের জীবনপরিক্রমা 'ইন কোয়েস্ট অফ রিয়ালিটি'। পরবর্তী খণ্ডগুলিতে এই 'রিয়ালিটি' সে খুঁজে পায় সমাজতন্ত্রের মধ্যে। বাংলা কাব্য-কবিতার ক্ষেত্রেও এই সময় থেকেই অরুণ মিত্র, বিমল চন্দ্র ঘোষ, মণীন্দ্র রায়, সুভাষ মুখোপাধ্যায়, সমর সেন, মঙ্গলাচরণ চট্টোপাধ্যায়, জ্যোতিরিন্দ্র মৈত্র, চঞ্চলকুমার চট্টোপাধ্যায়, বিষ্ণু দে প্রমুখ কবি প্রত্যক্ষভাবে মার্কসীয় চেতনায় উদ্বুদ্ধ প্রগতিমুখী কবিতা লিখতে শুরু করেন। ১৯৩৮-এর 'আনন্দবাজার পত্রিকা'-র শারদীয় সংখ্যায় প্রকাশিত হয় দীনেশ দাসের 'কাস্তে' কবিতাটি, যার বিখ্যাত পংক্তিটি হল 'চাঁদের শতক আজ নহে তো' ' এ যুগের চাঁদ হল কাস্তে'। ঐ একই সংখ্যায় প্রকাশিত হয় সুভাষ মুখোপাধ্যায়ের 'চীন ১৯৩৭' কবিতাটি— যার এক একটি চরণ সাম্যবাদী ঘোষণায় উচ্চকণ্ঠ— 'লাল নিশানের নিচে উল্লাসী মুক্তির ডাক'। ১৯৩৯-এ 'অগ্রণী'-তে অরুণ মিত্র তাঁর 'লাল ইস্তাহার' কবিতায় লেখেন 'লাল অক্ষরে লটকানো আছে দ্যাখো নতুন ইস্তাহার'। এমন অনেক শ্রেণিচেতনাময়, ফ্যাসিবাদবিরোধী কবিতা রচিত হয়েছিল সমগ্র চারের দশক জুড়েই, যার অন্তঃপ্রেরণা ছিল 'সমাজতান্ত্রিক বাস্তবতা'।

এই সময় থেকে সমাজতন্ত্রবাদী সাহিত্যের লক্ষ্য নিয়ে বিতর্কের সূত্রপাত হয়। এগুলির মধ্যে বুদ্ধদেব বসু-সরোজ দত্ত, সরোজ দত্ত-সমর সেন বিতর্ক ছিল উল্লেখযোগ্য। ১৯৪০-এ পার্টি বেআইনি ঘোষিত হলে 'অগ্রণী' বন্ধ হয়ে যায়। ১৯৪১ থেকে 'অরণি' হয়ে ওঠে মার্কসবাদী ভাবনাচিন্তার প্রধান মুখপত্র। এই দশকের শুরুতে 'সমাজতান্ত্রিক বাস্তবতা'-র সচেতন দৃষ্টিভঙ্গি নিয়ে সাহিত্য সমালোচনায় নামেন বিনয় ঘোষ। তাঁর *শিল্প, সংস্কৃতি, সমাজ* ও *নূতন সাহিত্য সমালোচনা* গ্রন্থে তিনি আক্রমণ করেন অতুলচন্দ্র গুপ্ত, মোহিতলাল মজুমদার, বুদ্ধদেব বসু, অমিয় চক্রবর্তী প্রমুখের সাহিত্যিক মতাদর্শকে। রবীন্দ্রনাথ, তাঁর মতে ভাববাদী বুর্জোয়া মতাদর্শের বিপজ্জনক প্রবক্তা।

দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ (১৯৩৯-৪৫), মন্বন্তর (১৯৪৩), দাঙ্গা (১৯৪৬), এবং তাতে সোমেন চন্দের মৃত্যু ও ১৯৪২-এ 'ফ্যাসিবিরোধী লেখক শিল্পী সংঘ'-র প্রতিষ্ঠা, পার্টির জনযুদ্ধ নীতি, পিপলস-রিলিফ কমিটি (১৯৪৩) ও গণনাট্য সংঘ (১৯৪৩)-র প্রতিষ্ঠা, দেশভাগ ও খণ্ডিত স্বাধীনতা, ১৯৪৬-এ ডাক-তার ধর্মঘট, '৪৬-'৪৭-এ তেভাগা আন্দোলন প্রভৃতি ঘটনার মধ্য দিয়ে কমিউনিস্ট পার্টির কার্যকরী ও জনমনসচেতক রূপটি স্পষ্ট হয়ে ওঠে। ২৪ অক্টোবর, ১৯৪৪-এ অভিনীত হয় 'গণনাট্য সংঘ'-এর যুগান্তকারী নাটক, বিজন ভট্টাচার্যের *নবান্ন*। নাটকটিতে মূর্ত হয়েছে 'সমাজতান্ত্রিক বাস্তবতা'। ১৯৪৪-এ গণনাট্যের নাট্যাভিনয় দেখে ভারতীয় 'গণনাট্য সংঘ'-র স্যুভেনিরে ধূর্জটিপ্রসাদ মুখোপাধ্যায় লিখেছিলেন "আমাদের সংস্কৃতি সম্বন্ধে Socialist realism এতদিন আমার কাছে ধরতাই বুলি ছিল। আজ আর নেই।" চারের দশকে রচিত হয়েছিল একাধিক সাম্যবাদী চেতনায় উজ্জীবিত গল্প। এগুলির মধ্যে উল্লেখযোগ্য মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়ের 'হারাণের নাতজামাই', 'ছোট বকুলপুরের যাত্রী', 'টিচার' এবং 'শিল্পী', সোমেন চন্দের 'দাঙ্গা', 'ইঁদুর', 'বনস্পতি', সুশীল জানার 'বউ', 'শ্যাওলা', 'কুকুর', সোমনাথ লাহিড়ীর '১৯৪৩', প্রবোধ সান্যালের 'অঙ্গার', শান্তি দেবীর 'কিউ', রমেশচন্দ্র সেনের 'সাদা ঘোড়া', সমরেশ বসুর 'আদাব' প্রভৃতি। এই সমস্ত গল্পের অধিকাংশেই নেই 'সমাজতান্ত্রিক বাস্তবতা', কিন্তু সমকালের সংকট ও সমস্যার পরিপ্রেক্ষিতে অত্যাচার ও

নিগ্রহের প্রকৃত স্বরূপ এবং অগ্নিবর্ষী প্রতিবাদের যে সুর গল্পগুলিতে ধ্বনিত হয়েছে তা সমাজতান্ত্রিক চেতনারই ফল।

১৯৪৬-এ সোভিয়েত ইউনিয়নে পার্টি-বিরোধী সাহিত্য রচনা করার জন্য সাহিত্যিক আখমাতোভা ও জশ্‌চেঙ্কোকে বহিষ্কার করা হয়। এই উপলক্ষে ঝানভ যে ভাষণ দেন তার মূলকথা হল— সমাজতান্ত্রিক সাহিত্য যেহেতু একটি নির্দিষ্ট লক্ষ্যে কাজ করে সুতরাং সেক্ষেত্রে সাহিত্যসৃজনের পদ্ধতি ও আদর্শটি পার্টি-নিয়ন্ত্রিত ও নির্দিষ্টমুখী হওয়া উচিত। ঝানভের মতামত নিয়ে ফ্রান্সে কমিউনিস্ট লেখকদের মধ্যে দ্বিমত তৈরি হয়। শুরু হয় গারোদি-আরাগঁ বিতর্ক। এই বিতর্কে আরাগঁ ছিলেন কট্টরপন্থী— সমাজতান্ত্রিক সাহিত্য সম্পর্কে ঝানভের অবস্থানকে তিনি পুরোপুরি সমর্থন জানান। গারোদি ঝানভের বক্তব্য সমর্থন করেন নি। গারোদি-আরাগঁর বিতর্ক প্রভাব ফেলে বাঙালি বুদ্ধিজীবীমহলেও। বিষ্ণু দে সমর্থন করেন গারোদি-কে। আরাগঁ-র প্রতি আস্থা জ্ঞাপন করেন নীরেন্দ্রনাথ রায়। হীরন্দ্রেনাথ মুখোপাধ্যায়, অরুণ মিত্র, সুভাষ মুখোপাধ্যায় বিষ্ণু দে-র পক্ষে মত দেন। নীরেন্দ্রনাথকে সমর্থন দিয়েছিলেন গোপাল হালদার, সরোজ দত্ত, অনিল কাঞ্জিলাল প্রমুখ।

১৯৪৮ সাল থেকে ১৯৫০-এর মধ্যে প্রকাশিত হয় *মার্কসবাদী* নামক আটটি সংকলন গ্রন্থ। এর প্রথম, চতুর্থ, পঞ্চম এবং ষষ্ঠ সংকলনে মার্কসীয় মাপকাঠিতে শিল্পসাহিত্যের সমালোচনামূলক পাঁচটি প্রবন্ধ প্রকাশিত হয়। এগুলি রচনা করেন বীরেন পাল ও রবীন্দ্র গুপ্ত ছদ্মনাম ভবানী সেন, ঊর্মিলা গুহ ও প্রকাশ রায় ছদ্মনামে প্রদ্যোৎ গুহ এবং নবগোপাল বন্দ্যোপাধ্যায় ছদ্মনামে গণেশ বন্দ্যোপাধ্যায়। 'বাংলা সাহিত্যের কয়েকটি ধারা' প্রবন্ধে বীরেন পাল সমাজতান্ত্রিক সাহিত্যের করণীয়গুলিকে সূত্রাকারে ব্যাখ্যা করেন। এইভাবে বাংলার সমাজতান্ত্রিক সাহিত্য প্রাপ্তবয়স্ক হয়ে ওঠে পাঁচের দশকের মধ্যেই। কিন্তু এত তর্ক-বিতর্ক ও আলোচনার মধ্যেও 'সমাজতান্ত্রিক বাস্তবতা' তত্ত্বটি নিয়ে কেউ পূর্ণাঙ্গ সুস্পষ্ট আলোচনায় নামেননি। 'প্রোলেটারীয় সাহিত্য' (ভূপেন্দ্রনাথ দত্ত), 'সংগ্রামী সাহিত্য' (শান্তি বসু), 'সাম্যতান্ত্রিক বস্তুবাদ' (নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায়), 'প্রগতি সাহিত্য' প্রভৃতি অনেক নামেই এই তত্ত্বটির কথা বলা হয়েছে। কিন্তু 'সমাজতান্ত্রিক বাস্তবতা'-র ভাষ্য রচনায় প্রবৃত্ত হননি কোনো বাঙালি পণ্ডিত। যদিও বিভিন্ন প্রবন্ধ-গল্প-উপন্যাস-বিতর্কের মধ্য দিয়ে যে পরিবেশটি সৃষ্টি হয়েছিল, তাতে বোঝা যায় এই সময়পর্বেই বাঙালির সাহিত্যচিন্তায় ঘটতে শুরু করেছিল 'সমাজতান্ত্রিক বাস্তবতা'-র উদ্ভাস।

তিনের দশকে 'সমাজতান্ত্রিক বাস্তবতা'-র তত্ত্বটি গৃহীত হওয়ার পর থেকে অদ্যাবধি বাংলা সাহিত্যে এমন প্রবণতাপ্রাণিত বেশ কিছু অনুশীলন ঘটেছে। সবগুলিতেই নিশ্চয় তত্ত্বটি প্রকাশের সচেতন অভিপ্রায় ছিল না। কিন্তু এইসব সাহিত্যিকেরা সকলেই ছিলেন সমাজতন্ত্রে আস্থাশীল। এঁরা মনে করতেন সাহিত্যে কেবলই আত্মগত ভাবপ্রকাশ অথবা নিছক সৌন্দর্যসৃষ্টির অভিপ্রায় অর্থহীন। মানুষের অন্তর্নিহিত সম্ভাবনাগুলির সর্বোত্তম বিকাশের পথে সহায়ক উপাদানগুলির অন্যতম উপাদান হবে সাহিত্য, তাতে প্রয়াস পাবে মানবপ্রগতির অন্তরায়গুলিকে অপসারণের আকাঙ্ক্ষা। স্বর্ণকমল ভট্টাচার্য তাঁর *অন্ত্যেষ্টি* (১৯৩৭) উপন্যাসে, যেমন মধ্যবিত্ত বুদ্ধিজীবীর করণীয়টি সাকার করে তুলেছেন এই দৃষ্টিকোণ থেকেই। কাহিনির শেষে উপন্যাসের লেখক-নায়ক তপেশের স্ত্রী-র মৃত্যু হয়। সঙ্গে সঙ্গে তপেশের কল্পনাপ্রবণ মনটিরও মৃত্যু ঘটে। আত্মকাহিনি লেখার চেষ্টায় ইতি টানে তপেশ। স্ত্রী-কে নিয়ে লেখা অসমাপ্ত বইটিকে আগুনে নিক্ষেপ করে সে। "কবি তপেশ মরিতেছে। সম্মুখে পুনর্জন্ম। লিখিবে সে, আবার লিখিবে।

কিন্তু আর ফুল ফসলের গল্প নয়, পলিমাটির রূঢ় সত্য কথা। স্বপ্ন-সুন্দর ভবিষ্যতের বর্তমান কঙ্কালে আজ সে একটি প্রয়োজনের পাঁজর।" শ্রেণিগত অভিমানের অন্ত্যেষ্টি ঘটিয়ে কীভাবে মধ্যবিত্ত বুদ্ধিজীবী অংশ নেবে শ্রেণিহীন সমাজ গড়ার কাজে— তারই সূত্র ধরিয়ে দেওয়ার প্রয়াস রয়েছে আলোচ্য উপন্যাসটিতে।

প্রথম যে বাংলা রচনায় 'সমাজতান্ত্রিক বাস্তবতা'-র পরিপূর্ণ প্রয়োগ ঘটেছিল, সেটি একটি ত্রয়ী উপন্যাসের (*অন্তঃশীলা, আবর্ত, মোহানা*) তৃতীয় ভাগ *মোহানা*। লেখক ধূর্জটিপ্রসাদ মুখোপাধ্যায়। প্রকাশকাল ১৯৪৩। 'সমাজতান্ত্রিক বাস্তবতা'-র ভিত্তি যে ঐতিহাসিক দ্বন্দ্বমূলক বস্তুবাদ তারই চেতনা-সঞ্জাত প্রজ্ঞায় নির্মিত ছিল ধূর্জটিপ্রসাদের সাহিত্যাদর্শ : "ভবিষ্যৎকে গড়ে তোলা তখনই শক্ত যখন ইতিহাস মানে নিয়তি.... ইতিহাসের নিয়ম আবিষ্কার করে অন্তত আংশিকভাবে অতিপ্রাকৃত, প্রাকৃতিক ও তথাকথিত সামাজিক নিয়তির কবল থেকে মুক্ত হতে চাই।"[১৮] *মোহানা* (১৯৪৩) উপন্যাসের কথাবস্তু গড়ে উঠেছে এমনই একটি অভিপ্রায় নিয়ে— একটি শ্রমিক আন্দোলনকে সামনে রেখে। কিন্তু উপন্যাসটির নায়ক খগেন্দ্রনাথ রায় উচ্চশিক্ষিত, বিত্তবান, বিলাসী, যুক্তিসচেতন প্রগাঢ় ভাবনায় বিশ্বাসী অন্তর্মুখী এক প্রৌঢ়। যদিও শ্রমিক-মালিক দ্বন্দ্ব, ধর্মঘটের রূপরেখা, পথ ও পদ্ধতির সমস্যা, নেতৃত্বের সংকট প্রভৃতি বিষয় নিয়েই ব্যয়িত হয়েছে উপন্যাসটির অধিকাংশ পৃষ্ঠা, কিন্তু এর সব কিছুই ঘটানো হয়েছে খগেনবাবুর মনের আলোড়ন অথবা পরিবর্তনকে তাৎপর্যময় করে তোলার জন্য। তিনটি খণ্ড জুড়ে মননসর্বস্ব— মস্তিষ্ক যাঁর সর্বদেহে পরিব্যাপ্ত— এমন একটি মানুষের ক্রমবিকাশ সেখানেই লেখকের অভীষ্ট ছিল। প্রথম খণ্ড *অন্তঃশীলা* (১৯৩৫)-য় মানুষটি রীতিমতো আত্মবন্দি— শুদ্ধ বুদ্ধির মন্থনে দিশাহারা। বুদ্ধিজীবী চিন্তাপ্রবণ খগেনবাবুর স্ত্রী সাবিত্রীর আত্মহত্যার মধ্য দিয়ে কাহিনির সূত্রপাত। বিপত্নীক খগেনবাবু সাবিত্রীর বন্ধু রমলার সঙ্গে ঘনিষ্ঠ হন। রমলা বিবাহিত, কিন্তু স্বামীর দুর্ব্যবহারে বীতশ্রদ্ধ হয়ে দাম্পত্য ত্যাগ করেছে। *আবর্ত* (১৯৩৫) -তে খগেনবাবু ও রমলার দৈহিক মিলনের পথটি প্রশস্ত হয়। একইসঙ্গে রমলার কামনামুখর ঘনিষ্ঠতায় খগেনবাবুর অবচেতনায় বিতৃষ্ণার বোধ জেগে উঠতে থাকে।

মোহনা উপন্যাসের শুরুতে দেখা যায় বিয়ে না করে এই যুগল নিবিড় বিলাসিতায় গা ভাসান। এতদিন তাঁরা প্রথাগত সমাজ-সংস্কারকে উপেক্ষা করেছিলেন। কিন্তু অক্ষয় ইঞ্জিনিয়ারের কুৎসিত ইঙ্গিতে তাঁদের কার্যকলাপের অসামাজিকতা উন্মোচিত হল। রমলার ব্যর্থ সন্তানসম্ভাবনা, মাতৃত্বের আকুল কামনার মধ্যে দিয়ে খগেন বাবুকে বেঁধে ফেলার প্রয়াস, সাময়িক বন্ধ্যাত্বের কারণে তাতে অক্ষমতা প্রভৃতি ঘটনায় উভয়ের মধ্যে বিরোধ ঘনিয়ে ওঠে। রমলাকে অবলম্বন করে নিজের অনিকেত সত্তার আত্মবিলোপী নিরাময়ের যে স্বপ্ন খগেনবাবু দেখেছিলেন তা পূর্ণ হল না। ব্যক্তিগত সম্পর্কগুলি আসলে মুক্তির স্তর নয়, তা যেন 'সাপ-মই খেলার ধাপ'। রমলা সংক্রান্ত অচরিতার্থতাই তাঁকে ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্যের অর্থহীনতা দেখিয়ে দিল—".....সভ্যতা সর্বসাধারণের কাজ, বৈদগ্ধ্য সভ্যতার ফল, ব্যক্তিগত জীবনের সফলতা-নিষ্ফলতা তাই, সার্বজনীন জীবনের গাঁটছড়ায় বাঁধা।" পারস্পরিক সঙ্গ যখন অসহনীয় হয়ে উঠল তখন কাশী ত্যাগ করে খগেন বাবুরা দেশ ভ্রমণে বেরোলেন। লখনউ স্টেশনে ধর্মঘটি টাঙ্গা ও এক্কাওয়ালাদের সমাবেশ দেখতে পেয়ে খগেনবাবু আগ্রহী হয়ে উঠলেন। এই প্রথম খগেন বাবু সাময়িকভাবে তাঁর শ্রেণিগত অবস্থান ভুলে সংগ্রামী জনতার ভিড়ে মিশে গেলেন। তারপর প্রতিবাদী উদ্দীপনার ছোঁয়াচ নিয়ে ফিরে এলেন প্ল্যাটফর্মে। রমলার সৌন্দর্য তাঁর কাছে ঠাট্টার মতো মনে হল। অপর একটি চরিত্রের মধ্যে দিয়েও সাকার হয়ে উঠেছে উন্মথিত সংগ্রামকে

বাস্তবায়িত করে তোলার আদর্শ। সে হল সফীক। ধর্মঘটি শ্রমিকদের বিক্ষোভের মাত্রাকে কিছুতেই জুড়োতে দিতে চায় না সফীক : "এগিয়ে চলুক বিরোধ, বেঁচে থাক জিদ, তাকে জুড়ুতে দেওয়া ইতিহাসের প্রতি বিশ্বাসঘাতকতা।" সমাজবিকাশের ক্রমঅগ্রগতিকে নিরন্তর করে তোলার পথে সফীক অক্লান্ত সেনানী। এই ইতিবাচক উপলব্ধি, বিপ্লবের আলোকোজ্জ্বল সংবেদনা সঞ্জীবিত করতে পারে খগেন বাবুকেও। *মোহানা* উপন্যাসের 'সমাজতান্ত্রিক বাস্তবতা' এই ব্যাপারটিকেই মূর্ত করে তুলেছে। বুদ্ধিসর্বস্ব খগেনবাবু চিন্তার জগৎ থেকে বেরিয়ে এসে নিজেকে জড়িয়ে ফেলেন মেথর সমস্যায়, টাঙ্গা-একাওয়ালাদের প্রতিবাদে, মিল মজুরদের হরতালে। আবার সফীকের তাৎক্ষণিক ব্যর্থতাও তিনি চোখের সামনে দেখেন। কিন্তু সফীক তাঁকে বোঝায় বিপ্লব কখনও থামে না। 'এটি ঢিলে হয়, ঝুলে পড়ে, বেতালা বেসুরো হয়'। কিন্তু স্তব্ধ হয় না কখনও। অতিক্রমশীল মানুষ দ্বিগুণ উৎসাহে প্রতিবন্ধ অপসারিত করে। উপন্যাস শেষ হয় খগেন বাবুর উত্তরণের ইঙ্গিত রেখে। শুধু সফীকের উদ্ধারের জন্য সর্বাঙ্গীণ প্রচেষ্টার মধ্য দিয়েই নয়, রমলাকে লেখা চিঠিখানি ছিঁড়ে ফেলার মধ্যেও স্পষ্ট হয়— তাঁর শ্রেণিগত অবস্থানটি মুছে ফেলতে তিনি কত তৎপর। সফীকের জামিনের ব্যবস্থা করতে খগেনবাবু মোটরে রওনা হন। এখন অন্তরে তাঁর অবচেতনার বুদ্বুদ নয়, অনুভবে তাঁর সংহত জনতার হার্দিক উষ্ণতা : "অ-মানুষিক বুকের স্পন্দন কানে আসে শূন্যতা ভেদ করে....ট্যাক্সি জোরে চলে.... রাস্তার পাশে একটা মোটর দাঁড়িয়ে....লোক নেই.....কোথায় গেল ওরা......এই ত মাঠটা ভরে গেল মানুষের প্রেমে, বন্ধুত্বে।" খগেনবাবুর এই যাত্রা তাঁকে পৌঁছে দেবে 'ব্যক্তি' থেকে 'পুরুষে', 'বুদ্ধি' থেকে 'বোধি'তে— এই উজ্জ্বল সম্ভাবনার মধ্যেই 'সমাজতান্ত্রিক বাস্তবতা' প্রতিষ্ঠিত হয়েছে *মোহানা* উপন্যাসে। তাছাড়া 'সমাজতান্ত্রিক বাস্তবতা'-য় আঙ্গিক নিয়ে পরীক্ষায় যে অনীহা লক্ষিত হয় তা-ও এখানে দেখি। তাই *অন্তঃশীলা* থেকে *আবর্ত* হয়ে *মোহানা*-য় পৌঁছতে ঘটে চেতনাপ্রবাহ রীতির ক্রমিক বিলুপ্তি। প্রথম খণ্ডে ঘটনা প্রায় ছিলই না। ছিল টুকরো টুকরো চিন্তার মধ্য দিয়ে চৈতন্যে নির্মিত অন্তর্বাস্তবকে ধরবার প্রয়াস। তৃতীয় খণ্ডে চিন্তা রয়েছে, কিন্তু অবচেতনা নেই। ঘটনা রয়েছে এবং তা নির্দিষ্ট লক্ষ্যাভিমুখী। লেখক-কথিত 'স্ট্রিম অফ কনশাসনেস' নয়, বরং 'রোমান্টিক' প্রভাব থেকে 'কংক্রীট'-এর দিকে যাত্রা— লেখকের অভীষ্ট লক্ষণগুলির কোনওটিই 'সমাজতান্ত্রিক বাস্তবতা'-কে অস্বীকার করেনি।

বিজন ভট্টাচার্যের *নবান্ন* (১৯৪৪) নাটকটির মধ্যেও মূর্ত হয়ে উঠেছিল 'সমাজতান্ত্রিক বাস্তবতা'। নির্যাতিত মানুষের মধ্যে সুপ্ত সংগ্রামী উদ্দীপনাকেই জাগাতে চেয়েছে নাটকটি। পার্টিকর্মী যুধিষ্ঠির যা পারেনি, সময় ও পরিস্থিতির চাপে সেই কাজটি স্বতঃস্ফূর্তভাবে সম্ভব হয়েছে। ক্রমে ক্রমে নিজেদেরই অভিজ্ঞতায় মানুষ বুঝেছে মন্বন্তর মানুষেরই তৈরি। কুঞ্জ, চারু দত্তের মুখের উপর বলেছে "জানি জানি, ওপরের দিকে হাত দ্যাখাবে, তা জানি। তা সে বিশ্বাস ভেঙে গেছে, ওতে আর ভয় করিনে।" নাটক শেষ হয় প্রতিকার খুঁজে ফেরা দুর্মর আশার মধ্য দিয়ে। আমিনপুরের লোকজন শহরের নারকীয় অভিজ্ঞতা ভুলে আবার ফিরে আসে গ্রামে। নতুন করে বাঁচার আশায় জোট বাঁধে। প্রত্যেকের জমিতে সকলে মিলে 'গাঁতায় খেটে' নতুন ধান তুলে দেওয়ার শপথ নেয়। ভবিষ্যৎ আকালের মোকাবিলায় তৈরি করে 'ধর্মগোলা'। অফুরান আশাবাদে দৃপ্ত পথপ্রদর্শনে এই নাটকের বাস্তবতা সমাজতান্ত্রিক।

গোপাল হালদারের ত্রয়ী উপন্যাস (*একদা, অন্যদিন, আর একদিন*) তিন ও চারের দশকের স্বতন্ত্র তিনটি দিনের বর্ণনা। নায়ক অমিত তিনের দশকের সুশিক্ষিত রাজনীতিমনস্ক যুবকদের প্রতিনিধি। সে জীবনের গভীরতর তাৎপর্যের অন্বেষী। প্রথম দুটি পর্ব *একদা* ও *অন্যদিন*-এ

অস্পষ্ট থাকেনি সাম্যবাদী আদর্শের অনুসরণ। *একদা*-তে অমিতের চিন্তাভাবনা, অনুষঙ্গবাহী স্মৃতিচিত্র যে তাৎপর্যময় সমগ্রতা গড়ে নিতে চায়—তা হল পরিপূর্ণ আত্মবিকাশ, 'ইনটেন্স লিভিং'-এর আকাঙ্ক্ষা। আত্মকেন্দ্রিকতায় অভ্যস্ত, অগভীর ভাবনা তৃপ্ত মধ্যবিত্ত বুদ্ধিজীবীদের দেখে অমিত ক্লান্ত। সংশয়ী হলেও সে জীবনবিমুখ নয়। নিজেকে সে মনে করে তীর্থযাত্রী। এই যাত্রা 'ছোট আমি' থেকে 'বড় আমি'-র দিকে। রূপান্তরিত জনজীবনের অন্তহীনতায় নিজেকে মিশিয়ে দেবার অভীপ্সা নিয়ে অমিত গ্রেপ্তার হয়। *অন্যদিন* উপন্যাসে ছয় বছরের জেলজীবনে শেষ করে অমিত বাড়ি ফেরে। সঙ্গে নিয়ে আসে বন্দিজীবনের অনুভূতিলব্ধ সমীক্ষা। এটি তার মতে 'প্রধানতম গুরুগৃহ' থেকে 'বিশ্বের বিশালতম বিদ্যালয়ে' প্রবেশ। স্বরচিত ভাবনার গণ্ডি অতিক্রম করে কর্মজীবনে সক্রিয় অংশগ্রহণের প্রয়াস *অন্যদিন*-এ। এই উপন্যাসের শেষে অমিত তার ঘরে কাটায় একটি বিনিদ্র রাত্রি। কৃতসংকল্প চিত্তে আলোড়িত অমিত নিজেকে নতুন করে রচনা করার শপথ নেয়। শুরু হয় *আর একদিন* উপন্যাস। এই উপন্যাসেই সংশয়াতীত ভাবে প্রতিষ্ঠিত হয় 'সমাজতান্ত্রিক বাস্তবতা'। এই পর্বে 'ইতিহাসের ছাত্র' আবার 'ইতিহাসের অস্ত্র' অমিতকে স্বাগত জানায় ক্ষমাহীন বন্ধুর পথ। মহাজীবনের অবারিত ক্ষেত্রে আত্মপরিচয় রচনার উন্মুখ আততি নিয়ে অমিত অবশেষে শনাক্ত করে ইতিহাসের সেই অনাগত দিনটিকে, যা মানবমুক্তির দিকে ক্রমঅগ্রসরমান।

নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায়ের *মন্দ্রমুখর* (১৯৪৬) উপন্যাসটিতেও 'সমাজতান্ত্রিক বাস্তবতা'-র প্রকাশ ঘটেছে। এই উপন্যাসের পটভূমি সমকালীন যুদ্ধ ও স্বাধীনতার আকাঙ্ক্ষায় স্পন্দিত উত্তরবঙ্গের মহকুমা শহর। ভারত-ছাড়ো আন্দোলনের ঢেউ ছড়িয়ে পড়ে প্রত্যন্তে। দেশজোড়া এই গণ-আন্দোলনের ঢেউ গ্রামগুলিতেও পৌঁছোয়। জোতদার-মহাজনদের অত্যাচারের বিরুদ্ধে সংঘবদ্ধ হয় খালি গা, নেংটি-পড়া, ধুলো মাখা হাজারে হাজারে মানুষ....ইতিহাসের অমোঘ নিয়মে আজকের বন্দি আগামীকালের সেনানায়ক। ঐতিহাসিক নিয়মে উদ্ভূত বিক্ষোভকে সুনির্দিষ্ট গণসংগ্রামে রূপান্তরিত করার জন্যে এক যুবকের আবির্ভাব ঘটে। হাসপাতালের লেডি-ডাক্তার এডিথের পূর্বপরিচিত এই যুবক বিপ্লব-সংগঠনের প্রস্তুতি নেয়। এখানেই উপন্যাসটি শেষ হলেও যুবকের বক্তব্যে প্রাণ পেয়েছে 'সমাজতান্ত্রিক বাস্তবতা'-র প্রত্যয়দৃপ্ত অবয়ব : "স্বপ্ন তো দেখি না রেখা। যা অনিবার্য তাকেই দেখি। বাঁধ যখন ভেঙেছে তখন তাকে ঠেকাবার সাধ্য কারও নেই।......প্রভাস চুপ করল। রেখা চুপ করে রইল। প্রভাসের সমস্ত মুখখানা জ্বলছে দীপশিখার মতো। উজ্জ্বল দীর্ঘদেহে অনাগত সার্থক দিনের যেন আনন্দময় প্রতিচ্ছবি এসে পড়েছে।"

১৯৩৮ সাল থেকে মানিক বন্দ্যোপাধ্যায় মার্কসবাদ-সম্পর্কিত পড়াশোনা শুরু করেছিলেন।[১৫] তখন থেকেই তিনি বুঝতে পারছিলেন একটি মানুষের চিত্ততলের ব্যবচ্ছেদ অথবা আপাত বাস্তবতায় একটি মানুষের দুঃখদুর্দশাকে বিচ্ছিছন্নভাবে না দেখে তাকে শ্রেণিসংঘর্ষের নিরন্তর ধারাবাহিকতায় রাজনৈতিক-অর্থনৈতিক পারিপার্শ্বিকতায় বিচার করতে হবে : "সমাজজীবনে কি আছে আর কি নেই, কি এসেছে আর কি আসছে এটা উপলব্ধি করে দীনতা ও অসম্পূর্ণতা থেকে মুক্ত করে জীবনকে পূর্ণতার দিকে এগিয়ে নিয়ে যাবার জন্য সংগ্রামে প্রেরণা জাগবে—সাহিত্যের মাধ্যমে এ সংগ্রাম চালাতে হলে ওই সমাজজীবনটির কি আছে আর কি নেই, কি এসেছে আর কি আসছে সেটাও উপলব্ধি করতেই হবে সাহিত্যিককে।"[১৬] তাঁর একাধিক রচনায় সমাজতান্ত্রিক আদর্শের অনুসরণ কমবেশি স্পষ্ট। এই প্রসঙ্গে তাঁর 'হারাণের নাতজামাই' গল্প এবং *চিহ্ন* উপন্যাসটি স্মরণীয়। 'হারাণের নাতজামাই' গল্পটিতে তে-ভাগা শেখানো শহুরে

কৃষক নেতাকে পাকড়াও করতে গিয়ে পুলিশ প্রথমদিন যতটা প্রতিরোধের মুখে পড়ে তা দিনে দিনে বেড়ে ওঠে অকল্পনীয়ভাবে। একটি কৃষক পরিবারকে লাঞ্ছিত করে তাদের ধরে নিয়ে যেতে গিয়ে হতবাক পুলিশ দেখে জনতা অশেষ হয়ে পথ আটকে দাঁড়িয়ে। এই পরিবারের অশিক্ষিত কর্ত্রী পুথি পড়ে বিপ্লবের দীক্ষা নেয়নি কস্মিনকালেও। কিন্তু অন্তরের আলোয় যে চেতনার প্রদীপখানি সে জ্বালিয়েছিল, তার থেকে নিজেদের প্রজ্বলিত করে নিল অগুনতি মানুষ। এই গল্পের বাস্তবতায় জনতাসমুদ্রের ব্যাপ্ত প্রতিরোধে প্রত্যক্ষ হয়ে ওঠে প্রত্যয়দৃপ্ত আগামী।

চিহ্ন (১৯৪৭) উপন্যাসের কাহিনি একটি বাস্তব ঘটনাকে আশ্রয় করে গড়ে উঠেছে। ১৯৪৬-এর রসিদ আলি দিবস উপলক্ষে ছাত্র-যুবকদের মিছিলে পুলিশী নিপীড়ন হল সেই ঘটনা। উপন্যাসের প্রায় প্রতিটি চরিত্রই বিপ্লবের নাতিচঞ্চল সুগভীর উজ্জীবনের প্রশান্ত স্পর্শ অনুভব করতে পেরেছে। গ্রামের ছেলে গণেশ প্রতিবাদী ছাত্রদের সুশৃঙ্খল অবস্থান দেখে অবাক হয়ে গেছে। স্কুলের ছাত্র রজত জানে পুলিশ তাদের উত্তেজিত করে তুলতে চাইবে। প্ররোচিত করবে দাঙ্গা বাধাতে। সুতরাং আন্দোলনে অংশ নিতে হবে শান্ত হয়ে। শুধু মিছিলের মধ্যে নয়, সর্বত্রই এই অনাগত অবশ্যম্ভাবীকে বোধনের জন্যে প্রতীক্ষাচঞ্চল শোষণজর্জর মানুষ নতুন করে বাঁচার স্বপ্ন দেখে। যুদ্ধের বাজারে চাকরি চলে গেছে যার, তার পরিবারও এতটুকু ঘাবড়ায় না : "সব ঠিক হয়ে যাবে, আমরা সব ঠিক করে নেব এই ভাব সকলের।" *চিহ্ন* উপন্যাসে বিভিন্ন চরিত্রের মনে জমে ওঠা প্রতিরোধী ভাবনা এক ব্যাপক গণসংগ্রামের জোয়ার রচনা করেছে। কারণ চরিত্রায়ণের মাধ্যমে লেখক প্রকৃতপক্ষে আগামী দিনের বলিষ্ঠ দুর্বার সত্যসন্ধ মুমুক্ষু মানবসম্প্রদায়ের ছবি এঁকেছেন। প্রত্যেকের দৃষ্টিভঙ্গিতে স্বাতন্ত্র্য থাকতে পারে কিন্তু জাগ্রত জনকল্লোলের ধ্বনি এরা যেন সকলেই শুনতে পেয়েছে।"[১৭] যুগের সমবায়ে একক ব্যর্থতা-হতাশাগুলিকে তুচ্ছ, অকিঞ্চিৎকর মনে হয়। আবদুলের স্বীকারোক্তি 'আমি তো একা নই' রসুলকে উদ্দীপ্ত করে। তার ডানহাতে গুলি লাগে। অবিরল রক্তপাতে ফ্যাকাশে হয়ে এলেও সে বিচলিত হয় না। বরং ব্যক্তিগত নিষ্ফলতা-অভিমানকে সমষ্টির সঙ্গে মিশিয়ে দেওয়ার প্রয়োজনীয়তা উপলব্ধি করে। মধ্যরাত্রে আহত রসুলকে দেখে আর্তনাদ করলেও শক্ত হতে দ্বিধা করে না আমিনা। কারণ 'ছেলেটা আজাদির জন্য অনায়াসে মরতে পারে......টের পাবার পর যেন আমিনার মনের এই জোরটা হু হু করে বেড়ে গেছে।' 'সমাজতান্ত্রিক বাস্তবতা'-র শিল্পতত্ত্বে ব্যক্তিমন হয়ে ওঠে সমষ্টির প্রতিরূপ। বৈভবে-গৌরবে, অভাবিত সাফল্যে, চমকপ্রদ কার্যকারিতায় উজ্জ্বল নায়কত্বের স্থান এখানে নেই। জীবনগঠনের সদর্থক সাধারণ সত্যটিকে উপলব্ধিতে এনে এটি আপামর মানুষকে প্রগতিবিরোধী ক্ষতিকর শক্তিগুলির বিরুদ্ধে লড়াই করতে উৎসাহ দেয়। *চিহ্ন* উপন্যাসটিতেও জনগণই নায়ক। অর্থনৈতিক অবস্থা ও প্রবণতার ভিন্নতা সত্ত্বেও প্রত্যেকের পথ শেষপর্যন্ত মিছিলে এসেই শেষ হয়েছে। দুর্দিনের চাকরিটা ধরে রাখতে হরতালের দিনে আরও তাড়াতাড়ি অফিস যাওয়া প্রয়োজন— অনন্তর এই ভীরু অজুহাত শেষপর্যন্ত ধ্বসে গেছে বিপরীত ভাবনার গণমুখী তাগিদে : "সবাই যা করে তাই করাই ভাল"। গণেশ, পুলিশের গুলি খেয়ে মরে যেতে যেতে প্রশ্ন করেছিল "ওরা এগোবে না?" অজয়ের স্বগতোক্তিতে যেন তার উত্তর খুঁজে পেয়েছে সেই ব্যাহতমানবাত্মা "আমরা এগিয়েছি, ঠেকাতে পারেনি, আমরা এগিয়েছি।" দৈহিক মৃত্যুর অব্যবহিত আগেই পুনরুজ্জীবিত হয়ে উঠেছিল গণেশের বাসনালীন শুদ্ধ বিপ্লবী চেতনা। উপন্যাসের শেষে

গণেশের বাবা যাদব শুনতে পেল সেই নির্বাধ মুক্তির অবারিত প্রতিধ্বনি। তার মনে হল "বাঘ যেন ডাক দিচ্ছে মনের আনন্দে।" *চিহ্ন* উপন্যাসটিতে সংহত হয়ে আছে সেই সীমাতিক্রমী উজ্জীবনের প্রতীতি, যা যুগান্তরের সূচনা করে।

সাবিত্রী রায়ের উপন্যাসে সচেতনভাবে মানুষের বিপ্লবী নিয়তিকে প্রতিষ্ঠিত করার প্রয়াস লক্ষ করা যায়। ইতিহাসের নির্দিষ্ট সময়খণ্ডকে বেছে নিয়ে তিনি প্রায়ই দেখাতে চেয়েছেন— নিজের ক্ষমতার অভাবনীয় সফলতায় আস্থাশীল মানুষ তার ভাগ্যকে চালিত করছে বিজয়ের অভিমুখে। এদিক থেকে তাঁর উল্লেখযোগ্য উপন্যাসগুলি হল *সৃজন* (১৯৪৭) *ত্রিস্রোতা* (১৯৪৮), *স্বরলিপি* (১৯৫২), *পাকা ধানের গান* (১৯৫৬, '৫৭, '৫৮), *মেঘনা পদ্মা* (১৯৬৪-৬৫), *সমুদ্রের ঢেউ* (১৯৬৬, '৬৭, '৬৮) প্রভৃতি। 'সমাজতান্ত্রিক বাস্তবতা' কার্যকরী ভূমিকা নিয়েছে গুণময় মান্না-র উপন্যাসেও। এইদিক থেকে গুরুত্বপূর্ণ তাঁর *লখীন্দর দিগার* (১৯৫০) উপন্যাসটি। এর কাহিনি ১৯৪৮-'৪৯ সালে মেদিনীপুরে সংঘটিত কৃষক আন্দোলনের প্রেক্ষাপটে রচিত। লখীন্দর একজন বয়স্ক চাষি। ধর্মভীরু এবং সরলপ্রাণ। নিজের শ্রেণিশত্রু সম্পর্কে একটা আবছা ধারণা তার আছে। কিন্তু প্রতিকারের পথটা জানা নেই। এক কৃষক নেতার কথায় সে সাম্যবাদ সম্পর্কে পড়াশোনা শুরু করে। ধীরে ধীরে চক্ষুষ্মান হয় সে। মাঠে কাজ করতে করতে গল্প করে সে "বুঝলে কিনা ভাই, এই সমাজের রন্ধ্রে রন্ধ্রে গলদ, হ্যাঁ। যত দুঃখ সব এই সমাজের অবস্থার জন্য।" গোর্কি-র *মাদার* উপন্যাসের মা পুলিশের হাতে ধরা পড়ার পরে বলেছিলেন— তাঁর পুনরুজ্জীবিত আত্মাটির মৃত্যু হবে না কখনও। পুনরুজ্জীবিত লখীন্দরও কৃষকসভায় বক্তৃতা দিয়ে 'অন্তরীণ-আদেশ' ভঙ্গ করেছে। পুলিশি অত্যাচার এবং গ্রেপ্তারের ভয় তাকে নিরস্ত করতে পারেনি। উপন্যাসের শেষে দেখা যায় বিনিদ্র রাতে লখীন্দর গ্রেপ্তারের জন্য প্রতীক্ষারত। তার বিপ্লবী বিবেকের উষ্ণতায় অভিভূত কৃষক-নেতা গোবিন্দ তাকে প্রণাম করে বলেছে "আমাদের শক্তি যে অপরাজেয় তা আগে বুদ্ধি দিয়ে জেনেছিলুম, আজ হৃদয় দিয়ে অনুভব করছি।" আসন্নপ্রভাত শুকতারার দিকে তাকিয়ে লখীন্দর ঠায় বসে অনেকক্ষণ ধরে কাঁদল। ওর সারা শরীর কেঁপে কেঁপে উঠছে, আর, এত আনন্দও আছে পৃথিবীতে।" এই আনন্দ সংগ্রামী জনগণের ভাগ্যের সঙ্গে নিজের ভাগ্যকে জড়িয়ে দেখার আনন্দ— যে সংগ্রামের পরিণামে আছে পৃথিবীব্যাপী মুক্ত মানুষ। এই সদর্থক প্রদীপ্ত উপলব্ধির মধ্যেই স্ফুট বাক হয়ে উঠেছে 'সমাজতান্ত্রিক বাস্তবতা'।

নিম্নবর্গের মানুষের জীবনসংগ্রামকে তাঁর কথাকৃতির পাথেয় করে তুলতে গিয়ে মহাশ্বেতা দেবী তাঁর রচনায় কখনও ব্যবহার করেছেন 'সমাজতান্ত্রিক বাস্তবতা'-র অভিজ্ঞানটি। যদিও তত্ত্বটি সচেতনভাবে প্রতিপাদনের প্রয়াস তিনি করেছেন বলে মনে হয় না। 'সমাজতান্ত্রিক বাস্তবতা'-র একটি অন্যতম উপাদান হল বৈপ্লবিক রোমান্টিকতা। লোককথার সহায়তায় এই উপাদান তিনি নিপুণভাবে ব্যবহার করেছেন *অরণ্যের অধিকার* (১৯৭৭) এবং *চোট্টি মুণ্ডা এবং তার তীর* (১৯৮০) উপন্যাস দুটিতে। চোট্টীর মায়াবী তীরের প্রেরণা সেখানে শানিত করে তোলে হাজার তীরের ফলা। যেমন করে বীরসার রক্তে কলরব তোলে চুটুয়া আর নাগু। তার হয়ে কথা বলে সমগ্র 'কৃষ্ণ ভারত'। আর সেই কারণেই দৈহিক মৃত্যু হলেও বীরসা তথা উলগুলান চিরকাল বেঁচে থাকে। লেখিকা দেখান হেরে গিয়েও আদিবাসীরাই জেতে। কারণ শাসকের ইতিহাস বিজেতার নাম রেকর্ড করে রাখে। মানুষের ইতিহাস কিন্তু ধরে রাখে অন্য নাম—"বিজিতের নাম মানুষের রক্তে-বঞ্চনায়-খিদেয়-দারিদ্র্যে-শোষণে ধান চারার মতো বোনা থাকে।"

'সমাজতান্ত্রিক বাস্তবতা'-র শৈল্পিক তাৎপর্য প্রশ্নাতীত নয়। এই তত্ত্বের প্রয়োগ ঘটেছে এমন অনেক রচনাই বৈচিত্র্যহীন এবং প্রচারধর্মী হয়ে উঠতে পারে। সেক্ষেত্রে সমালোচকের সঠিকভাবেই মনে হতে পারে "....তাহলে কি শিল্প-সাহিত্য স্বধর্মভ্রষ্ট হয় না? শিল্পী-সাহিত্যিকও কি স্বাতন্ত্র্য হারিয়ে বিশেষ মতাদর্শে কমিটেড হয়ে পড়েন না?"[১৮] নারোদনস্ট অনেক সময় হয়ে দাঁড়িয়েছে সংশোধন বাদীদের সেফটিভালভ যা শিল্পীর কাছ থেকে দাবি করে পার্টির প্রতি প্রশ্নহীন আনুগত্য। স্তালিন-এর সময় প্রবল হয়ে উঠেছিল 'বৈপ্লবিক রোমান্টিকতা'। এটি জন্ম দিয়েছিল একাধিক ছাঁচে ঢালা 'নতুন নায়ক' : "Just as histories claim that book A was modeled on book B, which was in turn modeled on boopk C....."[১৯] এইভাবে চারের দশকের সোভিয়েত সাহিত্যেই 'নতুন নায়ক'-এর ধারণাটি ক্রমশ অনুকরণসর্বস্ব এবং একঘেয়ে হয়ে উঠেছিল। তাছাড়া "এক এক সাহিত্যকর্তা ক্ষমতা পেয়ে এই সাহিত্যনীতির যে ব্যাখ্যা করেন তাতে মনে হয় পার্টির তখনকার রাজনৈতিক দৃষ্টিভঙ্গি মতো যা লেখা হয়, তাই 'সমাজতন্ত্রী বাস্তবতা' অন্য সব অগ্রাহ্য"[২০] তাছাড়া এই মতের আদর্শ ও আশাবাদকে প্রাধান্য দিলে বাস্তবতা তার ধর্ম থেকে বিচ্যুত হতে পারে। অপর সমালোচক বলেছেন "শ্রমিকশ্রেণি ও তার রাষ্ট্র আদর্শ বলে ধরে নিলে (assume), এবং শুধু সেই শ্রেণি ও রাষ্ট্রের রূপ প্রতিফলিত করার আহ্বান জানালে, তাতে যে অনুকরণ (mimesis) ফুটে উঠবে তাতে স্বভাবতই বাস্তবকে প্রতিফলিত করা যাবে না। প্রলেতারিয়েতের মধ্যেই শুধু আদর্শ মান রয়েছে— এই আদর্শ মান ধরে শিল্প রচনার ভাবনার মধ্যে প্লেটোর আদর্শ জগৎ, প্লেটোর আইডিয়ার জগতের ভাববাদের চোরাবালিতে শিল্পী-সাহিত্যিককে পড়তে হতে পারে।"[২১]

স্তালিনের মৃত্যুর (০৫.০৩.১৯৫৩) পরের বছর 'সোভিয়েত লেখক সংঘ'-র দ্বিতীয় সম্মেলন আহূত হয় এবং সেখানে পার্টির কঠোর নিয়ন্ত্রণ সমালোচিত হয়। ছয়ের দশকে নিকিতা ক্রুশ্চভ-এর সময় থেকে শিল্পীদের স্বাধীনতার প্রশ্নটির বিবেচিত হতে থাকে। কর্তৃত্বের বরফ গলতে শুরু করলে গর্বাচভ প্রবর্তিত 'গ্লাসনস্ত্' সমস্ত নিয়ন্ত্রণের অবসান ঘোষণা করে এবং স্বাধীন প্রকাশনা সংস্থা কাজ করতে শুরু করে। সাবেক সোভিয়েত ইউনিয়ন বিলুপ্ত হবার আগে পর্যন্ত সোভিয়েতের স্বীকৃত সাহিত্যতত্ত্বরূপে 'সমাজতান্ত্রিক বাস্তবতা' অস্তিত্ব বজায় রেখেছিল। বর্তমানে এই তত্ত্বটির প্রাসঙ্গিকতা কিন্তু লোপ পায়নি। ভুবনীকরণের ব্যাপকতায় তথাকথিত সমাজতন্ত্রবাদীরাও যখন উদারনৈতিক অর্থনীতির প্রয়োজনীয়তা স্বীকার করতে বাধ্য হচ্ছে এবং এড়াতে পারছে না বিপণন ও বিনোদনের মার তখনই 'সমাজতান্ত্রিক বাস্তবতা' নতুন তাৎপর্যে ধরা দিতে পারে। কারণ এখনও ধনতান্ত্রিক ও সাম্রাজ্য বাদী নিষ্পেষণে নিপীড়িত মানুষের, ভোগবাদের কাছে নিঃশেষিত-মূল্য মানুষের পথপ্রদর্শক হয়ে উঠতে পারে তা। মানুষকে তার শ্রেণিসংঘর্ষের নিরন্তর প্রবাহের মধ্যে বিকশিত করে তোলার শক্তি যে রয়েছে তারই মধ্যে নিহিত।

তথ্যসূত্র :

১. 'The Word begins in obscurity', Daniel Bell, Socialism, *International Encyclopedia of the Social Sciences*, V—14, edited by DAVID I Sills, 1968, p. 506

২. Pervyiscsoivzhyi S"ezd Sovetskikh pisatelei stenogratich otchet, 1934, p. 17 *Encyclopedia of World Literature in 20th Century*, Frederich Unger Publishing Co, New-york, 1971, P-252

৩. Gorky Maxim. Soviet Literature. *Soviet Writers Congress*, 1934, Lawrence and Wishart, London, 1977, p. 67
৪. Stetsky A I, Our guideline is that of Socialist Realism, *Soviet Writers Congress*, 1934, Lawrence and Wishart, London, 1977, p. 265
৫. হালদার গোপাল, *রুশ সাহিত্যের রূপরেখা*, এ মুখার্জী অ্যাণ্ড কোং, কলকাতা, ১৯৬৬, পৃষ্ঠা-৩৫৭
৬. চক্রবর্তী সুমিতা, সাহিত্যে বাস্তবতা, মুক্তাক্ষর, কলকাতা ১৯৯২, পৃষ্ঠা-৩১
৭. চক্রবর্তী সুমিতা, ত্রিশ-চল্লিশ দশকের বাঙালি কবি, *নন্দনতত্ত্ব জিজ্ঞাসা*, তরুণ মুখোপাধ্যায় সম্পাদিত, পুস্তক বিপণি, কলকাতা, ১৯৯৪, পৃষ্ঠা-২৭২
৮. হালদার গোপাল, *রুশ সাহিত্যের রূপরেখা*, এ মুখার্জী অ্যাণ্ড কোং, কলকাতা, ১৯৬৬, পৃষ্ঠা-৩৬২
৯. Gorky Maxim, Soviet Literature, *Soviet Writers Congress*, 1934, Lawrence and Wishart, London, 1977, p. 54
১০. ভট্টাচার্য হীরেন, সমাজতান্ত্রিক বাস্তবতা, *সমাজতান্ত্রিক বাস্তবতা ও অন্যান্য প্রবন্ধ*, গণমন প্রকাশন, কলকাতা, ১৯৮৭, পৃষ্ঠা-৩৩
১১. Zhdanov A.A. Soviet Literature —The richest in ideas, The most advanced literature, *Soviet Writers Congress*, 1934, Lawrence and Wishart, London, 1977, p. 21
১২. Gorky A.M. in V.I. Lenin & A.M. Gorky, Pis'mavos Pomidiia, Dokumentary, *Gret Soviet Encyclopedia*, Vol—24, Sovetskia Entsiklopedia publishing house, Moscow, Third edition, 1976, p — 245
১৩. দ্রষ্টব্য : দাশ ধনঞ্জয়, *বাংলার সংস্কৃতিতে মার্কসবাদী চেতনার ধারা*, অনুষ্টুপ, কলকাতা, ১৯৯২, পৃষ্ঠা-১২
১৪. মুখোপাধ্যায় ধূর্জটিপ্রসাদ, *অথকাব্য জিজ্ঞাসা*, বক্তব্য, বিদ্যোদয় লাইব্রেরি, কলকাতা, ১৯৫৭, পৃষ্ঠা-২২৮
১৫. "রমেনবাবু বলেন ১৯৩৮ সাল থেকেই তাঁর হাতে বুখারিনের ঐতিহাসিক বস্তুবাদ গ্রন্থখানি দেখে মানিক মার্কসবাদ সম্বন্ধে আগ্রহী হন এবং তারপর ল্যিয়েনটিয়েভের মার্ক্সীয় অর্থনীতি গ্রন্থ পাঠ করে উৎসাহী হয়ে ওঠেন।"— মিত্র সরোজমোহন, *মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়ের জীবন ও সাহিত্য*, গ্রন্থালয়, কলকাতা, ১৯৮২, পৃষ্ঠা-৫৪
১৬. বন্দ্যোপাধ্যায় মানিক, সাহিত্য করার আগে, লেখকের কথা, নিউ এজ পাবলিশার্স প্রাইভেট লিমিটেড, কলকাতা, ১৯৫৭, পৃষ্ঠা-১৫
১৭. বসু নিতাই, *মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়ের সমাজজিজ্ঞাসা*, দে বুক স্টোর, কলকাতা, ১৯৭৮, পৃষ্ঠা-১৬৪
১৮. মুখোপাধ্যায় বিমলকুমার, *সাহিত্য বিবেক*, দেজ পাবলিশিং, কলকাতা, ২০০৬, পৃষ্ঠা-১৭৩
১৯. Clark Katerina, *The Soviet Novel history as ritual*, The University of Chikago Press, Chikago & London, 1981, p. 27
২০. হালদার গোপাল, সোভিয়েত রুশ সাহিত্য : সমাজতন্ত্রী বাস্তবতার হেরফের, *রুশ সাহিত্যের রূপরেখা*, এ মুখার্জী অ্যাণ্ড কোং, কলকাতা, ১৯৬৬, পৃষ্ঠা-৩৫৬
২১. ঘোষ সুজিত, মার্ক্সবাদী সমালোচনাতত্ত্ব : উত্তরকাল, আকাদেমি পত্রিকা, পশ্চিমবঙ্গ বাংলা আকাদেমি, কলকাতা, নভেম্বর ১৯৯৭, পৃষ্ঠা-১৭০

জাদু বাস্তবতা
বাস্তবতার ভিন্ন স্বর
রবিন পাল

ম্যাজিক রিয়ালিজম বা জাদু বাস্তবতা বা কুহকী বাস্তবতা বহু আলোচিত একটি কনসেপ্ট, বহু নন্দিত ও নিন্দিত, এর ব্যবহার দেখা গেছে সাহিত্যে, শিল্পকলায়, চলচ্চিত্রে। এই জাদু বাস্তবতা এক কথায় কাকে বলে, তা বলা শক্ত, কারণ এর প্রয়োগগত বিভিন্নতা। কথাটা লেখক এবং সমালোচক উভয়ের ক্ষেত্রেই প্রযোজ্য। কেউ (লেখক বা সমালোচক) হয়তো এর ব্যবহার করলেন কোনো একটি বিশেষ ক্ষেত্রে কিন্তু অন্যক্ষেত্রে ঠিক একইরকম ভাবে ব্যবহার সংগত না-ও মনে হতে পারে। তবে, নামটিতে রয়েছে দুটি শব্দ— জাদু এবং বাস্তবতা, যা বস্তুত বিপরীতধর্মী উপাদান, তাদের জোর করে একত্রিত করার প্রয়াস আছে। বেশির ভাগ আলোচক জানাচ্ছেন জাদু বাস্তবতা সংজ্ঞায়িত করা কঠিন, যদিও কেউ কেউ তা করেওছেন।

সংজ্ঞার দরকার নেই, বৈশিষ্ট্যগুলি ধীরে ধীরে সূত্রায়িত হবে, কিন্তু তার আগে জাদু বাস্তবতা এই আখ্যার পূর্ব ইতিহাসটুকু জেনে নিলে সুবিধে হবে। এই আখ্যাটি সম্ভবত জার্মান *Magischer Realismus* থেকে এসেছে, তারপর এটি ডাচ ভাষায় অনূদিত হয় *Magisch-realisme*, এই পথ বেয়ে স্পেনীয় *realismo màgico* এবং ইংরেজি' magic realism' ব্যাপারটা চালু হয়ে গেছে। কেউ বলেন স্পেনীয় *lo real maravilloso* থেকে অনূদিত হয়ে গড়ে ওঠে ইংরেজি marvellous realism এবং marvellous reality, পরে স্পেনীয় *realismo magico* থেকে গড়ে ওঠে ইংরেজি magical realism এবং ক্বচিৎ màgico realism কথা দুটি। প্রতিবারই অনুবাদের ক্ষেত্রে আখ্যা এবং উৎসের সম্পর্ক অস্পষ্ট হয়ে যায়, বিভ্রান্তি জন্ম নেয়। জার্মান *Magischer Realismus* আখ্যাটি তৈরি করা হয় ১৯২০-র দশকে জার্মানি- তে ভাইমার রিপাবলিক-এর চিত্রকলা সূত্রে, যে চিত্রে আপাত বাস্তবের অন্তরালে জীবন রহস্যকে ধরার প্রয়াস ছিল। এই ১৯১৯—২৩ কালটা ছিল রাজনৈতিক ভঙ্গুরতা, রাজনৈতিক হিংস্রতার সময়। কাইজার পালিয়েছে, বাম ডান বিপ্লবী দলগুলো যুদ্ধ করছে, হিটলার-এর জাতীয় সমাজতন্ত্রী জার্মান শ্রমিক দলও এই যুদ্ধে লিপ্ত হয়েছে। আর জার্মানি-তে চূড়ান্ত অর্থনৈতিক দুরবস্থা, কারণ যুদ্ধে জার্মানি-র পরাজয়। ব্যাপক

মুদ্রাস্ফীতি, বিচ্ছিন্নতাবাদী ও বিপ্লবী কার্যকলাপে তৈরি হয়েছে জাতীয় সঙ্কট, কোয়ালিশন সরকার তা প্রশমিত করতে ব্যর্থ। জার্মানির অবস্থান ইউরোপের মূল ভূখণ্ড থেকে দূরত্বে, পুরোনো পৃথিবী ভাঙছে, ভবিষ্যৎ কোন্‌দিকে বলা যাচ্ছে না, দেশময় কোনোক্রমে বেঁচে থাকার মনোভাব (Sachlich keit) বাড়ছে। এই পরিস্থিতিতে শিল্পীরা সুভদ্র বস্তুগত বিচার ও প্রকাশবাদী (Expressionist) মানবিকতা এবং যুক্তিবিচারে আস্থা রাখতে না পেরে দ্বিধান্বিত, শঙ্কিত। এই অবস্থায় জার্মান শিল্প সমালোচক ফ্রাঞ্জ রো ভাইমার প্রজাতন্ত্রের শিল্প আন্দোলনের আলোচনা সূত্রে প্রকাশবাদী আন্দোলনের সঙ্গে, ভ্যান গখ ও পরাবাস্তববাদী শিল্পের ভিন্নতা প্রদর্শন করতে গিয়ে জাদু বাস্তবতার বাইশটি বৈশিষ্ট্যের কথা বলেন এবং পরাবাস্তববাদের সঙ্গে জাদু বাস্তববাদের সম্পর্ক ও স্বাতন্ত্র্যের কথাও তুলে ধরেন। জাদু বাস্তবের লক্ষ্য বস্তুজগৎ। বস্তুজগতে মানুষ ও অন্য প্রাণীর প্রকৃত অস্তিত্ব, পরাবাস্তবের লক্ষ্যও হয়তো এক, কিন্তু প্রকাশ অনেক বেশি বুদ্ধিগত, মনস্তত্ত্বগত। তবে রো বললেন জাদু বাস্তববাদী চিত্রে কংক্রিট অবজেক্ট-এর রহস্য তুলে ধরতে হবে বস্তুসম্মতভাবে। তিনি ফ্রয়েড এবং য়ুং-তত্ত্বে উৎসাহী হতে বললেন শিল্পীদের। এই গোলমেলে পরিস্থিতির কারণ হল জাদু বাস্তব ও পরাবাস্তব একই সময়ে গড়ে ওঠে, দুয়ের মধ্যে কিছুটা মিলও আছে। কিউবা-র জাদু বাস্তববাদী ঔপন্যাসিক আলেহো কার্পেন্তিয়ের রো-র চিন্তাও পরাবাস্তববাদীদের দ্বারা অনুপ্রাণিত। জাদু বাস্তববাদী চিত্র আন্দোলন জার্মানিতেই সীমাবদ্ধ থাকেনি, প্রভাব ছড়িয়েছে ফ্রান্স, হল্যান্ড, ইতালি, নিউ ইয়র্কে-এও। রো-র এ-সংক্রান্ত চিন্তা ইতালীয় লেখক মাসসিমো বোন টেমপেল্লি (১৮৭৮—১৯৬০)-কে ভীষণ ভাবে প্রভাবিত করে, যদিও একসময় ইনি ফ্যাসিবাদেও আকৃষ্ট হন। এঁর লেখা অবশ্য অনেক বেশি ফ্যানটাসি-ঘেঁষা, পরাবাস্তব-ঘেঁষা, তবে জাদু বাস্তব লেখালিখির গোড়াকার কথাসূত্রে তাঁর নামোল্লেখ করা হয়। রো-র যে-বইতে জাদু বাস্তববাদের আলোচনা ছিল তার কয়েকটি অধ্যায় স্পেনীয় ভাষায় অনুবাদ করেন ফের্নান্দো ভেলা, এবং তা মাদ্রিদ থেকে প্রকাশিত হয়। এই বইটি লাতিন আমেরিকা-য় ছড়িয়ে পড়ে ব্যাপক ভাবে, মিগুয়েল অ্যাঞ্জেল আস্তুরিয়াস এবং হোর্গে লুই বোরহেস বইটির গুরুত্ব স্বীকার করেন, এবং অনেক ইউরোপীয় বইয়ের অনুবাদ লাতিন আমেরিকার পাঠকদের কাছে তুলে ধরেন। তৃতীয় গুরুত্বপূর্ণ ব্যাপার ফরাসি-রুশ-কিউবান আলেহো কার্পেন্তিয়ের এবং ভেনেজুয়েলান আর্তুরো উস্‌লার-পিয়েত্রি-র ভূমিকা। বিশ ও ত্রিশের দশকে প্যারিস-এ বাসকালীন তাঁরা দুজনই ইউরোপীয় শিল্প আন্দোলনগুলির দ্বারা যথেষ্ট প্রভাবিত হন। কার্পেন্তিয়ের ইউরোপ থেকে কিউবা ফিরে, হাইতি ঘুরে এসে এক স্পষ্ট লাতিন আমেরিকান জাদু বাস্তববাদের উপরে জোর দেন, গড়ে তোলেন এক নতুন আখ্যা— *lo realismo maravilloso*। তিনি এই নতুন আখ্যা মারফত বিভিন্ন সাংস্কৃতিক পদ্ধতির, অভিজ্ঞতার নানাত্বকে মিশিয়ে এক অনন্য আবহনির্মাণে, লাতিন আমেরিকা-র বাস্তবতার স্বাতন্ত্র্য প্রকাশে বিকল্প দৃষ্টিভঙ্গির উপর জোর দেন। কার্পেন্তিয়ের-কেই লাতিন আমেরিকান জাদু বাস্তবতার প্রবক্তা বলা হয়ে থাকে। তিনি প্রথমে তাঁর বক্তব্যকে রূপ দিলেন ভেনেজুয়েলা-র 'El Nacional' পত্রিকায় একটি প্রবন্ধে, তারপর বিস্তারে গেলেন ১৯৪৯-এ প্রকাশিত *El reino de este mundo*— শীর্ষক উপন্যাসের প্রস্তাবনায়। এই রচনাটিতে তিনি রো-র জাদুবাস্তব-সংক্রান্ত বক্তব্যকে শীতল কৃত্রিম এবং ক্লান্তিকর ভান বলে নিজ বৈশিষ্ট্যকে উপস্থাপিত করলেন, বললেন সম্ভব অসম্ভাব্যতার একত্র অবস্থান এবং অবিশ্বাস্য মিশ্রণ যা জাদুবাস্তবতায় থাকে তা লাতিন আমেরিকা-র ইতিহাস, ভূগোল, বিভিন্ন সম্প্রদায় ও রাজনীতির সহাবস্থান থেকেই স্বভাবত উঠে আসতে পারে। আর একজন গল্পলেখক আর্তুরো উসলার-পিয়েত্রি

ভেনেজুয়েলার কিছু গল্পকারকে প্রেরণা দিলেও তিনি অনেকটাই রো-প্রবর্তিত মতবাদ প্রকাশবাদ পরবর্তী জাদু বাস্তবের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট— এই বক্তব্যকে সমর্থন করেন। তিনি মনে করতেন এই জাদু বাস্তবতা 'ভানগার্দিয়া' আধুনিক নিরীক্ষণ প্রবণতার ফলশ্রুতি। তবে উসলার পিয়েত্রি কার্পেন্তিয়ের-এর ব্যক্ত চিন্তা থেকে দূরে, লাতিন আমেরিকা-র বাইরে সুপরিচিত নন। অন্য দিকে জাদুবাস্তববাদী লেখককুলের শিরোমণি গাব্রিয়েল গার্সিয়া মার্কেজ কার্পেন্তিয়ের-কথিত চিন্তার অনুগামী।

অ্যাঞ্জেল ফ্লোরেস তাঁর ১৯৫৫-তে প্রকাশিত প্রবন্ধে Magical Realism কথাটি ব্যবহার করার পক্ষপাতী ছিলেন এবং তিনি হোর্গে লুই বোর্হেস-কেই প্রথম ম্যাজিক রিয়ালিস্ট লেখক বলতে চান। তিনি উসলার-পিয়েত্রি ও কার্পেন্তিয়েরকে লাতিন আমেরিকা-য় জাদুবাস্তবের প্রবর্তকের সম্মান না দিয়ে বলতে চান জাদু বাস্তববাদ স্পেনীয় ভাষার সাহিত্যের রোমান্টিক রিয়ালিস্ট ঐতিহ্যের পাশাপাশি ইউরোপীয় সাহিত্যের ধারানুসরণ। ফ্লোরেস-এর মতে লাতিন আমেরিকা-র জাদু বাস্তববাদের প্রেরণা জুগিয়েছিলেন ষোড়শ শতাব্দীর মিগুয়েল দে সাভেদ্রা সেরভান্তেস ও বিংশ শতাব্দীর চেক-অস্ট্রিয়ান লেখক ফ্রাঞ্জ কাফকার লেখা, সামান্যত রো-র রচনা, আর চিত্রে ইতালীয় চিত্রকর জিওর্জিয়ো দে চিরিক। ফ্লোরেস বলতে চান, লাতিন আমেরিকান জাদু বাস্তবতা ইউরোপীয় সাহিত্য-প্রভাবিত, বোর্হেস এর যথার্থ উদাহরণ। স্পেন-এ থাকার সময় বোর্হেস উল্ট্রাইসমো আন্দোলনের দ্বারা প্রভাবিত হন এবং এই আন্দোলন-অনুসারী ন্যূনতম কাব্যপ্রকরণে কবিতা রচনা, অলংকার ও সেন্টিমেন্টবর্জিত সংযোগরহিত মেটাফর প্রয়োগ প্রভৃতি আনতে চেয়েছিলেন লাতিন আমেরিকা-র সাহিত্যে। তিনি কাফকা-র দ্বারাও যথেষ্ট প্রভাবিত হন, কাফকা-র বেশ কিছু লেখা স্প্যানিশ-এ অনুবাদও করেন। তাঁর *El arte narrativo y la magi*a (১৯৩২) প্রবন্ধটিও এ-সূত্রে উল্লেখ্য। ফ্লোরেস-এর প্রবন্ধটি প্রকাশের পর জাদু বাস্তববাদ নিয়ে নতুন করে ভাবনাচিন্তা শুরু হয়, ১৯৫৯-তে। কিউবা-র বিপ্লবের সাফল্যের পর লাতিন আমেরিকান সাহিত্যে জাদু বাস্তববাদ নিয়ে প্রাবন্ধিক ও লেখকদের মধ্যে ভাবনাচিন্তা ব্যাপকভাবে শুরু হয়। অনেক লেখক জাদু বাস্তববাদী গল্প-উপন্যাস রচনায় প্রবৃত্ত হন, তার সঙ্গে ইউরোপীয় আধুনিক সাহিত্যশৈলীও মেশাতে থাকেন। গার্সিয়া মার্কেজ যেমন বলেছিলেন তাঁর কথাসাহিত্যে কাফকা ও জয়েস-এর প্রভাব আছে, ফকনার-এর কাছেও তিনি ঋণ স্বীকার করেছেন। লাতিন আমেরিকান, জাদুবাস্তববাদী লেখক হিসেবে কার্পেন্তিয়ের এবং বিশেষ করে গার্সিয়া মার্কেজ আন্তর্জাতিক খ্যাতি ও স্বীকৃতি পাবার পর লোকের একটা ভুল ধারণা হয়েছে যে জাদু বাস্তববাদ মানেই লাতিন আমেরিকান ধারণা। তা কিন্তু নয়— এই জাদু বাস্তববাদ আছে ভারত, কানাডা, আফ্রিকা, যুক্তরাষ্ট্র প্রভৃতি দেশের কথাসাহিত্যিকদের রচনায়। সালমন রাশদি, টনি মরিসন, আনা কাস্তিল্লো, মিলান কুন্দেরা, ডি. এম. থমাস প্রভৃতির লেখাতেও জাদু বাস্তবতার উপস্থিতি লক্ষণীয়।।

যেহেতু জাদু বাস্তববাদ আখ্যাটি বিতর্কিত, এর ইতিহাস জটিল, তাই এর সঙ্গে বাস্তববাদ, পরাবাস্তববাদ, রূপক, ফ্যানটাসি-র সম্পর্ক নিয়ে কিছু কথা বলা দরকার। জাদু বাস্তববাদ আখ্যার 'জাদু' কথাটির নানা ব্যাখ্যা হয়েছে। জাদু বলতে বুঝি অ-সাধারণ সংঘটন, ভৌতিক বা বিজ্ঞান ব্যাখ্যাতীত কোনো ঘটনা। কিন্তু জাদু বাস্তববাদে জাদু কথাটি জীবনরহস্য অর্থেই আসে, ভূতের আবির্ভাব লোকজনের অদৃশ্য হয়ে যাওয়া, অলৌকিক ব্যাপার, অ-সাধারণ ক্ষমতা, অদ্ভুত আবহ, এ-সবই আনা হয় কিন্তু বাস্তবকে বোঝানোর জন্য। জাদুর খেলা, জাদুকরের কারসাজি— জাদু বাস্তবের সঙ্গে এর সম্পর্ক নেই। অন্যদিকে কাকে বলে বাস্তব তা

নিয়ে তর্ক চলছে আরিস্টটল-এর কাল থেকে, অষ্টাদশ শতাব্দীর এমনকি উনবিংশ শতাব্দীর মাঝখানেও। আয়ান ওয়াট বলেন আধুনিক বাস্তববাদের উৎসে আছে দেকার্ত ও লক-এর চিন্তাভাবনা। বাস্তববাদ কথাসাহিত্যের ক্ষেত্রে জরুরি ব্যাপার। আর বাস্তববাদের সূত্রে আসে পরাবাস্তববাদের কথা। জাদু বাস্তব এবং পরাবাস্তব এ-দুটোই সাহিত্য ও শিল্পের আন্দোলন কিন্তু পরাবাস্তব বাস্তব সাহিত্যের প্রতি খড়্গহস্ত, কারণ তা বুর্জোয়া সমাজের ধারণা, কিন্তু জাদুবাস্তব বাস্তবকে অবজ্ঞা করে না। পরাবাস্তবের কারবার বাস্তবতারহিত মানব-অস্তিত্ব নিয়ে যতটা, বস্তুজগৎ নিয়ে ততটা নয়। পরাবাস্তব কল্পনা ও মন নিয়ে আগ্রহী, অন্তর্জীবন, মানবমনস্তত্ত্বকে আনতে চায় শিল্পে। কিন্তু অ-সাধারণ, জাদু বাস্তববাদে, তা ক্বচিৎ আসে স্বপ্ন বা মনস্তত্ত্বগত অভিজ্ঞতা মারফত, বরং এখানে জাদু ঘটানো হয় স্পর্শযোগ্য, বস্তুসত্য নিয়েই। পরাবাস্তব সংজ্ঞায়িত হয়েছিল, তার ম্যানিফেস্টো বার করেছিলেন ব্রেত, কিন্তু জাদুবাস্তব চর্চাকারীরা সংজ্ঞা দেননি, ম্যানিফেস্টো বার করেননি। জাদুবাস্তব আলোচনা সূত্রে এসে পড়ে ফ্যানটাসি-র কথা। ভুল করে জাদুবাস্তববাদী সাহিত্যকে ফ্যানটাসি-ও বলেছেন কেউ কেউ। কিন্তু তা ঠিক নয়। রাশদি-র মতো কাফকা-র রচনা নিয়েও এই গণ্ডগোল, কিন্তু আলোচকরা অনেকেই বলেছেন কাফকা-র রচনা রূপক ধাঁচের (allegoric), *গালিভারস ট্র্যাভেলস্*, যেমন। রাশদি-র অনেক লেখাতেও রাজনৈতিক ব্যাপার-সাপারকে রূপক ধাঁচে উপস্থাপন আছে। *মিডনাইটস্ চিলড্রেন* যেমন স্বাধীনতা-পরবর্তী ভারতবর্ষের ত্রিশ বছরের রূপক-আখ্যান। তবে রাশদির লেখায় জাদুবাস্তব-এর ঝোঁকও আছে।

পাঠকসমাজে একটা ভুল ধারণা আছে যে, জাদুবাস্তবতার একমাত্র ভূমি লাতিন আমেরিকা। কথাটা অসত্য, যদিও লাতিন আমেরিকাই জাদুবাস্তবতা বিকাশের উপযুক্ত ভূমি বলে অনেকে মনে করেন। জাদুবাস্তব উপন্যাসে থাকে গ্রামীণ আবহ, অথবা রাজনৈতিক শক্তিকেন্দ্র, আর থাকে এক কাল্পনিক অঞ্চল। গার্সিয়া মার্কেজ-এর অনেকউপন্যাসে আছে মাকোন্দো নামে একটা বানানো নগর, যা কোলোম্বিয়ার ক্যারাবিয়ান উপকূলে অবস্থিত। টনি মরিসন-ও গ্রামীণ আবহ, ছোট্ট নগর বেছেছেন। তবে, যে-সব রাজনৈতিকতা-ভাবিত লেখক এ-ধরনের উপন্যাসে ব্রতী তাঁরা বেছেছেন বড়ো বড়ো শহর, যেখানে আছে রাজনৈতিক ও সামাজিক টেনশন। সালমন রাশদি-র উপন্যাসে আছে লন্ডন, মুম্বাই, নিউ ইয়র্ক-এর প্রশস্ত নাগরিক এলাকা। তাছাড়া জাদু বাস্তব উপন্যাস চিত্রিত হয় রাজনৈতিক ক্ষমতা-বঞ্চিত মানুষজনের পরিপ্রেক্ষিত থেকে, গল্প তৈরি হয় রাজনৈতিকক্ষমতাবঞ্চিত প্রান্তিক মানুষ ও প্রভাববিস্তারী সমাজ নিয়ে, উত্তর-ঔপনিবেশিক দেশের মানুষ পূর্বতন শাসকদের বিরুদ্ধে লড়ছে— এসব নিয়ে।

এবার লাতিন আমেরিকা-র জাদু বাস্তব ঔপন্যাসিকদের সম্পর্কে পরিচয়ের একটা রূপরেখা উপস্থিত করা যাক। এখানে মনে রাখা যায় যে এইসব লেখকরা নানা দেশের সঙ্গে যোগ রাখতেন, নানা দেশ ঘুরতেন। গার্সিয়া মার্কেজ-এর যুগান্তকারী উপন্যাস *একশত বৎসরের নিঃসঙ্গতা* লেখা হয় ১৯৬৭-তে মেক্সিকো-য়, ১৯৭০-এ আর্জেন্তিনা-য় প্রকাশিত হয়। প্রকাশের আগেই উপন্যাসটি পড়েছেন মেক্সিকো-র লেখক কার্লোস ফুয়েন্তেস এবং কিউবান হুলিয়ো কোর্তাজার। পেরু-র লেখক মারিও ভার্গাস য়োশা বই লিখলেন গার্সিয়া মার্কেজ-কে নিয়ে। আলেহো কার্পেন্তিয়ের ইউরোপীয় এবং লাতিন আমেরিকান জাদুবাস্তবতার পার্থক্য নির্দেশ করেছিলেন। তাঁর মতে প্রথমটিতে আছে ক্লান্তিকর ভান, যার সঙ্গে সাংস্কৃতিক প্রসঙ্গের জাদুময় যোগ নেই, আর ইউরোপ জাদু বলতে বোঝে রূপকথা, মিথ, সেখানে ন্যারেটিভ করণকৌশল আছে, সাংস্কৃতিক বিশ্বাস নেই। ১৯৫৯-এ কিউবার বিপ্লবের সাফল্যের কালে এসবে ব্যস্ত

কার্পেন্তিয়েরে এর দশ বছর আগেই লিখেছিলেন বিখ্যাত জাদুবাস্তব উপন্যাস— *এই মর্ত্যের রাজত্ব*। সেখানে প্রস্তাবনায় তিনি বলেন এ-এক নতুন জাদু বাস্তবতা, যা একান্তভাবে লাতিন আমেরিকা-র, এখানেই প্রাসঙ্গিক। হাইতি-র পটভূমিতে রচিত এ-উপন্যাসে ১৮০০ সালের দাস বিদ্রোহের কথা বলতে গিয়ে তিনি আফ্রিকান আমেরিকান সংস্কৃতি ও বিশ্বাস চর্চার, বিশেষ করে ভুডু সংস্কৃতির কথা আনেন, চরিত্রেরা ইচ্ছেমতো আকার বদলাতে পারে আর মৃত্যুকালে উড়ে যেতে পারে। কেন্দ্রীয় চরিত্র তি নোয়েল ভুডু সংস্কৃতি বিষয়ে কিছুটা সংশয়ী, তবু তাকে মাকান্দাল আফ্রিকান মিথলজি শেখায় যাতে সে দাস বিদ্রোহে শক্তিমান হতে পারে। এ উপন্যাসে যে মিশ্র সংস্কৃতির কথা আছে, যেটা লাতিন আমেরিকা-র সত্তার অন্তর্গত, সেটাই এখানে সংস্কৃতি-সত্তা প্রকাশে জাদু বাস্তবকে উপন্যাসের যোগ্য করে তোলে। স্থানীয় দেবতা 'কেজা কোট্‌ল' মায়া ও আজটেক সংস্কৃতি ও বিশ্বাসের প্রতিমূর্তি, যার মধ্যে এই দেশের নানা সংস্কৃতির সমন্বয় ঘটেছে। স্থাপত্যের বারোক রীতিকে তিনি উপন্যাসের শৈলী করে নেন। এইভাবে ইউরোপীয় সংস্কৃতি স্বীকার ও বর্জনের জটিল পথ বেয়ে চলেন কার্পেন্তিয়ের।

এই ভারসাম্য রচনার জটিলতর প্রয়াস ছিল গুয়াতেমালা-র ঔপন্যাসিক মিগুয়েল অ্যাঞ্জেল আস্তুরিয়াস-এর, যাঁর জাদু বাস্তব, ইউরোপীয় প্রকাশবাদ-পরবর্তী ফর্মের কাছাকাছি, কিন্তু বিষয় মায়া মিথলজি, গুয়াতেমালা-র দেশি লোকজনের উপর ঔপনিবেশিক পীড়ন। তাঁর *য়োমব্রে দে মাইজ* বা *ভুট্টা মজুর* (১৯৪৯) গ্রন্থে মায়া সভ্যতার পোপোল-ভূ পবিত্র পঞ্জিকা নির্ভর করে সনাতনি দেশজ রীতিতে গল্প বলা হয়েছে। এখানে কালানুক্রমিক ঘটনাধারার পরিবর্তে সম্পর্কবিহীন গল্পমালা যা পাঠকের মনে গড়ে তোলে পুরো একটা গল্প আর চরিত্রগুলোর চারপাশে মায়া মিথলজির উষ্ণ চাপ। এখানে জাদু বাস্তব হল ইউরোপীয় দৃষ্টিকোণ থেকে পরস্পর অভিঘাতে আসা সাংস্কৃতিক প্রসঙ্গ, যা আবার মায়া সভ্যতা-প্রভাবিত। যেমন— প্লট কাঠামোয়—বৃষ্টিনারী, ভুট্টাজননীর উল্লেখে মায়া মিথ-এর আভা। একসময় জাদুবাস্তববাদী উপন্যাস এবং নব্য উপন্যাস এ-দুয়ের নিকট সম্পর্ক গড়ে উঠল লাতিন আমেরিকা-য়। গাব্রিয়েলা গার্সিয়া মার্কেজ-র কথা ধরা যাক। তাঁর *একশো বছরের নিঃসঙ্গতা*-য় (১৯৬৭) আছে নিরীক্ষা, রাজনৈতিক ও সামাজিক উদ্দেশ্যপ্রবণতা, বিশেষত লোকসাহিত্য ব্যবহার মারফত, আর আছে সাধারণ মানুষ। কার্পেন্তিয়েরে-এর রচনা মুখ্যত বাস্তবপন্থী, সেখানে কিছু জাদু ঘটনা বিস্ময়সহ উপস্থিত, যেমন এক দাস বিদ্রোহী তার হত্যাকারীর কাছ থেকে উড়ে পালাচ্ছে, দাসের সঙ্গীসাথিরা দেখে খুশি হচ্ছে। কিন্তু গার্সিয়া মার্কেজের উপন্যাসটির আবহ স্মৃতি রোমন্থনের আর তাতে আছে মাঝে মধ্যে জাদু ঘটনা— লেজসহ শিশুর জন্ম, যেন রোজ তা ঘটে। *একশো বছরের নিঃসঙ্গতা* এক পরিবারের ইতিহাস, যাতে স্মৃতি রোমন্থনে উঠে আসে মনোরম অদ্ভুতত্ব ও আতঙ্ক। এখানে বয়ানের আড়ালে আছে সহস্র দিনের যুদ্ধের মতো দেশজ অশান্তি, সরকারি নিষ্ঠুরতা (লা ভিওলেন্সিয়া, ১৯৪৮-৫৮), আর শুধু কার্পেন্তিয়েরে-সুলভ সাংস্কৃতিক বিচিত্রতা দেখানো নয়, সেখানে এসেছে কোলোম্বিয়ার মানসিক ক্ষত, বিভ্রান্তি, নিপীড়নের আতিশয্য। নোবেল পুরস্কার পাবার বক্তৃতায় গার্সিয়া মার্কেজ ব্যাখ্যা করেছিলেন কীভাবে লাতিন আমেরিকা-র ভয়াবহ অতীত ও বর্তমান প্রভাব ফেলেছে জাদু বাস্তববাদে। তা ছাড়া শুধু সাংস্কৃতিক মিশ্রণ দেখানোই নয়, নিজ সংস্কৃতি প্রসঙ্গকে গার্সিয়া মার্কেজ মূল্য দিতে গিয়ে তাঁর ঠাকুমার মুখে মুখে গল্প বলার রীতিকে ব্যবহার করেন। লেখকের শৈশব অতিবাহনের কালের ভুতুড়ে বাড়ি, নানা কুসংস্কারের বাতাবরণ জাদুবাস্তববাদের যোগ্য পরিবেশ গড়ে তোলে, আসে মধ্যযুগ থেকে বর্তমান কাল পর্যন্ত আফ্রিকান ও হিস্পানি সংস্কৃতির সমন্বয়। তাঁর শৈশবস্থান হয়ে ওঠে

উপন্যাসের মাকোন্দো, যা আরও কয়েকটি উপন্যাসে আছে। তাঁর উপন্যাসে নস্টালজিয়া এবং খেয়ালিপনার আড়ালে রাজনৈতিক অভিঘাত গুরুত্ব হারায় বলে গার্সিয়া মার্কেজ সমালোচিত হলেও, অনেকে মনে করেন অপ্রত্যক্ষ রাজনৈতিক প্রতিরোধের শক্তিশালী ফর্ম হিসাবে জাদুবাস্তবতার সম্ভাবনা অনেক বেশি। তা ছাড়া সংঘবদ্ধ ধর্মের কথাবার্তার বদলে গার্সিয়া মার্কেজ ব্যবহার করেছেন লোকসাহিত্য, যাতে পাওয়া-না-পাওয়া মানুষের স্বর ধৃত হয়। রাজনৈতিক কথাবার্তা বলার জন্যই জাদুবাস্তবতার কৌশল তাঁর একাধিক লেখায় দেখা যায়।

ইসাবেল আইয়েন্দে জাদুবাস্তববাদী মহিলা ঔপন্যাসিক হিসেবে স্বীকৃতি পান তাঁর *ভূতেদের বাড়ি* (১৯৮২) উপন্যাসের জন্য, যাতে গার্সিয়া মার্কেজ-এর শৈলী অনুসৃত, অনুভবের ভিন্ন মাত্রাও ছিল। সদৃশ শৈলী— ডিটেলে মনোযোগ এবং কখনও নস্টালজিয়া-য়। *ভুতুড়ে বাড়ি* এবং *একশো বছরের নিঃসঙ্গতা* দুটোই পারিবারিক সাগা, দুটোতেই এক প্রজন্ম থেকে অন্য প্রজন্মে একই নামের ব্যবহার, জাদু গল্পমালা থাকলেও, প্রথম উপন্যাসটির শুরুতেই ভূত প্রেত, অ-সাধারণ ঘটনা, ইন্দ্রিয়াতীত অনুভব, আতিশয্য (ক্লারার কুকুর অতিকায়, কুকুর ও ঘোটকীজাত বলে ব্যাখ্যা দেওয়া হয়) থাকলেও একটি অধ্যায়ে আইয়েন্দে সরকারি নিপীড়নের ভয়াবহ আতঙ্ককে বাস্তববাদী ন্যারেটিভ-এর ধাঁচে উপস্থিত করেন, তখন ভৌতিকতার পরিবর্তে মিলিটারি শাসনের তীব্রতা, জনসংগ্রামের প্রচার বড়ো হয়ে ওঠে। অবশ্য আল্‌বা নাম্নী নারী তার ঠাকুমার ডায়েরি থেকে প্রজন্ম পরিবর্তন এবং রাজনৈতিক মূল্যায়নকে উপস্থিত করছে— এই কৌশলটাও ব্যবহৃত।

এবার নজর দেওয়া যাক ইংরেজি-ভাষী জগতে। ১৯৭০-এর দশকে কানাডা, পশ্চিম আফ্রিকা, আমেরিকা-য় এই ধাঁচের উপন্যাস লেখা শুরু হয়, ছড়িয়ে যায় অন্যত্র। সুপরিচিত লেখক সালমন রাশদি, যাঁর রচনাশৈলীতে পরাবাস্তববাদী এবং লাতিন আমেরিকার মিথ-প্রাণিত জাদু বাস্তবরীতির মিশ্রণ ছিল। রাশদি এ-ব্যাপারে গার্সিয়া মার্কেজ, গুন্টার গ্রাস, বুলাগাকভ-এর প্রভাবের কথা স্বীকার করেছেন। অ্যাঞ্জেলা কার্টার আশি ও নব্বই দশকের নারী ঔপন্যাসিক জাদুবাস্তব রীতিতে যে-সব উপন্যাস লেখেন (যেমন— *বিজ্ঞ ছেলেমেয়েরা,* ১৯৯১) তাতে শেকসপিরীয় কমেডি, বাখতিন-এর তত্ত্বের অভিঘাত ছিল। ইংরেজিতে যাঁরা জাদুবাস্তববাদী রীতিতে উপন্যাস লিখছেন তাঁরা প্রায় সকলেই ব্রিটিশ ঔপনিবেশিকতা-বিরোধী, আর তাঁদের রচনায় রাজনৈতিকভাবনা মুখ্য হয়ে ওঠে। ভারতীয় ইংরেজি ভাষার এই ধারার লেখক অমিতাভ ঘোষ ও অরুন্ধতী রায়। এই সূত্রে আমরা কানাডা-র রবার্ট ক্রোয়েচ্, জ্যাক হজিন্স্, মাইকেল অনডাট্‌জে, আফ্রিকার বেন ওক্‌রি, আমোস টুটুয়োলা, আন্দ্রে ব্রিঙ্ক, টনি মরিসন, প্রভৃতির নাম উল্লেখ করতে পারি।

Maggie Ann Bowers বলতে চান অধিকাংশ জাদুবাস্তববাদী লেখককে বলা যায় উত্তর-ঔপনিবেশিক। (*Magical Realism,* p. 95) যদিও উত্তর-ঔপনিবেশিক বললেই জাদু বাস্তববাদী বোঝায় না। বাওয়ার্স-এর মতো Elleke Boehmer-ও এ-বিষয়ে একমত পোষণ করেন। (*Colonial and Post Colonial Literature : Migrant Metaphors,* p. 235) এ ব্যাপারে প্রণিধানযোগ্য আলোচনা করেছেন Stephen Slemon, তাঁর মতে জাদু বাস্তব তিনভাবে উত্তর-ঔপনিবেশিক ব্যাপারকে প্রকাশ করতে পারে। (ক) ন্যারেটিভ স্ট্রাকচার-এর দুটো দিক থাকায় জাদু বাস্তববাদী রচনা উত্তর-ঔপনিবেশিক প্রসঙ্গকে উপনিবেশকারী এবং উপনিবিষ্ট— এই দুয়ের দৃষ্টিকোণ থেকে উপস্থিত করতে পারে এবং তা ন্যারেটিভ কাঠামো এবং থিম দুদিক থেকেই। (খ) জাদুবাস্তববাদী রচনা এমন ক্ষেত্রে এমন একটা টেক্সট উপস্থিত করতে পারে যা

প্রতিনিধিত্ব করণের (উপনিবেশকারী, উপনিবিষ্ট) টেনশন এবং ফাঁক উন্মোচন করে দিতে পারে। (গ) উপনিবিষ্টের দৃষ্টিকোণ থেকে হারিয়ে যাওয়া মানুষের টুকরো কথা, স্বর অথবা অন্তর্গত ইতিহাসকে পুনরুদ্ধার করে সাংস্কৃতিক প্রতিনিধিত্ব করণের মধ্যকার ফাঁককে পূরণের প্রচেষ্টা চালাতে পারে। ['Magic Realism as Post Colanial Discourse' প্রবন্ধ, Lois Parkinson Zamora ও Wendy B. Faris সম্পাদিত *Magical Realism : Theory, History, Community*, 1988]

শ্লেমন জাদুবাস্তববাদী উত্তর-ঔপনিবেশিক রচনা হিসেবে কানাডিয়ান লেখক Jack Hodgins-এর *পৃথিবী আবিষ্কার* (১৯৭৭) এবং Robert Kroetsch-এর *কাকেরা কি বলেছিল* উপন্যাস দুটির কথা উল্লেখ ও আলোচনা করেন। দক্ষিণ আফ্রিকা-র লেখক Andre Brink-এর জাদু বাস্তববাদী উপন্যাস *শয়তানের উপত্যকা* (১৯৯৯) এবং *বালুকা কল্পনা* (১৯৬৬) লেখা হয়েছে উত্তর-ঔপনিবেশিক, উত্তর-অ্যাপারথায়েড, বঞ্চিতের ও আফ্রিকান পুরুষ— এদের দৃষ্টিকোণ থেকে। Michael Dash-ও অনুরূপ প্রবণতা লক্ষ করেছেন ক্যারিবিয়ান কোনো কোনো লেখকের মধ্যে। যেমন— Wilson Harris এর *ময়ূরের প্রাসাদ*, ১৯৯৮।

জাদু বাস্তববাদের প্রয়োগে শুধু বড়োদের কথাসাহিত্যেই নয়, শিশুসাহিত্যে, চলচ্চিত্র, চিত্রকলার ক্ষেত্রেও দেখা গেছে। ইংরেজ লেখিকা Edith Nesbit-এর *পাঁচটি বাচ্চা এবং এইটি* এবং *ফিনিক্স ও কার্পেট* (১৯৭৯)-কে উদাহরণ হিসেবে ধরা যেতে পারে। তুলনায় আধুনিক উদাহরণ ইংরেজ Michael Bond-এর *প্যাডিংটন নামে এক ভালুক* (২০০১) এবং আমেরিকান E. B. While-এর *ছোট্ট স্টুয়ার্ট* (১৯৬৯)। এসব লেখায় আছে বর্ণিত প্রাণীদের মধ্যে মানব শিশুর বৈশিষ্ট্য, প্রাণীদের আটপৌরে আচরণের মধ্যে ভিন্ন দৃষ্টিকোণ থেকে অনন্যতা আবিষ্কার। মেরি নর্টন তাঁর 'Bednob and Broomstick' গল্পে জাদু শক্তিময় বড়োদের দ্বারা অবহেলিত শিশু চরিত্রদের একঘেঁয়ে জীবন থেকে বার আনতে চেয়েছেন। সাধারণত চলচ্চিত্রে জাদুবাস্তব উপেক্ষিত কিন্তু অনালোচিত নয়। ফ্রেডারিক জেমসন-এর *On Magic Realism in Film* (১৯৮৬) এ-প্রসঙ্গে দ্রষ্টব্য। Alfonso Arau ১৯৯২ সালে Laura Esquivel-এর উপন্যাস *Como Agua Para Chocolate* (*চকলেটের জন্য জল*) অবলম্বনে ওই নামেরই চলচ্চিত্র নির্মাণ করেছেন। এ-ছাড়া Frank Capra-র 'এ এক বিস্ময়কর জীবন' (১৯৪৬), Spike Jonze-এর 'জন মালকোভিচ হয়ে উঠে' (১৯৯৯), Brad Siberling-এর 'দেবদূতদের শহর' (১৯৯৭), Wim Wenders-এর 'ইচ্ছার ডানা' (১৯৮৭), Rotert Minkoff-এর 'ছোট্ট স্টুয়ার্ট' (১৯৯৯) প্রভৃতির নাম করা যেতে পারে। 'ইচ্ছার ডানা' চলচ্চিত্রটিতে আদ্যন্ত জাদুবাস্তববাদী দৃষ্টিকোণ আছে। Maggie Ann Bowers মন্তব্য করেছেন যে এইসব চলচ্চিত্র কিছু দার্শনিক প্রশ্ন (যেমন—ঈশ্বরের অস্তিত্ব, ভাগ্যের ভূমিকা, আত্ম সম্পর্কে ধারণা) তুলে ধরে, নিছকবিনোদনের থেকে এগুলো মাঝে মাঝে বড়ো হয়ে ওঠে। (পূর্বোক্ত pp. 114–115)। জাদুবাস্তবতার ধারণাটা প্রথম উঠেছিল চিত্রপ্রদর্শনী উপলক্ষে। সুতরাং চিত্রকলার জগতে এর প্রকাশ স্বাভাবিক। প্রথম বিশ্বযুদ্ধের আতঙ্ক, ভাইমার রিপাবলিক-এর গণ্ডগোল ছাড়াও জাদুবাস্তববাদী চিত্রকরদের প্রভাবিত করেছিল ইতালীয় শিল্পী জিওর্জিয়ো দে চিরিকো-র চিত্রাবলি। পরে প্রভাব এসেছে উত্তর আমেরিকা-র চিত্রকরদের কাছ থেকে। জাদুবাস্তববাদী কয়েকটি উল্লেখযোগ্য চিত্রের উল্লেখ করি— Alex Colville-এর 'To Prince Edward Island' (১৯৬৫) 'Otto Dix-এর 'Match Seller I' (১৯২০), Metropolis (১৯২৭) Giorgio De Chirico-র 'The Enigma of the Day' (১৯১৪), George Grosz-এর 'Gray Day'

(১৯২১), Edward Hopper-এর 'Early Sunday Morning' (১৯৩০), 'Newyork Movie' (১৯৩৯), Fride Kahlo-এর 'The Two Fridas' (১৯৩৯), 'The Broken Column' (১৯৪৪), 'Tree of Hope' (১৯৪৬), Alexander Kandolt-এর 'Still Life II', (১৯২৬), Georg Schrimpf-এর 'Landscape in the Bavarian Forest' (১৯৩৩) ইত্যাদি। প্রখ্যাত ঔপন্যাসিক কার্লোস ফুয়েন্তেস-এর মতে Frida Kahlo হচ্ছেন জাদু বাস্তববাদী চিত্রকরদের মধ্যে সবচেয়ে চোখে পড়ার মতো শিল্পী। সাহিত্যের মতো, জাদুবাস্তববাদী চিত্রকলারও প্রধান জায়গাটা হল—লাতিন আমেরিকা।

এবার উত্থাপন করা যাক বাংলাদেশ ও পশ্চিমবঙ্গে জাদু বাস্তবতার চর্চার কথা। কেউ কেউ বলেছেন শহীদুল জহিরের *জীবন ও রাজনৈতিক বাস্তবতা* (১৯৮৭) বাংলাদেশে এই ধারার প্রথম সার্থক উপন্যাস। এর বিষয়— বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধ। নাসরীন জাহান *চন্দ্রের প্রথম কলা* (১৯৯৪) উপন্যাসে জাদু বাস্তবতার বৈশিষ্ট্য কিছু কিছু আনতে সচেষ্ট হলেও *চন্দ্রলেখার জাদু বিস্তার* (১৯৯৫)-এ এই রীতির সার্থক পরিচয় আছে। তাঁর *সোনালী মুখোশ* এবং *উড়ে যায় নিশিপক্ষী* (১৯৯৯)-তেও এই রীতির অবলম্বন আছে। *চন্দ্রলেখার জাদুবিস্তার*-এ রূপকথার আবহে নির্মাণ করেন দেশজ সমাজব্যবস্থাকে, চকিতে এরশাদ-পরবর্তী বাংলাদেশকে। নিশি নাম্নী নারীকে কেন্দ্রে রেখে দুটি গল্প গড়ে ওঠে। আখতারুজ্জামান ইলিয়াস-এর *খোয়াব নামা* (১৯৯৬) জাদু বাস্তবতার উজ্জ্বলতম দৃষ্টান্ত। এখানে আছে অতীত ইতিহাসের নানা অভিঘাত— সন্ন্যাসী বিদ্রোহ থেকে তেভাগা কিংবা আরও সাম্প্রতিক অনেক প্রসঙ্গ— সঙ্গে রহস্যময়তা, অতিবাস্তব দৃশ্য নির্মাণ, যৌনতা, দারিদ্র্য ও ক্ষুধা প্রসঙ্গকে করে তোলে তীব্র, সঙ্গে চকিত সময় বদলের নৈপুণ্য, আকস্মিকতা, আতঙ্ক ও অব্যাখ্যেয় উপাদান। নাসরীন জাহান অনেকটা ইউরোপীয়, আখতারুজামান বরং লাতিন আমেরিকান জাদুবাস্তবের কথা মনে পড়িয়ে দেয়। পশ্চিমবাংলায় এ ধরনটি ব্যাপকতা পায় আশির দশকে, বামপন্থী আন্দোলন পর্যুদস্ত, জরুরি অবস্থার বাক্‌নিয়ন্ত্রণ প্রভৃতির পর। মহাশ্বেতা দেবীর—*টেরাডাকটিল পুরণ সহায় ও পিরথা* (১৯৮৭) জাদু বাস্তবতা লক্ষণাক্রান্ত বাংলা উপন্যাসের বিশিষ্ট নিদর্শন। মিথ, অলৌকিকত্ব (পাথরের চলাফেরায় বিশ্বাস, সূর্য দেবতা) ইত্যাদির সাহায্যে আদিবাসী সম্প্রদায়ের একালীন বিপন্নতা বুঝতে ও বোঝাতে চেয়েছেন লেখিকা। কিন্নর রায় এক আধা গ্রামের পটে সাম্প্রদায়িক সংকট, ওসামা বিন লাদেন-এর পুকুর পাড়ে এসে জেহাদের ডাক, বুনো বেড়ালের উকিলে রূপান্তর, বোমা বৃক্ষের আবির্ভাব দেখান *স্বপ্ন পুরাণ* (২০০২) উপন্যাসে। তাঁর *ধূলি চন্দন* (২০০৫) উপন্যাসের দুই হাতি জঙ্গলে আত্মগোপন করে থাকা নকশাল নেতাদের সঙ্গে কথা বলে। এখানে আছে ব্যঙ্গমা ব্যঙ্গমী, লোকগল্প-কথন পাখি, ডানাওলা সাপ, যারা দেশভাগের যন্ত্রণা, ঝাড়খণ্ড ও নকশাল আন্দোলনের ঝিলিক দিয়ে যায়। দেবর্ষি সারোগী তাঁর *পাঁচ পুরুষ*-এর একটি জীর্ণ অট্টালিকা ও প্রদীপ হাতে বৃদ্ধার বিচরণের মধ্য দিয়ে প্রজন্ম রূপান্তরের কথা বলেন। তাঁর *ভ্রমণসঙ্গী ঈশ্বর* (২০০৫)-এ এক উন্মাদ ঈশ্বরের সঙ্গী হয়ে বার্লিন, কলকাতার জাতীয় গ্রন্থাগার ও অন্যত্র ঘুরে বেড়ায়, প্রসঙ্গত আসে কলম্বাস-পূর্ব সভ্যতা, মিথিক্যাল হুরাকান, প্লেটো ইত্যাদির কথা। অধ্যায়ের নামগুলোও বিচিত্র— 'সৃজন', 'স্বাধীনতা', 'বিভ্রম' ইত্যাদি। রমানাথ রায়ের *কাঁকন* (২০০১) উপন্যাসের যুবতী কাঁকন হাসি ভুলে গেছে, তাকে হাসাতে সচেষ্ট দু ভাই, অর্ধমানব অর্ধপক্ষী গরুড়, আর তাকে বিয়ে করতে আগ্রহী যুবক প্রধানমন্ত্রী পর্যন্ত। শেষে কাঁকন গরুড়ের সঙ্গে উড়ে যায় স্বর্গের দিকে আর জেগে ওঠে হাসি।

জাদু বাস্তবতার কয়েকটি আঙ্গিকগত বৈশিষ্ট্য উল্লেখ করা যাক। এ ধরনের রচনায় থাকবে—(ক) বাস্তব, ফ্যানটাসি, উদ্ভটের মিশ্রণ বা পাশাপাশি অবস্থান। (খ) চকিত সময় বদলের নৈপুণ্য। (গ) ন্যারেটিভ বা প্লটের বিভিন্ন অংশ একত্র পাকানো বা গোলকধাঁধার প্লট। (ঘ) স্বপ্ন, মিথ, রূপকথা গল্পের নানাপ্রকার ব্যবহার। (ঙ) প্রকাশবাদী ও পরাবাস্তববাদী বর্ণনা। (চ) রহস্যময় পাণ্ডিত্য। (ছ) অবাক বা সহসা চমকের উপাদান। (জ) আতঙ্কময় ও অব্যাখেয়ের উপস্থিতি—ইত্যাদি। (*Dictionaay of Literary Terms and Literary Theory–J. A. Cuddon*, P. 522) আর একজন বলছেন— (ঝ) এখানে থাকবে ফ্যানটাসি ও অশিক্ষিত ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য বাস্তব, সমাজবাস্তবের সমন্বয়, উদ্দেশ্য সেই সত্যসন্ধান যা প্রাত্যহিকতার আড়ালে থাকে। (ঞ) লেখক প্রকৃতিতে, মানব আচরণে সন্ধান করে চলেন এক লুকোনো ক্ষমতা/শক্তি, বাস্তব এখানে ভাঙা, আর এই রদবদলের মধ্য থেকে প্রয়োজনীয় সত্যের কাছে পৌঁছে যান পাঠক। (ট) জাদু বাস্তববাদী রচনায় চাবি-ঘটনার কেন্দ্রীয় কোনো কার্যকারণগত, মনস্তত্ত্বগত ব্যাখ্যা থাকে না। (ঠ) জাদু বাস্তববাদী পরিপার্শ্বের বাস্তবকে অনুসরণ না করে তার আড়াল থেকে বেরুতে থাকা রহস্যকে ধরতে চায়। (*Magic Realism*, Joan Mellen p.1) এবং (ড) সাধারণত এ-ধরনের রচনায় থাকে এক মহাকাব্যিক মাত্রা। (ঢ) এই রচনার প্রবণতাই হল ঐতিহাসিক, নৈতিক প্রেক্ষণ থেকে অতীতের সঙ্গে সংঘাতে নামা। (ণ) অনেক সময় থাকে এক কাল্পনিক নগর, সমাজ, আর আখ্যানে ফুটে উঠতে থাকে এখানের মানুষের চূড়ান্ত ভাগ্য। (ওই, p. 20) (ত) জাদু বাস্তববাদী সাহিত্য পরাবাস্তববাদী, ফ্যানটাসিমুখ্য সাহিত্য নয়, এর প্রবণতাই আলাদা।

এবার জাদু বাস্তববাদিতার কিছু উদাহরণ পেশ কথা যাক। (১) *একশো বছরের নিঃসঙ্গতা* উপন্যাসে গার্সিয়া মার্কেজ বেদেদের যে বর্ণনা দিয়েছেন তা যথেষ্ট ইন্দ্রিয়পর জাদু বাস্তব— "এরা নতুন বেদে, জোয়ান মেয়ে পুরুষের দল, কেবল নিজেদের ভাষাতেই কথা বলতে পারে তারা, তেলতেলে গতর আর পটু হাতের চমৎকার নমুনা; তাদের গান বাদ্য রাস্তা জুড়ে বপন করে দেয় হৈ হুল্লোড় ভরা উল্লাসের এক আতঙ্ক, সঙ্গে আরিঅ্যা (ইতালির আঠারো শতকীয় একক সঙ্গীত) আওড়াতে থাকা হাজারো রঙের কাকাতুয়া, আর খঞ্জনীর আওয়াজের তালে তালে একশোটা সোনার ডিমপাড়া এক মুরগি, মন-পড়ু য়া এক শেখানো-পড়ানো বানর, নানান কাজের এক অস্ত্র যা দিয়ে একই সঙ্গে বোতাম সেলানো আর জ্বর কমানো যায়, মানুষের বাজে স্মৃতি ভুলিয়ে দেয়ার এক যন্ত্র...।" [জি. এইচ. হাবীব-এর অনুবাদ, পৃ. ২৭]

(২) "কাজেই তার স্বামীর ক্ষ্যাপাটে চিন্তাভাবনার ধকল যতবার উরসুলার ওপর এসে পড়তো ততবারই সে এক লাফে তিনশো বছর পুরোনো নিয়তিতে ফিরে যেয়ে গাল পাড়তে থাকতো সেই দিনটাকে যেদিন স্যার ফ্রান্সিস ড্রেক হানা দিয়েছিল রিয়োহাচায়।" [একই উপন্যাস, একই অনুবাদ, পৃ. ৩০]।

(৩) জোসে আর্কাদিয়ো বুয়েন দিয়া-র ভুত খুন করে প্রুদেনসিও আগিলার-কে।

(৪) শিশু আমারান্তার ঝুড়ি আপনা আপনিই সারা ঘর ঘুরে বেড়ায়।

(৫) নিদ্রাহীন প্লেগ জর্জরিত করে গুয়াজিরো ইণ্ডিয়ানদের সম্প্রদায়কে।

(৬) গির্জাকৃত্যের সময় এক বালক ফাদার নিকানর রেইনাকে এক কাপ ঘন বাষ্প ওঠা চকলেট দেয় এবং এটা পান করে রেইনা চোখ বোজে ও মাটি থেকে ছয় ইঞ্চি উপরে উঠে যায়।

(৭) ওরেলিয়ানোর বন্ধু আলভারো মাকান্দো ত্যাগ করে, এক চিরন্তন টিকিট কিনে এমন এক ট্রেনে ওঠে যার ভ্রমণ শেষ হয় না।

(৮) *কলেরার সময় প্রেম* উপন্যাসে ড. জুভেনাল উরবিনো-র এক তোতাপাখি আছে যে ফরাসি, স্প্যানিশ, লাতিন ভাষায় কথা বলতে পারে, ফরাসি ক্যাবারে গায়ক ইভেৎ গিলবার্ট ও অ্যারিস্টাইড ক্রয়ান্ট এর গান গাইতে পারে মেয়েলি গলায়, সেন্ট ম্যাথুর গসপেল ও যোগ বিয়োগ গুণ ভাগ জানে।

(৯) *কুলপতির বসন্ত* উপন্যাসের অত্যাচারী শাসক সমুদ্র বেচে দেয়, হৃৎপিণ্ডের রক্ত টুকরো টুকরো করে বেচে দেয় আমেরিকা-কে।

(১০) ইসাবেল আইয়েন্দে-র *ভূতপ্রেতের ঘর বাড়ি* উপন্যাসে আমরা পাই তুয়েবার বাড়ির কথা, এখানে অতীতের প্রেত জীবিতের সঙ্গে ঘোরে, মেশে। চরিত্রগুলো অস্বাভাবিক শারীরিক ও প্রেতসুলভ গুণে পূর্ণ— রোসে ও আলবা-র আছে সবুজ চুল, ক্লারা-র আছে মিস্টিক ক্ষমতা, সে ভবিষ্যৎ বলে দিতে পারে, প্রেতদের সঙ্গে যোগ রাখে আবার ঢাকনা না খোলা পিয়ানো বাজাতে এবং মনের শক্তিতে জিনিসপত্র এদিক-ওদিক সরাতে পারে।

(১১) "বন্দুকের গুলিতে ফুটো গলা তার (মুনসি বয়তুল্লা শাহ্) আর পুরট হলো না। মরার পর সেই গলায় জড়ানো শেকল আর ছাইভস্ম মাখা গতর নিয়ে মাছের নকশা আঁকা লোহার পান্টি হাতে সে উঠে বসলো কাৎলাহার বিলের উত্তর সিথানে পাকুড় গাছের মাথায়। সেই তখন থেকে দিনের বেলা রোদের মধ্যে রোদ হয়ে সে ছড়িয়ে থাকে সারাটা বিল জুড়ে। আর রাতভর বিল শাসন করে ওই পাকুড় গাছের ওপর থেকেই।" [*খোয়াবনামা*— আখতারুজামান ইলিয়াস]

(১২) কিন্নর রায়ের *ধূলিচন্দন* উপন্যাসে জমিদার বাড়ির দুই হাতির সঙ্গে আত্মগোপনরত দুই নকশালের কথাবার্তায় এই দলের নগরকেন্দ্রিক গেরিলা আক্রমণের সীমাবদ্ধতা, আন্দোলনের মধ্যবিত্তের আধিক্য, ইত্যাদি কথোপকথন আছে।

জাদুবাস্তব রীতির ভবিষ্যৎ কি? Maggie Ann Bowers তাঁর বইতে একটি অধ্যায় রেখেছেন যাতে এই রীতির বিপক্ষে কিছু বক্তব্য ও কিছু রীতি বদলের পরিচয় আছে। একথা অনস্বীকার্য বিংশ শতাব্দীর কয়েক দশক জুড়ে এই রীতি হয়ে পড়েছিল 'So very fashionable' আর এবার মেক্সিকো-তে বেশ কিছু লেখক এই রীতির বিরুদ্ধে সোচ্চার হয়েছেন, অন্য-রকমে লিখতে চাইছেন। সত্যিকারের স্রষ্টা যাঁরা তাঁরাই প্রচল পথ ভাঙবেন, নতুন পথ গড়বেন— এটাই স্বাভাবিক।

বেনেদেত্তো ক্রোচে (১৮৬৬-১৯৫২)*

সুবোধচন্দ্র সেনগুপ্ত

১.

ক্রোচে আধুনিক কালের একজন বড় দার্শনিক। আলোচনার সুবিধার জন্য পাশ্চাত্ত্য দার্শনিক সমাজকে মোটামুটিভাবে দুই সম্প্রদায়ে ভাগ করা যাইতে পারে—ভাববাদী (Idealist) ও বস্তুবাদী (Realist)। প্রথম শ্রেণীর দার্শনিকদের মধ্যে আধুনিককালে সবচেয়ে প্রখ্যাত নাম বোধ হয় হেগেলের। হেগেলের কথা প্রারম্ভেই উল্লেখ করা প্রয়োজন, কারণ ক্রোচের চিন্তার উপর হেগেল খুব প্রভাব বিস্তার করিয়াছিলেন। অনেকে তাঁহাকে হেগেলপন্থী বলিয়া সংজ্ঞিত করিয়াছেন। কিন্তু এইরূপ বর্ণনা একদেশদর্শী হইবে এবং কেহ কেহ বলেন, হেগেলের পথে ক্রোচের দর্শনের বিচার করিলে সেই বিচারে ভুল হইবে। তাঁহার একখানি গ্রন্থের নাম : 'হেগেল দর্শনে যাহা প্রাণবন্ত এবং যাহা অবলুপ্ত' (*What is Living and What is Dead in Hegel's Philosophy)*। এই নামকরণ হইতেই বোঝা যাইবে যে, হেগেলের দ্বারা প্রভাবিত হইলেও তিনি ঠিক হেগেলপন্থী নহেন। হেগেলকে অনুসরণ করিয়া ক্রোচে চৈতন্যের কর্মময়তায় বিশ্বাস করেন। কিন্তু হেগেল দর্শন ও আর্টের মধ্যে তুলনা করিয়া দর্শনের শ্রেষ্ঠত্ব প্রমাণ করিতে চেষ্টা করিয়াছিলেন, এমন কি আর্টের সম্ভাব্য মৃত্যুর কথাও বলিয়াছেন। কিন্তু ক্রোচের মতে, ইহারা স্বতন্ত্র ; সুতরাং ইহাদের মধ্যে বড়-ছোট বিচার সম্ভব নয়।

ক্রোচে নামকরা দার্শনিক হইলেও তিনি প্রথম শ্রেণীর দার্শনিক কিনা সেই সম্বন্ধে সন্দেহের অবকাশ আছে। বিংশ শতাব্দীর শ্রেষ্ঠ পাশ্চাত্ত্য দার্শনিকদের কথা স্মরণ করিলেই মনে হইবে যে বের্গসঁ, উইলিয়াম জেমস্, বার্ট্রাণ্ড রাসেল প্রভৃতি তাঁহার অপেক্ষা অনেক

---

* ক্রোচের মূল ইতালীয় রচনার সঙ্গে আমার পরিচয় নাই। তাঁহার প্রধান প্রধান রচনা সবই ইংরেজিতে অনূদিত হইয়াছে। আমি সেই সকল অনুবাদ অবলম্বন করিয়াই ক্রোচের শিল্প ও সাহিত্য- চিন্তার বিশ্লেষণ ও বিচারে প্রবৃত্ত হইয়াছি। মাঝে মাঝে যে সব ইংরেজি শব্দ ব্যবহৃত হইয়াছে তাহারা উল্লিখিত অনুবাদগ্রন্থ হইতে নেওয়া এবং তাহাদিগকেই মূল বলিয়া ধরিতে হইবে। এই সকল পারিভাষিক শব্দের যে বাংলা প্রতিশব্দ দেওয়া হইয়াছে তাহাদের নির্বাচনের দায়িত্ব আমার।

বেশি প্রভাবশালী। রাসেল তাঁহার বহুল প্রচারিত History of Western Thought-গ্রন্থে তাঁহার নামোল্লেখই করেন নাই। ক্রোচের প্রাধান্য নন্দনতত্ত্বে এবং তাঁহার অগণিত রচনার মধ্যে *ঈস্‌থেটিক* গ্রন্থই যে শীর্ষস্থানীয় সেই বিষয়ে মতদ্বৈধ নাই। এই গ্রন্থের ইংরেজি অনুবাদক ক্রোচেকে ঈস্‌থেটিক শাস্ত্রের আবিষ্কারক কলম্বস বলিয়া অভিহিত করিয়াছেন। ইহা অত্যুক্তি, কিন্তু ভিত্তিহীন অত্যুক্তি নয়। আমার মনে হয় অ্যারিস্টটলের *পোয়েটিক্স*-গ্রন্থের পর ইউরোপীয় নন্দনশাস্ত্রে এইরূপ সারবান্ রচনার পরিচয় পাওয়া যায় না। এই কথাটাই জনৈক রসবেত্তা অন্যভাবে আমাকে বলিয়াছিলেন। ১৯৫২ সালে ক্রোচে যখন লোকান্তরিত হইলেন, তখন তিনি মন্তব্য করিয়াছিলেন, 'ভাবিলে অবাক্ হইতে হয় যে ক্রোচে আমাদের শতাব্দীরই লোক ছিলেন। সাহিত্যালোচনার সময় এই বিভ্রম সঞ্চারিত হয় যে, তিনি প্লেটো ও অ্যারিস্টটলের সমসাময়িক।'

২.

দার্শনিকদের মধ্যে অনেকেই সমস্ত বৈচিত্র্য এক সূত্রে গাঁথিয়া জগৎপ্রপঞ্চের ব্যাখ্যা করেন। বিশেষ করিয়া ভাববাদী দার্শনিকরা এই চেষ্টা করিয়াছেন। ক্রোচের দর্শনকে বলা যাইতে পারে, অ্যাব্‌সল্যুট আইডিয়ালিজম্ বা সার্বিক ভাববাদ ; কাজেই তিনিও যে এই পথের পথিক হইবেন তাহা ধরিয়াই লইয়া যাইতে পারে। কিন্তু আশ্চর্যের বিষয় এই যে, ঈস্‌থেটিক বা নন্দনতত্ত্ব-আলোচনায় ক্রোচের প্রধান কৃতিত্ব পৃথকীকরণ ; যে প্রতিভার বলে কবি ও শিল্পী সৃষ্টি করেন তিনি তাহাকে অন্য সকল শক্তি ও বৃত্তি হইতে বিচ্ছিন্ন করিয়া দেখিয়াছেন। কাব্য ও শিল্পের রূপ ও বিষয়বস্তু ঠিক কি তাহা অপেক্ষা ইহা ঠিক কি নয় সেই লক্ষণ নির্ণয়ই তাঁহার প্রধান অবদান। এই শাস্ত্রে তাঁহার পন্থা আলোচনা খুব সূক্ষ্ম অথচ স্পষ্ট, মার্জিত ; ইহা পরিচ্ছিন্ন বলিয়াই পরিচ্ছন্ন। তাঁহার পন্থা অনুসরণ করিয়াই একটি দৃষ্টান্তের সাহায্যে তাঁহার মতবাদ ব্যাখ্যা করিতে চেষ্টা করিব।

বাঙ্গালী পাঠকমাত্রই রবীন্দ্রনাথের 'সোনার তরী' কবিতার সঙ্গে পরিচিত আছেন। নীচে তাহার স্তবক উদ্ধৃত করিতেছি :

গগনে গরজে মেঘ, ঘন বরষা।
কূলে একা বসে আছি, নাহি ভরসা।
রাশি রাশি ভারা ভারা ধান-কাটা হল সারা,
ভরা নদী ক্ষুরধারা খরপরশা।
কাটিতে কাটিতে ধান এল বরষা॥
একখানি ছোটো খেত, আমি একেলা,
চারিদিকে বাঁকা জল করিছে খেলা।
পরপারে দেখি আঁকা তরুছায়ামসীমাখা।
গ্রামখানি মেঘে ঢাকা প্রভাত বেলা।
এ পারেতে ছোটো খেত, আমি একেলা॥

— এই কবিতাটি যে খুব ভাল কবিতা তাহা এখন সকলেই স্বীকার করেন। কিন্তু ইহার তাৎপর্য ও কাব্যসৌন্দর্য লইয়া বিতর্ক হইয়াছে এবং সেই বিতর্কের এখনও পরিসমাপ্তি হয় নাই। এই কবিতার মধ্যে কি আছে, তাহার পূর্বে বলিতে হইবে ইহার মধ্যে কি নাই।

(ক) প্রথম কথা, ইহা বাস্তব জীবনের ছবি নহে। বহুদিন পূর্বে দ্বিজেন্দ্রলাল রায় আপত্তি তুলিয়াছিলেন, বর্ষাকালে ধান কাটা হয় না ; যে ক্ষেতের চার দিকে জল তাহা চর, চরে ধান হয় না এবং বর্ষাকালে তাহা জলে ডুবিয়া যায়। তরুছায়ামসী-মাখা গ্রামখানির চিত্রও স্ববিরোধী,

কারণ মেঘেঢাকা গ্রামে তরুর ছায়া হয় না, আর ওপার হইতে তাহা দেখাও যাইবে না। দ্বিজেন্দ্রলালের আপত্তি সত্ত্বেও ইহা উৎকৃষ্ট কবিতা অথচ দ্বিজেন্দ্রলালের আপত্তিও অখণ্ডনীয়। ইহা স্পষ্ট যে, কবি যাহা লিখিয়াছেন তাহা কোন বাস্তব ঘটনার বিবরণ নহে, সুতরাং ইহা ইতিহাসের অঙ্গ নহে। ইহা ইতিহাসের অনুকরণও নয়, কারণ বাস্তবে এইরূপ ব্যাপার সম্ভবই নয়।

(খ) কবি যাহা লিখিয়াছেন তাহা দর্শনও নয়। অনেকে এই কবিতার দার্শনিক ব্যাখ্যা দিয়াছেন, কবি নিজেই ইহার মর্মার্থ বুঝাইতে চাহিয়াছেন এবং তাঁহার সেই ব্যাখ্যাও দর্শনঘেঁষা। কিন্তু প্রথমেই মনে রাখিতে হইবে, তত্ত্বকথা প্রমাণের অপেক্ষা রাখে, অথচ কাব্য প্রমাণশাস্ত্র নহে। যদি তত্ত্বকথা বলাই কাব্যের উদ্দেশ্য হইত, তবে কবি কাব্যের কুহেলিকাচ্ছন্ন রাজ্য ছাড়িয়া যুক্তিতর্কের রাজপথ ধরিতেন। যদি বলা যায় যে, গূঢ় তত্ত্বকথাকে সুন্দর সাজে সজ্জিত করাই কাব্যের কাজ, তাহা হইলে প্রশ্ন থাকিয়া যাইবে, কাব্যের কাব্যত্ব কোথায়— তত্ত্বকথায় না বাহিরের আভরণে, যদি তত্ত্বকথায় কাব্যত্ব থাকিত, তাহা হইলে বলা যাইতে পারে যুক্তি তর্কের দ্বারা অপ্রমাণিত তত্ত্বকথার মূল্য সামান্যই। আর যদি বহিরঙ্গর আভরণই সৌন্দর্যের উৎস হয়, তাহা হইলে আমাদের প্রাথমিক প্রতিজ্ঞাই সমর্থিত হইল— কাব্য তত্ত্বকথা বা দর্শন নহে। আলোচ্য কবিতাটি সম্পর্কে বলা যাইতে পারে, ইহাকে তত্ত্বকথার বাহন মনে করা হইয়াছে বলিয়াই প্রধানত ইহার বিরুদ্ধে অস্পষ্টতার অভিযোগ আনা হইয়াছে।

(গ) যদি বলা হয় যে, কাব্যের ছবিগুলি কোন গুহাহিত, রহস্যময় ভাবের দ্যোতক তাহা হইলেও ঠিক হইবে না। ক্রোচের মতে রূপের আড়ালে কোন রূপক থাকিতে পারে না। আমার জনৈক ক্রোচেপন্থী অধ্যাপক বলিতেন, 'The substance of a poem is the poem itself'। যাঁহারা কাব্যের symbolist বা রূপকাশ্রিত ব্যাখ্যা দেন, তাঁহারা বস্তুত কাব্যকে বিজ্ঞানের সামিল করিয়া দেখেন। জ্যামিতিতে ও অন্যান্য বিজ্ঞানে কোন কিছু বুঝাইতে হইলে ছবির প্রয়োগ করা হয়। একটি ছবি— যেমন কোন ত্রিভুজ— ত্রিভুজত্ব প্রভৃতি general বা সামান্য তত্ত্বের প্রতীক। কিন্তু কাব্যে ব্যক্তির ছবি ও নৈর্ব্যক্তিক তত্ত্ব অন্যোন্যাশ্রয়।

(ঘ) কেহ কেহ কাব্যের মিষ্টিক ব্যাখ্যা দিয়া বলেন, কাব্য রহস্যময়, অনির্বচনীয়, অবাঙ্‌মানসগোচর। শব্দ তাহার আভাস দিতে পারে, কিন্তু তাহাকে প্রকাশ করিতে পারে না। রবীন্দ্রনাথও এইরূপ মত প্রকাশ করিয়াছেন। কিন্তু শ্রেষ্ঠ আলংকারিক আনন্দবর্ধন ঠাট্টা করিয়া বলিয়াছেন যে, অন্তত 'অনির্বচনীয়' শব্দের দ্বারা রস বাচ্য। রবীন্দ্রনাথও অজস্র রচনার সাহায্যে কাব্যের অনির্বচনীয়তার ব্যাখ্যা দিয়াছেন। কথিত আছে, চল্লিশ ভল্যুমে মিষ্টিক কার্লাইল নীরবতার বাণী প্রচার করিয়াছেন! ক্রোচের মতে, মিষ্টিকরা প্রকৃতপক্ষে ভাষার শক্তিতে অবিশ্বাসী, তাঁহারা কর্মবাদী, নৈঃশব্দ্যের প্রবক্তা। তাই তাঁহারা কাব্যসমালোচনায় অনধিকারী, কারণ কাব্যের প্রাণ ভাষা, ভাষার শক্তিতে বিশ্বাস রাখেন বলিয়াই কবি কাব্য রচনায় প্রবৃত্ত হন।

(ঙ) শিল্প ও কাব্যের সঙ্গে কর্মজগতের সম্পর্ক নাই বলিয়া ইহারা নীতিশিক্ষা দেয় না। আমেরিকায় *টমকাকার কুটীর* -উপন্যাস দাসব্যবসায় উৎসাদিত করিতে সাহায্য করিয়াছিল এবং আমাদের দেশে বিপ্লবীরা *আনন্দমঠ* হইতে প্রেরণা পাইয়াছিলেন। পুরাকাল হইতে নীতিশিক্ষার জন্য সাহিত্য রচিত হইয়াছে এবং সর্বকালে পাঠক-সম্প্রদায় সাহিত্যে নীতির সন্ধান করিয়াছে। কিন্তু—রবীন্দ্রনাথের ভাষায়—কাব্য ও শিল্পের সঙ্গে প্রয়োজনের জগতের কোন সম্পর্ক নাই। ক্রোচের মতে, দর্শন ও আর্টে জ্ঞানার্জনী বৃত্তি ক্রিয়াশীল, কর্মজগৎ

জ্ঞানের উপরে নির্ভর করে, কিন্তু জ্ঞানার্জনী বৃত্তি তত্ত্বজগতের বা থিওরির বাহিরে দৃষ্টি দেয় না।

(চ) আর্ট এক ধরনের জ্ঞান, কিন্তু তাহা বিজ্ঞান নহে। বিজ্ঞান বস্তুজগৎকে বিচ্ছিন্ন করিয়া বিশেষ দৃষ্টিকোণ হইতে তাহার সূত্র রচনা করে। ইহার পদ্ধতি হইল ব্যবচ্ছেদ ও বিশ্লেষণের পদ্ধতি। তাই স্থূল পদার্থ লইয়া কারবার করিলেও এবং ব্যবহারিক জীবনে বৈজ্ঞানিক তথ্যের বহুল প্রয়োগ থাকিলেও বিজ্ঞান অবচ্ছিন্ন বা অ্যাবষ্ট্রক্ট অর্থাৎ আংশিকতাদোষদুষ্ট। শিল্প ও কাব্য কংক্রীট ; ইহাদের প্রধান গুণ সমগ্রতা ও স্বয়ংসম্পূর্ণতা।

(ছ) আর্ট বিজ্ঞান নয়, দর্শন নয়, নীতিশাস্ত্র নয়, তবে কি ইহা খেয়ালী কল্পনার স্বচ্ছন্দ বিলাস? কিন্তু তাহাও ঠিক নয়। খেয়ালী কল্পনা (fancy) বৈচিত্র্যের সন্ধানে ছবির পর ছবি আঁকিয়া যায়, সেই ছবিগুলি হাল্‌কা মেঘের মতো উড়িয়া বেড়ায়। কিন্তু আর্টের প্রধান গুণ সংসক্তি; ইহার বিভিন্ন অংশ দৃঢ় বন্ধনে বদ্ধ। আর্ট কল্পনার লীলা হইতে পারে, কিন্তু কল্পনার খেলা নয়। আলোচ্য কবিতা কতকগুলি ছবির সমষ্টি, কিন্তু তাহাদের দৃঢ় সংসক্তিও অনস্বীকার্য।

(জ) সাহিত্য ও শিল্প আনন্দবিধানের জন্য সৃষ্ট হয়, এই মত সাধারণ্যে প্রচলিত হইয়াছে এবং আমাদের দেশে রবীন্দ্রনাথের রচনায় এই মত খুব জোরাল অভিব্যক্তি পাইয়াছে। যে কোন শিল্পকর্ম হইতে আমরা আনন্দ পাই, কিন্তু আনন্দ শিল্পসৃষ্টির বা রসোপলব্ধির অনুষঙ্গমাত্র, তাহার সংজ্ঞা নহে। যদি তাহা হইত, তাহা হইলে যাহা কিছু আনন্দ দান করিত তাহাই শিল্পের লক্ষণাক্রান্ত হইত। কর্মী কর্মে আনন্দ পান, বৈজ্ঞানিক বিজ্ঞানে আনন্দ পান, খেলোয়াড় ও দর্শক খেলিয়া ও খেলা দেখিয়া চমৎকৃত হন, মাতা পুত্রলাভ করিয়া আনন্দ পান। এইসব আনন্দের সঙ্গে কাব্যানন্দের কোন মৌলিক সাদৃশ্য নাই। সুতরাং আনন্দরূপম্ যদ্বিভাতি বলিলে আর্টের সংজ্ঞা দেওয়া হইবে না।

(ঝ) সচরাচর বলা হইয়া থাকে, কাব্য ও শিল্প ভাবের বা অনুভূতির প্রকাশ, কিন্তু একটু চিন্তা করিয়া দেখিলেই দেখা যাইবে যে, ইহাও ঠিক নয়। যাহার ধান অপরে লইয়া গিয়াছে, যে নির্জন চরে পরিত্যক্ত হইয়াছে, সে হা হুতাশ করে, ছন্দোবদ্ধ ভাষায় প্রকৃতির রূপ বর্ণনা করে না। কামমোহিত ক্রৌঞ্চ চীৎকার করিয়া প্রিয়বিয়োগব্যথা প্রকাশ করিয়া থাকিবে, অনুষ্টুপ ছন্দে কাব্য রচনা করে না। আনন্দবর্ধন বলিয়াছেন যে, বাল্মীকির কাব্যে শোক শ্লোকত্ব প্রাপ্ত হইয়াছে, শোক প্রকাশিত হইয়াছে এমন কথা বলেন নাই। একটি বিশেষ বা উপচরিত অর্থেই বলা যাইতে পারে, আর্ট ভাবের অভিব্যক্তি।

৩.

এই উপচরিত অর্থের মধ্যেই ক্রোচের নন্দনতত্ত্বের বৈশিষ্ট্য নিহিত আছে। ক্রোচে ঈস্‌থেটিককে বলিয়াছেন অভিব্যক্তিতত্ত্ব (science of expression) এবং তিনি বলিয়াছেন ঈস্‌থেটিক বা linguistic বা ভাষাতত্ত্বের মধ্যে কোন পার্থক্য নাই। আমাদের মনে যখন অনুভূতি বা সংবেদন (sensation) সঞ্চারিত হয় তখন সেগুলি থাকে অস্পষ্ট এবং আমরা তাহাদের দ্বারা নিপীড়িত, অভিভূত, আচ্ছন্ন বোধ করি। এই অবস্থায় আমাদের চৈতন্য থাকে নিষ্ক্রিয়, কিন্তু সে পরিপূর্ণরূপে জাগ্রত হইয়া এই অস্ফুট, এলোমেলো অনুভব ও সংবেদনের বন্ধন হইতে মুক্ত হইয়া তাহাদিগকে সংহত করে এবং স্পষ্ট রূপ দান করে। ক্রোচের মতে ইহাই অভিব্যক্তি বা expression ; ক্রোচের দর্শনে ইহার পারিভাষিক নাম ইন্‌টুইশন বা প্রতীতি, কারণ এই প্রক্রিয়া জ্ঞানাত্মিকা। আমাদের প্রাচ্য সাহিত্যচিন্তায়ও ইহার অনুরূপ পরিকল্পনা

আছে। অভিনব গুপ্ত প্রভৃতি বলেন, আমাদের চৈতন্য নানা অবান্তর বস্তুতে আবৃত থাকে; কবি সেই আবরণ উন্মোচিত করিয়া চৈতন্যের স্বরূপ উদঘাটন করেন। তাই রসপ্রতীতিকে তাঁহারা বলিয়াছেন 'ভগ্নাবরণা চিৎ'।

আইডিয়ালিষ্ট দার্শনিকদের মতো ক্রোচে চৈতন্যকে একমাত্র সত্য বলিয়া স্বীকার করিয়া লইয়াছেন। কিন্তু তিনি ইহার মধ্যে চারটি সুনির্দিষ্ট কক্ষ্যা দেখিতে পাইয়াছেন। ইহাদের পার্থক্যনির্ণয়ই তাঁহার মতবাদের গোড়ার কথা; এইজন্য অনেকে তাঁহার দর্শনের নাম দিয়াছেন philosophy of distincts বা স্বতন্ত্রতাবাদ। চৈতন্যের ক্রিয়াকে মোটামুটিভাবে দুই ভাগে বিভক্ত করা যাইতে পারে— জ্ঞানযোগ ও কর্মযোগ। কর্ম জ্ঞানের উপর নির্ভরশীল; আমরা অনেক সময় এমন সব কর্মচঞ্চল লোক দেখি যাহারা কোন কিছু চিন্তা না করিয়া কর্মে ঝাঁপাইয়া পড়ে। কিন্তু এইসব হঠকারী ব্যক্তিও সাময়িক ভাবনার উপর নির্ভর করিয়াই কর্মে প্রবৃত্ত হয়। তাহাদের চিন্তা সুশৃঙ্খল নয়, কিন্তু চিন্তার অভাবে কোন কর্ম হয় না। অনেক সময় দেখা যায় যে, খুব ধীর স্থির, চিন্তাশীল লোক হঠাৎ এমন কাজ করিয়া ফেলে যাহার সঙ্গে তাহাদের চিন্তাধারার সংযোগ নাই ; তাহারা নিজেরাই বলিবে, না ভাবিয়া তাহারা হঠাৎ এই কাজ করিয়া ফেলিয়াছে। কিন্তু আকস্মিক কাজের অন্তরালে আকস্মিক চিন্তা থাকে। এমনও হইতে পারে যে এই চিন্তা মনের কোণে আত্মগোপন করিয়া ছিল, হঠাৎ কর্মে রূপান্তরিত হইয়াছে।

কর্মযোগের কথা ছাড়িয়া দিয়া জ্ঞানযোগের কথা বলা যাক্, কারণ ক্রোচের মতে কবিপ্রতিভা জ্ঞানার্জনী বৃত্তি। চৈতন্য যে শক্তির দ্বারা অস্পষ্ট, হালকা মেঘের মতো সঞ্চরণশীল, বিক্ষিপ্ত, বিশৃঙ্খল অনুভব ও সংবেদন ইহার বিষয়বস্তু, সেই হিসাবে ইহা স্থূল, কংক্রীট ; ইহা বহুকে সংহত করিয়া সমগ্রতা দান করে, সেই হিসাবেও ইহা কংক্রীট। ইউরোপীয় নন্দনতত্ত্বের একটা বড় সমস্যা বিষয়বস্তু (content) এবং রূপের বা ফর্মের দ্বন্দ্ব ও সমন্বয়। ক্রোচে এই সমস্যার এক সরল সমাধান দিয়াছেন। অস্পষ্ট, রূপহীন অনুভব ও সংবেদন না থাকিলে চৈতন্য কীসের প্রতীতি লাভ করিবে? কিন্তু ইহারা যখন রূপের অন্তর্গত হইল তখন ইহাদের আর কোন স্বাতন্ত্র্য রহিল না। সুতরাং form-ই সর্বময় প্রভু, কিন্তু বিষয়বস্তু না থাকিলে যে চৈতন্য form দান করে তাহা ক্রিয়াশীল হইবে না। বিষয়বস্তুর মধ্য দিয়াই রূপ রূপত্ব লাভ করে। তাই শিল্পে বিষয়বস্তু (content) ও রূপ (form) অভিন্ন।

অনুভূতি ও সংবেদন (sensation) প্রভৃতির রূপদানই শিল্প; এই অর্থেই কবির ইনটুইশনকে অভিব্যক্তি বলা যাইতে পারে। এই অভিব্যক্তি আর ব্যবহারিক জীবনের ভাবপ্রকাশ এক বস্তু নহে। প্রিয়জনের বিয়োগে অনেকেই আচ্ছন্ন, অভিভূত হন; মাতা সন্তানের শোকে উন্মাদিনী হন, যে স্ত্রী স্বেচ্ছায় সহমরণে গিয়াছেন বাল্মীকি ক্রৌঞ্চনিধনে তাহা অপেক্ষা বেশি শোক পাইয়াছিলেন এমন কথা কেহ বলিবে না। পার্থক্য এই যে, কবি অনুভূতির দ্বারা আচ্ছন্ন হন না, তাঁহার চৈতন্য অনুভূতির উপর স্বীয় কর্তৃত্ব প্রতিষ্ঠা করিয়া ইহাকে রূপ দিতে পারেন। সেই রূপের মধ্যে অনুভূতি এমন ভাবে মিশিয়া মিলাইয়া যায় যে তাহাকে আর পৃথক্ করিয়া দেখা যায় না। রূপের অন্তরালে রূপের কোন বিষয়বস্তু আছে এমন মনে হয় না। কবি ম্যালার্মের শিল্পী বন্ধু দুঃখ করিয়া বলিয়াছিলেন যে, তাঁহার মনে খুব ভাল ভাল ভাবের সঞ্চার হয়, কিন্তু সেই সকল আইডিয়া তিনি ভাষায় প্রকাশ করিতে পারেন না। তদুত্তরে ম্যালার্মে লিখিয়াছিলেন, কাব্য শব্দের দ্বারা লিখিত হয়, ভাবের দ্বারা নয়। ম্যালার্মের উত্তর অর্ধসত্য। কাব্য শব্দের দ্বারাও লিখিত হয় না। ভাব যখন ভাষার মধ্যে মিশিয়া যাইয়া সংহত রূপ লাভ করে তখনই কাব্যের সৃষ্টি হয়।

ম্যালার্মের বন্ধু ছিলেন শিল্পী। তিনি ভাষার দৈন্যের জন্য আক্ষেপ করিয়াছিলেন। সেই আক্ষেপও অনর্থক, কারণ ভাষা হইল একই সঙ্গে শিল্পের দেহ ও প্রাণ। তাহা অর্থবহ শব্দও হইতে পারে, বা অন্য কিছুও হইতে পারে— অর্থহীন শব্দ (সঙ্গীত), রংতুলি (চিত্রশিল্প), মৃত্তিকা ও পাথর (ভাস্কর্য) ইত্যাদি। অ্যারিস্টটল ও তৎপরবর্তী লেখকেরা এইসব মালমশলাকে শিল্পসৃষ্টির বাহন বা উপায় বলিয়া নির্দেশ করিয়াছেন, আমাদের দেশের আলংকারিকেরা কাব্যের দেহ ও আত্মার মধ্যে পার্থক্য করিয়াছেন। কিন্তু ক্রোচের নন্দনতত্ত্বে শিল্পে উপায় ও উপেয়, দেহ ও আত্মার মধ্যে কোন পার্থক্যের স্থান নাই। অস্পষ্ট অনুভব ও ভাবনা না থাকিলে রূপের অভ্যাগমের কোন অবকাশ থাকে না আর অস্ফুট ভাবনা মূর্তি গ্রহণ করিয়াই চৈতন্যলোকে প্রবেশ করে। কাব্যের দেহ ও আত্মা, ভাষা ও ভাব— এই যে সম্বন্ধকারক ও ষষ্ঠী বিভক্তির প্রয়োগ সকল দেশ ও সকল কালে করা হইয়াছে, ক্রোচে ইহাকে নস্যাৎ করিয়া দিয়াছেন। নন্দনতত্ত্বের আলোচনায় ইহা তাঁহার প্রধান কৃতিত্ব। কাব্য কোন কিছুর প্রকাশ করে না, দীপশিখা ও আলোক একই বস্তু।

৪.

প্রতীতি কংক্রীট, প্রাণবান্ মূর্তি ; অর্থাৎ ইহা রূপবিশিষ্ট, একক ব্যক্তিত্বসমন্বিত, ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য, সমগ্র। ইহার মধ্যে হয়ত নানা ভাব ও ভাবনা একত্রিত হইয়াছে, কিন্তু ঐক্যবোধের প্রেরণায় তাহাদের বিচ্ছিন্নতা লুপ্ত হইয়া গিয়াছে। এই নিবিড় সংসক্তি ও সর্বব্যাপী সমগ্রতার জন্য বিচার ও সমালোচনার সাহায্যে ইহার স্বরূপ নির্দেশ করা কাব্যের অনুবাদ করার মতোই কঠিন। রসপ্রতীতি যখন জাগ্রত হয় তখন পর্যন্ত বিচারবুদ্ধি সুপ্ত থাকে। এক মূর্ত প্রতীতির সঙ্গে আর এক মূর্ত প্রতীতির মধ্যে সম্বন্ধ নির্দেশ করিতে যাইয়াই বুদ্ধিবৃত্তি উন্মেষিত হয়; ইহার স্থান চৈতন্যলোকের দ্বিতীয় কক্ষ্যায়। এইবার ইহার লক্ষণ বিচার করা যাক্। যেহেতু ইহা বহু ব্যক্তির মধ্যে একটি লক্ষণ ভিত্তি করিয়া সম্পর্ক নির্দেশ করে সেইজন্যই ইহা অ্যাবষ্ট্রাক্ট, অবচ্ছিন্ন, অমূর্ত আইডিয়া, ইহার কোন রূপ নাই। ইহা একটি মানসিক ধারণা বা কনসেপ্ট (concept)। এই কনসেপ্ট একটি সামান্য লক্ষণ; ইহা বহু ব্যক্তির সকলের মধ্যে আছে, আবার অন্য বহু ব্যক্তির মধ্যে নাই। যেমন, যদি বলি দেবদত্ত অমর নহে, তাহা হইলে বুঝিতে হইবে দেবদত্তের মধ্যে এমন একটি লক্ষণ আছে যাহা তাহাকে মরণশীল প্রাণিজগতের সামিল করে এবং দেবতাদের মতো অমর শ্রেণী হইতে তাহার পার্থক্য সূচিত করে। ইহার মধ্যে দেবদত্তের সমগ্র ব্যক্তিত্বকে পাওয়া যায় না, তাহার শ্রেণীগত লক্ষণের ধারণা করা যায়। এইজন্যই ইহা abstract universal, অবচ্ছিন্ন ও সর্বসাধারণ প্রযোজ্য সামান্য লক্ষণ, ব্যক্তিস্বরূপ নহে।

ইনটুইশন বা প্রতীতি শুধু রূপ সৃষ্টি করে, সত্যাসত্য বিচার করে না, বাস্তব-অবাস্তবের ধার ধারে না। সেই বিচারের ভার বুদ্ধির উপর, যে বুদ্ধি বিশ্লেষণ করে, প্রমাণ করে, সাধারণ সূত্রের আবিষ্কার করে। ইনটুইশন বা রূপসৃষ্টির মধ্যে বুদ্ধিবৃত্তির অনুপ্রবেশের কোন স্থান নাই, কিন্তু বহু ইনটুইশনকে একত্র করিয়া পরীক্ষা করিয়াই বুদ্ধিবৃত্তি সাধারণ সূত্র বাহির করে। ইহা সত্য যে প্লেটো হইতে আরম্ভ করিয়া বের্গসঁ পর্যন্ত বহু দার্শনিকের রচনায় কাব্যশক্তির পরিচয় পাওয়া যায়, কিন্তু মনে রাখিতে হইবে তাঁহাদের মতবাদের সার্থকতার বিচার হইবে যুক্তিতর্কের মানদণ্ডে। কবিকল্পনার প্রাচুর্য একটা উপরি পাওনা মাত্র, অনেক ক্ষেত্রে তর্ককে ভারাক্রান্ত ও সিদ্ধান্তকে ঝাপসা করে বলিয়া এই কবিয়ানা দার্শনিকের অপরাধ বলিয়াও গণ্য হয়। দর্শন ইনটুইশনের উপর প্রতিষ্ঠিত হইলেও দর্শনে কাব্যের অনুপ্রবেশ সচরাচর দৃষ্ট হয় না এবং ইহাকে

সহজে বিচ্ছিন্ন করা যায়। কিন্তু কাব্যের মধ্যে দার্শনিক মতবাদ ওতপ্রোতভাবে জড়িত থাকে। লুক্রেসিউসের কাব্যকে এপিকিউরাসের দার্শনিক মতের ছন্দোময় রূপান্তর বলিয়া মনে হয়, দান্তের কাব্যে ক্যাথলিক তত্ত্বকথা, বিশেষ করিয়া সেণ্ট টমাস অ্যাকুইনাসের মতবাদ জীবন্ত হইয়া উঠিয়াছে। আমাদের দেশে বঙ্কিমচন্দ্রের *আনন্দমঠ, সীতারাম, দেবীচৌধুরানী*-তে প্রচারই মুখ্য, রবীন্দ্রনাথের *গোরা, ঘরে বাইরে* তর্কবহুল উপন্যাস। রবীন্দ্রনাথ বলিয়াছেন, এই সমস্ত গ্রন্থে দেখিতে হইবে তর্ক জায়গা পাইয়াছে, না জায়গা জুড়িয়াছে। কথাটা অস্পষ্ট এবং এইভাবে দেখিতে গেলে আসল প্রশ্নটা এড়াইয়া যাওয়া হইবে। *হ্যামলেট, কিং লীয়র* প্রভৃতি নাটকের জীবনজিজ্ঞাসা বাদ দিলে উহাদের মধ্যে হানাহানি, মারামারি ছাড়া আর কিছুই থাকিবে না, ইবসেন ও বার্ণার্ড শ'য়ের নাটকে সমস্যার আলোচনাই প্রাণ, তাহারা শুধুমাত্র জায়গা পাইয়াছে বলিলে এইসব রচনার মূল্যায়ন হইবে না। খুব খোলাখুলিভাবে না হইলেও, সমস্ত কাব্যসাহিত্যই জীবনবেদের দ্বারা অনুপ্রাণিত এবং তাহাকে বাদ দিয়া অথবা ছোট করিয়া দেখিলে সাহিত্যের পরিচয়ই বিঘ্নিত হইবে। অথচ জীবনজিজ্ঞাসাকে প্রাধান্য দিলে সাহিত্য দর্শনেরই অঙ্গীভূত হইবে, তাহার স্বাতন্ত্র্য থাকিবে না; আবার ইহা দর্শনের মর্যাদাও পাইতে পারে না, কারণ সাহিত্য প্রমাণশাস্ত্র নহে।

এই সমস্যার ক্রোচে যে সমাধান দিয়াছেন তাহা ত্রুটিমুক্ত না হইলেও প্রণিধানযোগ্য। তিনি মনে করেন, সাহিত্যে যে সকল দার্শনিক তথ্য থাকে তাহা প্রাথমিক অনুভব, সংবেদনের পর্যায়ে পরিণত হয়, তাহাদের দার্শনিক তাৎপর্য আচ্ছাদিত হইয়া যায় এবং তাহারা সৃষ্ট চরিত্রের অঙ্গ হইয়া যায়। সমগ্র গ্রন্থটির মধ্যেও একটি বিশেষ ভাব বা অনুভূতি রূপ লাভ করে এবং সেই অর্থে সমস্ত রকমের সাহিত্য— এবং প্রসারিত অর্থে সমস্ত শিল্পকর্মই এক একটি লিরিক। ক্রোচে মনে করেন, 'The whole is that which determines the quality of the parts'— সমগ্র বস্তুর দ্বারা অংশের গুণাগুণ নির্ধারিত হইবে। যেহেতু *হ্যামলেট* বা *ডিভাইনা কমেডিয়া* সাহিত্য অর্থাৎ রূপসৃষ্টি বা প্রতীতি, সেইজন্য ইহার ভিতরকার সব কিছুই— তত্ত্ব, ইতিহাস, অনুভূতি— এই বৈশিষ্ট্যের দ্বারা প্রভাবিত হইবে। শুধু প্রভাবিত বলিলে কম বলা হইবে, এইসব উপদান রূপেরই অঙ্গ হইবে।

কয়েকটি দৃষ্টান্তের সাহায্যে কথাটা আরও স্পষ্ট করা যাইতে পারে। পৃথিবীতে বহু সুন্দর বস্তু আছে, বহু কুৎসিত বস্তুও আছে। আমাদের মনে সৌন্দর্য ও কুশ্রীতার ধারণা বা কনসেপ্ট ও আছে; এই কনসেপ্ট অমূর্ত, সাধারণ লক্ষণ, আবার সৌন্দর্যবিশিষ্ট সুন্দর বস্তু এবং কুশ্রীতার প্রতিমূর্তি কুৎসিত বস্তুও আছে। আমরা এমন বস্তুরও ধারণা করিতে পারি, যাহার প্রতিরূপ বাস্তব জীবনে নাই। যেমন খাঁটি জ্যামিতিক সরল রেখা বাস্তবে সম্ভবে না, অথচ আমরা ত্রিভুজত্বের ধারণা করিয়া থাকি। শিল্পজগতে বাস্তব-অবাস্তব, সত্যাসত্যের প্রশ্ন অবান্তর, আবার শিল্প ও সাহিত্য অলীক কাল্পনিক সৃষ্টি এমন কথাও বলা চলিবে না। অলীক ও বাস্তব— তথা সুন্দর ও কুৎসিত— এই বিরোধই আর্টের জগতে নাই। ইহা শুধু রূপ সৃষ্টি করে, ইহাই তাহার একমাত্র পরিচয়। এই জগতে ম্যাকবেথ এবং ডাইনীবুড়ি ও ব্যাংকোর প্রেতাত্মা সমান সত্য এবং ইয়াগো ও ডেসডিমোনা সমান সুন্দর; ইয়াগো ডেসডিমোনা অপেক্ষা বেশি সুন্দর, কারণ বেশি জটিল ও বিস্তৃত।

জ্ঞানজগতে চৈতন্যের যে দুই কক্ষ্যা আছে, তাহার একটি প্রতীতি (ইনটুইশন) বা একের উপলব্ধি, তাহা সৃষ্টি করে শিল্প, সঙ্গীত, সাহিত্য। আর দ্বিতীয় কক্ষ্যায় থাকে বুদ্ধি, যাহা একে বহুর সঙ্গে যুক্ত করিয়া সাধারণ সূত্র রচনা করে। ইহা ছাড়া কোন তৃতীয় কক্ষ্যা নাই। তবে

এই কক্ষ্যার মধ্য পথে রহিয়াছে ইতিহাস যেখানে উভয় বৃত্তিই ক্রিয়াশীল। ইতিহাস ব্যক্তির কাহিনী ও চিত্র— অশোক, আলেকজাণ্ডার, রেনেসাঁস, ফরাসী বিপ্লব ইত্যাদি। এইজন্য ইহা কংক্রীট, রূপময়। আমরা ইতিহাসের নিয়ম, সূত্র প্রভৃতি আবিষ্কার করি, কিন্তু সেইসব সূত্র একেবারেই আপেক্ষিক, তাহাদের কোন দার্শনিক মূল্য নাই। তবে এক দিক দিয়া ইতিহাস দর্শনের পর্যায়ে পড়ে। ইহার নাম (ইতি + হ + আস) হইতেই বুঝিতে পারা যায় যে ইহা বাস্তবের কাহিনী, যাহা ঘটিয়াছে তাহার বিবরণ। ইহার মধ্যে যে সকল বিচ্ছিন্ন, স্বয়ংসম্পূর্ণ ব্যক্তির চিত্র পাওয়া যায় তাহারা সবাই এক সামান্য সত্য বা সর্বব্যাপী দার্শনিক সত্যের অন্তর্ভুক্ত— ইহারা ঘটমান জগতের অঙ্গ। এই সত্যাসত, বাস্তব-অবাস্তব বোধের সঙ্গে আর্টের সম্পর্ক নাই।*

৫.

ক্রোচে ভাববাদী (idealist) দার্শনিক। সুতরাং তিনি বস্তুজগতের স্বতন্ত্র অস্তিত্ব স্বীকার করেন। তাঁহার মতে বস্তুজগৎ চৈতন্যেরই রচনা (construction) এবং এইখানে চৈতন্যের ব্যবহারিক বৃত্তি ক্রিয়াশীল হইয়া থাকে। এইখানেও চৈতন্যের দুইটি— তৃতীয় ও চতুর্থ— কক্ষ্যা আছে। ব্যবহারিক জগতে চৈতন্য প্রথমে ব্যক্তিগত স্বার্থবুদ্ধির দ্বারা প্রণোদিত হয়; ইহার নাম দেওয়া যাইতে পারে ইকনমিক কর্ম। ইহার পরে আসে নৈতিক চেতনা যাহা বহুর স্বার্থচেতনার মধ্যে সমন্বয় করিয়া সার্বজনীন মঙ্গলের সন্ধান করে। ইহাদের সঙ্গে সম্বন্ধ ইনটুইশন বা প্রতীতির সঙ্গে বিচারবুদ্ধির সম্বন্ধের অনুরূপ। উভয়ত্র বিশেষ হইতে নির্বিশেষে, ব্যক্তি হইতে সাধারণ্যে আরোহণ করিতে হয়। ব্যক্তির স্বীয় স্বার্থজড়িত কর্মচেতনা হইতে সর্বার্থসাধিকতা কর্মচেতনা বা নীতিবোধের উদ্ভব হয়। সকলের মধ্যে আমিও আছি, সুতরাং সকলের স্বার্থসংরক্ষণের মধ্যেই আমার ব্যক্তিগত স্বার্থ বিলীন হইয়া পরিপূর্ণতা লাভ করিবে। এই বোধের মধ্যেই চিত্তের পরিপূর্ণ স্ফূর্তি বা স্বাধীনতা। জ্ঞান না হইলে কর্মচেতনার উদ্ভব হইতে পারে না; জগৎকে জানার পরই তো তাহার পরিবর্তন সাধন করিবার প্রবৃত্তি জাগ্রত হইতে পারে। কিন্তু শুধু জানার মধ্যে কর্মপ্রবৃত্তি নাও থাকিতে পারে।

চৈতন্যের প্রথম কক্ষ্যায় থাকে শিল্পসৃষ্টির প্রবৃত্তি এবং শেষের কক্ষ্যায় থাকে নীতিবোধ। সুতরাং ইহাদের মধ্যে— মূলত জ্ঞানার্জনী ও কর্মৈষণার মধ্যে— দুস্তর ব্যবধান। সেইজন্যই শিল্পকর্ম সম্পূর্ণরূপে নীতিবোধের এক্তিয়ারের বাহিরে। শিল্প ও সাহিত্য হইতে আমরা আনন্দ পাইতে পারি, ইহা আমাদের মঙ্গলবুদ্ধিকে জাগ্রত করিতে পারে অথবা আমাদিগকে পাপের পথে অগ্রসর করিতে পারে। কিন্তু ইহা রসবোধের অনুষঙ্গ মাত্র, তাহার স্বরূপের সঙ্গে এই সকল ব্যাপারের কোন সম্পর্ক নাই। এই সকল আলোচনা রূপলোকে ব্যবহারিক জীবনের অনধিকার প্রবেশের পরিচয় দেয়।

* ক্রোচে এই মত ঈস্‌থেটিক গ্রন্থে প্রচার করিয়াছিলেন। পরে এই মতের কিঞ্চিৎ পরিবর্তন করিয়া ইতিহাসকে দর্শনের অঙ্গীভূত করেন। তাঁহার পরবর্তী মতে, প্রত্যেকে judgement বা সিদ্ধান্তই ব্যক্তিবিশেষ সম্পর্কে সিদ্ধান্ত বলিয়া নির্দেশিত হয়; এইভাবে দেখিতে গেলে দর্শন ও ইতিহাস অভিন্ন হইয়া পড়ে। এই মতের বিস্তারিত আলোচনা এইখানে অপ্রাসঙ্গিক হইবে বলিয়া তাহার মধ্যে প্রবেশ করিলাম না। এই প্রসঙ্গে ক্রোচের দর্শনের যে বিবরণ দিলাম তাহাও খুব সংক্ষেপিত, তবে আশা করি বিকৃত নয়। এই সকল প্রশ্নের বিশদ আলোচনার জন্য ক্রোচের লজিক-গ্রন্থ দ্রষ্টব্য।

ক্রোচের মতে, অন্য এক ভাবেও বাহিরের বস্তুজগৎ শিল্পালোচনায় অনধিকার প্রবেশ করিয়াছে এবং ক্রোচেদর্শনের ইহাই সর্বাপেক্ষা বিতর্কিত বিষয়। ক্রোচে মনে করেন শিল্পীর চেতনায় যখন কোন ভাব ও ভাবনা রূপ গ্রহণ করিল তখনই শিল্পকর্ম পরিসমাপ্ত হইল ; সেই শিল্প বাহিরের কোন উপকরণ বা মালমশলা ছাড়াই কবির চিত্তে প্রতিভাসিত হয়। ইহার পর শিল্পী কোন কোন সৃষ্টিকে বাহিরের জগতে প্রকাশ করিতে ইচ্ছা করিতে পারেন। এখান ব্যবহারিক জগতের প্রেরণা আসিয়া পড়িল এবং বাস্তব জগতে যে উপকরণ গ্রহণযোগ্য হইবে, যাহা তাঁহার পক্ষে বেশি উপযোগী হইবে এইরূপ উপকরণ গ্রহণ করিয়া চৈতন্যে যে বিশুদ্ধ রূপ জাগ্রত হইয়াছিল তাহাকে তিনি বাহিরে প্রকাশ করেন। যে কাব্য তিনি এখন রচনা করেন তাহা অংশত ইন্টুইশনের প্রতিরূপ, অংশত ব্যবহারিক জগতের উদ্দেশ্যপ্রণোদিত এবং ব্যবহারিক জগতের উপকরণের দ্বারা নিয়ন্ত্রিত।

ক্রোচের এই মত বিতর্কসংকুল এবং সহজবোধ্য নয়। কিন্তু মূল বক্তব্যের যে কতকগুলি উপসিদ্ধান্ত আছ তাহা খুব তাৎপর্যপূর্ণ। অ্যারিস্টটলের আমল হইতে প্রকাশের উপকরণকে আমরা প্রাধান্য দিয়াছি বলিয়া শিল্প-সমালোচনায় টেকনিকের চর্চা অনেকখানি জায়গা জুড়িয়া আছে। কোন্ শিল্প কি ভাবপ্রকাশের উপযোগী, কোন্ শিল্পের বৈশিষ্ট্য কি, কোন্ শিল্পের শক্তির সীমা কোথায়— লেসিং প্রভৃতির সমালোচনায় এই সকল প্রশ্ন খুব বড় হইয়া দেখা দিয়াছে। অনেক সময় টেকনিকের প্রতি অত্যধিক মনোযোগ দেওয়ার ফলে আমাদের রসবোধ আচ্ছন্ন হইয়া পড়িয়াছে। ক্রোচের নন্দনতত্ত্বের ফলশ্রুতি এই যে, টেকনিক শিল্পে তাহার যথাযোগ্য স্থান পাইয়াছে। তিনি মনে করেন যে, টেকনিক শিল্পের উপকরণাশ্রিত বহিঃপ্রকাশের ব্যাপার, ইহার মধ্যে বিশুদ্ধ শিল্পসৃষ্টির সঙ্গে ব্যবহারিক বস্তুজগতের মিশ্রণ হইয়াছে। কিন্তু মনে রাখিতে হইবে যে টেকনিক প্রতিভাকে নিয়ন্ত্রিত করিবে না। ক্রোচে যে একটি সিদ্ধান্ত দিয়াছেন তাহার বিস্তারিত ব্যাখ্যা দিলে কথাটা আরও স্পষ্ট হইবে। ইউরোপীয় রঙ্গমঞ্চে প্রথমে বালকদের দ্বারা স্ত্রীভূমিকা অভিনীত হইত। 'ব্যাকরণ-বিভীষিকা' সত্ত্বেও ইহাদিগকে বলা যাইতে পারে 'বালক অভিনেত্রী'। ক্রমে মেয়েরাই মেয়েদের ভূমিকায় অবতীর্ণ হইতে আরম্ভ করিল এবং ইহার ফলে নাটকের বিষয়বস্তু ও প্রকাশভঙ্গিমায়ও খুব পরিবর্তন আসিয়া গেল। এই পরিবর্তন টেকনিকের ব্যাপার। ইহার সঙ্গে প্রতিভার সম্পর্ক গৌণ, পরোক্ষ। শেক্সপীয়রের নাটকের কথা স্মরণ করিলেই দেখা যাইবে প্রতিভা কেমন করিয়া টেকনিকের দ্বারা সীমিত না হইয়া তাহার উপর আধিপত্য বিস্তার করে। শেক্সপীয়রের আমলে মেয়েদের ভূমিকায় ছেলেরা নামিত ; এই টেকনিকের শেক্সপীয়র যে সদ্ব্যবহার করিয়াছেন তাহার পরিচয় পাওয়া যায় জুলিয়া, রোজালিণ্ড, ভায়ওলা, পোরশিয়া, ইমোজেন প্রভৃতি চরিত্রে এবং তাহাদের কাহিনীতে। কিন্তু এ. সি. ব্র্যাড্‌লী স্মরণ করাইয়া দিয়াছেন যে, শুধু যদি শেক্সপীয়রের নায়িকাদের নাম করা যায়— ক্যাথারিনা, বিয়াত্রিচি, হেলেনা, ইসাবেলা, ওফেলিয়া, ডেসডিমোনা, লেডি ম্যাক্‌বেথ, লীয়রের তিন কন্যা, পারডিটা, মিরাণ্ডা, ক্লিওপ্যাট্রা— তাহা হইলেই বোঝা যাইবে যে এই টেকনিক শেক্সপীয়রের প্রতিভার বাহন হইয়াছে, তাহাকে ব্যাহত করিতে পারে নাই। ক্লিওপ্যাট্রার একটি উক্তির মধ্যেই শেক্সপীয়রের প্রতিভার এই বৈশিষ্ট্য মুদ্রিত হইয়াছে। সীজারের কাছে আত্মসমর্পণ করিলে তাহার যে চরম লাঞ্ছনা হইবে মৃত্যুপথযাত্রী ক্লিওপ্যাট্রা তাহার বর্ণনা দিয়াছে এইভাবে :

I shall see
some *squcaking* Cleopatra *boy* my greatness
I' the posture of a whore.

শিল্পের যে বহিঃপ্রকাশ হয় তাহার মধ্যে বাস্তবজীবনের উপাদান ও উপকরণ প্রবেশ করে এবং এই বহিঃপ্রকাশিত শিল্পের রীতিনীতি সম্পর্কে কতকগুলি নিয়ম ও সূত্র রচিত হইয়া থাকে। এই সকল সূত্র বা নিয়মের উপযোগিতা আছে, কিন্তু বাস্তব অভিজ্ঞতাপ্রসূত বলিয়াই ইহারা দার্শনিক সূত্রের মতো চূড়ান্ত বা সর্বব্যাপী নয়; অভিজ্ঞতার পরিবর্তনের সঙ্গেই ইহাদের পরিধি সীমিত বা পরিবর্তিত হইবে। দৃষ্টান্তস্বরূপ অ্যারিস্টটলের Unities-এর কথা বলা যাইতে পারে। গ্রীক নাটকে স্থান ও কালকে সীমিত করার প্রয়োজন বা সার্থকতা ছিল। এই টেকনিককে সর্বব্যাপী করিতে যাইয়াই শিল্পী ও সমালোচকেরা নানা গোলযোগে পড়িয়াছেন। ক্রোচে এই জাতীয় টেকনিক বা আঙ্গিক-আশ্রিত নিয়মকানুনকে বলিয়াছেন pseudo-concepts বা মেকি সূত্র। টেকনিকের সংকীর্ণতা প্রমাণ করা ক্রোচের অন্যতম প্রধান অবদান।

এই সকল মেকি সূত্রের উপযোগিতা আছে, কিন্তু সে খুব সীমিত ক্ষেত্রে। অন্যান্য শিল্পের কথা বাদ দিয়া শুধু সাহিত্যের কথাই ধরা যাইতে পারে। উপায়, উপকরণ ও উদ্দেশ্যকে ভিত্তি করিয়া সাহিত্যের অনন্ত শ্রেণীবিভাগ করা হইয়াছে এবং প্রত্যেক শ্রেণী, উপশ্রেণী ও ইহাদের অঙ্গপ্রত্যঙ্গ সম্বন্ধে এত সূত্র রচনা করা হইয়াছে, এত আইন জারি করা হইয়াছে যে তাহার কাছে নক্ষত্রপুঞ্জের অসংখ্যতাও হার মানিবে। পোলোনিয়াসের জবানীতে শেক্সপীয়র এই অর্থহীন, অনন্ত শ্রেণীবিভাগের উপর অবিস্মরণীয় বিদ্রূপ বর্ষণ করিয়াছেন : 'tragedy, comedy, history, pastoral, pastoral-comical, historical-pastoral, tragical-historical, tragical-comical-historical-pastoral, scene individable, of poem unlimited...'। যে কোন সার্থক কাব্যই অনন্য; নিজেই নিজের শ্রেণী এবং শ্রেণীর কোন সংজ্ঞাই খুব আলাদাভাবেও সকল সাহিত্যকর্মের উপর প্রযোজ্য হইবে না। অ্যারিস্টটল শ্রেণী-বিভাগের উপর খুব জোর দিয়াছেন; তাঁহার *পোয়েটিক্স* গ্রন্থের মূল বিষয় ট্র্যাজেডি। ট্র্যাজেডি দুঃখের গুরুগম্ভীর কাহিনী এবং তাহা বিয়োগান্ত হওয়া উচিত। অ্যারিস্টটল ঈদিপাসের কাহিনীর ট্র্যাজিক তাৎপর্যের উপর খুব জোর দিয়াছেন এবং আমরা নিঃসন্দেহে মানিয়া লইতে পারি যে সফোক্লিসের *ঈদিপাস* নাটকদ্বয় বিষাদান্ত ও বিয়োগান্ত। কিন্তু তিনি ইউরিপিদিসের *Iphigenia in Tauris*-কেও ট্র্যাজেডি বলিয়াছেন, যদিও ইহা মিলনান্ত। কিন্তু ইহাকে কমেডি বলিয়া অ্যারিষ্টফেনিসের নাটকের সামিল করা কি সঙ্গত হইবে? বাংলাসাহিত্যে *চন্দ্রগুপ্ত*-কে কি বলিবেন? কমেডি? তাহা হইলে ইহা *প্রায়শ্চিত্ত, ত্র্যহস্পর্শ* প্রভৃতির পর্যায়ে পড়িবে। আধুনিক ইউরোপীয় সাহিত্যে *The Cherry Orchard, Mother Courage* ট্র্যাজেডি বলিয়া স্বীকৃত ও আদৃত হইয়াছে, কিন্তু শেখভ ও ব্রেখ্ট্ নিজ নিজ নাটককে কমেডি বলিয়াই মনে করিতেন।

বাস্তবিক পক্ষে, ক্রোচের মতে, ট্র্যাজিক, কমিক, উদাত্ত (sublime) প্রভৃতি মেকি ধারণা বা আধা-কন্‌সেপ্ট সম্পর্কে যত সন্তর্পণেই সংজ্ঞা রচনা করি না কেন, সেই সকল সংজ্ঞায় অব্যাপ্তি বা অতিব্যাপ্তি দোষ হইবেই। যত ব্যাপক সংজ্ঞাই করি না কেন কোন শ্রেষ্ঠ রচনাকেই তাহার দ্বারা উপলব্ধি করা যাইবে না এবং প্রত্যেক মৌলিক রচনার অভ্যাগমেই সেই সংজ্ঞার সংশোধন করিতে হইবে। ঈষৎ পরিহাসের সহিত ক্রোচে মন্তব্য করিয়াছেন, ট্র্যাজিক, কমিক প্রভৃতি হইল সেই বস্তু, সংজ্ঞাকারীরা তাঁহাদের সংজ্ঞার দ্বারা যে-সকল বস্তুকে বুঝাইয়াছেন বা বুঝাইবেন। ইহার অর্থ এই যে, কংক্রীট শিল্পজগতে সংজ্ঞা অর্থহীন, কারণ রূপ সূত্র নহে।

চরিত্রের সংজ্ঞা সম্বন্ধেও সেই একই আপত্তি প্রযোজ্য। প্রত্যেক চরিত্রের মধ্যেই স্বীয় স্বীয় বৈশিষ্ট্যই প্রাধান্য পাইয়াছে, তাহাকে সূত্রের মধ্যে আনিতে চাহিলে, তাহার বৈশিষ্ট্য আচ্ছন্ন

হইয়া যাইবে। অ্যারিস্টটল নির্দেশ দিয়াছিলেন যে, ট্র্যাজেডির নায়ক মোটামুটিভাবে ভাল মানুষ হইবে; রামচন্দ্রের প্রতি লক্ষ্য রাখিয়া আমাদের দেশের আলংকারিকেরা মহাকাব্যের নায়ক ধীরোদাত্ত হইবে এইরূপ নির্দেশ দিয়াছেন। কিন্তু ম্যাকবেথকে ভাল মানুষও বলা যায় না, ধীরোদাত্তও বলা যায় না। অ্যাকিলিসের মধ্যে উদাত্ততা থাকিলেও ধৈর্যগুণ আছে এমন কথা বলা যায় না। সাহিত্যের অন্যতম শ্রেষ্ঠ চরিত্র ডন্‌কুইক্সোটকে শ্রেণীবাচক কনসেপ্ট বা সূত্রের সাহায্যে ব্যাখ্যা করিবার চেষ্টা করা হইয়াছে। কেহ বলেন, ডন্‌কুইক্সোট বাস্তব সম্পর্কে অলীক ধারণার প্রতিরূপ, কেহ বলেন এই চরিত্রের মূলীভূত আইডিয়া গৌরবলাভের আকাঙ্ক্ষা। কিন্তু ক্রোচে বলেন, এই দুই আইডিয়ার প্রতিরূপ হিসাবে এমন অনেক লোকের কল্পনা করা যায় যাহারা ডন্ কুইক্সোট নয়, যাহাদের সঙ্গে ডন্ কুইক্সোটের কোন সাদৃশ্যই নাই। প্রকৃতপক্ষে, ডন্ কুইক্সোট একমাত্র ডন্ কুইক্সোট সম্প্রদায়েরই প্রতিনিধি!

ফল কথা এই যে, কাব্য ও শিল্প ব্যক্তির রূপ সৃষ্টি করে, তাহার একমাত্র লক্ষণ individuality বা প্রাতিস্বিকতা, অনন্যত্ব। ইহার মধ্যে বুদ্ধিবৃত্তির অনুপ্রবেশ সম্ভব নয়, বাস্তবজগতের সঙ্গেও ইহার সম্পর্ক নাই। বুদ্ধির জগতের তর্ক বা সিদ্ধান্ত ইহার মধ্যে প্রবেশ করিলে তাহাদের বৈশিষ্ট্য পরিত্যাগ করিয়া প্রাথমিক অনুভূতির মতো নিছক উপকরণ হিসাবেই প্রবেশ করিবে। বহির্জগতে প্রকাশের সময় বস্তুজগতের উপকরণ ও নিয়মশৃঙ্খলা ইহাকে খানিকটা আচ্ছন্ন করে, কিন্তু তাহার মধ্যে ইহার রূপসর্বস্ব অনন্যতা স্বে মহিম্নি প্রতিষ্ঠিত।

৬.

ক্রোচের নন্দনতত্ত্বের সঙ্গে আমাদের দেশের রসবাদ ও ধ্বনিবাদের সাদৃশ্য আছে এবং এই সাদৃশ্যের উপর ভিত্তি করিয়া অতুলচন্দ্র গুপ্ত তাঁহার পরমাশ্চর্য গ্রন্থ *কাব্য-জিজ্ঞাসা* রচনা করিয়াছেন। এই দুই মতবাদের মধ্যে সাদৃশ্যও পার্থক্য দুইই আছে। এই সাদৃশ্য আর পার্থক্যের উল্লেখ করিয়া অন্য প্রসঙ্গের অবতারণা করিব।

ইহাদের মধ্যে প্রধান সাদৃশ্য সাহিত্য ও শিল্পের অন্যফলনিরপেক্ষতা ও রূপসর্বস্বতা। ক্রোচে যাহাকে বলিয়াছেন অভিব্যক্তি, আনন্দবর্ধন ও অভিনব গুপ্ত তাহারই নাম দিয়াছেন রসপ্রতীতি বা রসের আস্বাদ্যমানতা। উভয় মতবাদেই, কাব্য শাস্ত্র-ইতিহাসাদি হইতে পৃথক এবং ইহা অন্যফলনিরপেক্ষ। উভয় মতবাদেই, কবিপ্রতিভা চৈতন্যকে প্রত্যক্ষ করে, সুতরাং ইহা জ্ঞানাত্মিকা। অভিনব বলিয়াছেন, চৈতন্য যে সকল অবান্তর বস্তুতে আচ্ছন্ন থাকে, কবিপ্রতিভা তাহাদিগকে অপসারিত করিয়া চৈতন্যকে স্বস্বরূপে উপলব্ধি করিতে চেষ্টা করে। এইজন্যই রসোপলব্ধি ব্রহ্মাস্বাদ-সহোদর। ক্রোচে বলিয়াছেন, বুদ্ধি— যাহা শাস্ত্রাদি রচনা করে— এবং কর্মপ্রবৃত্তি— যাহা ব্যবহারিক জগতে ক্রিয়াশীল— ইহারা চৈতন্যকে অধিকার করিবার পূর্বে চৈতন্য যে বিশুদ্ধ রূপ সৃষ্টি করে বা দর্শন করে তাহাই অভিব্যক্তি বা আর্ট।

এই পৌর্বাপর্যের মধ্যেই এই দুই মতবাদের পার্থক্য সূচিত হইয়াছে। ক্রোচের মতে, রসপ্রতীতি থাকে চৈতন্যের প্রথম কক্ষ্যায়, প্রথমে চৈতন্য স্বীয় অনুভব, সংবেদন (sensation) প্রভৃতিকে স্বসংবিদের মধ্যে প্রত্যক্ষ করে— এই প্রত্যক্ষীকরণের অপর নাম (expression) বা অভিব্যক্তি। ধ্বনিবাদীরা রসবিচার করিয়াছেন অর্থের মাধ্যমে। শব্দার্থের প্রথম কক্ষ্যায় অভিধা, অর্থাৎ শব্দের প্রাথমিক অর্থ, দ্বিতীয় কক্ষ্যায় থাকে তাৎপর্যবৃত্তি যাহা এক শব্দকে অন্য শব্দের সঙ্গে অন্বিত করে, তৃতীয় কক্ষ্যা হইল লক্ষণার অধিকার, সেখানে প্রাথমিক অর্থ বাধিত হওয়ায় অন্য এক অর্থের উদ্ভব হয়, আর শেষ কক্ষ্যায় থাকে ব্যঞ্জনা যাহা রস ধ্বনিত করে। প্রথম তিনটিতে এক পর্যায়ে ফেলিয়া শব্দার্থের দুইটি শ্রেণী স্বীকার করা যাইতে পারে— অভিধা ও

ব্যঞ্জনা। অভিধা শাস্ত্র-ইতিহাসাদি ও ব্যবহারিক জীবনের ভাষা, আর কাব্যের ভাষা ব্যঞ্জনা। অভিধাকে গৌণ করিয়াই ব্যঞ্জিত অর্থ আক্ষিপ্ত হয়, এই পরিভাষায় ক্রোচের মত হইবে যে, অভিধার অভ্যাগমের পূর্বেই ব্যঞ্জনার কার্য সমাপ্ত হইয়া যায় এবং ব্যঞ্জনাকে ভিত্তি করিয়া বুদ্ধি অভিধায় উপনীত হয়। আর ভারতীয় রসশাস্ত্রীরা বলেন, শাস্ত্র-ইতিহাসাদির অভিহিত অর্থের পরে কাব্যপ্রতীতির ব্যঙ্গ অর্থ প্রতিভাসিত হয়। ভারতীয় মতে ব্যঞ্জনার ভিত্তি অভিধা আর ক্রোচের মতে অভিধার ভিত্তি ব্যঞ্জনা।

অভিধা ও ব্যঞ্জনার মধ্যে কি সম্পর্ক, কেমন করিয়া অভিধা গৌণ হইয়া ব্যঙ্গ অর্থকে আক্ষিপ্ত করে তাহা ধ্বনিবাদীরা স্পষ্ট করেন নাই। আনন্দবর্ধন বলিয়াছেন, অভিধা ব্যঞ্জনার ভিত্তিভূমি, ব্যঞ্জনালাভের উপায়; পদের অর্থের দ্বারা যেমন বাক্যের অর্থ পাওয়া যায়, দীপশিখার সাহায্যে যেমন আলোক পাওয়া যায়, তেমনি অভিধার মাধ্যমে ব্যঞ্জনায় উপনীত হওয়া যায়। ইহা উপমা সমাবেশ, যুক্তি নহে। শিষ্য অভিনব গুপ্ত এই সমস্যা এড়াইয়া গিয়াছেন। রসবাদের এই ত্রুটি মৌলিক। ভারতীয় অলংকারশাস্ত্রের মূলে আছে রতি প্রভৃতি আট বা নয় ভাব, যাহারা রসত্বে নীত হয়। কিন্তু এই ভাবগুলি— রতি, হাস, উৎসাহ, ক্রোধ, জুগুপ্সা, ভয়, বিস্ময়, শোক, নির্বেদ— ইহারা কি প্রাথমিক অস্পষ্ট অনুভূতিমাত্র, না বুদ্ধিবৃত্তিসঞ্জাত আইডিয়াও বটে? ধ্বনিবাদীরা এই প্রশ্নের মধ্যে প্রবেশ করেন নাই বলিয়াই ব্যঞ্জনার মধ্যে অভিধার অংশ যাচাই করিতে পারেন নাই। এই দিক দিয়া ক্রোচে অনেক বেশি গভীর বিচারে প্রবিষ্ট হইয়াছেন। তিনি প্রতীতি (ইনটুইশন) ও বিচারবুদ্ধির মধ্যে সূক্ষ্ম পার্থক্য করিয়াছেন এবং প্রতীতির মধ্যে বিচারবুদ্ধির তর্ক ও সিদ্ধান্ত কেমন করিয়া মিশিয়া যায় তাহা দেখাইতে চেষ্টা করিয়াছেন।

কিন্তু এই সূক্ষ্ম পার্থক্য করিতে যাইয়া ক্রোচে একটা সমস্যায় পড়িয়াছেন যাহার তিনি কোন সমাধান দিতে পারেন নাই। তাঁহার একটানা নিশ্ছিদ্র নন্দনতত্ত্বের ইহা প্রধান অপূর্ণতা। শিল্পের সৃষ্টি হয় শিল্পীর চেতনায়, একান্ত ব্যক্তিগত উপলব্ধিতে ; অথচ এই যে প্রতীতি যাহার প্রধান বৈশিষ্ট্য রূপের অনন্যতা তাহার মধ্যে গৌড়জন আনন্দে পান করে সুধা নিরবধি। কেমন করিয়া ব্যক্তির প্রতীতি আপনার ব্যক্তিধর্ম রক্ষা করিয়াও নৈর্ব্যক্তিক সার্বভৌমতা লাভ করে ক্রোচে তাহার কোন ব্যাখ্যা দিতে পারেন নাই। এই দিক দিয়া বিচার করিলে ভারতীয় অলংকারশাস্ত্রের শ্রেষ্ঠত্ব সহজেই প্রমাণিত হয়। ভট্টনায়কের সাধারণীকৃতির উপর ভিত্তি করিয়া অভিনব গুপ্ত রসের যে দেশকাল-অনালিঙ্গিত, সার্বভৌম, অ-লৌকিকত্বের ব্যাখ্যা দিয়াছেন তাহার তুলনা ইউরোপীয় নন্দনশাস্ত্রে কোথাও পাওয়া যায় না।

আনন্দবর্ধন-অভিনব গুপ্তের ও ক্রোচের আলোচনায় আর একটি সাদৃশ্য আছে যাহা উভয় মতবাদকে সমানভাবে দূষিত, সীমিত করিয়াছে। ধ্বনিবাদীরা মনে করেন যে শব্দ যখন অভিহিত অর্থকে গৌণ করিয়া অন্য একটি অর্থকে প্রতীয়মান করিল তখনই ধ্বনির কাজ শেষ হইল। দুইটি ধ্বনির মধ্যে বিষয়গত পার্থক্য থাকিতে পারে এবং সেই অনুসারে বস্তুধ্বনি, অলংকারধ্বনি বা রসধ্বনিতে তাহাদিগকে বিভক্ত করা যাইতে পারে। কিন্তু তাঁহারা দুইটি ধ্বনিতে গুণগত পার্থক্যের নির্দেশ দিতে পারেন নাই। সেইজন্য ইঁহাদের মুখ্য কাজ হইয়াছে অগণিত ধ্বনিগণনা করা। এই অনন্ত বালুরাশির মধ্যে রসধারা নিঃশেষে শুকাইয়া গিয়াছে। ক্রোচেও একটি ইনটুইশনের সঙ্গে আর একটি ইনটুইশনের কোন গুণগত বৈষম্য দেখিতে পান নাই। সুতরাং তাঁহার কাছে একটি ছোট্ট লিরিকের দীর্ঘশ্বাস এবং *ডিভাইনা কমেডিয়া* ও *কিংলীয়ার*-এর বিশ্ববোধ— ইহাদের মধ্যে প্রভেদ শুধু আয়তনের। ধ্বনিবাদীদের কাব্যবিচার

গণনায় পর্যবসিত হইয়াছে আর ক্রোচে শুধু আয়তন নির্ধারণ ও পরিমাপ করিয়াছেন। উভয়ত্র এই জাতীয় বিশ্লেষণকে পণ্ডিতের পণ্ডশ্রম বলিয়া মনে হয়।

৭.

ক্রোচে আইডিয়ালিষ্ট বা ভাববাদী দার্শনিক। তিনি চৈতন্যকেই একমাত্র সত্য বলিয়া মনে করেন এবং চৈতন্যের সর্বব্যাপিতা ও অচলকর্তৃত্বে বিশ্বাস করেন। কিন্তু তাঁহার দর্শনের মূল কথা হইল চৈতন্যলোকের বিভিন্ন অংশের সীমানির্দেশ, যাহাতে একে অপরের কক্ষ্যায় অনধিকার প্রবেশ করিতে না পারে। পূর্বেই বলিয়াছি, কেহ কেহ এই দর্শনের নাম দিয়াছেন the philosophy of distincts বা স্বতন্ত্রতাবাদ।

চৈতন্যের বিভিন্ন অংশের সীমারেখা নির্দেশই ক্রোচের নন্দনতত্ত্বের প্রধান কৃতিত্ব, কিন্তু ইহাই তাহার মতবাদকে সীমিত, সংকীর্ণ করিয়া দিয়াছে। তিনি বলিয়াছেন, কাব্যের মধ্যে দার্শনিক কথা অনেক থাকে বটে, কিন্তু তাহাদের দার্শনিকত্ব একেবারে মুছিয়া যায়। সার্থক কাব্যে দার্শনিক তত্ত্ব নিজের বৈশিষ্ট্যকে আচ্ছন্ন করিয়া রূপসৃষ্টির উপাদানরূপে দেখা দেয়। সেই অবস্থায় দর্শনের দার্শনিকত্ব লুপ্ত হইয়া যায়, কারণ সমগ্রের দ্বারাই অংশের গুণাগুণ নির্ণীত হয়। কিন্তু তিনি ভুলিয়া গিয়াছেন, অংশ ও সমগ্র অন্যোন্যাশ্রিত, সমগ্রের দ্বারা যেমন অংশ নিয়ন্ত্রিত হয়, অংশের দ্বারাও তেমনি সমগ্র নিয়ন্ত্রিত হয়, কারণ অংশের বাহিরে সমগ্রের কোন অস্তিত্ব নাই। ক্রোচে মনে করেন, শিল্প বিষয়বস্তু নিরপেক্ষ, রূপসর্বস্ব সৃষ্টি। সুতরাং দুইটি সৃষ্টির মধ্যে কোন গুণগত পার্থক্য হইতে পারে না, কারণ একই বিষয়ের উপর দুই সৃজনীপ্রতিভা নিয়োজিত হইলেই গুণগত তারতম্য হইতে পারিত, একটি রূপকল্প অপর একটি রূপকল্প হইতে তীব্রতর হইতে পারিত। কিন্তু তাহা হইলে, শিল্প দর্শনের অঙ্গ হইয়া পড়িত, কারণ দর্শনই অ্যাবষ্ট্রাক্ট গুণ ও দোষের বিচার করে (scientia qualitatum)। এইভাবে অগ্রসর হইয়া ক্রোচে এক স্ববিরোধী সিদ্ধান্তে উপনীত হইয়াছেন। তিনি এই বলিয়া আরম্ভ করিয়াছেন যে, শিল্পের বৈশিষ্ট্য form বা রূপে, বিষয়বস্তু সম্পর্কে সে উদাসীন। তারপর তিনি এই মতও প্রকাশ করিয়াছেন যে দুইটি শিল্পকর্মের প্রভেদ করা যাইবে শুধু ইনটুইশনের ক্ষেত্রের বিস্তৃতির দ্বারা অর্থাৎ বিষয়বস্তুর জটিলতা ও আয়তনের পরিমাপের দ্বারা। এইভাবে বিষয়বস্তু একবার বর্জিত হইয়া আবার প্রাধান্য পাইয়াছে।

একই বিষয়বস্তুর সম্পর্কে যে একাধিক ইনটুইশন রচিত হইতে পারে না, ইহা সত্য নহে। রামায়ণ-মহাভারতের কাহিনী লইয়া বহু নাটক উপন্যাস রচিত হইয়াছে। শুধু এক প্রতিহিংসাগ্রহণ বিষয়কে আশ্রয় করিয়া এলিজাবেথের যুগে বহু নাটক লিখিত হইয়াছে। সত্য বটে কোন এক বিষয়ের একটি নাটকের সঙ্গে আর একটি নাটকের বহু পার্থক্য আছে; একই বিষয়ের দুইটি চিত্রে আসমান-জমিন প্রভেদ থাকে। এই প্রভেদ শুধু রূপের প্রভেদ নয়, বিষয়বস্তু, দার্শনিক চিন্তা ও রূপসৃষ্টির প্রভেদ। সবগুলি উপাদান মিলিয়া যে সমগ্র সৃষ্টি আমাদের কাছে প্রতিভাত হয় তাহাই প্রতীতি বা ইনটুইশন। ইহা রূপময়, রূপসর্বস্ব, কিন্তু নিরাশ্রয়, নিরালম্ব নহে। ইহা দার্শনিক বুদ্ধি ও অন্যান্য উপাদানের অপেক্ষা রাখিয়াই তাহাদের অসংখ্য বন্ধন মাঝেই মুক্তির আস্বাদ লাভ করে। এই অপেক্ষিত অনপেক্ষাই শিল্প সাহিত্যের প্রাণ প্রসঙ্গান্তরে অভিনব গুপ্ত রসব্যাখ্যায় পানক রসের উপমা দিয়াছেন। সুস্বাদু পানীয়ের মধ্যে গুড়মরিচাদি নানা উপাদান থাকে, রসিক ব্যক্তি যখন পানীয়ের আস্বাদ করেন, তখন তিনি বিভিন্ন উপকরণের আস্বাদ পান, আবার সমগ্র পানীয়ের আস্বাদও পান।

কবির জীবনচরিত, কবির উপরে তাঁহার প্রতিবেশের প্রভাব— ব্যবহারিক জীবনের এইসব প্রসঙ্গ সম্পর্কেও অনুরূপ মন্তব্য প্রযোজ্য সত্য বটে, কবির ব্যবহারিক জীবনের সঙ্গে তাঁহার কাব্যজীবনের সোজাসুজি কোন সম্পর্ক নাই, কবিরে পাব না তাহার জীবনচরিতে। কিন্তু বৈষ্ণবকাব্যে রাধার আদর্শায়িত, দেশকাল-অনালিঙ্গিত মূর্তির পরিপূর্ণ উপলব্ধি পাওয়ার জন্য রবীন্দ্রনাথ প্রশ্ন করিয়াছিলেন :

সত্য করে কহ মোরে হে বৈষ্ণবকবি,
কোথা তুমি পেয়েছিলে এই প্রেমচ্ছবি,
কোথা তুমি শিখেছিলে এই প্রেমগান
বিরহতাপিত।

দান্তের জীবনী তাঁহার কাব্যে প্রায় প্রত্যক্ষভাবে প্রতিফলিত হইয়াছে আর শেক্সপীয়রের জীবনী যতটুকু জানি তাহার সঙ্গে তাঁহার রচনার প্রায় কোন সম্পর্কই নাই। দান্তের বাস্তবজীবনের বস্তু কাব্যের রূপকে প্রভাবিত করিয়াছে, কিন্তু যেখানে ইহা প্রায় সোজাসুজিভাবে প্রকাশ পাইয়াছে সেইখানেও ব্যবহারিক জীবনের সংকীর্ণ গণ্ডি অতিক্রম করিয়া রূপলোকে অন্তরিত হইয়াই সে প্রকাশ পাইয়াছে। অপর পক্ষে শেক্সপীয়রের প্রায় প্রত্যেকটি চরিত্র আপন ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্যে ভাস্বর হইলেও এবং তাঁহার ব্যবহারিক জীবনের ঘটনা ও ব্যক্তিত্ব তাঁহার রচনায় প্রত্যক্ষভাবে প্রতিফলিত না হইলেও সেই রচনার মধ্যে ভাবশরীরী কবিসত্তার পরিচয় পাওয়া যায়, সেই সত্তা ব্যবহারিক জীবন হইতে বিচ্ছিন্ন নয়, যদিও ইহাদের সংযোগসেতু আমাদের কাছে খুব স্পষ্ট নয়।

ক্রোচে পুরাপুরি আইডিয়ালিস্ট। তাই নন্দনতত্ত্বে তিনি প্রকাশের উপকরণকে একেবারে গৌণ করিয়া দেখিয়াছেন ; তাঁহার মতে শিল্পের পরিপূর্ণ রূপই চৈতন্যের মধ্যে প্রতিভাত হয়। গ্রীক্ কিংবদন্তীতে আছে দেবরাজ জিউসের শিরোদেশ হইতে অস্ত্রশস্ত্রে সুসজ্জিত হইয়াই এথেনা আবির্ভূত হইয়াছিলেন, আমাদের কিংবদন্তীতে আছে যে পরিপূর্ণযৌবনা উর্বশী সমুদ্রগর্ভ হইতে উত্থিত হইয়াছিলেন। শিল্পীর সৃষ্টি কিন্তু এত সরল নহে। বিশিষ্ট উপকরণ— শব্দ, অর্থ, রং, মৃত্তিকা, পাথর প্রভৃতি— অবলম্বন করিয়াই সে রূপ গ্রহণ করে। এই উপকরণ প্রয়োগের মধ্য দিয়া ধাপে ধাপে শিল্পরূপ গড়িয়া উঠে, একটি উপমা আর একটি উপমা আনয়ন করে, একটি চরিত্রের প্রভাবে আর একটি চরিত্র বিকশিত বা আচ্ছাদিত হয়, একটি সুর আর একটি সুর জাগাইয়া তোলে। নিজের মতের সমর্থনে ক্রোচে মাইকেল এঞ্জেলোর একটি উক্তি উদ্ধৃত করিয়াছেন, 'শিল্পী হাত দিয়া চিত্র আঁকেন না, মস্তিষ্কের দ্বারা আঁকেন।' কিন্তু এই শিল্পীর সম্পর্কেই আর একটি উক্তিও প্রচলিত আছে যে তিনি পাথরের মধ্যেই মূর্তি দেখিতে পাইতেন এবং তিনি শুধু মূর্তিগুলি বাহির করিয়া আনিতেন। শিল্পীর উপকরণনির্ভরতাকে শিল্পপ্রতিভা হইতে বিচ্ছিন্ন করিয়া দেখিয়াছেন বলিয়া ক্রোচে শিল্পের স্বরূপের যে পরিচয় দিয়াছেন তাহা খণ্ডিত বলিয়া মনে হয়।

বস্তুজগৎকে তুচ্ছ করিয়াছেন বলিয়া এবং শিল্পের রূপকে দার্শনিক বন্ধন হইতে সম্পূর্ণরূপে মুক্ত করিতে চাহিয়াছেন বলিয়া ক্রোচের নন্দনতত্ত্বকে অভ্রান্ত ও সম্পূর্ণ বলিয়া গ্রহণ করা যায় না। কিন্তু অন্য কোন নন্দনতাত্ত্বিক শিল্পের অনন্যতা, অনপেক্ষিতত্ব ও রূপসর্বস্বতার এমন যুক্তিপূর্ণ ব্যাখ্যা দিতে পারেন নাই এবং তিনি রসপ্রতীতিকে শ্রেণীবিভাগের ও টেকনিকের দাসত্ব হইতে মুক্ত করিয়াছেন। এই কৃতিত্ব তাঁহাকে নন্দনতত্ত্বে অমরত্ব দান করিবে।

বেনেদেত্তো ক্রোচের নন্দনতাত্ত্বিক সাহিত্যচিন্তা

ইন্দ্রনীল আচার্য

বিভিন্ন গোষ্ঠীর লেখক, শিল্পী, নাট্যপ্রযোজক— এমনকি নৃত্যশিল্পী যাঁরা নিজেদের অভিব্যক্তিবাদের সমর্থক বলে দাবি করতেন— তাঁরা সবাই ক্রোচের মতবাদের মধ্যে নিজেদের শিল্পতত্ত্বের শক্ত ভিত্তিভূমির সন্ধান পেয়েছিলেন। তাঁরা হয়তো উপলব্ধি করেছিলেন যে ক্রোচের শিল্পদর্শন এক পরিপূর্ণভাবে মুক্ত শিল্পভাবনার চাহিদাগুলো পূরণ করতে সক্ষম হবে। পিরানদেলো (Pirandello) ক্রোচের এক ভাবশিষ্য যিনি অলীক পৃথিবীকে একমাত্র বাস্তব হিসেবে গড়ে তোলার ব্যাপারে যথেষ্ট মুনশিয়ানার পরিচয় দেন এবং যিনি মুক্তকণ্ঠে স্বীকার করেন যে তাঁর সাহিত্যকর্ম ক্রোচের নন্দনতত্ত্বের মূল নীতিগুলির সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ যদিও এই দাবি একেবারেই অমূলক যে পিরানদেলো যে ধরনের 'অভিব্যক্তিবাদী' নাটক রচনা করেছেন তা ক্রোচের শিল্পনীতির উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত। এর কারণ ক্রোচের নন্দনতত্ত্বের আলোচনায় কোথাও 'অভিব্যক্তিবাদী' শিল্পকর্মের উল্লেখ নেই। ক্রোচে যে অর্থে 'অভিব্যক্তিবাদ' এই অভিধাটি ব্যবহার করেছেন তা কোনো বিশেষ ধরনের শিল্পকলাকে বিশেষিত করে না। বরং সমস্ত ধরনের শিল্পকর্মকেই সূচিত করে। সেই ব্যাপক দৃষ্টিকোণ থেকে বিচার করলে ক্রোচের অভিব্যক্তিবাদের নমুনা যেমন পিরানদেলোর নাটকে পাওয়া যায়, ঠিক তেমনই সোফোক্লিস, শেক্‌সপিয়র এবং টেনিসনের লেখার মধ্যেও পাওয়া যায়।

ইতালীয় দার্শনিক ক্রোচের মত অনুসারে দুটি ভিন্ন ধরনের বাস্তবের অস্তিত্ব নেই— এমন একটি যা মানবমনের বাইরে পৃথকভাবে বিরাজ করে এবং আর একটি যা মনের মধ্যেই লুকিয়ে থাকে। তিনি মনে করেন যে মানবমনের বাইরে কোনো কিছুর অস্তিত্ব নেই যদিও নিজস্ব প্রয়োজনে এই মানবমন বাহ্যিক কোনো ধারণা পোষণ করে থাকে।

জ্ঞান দুই প্রকার— হয় স্বতলব্ধ বা স্বজ্ঞাত, নয় বিচারসাপেক্ষ, যুক্তিগ্রাহ্য। এই জ্ঞান হয় কল্পনাশক্তি প্রয়োগে অর্জিত হয়, নতুবা বুদ্ধির প্রয়োগে অধীত হয়। এই জ্ঞান থেকে জন্ম নেয় বহু বিশিষ্ট চিত্রকল্প অথবা একগুচ্ছ ধারণা। একটি জ্ঞান স্বতন্ত্র বস্তু সমূহের এবং অপরটি এই বস্তুবর্গের আন্তঃসম্পর্কজনিত। বুদ্ধির দ্বারা

আমরা এই সিদ্ধান্তে উপনীত হই যে মানুষ এক চিন্তাশক্তিসম্পন্ন জীব। অন্যদিকে, কল্পনাশক্তির সাহায্যে আমরা এমন এক জীবের অস্তিত্ব কল্পনা করি যার বৈশিষ্ট্য হল চিন্তাশক্তির প্রকাশ।

ক্রোচে তাঁর দার্শনিক মতবাদের দ্বারা সহজাত জ্ঞানের সাথে অভিজ্ঞতাজনিত প্রভাব বা ইন্দ্রিয়জ সংবেদনশীলতা ও অভিজ্ঞতার সাধারণ উপাদানগুলির পার্থক্য নিরূপণ করেছেন। এই সহজাত জ্ঞান যান্ত্রিকতা, সহজাত প্রবৃত্তিচালিত আচরণ ও একতরফা ক্রিয়ার চেয়েও আরও বিভিন্ন প্রভাবের সক্রিয় অভিব্যক্তি। ক্রোচে মনে করেন, "Every true intuition or representation is, also, expression. That which does not objectify itself in expression is not intuition or representation, but sensation and naturality. The spirit does not obtain intuitions otherwise than by making, forming, expressing ." [*Aesthetic : As Science of Expression and General Linguistic.* Translated by Douglas Ainslie1909]

প্রকৃত সহজাত জ্ঞান বা কল্পমূর্তি এক ধরনের অভিব্যক্তি প্রকাশের মাধ্যমে নির্দিষ্ট রূপ লাভ না করলে তাকে সহজাত জ্ঞান বা কল্পমূর্তির অভিধা প্রদান করা যায় না। সেক্ষেত্রে তা কেবল মাত্র ইন্দ্রিয়জ সংবেদনশীলতা বা এক ধরনের সরলীকৃত স্বাভাবিকতার নামান্তর। মানবাত্মা সহজাত জ্ঞান আহরণ করে থাকে বস্তুজগতের মধ্যে প্রবেশ করে তার নির্দিষ্ট রূপদান ও প্রকাশের মাধ্যমে।

উদাহরণ স্বরূপ বলা যায়, একজন চিত্রশিল্পী শুধুমাত্র কোনো কিছু অনুভব করে বা কোনো কিছু এক ঝলক অবলোকন করেই সেই বিষয়ে সহজাত জ্ঞানের অধিকারী হতে পারেন না। তা তখনই সম্ভব হয় যখন শিল্পী বস্তুকে পরিপূর্ণভাবে দেখেন, অর্থাৎ তাঁর মনে ওই বস্তুটির এক সামগ্রিক প্রকাশ ঘটে, নান্দনিক চেতনার উন্মেষ ঘটে যখন মানবমনের মধ্যে একটি বিশেষ রূপ প্রকাশিত হয়/ সৃষ্টি হয়। সেই রূপের নির্যাস হিসেবে আমরা পাই এক সংবেদনশীলতা। সহজাত জ্ঞান মানবাত্মার একটি প্রকাশিত ক্রিয়া যা একটি রূপদানে সহায়তা করে। এই বাঙ্ময় ক্রিয়াশীলতা ক্রোচের দৃষ্টিতে এক ধরনের মুক্তিদাতা যা কিনা আবেগ ও অনুভূতির বাঁধভাঙা জোয়ারকে নিয়ন্ত্রিত করে । এই নিয়ন্ত্রণ মানুষকে তার ব্যক্তিগত ধারণা/প্রভাবের জগৎ থেকে মুক্ত করে এবং তাদের এক বস্তুনিষ্ঠ প্রকাশ ঘটায়।

ক্রোচের দর্শনে শিল্প এক সহজাত জ্ঞান। অন্যভাবে বললে তা মনের মধ্যে সঞ্চিত ধারণাগুলির এক স্বতঃস্ফূর্ত প্রকাশ। মনের মধ্যে এই তাৎক্ষণিক উপলব্ধিগুলি তৈরির প্রক্রিয়া সর্বদাই চলতে থাকে। কখনও তা বৌদ্ধিক ধারণার স্তরে উন্নীত হয় অথবা শুধুমাত্র নগ্ন সংবেদনশীলতার স্তরেই নিমজ্জিত থাকে। এই তাৎক্ষণিক উপলব্ধিগুলো শিল্পের অভিধা পায় তখনই যখন তার সাথে মানবাত্মার মেলবন্ধন ঘটে এবং এক সুষম অভিব্যক্তির জন্ম হয়। এই স্তরে মনের মধ্যে জমে থাকা ধারণাগুলো কল্পনার রঙে রঙিন হয়ে ওঠে ও বিস্তার লাভ করে। যে সমস্ত সমালোচকেরা জীবনে অর্জিত অভিজ্ঞতা এবং শিল্পমাধ্যমে অর্জিত অভিজ্ঞতার মধ্যে পার্থক্য খোঁজেন তাঁদের সঙ্গে ক্রোচের নন্দনতত্ত্বের কোনো সাদৃশ্য নেই। ক্রোচের দৃষ্টিতে এই দুই অভিজ্ঞতার মধ্যে কোনো প্রকারগত ভেদ নেই। যদি কিছু তফাত থাকে তা হল একান্তই পরিমাণগত। যে-কোনো ধরনের জীবনের জলছবি এক শিল্পীর সৃষ্টির উপাদান হিসেবে পরিগণিত হতে পারে যখন তিনি তা খুব ভালো করে যাচাই করে নেন। আর এই খুঁটিয়ে দেখাই কিন্তু নিখুঁত প্রকাশের মাপকাঠি। ক্রোচে মনে করেন শিল্পী এমন এক মানুষ যিনি জীবনকে প্রাণোচ্ছল দেখেন আর সেই প্রাণোচ্ছলতাকে প্রকাশ করেন সৃষ্টিকর্মের মাধ্যমে। উৎকর্ষ নির্ভর করে

কল্পনাশক্তির পূর্ণ ক্রিয়াশীলতায় মনের মধ্যেকার ধারণাগুলিকে এক সজীব অভিব্যক্তি প্রদান করার মাধ্যমে। ক্রোচের মতে, সৃজনশীলতার প্রক্রিয়াটি স্রষ্টার অন্তর্জগতে সম্পাদিত হয়। নান্দনিক অভিব্যক্তি সামগ্রিকভাবে অন্তর্মুখী।

এই ধারণাও প্রাসঙ্গিক যে এই সৃষ্টি প্রক্রিয়ার একটি ধাপে শিল্পী তাঁর অভিব্যক্তিকে বহির্জগতে উন্মোচিত করতে পারেন । কিন্তু ক্রোচের ধারণা এই বহির্বিশ্বায়নের সঙ্গে শৈল্পিক ক্রিয়াকলাপের কোনো প্রত্যক্ষ যোগ নেই। মুক্ত প্রেরণাশক্তির প্রভাবে শিল্পীমন শিল্পের উপজীব্য বিষয় ভাবনায় নিমগ্ন হন। তিনি জানেন না তার উৎস কোথায় আর পরিণতিই বা কী, তাঁর সাধনা শুধু এই অন্তর্লীন সৃজনশীলতাকে সুন্দরের রসে জারিত করে সৃষ্টিকে সফল ও সার্থক করে তোলা। শিল্পের আনন্দ মূলত এক রোমাঞ্চ যা সফল প্রকাশের মাধ্যমে শিল্পী মনের মুক্তি ঘটায়। সুন্দর এক সফল শৈল্পিক অভিব্যক্তির অপর নাম।

ক্রোচে যখন বলেন যে নান্দনিক উৎকর্ষ সাধন আসলে কিছু সঞ্চিত ধারণার সুদীর্ঘ প্রকাশ তখন তিনি এমন এক অভিনিবেশের ধারণা দেন যা সম্পূর্ণভাবে শিল্পীর অন্তর্জগতে ঘটে থাকে। এর সঙ্গে কোনো বাহ্যিক উচ্চারণ বা লিখিত শব্দের যোগ নেই, নেই ক্যানভাসের আঁকিবুঁকি বা রঙের প্রলেপের সাথেও।

ক্রোচের শিল্পভাবনা বেশ ব্যতিক্রমী, হয়তো বা বৈপ্লবিক। এর কারণ তিনি প্রকাশিত বাহ্যিক শিল্পকর্মকে প্রকৃত শিল্পের স্বীকৃতি দেননি। তাঁর কাছে নানা অলংকারযুক্ত কোনো সুবক্তৃতা বা সুস্বাদু, অনুপম লিখিত গদ্য বা রঙিন জলছবি এমনকি লাস্যময় বিভঙ্গে অতুলনীয় কোনো স্ট্যাচু—সবকিছুই শিল্পীমনের আত্মীকৃত সহজাত—, তাৎক্ষণিক অনুভূতির প্রকাশের জন্য বাহ্যিক উত্তেজক বা প্রেরণাদায়ক উপস্থিতি মাত্র। এই স্পর্শগ্রাহ্য বাহ্যিক অভিব্যক্তিগুলি শিল্পীমনের কোণে লুক্কায়িত বহু মূল্যবান, ব্যতিক্রমী এবং তাৎক্ষণিক অনুভূতিগুলোর সংরক্ষণ করে। তারা প্রমাণ করে যে অনুভূতিগুলি হারিয়ে যায়নি, তারা এক বাহ্যিক মাধ্যমে বাঁধা পড়েছে। এই বাহ্যিক সৌন্দর্য আসলে শিল্পীচেতনার সেই স্তরকে সংজ্ঞায়িত করে যেখানে সুন্দর সহজাত উপলব্ধিগুলি মনোরাজ্যে বিচরণ করে থাকে।

ক্রোচের নন্দনতত্ত্বের একটি জায়গায় যুক্তিগ্রাহ্য ব্যাখ্যার অভাব আছে। শিল্পী ছাড়া অন্য কোনো শিল্পানুরাগী কীভাবে বাহ্যিক সৌন্দর্যপূর্ণ শিল্পবস্তু অবলোকন করে এক সুন্দর সহজাত তাৎক্ষণিক উপলব্ধির আলোয় উজ্জ্বল হয়ে উঠবেন সেই বিষয়ে ক্রোচের ব্যাখ্যা কিছুটা কমজোর। তাঁর কাছে এই তাৎক্ষণিক উপলব্ধি বা সহজাত জ্ঞান এক অনন্য ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্যের উপর প্রতিষ্ঠিত। কাজেই এর পুনরাবৃত্তি শিল্পী থেকে শিল্পানুরাগীতে সঞ্চারিত হওয়া সম্ভব নয়। এই বিভ্রান্তি দূর করার জন্য ক্রোচে কল্পনাশক্তি (Imagination) -কে সর্বশক্তিমান বলে অভিমত দেন এবং এই ব্যাখ্যা রসগ্রাহীর মনোজগতে সমমানের সহজাত তাৎক্ষণিক উপলব্ধির জন্ম দেবে। শিল্পী এবং শিল্পানুরাগীর ক্ষেত্রে তা সমভাবে প্রযোজ্য। তবু ক্রোচের তত্ত্বে একটি দ্বন্দ্ব প্রকট হয়ে থাকে। যদি কল্পনাশক্তি সর্বশক্তিমান হয়ে শিল্পী ছাড়াও বহু মানুষকে প্রভাবিত করে প্রকৃত শিল্প ভাবনা বা শিল্পজাত উপলব্ধি সঞ্চারিত করতে পারে সেক্ষেত্রে ক্রোচের আর এক প্রধান মতবাদ যা এই সহজাত, তাৎক্ষণিক উপলব্ধিকে একেবারেই ব্যক্তিসাপেক্ষ, অনন্য এবং অননুকরণীয় এক ধারণা হিসেবে প্রতিষ্ঠিত করেছে তার সাথে বর্তমান তত্ত্বটিকে মেলাব কী করে? কীভাবে এক শিল্পসমালোচক শিল্পবস্তুটির সমীক্ষা করে শিল্পীর সৃষ্টি-প্রক্রিয়া চলাকালীন যে অনন্য সহজাত জ্ঞানের উন্মেষ ঘটেছিল তার আস্বাদ পেতে পারেন? এর ফলে সমালোচককে

স্রষ্টার সমপর্যায়ে উন্নীত হতে হবে। ক্রোচে এই প্রসঙ্গে বলেছেন—"In order to judge Dante we must raise ourselves to his level." [পূর্বোক্ত]

ক্রোচে পরোক্ষভাবে স্বীকার করেছেন এই তাত্ত্বিক বিরোধের জায়গাটি। তিনিও মনে করেন যে শিল্পবস্তু অনেক ক্ষেত্রেই শিল্পসমালোচককে যথেষ্ট অনুপ্রাণিত করতে পারে না যাতে করে তিনি পরিপূর্ণভাবে নান্দনিক অনুভূতি শিল্পসমালোচনার মাধ্যমে পুনরুদ্ধার করতে পারেন। তিনি স্বীকার করেন যে শিল্পসমালোচককে যথেষ্ট জ্ঞানী রসবোদ্ধা এবং কল্পনাশক্তির অধিকারী হতে হবে যাতে করে তিনি স্রষ্টার সৃষ্টিকালীন ঐতিহাসিক প্রেক্ষাপটকে যথাযথভাবে বিশ্লেষণ করে সৃষ্টির উপাদানগুলিকে চিহ্নিত করতে পারেন এবং তাদের ব্যবহারের ধরন ও প্রক্রিয়া সম্বন্ধে সম্যকরূপে অবহিত থাকতে পারেন।

ক্রোচে আমাদের এক মহান সত্যের মুখোমুখি দাঁড় করিয়েছেন। শিল্প সবসময়েই এক ধরনের স্ব-প্রকাশ, সত্তার উন্মোচন। শিল্পের মাধ্যমে শিল্পীর এই সৃষ্টি ক্ষমতার স্বতঃস্ফূর্ত বহিঃপ্রকাশ শিল্পীমনে এক অনাস্বাদিত উল্লাসের জন্ম দেয়। এই উল্লাসের তীব্রতা আরও বেশি হয় যখন তা বিপরীত আবেগধর্মী ট্র্যাজিক শিল্পের অন্তর্নিহিত বেদনাকে শিল্প-মাধ্যমে এক গভীর জীবনবোধে উন্নীত করে।

তবু বিভ্রান্তি থেকে যায় কারণ ক্রোচের মতে 'শিল্প' এক স্বতন্ত্র ধারণা যা প্রচলিত সংজ্ঞাগুলি থেকে একেবারেই ভিন্ন। তাঁর কাছে এটি শিল্পীর মনোজগতে ক্রিয়াশীল একটি প্রক্রিয়া যা বহিরঙ্গের মাধ্যমগুলির (রং, তুলি, লেখনী) উপর কোনোভাবে নির্ভরশীল নয়। অন্যান্য সমালোচকেরা যখন শৈল্পিক প্রকাশের কোনো বাহ্যিক মাধ্যমের কথা বলেন তখন ক্রোচে এই মাধ্যমকে একেবারে গুরুত্বহীন বলে মনে করেন। তার কাছে সুন্দর শিল্পবস্তু এক ভ্রান্ত ধারণা। বস্তুজাত তাৎক্ষণিক উপলব্ধি বা জ্ঞান যা সুন্দরের দ্যোতনা বহন করে আনে তা-ই শিল্প। এইভাবে শিল্পকে অভিজ্ঞতার বিশুদ্ধ অন্তর্গত নির্মাণ হিসেবে দেখলে তা সমালোচনার বৃত্তের বাইরে থেকে যায়, কারণ তার বাহ্যিক রূপটি স্রষ্টার কাছে গুরুত্বহীন নির্মাণ হিসেবে পরিগণিত হয়। এই ধরনের শিল্পভাবনায় শিল্পীর সৃষ্টি-প্রক্রিয়ার উপর সম্পূর্ণ নিয়ন্ত্রণ থাকে এবং তা এক নিরঙ্কুশ, প্রশ্নাতীত আধিপত্যে পরিণত হয়। তাই অপব্যবহারের আশঙ্কাও তৈরি হয় বিশেষত শিল্পীর সৃষ্টিভাবনা বা সৃষ্টিকর্মের উপাদান যদি যথাযথ মান বা নীতিবোধ রহিত হয়।

ক্রোচের নন্দনতত্ত্বে বলা হয় যে শিল্পী কখনও তাঁর সমস্ত অন্তর্লীন ধারণাগুলিকে বাহ্যিক রূপ দেন না। ক্রোচে বলেন, "We select from the crowd of intuitions." (পূর্বোক্ত) এই বিষয়ে তিনি ম্যাথু আর্নল্ডের সাথে সহমত পোষণ করেন। আর্নল্ডের মতো তিনিও মনে করেন বিষয় নির্বাচন একটি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ বিষয়। কিন্তু তাঁর এই অভিমত পোষণ করার কারণটি একেবারে ভিন্ন। ক্রোচের মতে, শিল্পী যখনই বস্তুজগতের নিরিখে একটি শিল্পকর্মকে বহিরাঙ্গিক রূপ দেন তখনই তাঁর সৃষ্টিকে বাস্তববাদী, সমাজবদ্ধ জগতের মানদণ্ডে যাচাই করা হয়। এক্ষেত্রে নান্দনিক গুরুত্বের চেয়ে বেশি জরুরি হয়ে পড়ে অর্থনীতি, নীতিনৈতিকতা এবং প্রচারিত মতবাদের নিরিখে সৃষ্টিকর্মের অবস্থান। তাই এই সমাজ ব্যবস্থায় শিল্পীর বিষয় নির্বাচন অনেকাংশেই নিয়ন্ত্রিত হয় মানবজীবনের আর্থিক স্থিতি এবং নীতি অভিমুখের দ্বারা। ক্রোচের দৃষ্টিতে, এই নিকৃষ্ট ব্যবস্থায় স্রষ্টার স্বাধীনতা একেবারেই খর্ব হয়। শিল্পীকে রাষ্ট্রের অনুশাসন ব্যবস্থার ফাঁদে জড়িয়ে পড়তে হয়। বিদ্রোহী হলে রাষ্ট্রের দমনপীড়ন নীতির শিকারও হতে পারেন শিল্পী যেমনটা হয়েছিল স্বৈরতান্ত্রিক শাসক হিটলার বা মুসোলিনির আমলে।

নন্দনতত্ত্বের যে প্রধান নির্মাণটি ক্রোচে করেছেন সেখানে বিস্ময়করভাবে তিনি শিল্পীদের মনোভাব ব্যক্ত করেননি। শিল্প-বিষয়ক আলোচনায় তিনি শিল্পমাধ্যমের গুরুত্ব কিছুটা অবহেলা করেছেন। শিল্পের মাধ্যমে শিল্পী থেকে শিল্পের গুণগ্রাহীদের যোগাযোগের সেতুটি নিয়ে শব্দ খরচ করেননি। মানবমনের উপর শিল্পের প্রত্যক্ষ-অপ্রত্যক্ষ প্রভাব নিয়েও বিশেষ আলোচনা করেননি। হুইটম্যান, ইবসেনের মতো অমর শিল্পীরা শিল্পীর ব্যক্তিসত্তার প্রকাশের উপর যথেষ্ট গুরুত্ব আরোপ করা সত্ত্বেও ক্রোচে এ-ব্যাপারে একপ্রকার নীরব থেকেছেন। তাঁর ধারণায় কবি বা যে-কোনো মাধ্যমের শিল্পী কোনো ভাষায় নিজেকে ব্যক্ত করেন না। কবি বা শিল্পীর বক্তব্য এক গভীর গোপন আত্মকথন বই কিছু নয়।

মিস্ এ. ই. পাওয়েল তাঁর সমালোচনামূলক গ্রন্থ *The Romantic Theoy of Poetry : An Examination in the Light of Croce's Aesthetic* -এ ক্রোচের নান্দনিক অভিব্যক্তি তত্ত্বের মধ্যে একটি জটিলতার উল্লেখ করেছেন। তাঁর মতে, ক্রোচের তত্ত্বে শিল্পীর সহজাত জ্ঞান তাঁর আপন অভিজ্ঞতার আধারে অর্জিত হয়। কিন্তু শিল্পীসমালোচকের ক্ষেত্রে ওই একই সহজাত জ্ঞান অর্জনের লক্ষ্য পূরণ করতে হয় বিপরীতধর্মী উপাদানের মাধ্যমে— যার নাম বাহ্যিক স্পর্শগ্রাহ্য শিল্পবস্তু। এখন বস্তুজাত জ্ঞানের প্রকৃতি আর অভিজ্ঞতালব্ধ জ্ঞানের প্রকৃতি সম্পূর্ণ এক হওয়া কি সম্ভব? একটি ফটোগ্রাফ এবং একটি তৈলচিত্রের মধ্যে তফাত কী? একটি শিল্পকর্ম নয় এবং আর একটি শিল্পসৃষ্টি। এছাড়াও একটি ফটোগ্রাফ মুখাবয়বের একটি বিশেষ মুহূর্তের যথাযথ প্রতিফলন ঘটায়। কিন্তু একটি সফল তৈলচিত্র একটি মুখাবয়বের চরিত্রকে ধরে ফেলে যা আমরা উপর্যুপরি মুহূর্তের সমাহারে দেখি। ফটোতে দেখি এক নির্জীব তাৎক্ষণিক মুখাবয়বের প্রতিফলন ; আর তৈলচিত্রে দেখি একটি সজীব প্রাণবন্ত মুখাবয়বের শৈল্পিক নির্মাণ। ক্রোচের কাছেও শিল্প আদতে একটি চরিত্রায়ণ। কিন্তু তাঁর চরিত্রায়ণের ভাবনা বৃহৎ বাহ্যিক জীবনস্রোত থেকে বিচ্ছিন্ন। একেবারেই আত্মগত, শিল্পীর একান্ত বিষয় ভাবনার ফসল হিসেবে প্রতিষ্ঠিত। কিন্তু জীবনকে অস্বীকার করে শিল্পের সংজ্ঞা নির্ধারণ করা ক্রোচের নন্দনতত্ত্বের অসম্পূর্ণতাকেই প্রকটিত করে।

সবশেষে বলা যায়, ক্রোচের নন্দনতত্ত্বে সুন্দরের ধারণাটি অনেকাংশেই অনালোচিত রয়ে গেছে। সুন্দর শুধুমাত্র একটি আলংকারিক উপস্থিতি নয়, বাস্তব দর্শনের গভীরে এর অবাধ গতি এবং যে-কোনো শিল্পরসাস্বাদনে যে আনন্দ বা তৃপ্তির সঞ্চার হয় তার মধ্যে এই সুন্দরের উপস্থিতি অনিবার্য। ক্রোচে অত্যন্ত ব্যতিক্রমী ব্যক্তিত্ব হিসেবে নিজেকে প্রতিষ্ঠিত করেছেন যখন তিনি শিল্পীকে তার নির্বাচিত বিষয়ের উৎকর্ষের প্রশ্নে একেবারেই উদাসীন করে রেখেছেন। তিনি মনে করেন যে শিল্পীর মনোজগতে যে-কোনো ধরনের আলোড়ন সৃষ্টিকারী ধারণাই প্রকাশের যোগ্য। সেখানে গুণগত উৎকর্ষ বিচারের প্রক্রিয়াটি অপ্রয়োজনীয়। এই একটি প্রসঙ্গে বিখ্যাত সাহিত্য সমালোচক ও সাহিত্যস্রষ্টারা ভিন্নমত পোষণ করেছেন। আর্নল্ড, গ্যোটে কোল্‌রিজ, দান্তে, অ্যারিস্টটল এবং আরও অনেক অবিস্মরণীয় স্রষ্টা নির্বাচিত বিষয়ের গুণগত মানের বিচারে যথেষ্ট সময় ব্যয় করেছেন। তাই শেষ বিচারে ক্রোচের বাহ্যজগৎ ব্যতিরেকে শিল্পসৃষ্টি প্রক্রিয়ার কল্পনা অনেকাংশেই প্রকৃত সত্যের আংশিক প্রকাশ হয়ে দাঁড়িয়েছে। শিল্পসমালোচনার ইতিহাসে তাই ক্রোচের গ্রহণযোগ্যতা সর্বস্তরে স্বীকৃত হয়নি। যদিও অভিব্যক্তিবাদের আলোচনায় ক্রোচের নাম অবধারিতভাবেই উচ্চারিত ও আলোচিত হয়েছে। সাহিত্য সমালোচনার উদ্ভব ও বিবর্তনের প্রেক্ষাপটে ক্রোচের নন্দনতত্ত্বের একটি বিশিষ্ট ভূমিকা রয়েছে সাহিত্যের ছাত্রছাত্রীদের কাছে।

টি. এস. এলিঅটের নৈর্ব্যক্তিকতার কবিতাভাবনা ঐতিহ্য ও অনুক্রম

মৃদুলা কুণ্ডু

কবিতা আবেগের মুক্তি নয় বরং আবেগকে অতিক্রমণ এবং কবিতা ব্যক্তিত্বের প্রকাশ নয় ব্যক্তিত্ব থেকে পলায়ন[১] এই তাৎপর্যবাহী কথা বিংশ শতাব্দীর গোড়ায় যিনি বলেছেন তাঁর কবিতাভাবনা জুড়েই আছে রোমান্টিকতার বিরোধী ক্লাসিক ঘরানার সচেষ্ট অনুবর্তন। আবেগ থেকে বুদ্ধির শাসনে এবং নিশ্চয়তার বিপরীতে অনিশ্চয়তা ও বিচ্ছিন্নতার মধ্যেই ব্যক্তিকতা থেকে মুক্তির যাত্রা শুরু। একাকী মানুষের যন্ত্রণা ও সংগ্রামের নিষ্পেষণ থেকে মুক্তির উপায় তাই নৈর্ব্যক্তিকতা। নিজেকে, নিজের অসহায়তাকে বুদ্ধি দিয়ে আবৃত করার সুসভ্য উপায়। টি. এস. এলিঅটের কবিতাভাবনায় তাই বুদ্ধিবৃত্তি ও নৈর্ব্যক্তিকতার চর্চা।

জন্মের পর থেকে মানুষ সমাজ-পরিবেশের ভিতর থেকে নিজেরই প্রচেষ্টায় গড়ে তোলে ব্যক্তিত্ব (personality)। একজনের আচার-আচরণ ভাব-ভাবনা ব্যক্তিত্বেরই সূচক যা অন্যজনের চেয়ে ভিন্ন। আর ব্যক্তিত্বের ভিন্নতাই ব্যক্তি-স্বাতন্ত্র্যের সূচক। অন্যদিকে নৈর্ব্যক্তিকতার (impersonality) সঙ্গে অনিবার্য যোগ তন্ময়ত্বের। মন্ময়ত্ব থেকে সরে গিয়ে কবির ব্যক্তিগত আবেগ-অনুভূতি ও অভিজ্ঞতা থেকে বিচ্ছিন্ন হওয়ার মধ্যেই আছে রোমান্টিকতার বিরোধ। আমরা অবশ্যই মনে রাখবো নৈর্ব্যক্তিকতা বা তন্ময়তার মাত্রাগত ভিন্নতা দাঁড়িয়ে থাকে ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্যেরই ভিত্তিতে, যা ব্যক্তিত্বেরই পরিণত রূপ।

সময়ের জটিলতায় বিচ্ছিন্ন মানুষ ক্রমশ আত্মমুখীন হয়ে উঠলেও রোমান্টিকদের মতো 'আমি-সর্বস্ব' হয়ে না ওঠার চেষ্টায় এলিঅট ব্যক্তির 'আমি'-কে দু' ভাবে ভাগ করছেন— একদিকে আছে আত্ম-চিন্তন (self thinking) অন্যদিকে আছে আত্ম-বীক্ষণ (self-observing)। দ্বিতীয় স্তরটিতে উপনিষদের দ্রষ্টা পাখিটির মতো আত্ম-মুক্তি সম্ভব। ভালেরি বলছেন— '.............I believe........that all thought would be impossible if at every moment we are entirely present'.[২] এলিঅট কবির ব্যক্তিসত্তা এবং কবিসত্তা দু'টিকেই কাব্যে অনুপস্থিত রাখতে প্রয়াসী। কিটসের নেগেটিভ-কেপাবিলিটি ভাবনায় কবির সর্বব্যাপ্তিতে নৈরাত্ম্য সাধনার কথা পাই। এলিঅট

কবিতায় 'অলটার ইগো' বা 'মাস্ক' ব্যবহারেই থেমে থাকছেন না, আবেগকে কারুকলার (craft) মধ্যে নিমজ্জিত করার কথাও বলছেন।

আবেগকে প্রাইমারি এবং সেকেণ্ডারি দু'টি মাত্রার সঙ্গে যুক্ত করেছেন কোলরিজ। এলিঅট আবেগকে দু'ভাগে ভাগ করছেন— শিথিল (vague) এবং যথাযথ বা সুসংহত (precise)[৩]। বুদ্ধি এবং অভিজ্ঞতা দ্বারা মার্জিত হয়ে সুসংহত আবেগ সৃজনক্ষম হয়ে ওঠে। তাই তাঁর মতে কবিরাও দুই শ্রেণীর— বুদ্ধিবৃত্তি-সম্পন্ন (intellectual) এবং ধীশক্তি-সম্পন্ন (reflective)[৪]। এজরা পাউণ্ড বুদ্ধিমত্তা এবং প্রজ্ঞা (intellectual এবং intelligence) দু'টির ভিন্নতা বোঝাতে আবেগের (emotion) সাহায্য নিয়েছেন। তাঁর মতে আবেগ ছাড়া জ্ঞান হয় না, সেই আবেগ হতে পারে সম্মুখবর্তী (anterior) অথবা সমবর্তী (concurrent)[৫]। জ্ঞানের জন্য আবেগ এবং বুদ্ধি দুই-ই প্রয়োজন। এলিঅট বুদ্ধি এবং ধী দু'টিকে যুক্ত করছেন অভিজ্ঞতার (experience) সঙ্গে। অভিজ্ঞতা, তাঁর মতে.....'the results of reading and reflection, varied interests of all sorts, contacts and acquaintances, as well as passion and adventure.'[৬] অভিজ্ঞতা এবং তা ব্যক্ত করার সচেতন এবং ক্রমাগত প্রচেষ্টা চূড়ান্ত শীর্ষে পৌঁছোলেই কবিতা হয়। কোলরিজের 'ইমাজিনেশন'-এর ব্যাখ্যা প্রসঙ্গে আই. এ. রিচার্ডস্ একটি সুন্দর রূপক ব্যবহার করেছেন : 'Turn the current on at low tension and the elements are welded together : turn it on at higher tension and they are melted up and fused.'[৭] চূড়ান্ত শীর্ষে কারুকলায় ব্যক্তিত্বের নিমজ্জন এভাবেই চেয়েছেন এলিঅট।

এই নিমজ্জনের পথে রয়েছে অনেকগুলি ধাপ। কবির নিরীক্ষা, শ্রম, একাগ্রতা, অনুশীলন, এবং নিজেকে প্রস্তুত রাখা 'well oiled fire engine'[৮]-এর মতো। পরিপক্কতা (maturity) ছাড়া নির্মাণ অসম্ভব। এলিঅট ক্লাসিক বলতে বুঝিয়েছেন এই পরিপক্কতাকে। মনের, আচরণের, ভাষার পরিপক্কতা যথাযথ হলেই হয় ক্লাসিক। "A classic can only occur when a civilization is mature ; when a language and a literature are mature; and it must be the work of a mature mind."[৯] এই পরিপক্কতাই সর্বজনীনতার সহায়ক। এবং পরিপক্কতার পেছনে আছে ধী, আছে ধ্যান, তারই প্রতিরূপ হল কারুকলা।

নৈর্ব্যক্তিকতার পেছনেও আছে পরিপক্কতা। কবির প্রতিদিনের চেষ্টা হবে দুটি বিষয়ে— আত্মত্যাগ (self-sacrifice) এবং ব্যক্তিত্ব-বিলোপন (extinction of personality)।[১০] এর জন্য কবিকে হতে হবে অনুঘটকের মতো। সুসংহত অনুভূতি স্বাধীনভাবে একটি নতুন কারুকলায় যাতে প্রবেশ করতে পারে তার সহায়ক হবেন কবি। এলিঅট কবিতায় দু' রকম নৈর্ব্যক্তিকতার কথা বলছেন—'...........that which is natural to the mere skilful craftsman, and that which is more and more achieved by the maturing artist.'[১১] দ্বিতীয় শ্রেণীর নৈর্ব্যক্তিকতা হল— '........the poet who, out of intense and personal experience, is able to express a general truth; retaining all the particularity of his experience to make of it a general symbol.'[১২] অন্যদিকে ঐতিহ্যের ধারায় ব্যক্তির অস্তিত্ব সম্পর্কিত, তাই ব্যক্তিত্বের মুক্তি ঐতিহ্যের বিস্তারে।

নৈর্ব্যক্তিকতা ও কারুকলার পারস্পরিক সম্পর্কের ভাবনা ফরাসি প্রতীকবাদী কবি, মেটাফিজিক্যাল কবি, দান্তে, জেকোবিয়ান যুগের নাট্যকার গোষ্ঠীর থেকে ধারাবাহিক ভাবে এলিঅটে বর্তেছে। তার সঙ্গে যুক্ত হয়েছে সমসাময়িক ইমেজ-আন্দোলন। নৈর্ব্যক্তিকতার

বিস্তারে এলিঅটের উল্লেখযোগ্য আরো দুটি বিষয় হল, ঐতিহ্য ও ব্যক্তিগত প্রতিভা এবং বস্তুগত অনুষঙ্গ।

এজরা পাউণ্ড ঐতিহ্যকে বলছেন সৌন্দর্য, যা আমাদের শৃঙ্খলে বাঁধে না অথচ আমরা যাকে সংরক্ষণ করি।[১৩] এলিঅট বলছেন কবি ঐতিহ্য-বিচ্ছিন্ন কোনো স্বতন্ত্র সত্তা নন। কবির সৃষ্টিও ঐতিহ্যচ্যুত কোনো স্বাধীন জিনিস নয়— ঐতিহ্যধারায় সংযোজন মাত্র। কবি শুধু তাঁর সমকালকেই জানবেন না, অনুধাবন করবেন সমস্ত সাহিত্যধারা। কবি নিজেকে বিস্তৃত করবেন স্থান কালের বিস্তারে। এজরা পাউণ্ডের কবিতাসংগ্রহের ভূমিকায় এলিঅট লিখছেন : 'Invention is wrong only because it is impossible. ....The poem which is absolutely original is absolutely bad; it is, in the sense, 'subjective', with no relation to the world to which it appears.' [১৪] মৌলিকতা সম্পর্কিত হয় ঐতিহ্যে— যা পূর্ববর্তীদের ধারায় ধীরে ধীরে যৌক্তিক পারম্পর্যে উন্নত হয়, তা অকৃত্রিম তাই তা যথার্থ। ঐতিহ্য পরিপক্কতার মাধ্যমে যথাযথতায় পৌঁছে দেয়। এবং সেইজন্যই তা নৈর্ব্যক্তিকতার সঙ্গে যুক্ত।

আবেগ নিমজ্জন ও ব্যক্তিত্বের মুক্তির জন্য কবিতায় কাজে লাগে বস্তুগত অনুষঙ্গ (objective correlative)। 'Hamlet' প্রবন্ধে এলিঅট বলছেন : 'The only way of expressing emotion in the form of art is by finding an 'objective-correlative', a situation, a chain of events which shall be the formula of that particular emotion.'[১৫] ভিতরের আবেগ-অনুভূতি এবং বাইরের বস্তুগত অনুষঙ্গের একাত্মতাতেই ঘটে সার্থক কবিতার জন্ম। প্রতীকবাদ এবং চিত্রকল্পবাদের ভাবনারই নবতর রূপ বলা যায় এটিকে। বোদলেয়র, মালার্মে, ভালেরি, টি. ই. হিউম এবং পাউণ্ডের প্রসঙ্গ তাই ঘুরে ফিরেই আসে এলিঅটের লেখায়।

আর্থার সাইমনস্-এর *Symbolist Movement in Literature* বইটির প্রভাব এলিঅট স্বীকার করেছেন। বোদলেয়ারের উৎকৃষ্ট কারুকলা ও যথাযথ ভাষা ব্যবহার এলিঅটকে সমৃদ্ধ করে। অন্যদিকে ভালেরির কবিকে গণিতজ্ঞ ও বৈজ্ঞানিকের সমতুল্য বিবেচনায় তিনি উদ্বুদ্ধ। জন ডানের চমক লাগানো উপমা থেকেও তিনি শিক্ষা নিয়েছেন। দান্তের কাব্যে, ওয়েবস্টারের নাটকে এবং বোদলেয়ারের কাব্যে যুগের অবক্ষয় তাঁরা যেভাবে স্বাস্থ্যসম্মত চিত্রকল্পে ও কারুকলায় ফুটিয়ে তুলেছেন বিংশ শতাব্দীর গোড়ায় চিত্রকল্প আন্দোলনে তারই পূর্ণতা এবং এলিঅটে তারই অনুবর্তন।

পাউণ্ড বলছেন, 'An 'Image' is that which presents an intellectual and emotional complex in an instant of time.'[১৬] এই সমন্বয়ের জন্য শব্দের মিতব্যয়িতা জরুরি। সমস্ত জীবন জুড়ে অজস্র লেখার চেয়ে একটি উৎকৃষ্ট চিত্রকল্প রচনা অনেক ভালো কাজ। কবিকে খুব বেশি বর্ণনাত্মক হওয়া চলবে না, কেননা বড় ক্যানভাসে একজন চিত্রকর কবির চেয়ে অনেক ভালোভাবে তা করতে পারেন। কবিতায় অলঙ্করণ না থাকলেও চলে কিন্তু থাকলে সেই অলঙ্করণ হতে হবে উৎকৃষ্ট। কবিতা হবে সবচেয়ে সুসংহত ও যথাযথ (precise)। 'The serious artist is scientific in that he presents the image of his desire, of his hate, of his indifference as precisely that, as precisely the image of his own desire, hate or indifference. The more precise his record the more lasting and unassailable his work of art.'[১৭] কবিতার কারুকলা প্রসঙ্গে তিনি দু'টি

পদ্ধতির কথা বলেন একটি হল গাছের মতো, ডালপালায় যার বিস্তার। অন্যটি হল ফুলদানিতে জল ভরে রাখার মতো সংহত। তরল আবেগকে কঠিন-পাত্র-রূপ আধারে ধরে রাখাই হল কারুকলা। ভালো লেখা মানে যথাযথভাবে নিয়ন্ত্রণ।

টি. ই. হিউম স্বজ্ঞা (intuition) এবং বুদ্ধিমত্তার (intellect) সংযোগসূত্রটি ধরতে চান। বুদ্ধিমত্তা বাইরের বহুস্তরকে বোধগম্য করে আর স্বজ্ঞা অন্তরের বহুস্তরকে অনুভব করে। বুদ্ধি দিয়ে কবিতার অন্বয় এবং তার বিশ্লেষণ ব্যাখ্যা দিয়ে কবিতার অর্থ বোধগম্য হয়। আর স্বজ্ঞায় ছোঁয়া যায় অন্বয়াতীত জগৎ। বুদ্ধি দিয়ে অন্বিত কবিতার সামগ্রিক ঐক্যেই অন্বয়ের অতীত ভাবকে ছুঁতে পারে স্বজ্ঞা। কবিতার কারুকলা সম্পর্কে বলছেন 'In the sense the poetry writes itself.'[১৮] কোনো ভাব বা অভিজ্ঞতা সকলের মতো কবিকেও নাড়া দিয়ে যায়। তারপর কবি সেই ভাবটি পরিস্ফুট করার জন্য নতুন 'ইমেজ' খোঁজেন। সঠিক শব্দ ও পংক্তিসজ্জায় তা নির্মিত হয়। কবি তখন নির্বিচারে ব্যক্তিগত ইচ্ছে এবং পছন্দানুযায়ী শব্দ ব্যবহার বা বাক্যাংশ গঠন করতে পারেন না। ঐ চিত্রকল্পটিই ঠিক করে দেয় কোন শব্দ ঠিক কোনখানে বসাতে হবে। কবির এই নিষ্ক্রিয়তা কোনো দৈব প্রেরণার কাছে আত্মসমর্পণ নয়, বরং কারুকলার মধ্যে ব্যক্তিত্বকে নিমজ্জিত করা। 'ইমেজ' কবিতার উপকরণ মাত্র নয়, বরং স্বজ্ঞা-বাহিত অবশ্যম্ভাবী ভাষার সংহত রূপ।

পাউণ্ড শব্দের তিনরকম বৈশিষ্ট্যের কথা বলছেন। প্রথমত, যে শব্দ অর্থের সঙ্গে সরল সম্পর্কে বদ্ধ, যা সহজে বোধগম্য। দ্বিতীয়ত, যে ভাষায় কল্পনা 'ইমেজ' তৈরি করে, যার অনুবাদ দুরূহ নয়। তৃতীয়ত, যে ভাষায় শব্দের মধ্যে চলে বুদ্ধির নৃত্যচাঞ্চল্য। সহজে স্থিররূপে এর অর্থ ধরা যায় না, সহজে রূপান্তরও করা যায় না। এই তৃতীয় শ্রেণীর ভাষা নিয়ে কবিতার নির্মাণ। 'Great literature is simply language charged with meaning to the utmost possible degree.'[১৯] অন্বয়ের অতীত জগৎকে বোঝাতে পরবর্তীকালে পাউণ্ড 'Vortex'-এর কথা বলেন। যে ঘূর্ণাবর্তে ভাব স্থিরতা পায় না। এলিঅটের কবিতা বহু প্রসঙ্গ, উদ্ধৃতি, মুখচ্ছদ, প্রতীক, চিত্রকল্পের বহু মুখ শেষ পর্যন্ত অন্বয়যুক্ত একটি ভাবকেই ধরে দেয়। পাউণ্ডের বহুমুখীনতা এলিঅটে একমুখীন। পরবর্তীকালে আই. এ. রিচার্ডস্, এবং এম্পসনে আবার বহুমুখীনতার কথা পাই। 'দান্তে' প্রবন্ধে এলিঅট বলছেন : 'We have to consider the type of mind which by nature and practice tended to express itself in allegory ; and for a competent poet, allegory means clear visual images. And clear visual images are given much more intensity by having a meaning— we do not need to know what that meaning is, but in our awareness of the image we must be aware that the meaning is there too.'[২০]

'পোয়েটিক ইমেজারি' প্রবন্ধে এলিঅট বলছেন 'only a part of an author's imagery, comes from his reading. It comes from the whole of his sensitive life, since early childhood.'[২১] যেগুলি জীবনের সঙ্গে অন্বিত সেগুলি অন্য সমস্ত ঘটনা ও অনুভূতির চেয়ে বেশি উল্লেখযোগ্য বলেই তা আবেগের সঙ্গে সংযুক্ত হতে পারে। অবনীন্দ্রনাথ ঠাকুর শিল্পতত্ত্বের আলোচনায় বলছেন, 'শিশুর জীবনে অনেকখানি পথ অজ্ঞাত, সেখানে কল্পনার অবাধ গতি দেখতে পাওয়া যায় এবং প্রত্যেক শিশু এই অজ্ঞাতকে নিজের নিজের চরিত্র ও শক্তি অনুসারে নানা বিভিন্ন মূর্তি দিয়ে চলে। বড়.হলে মানুষের অনেক জিনিসকে জানা হয়ে যায়— স্মৃতি কাজ করতে থাকে তখন তার মনে। ভিন্ন ভিন্ন মানুষ নিজের চরিত্র ও শক্তি

অনুসারে এই স্মৃতি সমস্ত নিয়ে ব্যবহার করতে থাকে এবং এইভাবে কল্পনার সঙ্গে স্মৃতি, স্মৃতির সঙ্গে কল্পনার মেলামেশা সম্পন্ন হয় মানুষের রচনায়।'[২২] কিংবা বলছেন, 'অবিদ্যমানকে বিদ্যমানের মধ্যে ধরে দিচ্ছে মানুষ, অন্তরকে আনছে বাইরে, বাইরেকে নিয়ে চলেছে অন্তরে, এই হল শিল্পরচনার মূল কথা। শিল্প এলো সামনে, পিছনে লুকিয়ে রইলো শিল্পী,— এই হল শিল্পের সঠিক লক্ষণ।'[২৩] এখানেই আছে নৈর্ব্যক্তিকতা। আবার এখানেই আছে ব্যক্তিকতার অভিক্ষেপ। ইমেজ গঠনের পদ্ধতি যদি ব্যক্তিক নাও হয়, ব্যক্তিক মনের গঠন অনুযায়ী উপাদানের ব্যবহারেই সেগুলি গঠিত হয়।

কবিতায় কথনভঙ্গির বৈচিত্র্য ঐতিহ্য ও সমসময়ের বহু সামাজিক ও সাহিত্যিক প্রসঙ্গ, উদ্ধৃতি এবং চরিত্রের অভিক্ষেপ, প্রতীক ও চিত্রকল্পের নির্মিতি এসবে এলিঅটের সুনিষ্ঠ প্রচেষ্টা। তবু বলা যায় আবেগের এবং ব্যক্তিকতার মুক্তি ঘটাতে নৈর্ব্যক্তিকতার প্রয়াস কখনো কখনো ভার বাড়ায়। বুদ্ধিবৃত্তির অনুশীলনে আবেগের শ্বাসকষ্ট পাঠকের স্বাভাবিক পাঠ-প্রচেষ্টাকেও ব্যাহত করে। তবু তাঁর কবিতাভাবনার প্রভাব বিশ শতকের প্রথমার্ধে কবিদের ওপর ব্যাপক ও বিস্তৃত।

২.

বাংলা কাব্যের জগতে রবীন্দ্রপ্রভাব থেকে মুক্তির চেষ্টা এবং কবিতাভাবনায়— ভিন্নতা আনার মানসিকতা কবিদেরকে পাশ্চাত্যের এলিঅটের কবিতা ও প্রবন্ধের কাছে পৌঁছে দিল। বাংলা কবিতা এবং কবিতাভাবনায় গ্রহণে-বর্জনে প্রশংসা-সমালোচনায় এলিঅট প্রবলভাবেই উপস্থিত, বিশেষত বিশ শতকের তিরিশের দশকে। এলিঅটের কবিতাভাবনা সব ক্ষেত্রে গ্রহণযোগ্য মনে না হলেও প্রবন্ধগুলিতে এলিঅটের নিজস্ব মত প্রকাশের সামর্থ্য ও সাহস সেইসময়ের বহু কবি সাধনা করেছিলেন। সেই অসাধারণ শক্তির প্রভাবেই চালিত হয়েছিলেন অনেকে। চল্লিশের দশকে কিছুটা মোহভঙ্গ হলেও বিবাদ-বিতর্কের কেন্দ্রভূমিতে থেকেছেন এলিঅট। 'কৃত্তিবাস' পত্রিকার বিংশ সংকলনে (১৯৬৫) সুনীল গঙ্গোপাধ্যায় লিখেছেন— যখন প্রবল আবেগে এদেশে বিদেশী দ্রব্য বর্জন চলছিল; তখনই বাংলা সাহিত্যে একটি বিলিতি দ্রব্য অত্যন্ত সমাদরে গৃহীত হয়েছিল— তা হল টি. এস. এলিঅটের কবিতা। তার কারণ এলিঅট এসেছিলেন পাশ্চাত্যের সমস্ত কিছুর সমীকরণ হিসেবে।

বুদ্ধদেব বসু এই প্রভাব প্রত্যক্ষভাবে অস্বীকার করেন। তবু প্রেরণা ও আবেগনির্ভরতা থেকে ক্রমশ প্রকরণনিষ্ঠ হয়ে উঠতে দেখি তাঁকে। কারুকলায় নৈর্ব্যক্তিকতার কথা না বললেও কারুকলা বিষয়ে সচেতনতার কথা বলেন। তাই তাঁকে বলতে হয় 'আমার বিশ্বাস জন্মালো যে কবিতা লেখাও একটা কাজ— খাটুনির অর্থে, 'মাথার ঘাম পায়ে ফেলা'-র অর্থে কাজ— আর তার জন্য নানা ধরনের প্রস্তুতিরও প্রয়োজন।'[২৪]

কারুকলায় ব্যক্তিকতা ও আবেগ নিমজ্জনের কঠিন নিগড়ে কবিতাকে বাঁধতে চাননি জীবনানন্দ। তিনি অন্তঃপ্রেরণা স্বীকার করেন, এলিঅটের কঠোর নিয়মনিষ্ঠা নয়। তিনি এমন কথাও বলেন সম্পূর্ণ জ্ঞাতসারে বিশ্বের অতীত-বর্তমানের কাব্যভুবন সম্পর্কে দীক্ষা গ্রহণ করে কবিতা রচনার সচেতন অনুশীলনে তিনি বিশ্বাসী নন।[২৫] তবু এলিঅটের ঐতিহ্য ও ব্যক্তিগত প্রতিভা বিষয়ে ভাবনার সঙ্গে সাজুয্য পেয়ে যাই। এলিঅট বলছেন—'.......the poet must develop or procure the consciousness of the past and that he should continue to develop this consciousness throughout his career.'[২৬] এই বক্তব্যের সঙ্গে অন্তর্গত যোগ পাই জীবনানন্দে— 'যে কালে যে সমাজে ও যে বিসারে কবি রয়েছেন এবং

যে সময়ে যে সমাজে যে বিসারে তিনি ছিলেন না কিন্তু তবুও যে জিনিসগুলো রয়ে গিয়েছিলো, আছে থাকবে— সে সবের অভিজ্ঞতা সম্বন্ধে সৎ কবি তাঁর প্রতিনিয়ত শিক্ষিত মনকে আরো বেশি শিক্ষিত করে নিচ্ছেন, যা স্বভাব প্রতিভা বলে মনে হয়েছিল সেটাকে আরো স্থির ও বিশুদ্ধ করে।'[২৭]

কবিতাভাবনায় জীবনানন্দ আরো একটি গুরুত্বপূর্ণ কথা বলেছেন, 'সুসমাচার-সুলিপি এসব অবান্তর করে 'কবিতা নিজের চরিত্রবলে নিজেকে প্রাসঙ্গিক করে তোলে। পূর্বজ কবিরা একে মনে করতেন মায়াবল। অতটা সাহস আমার নেই। আমি একে কবিতার চরিত্রবল বলে অভিহিত করছি।'[২৮] শেলির মতো দিব্য অনুভূতি ও প্রেরণার মধ্যে থেকে সমস্ত কার্য-কারণ থামিয়ে হৃদয় মোমের মতো জ্বলে উঠলে যেভাবে কবিতার জন্ম হয় বলে তিনি বলেছেন, এখানে সেই স্তর অতিক্রান্ত। টি. ই. হিউম যাকে বলেছিলেন কবিতা নিজেই নিজেকে রচনা করে তোলে, জীবনানন্দ কবিতা সৃজনের পূর্ব-নির্মিতি স্তরে তাকেই বলছেন কবিতার চরিত্রবল।

এলিঅটের কবিতাভাবনার প্রভাব যে দু'জন কবি অকপটে স্বীকার করছেন তাঁরা হলেন সুধীন্দ্রনাথ দত্ত এবং বিষ্ণু দে। এবং অবশ্যই সমর সেন। যাঁকে কেন্দ্র করে এলিঅট-বিতর্ক উজ্জীবিত হয়। প্রথম দু'জন বিবাদ-বিতর্কে নিস্পৃহ থেকে প্রভাব এবং স্বতন্ত্র পথ অন্বেষণ করেছেন কবিতাভাবনায়। এলিঅটের প্রবন্ধ অনুবাদও করেছেন। ঐতিহ্য এবং কারুকলায় নৈর্ব্যক্তিকতায় দু'জনেরই অগাধ আস্থা।

সুধীন্দ্রনাথ নৈর্ব্যক্তিকতাকে বলেন 'নৈরাত্ম'। ঐতিহ্য এবং নৈরাত্ম পারস্পরিক, তার সঙ্গে যুক্ত হয় বৈচিত্র্য। কবিতায় ঐতিহ্যের পুনরুজ্জীবন ঘটলে কবিকে জানার প্রয়োজন হয় না। ঐতিহ্যের উল্লেখ থেকেই কবিতাটির মর্মোদ্ধার সম্ভব। ফলে বাহ্যবস্তুর অভিক্ষেপে কবি-ব্যক্তিত্বটি ঢাকা পড়ে যায়। কবিতায় কবির আবেগ অবশ্যম্ভাবী কিন্তু সেই আবেগের উচ্ছ্বসিত প্রকাশ কবিতায় সঙ্গত নয়। আবেগের সংহত ও বুদ্ধিগ্রাহ্য রূপদানই কবির কাজ। তিনি প্রেরণায় বিশ্বাসী নন, বিশ্বাসী চিন্তা এবং বুদ্ধিতে। বৈদগ্ধ্য অভিজ্ঞতা-জাত। দার্শনিক বোধ যে আত্মসমাহিতি, আত্মবিশ্লেষণ, ও প্রজ্ঞা দান করে তা ক্রমশ ব্যক্তিকতা থেকে বৃহৎ বোধে পরিণত হয় তাই সেখানে ব্যক্তিক উচ্ছ্বাসের অবকাশ কম। তিনি রবীন্দ্রনাথের ঋণ স্বীকার করেছেন *তন্বী* ও *অর্কেস্ট্রা* কাব্যগ্রন্থের ভূমিকায়। তবে রবীন্দ্রনাথের রোমাণ্টিক ঘরানা থেকে ক্রমশ সরে গেছেন কারুকলার শুদ্ধিতে। *সংবর্ত* কাব্যের ভূমিকায় জানাচ্ছেন, '.........আমি যখন পদ্য লিখতে শিখছিলুম, সে-সময়ে যাঁরা কবিযশঃপ্রার্থীদের অনুকার্য ছিলেন, তাঁরা ভাবতেন সার্থক কাব্যের প্রধান গুণ স্বাচ্ছন্দ্য; এবং সেই জন্যে উচ্ছ্বাসসংবরণ যে সাহিত্য সাধনার আদ্যকৃত্য, এ— কথা বুঝতে বুঝতে আমার অর্ধেক যৌবন কেটে গিয়েছিল।'[২৯]

'কাব্যের মুক্তি' প্রবন্ধে সুধীন্দ্রনাথ এলিঅটের 'অনুঘটক'-কে পরিণত করেছেন 'ঘটক'-এ পাত্র-পাত্রীর মিলনেই তার কাজ শেষ। 'নিরবলম্ব নিরপেক্ষতাই তার একমাত্র সম্বল।'[৩০] তাঁর কবিতাভাবনায় 'আধার আধেয়ের অগ্রগণ্য'। আধার রূপায়ণেই তিনি যত্নশীল। তাঁর কবিতা যুক্তিপারম্পর্যে বাঁধা স্তবক বিন্যাসে ধারাবাহিক। 'তথাপি', 'কিন্তু', 'অতএব', 'অবশ্য', 'নতুবা', 'ফলতঃ', এসব যোজক পদ ব্যবহার করে যুক্তি-পারম্পর্য বজায় রেখেছেন। যুক্তি, তর্ক, বিশ্লেষণ—গদ্যধর্মী সবরকম প্রচেষ্টাই তাঁর কবিতায় পাই। তিনি ধ্রুপদি-নিষ্ঠ বলেই শব্দ, শব্দ-বন্ধ, চিত্রকল্পে বক্তব্যকে বাঁধতে চান। তিনি বলেন—'কাব্যের প্রধান অঙ্গ lyricism নয়, intellectualism, এবং এতেই বিভিন্ন মনের আত্মীয়তার প্রকাশ।.......গঠনের পরিচয় কবিতার

পঙ্‌ক্তি বিষয়ের মধ্যে নাও পরিলক্ষিত হতে পারে; কিন্তু একটা কবিতাকে পুরোপুরি মেনে নিলে তার মধ্যে একটা ঠাস বাঁধুনি থাকা উচিত। গঠন সাম্যবাদী : যে কবিতাগুলি গঠনের নিয়ম মেনে চলে, তাদের সকলের ভিতরেই একটা বিশিষ্ট ঐক্য আছে।'[৩১] সুধীন্দ্রনাথের *সংবর্ত* এবং *দশমী* কাব্য পর্যন্ত পৌঁছে দেখি অনেকগুলি দর্শন-ভাবনা (নাস্তিবাদ, ক্ষণবাদ, সোহংবাদ, অস্তিত্ববাদ) এবং প্রতীক ও চিত্রকল্প-ভাবনার নৈরাত্ম সিদ্ধির সাধনাকেই তাঁর কাব্যে সমন্বিত করতে চেয়েছেন।

জ্ঞানপীঠ পুরস্কার নেওয়ার সময় বিষ্ণু দে তাঁর বক্তব্যে তাঁর সৃজন-বিশ্বে এলিঅটের প্রভাবের কথা সর্বসমক্ষে উল্লেখ করেন। তাঁর কবিজীবনের শুরুতেই এলিঅট সম্পর্কে তিনটি প্রবন্ধ লেখেন—'টমাস স্ট্যার্ণস্', এলিয়ট, 'এলিঅটের মহাপ্রস্থান' যেটি *সাহিত্যের ভবিষৎ* গ্রন্থে 'এলিঅট' নামে প্রকাশিত হয় এবং 'এলিঅট প্রসঙ্গে'। এলিঅটের মাধ্যমেই ইউরোপীয় সাহিত্যের মুক্তির চেষ্টা বাংলা সাহিত্যে প্রতিভাত হয় বলে তাঁর বিশ্বাস। এবং এলিঅট তাঁর মতে আত্মসচেতনতারই মহাকবি।

এলিঅটের ঐতিহ্যমুখীনতা, আত্মসচেতনতা, আবেগমুক্তি, নৈর্ব্যক্তিকতা এবং কারুকলার সাধনা বিষ্ণু দে গ্রহণ করতে চান। কিন্তু এলিঅটের ধর্মমুখীনতা এবং বিজ্ঞানে নিরুৎসাহ ও মানবজাতির সর্বজনীনতা ও সাম্য বিষয়ে নীরবতা তাঁর অপছন্দ। 'রবীন্দ্রনাথ, ইয়েটস্, পাউণ্ড' প্রবন্ধেও কারুকলার আলোচনা পাই। রবীন্দ্রনাথ প্রসঙ্গে আলোচনা ঐতিহ্যের সূত্রেই ধরতে চেয়েছেন। 'ভারতবর্ষের স্পষ্ট অস্পষ্ট ঐতিহ্যকে নিজের বিশিষ্ট সত্তায় স্বরূপ সন্ধানের সঙ্গে সঙ্গে গ্রহণ-বর্জন রূপান্তরের অক্লান্ত সম্বন্ধ সাধনায় তিনি কিভাবে রচনা করে গেছেন আমাদের উত্তরাধিকারের বিরাট ক্ষেত্র এবং তার অনিবার্য সীমাও— সে চর্চায় আমাদেরও জাগ্রত মনন শ্রম সাপেক্ষ ও অর্জিতব্য।'[৩২] কিংবা বলছেন— 'ঐতিহ্যের ভূমি ছাড়া ঐতিহ্যকে তথা রাবীন্দ্রিক সীমাকে অর্থাৎ নিজেকে রূপান্তরিত করা যায় না এবং রূপান্তরিত করতে না পারলে রচনার রূপায়ণে স্বকীয় শক্তি বিকাশের উপায় নেই।'[৩৩] মধুসূদন দত্তের কাব্য এবং যামিনী রায়ের শিল্পের আলোচনাও 'ঐতিহ্য ও ব্যক্তিগত প্রতিভা'র মূল ভাবনায় পরিচালিত। তাঁর স্বীকারোক্তি 'পাউণ্ড বা এলিঅট বা মার্কিন ফরাসি কবি স্যাঁ জনর্পেস। এঁদের আমি উপকৃত ভক্ত। তাঁদের কবিতায় আমি নন্দিত, তাঁদের প্রবন্ধাবলীতে শিক্ষিত। এবং তাঁদের বিশেষ কবিধর্মের গুণে সাধ্যমতো অল্পবিস্তর ঋণগ্রহণ বা প্রভাবের সন্ধানে আমিও ঘুরেছি।'[৩৪] এলিঅট এবং পাউণ্ডের ভাবাবেগের চেয়ে সচেতন প্রয়াস, এবং কারুকলার পরিশ্রমে বিষ্ণু দে আকৃষ্ট হন।

এলিঅটের ব্যক্তিকযন্ত্রণা ইতিহাস ও সমগ্র মানুষের চেতনা একাত্ম হয় সময়ের পটে সমগ্র মানবভাবনার অন্তর্নিহিত যোগে। কিন্তু ধর্মধ্বজী ভাবনায় তা প্রতিহত হয়। তাই বিষ্ণু দে মার্কসবাদী সাহিত্যদর্শনে অগ্রসর হন। তার কারণস্বরূপ বিষ্ণু দে বলছেন— 'এলিঅটের সীমাবদ্ধ সার্থকতা ও ব্যর্থতার করুণ নিদর্শনে বুঝলুম ঐ প্রাচীরের ঐতিহাসিক প্রয়োজনীয়তা, তার সীমা, রূপায়ণের দ্বন্দ্ব, অর্থাৎ শিখলুম ঐ মুক্তিকে ব্যবহার করতে, ধারাবহ করতে।'[৩৫] অথবা বলছেন, 'অজ্ঞাতসারেই এলিঅটের সমালোচনায় মার্কস অঙ্গীকৃত, তাঁর কাব্যের যুক্তিতে সাম্যবাদের আরম্ভ, যদিও হয়তো সে সত্য তিনি জানেন না বা মানেন না।'[৩৬] তিনি কবিতার বিষয় এবং কারুকলার সাযুজ্য সন্ধানে সচেষ্ট, তিনি কবিতায় মানুষের কথা বলার পাশাপাশি কারুকলার ইতিহাসও পরিভ্রমণ করেন। তিনি বলেন কবিতার প্রতিটি অঙ্গ বিষয়ে সচেতন হয়ে তারপর তাকে মানুষের গানে পরিণত করতে, এখানেও তিনি খুঁজে

পান এলিঅটকে। কারণ নৈর্ব্যক্তিকতা যেখানে ব্যক্তিকতা থেকে দূরবর্তী সেখানেই বৃহতের সঙ্গে যোগের সূচনা। তাই সাহিত্য অন্বিত হয় সমাজের সঙ্গে—'নিছক শিল্পগত বিবেচনাতেও এই সমাজভঙ্গের দিনে ব্যক্তিবৈশিষ্ট্যে সুস্থ পরিণতি ও ভারসাম্য আনা কঠিন। কারণ সমাজের তাল কাটলে ব্যক্তিগত স্বাধীনতার বোধও কেটে যায়। আর ঐ স্বাধীনতার বোধ ছাড়া মনের বিকাশ সম্ভব নয়।'[৩৭] এলিঅটের কবিতাভাবনার নিহিত বক্তব্যটিকে মার্কস-এঙ্গেলসের ভাবনার সঙ্গে অন্বিত করেন—'তিনিও (এলিঅট) প্রত্যক্ষে এক সৎ কবিস্বরূপের সন্ধানে, পরোক্ষে মার্কস-এঙ্গেলসের জগচ্চিত্রের অনুধাবনে বিশেষ সহায় হয়েছিলেন, তাঁর সময়ের অসম্পূর্ণ যন্ত্রণাদীর্ণ পশ্চিমা জগতে।'[৩৮] এভাবেই বিষ্ণু দে নৈর্ব্যক্তিকতাকে কারুকলায় মেলাতে চেষ্টা করেন সমাজজীবনের সঙ্গে।

অমিয় চক্রবর্তী এলিঅটের কবিতার ভাববস্তু পছন্দ করেননি, কিন্তু টেকনিক পছন্দ করেছেন। 'এলিয়টের কবিতা কালোত্তীর্ণ হওয়ার যোগ্য ; তাঁর কবিতার 'আভাময় বিস্ময়টুকু উপভোগ্য', 'সচেতন শিল্পের এইরকম বিশিষ্ট সুযৌক্তিক অথচ কল্পরঞ্জিত বাক্য, দৃঢ়বদ্ধ গদ্যকাব্যধর্মী প্রাঞ্জল এই ছন্দের অন্তর্লীন তরঙ্গ মনে একটি অপূর্ব নিবিষ্টতা সঞ্চার করে'।[৩৯] এই বক্তব্যে অমিয় চক্রবর্তী সচেতন শিল্পের সপক্ষেই থেকেছেন। তবে রবীন্দ্রভাবিত কবি এলিঅটের কারুকলায় অতিকঠোরতার পক্ষপাতী নন। তবু তাঁর কাব্যগ্রন্থের *পুষ্পিত ইমেজ* নামের মধ্যেই নিশ্চয়ই পেয়ে যাই কোনো অন্তর্লীন ইঙ্গিত।

সমর সেন নিখিল ভারত প্রগতি লেখক সঙ্ঘের দ্বিতীয় সম্মেলনে যে প্রবন্ধটি পাঠ করেন, পরের বছরে সেটি প্রকাশিত হয়। এলিঅটকে প্রগতিশীল এবং আধুনিক ইংরেজি কবিতার অগ্রদূত বলা অনেকে মেনে নিতে পারেননি। এই সময়ে সাম্যবাদের বিরোধী মনে করে এলিঅটের প্রসঙ্গে বিতর্ক শুরু হয়। এই বিতর্কে একপক্ষে থাকেন সমর সেন, বিষ্ণু দে অন্যপক্ষে সরোজ দত্ত, প্রদ্যোৎ গুহ প্রমুখ। সমর সেনের কবিতা ও কবিতাভাবনায় এলিঅটের গ্রহণযোগ্যতা সুধীন্দ্রনাথ দত্ত এবং বিষ্ণু দে-র পথ ধ'রে। সমর সেনের কবিতায় এলিঅটীয় নাগরিক জীবন যন্ত্রণা, চিত্রকল্প ও প্রতীক ব্যবহারে আবেগকে দূরবর্তী রাখার চেষ্টা লক্ষণীয়। *বাবু-বৃত্তান্ত* বইতে তৎকালীন বাংলা কাব্যজগৎ এবং তাঁর প্রবণতার কথা বলেছেন— 'বাংলার অতিবুদ্ধিজীবীদের মধ্যে তখন ইয়েটস, এলিয়ট, পাউণ্ডের প্রচণ্ড প্রভাব, বিশেষ করে এলিয়টের কবিতা ও গদ্যরচনাবলীর।....আমার বেশি অনুরাগ ছিল এলিয়টের প্রতি। "Poetry is not a turning loose of emotion" কথাটি এখনো মনে পড়ে বাংলা কবিতা পড়লে।'[৪০] সুধীন্দ্রনাথ দত্তের কবিতা প্রথম দিকে তাঁর মনে হত 'কঠিন শব্দের কালোয়াতি' কিন্তু পরে তিনি বলছেন— 'সুধীনবাবুর কাব্যপ্রতিভা সম্বন্ধে সচেতন হই— তাঁর কাব্যে যুক্তি ও আবেগের সমন্বয় ও শৃঙ্খলাবদ্ধ প্রকাশ আমাদের সাহিত্যে দুর্লভ।'[৪১]

কলাকৈবল্য কিংবা আবেগ প্রশমনকে পাশ কাটিয়ে চল্লিশ-পঞ্চাশ-ষাট দশকে কবিতাভাবনার বাঁকবদল ঘটে। কবিতা শুধু কথার কারিকুরি নয়, অথবা কবিতা লেখা কবিতা পাঠে শুধু বুদ্ধির খেলা নয়, যোগ থাকে আনন্দের (pleasure)। তাই আবেগ থেকে পালানো বা আবেগবান মানুষদের থেকে দূরে না গিয়ে কবিদেরকে কখনো বিদেশের নতুন মত অনুসরণ অথবা স্বদেশের সাবেক কিংবা নতুন পথ অন্বেষণে এগিয়ে যেতে দেখি। বিষয় এবং কারুকলার সম্পর্ক বিষয়ে অবশ্যম্ভাবী মতভিন্নতাও দেখা যায়। সমাজতান্ত্রিক দায়বদ্ধতা-আত্মজৈবনিকতা—শুদ্ধতা— ক্ষুধার্ত মতবাদ— কংক্রিট ও না-কবিতার মতবাদের ঐতিহ্য পরম্পরায় বাংলা কবিতায় উত্তর-আধুনিকতার ছোঁয়া লাগে। লোকায়ত ঐতিহ্য ও শিকড়সন্ধানে এলিঅটকে

অস্বীকারেরও উপায় থাকে না। কারুকলার শ্বাসরোধী চাপ নয়, ঐতিহ্যের গতি ও মুক্তিতে কবিতার সুগঠন গুরুত্ব পায়। অমিতাভ গুপ্ত বলেন, 'এই মুহূর্তের ভাঙাগড়ায় ব্রেখট্ বা এলিয়ট যতটা ঘনিষ্ঠ হয়ে রয়েছেন তরুণ কবিদের সঙ্গে, ততটা নিশ্চয়ই নেই সাজানো অলঙ্কারের হিসেবী কবিরা—বোদলেয়ার, রিল্‌কে, পাউণ্ড বা ইয়েট্‌স্।'[৪২] তবে এলিঅটের প্রভাব ততটা সুস্পষ্ট নয় উত্তর-আধুনিক বাঙালি কবির কাছে। কারণ, কালগত ব্যবধান ও মধ্যবর্তী সময়ের বিবর্তন ধারা। অমিতাভ গুপ্ত মধ্যবর্তী সময়ের বিবর্তন ধারায় এলিঅটকে অস্বীকার করেন না, বলেন, 'বাংলা কবিতায় আপাতত এলিয়টের প্রত্যক্ষ সঞ্চার নেই কোনো, কিন্তু পরোক্ষে রয়েছে অনেক। রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর থেকে ভাস্কর চক্রবর্তী পর্যন্ত কবিই নানাভাবে প্রতিফলিত করেছেন এলিয়টের শৈলীকে, এবং সেই প্রতিফলনের আভা কবিতায় তুলে নিতে হলে এলিয়টকে এড়িয়ে যাওয়ার উপায় নেই কোনো উত্তর-আধুনিক কবির।'[৪৩] ঐতিহ্যকে স্বীকার করলে এলিঅটকে এড়িয়ে যাওয়ার তাই কোনো অবকাশ আর থাকে না।

তথ্যসূত্র :

১। Eliot T. S.; *Selected Essays* ; "Tradition and the Individual Talent"; Faber and Faber Limited; July MCML III; Page 21.

২। Folliot Danise (Translated); Poul Valery–*The Art of Poetry*; Pantheon Books : Bolligen Series XLV-7; Page-113.

৩। তথ্যসূত্র ১, *Shakespeare and the Stoicism of Seneca* ; Page-135.

৪। ঐ "The Metaphysical Poets"; Page-287.

৫। Pound Ezra ; '*Literary Essays of Ezra Pound*'; "T. S. Eliot"; New Directions; Newyork; mcm liv; Page 420-421.

৬। Pound Ezra : *Selected Poems* : (An Introduction by T. S. Eliot); Faber and Gwyer Ltd; London; MCM X X XVIII; Page-X X.

৭। Richards, I. A ; *Coleridge on Imagintion* ; Routledge and Kegan Paul Ltd; London; 1962; Page. 33.

৮। তথ্যসূত্র ৬; Page XVIII.

৯। Eliot. T. S.; *On Poetry and Poets* ; "What is Classic" : Faber and Faber Ltd; London; 1971; Page-55.

১০। তথ্যসূত্র ১; Page-17.

১১। তথ্যসূত্র ৯; "Yeats"; Page-255.

১২। ঐ.

১৩। তথ্যসূত্র ৫; "The Tradition"; Page-91.

১৪। তথ্যসূত্র ৬; Page-X.

১৫। তথ্যসূত্র ১; Page-145.

১৬। তথ্যসূত্র ৫; "A Retrospect"; Page-4.

১৭। ঐ; "The Serious Artist"; Page-46.

১৮। Hulme. T. E.; *Further Speculations*; University of Nebraska Press; London; 1962; Page-95.

১৯। তথ্যসূত্র-৫; "How to Read"; Page-23.
২০। তথ্যসূত্র-১; Page-242-243.
২১। *Selected Prose*; Penguine Books; 1965; Page-89.
২২। *বাগেশ্বরী শিল্প প্রবন্ধাবলী*; রূপা; কলকাতা; ১৯৮৮; পৃ.২৭২.
২৩। ঐ, পৃ. ১০৪।
২৪। বসু বুদ্ধদেব; *কবিতার শত্রু ও মিত্র*; এম. সি. সরকার অ্যাণ্ড সন্স; কলকাতা; ফেব্রুয়ারি ১৯৮৪; পৃ. ৫১।
২৫। দাশ জীবনানন্দ ; *কবিতার কথা*; ভারবি; কলকাতা; জুন ১৯৮১; পৃ. ৭-৮।
২৬। তথ্যসূত্র-১; Page-17.
২৭। তথ্যসূত্র ২৫; "কবিতার আলোচনা"; পৃ. ১০৬।
২৮। *কাব্যসংগ্রহ* ; সম্পাদনা : দেবীপ্রসাদ বন্দ্যোপাধ্যায়); "কেন লিখি"; ভারবি; কলকাতা; সেপ্টেম্বর ১৯৯৬; পৃ. ৭২১।
২৯। *কাব্যসংগ্রহ*; দে'জ পাবলিশিং; কলকাতা; ডিসেম্বর ১৯৮৪; পৃ. ১৯৪।
৩০। *প্রবন্ধ সংগ্রহ*; "কাব্যের মুক্তি"; দে'জ পাবলিশিং; কলকাতা; জানুয়ারি ১৯৯৫; পৃ. ২০।
৩১। দেশ; সাহিত্য সংখ্যা; ১৩৭৯, পৃ. ১৫৫।
৩২। দে বিষ্ণু; *সেকাল থেকে একাল* ; "রবীন্দ্রজিজ্ঞাসার গরজে"; বিশ্ববাণী; কলকাতা; ১৯৮০,-পৃ. ৮৩।
৩৩। ঐ; পৃ. ৮১।
৩৪। *প্রবন্ধ সংগ্রহ* ২; 'রবীন্দ্রনাথ ও শিল্পসাহিত্যে আধুনিকতার সমস্যা'; দে'জ পাবলিশিং; কলকাতা; ১৯৯৮; পৃ.১৫।
৩৫। ঐ; 'জনসাধারণের রুচি' ; "এলিঅট প্রসঙ্গে"; পৃ.১৪২।
৩৬। ঐ; পৃ. ১৩৯।
৩৭। 'রুচি ও প্রগতি' ; "বাংলা সাহিত্যে প্রগতি" ; *প্রবন্ধ সংগ্রহ* (প্রথম খণ্ড); দে'জ; কলকাতা; এপ্রিল ১৯৯৭; পৃ ১৪।
৩৮। *সেকাল থেকে একাল*; "সাহিত্যের সেকাল থেকে মার্কসীয় কাল"; নভেম্বর ১৯৮০; বিশ্ববাণী; কলকাতা; পৃ. ১২।
৩৯। সাম্প্রতিক; "এলিয়টের নতুন কবিতা"; নাভানা; কলকাতা; মে ১৯৬৩; পৃ. ৭৪।
৪০। *বাবু বৃত্তান্ত*; দে'জ, কলকাতা; এপ্রিল ১৯৯১; পৃ. ২৪।
৪১। ঐ; পৃ. ২২।
৪২। গুপ্ত অমিতাভ; *উত্তর আধুনিক চেতনার ভূমিকা*; ত্রিরত্ন প্রকাশন; কলকাতা; সেপ্টেম্বর ১৯৯২; পৃ. ১৯৫-১৯৬।
৪৩। ঐ; পৃ. ১৯৬।

সাহিত্যে শিল্পসর্বস্বতার ভাবনা

কুন্তল চট্টোপাধ্যায়

শিল্প-সাহিত্যের মূল্য তথা উপযোগিতা কী এবং কিভাবে সেই মূল্য/উপযোগিতার বিচার ও নিষ্পত্তি করা যাবে তা নিয়ে বিতর্ক আজকের নয়। একটি গল্প/উপন্যাস / গান/ ছবি/ভাস্কর্য কীভাবে ও কতখানি আমাদের কাজে লাগে অথবা সামাজিক-রাজনৈতিক-অর্থনৈতিক বাস্তবতার সঙ্গে তার কী সম্পর্ক অথবা একটি শিল্প/সাহিত্যকর্ম কীভাবে ও কতদূর পর্যন্ত আপামর মানুষের সাধারণ যাপিত জীবনকে তুলে ধরে— এ-সব নানা প্রশ্ন নিয়ে বহু বিতর্ক হয়েছে ও হচ্ছে। একটি বই হল একটি বই, একটি গান শোনা মানে একটি গান শোনা এবং তার বাইরে ওই বই বা গানের আর কোনো গুরুত্ব বা তাৎপর্য থাকে না, এরকম যেমন কেউ কেউ মনে করে থাকেন তেমনই আবার মানবজীবন ও সমাজ, নীতি-নৈতিকতা-চিন্তন-রূপান্তরে শিল্প-সাহিত্যের সক্রিয় যোগদান তথা ভূমিকার কথাও নানাভাবে উচ্চারিত হয়। নিছক আনন্দবিধান ও সৌন্দর্যের উপাসনা, নাকি মানুষ ও তার জীবনের প্রতি দায়বদ্ধতা, এই দুই পরস্পর প্রতিমুখী দৃষ্টিকোণ ও এ' দুয়ের মধ্যবর্তী নানা অবস্থান থেকে শিল্প-সাহিত্যের উপভোগ ও মূল্যায়ন করা হয়ে থাকে।

উনিশ শতকের অন্তিমলগ্নে ইংল্যান্ডে শিল্প-সাহিত্য রচনা তথা সমালোচনার জগতে 'Aesthetic Movement' নামে এক আন্দোলনের সূত্রপাত হয় যার পুরোধা ছিলেন Walter Pater, Oscar Wilde, Arthur Symons, A. C. Swinburne, Ernest Dowson, Lionel Johnson, Aubrey Beardsley প্রমুখ কবি-লেখক-শিল্পীবৃন্দ। সৌন্দর্যসৃষ্টি ও আনন্দবিধান ছিল এঁদের মতে শিল্প-সাহিত্যের উদ্দেশ্য; কোনো সামাজিক বা নৈতিক আদর্শ, নিয়মবিধির শাসন-শৃঙ্খলা মানতে এঁরা সম্মত ছিলেন না। শিল্পসর্বস্বতার এই যুগ ছিল শতাব্দীর অবসান কাল— 'fin de siecle'.

অবশ্য এই রূপ-রস সর্বস্বতার শিল্পভাবনার উদ্ভবকে বলা যায় একটি ইউরোপীয় প্রবণতা যার সদর দপ্তর ছিল ফ্রান্স। ফরাসি কবি-লেখক থিওফিল গতিয়ে (Theophile Gautier, 1811-1872) তাঁর *Mademoiselle de Maupin* (1835) উপন্যাসের ভূমিকায় এক শুদ্ধ নন্দনবাদী প্রস্থান চিহ্নিত করেছিলেন

যে শিল্পের কোনো উপযোগিতা (utility) নেই। সেই থেকে অপরাপর ফরাসি কবি-লেখকেরা— যথা বদ্‌লেয়ার, ফ্লবেয়ার ও মালার্মে— শিল্পের জন্য শিল্প— 'l' art pour l' art'— এই শ্লোগানকেই ক্রমে জোরদার করে তোলেন। কার্যত শিল্পী-সাহিত্যিক শিল্পের খাতিরে ব্যক্তিগত জীবনকে পুরোপুরি সমর্পণ করবেন এরকম এক দৃষ্টিভঙ্গি ক্রমেই বিশেষ বর্ণময় হয়ে উঠতে থাকে। শিল্পীকে দেখা হতে থাকে এমন এক সর্বত্যাগী, পার্থিব জীবন সম্পর্কে সম্পূর্ণ উদাসীন, সন্ন্যাসীরূপে যাঁর একমাত্র কর্তব্য সৌন্দর্যের ধর্ম— ফ্লবেয়ারের ভাষায়' the religion of beauty'— পালন করা।

উনিশ শতকের মধ্যভাগে ফরাসি কবিতা ও উপন্যাসে কলাকৈবল্যবাদের এই ঘোষণারও এক ইতিহাস খুঁজে পাওয়া যাবে অষ্টাদশ শতকের শেষভাগে জার্মান দার্শনিক প্রবর ইমানুয়েল কান্ট-এর এই তত্ত্বে যে নান্দনিক ভাবনা হল 'disinterested'— একই সঙ্গে বাস্তব জগৎ ও সৌন্দর্যের উপযোগিতা বিষয়ে উদাসীন। কান্ট ছাড়াও উল্লেখ করা যায় ফরাসি কলাকৈবল্যবাদীদের সমসাময়িক আমেরিকান কবি-লেখক এডগার অ্যালান পো-র (Edgar Allan Poe, 1809–1849), যিনি শ্রেষ্ঠ শিল্পকর্ম বলতে বুঝিয়েছিলেন এমন এক কবিতা— poem per se'–'a poem writlten solely for the poem's sake'.

শিল্প-সাহিত্যে এই সৌন্দর্যবাদী-নন্দনবাদী আন্দোলনের আর একটি পরিচয়ের মাত্রা উল্লেখের দাবি রাখে। বদ্‌লেয়ার-এর বহুখ্যাত *Les Fleurs du Mal* কাব্যগ্রন্থের ১৮৬৮ সালের সংস্করণে গতিয়ে 'নোটিস' নামে যে প্রাক্‌কথন যুক্ত করেছিলেন তারই সূত্র ধরে কলাকৈবল্যের এই আন্দোলন পরিচিত হল 'Literary Decadence'-এর অভিধায়। 'Decadence' বলতে 'অবক্ষয়'; দেশকাল-সমাজ-মূল্যবোধ ইত্যাদি ভারী বিষয় বর্জন করে অবক্ষয়িত সৌন্দর্যের সচেতন আরাধনা। প্রাচীন রোম ও গ্রিসে শিল্পসাহিত্যের যে গরিমামণ্ডিত বিকাশ, বাইজান-টিয়ান যুগপর্বে তার এক অবক্ষয়িত সৌন্দর্য লক্ষ করা গিয়েছিল। উনিশ শতকের দ্বিতীয়ার্ধে অনুরূপ অবক্ষয়ের নমনীয় সৌন্দর্যে দেখা হয়েছিল ইউরোপীয় সভ্যতা-সংস্কৃতির অস্তাচলগামী গরিমাকে। এই 'Decadence'-এর প্রবক্তারা শিল্পকে দেখতে চাইলেন 'Nature' বা 'প্রকৃতি'র পূর্ণ প্রতিস্পর্ধায়— সে 'প্রকৃতি' রোম্যান্টিকদের প্রকৃতি বিশ্বে অথবা সামাজিক আচরণের নিরিখে নির্ধারিত মানব প্রকৃতি, যেমনই হোক্ না কেন। নীতিনিয়ম, শোভন ও সুভদ্র আচার-আচরণ, অর্থাৎ যা-কিছু স্বীকৃত ও সর্বতোমান্য, তাকে সচেতনভাবে বর্জন এবং চলনে বলনে, পোশাকে, চিন্তায়, ব্যবহারে উচ্চণ্ড ও উদ্ভট কৃত্রিমতা দিয়ে সকল প্রকার মান্যতাকে পর্যুদস্ত করা—'মাতাল তরণী'-র কবি আর্তুর র‍্যাঁবো যাকে বলেছিলেন, 'the systematic derangement of all the senses'. যথেচ্ছ মাদকাসক্তি, উচ্ছৃঙ্খল ও আগ্রাসী আচরণ, ভাষা-ভঙ্গির উদ্দামতা ও অশিষ্টতা, যৌন উৎকেন্দ্রিকতা— এ সব কিছুর মাধ্যমে মানুষের স্বাভাবিক জীবনের স্থিতাবস্থাকে দৃশ্যত বিপর্যস্ত করে দেওয়া। অবক্ষয়বাদী ধারণার এই যুগক্রান্তি তার চূড়ান্ত সীমা লাভ করেছিল J. K. Huysmans-এর উপন্যাস *A Rebours* (Against the Grain)-এ ১৮৮৪-তে।

ফরাসি নন্দনবাদী আন্দোলনের তত্ত্বসূত্রগুলি ইংরেজি সাহিত্যে এসে পৌঁছেছিলো ওয়ালটার পেটার-এর মারফৎ— এক কষ্টার্জিত কৃত্রিমতা, শৈলীগত সূক্ষ্মতা, চমকপ্রদ সংবেদন এবং সর্বোপরি নিরঙ্কুশ সৌন্দর্য-সন্ধান। তাঁর *Studies in the History of the Renaissance* (1873) -এর ভূমিকায় পেটার স্পষ্ট করেছিলেন Aestheticism -এর সৌন্দর্যবাদী অবস্থান। এই বইয়ের 'Conclusion'-অংশে ঘোষণা করেছিলেন কলাকৈবল্যের মূল স্বীকার্য— 'the love of art for its own sake.' প্রথাগত ভিক্টোরীয় নৈতিকতা-শাসিত সৌন্দর্য/নন্দন

ভাবনার বিরুদ্ধে এ ছিল এক সামাজিক নৈতিকতা-নিরপেক্ষ সৌন্দর্য-নির্মাণ, উপভোগ ও মূল্যায়নের দাবি। কোনো ব্যক্তি/বস্তু/দৃশ্য ইত্যাদির সৌন্দর্যকে বিমূর্ত নৈতিকতা ও চূড়ান্ত মূল্যের নিরিখে না দেখে তার মূর্ত বৈশিষ্ট্যে দেখতে হবে। আরনল্ড-এর অভিমত যে সকল সমালোচনার লক্ষ্য হল 'to see the object as in itself it realty is' খারিজ না হলেও পেটার-এর কাছে বস্তুকে তার সারবত্তায় দেখার অর্থ হল 'one's own impression as it really is'. গান, ছবি, প্রকৃতি জগৎ— এসব কিছুর যে ছাপ পড়ে আমাদের মনে তার ভিত্তিতেই শিল্পের বিচারে প্রয়াসী নন্দনবাদী কবিলেখক-সমালোচকবৃন্দ। নৈতিক ও বৌদ্ধিক প্রসঙ্গ ও প্রশ্ন তাঁদের কাছে গৌণ। কোনো বস্তু আমাদের মনে সৌন্দর্য ও আনন্দের যে বিশেষ সংবেদন সৃষ্টি করে তার মূল্যায়নই মূল কথা। সমালোচককে সেই কাজটি করতে হবে এবং এর জন্য প্রয়োজন এক নির্দিষ্ট মনোভঙ্গি ও সৌন্দর্যের নিদর্শনের দ্বারা গভীরভাবে আলোড়িত হবার শক্তি—'a certain kind of temperament, the power of being deephy moved by the presence of beautiful objects.' জীবনের 'ভীতিপ্রদ সংক্ষিপ্ততা' ('awful brevity') মানুষকে তার ইন্দ্রিয়লব্ধ অভিজ্ঞতা নিয়ে তত্ত্ব নির্মাণের সময় ও সুযোগ দেয় না। দৃষ্টি-শ্রুতি-স্পর্শ-ঘ্রাণের জগতে প্রতিটি বস্তু এক ব্যক্তির মন্ময় অভিজ্ঞতায় এক এব ধরনের ছাপ ফেলে যায়। তাই পেটার-এর মতে ব্যক্তিমানস মূর্ত অভিজ্ঞতার এই জগতের এক স্বকীয় স্বপ্ন কারাগারে বন্দি—'each mind keeping as a solitary prisoner in its own dream of a world.' এই সৌন্দর্যবাদী, নন্দনবাদী, মন্ময়, সত্য ও নৈতিকতার বিমূর্ততা বর্জিত, ব্যক্তিগত আবেগ-সংবেগ-সংবেদন নির্ভর শিল্প-সাহিত্য ভাবনা ছিল আরনল্ডসহ প্রধান ভিক্টোরীয় তত্ত্ববিদ-সমালোচকদের মনন-চিন্তন-সমাজবীক্ষার বিরুদ্ধে অবক্ষয়বাদী-কলাকৈবল্যবাদী যুগক্রান্তির দ্রোহ। পেটার-এর কলমে এই দ্রোহের সারকথাটি ব্যক্ত হয়েছিল কোল্‌রিজ-এর কবিতা-বিষয়ক ১৮৬০-এ 'ওয়েস্টমিন্‌স্টার রিভিউ'-এর পাতায় প্রকাশিত একটি প্রবন্ধে— 'Ideas must be devoted to the service of art.' ১৮৭৪-এর এপ্রিলে ওয়র্ডস্‌ওয়ার্থকে নিয়ে লেখা অন্য একটি প্রবন্ধে কবির কর্তব্য সম্বন্ধে পেটার মন্তব্য করেছিলেন : কবির কাজ নীতিবাগীশ রূপে নিজেকে প্রকাশ করা নয়, কবির কাজ হল 'to give the reader a peculiar kind of pleasure', আর এই 'অদ্ভুত ধরনের আনন্দ' হল এক অ-সাধারণ 'wisdom'-কে পাঠকের কাছে পৌঁছে দেওয়ার প্রক্রিয়া। কবির কাছ থেকে আমাদের সর্বাধিক গুরুত্বপূর্ণ প্রাপ্তি, পেটার-এর কথায়, 'the supreme importance of contemplation in the conduct of life.' ওয়ার্ডস্‌ওয়ার্থ-এর রচনায় 'impassioned contemplation'-এর সার্থকতা, কেবলমাত্র লক্ষ্যে পৌঁছোনোর পন্থা, অর্থাৎ 'means to an end' রূপে নয়, বরং এক যথার্থ 'end-in-itself' রূপে, পেটার-কে বিশেষ ভাবে মুগ্ধ করেছিল। পেটারের শিল্পভাবনায় আনন্দকে এক ভাব-শৃঙ্খলায় পরিণত করার যে তাগিদ লক্ষ করা যায় ওয়ার্ডস্‌ওয়ার্থ-বিষয়ক আলোচনায় তাই ছিল তাঁর নন্দনবাদী বয়ানের সারবস্তু—'That the end of Life is not action but contemplation— being as distinct from doing— a certain disposition of the mind : is, in some shape or other, the principle of all higher morality.' শিল্পসর্বস্বতার আন্দোলনে উত্তরকালে পেটার-এর অনুগামীদের কিছুটা প্রদর্শনধর্মী, অভিনবত্বসন্ধানী ভঙ্গিমার চাপে এই 'discipline of pleasure'- এর মূল্যবান সারাৎসারটি হারিয়ে গিয়েছিল। ছাত্রাবস্থায় তাঁর কৈশোরে পেটার অক্‌স্‌ফোর্ড মুভমেন্ট-এর অন্যতম পুরোধা, অক্‌স্‌ফোর্ড বিশ্ববিদ্যালয়ে কবিতার অধ্যাপক, জন কেব্‌ল্‌-এর সংস্পর্শে এসেছিলেন। পরে

অক্‌স্‌ফোর্ডে-এর কুইন্‌স্‌ কলেজে গিয়ে ক্রমে 'Tractarian Movement'-এর ধর্মনৈতিক প্রেরণা থেকে সরে গিয়েছিলেন এক সংশয়বাদী অবস্থানে। কিন্তু এই আন্দোলনের প্রভাবেই আরাধনা ও আচার-অনুষ্ঠান ইত্যাদির ইন্দ্রিয়ময়তার দিকটির প্রতি তাঁর বিশেষ আকর্ষণ গড়ে উঠেছিল যা তাঁকে শিল্পের উপভোগ ও মূল্যায়নে সৌন্দর্য ও আনন্দের ইন্দ্রিয়-সংবেদন সম্পর্কে এক নান্দনিক প্রস্থানের দিকে চালিত করেছিল। তাঁর উল্লেখযোগ্য রচনা *Marius the Epicurean* (1885) নামক উপন্যাসের নায়ক প্রাচীন রোমের ধর্ম ও সংস্কৃতিতে বেড়ে ওঠা এক যুবক যে তার এক খ্রিস্টান বন্ধু কর্নেলিয়াসকে রক্ষা করতে গিয়ে শহিদের মৃত্যু বরণ করে। রোমের খ্রিস্টীয় ধর্ম-সংস্কৃতির ক্রমবর্ধমান ক্ষমতার পরিমণ্ডলে ম্যারিয়াস-এর বয়ঃপ্রাপ্তি ও এসব কিছুর সঙ্গে তার সম্পর্ক খুবই দার্শনিকভাবে বিশ্লেষণ করেছিলেন পেটার তাঁর উপন্যাসে। কর্নেলিয়াস-এর উচ্চ আদর্শবোধ ও দায়বদ্ধতার প্রতি ম্যারিয়াস-এর প্রবল আকর্ষণই কিন্তু ম্যারিয়াসকে আত্মবলিদানে উদ্বুদ্ধ করেছিল। ম্যারিয়াস খ্রিস্টধর্ম গ্রহণ না করলেও তার শহিদত্ব খ্রিস্টের আত্মত্যাগের সদৃশ একটি ঘটনা। পেটার এ উপন্যাসে নায়কের আত্মোৎসর্গকে খ্রিস্টীয় শহিদত্বের ধর্মতাত্ত্বিক ধারণা থেকে মুক্ত করে এক সাংস্কৃতিক তাগিদ/উপযোগিতা হিসাবে দেখাতে চেয়েছিলেন। খ্রিস্টীয় ধর্মতত্ত্ব এবং তার সঙ্গে অবিচ্ছেদ্য শহিদত্বের ধারণা থেকে তাঁর নায়ককে মুক্ত করে তত্ত্বকে শিল্প-সংস্কৃতির বিন্যাসে প্রশমিত করতে চেয়েছিলেন পেটার। তাঁর ঘোষিত কার্যক্রমই তো ছিল— 'Ideas must be devoted to the service of art.'

১৮৪৮-এ ইংরেজ কবিশিল্পীদের যে ভ্রাতৃসংঘ 'Pre Raphaelite Brotherhood'-নামে প্রতিষ্ঠা অর্জন করেছিল কবিতা, চিত্রকলা ও ভাস্কর্যে এক নব্য-রোম্যান্টিকতার রূপময় ও বর্ণময় আদর্শের পুনরুজ্জীবনের লক্ষ্যে, স্বল্পমেয়াদি সেই কার্যক্রমের বেশ কিছুটা দীর্ঘস্থায়ী প্রভাব উনিশ শতকের অন্তিম লগ্নের নন্দনবাদী আন্দোলনে ছিল এক উল্লেখযোগ্য মাত্রা। এই প্রি-র‍্যাফেলাইট শিল্প-সন্দর্শনের বিলম্বিত ও বিস্তৃত প্রভাবমণ্ডলে বিশেষ স্মরণীয় কবি সুইনবার্ন (১৮৩৭-১৯০৯)। সুইনবার্ন ছিলেন পেটার-এর গুণগ্রাহী, যেমন পেটারও তাঁর লেখায় সুইনবার্ন-এর কবিতার প্রশংসা করেছিলেন। সুইনবার্ন অবশ্য কোনোভাবেই শিল্প-সৌন্দর্য-নন্দনের কোনো তত্ত্ব রচনায় আগ্রহী ছিলেন না। তাঁর প্রধান অবদান এলিজাবেথীয়— জ্যাকোবীয় নাটকের বিষয়ে তথা তাঁর শতকের কবি-লেখকদের রচনা বিষয়ে আগ্রহ গড়ে তোলা। এ-ছাড়া কবি হিসাবে ১৮৬০ ও ১৮৭০-এর দশকে সুইনবার্ন ভিক্টোরীয় ইংল্যান্ডের সামাজিক-নৈতিক অনুশাসনের বিপরীতে চিত্র-রূপময়তা, ইন্দ্রিয়ঘনত্ব, গীতিময় গড়ন ও শৈলী ও ছন্দচাতুর্যের যে প্রকরণবিলাস তথা কল্পনা ও আবেগের যে আবেশমদির উৎক্রম পাঠকদের দরবারে উপস্থাপিত করেছিলেন, অবক্ষয়বাদী-নন্দনবাদী শিল্প আন্দোলনে তারও গুরুত্ব ছিল অনস্বীকার্য। রোম্যান্টি সিজম্‌-এর অস্থিরতা, উৎকেন্দ্রিকতা, সৌন্দর্যতৃষ্ণা এবং ক্ল্যাসিসিজম্‌-এর প্রকরণ-চেতনা, এ দুয়ের দোলাচলে ও ব্যক্তিগত জীবনে তীব্র মাদকাসক্তির কারণে ভিক্টোরীয় যুগের এই 'enfant terrible'-কে তাঁর জীবনের শেষ বছরগুলি কাটাতে হয়েছে এক নিষ্ক্রিয়, নিয়ন্ত্রিত মান্যতার ঘেরাটোপে। তবু তাঁর সম্পর্কে ভাষ্যকারের মন্তব্যে সুইনবার্ন-এর প্রতিভার সারমর্ম কলাকৈবল্যবাদের শিল্প-সাংস্কৃতির ডিসকোর্সে-এ তাঁর স্থানটি চিহ্নিত করে— 'Just as Rossetti made thought pictorially sensuous, Suinburne has made thought musicalhy sensuosus. He is not merely melodic— Shelly was glorisushy melodic— he is harmonic ; Shelley's music is the music of the lute ; Swinburne's the music

of a full orchestra ; his melodies are rich and complex, with a sweeping grandeur that no other poet had equalled, much less excelled.'

উনিশ শতকের অন্তিম পর্বে ইংল্যন্ড-এর কবি-শিল্পী সমালোচকদের নন্দনবাদী/অবক্ষয়বাদী ঝোঁকের উৎসে ফরাসি কবি-লেখক যথা গতিয়ে-বদ্‌লেয়ার-মালার্মে প্রমুখের প্রতিষ্ঠান—বিরোধিতা ও বোহেমিয়ানা তথা সাহিত্যে বুর্জোয়া নৈতিকতার প্রতিস্পর্ধী ভাবভঙ্গি বিশেষ সক্রিয় ছিল। পেটার ও সুইনবার্ন ছাড়া নন্দনবাদী এই যুগক্রান্তির আর এক গুরুত্বপূর্ণ ব্যক্তিত্ব ছিলেন অস্কার ওয়াইল্ড (১৮৫৪-১৯০০)। তাঁর 'The Critic as Artist'-এ ওয়াইল্ড মন্তব্য করেছিলেন, 'The sphere of Art and the sphere of Ethics are absolutely distinct and separate.' শিল্প বাস্তব জীবনের অনুকৃতি, এই প্রচলিত ধারণাকে খণ্ডন করাই শুধু নয়, ওয়াইল্ড 'প্রকৃতি' বা 'Nature'-কে শিল্পের তুলনায় হীন বলেই মনে করেছিলেন— 'What Art really reveals to us is Nature's lack of design, her curious crudilies, her extraordinary monotony, her absolutely unfinished condition.' তাঁর 'The Decay of Lying' নামক ডায়ালগের এই উদ্ধৃত অংশে ও এই রচনার অন্যত্র ওয়াইল্ড-এর শিল্পভাবনা তাঁর স্বভাবসিদ্ধ বাক্‌চাতুর্যে সোচ্চার— 'Art never expresses anything but itself. It has an independent life, just as Thought has.' 'প্রকৃতি' (Nature) তথা জীবনের প্রতি বিশ্বস্ততা হল শিল্পের মৃত্যু। শিল্প জীবনকে অনুসরণ করে না, বরং জীবনই শিল্পকে অনুকরণ করে। শিল্প জীবনের দর্পণ নয়, জীবনই শিল্পের দর্পণ। ওয়াইল্ডের মতে বাস্তবতন্ত্র বা Realism শিল্পের প্রণালীরূপে ব্যর্থ— 'Lying, the telling of beautiful untrue things, is the proper aim of art.' এই যে শিল্পকে প্রকৃতির উপরে, খেয়ালি কল্পনা বা Fancy-কে সত্য ঘটনা বা Fact-এর উপরে, শৈলীকে ধারণার উপরে স্থান দেওয়া, অর্থাৎ এতদিনকার প্রচলিত তুলনামূলক গুরুত্বের বিন্যাস বা 'priority structure'-কে উল্টে দেওয়া, ওয়াইল্ড-এর এই কূটাভাস অবয়ববাদী (Structuralist) ও উত্তর-অবয়ববাদী (Post-Structuralist) প্রস্থানের বীজ ছড়িয়ে দিয়েছিল যুগাবসানের নতুন হাওয়ায়।

ওয়ালটার পেটার প্রবর্তিত ইমপ্রেশনিস্ট সমালোচনা পদ্ধতির সমর্থনে তাঁর বিচার-বিশ্লেষণ তুলে ধরেছিলেন ওয়াইল্ড 'The Critic as Artist শীর্ষক ডায়ালগটিতে। নিছক বস্তুনিষ্ঠ বিবরণ সমালোচনার উদ্দেশ্য নয়; একজন অভিনেতা যেমন অভিনয়ের সময় নাটকের text-কে তাঁর মতো করে বুঝে নেন এবং text-এর সঙ্গে যুক্ত হয় তাঁর ব্যক্তিত্ব, তেমনই সমালোচকের দায়িত্ব। ওয়াইল্ড-এর অভিমত, '....treat the work of art simply as a starting point for a new creation.' প্রকৃত সমালোচনা তাই 'objective' নয়, 'creative' এবং একজন সৃজনশীল সমালোচকের দৃষ্টিতে সেরা সাহিত্য হল এমন রচনা যা মুক্ত-পরিণাম যুক্ত বা open-ended এবং যাকে নানাভাবে বহুমাত্রিকতায় পাঠ করা সম্ভব। ওয়াইল্ড-এর বিচারে 'The aesthetic critic rejects...obvious modes of art that have but one message to deliver, and having delivered it become dumb and sterile, and seeks rather for such modes as....make all interpretations true, and no interpretation final.' ওয়াইল্ড-এর এইসব মন্তব্যে সাহিত্য ও তার মূল্যায়ন সম্পর্কে মূলত যে দৃষ্টিভঙ্গি লক্ষ করা যায় তাতে উত্তর-আধুনিকতার বার্তা যথেষ্ট স্পষ্ট।

উনিশ শতকের মধ্যভাগ থেকে ফ্রান্স-এ গতিয়ে ও বদ্‌লেয়ার-এর হাত ধরে ফরাসি রোম্যান্টিকতার যাত্রারম্ভ হয়েছিল প্রতীকবাদী তথা Symbolist শিল্প-সাহিত্যভাবনার অভিমুখে। রোম্যান্টিকদের

প্রকৃতি-আরাধনার প্রথা ভেঙে শিল্পকে প্রকৃতির উপরে স্থান দেওয়া, যেমনটা বলেছিলেন গতিয়ে 'Salon of 1837'-এ : 'Nature is stupid, without consciousness of itself, without thought or passion...art is more beautiful, more true, more powerful than nature.' রোম্যান্টিকদের স্বতঃস্ফূর্ত প্রেরণার তত্ত্ব তার গুরুত্ব হারালো; কবিতা তথা শিল্প হল নির্মাণ, শ্রম-কারিগরি-চাতুর্যের ফলশ্রুতি। বুদ্ধিবৃত্তির তুলনায় আবেগ/হৃদয়বৃত্তির প্রাধান্য আর স্বীকৃত বলে গণ্য হল না। শিল্পকে দেখা শুরু হল স্বতন্ত্র দৃষ্টিতে; শিল্পীর প্রাত্যহিক যাপিত জীবনের থেকে বিযুক্ত করে। নীতি-নৈতিকতার প্রসঙ্গ থেকে শিল্পকে পৃথক করা হল; বরং বদ্‌লেয়ার বললেন, 'if the poet has pursued a moral aim, he has diminished his poetic force.' শিল্পের মূল লক্ষ্য বলে বিবেচিত হল সৌন্দর্যের স্বীকৃতি ও মূল্যায়ন ; সামাজিক উপযোগিতার ধারণা খারিজ করে বলা হল যে উপযোগিতাহীন বস্তুই কেবল সুন্দর। কবি জীবন থেকে দূরে দাঁড়িয়ে থাকা, বুর্জোয়া অস্তিত্বের প্রতি বীতশ্রদ্ধ এক ব্যক্তি। গতিয়ের থেকে আরও কিছুটা এগিয়ে বদ্‌লেয়ার গোটা পৃথিবীটাকেই দেখলেন একটি শিল্পকর্মরূপে।

উনিশ শতকের মাঝামাঝি ইংল্যান্ড-এ কবিতা ও চিত্রশিল্পে যে 'প্রি-র‍্যাফেলাইট' আন্দোলনের সূত্রপাত হয়েছিল তার সঙ্গেও যোগ ছিল কিঞ্চিৎ পরবর্তী কলাকৈবল্যবাদী/অবক্ষয়বাদী কবি-শিল্পীদের। আবার এই প্রি-র‍্যাফেলাইটদের সৌন্দর্যভাবনার মূলে ছিল রোমান্টিক ইন্দ্রিয়ময়তা ও সৌন্দর্যমগ্নতার কবি কীট্‌স্‌-এর বহুখ্যাত মন্তব্য 'I have loved the principle of beauty in all things' অথবা 'A thing of beauty is a joy for ever' হয়তো বাস্তব জীবনযন্ত্রণার দহন ও দমন থেকে রূপ-বর্ণ-ঘ্রাণ-স্পর্শ-শ্রুতির এক ইন্দ্রিয়ময় জগতে কবি-শিল্পীর আবেশ ও আত্মমগ্নতার এক বিকল্প দিশার বার্তা বহন করেছিল। হয়তো আরও খানিক পিছু হাঁটলে আমরা 'The Shepherd's Calender', 'Amoretti' ও 'Faerie Queen'-এর কবি এডমন্ড স্পেনসার-কেও এই স্বপ্নময় ইন্দ্রিয়ময় সৌন্দর্যমগ্নতার পূর্বসূরি বলে চিহ্নিত করতে পারি।

শিল্পসর্বস্বতার নন্দনবাদী দৃষ্টিভঙ্গি মোটের উপর ফরাসি তথা ইউরোপীয় শিল্প-সাহিত্যে বাস্তববাদ বা রিয়ালিজম্‌-এর প্রভাব-প্রতিপত্তির বিরুদ্ধে এক রোমান্টিকতাবাদী প্রতিক্রিয়া। কোনো বিশেষ সামাজিক/নৈতিক উপযোগিতা বা উদ্দেশ্য শিল্পসৃষ্টির কারণ নয় এবং তাই তেমন কোনো উপযোগিতা/উদ্দেশ্য শিল্পের উপভোগ ও বিচারে প্রাসঙ্গিক বলে গণ্য হবে না। যুক্তি-বুদ্ধি-অনুশাসন-দায়বদ্ধতা থেকে কবি-লেখক-চিত্রকরেরা তাঁদের শিল্পকে সৌন্দর্যসন্ধান ও কল্পনার ইন্দ্রিয়ময় ও আবেগমণ্ডিত জগতে, সমাজসিদ্ধ জীবন ও সংস্কৃতির বিপরীতে এক নিভৃত আবেশ অথবা উৎকেন্দ্রিক বোহেমিয়ানায় চালিত করলেন। সৌন্দর্যবাদী/অবক্ষয়বাদী কবি-লেখক-শিল্পীদের এই অবস্থান বুর্জোয়া সমাজ-সংস্কৃতি-নৈতিকতার অন্তর্নিহিত সংকট ও সংশয়ের নানা জিজ্ঞাসায় চিহ্নিত। আধুনিকতাবাদী তথা মডার্নিস্ট ডিসকোর্স-এর এক গুরুত্বপূর্ণ ও জটিল আগমনী। আবার এই আলোচনায় আগেই উল্লেখ করা হয়েছে সাহিত্যে উত্তর-আধুনিকতার বহুমাত্রিক ডিসকোর্স-এও অবক্ষয়বাদী/নন্দনবাদী দৃষ্টিভঙ্গি নানা ইশারা-ইঙ্গিত রেখে গেছে। স্বাধীনতা-পরবর্তী পঞ্চাশোত্তর কবিতা, গদ্য ও চিত্রশিল্পে বিট ও হাংরিদের বিতর্কিত যোগদানও এ-প্রসঙ্গে স্মরণ করা যেতে পারে।

বর্তমান প্রবন্ধের উপসংহারে আমরা কলাকৈবল্যবাদী শিল্পদৃষ্টির সাধারণ বৈশিষ্ট্য/অবস্থানগুলি একটি তালিকার আকারে দেখে নিতে পারি—

(১) বাস্তববাদ (Realism) ও তার মার্কস্‌বাদী সংস্করণ, মূলত বিপ্লব-পরবর্তী রুশ সাহিত্য/সমালোচনায় উদ্ভাবিত, সমাজতান্ত্রিক বাস্তবতা (Socialist Realism) জাতীয় প্রবলভাবে

উপযোগিতাবাদী ও উদ্দেশ্যমূলক শিল্পসাহিত্য ভাবনার বিরুদ্ধে এক প্রতিক্রিয়া এই শিল্পসর্বস্বতার তত্ত্ব।

(২) শিল্প-সাহিত্য জীবনের দর্পণ এবং মানবসমাজের কল্যাণ ও উত্তরণে শিল্পী-সাহিত্যিকের প্রত্যক্ষ দায়বদ্ধ ভূমিকা রয়েছে— এ জাতীয় সমাজ-বাস্তবতা ও দায়বদ্ধতাকে অস্বীকার করে কেবলমাত্র শিল্পের রস-শৈলী-প্রকরণের প্রতি দায়বদ্ধ থাকা।

(৩) শিল্প জীবনকে নয়, জীবন শিল্পকে অনুকরণ করবে।

(৪) কোনো নীতিকথা প্রচার বা প্রতিষ্ঠা শিল্প-সাহিত্যের উদ্দেশ্য হতে পারে না। তাই শিল্প বা art এবং নৈতিকতা বা Morality-র মধ্যে কোনো সম্পর্ক নেই। কোনো শিল্প তাই অশ্লীল বা অনৈতিক বলে বিবেচিত হতে পারে না।

(৫) শিল্পে জীবনধর্মিতার কোনো প্রশ্ন ওঠে না। কোনো শিল্পকর্ম তাই 'true to life' কিনা সে জিজ্ঞাসা অবান্তর।

(৬) শিল্প-সাহিত্যের কোনো উপযোগিতা-নির্ভর মূল্যায়ন অনুচিত ও অসম্ভব। প্রকৃত শিল্পের তাই কোনো ব্যবহারিক মূল্য নেই। শিল্পের মূল্য স্বাশ্রয়ী, তার নান্দনিক অভিজ্ঞতার মূল্যেই কেবলমাত্র সেই স্বাশ্রয়ী মূল্যের বিচার করা যেতে পারে।

(৭) শিল্পকর্মের উপভোগ ও মূল্যায়ন অতীত ও ভবিষ্যতের সমস্ত দায় থেকে মুক্ত এবং একান্তভাবে নান্দনিক অভিজ্ঞতার বর্তমান-নির্ভর।

(৮) শিল্পী বাস্তব জীবনের নিয়ম-নীতি-অনুশাসন থেকে দূরে দাঁড়িয়ে থাকা একজন ব্যক্তি, যাঁর কাছে গোটা পৃথিবীটাই এক শিল্পকর্ম।

(৯) জীবন ও প্রকৃতির ওপরে স্থান শিল্পের; সৌন্দর্য নির্মাণই শিল্পীর মূল কাজ; শিল্প যেহেতু নির্মাণ, সুতরাং শিল্প মাত্রেই কৃত্রিম।

(১০) শিল্পের সমূহ স্বাশ্রয়ী মূল্য নিহিত আছে শিল্পীর জীবন ও প্রকৃতির যাবতীয় মান্যতা অতিক্রমকারী কল্পনার উচ্চ স্বাধীনতায়।

এই তালিকা আর দীর্ঘায়িত না করে এ আলোচনা শেষ করব কলাকৈবল্যবাদী আলোচক ক্লাটন ব্রক্-এর বহুপঠিত 'What is Art' প্রবন্ধের কয়েকটি প্রাসঙ্গিক উদ্ধৃতি দিয়ে—

(ক) "In fact, men have valued art, ever since there has been any art, for its own sake ; yet always they have cast about for irrelevant reasons, why they should value it; and even now, though we have discovered that it is to be valued for its own sake, we are puzzled by that discovery, and still often fail to think of art in terms of itself."

(খ) "If a work of art is good to me, its goodness is not moral but simply aesthetic, something perceived immedietely and valued for its own sake, without relation to any kind of conduct."

(গ) "People call a work of art true to life, when they mean that it is a work of art ; true is simply a wrong term of praise they give to it, because, in their thought, they are still forgetting their actual experience of the work and considering its effect upon their future."

(ঘ) "During it we look neither before not after ; only the now exists for us, *freed from all that has been or will be. And we recognize a work of art* by its power of giving us this freedom."

সমাজ-বাস্তবতা, বিজ্ঞান-প্রযুক্তি নির্ভর উন্নয়নের ভাবনা ও কার্যক্রম, বৃহৎ শিল্প ও পুঁজির প্রসার, মতাদর্শের গুরুভার, প্রতিষ্ঠানসমূহের আধিপত্যবাদী নিয়ন্ত্রণ, যুক্তি-বুদ্ধি উপযোগিতার সর্বাত্মক নিরিখে কল্পনার পরিসরকে সংকুচিত করে দেওয়া, ধর্ম-নৈতিকতা-সমাজ বিপ্লব ইত্যাদির দায়ভারে শিল্প ও শিল্পীর সৃজনের ছন্দ ও আনন্দকে নানাভাবে ব্যাহত করা— এ সব কিছুর বিরুদ্ধে প্রতিক্রিয়ায় শিল্পের রস-রূপ-শৈলীর স্বাতন্ত্র্যের এই নন্দনবাদী/অবক্ষয়বাদী অবস্থানভূমিটি নানাভাবে কর্ষিত হয়েছে। জীবনবিমুখতা বা পলায়নী মনোবৃত্তির নেতিমূলক তক্‌মা না এঁটে ইতিহাসের প্রেক্ষিতে কলাকৈবল্যবাদের বয়ানগুলি আমাদের আরও সতর্কতার সঙ্গে দেখা জরুরি। বাংলা গদ্য ও কবিতার ইতিহাসে শিল্পসর্বস্বতার কোনো সারবান আন্দোলন সংঘটিত হয় নি। কোনো কোনো সময়পর্বে সামাজিক ও রাজনৈতিক দায়বদ্ধতার প্রশ্নটি হয়তো অতিরিক্ত প্রাধান্য পেয়েছে, যেমন চল্লিশের দশকে কবিতায় ও গদ্য সাহিত্যে— অরুণ মিত্র, সুভাষ মুখোপাধ্যায়, সুকান্ত ভট্টাচার্য, দীনেশ দাস, বিষ্ণু দে, গোপাল হালদার, সতীনাথ ভাদুড়ী, সোমেন চন্দ প্রমুখের কলমে। আবার পঞ্চাশের দশকে 'শতভিষা' পত্রিকা ও আলোক সরকার এবং ষাটের দশকে বিট্‌নিক কবিদের প্রভাবে ও হাংরি আন্দোলনের সঙ্গে যুক্ত শক্তি চট্টোপাধ্যায়, উৎপল কুমার বসু প্রভৃতিরা সেই উচ্চকণ্ঠ সামাজিক দায়বদ্ধতা থেকে সরে গেছেন ব্যক্তিগত তথা গোষ্ঠীগত বোহেমিয়ানা ও ভাষা-প্রকরণের উৎকেন্দ্রিকতার অভিমুখে। এই সরে যাওয়া কতখানি জীবন-বাস্তবতা থেকে নিছক শিল্প-সাহিত্যের নন্দনবাদী সৌন্দর্য/অভিনবত্বের সন্ধান বলা কঠিন। বাংলা উপন্যাসে বঙ্কিম যতখানি শিল্পসৌন্দর্য তথা নির্মাণকলার সচেতন রূপকার, শরৎচন্দ্র অবশ্যই ততখানি নন। তারাশঙ্কর ও অনেকাংশে মানিক বন্দ্যোপাধ্যায় এবং তারপরে সমরেশ বসু যেভাবে তাঁদের রচনায় লেখকের সমাজমনস্কতার দৃষ্টান্ত তুলে ধরেছেন তেমন অন্যদের লেখায় পাইনা। কী বলবো বিভূতিভূষণ সম্পর্কে? সৌন্দর্যবাদী না জীবন-জিজ্ঞাসার কথাকার?

সাহিত্যসমালোচনার ধারায় পাউণ্ড ও এলিঅট

ইন্দ্রনীল আচার্য

এজরা পাউণ্ড :

সাহিত্য-সমালোচক হিসেবে এজরা পাউন্ডের খ্যাতি তাঁর সাতটি গ্রন্থের ওপর ভিত্তি করে গড়ে উঠেছে। অবশ্য এখন ওই বইগুলোর কোনো মুদ্রিত সংস্করণ পাওয়া যায় না। এবং টি. এস. এলিঅটের অসাধারণ প্রবন্ধ সংকলন *Literary Essays* (1954) পরবর্তীকালে উইলিয়ম কুক্‌সন তাঁর প্রবন্ধ সংকলন *Selected Prose* (1973)-এ পাউন্ডের গুরুত্বপূর্ণ সমালোচনামূলক প্রবন্ধগুলিকে একসাথে গ্রথিত করে প্রকাশ করেন।

সাহিত্য-সমালোচক হিসেবে পাউন্ডের মুখ্য বৈশিষ্ট্যগুলি আলোচনা করতে গেলে তার পরিসর অনেক বড়ো হয়ে যাবে। একই সাথে ল্যাটিন সাহিত্য এবং লেখকদের নিয়ে অনেক গভীর তথ্যনিষ্ঠ আলোচনার প্রয়োজন হয়ে পড়বে। সেখানে দান্তে, ক্যাভালকান্তি, আরনট ড্যানিয়েল সহ অনেক 'Provencal' কবির শৈলী নিয়ে পাউন্ডের বক্তব্য আলোচনার দরকার হবে। কিন্তু সাহিত্য সমালোচনায় বিবর্তনের ধারায় এজাতীয় আলোচনা বহুলাংশে নিষ্প্রয়োজন। তাই আমরা পাউন্ডের সাহিত্য-সমালোচনার সেইসব বৈশিষ্ট্য নিয়ে আলোচনা করব যেখানে তাঁর সমসাময়িক আর এক প্রখ্যাত আমেরিকান কবি-সমালোচক টি. এস. এলিঅটের সঙ্গে একটি তুলনামূলক আলোচনা সম্ভব হয় এবং সেই সঙ্গে উভয়ের মধ্যে পারস্পরিক প্রভাবের প্রক্রিয়াটিও বিস্তারিত ভাবে তুলে ধরার চেষ্টা করা হবে।

সাহিত্য সমালোচনার ক্ষেত্রে পাউন্ড অনেক সময়েই অঙ্ক, পদার্থবিদ্যা ও রসায়নবিদ্যা থেকে পারিভাষিক প্রয়োগ পছন্দ করতেন। তাঁর বিখ্যাত গ্রন্থ *Spirit of Romance*-এ কবিতা সম্পর্কে তিনি বলেছেন, "(Poctry) is a sort of inspired mathematics, which gives equations, not for abstract figures.....but for the human emotions." প্রায় এক দশক বাদে এই ধারণাটি টি. এস. এলিঅট গ্রহণ করেন তাঁর বিখ্যাত পরিভাষা 'objective correlative' উদ্‌ভাবনের মাধ্যমে। পরবর্তীকালে *Elizabethan Dramatists* গ্রন্থের মুখবন্ধে তিনি স্বীকার করেন যে এই শব্দবন্ধটি তাঁর আগে ওয়াশিংটন অ্যালস্টন ব্যবহার করেছিলেন। অনেকটা পূর্বসূরি পাউন্ডের সুরে সুর মিলিয়ে

এলিঅট 'objective correlative'-এর ধারণাটিকে সংজ্ঞায়িত করেন এইভাবে—"a set of objects or situation, a chain of events which shall be the formula of that particular emotion."১৯১৯ সালে প্রকাশিত এলিঅট তাঁর প্রথম প্রবন্ধসংকলন *The Sacred Wood*-এর একটি প্রবন্ধ 'Hamlet and His Problems'-এ এই বিখ্যাত সূত্রটি ব্যবহার করেন। পাউন্ডের মতোই এলিঅট এখানে একটি 'সমুজ্জ্বল পুঙ্খানুপুঙ্খতা'-র ধারণা দিয়েছেন। কিন্তু দুজনের ভাবনার মৌলিক পার্থক্য হল এলিঅট তাঁর প্রয়োগের ক্ষেত্র হিসেবে শুধু শিল্প-সাহিত্যকেই বেছে নিয়েছেন। আর পাউন্ড তাঁর *The Cantos*-এর পাঠকের সামনে হাজির করেছেন 'জীবন্ত' চরিত্র সরডেলো এবং সিগিমোন্‌ডোকে। এইভাবে তিনি কবিতা ও ইতিহাসকে মিলিয়ে দেওয়ার চেষ্টা করেছেন।

পাউন্ড এবং এলিঅট উভয়েই তাঁদের সাহিত্যকর্মে বহুল পরিমাণে ধুয়ো (leitwotif) ব্যবহার করেছেন। অর্থাৎ বাক্যাংশ এবং চিত্রকল্পের পুনরাবৃত্তি ঘটিয়েছেন বিভিন্ন পরিস্থিতিকে একসূত্রে বাঁধতে এবং সামগ্রিক মূল্যায়ন করতে। এলিঅটের সর্বাপেক্ষা পাউন্ড-প্রভাবিত কাব্যগ্রন্থ *The Waste Land* (1922)-এ এরকম অনেক উদাহরণের মধ্যে একটি হল—'Those are pearls that were his eyes.' আবার পাউণ্ডের ক্যান্টোস-এর ১১, ১৭ এবং ২১-এ একটি তাৎপর্যপূর্ণ ধুয়ো হল—'in the gloom the gold'. পাউণ্ডের ধুয়োগুলি অবশ্য ইতিহাস-ভিত্তিক, প্রতীক-নির্ভর নয়।

'Imagism' বা চিত্রকল্পবাদ পাউন্ডের সাহিত্যসমালোচনায় এক গুরুত্বপূর্ণ সংযোজন। তবে যে-সব অতীত কবিদের উদাহরণ তিনি দিয়েছেন এই প্রসঙ্গে সেখানে তাৎপর্যপূর্ণভাবে মিল্টনের উল্লেখ নেই। আসলে পাউন্ডের ঘোর অপছন্দ ছিল মিল্টনের বাগাড়ম্বর এবং আলংকারিক কাব্যশৈলী। যে মিল্টন-বিরোধিতার ধারা তিনি শুরু করেন তা পরবর্তী কালে এলিঅটের সমালোচনায় প্রতিধ্বনিত হয়।

তাঁর সমালোচনামূলক প্রবন্ধ সংকলন *A Retrospect*-এ তিনি তাঁর সমসাময়িক কিছু লেখক— যেমন জেমস্ জয়েস্ এলিঅট এবং উইন্ড্যাম লুইসের লেখা নিয়েও সাগ্রহে আলোচনা করেছেন।

কাব্যিক উৎকর্ষের উদাহরণ হিসেবে পাউন্ডের স্বভাব ছিল বিশ্বখ্যাত প্রাচীন লেখকদের লেখার অংশবিশেষ উদ্ধৃত করা। এই ব্যাপারে তাঁর সঙ্গে ম্যাথু আর্নল্ডের 'Touchstone' পদ্ধতির অনেক সাদৃশ্য পরিলক্ষিত হয়। বিশেষত আর্নল্ড ১৮৮০ সালে প্রকাশিত তাঁর বিখ্যাত প্রবন্ধ 'The Study of Poetry'-তে যে-সব অতীতকালের প্রসিদ্ধ কবিদের উদ্ধৃতি দিয়েছিলেন তাঁদের অনেকের লেখার নমুনা পাউন্ডও পেশ করেছেন। এই ধরনের উদ্ধৃতি ব্যবহারের মাধ্যমে 'আলোকিত পুঙ্খানুপুঙ্খতা' (luminous detail) সৃষ্টির যে প্রয়াস পাউন্ড গ্রহণ করেন তার সমর্থন টি. এস. এলিঅটের লেখাতেও পাওয়া যায়। অবশ্য তাঁরা দুজনেই অনেক ক্ষেত্রে উদ্ধৃতি দিয়েছেন উৎস উল্লেখ না করেই। এই অভ্যেস তাঁদের কাব্যগ্রন্থের শীর্ষকের দিকে তাকালেই বোঝা যায়— 'A Lume Spento' 'Ara Vos Prec' প্রভৃতি। অবশ্য এই প্রয়োগের ক্ষেত্রে দুজনেই মহাকবি দান্তের কাছে ঋণী। পাউন্ড ও এলিঅট উভয়েই 'order'-এর প্রশংসা করেছেন একটি গঠনমূলক ধারণা হিসেবে। কিন্তু উভয়ের কাব্যগ্রন্থে সংস্কৃতির একটি শৃঙ্খলাবদ্ধ এবং পর্যায়নুক্রমিক ধারণাকে ভেঙে ফেলার ছবি আঁকা হয়েছে।

১৯১৪ খ্রিস্টাব্দে পাউন্ড প্রথম এলিঅট-এর কবিতা 'The Love Song of J. Alfred Prufrock' পড়েন। এলিঅট তাঁর কাব্য রচনার প্রেরণা পেয়েছিলেন জুল মাফোর্গ-এর কবিতা

এবং জেকোবিয়ান নাটকের ধারা থেকে। পাউন্ড অবশ্য এই সব ধারার সঙ্গে সম্যকরূপে পরিচিত ছিলেন না। তা সত্ত্বেও তিনি এলিঅটের কবিতায় নগরকেন্দ্রিক অ-কাব্যিক চিত্রকল্পের ব্যবহার নিয়ে রসগ্রাহী সমালোচনা করতে সমর্থ হন। এলিঅট অবশ্য ১৯১৪ সালে লন্ডনে আসার পরে তাঁর কিছু কবিতায় যেমন, 'Aunt Helen' 'Mr. Apollirax' পাউন্ডের কাব্যশৈলীর ব্যঙ্গাত্মক ও পরিশীলিত স্বরটি উৎক্ষেপ করেছিলেন। এই দুই কবি-সমালোচক নিবিড় সংযোগে কাজ করেছেন ১৯২২ সাল পর্যন্ত এমনকি তার পরেও।

ইমেজিস্ট আন্দোলনের পরে ১৯১৪ সালে আরও একটি আন্দোলনের জোয়ার আসে কবিতার ক্ষেত্রে। এই আন্দোলন সাধারণভাবে Vorticism নামে পরিচিত। ১৯১৪ সনের এই আন্দোলনের লেখককুলের মধ্যে উল্লেখযোগ্য হলেন পাউন্ড, এলিঅট, জয়েস এবং লুইস। সে-সময় তাঁদের বয়স ছিল যথাক্রমে ২৯, ২৬, ৩২, এবং ৩০ বছর। ৮ আগস্ট ১৯১৪ সালে যখন ইংল্যান্ড জার্মানির বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা করল সেই সময়ে ইউরোপীয় সভ্যতার এক সামগ্রিক পুনর্মূল্যায়নের প্রয়োজন তীব্রভাবে অনুভূত হয়েছিল। বিভিন্ন যুগান্তকারী লেখার মধ্যে এই পুনর্মূল্যায়নের প্রয়াস পরিলক্ষিত হয়। এর মধ্যে রয়েছে জয়েসের *Ulysses,* এলিঅটের *The Waste Land* এবং পাউন্ডের *The Cantos.*

যুদ্ধের বছরগুলো সমালোচক পাউন্ডের কাছে কর্মবহুল ছিল। *Literary Essays* সংকলনে টি. এস. এলিঅট যে প্রবন্ধগুলি অন্তর্ভুক্ত করেছিলেন তার অর্ধেক প্রবন্ধের রচনাকাল ১৯১৪—১৯১৮। এই সময় এলিঅট জুল লাফোর্গ নামে এক অল্পপরিচিত ফরাসি সিম্বলিস্ট কবির লেখার বিষয় ও শৈলী নিয়ে গভীর মনোনিবেশ করেন এবং তার ফলশ্রুতি হিসেবে পাউন্ড একটি মননশীল প্রবন্ধ রচনা করেন যার নাম ছিল "Irony, Laforgue and Some Satire." পাউন্ড এলিঅটকে প্রভাবিত করেন কিছু গুরুত্বপূর্ণ লেখা পড়ার জন্যে এবং এলিঅট ফরাসি সমালোচক রেমি দ্য গুরমঁ (Remy de Gourmont) এবং কবি থিওফাইল গোতিয়ে-র (Theophile Gautier) লেখা পড়ে ফেলেন। এর প্রভাবে এলিঅট কিছু প্রবন্ধ রচনা করেন যা তাঁর প্রথম প্রবন্ধ সংকলন *The Sacred Wood*-এ অন্তর্ভুক্ত হয়। এ-ছাড়া তাঁর ১৯২০ সালে প্রকাশিত সংকলন *Poems*-এর কিছু কবিতা পাউন্ড-এর গোতিয়ের অনুসরণে 'quatrain' বা চৌপদি ছন্দে লেখা হয়।

মধ্যযুগের সাহিত্য সম্বন্ধে পাউণ্ডের নানা সমালোচনামূলক রচনা আছে। মার্চ ১৯২৮ সনে 'Dial' পত্রিকায় প্রকাশিত তাঁর প্রবন্ধ 'Medievalism'-এ পাউন্ড ১৫২৭ খ্রিস্টাব্দের আগে ইতালীয় সাহিত্যে এক ঐক্যবদ্ধ সংবেদনশীলতা (Unified sensibility) বিরাজ করত এমন কথা বলেছেন, বিশেষত দান্তে এবং গিডোর কবিতায়। এই পর্যবেক্ষণের সঙ্গে এলিঅটের 'dissociation of sensibility' মতবাদের যথেষ্ট সাদৃশ্য রয়েছে। এলিঅট তাঁর প্রবন্ধ 'The Metaphysical Poets'-এ এই সংবেদনশীলতার অনৈক্য বা বুদ্ধিবৃত্তি ও হৃদয়বৃত্তির অসাযুজ্যের কথা বলেছিলেন কবি জন ডন (Donne) থেকে জন মিলটন অবধি কাব্যসাহিত্যের ধারা বিশ্লেষণ করতে গিয়ে। এলিঅটের 'Ash Wednesday" (1930) কবিতার মতো পাউন্ডও তাঁর *A Draft of xxx Cantos* (1930) সংকলনে একটি উজ্জ্বল, দ্যুতিমান পৃথিবীর ধারণাকে পুনরুদ্ধার করতে চেয়েছিলেন যেখানে চলমান উদ্যমী ভাবনাগুলি একে অপরকে ছুঁয়ে যায় ও সঞ্জীবিত করে।

১৯২৯ সালে 'New York Herald Tribune' পত্রিকায় পাউন্ড ধারাবাহিকভাবে কিছু সমালোচনামূলক প্রবন্ধ লেখেন যার শীর্ষক ছিল "How to Read" সেখানে ভাষা সম্পর্কে

অলোচনা করতে গিয়ে এক জায়গায় তিনি তিন ধরনের কবিতার উল্লেখ করেন প্রথমটি 'Melopoeia' যার অর্থ কবিতা বা সংগীত (Canto)। দ্বিতীয়টি 'Phanopoeia' যার অর্থ দৃশ্যকল্পের সাহায্যে কবিতা সৃষ্টি করা এবং তৃতীয়টি 'Logopoeia', যা শব্দ নিয়ে বুদ্ধিদীপ্ত দাপাদাপি। এটি এমন এক ধরনের কবিতা যেখানে অতীতের উদ্ধৃতি আছে, বিভিন্ন সাহিত্যে প্রসঙ্গান্তর আছে এবং গভীর তাৎপর্যপূর্ণ ব্যঞ্জনা রয়েছে। এই তৃতীয় কাব্য কবিতা স্রষ্টাদের মধ্যে তিনি জুল লাফোর্গ এবং টি. এস. এলিঅটকে স্থান দিয়েছেন।

আধুনিক কালে পাউন্ড সাহিত্য সমালোচনার জগতে এক বিশিষ্ট ব্যক্তিত্ব রূপে সমাদৃত। বিভিন্ন ধরনের কবিতার সংজ্ঞা প্রদানের মাধ্যমে এবং পরস্পর সম্বন্ধযুক্ত কিছু কার্যকরী ধারণার উদ্ভবের মাধ্যমে তিনি চিরকালীন গ্রহণযোগ্যতা লাভ করেছেন। এই ধারণাগুলির মধ্যে রয়েছে 'image' চিত্রকল্প, 'Vortex' 'ভ্রমিল', এবং 'ideogram' (ভাবলিপি)। অন্যান্য ভাষা এবং সংস্কৃতির প্রতি পাউন্ডের গভীর অনুরাগের কারণে বহু অনালোচিত লেখক এবং তাঁদের সাহিত্য কীর্তির ধারাকে পাদপ্রদীপের আলোয় তুলে ধরেছিলেন। তাঁর প্রয়াস ছাড়া এইসব লেখক ও ধারাগুলি বিশিষ্ট গবেষণার বস্তু হিসেবে অধরা রয়ে যেত। তাঁর সাহিত্য সমালোচনা ইউরোপীয় অভিমুখের (Euro-Centric) বিপরীতে ছিল এবং তিনি বিশ্বাস করতেন যে সাহিত্য সম্যক্‌রূপে উপলব্ধি করতে হলে তার সঙ্গে চিত্রকলা, সংগীত, অর্থনীতি প্রভৃতি বিষয়ের তুলনামূলক পাঠ-প্রয়োজন। ইতালিতে অনেক লেখক-সমালোচক মুক্তকণ্ঠে স্বীকার করেছেন যে দান্তে সম্বন্ধে তাঁদের ধারণা অনেকাংশে পরিমার্জিত ও পরিবর্ধিত হয়েছে পাউন্ড এবং এলিঅটের লেখার মাধ্যমে। সামগ্রিকভাবে সাহিত্য সমালোচনার ধারাকে তাঁরা পুষ্ট করেছেন এক বৃহৎ ইউরোপীয় চেতনার আলোকে। সনাতন ঐতিহ্যের অনুসারী হয়ে তাঁরা আধুনিক মনন ও প্রতিভাকে তার সাথে যুক্ত করার প্রয়াস চালিয়ে গিয়েছেন। ফলস্বরূপ, তাঁদের রচনায় ঐতিহ্য ও আধুনিকতার মেলবন্ধন রচিত হয়েছে যা সর্বকালে সাহিত্যচর্চার ক্ষেত্রে এক কাঙ্ক্ষিত পরিণতি হিসেবে পরবর্তী লেখক শিল্পীদের অনুপ্রাণিত করেছে।

টি. এস. এলিঅট :

বিংশ শতাব্দীর সাহিত্য সমালোচনার ইতিহাসে এক উজ্জ্বল জ্যোতিষ্ক টি. এস. এলিঅট। সনাতনপন্থী সমালোচনার ধারার সঙ্গে ব্যক্তিনৈপুণ্যের সুষম সংমিশ্রণে এক আদর্শ সমালোচনার ধারা প্রতিষ্ঠার ক্ষেত্রে তিনি ছিলেন এক অগ্রণী ব্যক্তিত্ব। অনেকের মতে আধুনিক সমালোচনার ধারায় তিনি শেষ উল্লেখযোগ্য সমালোচক। তাঁর পর থেকে উত্তর-আধুনিকতাবাদী ও উত্তর-গঠনতন্ত্রবাদী সমালোচনার বিকাশ ও ব্যাপ্তি ঘটে।

১৯৪২ সালে প্রকাশিত তাঁর এক প্রবন্ধ 'The Music of Poetry'-এ এলিঅট লিখেছিলেন যে তাঁর বিশ্বাস যে-সব কবি কাব্যসমালোচনার জগতে প্রবেশ করেন কবিতা সৃষ্টি প্রসঙ্গে নিজেদের মতামত ব্যক্ত করেন তাঁরা প্রায় সকলেই কমবেশি সচেতনভাবে নিজেদের কাব্যধারার সপক্ষে যুক্তি প্রতিষ্ঠা করতে চান। বিশেষত তরুণ কবিরা যে ধারার কবিতা লিখে চলেছেন তার যথার্থতা খুঁজতে গিয়ে অনেক সময়েই তাঁরা প্রাচীন সাহিত্যের দ্বারস্থ হন। এই সব কবিরা যখন কাব্যসৃষ্টির প্রক্রিয়াটিকে নিজস্ব তত্ত্বের আলোকে ভাস্বর করে তোলেন তখন স্বাভাবিকভাবেই যে-সব মৃত প্রাচীন কবিদের তাঁরা অনুসরণ করেন তাঁদের প্রশংসাসূচক পর্যালোচনা করেন। অন্যদিকে যে-সব প্রাচীন কবির কবিতা সৃষ্টির উদ্দেশ্য তাঁদের থেকে ভিন্ন সেই লেখকদের কিছু আপাত-ত্রুটিকে ফুলিয়ে ফাঁপিয়ে তুলে ধরেন। সোজা কথায় কবিতা লেখার সময়ে এই

নবীন কবিরা একটি বিশেষ ধারার অভিজ্ঞতাকে প্রাধান্য দিয়ে তাকে পাঠকের কাছে অভ্রান্ত বলে প্রতিষ্ঠা করার প্রয়াস করেন।

এলিঅটের এই অকপট স্বীকারোক্তি প্রকৃতপক্ষে সমস্ত নান্দনিক তত্ত্বসমূহের সীমাবদ্ধ সত্যতাকে সূচিত করে। অবশ্য কাব্যসমালোচনার ক্ষেত্রে এ-ধরনের ব্যক্তিগত বিশ্বাস ও অভিজ্ঞতার অনুপ্রবেশ নিয়ে এলিঅট আরও অনেক লেখাই লিখেছেন। তাঁর বিখ্যাত প্রবন্ধ 'The Use of Poetry and the Use of Criticism'-এর মুখবন্ধে এলিঅট ঘোষণা করেন, "When the critics are themselves poet, it will be suspected that they have formed their critical statements with a view of justifying their poetic practice." এলিঅটের নিজস্ব সমালোচনা রীতির সঙ্গে এই ঘোষণাটি খুব সামঞ্জস্যপূর্ণ। তাঁর প্রথম দিকের লেখাগুলিতে তিনি জন ড্রাইডেন, বেন জনস্ন এবং স্যামুয়েল জনসনের প্রশংসা করেছেন তার কারণ তিনি তাঁদের কাব্যরীতিকে সচেতনভাবে অনুসরণ করেছিলেন। অন্যদিকে রোমান্টিক, ভিক্টোরিয়ান ও জর্জিয়ান কবিতার প্রতি তাঁর বীতরাগ প্রকাশ পেয়েছে কারণ তিনি সেই কাব্যধারার অনুসারী ছিলেন না।

ঔপন্যাসিক হেনরি জেমস-এর মতো এলিঅটের জন্ম হয়েছিল নিউ ইংল্যান্ড মানসিকতার পরিবারে পিউরিটান বিশ্বাসের অবক্ষয়ের যুগে। জেম্স-এর মতোই তিনি এই স্বৈরাচারী ধর্মবিশ্বাসের বিরুদ্ধে প্রতিবাদে সোচ্চার হন। যদিও তিনি যা অপছন্দ করতেন তার অনেক কিছুই তিনি নিজের মধ্যে আবিষ্কার করেন। এই উপলব্ধি তাঁর গোড়ার কবিতাগুলিতে এক প্রচ্ছন্ন হতাশার ছবি ফুটিয়ে তোলে। আর এই হতাশা থেকে মুক্তি পেতে তিনি সমস্ত ব্যক্তিগত বিষয়কে কবিতা থেকে বিসর্জন দেন এবং একটি নৈর্ব্যক্তিক মুখোশের মোড়কে তাঁর প্রথমদিকের কবিতাগুলোকে বেঁধে ফেলেন। এজন্য Wyndham Lewis-এর মতো সমালোচকেরা তাঁকে অন্তরে অন্তরে এক রোমাণ্টিক হিসেবে তুলে ধরেছেন এবং তাঁরা মনে করেন যে এলিঅটের 'objective correlative'-এর তত্ত্ব আসলে রোমান্টিক অভিব্যক্তি তত্ত্বের (expressive theory) একটি অন্য রূপ।

বিংশ শতাব্দীর সাহিত্য সমালোচনার ধারায় এলিঅটের অবস্থান কী তা আলোচনা করা প্রয়োজন। এই সময়ের সাহিত্য সমালোচনা মূলত দুটি অভিমুখে প্রবাহিত হয়েছিল। প্রথমত অতীত সাহিত্যের পুনর্মূল্যায়নের প্রক্রিয়া এবং দ্বিতীয়ত নতুন তাত্ত্বিক ধারণার সৃষ্টি ও সংযোজন। এলিঅট প্রথম ধারাটি নিয়ে মূলত ভাবিত ছিলেন যদিও পুনর্মূল্যায়নের মাধ্যমে তিনি নতুন ধারণার সংযোজনও ঘটিয়েছিলেন। তাঁর বিখ্যাত প্রথম পর্যায়ের প্রবন্ধ সংকলন *The Sacred Wood*-এ তিনি এই দুইয়ের সংমিশ্রণ ঘটিয়েছিলেন।

আধুনিক সমালোচনার ধারায় বিভিন্ন মতবাদ গোষ্ঠী রয়েছে। মনস্তাত্ত্বিক সমাজবৈজ্ঞানিক ও ঐতিহাসিক মতবাদ-গোষ্ঠী ইতিমধ্যে সুপ্রতিষ্ঠিত। এ ছাড়াও রয়েছে 'Impressionistic Criticism'-এর গোষ্ঠী। এই ইমপ্রেসনিজম্ বিংশ শতাব্দীর গোড়ায় Arthur Symons এবং J. E. Spingarn-এর উদ্যোগে বিশেষ জনপ্রিয়তা অর্জন করে। এলিঅট অবশ্য এই ধারাগুলির কোনোটির সঙ্গেই যুক্ত ছিলেন না।

টি. এস. এলিঅট ও ম্যাথু আর্নল্ডের সাহিত্য সমালোচনা পাশাপাশি রাখলে একটি বিষয় স্পষ্টরূপে প্রতিভাত হয়। এলিঅট সমালোচনার ক্ষেত্রে এক বিপ্লবের সূচনা করেন। ১৮৬৫ সালে আর্নল্ডের প্রকাশিত *Essays in Criticism*-এর পরে কাব্য সমালোচনার জগতে একটি সামগ্রিক পুনর্মূল্যায়নের প্রচেষ্টা সেভাবে নজরে পড়েনি। এর ফলে আর্নল্ডের অনেক বিতর্কিত

পর্যবেক্ষণ ১৯২০-র দশকেও গ্রহণযোগ্য ছিল। আসলে আর্নল্ডের পরবর্তী সময়ের প্রধান সমালোচকেরা মূলত ঐতিহাসিক দৃষ্টিভঙ্গিতে সাহিত্য সমালোচনার বিবর্তনকে ধরার চেষ্টা করেছেন। নতুন কোনো প্রশ্ন তুলতে তাঁরা ব্যর্থ হয়েছেন।

মূলত Hulme এবং Pound-এর জিজ্ঞাসু সমালোচনার হাত ধরে প্রথম বিশ্বযুদ্ধকালীন প্রেক্ষাপটে সমালোচনার জগতে এক নতুন দিগন্ত উন্মোচিত হয়। প্রখ্যাত সমালোচক Matthiessen তাই যথার্থই বলেছেন—"There was no detailed intensive re-examination of the quality and function of poetry until the publication of the Sacred Wood in 1920."

এই প্রকাশনার মাধ্যমে এলিঅট ইংরেজি সাহিত্য সমালোচনার মূল ধারার অন্তর্ভুক্ত হন। এই ধারাটি সাধারণভাবে বেন জনসন এবং ড্রাইডেন থেকে স্যামুয়েল জনসন, কোল্‌রিজ ও ম্যাথু আর্নল্ড অবধি বিস্তৃত। এলিঅটের কাব্য সমালোচনার ক্ষেত্রে যে প্রত্যয়ী ঘোষণা আমরা শুনতে পাই— বিশেষত বিশ শতকে জন ডন ও মেটাফিজিক্যাল কবিতার পুনর্মূল্যায়নের মাধ্যমে, তার মধ্যে তাঁর নিজের কাব্যরীতিতে মেটাফিজিক্যাল ধারার আত্তীকরণের আভাস পাওয়া যায়। তিনি জোর দিয়ে তত্ত্বকথা বলতে পারেন তার প্রধান কারণ এই যে সেই সব তত্ত্বকে তাঁর কবিতার মাধ্যমে তিনি প্রয়োগ করে থাকেন।

এলিঅট এবং আর্নল্ডের মধ্যে প্রধান পার্থক্যের জায়গাটি হল এই যে আর্নল্ড কবিতার বিষয়বস্তু নিয়ে যেভাবে বিস্তারিত আলোচনা করেছেন আঙ্গিক নিয়ে তা করেননি। অপর পক্ষে এলিঅট কবিতার আঙ্গিকের দিকে বিশেষ দৃষ্টি দিয়েছেন। 'Burnt Norton' কবিতায় তিনি লিখেছেন :-

Only by the form, the pattern
Can words or music reach
The stillness.

তাই এলিজাবেথীয় নাট্যকারদের ওপর লেখা প্রবন্ধে তিনি নাটকগুলির বিষয়গত পর্যালোচনার মধ্যে প্রবেশ করেননি। বরং তিনি অনেক বেশি মনোযোগ দিয়েছেন নাটকগুলির অঙ্গিকগত বৈশিষ্ট্যগুলির বিশেষ সমীক্ষায়। এই সমালোচনার ধারণা প্রবর্তন করার বিষয়ে এলিঅটের ওপর হিউমের প্রভাব অনস্বীকার্য কারণ হিউমের মতে, কবিতায় বিষয়বস্তুর চেয়ে আঙ্গিক বেশি গুরুত্বপূর্ণ। হয়তো এইজন্য ১৯২৮ সালে *The Sacred Wood*-এর একটি সংস্করণের মুখবন্ধে এলিঅট কবিতার একটি বিশুদ্ধ আঙ্গিক-ভিত্তিক সংজ্ঞা দেন : "......excellent words in excellent arrangement and excellent metre."

সারা জীবন ধরে এলিঅট ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্যবাদের বিরুদ্ধে তাঁর প্রতিক্রিয়া জানিয়েছেন। বিশেষত তাঁর সমকালীন আমেরিকায় তখন ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্যবাদ অত্যন্ত জনপ্রিয় একটি ধারণা ছিল। এ-প্রসঙ্গে এমার্সনের 'Self-reliance'-এর ধারণা এবং আর্নল্ডের 'Burial life'-এর ধারণা তাঁর কাছে একেবারেই গ্রহণযোগ্য ছিল না। আসলে হিউমের প্রভাবে তিনি সাহিত্য ও ধর্মবিশ্বাসের একটি যোগসাধন করেছিলেন যার দ্বারা 'Original Sin' বা আদিম পাপের ধারণা মহান সাহিত্যকীর্তির সঙ্গে যোগ করে দেওয়া হয়। মানুষ প্রকৃতপক্ষে পাপী, অধঃপতিত এই ধারণা মানুষের অহংবোধকে নাশ করবে ও তার সীমাবদ্ধতাকে স্মরণ করিয়ে দেবে। এর ফলে মানুষ শৃঙ্খলা, নিয়ম, রীতি মেনে চলবে। এই শৃঙ্খলাপরায়ণতাই সাহিত্য সৃষ্টির প্রেরণা হিসেবে কাজ করবে ও শিল্পীকে মুক্তির স্বাদ দেবে।

এলিঅটের সাহিত্য সমালোচনার ভিত্তিভূমি তৈরি হয়েছিল তাঁর দুটি উল্লেখযোগ্য নিবন্ধে— 'Tradition and the Individual Talent' এবং 'The Function of Criticism' । এই দুটি নিবন্ধে তিনি একটি সজীব পরম্পরার ধারণা দেন এবং সেই সঙ্গে বস্তুনিষ্ঠ সমালোচনার আদর্শকে তুলে ধরেন যেখানে বলা হয় সাহিত্যকীর্তিকে গুরুত্ব দিতে হবে, স্রষ্টাকে নয়। এই ধারণাই পরবর্তী কালে 'New Criticism' আন্দোলনের মুখ্য প্রতিপাদ্য বিষয় হিসেবে গৃহীত হয়।

The Sacred Wood প্রবন্ধ সংকলনে এলিঅট-এর বহু কেন্দ্রীয় ভাবনা সংকলিত হয়েছে। যেমন 'The Perfect Critic' নিবন্ধে এলিঅট সৃষ্টি-কর্ম ও সমালোচনা-কর্মকে পরস্পরের পরিপূরক হিসেবে বর্ণনা করেছেন। তাঁর মতে সমালোচক ও স্রষ্টা একই ব্যক্তি হলে সুবিধে হয়। ভালো সমালোচকের মধ্যে ব্যক্তিগত আবেগজনিত অভিজ্ঞতার প্রকাশ ঘটে না। তাঁর লেখায় নৈর্ব্যক্তিক আবেগবর্জিত একটি দৃষ্টিকোণের প্রকাশ ঘটে। তাই প্রথম প্রবন্ধ থেকেই এলিঅট তাঁর নৈর্ব্যক্তিক তত্ত্ব বা 'Impersonality theory-র প্রয়োগ ঘটিয়েছিলেন। এই তত্ত্বের আলোকে প্রাচীন সমালোচকদের পর্যালোচনা করতে গিয়ে এলিঅট যেমন অ্যারিস্টটলের প্রশংসা করেছেন তেমনই কোল্‌রিজ-এর সমালোচনা করেছেন আবেগের আতিশয্যের কারণে।

তাঁর বহু প্রশংসিত প্রবন্ধ 'Tradition and the Individual Talent'-এ এলিঅট তাঁর অন্যতম মুখ্য ধারণা অতীতের বর্তমানত্ব বা 'Presentness of the Past' নিয়ে সুদীর্ঘ রসগ্রাহী আলোচনা করেছেন। এই একই বিষয় নিয়ে পনেরো বছর বাদে তিনি *After Strange Gods* গ্রন্থে বিস্তৃতভাবে আলোচনা করেন, এই গ্রন্থে তিনি চেষ্টা করেন সমালোচনার এমন একটি মানদণ্ড তৈরি করতে যার সাহায্যে সাহিত্য, ধর্ম, রাজনীতি, ব্যবহারবিধি, নৈতিকতা ও দর্শনের মূল্যায়ন করা সম্ভব হয়। অনেকটা বাইবেলের ঢঙে তিনি এই গ্রন্থের উপসংহারে ব্যক্তিত্বের বিনাশের প্রয়োজনীয়তার কথা উল্লেখ করেন সাম্য প্রতিষ্ঠার লক্ষ্য মাথায় রেখে। "And the word of the Lord came to me, saying son of man, these men have taken their idols into their hearts, and put the stumbling-block of their inequity before their face." এই উক্তির মধ্যে স্পষ্ট হয় যে, এলিঅটের সাহিত্যসমালোচনা ও সাহিত্যসৃষ্টির দুটি প্রক্রিয়াই একটি কেন্দ্রীয় ভাবনার দ্বারা প্রভাবিত যেখানে মানুষের স্বভাবকে তিনি পাপবিদ্ধ এবং সীমাবদ্ধ হিসেবে গণ্য করেন। তাই এই সীমায়িত সত্তাকে সাহিত্যের মধ্যে প্রকাশ করাকে তিনি তাঁর শিল্পতত্ত্বের বিরোধী প্রক্রিয়া হিসেবে গণ্য করেন।

অবশ্য এই ধরনের ধারণাগত প্রয়োগের ক্ষেত্রে স্পষ্টতার অভাব রয়েছে এবং তা সাহিত্যের সীমা অতিক্রম করে অতীন্দ্রিয়বাদ ও দর্শনের রাজ্যে প্রবেশ করে। এলিঅটের বিশ্বাস ও কবিতার আলোচনার ক্ষেত্রে তাঁকে অনেকখানি অগোছালো মনে হয়। যেমন দান্তের পর্যালোচনার সময় এলিঅট বলেন যে কবির মতবাদ বা জীবনদর্শন তাঁর কবিতার রসাস্বাদনের ক্ষেত্রে কোনো ভূমিকা পালন করে না। আবার যখন শেলির কাব্যধারার বিশ্লেষণ করেন তখন এলিঅট কবির মতবাদের সমালোচনায় ব্যাপৃত হন, বলেন—'repellent ideas' এমনকি ব্যক্তি মিলটনের প্রতি তাঁর অনীহা কবি মিলটনের কাব্যসমালোচনাকেও প্রভাবিত করে, হয়তো পক্ষপাতদুষ্ট করে।

সাহিত্যের নান্দনিক স্বাতন্ত্র্যের ধারণাটি এলিঅট সমর্থন করেন এবং ধর্ম ও দর্শন থেকে তার পৃথক অস্তিত্বকে স্বীকার করেন। তবে এর সঙ্গে সঙ্গে তাঁর লক্ষ্য হয় সমালোচনার

ক্ষেত্রেও একটি স্বয়ংসম্পূর্ণ মানদণ্ড প্রস্তুত করা যার সাহায্যে অনুরূপ সাহিত্যকর্মের যথাযথ মূল্যায়ন সম্ভব হয়। আবার এই সময় তাঁর ধর্মীয় ও সামাজিক চেতনার উন্মেষ বিশুদ্ধ নান্দনিক চেতনার প্রসারে বাধা হয়ে দাঁড়ায়। এই বিপরীতমুখী চেতনার দ্বন্দ্ব এড়িয়ে একটি সমন্বয়ী দর্শন গড়ে তোলার জন্য বিশের এবং তিরিশের দশকে এলিঅট বিশেষ সচেষ্ট ছিলেন।

সাহিত্যসমালোচক হিসেবে এলিঅট কোনো স্বয়ংসম্পূর্ণ এবং পূর্ণাঙ্গ বিশ্লেষণী দর্শন প্রতিষ্ঠা করে যাননি। এমনকি তাঁর অতি পরিচিত কিছু বাক্যাংশ যেমন 'objective correlative' বা 'diret sensuous apprehension of thought' সেভাবে প্রচার ও প্রসারের উদ্দেশ্যে তিনি ব্যবহার করেননি। সাধারণের মনে একটি ভ্রান্ত ধারণা আছে যে এলিঅট বুঝি Metaphysical কবিকুল এবং গৌণ এলিজাবেথীয় নাট্যকারদের অবিমিশ্র প্রশংসা করেছেন। প্রকৃতপক্ষে তিনি প্রশংসা ও দোষারোপের প্রক্রিয়াদুটির মধ্যে একটি সুন্দর ভারসাম্য বজায় রেখেছেন। এলিঅট-এর সমালোচনাধারার একটি উল্লেখযোগ্য বৈশিষ্ট্য হল নমনীয়তা। কোনো কিছুকেই তিনি অনিবার্য হিসেবে গ্রহণ করেন না। বরং সময়ের সঙ্গে অনেক প্রচলিত ধারণার পরিবর্তন ও পরিবর্ধনে তিনি বিশ্বাস রাখেন। তাঁর একটি প্রবন্ধ 'Shakespearean Criticism, from Dryden to Coleridge'-এ তিনি লিখেছেন— "It would be imprudent to say that we are approximating towards a final goal of understanding, after which there will be nothing new to be said." যে-কোনো গ্রন্থ বা লেখক সম্পর্কে তাঁর অভিমত অতি সাবধানী এবং অনেক ক্ষেত্রেই সম্ভাব্যতার বেড়াজালে আবদ্ধ। এই সতত সংযমী প্রতিক্রিয়া অনেক সময়ে পাঠকের মনে বিরক্তির জন্ম দেয়।

প্রসিদ্ধ সমালোচক Muriel Bradbrook অত্যন্ত দক্ষতার সঙ্গে সাহিত্য সমালোচক হিসেবে এলিঅটের সীমাবদ্ধতার কথা তুলে ধরেছেন: "The influence of Mr. Eliot as a critic must surely be noted rather in the history of taste than in the history of ideas......Eliot employs criticism not to the communication of truths but to the co-operative delineation of the poetic experience." সাহিত্যসমালোচক হিসেবে তাঁর এই ত্রুটি হয়তো তাঁকে ক্রোচের মতো এক নন্দনতত্ত্বের দার্শনিক হিসেবে স্বীকৃতি দেয়নি। আবার এই সীমাবদ্ধতা হয়তো তাঁকে কাব্যরসের এক মহত্তর গুণগ্রাহী হিসেবে প্রতিষ্ঠা দিয়েছে।

সাহিত্যরস আস্বাদনের ক্ষেত্রে পাঠকের যোগ্যতার মাপকাঠি নির্ধারণের ক্ষেত্রে এলিঅটের ভূমিকা বিংশ শতাব্দীতে আর কোনো সমালোচক এত ব্যাপকভাবে পালন করেননি। ইমপ্রেসনিজম্-এর ধারাকে উপেক্ষা করে একটি বিশুদ্ধ বিশ্লেষণাত্মক ধারার উদ্ভাবন ও প্রয়োগের ক্ষেত্রে তাঁর অবদান অনস্বীকার্য। যদিও মিলটন শেলি এবং বায়রনের মতো কবিদের ক্ষেত্রে হয়তো তিনি যথার্থ মূল্যায়নে বিরত থেকেছেন কিন্তু মেটাফিজিক্যাল ও অগাস্টান কবিদের পুনর্বাসনে তিনি অগ্রণী ভূমিকা গ্রহণ করেছেন।

সাহিত্যসমালোচক হিসেবে এলিঅট-এর মুখ্য বৈশিষ্ট্যগুলি প্রকৃতপক্ষে তাঁর কবিসত্তার অপরিহার্য বৈশিষ্ট্যগুলির সাথে সমার্থক। তাঁর তত্ত্বগুলির বাস্তব রূপদানের ক্ষেত্র হিসেবে তাঁর কবিতাগুলি লেখা হয়েছে। বিখ্যাত এলিয়ট-সমালোচক F. O. Matthiessen এই প্রসঙ্গে বলেছেন—"His criticism steadily illuminates the aims of his verse, while his verse illustrates many aspects of his critical theory."

এখন প্রশ্ন, এলিঅটকে কী ধরনের সমালোচক হিসেবে গণ্য করা হবে? প্রখ্যাত সমালোচক John Crowe Ransom তাঁকে ইতিহাসনিষ্ঠ সমালোচক বলেছেন কারণ তিনি সাহিত্য উপলব্ধির ক্ষেত্রে ইতিহাস চর্চার প্রয়োগ করেছেন। তাঁর মতে, এলিঅট ড্রাইডেন ও স্যামুয়েল জনসন-এর মতোই সমালোচক পণ্ডিত। এলিঅট এমন এক কাব্যচর্চার ধারার অনুসন্ধান করেছেন যা ইউরোপীয় কাব্যের ট্র্যাডিশনকে ভিত্তি করে গড়ে উঠেছে। স্বভাবতই ইতিহাসনিষ্ঠ-সমালোচনার প্রবণতাই তাঁর লেখায় প্রতিফলিত হয়েছে। তাই Ransom-এর মতে এলিঅট যে-কোনো সাহিত্যকর্মের নান্দনিক গুরুত্ব নিয়ে সেভাবে যত্নশীল নন। তিনি অনেক বেশি মনোযোগী সাহিত্যকর্মকে ট্র্যাডিশনের আলোয় বিচার-বিশ্লেষণ করার কাজে।

এতসব সমালোচনার পরেও এলিঅট এক শক্তিশালী সাহিত্য সমালোচক হিসেবে স্বীকৃত কারণ সাহিত্য পাঠের ক্ষেত্রে তিনি তুলনামূলক বিচার ধারার সঠিক প্রয়োগ করেছেন। যেমন A. C. Swinburne-এর কবিতা বিশ্লেষণের সময় তিনি তাঁর কাব্যধারার অনুসারী অন্যান্য কবিদের সাথে তাঁর কবিতার তুলনামূলক আলোচনা করেছেন। তবে কোনো সামগ্রিক সাধারণ পর্যবেক্ষণ এলিঅটের সমালোচনায় অনুপস্থিত। বরং অর্ধ-সত্য বা প্রাসঙ্গিক-সত্য নিয়ে তিনি সন্তুষ্ট থেকেছেন। আর্নল্ডের কাব্যধারার 'Touchstone' পদ্ধতিটি এলিঅট তাঁর তুলনামূলক সাহিত্য সমালোচনার মাধ্যমে অনুসরণ করেছেন। র‍্যান্‌সমের ভাষায় বলতে হয়, "No critic proceeds so regularly by the technique of comparative quotation."

সাহিত্যসমালোচক হিসেবে এলিয়ট কীভাবে আত্মমূল্যায়ন করেছেন তা এ-প্রসঙ্গে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। তাঁর একটি উল্লেখযোগ্য প্রবন্ধ 'To Criticize the Critic'-এ তিনি সমালোচকদের চারটি শ্রেণি বিভাজন করেছেন। প্রথমে পেশাদার সমালোচককুল যাঁদের কাছে সাহিত্য সমালোচনা খ্যাতি অর্জনের সোপানমাত্র। উদাহরণ হিসেবে তিনি Sainte Beauve-এর নাম করেছেন। দ্বিতীয় শ্রেণিতে রয়েছেন এমন সমালোচকেরা যাঁরা অতীতের বিস্মৃত বা অবহেলিত লেখকদের পুনর্মূল্যায়ন করেন ও তাঁদের সাহিত্যকর্ম সম্বন্ধে পাঠকের আগ্রহ বাড়িয়ে তোলেন। উদাহরণ হিসেবে এলিঅট Saintsbury, Whibley এবং Arthur Quiller Couch-এর উল্লেখ করেছেন। তৃতীয় শ্রেণিতে রয়েছেন বিশুদ্ধ তাত্ত্বিক সমালোচকেরা, যেমন, W. P. Ker, I. A. Richards, William Empson এবং F. R. Leavis। সর্বশেষ দলে তিনি অন্তর্ভুক্ত করেছেন সাহিত্যিক সমালোচকদের। এই দলে স্যামুয়েল জনসন, কোল্‌রিজ, ড্রাইডেন, রেসিন্‌ এবং ম্যাথু আর্নল্ডের সঙ্গে এলিঅট নিজেকেও স্থান দিয়েছেন।

সাহিত্যসমালোচক হিসেবে এলিঅটের সার্বিক মূল্যায়নের ক্ষেত্রে তাঁর তিনটি পৃথক স্বরের উল্লেখ করা যেতে পারে। প্রথম স্বরটি বিংশ শতাব্দীর বিশের দশকে শোনা যায় যখন কবি এবং সমালোচক হিসেবে তিনি এক সমন্বয়ী দৃষ্টিভঙ্গি অর্জন করতে পেরেছিলেন। দ্বিতীয় স্বরটি তাঁর সমাজ ও ধর্ম-বিষয়ক আগ্রহী মনোভাবে শ্রুত হয়। যদিও এই স্বরটি তাঁর সমালোচক সত্তাকে সেভাবে স্বীকৃতি দেয়নি। সর্বশেষ স্বরটি এক ক্লান্ত প্রয়াস তাঁর সৃষ্টির আগ্রহকে নতুন জীবনদানের জন্য। যদিও এর মধ্যে সাফল্য সেভাবে পরিলক্ষিত হয়নি। এই তিনটি স্বর সমালোচক হিসেবে এলিঅটের বিভিন্ন পর্যায়কে সঠিকভাবে চিহ্নিত করে।

উপসংহারে উল্লেখ করা যেতে পারে কীভাবে এক প্রখ্যাত এলিঅট-সমালাচক George Watson তাঁর সমালোচনামূলক গ্রন্থ *The Literary Critics*-এ বিংশ শতাব্দীর এই মুখ্য সাহিত্য সমালোচকের মূল্যায়ন করেছেন। Watson লিখেছেন, "Eliot made English criticism look different, but in no simple sense. He offered it a new range of

rhetorical possibilities, confirmed in its increasing contempt for historical processes, and yet reshaped its notion of period by a handful of brilliant intuitions. It is not to be expected that so expert and professional an observer of poetry should allow his achievment to be more neatly classified than this."

এক কথায় এলিঅটের সাহিত্যসমালোচনার ধারা এক পরম প্রাপ্তির লক্ষ্যে পৌঁছোতে পেরেছে যখন তাঁর মধ্যে সমালোচক এবং সামাজিক অনুশাসনের প্রবক্তা— এই দুই সত্তা মিলেমিশে একাকার হয়ে গেছে।

ইমেজিসম ও ভর্টিসিজম কাব্য আন্দোলন ও তত্ত্বভাবনা

রবিন পাল

ইংল্যান্ড ও আমেরিকা সংশ্লিষ্ট এক পর্যায়ের কাব্য আন্দোলন সূত্রে পাঠকরা 'ইমেজিসম্' বা 'চিত্রকল্পবাদ' এবং 'ভর্টিসিজম' বা ঘূর্ণ্যবাদ কথাদুটির সঙ্গে পরিচিত হয়। তার পর অনেক রদবদল সাহিত্যে ঘটে গেছে কিন্তু এই দুই তত্ত্ব নিয়ে পণ্ডিতদের, পক্ষপাতীদের তর্ক মেটেনি। কেউ বলেছেন এসব হল রোমান্টিক আন্দোলনের মতো ইংরেজি ভাষা ও সাহিত্যে এক মৌহূর্তিক বিপ্লব (Graham Hough); কবিতায় ভুলভাল কিছু ঘটে যাচ্ছে তার অল্প স্বল্প প্রতিক্রিয়া (F.R. Leavis)। টি. এস. এলিঅট তাঁর লণ্ডনে কাব্যচর্চাকালীন পাউণ্ড-ঘনিষ্ঠতা স্মরণে রেখেও এই আন্দোলনকে 'সৃজন অপেক্ষা বিচারমুখ্য' হিসেবে অভিহিত করেছেন। হার্বার্ট রীড, যিনি নিজেই লিখেছেন কিছু ইমেজিস্ট কবিতা, মনে করেন, T.E. Hulme F.S Flint, H.D. (অর্থাৎ Hilda Doolittle) লিখেছেন আমাদের শতাব্দীর একমাত্র চিরস্থায়ী কিছু কবিতা, আবার *The Poetry of Ezra Pound* বইয়ের রচয়িতা Hugh Kenner মনে করেন পাউণ্ড ছাড়া যথার্থ ইমেজিস্ট আর কাউকে বলা যায় না, ইতিহাস বিচারে এ-আন্দোলনকে 'এক লাল হেরিং মাছ' ছাড়া অন্য কোনো গুরুত্ব দিতে তিনি নারাজ। অন্যদিকে 'ইমেজ'-তত্ত্ব নিয়েও মতভেদ আছে। কারো মতে ইমেজতত্ত্ব সনাতনী, প্রতীকবাদী নন্দনতত্ত্বের মতোই, তবে আধুনিকীকৃত (Frank Kermode), অথবা প্রতীকবাদী নন্দনতত্ত্বের বিরোধিতায় তড়িঘড়ি বাস্তবমুখী প্রতিক্রিয়া (Donald Davie)। কোনো আলোচক T.E. Hulme ও Ezra Pound-এর তত্ত্বের মধ্যে পার্থক্য দেখেন,অন্য কারো মতে হিউম-কথিত কথাবার্তার যোগ্য উদাহরণ মিলবে পাউণ্ডের কবিতাতেই। এমনকি ইমেজিস্ট কবিতা সংকলনে অংশগ্রহণকারীরাও এই আন্দোলনের প্রকৃতি ও গুরুত্ব বিষয়ে একমত নন।

সোজা সাপটা কথায় ইমেজিসম হল ইংল্যাণ্ড এবং আমেরিকা সংশ্লিষ্ট ১৯০৯ থেকে ১৯১৭ সাল ব্যাপী এক কাব্য আন্দোলন, যা টি.ই. হিউম-কথিত নন্দনতত্ত্ব দ্বারা প্রভাবিত, যার অগ্রগণ্য প্রবক্তা ছিলেন পাউণ্ড, যিনি এফ. এস. ফ্লিন্ট-এর সঙ্গে একটি ইমেজিস্ট ম্যানিফেস্টো লেখেন যেটি ১৯১৩-তে 'পোয়েট্রি' নামের পত্রিকায় প্রকাশিত হয়। পাউণ্ড ১৯১৪ সালে *Des*

Imagistes নামে প্রথম একটি কবিতাসংকলন প্রকাশ করেন যাতে ফ্লিন্ট, রিচার্ড অ্যালডিংটন, হিল্ডা ডুলিটল, ফোর্ড ম্যাডক্স ফোর্ড, জয়েস, অ্যামি লোয়েল এবং উইলিয়াম কার্লোস উইলিয়ামস্-এর কবিতা ছিল। ১৯১৪-র পর অ্যামি লোয়েল আন্দোলনের নেতৃত্ব দিতে থাকেন এবং *Some Imagist Poets*— এই নামে ১৯১৫, ১৯১৬, ১৯১৭-তে তিনটি সংকলন প্রকাশ করেন।

Natan Zach এই আন্দোলনকে তিনটি স্পষ্ট পর্বে বিভক্ত করতে চান। বিভাগগুলি হল— (১) হিউম-এর ১৯০৯ গোষ্ঠীর অস্পষ্ট, দ্রোহমুক্ত কবির দল, যারা বছর জুড়ে তাদের সোহো রেস্তোরাঁর আসরে শুষ্ক শক্ত কবিতার কথা বলতেন। (২) পাউণ্ডের অধিকতর উচ্চাশামুখী, যুযুধান ১৯১২-র দলবল। (৩) পাউণ্ড-পরবর্তী ইমেজিস্টগণ, মোহমুক্ত হয়ে যাদের পাউণ্ড Amygists নাম দেন, অ্যামি সোয়েসের নেতৃত্ব মনে রেখেই। ইয়েটস, এলিঅট, লরেন্স, উইলিয়ামস, ওয়ালেশ স্টিভেনস, ফ্রস্ট, ম্যারিয়ান মুর, স্যাণ্ডবর্গ, হার্ট ক্রেন— বিংশ শতাব্দীর অ্যাংলো-আমেরিকান এইসব আধুনিক কবিরা কোনো-না-কোনো সময় এই আন্দোলন স্পর্শ করে গেছেন। (Imagism and Vorticism/Natan Zach, *Modernism*, Ed. M Bradbury and J. McFarlane, Penguin, *1983*) জাখ্ আরও বলেন, ইংরেজি কবিতার এই আন্দোলন, অ-ইংরেজ জগতের সমকালীন বেশ কয়েকটি আন্দোলন— ভবিষ্যবাদী (Futurism), অনামাবাদী (Unanimism), প্রকাশবাদী (Expressionism) আন্দোলনের কথা মনে পড়িয়ে দেয়।

ইমেজিস্ট কবিতার বৈশিষ্ট্যের কথা তোলার আগে আরও কিছু ইতিহাসের কথা বলে নেওয়া দরকার, এই সূত্রেই বৈশিষ্ট্য বিবর্তনের কথা উঠবে। ১৯১২-র বসন্তে পাউণ্ড অনাবিষ্কৃত কয়েকজন কবির কবিতা প্রকাশের কথা ভাবছিলেন। তাঁরা হলেন—হিল্ডা ডুলিটল, রিচার্ড অ্যালডিংটন প্রভৃতি, যাঁদের পাউণ্ড Imagistes অ্যাখা দেন। হ্যারিয়েট মনরোকে এক চিঠিতে নিজের কিছু কবিতা প্রসঙ্গে an over-elaborate post-Browning 'Imagiste affair' কথা গুলি ব্যবহার করেন। এরপর Les Imagistes কথাটি ওঠে পাউণ্ডের Ripostes (অক্টোবর, ১৯১২) প্রসঙ্গে যাতে তিনি বলেন ইমেজিস্টরা হিউমের ১৯০৯-এর বিস্মৃত গোষ্ঠীর উত্তরসূরি। আসলে হিউমের কাব্যচিন্তাকে পরিচিত করাতে পাউণ্ডের ভূমিকা ছিল। হিউমদের কবিতা ক্লাব ১৯০৮ থেকেই সমাজ প্রথা পালনের ক্ষেত্রে কিছুটা রক্ষণশীল ছিল, পরে হিউম এই গোষ্ঠী ত্যাগ করে ফ্লিন্টের সঙ্গে আর একটি গোষ্ঠীতে যোগ দেন, যাঁরা জাপানি, হিব্রু এবং ফরাসি প্রতীকবাদী কবিতা আঙ্গিকের জন্যে পড়তেন, যাতে ইমেজারির প্রধান্য ছিল, যথার্থ ও যোগ্য শৈলী সন্ধানের ব্যাপার ছিল। পাউণ্ড এদের সভায় কখনও কখনও থেকেছেন। একবছর পর এ গোষ্ঠীর অপমৃত্যু, তারপর 'ফ্রিথ স্ট্রিট সন্ধ্যা গোষ্ঠী', এদের সূত্রেই নামডাক হল হিউমের। পাউণ্ড তখন তাঁর Ripostes কাব্যের শেষে হিউমের কিছু কবিতা রেখে দেন এবং School of Images প্রসঙ্গে কিছু অস্পষ্ট মন্তব্য পেশ করেন। পাউন্ড মনে করতেন হিউম যতটা তাত্ত্বিক ততটা সমর্থ কবি নন। যাহোক, এই Les Imagistes হল প্রাথমিক এক ধাপ। ইতিমধ্যে বেরুল 'পোয়েট্রি' পত্রিকা— পাউন্ড ছিলেন এই পত্রিকার বিদেশী প্রতিনিধি। পাউণ্ড থাকার ফলে, রবীন্দ্রনাথ, অ্যালডিংটন, এইচ. ডি. প্রমুখের কবিতা পত্রিকার জন্য পাবেন ভেবে মনরো খুশি হলেন।

মনরো 'পোয়েট্রি' পত্রিকার ১৯১২ নভেম্বর সংখ্যায় ইমেজিসম প্রসঙ্গে কিছু কথা বলতে গিয়ে ফরাসি কবিতা, মালার্মে ও তাঁর অনুবর্তীদের কথা টেনে আনলেন, তাদের সম্পর্কে ardent Hellenists কথাটি ব্যবহার করলেন। 'পোয়েট্রি'র জানুয়ারি সংখ্যায় পাউণ্ডের মন্তব্য

ছিল এ রকম— এখানে তরুণতম কবি গোষ্ঠী যাঁরা তাঁদের মেজাজ দেখে বলা যায় তাঁরা Imagistes। পাঠকদের অনুরোধে এ-পত্রিকার ১৯১৩, মার্চ সংখ্যায় পাউণ্ডকে লিখতে হল— 'A Few Don'ts by an Imagiste', আর ফ্লিন্ট লিখলেন— Imagisme, যাতে এই গোষ্ঠীর লক্ষ্যের কথা বলা হল। ফ্লিন্ট বন্ধুত্বপূর্ণ কিন্তু দূরত্বরাখা মন্তব্যে জানান, ইমেজিস্টরা চান— (ক) বস্তু (Thing) তা সে আত্মলীন বা বস্তুনিষ্ঠ যাই হোক তার প্রকাশ সরাসরি হওয়া বাঞ্ছনীয়, (খ) উপস্থাপনে অপ্রয়োজনীয় একটিও শব্দ ব্যবহার না করা, (গ) লয় (rhythm) প্রসঙ্গে বলা যায় এরা গীতল বাক্যংশে তা রাখবেন, তবে তালবাদ্য (metro nome) অনুযায়ী নয়। পাউণ্ড তাঁর এখানের লেখার 'ইমেজ' প্রসঙ্গে বললেন— এ হল ক্ষণমুহূর্তের বৌদ্ধিক ও অনুভবগত জটিলতার প্রকাশ। এর ব্যবহারে চাই মূর্ততা, তবে বিমূর্ততা বিপজ্জনক,কিন্তু ইমেজিস্টদের স্বাতন্ত্র্য কোথায় তা বলা হল না। 'পোয়েট্রি অ্যান্ড ড্রামা' এবং 'দ্য নিউ ফ্রি ওম্যান' এ-সম্পর্কিত বক্তব্যকে তুলে ধরল। এই শেষোক্ত পত্রিকাই হয়ে উঠল ইমেজিস্টদের নিজস্ব পত্রিকা। পাউণ্ড এই পত্রিকা এবং অন্য কয়েকটি পত্রিকা সূত্রে অনেক অখ্যাত কবিকে নিয়ে এলেন পাদপ্রদীপের আলোয়। এক সময় পাউণ্ড আবহে এসে পড়লেন অ্যামি লাওয়েল যিনি ইমেজিস্ট কবিদের সঙ্গে যোগাযোগ রেখে ছিলেন। পূর্বোক্ত 'দ্য নিউ ফ্রি ওম্যান' পত্রিকায় এক গুচ্ছ ইমেজিস্ট কবিতা প্রকাশ পেল ১৯১৩, সেপ্টেম্বরে। শেষ পর্যন্ত 'দ্য গ্লোব' পত্রিকার পৃষ্ঠপোষকতায় পাউণ্ডের উদ্যোগে এই পত্রিকাতেই বেরুল অনেকগুলি সমসূত্রের কবিতা—Les Imagistes : An Anthology এই নামে, কিন্তু এই কবিতাগুলি প্রকাশিত হবার পর পরই পাউণ্ড এ-ব্যাপারে অনাগ্রহী হয়ে পড়েন, এবং অন্য এক আন্দোলন, কবিতা নয় চিত্রকলা বিষয়ক আন্দোলনে উৎসাহী হয়ে ওঠেন। নতুন বন্ধু হলেন পার্শি উইন্ডহ্যাম লিউয়িস এবং হেনরি গদিয়ের ব্রজেস্কা। সে সময় চিত্রকর কবিদের মধ্যে ভবিষ্যবাদ নিয়ে আগ্রহ জেগেছে। ভবিষ্যবাদ সনাতনী ও প্রথাবদ্ধ শিল্পরীতি ভাঙতে চায়, কিন্তু কেউ কেউ ভবিষ্যবাদে ভরসা পেলেন না। তাঁরা অর্থাৎ লিউয়িস,গদিয়ের, হিউম প্রভৃতিরা চাইলেন নতুন এক আন্দোলন, নাম দেওয়া হল— Vorticism যা কবিতা ও চিত্রকলার যৌথ আন্দোলন। পাউণ্ড এবং হুয়েকার এ-বিষয়ে নানাস্থানে বক্তৃতা দিতে লাগলেন, একটা হল ভাড়া নেবার কথা হল যেখানে পাঠ ও বক্তৃতা হবে, একটা পত্রিকা বার করা হল, নাম হল— Blast। উদ্বোধনী চা-পার্টিতে এরা ঠিক করলেন সম্পাদকীয় নীতি, আর কাদের বিরুদ্ধে ধ্বংসাত্মক কথা বলা হবে, এবং কাদের প্রশংসা করা হবে তা ঠিক হল। প্রথম দুটো সংখ্যায় বিস্ফোরণ ছিল বার্গসঁ, রবীন্দ্রনাথ প্রমুখের প্রতি। কৃপাবর্ষণ ছিল ইংরেজি রসিকতা, ফরাসি পর্নোগ্রাফি, ফরাসি নারী, জয়েস প্রভৃতির প্রতি। এগারো জনে সই করে ম্যানিফেস্টো বার করলেন, পাউণ্ডের কিছু কবিতা ছিল (যেমন— Salutation the Third) কিছু সংখ্যায় রেবেকা ওয়েস্টের গল্প, এলিঅটের কবিতা, এপস্টাইনের কাজ থাকলেও পত্রিকাটির মেজাজ ছিল তীব্র, আক্রমণাত্মক, নিম্নরুচির। পাউণ্ড ১৯১৪-য় তাঁর লেখায় বলছিলেন ইমেজিসম এবং ভর্টিসিজম সমার্থক। তবে ভর্টিসিজম এর বিরূপ সমালোচনাই হয়েছিল বেশি। অ্যামি লাওয়েল দ্বিতীয়বার লণ্ডনে এসেই ব্যাপার সাপার দেখলেন, ১৯১৪ থেকে ১৯১৭-য় লিখলেন— আমাদের ছোট্ট গোষ্ঠী ভেঙে গেছে, ইমেজিস্ট সংকলন সূত্রে তীব্র হিংসা ফেটে পড়েছে, বেচারা এজরা এমন একটা হাস্যকর আন্দোলনে জড়িয়েছে, লোকজনকে গাল দিয়ে, অশালীন কবিতা লিখে সে খ্যাতি হারিয়েছে। লাওয়েল লণ্ডনে ফেরার পর পত্রিকার জন্য টাকা না দিতে চাওয়া নিয়ে পাউণ্ডের সঙ্গে ঝগড়া হয়, পাউণ্ড লাওয়েলকে বাদ দিয়ে

অ্যালডিংটনদের নিয়ে একটি কবিতা সংকলন প্রকাশ করতে চাইলেন। অ্যালডিংটনও এক সময় বিরক্ত হয়ে ওঠেন পাউণ্ডের পাগলামিতে। ১৯১৪ থেকে ১৯১৭ -তে ইমেজিসম্ আন্দোলন চলে লাওয়েল ও তাঁর অনুগামীদের দ্বারা। এখানেও পাউণ্ড তৈরি করেন নানা ঝামেলা, শেষ পর্যন্ত লাওয়েল প্রকাশ করলেন *Some Imagist Poets* নামে একটি সংকলন ১৯১৫-তে। এখানে পাউণ্ডের কবিতা ছিল না, অ্যালডিংটন, এইচ. ডি., ফ্লিন্ট, লাওয়েল, ফ্লেচার ও লরেন্স— এই ছজনের কবিতা ছিল, তবে পাউণ্ড-প্রভাবিত এক দীর্ঘ ভূমিকা ছিল তাতে বলা হল— (ক) সাধারণ্যে প্রচল ভাষা, উপযুক্ত শব্দ ব্যবহার করা হবে, এবং আলঙ্কারিক শব্দ বর্জিত হবে। (খ) নতুন রিদম চাই, নতুন মুডের জন্য। মুক্ত ছন্দে (free verse) -র ওপর জোর দেওয়া হবে না, এটাই একমাত্র মুক্তির পথ নয়। অবশ্য কবি ব্যক্তিত্বের একত্ব মুক্তছন্দে প্রকাশ পায় বেশি মাত্রায়। (গ) বিষয় নির্বাচনে থাকবে পুরো স্বাধীনতা। আধুনিক জীবনের শৈল্পিক মূল্যে আমরা বিশ্বাসী। (ঘ) আমরা ইমেজ উপস্থাপনে চিত্রশিল্পের দ্বারস্থ হব না, আমরা মহাজাগতিক (Cosmic) কাব্যের বিরোধী। (ঙ) কবিতা হবে কঠিন, স্পষ্ট, কখনই অস্পষ্ট, অনির্দ্দিষ্ট নয়। (চ) কবিতার আসল কথা— মনঃসংযোগ। আমেরিকায় অতি দ্রুত, ইংল্যাণ্ডে একটু ধীরে এই কবিতা সংকলনের বক্তব্য জনপ্রিয় হয়ে উঠল। The Egoist পত্রিকা ইমেজিস্ট সংখ্যা বার করল, পরপর আরো দুটো ইমেজিস্ট কবিতার সংকলন বেরুল। ১৯১৭-য় লণ্ডনে ইমেজিস্ট কবিতা সম্পাদনার দায়িত্ব এসে পড়ে এইচ. ডি.-র ওপর। বেশ কয়েকটি আমেরিকান পত্রিকা এবং প্রকাশনার সঙ্গে যোগ থাকায় লাওয়েল-এর ওপর ইমেজিস্ট কবিতা সংকলনের মুখ্য দায়িত্ব এসে পড়ে। তখন শুধু এই সংকলন নয়, আন্দোলন প্রসারে অ্যালডিংটন বক্তৃতার ব্যবস্থা করলেন, ফরাসি দেশেও এই আন্দোলন ছড়িয়ে দেওয়া হল। পাউণ্ড প্রথমে ক্ষিপ্ত হলেও শেষ পর্যন্ত ইমেজিস্ট ও ভর্সিসিস্ট আন্দোলন যে এক একথা লিখতে লাগলেন নানা পত্রিকায়।

লক্ষণ ও বৈশিষ্ট্যের দিক থেকে ইমেজিস্ট কবিতার সংজ্ঞা দিতে গিয়ে বলা হয়েছে যে, এতে থাকবে—'a belief in the short poem, structured by the single image or metaphor and a rhythm of cadences, presenting for direct apprehension by the reader an object or scene from the external world, and refusing to implicate the poem's effect in extended abstract meaning.' [*Princeton Encyclopedia of Poetry and Poetics*, Ed. by Alex Preminger, Macmillan, 1986 edn. pg. 377]

১৯১৪ থেকে ইমেজিস্ট আন্দোলন শুরু, অ্যামি লাওয়েলের প্রাধান্য ক্রমবর্ধমান, তাই পাউণ্ড শ্লেষ করে তৎকালীন আন্দোলনকে 'amygism' অ্যাখ্যা দেন। এই পর্যায়ে তাত্ত্বিক ব্যাখ্যানের মুখ্য দায়িত্ব এসে পড়ে অ্যালডিংটনের ওপর। তিনি, পাউণ্ডের মতোই জোর দিলেন কবিতার ভাষার ওপর, বললেন চাই যথার্থ শব্দ, কারণ মহান কবিতা মাত্রেই যথার্থ শব্দ- নির্ভর, এর ওপর আমরা বেশি জোর দিতে চাই। তিনি কবিতার কাঠিন্যের (hardness) কথা বললেন। আরও বললেন, 'বিষয়ের সরাসরি ব্যবহারের কথা— বস্তু ও অনুভবের আবহকে কোনো মন্তব্য ছাড়াই তুলে ধরতে হবে।' পঁচিশটি শব্দে নারীর বর্ণনা না করে, ইমেজিস্টরা পছন্দ করবেন তাকে একটি ইমেজ-এ ধরতে। পাউণ্ড এবং অ্যালডিংটন দুজনেই দূরে রেখেছিলেন প্রতীকবাদকে। অ্যামি লাওয়েল-এর মতবাদ বিষয়ে জনৈক সমালোচক বলছেন, এ মত নির্দিষ্ট করে ইমেজিসম এর বদলে সার্বজনীন প্ল্যাটফর্মে আগ্রহী করে তুলেছে কবিদের। [*Imagism*, Stanley K. Coffman, University of Oklahoma Press, 1951, pg. 170]

কিছু Imagist কবিতার উদাহরণ— আমরা নিচে সাজিয়ে দিলাম :

(ক) **ধ্যান**

যখন আমি সতর্ক হয়ে কুকুরের সন্ধানী স্বভাবের কথা ভাবি
আমি এই সিদ্ধান্তে আসতে বাধ্য হই
যে মানুষ শ্রেষ্ঠ প্রাণী।
যখন আমি মানুষের সন্ধানী স্বভাবের কথা ভাবি,
বন্ধু, আমি স্বীকার করি, আমি হতবুদ্ধি হয়ে যাই। [এজরা পাউণ্ড, অনুবাদ : অরবিন্দ গুহ]

(খ) **Oread**

ঘুরিয়ে জাগাও, সাগর তুমি
ঘুরিয়ে জাগাও সূঁচালো তোমার পাইনগুলো
আছড়ে দাও বিশাল তোমার পাইনগুলো
আমাদের ওই পাথর গুলোয়
সজোরে দাও সবুজ তোমার মোদের ওপর
ঢেকে ফেলো তোমার জলের পশম দিয়ে।

[এইচ. ডি. অনুবাদ : প্রাবন্ধিক]

এই দুটি কবিতার রচয়িতা ইমেজিস্ট আন্দোলনের অংশীদার, প্রখ্যাত কবি ও তাত্ত্বিক। কবিতাগুলি আকারে সংক্ষিপ্ত, রচনায় সাধারণ শব্দ ব্যবহৃত হয়েছে, কোনো বিমূর্ততা নেই, কোনো ব্যাখ্যান নেই। দুটিতেই একটি প্রসঙ্গ ঘিরে ভাবনা/কল্পনা আবর্তিত। ইমেজিস্ট কবিতার সার্থক উদাহরণ।

আলাদা ক'রে ভর্টিসিজম নিয়ে কিছু কথা বলা যেতে পারে। আধুনিক ব্রিটিশ শিল্প আন্দোলনের প্রকাশ এই ভর্টিসিজম-এ, ব্যাপ্ত বিকাশ ১৯১৩ থেকে ১৯১৫-র মধ্যে, বিখ্যাত লেখক, চিত্রশিল্পী উইন্ডহ্যাম লিউয়িস এই আন্দোলনের প্রধান ব্যক্তিত্ব। ১৯১৩ সালের অক্টোবরে শিল্প সমালোচক রজের ফ্রাই-এর সঙ্গে বিবাদের পর তিনি ওমেগা ওয়ার্কশপ থেকে বেরিয়ে আসেন, এটি পরিচালিত হত ব্লুম্‌স্‌বরি গোষ্ঠীর দ্বারা। লিউয়িসের সঙ্গী হলেন চিত্রকর Frederick Etchells, Cuthbert Hamilton এবং Edward Wadsworth; ১৯১৪-র মার্চে এঁরা গড়ে তোলেন বিদ্রোহী শিল্পকেন্দ্র, যাতে আকৃষ্ট হলেন আরও অনেক শিল্পী, যেমন— ভাস্কর Jacol Epstein এবং ইমেজবাদী কয়েকজন কবি—যারা পোস্ট-ইমপ্রেশনিজমের রক্ষণশীলতা বর্জন করেছিলেন পরিবর্তে তাঁদের পছন্দ ছিল জার্মান নন্দনতত্ত্ব, প্রকাশবাদ, ঘনকবাদ, ভবিষ্যবাদ, মাতিসের অলঙ্করণ শিল্প। Vortex কথাটি প্রথম অবশ্য ব্যবহার করেছিলেন পাউণ্ড, লণ্ডনের শিল্প বিশ্বে আভাঁ গার্দ মেজাজ বোঝাতে গিয়ে। এই কথাটি লিউয়িসেরও পছন্দ হল, তিনি আধুনিক নব্যশিল্পের সংহত প্রাণশক্তি বোঝাতে কথাটি ব্যবহার করতে চাইলেন। ভর্টিসিজম, তাই শিল্পে সক্রিয়তা, তাৎপর্য স্থাপনের, প্রয়োজনীয় আন্দোলন সূচনা করার, ব্যক্তি মনের প্রাণশক্তি প্রকাশের কথা বলে। ভর্টিসিস্ট চিত্রে এবং ড্রইং-এ পাই তীক্ষ্ণ রেখার ব্যবহার, কৌণিক বিমূর্ততা, কোনো বিশেষত্ব মনে না রেখে উপস্থাপন, যদিও এই সব চিত্রে আমরা পাব আধুনিক যন্ত্রজগতের, কলকারখানার ভূদৃশ্য। কফম্যানের মতে, ভর্টিসিস্টরা অধিকতর প্রাণশক্তি, উদ্দীপনা চান শিল্পে. তাঁরা অতীত ও ভবিষ্যৎকে বর্জনের বিপক্ষে, এবং বস্তুচিত্রে বিমূর্ততায় আগ্রহী। ইমেজিস্ট এবং ভর্টিসিস্ট দু-দলই ইমোশন ও ইনটেলেকট-এর সমন্বয়ে বিশ্বাসী। (পূর্বোক্ত, পৃ. ২০০-২০৫) সুতরাং দেখা যাচ্ছে ইমেজিস্ট ও ভর্টিসিস্ট রচনার মধ্যে মিল

আছে, তফাৎও আছে, অন্তত ছবির ক্ষেত্রে, ছবির নন্দনতত্ত্বে। কতকগুলি উদাহরণের সাহায্যে বিষয়টা বোঝা যেতে পারে :

ছবি
জানলা দিয়ে দৃশ্য কুসুম
হলুদ, ল্যাভেন্ডার
বদলে গেছে শ্বেত পর্দার—
গন্ধ স্বচ্ছতার—
বেলাশেষের সূর্যকিরণ
কাচের থালার উপর
কাচের সোরাই,পানপাত্র
উলটে রাখা, যার অদূরে
একটি চাবি শয়ান এবং
অমন শাদা শয্যা।

[উইলিয়ম কার্লস উইলিয়মস্ ; অনু. মানস রায়চৌধুরী]

পশ্চিম বাংলায় বা বাংলাদেশে ইমেজিস্ট বা ভর্টিসিস্ট আন্দোলন সে-ভাবে কোনো প্রভাব ফেলতে পারে নি। তবে বিষয় সামীপ্যে দু-একটি উদাহরণ পেশ করা যেতে পারে।

(ক) রঙ্গন সেজেছে ব'লে তাকে কেন বারোমাস সাজতে গুজতে হবে
শেফালি ঝরেছে ব'লে সারা বছর ঝরে যেতে হবে?
বসন্ত চলেছে, যাক, গ্রীষ্ম ও বর্ষার একই দাহ,
জলন্ত আগুন কিংবা ঝরে-পড়া জল একই লাভা,
যাকে কেউ তাপ বলে, কেউ বলে, শীতল ধাতব,

[তৈরি হয়েছে কি, ২য় স্তবক/তরুণ সান্যাল]

(খ) আমলকী গাছে ঠেস দিয়ে আছে শীত
উড়ে গেল তিনটে প্রজাপতি
একটি কিশোরী তার করমচা রঙের হাত মেলে দিল বিকেলের দিকে
সূর্য খুশি হয়ে উঠলেন,
তাঁর পুনরায় যুবা হতে সাধ হলো।

[নিসর্গ/সুনীল গঙ্গোপাধ্যায়]

(গ) অন্ধকার ভূমির পরে
নদীর জল এসো
ভস্মে চুল লুটিয়ে এসো
জাহ্নবীর ধারা
তিন সাগর সাত শিখর
মৃতজীবীর মাঠ
শব্দ না কি খনিত্র এ
ভিতরে খুড়ে দেখি
মৃতবীজের নবজাতক
বাঁচাতে পারো কি না

[ভস্ম ভেঙে উঠে এসো কিশলয়, ঘাস, ২য় ও ৩য় স্তবক/জয়া মিত্র]

(ঘ) জানালায় চাঁদ আজ সত্যি আবির মাখা ছবি।
ইচ্ছে হয় ফাল্গুনীর গুঁড়ো দিয়ে হৃদয় রাঙাই।
একটি শিশুর হাত বাড়াতে চেয়ে ও ফিরে অন্য কাজে লোভী
হয়ে যায়। আমি এক গোল টাকা নিয়ে শত পয়সা ভাঙাই।
মৃগ ওটা আর শশ নয়— বেশ সোনার মৃগ ও ভাবা যায়।
তাছাড়া হরিণী চিত্রা চিত্র..........চলে বেশ :
অর্জুনবনের শব্দ যে ধ্বনি বাজায়
কুরুক্ষেত্র থেকে নিয়ে দিচ্ছি আশ্লেষ।

[অমোঘ ফাল্গুন/সঞ্জয় ভট্টাচার্য]

সাইকোঅ্যানালিটিক ক্রিটিসিজম বা মনঃসমীক্ষণগত সমালোচনা

শান্তনু গঙ্গোপাধ্যায়

বৃহদর্থে তথাকথিত ফ্রয়েডীয় সমালোচনা বা ধ্রুপদি সাইকোঅ্যানালিটিক সমালোচনার উদ্দেশ্য শিল্পী ও শিল্পকর্মের সম্পর্ক আবিষ্কার ও স্বরূপসন্ধান এবং সেই সূত্রে স্থাপিত সম্পর্কের বিশ্লেষণ। স্বভাবতই এই সমালোচনা দূরকল্পী, এবং 'শিল্পী' বলতে স্রষ্টা ও নির্মাতা— উভয়কেই বোঝানো হচ্ছে এখানে; আর 'শিল্পকর্ম' বলতে রসসাহিত্য, চিত্রকলা, স্থাপত্য, ভাস্কর্য, সংগীত— সবই ধরে নিতে হবে। সাহিত্যক্ষেত্রে এই সমালোচনারীতি বিশ্লেষণ করে লেখক দ্বারা 'আবিষ্কৃত' চরিত্রসমূহ, লেখক-ব্যবহৃত ভাষা এবং সেইসব বস্তু যা পরিচিত 'ফ্রয়েডীয় বাক্‌প্রতিমা' নামে। এইভাবে ফ্রয়েডীয় প্রণালীতে একটি সাহিত্যচরিত্র বিশ্লেষিত হয় জীবন্ত ব্যক্তি হিসেবেই। অপরপক্ষে, জাক লাকাঁ (১৯০১-১৯৮১)-নির্দেশিত পদ্ধতি অনুযায়ী সাহিত্য বিবেচিত হয় লেখকের 'লক্ষণ' হিসেবে।

আপন সূত্রাদি প্রয়োগ করে সিগমুন্ড ফ্রয়েড (১৮৫৬-১৯৩৯) স্বয়ং রচনা করেন মনঃসমীক্ষণ-সংক্রান্ত চিত্তাকর্ষক বিশ্লেষণমূলক প্রবন্ধ। 'সাইকোঅ্যানালিসিস' কথাটিও ফ্রয়েড-এরই উদ্‌ভাবন, ১৮৯৬ খ্রিস্টাব্দে। *দি ইন্টারপ্রিটেশন অফ ড্রিমজ* (১৯০০) প্রবন্ধগ্রন্থে তিনি আলোচনা করেন ইডিপাস ও হ্যামলেট-এর মতো জটিল চরিত্রের। ফ্রয়েড-এর বিবেচনায় *হ্যামলেট*-এর মনোজাগতিক উৎস সোফোক্লেস-এর *ইডিপাস রেক্স*, অর্থাৎ অবদমিত শৈশবকালীন যৌন বাসনা। "মানবসমাজের আবেগময় জীবনে অবদমনের যে-যুগব্যাপী অগ্রগতি"— এরই মধ্যে দিয়ে আমরা বুঝতে পারি কীভাবে এদুটি নাটক একই কাঁচামাল ব্যবহার করেছে। ফ্রয়েড-এর বক্তব্য-অনুযায়ী *ইডিপাস রেক্স*-এ "শিশুর অভিলাষী কল্পনা যা সুপ্ত থাকে তা-ই আনা হয় বাইরে এবং সেটাই বাস্তবায়িত হয় যেমনটি হয়ে থাকে স্বপ্নে। *হ্যামলেট*-এ তা থাকে অবদমিত; এবং— ঠিক স্নায়বিক পীড়ার মতোই— আমরা তার অস্তিত্ব সম্পর্কে জানতে পারি দমনজনিত ফলাফল থেকে।" অন্যভাবে বলতে গেলে হ্যামলেট-ই বিলিতি মঞ্চে প্রথম আধুনিক মনোবিকারগ্রস্ত চরিত্র; সে এমন এক চরিত্র যে করতে পারে যে-কোনো কাজ "শুধুমাত্র সেই মানুষটির ওপর প্রতিশোধ নেওয়া ছাড়া যে তার পিতাকে হত্যা করে পিতার স্থান দখল করেছে মাতার পাশে, যে-মানুষটি তারই শৈশবের অবদমিত বাসনা

বাস্তবায়িত করে।" এককথায়, *হ্যামলেট* আমাদের সামনে তুলে ধরে গভীরভাবে অবদমিত ইডিপাস-এষণাই। ফ্রয়েড-কৃত *হ্যামলেট*-এর সংক্ষিপ্ত ব্যাখ্যা তুমুলভাবে সমালোচিত হয় শেকসপিয়র-বিশেষজ্ঞমহল দ্বারা, কিন্তু তৎসত্ত্বেও এই ব্যাখ্যাটি টিকে যায় নাটকটির অভিনব বিশ্লেষণ হিসেবে— উভয়বলতার এক চরম দৃষ্টান্ত— যা মনঃসমীক্ষণ ও সাহিত্যসমালোচনার সম্পর্কবিচারে আজও উল্লেখযোগ্য স্থান অধিকার করে রয়েছে।

দ্য থিম অফ দ্য থ্রি কাসকেটস (১৯১৩)-এ ফ্রয়েড-এর আলোচনার বিষয় *দ্য মার্চেন্ট অভ ভেনিস* ও *কিং লিয়র*-এর বিভিন্ন দিক, যেমন ব্যাসানিয়ো দ্বারা বেছে নেওয়া পোর্শিয়া-র প্রতিচিত্র রাখা ডালাবদ্ধ ঝুড়ি এবং লিয়র ও কর্ডেলিয়া-র মিলন-সাধন। *সম ক্যারেকটর-টাইপস মেট উইথ ইন সাইকোঅ্যানালিটিক ওয়ার্ক* (১৯১৫)-এ ফ্রয়েড বিশ্লেষণ করেন লেডি ম্যাকবেথ, রিচর্ড দ্য থার্ড এবং ইবসেন-এর রেবেকা ওয়েস্ট-কে [*রসমারশল্‌ম* (১৮৮৬) নাটকের নায়িকা]। ডস্টয়েভস্কি-র *দ্য ব্রাদরস কারামাজভ* (১৮৮০)-এরও বিশ্লেষণ করেন ফ্রয়েড এবং *ডিলিউশন অ্যান্ড ড্রিম* (১৯১৭)-এ ভিলহেল্‌ম জেনসেন-এর উপন্যাস *গ্রাদিভা*-র বিস্তারিত আলোচনা করেন। পরবর্তীকালে মনঃসমীক্ষক আর্নেস্ট জোনস (১৮৭৯-১৯৫৮) পূর্বসূরির হ্যামলেট -বিশ্লেষণ অনুসরণ করে রচনা করেন *হ্যামলেট অ্যান্ড ইডিপাস* (১৯৪৯), যা ইডিপাস কমপ্লেক্স-বিষয়টির গভীরে অনুসন্ধান চালায়।

ফলিত মনঃসমীক্ষণ এ-সম্পর্কিত সাহিত্যসমালোচনাকে দুটি প্রধান ভাগে বিভক্ত করে : প্রথমটিতে বিচার্য মনঃসমীক্ষণগত ধারণার 'উদাহরণ' হিসেবে সাহিত্য, এবং দ্বিতীয় ক্ষেত্রে, 'মনঃসমীক্ষণগত জীবনী'। আর্নেস্ট জোনস-এর *হ্যামলেট অ্যান্ড ইডিপাস* প্রথম ভাগটির উদাহরণ, যেহেতু এই গ্রন্থে ইডিপাস কমপ্লেক্স-এর বৈশ্বিকতাই প্রতিষ্ঠিত। ফ্রয়েড-এর আদি পর্যায়ের ব্যাখ্যার বিস্তৃত সমর্থনসূত্রে জোনস একথা প্রমাণ করতে প্রয়াসী হন যে কীভাবে শেকসপিয়র-এর নাটকের আবেদন হ্যামলেট-এর ইডিপাস সংঘাত দ্বারা ব্যাখ্যা করা যেতে পারে। জোনস-এর নিজের ধারণায় এর পেছনে শেক্সপিয়র-এর আপন অপূর্ণ ইডিপাস কমপ্লেক্স-ই এক্ষেত্রে প্রত্যক্ষ প্রকাশ লাভ করেছে। এই অচেতন ইডিপাস এষণা ক্রমশ ধ্বনিত হয় দর্শকের অচেতন এষণার সঙ্গে; আর সেটাই জোনস-এর মতে, নাটকটির বৈশ্বিক আবেদন ও কালোত্তীর্ণতার জন্য দায়ী। জোনস-এর ব্যাখ্যা যদিও বিশিষ্ট কিন্তু একাধিক হেত্বাভাসের ওপর প্রতিষ্ঠিত, এবং অনেকাংশে শেকসপিয়র-এর জীবন-সম্পর্কিত দূরকল্পনামূলক। হ্যামলেট-এর যে-অপূর্ণ ইডিপাস সংঘাত রয়েছে, একথা দাবি করার আগে আমাদের প্রথমে ধরে নিতে হবে যে হ্যামলেট এক 'বাস্তব' ব্যক্তি, মঞ্চের ওপর কোনো চরিত্র নয়। তাই, জোনস-কে জোর দিতেই হবে শেক্সপিয়র-এর মূল রচনার 'আপাতদৃষ্টিতে সত্য বলে প্রতীয়মানতা'-বিষয়ে এবং অগ্রাহ্য করতেই হবে সেই মূল রচনার সাহিত্যসম্মত ও নাটকীয় গুণাবলি। দ্বিতীয়ত, সমালোচককে একথা ধরেই নিতে হবে যে মূলরচনা লেখকের কোনো বিশেষ স্নায়বিক পীড়ার নিছক 'লক্ষণ'।

মনঃসমীক্ষণগত জীবনী-ধারণাটির কেন্দ্রীয় বীজটি এই যে মূলপাঠ লেখকের অচেতনের লক্ষণ। এই বিষয়টি আধুনিক পরিভাষায় উল্লিখিত 'সাইকোবায়োগ্রাফিকাল' পদ্ধতি বলে, এবং এখানে লেখকের অভিপ্রায় ও উদ্দেশ্য সাধন করতে-করতে বা আবিষ্কারের লক্ষ্যে সমালোচক দৃষ্টিনিক্ষেপ করেন লেখকের অনুপ্রেরণার পটভূমিতে, তাঁর উদ্দীপনার উন্মেষের আড়ালে, যুক্তিবুদ্ধির শিকড়ে। এ-পদ্ধতিটি অসামান্যভাবে প্রকাশিত লিভিংস্টোন লো-রচিত কোলরিজ-জীবনী *দ্য রোড টু জানাডু*-তে (১৯২৭)। কবির ব্যক্তিত্ব ও তাঁর কবিতার মধ্যে সম্পর্ক নিয়ে

পরীক্ষা চালান সি. এস. লুইস (১৮৯৮-১৯৬৩) ও ই. এম. ডব্লু. টিলিয়ার্ড (১৮৮৯-১৯৬২) এবং এ-ব্যাপারটি তাঁরা যৌথভাবে অভিহিত করেন 'দ্য প্যর্সোনাল হেরেসি' বলে। ১৯৩৪-এ সি. এস. লুইস 'দ্য প্যর্সোনাল হেরেসি ইন ক্রিটিসিজম'-শীর্ষক একটি সন্দর্ভ রচনা করেন *এসেইজ অ্যান্ড স্টাডিজ*-এ। সেই আমলে যে-বিশ্বাস প্রচলিত ছিল কাব্যজগতে— কবিতা কবিরই ব্যক্তিত্বের প্রকাশ আর তেমনটাই হওয়া উচিত— তার প্রতি অনাস্থা পোষণ করেন তিনি এই সন্দর্ভে। আলোচনা প্রসঙ্গে তিনি টিলিয়ার্ড-রচিত মিলটন-বিষয়ক একটি গ্রন্থের উল্লেখ করেন। তাঁর বক্তব্য-অনুযায়ী টিলিয়ার্ড ঘোষণা করেন যে যাবতীয় কাব্য কবিরই মনের অবস্থার পরিচায়ক। লুইস-এর সন্দর্ভের 'উত্তর' দেন টিলিয়ার্ড, আর-একটি সন্দর্ভে। তার 'প্রত্যুত্তর' দেন লুইস। এইভাবে চলতে থাকে। অবশেষে উভয় সমালোচক স্থির করেন যে প্রত্যেকেরই তিনটি করে রচনা দু-মলাটবন্দি হয়ে প্রকাশ হবে। ১৯৩৯-এ প্রকাশ হয় *দ্য প্যর্সোনাল হেরেসি*। মতপার্থক্য থাকা সত্ত্বেও দুই যথার্থ ধীমান ব্যক্তি কীভাবে যৌথ উদ্যোগে সত্য সন্ধান করতে পারেন এই রুচিমান, সুসংস্কৃত, সারবান ও ক্রমাগত উদ্দীপক গ্রন্থটি তার এক আদর্শ নমুনা হিসেবে বিবেচিত।

দ্য লাইফ অ্যান্ড ওয়ার্ক অফ এডগার অ্যালান পো : আ সাইকোলজিকাল ইন্টারপ্রিটেশন (১৯৪৯) গ্রন্থের রচয়িতা মারি বোনাপার্ট দাবি করেন যে-কোনো সাহিত্যরচনা কোনো-না-কোনো স্বপ্ন বা লক্ষণেরই অনুরূপ। আর তাই একটি সাহিত্যরচনার মধ্যে দেখা যায় লেখকেরই মনোবিকারের প্রকাশ। বোনাপার্ট দুটি ঘটনার উল্লেখ করেন যা অ্যালান পো-র জীবনে স্থায়ী ছাপ ফেলে যায়: এক, তাঁর মৃতা জননীর দৃশ্য এবং তৎপরবর্তী অবস্থায় জননীর প্রতি মোহাচ্ছন্ন হন তিনি; দুই, কোনো একটি রাত তিনি কাটান যক্ষ্মারোগগ্রস্ত এক আত্মীয়ার সঙ্গে একই ঘরে এবং তীব্র কামনা দ্বারা দগ্ধ হন। এই ঘটনা দুটি ঘুরেফিরে আসে পো-র কথাসাহিত্যে, যদিও ছদ্মবেশে। আর এগুলিই বুঝতে সাহায্য করে পো-র রচনার আড়ালে সদা-ক্রিয়াশীল অবদমিত বিকারগ্রস্ত শবকামুকতা। আর্নেস্ট জোনস-এর মতোই, বোনাপার্ট-ও পো-র জীবন ও কর্মে চিত্তাকর্ষক অনুসন্ধান চালান, কিন্তু সেইসঙ্গে তিনি কথাসাহিত্যের মূলপাঠ ও লেখকের জীবনীকে সরল সমীকরণে ফেলার সমস্যারও মোকাবিলা করেন। এই সমস্যারই মাত্রা বৃদ্ধি পায় যখন কোনো সাহিত্যরচনা ও স্বপ্নের মধ্যে সাদৃশ্যের সন্ধান করা হয়।

'ক্রিয়েটিভ রাইটরস অ্যান্ড ডে-ড্রিমিং' শীর্ষক সন্দর্ভে ফ্রয়েড দেখান কীভাবে বয়ঃসন্ধিকালীন কিশোর-কিশোরী ও প্রাপ্তবয়স্ক নারী-পুরুষের স্বপ্ন শিশুকালের খেলাধুলোর সঙ্গে সম্পর্কিত এবং কীভাবে উভয়ই প্রকাশ করে থাকে কাল্পনিক আশা-আকাঙ্ক্ষার পূরণ। আরও কয়েক ধাপ এগিয়ে ফ্রয়েড দাবি করেন দিবাস্বপ্ন ও সর্জনশীল সাহিত্যচর্চার মধ্যে সম্পর্ক বিদ্যমান। সর্জনশীল সাহিত্যচর্চা লেখকের অচেতন, শৈশবকালীন বাসনা চরিতার্থ করে তাঁর কল্পজগৎকে ছদ্মবেশে প্রকাশের পথ দেখিয়ে। অন্য কথায়, লেখক কল্পনার মাধ্যমে তাঁর সচেতন ও অচেতনভাবে এখন, একদিকে, লুকিয়ে রাখা বাসনা প্রকাশ করে থাকেন যার ফলে তারা একইসঙ্গে বৃহৎ জনমানসের কাছে গ্রহণীয় ও অধিগত হয়। এখন, একদিকে, কোনো সাহিত্যরচনা যদি স্বপ্নতুল্য হয়, তবে মনঃসমীক্ষণ এক আদর্শ ব্যাখ্যাকারী পদ্ধতি হতে পারে যা স্বপ্নের মাধ্যমে— ঘনীভবন, স্থানান্তরণ, পুনরধ্যয়ন ইত্যাদি দ্বারা— রচনাটি বিশ্লেষণ করতে পারে। এমনটাই বলেন লিয়োনেল ট্রিলিং (১৯০৫-১৯৭৫), *দ্য লিবরাল ইম্যাজিনেশন* (১৯৫০) গ্রন্থের অন্তর্ভুক্ত 'ফ্রয়েড অ্যান্ড লিটারেচার'-শীর্ষক প্রবন্ধে। আবার, অন্যদিক থেকে দেখলে, সাহিত্যরচনাকে

যদি দেখা যায় লেখকের অচেতন জগতে প্রবেশপথ হিসেবে, তবে একবার যদি সমালোচক চিনে নিতে পারেন লেখকের সুপ্ত স্নায়বিক বিকার, তবে মূলপাঠের মধ্যে লুকিয়ে থাকা যথাযথ প্রতীকগুলি সমালোচকের খুঁজে নেওয়া ছাড়া বিশ্লেষণের জন্য আর কিছু করার থাকে না। তাঁর বিশ্লেষণ যথার্থ কিনা, তা অনুমোদন করা, সেই বিশ্লেষণ সত্য বলে স্বীকার করা— সবই নির্ভর করে মূলপাঠে লুকিয়ে-থাকা প্রতীকসমূহ লেখকের অচেতন জগতের সঙ্গে খাপে-খাপে মিলে যাচ্ছে কিনা, তার ওপর। এবং অনিবার্যভাবে, সব ক্ষেত্রেই, সমালোচক খুঁজে পান বাঞ্ছিত প্রতীকসমষ্টি যা লেখকের ছদ্মবেশী, স্থানান্তরিত ও অবদমিত বাসনাকুসুমের পরিচায়ক। এইভাবে সমালোচকের ব্যাখ্যা হয়ে ওঠে বৃত্তাকার ও স্বয়ংসম্পূর্ণ।

ফ্রয়েড, জোনস ও বোনাপার্ট আদি পর্যায়ের প্রথম সারির মনঃসমীক্ষক এবং সাহিত্যের প্রতি তাঁদের আগ্রহ শুধুই সেটুকু পর্যন্ত যেটুকু পর্যন্ত সাহিত্যলেখকব্যক্তিটির মনোজগৎ প্রকাশ এবং মনঃসমীক্ষণগত ধ্যানধারণা অকাট্য ও বৈধ প্রতিপন্ন করে থাকে। 'সাহিত্যরস' বলতে আমরা যা বুঝি তার প্রতি কোনো আকর্ষণ বা তার সামান্যতম বিচার করার তাগিদ এঁরা বোধ করেন না। এঁদের প্রত্যেকেরই ব্যাখ্যা শেষ পর্যন্ত মূল রচনাটিকে নামিয়ে আনে লেখকের অচেতন জগতের বহিঃপ্রকাশ হিসেবে। অবশ্য ফলিত মনঃসমীক্ষণ শুধুই মনঃসমীক্ষকদের মধ্যে সীমিত ছিল না। একাধিক উল্লেখযোগ্য সাহিত্যসমালোচক মনঃসমীক্ষণের শরণাপন্ন হন একইভাবে।

যে-দুজন প্রধান বিশ শতকী সমালোচক ফ্রয়েডীয় ভাবনা দ্বারা বিশেষভাবে প্রভাবিত, তাঁরা লিয়োনেল ট্রিলিং (পূর্বোল্লিখিত গ্রন্থ ছাড়াও যাঁর অপর দুটি প্রখ্যাত গ্রন্থ : *দি অপোজিং সেলফ*, ১৯৫৫, ও *সিনসিয়ারিটি অ্যান্ড অথেনটিসিটি*, ১৯৭২) এবং এডমন্ড উইলসন (১৮৯৫-১৯৭২), যিনি *দি উন্ড অ্যান্ড দ্য বো* (১৯৪১) গ্রন্থে অসামান্যভাবে প্রকাশ করেন শিল্পীর শৈশব-অভিজ্ঞতাজনিত কোনো 'ক্ষত'-র সঙ্গে তাঁর শিল্পকর্ম ও সৃষ্টিক্ষমতার সম্পর্কের কথা। সাহিত্যসমালোচক ডি. এচ. লরেন্স্-ও প্রভাবিত ফ্রয়েড দ্বারা। ফ্রয়েডীয় প্রণালী ও সূত্রাদি দ্বারা গভীরভাবে প্রভাবিত আর-এক গুরুত্বপূর্ণ সমালোচক, এরিক এরিকসন (১৯০২-১৯৯৪)। ভিয়েনা সাইকোঅ্যানালিটিক ইন্সটিটিউট-এ শিক্ষাপ্রাপ্ত এরিকসন-কে বলা যেতে পারে 'সাইকোবোয়োগ্রাফি'-র অন্যতম পথপ্রদর্শক। জীবনীসাহিত্যের এই রীতিটি প্রায় চিকিৎসাশাস্ত্রীয় পদ্ধতিতে নিবিড়ভাবে বিচার করে আলোচ্য ব্যক্তির জীবন, এবং গুরুত্ব আরোপ করে তাঁর মনস্তাত্ত্বিক ক্রমবিবর্তনে। এর জন্য জীবনীকার প্রয়োগ করেন মনস্তত্ত্ব-বিষয়ক জ্ঞান ও সূত্রাবলি। উদাহরণ হিসেবে বলা যায় মার্টিন লুথার-এর যে-জীবনী রচনা করেন এরিকসন— *ইয়ং ম্যান লুথর* (১৯৫৮)— সেখানে ফ্রয়েড-কৃত আবিষ্কার ও তত্ত্বসমূহ তিনি বিশদভাবে ব্যবহার করেন লুথার-এর বয়ঃসন্ধিকালীন 'অস্তিত্বসংকট' বিশ্লেষণকালে। সাহিত্যে সাইকোবায়োগ্রাফি-র আরও দুটি উল্লেখযোগ্য দৃষ্টান্ত : লিয়ন এডেল-রচিত *হেনরি জেমস* (১৯৫৩-১৯৭২) এবং জাস্টিন কাপলান-এর *মার্ক টোয়েন অ্যান্ড হিজ ওয়ার্লড* (১৯৭৪)।

সাম্প্রতিক মনঃসমীক্ষণগত সমালোচনার বৈশিষ্ট্য যথেষ্ট। যেমন, *দি অ্যাংজাইটি অফ ইনফ্লুয়েনস* (১৯৭৩)-এ হ্যারল্ড ব্লুম এক অতীব মৌলিক ও তর্কসাপেক্ষ তত্ত্ব উপস্থাপন করেন ইডিপাস কমপ্লেক্স-ধারণাটি আশ্রয় করে। তিনি এই বক্তব্যই প্রকাশ করেন যে প্রত্যেক কবিই (বিশেষভাবে মিলটন থেকে) এক অর্থে 'অতি বিলম্বে আগত' এবং 'পূর্ববর্তী' কবিদের জন্য (বিশেষত যাঁরা মহান কবি) উৎকণ্ঠা দ্বারা পীড়িত। যেমন বলা যেতে পারে জনসাধারণ্যে

পরিগণিত একজন কবি বা কোনো অনুমিত কবি বর্তমানে গড়ে উঠছেন অতীতের মহান কবিদের ছায়ার আড়ালে। এই কবিটি সম্পর্কের বিচারে তাঁদের 'পুত্র', কিংবা বিশেষ একজনের 'পুত্র' বলা যায়, এবং এই সম্পর্কহেতু অবদমিত বোধ করে। ইডিপাস এষণার ধারণার মাধ্যমে ব্লুম ইঙ্গিত দেন যে এমনতর 'পুত্র' হয়ে ওঠে 'পিতা' কবির প্রতিদ্বন্দ্বী, যিনি 'লিঙ্গচ্ছেদী পূর্বগামী'। 'পুত্র' যেহেতু 'পিতা'-র কোনো-কোনো 'জনক' কবিতা বা কবিতাগুচ্ছ দ্বারা প্রভাবিত, তাই সে উভয়বল অনুভূতি বোধ করে, একইসঙ্গে ভালোবাসা ও অনুরাগ এবং ঈর্ষা ও ভীতি— এবং হয়তো কখনও, ঘৃণা। এই ভীতি ও ঘৃণার কারণ 'পিতা'-র বিরুদ্ধে বিদ্রোহ ঘোষণা এবং 'পিতা'-কে নস্যাৎ করার তাগিদ অনুভব করে সে, সচেষ্ট থাকে মৌলিক ও স্বায়ত্তাধীন হতে, তৎপর থাকে আপন 'কণ্ঠস্বর' খুঁজতে। *আ গ্লসারি অফ লিটররিটার্মস* (১৯৫৭)-এ এম. এচ. আব্রামস এই দুর্ভাগ্যজনক অবস্থাটির অতি সংক্ষিপ্ত বিশ্লেষণ করেন :

> অনুজ কবি অচেতনভাবে স্বায়ত্তশাসন ও অগ্রাধিকারবোধ টিকিয়ে রাখেন একটি জনক-কবিতা 'প্রতিরোধমূলকভাবে' পাঠ করে, এবং তা এমনভাবে করেন যাতে সেই কবিতাটি এমনই বিকৃত রূপ নেয় যে তাঁর নিজের পক্ষে সেটি সচেতনভাবে শনাক্ত করা-ও অসম্ভব হয়ে পড়ে। এতৎসত্ত্বেও, তিনি সেই বিকৃত জনক-কবিতাটি আপন ব্যর্থ প্রয়াস দ্বারা চূড়ান্ত মৌলিক কবিতায় রূপ দিতে তৎপর থাকেন; শ্রেষ্ঠ অর্বাচীন কবির পক্ষে যা সর্বাধিক অর্জন করা সম্ভব তা হল এমন এক 'শক্তিশালী' কবিতা রচনা করা যা 'অগ্রবর্তিতা'-র অলীক ধারণা প্রকাশ করে— অর্থাৎ এমন এক অলীক ধারণা যা বোঝায় যে সেই কবিতাটি সময় ও মহত্ত্ব— উভয়েরই বিচারে জনক-কবিতাটি থেকে এগিয়ে।

এ-প্রসঙ্গে ব্লুম ছটি বিকৃতকারী প্রক্রিয়ার কথা জানান (তাঁর ভাষায় 'রিভিশনারি রেশিয়োজ') যারা ক্রিয়াশীল থাকে অগ্রজ কবির রচনা পাঠকালে, এবং সেই প্রতিক্রিয়াগুলি ব্লুম ব্যাখ্যা করেন ফ্রয়েড-এর প্রতিরোধকারী পদ্ধতিগুলির আদর্শে। তিনি এই সিদ্ধান্তে আসেন যে একটি কবিতাকে কখনওই একান্তভাবে ('পোয়েম-ইন-ইটসেলফ') জানা সম্ভব নয় এবং যাবতীয় ব্যাখ্যাই শেষ পর্যন্ত 'জরুরি ভ্রান্তপাঠ', সমস্ত পাঠই ভ্রান্তপাঠ হতে বাধ্য।

দি অ্যাংজাইটি অফ ইনফ্লুয়েনস-এর পর বিভিন্ন কবিতা-সংক্রান্ত বিশদ ব্যাখ্যামূলক অনুসন্ধান করেন ব্লুম একাধিক গ্রন্থে : *আ ম্যাপ অফ মিসরিডিং* (১৯৭৫), *কাবালা অ্যান্ড ক্রিটিসিজম* (১৯৭৫) ও *পোয়েট্রি অ্যান্ড রিপ্রেশন* (১৯৭৬)।

মনঃসমীক্ষণগত সমালোচনার আর-একটি সম্প্রসারিত রূপ 'ইগো-সাইকোলজি', নর্মান এন. হল্যান্ড যার আলোচনা করেন *দ্য ডায়ানামিকস অফ লিটারেরি রেসপনস্* (১৯৬৮) ও *ফাইভ রিডরস্ রিডিং* (১৯৭৫)-এ। এই তত্ত্বটি পাঠক-মূলপাঠ মনস্তত্ত্ব-নির্ভর এবং এইভাবে পাঠক ও মূলপাঠের সম্পর্ক বিষয়ে দৃষ্টিনিক্ষেপ করে। জেফরসন ও রোবি-সম্পাদিত *মডার্ন লিটারেরি থিয়োরি*-তে (১৯৮২) এলিজাবেথ রাইট এ-প্রসঙ্গে বলেন : "হল্যান্ড এটি দেখেন লেখক ও পাঠকের মধ্যে নিবিড় সহযোগিতাময় দৃশ্য হিসেবে, যার ওপর ভিত্তি করে তিনি প্রতিবেদনশীল নন্দনতত্ত্ব প্রতিষ্ঠা করেন।" হল্যান্ড বিশ্লেষণ করেন যে কীভাবে একটি নির্দিষ্ট পাঠের প্রতি সাড়া দেন পাঠক এবং সেই সূত্রে তিনি বলেন যে কীভাবে পাঠক একটি মূলপাঠ ব্যবহার করেন অচেতন বাসনা পরিতুষ্ট করতে। আপাতভাবে এই তত্ত্ব হয়তো তেমন অভিনব নয়, অভিনব নয় তার প্রায়-নিদানিক পদ্ধতি, কারণ এটা বৌদ্ধিক বিচারে নিরাপদ ধারণাই বলা যায় যে বহু পাঠক একটি কাল্পনিক চরিত্রের মধ্যে নিজেদের 'শনাক্ত' করতে পারেন সহমর্মিতা

দ্বারা। সম্প্রতি হল্যান্ড অধিকতর গুরুত্ব সহযোগে বলেছেন যে পাঠকই কাজটা করেন, মূলপাঠ 'নয়'। পাঠকই পুনর্নির্মাণ করেন চরিত্রের পরিচয়।

এর থেকে আরও অনেক বেশি সূক্ষ্ম ও জটিল পদ্ধতি ও তত্ত্বাদি উপস্থাপন করেন জাক লাকাঁ (১৯০১-১৯৮১) ভাষা এবং অচেতনের সঙ্গে ভাষার সম্পর্ক-সংক্রান্ত পরীক্ষা-নিরীক্ষায়, মূলত দুটি গ্রন্থে : *ইক্রিটস* (১৯৭৭) ও *ফোর ফান্ডামেন্টাল কনসেপ্টস অফ সাইকো-অ্যানালিসিস* (১৯৭৭)। *ইক্রিটস*-এ তিনি গ্রন্থনবাদী ও উত্তর-গ্রন্থনবাদী তত্ত্বসমূহের নিরিখে ফ্রয়েড-কে পুনর্ব্যাখ্যার প্রয়াসী হন। এই তত্ত্বগুলি এতই জটিল এবং প্রায়শই এমন সঘন ও সংবর্তক গদ্যে রচিত যে এখানে সে-বিষয়ে দুটি কথা বলা ছাড়া আর কিছু বলার অবকাশ নেই। লাকাঁ-র মতে (ক) দ্যোতক ও দ্যোতিত মেলে না (যেমনটি দেখি সোস্যুর-এ); দ্যোতক যা কিছু উল্লেখ করে তা থেকে 'ভেসে বেড়ায় স্বাধীনভাবে', কারণ দ্যোতক অন্যান্য প্রতীকের প্রতীক (অর্থাৎ একটি প্রতীকী ভাষার মাত্রা, যে-ভাষা কখনওই 'বাস্তব' বা স্থিতিশীলভাবে ভিন্ন কিছুর উল্লেখমূলক নয়)। অচেতন স্বপ্নব্যাখ্যা-বিষয়ে এটাই মূলত ফ্রয়েড-এর অবস্থান। 'বাস্তব' ধারণাটি একসময় অপসৃত হয় এবং যা পড়ে থাকে তা শুধুই 'প্রতিকল্প'। (খ) দ্যোতককে লাকাঁ সুবিধাজনক স্তরে রাখেন সামাজিক ভূমিকাদি নামকরণের নিরিখে। লাকাঁ (ক) এর একটি উদাহরণ দেন এভাবে : একটি শিশু যখন 'প্রতীকী শৃঙ্খলা'-য় প্রবেশ করে তখন সে 'দর্পণ স্তর'-এ আত্মপরিচয় পেতে সমর্থ হয়, যে-স্তর বা পর্যায়ে নিয়ম ও আইন-ভরা পৃথিবী এবং সামাজিক গোষ্ঠীর ছবিটি স্পষ্ট, যে-পৃথিবী বা গোষ্ঠী কোনো-না-কোনোভাবে এক-একটি পিতৃপ্রতিম ব্যক্তিত্বের সঙ্গে সংযুক্ত। এই পরিচয় বা আত্মজ্ঞান 'নির্মিত' হয় পিতৃতান্ত্রিক প্রতীকী শৃঙ্খলায়। সুতরাং লাকাঁবাদী ধারণায় 'আমি' শুধুমাত্র হতে পারে দ্যোতক, কারণ তা একটি প্রতীকী জগতের সঙ্গে সম্পর্ক স্থাপন করে; তা কখনওই সুস্থির বাস্তবের সঙ্গে সংযুক্ত নয়।

লাকাঁ-র বক্তব্য অনুযায়ী ভাষার মর্মে অচেতন গ্রন্থিতই শুধু নয়, অচেতন আসলে 'ভাষারই ফল'। তাঁর মতে ভাষার সঙ্গে তাল মিলিয়ে অচেতন মূর্ত হয়ে ওঠে। অপরপক্ষে, ফ্রয়েড-এর বক্তব্য অনুযায়ী ভাষার প্রভাববিস্তারের পূর্বেও ছিল অচেতন। এই প্রসঙ্গে বর্তমান রচনার পরবর্তী অংশে কিছুটা বিস্তারিতভাবে আলোচনা করেছি। এখন মূল বিষয়ের সূত্র ধরে অন্যান্য বিষয়ে আলোকপাত করা আবশ্যক মনে হয়। তার আগে শুধু এটুকু বলা যেতে পারে যে, 'কলেকটিভ আনকনশ্যাস' ও 'আর্কিটাইপ'-সংক্রান্ত ইয়ুংগীয় মনস্তত্ত্ব এবং ইয়ুংগীয় তত্ত্বাদি যদিও মনস্তত্ত্বমূলক সমালোচনার ক্ষেত্রে ফলদায়ী প্রভাববিস্তার করেছে, কিন্তু ফ্রয়েডীয় তত্ত্বের তুলনায় তার ব্যাপ্তি কম।

কার্ল ইয়ুং (১৮৭৫-১৯৬১), ফ্রয়েড-এর প্রথম পর্বের সহযোগী ও পরে বিরুদ্ধ-মতাবলম্বী— নিখাদ ফ্রয়েডীয় পদ্ধতি থেকে স্বতন্ত্র ধারায় প্রতিষ্ঠা করেন বিশ্লেষণাত্মক মনঃসমীক্ষণ, যা পরে পরিণত হয় 'আর্কিটাইপাল' সমালোচনা হিসেবে। সাধারণভাবে 'আর্কিটাইপ' হল আদিম ও মৌলিক রূপ যা ব্যক্তির মনে উপস্থিত থাকে না সচরাচর, কিন্তু সেইখানে থাকে যা ইয়ুং-এর ভাষায় 'কলেকটিভ আনকনশ্যাস', যা আন্তর্সাংস্কৃতিক ও আন্তরৈতিহাসিক। এইসব 'আর্কিটাইপ' বা সুবিধাপ্রাপ্ত প্রতীকসমূহ, যেমন অ্যানিমা ও অ্যানিমাস (নারীত্ব ও পৌরুষ), পিউয়্যার ও সেনেক্স (বার্ধক্য ও যৌবন), এবং প্রতারণা শুধু যে ব্যক্তির অচেতনে ঘুরেফিরে আসে তা নয়, আমাদের পুরাণ-উপকথা ও সাহিত্যচরিত্রেও দেখা যায়।

আর্কিটাইপাল সমালোচনা-সংক্রান্ত সর্বাধিক প্রভাববিস্তারী কাজ, এবং সম্ভবত গত পঞ্চাশ বছরে ইঙ্গ-মার্কিন দুনিয়ায় এ-বিষয়ে পয়লা নম্বর কীর্তি নরথ্রপ ফ্রাই (১৯১২-১৯৯১)-রচিত

অ্যানাটমি অফ ক্রিটিসিজম। 'আর্কিটাইপ' ধারণাটি ফ্রাই ব্যবহার করেন সাহিত্যপ্রকার ও পন্থার শ্রেণিবিভাজন-সম্পর্কিত নিজস্ব প্রণালীর উন্নতিসাধনে। তাঁর মতে সাহিত্য চারটি 'বর্গীয়পূর্ব' আর্কিটাইপ বা বর্ণনাত্মক শ্রেণিতে বিভক্ত : 'দ্য মিথস অভ স্প্রিং : কমেডি', 'দ্য মিথস অফ সামার : রোমান্স', 'দ্য মিথস অফ অটাম : ট্র্যাজিডি ' ও 'দ্য মিথস অফ উইন্টর : আয়রনি অ্যান্ড স্যাটায়ার'। এই প্রতিটি মিথস (*mythos* ; pl. *mythoi*) ফ্রাই-এর বিচারে চালিত হয় এক বিশেষ বর্ণনাত্মক গঠন দ্বারা এবং শেষ পর্যন্ত অচেতন বাসনা পরিতুষ্টির প্রতিনিধিত্ব করে। ফ্রাই-এর পর এ বিষয়ে সাম্প্রতিককালে উল্লেখযোগ্য সমালোচনা টেড হিউজ-রচিত *শেকসপিয়র অ্যান্ড দ্য গডেস অফ কমপ্লিট বিইং* (১৯৯২)।

অবশ্য এটুকু বললেই আর্কিটাইপাল বা আদিপ্রতীকী বা আদিরূপী সমালোচনার সবটুকু বোঝা যায় না। মনঃসমীক্ষণগত সমালোচনার ওপর এর প্রত্যক্ষ প্রভাব না-পড়লেও মনঃসমীক্ষণগত সমালোচনার গতিপ্রকৃতি বুঝতে গেলে আদিপ্রতীকী সমালোচনা আরও কিছু ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণ দাবি করে।

সাহিত্যপ্রসঙ্গে 'আর্কিটাইপ' বলতে আমরা বুঝে থাকি পুনঃসংঘটনশীল কোনো বস্তু, ব্যক্তি, ক্রিয়া, রূপ বা অন্য কোনো পদার্থ যা স্থানিক বা কালিক ভিন্নতা সত্ত্বেও সাহিত্যরচনায় পাওয়া যায়। আদিপ্রতীকী সমালোচনার মূলে রয়েছে এই বিশ্বাস যে এক-একটি আলাদা সাহিত্যরচনার আকস্মিক বা আপতিক বিশদ বর্ণনার আড়ালে রয়েছে আদিপ্রতীকী বা আদিরূপী নকশা ও গঠনবিন্যাস, এবং এইসব সাহিত্যসম্মত আদিপ্রতীক থাকার ফলেই মূলরচনাগুলি অর্জন করতে পেরেছে যাবতীয় শক্তি ও গরিমা।

জিয়ামবাতিস্তা ভিকো, যোহান ভোলফগাং ফন গ্যোয়েটে ও এফ. ডব্লু. জে. শেলিং-এর রচনার উল্লেখযোগ্য পূর্বদৃষ্টান্ত যদিও বর্তমান, আদিপ্রতীকী সমালোচনা একান্তভাবে বিশ শতকী ঘটনা। বিশ শতকের দুই অন্যতম প্রধান চিন্তাবিদ দ্বারা এটির বিকাশ ও উন্নতি ঘটেছে, অন্তত প্রাথমিকভাবে; স্যর জেমস ফ্রেজার (১৮৫৪-১৯৪১) ও কার্ল গুস্তাফ ইয়ুং (পূর্বোল্লিখিত)।

ফ্রেজার-এর প্রধান কীর্তি : *দ্য গোল্ডেন বাও*, ১৮৯০ থেকে ১৯১৫-র মধ্যে যা বারোটি খণ্ডে প্রকাশ হয়। এই গ্রন্থে ফ্রেজার পরীক্ষা করেন বিভিন্ন দেশ-কালের বিপুল পরিমাণ অতিকথা— ক্লাসিকালপূর্ব কাল থেকে আধুনিক কাল পর্যন্ত, অস্ট্রেলিয়া ও এশিয়া থেকে ভূমধ্যসাগরীয় অঞ্চল ও আমেরিকা পর্যন্ত তার বিস্তার— এবং তা করতে গিয়ে তিনি প্রয়োগ করেন তুলনামূলক প্রণালী, সচেষ্ট থাকেন এদের একান্ত সাদৃশ্যগুলি চিহ্নিত করতে। ফ্রেজার ও তাঁর অনুগামীদের কীর্তির সচেতন বা অন্য উদ্দেশ্য ছিল একথা বোঝানো যে স্থানিক ও কালিক পার্থক্য যতই থাকুক না কেন, অতিকথা ও আচারানুষ্ঠান অনুসরণ করে পুনঃসংগঠনশীল নকশা। ফ্রেজার-এর কীর্তির স্থায়ী আদি প্রয়োগ যা দেখতে পাই সাহিত্যক্ষেত্রে, তা সবই কেমব্রিজ-এর ধ্রুপদি সাহিত্যের পণ্ডিতবর্গ কৃত। জেন হ্যারিসন (১৮৫০-১৯২৮), গিলবার্ট মারে (১৮৬৬-১৯৫৭), এফ. এম. কর্নফোর্ড (১৮৭৪-১৯৪৩) প্রমুখ চিন্তাবিদের মাধ্যমে আমরা দেখতে পাই ফ্রেজর-এর প্রেরণা জাজ্বল্যমান, যার ফলে ধ্রুপদি সাহিত্যরচনা নতুন দৃষ্টিতে পঠিত হতে থাকে। এঁরা এ-ব্যাপারে সহমত ছিলেন যে যেমনটি প্রাথমিকভাবে দেখা যায় ঋতুচক্রে, তেমনভাবেই আখ্যানমূলক অতিকথায় বারংবার বর্ণিত হয় মৃত্যুর ওপর জীবনীশক্তির জয়, আর এটাই কাব্য ও নাট্যের মূল কথা। যেমন, কর্নফোর্ড সচেষ্ট হন থুসিদিদিস-এর আখ্যানের অন্তর্গত অতিকথার নকশা খুঁজে বের করতে; বছরের দেবতার তুষ্টিসাধন দ্বারা

কৃষিজমি উর্বরা করার উদ্দেশ্যে যে-আচারানুষ্ঠান— তারই মধ্যে নিহিত গ্রিক কমেডির উৎস, এ-কথা প্রমাণ করার জন্য। গিলবার্ট মারে গ্রিক ট্র্যাজিডি-তে (এবং *হ্যামলেট*-এও) দেবতাদের মৃত্যু ও পুনর্জন্ম-বিষয়ক অতিকথার স্বরূপ সন্ধান করেন; *এনশেন্ট আর্ট অ্যান্ড রিচুয়াল* (১৯১৩) গ্রন্থে জেন হ্যারিসন এ-কথা জোর দিয়ে বলেন যে "শিল্পকলা ও আচারনুষ্ঠানের ... রয়েছে একই শিকড়, এবং একটি ছাড়া বোঝা যাবে না আর-একটি। প্রাথমিকভাবে একই আবেগ মানুষকে চালনা করে গির্জা ও থিয়েটারে যাবার জন্য।" এখানে আচারানুষ্ঠানকে তিনি বুঝতে সচেষ্ট একটি অতিকথার শিল্পিত পুনঃসংঘটন হিসেবে। এই পণ্ডিতবর্গ পরিচিত 'কেমব্রিজ রিচুয়ালিস্টস' নামে, এবং এঁদের কীর্তির দ্বারা প্রেরণা পান অন্যান্য সমালোচক ও পণ্ডিত, যাঁরা ক্রমে উৎসাহ বোধ করেন অতিকথার চরিত্র, আখ্যান ও পরিস্থিতির সাদৃশ্যের আলোকে বিপুল পরিমাণ সাহিত্যরচনা বিচার করতে।

ইয়ুং বলেন যে মানব-অচেতনে দুটি স্তর বিদ্যমান। একটি হল ব্যক্তিগত অচেতন, যার আধেয় সংগৃহীত হয় ব্যক্তিটির জীবনব্যাপী অভিজ্ঞতা অর্জনের মাধ্যমে। অপরটি যৌথ অচেতন বা 'কলেকটিভ আনকনশ্যাস' (এটিও পূর্বোল্লিখিত), যার আধেয় মানবজাতি উত্তরাধিকারসূত্রে পেয়ে থাকে এবং যা সাধারণভাবে বিদ্যমান। এই যৌথ অচেতন গড়ে ওঠে আদিম বা মৌলিক ভাব দ্বারা (আরও ভালোভাবে বলতে গেলে, গাঠনিক নকশা দ্বারা) যার অস্তিত্ব মানবসমাজের প্রথম দিন থেকেই। অবশ্য তারা আমাদের সচেতন মনে সরাসরি লভ্য নয়, এবং তাদের 'দেখা যায়', যখন তারা আচ্ছাদিত থাকে সচেতন মন ও সচেতন অভিজ্ঞতালব্ধ বস্তুসমূহ দ্বারা। ইয়ুং নিজে সর্বাধিক দৃষ্টিনিক্ষেপ করেন অ্যানিমা ও অ্যানিমাস— এ-দুটি আদিপ্রতীকের ওপর, এবং এছাড়া মা, শিশু, আত্ম ও প্রতিবিম্বের উপর। *ভান্‌ডলুংগেন উন্ড সিমবলে ডের লিবিডো* (১৯১১-১৯১২; *সাইকোলজি অফ দি আনকনশ্যাস*, ১৯১৬) গ্রন্থে ইয়ুং বিশ্লেষণ করেন হেনরি ও অডসওয়ার্থ লংফেলো-র 'হিয়াওয়াথা'-র; আর-একটি প্রবন্ধে ('অন দ্য রিলেশন অফ অ্যানালিটিকাল সাইকোলজি টু পোয়েটিক আর্ট'— ১৯২২-এ রচিত এই প্রবন্ধটি পরে সংকলিত হয় ১৯২৮-এ প্রকাশিত *কনট্রিবিউশনস টু অ্যানালিটিকাল সাইকোলজি* গ্রন্থে) তিনি বলেন যে এইসব আদিপ্রতীকের ফলপ্রসূ ব্যবহারের মাধ্যমে কবি তাঁর রচনাটি "সাময়িক ও ক্ষণকালীনতার ঊর্ধ্বে চিরকালীন স্তরে" উন্নীত করতে পারেন। ইয়ুং-এর প্রকল্প যদি স্বীকার করে নিই তবে ধরে নিতে হয় যে সমালোচনার একটি কাজ হল সাহিত্যরচনায় এইসব 'আদিম প্রতী ক'-এর উপস্থিতি আবিষ্কার করা, যারা বিশেষ-বিশেষ সাহিত্যরচনার আকস্মিকতা দ্বারা আচ্ছাদিত। এইরকম আবিষ্কারের জন্য অনুসন্ধান দেখি ইয়ুং-নির্ভর সমালোচনার আদি নমুনাগুলির মধ্যে, যেমন মড বডকিন-এর *আর্কিটাইপাল প্যাটার্নস ইন পোয়েট্রি* (১৯৩৪)। তাঁর গ্রন্থটি দেখা যেতে পারে ইয়ুং-এর প্রকল্পের বিচার হিসেবে (তাঁর গ্রন্থের সূচনাবাক্যটিই বলে ১৯২২-এ রচিত ইয়ুং-এর প্রবন্ধটির কথা), যে-প্রকল্পটি তিনি বোঝেন নৃতাত্ত্বিক অনুসন্ধানের আলোকে। বডকিন বলেন যে 'আদিপ্রতীকী নকশা'-কথাটি তিনি ব্যবহার করবেন সেই বিষয়টির প্রতি ইঙ্গিত করার জন্য, যা, গিলবার্ট মারে-র ভাষায়, লাফিয়ে উঠে সাড়া দেয় কোনো প্রাচীন বিষয়কে কাব্যে ফলপ্রদরূপে প্রকাশ করার খাতিরে। যে-প্রকল্পটি পরীক্ষাসাপেক্ষ, তা হল কাব্যে— এবং এখানে আমাদের বিশেষভাবে ধরে নিতে হবে ট্র্যাজিক কাব্য— আমরা চিনে নিতে পারি সেইসব কেন্দ্রীয় বিষয় যাদের রয়েছে বিশেষ গঠনবিন্যাস ও নকশা, যা টিকে থাকে যুগে-যুগে পরিবর্তনের মধ্যে, এবং যা সেইসব ব্যক্তির আবেগপ্রবণতার বিশেষ কোনো নকশা বা

কাঠামোর সঙ্গে সংযোগস্থাপন করতে পারে, যে-সব ব্যক্তির মন সেই বিষয় দ্বারা মথিত হয়। এরপর কোলরিজ-এর 'রাইম অফ দি এনশেন্ট ম্যারিনর'-এ 'আদিপ্রতীকের পুনর্জন্ম'-প্রসঙ্গে বডকিন আলোচনা করেন, আলোচনা করেন 'কুবলা খান'-এ স্বর্গ-নরকের আদি প্রতীক নিয়ে; দান্তে-ভার্জিল-উইলিয়ম মরিস-এর কবিতা-প্রসঙ্গে; দান্তে, গ্যোয়েটে ও মিলটন-এর কবিতায় 'নারীর প্রতিরূপ' নিয়ে; শেলি ও অন্যান্য কবির রচনায় 'শয়তান, নায়ক ও ঈশ্বরের প্রতিরূপ' নিয়ে, এবং 'পবিত্র ও সমসাময়িক সাহিত্যে নকশা' নিয়ে, যেখানে আলোচনা-প্রসঙ্গে এসে পড়েন শেকসপিয়র, ডি. এচ. লরেনস্, ভর্জিনিয়া উলফ ও টি. এস. এলিয়ট। বডকিন-এর গ্রন্থটি আজও চিন্তা-উদ্রেককারী, যদিও বর্তমানে অনিবার্যভাবে কিঞ্চিৎ সেকেলে মনে হয়, মনে হয় কোথাও-কোথাও ব্যাখ্যার অনমনীয়তা রচনাটিকে সীমাবদ্ধ করেছে। এই গ্রন্থটি ইউংগীয় আদিপ্রতীকী সমালোচনার প্রথম পর্যায়ের প্রয়াস হিসেবে যে-সব সমালোচনার সম্মুখীন হয়, সে-সব সমালোচনাই প্রযোজ্য এই আদিপ্রতীকী সমালোচনার উত্তরসাধকদের ক্ষেত্রেও, যেহেতু তাঁরা বহুলাংশে কাল ও বর্গের, সাহিত্য ও ঐতিহাসিক রীতির প্রভেদ অগ্রাহ্য করেন। এই সমালোচনার একটি প্রধান বিপদ এই যে এটি এক-একটি সাহিত্যরচনার স্বতন্ত্র জটিলতা এড়িয়ে যায় কিংবা সেইসব সাহিত্যরচনার নির্দিষ্ট পাঠের পরিবর্তে নিয়ে আসে ব্যাপ্ত থেকে ব্যাপ্ততর সাধারণীকরণ। অবশ্য উইলিয়ম ব্লেক যে-দাবি করেন :

> The Nature of Visionary Fancy, or Imagination,"is very little known, and the Eternal nature and permanence of its ever Existent Images is consider'd as less permanent than the things of Vegetation and Generative Nature ; yet the Oak dies as well as the Lettuce, but Its Eternal Image and Individuality never dies, but renews by its seed ; just as the Imaginative Image returns by the seed of Contemplative Thought.

—আমাদের সময়ে তা উপলব্ধি করতে সাহায্য করে এই ঘরানার চিন্তা। এইসব নৃতাত্ত্বিক ও মনস্তাত্ত্বিক আদর্শরূপের ওপর নির্ভর করে (যেগুলির পুষ্টিসাধন করেছেন ফ্রেজার ও ইয়ুং ছাড়াও অনেকে) একাধিক কর্মপন্থা বিস্তারিত ও উন্নীত করেছেন যে-সব সমালোচক, তাঁরা আলোচনা করেছেন বহু ধরনের সাহিত্যরচনায় আদিপ্রতীকী 'মোটিভ'-এর উপস্থিতি ও প্রভাব; এইসব আলোচনায় অন্তর্ভুক্ত আদিপ্রতীকী ব্যক্তিত্ব বা চরিত্র (নায়ক : ইউলিসিস-রূপী, খল : দন হুয়ান-রূপী, বিদ্রোহী : প্রমিথিউস-রূপী, অসহায় কুমারী, জাদুকর ইত্যাদি)। আদিপ্রতীকী স্থান (যেমন স্বর্গীয় উদ্যান, গোলকধাঁধা, পাতালজগৎ), উদ্ভিদ ও প্রাণী (যেমন গোলাপ, সাপ, সিংহ), এবং আদিপ্রতীকী কার্যকলাপ (সন্ধান, প্রায়শ্চিত্তমূলক কর্ম, যেমন, উৎসর্গীকৃত হত্যা, পাতালপ্রবেশ, ঋতুচক্র ইত্যাদি)। বহু গুরুত্বপূর্ণ আদিপ্রতীক উদাহরণসহ আলোচিত হয়েছে *দিকসিয়ঁনেয়ার দা মিৎ লিতারেয়ার* (১৯৮৮, সম্পাদনা : পিয়ের ব্রুনেল; *কমপ্যানিয়ন টু লিটারেরি মিথস, হিরোজ অ্যান্ড আর্কিটাইপস*, ১৯৯২)। যে-সব সাহিত্যরচনা ও লেখক আদিপ্রতীকী সমালোচনা দ্বারা আলোকিত হন, তাঁরা সংখ্যায় বহু ও বৈচিত্র্যে বিপুল। এই তালিকায় রয়েছেন দান্তে, ব্লেক, নোভালিস ও উইলিয়ম বাটলর ইয়েটস থেকে শুরু করে (যাঁদের ক্ষেত্রে এই সমালোচনারীতি সুপ্রযোজ্য) হেনরি জেমস, চার্লস ডিকেনস ও জোসেফ কনরাড পর্যন্ত (যাঁদের ক্ষেত্রে এই সমালোচনার প্রাসঙ্গিকতা সন্দেহাতীত নয়)।

আদিপ্রতীকী সমালোচনার অন্তর্দৃষ্টি প্রণালীবদ্ধ করতে এবং তা সাহিত্য ও সাহিত্যালোচনা-বিষয়ক বৃহৎ প্রণালীভুক্ত করার প্রয়াস নেন নরথ্রপ ফ্রাই (পূর্বোল্লিখিত)। যদিও তিনি নৃতাত্ত্বিক ও ইয়ুংগীয় ঘরানা দ্বারা প্রভাবিত, ফ্রাই-এর ধারণায় যে-আদিপ্রতীকী সমালোচনা, তা এই দুটি ঘরানার কোনোটি দ্বারা প্রভাবিত নয়। তাঁর বিশ্বাস সাহিত্যে আদিপ্রতীকসমূহ বস্তুত সেই গঠনবিন্যাস যা সাহিত্যে সামঞ্জস্য প্রদান করতে, তাকে 'হয়ে উঠতে' সাহায্য করে, এবং এই আদিপ্রতীকসমূহ নিখাদ সাহিত্যব্যাপার। তুলনামূলকভাবে প্রাথমিক পর্যায়ের একটি রচনায় (*ফিয়ারফুল সিমেট্রি : আ স্টাডি অফ উইলিয়ম ব্লেক*, ১৯৪৭) ফ্রাই ব্যাখ্যা করেন ব্লেক-এর কাব্য। তিনি দেখান যে ব্লেক-এর কাব্য গড়ে উঠেছে একক, পুনঃসংঘটিত আদিপ্রতীকী আখ্যান (বা অতিকথা) আশ্রয় করে, যা সৃষ্টি, পতন, প্রায়শ্চিত্তকরণ ও রহস্যোদ্‌ঘাটন-সম্পর্কিত (সেই পার্থিব আখ্যান পালটা তর্কের সম্মুখীন হয় চারটি স্থানিক দৃষ্টান্ত দ্বারা— এক উদ্ধারপ্রাপ্ত রহস্যোদ্‌ঘাটনমূলক জগৎ, এক অপাপবিদ্ধ প্রকৃতিজগৎ (যা উপলব্ধি করা যায় শুধুমাত্র কল্পনায়), স্থানিক ও কালিক বিচারে পতিত ভূদৃশ্য, এবং একটি দানবীয় জগৎ। চূড়ান্ত আদিপ্রতীক হল এই চারটি স্তরের মধ্যে দিয়ে নায়কের আবিষ্কারযাত্রার আখ্যান। *ফেবলস অফ আইডেনটিটি* (১৯৬৩) গ্রন্থে এবং আরও সুসংবদ্ধভাবে *অ্যানাটমি অফ ক্রিটিসিজম*-এ ফ্রাই এই ধারণাগুলির উন্নতিসাধন করেন সামগ্রিকভাবে সাহিত্য-বিষয়ক একটি পর্যবেক্ষণমূলক বক্তব্যের দিকে। শেষোক্ত বইটিতে একটি 'বিতর্কমূলক ভূমিকা'-র পর রয়েছে চারটি প্রবন্ধ : 'হিস্টরিকাল ক্রিটিসিজম : থিয়োরি অভ মোডস', 'এথিকাল ক্রিটিসিজম : থিয়োরি অভ সিম্বলস', 'আর্কিটাইপাল ক্রিটিসিজম : থিয়োরি অফ মিথস' ও 'রেটরিকাল ক্রিটিসিজম : থিয়োরি অফ জঁরস'। গোটা বিষয়ের ক্ষেত্রে আদি প্রতীকের ধারণার মৌলিক গুরুত্ব অনস্বীকার্য। *দি অ্যানাটমি অফ ক্রিটিসিজম* এমন এক সাহিত্যদর্শন প্রতিষ্ঠা করতে সাহায্য করে যেখানে সাহিত্যের ইতিহাস দেখা যেতে পারে এক মৌলিক, অতিকথাতুল্য আদিপ্রতীকের বিবর্ধিত আলোচনা হিসেবে, আরও চারটি উপায়ের মাধ্যমে : রোমান্স, অধিক মাত্রায় অনুকরণ, স্বল্প মাত্রায় অনুকরণ ও উপহাসমূলক। সাহিত্যকে ফ্রাই বোঝেন এক শৃঙ্খলা হিসেবে যেখানে একদিকে চূড়ান্ত রূপ অতিকথা, আর-একদিকে প্রকৃতিবাদ। আদিপ্রতীকের সংজ্ঞার্থ তিনি এইভাবে দেন : "একটি প্রতীক যা একটি কবিতাকে সংযুক্ত করে আর-একটির সঙ্গে এবং সেভাবে আমাদের সাহিত্য অভিজ্ঞতা সমন্বিত ও সংহত করে। এবং যেহেতু আদিপ্রতীক সংযোগসাধক প্রতীক, তাই আদিপ্রতীকী সমালোচনা প্রাথমিকভাবে সাহিত্যকে ধরে নেয় সামাজিক তথ্য হিসেবে এবং সংযোগের উপায় হিসেবে। চলিত প্রথা ও ধরন পাঠ করার পর, সে প্রয়াস চালায় কবিতাকে সামগ্রিক কাব্যশরীরে একীভূত করতে।" এইভাবে আদিপ্রতীক আবিষ্কার করতে থাকে ফ্রাই-এর ধারণায় সাহিত্যশৃঙ্খলা। *অ্যানাটমি অফ ক্রিটিসিজম*-এর তৃতীয় প্রবন্ধটিতে এ-কথাটি সর্বাধিক প্রাঞ্জল, যেখানে তিনি চারটি গাঠনিক আদিপ্রতীক চিহ্নিত করেন ও তাদের তুলনা টানেন চারটি ঋতুর সঙ্গে (পূর্বোল্লিখিত)। এই প্রতিটি আদিপ্রতীকে তিনি স্পষ্ট পর্যায়সমূহ চিহ্নিত করেন এবং দৃষ্টান্তসহ তাদের উপস্থিতি নির্দেশ করেন সুপ্রচুর সাহিত্যরচনায়। *অ্যানাটমি অফ ক্রিটিসিজম* যতটা প্রভাববিস্তারী, প্রায় ততোধিক বিতর্কিত একটি গ্রন্থ। আদিপ্রতীকী সমালোচনারীতি নিজস্ব ধারায় ফ্রাই প্রয়োগ করেন তাঁর পরবর্তী গ্রন্থগুলিতেও, যেমন *আ ন্যাচারাল পার্সপেকটিভ : দ্য ডেভেলপমেন্ট অফ শেকসপিয়রিয়ান কমেডি অ্যান্ড রোমান্স* (১৯৬৫), *দ্য রিটর্ন অফ ইডেন : ফাইভ এসেইজ অন মিলটন'স এপিকস* (১৯৬৫),

আ স্টাডি অফ ইংলিশ রোমান্টিসিজম (১৯৬৮), *স্পিরিটুস মিউনডাই : এসেইজ অন লিটারেচর, মিথ অ্যান্ড সোসাইটি* (১৯৭৬), *দ্য গ্রেট কোড : দ্য বাইব্‌ল অ্যান্ড লিটারেচর* (১৯৮২), *দ্য মিথ অফ ডেলিভারেন্স : রিফ্লেকশনস অন শেকসপিয়র'স প্রবলেম কমেডিজ* (১৯৮৩), এবং *ওয়ার্ডস উইথ পাওয়ার : বিইং আ সেকেন্ড স্টাডি অফ 'দ্য বাইবেল অ্যান্ড লিটারেচর'* (১৯৯০)। *অ্যানাটমি অভ ক্রিটিসিজম*-এর ওপর ভিত্তি করে উত্তরকালে সাহিত্যসমালোচনার অনেক প্রকার সম্প্রসারণ ও বিকাশ ঘটে, এবং জুলিয়া ক্রিস্টেভা (১৯৪১) এই গ্রন্থটির যথার্থ প্রশংসা করে বলেন : "বহু ধ্বনির পুনরাবিষ্কার...যা পাশ্চাত্য কল্পনাকে পরিস্ফুট করে"। তাঁর বিচারে "ফ্রাই আমাদের প্রদান করেছেন এক ব্যতিক্রমী অভিজ্ঞতা, যা পাণ্ডিত্য ও প্রাজ্ঞতায় সমৃদ্ধ, যার সমকক্ষ আমাদের কেউই আজও হয়ে উঠতে পারেনি।"

পরবর্তীকালে আদিপ্রতীকী সমালোচনা-প্রভাবিত জেমস হিলম্যান (১৯২৪) দ্বারা, যিনি দর্শন ও সাহিত্যের সমৃদ্ধ ঐতিহ্যের উপর নির্ভর করে তাঁর চিন্তা প্রতিষ্ঠা করেন। প্লটিনাস, প্রক্লাস, মার্সিলিয়ো ফিচিনো, ভিকো, ব্লেক ছাড়াও বিশ শতকী ইসলামি চিন্তাবিদ অঁরি করব্যাঁ-র (১৯০৩-১৯৭৮) দৃষ্টান্ত তিনি উপস্থাপন করেন আপন রচনায়। হিলম্যান-এর বিচারে আদিপ্রতীক কল্পনাক্রিয়ারই অবিচ্ছেদ্য অঙ্গ। এই দৃষ্টিকোণ থেকে তিনি রচনা করেন কিছু গুরুত্বপূর্ণ গ্রন্থ, যেমন *রি-ভিশনিং সাইকোলজি* (১৯৭৫) ও *আর্কিটাইপাল সাইকোলজি : আ ব্রিফ অ্যাকাউন্ট* (১৯৮৩)। ১৯৭০-এ হিলম্যান চালু করেন একটি সাময়িকপত্রের নবপর্যায় : *স্প্রিং : অ্যান অ্যানুয়াল অফ আর্কিটাইপাল সাইকোলজি অ্যান্ড ইয়ুংগিয়ান থট*, এবং এই পত্রিকার পৃষ্ঠাও সমৃদ্ধ হয় তাঁর তাত্ত্বিক সন্দর্ভে।

সম্প্রতি তুমুল উত্থান ঘটেছে একটি মানবীবাদী সমালোচক ও তত্ত্ববিদ গোষ্ঠীর। এঁরা ইয়ুংগীয় আদর্শ রূপ দ্বারা একই সঙ্গে উদ্‌বুদ্ধ এবং পাশাপাশি ইয়ুং-এর বহু রচনায় যে-পৌরুষ পক্ষপাত বর্তমান, তা 'সংশোধন' করতে তৎপর। অ্যানিস প্র্যাট ও এসটেলা লটর-এর মতো কেউ-কেউ আদিপ্রতীকী সমালোচনার দিগন্ত বিস্তৃত করেছেন চিত্তাকর্ষকভাবে; তার সঙ্গে সম্পর্ক খুঁজছেন ভাষা ও লিঙ্গ-সংক্রান্ত প্রশ্নের, এবং তা এমনভাবে যার ফলে আদিপ্রতীক প্রসঙ্গে ইয়ুংগীয় ধারণা অন্যান্য আধুনিক সাহিত্যতত্ত্ব ও সমালোচনার সঙ্গে সম্পর্কিত করা যায়। *উইমেন অ্যাজ মিথমেকারস* (১৯৭৬)-এ লটর চিন্তা-উদ্রেককারী ভঙ্গিমায় দেখান কীভাবে চিরাচরিত অতিকথা পরিবর্তিত হচ্ছে অ্যান সেক্সটন, ডায়ন ওঅক্সি প্রমুখ মার্কিন কবির রচনায়। জুডিথ ক্রল-রচিত *চ্যাপ্টরস ইন মিথলজি : দ্য পোয়েট্রি অভ সিলভিয়া প্লাথ* (১৯৭৬) প্রকাশ করে আদিপ্রতীকী সমালোচনারীতির ক্রমবর্ধমান মূল্য, যা অন্যান্য সমালোচনা-পদ্ধতির পূর্ণ সচেতনতায় ব্যবহৃত হলে, সারবান হবে। আদিপ্রতীকী সমালোচনাকে বিচ্ছিন্ন অনড় সমালোচনাপদ্ধতি করে রাখলে এর উন্নতিসাধন সম্ভব নয়। সাহিত্যসম্মত কল্পনা ও তার ফল হৃদয়ঙ্গম করার জন্য আদিপ্রতীকী সমালোচনার গুরুত্ব অস্বীকার করা যায় না। এই সমালোচনারীতি, যে-কোনো সমালোচনারীতির মতোই, কোনো চূড়ান্ত ও বিশ্বজনীন উত্তর দিতে সমর্থ নয়, যেমনটি ভ্রান্তিবশত ধরা হয়েছিল প্রথমে। কিন্তু এর প্রণালী ও অন্তর্দৃষ্টি সামগ্রিকভাবে সমালোচনা-বিষয়টি বোঝার পক্ষে অবশ্যমান্য।

দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ-পূর্ববর্তী সাহিত্যসমালোচনা যা মনস্তত্ত্বমূলক তত্ত্বাদি-আশ্রয়ী বা প্রভাবিত, তার সঙ্গে দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ-পরবর্তী সাহিত্যসমালোচনার (অর্থাৎ যে-সব সাহিত্যসমালোচনা গত কয়েক দশকে মনস্তত্ত্বমূলক তত্ত্বাদিনির্ভর বা প্রভাবিত) সবচেয়ে উল্লেখযোগ্য পার্থক্য এই

যে দ্বিতীয় ধারাটি প্রথমের মতো নিখাদ মনস্তত্ত্বমূলক তত্ত্বসমূহের ওপর নির্ভরশীল নয়। উদাহরণ হিসেবে বলা যেতে পারে যে বিশ শতকের দুইয়ের ও তিনের দশকের ফ্রয়েডীয় সাহিত্যসমালোচনা সাধারণত উপস্থাপন করে এক ধরনের স্বাতন্ত্র্যকামী রূপ, এবং ফ্রয়েড ও তাঁর অনুগামীবৃন্দ ছাড়া অন্যান্য তাত্ত্বিকের প্রতি কোনো আস্থাপোষণ করে না। এর পাশাপাশি. আধুনিক সাহিত্যসমালোচক বা তাত্ত্বিক, যিনি বিশেষভাবে নির্ভরশীল জাক লাকাঁ-র ওপর, তিনি বিনির্মাণবাদী ও উত্তর-গ্রন্থনবাদী তত্ত্বের প্রতি সাধারণভাবে অধিকতর উদার ও আগ্রহী।

মনঃসমীক্ষা ও মনঃসমীক্ষণগত সমালোচনা বিষয়ে অতীব উপযোগী ও সামগ্রিক মূল্যায়নকারী *সন্দর্ভ পাই ই. অ্যান ক্যাপলান-রচিত সাইকোঅ্যানালিসিস অ্যান্ড সিনেমা-র* (১৯৯০) ভূমিকায়। *"ফ্রম প্লেটো'স কেভ টু ফ্রয়েড'স স্ক্রীন"-শীর্ষক সেই রচনায় ক্যাপলান মনঃসমীক্ষার ছটি বিভিন্ন দিক নিরূপণ করেন।*

১। 'কথাবার্তা'-র দ্বারা আরোগ্যসাধন হিসেবে মনঃসমীক্ষা। (এখানে ক্যাপলান প্রক্রিয়াটি দুটি ভাগে বিভক্ত করেন : এক, বিশ্লেষণমূলক দৃশ্য; দুই, 'ফ্রয়েড-এর মূল ধারণায় নিহিত মানবোন্নতির তত্ত্ব')

২। সাহিত্যমূলক সম্পর্ক, আচার-আচরণ, উদ্দেশ্য এবং মূলপাঠের আপন অস্তিত্বেরই *ব্যাখ্যা*-র জন্য মনঃসমীক্ষা।

৩। *গাঠনিকভাবে* মনঃসমীক্ষা এক নান্দনিক আলাপচারিতা। (এখানে ক্যাপলান ইঙ্গিত দেন 'বর্ণনাত্মক তত্ত্ব'-র প্রতি, এবং এ-কথাও বলেন যে বিশ্লেষক ও বিশ্লেষিতকে দেখা যায় উভয়ের মধ্যে আদানপ্রদান দ্বারা 'কাহিনি' গড়ে তুলতে, যা ভাষার সাহিত্যসুলভ ব্যবহার থেকে আলাদা কিছু নয়)।

৪। বর্ণনামুলক আলোচনায় মনঃসমীক্ষা— যা সাহিত্য বা চলচ্চিত্রের মূলপাঠের বিষয় হিসেবে ব্যবহৃত।

৫। ঐতিহাসিক, আদর্শগত ও সাংস্কৃতিক আলোচনা হিসেবে মনঃসমীক্ষা।

৬। নির্দিষ্ট প্রক্রিয়া বা প্রক্রিয়ার সমষ্টি হিসেবে মনঃসমীক্ষা, যা সাহিত্য বা চলচ্চিত্র-মূলক আলোচনা হিসেবে ব্যবহার করেন, মূলপাঠের প্রক্রিয়াগুলি আলোকিত করার জন্য এবং মূলপাঠের মুখোমুখি পাঠক/দর্শকের অবস্থান বোঝানোর জন্য।

বিশ শতকের তিনের দশকে জার্মানি-তে মনঃসমীক্ষণগত সাহিত্যপদ্ধতির উত্থান, চারের দশকে ও তৎপরবর্তীকালে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে তার উন্নতিসাধন সম্পর্কে ক্যাপলান-এর বিবরণ সম্পর্কে আগ্রহী পাঠকের কাছে সিঁড়ির আদর্শ প্রথম ধাপ হিসেবে বিবেচিত হতে পারে।

ভাষারই মতো গঠিত অচেতন, লাকাঁ-র এই দাবি মনঃসমীক্ষার জগতে 'ভাষাতাত্ত্বিক দৃষ্টান্ত'-রই বিস্তার। বিষয় ও ভাষা-সম্পর্কিত আমাদের ধারণা হৃদয়ঙ্গম করার ক্ষেত্রে এর ভূমিকা গুরুত্বপূর্ণ। বিশেষ কোনো সাহিত্যরচনা আলোচনা-প্রসঙ্গে অবশ্য লাকাঁ-র প্রভাব সুনির্দিষ্টভাবে চিহ্নিত করা যাবে না। এডগার অ্যালান পো-র গল্প 'দ্য পারলয়েনড লেটার' সম্পর্কে তাঁর সন্দর্ভটি যত না সাহিত্যসমালোচনা, তার থেকে বেশি বিশেষ-বিশেষ মনঃসমীক্ষণগত বিষয় উদাহরণসহ বোঝানোর জন্য একটি সাহিত্যরচনা ব্যবহারের দৃষ্টান্ত। যদিও এটি পরবর্তীকালে একাধিক প্রবন্ধ-নিবন্ধের প্রেরণা জোগায়, তবে সন্দেহ থেকেই

যায় যে অ্যালান পো-বিষয়ে কোনো আগ্রহী ব্যক্তির কাছে এটির আকর্ষণ কতখানি থাকবে, সে-ব্যাপারে।

আটের দশক থেকে মনঃসমীক্ষণগত তত্ত্ব বিশেষভাবে সাহিত্যচর্চায় প্রবেশ করে মানবীবিদ্যার হাত ধরে। স্টিভি জ্যাকসন ও স্যু স্কট দেখান যে মনঃসমীক্ষণের কেন্দ্রে থাকে অবদমনের ধারণা, আর এটাই মার্কসবাদী ও সমাজতন্ত্রী মানবীবাদীদের প্রেরণা জোগায় নারীর যৌনচেতনায় তাঁদের পরিভ্রমণের ক্ষেত্রে মনঃসমীক্ষণের ব্যবহার করতে। আজ মনঃসমীক্ষণমুখী একাধিক মানবীবাদী সাহিত্যসমালোচনা নিয়োজিত 'লিঙ্গ' নির্মাণ, অবদমন ও যৌনচেতনা-সম্পর্কিত বিভিন্ন বিষয়ে। জ্যাকসন ও স্কট-এর কাছে ফ্রয়েড-সম্পর্কিত পরিপ্রেক্ষিতের আকর্ষণ গড়ে ওঠে লাকাঁ-র মাধ্যমে। এইভাবে তা জোর দেয় সাংস্কৃতিক ও ভাষাতাত্ত্বিক কাঠামোয়, যে-কাঠামোয় নারীর অবস্থান যৌন বস্তু বা বিষয় হিসেবেই, যেখানে নারীত্বের যৌন সত্তার প্রকাশ বিবেচিত হয় এক বিপজ্জনক সাফল্য হিসেবে।

লাকাঁ-র রচনা কীভাবে চলচ্চিত্রচর্চা ও মানবীবিদ্যায় বিপুল প্রভাব বিস্তার করেছে, তা ব্যাখ্যা করেন ল্যরা মালভি।

> তাঁর প্রভাব লিঙ্গবৈষম্যসংক্রান্ত ধারণা বিস্তৃত ও অগ্রসর করে, জোর দেয় পৌরুষ ও নারীত্বের বানিয়ে তোলা, কাল্পনিক প্রকৃতির ওপর, যা সামাজিক ও প্রতীকী অনুজ্ঞার ফল, কিন্তু জীববিদ্যার নয়। রাজনৈতিক দৃষ্টিকোণ থেকে, এই অবস্থানটি মানবীবাদীদের কাছে বিশেষ আকর্ষণীয় : যখন দৈহিক গঠনতন্ত্র ভবিতব্য হিসেবে বিবেচিত হয় না আর, তখনই নারীর প্রতি পীড়ন ও শোষণ হতে পারে আকস্মিক, কিন্তু জরুরি নয়। ইডিপাস-এষণা-সংক্রান্ত লাকাঁ-র বিচার দাঁড়িয়ে আছে পিতার সঙ্গে আইন, সংস্কৃতি ও প্রতীকীকরণের সম্পর্কের উপর, আর তাই পিতৃতন্ত্রের অধীনে মাতৃত্ব লাভ করে এক গুরুত্বপূর্ণ মনঃসমীক্ষণগত মাত্রা। [ভিজুয়াল অ্যান্ড আদার প্লেজারস, ১৯৮৯]

অবশ্য সেই সঙ্গে মালভি একটি সাবধানবাণীও উচ্চারণ করতে ভোলেন না।

> কিন্তু, শেষ বিচারে, তত্ত্ব ও রাজনীতি থেকে যায় বিততির মধ্যে। লিঙ্গ-পার্থক্যের যে-লাকাঁবাদী প্রতিনিধিত্বকরণ (যা সংজ্ঞায়িত হয় শিশ্নের উপস্থিতি বা অনুপস্থিতির ওপর) , তার ফলে নারী থেকে যায় এক নেতিবাদী সম্পর্কে, যার সংজ্ঞার্থ 'না-পুরুষ' এবং আটকে থাকে এমন এক তত্ত্বে যা অসাধারণভাবে বর্ণনা করে পুরুষতান্ত্রিক শক্তিগুলির সম্পর্ক কিন্তু পাশাপাশি এটাও স্বীকার করে যে পরিত্রাণের কোনো প্রয়োজন নেই। [তদেব]

এই সন্দেহের সুর পাই স্টিভি জ্যাকসন ও স্যু স্কট-এর মধ্যেও, যাঁরা বলেন যে মানবীবাদীরা 'সামগ্রিক মনঃসমীক্ষণগত বিষয়টিরই প্রতি সন্দিহান', কারণ এটি যে-'বৈশ্বিক আত্মবাদী তত্ত্ব' উপস্থাপন করে তা 'সময়ের সঙ্গে-সঙ্গে পরিবর্তনশীল যৌনতার ঐতিহাসিক চেতনার সঙ্গে সমন্বিত করা দুরূহ'। [*ফেমিনিজম অ্যান্ড সেকশুয়ালিটি : আ রিডর*, সম্পাদনা : স্টিভি জ্যাকসন ও স্যু স্কট, ১৯৯৬]

মনঃসমীক্ষণগত সাহিত্যসমালোচনা-বিষয়ক আর একটি প্রয়োজনীয় সমালোচনামূলক সন্দর্ভ, পিটর ব্রুকস-এর, 'দি আইডিয়া অফ আ সাইকোঅ্যানালিটিক ক্রিটিসিজম'। তাঁর *সাইকোঅ্যানালিসিস অ্যান্ড স্টোরিটেলিং* (১৯৯৪) গ্রন্থের অন্তর্ভুক্ত প্রবন্ধগুলির (মূলত বক্তৃতা) অন্যতম এটি। এই প্রবন্ধে ব্রুকস স্বীকার করেন যে এ-বিষয়ে প্রাথমিক ও মৌলিক সমস্যা এই যে 'সাহিত্যপাঠে মনঃসমীক্ষণ বারংবার সমীক্ষণের লক্ষ্যবস্তুটিকে ভুল ঠাওরেছে'; কখনও সে

মনোনিবেশ করেছে লেখকের প্রতি, কখনও পাঠক, বা মূলপাঠে কাল্পনিক ব্যক্তিবর্গের প্রতি। ব্রুকস একটি বিকল্প প্রস্তাব দেন :

> আমার ধারণা সাহিত্যপাঠের ক্ষেত্রে, যাবতীয় প্রতিবন্ধকতার বিরুদ্ধে, মনঃসমীক্ষণগত পরিপ্রেক্ষিতের ক্রমান্বয়িক প্রয়াস শেষ পর্যন্ত আমাদের এই বিশ্বাস থেকে উদ্ভূত হয় যে-সব বস্তুর ওপর তারা নিজেদের বিশ্লেষণশক্তি প্রয়োগ করে, সেগুলি কোনো এক মৌলিক ধারণা অনুযায়ী, একই : সাহিত্যের গঠন এক অর্থে মনেরই গঠনের প্রকাশ— কোনো নির্দিষ্ট মনের নয়, কিন্তু ফ্রয়েড-এর এই রচনাবলির *প্রামাণ্য সংস্করণ*-এর অনুবাদকরা যাকে বলেন 'মানসিক যন্ত্রপাতি'...যে-কথাটি মনোজগতের বিচক্ষণ ও সক্রিয় প্রতিষ্ঠানকে বোঝায়, যা গঠনকামী প্রক্রিয়ার অভিমুখী...আমরা স্বপ্ন দেখি মনঃসমীক্ষণ ও সাহিত্যসমালোচনার মিলনের, কারণ আমাদের মনে হয় সাহিত্যরূপ ও মানসিক প্রক্রিয়ার মধ্যে কোনো-না-কোনো সংযোগ রয়েছে, আমরা আশা করি নান্দনিক গঠন ও রূপ, সাহিত্যের গূঢ়োক্তিসমেত কোনো-না-কোনোভাবে সমাপতনিক হবে মনোজাগতিক গঠন ও প্রক্রিয়ার সঙ্গে, যার প্রতি তারা যুগপৎ সাড়া দেয় ও জাগ্রত করে।

পরিষ্কার বোঝা যায় এহেন মন্তব্য এমন এক ব্যক্তির যিনি স্রোতের বিপরীতে সাঁতার কাটতে ভালোবাসেন। 'যাবতীয় প্রতিবন্ধকতার বিরুদ্ধে' 'এক অর্থে', 'স্বপ্ন', 'কোনো-না-কোনোভাবে সমাপতনিক' ইত্যাদি শব্দবন্ধ এটাই বোঝায় যে ব্রুকস নিজেও পুরোদস্তুর আত্মবিশ্বাসী নন, এবং তাঁর বক্তব্য এমন বিশ্লেষণ আহ্বান করে যা জনপ্রিয় ভাষায় মনঃসমীক্ষণগত বলা যায়।

ব্রুকস নিজেও মনঃসমীক্ষণগত সমালোচনার বিরোধী দুটি প্রধান সমালোচনার মহলা দেন; তাঁর প্রথম সমালোচনা : সাম্রাজ্যিক কায়দায় মনঃসমীক্ষণ দাবি জানায় সাহিত্য বিশ্লেষণ করার; দ্বিতীয় অভিযোগটি আরও জটিল (ও সমসাময়িক) : মনঃসমীক্ষণ সাহিত্য 'বই' কিছুই নয়, এবং সম্পর্কস্থাপন আন্তর্পাঠের নিছক খেলা ছাড়া কিছুই নয়, এমনকি অনুলাপীও বলা যেতে পারে। অন্যভাবে বলতে গেলে, মনঃসমীক্ষণগত সমালোচনা গোড়ায় অভিযুক্ত হয় এই কারণে যে তার অবস্থান মূলপাঠের বাইরে এবং মূলপাঠের জটিলতা ও বিশিষ্টতার প্রতি সে নিঃসাড়। আর এখন তাকে খাপ খাইয়ে নিতে হবে উত্তর-গ্রন্থনবাদী সংশয়দীর্ণ এক জগতে যেখানে অনেকেই মনে করেন মূলপাঠের বাইতে থাকতে পারে না কোনো কিছু।

একই গ্রন্থের অন্তর্ভুক্ত আর-একটি প্রবন্ধে ('চেনজেস ইন দ্য মার্জিন : কনস্ট্রাকশন, ট্রান্সফারেন্স, অ্যান্ড ন্যারেটিভ') ব্রুকস অন্য পথে হাঁটেন। সাহিত্য ও মনের তুলনার উপর দৃষ্টিনিক্ষেপ না-করে জোর দেন মনঃসমীক্ষককে গল্প বলা ও সাহিত্যপাঠককে গল্প বলার তুলনার মধ্যে। তাঁর মতে 'মনঃসমীক্ষণ যে আখ্যানমূলক শৃঙ্খলা, সে-বিষয়ে দেখা দেবে ক্রমবর্ধমান সহমত, মনঃ-সমীক্ষকদের মধ্যেও'। মনঃসমীক্ষক ভাবিত থাকেন 'তাঁর' রোগীদের বলা গল্প নিয়ে, যে-সব গল্প স্বাভাবিকভাবে 'ত্রুটিপূর্ণ বাক্যগঠন' ও ফাঁক-সমন্বিত, যেগুলির কালক্রম স্ববিরোধী, এবং অবদমিত বস্তুসমূহ লুকিয়ে রাখা স্মৃতি আচ্ছাদিত করে রাখে। মনঃসমীক্ষক এসব বাধা মেনে নিয়ে ও কাটিয়ে পুনর্নির্মাণ করেন বর্ণনামূলক আলোচনা, বিশ্লেষিত ব্যক্তির সঙ্গে, এবং এই কাজ করার সঙ্গে-সঙ্গে পরিবৃত্তি ও নির্মাণ— এই ধারণার সাহায্যে, (ব্রুকস তাঁর প্রবন্ধের হয়তো সর্বাধিক সাহসী কথাটি বলেন এ-প্রসঙ্গে) মনঃসমীক্ষণ সম্ভবত 'ইঙ্গিত দেয় আখ্যানমূলক ধারণার এক যথোচিত সক্রিয় আদর্শ রূপের যা আমাদের সুযোগ দেয় এক আঙ্গিকবাদী 'আখ্যানশৈলী'-র বাইরে আখ্যানের এক বিশেষ অনুষঙ্গার্থক কর্মের পুনরধিকার করার, যেখানে অনুষঙ্গ বোধগম্য হয় কোনো পার্থিব নাম হিসেবে নয়,

মূলপাঠের সামাজিক ব্যাখ্যা হিসেবেও নয়, কিন্তু 'অনুষঙ্গের চলন' হিসেবে যা ঘটে থাকে কথক থেকে শ্রোতা, আবার শ্রোতা থেকে কথকে, কথনের পরিবৃত্তির সাহায্যে।"

চিত্তাকর্ষক ও চিন্তা-উদ্রেককারী সমালোচক ব্রুকস, কিন্তু তাঁর গ্রন্থভুক্ত প্রবন্ধগুলি এমন এক তত্ত্বের ইঙ্গিত দেয় যা সংকটপূর্ণ।

পরিবৃত্তি একান্তভাবে সেই প্রক্রিয়া যার ফলে বিশ্লেষণের মধ্যে, বিশ্লেষিত ব্যক্তি নিজের সঙ্গে বিশ্লেষকের সম্পর্কের ওপর চালান করতে পারে শৈশবকালীন যৌন কল্পনা বা অতীতের যৌন অভিজ্ঞতাসমূহ। পরিবৃত্তি প্রক্রিয়ার মধ্যে অতীত পুনর্নির্মিত হয়, বা পুনরাভিনীত হয় বর্তমানে। *রিডিং ফর দ্য প্লট : ডিজাইন অ্যান্ড ইনটেনশন ইন ন্যারেটিভ* (১৯৮৪)-এর রচয়িতা পিটর ব্রুকস-এর মতে পরিবৃত্তি সৃষ্টি করে অতীত ও বর্তমানের এক অন্তর্বর্তী অঞ্চল, যা বাইরেও নয়, ভেতরেও নয়; যা কল্পরচনাও নয়, বাস্তবও নয়। পরিবৃত্তি পূর্ব-অভিজ্ঞতার প্রতীকী পুনর্নির্মাণ, এবং এটি আদ্যন্ত মূল পাঠভিত্তিক, ঠিক যেভাবে মূলপাঠ আদতে পরিবৃত্তিনির্ভর। মূলপাঠের সঙ্গে সংলাপে লিপ্ত হয় পাঠক, এবং ব্রুকস-এর মতে, শুধু মূলপাঠে যা রয়েছে, পাঠক তা-ই উপলব্ধি করেন না, তার বাইরে যা রয়েছে— অর্থাৎ মূল পাঠে যা অনুচ্চারিত থেকে গেছে, তাও উপলব্ধি করেন। কিন্তু একটি মূল পাঠ কীভাবে তাঁর ওপর ক্রিয়াশীল, তা যদি পাঠককে বুঝতে হয় তবে গোটা বিষয়টিই পুননির্মিত হওয়া কাম্য।

লিটরেচর অ্যান্ড সাইকোঅ্যানালিসিস, দ্য কোয়েশ্চেন অফ রিডিং : আদারওয়াইজ (১৯৮২)-এর সম্পাদক শোশানা ফেলম্যান-কৃত হেনরি জেমস-এর গল্প 'দ্যা টার্ন অফ দ্য স্ক্রু'-র বিশ্লেষণ এ-ধরনের সমালোচনার অনবদ্য দৃষ্টান্ত। পূর্ববর্তী যে-সব মনঃসমীক্ষণগত সাহিত্যসমালোচনা যাবতীয় মূল রচনার মধ্যে ইডিপাস নাটকীয়তা খুঁজে বেড়ায়, ফেলম্যান সে-সবের প্রভাব ও উপস্থিতি যথাসম্ভব বোধ করেন এ-ক্ষেত্রে। তাঁর কাছে, লাকাঁ-র বক্তব্য—অর্থাৎ বাসনা চালিত করে দ্যোতনাময় ভাষার শৃঙ্খল— এই কথাই বোঝায় যে ভাষার অর্থ কখনওই অনড় নয় এবং তা কখনওই নির্ধারণ করা যাবে না। তাই তিনি অনুসন্ধান করেন কীভাবে জেমস-এর গল্পটির পাঠক ও সমালোচক আটকা পড়েন মূলপাঠের সঙ্গে পরিবৃত্তিমূলক জটিল সম্পর্কের মধ্যে। মূলরচনা ব্যাখ্যা করার সময়ে, সমালোচকরা অনিবার্যভাবে মূলরচনার অর্থ নির্ধারণেই বারংবার লিপ্ত হন যে-অর্থ তাঁরা গোড়ায় মোকাবিলা করতে উদ্গ্রীব ছিলেন। ফেলম্যান-এর কাছে এটা আদৌ সমাপতনিক নয় যে মনঃসমীক্ষণ আমাদের শেখায় ঘটে যাওয়া ক্রিয়াকর্ম পুনরায় সাধন করতে গেলে আমাদের সকলেরই ভরাডুবি নিশ্চিত। কিন্তু মনঃসমীক্ষণ পাশাপাশি আরও একটি শিক্ষা দেয় : ভাষার অর্থ সম্পূর্ণভাবে স্থিরীকৃত করার প্রক্রিয়াটি কখনওই সম্ভবপর নয়। তাই তিনি জেমস-এর মূলরচনার অর্থের অনিশ্চয়তাকেই তুলে ধরেন, এবং সেই সূত্রে বিচার করেন কীভাবে অচেতন বাসনা মূলরচনার ক্ষেত্রে সুনির্দিষ্ট একক অর্থ প্রদান করতে অস্বীকার করে। মনঃসমীক্ষণ আমাদের সামনে মূলরচনাটি উন্মুক্ত রাখতে সাহায্য করে, যা বারংবার পড়ে আমরা নিত্যনতুন অর্থের দিকে ধাবিত হই।

এইভাবে মনঃসমীক্ষণগত সমালোচনা সাঙ্গ করেছে পরিক্রমণ, যার সূচনা সেই ব্যাখ্যাকারী চাবিটি প্রদান করার মাধ্যমে, যা প্রকাশ করে সাহিত্যের 'প্রকৃত অর্থ', যেমনটি ফ্রয়েড বলেন *হ্যামলেট* সম্পর্কে— এবং পরিণতি সেই সক্রিয় আদর্শ রূপ উপস্থাপনে যা দেখায় কীভাবে অচেতন কল্পনা ও বাসনা কর্মরত থাকে ভাষা ও মূল পাঠের মধ্যে, স্থির ও নিশ্চিত অর্থকে বাধা দেবার জন্য।

স্ট্রিম অফ কনশ্যাসনেস
বা
মগ্নচৈতন্যপ্রবাহ

শান্তনু গঙ্গোপাধ্যায়

মার্কসীয় দর্শন ছাড়া আর তেমন কোনো শাস্ত্রের কথা বলা যায় না যা সাহিত্যে প্রভাব-বিস্তারের ক্ষেত্রে ফ্রয়েডীয় মনস্তত্ত্বের মতো গুরুত্বপূর্ণ। আলোচ্য বিষয়ের সঙ্গে সরাসরি ফ্রয়েডীয় মনস্তত্ত্বের যোগ না-থাকলেও, সাধারণভাবে মনোজগতের প্রসঙ্গ এখানে এসেই পড়ে, এবং কিছু দূর এগোনোর পর ফ্রয়েডীয় মনস্তত্ত্ব-বিষয়টি অগ্রাহ্য করার কোনো উপায় থাকে না। অবশ্য 'স্ট্রিম অফ কনশ্যাসনেস' বা মগ্নচৈতন্যপ্রবাহ একান্তভাবেই সাহিত্যবিষয়, এবং এর উপস্থিতি বিশেষভাবে কথাসাহিত্যে লক্ষিত। মূল বিষয়ে পৌঁছোনোর আগে এর পটভূমি ও পরিপ্রেক্ষিত বুঝে নেওয়া আবশ্যক, কারণ এরই মধ্যে বিষয়টির অর্থ ও তাৎপর্য নিহিত। প্রথম বিশ্বযুদ্ধের ঠিক আগে, তিনজন ঔপন্যাসিক, একে অপরের সঙ্গে পরিচিত না-হয়েও, ব্যাপৃত ছিলেন আপন-আপন রচনায়, যা শুধু পাশ্চাত্যেই নয়, সামগ্রিকভাবে বিশ-শতকি কথাসাহিত্যে উল্লেখযোগ্য ভূমিকা পালন করবে। ফ্রান্স-এ মার্সেল প্রুস্ত (১৮৭১-১৯২২)-নামক এক রুগ্ণ ও প্রায় নির্জনবাসী, গভীরভাবে অন্তর্দর্শী ও আত্মমগ্ন, ১৯১৩-য় প্রকাশ করেন সেই রচনার প্রথম খণ্ডটি, যা পরে আরও পনেরোটি খণ্ডে প্রকাশ হয় ফরাসি ভাষায়; শেষ খণ্ডটি বেরোয় লেখকের মৃত্যুর পাঁচ বছর পর (১৯২৭), যাকে আজ আমরা জানি *আলা রাশ্যর্শ দু ত্যঁ পার্দু* (*অতীতের স্মৃতি* বা *রিমেমব্রানস অফ থিংস পাস্ট*, সি. কে. স্কট-মনক্রিফ-এর ইংরেজি অনুবাদ-মারফৎ) নামে। যখন এই খণ্ডগুলি মুদ্রিত হচ্ছে, সেই সময়ে এক ইংরেজ মহিলা, ডরোথি মিলার রিচার্ডসন (১৮৭৩-১৯৫৭), অত্যুৎসাহী মানবীবাদী এবং অন্তর্লীন মনোজগৎ-বিষয়ে প্রবল সচেতন, শুরু করেন একটি উপন্যাস লেখা, যা ভবিষ্যতে বারো খণ্ডে সম্পূর্ণ হয়ে *পিলগ্রিমেজ* নামে প্রকাশ পাবে। এর প্রতিটি খণ্ড শ্রীমতী রিচর্ডসন অভিহিত করেন 'পরিচ্ছেদ' বলে, যার প্রথমটি প্রকাশ হয় ১৯১৫-য়, এবং শেষটি ১৯৩৮-এ। ইংলিশ চ্যানেল-এর দুকূলে এই উচ্চাকাঙ্ক্ষী রচনা দুটি প্রকাশ হবার মাঝে, ত্রিয়েস্ত-এ ব্যর্লিৎস বিদ্যালয়ের ইংরেজি-শিক্ষক এক আইরিশ ভদ্রলোক— জেমস জয়েস (১৮৮২-১৯৪১)— ১৯১৬ সালে প্রকাশ করেন একটি উপন্যাস : *আ পোর্ট্রেট অফ দি আর্টিস্ট অ্যাজ আ ইয়ং*

ম্যান। পূর্বোক্ত লেখকদ্বয়ের মতো এটি কোনো বৃহৎ রচনার অংশমাত্র নয় ; কিন্তু এই উপন্যাসটিরও রয়েছে এক পরবর্তী রূপ, যার ব্যাপ্তি ও বিন্যাস— দুই-ই পূর্ববর্তী রচনার তুলনায় অনেক পরিণত, এবং যা বিশ শতকের কথাসাহিত্যের মোড় ঘুরিয়ে দেবে।

এইভাবে, ১৯১৩ থেকে ১৯১৬-র মধ্যে জন্ম নেয় এক বিশেষ শ্রেণির উপন্যাস— যা ইংরেজি সাহিত্যে 'মনস্তাত্ত্বিক উপন্যাস' বা মগ্নচৈতন্যপ্রবাহী উপন্যাস, বা নৈঃশব্দ্যের উপন্যাস, বা অন্তঃস্থ উপন্যাস হিসেবে পরিচিত; আর ফরাসি সাহিত্যে, আধুনিক বিশ্লেষণাত্মক উপন্যাস নামে, যা ঠিক চৈতন্যপ্রবাহী না-হয়েও, মনোজাগতিক পরিবেশ ফুটিয়ে তুলতে সমর্থ হয়।

এটা প্রায় কাকতালীয় বলা যায় যে এই তিনজন লেখকই— একে অপরের পরিচিত না-হওয়া সত্ত্বেও, স্পষ্টত স্বতন্ত্র মানসিকতা ও প্রতিভার অধিকারী— একইসঙ্গে কথাসাহিত্যকে ফেরান বহির্জাগতিক বাস্তব থেকে অন্তর্জাগতিক বাস্তব-অভিমুখে; এক শতাব্দ আগে যে-বহির্জগৎ চিত্রিত করেন বালজাক (১৭৯৯-১৮৫০), সেখান থেকে এঁরা কল্পনা ও জাগরস্বপ্নের গোপন জগতে পৌঁছে দেন কথাসাহিত্যকে— যেখানে সর্বক্ষণ জাগ্রত থাকে আমাদের মগ্নচৈতন্যজগৎ। উল্লিখিত তিন সাহিত্যিকের বৈসাদৃশ্যের পাশাপাশি তাঁদের সাদৃশ্যও সুস্পষ্ট। তিনজনের উপন্যাসই একান্তভাবে আত্মজীবনীমূলক। তিনটি উপন্যাসেরই ভাষা কাব্যোপম। তিনটি উপন্যাসেরই নাম (জয়েস-এর *আ পোর্ট্রেট অফ দি আর্টিস্ট অ্যাজ আ ইয়ং ম্যান*-এর সঙ্গে যদি তাঁর পরবর্তী উপন্যাস *ইউলিসিস*, ১৯২২-কেও, ধরা যায়) অনুসন্ধান, সমুদ্রযাত্রা ও তীর্থযাত্রার ব্যঞ্জনা প্রকাশ করে (এই ধারার আর-এক ঔপন্যাসিক, ভার্জিনিয়া উলফ, ১৮৮২-১৯৪১, তাঁর প্রথম উপন্যাস, *দ্য ভয়েজ আউট*, ১৯১৫-এর, নামকরণের বেলাতেও সচেতন বা অচেতনভাবে) একই কথা প্রমাণ করেন। এক আশ্চর্যজনক সাদৃশ্য! এবং প্রতিটি রচনাতেই যাত্রা চলে মগ্নচৈতন্যজগতের মধ্যে দিয়ে। কারণ তিনজন লেখকই অস্বাভাবিক মাত্রায় আপন-আপন অনুভূতির প্রতি সচেতন। এছাড়া, এঁরা প্রত্যেকেই সমর্থ অকপট আত্মসমীক্ষায়, এবং তার মাত্রা এতটাই তীব্র, যা লেখকসমাজে সাধারণত বিরল। মনে হয় এঁরা তিনজনই অতীব তাগিদ বোধ করেন আপন-আপন অন্তঃসংকটের সঙ্গে মানিয়ে নেবার, এবং আপন-আপন অন্তর্জগৎ সর্বসমক্ষে প্রকাশ করার। হয়তো কথাটা যে-কোনো শিল্পী-সম্পর্কেই খাটে : কিন্তু অন্তর্জগতের প্রকাশ যেমনটি প্রথাগতভাবে বহির্জগতের সঙ্গে সম্পর্কিত কাল্পনিক কথনের মাধ্যমে ঘটে থাকে, এক্ষেত্রে কিন্তু তেমনটি ঘটে না। এই ঔপন্যাসিকরা সচেষ্ট থাকেন অভিজ্ঞতার 'অন্তর্মুখিতা' বজায় রাখতে ও লিপিবদ্ধ করতে।

একটানা অসুস্থতার জন্য প্রুস্ত-কে বদ্ধ ঘরে কাটাতে হয় দিনের পর দিন, সে-ঘরে কর্ক-এর তক্তায় মোড়া দেওয়াল পেরিয়ে ঢোকে না বাইরের শব্দ ও ধুলোময়লা, এবং এইভাবে ঘরটাই হয়ে ওঠে তাঁর মনের বাহ্যিক রূপ, যার মধ্যে খেলে বেড়ায় চিন্তাস্রোত, বহির্জগতের নির্মম আলো-তাপের নাগালের বাইরে। মনঃসমীক্ষণের বেলায় যেভাবে রোগীকে বিচ্ছিন্ন করে দেওয়া হয় বাহ্যিক উত্তেজক থেকে— যাতে তার মন অতীতে খেলে বেড়ানোর সঙ্গে-সঙ্গে বর্তমানের সঙ্গে সংযুক্ত হতে পারে— সেভাবেই প্রুস্ত তাঁর শব্দরোধী বিচ্ছিন্নতায় বাস করে চালিয়ে যান অনন্যসাধারণ আত্মবিশ্লেষণ। বর্তমান তাঁকে জর্জরিত করে ভয়াবহভাবে; তাৎক্ষণিক অভিজ্ঞতা স্ফুরিত হয় প্রকট শারীরিক ব্যাধির মতো। অতীতে রয়েছে শান্তি ও স্থিরতা— এবং আবিষ্কার। স্মৃতি রোমন্থনের মাধ্যমে তিনি খুঁজে পান নিজেকে।

জয়েস-এর ক্ষেত্রে অভিজ্ঞতা অন্য রূপ নেয়। প্রায় জন্মান্ধ জয়েস-এর ভুবন শব্দময়, তাঁর যৌবনের শহর ডাবলিন-এর একটানা কলধ্বনি তিনি বয়ে নিয়ে চলেন নিজের সঙ্গে; ত্রিয়েস্ত,

জুরিখ, পারি— যেখানেই যান না কেন, সব শহরের কোলাহল মিলেমিশে একাকার হয়ে যায়, সব স্থানের ভাষা জড়িয়ে-মড়িয়ে যায় শেষ পর্যন্ত, এবং জয়েস-এর মন হয়ে ওঠে বিশৃঙ্খলার ক্ষেত্র। প্রুস্ত-এর সঙ্গে তফাত এই যে জয়েস বেঁচে থাকেন বর্তমানে, প্রত্যক্ষকরণের তাৎক্ষণিক মুহূর্তে— যা তাঁর ভাষায় 'ইপিফ্যানি', শিল্পীর চেতনায় তিনি প্রয়োগ করেন এই ধর্মীয় শব্দটি। প্রুস্ত-এর কাছে অতীতই বর্তমান, যা ক্ষণকাল পরই মিলিয়ে যায় অতীতে। জয়স-এর কাছে বর্তমানই একমাত্র গুরুত্বপূর্ণ— সে বর্তমান সতত বহমান, যেখানে অতীত অনিবার্যভাবে বিলম্বিত।

প্রুস্ত ও জয়েস-এর তুলনায় অধিকতর সুস্বাস্থ্যের অধিকারী ছিলেন রিচার্ডসন, যদিও তথ্য হিসেবে এটুকু জানানো যেতে পারে যে তিনি দৃষ্টিক্ষীণতায় ভুগতেন রীতিমতো, এবং হয়তো এই কারণেই তাঁর অনুভূতিক্ষমতা সূক্ষ্ম হয়ে থাকবে। প্রুস্ত ও জয়েস-এর তুলনায় শান্ততর ও স্বল্প নাটকীয় জীবন তাঁর, আর তাই সে-জীবন অধিকতর সীমাবদ্ধ। কিন্তু তাঁর অন্তর্জগতের সমাহিত তীব্রতা প্রচণ্ড দাবি জানায় লিপিবদ্ধ হতে, এবং সেহেতু তাঁর উপন্যাস হয়ে ওঠে এমন এক পরীক্ষার ক্ষেত্রে যার মধ্যে তিনি নিজের যাবতীয় সম্পদ ও ভক্তি উজাড় করে দেন। আলোচ্য লেখকত্রয়ীর মধ্যে তাঁরই শিল্পীসত্তা সর্বাপেক্ষা কম, এবং 'পৌরুষময়' উপন্যাসের ধারা প্রতিদ্বন্দ্বিতায় আহ্বান করতে বদ্ধপরিকর। তিনি সচেষ্ট থাকেন নারীর 'দৃষ্টিকোণ' ফুটিয়ে তুলতে, এবং সেই লিখনপ্রক্রিয়া চলাকালীন তিনি রপ্ত করেন লিখনের কারিগরি।

প্রুস্ত-এর উপন্যাস শুরু হয় স্মৃতির প্রত্যক্ষ কথন হিসেবে, আর রিচর্ডসন-এর বেলায় একেবারেই চলতি ধারায়। কিন্তু এ-দুটি উপন্যাসেরই সূচনাংশ পড়ে বোঝার উপায় নেই যে কথাসাহিত্যের শিল্পরূপের এক বৃহৎ পরিবর্তন আসতে চলেছে। বেশ কিছু পৃষ্ঠা পড়ার পরই পাঠক বুঝতে পারেন যে তিনি দাঁড়িয়ে রয়েছেন অভিনব এক উদ্ভাবনের দোরগোড়ায়। অবশ্য তখনও কেউ-কেউ প্রশ্ন তুলতে পারেন যে সত্যি-সত্যিই এ-রচনাদুটি সবচেয়ে নমনীয় সাহিত্যরূপের থেকে আদৌ গুরুতরভাবে পৃথক কিনা, যে-সাহিত্যরূপ ধারণ করে *ট্রিস্ট্রাম শ্যান্ডি* (১৭৬০) ও *দি অ্যামবাসেডরস* (রচনাকাল : ১৯০০-১৯০১, প্রথম প্রকাশ : ১৯০৩)-এর মতো বিপরীতধর্মী নমুনা। কিন্তু জয়েস-এর *আ পোর্ট্রেট অফ দি আর্টিস্ট অ্যাজ আ ইয়ং ম্যান*-এর সূচনাংশ পড়ার বেলায় তার অভিনবত্ব আমরা সহজেই চিনে নিতে পারি, উপন্যাসটির বিশিষ্টতা নিয়ে কোনো প্রশ্ন থাকে না আর।

পড়তে-পড়তে পাঠক একসময়ে বুঝতে পারেন এই রচনাগুলির সঙ্গে প্রচলিত উপন্যাস-পাঠের অভিজ্ঞতা মিলছে না। প্রুস্ত-কে বাদ দিলে অপর দুজন লেখকই তাঁদের আপন-আপন রচনা থেকে লেখক-ব্যক্তিটিকে সরিয়ে নিয়ে পাঠককে রচনার চরিত্রগুলির মানসিক অভিজ্ঞতার মুখোমুখি দাঁড় করান। কথনের বেলায় মাঝেমধ্যে অতীত থেকে বর্তমানে, বর্তমান থেকে অতীতে আসা-যাওয়া করতে দেখা যায়। প্রচলিত ধারার উপন্যাসে যেভাবে কাহিনি রাজকীয় আলস্যে নিজেকে উন্মোচিত করে, এবং সর্বদর্শী লেখক আগাগোড়া কাহিনি বলে যান এবং জেনে বসে থাকেন চরিত্রদের সবকিছু, সে-সব বৈশিষ্ট্য উধাও আলোচ্য রচনাগুলির বেলায়। এক্ষেত্রে লেখক সরে যান দৃশ্যপট থেকে— তাঁকে কখনও-বা অনুপ্রবেশকারী হতে দেখি বটে, কিন্তু সর্বস্থানে তিনি বিরাজ করেন না আর, সর্বঘটেও থাকেন না— আর তাই কথনরীতিতেও পরিবর্তন হয় উল্লেখযোগ্যভাবে। এর জন্য প্রয়োজন হয় চরিত্রের স্মৃতি ব্যবহার করার, যার ফলে পাঠক তাদের অতীতের সঙ্গে সম্পর্কস্থাপন করতে পারেন। এখানে কোনো 'গল্প' নেই,

'আখ্যানভাগ' নেই। এবং সর্বোপরি এধরনের উপন্যাস পাঠককেই করে তোলে লেখক : শেষ পর্যন্ত পাঠকই গল্পে প্রদান করেন সমগ্রতা, আপন বুদ্ধি স্থির রেখে সংগ্রহ করেন বিচ্ছিন্ন তথ্যাদি। বালজাক বা ডিকেনস-এর (১৮১২-১৮৭০) উপন্যাসে পাঠককে আলাদা করে খুঁজে নিতে হয় না কিছু। সেটুকু তাঁর হয়ে লেখকই করে থাকেন। কিন্তু এখানে পাঠককে উদ্যমী হয়ে লেখক-রচিত শব্দ-বাক্য-অনুচ্ছেদ আশ্রয় করে এঁকে নিতে হয় ছবি, গড়ে নিতে হয় পথ, খুঁজে নিতে হয় গন্তব্য। এ এক নতুন ধরনের বাস্তব, যার সঙ্গে আর্নল্ড বেনেট (১৮৬৭-১৯৩১), এচ. জি. ওয়েলস (১৮৬৬-১৯৪৬), জন গলসওয়ার্দি (১৮৬৭-১৯৩৩) বা আনাতল ফ্রাঁস-এর (১৮৪৪-১৯১৪) কথাসাহিত্যের কোনো সম্পর্ক নেই। এই তিন ইংরেজ ও এক ফরাসির নাম বিশেষভাবে করলাম কারণ মনস্তত্ত্বমূলক উপন্যাস নিয়ে পরীক্ষানিরীক্ষা যখন চলছে পুরোদমে, তখন দাপটে লিখে যাচ্ছেন এঁরা। এলোমেলো ভাবনার প্রবাহ এবং ইন্দ্রিয়জগতের সমগ্রতার চিত্রণের জন্য প্রুস্ত-জয়েস-রিচর্ডসন-এর প্রয়াস পূর্ববর্তীদের থেকে অধিকতর সানুপুঙ্খ রীতিতে বোনা। ঘুরিয়ে বলতে গেলে, এই প্রথম আমরা দেখলাম ঔপন্যাসিক সচেষ্ট এমন সব শব্দের সন্ধান পেতে যা পলায়মান ও বিলীয়মান চিন্তারাজি ফুটিয়ে তুলতে পারবে। মনে যে-সব শব্দ খেলা করে, শুধু তারই অনুসন্ধান নয়; অন্তর্জগতের কল্পনার খেলা, ধ্বনি ও গন্ধের একীভবন, প্রত্যক্ষজ অভিজ্ঞতাময় ভুবন— এসবই চিত্রিত করার জন্য শব্দের অন্বেষণ করেন এঁরা। কিন্তু এঁদের প্রয়াস অভিনব মনে হয়নি তৎকালীন একাধিক ধীমান সমালোচকের কাছে। তাঁরা বলেন যে বহু শতাব্দ ধরে, বহু দেশেই লেখকরা প্রয়াসী হয়েছেন অঙ্কিত চরিত্রের ভাবনা ও কল্পনা প্রকাশ করতে। যেমন, ডস্টয়েভস্কি-তে (১৮২১-১৮৮১) কি পাই না আত্মমগ্ন কথন? তাঁর সঙ্গে কতটুকুই বা পার্থক্য জয়েস-এর? *আনা কারোনিনা*-র (রচনাকাল: ১৮৭৫-১৮৭৭; প্রথম প্রকাশ: ১৮৭৭) শেষে কি দেখি না টলস্টয় (১৮২৮-১৯১০) তাঁর নায়িকার অস্থির চিন্তাপ্রবাহ ছিঁড়ে-ছিঁড়ে ফেলছেন টাটকা রঙের গন্ধ দিয়ে আচ্ছন্ন করে? *যুদ্ধ ও শান্তি*-তে (রচনাকাল : ১৮৬২-১৮৬৯; প্রথম প্রকাশ : ১৮৬৯) তো রয়েইছে বেশ কিছু আচ্ছন্নকারী অংশ, যেগুলি আত্মকথনমূলক। এমনটাই বলেন তাঁরা। কিন্তু পার্থক্য রয়েছে, যথেষ্ট গুরুত্বপূর্ণ সে-পার্থক্য। ডস্টয়েভস্কি-র পাত্রপাত্রীদের দেখি না-বলা কথা বলতে ব্যস্ত, এবং যখন তারা তেমনটি বলে না, তখন স্বয়ং লেখক ভাবতে থাকেন তাদের হয়ে। তাদের ভাবনা তিনিই বোনেন; অর্থাৎ এখানে কোনো প্রবহমান চেতনাস্রোত দেখি না, যা পাই তা কথকেরই বর্ণনা; এবং এক্ষেত্রে লেখকই যেহেতু কথক, তাই চরিত্রের মনের গহনে তিনি ডুব দিতে পারেন সহজেই। দৃষ্টান্ত আরও রয়েছে। শেকসপিয়র-এর (১৫৬৪-১৬১৬) কথাই ধরা যাক। তাঁর চরিত্রদের অতুলনীয় স্বগতোক্তি বা আত্মকথন বা 'সলিলকি'-র মধ্যে কি খুঁজে পাওয়া যায় না এসব নবীন উপন্যাসের পূর্বাভাস? কী বলব হ্যামলেট বা ওথেলো-র সেইসব আত্মকথনের বেলায়, যা আজও আমরা উঠতে বসতে আউড়ে থাকি? কিন্তু যদি যত্নসহকারে পড়ি বা শুনি, তবেই বুঝতে পারব যে এদের বিন্যাস গাঠনিক, এখানে মন সাজিয়ে গুছিয়ে উপস্থাপন করে সুসংবদ্ধ ভাবনা, যা মগ্নচৈতন্যপ্রবাহের 'অন্তিম ফল'— এরা কোনো অবস্থাতেই স্বয়ং অবিন্যস্ত প্রবাহ নয়। লিয়র-এর উন্মত্ত ভাষণ যতই হৃদয় মথিত করুক না কেন, একথা বলে দিতে হয় না যে সে-উন্মত্ততায় যুক্তির কোনো অভাব নেই। নিজের অপরাধবোধজনিত ভাবনার ধারাবিবরণী দিয়ে যায় লেডি ম্যাকবেথ, সেখানে নানা প্রসঙ্গ-অনুষঙ্গ গ্রন্থিতও হয়, ক্ষণিকের জন্য সে-চরিত্রের মনের ভেতর প্রবেশের সুযোগও ঘটে আমাদের; কিন্তু তা থেকে নির্গত চিন্তাস্রোত কোনো অবস্থাতেই 'মগ্নচৈতন্যপ্রবাহ' নয়, আধুনিক অর্থে যেমনটি বুঝে থাকি,

যেমনটি পেয়ে থাকি জয়েস ও উইলিয়ম ফকনর-এ (১৮৯৭-১৯৬২)। লেডি ম্যাকবেথ-এর আত্মকথনে এমন কিছু বৈশিষ্ট্য বর্তমান যা আধুনিক 'মগ্নচৈতন্যপ্রবাহ'-য় খুঁজে পাওয়া যায়, যেমন অবচ্ছিন্নতার উপাদান, প্রাসঙ্গিক ও অপ্রাসঙ্গিকের আপাত মিশ্রণ, সেইসব শব্দের অনুপস্থিতি যা নাটকীয়তার বিচারে অবান্তর। বিশ শতকের পূর্ববর্তী বিশ্বসাহিত্যে এমন বহু দৃষ্টান্ত পাওয়া যায় যার সঙ্গে আধুনিক মগ্নচৈতন্যপ্রবাহ অথবা অন্তরাত্মকথনের (ইনটার্নাল মনোলগ) সাদৃশ্য বর্তমান। কিন্তু সেইসব সাদৃশ্যের নিরিখে তুলনা টানলে অগ্রাহ্য করতে হয় প্রথম বিশ্বযুদ্ধের অব্যবহিত পূর্বে ও পরে রচিত কথাসাহিত্যের গভীর তাৎপর্য এবং সেইসব লেখকের গুরুত্ব যাঁরা সচেতনভাবে 'ভিতরপানে' যাত্রা শুরু করেন।

এ-প্রসঙ্গে আরও কয়েকটি কথা বলে রাখা ভালো। ১৯০০ সালে প্রকাশ হয় আর্টুর শ্নিৎস্ল্যর (১৮৬২-১৯৩১)-রচিত বড়ো গল্প 'লয়েট্‌নান্ট গুস্ট্ল'। গ্রন্থাকারে প্রকাশ ১৯০১-এ। সেনাবাহিনীর সম্মানবোধের উদ্দেশে ব্যঙ্গাত্মক এই রচনাটি তৎকালীন সরকারি ও সেনাবিভাগে বিতর্কের ঝড় তোলে। ফলত, শ্নিৎস্ল্যর-কেও সামরিক বিভাগের চিকিৎসা দপ্তরের কর্মচারী পদ থেকে সরে যেতে হয়। এই রচনাটি অন্তরাত্মকথনের এক আদি নমুনা, যেখানে গুস্ট্ল-এর দ্বন্দ্বদীর্ণ চরিত্রটি প্রতিভাত হয় তারই ভাবনা দ্বারা। ১৮৯৮-এ প্রকাশিত একটি গল্পগ্রন্থে (*ফ্রাউ ডেস ভাইজেন*) অন্তর্ভুক্ত 'ডি টোটেন শোয়াইগেন' গল্পটিতেও দেখি ফ্রাউ এম্‌মা-নাম্নী এক রমণী অবৈধ প্রেমের অপযশ থেকে দৈবাৎ রক্ষা পেয়ে প্রায় অন্তরাত্মকথনের ভঙ্গিতে স্বীকারোক্তি করে স্বামীর কাছে। ১৯২৪-এ রচিত আরও একটি বড়ো গল্প 'ফ্রাউলাইন এলজে'-তে শ্নিৎস্ল্যর প্রয়োগ করেন অন্তরাত্মকথনরীতি। এক অপমানিতা কুমারীর ন্যক্কারজনক পরিস্থিতির শিকার হবার ফলে আত্মহননের পথ বেছে নেওয়া— এ-বিষয়টি আগাগোড়া বর্ণিত হয় তারই বাঙ্ময় ভাবনা দ্বারা, যা প্রমাণ করে যে লেখক যথেষ্ট অবহিত ফ্রয়েডীয় মনস্তত্ত্ব সম্পর্কে। ১৯২১-এ জার্মানি-তে ই. লর্ক প্রবর্তন করেন 'অ্যর্লেব্‌টে রেডে' কথাটি, প্রতীতীবাদী ও মনঃসমীক্ষণকারী কথাসাহিত্যশৈলী বোঝানোর জন্য। এটি নিয়ে আধুনিক জার্মন কথাসাহিত্যে যে-চর্চা হয়, তার আলোচনা বা ঋণস্বীকার দেখি না আধুনিক ফরাসি, মার্কিন ও ইংরেজ সমালোচক ও রসসাহিত্যিক মহলে।

অতীতের লেখকরা, বিশেষত উনিশ শতকের ঔপন্যাসিকরা, বিভিন্ন পরিস্থিতির পার্থিব তথ্যনির্ভর চিত্রপরিবেশনে যতটা আত্মবিশ্বাসী, অনুরূপ পরিস্থিতি-সংক্রান্ত মনোজাগতিক তথ্যজ্ঞাপনে ততটা আশাবাদী নন। বালজাক-টলস্টয়-স্তাঁদলে-এর (১৭৮৩-১৮৪২) কাছে কোনো চরিত্রের মনোজগৎ স্বতন্ত্রভাবে উদ্ভাসিত হয় না, তার সঙ্গে যুক্ত থাকে বৃহৎ জাগতিক কর্মকাণ্ড। ফ্লবেয়ার (১৮২১-১৮৮০) ও ডস্টয়েভস্কি এক-একটি চরিত্রের অন্তর্ভুবনে প্রবেশ করেন বহির্ভুবনের পথ ধরে, এবং সেখানে তিনিই একমেবাদ্বিতীয়ম। এবং এঁরা সকলেই এ-ব্যাপারে সহমত যে আত্মবাদী অবস্থা উপন্যাসে বিবৃত করা যায় বটে, কিন্তু সরাসরি দেখানো যায় না। ১৮৮৯-এ প্রকাশ হয় উইলিয়ম জেমস (১৮৪২-১৯১০)-রচিত *প্রিনসিপিলস অফ সাইকোলজি।* এবং তিনিই এই কথাটি প্রত্যয়পূর্ণভাবে অনুমোদন করেন। তিনিই প্রথম ব্যবহার করেন 'স্ট্রিম অফ কনশ্যাসনেস' কথাটি; এই রূপকালংকারটি তিনি ব্যবহার করেন মনের প্রবহণ বর্ণনা করতে, মনের সদা-পরিবর্তনশীলতা বোঝাতে।

উইলিয়ম জেমস-এর মতে আমরা যা কিছু অভিজ্ঞতা লাভ করেছি এবং করে চলেছি, তারই একত্রিত রূপ চৈতন্য। প্রতিটি ভাবনাই ব্যক্তিগত চৈতন্যের অংশ; প্রতিটি ভাবনাই অদ্বিতীয় ও সদাপরিবর্তনশীল। আমাদের ভাবনার ক্ষেত্রে আমরা বাছবিচার করি, বেছে নিই

কোথায় মনোযোগ দেব বা দেব না, মনঃসংযোগ করি শুধু কিছু বিশেষ বস্তু ও এলাকার ওপর যা আমাদের অভিজ্ঞতার সীমানাভুক্ত, আর এইভাবে আমরা অপরাপর বস্তু ও এলাকা প্রত্যাখ্যান করি, তাদের কোনোমতেই স্থান দিই না চিন্তাজগতে। কোনো একটি ভাবনা যখন মনে ঘুরেফিরে বাজতে থাকে, তা কখনওই আগের বারের মতো হয় না। পুনরায় নবীকৃত হবার ফলে সে তার সঙ্গে বয়ে নিয়ে চলে পুনর্নবীকরণের সতেজতা, এবং সেই প্রসঙ্গটি যে-প্রসঙ্গে সে পুনরুত্থিত হয়েছে। "প্রতিমুহূর্তে অভিজ্ঞতা আমাদের পুনর্গঠিত করে চলেছে, এবং প্রতিটি প্রাপ্ত বস্তুর ক্ষেত্রে আমাদের মানসিক প্রতিক্রিয়া আসলে সেই মুহূর্ত পর্যন্ত আমাদের বৈশ্বিক অভিজ্ঞতা দ্বারা উদ্ভূত।" কথাটি শুধু ধারণারই ক্ষেত্রে খাটে না, সংবেদজ উপলব্ধির বেলাতেও খাটে, যেভাবে তারা নিবদ্ধীকৃত হয় চৈতন্য-দ্বারা।

ভাবনার গতি পালটায়। তার রয়েছে "অভিজ্ঞতাপূর্ণ স্পষ্ট আলোকিত কেন্দ্র" যাকে ঘিরে রয়েছে আলো-আঁধারি অঞ্চল— সে-অঞ্চলটি অন্যান্য ভাবনার "প্রান্তরেখা" বা "বিভামণ্ডল"। যাই হোক, উইলিয়ম জেমস-বর্ণিত প্রবহমান ভাবনা মুঠিবদ্ধ ও পরীক্ষা করার দুরূহতাই আসল কথা।

> ভাবনার গতিময়তা এতটাই বাঁধভাঙা যে প্রায় সবসময়ই তাকে রুদ্ধ করার আগে তা আমাদের সিদ্ধান্তে উপনীত করে। কিংবা আমাদের অভিপ্রায়হেতু আমরা যদি তৎপর থাকি যথেষ্ট এবং তাকে অবরুদ্ধ করতে সমর্থ হই, সঙ্গে-সঙ্গে সে আর নিজস্ব অবস্থায় থাকে না। একটি তুষারকণা যেভাবে উষ্ণ হাতে ধরলে তা আর তুষারস্ফটিক না -থেকে জলবিন্দু হয়ে যায়, সেভাবেই, চলমান কোনো ভাবনাকে ধরার অনুভূতির পরিবর্তে, আমরা দেখি যে বন্দি করেছি কোনো অস্তিত্বব্যঞ্জক পদার্থ, সাধারণত উচ্চারিত শেষ শব্দটি, স্থির অবস্থায়; কিন্তু বাক্যটির কাজ, প্রবণতা, এবং বিশেষার্থ ততক্ষণে একেবারেই বাষ্পীভূত। এইসব ক্ষেত্রে অন্তর্দর্শী বিশ্লেষণের প্রয়াস বস্তুতপক্ষে একটি ঘুরন্ত লাট্টু ঘুরতে থাকা অবস্থায় ধরার মতো, কিংবা চট করে আলো নিভিয়ে দিলে কেমন লাগে অন্ধকার দেখতে, সেই চেষ্টা করার মতো।

এর অর্থ কি এই যে ঔপন্যাসিক মনের খেলা ভাষায় প্রকাশ করতে গিয়ে অসম্ভবের পেছনে ধাবমান হন? চৈতন্যকে ভাষায় প্রকাশ করার উদ্‌যোগ নিয়ে, অন্ধকারের ওপর আলো ফেলার চেষ্টাকালে সব সময় অন্ধকারের পরিবর্তে আলো খুঁজতে গিয়ে, হাতের মুঠোয় তুষারকণা ধরে রাখা সত্ত্বেও তা জলবিন্দু হয়ে যাবার বেলায়, তিনি কি প্রথম থেকেই নিয়তি-নির্ধারিত নন, শিকার নন একটানা হতাশার? ঘুরন্ত লাট্টু ধরব, এবং ধরার পরও তা ঘুরতে থাকবে আগের মতো, তা কি কোনো অবস্থাতেই হয় না?

যখন আমরা অতিসাধারণ কোনো কাজ করে থাকি— যেমন মুখোমুখি বসে কোনও বন্ধুর সঙ্গে আলাপচারিতা— তখন চতুর্পার্শ্বস্থ জগৎ সম্বন্ধে আমাদের তাৎক্ষণিক উপলব্ধি, চৈতন্য-অচৈতন্যের ভাবরাশি ঘিরে থাকা সেইসব "প্রান্তরেখা" ও "বিভামণ্ডল" ও অগণ্য প্রত্যক্ষ ধারণা কীভাবে ফুটিয়ে তোলা যায় কথাসাহিত্যে? আলাপকালে বন্ধুর মুখের পুঙ্খানুপুঙ্খ ছবি, তার যাবতীয় অভিব্যক্তি, তার পোশাকের রং, তার কেশবিন্যাস— সবই না হয় ফোটানো গেল। উল্লেখযোগ্য বৈশিষ্ট্যগুলি ভেসে বেড়াতে পারে আমাদের অভিজ্ঞতার আলোকিত কেন্দ্রস্থলে অথবা আবছা প্রান্তরেখায়, যখন আমরা সচেতন কী বলছি তা নিয়ে। আর একই সঙ্গে আমাদের মন খেলা করছে আর-এক স্তরে, যেখানে হয় ধরা পড়ছে আমার উলটোদিকে বসা ব্যক্তি-সম্পর্কে আমার অনুভূতি, নয়তো একেবারে সংযোগহীন

কোনো দূর দৃশ্য— যেমন মাঠ বা নদীতীর, অন্য কারও মুখ, কোনো অলস বিকেলের কথা। এসবই চলতে পারে একসঙ্গে, যখন বন্ধুটির চোখে চোখ রেখে সাজানো গোছানো যুক্তিবদ্ধ কথা বলে যাই, হেসে উঠি, তর্কে মাতি, অথচ কানে ভেসে আসে গাড়ি চলার আওয়াজ, চায়ের কাপে চামচ নাড়ানোর টুংটাং, জানলার বাইরে কোনো প্রতিবেশিনীর চকিত ছবি; সেই সময়ই হয়তো মুখে তুলে নিচ্ছি চায়ের কাপ, তার স্বাদ ও ঘ্রাণ আমাদের পুলকিত বা রুষ্ট করে; এবং যদি প্রুস্ত-এর মতো সম্বন্ধ স্থাপনের প্রবণতা থাকে, তবে চায়ে চুমুক দেবার সঙ্গে-সঙ্গে আমাদের মনে ঢল নামবে অতীতের এরকম অসংখ্য চা-পানের স্মৃতি, এবং সেইসব স্মৃতি-বিজড়িত নানা ছবি ও শব্দ। আর এসবই ঘটে যাবে বন্ধুর সঙ্গে আড্ডা চলাকালীন; বন্ধুটি জানতেও পারবেন না আমার মনে খেলতে থাকা এসব অসংখ্য ভাবের ব্যাপারে— ঠিক যেভাবে আমিও টের পাব না বন্ধুর মনে খেলে যাওয়া ভাবরাশি সম্পর্কে। আমাদের মনে শুধু ততটুকুই ছাপ ফেলবে যতটুকু আমরা প্রকাশ করি কথায়।

এতক্ষণ ধরে যে-উদাহরণ দেবার চেষ্টা করলাম কোনো এক ব্যক্তির মনের নানাবিধ অভিজ্ঞতার যুগপত্তা-বিষয়ে, সেটা চৈতন্যপ্রবাহেরই এক অপটু খসড়ামাত্র। ভাবনার জটিলতা এবং সংজ্ঞাবহ অভিজ্ঞতা সম্পূর্ণভাবে বোঝানো যাবে না কখনওই। একইসঙ্গে এত ছবি, এত ধ্বনি, এত বর্ণ, এত গন্ধ, এত স্মৃতি, এত অনুভূতি কী করে শব্দে সাজানো যাবে, যেখানে প্রতি মুহূর্তে প্রবেশ করছে অপরের কণ্ঠস্বর, এবং সেইসঙ্গে অপরের ছবি, ধ্বনি, বর্ণ, গন্ধ, স্মৃতি ও অনুভূতি? প্রান্তরেখা ও বিভামণ্ডল থেকে কীভাবে সরিয়ে রাখা যাবে ভাবনার কেন্দ্রভাগ? তা সম্ভব নয়, এবং যদি সম্ভবও হত, তবে তা আমাদের পাঠক্রিয়া বিঘ্নিত করত প্রতিমুহূর্তে, আমরা মনঃসংযোগ করতে পারতাম না কিছুতেই। এরকম কোনো উচ্চাকাঙ্ক্ষী সাহিত্যপ্রয়াস যে-কোনো ক্ষেত্রেই ব্যর্থ হবে, তার কোনো সাহিত্যমূল্য থাকবে না।

হয়তো এই কারণে বালজাক ও ডস্টয়েভস্কি ঠিকই বলেছিলেন যখন তাঁরা চরিত্রের ভাবনা পরিপাক করা ও সংবেদন শব্দে অনুবাদ করার প্রয়োজন স্বীকার করেন। কিন্তু তাঁরা সেই সময়ে যে-ব্যাপারটি গোচরে আনেননি তা হল চরিত্রের মনের ভেতর পাঠকের উপস্থিত থাকার বিভ্রম সৃষ্টি করেন লেখক, ঠিক যেভাবে কোনো গৃহাভ্যন্তরের দৃশ্য জীবন্ত করেন উনিশ-শতকি ঔপন্যাসিক খুঁটিনাটি বিবরণের সাহায্যে, এবং তা এমনভাবে যে মনে হয় আমরা সত্যি-সত্যিই প্রবেশ করেছি কোনো সরাইখানা বা পল্লিকুটির বা বেশ্যালয়ে। উনিশ-শতকি ঔপন্যাসিক যা বুঝতে পারেননি তা হল একটি গৃহাভ্যন্তরের দৃশ্য শুধুই বস্তুসামগ্রীর বিবরণ ছাড়াও সেখানে উপস্থিত মানুষজনের তীব্র আবেগ-অনুভূতির বর্ণনার সাহায্যেও জীবন্ত করে তোলা যায়। বিশ শতকের দুইয়ের দশকে অনেক সমালোচকই ভুল পথে চালিত হন (যদিও পরে সংশোধন করেন) যখন বলেন যে *ইউলিসিস*-এর রচয়িতা চরিত্রদের চিন্তাভাবনা যথাযথ চিত্রণ করেননি। তাঁরা আশা করেছিলেন যে জয়েস মুভি ক্যামেরা তাক করে বসে থাকবেন মলি, স্টিভন ও লেপোল্ড-এর মনে আর পাঠককে ঠিকঠাক জানিয়ে যাবেন ওখানে ঘটে চলা যাবতীয় কাণ্ড-কারখানা। এমনকি কথাসাহিত্যের শিল্পকৌশলে সুদক্ষ ইডিথ হোঅর্টন-এ (১৮৬২—১৯৩৭) মগ্নচৈতন্যপ্রবাহী রচনারীতি সম্পর্কে বলেন যে এখানে ভাবনা ও ধারণার 'পাঁচমিশালি প্রাচুর্য'। এঁরা কেউই বুঝতে পারেননি যে জয়েস সচেষ্ট ছিলেন নিশ্ছিদ্র নির্বাচন ও বিন্যাসে, যখন মনে হয় তিনি সুপ্রচুর সম্পর্কহীন বিষয়বস্তু তুলে আনছেন, তখনও। তাঁর নির্বাচনের উদ্দেশ্য এই বিভ্রম সৃষ্টি

করতেই যে কোনো নির্বাচনই ঘটেনি আসলে। কারণ তিনি এ-ব্যাপারে সচেতন ছিলেন যে তাঁর কাজ সেইসব বস্তু শব্দে রূপান্তরিত করা যারা তাদের বিলীয়মানতা-বৈশিষ্ট্যহেতু যে-কোনো শাব্দিক বর্ণনার বিরোধিতা করে।

এখান থেকে আমাদের আবার ফিরে যেতে হবে পুরোনো কথায়, শিল্পসাহিত্যের ইতিহাসের সেই পর্যায়ে যখন প্রকৃতিবাদের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ ঘোষণা করেন প্রতীকীবাদীরা। সেইসঙ্গে আমাদের মনে পড়ে যায় উনিশ শতকের আটের দশকের কথা, যখন উপন্যাস-কেন্দ্রিক এক যুগান্তকারী বিতর্কে লিপ্ত ছিলেন স্যর ওয়াল্টার বেসান্ট (১৮৩৬ —১৯০১) ও হেনরি জেমস (১৮৪৩—১৯১৬), এবং থেকে-থেকে তাল ঠুকছিলেন রবর্ট লুই স্টিভেনসন (১৮৫০—১৮৯৪)। শেষোক্তজনই মূল বিষয়টিতে প্রদান করেন স্বচ্ছতা :

> জীবন দানবিক, অসীম, যুক্তিহীন, আকস্মিক ও অপ্রত্যাশিত এবং তীক্ষ্ণ; একটি শিল্পকর্ম সে-তুলনায় পরিপাটি, অসীম, স্বয়ংসম্পূর্ণ, যৌক্তিক, প্রবহমান ও হীনবীর্য। অসম্বদ্ধ বজ্রের মতো পাশবিক শক্তি দ্বারা কর্তৃত্ব ফলায় জীবন; এক বিচক্ষণ বাদক যেরকম কৃত্রিমভাবে বাতাস ধ্বনিত করেন সেইভাবে শিল্পকলা আমাদের মর্মে প্রবেশ করে অভিজ্ঞতার তীব্রতর শব্দ ছাপিয়ে...শিল্পকর্ম হিসেবে উপন্যাস বিরাজ করে, জীবনের সঙ্গে তার সাদৃশ্য থাকার জন্য নয়, কারণ জীবন বাধ্যতামূলক ও বস্তু-সম্পর্কিত, যেমন একপাটি জুতো শেষ পর্যন্ত চামড়ারই, কিন্তু জীবনের সঙ্গে তার পরিমাপের অতীত বৈসাদৃশ্য থাকার জন্যই, কারণ সে পরিকল্পিত ও গুরুত্বপূর্ণ, এবং একই সঙ্গে কর্মটির প্রণালী ও অর্থের দ্যোতক।

উপর্যুক্ত অংশটিতে 'জীবন' শব্দের পরিবর্তে যদি বসানো যায় 'ভাবনা' বা 'প্রত্যক্ষজ অভিজ্ঞতা', তবেই স্টিভেনসন-এর বক্তব্য সমান জোরালোভাবে খাটে আত্মবাদী উপন্যাসের বেলায়।

একই বিতর্কে হেনরি জেমস অভিজ্ঞতার সংজ্ঞার্থ ও কথাসাহিত্যের ভুবনের পরিধি বাড়ান আত্মবাদী বিশ্ব অন্তর্ভুক্ত করার জন্য :

> মানবজীবন বিপুল ও বহুরূপী; সবচেয়ে বেশি আমরা যা করতে পারি তা হল এই কথাটি স্বীকার করা যে কথাসাহিত্য-পুষ্পের কোনো-কোনোটি মানবজীবনের ঘ্রাণযুক্ত, কোনোটি নয়; আপনার পুষ্পস্তবক কী দিয়ে গঠিত হবে, তা আগে-ভাগে বলে দেওয়া অবশ্য অন্য ব্যাপার। একইভাবে চমকপ্রদ ও সিদ্ধান্তহীন এমন কথা বলা যে একজন লিখবেন অভিজ্ঞতা থেকে; আমাদের নকল দাবিদারের পক্ষে এমন ঘোষণা বিদ্রূপাত্মক। কী ধরনের অভিজ্ঞতা আশা করা হচ্ছে, এবং কোথায়ই বা তার শুরু ও শেষ? অভিজ্ঞতা কখনওই সীমাবদ্ধ নয়, এবং সম্পূর্ণ নয় কখনওই; তা এক বৃহৎ বেদিতা, একপ্রকার অতিকায় উর্ণনাভ, যা রেশমি সুতোসমেত ঝুলে রয়েছে চৈতন্যের কক্ষে, এবং বাতাসে ভাসমান প্রতিটি ধূলিকণা শুষে নেয় নিজের কোষসমূহে। তা মনেরই পরিবেশ; এবং মন যখন কল্পনাপ্রবণ হয়— তা অনেক বেশি হয় যখন সেই মনের অধিকারী হন প্রতিভাবান— তা সাড়া দেয় জীবনের ক্ষীণতম ইঙ্গিতে, বায়ুর একান্ত কম্পন সে রূপান্তরিত করে উপলব্ধিতে।

"মনের পরিবেশ" কথাটি হেনরি জেমস বলামাত্রই আমরা আশ্বস্ত হই, কারণ বুঝতে পারি এতক্ষণে এই দুটি শব্দ সেই বিষয়টি অনেকাংশে প্রাঞ্জল করতে সমর্থ হয়েছে যা ঔপন্যাসিকরা তাঁদের চরিত্রদের আত্মবাদী জীবন আঁকার সময়ে ফোটাতে চান। যখন ঔপন্যাসিকরা মনের অভিজ্ঞতা প্রকাশ করতে চান তাঁদের উদ্ভাবিত প্রকরণ দ্বারা— এবং এই প্রকরণ উদ্ভাবনের বেলায় তাঁরা অতীব ক্ষমতাবান— কিংবা আশ্রয় নেন

প্রুস্তীয় প্রথম পুরুষের আত্মবিশ্লেষণে, তখন তাঁরা অনিবার্যভাবে চেষ্টা করেন পাঠকের হয়ে এই মনের পরিবেশ করায়ত্ত করতে।

যে-মুহূর্ত থেকে তাঁরা তা শুরু করেন, কিছু-কিছু গুরুত্বপূর্ণ সমস্যা মাথাচাড়া দেয় লেখক ও তাঁর চরিত্রদের সম্পর্ক এবং লেখক-পাঠকের সম্পর্ক নিয়ে। লেখকের কাছে প্রাথমিক সমস্যা হল কোন প্রকার মন তিনি নির্বাচন করবেন। এটা নিতান্তই স্পষ্ট যে যত নিষ্প্রভ হবে সে-মন, তত বেশি লেখককে উদ্ভাবনশক্তিসম্পন্ন হতে হবে পাঠকের আগ্রহ ধরে রাখার জন্য। নির্বাচন সাঙ্গ হলে তিনি সম্মুখীন হন দ্বিতীয় সমস্যার : কোনো-না-কোনোভাবে কল্পিত চরিত্র থেকে নিজেকে বিচ্ছিন্ন করে নেবেন লেখক, কিন্তু তা করবেন কীভাবে? ভাবনারাশি— তা মগ্নচৈতন্যপ্রবাহ বা অন্তরাত্মকথন— যাই হোক না কেন, নিজেরাই নিজেদের কথা বলবে, এবং সেখানে অনুপ্রবেশ করবে না কথক। "আপন রচনার ক্ষেত্রে লেখককে হতে হবে সৃষ্টিকর্মে লিপ্ত ঈশ্বরের মতো, অদৃশ্য ও সর্বশক্তিমান; সর্বত্র তিনি অনুভূত হবেন কিন্তু তাঁকে দেখা যাবে না কোথাও।" বহুকাল আগে এমনটাই বলেন ফ্লবেয়ার। আর তেন (১৮২৮-১৮৯৩)-এর মতে শিল্পী ছিন্ন করবেন তাঁর সৃষ্টির সঙ্গে যুক্ত গর্ভনাড়ি। আত্মবাদী কথাসাহিত্য রচনার বেলায় জয়েস এই সমস্যারই সম্মুখীন হন, এবং ফ্লবেয়ার-এর কথাই প্রতিধ্বনিত করেন যখন নাটকীয় শিল্পী সম্পর্কে বলেন যে তিনি "সৃষ্টিকর্তা ঈশ্বরের মতো, আপন কর্মের ভেতর বা আড়ালে বা দূরে বা ঊর্ধ্বে বিরাজ করেন...নখ কাটতে-কাটতে।" এবং এখান থেকে উঠে আসে আর-একটি প্রশ্ন : লেখক কি তাঁর নিজেরই মনের উপাদানের ওপর নির্ভরশীল (কারণ সৃষ্টিকালে শুধু সেই মনটিই তো তিনি ব্যবহার করতে পারছেন); সত্যিই কি তাঁর চরিত্রদের থেকে বিচ্ছিন্ন করতে পারেন নিজেকে; অর্থাৎ চরিত্রদের আত্মপ্রকাশ বাস্তবে লেখকের নিজেরই আত্মপ্রকাশ কিনা। অন্য কথায় : একটি আত্মবাদী উপন্যাস কি ছদ্মবেশী আত্মজীবনী নয়?

এইসব সমস্যা দুরূহ, সন্দেহ নেই, কিন্তু দুরূহতম সমস্যাটি এখনও রয়ে গেছে আলোচনার জন্য। যখন একটি বিশেষ মন বর্ণনার্থে প্রয়াস নেওয়া হয়, তখন সেই মনের সঙ্গে পাঠকের মনের মিলন সাধিত হয়। দুটি মানসিক পরিবেশ মিশে যায় একে অপরের সঙ্গে। পুরোনো আমলের উপন্যাসের এ-বালাই ছিল না। পাঠককে গল্প বলা হত। পাঠক শুনে যেতেন। প্রাথমিকভাবে তিনি উপন্যাসে আকৃষ্ট হতেন একটি-না-একটি চরিত্রের সঙ্গে মিল খুঁজে পেয়ে। হালের মনস্তাত্ত্বিক উপন্যাসে পুরোনো ধারণা অনুযায়ী কোনো 'গল্প' নেই, এবং এক-একবারে হাজির থাকে শুধু এক-একটি চরিত্র, যার মধ্যে পাঠক নিজেকে খুঁজে পেতে সচেষ্ট থাকেন। যদি লেখক সমর্থ হন পাঠককে এই একক চৈতন্যের প্রতি আকৃষ্ট করতে, তিনি কৃতকার্য হবেন পাঠককে চরিত্রটির সঙ্গে যুগপৎ অনুভব করানোয়: এবং পাঠক তা করেন তখনই যখন চরিত্রটির মধ্যে তিনি খুঁজে পান নিজেকে।

জয়েস বা ফকনার-এর উপন্যাসের প্রধান বৈশিষ্ট্য এই যে যতক্ষণে তা পড়া শেষ হয়, ততক্ষণে আমরা পরিভ্রমণ সাঙ্গ করি বিভিন্ন চরিত্রের মনোজগতে। দৈনন্দিন জীবনে তা সম্ভবপর নয়, কারণ সেখানে আমরা শুধু একটি চৈতন্যেই আবদ্ধ, এবং তা আমাদের নিজের-নিজের। এইভাবে চরিত্রদের মানসিক অভিজ্ঞতার সঙ্গে আমাদের সরাসরি সংযুক্ত করে, মনস্তাত্ত্বিক উপন্যাস এক গুরুত্বপূর্ণ মাত্রা প্রদান করে কথাসাহিত্যশিল্পে। *ইউলিসিস* বা *দ্য সাউন্ড অ্যান্ড দ্য ফিউরি* (১৯২৯) পড়ার অর্থ নিজেদের অভিজ্ঞতার পরিধি বাড়ানো, যা পূর্বে ঘটেনি। পুরোনো দিনের উপন্যাস-পাঠক পড়তে বসে লেখক মহাশয়ের কাছে এক সাধারণ দাবি পেশ

করতেন : "আমাকে মজিয়ে রাখুন গল্পে।" কিন্তু ব্যাপারটা উলটে গেছে আত্মবাদী উপন্যাসের বেলায়। এই ধারার উপন্যাস-লেখক বলেন পাঠককে : "এখানে রয়েছে একটি মনের শৈল্পিক বিবরণ, ঠিক সেই মুহূর্তে যখন সে চিন্তারত— তার ছবি বিধৃত এখানে; আপনি চেষ্টা করুন প্রবিষ্ট হতে। আপনি শুধু ততটুকুই জানতে পারবেন যতটুকু সেই মন উন্মোচন করতে আগ্রহী। যদি কোনো 'গল্প' খুঁজে পান, তার আলাদা-আলাদা টুকরো জোড়া লাগাবেন আপনিই, আমি নই। অবশ্য আপনার জন্য বিভ্রমের ব্যবস্থা করে দিয়েছি। কিন্তু আপনাকেই লাভ করতে হবে তার অভিজ্ঞতা।"

বাস্তবে এটা একেবারেই কাকতালীয় নয় যে বিশ শতকের গোড়ায় প্রুস্ত, জয়েস ও রিচার্ডসন একসঙ্গে উদ্যোগী হন মনস্তাত্ত্বিক উপন্যাস রচনায়। এঁরা তিনজনই রোমান্টিক উনিশ শতকের সন্তান ; যুক্তিবাদ ও যুক্তি-অন্বেষণ যখন পথ ছেড়ে দেয় সংবেদন ও অন্তর্দর্শনকে। ক্লাসিসিজম যদি হয় ধী ও প্রশান্তির সমার্থক, তবে রোমান্টিসিজম আত্মমগ্নতা ও প্রবহণের। রোমান্টিক নায়কের যাত্রা শুরু আপন হৃদয়ের প্রতি ধ্যানাভিমুখী অবস্থায়; তার যাত্রার পরিসমাপ্তি ঘটে মনের প্রতি তদ্গত হবার দ্বারা। এবং তিনি আবিষ্কার করেন যে হৃদয়— সংবেদন ও প্রত্যক্ষকরণের প্রতীক, এবং মন— চিন্তা ও যুক্তির প্রতীক, নিবিড়ভাবে সংযুক্ত। হৃদয় যা অনুভব করে প্রায়শই তা ব্যাখ্যা করতে সচেষ্ট থাকে মন।

ইংরেজি সাহিত্যে মনস্তাত্ত্বিক উপন্যাসের আকস্মিক সূচনা ঘটে স্যামুয়েল রিচার্ডসন (১৬৮৯-১৭৬১) দ্বারা, পত্রোপন্যাস রচনার মাধ্যমে (*পামেলা*, ১৭৪০), যে-প্রকরণের সাহায্যে পাঠককে নিয়ে আসা যায় চরিত্রের চিন্তা-ভাবনা-অনুভূতির কাছাকাছি। আর ফরাসি সাহিত্যে এর সূচনা অ্যাবেই প্রেভস্ত-এর (১৬৯৭-১৭৬৩) *মানঁ ল্যাকো-র* (১৭৩১) সঙ্গে-সঙ্গে, যদিও এটি পত্রোপন্যাস নয়। পত্রোপন্যাসের মাধ্যমে ফরাসিদের মনস্তাত্ত্বিক সন্ধান চালাতে দেখি আরও পরে, লাক্‌ল (১৭৪১-১৮০৩) রচিত *ল্য লিয়াইসঁ দাঁজরস* (১৭৮২) থেকে। এইসব উপন্যাসের দৃষ্টান্ত পথ করে দেয় আত্মসচেতন মনস্তাত্ত্বিক উপন্যাসের, যেখানে চিন্তা-ভাবনা-অনুভূতির পুনর্সৃষ্টি ঘটে। স্যামুয়েল রিচার্ডসন সম্পর্কে কোলরিজ (১৭৭২-১৮৩৪) বলেন যে তিনি ফুটিয়ে তুলেছেন মনের সামগ্রিক প্রবহণ ও পুনর্প্রবহণের মধ্যে বা আত্মবিজড়িত স্বপ্নতুল্য প্রবহমানতায় যাবতীয় ভাবনা ও অনুভূতির রোগগ্রস্ত চৈতন্য। সেই সমালোচনাই অনুসরণযোগ্য ও মৌলিক চিন্তাসমৃদ্ধ যা অতীত কীর্তির বিচার করতে-করতে ভবিষ্যৎ অবলোকন করে। "মনের প্রবহণ ও পুনর্প্রবহণ"-এর কথা লিখতে গিয়ে কোলরিজ বাস্তবে সেই কাজেরই বর্ণনা করেন যা আগামী দিনে করতে উদ্যোগী হবে মগ্নচৈতন্যপ্রবাহী উপন্যাস। 'চৈতন্যের সন্ধ্যালোকিত এলাকা' এবং "অন্তরতম সত্তার প্রণালী"-র কথা কোলরিজ-ই বলেন "অবিশ্বাসের স্বেচ্ছাকৃত নিলম্বন" বর্ণনাকালে, যা প্রত্যেক লেখকই আশা করেন তাঁর পাঠকের কাছে। একই ভাবনা প্রকাশ করেন মোপাসাঁ (১৮৫০-১৮৯৩), যখন লেখেন : "সত্যকে প্রকাশ করতে হলে...মায়ালোক সম্পূর্ণ বিশ্বাসযোগ্য করে তোলা চাই...এর জন্য প্রতিভাবান বাস্তববাদীদের কৃতজ্ঞচিত্তে স্মরণ করতে হবে মায়াবাদীদেরই।" আর বোদলেয়ার (১৮২১-১৮৬৭) বলেন "বিশুদ্ধ শিল্প"-র কাজ হল 'ইঙ্গিতময় ইন্দ্রজাল' অভিব্যক্ত করা। জুল লাফর্গ (১৮৬০-১৮৮৭) নিজেকে পুনঃপ্রকাশ করেন একই কথা লিখে : 'শিল্পকর্ম কখনই পলায়নপর বাস্তবের সমতুল্য হতে পারে না।' প্রতীকীবাদী ও প্রকৃতিবাদীদের মধ্যে বৈরিতার নিরসন না-ঘটলেও, উভয়পক্ষের দৃষ্টিভঙ্গি মূলগতভাবে অভিন্ন। প্রকৃতিবাদীরা তথ্যবোঝাই প্রামাণ্য দলিলের পাহাড় তৈরি করে

আর প্রতীকীবাদীরা প্রতীকের অনিঃশেষ মিছিল নিয়ে যা সৃষ্টি করতে সচেষ্ট ছিলেন তা বাস্তবের মায়া।

আধুনিক মনস্তাত্ত্বিক উপন্যাস এই অর্থে 'আধুনিক' (গত শতকের প্রথম ভাগ পর্যন্ত কথাটা খাটে অবশ্য) যে সে প্রতিফলিত করে বিশ শতকের অন্তরের গভীরতর ও নিবিড়তর অনুসন্ধানপ্রক্রিয়া, বিশ শতকের অন্তর্মুখিতা ধরা পড়ে এই বিশেষ ধারার কথাসাহিত্যের মাধ্যমে। এই অন্তর্মুখী যাত্রার সূচনাসংগীত শুনি উইলিয়ম জেমস ও আঁরি বার্গসঁ-র (১৮৫৯-১৯৪১) রচনায়, এবং তাঁদের পর পরীক্ষামূলক ও নিদানিক স্তরে, সিগমুন্ড ফ্রয়েড (১৮৫৬-১৯৩৯)-এর রচনায়। অবশ্য মনস্তত্ত্বচর্চার উদ্যোগ আরও আগে নিতে দেখি হিউম (১৭১১-১৭৭৬), লক (১৬৩২-১৭০৪), বার্কলি (১৬৮৫-১৭৫৩) ও মিল (১৮০৬-১৮৭৩) প্রমুখ চিন্তাবিদকে। তাঁদের সাহসী প্রয়াসের পরিণতি দেখি ফ্রয়েড-এ। এবং যখন প্রুস্ত, জয়েস ও ডরোথি রিচার্ডসন লেখা শুরু করেন, তখন সবে ফ্রয়েড-এর প্রভাব অনুভূত হতে শুরু করেছে। প্রুস্ত ও কিয়দংশে জয়েস-এর ভূমিকার কথা যদি স্মরণ করি, তবেই বোঝা যাবে যে এঁরা সেই বৌদ্ধিক পরিবেশের প্রকৃত স্রষ্টা, যে-পরিবেশে জন্ম নেয় আত্মবাদী উপন্যাস। এবং যেরকমটি দেখা গেছে প্রায়শই, দার্শনিক চিন্তার পরিবর্তন সূচিত করেছে শিল্পকলার কৌশলগত উদ্‌ভাবন।

আমরা জানি যে প্রুস্ত সাময়িকভাবে বার্গসঁ-র অধীনে শিক্ষালাভ করেন এবং পাঠ করেন বার্গসঁ-র রচনাদি। অবশ্য বার্গসঁ-র উল্লেখ তিনি করেন একবারই, *সিটিজ অফ দ্য প্লেইন*-এ (*সদম এ গমর*, প্রথম খণ্ড : ১৯২১, দ্বিতীয় খণ্ড : ১৯২২, প্রথম ইংরেজি সংস্করণ : ১৯২৮), স্মৃতির ওপর নিদ্রাকর্ষক ওষুধের প্রভাব বর্ণনাকালে। বার্গসঁ-র পরিভ্রমণের কেন্দ্রে থাকে স্মৃতি, এবং প্রুস্ত-এর ক্ষেত্রেও তা থাকে অনুরূপভাবে। বার্গসঁ-র ধারণায় সময়— *লা দুরে*— যা অস্তিত্বের পরিমাপ, "অতীতের অদৃশ্য অগ্রবর্তিতা, যা ভবিষ্যৎকে যন্ত্রণাদীর্ণ করে",' সৃষ্টিকর্মের বিবর্তনে অতীতের ব্যবহার-বিষয়ক তাঁর গবেষণাপত্র, স্বজ্ঞা ও বাস্তব প্রসঙ্গে তাঁর আলোচনা, অভিজ্ঞতার প্রবহণ সম্পর্কে তাঁর বিশ্বাস— এইসব যত্নসহকারে পাঠ করেন প্রুস্ত। উইলিয়ম জেমস্-এর মতোই, বার্গসঁ-ও শেখান আমরা প্রতিদিন প্রতিনিয়ত অভিজ্ঞতা দ্বারা নিজেদের আগের ছাঁচ ভেঙে ফেলে গড়ে তুলছি নতুন ছাঁচ; তাঁর বিচারে চৈতন্য অনিঃশেষ উপলেপ-প্রক্রিয়া, যতক্ষণ পর্যন্ত মন ও ইন্দ্রিয় সচল; তাঁর দৃষ্টিতে চৈতন্য " জীবন্ত বর্তমানে অনিশ্চিত অতীতের প্রবহমানতা।" এবং এর থেকে যে-কথাটি বেরিয়ে আসে তা হল সময় নিয়ে বিভোর থাকা-ই মনস্তাত্ত্বিক উপন্যাসের কেন্দ্রীয় বিষয়। ঘড়ির কাঁটা একটানা সময় মেপে চলে নিয়মিতভাবে, কিন্তু চৈতন্য কখনও কখনও একটি ঘণ্টাকে মনে করায় একটি দিনের মতো বা একটি দিনকে একটি ঘণ্টার মতো। মনের ভেতর মিলেমিশে যায় অতীত ও বর্তমান : সহসা আমরা স্মরণ করি কোনো শৈশবস্মৃতি, যা কালের নিরিখে সুদূর; কিন্তু শৈশবের সেই ছবিতে স্মৃতি স্পষ্ট হয়ে ওঠে সঙ্গে-সঙ্গে এবং পুনর্জীবিত হয় সেই মুহূর্তে যে-মুহূর্তে তাকে স্মরণ করা হয়েছে। সুতরাং, অঙ্কিত চরিত্রের মনের মধ্যে প্রবাহিত ভাবনা লিপিবদ্ধ করার মাধ্যমে ঔপন্যাসিক বর্তমান মুহূর্তকেই ধরেন ও লিপিবদ্ধ করেন— অন্য কিছু নয়। তাই, এটা কোনো দুর্ঘটনা নয় যে *ইউলিসিস*-এ জয়েস সচেষ্ট হবেন শুধুমাত্র একটি দিনের বিবরণী রচনা করতে করতে এবং ভার্জিনিয়া উলফ (১৮৮২-১৯৪১) বিভোর থাকবেন "মুহূর্ত" নিয়ে।

অবশ্য প্রুস্ত-কে শুধুমাত্র বার্গসঁ-র সঙ্গে সংযুক্ত করলে ভুল হবে। বার্গসঁ-র মধ্যে তিনি পান কিছু গুরুত্বপূর্ণ এবং রুচি-অনুকূল দার্শনিক ও মনস্তাত্ত্বিক চিন্তা; তাদের শৈল্পিকভাবে প্রকাশ

করতে তিনি মুখ ফেরান সেই সাহিত্য আন্দোলনের দিকে যা তাঁর পরিণত পর্যায়ে তুঙ্গস্পর্শী ছিল। এবং সেই আন্দোলনকারীরা, অর্থাৎ প্রতীকীবাদীরা যা বিশ্বাস করতেন— শিল্পের ক্ষেত্রে— তা বার্গসঁবাদেরই নিকটবর্তী। বার্গসঁ বর্ণনা করেন জীবনের প্রবহণের। প্রতীকীবাদীরা তা-ই বিধৃত করতে চান শব্দে। তাঁদের বক্তব্য-অনুযায়ী অভিজ্ঞতার বিলীয়মানতা সাহিত্যে মূর্ত হয় শুধুমাত্র প্রতিরূপ ও প্রতীক ব্যবহারেরই মাধ্যমে। মনের প্রকাশের জন্য প্রয়োজন মনেরই শাব্দিক সৌন্দর্য। জুল লাফর্গ বলেন, "আমার কী-বোর্ড পালটাচ্ছে সবসময়, এবং আর কোনো কী-বোর্ড নেই যা আমার কী-বোর্ডের মতো।" সামগ্রিক বিচারে প্রুস্ত-এর উপন্যাসের শিকড় এই প্রতীকীবাদী আন্দোলনের গভীরে নিহিত।

এবার আসা যাক জয়েস-প্রসঙ্গে। চরিত্র ও ব্যক্তিত্ব হিসেবে তিনি জটিল। মনের পুষ্টি সংগ্রহ করেন অ্যাকুইনাস (১২২৫-১২৭৪) ও ভিকো (১৬৬৮-১৭৪৪) থেকে, সজাগ ছিলেন সমকালীন যাবতীয় সাহিত্য আন্দোলন-সম্পর্কে। আর তাই তাঁর মধ্যে বহু উৎসধারার প্রভাব কার্যকর ছিল। এ-ব্যাপারে বহু গবেষণা হয়েছে এবং হবেও নিশ্চয়ই আরও। কিন্তু এক্ষেত্রে একটি উৎসই আমাদের প্রধান বিবেচ্য। এটি নিয়ে অনেক কথা বলেন জয়েস স্বয়ং, কিন্তু দীর্ঘদিন পর্যন্ত তাঁর কথায় তেমন আমল দেওয়া হয়নি। কুড়ি বছর বয়সে জয়েস পড়েন ১৮৮৮-তে রচিত একটি ফরাসি উপন্যাস। সালটি দেখেই আশা করি বোঝা যাচ্ছে তখন প্রতীকীবাদী আন্দোলনের চূড়ান্ত পর্ব। উপন্যাসটির রচয়িতা এদুয়ার দুজারদ্যাঁ (১৮৬১-১৯৪৯), এবং এর ফরাসি নাম *লে লরিয়ে সঁ কুপে* (১৮৮৮; ইংরেজি সংস্করণ : *উই'ল টু দ্য উডস নো মোর*)। ডাবলিন-এ এটির কথা বলেন জর্জ মুর (১৮৫২-১৯৩৩)। তা ছাড়া দুজারদ্যাঁ তাঁর বন্ধুও বটে। জয়েস অভিভূত হন এর কথনকৌশল সম্পর্কে জানতে পেরে। রচনার আগাগোড়া পাঠক নিজেকে দেখেন প্রধান চরিত্রের মনের ভেতর। 'ঘটনা' বলতে আমরা সাধারণত যা বুঝি, তা খুবই কম ঘটে এ-উপন্যাসে। এক নিষ্কর্মা শহুরে তরুণ প্রেমে পড়ে এক অভিনেত্রীর। মহিলাটি তার কাছ থেকে খালি টাকা চায়; তরুণটি তাকে দিয়েই যায় এ-আশা নিয়ে যে একদিন-না-একদিন তার ভালোবাসার নারী তাকে মিষ্টি কথা আর হাসির অধিক কিছু দেবে। কিন্তু তার আশা দুরাশামাত্র। মূল ঘটনা— উপন্যাসটির মতোই— সাদামাঠা। আজ ভাবতে আশ্চর্য লাগে যে এটি *ইউলিসিস*-এর মতো উচ্চ মানের রচনার আড়ালে প্রভাববিস্তারী ভূমিকা পালন করে কী করে। তবু জয়েস-কে যখনই প্রশ্ন করা হয় যে তাঁর মগ্নচৈতন্যপ্রবাহের কৌশল তিনি কোথা থেকে পেয়েছেন, জয়েস সবসময় ঋণস্বীকার করেন দুজারদ্যাঁ-র কাছে। *ইউলিসিস* প্রকাশের সময়ে বেঁচেছিলেন দুজারদ্যাঁ, যদিও দীর্ঘকাল যাবৎ বিস্মৃত। জয়েস-এর স্বীকৃতির মাধ্যমে তিনি পুনর্জন্মপ্রাপ্ত হন। এক মৃত লেখককে পুনরায় 'বাঁচিয়ে তোলা'-র জন্য দুজারদ্যাঁ-ও ঋণস্বীকার করেন জয়েস-এর কাছে। তাঁর উপন্যাসটি পুনর্মুদ্রিত হয়। এর ভূমিকা লেখেন ভালেরি লার্বো (১৮৮১-১৯৫৭), সেই স্বনামধন্য ফরাসি সমালোচক, যিনি *ইউলিসিস*-এর হোমারিক গঠন ব্যাখ্যা করেন প্রথম। দুজারদ্যাঁ-র উপন্যাসটি সমালোচিত হয় টাটকা উপন্যাসেরই কদর পেয়ে, এবং এর বর্ণনকৌশলে লার্বো খুঁজে পান অন্তরাত্মকথন। ১৯৩০-এ একটি বক্তৃতাকালে দুজারদ্যাঁ সচেষ্ট হন অন্তরাত্মকথনের সংজ্ঞার্থ নির্ণয় করতে, এবং এই কথাটি প্রথম ব্যবহারের সম্মান অর্পণ করেন পল বুর্জে-কে (১৮৫২-১৯৩৫)। কিন্তু বুর্জে-র সময়ে 'মনস্তত্ত্ব' বলতে যে-ধারণা ছিল, এবং তার প্রতি বুর্জে আকৃষ্ট ছিলেন যতটা, সে-কথা বিচার করলে আত্মবাদী বা মগ্নচৈতন্যপ্রবাহী উপন্যাসের ক্ষেত্রে শব্দটি প্রথম প্রয়োগের কৃতিত্ব লার্বোর-ই লাভ করা উচিত। তাঁর স্মৃতিকথায় মেরি কলাম (১৮৮৪-১৯৫৭) দাবি করেন যে

জয়েস-কৃত দুজারদ্যাঁ-র উপন্যাসের পুনরুজ্জীবন বাস্তবিক একটি বড়োসড়ো ধোঁকা, জয়সীয় রসিকতার নকশাদার নমুনামাত্র। যদি কলাম-এর কথা ঠিক হয় তবে ব্যাপারটি সত্যিই এক নিষ্ঠুর রসিকতা— এক প্রবীণ ও সম্মাননীয় সাহিত্যিকের প্রতি; এবং সাহিত্যমহলে তা যে বিশ্বাস করা হয়েছে, এটা আরও হাস্যকর! কিন্তু দুজারদ্যাঁ-র উপন্যাসটির পাঠকমাত্রই জানেন প্রকৃত সত্য কী। আজ উপন্যাসটি যতই ধূসর ও সুদূর হোক না কেন, একথা সন্দেহাতীত যে ওই রচনাটিই প্রথম যা মগ্নচৈতন্যপ্রবাহ-ধারণাটি সুসংগতভাবে বজায় রাখতে পারে শুরু থেকে শেষ পর্যন্ত, যদিও তার প্রকরণ সেকেলে।

দুজারদ্যাঁ-র পরীক্ষানিরীক্ষা খুঁটিয়ে বিচার করেন জয়েস, খতিয়ে দেখেন ভুলভ্রান্তি, এবং তার ওপর নিজের অসামান্য বাক্‌পটুত্ব প্রয়োগ দ্বারা অতিক্রম করে যান দুজারদ্যাঁ-র ব্যর্থতা ও সীমাবদ্ধতার ক্ষেত্র। দুজারদ্যাঁ-র কাছে ঋণস্বীকারের মাধ্যমে জয়েস প্রকৃতপক্ষে স্বীকৃতি জানান প্রতীকীবাদী আন্দোলনকেই, কারণ দুজারদ্যাঁ স্বয়ং প্রতীকীবাদী আন্দোলনেরই শরিক, তাঁর রচনা মালার্মের (১৮৪২-১৮৯৮) গৃহে প্রতি মঙ্গলবারের আড্ডা আর উনিশ শতকের আটের দশকের পারি-র সাহিত্য আলোড়নেরই ফসল।

অ্যাক্সেল'স কাসল-এ (১৯৩১) এডমন্ড উইলসন (১৮৯৫-১৯৭২) সংজ্ঞায়িত করেন জয়স ও প্রুস্ত এবং প্রতীকীবাদীদের সম্পর্ক। ফরাসি কবিদের বিশদ তাত্ত্বিকতা থেকে উইলসন এখানে প্রতীকীবাদী মতবাদের নির্যাস নিষ্কাশন করেন।

> যা-যা সংবেদনক্ষমতা বা অনুভূতি আমাদের রয়েছে, আমাদের চৈতন্যের প্রতিটি মুহূর্ত, একে অপরের থেকে ভিন্ন; ফলত, সাধারণ সাহিত্যের চলতি ও সর্বজনীন ভাষার মাধ্যমে আমাদের অনুভূতি প্রকাশ করা অসম্ভব। প্রত্যেক কবিরই রয়েছে স্বতন্ত্র ব্যক্তিত্ব; তাঁর প্রতিটি মুহূর্তেরই রয়েছে বিশেষ স্বন, মিশ্রিত উপাদানবর্গের রয়েছে বিশেষত্ব। এবং কবির কাজ হল সেই বিশেষ ভাষার অন্বেষণ ও আবিষ্কার যা তাঁর ব্যক্তিত্ব ও অনুভূতি প্রকাশ করতে সমর্থ হবে...

বস্তুত, এটাই করতে চান প্রতীকীবাদীরা। আর জয়স-এর মধ্যে আমরা দেখি সেই অদ্ভুত ও ফলদায়ী এবং স্ববিরোধী চিত্র, যা ফ্লবেয়ার ও জোলা-র (১৮৪০-১৯০২) চরম বাস্তববাদী ঐতিহ্যে লালিত হয়ে প্রকরণের জন্য শরণাপন্ন হয় প্রতীকীবাদীদের, যার সাহায্যে তা সৃষ্ট করতে পারে এক নিজস্ব বাস্তববাদ।

দুজারদ্যাঁ-র উপন্যাস যখন প্রথম প্রকাশিত হয়, খুব কম পাঠকেরই তা দৃষ্টি আকর্ষণ করে। অবশ্য সমালোচক র‍্যমি গ্য গুরমঁ-এর (১৮৫৮-১৯১৫) দৃষ্টি এড়ায়নি। বইটি সম্পর্কে তিনি বলেন : "এটি এমন এক উপন্যাস যা চলচ্চিত্রের পক্ষান্তরিত পূর্বাভাস বলে মনে হয়।" *লা র‍্যভু অ্যাঁদেপঁদাঁৎ*-এ ধারাবাহিক প্রকাশকালেই উপন্যাসটি পড়েন জর্জ মুর, এবং দুজারদ্যাঁ-কে চিঠিতে বলেন যে এটি সাহিত্যে প্রথম "আত্মার অন্তর্জীবন" উন্মোচিত করেছে। মুর-এর আশঙ্কা ছিল যে এই অভিনব প্রণালী হয়তো বৈচিত্র্যহীনতা দ্বারা আক্রান্ত, এবং কালক্রমে এটাই তার সীমাবদ্ধতা বলে চিহ্নিত হবে।

এতক্ষণে এটুকু বোঝা গেছে যে অন্তর-অভিজ্ঞতা ভাষায় প্রকাশ করা কী পরিমাণ দুরূহ ঔপন্যাসিকের পক্ষে। অনুরূপভাবে সমালোচকের পক্ষেও সমস্যাব্যঞ্জক এই সাহিত্যপ্রক্রিয়ার যথাযথ নামকরণ করা। উইলিয়ম জেমস 'মগ্নচৈতন্যপ্রবাহ' রূপকটি বেছে নেন 'চিন্তামালা' বা 'চিন্তাপরম্পরা' বাতিল করার পরই। উভয় ক্ষেত্রেই এমনটা মনে হয় যে এক-একটি

চিন্তা বা ভাবনা পরস্পর সংযুক্ত। কিন্তু 'প্রবাহ' রূপকটি ব্যবহার করলে, চৈতন্য বা আত্মবাদী জীবনের অসংবদ্ধ চিন্তাভাবনার কথা বোঝা যায়। এত কথা জেমস বলার পর সমালোচনার ভাষা পদে-পদে হোঁচট খেয়েছে এক যথাযথ, সর্বার্থসাধক তকমা বের করতে। একাধিক 'অন্তঃ'-যুক্ত তকমা বাছা হল : অন্তর্দর্শন, অন্তর্চলচ্চিত্র ইত্যাদি। শেষ পর্যন্ত 'অন্তরাত্মকথন'-ই পেল মান্যতা।

জয়েস অন্তরাত্মকথনের প্রকৃত উদ্‌ভাবক হিসেবে দুজারদ্যাঁ-কে স্বীকৃতি জানানোর পর শেষোক্তজন একটি বক্তৃতাকালে সচেষ্ট হন বিষয়টি সংজ্ঞায়িত করার, যে-বিষয়টি অর্ধশতাব্দ আগে তিনি আবিষ্কার করেন। বক্তৃতাটি পরে প্রকাশ হয় একটি আকর্ষণীয় শিরোনামসহ : 'জেমস জয়েস-এর রচনাবলি ও সমসাময়িক কথাসাহিত্যে অন্তরাত্মকথনের রূপ, উৎস ও স্থান'। সন্দর্ভের বক্তব্যের তুলনায় শিরোনামটি যথেষ্ট নয়। এবং দুজারদ্যাঁ স্পষ্টতই বলেছেন যে এটি সংজ্ঞায়িত করার 'প্রয়াসমাত্র'। মোটের উপর তিনি এই সিদ্ধান্তে আসেন :

> প্রত্যেক আত্মকথনের মতোই, অন্তরাত্মকথনও, একটি প্রদত্ত চরিত্রের বক্তব্য, যা সাজানো হয়েছে সেই চরিত্রের অন্তর্জীবনের সঙ্গে আমাদের সরাসরি পরিচয় করানোর জন্য, যেখানে কোনোরকম ব্যাখ্যা বা মন্তব্যের সাহায্যে লেখক মাথা ঘামাবেন না; এবং যে-কোনো আত্মকথনের মতোই, এটি শ্রোতাহীন ও অনুচ্চারিত সবিশদ বক্তৃতা;
>
> কিন্তু ঐতিহ্যগত আত্মকথনের সঙ্গে তার পার্থক্য এই যে :
>
> বিষয়গত বিচারে এটি প্রকাশ করে সর্বাধিক গোপন চিন্তা, যা চৈতন্যের সর্বাধিক নিকটবর্তী;
>
> গুণগত বিচারে, এটি যাবতীয় যৌক্তিক শৃঙ্খলার পরপারে, মনে ঠিক যেভাবে চিন্তার উদয় হয়, সেই প্রকৃত অবস্থার চিন্তা পুনঃপ্রকাশিত হয় এখানে,
>
> আঙ্গিকগত বিচারে, এটি প্রকাশ হয় প্রত্যক্ষ বাক্য দ্বারা, যার বাক্যগঠনবিধি যথাসম্ভব সংক্ষেপিত ;
>
> এইরকম একান্তভাবে সে হালের কবিতার ধারণার প্রতি সাড়া দেয়।

এই ভূমিকা-রূপী বিশ্লেষণ থেকে তিনি নির্ণয় করেন অধিকতর সংক্ষিপ্ত সংজ্ঞার্থ :

> কোনো চরিত্রের অশ্রুত ও তথাকথিত বচন, যার দ্বারা সে প্রকাশ করে তার গভীরতর ভাবনা, যা তার অচৈতন্যের সবচেয়ে ঘনিষ্ঠ—অর্থাৎ তার মূল অবস্থায়—প্রত্যক্ষ বাক্যকে ন্যূনতম গঠনবিধির সাহায্যে সংক্ষেপিত করে, এবং এমনভাবে যার দ্বারা মনে উদিত হওয়া ভাবনার প্রতীতি পুনঃপ্রকাশ করা যায়, সেটাই অন্তরাত্মকথন, যার প্রকৃতি কাব্যোপম।

ভূমিকা ও সংজ্ঞার্থ কোথাও-কোথাও গুলিয়ে ফেলে নিজেদের কথা। 'বক্তব্য' বা 'বচন' কী করে 'অশ্রুত' বা 'অকথিত' হবে? শব্দ ব্যবহার করার অর্থ আমরা বাচনিক স্তরে চিন্তা রূপান্তরিত করছি; অথচ দুজারদ্যাঁ-র ধারণায় ভাবনা যেভাবে মনে আসে— সংবেদজ, কল্পনাময় ও খণ্ডিতভাবে, তা প্রায়শই শব্দের অতীত। সর্বোপরি, 'অন্তরাত্মকথন' ধারণাটি যখন বলে সেইসব চিন্তাভাবনার কথা যা চৈতন্যের নিকটতম, তখন অচৈতন্যের প্রকৃতি ও স্বরূপ নিয়ে ভুল বোঝাবুঝির আশঙ্কা থেকে যায়। *দ্য ডেস্ট্রাকটিভ এলিমেন্ট* (১৯৩৫)-এ স্টিভন স্পেন্ডর (১৯০৯-১৯৯৫) ঠিক একই ভুল করেন জয়েস ও হেনরি জেমস-বিষয়ক পরিচ্ছেদটির 'অচৈতন্য' তকমা দিয়ে। আসলে চৈতন্য ও অচৈতন্যের প্রভেদ কখনওই বর্ণনা করা যায় না, অনুমান করা যায়।

এছাড়া আরও কিছু ব্যাপার রয়েছে যা ব্যাখ্যা করা অচৈতন্যের ব্যাখ্যা থেকেও কঠিন। একথা ঠিক যে অনেকেই এর অস্তিত্ব অস্বীকার করেন, যদিও আদিকাল থেকে এ-সম্পর্কে সজাগ বহুজন। কেউ-কেউ এমন কথাও বলেন যে এটা ফ্রয়েড-এর আবিষ্কারই নয়। আধুনিক মনস্তত্ত্ব এটাই শেখায় যে (এবং আমাদের দৈনন্দিন জীবনে এর প্রমাণ রয়েছে ভূরি-ভূরি, যদি আমরা জানি কী করে তা পর্যবেক্ষণ করতে হয়) অভিজ্ঞতার অচেতন স্তর আমাদের সকলেরই মধ্যে গঠিত, এবং এর সচেতন নকশা শুধু তাঁরাই পাঠ করতে পারেন যাঁরা বিশেষভাবে শিক্ষাপ্রাপ্ত। আমাদের, সাধারণ মানুষের, মাঝেমধ্যে তার চকিত ঝলক পাবার সুযোগ মিলতে পারে। তা পঠিত হতে পারে শুধুমাত্র সেইসব ভাবনা ও কল্পনা দ্বারা যা আমরা চৈতন্যের স্তরে উত্তীর্ণ করতে পারি। অর্থাৎ, অচেতন কখনওই তার অচেতন রূপে প্রকাশ হতে পারে না, এবং পারে না তা অচেতন বলেই। আমরা তা নির্ণয় করতে পারি শুধু কিছু প্রতীক দ্বারা যা ব্যক্তির সচেতন প্রকাশ দ্বারা পরিস্ফুট হয়। যেমন, স্বপ্ন, কল্পনা ইত্যাদি। সুতরাং, এদুয়ার দুজারদ্যাঁ যখন অচেতনের নিকটতম অঞ্চলের কথা বলেন, তিনি প্রকৃতপক্ষে বলতে চান সেই সীমান্তবর্তী অঞ্চলের কথা, যা কেন্দ্রীয় চিন্তাপ্রবাহের পরিধির বাইরে, যা আমরা খেয়াল করি না সাধারণত কিন্তু উইলিয়ম জেমস-এর ভাষায় যা বিভামণ্ডিত হয়ে থাকে। দুজারদ্যাঁ-ব্যবহৃত 'অচৈতন্য' শুধু বিভ্রান্তিই সৃষ্টি করতে পারে। তা আমাদের নিয়ে যায় এমন এক স্তরে যার বর্ণনা অসম্ভব। আমরা শুধু পারি তার প্রতিকল্প হিসেবে কিছু প্রতীকী চৈতন্যময় রূপ ফুটিয়ে তুলতে।

'অন্তরাত্মকথন' কথাটি প্রথমে ব্যবহৃত হয় 'মগ্নচৈতন্য প্রবাহ'-র পরিবর্তে। জয়েস-বিষয়ক সমালোচনাগ্রন্থে (*জেমস জয়েস : আ ক্রিটিকাল ইনট্রোডাকশন*, ১৯৪১) হ্যারি লেভিন (১৯১২-১৯৯৪) জানান 'অন্তরাত্মকথন'-সম্পর্কে তাঁর পক্ষপাতের কথা। "অলীক মগ্নচৈতন্যপ্রবাহের তুলনায় সফলতরভাবে অন্তরাত্মকথন দ্বারা সমালোচনামূলক বিশ্লেষণ সম্ভব।" অবশ্য এ-দুটি কথাই সর্বক্ষেত্রে সমান প্রযোজ্য নয়, সবটুকু বোঝাও যায় না এদের দ্বারা। কিন্তু 'আত্মকথন' শব্দটির মধ্যে থিয়েটারের অনুষঙ্গ উপস্থিত বলে এটি সুস্পষ্ট সাহিত্য ও নাট্যব্যঞ্জনা প্রকাশ করে, যার সঙ্গে প্রবহণ-ধারণাটির কোনো সংযোগ নেই। চিরাচরিত আত্মকথন-এ, গ্রিক ধারণায় যার মূল অর্থ "একাকী কথন"— চরিত্রটি দর্শকদের কাছে যৌক্তিক সুসংবদ্ধ চিন্তাই প্রকাশ করে। বাহ্যিক উত্তেজক উপাদান ছাড়াই এই 'গ্রন্থিত' চিন্তা ফুটিয়ে তোলে ভাব ও কল্পনা। হ্যামলেট-এর "টু বি অর নট টু বি..." নাটকের প্রসঙ্গ থেকে বিচ্ছিন্ন করে পাঠ করলে হ্যামলেট-এর সেই মুহূর্তের চতুর্পার্শ্বস্থ পরিস্থিতি অথবা তার সংজ্ঞাবহ অভিজ্ঞতা— কিছুই বোঝায় না। ডেনমার্ক-এর যুবরাজের আত্মকথন প্রকাশ করে তার চাপা উত্তেজনা, তার বিক্ষুব্ধ হৃদয়ের সংঘাত। এখানে তার মগ্নচৈতন্যপ্রবাহ থেকে বাহুল্যময় ভাবনা সরিয়ে সুসংবদ্ধ চিন্তা ছেঁকে তুলে আনেন রচয়িতা। এখানে, তাই, হ্যামলেট-এর মগ্নচৈতন্যপ্রবাহের সন্ধান পাবার কোনো সুযোগ নেই আমাদের। এক্ষেত্রে 'নাটকীয় আত্মকথন', 'অন্তরাত্মকথন' ও 'মগ্নচৈতন্যপ্রবাহ'-র পার্থক্যগুলি তাই সাহিত্য-পাঠকের স্মরণে রাখা আবশ্যক। ছাপ-মারা সংজ্ঞার্থ নির্ণয় না-করেও শুধু এটুকু বলা যেতে পারে যে 'অন্তরাত্মকথন' শব্দটি কিছু আত্মবাদী সাহিত্যরচনার ক্ষেত্রে প্রযোজ্য, যেখানে সেই কথাসাহিত্য রচিত একক দৃষ্টিকোণ থেকে, যেখানে লেখক নিজেকে সীমায়িত করেছেন মগ্নচৈতন্যপ্রবাহে, এবং নিজেকে স্থাপন করেছেন চরিত্রের ভাবনার 'কেন্দ্র'-য়, যে-কেন্দ্র সাধারণত প্রতিরূপের পরিবর্তে শব্দ ব্যবহার করে।

স্বয়ংক্রিয় লিখনপদ্ধতি নিয়ে পরীক্ষানিরীক্ষাকালে পরাবাস্তববাদীরা, এবং তাঁদেরও আগে গারট্রুড স্টাইন (১৮৭৪-১৯৪৬), সচেষ্ট হন অচেতন থেকে মুহূর্তপুঞ্জ চয়ন করে তা মুঠিবদ্ধ

করতে। বিশ শতকের দুইয়ের দশক থেকে এই সাহিত্যরীতি দাপটে শাসন করে দীর্ঘকাল; আবির্ভূত হয় জয়েস-উল্ফ-ফকনার-এর অসংখ্য অনুকরণকারী, এবং ধূর্জটিপ্রসাদ-বুদ্ধদেব বসুর মতো কোনো-কোনো বাঙালি সাহিত্যিক (পরে শীর্ষেন্দু মুখোপাধ্যায়ের কিছু গল্প-উপন্যাসেও এর হদিশ পাই) এটির বাহ্যিক লক্ষণাদি নিয়ে কিছুদূর ভাসা-ভাসা চর্চা করলেও, বর্তমানে এই রীতি বহুব্যবহারে জরাজীর্ণ হবার ফলে পরিত্যক্ত। কিন্তু সাহিত্যের ইতিহাসে এর ভূমিকা অনস্বীকার্য। বিশ শতক জুড়ে উপন্যাসশিল্পে যত ভাঙা-গড়ার খেলা দেখি, ঔপন্যাসিকরা যতবার নতুন-নতুন পথে হাঁটতে উদ্‌যোগী হন, তার অধিকাংশেরই মূলে মগ্নচৈতন্যপ্রবাহের প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষ প্রেরণা স্মর্তব্য।

সিম্বলিজম বা প্রতীকবাদ

সুরশ্রী কুণ্ডু

সিম্বলিজম শিল্পের একটি মতবাদ। যার নির্দিষ্ট স্থানিক ও কালিক মাত্রা আছে। বাকি পাঁচটা মতবাদের মতো এই মতবাদেও সাহিত্য, সমাজ, জীবন, দর্শন, সংস্কৃতি এগুলো সম্পর্কে মানুষের বিপুল ভাবনাচিন্তা ধরা পড়েছে। তবে মূল আলোচনায় প্রবেশের আগে 'সিম্বল' শব্দটি প্রসঙ্গে কিছু বলে নেওয়া প্রয়োজন। কারণ এই 'সিম্বল'-কে বাদ দিয়ে সিম্বলিজমের আলোচনা সম্ভব নয়।

'সিম্বল'-এর বাংলা পরিভাষা 'প্রতীক'। গ্রিক 'symbolon' থেকে 'symbol' শব্দটা এসেছে। 'symbolon'-এর অর্থ 'mark', 'emblem', 'token', অথবা 'sign' (চিহ্ন)। "It (symbol) is an object, animate or inanimate, which represents or 'stands for' something else."[১] প্রতীক বলতে বোঝায় এমন কিছু যার একটা আলাদা অর্থ আছে, ব্যঞ্জনা আছে। সে হিসেবে ভাষাও একটা প্রতীক। সাধারণভাবে ভাষার কাজ একটা ধ্বনি-প্রতীকের (verbal sign) মধ্য দিয়ে একটা বিশেষ জিনিসকে বুঝিয়ে দেওয়া। আর এই ধ্বনি-প্রতীক (শব্দ) যখন আবার বাড়তি দায়িত্ব বহন করে 'প্রতীক'-এর হয়ে, তখন আমাদের ভাবনায় ঐ বিশেষ প্রতীকায়িত শব্দটি (বা শব্দগুচ্ছ) বহুস্তরের ব্যঞ্জনা তৈরি করে। কবিদের কাজ এই ভাবতরঙ্গ তৈরি করা। এই ভাবতরঙ্গ তাঁরা তৈরি করেন কীভাবে? আমাদের প্রচলিত কোনো শব্দকে বা কোনো বস্তুকে তাঁরা সচেতন ভাবে ভিন্ন ভিন্ন অনুষঙ্গে (context) ব্যবহার করেন নিজ নিজ মর্জি অনুযায়ী, আর তখনই সেই নির্দিষ্ট ধ্বনিপ্রতীকের মধ্য দিয়ে আমরা যা বোঝার তার চাইতেও অনেক বেশি কিছু বা অন্যকিছু বুঝতে থাকি করিরই হাত ধরে। তাই জীবনানন্দের রচনায় 'হেমন্তের মাঠ' বা সমর সেনের কাব্যে 'বুড়ো বটগাছ' আমাদের ভাবনায় নিছক বাস্তবের মাঠ আর গাছই থাকে না, তা আমাদের পৌঁছে দেয় কবির অভিপ্রেত কোনো বিশেষ প্রতীতিতে, যা উপমা, রূপকের গণ্ডি পেরিয়ে আমাদের নিয়ে যায় আরো গভীরে।

প্রতীকের ব্যবহার সাহিত্যে নতুন নয়, দীর্ঘদিনের। তবে এই ব্যবহার যখন একটা নির্দিষ্ট স্থান-কালের গণ্ডিতে এসে একদল তরুণের হাতে চর্চায়, অভ্যাসে পরিণত

হল, তখন তৈরি হল এক বিশেষ বীক্ষা, নজর (attitude), মতবাদ। 'প্রতীক'-কে ঘিরে সেই মতবাদই প্রতীকবাদ বা সিম্বলিজমই নামে পরিচিতি লাভ করল : "The practice of employing symbol is called symbolism."[২] আলাদা করে এই চর্চা (practice) আমাদের প্রচলিত সাহিত্যভাবনায় একটা ধাক্কা দিল। এর আগেও কবিরা 'প্রতীক' ব্যবহার করেছেন, কিন্তু সেখানে প্রতীক এসেছে কবির কথার সহযোগী হিসেবে। আর এই নতুন প্রতীকবাদী কবিদের হাতে 'প্রতীক'ই একমাত্র হাতিয়ার হয়ে উঠল, 'প্রতীকে'র ওপর নির্ভর করেই এঁরা কথা বলেন, দেখেন, ভাবেন ও আমাদের ভাবান, বাকি সবই আসছে প্রতীকের সহযোগী হিসেবে। পার্থক্যটা এখানেই।

উনিশ শতকের শেষার্ধে প্রতীকবাদী আন্দোলন ফ্রান্সে একটা গুরুত্বপূর্ণ কাব্য আন্দোলন হিসেবে আত্মপ্রকাশ করে। তবে পাশাপাশি ছবি ও নাটকেও এই আন্দোলনের অভিব্যক্তি লক্ষ করা যাচ্ছিল। বলা যেতে পারে, উত্তর-রোমান্টিক পর্বে ইউরোপের আধুনিক কবিতার সূত্রপাত এই আন্দোলনের মধ্যে দিয়ে। ১৭৫৭-তে প্রকাশিত হল বোদলেয়ারের *Les Fleurs du Mal*।* বইটি প্রকাশিত হওয়া মাত্রই চারদিকে বেশ হৈ চৈ পড়ে যায়। বইটি তখনকার প্রচলিত কবিতার ভাব ও ভঙ্গি দুটোকেই নাড়িয়ে দেয় জোরালো ভাবে। চলতি স্রোতের বিপরীতে যাওয়ার অনেক অসুবিধের মধ্যে একটা সুবিধে হল— তার থেকে যতই মুখ ফেরাতে চাই, পুরোপুরি ফেরানো সম্ভব হয় না। বোদলেয়ারের বইটি বেরোনোর সঙ্গে সঙ্গে রক্ষণশীল শিবিরে শুরু হয়ে যায় কানাকানি। এসব কী কথা বলছেন এই কবি! বলছেন—

> 'অদৃশ্যকে দেখতে হবে, অশ্রুতকে শুনতে হবে'; 'ইন্দ্রিয়সমূহের বিপুল ও সচেতন বিপর্যয় সাধনের দ্বারা পৌঁছতে হবে অজানায়'; 'জানতে হবে প্রেমের, দুঃখের, উন্মাদনার সবগুলি প্রকরণ'; 'খুঁজতে হবে নিজেকে, সব গরল আত্মসাৎ করে নিতে হবে'; 'পেতে হবে অকথ্য যন্ত্রণা, অলৌকিক শক্তি, হতে হবে মহারোগী, মহাদুর্জন, পরম নারকীয়, আর এমনি করেই পৌঁছতে হবে অজানায়।'[৩]

এসব 'নতুন' কথা শোনার পর আন্দাজ করা যায় সেই সোরগোলের কারণ। বোদলেয়ার তাঁর বিখ্যাত কবিতা 'প্রতিষঙ্গে' (correspondances) প্রথম 'প্রতীক' (symbol) সম্বন্ধে বললেন—

> Nature's a temple where the pilasters
> Speak sometimes in their mystic languages ;
> Man reaches it through symbol dense as trees,
> That watch him, with a gaze familiar.[৪]

বুদ্ধদেব বসু এর অনুবাদ করছেন—

> প্রকৃতি মন্দির এক; স্তম্ভরাজি, প্রাণের স্পন্দনে
> মাঝে মাঝে অস্পষ্ট প্রলাপে দেয় সংকেত ছড়িয়ে;
> সেখানে মানুষ আসে প্রতীকের অরণ্য পেরিয়ে,
> যে অরণ্য দ্যাখে তাকে অনুক্ষণ অভ্যস্ত নয়নে[৫]

এভাবে 'প্রতীক' সম্বন্ধে প্রথম গুছিয়ে, স্পষ্টভাবে তাঁর বক্তব্য জানালেন বোদলেয়ার। সে কারণেই হয়তো শার্ল বোদলেয়ারকে (১৮২১-১৮৬৭) প্রতীকবাদের প্রথম প্রতিভূ কবি বলা হয়। র‍্যাঁবো যাকে বলেন— 'প্রথম দ্রষ্টা তিনি, কবিদের রাজা, এক সত্য দেবতা'। বোদলেয়ারের অনুগামী হিসেবেই ফরাসি সাহিত্যে একের পর এক তরুণ কবির আবির্ভাব ঘটে— মালার্মে,

* বুদ্ধদেব বসু *ক্লেদজ কুসুম* নামে *Les Fleurs du Mal*-এর বইটির বঙ্গানুবাদ করেন।

ভের্লেন, র‍্যাঁবো, লাফোর্গ, ভালেরি, ক্লোদেল প্রমুখ। এঁদের হাতেই কবিতার এই নতুন 'ভাব' ও 'ভঙ্গি'র চর্চা আরো স্পষ্ট অবয়বে মূর্ত হতে থাকে। ধীরে ধীরে দানা বাঁধতে শুরু করে একটা মতবাদ— যার নাম প্রতীকবাদ।

'প্রতীকবাদ' বা 'সিম্বলিজম' কবিতার আন্দোলন হিসেবে প্রাতিষ্ঠানিক ভাবে স্বীকৃতি পায় ১৮৮৬-র ১৮ই সেপ্টেম্বর 'Le Figaro' পত্রিকায় জাঁ মোরেআস (Jean Moreas) -'প্রতীকবাদী ইশ্‌তেহার' (Le Manifeste Symboliste) বেরোনোর মধ্যে দিয়ে। জাঁ মোরেআসে-ই প্রথম 'symbolisme' শব্দটা ব্যবহার করেছেন একটা নির্দিষ্ট কবিগোষ্ঠীকে চিহ্নিত করার জন্য। ১৮৮৫ নাগাদ যখন একদল সাংবাদিকদের দ্বারা সমকালীন কয়েকজন তরুণ কবি, বিশেষত মালার্মে, বিরুদ্ধ সমালোচনায় বিদ্ধ হলেন 'decadent' (অবক্ষয়ী) নামে, তখন শব্দটার অপপ্রয়োগের বদলে মোরেআস প্রয়োগ করলেন 'symbolistes' শব্দটা। সমালোচকদের জবাব দেওয়ার জন্য লিখতে শুরু করলেন প্রতীকবাদের ইশ্‌তেহার। এর বছর পাঁচেক বাদে ১৮৯১-এর ১৪ই সেপ্টেম্বর ঐ একই পত্রিকায় মোরেআস্ জানালেন— "symbolisme was dead. Thus symbolisme was an ephemeral name for a very small clique of French poets."[৬] এই তথ্যটা দেশকালের সাপেক্ষে একটা মতবাদের তথ্যগত কিছু দাবি হয়তো পূরণ করে। কিন্তু আসলে যেমন হঠাৎ একদিনে কোনো মতবাদের জন্ম সম্ভব নয়, তেমনি আবার ঘোষণা করে হঠাৎ 'মৃত্যু'ও সম্ভব নয়। তথ্যের খাতিরে বরং এটা বলা যেতে পারে, বিশ শতকে স্যুররিয়ালিজমের আবির্ভাবের আগে পর্যন্ত প্রতীকবাদই ছিল আধুনিক ফরাসি কবিতার প্রধান প্রস্থান।

কিন্তু কী এমন অভিনব দৃষ্টিভঙ্গি ছিল তাঁদের লেখায় যার জোরে আমরা সিম্বলিজমকে আধুনিক ইউরোপীয় কবিতার ভিত্তি বলে ভাবতে পারি? যদি সময়ের দিক থেকে একটু পিছিয়ে যাই তাহলে দেখব উনিশ শতকের তিন, চার, এবং পাঁচের দশক জুড়ে একের পর এক বেরোচ্ছে স্তাঁদাল, বালজাক, ফ্লোবের, জোলার 'রিয়ালিস্টিক' লেখাপত্র। বাস্তবে যা দেখছ তারই হুবহু অনুকরণ সাহিত্যে আনা দরকার— এমনই প্রতিফলন-তত্ত্বে বুঁদ হয়ে আছে গোটা সমাজ। আর তার কিছুদিন আগেই (১৮৩৯) বিজ্ঞানের আরেক আবিষ্কার তাক লাগিয়েছে মানুষের চোখে যার নাম— ফোটোগ্রাফি বা ক্যামেরা। এভাবে ক্রমাগত আমার চোখে দেখা বাস্তবকে একটা ফ্রেমের মধ্যে হুবহু এঁটে ফেলার নেশায় মানুষ মেতেছে। আর এরকম সময় ১৮৫৭-তে বেরোচ্ছে বোদলেয়ারের সেই বিখ্যাত বই *Les Fleurs du Mal*— যা সমকালীন পরিস্থিতিতে যেন চূড়ান্ত ছন্দপতন!

বোদলেয়ার বলছেন প্রকৃতিই হচ্ছে প্রতীকের ভাঁড়ার। এক অসাধারণ রহস্য ও স্বপ্নের জন্মভূমি— যেখানে শব্দ, গন্ধ, বর্ণ, স্পর্শের পারস্পরিক স্থান বিনিময়ের ঐক্য দেখা যায়। প্রতীকের অরণ্যের ভিতর দিয়েই নাকি প্রকৃতির এই রহস্যময় ভাষার কাছে মানুষ পৌঁছোয়। বোদলেয়ার এই ভাবনা আংশিকভাবে নিচ্ছেন সুইডিশ মিস্টিক স্যুইডেনবোর্গ-এর (১৬৮৮-১৭৭২) ধারণা থেকে। একথা তিনি নিজেই জানাচ্ছেন 'Victor Hugo' (1861) প্রবন্ধে। স্যুইডেনবোর্গ দুটো বিশ্বের কল্পনা করেছিলেন— একটা আমাদের চারপাশের 'চোখে দেখা দুনিয়া' আর একটি 'অন্য এক দুনিয়া' (other world)। তিনি মনে করতেন, প্রকৃতিতে আমরা যা দেখি, তা আসলে সবই প্রতীকের মধ্য দিয়ে দেখি। আর সেই প্রতীক পাঠায় ঐ 'অন্য-দুনিয়া'। বোদলেয়ার এই ভাবনাটা নিলেন, কিন্তু প্রয়োগ করলেন উল্টো ভাবে। তিনি বললেন— আমরা প্রতীকের অরণ্যের মধ্য দিয়েই অন্য এক রহস্যঘেরা স্বপ্নের জগতে পৌঁছোতে পারব।

আর সেটা করতে গেলে অবশ্যই যেটা দরকার, তা হল ইন্দ্রিয় বিপর্যাস। শব্দ, গন্ধ, বর্ণ, স্পর্শ— এদের পরস্পরের জায়গা বদল করতে হবে। তিনি বললেন—

> কোনো-কোনো গন্ধ যেন অর্গানের নিস্বনে কোমল,
> প্রেইরির সবুজে মাখা, শিশুর পরশে সুখময়; [প্রতিষঙ্গ]

গন্ধকে স্পর্শে নিয়ে গেলেন সেখান থেকে আবার দৃশ্যে স্থানান্তরিত করলেন। ইন্দ্রিয়ের স্থান বিনিময়ের আরেক দুরন্ত দৃষ্টান্ত আছে র‍্যাঁবোর বিখ্যাত কবিতা 'Voyelles' (স্বরবর্ণ)-এ। সেখানে দেখি, র‍্যাঁবো প্রত্যেক ধ্বনিকে কানে শোনা থেকে চোখে দেখায় নিয়ে গিয়ে অনুষঙ্গের বদল ঘটিয়ে ধ্বনিগুলোকে বিভিন্ন প্রতীকের মধ্য দিয়ে একে একে হাজির করছেন। তাঁর আশ্চর্য ঘোষণা— 'A কালো, E সাদা, I লাল, U সবুজ, O নীল...'

A	A∀A∀	—	কালো— 'কৃষ্ণনীবিবাস, রোমশ মৌমাছি তারে অবিনয়ে স্ফীত করে'
E	⊔⊔	—	সাদা— 'বল্লম হিমবাহের, শ্বেত রাজা, কম্প্র পুষ্পদল'
I	├──┤	—	লাল— 'লোহিত রক্ত ইতস্তত, হাসি কোপন চঞ্চল'
O		—	নীল— 'পরম ভেরী', 'তোমার দৃষ্টি কাঁপে নীল কিরণ-হিল্লোলে'
U	· ˙	—	সবুজ— 'আকাশবৃত্ত, স্পন্দমান দিব্য সবুজ সাগর'*

ধ্বনি প্রতীক
কান ↔ চোখ অনুষঙ্গের বদল স্বরবর্ণগুলো ভিন্ন ভিন্ন প্রতীকে হাজির হল[৭]
ইন্দ্রিয় বিপর্যাস

অনুভূতির বিপর্যাস এতটাই হয়ে যায় যে, স্বরবর্ণে রঙ দেখতে পান কবি। একারণেই কি র‍্যাঁবো নিজেকে বলেছিলেন—'le poeté voyant' অর্থাৎ 'কবি দ্রষ্টা'?

১৮৭১-এর ১৫ মে তারিখে বন্ধু পোল দমিনি-কে একটি চিঠিতে র‍্যাঁবো লিখছেন—'আমি জোর দিয়ে বলি দ্রষ্টা হতে হবে— মানে নিজেকে অবলোকনবিদ (VISIONARY) হিসেবে গড়ে তুলতে হবে। ...একজন কবি নিজেকে দ্রষ্টা বানিয়ে তোলেন দীর্ঘ, সীমাহীন এবং ধারাবাহিক ভাবে সর্ব ইন্দ্রিয়ের বিপর্যয় সাধনের মাধ্যমে।'[৮]

এভাবেই কবিকে হতে হবে দ্রষ্টা ও ধ্যানী। কবি 'দ্রষ্টা' হয়ে গেলে পৌঁছে যাবেন সেই অন্য এক দুনিয়ায়, রহস্য স্বপ্নে ঘেরা অলৌকিক জগতে। এ প্রসঙ্গে বুদ্ধদেব বসু-র একটি কবিতার প্রারম্ভিক চার পঙ্‌ক্তি থেকে আমরা প্রতীকবাদী কবিদের প্রবণতার সারাৎসার নিষ্কাশন করে নিতে পারি।

> 'গাছ', 'ফুল', 'পুকুর', 'মেঘলা দিন'— এরা শুধু গণিতের কঠিন সংকেত হ'য়ে পড়ে থাকে :
> তারপর তুমি দাও পর্দা তুলে; চেয়ে দেখি দৃষ্টিও তোমার। গা বেয়ে আঙুরলতা বেড়ে ওঠে,
> হঠাৎ হলুদ ফুলে দিগন্তের খেত আকাশ রাঙিয়ে দেয়। এইভাবে, পৃথিবী, নক্ষত্র, সব করি
> অধিকার। [স্মৃতির প্রতি : ২]

* পঙ্‌ক্তিগুলি লোকনাথ ভট্টাচার্য-কৃত অনুবাদ কবিতা 'স্বরবর্ণ' থেকে গৃহীত।

নিজেকে কবি-দ্রষ্টা (voyant) বলার পর র‍্যাঁবোর মুখে শোনা যাবে— "আমি সব কিছু শুনেছি, সব কিছু জেনেছি, সব কিছু পেয়েছি" (De'part : Departure)। এই দেখা, শোনা, পাওয়া হচ্ছে আসলে বস্তুর ভিতরের সারাৎসারকে পাওয়া, দৃশ্য ধ্বনি এসবের শুদ্ধ স্বরূপকে পাওয়া। আর এখানেই একজন দ্রষ্টার আসল আনন্দ। এভাবেই একজন কবি তার 'চোখে দেখা দুনিয়াকে' অতিক্রম করে পৌঁছে যান 'অন্য এক দুনিয়া'য় (স্যুইডেনবোর্গ-এর 'দ্বিতীয় পৃথিবী')। আর এই উত্তরণে তাঁর প্রধান, প্রায় একমাত্র সহায়ক— প্রতীক বা সিম্বল।

প্রতীকবাদীরা এভাবেই হয়তো প্রতীকের সাহায্যে কবিতায় যাবতীয় যৌক্তিক পারম্পর্য ভেঙ্গে বিমূর্ত অনুভবের স্পন্দন চারিয়ে দিতে চান পাঠকের মনে। শব্দের পর শব্দ সাজিয়ে প্রতীকের মোড়কে গড়ে তোলেন অভিধা-অতিরিক্ত এক অনুভূতির জগৎ। পাঠক একই সঙ্গে পায় অভিধা ও অভিধা-অতিক্রমী ব্যঞ্জনা।

প্রতীকের এই গুণের জন্যই হয়তো ইয়েটস (W.B. Yeats) প্রতীককে তুলনা করেছিলেন, দ্বিফলা তরবারির সঙ্গে।[৯] সেই সূত্রে আমাদের মনে পড়ে যেতে পারে প্রতীকবাদী কবি ভালেরির 'Les Pas' (পদধ্বনি) কবিতাটির কথা। কবিতাটিতে পদক্ষেপকে (steps) প্রতীক হিসেবে ব্যবহার করে দুটি ভিন্ন মাত্রার কাহিনিকে উন্মোচিত করেন— একটি উদ্‌গ্রীব এক প্রেমিকের, যে উৎকর্ণ হয়ে বিছানায় শুয়ে শুনতে চাইছে প্রণয়িনীর আগমন শব্দ; আর একই ভাবে উদ্‌গ্রীব এক কবি অপেক্ষায় রয়েছেন তাঁর জীবনে কখন প্রেরণার পদক্ষেপে ঘটে যাবে শিল্পসৃষ্টির মুহূর্তে অভাবনীয় উত্তরণ।

> যদি ঠোঁট দুটি এগিয়ে তুমি আমার মনের মানুষকে চুম্বনে সমৃদ্ধ করতে চাও, তাড়াহুড়ো কোরো না গো, নম্রতায় ভরে দাও তাকে, অস্তিত্বে-অনস্তিত্বে যা কেবল মধুময়, আমি তো রয়েছি বেঁচে শুধু তোমারই জন্যে অপেক্ষায়, আর আমার হৃদয়স্পন্দন জেনো অন্য কিছু নয়, পদধ্বনি তোমার পদধ্বনি শুধু...

এই পদধ্বনিকেই প্রতীকবাদী কবিরা বারবার শুনতে চেয়েছেন, পাঠককে শোনাতে চেয়েছেন। আর পাঠকের কাছে সেই বার্তা পৌঁছে দেওয়ার জন্য অনেক আয়োজন করেছেন কবিতায়। অনায়াসেই কবিতায় সংগীত (musicality) মিশিয়ে দিয়েছেন। সংগীত যেহেতু যাবতীয় শিল্পের মধ্যে সবচেয়ে বিমূর্ত তাই সংগীতকেই এঁরা সবচেয়ে উপযুক্ত মনে করেছেন কবিতার সৌন্দর্য প্রকাশের ক্ষেত্রে। এখানে সংগীত মানে গীতিতুল্য শব্দ মূর্ছনা নয়; সংগীত অর্থে সুরের বিমূর্ততার কথাই তাঁরা বোঝাতে চেয়েছেন। সংগীত যেমন শুধু ভাবকে জানায় না, তার বহু অর্থ হতে পারে, মালার্মেও চেয়েছিলেন কবিতা একটি অর্থে বন্দি থাকবে না, বহুমুখী অর্থযুক্ত হবে। তিনি মনে করতেন, একটা নির্দিষ্ট অর্থ সাহিত্যের রহস্যধর্ম নষ্ট করে দেয়। এঁদের কাছে সৌন্দর্যের ধারণায় যেহেতু 'রহস্য' একটা বড় অবলম্বন তাই তাকে কিছুতেই ব্যাহত হতে দেওয়া যাবে না। এভাবেই কবিতা হল অস্পষ্ট, অস্পষ্টের অনির্দিষ্ট আভা ফুটে উঠল। আর এ ভাবনাই প্রধান হয়ে উঠল, প্রতীক-কবিতা সংবাদ দেয় না আভাস দেয়, বস্তুর বর্ণনা দেয় না তার স্বাদ গন্ধ উপহার দেয়।

এই 'আভাস', 'স্বাদ গন্ধ' উপহার দেওয়ার আনন্দে মেতে গিয়ে, মাধ্যম বা উপায়কে আঘাত করে ফেললে মুশকিল। এই ভয়েই বোধহয় রবীন্দ্রনাথ প্রতীক জাতীয় শব্দগুলিকে পাঠকের মন থেকে সরিয় নিতে চেয়েছিলেন। "রবীন্দ্রনাথ জানেন যে এই শব্দগুলি উচ্চারিত হবার সঙ্গে সঙ্গে পাঠকের জীবনচর্চা থেকে অনেকখানি দূরে সরে যায় চরিত্রগুলো। বস্তুত এরা

আর চরিত্রই থাকে না, হয়ে ওঠে কয়েকটা অলীক চিহ্নের খেলা মাত্র।"[১০] আর এটা তো সত্যিই মস্ত ক্ষতি সেই কবির কাছে, যিনি আসলে জীবনের কথাই বলতে চান। তাই কবি শঙ্খ ঘোষ সচেতন করে দেন, "জীবনকে সমস্ত আঙুল দিয়ে আঁকড়ে ধরবার চেষ্টায় কবিতা আজ প্রত্যক্ষ অনুভূতিতে দাঁড়াবে, প্রতীকের মধ্য দিয়ে তাকে সরিয়ে নেবে না আর। আমাদের একটা মুশ্‌কিল ছিল এই যে প্রতীক আমাদের বলে দিত : এটা নয়, ওটা। ...কিন্তু আজ প্রতীক আসতে পারে কেবল এই ভাবে : এটা এবং ওটা। বর্ণনীয় বিষয় বা ছবি বা চরিত্রের একটি কণাও ছাড়তে চাই না আমি। তাকে সম্পূর্ণ স্বভাবে রেখেও যদি বিষয়ান্তর বা চিত্রান্তরের দ্যুতি দিতে পারে প্রতীক, সেটা তবে গ্রাহ্য হবে নিশ্চয়।"[১১]

এভাবে ভাবলে 'প্রতীকবাদ' নেহাৎই দেশকাল সাপেক্ষ একটি মতবাদ থাকে না, সাপেক্ষতার বাইরে বেরিয়ে আসে এক বড়ো উদ্‌বৃত্ত অংশ। যে অংশ বলে সাহিত্য আর জীবনের কথা, জীবনের সঙ্গে সাহিত্যের যোগের কথা— সহিতত্বের কথা।

তথ্যসূত্র :

১. *A Dictionary of Literary Terms and Literarry Theory*, Ed. by J.A. Cuddon, Blackwell Pub 4th Edition, 1998.

২. *Collins Dictionary of Literary Terms*, Edward Quinn, Harper Collins Pub., 2004.

৩. *শার্ল বোদলেয়ার : তাঁর কবিতা*, বুদ্ধদেব বসু, দে'জ পাবলিশিং, প্রথম সংস্করণ, জুন ১৯৮১।

৪. *Baudelaire : Selected Poems*, trans. Joanna Richardson, Penguin.

৫. *শার্ল বোদলেয়ার তাঁর কবিতা*, বুদ্ধদেব বসু, দে'জ পাবলিশিং, প্রথম সংস্করণ, জুন ১৯৮১।

৬. *The Term and Concept of Symbolism*, Rene Wellek, New Literary History, Vol–1., winter 1970.

৭. *সপ্তসিন্ধু দশদিগন্ত*, সম্পাদনা শঙ্খ ঘোষ, অলোকরঞ্জন দাশগুপ্ত, নতুন সাহিত্য ভবন, মাঘ ১৩৬৯।

৮. *Realism, Naturalism, and Symbolism : Modes of Thought and Expression in Europe, 1848-1914*, Ed. by Roland N. Stromberg, Harper Torchbooks, First Edition, 1968.

৯. *Poetry of this Age (1908-1958)*, J.M. Cohen, Arrow Books Ltd, London, 1959.

১০. *শব্দ আর সত্য*, শঙ্খ ঘোষ, প্যাপিরাস, তৃতীয় মুদ্রণ, মাঘ ১৪০৫।

১১. *শব্দ আর সত্য*, শঙ্খ ঘোষ, প্যাপিরাস, তৃতীয় মুদ্রণ, মাঘ ১৪০৫।

দি অ্যাবসার্ড : নাটকে উদ্ভটতত্ত্ব

দত্তাত্রেয় দত্ত

উদ্ভটের প্রতি একটা ঝোঁক সর্বদেশেই আছে। আমাদের দেশে ধ্রুপদি সাহিত্যে উদ্ভটশ্লোকে তার নজির মেলে; এমনকি রবীন্দ্রনাথের মতো স্থিতধী লেখকের রচনাতেও তার প্রচুর নিদর্শন পাওয়া যায়। কিন্তু নিছক মজা পাবার জন্য যে উদ্ভটের চর্চা, তাকে গুরুতর বিষয়ে প্রয়োগ করা হলে তা চিন্তার—ক্ষেত্রবিশেষে হয়তো বা দুশ্চিন্তারও কারণ হয়ে দাঁড়াতে পারে। বিশ শতকের শেষার্ধে এমনই এক নাট্যধারা ইওরোপে দেখা দেয়, যা জীবনের বা জৈবনিক অভিজ্ঞতার ব্যাখ্যা হিসেবে উদ্ভটকে অবলম্বন করে। এ-ধারাটা আমাদের অভ্যস্ত নাট্যধারার এতই বিপরীতমুখী ছিল যে এ প্রথমে আমাদের চমক লাগিয়েছিল, তারপরে বিস্ময় জাগিয়েছিল। তার পরে প্রশ্ন তুলেছিল, এ কেমন নাটক? এর তাৎপর্য কী? এ নাটক কেন এইভাবে লেখা হয়েছে? অ্যাবসার্ড নাটক নিয়ে যত আলোচনা, তা মূলত এই শেষ প্রশ্নটাকে ঘিরে। প্রথাসিদ্ধ নাটক এ-ধরনের প্রশ্ন জাগায় না।

নামেই প্রমাণ, অ্যাবসার্ড নাটকের ধারণাটা বিদেশে উদ্ভূত। অবশ্য সুসংহত নাট্য-আন্দোলন হিসেবে অ্যাবসার্ড নাটক দেখা দেয়নি। কিছু বিচ্ছিন্ন নাট্যকারের নাট্যরচনার মধ্যে এক ধরনের মিল লক্ষ করে মার্টিন এস্‌লিন এই ধারাটিকে অ্যাবসার্ড নাট্যধারা হিসেবে চিহ্নিত করেন। তাঁর *Absurd Drama* নামে নাট্যসঙ্কলন ও *The Theatre of the Absurd* নামে প্রবন্ধের বইটিই এই নাট্যধারা সম্পর্কে সবচেয়ে পরিচিত ও প্রাথমিক পাঠ। আমাদের দেশে ঐ ধারার সমান্তরালে যা নাটক লেখা হয়েছে, তাদের একটা চমৎকার নাম দেওয়া হয়েছে: 'কিমিতি নাটক'। কিম্‌ ইতি— অর্থাৎ 'কী এ?' যাকে সাধারণ যুক্তিতর্কের গণ্ডিতে বাঁধা যায় না, দৈনন্দিন জীবনের ছক দিয়ে বোঝা যায় না, তাকে নিয়েই প্রশ্ন ওঠে যে এটা কী? কিমিতি নাটকের রূপ এমন হবার কারণ এই যে অ্যাবসার্ড নাটকের মতো এতেও যত উদ্ভট ঘটনা উদ্ভট রকমে ঘটে; লোকে অদ্ভুত আচরণ করে; প্রত্যাশিত ক্রিয়া-প্রতিক্রিয়া ঘটে না। নাটক দেখার পর ভাবতে হয় যে এটা কী দেখলাম। এই নাট্যধারা দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের পরে ইওরোপে জন্ম নিয়ে কিছুদিন পশ্চিম দেশে আলোড়ন তুলে অতঃপর কালের গর্ভে

বিলীন হয়ে গেছে। এর ক্ষণস্থায়িত্ব খেয়াল করলে, এর ওপরে যে পরিমাণ আলোচনা হয়েছে তার মূল্য ও প্রয়োজন সম্বন্ধে কিছুটা সন্দেহ জাগে।

এস্‌লিনের মতে এই নাট্যকাররা অ্যাবসার্ড ধারণাটা নিয়েছিলেন কামুর *দ্য মিথ অফ সিসিফাস* (১৯৪২) নামে বই থেকে, যেখানে কামু বলেছেন যে জগৎ অর্থহীন, জীবন অর্থহীন; জগতে মানুষ নিজেকে বহিরাগত বোধ করে; তার সব উদ্যম নিষ্ফল। গ্রিক পুরাণের হিরস সিসিফাসের মতোই আমরা একটা বিশাল পাথরকে পাহাড়ের ঢালু বেয়ে ক্রমাগত তুলছি, আর প্রত্যেকবারই সেটা চুড়ো থেকে গড়িয়ে নীচে পড়ে যাচ্ছে। অথচ ঐটেই আমাদের করে যেতে হবে। এ এক হতাশাময় অস্তিত্ব। দর্শনের জগতে এ-ধারণার পূর্বসূত্র পাওয়া যায় সার্ত্রর অস্তিত্ববাদী দর্শনে, যার বক্তব্য এই ধরনের যে মানুষ এক অর্থহীন জগতে উৎকণ্ঠা আর হতাশা সম্বল করে বেঁচে থাকে। যতক্ষণ না সে নিজের কর্মপন্থা সম্বন্ধে একটা সিদ্ধান্ত নিচ্ছে, ততক্ষণ সে পরিচিতিহীন একটা অস্তিত্বমাত্র। ঐ সিদ্ধান্তেই মানুষ হিসেবে তার পরিচিতি, তার বাঁচার উদ্দেশ্য, তার মানবিক সম্ভ্রম। ভবিষ্যৎ কর্মপন্থা সম্বন্ধে এই সিদ্ধান্ত যদি কোনো সামাজিক অথবা রাজনৈতিক সিদ্ধান্ত হয়, তখন অবশ্যই তা নাটকের উপজীব্য হতে পারে : যেমন সার্ত্রর নিজের লেখা নাটকগুলো এই মূল ধারণারই রূপায়ণ বললে অত্যুক্তি হয় না। কামু অবশ্য সার্ত্রর দর্শনের সঙ্গে সরাসরি কোনো যোগ অস্বীকার করেছিলেন; তবুও দুজনের ধারণার মিল খুবই লক্ষণীয়। কামুর দৃষ্টিতে, সিসিফাসের কাহিনীতে প্রতীকায়িত ব্যর্থ পরিশ্রম আর নিরর্থ অস্তিত্বের উদ্‌ভ্রান্ত জগতে মানুষ এক অচেনা আগন্তুক : এক Stranger বা Outsider । কাজেই জীবনের কোনো অর্থ আদৌ আছে কিনা, এ তার কাছে অত্যন্ত সঙ্গত প্রশ্ন। জীবনের এই অর্থহীনতার বোধই হল অ্যাবসার্ডের অনুভূতি : *le sentiment de l'absurdite*। তাই বলে এর থেকে বেরোবার পথ আত্মবিলোপ নয়: অন্তত কামুর মতে নয়। অযৌক্তিকতার সঙ্গে লড়াইয়ে মানুষের অস্ত্র হল তার স্বচ্ছ দৃষ্টি, তার অন্তরে নিহিত অর্থ-অনুসন্ধানের প্রবণতা। অর্থহীনতার সঙ্গে এই সংগ্রামেই মানুষের অস্তিত্বের সার্থকতা।

কামুর বইটা কার্যত অ্যাবসার্ডপন্থীদের প্রচারপুস্তিকা হয়ে দাঁড়ায়। কিন্তু কামুর বক্তব্যকে তাঁরা তীক্ষ্ণভাবে সঙ্কীর্ণ করে নিলেন তার ইতিবাচক অংশটা বাদ দিয়ে। ১৯৪১-৪৩ সালে সার্ত্র ও কামুর রচনার দার্শনিক ভিত্তিতে ছিল দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের লড়াই ও জার্মানি-অধিকৃত ফ্রান্সে গোপনে জার্মান-প্রতিরোধ চালিয়ে যাওয়ার কর্মকাণ্ড — যাতে সার্ত্র-কামুরা প্রত্যক্ষভাবে জড়িত ছিলেন। তাঁরা অত্যাচার দেখেছেন, নিরর্থক মৃত্যুও দেখেছেন, কিন্তু সেসব তখনও অনেকটা ব্যক্তিক পর্যায়ে আবদ্ধ ছিল— নিজের সিদ্ধান্তে বা কাজের মাধ্যমে তার প্রতিকার করা মানুষের আয়ত্তে ছিল (বা অন্তত তার পক্ষে করতে পারা সম্ভব, এই ভাবনার অবকাশ ছিল)। আর ১৯৪৫-এর পরে, গ্যাস-চেম্বারে অগণ্য ইহুদিনিধনের পরে, আণবিক বোমায় বেহিসেবি গণহত্যার পরে, পঞ্চাশের দশকে পড়ে ছিল শুধুই জীবনের অর্থহীনতার বোধ : যে জীবন যে-কোনো মুহূর্তে যে-কারো খেয়ালে সামগ্রিভাবে ধ্বংস হয়ে যেতে পারে— অথচ যে জীবন আমরা যাপন করতে বাধ্য হই— কিসের আশায়, কিসের ভরসায়, তা আমরা নিজেরাই জানি না। এই জগৎব্যাপী অনিশ্চিতির পশ্চাৎপটে মানুষের অস্তিত্বের তুচ্ছতা, তার কাজকর্মের হাস্যকরতা দেখাতে উদ্বুদ্ধ হয়েছিলেন কিছু নাট্যকার পঞ্চাশের দশকে। তাঁরাই প্রধানত অ্যাবসার্ড নাট্যকার হিসেবে চিহ্নিত।

এই নাট্যকারদের একটা সাধারণ ধারণা ছিল এই যে মানুষ একটা বিগড়ে যাওয়া জগতে বাস করছে। এ জগতের অর্থ কিছু বোঝা যায় না, মানুষ এখানে উদ্দেশ্যহীনভাবে বাঁচে;

উপরন্তু সে উদ্‌ভ্রান্ত, তুচ্ছ অসুবিধে নিয়ে ব্যস্ত, এবং অস্পষ্টভাবে বিপন্ন। এটাকে শুধুমাত্র তাঁদের উৎকল্পনা বলে উড়িয়ে দেবার প্রয়োজন নেই। বস্তুত ধনতন্ত্রের উদ্‌গতির চাপে রেনেসাঁস আমল থেকেই জগৎ ও সমাজ থেকে hierarchy বা চিরায়ত স্তরবিন্যাসের ধারণাটা ক্রমে লোপ পেতে আরম্ভ করেছিল। তার ফলে জগৎকে ব্যাখ্যা করার একটা স্থায়ী ছক নষ্ট হয়ে যায়। আবার উনিশ শতকে ডারউইন ও নীট্‌ৎশে তত্ত্বের প্রভাবে ঈশ্বরও দুনিয়া থেকে পাকাপাকিভাবে বিদায় নিয়েছিলেন। ফলে বিশ শতকে মানুষের চৈতন্য থেকে ব্যবস্থিত জীবন, ধর্মবোধ ও ঐশ্বরিক চেতনা ক্রমে হারিয়ে গিয়ে তার জগৎটা বিগ্‌ড়ে গিয়েছিল। অর্থাৎ এই জগৎটাকে সুব্যবস্থিতভাবে চালাবার কেউ যদি না থাকে তো জগৎ নিশ্চয় বিশৃঙ্খল— এই ধারণাটা অস্পষ্টভাবে মানুষের চেতনায় হানা দিচ্ছিল।

কাজেই, প্রথাগত বিশ্বব্যবস্থা অচল হয়ে পড়লে প্রথাগত পন্থার শিল্প কী করে তাৎপর্য বহন করবে, এ-সন্দেহ বিশ শতকের বহু শিল্পীরই মনে দেখা দিয়েছিল। সেই কারণে সারা বিশ শতক জুড়ে শিল্পে প্রথাতিগ নানা ইজ্‌মের প্রাদুর্ভাব ঘটতে থাকে, যার মধ্যে অ্যাবসার্ড ধারার নাটক মাত্র একটি। থিয়েটার বলতে যা কিছু বোঝায়, সে সমস্ত বর্জন করে এই নাট্যকাররা ফিরতে চেয়েছিলেন আদিম সেই যুগের মানসিকতায়, যখন ঈশ্বর নেই, চরাচরের কোনো যুক্তিগ্রাহ্য ব্যাখ্যা নেই, আছে শুধু অস্পষ্ট ও ব্যাপক উদ্বেগ-উৎকণ্ঠার মধ্যে দুর্বোধ্য রিচুয়াল বা অভিচারের মতো একই কাজ বারবার করে যাওয়া। বিশেষত তাঁদের ক্ষেত্রে আণবিক যুদ্ধে মানবজাতির ধ্বংস হয়ে যাওয়ার আশঙ্কা মানুষের অস্তিত্বের অর্থহীনতার ধারণাটাকে আরো প্রবল করে তুলেছিল। মানুষের অস্তিত্বই যেখানে অনিশ্চিত, সেখানে মূল্যবোধ টিকে থাকতে পারেনা। আর শুধু বিশ্বযুদ্ধ নয়, এমনিতেই সারা বিশ শতক জুড়ে পশ্চিম দেশে পরিবারপ্রথার ভাঙন ত্বরান্বিত হচ্ছিল। মানুষে-মানুষে সম্পর্ক অস্থির হয়ে পড়ার দরুন মূল্যবোধেরও অবলুপ্তি ঘটছিল। এই মূল্যবোধের অভাব অ্যাবসার্ড নাট্যকারদের পরিপূর্ণভাবে চরিত্রায়িত করে।

এরই সঙ্গে বিশ শতকে ফ্রয়েড, য়ুঙ্গ, আড্‌লার, প্রমুখ মনোবিজ্ঞানীদের গবেষণার প্রভাবে মানুষ জানছিল যে আমাদের চৈতন্যের যুক্তিময় উপরিতলের ঠিক নীচেই ঢের বেশি শক্তিশালী এক যুক্তিহীনতার প্রেরণা কাজ করে চলেছে: তার নাম অবচেতন মন। এর প্রভাব আর্তো প্রমুখের থিয়েটার তত্ত্বের ওপর পড়েছিল ; আর সেই তত্ত্বের সুবাদে অবদমিত আবেগের উন্মোচন, এবং ভাষার পরিবর্তে দেহ, গতি, ও অন্যান্য মঞ্চউপাদানের ব্যবহার করাটা নাট্যচর্চার ক্ষেত্রে একটা তাত্ত্বিক ভূমি পেয়ে গিয়েছিল। এর পরিণতি দেখা গিয়েছিল ইউরোপীয় থিয়েটারে অ্যাবসার্ড নাটকের ক্ষীয়মাণ পর্বের আমলে গ্রতোভ্‌স্কি ও পিটার ব্রুকের নানা প্রযোজনায়: *The Constant Prince*-এ সীজ্‌লাকের নাড়ীকাঁপানো নিনাদে ও *Dionysus 1969*-এর মঞ্চে দর্শকসান্নিধ্যে উলঙ্গ অভিনেতা-অভিনেত্রীদের প্রকাশ্য যূথযৌনাচারে। কিন্তু ঐ একই প্রভাবে এসবের আগেই অ্যাবসার্ড নাট্যকাররা ব্যক্তিগত দুঃস্বপ্ন, আতঙ্ক ও উৎকল্পনাকে অবলম্বন করে নাটক লিখতে আরম্ভ করেছিলেন : ব্যক্তিগত চৈতন্যে যা প্রামাণ্য, সার্বজনীন স্তরেও তা প্রামাণ্য হতে বাধ্য, এই যুক্তিতে। অবচেতন মনের ওপর এই জোর দেবার ফলে অ্যাবসার্ড নাট্যকাররা নাটকে যুক্তি, অর্থাৎ ঘটনার কার্যকারণসিদ্ধ প্রগতি একেবারেই বর্জন করেছিলেন। তাঁদের নাটক শুধু মূল্যবোধ-বর্জিত নয়, যৌক্তিকতা-বিরোধীও বটে। অ্যাবসার্ড নাটকে যা ঘটে, তা আকস্মিকভাবে ঘটে, পূর্ব ঘটনার সঙ্গে তার কোনো যৌক্তিক সম্পর্ক থাকে না। প্রাচীন কালের নিন্দিত দর্শন হঠবাদকে অ্যাবসার্ড নাট্যকাররা উদ্দেশ্যমূলকভাবে মঞ্চেফিরিয়ে আনতে উদ্যোগী হয়েছিলেন।

মানুষে-মানুষে অর্থপূর্ণ যোগাযোগস্থাপনের মাধ্যম হিসেবে ভাষার ভূমিকা অ্যাবসার্ড নাট্যকাররা অস্বীকার করেছিলেন। তাঁদের মতে আমরা যে শুধু অর্থহীন কথা বলি তাই নয়; ভাষা জিনিসটাই বাস্তবকে উপস্থাপিত করতে পারে না। ভাষাও শুধুমাত্র একটা প্রথা— অতএব নিরর্থ। আমরা কথা বলি অভ্যাসে। কাজেই অ্যাবসার্ড নাটকে আমরা ক্রমাগতই অর্থহীন সংলাপ পাই, যার মধ্যে খেজুরে কথা, সাংবাদিক বুক্‌নি, রাজনৈতিক স্লোগান, বৈজ্ঞানিক বা দার্শনিক কচ্‌কচি, ইত্যাদির খিচুড়ি থাকে। আমরা নিত্যই দেখি যে কিছু লোক বিপ্লব, লড়াই, ইন্ডিটার্মিনেসি, বিশ্বায়ন, গণতান্ত্রিক পদ্ধতি, ফোর্থ ডাইমেনশন, শ্রেণীসংগ্রাম, ইত্যাদি নানা শব্দ নির্বিচারে প্রয়োগ করে চলেছে— কথাগুলোর তাৎপর্য তিলমাত্র অনুধাবন না করেই। ভাবলে বোঝা যায় যে আমরাও— অতটা উগ্রভাবে না হলেও— প্রায়ই অমন কাজ করে থাকি। অর্থাৎ আমরা কতকগুলো শব্দই কেবল পৌঁছে দিই অপরের কাছে—তার কোনো তাৎপর্য বোধ করি বা না করি, অন্যের কাছে তা পৌঁছক বা না-পৌঁছক। অ্যাবসার্ড নাট্যকাররা এই আটপৌরে ভাষার (কখনো বা পরিশীলিত ভাষারও) নিরর্থকতার ওপর বিশেষ জোর দিয়ে তার শূন্যগর্ভতা প্রকট করার দিকে সবিশেষ মন দেন। অবশ্য তার পরিবর্ত কোনো অর্থপূর্ণ ভাষা তাঁরা তৈরি করেননি : বরং একটা নেতিবাচক ভূমিকা অবলম্বন করেই তাঁরা নিজেদের সার্থক ভেবেছিলেন। সেই কারণে তাঁদের নাটকে জীবনের চিত্র না পেলেও অন্তত জীবনের প্যারডিকার হিসেবে তাঁদের শ্রেষ্ঠত্ব অস্বীকার করা যায় না। অ্যাবসার্ড ধারার প্রথম গুরুত্বপূর্ণ নাটকের নামই হল *প্যারডি* (অ্যাডামভ, ১৯৪৭)।

এছাড়া লক্ষণীয়ভাবে অ্যাবসার্ড নাটকে নাট্যদ্বন্দ্ব অনুপস্থিত। যে-জগতে সামাজিক স্থিতি বা পর্যায়ক্রম নেই, সেখানে ক্ষমতার দ্বন্দ্ব থাকতে পারে না; যেখানে মানুষের অস্তিত্বের ও কাজের অর্থ নেই, সেখানে ব্যক্তিদ্বন্দ্ব বা উদ্দেশ্যের দ্বন্দ্ব থাকতে পারে না, এবং যেখানে কথা অর্থহীন, সেখানে মতদ্বন্দ্ব অসম্ভব। কাজেই এমন নাটকে মানুষ যত উদ্‌গ্রীব হয়ে যা কিছুই করুক না কেন, তার কোনো ফলোদয় হয় না— তাদের উদ্যমের সঙ্গে উদ্যমের পরিণতির কোনো সম্পর্ক থাকে না— যার ফলে তাদের অস্তিত্বের চরিত্র কখনোই পালটায় না।

১৯৫২ (বেকেটের *ওয়েটিং ফর গোডো*) থেকে ১৯৬২ (ইওনেস্কোর *এক্সিট দ্য কিং*) পর্যন্ত সময়টাকে নিশ্চিতভাবেই বিশ্ব রাজনীতিতে ঠাণ্ডা লড়াইয়ের যুগ বলে চিহ্নিত করা যায়। এই সময়ের যত উৎকণ্ঠা, অনিশ্চিতির আতঙ্ক, আণবিক যুদ্ধের সম্ভাবনা, মনুষ্যজাতি বিলুপ্ত হবার ভয়, সবই অ্যাবসার্ড নাট্যকারদের জীবনদৃষ্টিকে প্রভাবিত করেছিল ; কিন্তু তা'বলে তাঁরা গোষ্ঠীবদ্ধ হয়ে কোনো আদর্শগত মুখপত্র হাতে নিয়ে কোনো নাট্য-আন্দোলনে নামেন নি। এমনকি এই সময়ের প্রধান নাট্যকাররা— স্যামুয়েল বেকেট (আয়র্ল্যাণ্ড, ১৯০৬-৮৯), ইউজীন ইওনেস্কো (রুমানিয়া, ১৯০৯-৯৪), আর্থার অ্যাডামভ (রাশিয়া, ১৯০৮-৭০), এডওয়ার্ড অল্‌বি (আমেরিকা, ১৯২৮), হ্যারল্ড পিন্টার (ইংলণ্ড, ১৯৩০) ও ফার্নাণ্ডো অ্যারাবাল (স্পেন, ১৯৩২), প্রমুখরা এক দেশেরও লোক ছিলেন না, আর— কামুর প্রভাব সত্ত্বেও— তাঁরা সকলে একটা সাধারণ দার্শনিক ভূমির ওপর দাঁড়িয়েও নাটক রচনা করেননি। অ্যাবসার্ড নাটকের জন্মস্থান ও লীলাভূমি ফ্রান্সে হলেও মেজাজে এঁদের নিকটতম ফরাসি নাট্যকার ছিলেন একমাত্র জাঁ জেনে, যাঁকে সঙ্গত কারণেই অ্যাবসার্ড নাট্যকারের দলে ফেলা হয় না। এঁরা প্রথাভিগ বা ব্যতিক্রমী নাট্যরচনার কোনো 'তরুণ বিদ্রোহী' দলও ছিলেন না (বস্তুত *গোডো*-র সময়ে এক অ্যারাবাল ছাড়া সকলেই চল্লিশোর্ধ); এমনকি থিয়েটারসংক্রান্ত কোনো পরীক্ষা-নিরীক্ষা বা অগ্রগতির আন্দোলনেও এঁরা কেউ যুক্ত ছিলেন না। কাজেই এস্‌লিনের প্রথম বই

থিয়েটার অফ দ্য অ্যাবসার্ড-এর চাইতে দ্বিতীয় বইয়ের *অ্যাবসার্ড ড্রামা* নামকরণ সঙ্গততর হয়েছিল। বেকেট পরবর্তী কালে নাট্যনির্দেশনায় যুক্ত হলেও অ্যাবসার্ড নাটক কোনোকালে নির্দেশকের থিয়েটার ছিল না— গোড়া থেকেই তা ছিল সাহিত্যিকদের থিয়েটার— এবং তার ফল ঠিক যেমনটি হবার, তেমনটিই হয়েছিল।

ডাডাইস্ট, সুরিয়ালিস্ট, ইত্যাদির মতো অ্যাবসার্ডিস্ট নাটককেও সিম্বলিক নাট্যধারার একটা অতিকৃত বিস্তৃতি মনে করা যায়। বাস্তববাদী নাটকের প্রথাগত নাট্যক্রিয়া বা চরিত্রায়ণ এতে নেই; পাত্রপাত্রীদের কাজের কোনো উদ্দেশ্য প্রকট হয় না, বরং তার উলটোটাই প্রমাণ করতে নাট্যকার বেশি উৎসাহী। প্লটের কোনো সংগঠন না থাকায় একই ঘটনা ক্লান্তিকর ও একঘেয়েভাবে বারবার ঘটে চলেছে বলে বোধ হয়। সেটা মানুষের জীবনের অর্থহীন চাক্রিকতারই প্রতিচ্ছবি। এই পশ্চাৎপটের সামনে চরিত্রের সংলাপ হিসেবে আমরা পাই তুচ্ছ কথার সমাহার— সময় কাটাবার জন্য বলা অতিপরিচিত কিছু দৈনন্দিন বুক্‌নি— যার বিশেষ কোনো তাৎপর্য নেই, যা কোনোভাবেই ঘটনাকে বুঝতে বা এগোতে সাহায্য করে না। এর সামগ্রিক বক্তব্য হল : এক অর্থহীন দুনিয়াতে মানুষ শুধু অর্থহীন কাজ করে চলেছে, অর্থহীন কথা বলে চলেছে। এখানে কিছুই আসলে ঘটে না; আর যদি বা ঘটে, তো তার পিছনে কোনো কারণ নেই, যে-কোনো ঘটনা যে-কোনো মুহূর্তে আকস্মিকভাবে ঘটতে পারে; আগের ঘটনার সঙ্গে তার কোনো সম্বন্ধ নেই, কারণ জীবনে যুক্তি, পারম্পর্য, কারণশৃঙ্খলা, বা অর্থ নেই।

১৯৪৬ সালে যখন আনুই-এর *আন্তিগোনে* নাটকের বিরূপ সমালোচনা হয়, তখন সার্ত্র সে-নাটকের সমর্থনে এগিয়ে এসেছিলেন এই যুক্তি নিয়ে যে, এ-কোনো বাস্তববাদী নাটক নয় যে এখানে সুনির্মিত ঘটনার, বা মনোবিজ্ঞানসম্মত চরিত্রের প্রত্যাশা করতে হবে। এ হল সামগ্রিক মানবিক পরিস্থিতির নাটক— যেখানে মানুষ এক সঙ্কটময় পরিস্থিতির প্রেক্ষাপটে নিজের কর্তব্য নির্ধারণ করছে। আন্তিগোনের ব্যক্তিত্বে নয়, তার প্রতিবাদী সিদ্ধান্তেই তার মানবিক সম্ভ্রম। এ হল দায়বদ্ধ থিয়েটার বা 'কমিটেড থিয়েটার'। এই সঙ্কটের ভাবটা লোপ পেয়ে গিয়েছিল অ্যাবসার্ড নাট্যকারদের সময়ে। তাঁরা প্রত্যক্ষ কোনো সঙ্কটের মধ্যে ছিলেন না, কিন্তু সর্বদাই এই আশঙ্কায় ছিলেন যে এই বুঝি কিছু হল। কী যে হতে পারে, সে সম্বন্ধেও কোনো স্পষ্ট ধারণা তাঁদের ছিল না, ফলে তাঁদের নাটকে আমরা সর্বদাই দেখি একটা ঘটবে-ঘটবে ভাব— কিন্তু আসলে কিছুই ঘটে না। ঐতিহ্যগত ধারায় নাটক ছিল ঘটনা বা চরিত্রের নাট্য; অস্তিত্ববাদীদের হাতে তা হল পরিস্থিতির নাট্য; অ্যাবসার্ড নাট্যকারেরা তাকে করলেন অবস্থার নাটক— অর্থাৎ মানুষের কী দুরবস্থা, তারই রূপায়ণ। বলা বাহুল্য, এই অবস্থাটা অ্যাবসার্ড নাট্যকারদের মতে হল হাস্যকর; তাই মানুষ প্রাণীটিও তাঁদের দৃষ্টিতে এক হাস্যকর জীব ছাড়া আর কিছু নয়। মানুষের দুরবস্থা নিয়ে তাঁরা প্রচুর হেসেছেন। এঁদের অন্যতম প্রবক্তা ইওনেস্কোর ভাষায় :

> কোনো পরিবর্ত নেই : মানুষ যদি ট্রাজিক না হয়, তবে সে হাস্যকর ও পীড়াদায়ক—বস্তুত 'কমিক'— তবে তার উদ্ভটত্ব প্রকট করে একধরনের ট্রাজেডি পাওয়া যেতে পারে।...বস্তুত আমার মনে হয় মানুষ হয় অসুখী (metaphysically unhappy), নয়তো সে নির্বোধ।

কিন্তু এই অ-সুখ নিয়ে মানুষের কিছু করার নেই; কারণ কর্মের মাধ্যমে তার প্রতিকারের প্রচেষ্টাও অর্থহীন ও হাস্যকর। এমন জীবনদৃষ্টিকে কেউ যদি মানুষের উপযুক্ত জীবনদৃষ্টি বলে ভাবেন, তো সে স্বাধীনতা তাঁর অবশ্যই আছে। কিন্তু প্রশ্ন হল, সেটা নাটকে উপস্থাপনার উপযুক্ত জীবনদৃষ্টি কিনা। নাটকে তখনও পর্যন্ত যা কিছু গড়ে উঠেছিল, উদ্দেশ্যহীনতা তার

কিছুর সঙ্গেই মেলে না। বস্তুত উদ্দেশ্যহীনতা ব্যাপারটাই নাট্যগুণহীন, বলতে গেলে নাটক-বিরোধী। সেটা উক্ত নাট্যকাররাও বুঝেছিলেন। তাই তাঁদের 'অ্যান্টি-থিয়েটার'-কে দর্শকগ্রাহ্য করে মঞ্চে হাজির করার জন্য তাঁদের কিছু থিয়েটারি চাতুরীর আশ্রয় নিতে হল। অ-নাটকীয়তার প্রতি দর্শকের যে মানসিক প্রতিরোধ, সেটাকে এড়াবার জন্য তাঁরা— বিশেষত বেকেট— নিজেদের বক্তব্যকে ভাঁড়ামির খোলসে মুড়ে হাজির করলেন দর্শকসান্নিধ্যে, যাতে দর্শক অন্তত ভাঁড়ামি দেখার মজা পাবার জন্যও নাটকটা দেখে। 'মানুষের হাস্যকরতা' দেখাবার যে উদ্দেশ্য তাঁদের ছিল, তার সঙ্গে এ-চাতুরীটা খাপ খেয়েও গেল। তবে এতে করে শুধু নাটকটা নয়, তাঁদের বক্তব্যও যে ভাঁড়ামিতে পর্যবসিত হচ্ছে, সে নিয়ে বিশেষ যে দুশ্চিন্তা তাঁদের ছিল, এমন প্রমাণ মেলে না। পৃথিবীর সম্ভবত সর্বাধিক আলোচিত অ্যাবসার্ড নাটক— বেকেটের *ওয়েটিং ফর গোডো* এবং *এণ্ডগেম* (১৯৫৬)— এমনই চারটে করে ভাঁড়কে নিয়ে লেখা, যাদের প্রতীক্ষা, কাজকর্ম, কথাবার্তা, প্রচেষ্টা, সবই নিরর্থক। গোগো আর ডিডি যেমন, হ্যাম আর ক্লোভও তেমন, এক নিশ্চল সময়ের পটে শুধু প্রতীক্ষা করে— কিসের প্রতীক্ষা করে, তা তারা নিজেরাও জানে না, আর সময় অচল বলে প্রতীক্ষিত কিছু ঘটেও না। ফলে মঞ্চে চরিত্রদের যা কিছু কথা-কাজ, সবই নিষ্ফল, হাস্যকর প্রচেষ্টা বলে বোধ হয়। বলা যেতে পারে, এই কিচ্ছু না-ঘটাটাই হল বেকেটের 'নাটক'। মূল ঘটনা হল প্রতীক্ষা : *গোডো*-তে ভ্লাদিমির ও এস্ত্রাগন একটা হতাশ আশা নিয়ে প্রতীক্ষা করে; *এণ্ডগেম*-এ হ্যাম ও ক্লোভ প্রতীক্ষা করে এক নিরবয়ব আশঙ্কা নিয়ে। দুটো নাটকেই প্রতীক্ষার কোনো পরিণতি নেই। এই প্রতীক্ষা নিয়ে বেকেটের চূড়ান্ত নাটক *ব্রেথ* (১৯৬৯)— যেখানে দর্শকই একটা অনির্দিষ্ট প্রত্যাশা নিয়ে অপেক্ষা করেন কিছু ঘটার। পর্দা ওঠে, জঞ্জাল-ছড়ানো মঞ্চে নবজাতকের চীৎকার শোনা যায়, তারপর শ্লথ শ্বাসের ধ্বনি, তার সঙ্গে তাল রেখে মঞ্চেআলো বাড়ে ও কমে। অতঃপর আরেকটি চীৎকার দিয়ে নাটক শেষ।

ওয়েটিং ফর গোডো-র প্রথম প্রদর্শনীতে (১৯৫৩) ফ্রান্সে বিরূপ প্রতিক্রিয়া এনেছিল। কিন্তু কিছু বুদ্ধিজীবী— তাঁদের মধ্যে আনুই-ও ছিলেন— নাটকটিকে সেযুগের প্রতিভূ নাটক বলে দাবি করার পর ক্রমে সেটাই এর স্থায়ী মূল্যায়নে দাঁড়িয়ে যায়। নানা ভাষায় অনুবাদ ও বিশ্বব্যাপী মঞ্চায়নের ফলে বিতর্ক ও প্রশংসার ঝড়ও বইতে থাকে। ব্রিটেনে অবশ্য এ-নাটকের তেমন মর্যাদা হয়নি। তখনকার দিনের অন্যতম অভিনেতা র‍্যাল্‌ফ রিচার্ডসন (অ্যালেক গিনেসের ভ্লাদিমিরের বিপরীতে) এস্ত্রাগনের ভূমিকায় অভিনয় করতে অস্বীকার করেন, কারণ নাট্যকার নিজেই নাটকটা তাঁকে বোঝাতে পারছিলেন না। জন গিলগুডও পরবর্তীকালে *এণ্ডগেম* নাটকে অভিনয় করতে অস্বীকার করেন এই যুক্তিতে যে, যে-জিনিস বোঝাই যায় না, তাতে অভিনয় করা তাঁর পক্ষে সম্ভব নয়। ১৯৫৫ সালে পিটার হল গোডো-র প্রযোজনা করলেন আর্টস থিয়েটার ও ক্রাইটেরিয়ন থিয়েটারে। পরবর্তীকালে তিনি এবং তাঁর দল স্বীকার করেন যে, মঞ্চে তাঁরা যে ঠিক কী করছিলেন এবং কেন করছিলেন, সে-বিষয়ে তাঁরা নিজেরাও খুব একটা নিশ্চিত ছিলেন না। বস্তুত, নাটকটা নিয়ে বাইরে ভ্রমণ করার সময়ে একবার ট্রেন ফেল করবার ভয়ে তাঁরা দ্বিতীয় দৃশ্যটা ঝড়ের বেগে অভিনয় করে যান, এবং দর্শক সেই ব্যাপারটাকেই চরম আশ্চর্য নাটক মনে করে খুব উল্লসিত হয়ে ওঠে। কিন্তু যাবতীয় সমালোচক বিরূপতা প্রকাশ করলেও কেবলমাত্র হ্যারল্ড হবসন ও কেনেথ টাইনানের সুউচ্চ প্রশংসার জোরে নাটকটা ছাত্র ও অ্যামেচার মহলে প্রচুর চলতে লাগল— এর ভাঁড়ামি আঙ্গিকটাকে যথেচ্ছ বাড়িয়ে নিয়ে।

১৯৫৫ সালে 'দি গার্ডিয়ান' পত্রিকায় টাইনানের যে-বক্তব্যের খুঁটির জোরে ইংরেজিভাষী মহলে বেকেটের সুনাম ছড়াল, সেটা মোটামুটি এইরকম:

> যা কিছু দিয়ে আমরা থিয়েটারকে চিনি, *ওয়েটিং ফর গোডো* পরিষ্কার সেসব বর্জন করেছে। যেন সে কাস্টম্‌স হাউসে এসেছে কোনো মালপত্র কি পাসপোর্ট ছাড়াই, এমনকি বিশেষ করে জানাবার মতোও কোনো কিছু না নিয়ে। তবু সে— যেন মঙ্গলগ্রহাগত এক তীর্থযাত্রীর মতো—ছাড়পত্র পেয়ে যায়। এইটে সে পারে, কারণ তার আবেদন পৌঁছয় বইয়ে পাওয়া নাট্যসংজ্ঞার চাইতে মৌলিকতর কোনো নাট্যবোধের কাছে। সে বলে যে বীতশ্রদ্ধ না হয়ে অন্ধকারে দু'ঘণ্টা কাটানোই হল নাটক— আর সেটা প্রমাণও করে দেয়।'

নাটকের এমন সংজ্ঞার সঙ্গে ক'জন একমত হবেন বলা শক্ত; তবে 'বোর্‌ড' না হয়ে দুঘন্টা কাটানোর যে দাবি টাইনান করেছিলেন, সেটা সর্বসত্য বলে মানার কোনো কারণ নেই। ১৯৫৬ সালে আমেরিকায় প্রথম উপস্থাপনাতেও এ-নাটক ব্যর্থ হয়, কারণ বিজ্ঞাপনে এটাকে 'দুই মহাদেশের হাসির জোয়ার'-বওয়ানো নাটক বলে ঢাক পিটিয়ে দর্শকদের খুশি হবার জন্য যথাসাধ্য প্রস্তুত করে রাখা সত্ত্বেও গোগোর ভূমিকায় পেশাদার ভদভিল-অভিনেতা বের্ট লার পর্যন্ত দর্শককে হাসিয়ে উঠতে পারেন নি।

ওয়েটিং ফর গোডো-র নির্মাণকৌশল সম্বন্ধে একটা কথা খুব গর্বের সঙ্গে বলা হয়ে থাকে যে এ-নাটকে কিচ্ছু ঘটে না : শুধু একবার নয়—দু'দুবার। কিন্তু সত্যিই কি দুটো অঙ্কে একই ব্যাপারের পুনরাবৃত্তি ঘটে? লাকি আর পোজো প্রথম অঙ্কে যে অবস্থায় আসে, যা যা করে, সেটাই কি দ্বিতীয় অঙ্কে ঘটে? তাদের পারস্পরিক সম্পর্ক কি একই জায়গায় দাঁড়িয়ে থাকে? তেমন হলে বোধহয় দর্শক হল ছেড়ে চলেই যেত। আসলে তাদের পারস্পরিক অবস্থানে উচ্চাবচ আছে— সেই অবস্থান উলটে যায়, পরিস্থিতি পালটায়; ঘটনা এগোয়; দর্শক তাৎপর্য খোঁজার একটা কোনো অছিলা অন্তত পায়। নাটকে সম্পূর্ণ স্থিতাবস্থা চলতে পারে না। এ নাটকও তার ব্যতিক্রম ঘটাতে পারেনি। 'যা কিছু দিয়ে আমরা থিয়েটারকে চিনি,' তার, সমস্তটা মোটেই এ-নাটক বর্জন করতে পারেনি। ও দাবিটা আসলে টাইনানের পেশার প্রয়োজন থেকে উদ্ভূত হয়েছিল।

টাইনান (এবং পরবর্তী বহু আলোচক) কার্যত অ্যাবসার্ড নাটককে একটা কৌতূহলোদ্দীপক ফর্ম হিসেবে ভাবলেও *ওয়েটিং ফর গোডো* এবং সেখানে রূপায়িত জীবনদর্শনের যথার্থতা সম্বন্ধে অন্তত একটা প্রমাণ দেওয়া হয়ে থাকে একটা তুঙ্গী উদাহরণের মাধ্যমে। স্যান কোয়েন্টিনের জেলখানায় কারাদণ্ডে দণ্ডিত চোদ্দ শ' আসামির সামনে এ-নাটক যখন উপস্থিত করা হয়েছিল, তখন তাদের নাকি নাটকটা খুবই ভালো লেগেছিল— তারা নিজেদের পরিস্থিতি দিয়ে নিজেদের মতো করে এ-নাটকের অর্থ বুঝে নিয়েছিল : 'গোডো হল সমাজ', বা 'গোডো হল বাইরের জগৎ।' পরবর্তী কালে তারা নিজেরা নাট্যদল গড়ে পরপর বেকেটের ও অন্যান্য নাট্যকারের অ্যাবসার্ড নাটক মঞ্চস্থ করতে থাকে; এমনকি রিক ক্লাচি, ওয়াল্টার অ্যাসমাস, প্রমুখ দণ্ডিত অপরাধীরা মুক্তির পরে নাট্যনির্দেশনাতেই নেমে পড়েন। বেকেটের সঙ্গেও তাঁরা সহ-নির্দেশক হিসেবে কাজ করেন; প্রায় তাঁর বন্ধুই হয়ে যান।

এ-প্রসঙ্গে একপক্ষে অবশ্যই বলা যায় যে যারা নিজেদের দণ্ডিত— হয়তো বা যাবজ্জীবন দণ্ডিত— বলে জানে, তারাই জগতে মানুষের সঠিক অবস্থান অনুভব করতে পারে; আর বাকি আমরা সবাই আসলে তাদের মতো দণ্ডিত (সার্ত্র-র ভাষায় 'condemned to be free') হওয়া সত্ত্বেও শুধুমাত্র মুক্তির ভ্রান্তিতে ভুগছি। অপরপক্ষে এও বলা যায় যে অপরাধ কোনো একটা

ক্রিয়ামাত্র নয়, অপরাধ একটা বিশেষ প্রবণতার প্রকাশ ; এবং সে-প্রবণতাগ্রস্ত না হলে বেকেটের নাটকের যথার্থ তারিফ করা সম্ভব নয়। এ-প্রসঙ্গে বেকেটের জীবনের একটা ছোট্ট ঘটনার কথা উল্লেখ না করে পারা যায় না। ১৯৩৮ সালে প্যারিসে এক কুখ্যাত বেশ্যার দালাল (তার নাম প্রুডেন্ট) তাঁকে ছুরি মারে— তার প্রস্তাব প্রত্যাখান করার জন্য। বেকেট তাকে যখন প্রশ্ন করেন সে কেন তাঁকে ছুরি মেরেছিল, সে বলে 'আমি ঠিক জানি না স্যার, আমি দুঃখিত।' উত্তরটা বেকেটের নাকি ভালো লেগেছিল, এবং লোকটিকেও বেশ ভালো লেগেছিল। তিনি তার বিরুদ্ধে নালিশ প্রত্যাহার করে নেন। পরবর্তীকালে জাঁ পল সার্ত্রও অপরাধ-মানসিকতাগ্রস্ত জাঁ জেনে-কে 'সেন্ট' উপাধিতে অভিষিক্ত করেছিলেন।

অ্যাবসার্ড নাটকের অন্যতম প্রবক্তা ও রচয়িতা ইওনেস্কো বেকেটের কিছু আগেই এই ধারায় নাট্যরচনা শুরু করেছিলেন। তিনি তাঁর নাটকের উদ্দেশ্য ও বক্তব্য বিষয়ে বেকেটের চাইতে ঢের বেশি সোচ্চার। *The Bald Prima Donna* (১৯৫০) নাটক দিয়ে তাঁর অ্যাবসার্ড নাটক রচনা শুরু। অদ্ভুতভাবে কেনেথ টাইনান, যিনি মঞ্চে সামাজিক বাস্তববাদের তন্নিষ্ঠ সমর্থক ছিলেন, যিনি ব্রেশ্‌ট ও সার্ত্র-কে নাটকীয় উদ্দেশ্যমুখীনতার পরাকাষ্ঠা বলে মানতেন এবং অস্‌বোর্ন ও ওয়েস্কারের বাস্তবধর্মের উচ্চপ্রশংসা করেছিলেন (আবার যিনি বেকেটের নাটকের স্তুতিবাদ করতেও পরাঙ্মুখ হননি), তিনিই ইওনেস্কোর বিরূপ সমালোচনা করেছিলেন। তাঁর মতে ইওনেস্কোর নাটক উদ্দেশ্যবিহীন, দায়বদ্ধতাহীন। ইওনেস্কো এর জবাবে ১৯৫৮ সালে লেখেন যে শিল্পের সঙ্গে তত্ত্বের কোনো সম্পর্ক নেই, বাস্তবকে সরাসরি উপলব্ধি করার জন্য শিল্প নিজস্ব উপায় অবলম্বন করে। বস্তুত যে-ঘটনা থেকে *Prima Donna* নাটকটির উদ্ভব, সেটা ইওনেস্কোর একটা অভিজ্ঞতা। ইংরেজি শিখতে গিয়ে তিনি একটা কথ্য ইংরেজি শেখার বইয়ে পান জনৈক মিস্টার স্মিথ এবং তাঁর স্ত্রী মিসেস স্মিথের বাক্যবিনিময়।। সে বইয়ে মিসেস স্মিথ ক্রমাগত নিজেরই স্বামীকে নিজেদের পদবি কী, কটি সন্তানাদি, মিস্টার স্মিথের পেশা কী, কোথায় থাকেন, তাঁদের বাড়ির চাকরানির পরিচয়, ইত্যাদি সংবাদ দিচ্ছেন। এই একটা বাজারি টেক্সটবইয়ের পাতা থেকে ইওনেস্কোর উপলব্ধি ঘটে যে বাস্তবে আমরা সকলেই অর্থহীন উদ্ভট কথাবার্তা বলে চলেছি, জীবনটাই অর্থহীন একটা অস্তিত্ব। তাঁর ভাষায় : 'পরাবাস্তব এখানেই আছে, আমাদের নাগালের মধ্যে, আমাদের দৈনন্দিন আলাপের মধ্যে।' ইওনেস্কোর শিল্পে 'বাস্তবকে সরাসরি উপলব্ধি করার নিজস্ব উপায়ের' দাবির ব্যাপারে এর চাইতে বেশি টীকা বোধহয় অনাবশ্যক; তবে একটু আগে অ্যাবসার্ড থিয়েটার 'সাহিত্যিকদের থিয়েটার হওয়ার ফল' সম্বন্ধে যে মন্তব্য করা হয়েছে, সে-বিষয়ে কিছু ব্যাখ্যা এ-ঘটনা থেকে পাওয়া যেতে পারে।

The Bald Prima Donna নাটকের চরিত্র মিস্টার স্মিথ এবং মিসেস স্মিথের সংলাপ থেকে এই 'পরাবাস্তবতা'র সামান্য উদাহরণ নেওয়া যায়। স্মিথ-দম্পতি গিয়েছিল জনৈক ববি ওয়াটসনের অন্ত্যেষ্টিক্রিয়ায়, আর তারই বৌয়ের দুঃখ নিয়ে তাদের মধ্যে কথাবার্তা হচ্ছিল— তার মধ্যে মিসেস স্মিথ বলেন:

মিসেস : ও, তা ওরা দুটিতে কবে বিয়ে করছে?
মিস্টার : বড় জোর সামনে বসন্তে।

মিসেস : ইস্! এই বয়সে বিধবা হয়ে যাওয়া কী দুঃখ বল তো?
মিস্টার : ভাগ্যি ভালো যে ওদের ছেলেপুলে হয় নি।

মিসেস : ওঃ! তা হলেই হয়েছিল আর কি! এর ওপর ছেলেপুলে থাকলে ও কী করত বলো দেখি!

মিস্টার : মহিলার বয়স এখনও অল্প। আবার বিয়ে করে নিতে পারে। যাক্ শোকের পোশাকে মহিলাকে দারুণ দেখাচ্ছিল।

মিসেস : কিন্তু বাচ্ছাগুলোকে কে দেখবে? জানো তো— একটা ছেলে, একটা মেয়ে। কী যেন নাম ওদের?

এইরকমই চলতে থাকে, যেন আগের কথার সঙ্গে পরের কথার কোনো বিরোধ নেই; যদিও এমন পরিস্থিতি অবাস্তব বলেই হাস্যকর ও অর্থহীন। কিন্তু এ তো বাস্তব নয়, এ-হল পরাবাস্তব, তাই বাস্তবতার কোনো মানদণ্ডেই একে বিচার করা চলবে না। ফলে এ নাটক তারিফ করার জন্য পরাবাস্তব দর্শকের নিতান্ত প্রয়োজন। কিংবা একে 'সম্ভাব্য জগৎ তত্ত্ব' (Possible World's Theory) দিয়েও ব্যাখ্যা করা যায়: একজন লোকের মৃত/জীবিত থাকা, বিবাহিত/অবিবাহিত হওয়া, নিঃসন্তান/সসন্তান হওয়া একই সঙ্গে সম্ভব— বিভিন্ন সম্ভাব্য / পরিবর্ত জগতে। কেবল প্রেক্ষাগৃহে বসে সে-সব কথা তৎক্ষণাৎ বোঝার জন্য ওসব তত্ত্বে দীক্ষিত দর্শক দরকার। নাটকটা দেখতে দেখতে পরাবাস্তববাদ কিংবা সম্ভাব্য জগৎ তত্ত্বয় শিক্ষিত হয়ে ওঠা কারো পক্ষে সম্ভব নয়, এ নিয়ে ধন্ধ বোধহয় ইওনেস্কোর নিজেরই মনে ছিল:

> বেশ কিছুকাল ধরে বিজ্ঞান ও অচেতন-মনের তত্ত্ব বিশালভাবে এগিয়ে চলেছে, যেক্ষেত্রে লেখকদের অভিজ্ঞতাগত প্রতিভাসগুলো (empirical revelation) খুব অল্পই তা পারছে। এ অবস্থায় সাহিত্যকে কি জ্ঞানার্জনের মাধ্যমে হিসেবে আর ভাবা যায়?

সাহিত্যকে জ্ঞানার্জনের মাধ্যম ভাবা যাক বা না-যাক, নাটককে 'সাহিত্য' কিংবা 'জ্ঞানার্জনের মাধ্যম' হিসেবে ভাবার চেষ্টাটা আদৌ নাট্যদৃষ্টির পরিচায়ক কিনা, তা সন্দেহের বিষয়। তবে এর থেকেই বোঝা যায় যে নিজের সংকীর্ণ দার্শনিক ভূমিতে দর্শককে দাঁড় করাবার ভ্রান্ত সাহিত্যিক প্রচেষ্টাই অ্যাবসার্ড নাটকের ব্যর্থতার মূল কারণ। অভিজ্ঞতা দেখিয়ে দেয় যে নাটকের উপজীবী— অর্থাৎ পেশাদার সাহিত্যপণ্ডিত, নাট্যসমালোচক, বোদ্ধাযশঃপ্রার্থী, ইত্যাদি— এঁরা ছাড়া অ্যাবসার্ড নাটকের তারিফদার জেলের বাইরে দুর্লভ।

The Bald Prima Donna শূন্যগর্ভ বিবাহিত জীবনের নাটক। তারই আরেক চেহারা আমরা দেখি ইওনেস্কোর সবচেয়ে পরিচিত নাটক *Amedee, or How to Get Rid of It* নামে পূর্ণাঙ্গিকাতে। এ-নাটকে ঐ মিস্টার এবং মিসেস স্মিথই নাম পালটে অন্য এক দম্পতি হিসেবে হাজির, একই ধরনের কথোপকথন নিয়ে। এবারে শুধু তাদের বাড়ির মধ্যে কেবলই ব্যাঙের ছাতা গজায়, আর ভেতরের একটা ঘরে একটা মৃতদেহ কেবলই মাপে বড় হতে থাকে। সম্ভবত সেটা তাদের মৃত প্রেমের শব। সেটা অবশেষে বাড়তে বাড়তে তাদের বসবার ঘরে ঢুকে পড়ে, এবং তারা যখন সেটাকে জানলা দিয়ে বাইরে ফেলে দেবার জন্য টানাটানি করতে থাকে, সেটা সারা বাড়ি এবং মূল চরিত্রদের নাড়িভুঁড়ি যেন সবলে আকর্ষণ করে বাইরে নিয়ে যায়। অবশেষে সেটা রাস্তায় আমেদিকে পেঁচিয়ে ধরে উড়িয়ে নিয়ে চলে এবং সবাই তার তারিফ করতে থাকে। লেখকের কল্পনার দৌড় হিসেবে এ বোধহয় উচ্চ প্রশংসার দাবি রাখে ; কিন্তু এই অনবদ্য সমাপ্তিটা ইওনেস্কো পালটে ফেলতে বাধ্য হন, কারণ থিয়েটারে এটা করা সম্ভব ছিল না।

পরবর্তীকালে ইওনেস্কোর নাটকের সুর কিছুটা পালটে যায়। তাঁর চরিত্ররা কিছুটা ত্রিমাত্রিক হয়; হয়তো কিছুটা সামাজিক বাস্তবতার ছোঁয়াও তাদের গায়ে লাগে। মৃত্যু বা কোনো ভয়াবহ পরিণতি তাঁর নাটকের বিষয়বস্তু হয়ে ওঠে, এবং ঘটনার কেন্দ্রে আমরা প্রায়ই দেখি বেরঁজে

নামে একটি লোককে, যার একগুঁয়ে, অযৌক্তিক মূল্যবোধের মধ্যে আমরা ঝাপসাভাবে হলেও এমন মানুষকে দেখতে পাই যার সঙ্গে আত্মিকতা ঘটা সম্ভব। *ঘাতক* (*The Killer*) নাটকে আমরা দেখি উজ্জ্বল, সুন্দর শহর বলে প্রচারিত কোনো এক শহরে কোনো এক অজানা লোক কেবলই নরহত্যা করে চলেছে। বেরঁজে তাকে খুঁজে বার করে আবিষ্কার করে যে সে একটা বামন। তখন তার মোকাবিলা করতে গিয়ে সে অন্য সকলের মতো অনিবার্যভাবে তার হাতে মরে। নাটকের সংঘটনটা কোনোভাবে নানা দেশে অত্যাচারের বিরুদ্ধে উৎসর্গিতপ্রাণ শহীদের কথা আমাদের মনে পড়ায়; এটুকু অন্তত ভাবায় যে এমন মৃত্যু যতই অ্যাবসার্ড হোক, সম্পূর্ণ ব্যর্থ নয়।

আবার *গণ্ডার* (*Rhinoceros*) নাটকেও তেমনই দেখি চেনা-পরিচিত সবাই যেখানে গণ্ডার হয়ে যাওয়াই শ্রেয় বোধ করছে, সেখানে একা বেরঁজে— সম্ভবত শহরের সর্বশেষ মানুষ— গণ্ডার হতে অস্বীকার করছে। মানুষের গণ্ডার হয়ে যাওয়া ব্যাপারটা আপাতদৃষ্টিতে অ্যাবসার্ড হলেও ইওনেস্কো কিন্তু নাটকটার অনুশীর্ষক দিয়েছিলেন : 'একটি নাৎশি-বিরোধীই নাটক'— কারণ তিনি নাটকটা লিখেছিলেন পরিচিত বন্ধুরা ক্রমে ফ্যাসিবাদের দিকে ঝুঁকছেন দেখে। জার্মানিতে এ-নাটক পঞ্চাশবার 'কার্টেন কল' পেয়েছিল : তাদের বক্তব্য ছিল 'ইওনেস্কো আমাদের দেখিয়েছেন কী করে আমরা নাৎশি হয়ে গেছিলাম।' মস্কো আবার আপত্তি জানিয়ে নাটকটির এমন পুনর্লিখন দাবি করে যাতে স্পষ্ট হয় যে নাটকটা নির্দিষ্টভাবে নাৎশি-বিরোধীই— রাশিয়ান টোটালিট্যারিয়ানিজ্‌ম-বিরোধী নয়। আর্জেন্টিনায় সবাই ভেবেছিল যে ওটা তাদের পেরোনিজ্‌মের ওপর আক্রমণ; আর ইংলণ্ডের ধারণা হল যে ইওনেস্কো মূলত পেটি-বুর্জোয়া : বিপ্লবকে ভয় পাচ্ছেন। অর্থাৎ নাটকটা নেহাৎই অ্যাবসার্ড হবার বদলে বরং নানা দেশে নানাভাবেই মানুষকে তাদের রাজনৈতিক অবস্থানের কথা মনে পড়িয়ে দিয়েছে। এযুগেও এ-নাটক দেখে আমাদের মনে পড়ে যে এখনও এমন কিছু মানুষ আছেন, যাঁরা নানা চাপ সত্ত্বেও কোনো রাজনৈতিক দলের তক্‌মা পরতে রাজি নন। ফলে এইখানে পৌঁছে নাটকের মধ্যে 'অর্থ' এসে যাচ্ছে— বেরঁজের কাজের একটা তাৎপর্য আমরা যে-মুহূর্তে খুঁজে পাচ্ছি, সে-মুহূর্তে বেরঁজে বা তার কাজ আর অর্থহীন থাকছে না। অ্যাবসার্ড নাটকের মূল উদ্দেশ্যই পরাভূত হচ্ছে।

ইংল্যাণ্ডের পিন্টার এবং আমেরিকার অলবিকেও অ্যাবসার্ড নাট্যধারার মধ্যে রাখা হয়। পিন্টার বেকেটকে সমকালের শ্রেষ্ঠ নাট্যকার হিসেবে চিহ্নিত করে তাঁর কাছে ঋণ স্বীকার করেছেন; এবং তাঁর নাটকে বেকেটীয় সংলাপশৈলীর কিছু প্রভাব সমালোচকরা দেখে থাকেন। কিন্তু তিনি নিজে অভিনেতা এবং নির্দেশক ছিলেন বলে দর্শকের কথা একেবারে ভুলতে পারেননি। তাঁর মঞ্চ অনেক সময়েই বেকেটের মতো নিরাভরণ; কিন্তু বেকেটের চরিত্রায়ণহীন পাত্রদের নিস্তরঙ্গ সংলাপের চাইতে তাঁর নাটকে ইংরেজি ড্রয়িংরুম কমেডির পরিশীলিত সংলাপের ছোঁয়া প্রায়ই বেশি ধরা পড়ে। *গোডো* বা *এণ্ডগেম*-এর পাত্রপাত্রীদের তুলনায় *দ্য রুম* বা *দ্য ডাম্ ওয়েটার*-এর চরিত্ররা ঢের বেশি স্পষ্ট রেখায় আঁকা; তাদের সামাজিক বা জাগতিক অবস্থাও বেশ বোঝা যায়। এছাড়া পাত্রদের বাস্তবসম্মত মনোগতি— অর্থাৎ তাদের মানসিক আততি ও উদ্বেগও তাঁর নাটককে ঢের বেশি থিয়েটারপদবাচ্য করে তোলে।

দ্য রুম নাটকে এক অচেনা ব্যক্তি তাঁর সঙ্গে দেখা করার জন্য বাড়ির বাইরে ক'দিন ধরে অপেক্ষা করছে জেনে এক মহিলা খুব সন্ত্রস্ত হয়ে থাকেনা অবশেষে যে লোকটি এলে দেখা যায় যে, সে একজন অন্ধ নিগ্রো। সে বলে যে মহিলার বাবা তাঁর সঙ্গে দেখা করতে চান;

আর মহিলার স্বামী বিনা প্ররোচনায় লোকটিকে হত্যা করার সঙ্গে সঙ্গে মহিলা অন্ধ হয়ে যান। *দ্য ডাম্ ওয়েটার* নাটকে দুজন ভাড়াটে ঘাতক কাউকে হত্যা করার জন্য একটা রেস্তোরাঁর ভূগর্ভকক্ষে অপেক্ষা করে; কিন্তু কাকে যে মারতে হবে, তা তারা তখনও জানে না। তারা নিজে থেকে যা কিছু করতে যায়, তা কেবলই পণ্ড হয়; কিন্তু সে ঘরে একটা 'ডাম্ ওয়েটার' আছে (একটা ছোট্ট লিফ্‌ট্, যাতে করে ওপর থেকে খাবারের ফরমাস আসে এবং ওপরে খাবার পাঠানো যায়) যাতে করে উত্তরোত্তর জটিল থেকে জটিলতর রান্না পাঠাবার ফরমাস এবং সে-সব রান্নার বিশ্রী নিন্দেমন্দ আসতে থাকে। অবশেষে ছোট্ট ঘাতক একবার বাইরে গেলে বড় ঘাতকের কাছে শেষ ফরমাস আসে : তার আজকের শিকার হল ছোট ঘাতক ব্যক্তিটি।

এ-নাটকগুলো বারবার পড়ে কিছুদিন ভাবলে হয়তো এদের একটা তাৎপর্য দাঁড় করানো যেতে পারে; কিন্তু মঞ্চঅভিজ্ঞতা হিসেবে এদের সবটাই ব্যর্থ হত যদি না পিন্টারের বক্র রসিকতা আর চমৎকার ভাষার ব্যবহার সংলাপকে অত মনোগ্রাহী করে রাখত। অবশ্য ঠিক এই কারণেই পিন্টারের নাটক যথার্থ অনুবাদও করা যায় না, আর করলেও তা বিদেশী মঞ্চায়নে তেমন সিদ্ধিলাভ করে না।

তবে সংলাপ রচনায় তাঁর সমধিক দক্ষতা সত্ত্বেও পিন্টার সশব্দে নৈঃশব্দ্যের জয়গান গেয়েছেন। দেক্রুর কথার প্রায় প্রতিধ্বনি করে তিনি ১৯৬৬ সালে লেখেন:

> নাটক যা দেখায়, জীবন তার চাইতে ঢের বেশি রহস্যময়। এই রহস্যই আমাকে মুগ্ধ করে : শব্দের ফাঁকে ফাঁকে কী ঘটে— কী ঘটে, যখন কোনো শব্দ থাকে না।'

শব্দভারাক্রান্ত মঞ্চকে কথা ও তার দাসত্ব থেকে মুক্তি দিতে পিন্টার মঞ্চে নিরর্থক কথার ভিড় বাড়াননি; বরং কথার মাঝে নৈঃশব্দ্যও কোনো বিশেষ বক্তব্য রাখতে পারে কিনা তারই সন্ধান করেছেন। তত্ত্বগত দিক থেকে এ খুবই প্রশংসনীয় প্রচেষ্টা। কিন্তু নৈঃশব্দ্যের তাৎপর্য খোঁজার নানা অসুবিধেও আছে। একটা বাস্তব ঘটনা থেকে তার কিছুটা প্রমাণ পাওয়া যাবে। একবার *দ্য ডাম্ ওয়েটার*-এর একটি প্রম্প্‌ট্-নির্ভর মঞ্চায়নে হঠাৎ দেখা গেল যে প্রম্প্‌টার আধখানা প্রম্প্‌ট্-কপি বাড়িতে ফেলে এসেছেন। তখন তিনি গাড়ি ধরে বাড়িতে ছুটলেন বাকি কপিটুকু আনবার জন্য; আর পাত্রদ্বয় মঞ্চে সংলাপহীন নানা অ্যাকশন দিয়ে চললেন। শেষে প্রম্প্‌টার ফিরে এলে নাটকের বাকিটা শেষ হল। কিন্তু তৎকালীন এক বিদগ্ধ সমালোচক এক শীর্ষস্থানীয় পত্রিকাতে সেই উপস্থাপনায় 'পিন্টারীয় নৈঃশব্দ্যে'র অসামান্য প্রয়োগের প্রশংসায় মুখর হয়ে উঠেছিলেন। এ-ঘটনাটা শুধুমাত্র হাসির খোরাক নয়; বস্তুত অ্যাবসার্ড নাটকের তাৎপর্য, তার বিচারে বিশেষজ্ঞদের ভূমিকা, ও দর্শকদের ওপরে তার প্রভাব সংক্রান্ত পুরো প্রসঙ্গটাই এই ঘটনার আলোকে পুনর্বিচার করে দেখা যেতে পারে। এ-প্রসঙ্গে ব্রেশ্‌টের একটা দার্শনিক চুট্‌কি মনে পড়ে:

> বন্ধু : মেয়েটি সুন্দরী হিসেবে ইদানীং বেশ প্রতিষ্ঠা পেয়ে গেছে।
> হের কয়নার : বাজে বোকো না। প্রতিষ্ঠা পেয়ে গেছে বলেই মেয়েটি সুন্দরী।

অ্যাবসার্ড নাটকের যুগ বা হুজুগ পেরিয়ে আসার এতদিন পরে এ-প্রশ্ন খুবই প্রাসঙ্গিক বলে মনে হয় যে এঁরা প্রতিষ্ঠা পেয়ে গিয়েছিলেন বলেই মহৎ নাট্যকার ছিলেন কিনা।

আমেরিকায় অল্‌বি ইওনেস্কোর দ্বারা প্রভাবিত হয়ে নাটক লেখা শুরু করেন, এ কথা সত্যি; কিন্তু তাঁর নাটকে পরিস্থিতি ও সংলাপ বাস্তবধর্মী তো বটেই, উপরন্তু পাত্রদেরে ক্রিয়া-প্রতিক্রিয়াও অস্বাভাবিক বা উদ্ভট নয়। তাঁর সবচেয়ে বিখ্যাত নাটক *চিড়িয়াখানার গল্প (The Zoo Story)* এই কারণেই ভালো নাটক; *ভার্জিনিয়া উল্‌ফকে কে ডরায়? (Who's Afraid*

of Virginia Woolf?) সম্বন্ধেও সেই একই কথা বলা চলে। অল্‌বি সঠিক বুঝেছিলেন যে মঞ্চের ওপরে পাত্রপাত্রীদের নিয়ে বোধ্য স্তরে কিছু একটা না ঘটলে সেটা নাট্যপদবাচ্য হয় না। *চিড়িয়াখানার গল্প* নাটকে জেরি বলে এক তরুণ পার্কে এসে পিটার নামে এক অপরিচিত মাঝবয়সীর সঙ্গে কথাবার্তা চালানোর চেষ্টা করে : 'আমি চিড়িয়াখানায় গিছলাম'—এই কথা বলে তার মনোযোগ আকর্ষণ করতে চায়। বস্তুত সে চিড়িয়াখানার কথা কিছুই বলে না; ওটা তার একটা অছিলা মাত্র। সে সম্পূর্ণ নিঃসঙ্গ, বিচ্ছিন্ন বোধ করে, তাই একজন মানুষের সঙ্গে সংযোগ স্থাপনের তার এই প্রাণান্ত প্রচেষ্টা। জীবনে সে মাত্র একজনের সঙ্গে সংযোগ স্থাপন করতে পেরেছিল— সে একটা কুকুর। কুকুরটা রোজ তাকে আক্রমণ করত, আর রোজ জেরি পালাত। শেষে একরাতে সে কুকুরটাকে বিষ খাওয়ায়। কুকুরটা অর্ধমৃত হয়েও বেঁচে যায়; কিন্তু তারপর থেকে দুজনের মধ্যে একটা সমীহপূর্ণ সমঝোতা তৈরি হয়। দুজনেই দুজনকে বুঝতে পারে, এবং পরস্পর থেকে সাবধানে থাকার চেষ্টা করে। এই জেরির জীবনে একমাত্র সংযোগস্থাপন। কিন্তু এ কোনো হৃদ্যতার যোগসূত্র নয়, বরং বিচ্ছিন্নতার বোঝাপড়া। পিটার আর জেরিও দুই আলাদা জগতের মানুষ। তাদেরও পরস্পরের মধ্যে কোনো সংযোগ ঘটে না। শেষে জেরি বাধ্য হয়ে পিটারকে ব্যঙ্গ করে, অপমান করে, শারীরিক আঘাত দিয়ে ব্যাপারটাকে জোর করে মারামারির পর্যায়ে নিয়ে গিয়ে পিটারের হাতে একটা ছুরি ধরিয়ে দিয়ে নিজে সেটার ওপরে ঝাঁপিয়ে পড়ে মরে। এই একমাত্র উপায়ে সে একজন মানুষের সঙ্গে সংযোগস্থাপনে সিদ্ধকাম হয়। বলা বাহুল্য, এ-নাটকের নাট্যগত সার্থকতা নিহিত এর অ্যাবসার্ডিজমে্ নয়; বরং এর স্বভাবধর্মী মঞ্চসজ্জায়, বাস্তবধর্মী সামাজিক পশ্চাৎপটে, জেরির অক্লান্ত উদ্যমে, আর অনর্গল সংলাপে তার দিশাহারা নিরর্থক জীবনযাত্রার আনুপুঙ্খিক ছবি আঁকার মধ্যে।

এই একই মন্তব্য *ভার্জিনিয়া উল্‌ফ* সম্বন্ধেও খাটে। এর অংশবিশেষ আলাদা করে অভিনয় করলে তা ইবসেনীয় ধারার কোনো নাটকের দৃশ্যাংশ বলেও ভ্রম হতে পারে। আমাদের দৈনন্দিন অভিজ্ঞতার পিছনে যুক্তিরিক্ততার যে প্রচ্ছন্ন শাসানি আমরা মাঝে মাঝে শুনতে পাই, সেইটেকে প্রকট করতে পেরেছেন বলে অল্‌বিকে কোনো কষ্টকল্পিত পরিস্থিতি বা চরিত্র অবলম্বন করতে হয়নি—আর সেইজন্যই তিনি টিকে গেছেন ; হয়তো টিকে থাকবেনও। তাঁর নাটককে আমাদের নিজেদের অভিজ্ঞতা বলে প্রায়ই বোধ হয়; তার জন্য আমাদের জেলে ঢোকার প্রয়োজন পড়ে না। কাজেই জাঁ জেনে বা টম স্টপার্ডের মতোই তাঁকেও অ্যাবসার্ড ধারায় ফেলা সমীচীন কিনা, তা বিচার্য।

এঁরা ছাড়া সুরীয়ালিস্ট কবি অ্যাডামভ নিজের নানা দুঃস্বপ্ন ও উৎকল্পনার নাট্যরূপ— যেমন, *প্রফেসর তারান্নি* (১৯৫৩), *দ্য বিগ অ্যাণ্ড দ্য লিট্‌ল ম্যানুভার* (১৯৫০)— ইত্যাদি দিয়ে নাটক লিখতে শুরু করলেও *পিং পং* (১৯৫৫) ও *পাওলো পাওলি* (১৯৫৭) নাটক থেকেই বাস্তবতার দিকে ঝুঁকতে থাকেন, এবং পরবর্তীকালে নিজের গোড়ার দিকের নাট্যদর্শনের তীক্ষ্ণ সমালোচনা করে ব্রেশ্‌টীয় ধারার দিকে মোড় নিয়ে সোশ্যালিস্ট রিয়ালিজ্‌মে দায়বদ্ধ হয়ে পড়েন। স্পেনের অ্যারাবাল, যিনি ঘোর তামস কমেডি দিয়ে অ্যাবসার্ডধর্মী নাটক লিখতে শুরু করেছিলেন, তিনিও ও-পথ থেকে সরে আসেন। বস্তুত এঁরা সকলেই একটা কথা বুঝতে পেরেছিলেন যে নাটক হল জীবনের তাৎপর্যের অনুসন্ধান— তাৎপর্যহীনতার নয়। মঞ্চে এই নিরর্থকতার চর্চা প্রসিদ্ধি পেয়েছিল বেকেটের কৃপায়— যিনি নাট্যকার ছিলেন না, ছিলেন সাহিত্যিক, কবি ও ঔপন্যাসিক। কবি চাইলে নিজের ঘোলাটে কল্পনার স্রোতে হাবুডুবু খেতে পারেন, কিন্তু নাট্যকার তা পারেন না— কারণ নাটক একটা হাট : এখানে এমন কিছু নিয়ে

আসতে হয় যা দর্শকের জীবনে প্রাসঙ্গিক বলেই প্রয়োজনীয়। সে-হাটে দর্শক কিছু অর্থ নেয়, তবে সে কিছু অর্থ দেয়। আসলে নাটকের হাটে বেকেটের কিছুই না বেচা উচিত ছিল; কিন্তু তিনি গভীর চাতুর্যের সঙ্গে রটিয়েছিলেন যে তিনি 'কিছুই না' বেচছেন। এই রটনার ফলেই তাঁর খরিদ্দার জুটে গিয়েছিল। তারা টিকিট কেটে কিছুই না দেখেও মহা খুশি হয়ে ধরে নিয়েছিল যে এই বোধহয় নাটক। আর এর জন্য দর্শকের চাইতে বেশি দায়ী ছিলেন পেশাদার নাট্যবোদ্ধারা।

আগেই বলা হয়েছে যে বিশ্বযুদ্ধ নয়, যুদ্ধোত্তরকালের আবহাওয়াই অ্যাবসার্ড নাটকের জন্ম দিয়েছিল। যুদ্ধের সময়ে ছিল আক্রমণ, আগ্রাসন, অত্যাচার,— যা অত্যন্ত বাস্তব একটা ব্যাপার। পরবর্তীকালে যা রইল, তা যুদ্ধের সন্ত্রাস নয়, যুদ্ধের আশঙ্কা। সন্ত্রাসের একটা বস্তুগত চেহারা আছে, কিন্তু আশঙ্কা অত্যন্ত ঝাপসা, ধোঁয়াটে একটা ব্যাপার— তার নির্দিষ্ট কোনো রূপ নেই। ঠিক এই ব্যাপারটাই প্রতিফলিত হয়েছে অ্যাবসার্ড নাটকের চেহারায় ও তার বক্তব্যে। টাইনানের কথার প্রায় হুবহু প্রতিধ্বনি করে মার্টিন এসলিন বলেছেন:

> অ্যাবসার্ড থিয়েটার জগৎকে দেখায় একটা অবোধ্য স্থান হিসেবে। মঞ্চের ঘটনা দর্শকরা সম্পূর্ণ বাইরে থেকে দেখেন— এই অদ্ভুত ঘটনার ছকের পুরো অর্থ না বুঝেই—যেন, যে দেশের ভাষা তাঁরা বোঝেন না, তেমন এক দেশে তাঁরা সদ্য এসে পৌঁছেছেন।

কথাটা একেবারে যথার্থ; এর কারণ, অ্যাবসার্ড নাট্যকারদের ব্যক্তিগত দুঃস্বপ্ন, অবচেতন ভীতি, ও নৈতিক পক্ষাঘাতের সঙ্গে সাধারণ দর্শক কখনো যোগাযোগ স্থাপন করতে পারেনি। তাছাড়া, কর্মব্যস্ত রাস্তায় কেউ যদি ক্রমাগত লোককে ধরে দাঁড় করিয়ে বেকেটের মতো বলতে থাকে: 'শুনুন ভাই, আমার কিচ্ছু বলবার নেই', তাহলে লোকে বিরক্ত হয়। তেমনই নাটকে যদি দর্শককে কেবলই বলা হয় যে বোঝবার কিচ্ছু নেই, কিংবা সে কিছুই বোঝেনা, তখন সে প্রশ্ন করে: তাহলে আমি নাটকটা দেখব কেন? মানুষ শিল্পের কাছে যায় জীবনকে বুঝতে। আমাদের জীবন আমাদের কাছে এমনিতেই যথেষ্ট দুর্বোধ্য; সেই কথাটা নতুন করে জানবার জন্য নাটক দেখা সময়ের অপচয় ছাড়া আর কিছু হতে পারে না। অয়দিপাউস কিংবা কিং লীয়রের জগৎও যথেষ্ট দুর্বোধ্য ; এবং মানুষ সেখানেও কিছু কম উদ্‌ভ্রান্ত নয়। কিন্তু মানুষের কর্ম, কর্মের দায়, এবং দায়িত্ব সেখানে তাৎপর্যহীন নয়। জগৎ সেখানেও ব্যাখ্যাগোচর নয়, কিন্তু সেখানে মানুষের কাজ তাকে অর্থমণ্ডিত করে। অ্যাবসার্ড চিন্তার উদ্‌গাতা কামু, কিংবা তাঁর আগে সার্ত্রও মানুষের কর্মকে অর্থহীন বলেননি। বরং তাঁদের মতে মানুষের কর্মই তার অর্থহীন জীবনকে তাৎপর্য দেয়। বিশ শতকেই তাঁদেরও আগে চেখভ এবং পিরান্দেল্লো মানুষের ভ্রান্তি নিয়ে হেসেছেন। কিন্তু অ্যাবসার্ড নাট্যকাররা যে ভূমিকা নিয়েছিলেন, তা সম্পূর্ণ অমানবিক। অমানবিকতা শিল্পের উৎস হতে পারে না; তাই সংস্কৃতির ফ্যাশানেব্‌ল মহলে কিছুদিন উত্তেজনা সৃষ্টি করে অ্যাবসার্ড নাটক তলিয়ে যায়।

অ্যাবসার্ড নাটককারদের মধ্যে তাত্ত্বিক দিকে সবচেয়ে মুখর বোধহয় ইওনেস্কো স্বয়ং। চারিত্রিকভাবে তিনি নাট্যকার ছিলেন না, ছিলেন কবি এবং দার্শনিক। তাই বারবার নিজের কথা না বলে তিনি থাকতে পারেননি। নিজের নাটক সম্বন্ধে তাঁর বক্তব্য:

> সমগ্র মানবজাতির সাধারণ মৌলিক সমস্যা কী, তা জানতে হলে আমার নিজের মৌলিক সমস্যা কী, আমার সবচাইতে দুর্লঙ্ঘ্য ভয় কী, সেটা আমায় জানতেই হবে। তখন আমি নিশ্চিতভাবে প্রায় সকলেরই সমস্যা ও ভয় কী, তা জানতে পারব।

এমন কথা শুনলে গোড়াতেই মনে ধন্দ জাগে সফোক্লিস একযোগে ঈডিপাস ও ইলেক্ট্রা কম্‌প্লেক্সে ভুগতেন কিনা। ব্যক্তিগত ভয়ভাবনার রূপায়ণ হিসেবে নাটককে দেখা রোমান্টিক কবির আদর্শ হতে পারে, নাট্যকারের নয়। এমনকি নাটককে নাট্যকারের ব্যক্তিগত চৈতন্যের রূপায়ণ বলে ভাবলেও তা নাটক নামে ফর্মটার সঙ্গে বিশ্বাসঘাতকতা করা হয়। সে-প্রসঙ্গে ইওনেস্কোর বক্তব্য :

> আমার যাবতীয় নাটকের উৎপত্তি চৈতন্যের দুটো মৌলিক অবস্থা থেকে: কখনো একটা, কখনো বা অন্যটা প্রধান হয়ে ওঠে, আবার কখনো দুটোই মিশে যায়। চৈতন্যের এই দুটো মৌলিক অবস্থা হল নিরবয়বত্ব আর ঘনত্বের, শূন্যতা আর অতিরিক্ত উপস্থিতির, জগতের অবাস্তব স্বচ্ছতা ও অনচ্ছতার, আলো ও গাঢ় অন্ধকারের চেতনা।

প্রশ্ন এই যে, এসব ব্যাপারে আমি, অর্থাৎ দর্শক, উৎসাহিত হব কেন? ইওনেস্কো বা বেকেট তো আমার ব্যক্তিগত বন্ধু নন যে তাঁদের চৈতন্যের চেহারায় আমার কৌতূহল থাকবে! আমার চৈতন্যের রূপ অ্যাবসার্ড নাটকে কোথায়? কোথায় আমা-'দের' চৈতন্যের রূপ?

বস্তুত, মানুষের কাজের সত্যিই কোনো অর্থ না থাকলে নাটক লেখারও কোনো অর্থ নেই। মানুষের কথাবার্তার কোনো অর্থ না থাকলে নিজের রচনার সপক্ষে কিছু বলাও অসততার পরিচয়। তাহলে অ্যাবসার্ড নাটক লেখা কেন, বা নিজের নাটকের সমর্থনে নানা কথা বলাই বা কেন, এ-প্রশ্নটার উত্তর ঐ নাট্যকাররা কখনো দেবার চেষ্টা করেননি। মানুষের অস্তিত্বের অর্থ কী, তা আজ অবধি কেউ বুঝতে পারেননি; অ্যাবসার্ড নাট্যকাররাও পারেননি। কিন্তু তাঁদের অক্ষমতাটাকেই তাঁরা শেষ কথা ধরে নিয়ে সবাইকে সেটা জানাবার জন্য ব্যস্ত হয়ে উঠেছিলেন। তাঁদের ভাবনাচিন্তার আদিপুরুষ নীট্‌শে যখন ঈশ্বরকে মৃত বলে ঘোষণা করেছিলেন, তখনই কার্যত মানুষের জীবন থেকে অর্থ লোপ পেয়ে গিয়েছিল। সেই অনাথ নিরবলম্ব চৈতন্যের উত্তরাধিকারী অ্যাবসার্ড নাট্যকাররা এই অর্থশূন্যতায় উৎকণ্ঠিত হয়ে পড়েছিলেন। মানবচৈতন্য থেকে ঈশ্বরের হারিয়ে যাওয়ার ব্যাপারটা ইওনেস্কোকেও ভাবিয়েছিল। তিনি লিখেছেন :

> মূল সমস্যাটা হল যদি ঈশ্বর থাকেন তো সাহিত্য থাকার মানেটা কী? আর যদি তিনি না-ই থাকেন তো সাহিত্য থাকার মানেটা কী? যে দিক দিয়েই দেখা হোক, এযাবৎ একমাত্র যে জিনিসটি আমি করতে পেরেছি— অর্থাৎ আমার লেখা— তা একেবারে বাতিল।

অ্যাবসার্ড নাটকের সর্বপ্রধান উদ্‌গাতার এই আত্মমূল্যায়ন সমগ্র ধারাটারই মূল্যায়ন হিসেবে ধরা যায়। জগৎ বা অভিজ্ঞতা যে অর্থহীন, সে আমরা জানিই; কিন্তু মানবমস্তিষ্কের প্রধানতম কাজ হল এই অর্থহীনতার মধ্য থেকে অর্থ সৃষ্টি করা বা অর্থ 'আদায়' করে আনা। যে প্রাণীর মস্তিষ্ক যতটুকু উন্নত, সে ঠিক ততটুকুই অর্থ আদায় করতে পারে, ততটুকু সার্থকভাবে বাঁচতে পারে। কাজেই যার মস্তিষ্ক কোথাও কোনো অর্থ খুঁজে পায় না, তার মস্তিষ্কে কিছু ঘাটতি আছে বলেই ধরতে হবে। তেমন লোকের কথা মূল্যবান বলে না ধরাই সঙ্গত। আজকাল কেউ অ্যাবসার্ড নাটক লেখেন না তার কারণ অ্যাবসার্ড নাটকের রমরমার সময় পেরিয়ে যাবার ঠিক পরেই বিজ্ঞানের জগতে Clinical Psychology-র বিশাল অগ্রগতি ঘটে গেছে। এখন কেউ যদি বেকেটের মতো দাবি করে যে বাল্যকাল থেকেই তার আনন্দবোধ বলে কিছু ছিল না, তবে আমরা বুঝতে পারি যে তার মগজে nucleus accumbens-এ কিছু গণ্ডগোল আছে। কেউ যদি নাটক লিখতে গিয়ে একই ব্যাপার বারবার ঘটায়, তবে আমরা মিলিয়ে দেখি যে যাদের মস্তিষ্কের দুই গোলার্ধের মধ্যে সংযোগরজ্জু (corpus callosum) কাটা গেছে, তারাই এমনটা

করে : অস্ত্রোপচারের পাঁচ-দশ বছর পরেও তারা একই পুরোনো কথা একই রকম ভাবে বলে চলে (যাকে মনস্তত্ত্ব-গবেষক ডিমণ্ড বলছেন recycling of mental content)। তারা অতিরিক্ত কথা বলে, কখনোই বুঝে উঠতে পারে না যে যথেষ্ট বলা হল কিনা। লক্ষ্যহীন সংলাপে ভারাক্রান্ত *ওয়েটিং ফর গোডো* একটু খুঁটিয়ে পড়লেই এই সমস্ত চারিত্রিকতার উপস্থিতি ধরা পড়ে। ডানদিকের মগজ থেকে কিছু অংশ বাদ গেলে (right hemispheric lobotomy) মানুষের মূল্যবোধ লোপ পায়। ডিমণ্ডের এইরকম এক রুগি কামুর *The Outsider* উপন্যাসের নায়কের মতো সত্যিই বলেছিল: 'এক মজার কাণ্ড হয়েছে, জানেন! এখুনি চিঠি পেলাম: মা ভীষণ অসুস্থ!'

অ্যাবসার্ড নাট্যকাররা দার্শনিক অবস্থান থেকে নাটক রচনা করেছিলেন, এই কথা মনে করা হয়। কাজেই সে দিকটাও একটু খতিয়ে না দেখলে তাঁদের প্রতি অবিচার করা হবে। তাঁদের মূল বক্তব্য হল : জীবন অর্থহীন। প্রশ্ন এই যে তাহলে শিল্পের— বর্তমান ক্ষেত্রে নাটকের— অবস্থানটা কী? সে কি জীবনের অঙ্গ হিসেবে অর্থহীন, নাকি জীবনের বাইরে অবস্থিত বলে তাৎপর্যময়? যদি নাটক জীবনেরই অঙ্গ হয়, তবে সে তো অর্থহীন— অ্যাবসার্ডিস্টরা নাটক আদৌ লিখেছিলেন কেন? যেটা আমার কাছে অর্থহীন, সেটা না জানলে আমার কী আসে যায়? আর যদি শিল্পের অবস্থান অর্থহীন জীবনের বাইরে হয়, তবে তার অর্থ থাকা চাই। সে অর্থ নির্মাণ অ্যাবসার্ড নাটকে কোথায়?

কামুর তত্ত্ব থেকেই যেহেতু অ্যাবসার্ড নাট্যধারার উদ্ভব বলে ধরা হয়, অতএব সে-প্রসঙ্গে ফিরে এসে *সিসিফাস* থেকে একটি সংক্ষিপ্ত কেন্দ্রীয় উক্তির বিশ্লেষণ দিয়ে এ-আলোচনা শেষ করা অসঙ্গত হবে না। অ্যাবসার্ড ভাবনার উৎস হিসেবে এ-উক্তিটিকে স্বয়ং এস্‌লিন যখন প্রামাণ্য মেনেছেন, তখন আমাদেরও তা মানতে দোষ নেই :

> A world that can be explained by reasoning, however faulty, is a familiar world. But in a universe that is suddenly deprived of illusions and of light, man feels a stranger. [যে জগৎকে যুক্তি দিয়ে ব্যাখ্যা করা যায়— সে যতই ত্রুটিময় যুক্তি হোক না কেন— সে বেশ আত্মীয় জগৎ। কিন্তু মায়া ও আলোক থেকে যে চরাচর সহসা বঞ্চিত হয়েছে, সেখানে মানব নিজেকে বহিরাগত বোধ করে]

কথাগুলোর কাব্য আমাদের নাড়া দেয় ঠিকই; কিন্তু কথাটাকে যদি দার্শনিক সত্য বলে ধরে নিই, তবে প্রশ্ন ওঠে যে দায় কার? কামুর কথাটা বোঝার জন্য উক্তিটার একটু বিশ্লেষণ দরকার :

প্রথমত, কার যুক্তি দিয়ে ব্যাখ্যা করার কথা এখানে হচ্ছে? নিশ্চয় মানুষেরই যুক্তি। অতএব জগৎকে মানুষ আত্মীয় বা পরিচিত করে নিয়েছিল যুক্তি দিয়ে ব্যাখ্যা করে। কথাটা ভুল। জগৎকে আমরা চিনি যুক্তি দিয়ে নয়, স্বজ্ঞা (intuition) দিয়ে। যুক্তিরিক্ত যে জীব— যেমন একটা শামুক— সেও তার পরিচিত জগতেই বাস করে। কিন্তু আমাদের স্বজ্ঞা অপরের কাছে পৌঁছে দেবার জন্য আমাদের যুক্তি দরকার হয়; যেমন আমার মনোভাব অন্য লোকের কাছে বোধ্যরূপে পৌঁছে দেবার জন্য ব্যাকরণসিদ্ধ বাক্যের প্রয়োজন হয়। যুক্তি একটা সাধারণ জমি, যার ওপর দাঁড়িয়ে আমরা পরস্পরের সঙ্গে সংযোগ স্থাপন করতে পারি। যুক্তি প্রয়োগের ক্ষমতা লোপ পেলে মানুষ মানুষের সঙ্গে যোগাযোগ স্থাপন করতে পারে না, এবং সংযোগ অসম্ভব বলে মনে করে। নইলে নিজের কাছে নিজের বোধকে তর্ক করে সপ্রমাণ করার কোনো দরকার আমাদের হয় না। জগতের সঙ্গে আমাদের আত্মীয়তা ব্যাখ্যার ওপর নির্ভরশীল নয়।

কিন্তু নিজের এই ভুলটা চাপা দেবার জন্য 'ক্রটিময়' যুক্তির প্রসঙ্গকোনো ব্যাখ্যা ছাড়াই ঢুকিয়ে দিয়ে কামু খুব চাতুরীর সঙ্গে ইঙ্গিত করেছেন যে এযাবৎকাল জগতের ব্যাখ্যাটা কিছু অল্পবুদ্ধি লোকের ক্রটিময় যুক্তির ওপরে দাঁড়িয়ে ছিল। তাঁর মতন কিছু আলোকপ্রাপ্ত (যাঁরা তাঁর মতন আঁধারগ্রস্ত) ব্যক্তি ওই ক্রটিটা ধরে ফেলেছেন, এবং বুঝেছেন যে জগৎ মায়া ও আলোক থেকে হঠাৎ বঞ্চিত হয়ে পড়েছে।

দ্বিতীয়ত, 'মায়া' ও 'আলোক' থেকে জগৎকে কে হঠাৎ বঞ্চিত করল? ও-দুটো কথার কোনো ব্যাখ্যা নেই, কিন্তু প্রসঙ্গ থেকে অনুমান করা অসঙ্গত নয় যে, ওরা হল পরিচিতির মায়া ও যুক্তির আলোক। এখন, ও দুটো কি চরাচরের নিজস্ব গুণ, নাকি আরোপিত? যুক্তি জগতের নিজস্ব গুণ হতে পারে না— কারণ তা হলে যুক্তি দিয়ে তাকে ব্যাখ্যা করার প্রয়োজন হত না— সে স্বতঃসিদ্ধরূপেই ব্যাখ্যাত হয়ে থাকত। কিন্তু পরিচিতির ব্যাপারটা একটু আলাদা। আমাকে কেউ না চিনলেও আমার পরিচিত হবার ক্ষমতা বা সম্ভাবনা লোপ পায় না: আমি অন্য কারোর কাছে পরিচিত হতেই পারি। তেমনই, ব্যক্তিগতভাবে আমি যদি জগৎকে নাও চিনতে পারি, তাহলেও জগতের পরিচিত হবার সম্ভাবনা লোপ পায় না। কামু বাক্যগঠনের কৌশলে মায়া ও আলোক থেকে বঞ্চিত হবার দায়টা চরাচরের ওপর ছেড়ে দিয়েছেন— যেন প্রবঞ্চক ছাড়াই বঞ্চনাটা ঘটে গেছে। কিন্তু আসলে বোঝবার ও চেনবার দায়িত্বটা ছিল আমার। দুক্ষেত্রেই দায়িত্বটা সেই ব্যক্তির, যে যুক্তি দিয়ে জগৎকে ব্যাখ্যা করতে বা বোধ দিয়ে চিনতে পারছে না।

তৃতীয়ত, প্রত্যেকটি মানুষ জগৎকে চিনতে পারছে না, এমন কথা কামু বলেননি। কিন্তু তিনি নিজে, এবং অন্তত আর কিছু মানুষ, নিশ্চয় পারছিলেন না। প্রশ্ন হল : হঠাৎ কিছু মানুষের এমনটা হল কেন? বিশ্বযুদ্ধের অভিজ্ঞতা, যুদ্ধোত্তর আর্থ-সামাজিক সংকট, ঐতিহ্যগত মূল্যবোধের অবক্ষয়, এইসবের প্রভাবে? এগুলো মেনে নিলে প্রতি ক্ষেত্রেই দায়টা গিয়ে পড়ে সেইসব ব্যক্তিদেরই ঘাড়ে, যারা এক দ্রুত পরিবর্তনশীল বাস্তবের সঙ্গে খাপ খাইয়ে চলতে না পেরে, উদ্‌ভ্রান্তচিত্তে সেটাকে অর্থহীন বলে ঘোষণা করে, তার সঙ্গে তাল মিলিয়ে চলার কিংবা তার প্রতিকারের চেষ্টার দায়িত্ব এড়াতে চেয়েছিল। কিন্তু তাদের অক্ষমতার দায়টা তাদের নিজেদের নয়— জগতের নিজস্ব দোষেই এমনটা হয়েছে, এইটে কামু পাকেপ্রকারে প্রতিষ্ঠা করতে চাইছে।

চতুর্থত বলতেই হয় যে দায়টা জগতের ঘাড়ে চাপানো কামুর দরকার ছিল এইজন্য যে তাহলে ব্যাপারটাকে ব্যক্তিগত পর্যায় থেকে মুহূর্তে সার্বিক স্তরে ('মানব' শব্দটার প্রয়োগ লক্ষণীয়) তুলে আনা যায়। অর্থাৎ কিছু লোকের বুদ্ধিভ্রংশের দোষটা জগতের ঘাড়ে চাপালে চরাচরকে স্বতঃই অবোধ্য বলে দাবি করা যায়; আর চরাচরই যদি অবোধ্য হয়, তবে মানবজাতি— যারা তাকে বুঝতে চাইছে— নিশ্চয় নির্বোধ : তারা শুধু বুঝতে পারার ভ্রান্তিতে ভুগছে। এই যুক্তি বা কুযুক্তির চালাকিতে সমগ্র মানবজাতিই বুদ্ধিভ্রষ্ট, জগৎকে চিনতে না পেরে নিজেকে বহিরাগত বোধ করছে, এই দাবি করা সম্ভব হয়।

উদ্ভট নাটকের ভ্রান্তিময় দর্শনের দায় তৎকালীন যুগপরিস্থিতির ওপরে চাপিয়ে দিয়ে তাঁদের একটা বিশেষ যুগের মানসিকতার প্রতিভূ বলে গৌরবান্বিত করা হয়। অথচ তাঁরাই যদি সে-যুগের প্রতিভূ হয়ে থাকেন তো সে-যুগে অন্য নাট্যকাররা কী করছিলেন? ব্রেশ্‌ট বা মিলার, যাঁরা মানুষের কাজের অর্থে এবং মানুষের দায়িত্বে আস্থা রেখে নাটক রচনা করছিলেন, তাঁরা তো মানবিক জগৎটাকে সংশোধনীয় মনে করেছিলেন! নাকি তাঁরা ঐ সব হাস্যকর মানুষদের

দলে পড়েন, যাদের কাজের কোনো অর্থ নেই? যাঁরা অ্যাবসার্ড নাটকের শৌখিনতম সমর্থক, তাঁরাও এমন কথা স্বীকার করবেন বলে মনে হয় না।

নাটককে যদিও প্রতিদিনই পরিবর্তমান জীবনের সঙ্গে সাযুজ্য রেখে অতীত চর্চাকে অতিক্রম করে পরীক্ষামূলকভাবে এগিয়ে চলতে হয়, তবু নাট্য ব্যাপারটা শিল্পের মধ্যে সম্ভবত সর্বাধিক প্রথানির্ভর মাধ্যম; কারণ নাট্যকারের রচনা প্রধানত নির্দেশক ও অভিনেতার (এবং গৌণত অন্যান্য মঞ্চকর্মীদের) হাতে ব্যাখ্যাত হয়ে তবে দর্শকের কাছে পৌঁছোয় অন্তিম ব্যাখ্যানের জন্য। সংস্কৃতিগতভাবে, মঞ্চব্যক্তিরা যেমন কতকগুলো নাট্যয়নপ্রথার মাধ্যমেই নাটককে উপস্থাপিত করতে পারেন, দর্শকও তেমনই কতকগুলো নাট্যপ্রত্যাশার দ্বারা নিয়ন্ত্রিত; সেই সব প্রথাগত প্রত্যাশাও নাটককে পূরণ করতে হয়। এই প্রথাতিগমন ও প্রথানুগমনের দ্বান্দ্বিকতার মধ্যে দিয়েই নতুন নাট্যধারা জন্ম নেয়, এবং যে-নাট্যকার এই দ্বান্দ্বিকতার যত সার্থক নিরসন করতে পারেন, তিনি তত সার্থক নাট্যকার হন। এই দ্বান্দ্বিকতা না থাকলে নাটক শিল্প হিসেবে তুচ্ছ হয়ে পড়ে : যেমন সম্পূর্ণ প্রথানুগামী উনিশ শতকি মেলোড্রামা, কিংবা সম্পূর্ণ প্রথাবিরোধী অ্যাবসার্ড নাটক। অ্যাবসার্ড নাটকের বক্তব্য এবং সে-বক্তব্যের উপস্থাপন— দুটোই আমাদের নাট্যপ্রত্যাশার বিপরীতে যায়। ফলে আমরা কোনো একটার ওপরে নির্ভর করে দাঁড়িয়ে অন্যটাকে আত্মসাৎ করতে পারি না। শিল্পরূপ হিসেবে নিছক 'অ্যাবসার্ড' নাটকের ব্যর্থতার এটা একটা মূল কারণ। নিরর্থকতা এবং সার্থকতা বিপরীতমুখী বলেই এই ধারার নাটকে লেখকদের কপালে প্রসিদ্ধি মিললেও সিদ্ধি মেলেনি।

॥ ১॥

১.১.০ পুরাকথা বলতে আমরা কি বুঝি? তা কি কেবল রূপক— সত্য নেই তাতে? বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় এ রকম একটি প্রশ্ন নিয়ে 'কৃষ্ণচরিত্র'-সন্ধান করেছিলেন। তাঁর আপত্তির কারণ ছিল পাশ্চাত্য পুরা-কথা বিশ্লেষণ। পুরা-কথা বা মিথ হল শব্দের অর্থ-তাৎপর্য রূপক আর বাস্তবের দ্বন্দ্ব মিলনের সমাপতনের প্রক্রিয়া— প্রথমদিকের তাত্ত্বিকরা এভাবেই বিষয়টি দেখতে শুরু করেন। সে বিশ্লেষণের স্বরূপ পরে বিবেচনা করা যাবে। বঙ্কিমচন্দ্র কেমনভাবে দেখলেন সেই বিশ্লেষণ? তির্যক সেই ভাষা।

রামের নামের ভিতর 'রম্' ধাতু পাওয়া যায়, এবং সীতার নামের ভিতর 'সি' ধাতু পাওয়া যায়, এই জন্য রামায়ণ কৃষিকার্যের রূপকে পরিণত হইয়াছে। জর্ম্মণ পন্ডিতেরা এমনই দুই চারিটা ধাতু আশ্রয় করিয়া ঋগ্বেদের সকল সূক্তগুলিকে সূর্য্য ও মেঘের রূপক করিয়া উড়াইয়া দিয়াছেন।

[*কৃষ্ণচরিত্র* : প্রথম খণ্ড : উপক্রমণিকা ষষ্ঠ পরিচ্ছেদ— পাণ্ডবদিগের ঐতিহাসিকতা/ইউরোপীয় মত]

১.১.১. ফ্রিডারিখ ম্যাক্সমুলার (১৮২৩—১৯০০) এইরকম একটি বিচার পদ্ধতি প্রচার করেছিলেন বটে। তাঁর মতে প্রাচীন ভাষাগুলিতে বিমূর্ত নাম-শব্দ ('abstract nouns') বা ক্লীবলিঙ্গ ('neuter gender') ছিল না বা প্রায় ছিল না ('absence or near-absence'–ছিল তাদের)। সমুদ্র বোঝাবার জন্য তারা প্রয়োগ করতেন 'raging' অর্থাৎ গর্জনশীল কিছু, কিংবা সূর্য বলতে তাদের প্রয়োগ ছিল— যা উত্তাপ দিয়ে থাকে— 'the giver of warmth.' শব্দগুলি পরিচিত হতে থাকে— পরের প্রজন্মে ('later generations') তৈরি হতে থাকে ব্যাখ্যা যোজনার ইচ্ছা। পরের প্রজন্ম এই ক্রিয়াশীল বিশেষ্যগুলি কেন, কীভাবে এই কাজ করে ওরা?—এরকম প্রশ্ন ভাবতে থাকে। এভাবেই তৈরি হতে থাকে দেবত্ব। দেবত্ব সেক্ষেত্রে পুরাকথার শক্তির সংহত রূপ। ক্রিয়াশীল বিশেষ্য শব্দের ব্যাখ্যা 'to fill in the life of this male or female god'— থেকেই তৈরি হয় পুরাকথা বা myth।[১]

পুরাকথা, আদিকল্প ও সাহিত্য সমালোচনা

অচিন্ত্য বিশ্বাস

১.১.২. উষা হচ্ছে সূর্যোদয়ের আগেকার আলো; অনিরুদ্ধ হল অরুণ অর্থাৎ সূর্যের প্রথম আলো। এই দুই শব্দ যখন দেবী-দেবতায় পরিণত হল তখন তৈরি হল কথা— পুরাকথা। বৈদিক সূক্ত থেকে তৈরি সেই পুরাকথার স্বরূপ— ব্যর্থ প্রেমের গল্প। 'অনন্ত আকাশ-পথ অনুধাবনে' অগ্নি ইন্দ্র ও সূর্য আজীবন অগ্রসর হন, কিন্তু তাঁদের চেষ্টা ব্যর্থ হয়।'[২] পুরাণ-কথায় এই রূপকের নতুন রূপান্তর উষা-অনিরুদ্ধের প্রেমের কাহিনীতে পরিণত হয়। ম্যাক্সমুলারের সূত্র এইভাবে ভারতীয় পুরাকথাগুলিকে রূপকধর্মী করে তুলেছে। শুধু ভারতীয় পুরাণের ব্যাখ্যায় নয় পাশ্চাত্যেও এই ব্যাখ্যা রীতি জনপ্রিয় হয়েছিল।

১.২.১. সবাই অবশ্য ম্যাক্সমুলারের বক্তব্য মেনে নেন নি। যাঁরা মেনে নেননি তাঁদের মধ্যে অন্যতম এডওয়ার্ড বি. টেইলার (১৮৩২—১৯১৭) মনে করেন পুরাণ বা পুরাকথা, myth আসলে দর্শনের একটি রূপ। আধুনিক দর্শনের দুটি ভাগ থাকতে পারে— দর্শন আর বিজ্ঞান, কিন্তু আদিম মানুষের মনে দর্শন-বিজ্ঞান আর ধর্মের জন্য কোনো পৃথক কোঠা ছিল না। আদিম ধর্ম আর দর্শন— আচার-আচরণ আর ব্যাখ্যান মিলে মিশে থাকত। 'Primitive philosophy is identical with primitive religion.'[৩] শুধু তাই নয়, তা আসলে দিতে চেয়েছে জগৎ ব্যাপারের সম্ভাব্য ব্যাখ্যানও। 'Primitive religion is primitive counterpart to science because both are explanations of the physical world.'[৪] তাই যদি হয় তাহলে পুরাকথা মোটেই রূপক নয় আরো কিছু— সত্য বলেই তাকে বিশ্বাস করেছে সেই পুরাকথার রচক সমাজ। পুরাকথাকে ঠিক এজন্যই আলঙ্কারিক অভিযোজন বা রূপকের নির্মাণ হিসাবে symbolically দেখতে চান না টেইলার, তিনি একে দেখতে চান সাহিত্যের রূপায়ণ হিসাবে— poetically, যথারীতি এই আলঙ্কারিকতা বস্তুধর্মের সঙ্গেই মিশে থাকে। পুরাকথা বিবেচনার চেষ্টাটি তিনি 'metaphorically' দেখার পক্ষপাতী। এই পথেই হেঁটেছেন স্যর জেমস জর্জ ফ্রেজার (১৮৫৪-১৯৪১)। তিনি পুরাকথাকে বিজ্ঞানধর্মী মনে করেছেন। পুরাকথা তাঁর কাছে প্রায়োগিক বিজ্ঞান— applied science.

১.২.২. ম্যাক্সমুলার যেখানে দেখালেন প্রজন্মের পর প্রজন্ম ধরে যোজিত হচ্ছে নতুন নতুন ভাষা ও ব্যাখ্যান : টেইলার আর ফ্রেজার বললেন, পুরাকথা ব্যাখ্যান ঠিকই— তবে তা জীবনের রহস্যের ব্যাখ্যান, তা আসলে ক্ষয় আর পতনের বিরুদ্ধে মানুষের পরাক্রমের না হোক আশার ভাবনাও। পুরাকথা কখনোই একা থাকে না— বিচ্ছিন্ন, নিষ্ক্রিয় পুরাকথা হতে পারে না। তার সঙ্গে ধর্মাচার আর জাদুবিশ্বাসের আপতন অনিবার্য। 'The combination of myth and ritual is the combination of religion and magic.'[৫] ফ্রেজার তাঁর মহাগ্রন্থ *The Golden Bough—A Study in Magic and Religion*-এর অ্যাডোনিস আর ওসিরিস-সংক্রান্ত পুরাকথার সঙ্গে জাদুবিদ্যা মিশে যাবার প্রক্রিয়াটি ব্যাখ্যা করেছেন।[৬] দেবতার নর প্রতিনিধি এখানে পুরাকথার পুনরাভিনয়ের মাধ্যমে প্রকৃতিকে নিয়ন্ত্রণের চেষ্টা করতে থাকে।

১.২.৩. পুরাকথা আর প্রকৃতির ঘটনাবলী কেমন করে পরস্পর দর্পণের মতো ব্যবহার করে তার একটি উদাহরণ এনেছেন জন পিনসেন্ট। আর্কাডিয়ার রাজা লাইকাওন (Lycaon)-এর সময় পিলাসগুস (Pelasgus)-দের জন্ম। পিলাসগুস-রা মানুষ তবে দেবতাদের সঙ্গে তারা খাওয়া দাওয়া করেন। তারা 'were guests and shared the same with the gods for their justice and piety, and they openly met at the gods.'[৭] এদিকে রাজা লাইকাওনদেব রাজ জিউসকে ছলনা করেন— জিউস তাকে অভিশাপ দিয়ে নেকড়ে বাঘে

পরিণত করে দেন। জিউসের ক্ষোভ থেকে বাঁচে না কেউ— ধরিত্রী দেবী জিউসের ডানহাত ধরে তাঁকে কোনক্রমে নিবৃত্ত করেন, ফলে লাইকাওনের ছোট ছেলে নিকটিমাস (Nyctimus) বেঁচে যায়। জিউস লাইকাওনকে নেকড়ের মুখোশ-পরা পুরোহিত হিসাবে নিয়োগ করলেন ; এবার থেকে লাইকাওন হলেন 'the wolf-priest of Zeus'। পিনসেন্ট ব্যাখ্যা করছেন এইভাবে 'the sacred kingship'-এর উচ্চতা থেকে স্খলিত হয়ে লাইকাওন হলেন নিম্নস্তরের পুরোহিত— 'was downgraded to a priesthood.'[৮]

নিকটিমাস-কে বাঁচাবার পর পৃথিবীতে নামে প্রবল বর্ষা। বৃষ্টির ব্যাপারটি দেবরাজ নিয়ন্ত্রণ করতেন বলে মনে হয়। পিনসেন্ট-এর বর্ণনা : 'Then he overwhelmed the earth with rain.' বৃষ্টি নিয়ন্ত্রণের বিষয়টি ক্রমে পুরাকথা আর আচার-অনুষ্ঠান-ধর্মী লোকাচারের সঙ্গে মিলিত হয়ে গেল। জিউসের পুরোহিত-রা একসময় বৃষ্টির জাদু (rain charm) করতেন। এর কারণ অবশ্য নেহাৎই প্রাকৃতিক। বস্তুত গ্রিসে বৃষ্টিপাতের আসল কারণটি প্রাকৃতিক। আরকেডিয়া পাহাড় আর লাইকায়েউস (Lycacus) শৃঙ্গে ধাক্কা লেগেই মেঘ জমাটবদ্ধ হয়ে গ্রিসে বৃষ্টি হয়। নিয়মমতো বৃষ্টি না হলে ডাক পড়ত পুরোহিতদের : 'When there was a draught, the priest the surface.....'with an oak branch, whereupon a mist arose, which turned into a cloud, which attracted others and brought rain to Arcadia.'[৯]

১.২.৪. ডি. ডি. কোশাম্বী তাঁর বিখ্যাত গবেষণাগ্রন্থ *মিথ অ্যান্ড রিয়্যালিটি*-তে দেবভাবনার উৎস বিবেচনার জন্য প্রাকৃতিক ঘটনার প্রতি দৃষ্টিপাত করেছেন। ভারতীয় পুরাকথার বিশ্লেষণে জাতি (race) প্রসঙ্গ এড়ানো যায় না। তাই তিনি দেখেছেন শব্দের বিচারে আর্য-অনার্য উপাদানের দ্বন্দ্ব সমন্বয়। 'নারা' শব্দের অর্থ জল, এটি থেকে 'নারায়ণ' শব্দ নিষ্পন্ন। আর 'The word ' (plural) for 'the waters' is not Indo-Aryan'. সঙ্গে সঙ্গে কোশাম্বীর বিশ্লেষণ : 'The etymology seems to be he who sleeps upon the flowing waters nārā and this is taken as the steady state of nārāyana .'[১০] নারায়ণের প্রথম তিন অবতার ড. কোশাম্বীর মতে টোটেম ভাবনার ফল। —'Fish, Tortoise and Boar— surely related to primitive totemic worship.'[১১]

ড. কোশাম্বীর মতে প্লাবনের কাহিনী পুরাকথার অন্যতম বিশেষ অংশ। এর সঙ্গে যুক্ত থাকে সৃষ্টির কাহিনী। সৃষ্টি-বিবরণ পৃথিবীর যে-কোনো পুরাকথার আদিকথা। পুরাণেও এই বৈশিষ্ট্যের কথা উল্লেখিত হয়েছে।

সর্গশ্চ প্রতিসর্গশ্চ বংশো মন্বন্তরাণি চ।
বংশানুচরিতং চৈব পুরাণং পঞ্চলক্ষণম্॥

[*বায়ুপুরাণ* : ৪.১০.১১]

অর্থাৎ পুরাণ হল সর্গ (সৃষ্টি), প্রতিসর্গ (ধবংস), বংশ (দেবতা-ঋষিদের বংশকথা), মন্বন্তর (মনুদের শাসনকাল), বংশানুচরিত (নৃপতিদের বংশকথা)— এই পাঁচটি লক্ষণের সমাহার। প্লাবনের গল্পে নারায়ণ অবতীর্ণ হলেন মৎস্যরূপে। এই পুরাকথা-র একটি দিকে আমাদের দেশের জাতিগত বিমিশ্রণের প্রমাণ বহন করছে, বলাই বাহুল্য। এ কেবল শব্দতত্ত্বের বিবেচনা নয়—জাতিতত্ত্বেরও বিষয়। কোশাম্বীর ভাষায় : 'The later appearance in Sanskrit only means that the peaceful assimilation of the people who transmitted the

legend was late.'[১২] অন্যদিকে প্লাবন-কাহিনী আমাদের আবহাওয়ার সঙ্গে নিবিড়ভাবে যুক্ত। কোশাম্বীর বস্তুগত ব্যাখ্যান এইদিকে আক্ষিপ্ত : 'At any rate the flood-and-creation myth (so natural in a Monsoon Country')।[১৩]

১.৩.০. পুরাকথা শুধু রূপক নয় বঙ্কিমচন্দ্রের এই দাবি অবশ্যই অনেকাংশে গ্রহণযোগ্য— আশা করি সেটি প্রমাণ করা গেছে। বঙ্কিমচন্দ্র রূপকের ইঙ্গিত অস্বীকার করেন নি, কিন্তু পুরা-কথা কেবল রূপক ভাবাতেই তাঁর আপত্তি। একটু লঘু করে তিনি অন্যত্রও এই ব্যাখ্যা পদ্ধতির বিপক্ষতা করেছেন।[১৪] প্রায় একই ভঙ্গিতে তিনি 'নবদ্বীপাধিপতি কৃষ্ণচন্দ্রকে এইরূপ রূপক' বলে অস্বীকার করেছেন! কারণ 'কৃষ্ণ অর্থে অন্ধকার, তমোরূপী। কৃষ্ণনগরে অর্থাৎ অন্ধকারপূর্ণ স্থানে তাঁহার রাজধানী।' শুধু কি তাই, রাজার 'ছয়পুত্র', 'অর্থাৎ তমোগুণ হইতে ছয় রিপুর উৎপত্তি।'— এরকম যুক্তি জালের দ্বারা 'সেদিনের মানুষ' কৃষ্ণচন্দ্রকে— 'রাজধানী, রাজপুরী, রাজবংশ' থাকা সত্ত্বে রূপক ব্যাখ্যান-কৌশলে উড়িয়ে দেওয়া গেল। 'পলমাত্র উদ্ভাসিত যে অসি' তাকে পলাসি বলা গেলে, 'ক্লীবগুণ যুক্ত ক্লৈব (clive)' হিসাবে ধরা হলে, সিরাজকে 'সুরাজা অর্থাৎ যিনি উত্তম রাজা' বলে ধরলে পলাসির যুদ্ধকেও রূপক বলা চলে![১৫] সুতরাং বঙ্কিমচন্দ্র পুরাকথার বিবেচনা করতে চান দুটি দিকই খোলা রেখে। তিনি স্বীকার করেন পুরাকথায় আছে রূপক, কিন্তু তা বলে সবই রূপক বলে মানেন না। পুরাকথাকে যখন রোলা বার্থ বলেন : 'Myth is a system of communication' আর তার শেষে থাকে একটি গভীর অন্তর্ভেদী সংবাদ 'a message' তখন পুরাকথার অন্য ভাষ্যটিই উঠে আসে। এই বার্তা কি কেবল আমাদের আদিম পিতামহদের নির্মাণ? নাকি পুরাকথায় জমাট বদ্ধ থাকে সময়ের শৃঙ্খল? পুরাকথাকে ব্যাখ্যানধর্মী বলেও একজন বিশিষ্ট নৃতত্ত্ববিদ্ লিখেছেন : 'The myth is basically religious, in that its subject matter is the ultimates of human existence : where we and the things in our world came from, why we are here, and where we are going. Any aspect of these very large questions may be called a myth. The myth has an explanatory function ; it depicts and describes an orderly universe, which sets the stage for orderly behavior.'[১৬] এভাবে দেখলে বলতেই হবে দেশ-কাল-ধৃত দৃশ্যমান জগৎ ব্যাপারের আড়ালে যে অনাদি অনন্ত রহস্য তাকে পুরাকথা তৈরি করতে থাকে— ব্যাখ্যা করতে করতে অগ্রসর হতে থাকে আবার সেই রহস্যের গর্ভে লুকিয়ে যায় বহু অনুষঙ্গ। যে-সমাজ পুরাকথা ধারণ করে না— সে সমাজ যথেষ্ট মানবিক নয়। আর আধুনিক সময় যতই বলুক 'Myth is 'mere' myth'— কিংবা 'myth is false', তবু, কোন এক অবিনাশী সহস্রগ্রীব দানবের মতো পুরাকথা থেকে যায়।[১৭] এই রহস্যালোকটিকে তাই ভাষিক শিল্প (verbal art) হিসাবে না দেখে একটি আকার হিসাবে— সংগঠন হিসাবে বোঝবার চেষ্টা করেছেন কেউ কেউ। সে চেষ্টাতেও পুরাকথা ঠিক সাহিত্য নয়। সাহিত্য পুরাকথাকে আশ্রয় করে, কিন্তু পুরাকথার বিবেচনা নিছক সাহিত্য দিয়ে বোঝার চেষ্টায় খুব লাভ নেই।

।। ২।।

২.১.০. পুরাকথার সঙ্গে মানুষের প্রথম সম্পর্ক তৈরি হয় কৃত্যের। কৃত্য অর্থাৎ ব্রতাচার। ক্রমে তার সঙ্গে যুক্ত হয় পবিত্রতার ধারণা। আব্রামস-এর ভাষায় : 'Most myths are related to social rituals— set forms and procedures in sacred ceremonies.'[১৮] পাশাপাশি দুই রকম গল্প সমাজে চালু থাকতে পারে। কোন কাহিনী হয়তো নিছক আসরকে

জমিয়ে রাখার জন্য। সেই কাহিনী যদি কোনো ব্রতাচারকে আশ্রয় না করে তবে তা পুরাকথা নয়। কিছুদিন আগে গিয়েছিলাম মুর্শিদাবাদ জেলার ধুলাউড়ি গ্রামে। সেখানে একটি মনসামঙ্গল গান শুনছিলাম। সঙ্গে ছাত্রছাত্রীর দল। একটি মুসলমান তরুণ যে সাধারণত আলকাপের 'ছোকরা' সাজে— অপূর্ব ভঙ্গিতে বেহুলা সেজে নাচছিলেন। বাইরের তথ্য যাই বলুক ওই কাহিনীর মধ্যে যারা ঢুকে পড়েছিলেন, তাদের কাছে হিন্দু-মুসলমান ইত্যাদি ধর্মবোধ লুপ্ত হয়ে উঠে আসছিল অন্য একটি পুরাকথার জগৎ। লখিন্দরের জাগরণের সময় সঙ্গের বিবাহিতা ছাত্রীটিকে ঘোমটা দিয়ে গামছার এক পাশে টান দিয়ে বসতে হল। অন্যপ্রান্তগুলো ধরলেন আরও চারজন স্থানীয় মহিলা— সকলকেই বিবাহিতা হতে হবে। একটু পরেই বেহুলার অক্ষয় সিঁদুর রক্ষা করতে হলে এয়োতিদের এটুকু করা চাই। অর্থাৎ নিছক মনোরঞ্জক সাহিত্যধারার তুলনায় পুরাকথা বহু দূরবর্তী।

আর একটি উদাহরণ নেব। বিজয়গুপ্তের মনসামঙ্গলে বেহুলার মৃত্যু শেষে মনসা মন্ত্রজাত করে বাঁচিয়ে দিলেন লখিন্দরকে। কিন্তু ছয়মাস শব হিসাবে ভেসে আসা লখিন্দর তো বিবস্ত্র!

আঁখি মেলিয়া লখাই চারিদিকে চায়। দেখিয়া লজ্জিত বেহুলা বস্ত্র নাহি গায়।।
সভা মধ্যে লক্ষ্মীন্দর নাহিক বসন। হেট মাথা করিয়া রহিল লজ্জিত হইয়া মন।।

যথারীতি বিজয়গুপ্ত মধ্যস্থতা করে জানালেন সমাধান।

বিজয়গুপ্ত বলে তবে কার্যে দেও চিত্ত। হেন সময় বস্ত্র দেওয়া গাইনের উচিত।।

এই ভাবে গল্পের সঙ্গে যুক্ত হয় গায়কী। পেশাদার গায়কদলের ব্যবস্থাপনায় কাহিনীর তুচ্ছ পরিস্থিতি ভেঙে যাবে— যুক্ত হবে দাবি, চাহিদা আর ভক্তি, পূজার আবশ্যিক বিনিময়। কৃত্য আর পুরাকথার এই রকম বিনিময় যেখানে নেই, সেখানে পুরাকথার তাৎপর্য অস্পষ্ট।

২.১.১. এডমন্ড লীচ দেখেছেন পুরাকথা যখন কৃত্যকে অবলম্বন করে তখন শব্দ আর নৈশব্দ্যের মধ্যে পার্থক্য তৈরি হয়। নৈঃশব্দ্য থেকে শব্দে আসা— মৃত্যু থেকে জীবনে আসার মতো। উক্ত পরিস্থিতির কথা ভেবে দেখলে বিষয়টি স্পষ্ট হয়। লখিন্দর ছিলেন মৃত— বেঁচে ওঠার সময় নৈঃশব্দ্য আর শব্দের যোগ তৈরি হল। তাকে মন্ত্রজাত করলেন মনসা। মন্ত্রজাত— মন্ত্রযাত্রা। সাপুড়েদের মতো জঙ্গম সে-যাত্রা। দেবী মনসা জয়ন্তী থেকে সাগরকূলে এসে মৃত পিতা মহাদেবকে বাঁচিয়ে তোলেন এই দৈব পবিত্র মন্ত্র শুনিয়ে। লখিন্দরও বেঁচে উঠলেন মন্ত্র জাতের মাধ্যমে। শব্দ আর নৈঃশব্দ্যের পবিত্র সম্পর্ক তৈরি হল।

মুষ্টি মুষ্টি নিবিষ্টী জপিল মূলমন্ত্র। গরুর আসনে বহসি নিরক্ষর তন্ত্র।।

[*বিপ্রদাস পিপিলাইয়ের মনসামঙ্গল* : দ্বাদশপালা ৫২.৭০৬][২০]

মন্ত্রগুলির রূপ ভাষায় আছে আদিমতার ইঙ্গিত। জাদুশক্তির সঙ্গে অনন্ত অতীতের সুদূরের অস্পষ্ট কোনো সম্পর্ক রচিত হতে থাকে।

২.১.২. রামায়ণের গঙ্গাবতরণের অংশটি স্মরণ করতে হচ্ছে।.... 'মহাদেব গঙ্গাকে বিন্দু সরোবরের দিকে পরিত্যাগ করলেন। গঙ্গা সপ্ত স্রোতে বইতে লাগলেন— পশ্চিমে হ্লাদিনী, পার্বণী ও নলিনী, পূর্বে সুচক্ষু, গীতা ও সিন্ধু এবং সপ্তম স্রোত ভগীরথের পশ্চাতে।' আর সেই চমকপ্রদ জলপ্রবাহ সঁশব্দ— যেন শব্দের অভিঘাতে সগর রাজার ষাট হাজার সন্তানের বেঁচে ওঠার প্রস্তুতি। বাল্মীকির বর্ণনা :

সলিলেনৈব সলিলং ক্বচিদভ্যাহতং পুনঃ।
মুহূপূর্ধর্বপথং গত্বা পপাত বসুধাং পুনঃ।।

['কোনও স্থানে জলের সঙ্গে জলের সংঘর্ষ হল, জলপ্রবাহ ঊর্ধ্বপথে গিয়ে আবার ধরাতলে পড়ল।'][২১]

২.১.৩. এডমণ্ড লীচ পুরাকথার সঙ্গে 'কালাবাস' নামক সুরযন্ত্রের সম্পর্ক ব্যাখ্যা করেছেন। এই 'instrument of music' শুধু নৈঃশব্দ্য দূর করে না— তৈরি করে দৈব শব্দ শৃঙ্খলা। অর্থাৎ বিশৃঙ্খলার কোলাহলের মধ্যে পুরাকথা তৈরি করে পবিত্র স্বর্গীয় সুরের ঝঙ্কার। নারদের বীণা বা সরস্বতীর কচ্ছপী কিংবা শিবের ডম্বরু— যাইহোক নৈঃশব্দ্য ভেঙে তৈরি হতে থাকে যে পুরাকথার আবহ— তাই তাকে কৃত্যের সঙ্গে মিশিয়ে দেয়।

২.১.৪. আব্রামস মনে করেন পুরাকথা বা মিথ কৃত্যের সঙ্গে যুক্ত হলেও তাকে ধর্ম বলে ব্যাখ্যা করা যাবে না। ধর্ম মানবসমাজের অনেক পরবর্তী সময়কার শৃঙ্খলা। পুরাকথা মানব উপলব্ধির অজ্ঞাতপ্রায় অতীতের প্রতিধ্বনি। সাহিত্যের মতোই সেই শব্দ-শৃঙ্খলের সঙ্গে ধর্মের সম্পর্ক কোন কোন সময় তৈরি হয়। তা বলে ধর্মকে পুরাকথার সঙ্গে মিলিয়ে ফেললে চলবে না। 'It can be said that a mythology is a religion in which we no longer believe.'[২২] — এই হল আব্রামসের নিদান।

একই পুরাকথার উত্তরাধিকার ভারতবর্ষে হিন্দু-বৌদ্ধ-জৈন সংস্কৃতিতে প্রবাহিত। সামান্য কিছু পার্থক্য থাকলেও তা ধর্তব্যের মধ্যেই নয়। ইহুদি-খ্রিস্টান আর ইসলামি পুরাকথাও একই ওল্ড টেস্টামেন্ট থেকে তৈরি পুরাকথার বিন্যস্ত নির্মাণ। এ থেকেই আব্রামস-এর বক্তব্য স্পষ্ট হয়ে আসে। আবার খ্রিস্টান ধর্মের মধ্যে থাকলেও কেলটিক পুরাকথার আবহে থাকা ব্রিটেন-স্কটল্যান্ডের সঙ্গে টিউটানিক পুরকথার আবহমণ্ডলীর জার্মান-বোহেমিয়া-স্ক্যান্ডিনেভিয়ার ঐতিহ্য এক নয়। আমাদের দেশে এক প্রজন্মের ধর্মান্তরিত কবীর রামকথার নব রূপায়ণ ঘটাতে পারেন— ধর্মের শক্তি তার পুরাকথার চেতনাকে বিচলিত করতে পারে না।

২.২.১. মির্চা এলিয়াদ (1907–1986) পুরাকথা সম্পর্কে কিছু নতুন কথা ভেবেছেন। তাঁর মতে আরব্য রজনীর 'উড়ন খাটোলা' বা ম্যাজিক কারপেটের মতো, পুরাকথা আমাদের বহন করে নিয়ে যায়। এই জাদুগালিচার যাত্রা অতীতের দিকে— সে এক আশ্চর্য অভিজ্ঞতা। 'Myth works like a magic carpet, albeit one that goes in a single direction.'[২৩] ওয়েলস-এর টাইমমেশিন নয় এই একমুখীগতি পুরাকথায় প্রাচীনের প্রতিই একান্ত ধাবিত। এই যাত্রাপথে আমরা চলে যাই অজ্ঞাততম অতীতে— এলিয়াদ যাকে বলবেন, 'primorial time'। আর এই ভাবে পুরাকথা দেবতাদের নিকটতম এক মানস-ভূগোলে আমাদের নিয়ে যেতে থাকে। মির্চা এলিয়াদ বলেন পুরাকথার এই শক্তি অভাবিত-পূর্ব পরিস্থিতির জন্ম দেয় : 'myth reunites one with the gods, for it is then when they are nearest.'[২৪] গাজনের সময় 'শিবোহে' বলতে বলতে অগ্নিকুণ্ডের উপর দিয়ে হেঁটে যাওয়া সন্ন্যাসীরা শিবঠাকুরের আপন দেশে চলে যান যে মানস অভিসারে সেখানে পুরাকথার ব্যবস্থাপনাই থাকে।

২.২.২. বস্তুত আদিম সমাজে যেভাবে দেবতার সঙ্গে প্রত্যক্ষ সম্পর্ক ঘটে— 'ভর নামা' 'বাইলপড়া' প্রভৃতি বিভিন্ন নামে যা বোঝানো হয়, তার সঙ্গে আধুনিক পুরাকথা চর্চার আকাশ পাতাল ফারাক বোধ হয়। দীনেশচন্দ্র সেন-এর স্মৃতি থেকে বাইলপড়ার বিবরণ শোনাই : 'করুণার একটি ঘর বহুবিধ মাটির দেবদেবী মূর্তিতে পূর্ণ ছিল।... চৈত্রসংক্রান্তিতে শিবপূজা উপলক্ষে সে ধুনচি হইতে বহু লোক পরিবৃত্ত হইয়া মাথা দোলাইতে দোলাইতে ছুটিতে থাকিত। ধুনচি হইতে ধুনার ধোঁয়াকে ও তাহার এলোচুলে মুখ ঢাকিয়া গিয়া তাহাকে একটা

কবন্ধের মত দেখাইত।..... ইহার কিছু পরেই সে মুখে ফেনা তুলিয়া অজ্ঞান হইয়া পড়িত। আমাদের দেশে একে 'বাইল পড়া' বলে।'[২৫] অষ্টাদশ শতাব্দীতে 'খ্রিস্টানদের কোন কোন সম্প্রদায়ের মধ্যে' এরকম ব্যাপার লক্ষ করেছেন কেউ কেউ। 'কোচ জাতীয় পরিচারিকা' করুণার এই আচরণে 'প্রেম পিপাসু বালবিধবার সন্তপ্ত হৃদয়ের হাহাকারের পরিণতি দেখেছেন দীনেশচন্দ্র। হতে পারে। শিক্ষিত সমাজ যে ভাবে পুরাকথার সঙ্গে সম্মিলিত হয় তাকে বলতে পারি শব্দ অর্থের সংযোগ— মুদ্রিত গ্রন্থাদির মাধ্যমে সেই সংযোগ। ঐ করুণার মতো অনক্ষর (unlettered) মানুষ পুরাকথার দীপ্যমান জগতে প্রবেশ করেন কিভাবে? নিশ্চয় কোনো-না-কোনো প্রতীক বা আদল তথা গঠনের অবয়ব (structure) তাঁর মনে থাকে। যাই হোক গভীরভাবে পুরাকথার সঙ্গে সম্পর্ক রচনা করতে পারলে এরকম উজান যাত্রা নিষ্পন্ন হতে পারে। তখন মনে হয় দৈবসত্তা একান্তই নিকটবর্তী ('they are nearest')।

২.২.৩. মির্চা এলিয়াদ বলছেন যে আদি বিচ্ছিন্নতার কথা আমাদের পুরাকথায় আছে। বাইবলের ইডেন উদ্যান থেকে ভ্রষ্ট হয়ে যে আদি-পাপের প্রায়শ্চিত্ত করছে খ্রিস্টিয়ান মন তা যেন মুহূর্তে অপনোদিত হয় পুরাকথার ব্যবস্থাপনায়। পুরাকথার শক্তি এই অভাবিত অতীত অভিসারের সক্ষমতায় : 'That're union' reverses the post-Edenic separation from the gods and renews one spirituality.'[২৬] অনক্ষর অমার্জিত করুণা আর পাশ্চাত্য দার্শনিক প্রতিভাদীপ্ত এলিয়াদ— দুজনের অভিজ্ঞতার এই অপূর্ব মিলটি সংগঠিত হচ্ছে পুরাকথার মধ্যস্থতায়। একে এলিয়াদ বলেছেন, 'a symbolic rebirth'— প্রতিকী পুনর্জন্ম।

২.২.৪. ম্যালিনোস্কি ১৯২৫ খ্রিস্টাব্দের নভেম্বর নাগাদ ইউনিভার্সিটি অফ লিভারপুল-এ জেমস্ জর্জ ফ্রেজারের সম্মাননা বক্তৃতা ('মিথ ইন প্রিমিটিভ সাইকোলজি')-য় ফ্রেজারকে বলেছেন : 'the modern representative of primitive man, the contemporary savage.'[২৭] উক্ত প্রবন্ধের সূচনায় বলা এই কথা শুধু ফ্রেজারের জন্য নয়— যে-কোনো পুরাকথা সচেতন গবেষকের পক্ষেই প্রযোজ্য। ম্যালিনোস্কি এই প্রবন্ধে পুরাকথা বিশ্লেষণের নতুন কিছু সংবাদ দিয়েছেন। 'দি সোসাইটি ফর দি কমপারেটিভ স্টাডি অফ মিথ' প্রতিষ্ঠিত হয় ১৯০৬, বার্লিনে। তাঁদের প্রথমদিকের চেষ্টা ছিল পুরাকথাকে প্রতীকের বিন্যাসে ধরা। সূর্যকে তাঁরা দেখলেন প্রাচীন পুরাকথার একমাত্র বিষয় : 'The sun as the only subject round which primitive man has spun his symbolic.' তার সঙ্গে যুক্ত হল অন্যান্য প্রতীকও— সবই চেনা পৃথিবীর প্রতীক। 'wind, weather and colors of the skies' হয়ে উঠল 'essence of myth'।[২৮] এ নিয়ে প্রথম অনুচ্ছেদগুলিতে আলোচনা করেছি। ভুণ্ড (Wundt)-কে স্মরণ করে ম্যালিনোস্কি যখন বলেন, আদিম মানুষের মধ্যে পুরাকথা একটি অতি গুরুত্বপূর্ণ সাংস্কৃতিক শক্তি ('extremely important cultural force') হয়ে দেখা যায়, তখন সেই জীবন্ত শক্তির কার্যকারিতা সামান্য স্পষ্ট হয় নিশ্চয়। মির্চা এলিয়াদ তাকেই অনুভব করেছেন। সেই কার্যকারিতাকে। আর এজন্যই ম্যালিনোস্কি উচ্চারণ করেন তার অমোঘ উদ্ধৃতি— পুরাকথা হল মানব সংস্কৃতির অতীব গুরুত্বপূর্ণ অন্তর্বস্তু— 'Myth fulfills in primitive culture an indispensable function : it expresses, enhances, and codifies belief ; it safeguards and enforces morality ; it vouches for the efficiency of ritual and contains practical rules for the guidance of man.'[২৯] না, এ কোন গল্প নয়— সাহিত্য নয়, ধর্মও নয়— সমাজের অন্তর্গত নীতিবোধ আর বিধি ব্যবস্থার নির্মাণের অপরিহার্য কাঠামো। 'Myth is thus a vital ingredient of human civilization'।[৩০]

।। ৩।।

৩.১.০. কলকাতার এশিয়াটিক সোসাইটি লেভিস্ট্রোস (২৮.১১.১৯০৮)-এর শতবর্ষ-স্মারক আলোচনাচক্র করল ১৮-১৯ ডিসেম্বর ২০০৮। সেখানে সংকেত ভাষণ দিতে গিয়ে অধ্যাপক প্রবাল দাশগুপ্ত একটি বিচিত্র প্রসঙ্গ এনেছেন। *কাঁচা আর রান্না*—বইয়ের একত্র লেভিস্ট্রোস লিখেছেন : 'The myths about the origin of cooking relate to a physiology of the marriage relationship, the harmonious functioning of which is symbolized by the practice of the art of cooking, whereas, on the acoustic and cosmological levels,.......the meaning of the message conveyed by the introduction of cooking.'[৩১] রন্ধন ব্যাপারটির সঙ্গে বিবাহ-সম্পর্কের বিষয়টি এক দিক থেকে অভাবিতপূর্ব। লেভিস্ট্রোসের সঙ্গে আমাদের সংলাপ পুরাকথা আর বিবাহকে ঘিরে শুরু হলেও কেমন করে চলে আসা যায়— প্রযুক্তি, অর্থনীতি, সমাজতাত্ত্বিক এমন কি বিশ্বদৃষ্টি সংক্রান্ত ভাবনার সত্যেও। ভাষা-সংস্কৃতির গঠন তাৎপর্য ('the language-culture interface of procedures of structural analysis')-টি বুঝে নেবার গুরুত্বপূর্ণ পথরেখা হিসাবে প্রবালবাবুর প্রবন্ধটি গুরুত্বপূর্ণ।

৩.১.১. আমাদের মনে পড়ছে বাংলার মনসামঙ্গলের একটি প্রসঙ্গ। পুত্রের বিবাহ প্রস্তাব নিয়ে গেছেন চাঁদ সদাগর। সঙ্গে নিয়েছেন লোহার কলাই। সায়বেনেকে বললেন :

নিত্য সিজাইয়া খাই লোহার কলাই। সাহে জানাইল গিয়া সুমিত্রার ঠাঞি।

[*বিপ্রদাস পিপিলাইয়ের মনসামঙ্গল* : একাদশ পালা ১০.১৫১][৩২]

সুমিত্রা পারলেন না এই কঠিন কাজটি সম্পন্ন করতে। বেহুলা অবশ্য সে-কাজ অনায়াসেই করলেন :

মনসা চিন্তিয়া মাত্র তথি সেই জ্বাল। ফেনা বান্দী বান্দী শীঘ্র ধরিল উথাল।।
হাতে করি তুলি দেখে গোটা পাচ সাত। তুলিয়া দেখিল যেন হইয়াছে ভাত।।

[ঐ; ১২.১৭০—১৭১][৩৩]

'আড়াই হালা' 'বেনা' (দশ আঁটি খড়) নিয়ে এই রন্ধন। বেহুলার বিবাহের পূর্বশর্ত পূরণ করল।

৩.১.২. বিবাহরাত্রে লখিন্দরের খিদে পেল। বেহুলা বহু অনুনয় বিনয়ের পর রাঁধতে বাধ্য হলেন। লখিন্দরের পরামর্শ :

নারিকল জল দিয়া মঙ্গল হাঁড়ি লইয়া করো রামা অন্নের সূচনা।
পরিচারক এই আমি প্রদীপের বর্ণি আনি রান্ধ এই করিয়া মন্ত্রণা।।

শেষ পর্যন্ত :

প্রভুর যতন দেখি ভাবিয়া তো শশিমুখী রন্ধন করিল সেই যোগে।

[*বিপ্রদাস পিপিলাইয়ের মনসামঙ্গল* : দ্বাদশ পালা ২৬.৩৪১-৪২][৩৪]

বিবাহরাত্রে মঙ্গল-কলসীতে রান্না করার কারণেই বিপন্ন হলেন এই নবীন দম্পতি। — এই বিশ্লেষণ ভুল নয়। ভাসান যাত্রার শেষে ডোমনীর বেশে সনকার সঙ্গে সাক্ষাৎ করলেন বেহুলা। সে সময় এই খাবারগুলির ঢাকনা খুলে দেখা গেল সবই আছে! নারায়ণদেবের রচনা থেকে প্রক্ষিপ্ত হয়েছে দ্বিজবংশী দাসের রচনায় :

কাঁচা হাড়িতে অন্ন রন্ধন হয়েছে। [*শ্রীশ্রী পদ্মাপুরাণ* : দ্বিজ বংশীদাস][৩৫]

৩.১.৩. দক্ষিণ চব্বিশ পরগণা ও সংলগ্ন অঞ্চলে রান্নাপুজোর কথা প্রসঙ্গও মনে করতে পারি। মনসাপূজার সঙ্গে এই কৃত্য অনুষ্ঠিত হয়। এদিন অরন্ধন। উনুনে রাখা থাকে মনসা তথা সিজ গাছ। আগের দিন সম্ভবমতো ভালোমন্দ রান্না করা হয়। পশ্চিমবঙ্গে এই অনুষ্ঠান হয় 'শীতল' নামে— সরস্বতী পূজার আগের দিন।

৩.১.৪. রাঢ় বাংলায় লোকদেবতাদের পূজানুষ্ঠানে কাঁচা বা রান্না কারা নৈবেদ্য সম্পর্কে সামান্য তথ্য উপহার দিলাম।

কাঁচা-নৈবেদ্য : ১. বাঁকুড়ার 'পাউড়ি' দেবতার নৈবেদ্য দইচিঁড়ে।[৩৬]

২. মেদিনীপুরের কাঁথির খেজুরি থানার মৌহাটি গ্রামের দেবতা চন্দ্রগোল ; নৈবেদ্য দুধ চিঁড়ে আর গাঁজা।[৩৭]

৩. বাঁকুড়ার রাইপুর থানার খড়িগোড়্যায় 'বাল্যভোগ'— দুধ গুড় চিঁড়ে কাঁঠাল-কোষ দেওয়া হয়, সকালবেলায়। দেবতা— ঘোড়াপাহাড়ী।[৩৮]

রান্নাকরা নৈবেদ্য : ১. 'বড় ভোগ' বা খিচুড়ি—নৈবেদ্য দেওয়া হয় বাঁকুড়ার ইঁদপুর থানার সাতামী গ্রামের 'বাঁদড়া' ও 'ছড়িদাও'-এর উদ্দেশ্যে। সেই খিচুড়ি থানেই খেতে হবে, অন্যত্র নেওয়া যাবে না।[৩৯]

২. ঘোড়া-পাহাড়ী-র বার্ষিক পূজায় দুপুরে দেওয়া হয় 'পায়েস ভোগ' আর 'খিচুড়ি ভোগ'।[৪০]

৩. বাঁকুড়ার বড়জোড়া থানার নতুন গ্রামের দেবী মালঞ্চকে বারতি (ব্রতী)-রা উপহার দেয় শীতল, মনুই বা মনুই ভোগের পরিবর্তে মান্যস্বরূপ পয়সা বা শাঁখা শাড়ি সিঁদুর।[৪১]

কোথাও কোথাও লোক দেবতার কাছে দোর ধরে ভক্ত পায় স্বপ্নাদ্য ওষুধ সেসব ক্ষেত্রে 'রোগী সারাজীবন ধরে বোয়াল মাছ, চ্যাং মাছ ও মুরগীর ডিম খেতে পাবে না।'[৪২]

এই নিষেধাজ্ঞা বাঁকুড়ার লাউ গ্রামের দেবী দণ্ডেশ্বরীর কাছে মানত রাখলে পালন করতে হয়।

৩.২.১. লেভিস্ট্রোস ভাষা সম্পর্কে কিছু মৌলিক বক্তব্য রেখেছেন। সেখান থেকে পুরাকথার তাৎপর্য বোধ করা সম্ভব। বক্রোক্তি (Trope), লক্ষণা (Metonymy) কিংবা রূপক (Meta phor) আসলে অলংকৃত ভাষা (Figurative Language)-র প্রাণ। আর এইসব ভাষা অর্থের রহস্য তৈরি করে। অর্থের দ্যোতনা তৈরির আগেই শব্দ জন্ম নেয়— নিতে পারে। এই হল লেভি স্ট্রোসের ভাবনা। তাঁর বক্তব্য : 'Figurative language was the first to be born, proper meaning were the last to be found.'[৪৩] বস্তু বা চরিত্র আকার নেবার পরই নাম ভাবা হয়। এভাবে দেখলে ভাষা ভাবনার একটি রহস্য তৈরি হয়। আর মনে হয় লেভিস্ট্রোস কী এখানে ম্যাক্সমুলারের ভাষ্যেই ফিরে যাচ্ছেন না? ম্যাক্সমুলার ভেবেছিলেন পুরাকথার জন্ম হয় ভাষার বিপর্যস্ত পাঠ থেকে।[৪৪] লেভিস্ট্রোস-এর ভাবনাটি পুরাকথার ব্যাখ্যায় কিভাবে সাহায্য করে?

কয়েকটি পুরা-কথার চরিত্র বিচার করলেই বিষয়টি স্পষ্ট হবে।

কার্তিক, স্কন্দ আর ষড়ানন তিনটি শব্দই কার্তিকের নাম শব্দ। কৃত্তিকারা ক্রতু-পুলহ-পুলস্ত্য-অঙ্গীরা-অত্রি-মরিচী— এই ছয় জনের স্ত্রী। অগ্নির তেজ সেবন করায় গর্ভবতী হন। হিমালয়ে গর্ভপাত করলেও সেই তেজ মিলিত হয়ে কুমার কার্তিকেয়র জন্ম দেয়।[৪৫] স্কন্দ শব্দটি থেকে কার্তিক জন্মের অন্য পুরাকথা জানা যায়। ইন্দ্র সদলে তাঁকে বলে নির্জিত করতে ব্যর্থ হলেন, কিন্তু তাঁর বজ্র কার্তিকের দক্ষিণ পার্শ্ব বিদীর্ণ হয়ে যায়। স্বাহা অগ্নির স্খলিত বীর্য— সন্ন থেকে

জন্ম দিয়েছিলেন তাই তাঁর নাম হয় স্কন্দ। আর দক্ষিণ পার্শ্ব বিদীর্ণ করে কার্তিকের নবজন্ম হয় বলেই তাঁর নাম হয় বিশাখ।[৪৬]

অনুরূপে গজানন-কে ঘিরে সংহত হয় একটি নির্দিষ্ট পুরাকথা। সে কাহিনী আমরা অনেকেই জানি।

লেভিস্ট্রোস ঠিকই লিখেছিলেন : 'Things were called by their true name only when they were seen in their true form'.[47]

দেবতাদের অষ্টোত্তর শতনাম বেশ পরিচিত কাব্য সংরূপ। আকাশে ব্যাপ্ত সাতাশটি নক্ষত্রের চারটি অবস্থা। দেবতা সে সবেই আছেন— এ রকম একটি আঙ্কিক নিয়ম এর আড়ালে আছে বলে কেউ কেউ মনে করেছেন। সে যাহোক প্রত্যেকটি নামই বস্তুত দেবতাদের প্রতি আক্ষিপ্ত পুরাকথা। কোনটি আগে? লেভিস্ট্রোস বলবেন প্রথমে রূপ (Structure) তারপর শব্দ (Figurative language) আর তারপর— পুরাকথা। মানুষের চিন্তন-প্রণালী বস্তুত ভাষাতীত যে বিমূর্ত ও মূর্ততা (abstract ও concrete)-কে অবলম্বন করে— লেভিস্ট্রোস যেন তাকেই ইঙ্গিত করেন।

৩.২.৩. পুরাকথাকে বুঝতে হলে আমাদের গঠনতাত্ত্বিক প্রণালী অবলম্বন করা ছাড়া গতি নেই। আদিম মানুষ যে মানসিক স্তরে পুরাকথা তৈরি করে আর আজকের মানুষের যে মানসিক স্তর থেকে তা বুঝতে চায় তা এক নয়। পুরাকথা গড়ে ওঠে অজ্ঞাততম (unknownest) ভাবনার প্রেক্ষিতে। তাকে আমরা বুঝব কি করে? অপেরা বা দীর্ঘ সঙ্গীত উপকরণক যেমন ভাষাতীত লিব্রেট্টো (Libretto)–র দ্বারা ব্যক্ত করা হয়— তেমনি কোনো উপায় খুঁজে বের করতেই হবে। জানা হলে পুরাকথাকে বোঝা যাবে না। ভাষাতিরিক্ত চিহ্নের দ্বারা গানের ভাষাকে অনুভূতির ভাষায় রূপান্তরিত করার চেষ্টা করে লিব্রেট্টো। বস্তুত এ হল অনুভূতিকে বোঝার জন্য একটি চিহ্নায়ন (codification)।

জ্যামিতির ক্ষেত্রে বীজগণিতের ক্ষেত্রে এই রকমই পদ্ধতি আরোপিত হয়। কোনো জ্যামিতিক চিহ্নই তো অবাস্তব। প্লেটো বলেছিলেন আদর্শ বৃত্ত বা ত্রিভুজ আঁকা যায় না। সংজ্ঞা আর চিহ্নের মধ্যে বিনিময় ঘটে না কখনই। আমরা দুটিকেই ভেবে নিই। বীজগণিতে যেমন। কাল্পনিক রাশিতে প্রতীক বা চিহ্নের মারফৎ আমাদের যাত্রা শুরু হয়।

বিষয়টি বোঝার জন্যই লেভিস্ট্রোস চলে যান লাতিন আমেরিকার পুরাকথায় স্পেনীয় আক্রমণ-পূর্বতথ্য বিচারের দিকে। ভারতীয় পুরাকথা ক্রমাগত পরিবর্তিত হয়েছে— গ্রেকো-রোমক পুরাকথাও সাহিত্যের সঙ্গে সমঝোতা করে করে এগিয়েছে। স্পেনীয় আক্রমণে নির্জিত হবার পর লাতিন আমেরিকার পুরাকথা গেছে শেষ হয়ে— প্রায় সম্পূর্ণ উৎসাদন হয়েছে সেগুলির। এজন্যই এইসব পুরাকথা বুঝে দিতে চান লেভি স্ট্রোস। একটি কাহিনীর মধ্যে আছে স্কেট (skate) বা শঙ্কর মাছের সঙ্গে উত্তর বায়ুর টানা পোড়েন। উত্তর বায়ু মানুষের সাহায্যে আসে না— সাহায্যে আসে স্কেট মাছ। লেভিস্ট্রোস কাহিনীটিকে ব্যাখ্যার সময় বলছেন এই পুরাকথাটির উদ্ভব ঘটেছে এমন সুদূর অতীত সময় যখন প্রকৃতি জীবজগৎ আর মানুষ স্বতন্ত্র কোনো সত্তা নয়। উত্তর বায়ুর ধাক্কায় মানুষ প্রবল কষ্টে পড়ত তখন— শিকার করাও হত ব্যাপক সমস্যার ব্যাপার। পুরাকথাটি বলতে স্কেট মাছ এসময় মানুষকে সাহায্য করল। উত্তর বায়ুর প্রবাহকাল হল নির্ধারিত। লেভিস্ট্রোস প্রশ্ন তুলছেন এই পুরাকথার মধ্য দিয়ে উঠে আসে ব্যাখ্যাতীত আর একটি বিষয়— স্কেট মাছ শিকার হিসাবে মানুষের খুব প্রিয় : তাহলে কি স্কেট বা শঙ্কর মাছ নিজেকে ধবংস করার জন্য এই রকম বুদ্ধি দিল মানুষকে? প্রকৃতপক্ষে

শঙ্কর মাছের চেহারার বৈশিষ্ট্য এই পুরাণ-কথার মূল বা আদিস্তরে একটি সংগঠনগত রূপ নিয়ে আসে লেভিস্ট্রোসের মনে। স্কেট বা শঙ্কর মাছের চেহারা বেশ দীর্ঘ আর চ্যাপ্টা। এর এক পাশ পিচ্ছিল আর অন্য পাশ অমসৃণ। আদিম মানুষের চোখে মাছটি হ্যাঁ আর না-এর ভাষায় পুরাকথাটি তৈরি হয়েছে। উত্তর বায়ুর না শঙ্কর মাছের হ্যাঁ থেকে শঙ্কর মাছের পিচ্ছিল দিকের না থেকে অমসৃণ দিকের হ্যাঁ— ঠিক যেন একালের কম্পিউটার যন্ত্রের প্রতীক ভাষ্যের নির্মাণ। সেখানেও হ্যাঁ আর না-এর সমাপতন।

৩.৩.১. লেভিস্ট্রোসের ভাববিশ্ব বিজ্ঞানধর্মী বলে মনে হয়— তবে তিনি বিজ্ঞানকে মানবিকবিদ্যার তুলনায় শ্রেষ্ঠ বলে মনে করেন না। তাঁর মতে, বিজ্ঞান কোনোদিন সম্পূর্ণ হবে না। বিজ্ঞানের অগ্রগতি আকস্মিক ও আপতিক। বিজ্ঞান নিজেই জানে না তার কার্যক্রমের পরিণতি। আজ যে প্রশ্নের সমাধান হল, কাল সেইখান থেকেই জেগে উঠবে নতুন প্রশ্ন— সেই অনাগত প্রশ্নের মধ্য দিয়ে আজকের আপাত-সমাধান কী নস্যাৎ হয়ে যাবে না! সুতরাং দর্শন অনেক বেশি পূর্ণাঙ্গ— তার বহু প্রশ্নের উত্তর বিজ্ঞানে নেই। এই জন্যই লেভি স্ট্রোসের পুরাকথা-বিষয়ক আলোচনা পূর্ণতর মানবিক জিজ্ঞাসার উত্তর— উত্তরণের আকাঙ্ক্ষাও হয়তো।

৩.৩.২. পুরাকথা আর ইতিহাস বিপরীতধর্মী। পুরাকথার মারফৎ আমরা স্পর্শ করি সেই অতীত যা আমাদের অনুভূতিকে রহস্যময় এক স্তর থেকে উঠে আসা প্রতিধ্বনির মতো শোনাতে থাকে উপলব্ধির ইশারা। অন্যদিকে ইতিহাস ক্রমশই পরিবর্তনশীল— জীবন্ত আর খোলামুখ। পুরাকথা স্থির, অপরিবর্তনযোগ্য— তাতে মিশে থাকে ছোট ছোট পুরাকথার উপাদান। লেভিস্ট্রোস একে বলেন mythical cell। ইতিহাস এক অর্থে বিজ্ঞানের মতো— অখণ্ড ঐক্য বা তাৎপর্য তৈরি করে না। পুরাকথা মানুষের সমাজসংগঠনের আদি কোন স্তর থেকে উঠে আসে— ইতিহাসের উৎসও সম্ভবত তাই। অথচ ইতিহাস বার বার পুরাকথাকে অস্বীকার করে প্রতিস্থাপিত করে অগ্রসর হবার চেষ্টাই করছে। আদিম অনক্ষর মানুষ (non-lettered folk) ইতিহাসের মতো সংগ্রহ আর তুলনায়— বিন্যাস আর উপহার দেবার কৌশল জানেন না। পুরাকথার মধ্যে আদিম মানুষ তার স্মৃতিবাহিত অতীত আর কর্মপ্রবাহের বর্তমানকে সঙ্গতিবিধান করতে চায়। ইতিহাস এরকম কোনো সঙ্গতিবিধান করতে পারে না। তাকে অগ্রসর হতে হয় একটি মধ্যবর্তী অন্ধকারকে রেখে। বস্তুত পুরাকথা যেখানে শেষ সেখানেই ইতিহাস শুরু হয় না— মাঝখানে থাকে বেশ খানিকটা চিহ্নহীন শূন্যতা। লেভিস্ট্রোস মনে করেন এই শূন্যতার অন্ধকার অস্বীকার করতে হলে পুরাকথার ধারাবাহিকতাকে স্বীকার করতে হবে— ইতিহাসের এক যান্ত্রিকতাকে অস্বীকার করতে না পারলে এই সমাধানে যাওয়া সম্ভব নয়।

৩.৩.৩. ইতিহাস বস্তু নির্ভর, পাথুরে প্রমাণ ছাড়া কিছুতেই তার বিশ্বাস নেই। এই রকম অবস্থান থেকে না সরলে পুরাকথার শেষ আর ইতিহাসের সূচনার মধ্যবর্তী শূন্যতার সমাধান হবে না। এই সমাধান করতে হলে সাংস্কৃতিক নৃতত্ত্ব (Cultural Anthropology)-কে স্বীকার করতে হবে। ইতিহাস আর পুরাকথার দ্বৈত-আদল (binary-structure) তৈরি করতে করতে অগ্রসর হতে চান তিনি। এ-পথেই সাংস্কৃতিক বিকাশের পদচিহ্ন খুঁজতে হবে।

লেভিস্ট্রোস দেখেছেন সাংস্কৃতিক বিকাশের তিনটি পূর্বশর্ত। আদিম সংস্কৃতি বিচ্ছিন্ন, মৌলিক এই ধারণা সংস্কৃতিক নির্দিষ্টতা দেয়। শ্রেষ্ঠত্বের ধারণা (অর্থাৎ আমাদের সংস্কৃতি শ্রেষ্ঠ— এরকম একটি মানসিক প্রত্যয়) একপাশে সরিয়ে রাখলে সংস্কৃতি সচল হতে থাকে। সংস্কৃতির নির্দিষ্টতা আর সচলতাকে লেভিস্ট্রোস ইতিহাসের দিকে এগিয়ে আসার সম্ভাবনার ভূমিকা বলে মনে করে। আত্ম বিচ্ছিন্ন মৌলিক সংস্কৃতি যে-পর্বে সাংস্কৃতিক শ্রেষ্ঠত্বের ধারণার

জন্ম দেয় তখন থেকেই 'না' থেকে 'হ্যাঁ'-এর ভূমিকা রচিত হয়। পুরাকথা এইভাবে দ্বৈত-আদল তৈরি করতে করতে ইতিহাসের সঙ্গে মিশে যায়।

কলম্বিয়ার ভাউপ (vaupes) অঞ্চলের পুরাকথায় চারটি স্তর খুঁজে পেয়েছেন লেভিস্ট্রোস। সেই চারটি স্তর এই রকম :

প্রথম স্তর : বীর কাহিনী বা saga ;
দ্বিতীয় স্তর : বিশ্বতত্ত্ব গড়ে ওঠা বা সৃষ্টি বিবরণ creation myth ;
তৃতীয় স্তর : ঐতিহ্য-সম্মত রূপকথা ; আর
চতুর্থ স্তর : গোত্রীয় ইতিহাস।

পুরাকথার এই চারটি স্তরকে ঠিকমত শনাক্ত ও বিশ্লেষণ করা গেলে উক্ত চিহ্নহীন শূন্যতার অন্ধকার অতিক্রম করা সম্ভব— লেভিস্ট্রোস এভাবেই ভাবতে চান।

৩.৪.১. সাহিত্যকর্মের সঙ্গে পুরাকথার পার্থক্য দুস্তর। পুরাকথায় ব্যক্তির কোন ভূমিকা নেই, সাহিত্যে ব্যক্তির ভূমিকাই প্রধান। পুরাকথায় যে আদিম রহস্য তা মানব সমাজের সাধারণ সম্পদ। সাহিত্য কাল আর দেশে পরিচ্ছিন্ন। লেভিস্ট্রোসের ধারণায় তাই এই দুইয়ের কোনো বিনিময় অসম্ভব। তিনি যখন বলেন কবিতা অনুবাদ করা যায় না 'Poetry is a kind of speech which cannot be translated except at the cost of serious distortions', তখন সাহিত্যের দেশ-কাল-সমাজ ঐতিহ্যের বিচ্ছিন্ন সত্তাই স্পষ্ট হয়। এক দেশের সাহিত্য অন্য দেশের ভাষায় অনুবাদ করা যায় না। করতে গেলে বহু ইঙ্গিত ইশারার তাৎপর্য হারিয়ে যায়। পুরাকথার ক্ষেত্রে এমন হয় না। পুরাকথার তাৎপর্য ধরা পড়ে অন্য দেশকাল ও সমাজে 'the myth is preserved even through the worst translations.' সাহিত্যের যে-ধারাটি পুরাকথার সঙ্গে সংশ্লিষ্ট তার কথা লেভিস্ট্রোস ভাবেন নি। পুরাকথাকে যেন জিতিয়ে দেওয়াতেই তার আনন্দ।

॥ ৪ ॥

৪.০.০. সিগমুণ্ড ফ্রয়েড (১৮৫৬—১৯৩৮) পুরাকথার সঙ্গে সাহিত্যের সম্পর্ক দেখেছেন মনস্তত্ত্বের সূত্রে। তাঁর মতে মানুষের আদি সাহিত্য পুরাকথা— আর সেখানে থাকে ব্যক্তি মানুষের আকাঙ্ক্ষার প্রক্ষেপ। 'At heart, the myth is not biography but autobiography'[৪৮] কেমন করে পিতৃহত্যা (patricide)-র গোপন ইচ্ছার জন্ম হয়, কেমন করে সেই ইচ্ছার সাহিত্যিক প্রকাশ ঘটে, কেমন করেই বা সেই সাহিত্যের বাচ্য মানুষের মধ্যে জনপ্রিয় হয় এ-বিষয়ে ফ্রয়েডের ভাবনা তাঁর বিভিন্ন রচনাতে ছড়িয়ে আছে। তিনি যখন ওদিপুস-পুরাকথাটি বিচার করতে থাকেন তখন মনে রাখেন সাহিত্যকথাও। সোফোক্লেসের ট্রাজিডির কথাও ভোলেন না। গ্রিক নাটকের যুগে যেমন, এখনও তার তাৎপর্য, প্রভাব, বিহ্বলতা কাজ করে ('moves a modern audience no less than it did the contemporary Greek one')।[৪৯] এর কারণ মানুষের সংস্কার। 'King Oedipus, who slew his father Laius and married his mother Jocasta, merely shows us the fulfilment of our own childhood wishes.'[৫০] বস্তুত এই মনস্তত্ত্ব বিশ্বজনীন। সুতরাং পুরাকথা আর আদি সাহিত্যে একই বিশ্বজনীন ভাবসত্য স্পষ্ট হয়ে ধরা পড়ে।

৪.১.০. *মোজেস অ্যান্ড মনোথেইজম*-এ ফ্রয়েড চলে যান সমাজ সংগঠনের আদি স্তরে যখন মানুষ ছোট ছোট গোষ্ঠীতে বিভক্ত ছিল ('in primaeval times men lived in small

hordes') আর সেগুলি শাসিত হত একজন শক্তিশালী স্বেচ্ছাচারী পুরুষের অধীনে। ঐ পুরুষ ছিল সর্বাঙ্গীণ নিয়ন্তা— 'The strong male was the master and father of the whole horde : unlimited in his power, which he used brutally.'[৫১] সেই গোষ্ঠীর যে-কোনো নারীই হত তার শয্যা-সঙ্গী। নতুন প্রজন্মের পুরুষ মাত্রই নিষ্ঠুর ভাবে হত্যার শিকার হত তার। পারতপক্ষে যারা বাঁচত তারা গোষ্ঠী গড়ত নিজেরা— কখনো কখনো তারা হত্যা করার চেষ্টা করত অত্যাচারী পিতৃকল্প ঐ সত্তাকে। এভাবেই গড়ে উঠেছে পুত্রদের বনবাসে পাঠানো আর নির্দিষ্ট সময়ের পর তাদের ফিরে আসা আর সেই পিতৃকল্প চরিত্রের মৃত্যুর পুরাকথা। ফ্রয়েড জানাচ্ছেন : 'An echo of the expulsion of the eldest son, as well as of the favoured position of the youngest, seems to linger in many myths and fairy tales.'[৫২] সুতরাং পুরাকথা আর সাহিত্যের যাত্রা অনেক সময়ই একই উৎস ও পরিণতির দিকে।

৪.২.০. কার্ল জি. ইয়ুং (১৮৭৫-১৯৬১) ফ্রয়েডের শিষ্য হিসাবে কাজ শুরু করলেও, সবাই জানি অন্যপথে হেঁটেছেন অচিরেই। তাঁর বিশ্লেষণে পুরাকথা একটু অন্য ক্ষেত্র খুঁজে পেয়েছে। তাঁর 'কাব্যশিল্পের সঙ্গে মনস্তাত্ত্বিক বিশ্লেষণ-এর সম্পর্ক' শীর্ষক প্রবন্ধ (১৯২২) এক্ষেত্রে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ।[৫৩] ফ্রয়েডের মতো তিনি ব্যক্তিগত মনস্তত্ত্বকে গুরুত্ব দিলেন না, তাঁর ব্যাখ্যানে ফুটে উঠল সামূহিক নির্জ্ঞান তথা 'collective unconscious', পুরাকথার মধ্যে ধরা পড়ল জাতির স্মৃতি পরম্পরা 'racial memories'। পুরাকথা বস্তুত কিছু মৌলিক কল্পচিত্র তৈরি করতে থাকে—এইসব 'primordial images'-এর মধ্যে মানব-মনস্তত্ত্বের অধঃক্ষেপ পড়তে থাকে, একে ইয়ুং বলেছেন, 'psychic residue'।

৪.২.১. ইয়ুং-এর পুরাকথা বিচার ধীরে ধীরে সাহিত্য আর পুরাকথাকে একসঙ্গে বিচার করার পথ নির্দেশ করল। ১৯৩৩ নাগাদ তিনি রচনা করলেন একটি গবেষণা-পত্র, 'আত্মার সন্ধানে আধুনিক মানুষ' ('Modern Man in Search of Soul')। এই গবেষণাপত্রে ইয়ুং সর্বপ্রথম আদিকল্প বা 'archetypal image' শব্দটি প্রয়োগ করেন। আদিকল্পে পুঞ্জীভূত হয় জাতির মগ্নচৈতন্য। বড় সাহিত্যিক এই আদিকল্পটি বুঝতে পারেন— পাঠকরা তাঁর রচনার মধ্য দিয়ে চলে যেতে পারেন সৃজনের মৌলিক স্তরে। ক্রমে তৈরি হতে থাকে এক নতুন ধরনের অনুভবের শৃঙ্খল। ইয়ুং-এর বর্ণনা : 'A great author possesses, and provides for readers, access to the archetypal images buried in the racial memory, and so suceeds in revitalizing aspects of the psyche which are essential both to individual self-intregation and to the mental and emotional well-being of the human race.'

৪.২.২. আদিকল্প বলতে কি বোঝায়? একে বলতে হয় পুরাকথা আর সাহিত্যের সংযোগ রহস্যের ক্ষেত্র। রহস্য-ভেদ আর রহস্য-সৃজন আদিকল্পের মারফৎ দুই-ই হতে থাকে। চেনা সাহিত্যখণ্ড এর মাধ্যমে সময়সীমানা ভেদ করে চলে যায় সুদূর অতীতের কোনো ক্ষেত্রে। সাহিত্যের বেড়াটি ভেঙে যায়— সীমানা তখন অন্য এক অপরূপ পরিবেশকে আশ্রয় করে। পাঠক পান মানস অভিসারের জাদুগালিচা, মির্চা এলিয়াদ যেমন ভেবেছেন। জে. এ. কুডন লিখেছেন : 'An archetype is at a vestiç and universal, the product of the collective unconscious' and inherited from our ancestor. The fundamental facts of human existence are archetypal : birth, growing up, love, family and

tribal life, dying, death, not to mention struggle between children and parents and fraternal rivalry.'[৫৪]

কুডনের সংজ্ঞার শেষাংশ ফ্রয়েড-এর তত্ত্বকে আর প্রথমদিককে ইয়ুং বা ইয়ুং-পরবর্তী তাত্ত্বিকদের ভাবনাচিন্তাকে সমন্বয় করতে চেয়েছে।

৪.৩.০. বাংলা সাহিত্যের মধ্যযুগে পুরাকথার উপাদান অজস্র। তবে সেসব কি আদিকল্প হয়ে উঠেছে? একটু ভেবে দেখা যেতে পারে। কয়েকটি উদাহরণ নিচ্ছি।

ক. কালকেতু পশুশিকার করতে গিয়ে দেখলেন বনে কিছুমাত্র পশু দেখা যাচ্ছে না। হঠাৎ একটি হরিণ দেখলেন কালকেতু—

দেখি বীর খুর নখ না চলে লোচন পথ আছে মৃগ দেখিতে না পায়

তারপর কবিকঙ্কণ মুকুন্দ রামের বর্ণনা—

এ পাপ দারুণ মৃগ পবন জিনিঞা বেগ মোরে বিড়ম্বিতে কৈলা বিধি
জেন রাম বিড়ম্বিতে আইল কানন পথে মারীচ জেমন মায়া নিধি।[৫৬]

খ. লাউসেন আর কর্পূর ধবলকে গোলাহাটে বন্দি করেন সুরক্ষা। এই পর প্রার্থনা করেছেন লাউসেন :

তোমার মহিমা বড় শুন্যাছি পুরাণে। গোলোক তেজিয়া প্রভু রাখ লাউসেনে॥
যখন হারিল রাজা দ্রুপদনন্দিনী। তার লজ্জা নিবারণ করিলে আপনি॥
চুলে ধর্যা আনিল শকুনি দুঃশাসন। দ্রৌপদী উলঙ্গ করে দেখে সর্বজন॥[৫৭]

এরপর 'রাধার জীবন' কৃষ্ণ এসে পরিত্রাণ করলেন যেভাবে, লাউসেন কে সেভাবেই উদ্ধার করুন ধর্ম। সুরিক্ষাও কৃষ্ণকথা শোনেন—

পাঠক পুরাণ পড়ে বেউশ্যার কাছে। বৃন্দাবনে গোপীসনে কৃষ্ণচন্দ্র নাচে॥[৫৮]

গ. *বাশুলীমঙ্গল*-এর একাংশে দেবী দুর্গার সংসারের সংকট বর্ণিত। দেবী দুই সখী জয়া আর বিজয়াকে বলছেন :

প্রভাতে ভাতেরে কান্দে যুগল ছাওয়াল। প্রতিদিন কত আমি করিব উধার॥
উধার করিলে সখি শোধ নাহি যায়। কি করিব কহ সখি বল না উপায়॥[৫৯]

ঘ. *পঞ্চাননমঙ্গল*-এর একাংশে রামায়ণকথা এসেছে এইভাবে :

শোন সেতবন্ধের কথন
রঘুবংশে ইতিহাস শুনিলে কলুষনাশ জম সঙ্গে নাহয় দরশন।
ক্ষেতি মধ্যে মহাতেজা দশরথ মহারাজা আছিলেন অজধ্য নগরে
উৎপত্তি ভাস্কর বংশে বিষ্ণুগিয়্য তিন অংশে জনম হইলা তার ঘরে।[৬০]

উপরের চারটি উদাহরণ থেকে বোঝা যাচ্ছে মধ্যযুগে নানাভাবে পুরাকথা বাংলা সাহিত্যের ভিত্তি হিসাবে কাজ করেছে। কবিকঙ্কণ মুকুন্দরাম চক্রবর্তী কালকেতুর ভাবনায় রামায়ণের কাহিনী আনছেন রূপকল্প হিসাবে। পলায়নরত হরিণটি দেখে তার রামায়ণকথা মনে পড়ার কারণ এক মায়া-পরিস্থিতি। বনভূমিতে পশুপক্ষী মিলছে না। এরকম পরিবেশে পুরাকথা স্মৃতি বাহিত হয়ে আসছে। এ অবশ্য কুশলী কবির নির্মাণ। মায়ামৃগের প্রতি ধাবিত হয়ে রামের দুর্ভাগ্য নেমে এসেছে— সীতাহরণ করেছেন রাবণ। অন্যপক্ষে কালকেতুর পক্ষে মায়া-হরিণ তার দুর্ভাগ্য দূরই করেছে। তবু মুকুন্দরাম চক্রবর্তী কেন এই মায়াবী হরিণ প্রসঙ্গ আনলেন? কালকেতুর মধ্যে তিনি কি রামকে খুঁজছেন? নিশ্চয় নয়। কালকেতুর ভাবনায় বিষয়টি এনে সম্ভবত মুকুন্দরাম আসরকে নিয়ন্ত্রণ করতে চাইছেন। রামায়ণ কাহিনী তখন বাংলায় খুব পরিচিত ছিল না। যদি থাকত, তাহলে এর চরিত্রগুলির নাম তদ্ভব রূপে মিলত। কৃষ্ণকথার ক্ষেত্রে যেমন

ঘটেছে। কানু-রাই-আয়ান বাংলার সংস্কৃতিতে ধারা বাহিকভাবে পরিচিত ছিল বলেই কৃষ্ণ-রাধিকা-অভিমন্যু নামগুলি বদলে গিয়েছিল। রামায়ণের ক্ষেত্রে অন্তত 'লক্ষ্মণ' হতে পারত 'লাখন'।[৬১] বাঙালি তেমন তদ্ভব রূপ তো করেইছে— লক্ষ্মীন্দ্র হয়েছে লখাই বা লখিন্দর। মুকুন্দরাম রামায়ণ কথা শোনাবার অবকাশ গ্রহণের জন্যই ঐ রূপকল্পটি তৈরি করেছেন।

চতুর্থ উদাহরণে লোকায়ত পঞ্চাননকে রামায়ণকথার অনুষঙ্গে বিমিশ্র করছেন দ্বিজ শ্রীরঘুনন্দন। প্রাপ্ত পুথিটি ১২০২ বঙ্গাব্দে লিপি করা। অষ্টাদশ শতাব্দীর আগে এ-বই লেখা হয় নি।[৬২] ততদিনে বাংলায় রামকথা বেশ পরিচিত হয়ে গেছে। সেতু বন্ধের প্রসঙ্গ পেয়ে রামায়ণ কথা ঢুকিয়ে দিয়ে শ্রী রঘুনন্দন গায়েনদের সুযোগ করে দিয়েছেন। ততদিনে বাংলার সমাজ এই আদিকল্পকে সহজেই অনুভব করতে পেরেছে।

দ্বিতীয় উদাহরণ থেকে বোঝা যাচ্ছে লাউসেন কর্পূর ধবল কৃষ্ণকথার যে ভাষ্যের সঙ্গে পরিচিত ছিলেন তার সঙ্গে সুরিক্ষার প্রিয় ভাষ্য সামান্য পৃথক ছিল। দ্রৌপদী রাধানাথ কৃষ্ণকে একান্তে ভক্তি জানাচ্ছেন সংকট মোচনের লক্ষ্যে। এই ভাষ্য লাউসেন-এর। গণিকা সুরিক্ষাকে পুরাণ-পাঠক আর ছ-কুড়ি নাগর বাদ্যযন্ত্রের সাহায্যে সে গান বৃন্দাবন লীলার। নৃত্যগীতময়— ভক্তি আপেক্ষা জীবনের লাস্য সেখানে প্রধান। দুটি ভাষ্যই বাংলায় পরিচিত ছিল।

তৃতীয় উদাহরণ হরপার্বতীর পুরাকথাকে দুমড়ে মুচড়ে কেমন করে বাঙালি নিজস্ব করে আনতে চেয়েছে তার প্রমাণ। শিব এখানে ভিখারি। তার সঙ্গে পার্বতীর জীবন— স্বতত সংকটময়। এই পুরাকথা নিত্য বাঙালির মনকে বিমিশ্র বিহ্বল করেছে। আমাদের জাতিগত চৈতন্যের গভীর স্তরে এই পুরাকথা কেমন সর্বাঙ্গীণ আদিকল্পের জন্ম দিয়েছে, তার অজস্র প্রমাণ আছে। রবীন্দ্রনাথ এই বিষয়টিকে তাঁর বিশ্লেষণে এনেছেন বেশ সুন্দর ভাষা ও ভঙ্গিতে। দুটি উদাহরণ দিচ্ছি :

অ. বাংলাদেশে অত্যুগ্র চণ্ডী ক্রমশ মাতা অন্নপূর্ণার রূপ, ভিখারীর গৃহলক্ষ্মী রূপে, বিচ্ছেদ বিধুর পিতামাতার কন্যা রূপে— মাতা পত্নী ও কন্যা রমণীর এই ত্রিবিধ-মঙ্গল-সুন্দর রূপে— দরিদ্র বাঙালির ঘরে— রসসঞ্চার ঘটেছে।[৬৩]

আ. হরপার্বতীর কত কথা তাহা কোনো পুরাণে নাই, রাম সীতার কত কাহিনী যাহা মূল রামায়ণে পাওয়া যায় না, গ্রামের গায়ক-কথকদের মুখে মুখে পল্লীর আঙিনায় ভাঙা ছন্দ ও গ্রাম্যভাষার বাহনে কতকাল ধরিয়া ফিরিয়া বেড়াইতেছে।[৬৪]

এইভাবে বাংলা সাহিত্যে যা ঘটেছে তাকে বলতে হবে পুরাকথার বিস্তার। পাশ্চাত্য গবেষকরা এর তাৎপর্য ঠিকমতো বুঝতে পেরেছেন কিনা সন্দেহ। পাশ্চাত্য প্রভাবিত সাহিত্যিক বা সমাজ ব্যাখ্যা তারাও পুরাকথাকে ঠিক মতো বোঝেন নি বলেই মনে হয়। এ-বিষয়টির কথা একটু বলে না নিলে বাংলা পুরাকথা-কেন্দ্রিক সাহিত্য আলোচনা সম্পূর্ণ হবে না।

|| ৫ ||

৫.০.০. ঊনবিংশ শতাব্দীর বাংলাসাহিত্য পুরাকথা থেকে স্বেচ্ছা বিযুক্তি ঘটাতে চেয়েছে। পুরাকথাকে ইতিহাস দ্বারা প্রতিস্থাপিত করার সেই চেষ্টা, যুক্তি দিয়ে পুরাকথাকে বিচার করার প্রয়াস হয়ে দেখা দিয়েছে। আমাদের আলোচনার শুরুতে *কৃষ্ণচরিত্র*-র কথা লিখেছি। পাশ্চাত্য পুরাকথাবিদ্‌দের সম্ভব মতো ব্যঙ্গ করলেও বঙ্কিমচন্দ্র শেষ পর্যন্ত *কৃষ্ণচরিত্র*-তেও ইতিহাসের বিচার পদ্ধতিই প্রয়োগ করেছেন। ডেভিড কফ একে বলতে চান 'modern reinterpratation of the Hindu tradition'— হিন্দু ঐতিহ্যের আধুনিক ব্যাখ্যান।[৬৫] নব্য ব্যাখ্যানই। তার ফলে 'কৃষ্ণ চরিত্র' ছাড়াও রচিত হল মধুসূদনের রাম-বিরোধী রামায়ণ ভাষ্য— *মেঘনাদ বধ*

কাব্য, নবীনচন্দ্র সেনের কৃষ্ণ-নায়কের জাতীয় ভাষ্য— *প্রভাস-রৈবতক* ও *কুরুক্ষেত্র*। '*কৃষ্ণ চরিত্রে*' *যুক্তির ভারে পুরাকথার রহস্য নষ্ট হয়ে গেছে। কয়েকটি মাত্র উদাহরণ দেব, তাতেই* বোঝা যাবে আমাদের মন্তব্যের সত্যতা।

ক. 'বসুদেবকে কবি কল্পনা বলিতে হয়, বল— কিন্তু বাসুদেব কবি কল্পনা নহেন।'[৬৬]

খ. '(১) বৎসাসুর, (২) বকাসুর, (৩) অঘাসুর। প্রথমটি বৎসরূপী, দ্বিতীয়টি পক্ষিরূপী, তৃতীয়টি সর্পরূপী। বলবান্ বালক, ঐ সকল জন্তু গোপালগণের অনিষ্টকারী হইলে, তাহাদিগকে বধ করা বিচিত্র নহে। কিন্তু ইহার একটিরও কথা বিষ্ণু পুরাণে বা মহাভারতে, এমনকি, হরিবংশেও পাওয়া যায় না। সুতরাং অলৌলিক বলিয়া তিনটি অসুরের কথাই আমাদের পরিত্যাজ্য।' [৬৭]

গ. বস্ত্রহরণ-প্রসঙ্গে বঙ্কিমের ব্যাখ্যা ; 'লজ্জা স্ত্রীলোকের শেষ রত্ন। যে স্ত্রীলোক, অপরের জন্য লজ্জা পরিত্যাগ করিল, সে তাহাকে সব দিল। ....ইহার কিছুমাত্র সত্যতা নাই।'[৬৮]

ঘ. কৃষ্ণই গীতায় বলিয়াছেন, লোক শিক্ষার্থ তিনি কর্ম্ম করিয়া থাকেন। লোক শিক্ষক পরদারিক হইলে, পাপাচারী ও পাপের শিক্ষক হইলেন।'[৬৯]

উদাহরণ বাড়িয়ে লাভ নেই। আধুনিক রুচি, দৃষ্টিভঙ্গি, যুক্তিবোধ, কালচেতনা দিয়ে পুরাকথা ব্যাখ্যান অসম্ভব।

৫.১.০ মধুসূদন দত্ত *ব্রজাঙ্গনা* আর *মেঘনাদবধ কাব্য*-এ পুরাকথার পুনর্নির্মাণ করেছেন। তবে তাকে আদিকল্প নির্মাণ বলা যাবে না। আদিকল্প কিভাবে নির্মিত হয়? বিষয়টিতে এইখানে প্রবেশ করব না। মধুসূদনের *একেই কি বলে সভ্যতা?*-র কয়েকটি সংলাপ থেকে উনিশ শতকের পুরা-কথা-বিরোধী চেতনার সামান্য পরিচয় পাই। নবকুমারের বৈষ্ণব-বাবাকে কালী আত্মপরিচয় দেবার আগে নিজের সম্বন্ধে নবকুমারকে বলেছিল : ....'আমি বিয়রের— মুখটি—স্বকৃতভঙ্গ—সোনাগাছিতে আমার শত শ্বশুর— নানা শ্বশুর নয়, শত শাশুড়ীর আলয়, আর উইলসনের আখড়ায় নিত্য মহাপ্রসাদ পাই—'[৭০]

জয়দেবের গীতগোবিন্দ, শ্রীমদ্ভগবত গীতা তার কাছে 'শ্রীমতী ভগবতীর গীত,— আর বৃন্দা দুতীর গীত'।

বুড়ো শালিকের ঘাড়ে রোঁ-তেও দরিদ্র মুসলমান বিবাহিত ফতেমাকে যখন ডেকে পাঠায় ভক্তপ্রসাদ, তখন জনান্তিকে তার কথা : 'মন্দিরের মধ্যে — হ্যাঁ তা ভগ্নশিবে তো শিবত্ব নাই, তার ব্যবস্থাও নিয়েছি।'[৭১] নাটকটির আগে অন্য নাম ভেবেছিলেন মধুসূদন— 'ভগ্ন শিব মন্দির'। বাংলার আধুনিকতার চাপে ও টানে পুরাকথার জগৎ ভেঙে যাচ্ছিল। মধুসূদন তাকেই হয়তো ব্যক্ত করতে চাইলেন তাঁর প্রহসন দুটিতে।

৫.১.১ 'পুরাকথার যে আদল' পছন্দ তা নিয়ে 'আন্দোলন করা' 'আর যে আদল অপছন্দ' 'তা নিয়ে হৈ চৈ করা'— 'দুভাবেই রাজনীতি আর পুরাকথা মিলেমিশে যাচ্ছে ভারতে।' এরকম একটি সিদ্ধান্ত করেছি কিছুদিন আগে রচিত একটি প্রবন্ধে। 'কৌশল আর আন্দোলনের রীতি-নীতিতেও পুরাকথার ভূমিকা' দেখিয়েছি সেখানে।[৭২] লেখাটিতে সামাজিক-রাজনৈতিক প্রসঙ্গ বেশি। দেখিয়েছি সেখানে দক্ষিণভারতে ব্রাহ্মণ্য-বিরোধী আন্দোলন আর পশ্চিম ভারতের অচ্ছুৎ সমাজের আত্মমর্যাদা সম্মানের আন্দোলন কেমন করে পুরাকথার বিরোধিতা করতে চেয়েছে। পাশাপাশি মহাত্মা গান্ধী থেকে অধুনা ভারতীয় জনতা দল কেমন করে রামধুন থেকে রামজন্মভূমি পর্যন্ত বিভিন্ন রাজনৈতিক-আদর্শবাদে পুরাকথার সাহায্য নিয়েছেন। মহাত্মা জ্যোতি বা ফুলে, ড. আম্বেদকার কিংবা রামস্বামী নাইকার পুরাকথার বিরুদ্ধে বুদ্ধির সংগ্রাম পরিচালনা করেছেন।

উক্ত প্রবন্ধে দেখিয়েছিলাম বাংলাদেশের মুক্তি সংগ্রামের সময় কেমন করে পুরাকথা মিলে গেছে লোকমুখে প্রচলিত কিছু সমসাময়িক কবিতায়। উদাহরণ :

শুন বন্ধুগণ ২
দুর্য্যোধন, কলির ইয়াহিয়া।
পাকিস্তানের সর্বনাশ আনিল ডাকিয়া
মার্কিন যুক্তি নিয়া ২[৭৩]

উত্তরবঙ্গ থেকে পাওয়া একটি গানে পেয়েছি :

প্রথমে বন্দনা করি বাংলার জননী।
অসুর দলনে মাগো হয়ে সংহারিণী।।[৭৪]

সংহারিণী হবার সম্ভাবনা এই শেষ শব্দ— 'সিংহ বাহিনী'ও হতে পারে। পুরাকথার নির্মাণ বিনির্মাণের এই প্রণালী নিত্য চলমান। আমরা বলছিলাম সাহিত্যের কথা। সে কথায় ফিরে আসি।

৫.২.১ *চোখের বালি*-র চরিত্র আর কাহিনীতে পুরাকথার বুনট চমৎকার ধরা পড়ে। মহেন্দ্র শিব ; বিনোদিনী রাধা ; বিহারী কৃষ্ণ। এই আদিকল্প কখনো কখনো উপন্যাসের ঘটনাকে নিয়ন্ত্রিত করেছে বলেই মনে হয়। দুয়েকটি প্রসঙ্গ তুলে আনব।

(ক) বিনোদিনীর 'উর্ধ্বোৎক্ষিপ্ত ব্যাকুল মুখের চুম্বন নিবেদন' অস্বীকার করার পর বিহারী সম্পর্কে উপন্যাস-কথক যখন লেখেন ; 'ইহার তুলনায় বিহারী কী পাইয়াছে। এতদিন পর্যন্ত সমস্ত জীবন উৎসর্গ করিয়া সে কেবল প্রেম ভাণ্ডারের খুদ কুঁড়া ভিক্ষা করিতেছিল। প্রেমের অন্নপূর্ণা সোনার থালা ভরিয়া আজ একা তাহারই জন্য যে ভোজ পাঠাইয়াছেন, হতভাগ্য কিসের দ্বিধায় তাহা হইতে নিজেকে বঞ্চিত করিবে।'— প্রসঙ্গটি এখানে বিহারীর মনোভাবকে অবদমনের। কিন্তু 'প্রেম ভাণ্ডারের খুদ কুঁড়া ভিক্ষা' আর 'প্রেমের অন্নপূর্ণা সোনার থালা' ভরে দান করছেন— এই চিত্রে পুরাকথা উচ্ছল হয়ে উঠেছে।[৭৫]

(খ) মহেন্দ্রের সঙ্গে পশ্চিমে গিয়ে বিনোদিনী এলাহাবাদে রেল স্টেশনে বিলি-না-করা চিঠির বিজ্ঞপ্তি দেখে ঠিক করে নেয় কোথায় এসেছিল বিহারী। তাকে মনে মনে সঙ্গী হিসাবে পাবার চেষ্টায় সেখানে গিয়ে পৌছোলো বিনোদিনী। মহেন্দ্র ভাবল আজ হয়তো বিনোদিনীকে সে পুরোপুরি লাভ করবে। 'মহেন্দ্র চক্ষু অর্ধেক মুদ্রিত করিয়া কাব্যালোক হইতে গোখুর-ধূলি-জালের মধ্যে বৃন্দাবনের ধেনুদের গোষ্ঠে প্রত্যাবর্তনের হাম্বারব শুনিতে পাইল।' তার মনে হল বিনোদিনী যেন 'চিরন্তন গোপবালা'। 'সমস্ত বিরহ, সমস্ত বেদনা, সমস্ত যৌবনভার লইয়া তখনকার কাল হইতে অভিসার' শুরু হয়েছিল— 'কত গান কত ছন্দের মধ্য দিয়া এখনকার কালের তীরে' এসে পড়েছে সে। আজ 'এই জনহীন যমুনাতটের উপরকার আকাশে' তারই 'কণ্ঠস্বর' শুনতে পেল মহেন্দ্র। কিন্তু বিনোদিনী তো 'ফুলে ভূষিত হইয়া সে বসন্ত কালের পুষ্পভার লুণ্ঠিত লতাটির ন্যায় জ্যোৎস্নায় বিছানার উপর' অপেক্ষা করছিল অন্য কারো জন্য। মহেন্দ্র প্রশ্ন করেছিল উত্তর জুড়ে— 'সে বিহারী?' বিনোদিনী বলেছিল 'তাহার নাম তুমি মুখে উচ্চারণ করিয়ো না।'[৭৬] বিনোদিনী আর বিনোদ বিহারীর যে ছবিটি এখানে অঙ্কিত হল তাকে নিছক রূপক বলা যাবে না। একে বলতে হতে আদিকল্প— Archetypal image।

৫.২.২ শরৎচন্দ্রের লেখায় *শ্রীকান্ত* প্রথমপর্বে সাহজী সাপের ঝাপির পাশে নেশা করে শুয়ে থাকে। অন্নদাদিদি এসে হাজির হন— 'ভস্মাচ্ছাদিত বহ্নি'র মতো। হরপার্বতীর archetypal

image ছাড়া একে অন্যভাবে ব্যাখ্যা করা যায় না। পিয়ারী কেমন করে রাজলক্ষ্মীতে পরিণত হচ্ছে— কেমন করেই বারণরঙ্গিণী চণ্ডীর মতো উপন্যাসে উপস্থিত হচ্ছে অভয়া— এসবের মধ্যে ভারতীয় পুরাকথার উপাদানে শরৎসাহিত্য সমৃদ্ধ।

৫.২.৩. *আরণ্যক* উপন্যাসে বনবাসীদের আদিম মন তৈরি করেছে অপূর্ব অভিনব পুরাকথার আবহ— 'বন্য মহিষের রক্ষাকর্তা সদয় দেবতা টাঁড় বারো'-র কথা বিশেষভাবে মনে পড়ছে।[৭৭] এর সঙ্গে সত্যচরণের আর্য-মনসঞ্জাত দ্বন্দ্ব পরিস্থিতিটি চমৎকার ধরা পড়েছে। ভারতীয় পুরাকথার প্রবাহ আরণ্যক আদিবাসীদের পুরাকথার মুখোমুখি দাঁড়ানো এক দরদী দর্শকের অন্তর্দৃষ্টি মানবিকতায় কেমন করে ধরা পড়ল তার এমন চমৎকার বিচরণ— পারস্পরিক শ্রদ্ধা বাংলা সাহিত্যে আর আছে কিনা জানিনা। মহাশ্বেতা দেবীর *অরণ্যের অধিকারে*-এ আছে দ্বন্দ্বের মাত্রা— বিভূতিভূষণে আছে সমন্বয়ের সাধন।

৫.২.৪. হরিহর সর্বজয়ার সংসার— সেতো হর-পার্বতীর পুরাকথারই আভাসিত দিঙমণ্ডল। *পথের পাঁচালী*-তে উপরন্তু আছে অপুর চোখে দেখা পুরাকথার নির্মাণ ও বিনির্মাণের খেলাঘর। কখনো সেখানে দুর্গাকে দেখা যায় শেষ বারের মতো নিশ্চিন্দিপুর ত্যাগ করে চলে আসার পরিসরে : .....'দিদির অদৃশ্য স্নেহস্পর্শ ছিল নিশ্চিন্দিপুরের ভাঙা কোঠাবাড়র প্রতি গৃহকোণে— আজ সত্য-সত্যই দিদির সহিত চিরকালের ছাড়া ছাড়ি হইয়া গেল!....

দিদি এখনও একদৃষ্টে চাহিয়া আছে—।'[৭৮]

উত্তর-জীবনে দুর্গার এই একমেটে প্রতিমা কোনোদিন বিসর্জন হয়নি তার। 'নীলকুন্তলা সমুদ্র মেখলা ধরণীর' উপর— 'গতির পুলকে' আচ্ছন্ন অপুর চোখে ভাসত সে ছবি— বার বার, তাহার মনে পড়িত এক ঘন বর্ষার রাতে, অবিশ্রান্ত বৃষ্টির শব্দের মধ্যে এক পুরানো কোঠার অন্ধকার ঘরে, রোগশয্যাগ্রস্ত এক পাড়াগাঁয়ের গরীব ঘরের মেয়ের কথা'—[৭৯] *পথের পাচালী* আর *অপরাজিত* দেবী-প্রতিমার প্রত্ন অভিসারে বর্ণাঢ্য। নিশ্চিন্দিপুরের দুর্গা আর কাশীর অন্নপূর্ণার মাঝখানে এক সর্বংসহা স্নেহে আর্দ্র বেদনায় মলিন সর্বজয়া— বাঙালি জীবনে যাকে আগমনী আর বিজয়ার কান্নাহাসির দোলায় আমরা দেখতে পাই।

পথের পাঁচালী-তে আরও কিছু আদিকল্প আছে। একটি দেখাই। মহাভারত শুনে অপুর সব থেকে ভালো লাগে কর্ণকে। রথের চাকা তুলতে তুলতে অর্জুনের বাণে মৃত এই বীর— 'নিরস্ত্র অসহায়, বিপন্ন'। বেলা পড়লে মা যখন 'গৃহকার্যে' উঠে যায়, বাইরে দাঁড়িয়ে শিশু অপু অশ্বত্থ গাছটার দিকে চেয়ে থাকে— কখনো 'বৈকালের রাঙা রোদ' যখন 'অলসভাবে গাছটার মাথা'-য় আবছা অস্পষ্টতা নিয়ে আসে তখন তার মনে হয়— 'অনেক দূরে কোথায় এখনও মাটি' থেকে 'রথের চাকা দুইহাতে প্রাণপণে' কেবল টেনে তুলছেন সেই নিরস্ত্র বীর।[৮০] দরিদ্র কথকের পুত্র— মায়ের কাছ থেকে শোনা পুরকথাকে নির্মাণ— পুনর্নির্মাণের রহস্যে আশ্চর্য এক মানসবিহার অনুভব করতে থাকে। দরিদ্র অপুর জীবন সংগ্রামের ভূমিকা হয় এই আদিকল্প।

৫.৩.১ তারাশঙ্কর-এর পুরাকথা চেতনা আঞ্চলিক পরিসর আর নিম্নবর্গীয় চেতনার আবহে অন্য রকম হয়ে এসেছে। আঞ্চলিক পরিসরের এক পাশে গাঙ্গেয় বঙ্গের বৈষ্ণবান্দোলন। এক্ষেত্রে অন্তত তিনটি উপন্যাস— *রাইকমল*, *স্বর্গমর্ত* আর *রাধা*। *রাই কমলে*-র কমলিনী আর রঞ্জন-কে ঘিরে যে বৈষ্ণবতার উপাদান তা আদিকল্পের বহুমাত্রিকতায় উপস্থিত। 'মধুর মধুর বংশী বাজে কোথায় কোন কদমতলিতে'— এই গান কমলিনীর। এ-গান

তারাশঙ্করের নিজের লেখা। কখনো তার নায়িকা 'রসকলি আঁকার সময়' গেয়ে ওঠে মহাজন পদাবলী।

সখি বলিতে বিদরে হিয়া।
আমারই বঁধূয়া আন বাড়ি যায়
আমারই আঙিনা দিয়া।

স্বর্গ মর্ত্য-র ব্রজদাসী বাৎসল্যরসের সাধিকা। তার পুত্র দুলাল। নাম যাই হোক, দুলাল দুর্দমনীয়— অবৈষ্ণব স্বভাব তার। এ-নিয়ে ব্রজদাসীর বেদনা উপন্যাসের মর্ম। দুটি রচনাতেই বাংলার বৈষ্ণব সমাজে নারী সাধিকাদের ক্রমিক অধঃপাতের চিত্র। পুরুষপ্রধান সমাজ তাদের সাধনাকে বিকশিত হতে দেয় না। 'পথের মাঝেই পথ' হারাতে হয়। এই বাস্তবের ঘেরাটোপে দুটি উপন্যাসেই আদিকল্পের বিচিত্র আয়োজন।

৫.৩.২ *রাধা*-য় আছে দ্বিমুখী যাত্রা। মাধবানন্দের সন্ন্যাস— নারী বর্জিত সাধনা, বীরভূমের আখড়ার কৃষ্ণদাসী আর গোবিন্দমেহিনীর সংস্কারে তা সত্য নয়। জয়দেবের সাধনক্ষেত্র গীতগোবিন্দ-কীর্তনে দক্ষ কৃষ্ণদাসী আর গোবিন্দমোহিনী কীর্তন শোনাতে গিয়ে অপমানিত হয়ে ফিরল তারা, মাধবানন্দ তাদের তীব্র আঘাত দিলেন। এর ফলে শেষ অবধি কৃষ্ণদাসীর মনে জেগে উঠল প্রতিশোধের স্পৃহা। শেষ পর্যন্ত উন্মাদিনী হয়ে গেল কৃষ্ণদাসী। তখন বর্গীর হান্দামা চলছে। গোবিন্দমোহিনী চলে গেল রাজমহল পাহাড়ের কাছে— নিজস্ব আশ্রমে অন্য নামের আড়ালে। ইতিহাসের ঘনঘোর দুর্বিপাকে সে-এক বিচিত্র টানা ও পোড়েন। শেষ পর্যন্ত মাধবানন্দ স্বীকার করলেন— গোবিন্দমেহিনীই তার রাধা। গোবিন্দমোহিনী আর মাধবানন্দ আলিঙ্গনাবদ্ধ হয়ে মারা গেলেন। তৈরি হল লোক গান :

শ্যামের সঙ্গে বাঁশরীওয়ালী প্যারে যাচ্ছেন বৃন্দাবন।
ওসে গোপন মনের গুপ্ত বৃন্দাবন।
হোক না লক্ষ কুরুক্ষেত্র
বৃন্দাবনে অহরহ যুগল-মিলন।

এক পাশে কুরুক্ষেত্রের মতো দ্বন্দ্বঘন পরিবেশ অন্যদিকে মনের মধ্যে রাধার মতো গভীর সাধন সত্যকে জাগিয়ে তোলা— রাঢ় বাংলার বিস্তৃত ভূখণ্ডে এই বিষয়টি কৃষ্ণদাসী আর গোবিন্দমোহিনীর জীবনসাধনায় তুলে ধরেছেন তারাশঙ্কর। পুরাকথা কিভাবে জীবনে ছায়া ফেলে জীবন কেমন করে পুরাকথার চরিত্রের দিকে অভিসারিত হয় তার অনন্য উদাহরণ বাংলার পল্লীজীবনকে রসসিক্ত করেছে। তারাশঙ্করের রচনায় তার পরিচয় ধরা পড়েছে। আদিকল্পের এমন বহুমাত্রিকতা বাংলাসাহিত্যে খুব বেশি দেখি না।

৫.৩.৩ *কবি*-তেও গোবিন্দ এসেছেন। বসন আর নিতাইয়ের টানাপোড়েনে মৃত্যুর আগে পর্যন্ত উপলব্ধির এমন চরিতার্থতা দেখি না। এক সময় নিতাইকেই জ্বরতপ্ত বসন বলে— এ হল 'চন্দ্রাবলীর প্রেমজ্বর'। লেভিস্ট্রোস এই রকম পুরাকথার বিচলনের কথা ভাবেন নি। আদিকল্পের প্রস্তাবক ইয়ুঙ সামান্য ভেবেছেন বটে। এ যেন এক নিত্যনাটের অভিনয়। অভিনেতারা জীবনপাত করেন এই অভিনয় সূত্রে। বাস্তব জীবন আর কাল্পনিক জীবন একাকার হয়ে যায়। *কবি*-র তেরো পরিচ্ছেদে বসন বলেছে নিতাইকে : 'তুমি আমার কালো-মানিক। আমার মান রেখেছ তুমি, ছিদ্দ কুম্ভে জল রেখেছ— তুমি আমার কালো-মানিক।' আসলে, অশিক্ষিত হলেও ঝুমুর দলের বসনের মধ্যে কৃষ্ণদাসী, গোবিন্দমোহিনী, কমলিনী বা ব্রজদাসীর মতোই পুরাকথার শিক্ষা ছিল। তাকে তারা কোন দিন ভুলতে পারে নি। রাধা-চন্দ্রাবলীর মতো এক

কল্পনার প্রস্তাবে তারা কখন যেন প্রবেশ করে এই জীবন রহস্যে। এইভাবে পুরাকথার সত্য সাহিত্যের আদিকল্প গড়ে নিশ্চয়— পাশাপাশি এই জীবন পুরাকথার মধ্যে বাস্তবের অতিরিক্ত একটি স্তরে ঢুকে যেন পড়ে।

তারাশঙ্কর আর একটি পথ তৈরি করেছেন *কবি*-তে— পুরাকথার মধ্য দিয়ে সেই পথে মানসিক অভিসার হয় ঠিকই কিন্তু সমাজে যে বর্ণ-বর্গ-জাতি কাঠামোর অনড় অদৃশ্য চাপ বিদ্যমান, তাকে অস্বীকার করা সম্ভব হয় না। এদের প্রতিবেশ তাই বেদনার সারাৎসারকে নিত্য অনুভব করতে করতে তীব্র যন্ত্রণায় কাতর হতে থাকে। কল্পনার অধ্যাত্মযাত্রা আর বাস্তবের অস্পৃশ্য প্রতিবেশ— এই দ্বন্দ্বঘন পরিস্থিতি তাদের। নিতাই যখন বসনকে মৃত্যুর পূর্ব মুহূর্তে গোবিন্দের নাম নিতে বলেছে, তখন বসন প্রতিবাদ করেছে। গোবিন্দ তখন তার সাধনসঙ্গী কবিয়াল নয়— সর্বশক্তিমান। নিতাই সেই ঈশ্বরকে স্মরণ করতেই বলেছিল। প্রথমে রাজি হয় নি বসন— ফলে পুরাকথার জগৎ আদিকল্পের দৃষ্টান্তটি ভেঙে যায় যেন। পরমুহূর্তে অবশ্য বসন বলেছে; 'গোবিন্দ, রাধানাথ, দয়া করো আসছে জন্মে দয়া করো।' অর্থাৎ যে জীবননাট্য আধ্যাত্মিক - বাস্তবতার একমাত্র বিলাস— তাকে মায়িক বলে চিহ্নিত করে বসন আবার চলে যায় সেই মায়ার দুর্জ্ঞেয়তম স্তরে।

৫.৩.৪ ড. চন্দ্রমল্লী সেনগুপ্ত তাঁর *মিথ পুরাণের ভাঙাগড়া* গ্রন্থের একত্র লিখেছেন '*হাঁসুলী বাঁক*-এর কাহিনীর মূল উপজীব্য মিথ বনাম রিয়্যালিটির দ্বন্দ্ব।'[৮১] ঠিকই লিখেছেন চন্দ্রমল্লী। পূর্ববর্তী অনুচ্ছেদে এ-নিয়ে সামান্য আলোচনা করেছি। সেছিল শাস্ত্র অনুসারী পুরাকথার (অর্থাৎ যে পুরাকথায় কৃত্যানুষ্ঠানগুলিকে শাস্ত্রীয় বিধিসম্মত করার চেষ্টা হয়েছে।)— বৈষ্ণব পটভূমির আঞ্চলিক উপস্থাপনা। *হাঁসুলীবাঁকের উপকথা*-য় পুরাকথার মৌল বৈশিষ্ট্যটি উঠে এসেছে নিম্নবর্গীয় সমাজের প্রান্তিক অবস্থান থেকে। এ তাদের নিজস্ব নির্মাণ। এই নিজস্ব নির্মাণটি ভেঙে নতুন এক প্রত্যয়ী সৌধ তৈরি করেছে করালী। মিথ তার কাছে কোন তাৎপর্য তৈরি করে না। কর্তা বাবার থানে পুজো দেবার উদ্দেশ্য তার পায়রার মাংস খাওয়ার উপক্রমণিকা ; ভাঁজোর নাচ নির্ছক আনন্দের— সাহেব মেমদের কাছে দেখানোর উদ্দেশ্যে সমাজত্যাগী— কুলত্যাগী নরনারীর উদ্দাম হৈ চৈ মাত্র।

'রেল লাইনে আটাশ মাইল'-এর কথা তার জানা। এই জানা তথ্য, তার শক্তি। তাই বাঁশ বনে আগুন দিয়ে ধোঁয়া তৈরি করে চন্দ্রবোড়া সাপটিকে ফেলে দেবার সময় বনওয়ারীকে ডেকে তার অট্টহাসি আর অহঙ্কৃত উক্তি; 'ওই ওই দেখ, তোমার কর্তা পড়ছে বাঁশের ডগা থেকে।'[৮২] সুচাঁদকে ঝড়ের রাতে চীৎকার করে তেমনি অহঙ্কারের সঙ্গেই বলেছে করালী : 'বাবা ঠাকুরের ডিঙা উল্টাচ্ছে। বেলগাছ উপড়ে মুখ গুঁজে পড়ে আছে'।[৮৩] একে 'রিয়্যালিটি' বলা যেতে পারে— কিন্তু এটি শুধু বাস্তবের অভিঘাত নয়। এখানে একটি কালচেতনার পাশাপাশি তার আর্থ-সামাজিক মাত্রাও আছে; একই সময় পরিবেশে বাস করলেও সুচাঁদ-বনওয়ারী-পরম আর করালী আসলে বিভিন্ন কালের মাত্রা থেকে উঠে এসেছে: তারা একই ভূগোল আর সময়ের মানুষ কিন্তু এক কালের নয়। আর্থ-সামাজিক মাত্রাও তাদের ভিন্ন। লুণ্ঠনজীবী-পুলিশের খাতায় নাম থাকা— দাগী- রাঁইবেশে-নাচের লাঠিয়াল পরম আর কৃষি শ্রমিক— বন্দোবস্ত নেওয়া সামান্য জমির মালিক— কোশকেঁধে বনওয়ারী ভিন্ন বর্গের মানুষ। সুচাঁদের মধ্যে পুরোহিত বৃত্তি শুরু হবার আগেকার ডাকিনীবিদ্যার ইঙ্গিত— পুরাকথার সাহায্যে গোটা সমাজের শাসন প্রণালী তার করায়ত্ত; জাগতিক ঘটনার পুরাকথা-সম্মত ব্যাখ্যাদানের দ্বারা তার এই শক্তি সঞ্চারিত হয়। আর করালী? সে তো কাহার পল্লীর নতুন যুগের নটবর।

তার শক্তি শিল্প নগরের ব্যবস্থাপনায় সর্বাতিশায়ী— কুলিগ্যাঙে নগদ উপায়, মারওয়াড়ী ঋণদাতাদের সঙ্গে সম্পর্ক তৈরি করা, চন্দনপুরে মুসলমানদের শাসন করার বাহুবলও তার আয়ত্ত। এই শক্তির সঙ্গে চিরাচরিত পুরাকথা-শাসিত কাহারদের বোবা-বাস্তবের সম্পর্ক নেই— করালীর এই পুরাকল্প-বিরোধী প্রত্যয়টিকে কেবল 'রিয়্যালিটি' বলা উচিত নয়।

উপন্যাসের শেষে বনওয়ারী বুঝতে পারে 'হাসুলীবাঁকের দেবতা, উপকথার বিধাতা পুরুষ চলে গিয়েছেন।'[৮৪] সেই দেবতা, যার পাশ দিয়ে আসার সময় ভর দুপুর বেলায় হাত তালি দিয়ে আসার নিয়ম। বনওয়ারী যার ভেঙে যাওয়া বেদিটিকে 'বিলাতী মাটি' দিয়ে সারিয়ে দেবার চেষ্টা করেছে। যার বাহন অজগর বা চন্দ্রবোড়া সাপ— মা মনসার বেটি, আকাশের বিদ্যুৎচমকে যাকে দেখতে পেয়েছে খর-জিহ্বা বাসিনী বউ।[৮৫] হাততালি দিয়ে নেচেছে—বিশেষ করে যখন করালীর কোঠা বাড়িটি ধুলিসাৎ হয়েছে! সেই কর্তা বাবা চলে গেলেন। কনওয়ারীর মনে হল 'তবে আর কি রইল তাদের?'[৮৬]

৫.৩.৫. অন্য আরো কতক পুরাকথার সঙ্গে বনওয়ারী আর তার সমাজ পরিচিত। সে-সব বনওয়ারীর যতটা, তার চেয়ে যেন তার স্রষ্টার মানসিক প্রত্যয়কে স্পষ্ট করে। দুয়েকটি তেমনি পুরাকথার অনুগত আদিকল্পের ইঙ্গিত আনা যাক।

ক. ভাঁজোর রাত্রে বনওয়ারী পরমের ঘরে আগুন দিতে গিয়েছিল। পরমের ঘরের দিকেই গিয়েছিল-- মুখের অসংলগ্ন কথায় সেই রকম সংকল্প ছিল। অথচ বনওয়ারী নিজের ইচ্ছায় ওখানে যায় নি— ভুল করে রমণের ঘরে আগুন দিয়ে আসেনি। 'কে যেন তাকে ঘাড়ে ধরে নিয়ে গিয়েছিল।'[৮৭] আগুনকে পুরাকথার অন্যতম প্রধান উপাদান বলে মনে করেন আলোকচকরা। আদিম মানুষকে আগুন এনে দিয়েছিলেন প্রমেথিউস। তার ফলে দেবতারা তাকে চরম শাস্তি প্রদান করেন। অসুর নিধনের জন্য ভারতীয় পুরাণেও পবিত্র যজ্ঞাগ্নি বহন করেছেন পুরোহিত বর্গ তাদের যজ্ঞ পণ্ড করেছেন রাক্ষসরা। একাজ কখনও শিবও করেছেন। আগুনের পবিত্র শিখা থেকে জন্মেছেন পাঞ্চালী আর ধৃষ্টদ্যুম্ন, রাম-লক্ষ্মণ-ভরত-শত্রুঘ্ন। আগুনে পরীক্ষা দিয়েছেন সীতা। লঙ্কায় আগুন লেগে প্রথম এসেছে ধবংসের ইঙ্গিত।

জানে বনওয়ারী ইন্দ্র রাজা 'মেঘের সমুদ্রে আঘাত'— করেন বলেই বৃষ্টি নামে। সেই আঘাত ব্রজ্রের— 'ঝলকে ওঠে আগুনের লকলকানি।' কখনো এই আগুন আর বজ্র ইশারার মতো প্রযুক্ত হয়। কর্তা বাবা সেই ভাষায় তাঁর সাবধান বাণী শুনিয়ে থাকেন। 'কড় কড় করে বাজ' পড়ে, 'শিমুল গাছের মাথায়' 'বাবার দহের ধারে'— জ্বলে আগুন। তিনবার সাবধান বাণী না শুনে আটপৌরেরা ধরা পড়ে যায়।[৮৮]

খ. গোপালী বালাকে বনওয়ারী কুড়ি টাকা দিয়েছিল— দ্বিতীয় বিয়ের আগে। পরামর্শটি ছিল নিমতেলে পানুর। টাকায় লোকে পুত্রশোক ভোলে— এ তো সামান্য অভিমান। 'আজলা-ভরা ঝকঝকে টাকা'-য় মন ভুলেছিল গোপালীর।[৮৯] সে ছিল যুদ্ধের বাজার। দাম বাড়ছে হু হু করে। মাঠে কাজের ফাঁকে জল খাবার করার সময় গোপালীবালাকে পরামর্শ দেয় বনওয়ারী। ঐ টাকায় ধান আর আখ কিনুক। লাভ যা হবে তা থাকবে গোপালীর কাছেই। আর তারপর বনওয়ারীর অনুরোধ ; 'তবে যদি অভাব অনটন পড়ে, লোক তোমার কাছে চেয়ে খাবে। তুমিই তো ঘরের গিন্নী, তুমিই তো লক্ষ্মী আমার, তোমার দৌলতেই তো সব। আমি তো ভিখিরি, খাটি, খাই।'[৯০]

অন্নদামঙ্গল-এর কাহিনী— ভিখারি শিবের পুরাকথা কি বনওয়ারী জানত? নাকি এর মাধ্যমে তারাশঙ্কর চেয়েছেন নিম্ন বর্গের আঞ্চলিক নিজস্ব পুরাকথাকে সর্বভারতীয় পুরকথার

মোহনায় এনে ফেলতে? হয়তো তাই। তবে শৈব পুরাকথা বহুদিন ধরেই বাংলার নিম্নবর্গীয় সমাজে পরিচিত।

গ. আগুনের মতোই, পুরাকথার আর একটি উপাদান বন্যা। পৃথিবীর যে-কোনো পুরাণই প্লাবনের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট। *হাঁসুলীবাঁকের উপকথা*-য় এই উপাদানটি নানা ভাবে এনেছেন তা রাশঙ্কর। হড়পা বান আসার পর কোপাই তীরের কাহারদের জীবন বদলায়। তাদের ঘর বাড়ি সামান্য উঁচু হয়। বন্যা আসার ফলেই নীলকররা হারিয়ে যায়— আলোয় আলো এক ভরা-ভরাট নৌকা এসে ভেড়ে ; চৌধুরীদের পূর্বপুরুষ তা পান— জমিদারি কেনেন। এরপর আটপৌরে কাহাররা বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়ে— কোশকেঁধে কাহাররা রীতিমতো কৃষি শ্রমিককে পরিণত হয়। বনওয়ারীর ধারণা ছিল—'বান না এলে শেষ হবে না হাঁসুলী বাঁকের উপকথা। প্রলয়ঙ্কর বান।'[১১] একটু আরোপিত হলেও উক্ত তিনটি উপাদান তারাশঙ্করের পুরাকথা প্রয়োগের দৃষ্টান্ত। *হাঁসুলী বাঁকের উপকথা*-র সিদ্ধি তুলনা রহিত।

৫.৩.৬. *নাগিনী কন্যার কাহিনী* তারাশঙ্করের আশ্চর্য সৃষ্টি। এতে আছে মনসা পুরাকথার বিচিত্র সমাপতন। নাগিনী কন্যা আর শিরবেদেদের প্রজন্ম-বাহিত পুরাকথার আড়ালে আছে যৌন-প্রতিযোগিতা ঈর্ষা আর সংঘাতের বিচিত্র অভিজ্ঞান। এ-বিষয়ে আমরা বিস্তৃত আলোচনায় যাবো না। মনসা-পুরাকথার মধ্যেও আছে এই ধরনের যৌন-প্রতিযোগিতা, ঈর্ষা, স্খলন আর সংঘাত প্রসঙ্গ। *নাগিনী কন্যার কাহিনী* বাংলার নিজস্ব পুরাকথার বিস্তৃত বিশেষীকৃত আশ্চর্য প্রসারণ।

।। ৬ ।।

৬.০.০. মালার্মে সাহিত্য বিবেচনার জন্য একটি শব্দ প্রয়োগ করেন; 'Symbolisme'। তাঁর মতে এ হল সেই রকম বাদ্য যা কিনা উচ্চারণের সঙ্গে সঙ্গে তৈরি হওয়া অভিঘাত থেকে জন্ম নেয়। এ হল 'immediate impact of sounds।' অর্থের তাৎপর্য ক্রমেই এক অনন্ত সম্ভাবনার দিকে যাত্রা করে। মালার্মের ভাষায় 'the sense of a growing richness of meaning unlimited by denotation' ; এরকম পরিস্থিতি তৈরি হবার সময় শব্দ-অর্থের সমবায়ে গড়ে ওঠে 'symbolisme'. মালার্মের সন্ধেয় 'what does it mean?' শব্দটির অর্থ কী— তাৎপর্য কী?

নর্থ্রপ ফ্রাই (১৯১২-১৯৯১) মালার্মে-র মতো করে চলে যান তাঁর আদিকল্প (archetypal image)-এর বিবেচনায়। তাঁর মতে আদিকল্প হল শোনা বা শোনানোর অতিরিক্ত এক বস্তু বা সত্তার দিকে চলে যাওয়া, এ-হল চিত্রধর্মিতা। বিষয়টি বোঝাতে তিনি দুটি লাতিন শব্দ প্রয়োগ করেন— মাইথোস আর ডায়ানোইয়া। 'মাইথোস' হল তাই যা আমরা শ্রবণসূত্রে লাভ করি। ফ্রাই একে বলেছেন— 'The sense of movement caught by the ear'. 'ডায়ানোইয়া' হল দৃশ্যমানতা। 'the sense of simulteneity caught by the eye।' পুরালব্ধ আদিকল্প (archetypal image) মাইথোস আর ডায়ানোইয়া-র সমাপতিত ধ্বনিরূপ। মহাকালের গর্ভে-শব্দ-অর্থ আর চিত্রধর্মিতার মিলিত তাৎপর্যটি বুঝে নেবার জন্য আদিকল্পের বিষয়টিকে ধরতে চান নর্থ্রপ ফ্রাই।

৬.১.০. ১৯৫৭-তে নর্থ্রপ ফ্রাই-এর বিখ্যাত গ্রন্থ *অ্যানাটমি অফ ক্রিটিসিজম* প্রকাশিত হয়। তিনি দেখাতে চান নৃতত্ত্ব, মনস্তত্ত্ব আর সাহিত্য সমালোচনা ভিন্ন ধরনের মানবিকী বিদ্যা হলেও

এই তিনটিকে গভীরভাবে বিশ্লেষণ না করলে পুরাকথাকে বিচার করা যাবে না। তাঁর ভাষা '....the subjects of anthropology, psychology, and literary criticism are not yet clearly separated, and the danger of determinism has to be carefully watched.' [১২]

বস্তুত কানাডার বিশ্ববিদ্যালয়ে চারটি বক্তৃতার সূত্রে ফ্রাই দেখালেন সমাজ আর সংস্কৃতির ইতিহাসের সঙ্গে নৃতত্ত্বের খুব একটা পার্থক্য নেই— আর এগুলো এড়িয়ে সাহিত্য সমালোচনা অসম্ভব। তাঁর কথা ; 'Social and cultural history, which in anthropology is an extended sense, will always be a part of the context of criticism.'[১৩]

৬.১.১. আদিকল্পের কিছু সম্ভাব্য বিভাজন করেছেন নর্থ্রপ ফ্রাই। যথা ;

ক. অবিকৃত আদিকল্প। একে বলতে হয় 'undisplaced myth'। এর আবার দুটি রকম হতে পারে।

অ. ইচ্ছাকৃত (desirable)

আ. অনিচ্ছাকৃত (undesirable)।

খ. রোমান্টিকতার প্রয়োজনে আনা আদিকল্প।

গ. বাস্তবতার প্রয়োজনে আনা আদিকল্প।[১৪]

৬.১.২. এক ধরনের সাহিত্যে পুরাকথার গভীর প্রভাব দেখেছেন নর্থ্রপ ফ্রাই। এই ধরনের সাহিত্যকে সাধারণভাবে পুরাকথা-নির্ভর সাহিত্য বলতে চান তিনি— 'mytheopetic literature'[১৫] এই সাহিত্যে রোমান্টিক উপাদানের প্রভাব আছে বলে মনে করেছেন নর্থ্রপ ফ্রাই। আবার সেই সঙ্গে মনে করিয়ে দিয়েছেন রোমান্টিক সাহিত্যের সঙ্গে নায়ক-এর শক্তির তারতম্যে পুরাকথার পার্থক্য বিদ্যমান। পুরাকথায় নায়ক দৈবশক্তির অধিকারী ('in the myth proper he is divine') আর রোমান্টিক সাহিত্যের নায়ক মানুষ ('in the romance proper he is human')—তবে কাব্যগুণের বিবেচনায় দুই ধারাকেই সমধর্মী বলে ভেবেছেন ফ্রাই।

৬.২.১. নর্থ্রপ ফ্রাই যখন সংরূপের দিকে মনোযোগ দিয়ে আদিকরে সূত্রে বিচার করেছেন সাহিত্যসৃষ্টিকে তখন তাঁর প্রভাব পরবর্তী সমালোচনা সাহিত্যের উপর সব থেকে বেশি পড়েছে। প্রথমে নর্থ্রপ ফ্রাই-এর ভাবনার মৌলিকত্বটি একটি সারণীর দ্বারা দেখাতে পারি।

সংরূপ	সময়/ঋতু	সময়/দিন রাত্রি	নায়কের অবস্থা	নায়কের ভাব
রোমান্স	বসন্তকাল	সূর্যোদয়	জাগরণ	নায়কের জন্ম, প্রেরণা
কমেডি	গ্রীষ্মকাল	মধ্যাহ্ন	চলমান সচেতনতা	নায়কের বিজয়, উল্লাস
ট্র্যাজিডি	শরৎকাল	সূর্যাস্ত	দিবাস্বপ্নাচ্ছন্নতা বিপন্নতাবোধ	নায়কের
স্যাটায়ার	শীতকাল	রাত্রি	নিদ্রাবস্থা	নায়কের পরাজয়

প্রাথমিকভাবে মনে হতে পারে এ একটি আরোপিত প্রস্তাব মাত্র। মনে হয় ব্যাখ্যানের বুদ্ধিদীপ্ত ব্যাপ্তি আর গভীরতার চেয়ে এখানে পাঠককে বিহ্বল করার চেষ্টাই আছে। কিন্তু নর্থ্রপ এই ব্যাখ্যান থেকে যখন চলে যান নায়কের জীবন-চক্র অনুভব করার বিচারে তখন বিহ্বল না হয়ে পারি না। নায়কের জীবনচক্রটিকে কিভাবে বোঝা সম্ভব? বিশেষত পুরাকথার আলো ফেললে

তা বোঝার তিনটি চাবিকাঠি খুঁজে পাচ্ছেন নর্থ্রপ; যথা :

ক. বর্ষচক্রের বৃত্ত— ঋতু পরিবর্তনের মোহিনী মায়া ('yearly cycle of the season'),

খ. সূর্যের চলন বৃত্ত— দিনের নানা পর্ব চক্র ('the daily cycle of the sun') আর,

গ. রাত্রির স্বপ্ন-জাগরণের চক্র ('the nightly cycle of dreaming and awakening')।

এই বিবেচনা পদ্ধতিতে আমরা শুধু চমৎকৃত হই না খুঁজে পাই একটি অনন্য বিশ্লেষণী পাবঙ্গমতা।

৬.২.১. নর্থ্রপ ফ্রাই-এর প্রভাব গভীর ভাবেই পড়েছে সমালোচক মহলে। নতুন একশ্রেণীর সমালোচকের জন্ম হয়েছে। এদের বলা হচ্ছে পুরাকথা-নির্ভর সাহিত্যসমালোচক Myth Critics। জার্মান সমালোচক হানস ব্লুমেনবার্গ ছিলেন এইরকম একজন মিথ-সমালোচক। (তাঁর বই — *Work on Myth*][৯৭] ইংরেজি ভাষায় যাঁরা এই ধরনের সমালোচনা করেছেন, তাঁদের মধ্যে রবার্ট গ্রেভস (পশ্য : 'শ্বেতশুভ্র দেবী')[৯৮] রবার্ট ডি. ডেনহ্যাম (পশ্য : 'নিশ্চেতনার প্রতীক বিদ্যান')[৯৯]। অটো র‍্যাঙ্ক ('নায়কের জন্ম সংক্রান্ত পুরাকথা')[১০০] কিংবা কার্ল অব্রাহম ('স্বপ্ন আর পুরাকথা')[১০১] আগে লেখা হয়েছে। কিন্তু নর্থ্রপ ফ্রাই-এর মতো সাহিত্য সমালোচনায় তাঁদের প্রভাব পড়ে নি। নর্থ্রপ ফ্রাই পুরাকথার যে সংজ্ঞা দিয়েছেন— 'কৃত্য আর স্বপ্নের কথা বাহিত সংযোগ পদ্ধতি হল পুরাকথা' ('The union of ritual and dream in a form of verbal communication is myth')[১০২]— তাকে স্বীকার করে নিয়েছেন সবাই।

অনুষঙ্গ :

১. রবার্ট এ. সেগাল : *Myth A very Short Introduction*; অ'ফোর্ড ইউনিভার্সিটি প্রেস, ২০০৮; প্রথম সংস্করণ — ২০০৬ ; ২০ পৃ.।

২. সুধীরচন্দ্র সরকার সংকলিত : *পৌরাণিক অভিধান* ; এম. সি. সরকার অ্যান্ড সন্স প্রা. লি, কলকাতা ; চতুর্থ সংস্করণ, মাঘ, ১৩৮৮ ব.; প্রথম সংস্করণ, আষাঢ় ১৩৬৫ ব.; ৬ ৯ পৃ.।

৩. সেগাল : 14 পৃ.।

৪. তদেব।

৫. তদেব : 65 পৃ.।

৬. পশ্য xxiv - পরিচ্ছেদ : *The Myth of Adonis* এবং xxxviii-পরিচ্ছেদ : *The Myth of Osiris*. ১৯৫৪ সংস্করণ ; প্রথম সংস্করণ-১৯২২। লণ্ডন। ম্যাকমিলান অ্যান্ড কোং লি।

৭. জন পিনসেন্ট : *Greek Mythology* ; দি স্ট্যাণ্ডার্ড লিটারেচার কোম্পানি লি. ; ১৯৮১; প্রথম সংস্করণ ১৯৬৯; 41 পৃ.।

৮. তদেব।

৯. তদেব।

১০. ডি. ডি. কোশাম্বী : *Myth and Reality / Studies in the Formation of Indian Culture* ; পপুলার প্রকাশন প্রা. লি. ; বম্বাই, ১৯৮৩ ; 20 পৃ.।

১১. তদেব ; 21 পৃ.।

১২. তদেব, 'legend' শব্দটি সামান্য ভুলভাবে প্রয়োগ করেছেন কোশাম্বী। পুরাকথা legend নয়। legend-এর প্রধান চরিত্র (protagonist) অসাধারণ মানুষ — দেবতা নন। পশ্য: এম. এইচ. আব্রামস : *A Glossory of Literary Terms*; হারকোর্ট ইনডিয়া প্রাইভেট লিমিটেড, ২০০১; প্রথম সংস্করণ ১৯৪১; 170 পৃ.।

১৩. তদেব; 21 পৃ.।

১৪. *লোক রহস্যে*-র অন্তর্গত 'রামায়ণের সমালোচনা', 'কোন "স্পেসিয়ালের" পত্র'-র কথা সবাই জানেন। আমি শুধু দুটি উদাহরণ আনছি :

ক. রামায়ণের একটি কাণ্ডে যোদ্ধাদিগের কোন কথা না থাকায় তাহার নাম হইয়াছে "অযোদ্ধা কাণ্ড"। গ্রন্থকার তাহা 'অযোদ্ধা কাণ্ড" না লিখিয়া 'অযোধ্যা কাণ্ড" লিখিয়াছেন।

খ. 'আমাদিগের খ্রীষ্টের নাম হইতে ইহাতে প্রধান দেবতা কৃষ্ণের নাম নীত হইয়াছে'।

১৫. পশ্য : *কৃষ্ণচরিত্র* উক্ত পরিচ্ছেদ।

১৬. উইলিয়াম এ. হেভিল্যাণ্ড : *Anthropology*, ইউনিভার্সিটি ভারমন্ট ; মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র; ১৯৭৪; 525 পৃ.।

১৭. সেগাল : 6 পৃ.।

১৮. এম. এইচ. আব্রামস : *A Glossary of Literary Terms* ; হারকোর্ট ইণ্ডিয়া প্রাইভেট লিমিটেড ২০০১, প্রথম সংস্করণ ১৯৪১ ; 170 পৃ.।

১৯. বসন্ত কুমার ভট্টাচার্য সংকলিত : *বিজয় গুপ্তের মনসামঙ্গল* : বাণী নিকেতন; বরিশাল, রথযাত্রা, ১৩৩৫ সন। ২৩১ পৃ.।

২০. অচিন্ত্য বিশ্বাস সম্পাদিত : *বিপ্রদাস পিপিলাইয়ের মনসামঙ্গল* : রত্নাবলী; প্রথম সংস্করণ, 'এপ্রিল ২০০২ ; কলকাতা ; ২০৫ পৃ.।

২১. রাজশেখর বসু-কৃত সারানুবাদ : *বাল্মীকি রামায়ণ* ; এম. সি. সরকার অ্যান্ড সন্স প্রাইভেট লিমিটেড ; কলকাতা, ষষ্ঠ মুদ্রণ, ১১৭৮; প্রথম সংস্করণ — ১৩৫৩ ব. ; ৩১ পৃ.।

২২. আব্রামস ; 171 পৃ.।

২৩. মির্চা এলিয়াদ : *The Sacred and the Profane*, ইংরাজি অনুবাদ সংস্করণ ১৯৬৮; নিউইয়র্ক; প্রথম সংস্করণ ১৯৫৯ ; ৪২ পৃ.।

২৪. তদেব।

২৫. দীনেশচন্দ্র সেন : *ঘরের কথা ও যুগ সাহিত্য*; জিজ্ঞাসা; কলকাতা ; দ্বিতীয় সংস্করণ জুন ১৯৬৯ ; প্রথম সংস্করণ, ১ বৈশাখ ১৩২৯ ব.; ৮—৯ পৃ.।

২৬. এলিয়াদ : *The Sacred and the Profane* : উক্ত, 82 পৃ.।

২৭. ব্রনিসল ম্যালিনোস্কি : *Magic, Science Religion and other Essays*, ডবল ডে অ্যাঙ্কর বুকস, নিউইয়র্ক ; ১৯৪৮ ; ৯৪ পৃ.।

২৮. তদেব ; ৯৭ পৃ.।

২৯. তদেব ; ১০১ পৃ.।

৩০. তদেব।

৩১. পশ্য : প্রবাল দাশগুপ্ত-এর সংকেত ভাষণ (key note address) : "Revisting the Archimedean Structuralist"; এসিয়াটিক সোসাইটি, কলকাতা ; ডিসেম্বর, ২০০৮ ; 18 পৃ.।

৩২. অচিন্ত্য বিশ্বাস সম্পাদিত : *বিপ্রদাস পিপিলাইয়ের মনসামঙ্গল* ; উক্ত ১৬৩ পৃ.।

৩৪. তদেব, ১৮৫ পৃ.।

৩৫. বটতলার সংস্করণ। 'শ্রী অনাথ বন্ধু কাব্য ব্যাকরণতীর্থ সংগৃহীত ও পরিশোধিত'। *দ্বিজ বংশীকৃত শ্রী শ্রী পদ্মা পুরাণ* ; বেণীমাধব শীল'স লাইব্রেরি; কলকাতা; প্রকাশকাল দেওয়া

নেই। ২৫১ পৃ.। 'ভণিতা আছে : সুকবি নারায়ণ দেবের সুরস পাঁচালী। পয়ার প্রবন্ধে বলি এক লাচাড়ি॥'

৩৬. ড. মিহির চৌধুরী কামিল্যা : *রাঢ়ের গ্রাম দেবতা* ; বর্ধমান বিশ্ববিদ্যালয় ; বর্ধমান; দোলপূর্ণিমা ১৩৯৫ ব., ১২ মার্চ ১৯৮৯ ; ২৫ পৃ.।

৩৭. তদেব ; ৩১ পৃ.।

৩৮. তদেব ; ৫৫ পৃ.।

৩৯. তদেব ; ৩৮ পৃ.।

৪০. তদেব ; ৫৫ পৃ.।

৪১. তদেব ; ১৭০ পৃ.।

৪২. তদেব ; ১৮০ পৃ.।

৪৩. লেভি স্ট্রোস : *Totemism* ; মূল ফরাসি গ্রন্থ ১৯৬২; ইংরেজি অনুবাদ ১৯৬৪ লণ্ডন, 175 পৃ.।

৪৪. এ ব্যাপারে দেখুন বর্তমান আলোচকের প্রবন্ধ—'পুরাণ কথার আলোয় বুদ্ধদেব বসুর মহাভারতের কথা'; আসাম বিশ্ববিদ্যালয় বাংলা বিভাগ আয়োজিত আন্তর্জাতিক আলোচনা চক্র 'শত বর্ষে বুদ্ধদেব'-তে উপস্থাপিত প্রবন্ধ দ্রষ্টব্য, ১১-১৩ নভেম্বর ২০০৮।

৪৫. *পৌরাণিক অভিধান* ; উক্ত; ১২০ পৃ.।

৪৬. তদেব ; ৫৭৪ পৃ.।

৪৭. লেভিস্ট্রোস : *Totemism* ; উক্ত, 175 পৃ.।

৪৮. সেগান : উক্ত ; 93 পৃ.।

৪৯. জেমস স্ট্রাচি (সম্পাদিত, অনুবাদিত) : *Standard Edition of the Complete Psychological Works of Sigmund Freud* : হোগার্থ প্রেস অ্যাণ্ড ইনস্টিটিউট অফ সাইকো-অ্যানালিসিস, লণ্ডন, ১৯৫৩ (প্রথম রচনা / সংস্করণ ১৯১৩) ; 262 পৃ.।

৫০. তদেব ; 262-63 পৃ.।

৫১. সিগমুণ্ড ফ্রয়েড : *Moses and Monotheisen* ; মূল জর্মন থেকে অনুবাদ ক্যাথেরিন জোনস; দি হোগার্থ প্রেস লিমিটেড ; লন্ডন; ১৯৫১; মূল বই ১৯৩২; 130 পৃ.।

৫২. তদেব, 131 পৃ.।

৫৩. পশ্য; *On the Relation of Analytical Psychology to Poetic Art; Contribution to Analytical Psychology* (1928)-গ্রন্থভুক্ত।

৫৪. জে. এ. কুডন ; *A Dictionary of Literary Terms* : ডাবলডে অ্যান্ড কোম্পানি নিউ ইয়র্ক, ১৯৭৬।

৫৫. ড. সুকুমার সেন সম্পাদিত ; *কবিকঙ্কণ মুকুন্দ বিরচিত চণ্ডীমঙ্গল*, সাহিত্য আকাদেমি; দ্বিতীয় সংস্করণ ১৩৯২ পৌষ; প্রথম সংস্করণ ১৩৮২ বৈশাখ; ৫২ পৃ.।

৫৬. তদেব; ৫৩ পৃ.।

৫৭. অক্ষয় কুমার কয়াল সম্পাদিত : *রূপরাম চক্রবর্তী বিরচিত ধর্মমঙ্গল*; ভারবি; কলকাতা এপ্রিল ১৯৯২; প্রথম সংস্করণ ১৯৮৬। ১৬৭-১৬৮ পৃ.।

৫৮. তদেব, ১৬৮ পৃ.।

৫৯. শ্রীসুবল চন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় ও শ্রী শুভেন্দু সুন্দর সিংহরায় সম্পাদিত ; *কবিচন্দ্র মুকুন্দ মিশ্র প্রণীত বাসন্তীমঙ্গল বা বিশাল লোচনীর গীত* ; বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষৎ ; কলকাতা; চৈত্র ১৩৬৮ ব.। ১১ পৃ.।

৬০. শ্রীপঞ্চানন মণ্ডল সম্পাদিত : *দ্বাদশ মঙ্গল*; সাহিত্য প্রকাশিকা, ৫ম খণ্ড ; বিশ্বভারতী,

শান্তিনিকেতন; সেপ্টেম্বর, ১৯৬৬। ২৬৫ পৃ.।

৬১. যেমন মিথিলা-ত্রিহুতে হয়েছে. 'রামলাখন' সেখানে সুপরিচিত নাম।

৬২. 'পঞ্চানন মঙ্গলের' পুথিতে 'বহু আধুনিক স্থান নাম' আছে বিশেষত 'কলিকাতা শহরের কথাও উল্লেখ' করেছেন কবি। সুতরাং এ লেখা অর্বাচীন।— এই মত প্রচার করেছেন অধ্যাপক আশুতোষ ভট্টাচার্য : *বাংলা মঙ্গল কাব্যের ইতিহাস* ; উক্ত; ৯৫৯ পৃ.।

৬৩. রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর : 'বঙ্গভাষা ও সাহিত্য'; 'বঙ্গদর্শন', শ্রাবণ, ১৩০৯ ব.।

৬৪. ঐ : ''সাহিত্য সৃষ্টি''; 'বঙ্গদর্শন', আষাঢ়, ১৩১৪ ব.।

৬৫. ডেভিড কফ : *British Orientalism and the Bengal Renaissance (The Dynamics of Indian Modernism) 1773–1835,* ফার্মা কে. এল. মুখোপাধ্যায়, কলকাতা, ১৯৬৯ ; ৩ পৃ.।

৬৬. *কৃষ্ণ চরিত্র*; প্রথম খণ্ড ; অষ্টম পরিচ্ছেদ — 'কৃষ্ণের ঐতিহাসিকতা'।

৬৭. তদেব; দ্বিতীয় খণ্ড ; চতুর্থ পরিচ্ছেদ — 'কৈশোর লীলা'।

৬৮. তদেব, দ্বিতীয় খণ্ড ; সপ্তম পরিচ্ছেদ— 'ব্রজগোপী— ভগবত'।

৬৯. তদেব।

৭০. *একেই কি বলে সভ্যতা?*— প্রথমাঙ্ক, প্রথম গর্ভাঙ্ক।

৭১. *বুড় শালিকের ঘাড়ে রোঁ*— দ্বিতীয় অঙ্ক, দ্বিতীয় গর্ভাঙ্ক।

৭২. অচিন্ত্য বিশ্বাস : ''পুরাকথার মৌলিক আবেগ''; *ধর্ম* ও *জন সংস্কৃতি* শীর্ষক গ্রন্থভুক্ত ; সম্পাদক; অভিষেক রায়; বার্তা প্রকাশনী; কলকাতা; ২০০৮; ৩৫ পৃ.।

৭৩. হেটো ছড়ার মতো এই কবিতার শিরোনাম ছিল 'বঙ্গ বন্ধু মুজিবুরের বুদ্ধি ও পাক ভারত যুদ্ধ'।

৭৪. এ গানের নাম : 'নির্যাতিত বাঙালি বা মুজিবের ডাক'।

৭৫. *চোখের বালি*; ৩৭ পরিচ্ছেদ।

৭৬. ঐ; ৫১ পরিচ্ছেদ।

৭৭. *আরণ্যক*; পেপার ব্যাক সংস্করণ; মিত্র ও ঘোষ; কলকাতা, ষোড়শ মুদ্রণ, ১৪০৮ ব.। ১৬৩ পৃ.

৭৮. *পথের পাঁচালী* ; পেপার ব্যাক সংস্করণ; মিত্র ও ঘোষ; কলকাতা; ষোড়শ মুদ্র; ১৪০৫ ব.। ১৪২ পৃ.।

৭৯. তদেব ; ১৪২ পৃ.।

৮০. তদেব ২৯ পৃ.।

৮১. *মিথ পুরাণের ভাঙাগড়া*; পুস্তক বিপণি; কলকাতা; এপ্রিল ২০০১; ১১৭ পৃ.।

৮২. *হাঁসুলিবাঁকের উপকথা*; প্রথম পর্ব, দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ

৮৩. তদেব; পঞ্চম পর্ব, সপ্তম পরিচ্ছেদ।

৮৪. তদেব।

৮৫. তদেব, তার কথা সেদিন: 'বাহনের মাথায় চেপে নাচো বাবা। নক নক করুক তোমার বাহনের জিভ!' দ্বিতীয় পর্ব, ছয় পরিচ্ছেদ।

৮৬. তদেব; পঞ্চম পর্ব, সপ্তম পরিচ্ছেদ।

৮৭. তদেব; পঞ্চম পর্ব; ষষ্ঠ পরিচ্ছেদ।

৮৮. তদেব; পঞ্চম পর্ব; চতুর্থ পরিচ্ছেদ।

৮৯. তদেব; পঞ্চম পর্ব ; প্রথম পরিচ্ছেদ।

৯০. তদেব; পঞ্চম পর্ব; তৃতীয় পরিচ্ছেদ।

৯১. তদেব; শেষ পর্ব।

৯২. নর্থ্রপ ফ্রাই : *Anatomy of Criticism,* প্রিন্সটন, নিউ জার্সি প্রিন্সটন ইউনিভার্সিটি প্রেস; ১৯৫৭, 108 পৃ.।

৯৩. তদেব, 110 পৃ.।

৯৪. তদেব; 139-140 পৃ.।

৯৫. সমরেশ বসুর 'শাম্ব'-কে এই পর্যায়ের ব্যাখ্যা করা যায়। উপন্যাসের এই রূপ খুবই বিরল।

৯৬. তদেব; 188 পৃ।

৯৭. এঁর বইটি জর্মন ভাষায় প্রকাশিত হয় ১৯৭৯, ইংরেজিতে অনুবাদ হয় ১৯৮৫। হানস মনে করেন পুরাকথা গল্প নয়— ক্রিয়া ('a work')। এই ক্রিয়াশীলতা মানব জীবনকে বাস্তবতার নতুন ক্ষেত্রে বিবেচনায় আনতে চায়— 'the function of myth is to help human beings copewith the inexarability of given reality.'

৯৮. *The White Goddess* (১৯৬১)।

৯৯. 'Symbolism of the unconscious'— প্রবন্ধ, রবার্ট ডি. ডেন হ্যাম-এর সম্পাদিত গ্রন্থ : Northrop Frye on Culture and Literature, শিকাগো বিশ্ববিদ্যালয়; শিকাগো ; ১৯৭৮; 84-94 পৃ.।

১০০. *The Myth of the Birth of the Hero* ; নিউইয়র্ক, ১৯১৪।

১০১. *Dreams and Myths* ; নিউইয়র্ক, ১৯১৩।

১০২. *Anatomy of Criticism ;* 106 পৃ.।

সংস্কৃতিচর্চায় জঁর ক্রিটিসিজম একটি সংক্ষিপ্ত তুলনামূলক আলোচনা

পরিচয় পাত্র

'জঁর ক্রিটিসিজম' টার্মটির উদ্ভবের পূর্বেই সাহিত্যে 'জঁর'-এর ধারণা বিষয়ে প্রধানত ক্লাসিকাল সাহিত্যালোচনায় কিছু চর্চা হয়েছিল। আরিস্তোতল-এর *পোয়েটিক্স* এবিষয়ে নিঃসন্দেহে একটি দিকচিহ্ন। তাঁর সমকালীন দুই প্রধান জঁর 'ট্র্যাজেডি' ও 'এপিক'-এর পৃথক বৈশিষ্ট্যগুলি নিয়ে তিনি তুলনামূলক আলোচনা করেছেন, প্রতিতুলনা শেষে 'ট্র্যাজেডি'-কে মহত্তর আর্ট ফর্ম রূপে ঘোষণাও করেছেন। তাঁর 'কমেডি'-বিষয়ক আলোচনা অত্যন্ত সংক্ষিপ্ত, এই নির্দিষ্ট জঁরটি সম্পর্কে তাঁর চিন্তাভাবনার অত্যন্ত সংক্ষিপ্ত বিবরণ আমাদের কাছে পৌঁছেছে। উত্তরাধুনিক সময়ের অন্যতম শ্রেষ্ঠ semiotics বিশেষজ্ঞ উমবের্তো একো আরিস্তোতলের কমেডির ধারণাকে ভরকেন্দ্র স্থাপন করে রচনা করেছিলেন তাঁর *নেম অব দ্য রোজশীর্ষক* এক উত্তরাধুনিক থ্রিলার। মনে রাখা ভাল যে আরিস্তোতল-পরবর্তী যুগেও সাহিত্যে জঁর চর্চা নেহাত সীমিত নয়। হোরেস-এর *আর্স পোয়েটিকা* অথবা লনজাইনাস-এর *অন দ্য সাব্লাইম* সে কথাই বলে। ট্র্যাজেডিকে একটি জঁর রূপে গ্রহণ করে তার নির্দিষ্ট বৈশিষ্ট্যসমূহ, বিশেষত, 'ইউনিটি'-র ধারণার গ্রহণ/বর্জন বিষয়ে, ট্র্যাজেডির বিশুদ্ধতা রক্ষার ইস্যুতে ইংরেজি সাহিত্যের নিওক্লাসিকাল যুগে চাপানউতোর চলেছে বিস্তর। জঁর ক্রিটিসিজম সাহিত্য সমালোচনার প্রধান স্রোতঃপথ থেকে পরিত্যক্ত হয়েছে দীর্ঘকাল পরে; টেক্সটুচুয়াল ক্রিটিসিজম— সাংস্কৃতিক মেটিরিয়ালিজম— রিডার রেসপন্স পাঠকৃতির যুগে তার গুরুত্ব কমে এসেছে।

সংস্কৃতিচর্চা (Culture Studies)-র প্রায় প্রতিটি ক্ষেত্রেই জঁর বা গোত্র (জঁর-এর সঠিক অনুবাদ করা গেল না) সমালোচনার একটি বিশেষ স্থান রয়েছে। সাহিত্যসমালোচনা, দৃশ্যশিল্প-বিষয়ক আলোচনা বা চলচ্চিত্রচর্চায় এই ধারাটির অবদান অনস্বীকার্য। প্রাক্-উত্তরাধুনিক সময়ের এই সমালোচনারীতি পরবর্তীকালের সমালোচনা ক্ষেত্রেও নিজের গুরুত্ব বজায় রেখেছে। সংস্থানবাদ (Structuralism), চিহ্নার্থতত্ত্ব (Semiotics) ও সাংস্কৃতিক নৃতত্ত্ব (Cultural Anthropology)-র মতো বহু ঘরানার তত্ত্বালোচনাতেই জঁর ক্রিটিসিজম-এর এক নিজস্ব ভূমিকা রয়েছে।

চলচ্চিত্রচর্চার ক্ষেত্রে ক্লাসিক্যাল চলচ্চিত্রতত্ত্বের একটি প্রধান অঙ্গ হল জঁর ক্রিটিসিজম (অন্যগুলি যথাক্রমে রিয়ালিস্ট চলচ্চিত্রতত্ত্ব, ফর্মালিস্ট তত্ত্ব এবং 'Auteur' সমালোচনারীতি)। প্রধানত ফ্রান্স, ব্রিটেন ও মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে উদ্ভূত এই তৃতীয় রীতি এবং 'Auteur' সংস্থানবাদ-এর বিপ্রতীপ চিন্তন থেকেই জঁর ক্রিটিসিজম আসে, সাহিত্য ও চলচ্চিত্রে জঁর-এর ধারণার প্রভূত সাদৃশ্য বিদ্যমান। তবে, যে-কোনো সমালোচনা রীতির মতোই, এই ধারাটিরও সীমাবদ্ধতা প্রচুর। সে-প্রসঙ্গে পরে আসা যাবে।

ব্যুৎপত্তিগত দিক থেকে 'জঁর' শব্দটি ফরাসি। নিকটতম সম্পর্কযুক্ত শব্দ (David Bordwell ও Kristin Thompson সম্পাদিত *Film Art : An Introduction* অনুযায়ী) 'genus', যা বস্তুত একটি জীববিদ্যাবিষয়ক টার্ম। সাধারণত জীববিজ্ঞানীরা সমধর্মী (DNA এর বিচারে) উদ্ভিজ্জ বা প্রাণীজ অস্তিত্বগুলিকে একটি 'genus'-এর অন্তর্ভুক্ত করেন। লেখক/চিত্রনির্মাতা, প্রকাশনা/চলচ্চিত্র ইন্ডাস্ট্রি, সমালোচক এবং পাঠক/দর্শকের বিচারে কিছু (মুদ্রিত/film) text-কে একটি গোত্রের অন্তর্ভুক্ত করা হয়। জঁরের ধারণা ভীষণভাবেই সময়-নির্দিষ্ট (temporal), কেননা সময়ের সঙ্গে সঙ্গে বিভিন্ন জঁর-এর পরিবর্তন ঘটে। নূতনতর জঁর-এর সৃষ্টি হয়। উত্তরাধুনিক শিল্পকর্মের ক্ষেত্রে বিভিন্ন জঁর-এর সংমিশ্রণ বা কোনো প্রচলিত জঁর-এর অন্তর্ঘাত (Subversion) খুবই প্রচলিত পদ্ধতি।

জঁর-এর সামাজিক ভূমিকা (Social Function), বিশেষত পপুলার কালচার-এর নানা ক্ষেত্রে (জনপ্রিয় সাহিত্য বা হলিউড-এর মতো), খুবই কৌতূহলোদ্দীপক। ক্লদ লেভি স্ত্রোস-এর সাংস্থানিক নৃতত্ত্ব অনুসারে এই জাতীয় সামাজিক ভূমিকা অনেক ক্ষেত্রেই প্রথা, রীতিনীতি- নির্ভর (Ritualistic)। মার্কিন চলচ্চিত্রের বিশেষজ্ঞরা এগুলির বিষয়ে বিস্তারিতভাবে আলোকপাত করেছেন তাঁদের গবেষণায়।

জঁর-এর সামাজিক ভূমিকা বিষয়ে অপর একটি মত হল যে জঁর চলচ্চিত্র প্রধানত অন্তেবাসী নানা সাামাজিক গোষ্ঠী (নারী এবং মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের জাতিগত সংখ্যালঘু আফ্রো-আমেরিকান, হিস্পানিক, এশীয় অভিবাসী প্রভৃতি সম্প্রদায়) বা নিম্নবর্গীয় মানুষ সম্পর্কে নিজস্ব অভিমত দেয়। কাহিনি এবং 'Iconography' (এই টার্মটির ব্যাখ্যায় পরে আসছি)— এই গোষ্ঠীগুলিকে সংখ্যাগরিষ্ঠ জীবনদর্শনের পক্ষে উদ্‌বেগজনক রূপে চিহ্নিত করে। এরপর ছবির ঘটনাক্রম এই উপাদানগুলিকে অঙ্গীভূত করে সেগুলিকে পরাভূত করে। Robin Wood বা Noel Carroll-এর মতো সংস্কৃতি-গবেষকদের এ-বিষয়ে অবদান প্রচুর।

ফ্রান্স-এ সংস্থান / উত্তর-সংস্থানবাদের সুবর্ণযুগ ও *Tel Quel* নামক চিহ্নার্থতত্ত্ব ও মাওবাদ বিষয়ক-পত্রিকাটির রমরমার আমলে 'কাহিয়ে দ্যু সিনেমা'-র তরুণ তুর্কিরা চিত্রনির্মাতা/Auteur (দুটি ঠিক প্রতিশব্দ নয়, দ্বিতীয়টির বহুবিধ Connotations বিদ্যমান)-এর ভূমিকার উপর সবিশেষ গুরুত্ব আরোপ করে জঁর ক্রিটিসিজমকে অনেকটাই অপ্রাসঙ্গিক করে তোলেন, তদবধি ইউরোপীয় শিল্পচেতনায় 'Author'/'Auteur' সর্বদাই এক সুবিধাজনক অবস্থান পেয়েছেন, স্টাইল বা জঁর-নির্ভর আলোচনার তুলনায়। ফুকো ও বার্ত-এর 'author–function' সম্পর্কে সমীক্ষণমূলক আলোচনা সত্ত্বেও এই মৌরসিপাট্টায় আঘাত হানতে ইউরোপীয় চলচ্চিত্রকে ডগমে চিত্রনির্মাতাদের আবির্ভাব পর্যন্ত অপেক্ষা করতে হয়েছিল।

পল রোথা কুড়ির দশকে এক রচনায় মার্কিন পপুলার কালচার-এর (প্রধানত পপুলার ফিকশন ও হলিউডে-এর ছবির কথাই হচ্ছে) 'টাইপ' ধর্মী কাজের তীব্র সমালোচনা করেন। এখানে রোথা 'টাইপ' বলতে জঁর-কেই বুঝিয়েছেন। কালচার স্টাডিজ নামক স্বতন্ত্র ডিসিপ্লিন-

এর উত্থানের ফলে যখন উচ্চ ও নিম্ন সংস্কৃতির সংস্থানগত ভেদাভেদ বিষয়ে আলোচনা খুবই প্রাসঙ্গিক হয়ে পড়ল তখন থেকেই জঁর ক্রিটিসিজম ইউরোপ-এ কিছুটা জমি ফিরে পায়। মার্কিন সংস্কৃতির 'Set pattern'-গুলি mass-কে কতটা আকর্ষণ করে এবং এই প্যাটার্নগুলির শনাক্তকরণের মাধ্যমে জনতা তাদের পছন্দের জঁরটিকে কীভাবে চিনে নেয় সে-বিষয়ে গুরুত্বপূর্ণ আলোচনা করেছেন Colin McArthur, তাঁর *Underworld USA* শীর্ষক রচনায় (এটি মূলত পপ ফিকশন/ফিল্ম-টেক্সট-এর পাঠক/দর্শকের মানসিকতা বিষয়ক ও জঁর-এর আলোচনায় রিডার-রেসপন্স ক্রিটিসিজম ব্যবহারকারী)। 'জঁর' বা গোত্রের ধারণার সঙ্গে 'কনভেনশন', 'আইকনোগ্রাফি', 'টাইপ', 'মোড', 'সাইক্‌ল', 'সিরিজ' বা 'ফর্মুলা' প্রভৃতি টার্মগুলি খুবই প্রাসঙ্গিক। জঁর ছবির/সাহিত্যের 'recurent pattern' বা symbolic image গুলিই সাধারণভাবে 'আইকনোগ্রাফি' নামে পরিচিত। আর যে বিশেষ পরিস্থিতি ও প্রতিবেশে এক বিশেষ গোত্রভুক্ত ছবির/সাহিত্যের প্রাধান্য দেখা যায়, তাকে একটি 'cycle' রূপে চিহ্নিত করা হয়।

বিশিষ্ট ফরাসি নন্দনতাত্ত্বিক অন্দ্রে বাজাঁ জনসংস্কৃতিতে জঁর-এর সদর্থক ভূমিকা নিয়ে আলোচনা করেছেন। জঁর এর ধারণা এবং পৃথক পৃথক জঁর-এর সংজ্ঞায়ন এক সমস্যান্বিত বিষয়। বিষয়বস্তু, স্টাইল, পাঠক-প্রতিক্রিয়া, এবং আরও কিছু বৈশিষ্ট্যের সমন্বয়ে একটি জঁর-কে শনাক্ত করা হয়। 'গ্রুপিং'-এর এই সমস্যা ও নির্দিষ্ট জঁর-এর নির্দিষ্ট সংজ্ঞার অভাব একটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয়। David Bordwell এ-বিষয়ে আলোচনা করতে গিয়ে রুশ ফর্মালিস্ট বরিস টমাশেভস্কি (Boris Tomashevsky)-র উদ্ধৃতি দিয়েছেন, "(n)o firm logical classification of genres is possible. Their demarcation is alaways historical, that is to say, it is correct only for a specific moment of history ; apart from this they are demarcated by many features at once, and the markers of one genre may be quite different in kind from the markers of another genre and logically they may not exclude one another."

হলিউড-এর স্টুডিও যুগে মার্কেটিং ও বিজ্ঞাপনের কারণে জঁরগত বৈশিষ্ট্যগুলি গুরুত্বপূর্ণ হয়ে ওঠে। 'Auetor'/'Auteur'-এর ক্ষয়িষ্ণু পরিস্থিতিতে জঁর-এর তাত্ত্বিক ব্যাখ্যা ও individual শিল্পকর্মের সঙ্গে তার সম্পর্ক বিষয়ে আলোচনা হতে থাকে। জঁর-কে সাধারণত দুটি ভাগে বিভক্ত করা যায়—তাত্ত্বিক ও ঐতিহাসিক। রুশ ফর্ম্যালিস্ট Tzvetan Todoror তাঁর *The Fantastic* গ্রন্থে এই বিভাজন-পদ্ধতিটি বিশ্লেষণ করেছেন। তাত্ত্বিক জঁর-কে তাঁরা একটি 'ক্যাটিগরি' রূপে গণ্য করেছেন যা আর্ট ফর্মটির মূল বৈশিষ্ট্যগুলির এক তত্ত্বনির্ভর পরিমার্জন থেকে উদ্ভূত এবং কোনো বিশেষ শিল্পকর্ম-নির্ভর নয়। উদাহরণস্বরূপ Todorov প্রাচীন গ্রিকরা যেভাবে কথনপ্রণালীর তারতম্য অনুসারে কোনো কাহিনিকাব্যকে তিনটি পৃথক জঁর-এ ভাগ করতেন তার উল্লেখ করেছেন (*Poetics* কথক-কথিত, চরিত্র-কথিত ও মিশ্র এই তিনটি বিভাজনের কথা বলে)। এই উদাহরণে কথনক্রিয়ার পারফরর্মেন্সকে 'literary activity'-র অন্যতম উপাদান হিসেবে গ্রহণ করা হয়েছে। সিনেমাকেও একইভাবে বিভিন্ন বিশেষীকৃত জঁর-এ বিভক্ত না করে রেপ্রেসেন্টশনগত কারণে 'কাহিনিধর্মী তথ্য ভিত্তিক' ও 'বিমূর্ত' (নন রেপ্রেসেন্টেশনাল) এই তিনটি ভাগে বিভক্ত করা যায়।

ঐতিহাসিক জঁর-এর ব্যাখ্যার ক্ষেত্রে জঁর ক্রিটিসিজম-এর পরিধি অনেকটাই বিস্তৃততর। তিন ধরনের বিশ্লেষণ এই কনসেপ্ট টির ক্ষেত্রে কার্যকর। প্রথমত, জঁরতন্ত্র (generic system)-এর সংজ্ঞা, যা বিশেষীকৃত জঁরগুলিকে একটি অপরটির সঙ্গে সংযুক্ত করে তোলে। দ্বিতীয়ত,

বিশেষ জঁরগুলির অন্তর্লীন লজিক ও রীতিনীতির ব্যাখ্যা এবং তৃতীয়ত, বিশেষ ছবিগুলির ব্যাখ্যা কোন একটি বা একাধিক জঁর-এর সঙ্গে সম্পর্কযুক্তভাবে। জঁর এবং বিশেষীকৃত শিল্পকর্ম এই তন্ত্রের দুই মূল উপাদান। Frederic Jameson এদের সম্পর্ক ও 'literary' জঁর প্রসঙ্গে মন্তব্য করেছেন, "(they) are wholly distinct in nature from each other, the one the generic system— being a constellation of idea ; relationships, but the other— the work itself— being a concrete verbal composition. We must understand the former as constituting something like an environment for the latter, which emerges into a world in which the genres form a given determinate relationship among themselves, and which then seeks to define itself in terms of mat relationship."

Steve Neale জঁর-এর ঐতিহাসিক দিকটির ফর্মালিস্ট ধারণাকে বিশ্লেষণ করতে গিয়ে বিভিন্ন আন্তঃ-মিডিয়া প্রভাবের কথা বলেছেন, যথা পপুলার সাহিত্য, সংগীত, vandeville থিয়েটার, প্রেস ও কমিকস্ এবং সিনেমায় উপস্থিতির পরিবর্তনশীল প্যাটার্ন-এর প্রভাব। ন্যারেটিভ ও স্পেক্‌ট্যাকল-এর সম্পর্ক জঁর থেকে জঁর-এ বদলায়। Neale-এর মতে "part of the very function of genres is precisely to display a variety of the possibilities of the semiotic processes of mainstream narrative cinema while simultaneously containing them as genre."

জঁর ক্রিটিসিজম-এর প্রধান সম্ভাবনা তার ক্লোজারহীন 'openendedness', প্রধান সমস্যা তার শনাক্তকরণগত সংশয়ের। সংবাদপত্রের সমালোচনা, জার্নাল কমেন্ট্রি, টিভি-রেডিওর ধারাভাষ্যকারদের আলোচনা, দর্শক/পাঠকের রেসপন্স, এবং চলচ্চিত্রের ক্ষেত্রে 'স্টারডম' জঁর-এর ক্যাটিগরি হয়ে ওঠাকে প্রভাবিত করে থাকে। এ-বিষয়ে বাজাঁ বা ওয়ারশোর মতো তাত্ত্বিকদের জটজটিল আলোচনায় প্রবৃত্ত না হলেও জঁরতন্ত্রের 'inclusive' ও 'exclusive' প্রবণতার বিষয়ে আলোকপাত বাঞ্ছনীয়। জঁর-এর সেম্যান্টিক (semantic) সংজ্ঞা ভীষণভাবেই 'inclusive', তা বিভিন্ন শিল্পকর্মকে একটি সংজ্ঞার্থে অন্তর্ভুক্ত করার পক্ষপাতী। অপরপক্ষে 'Syntactic' সংজ্ঞা অনেকাংশে 'exclusive', তা খুব স্বল্পসংখ্যক কাজকেই সংজ্ঞার্থের অন্তর্ভুক্ত করে। বিশেষ ও নির্দিষ্ট শিল্পকর্মের সঙ্গে একটি জঁর-এর সম্পর্ক নির্ধারণ প্রসঙ্গে Jonathan Culler তাঁর *Structuralist Poetics* গ্রন্থে 'পঠন-প্রক্রিয়া' (operations of reading)-র উপর সমধিক গুরুত্ব আরোপ করেছেন। Culler-এর মতে যে-কোনো পাঠ প্রক্রিয়াই পটভূমি, প্রেক্ষিত ও একটি সাধারণ রেফারেন্স-পয়েন্টকে ধরে এগিয়ে চলে। জঁর ক্রিটিসিজমও এই পথেই হাঁটে, তার ক্ষেত্রে প্রেক্ষাপট হল সেই generic system বা তন্ত্র।

Linda Williams তাঁর 'Body Generes'- বিষয়ক এক প্রবন্ধে ('Film Bodies : Gender, Genre and excess', *Film Quarterly*, গ্রীষ্ম, ১৯৯১) দেখিয়েছেন ক্ল্যাসিক্যাল ন্যারেটিভ-এর একমাত্রিক, কার্যকারণবাদ সমন্বিত 'linearity'-কে ভাঙতে বিভিন্ন মেলোড্রামাটিক 'excess'-কে ব্যবহার করে জঁরতন্ত্র। তিনি পারস্পরিক সম্পর্কযুক্ত তিনটি জঁর, যথাক্রমে পর্নোগ্রাফি, হরর আর্ট ও মেলোড্রামাকে নিয়ে আলোচনা করেছেন। এদের একটি 'excess' রূপে যৌনতা, একটি হিংসা এবং অপরটি আবেগকে ব্যবহার করে তাদের নিজস্ব 'টার্গেট অডিয়েন্স'-কে উত্তেজিত করে তোলে (টার্গেট যথাক্রমে অ্যাক্টিভ পুরুষ, অ্যাক্টিভ-প্যাসিভ বয়ঃসন্ধির কিশোর ও প্যাসিভ নারী)। এইভাবেই ক্লোজারসমন্বিত ক্ল্যাসিকাল ন্যারেটিভ-এর কার্যকারণবাদকে subvert করে জঁর।

২.

কয়েকটি কেস স্টাডি

হলিউড-এর তিন প্রধান জঁর হল ওয়েস্টার্ন, মিউজিক্যাল ও হরর ফিল্ম। জার্মানি-র 'Heimatfilm' মফস্‌সলি শহরজীবনের আলেখ্য। মেক্সিকান 'Cabaretera' ঘরানার ছবি গণিকাদের কাহিনিসমন্বিত মেলোড্রামা। হলিউড-এর অনেক ছবিই জঁরগত ক্যাটেগরাইজেশনকে সমস্যায়িত করে, বিশেষত উত্তরাধুনিক হলিউড। অ্যানিমেটেড ছবি 'বিউটি অ্যান্ড দ্য বিস্ট', মিউজিক্যালও বটে, আবার জাপানি কার্টুন 'আকিরা' একটি কল্পবিজ্ঞান-ছবি।

কিছু জঁর স্বাভাবিকভাবেই নির্বাচনগত সমস্যাকে বাড়িয়ে তোলে। 'Bugsy Malone' একটি গ্যাংস্টার মিউজিক্যাল যাতে শিশু অভিনেতারা প্রাপ্তবয়স্কদের ভূমিকাগুলিতে রূপদান করে, আবার স্ট্যানলি কুব্রিক-এর সুবিখ্যাত *2001 : A Space Odyssey* শুরু থেকেই কল্পবিজ্ঞান জঁর-এর প্রথাগুলিকে লঙ্ঘন করে যায়।

বিশিষ্ট 'Film Noir' '-বিশেষজ্ঞ অ্যান্ড্রু স্পাইসার তাঁর *European Film Noir* (২০০৭) বইটিতে এই বিশেষ জঁরটিকে এক ধারণাগত কৃষ্ণগহ্বর (Conceptual Black Hole) রূপে চিহ্নিত করেন। তাঁর মতে স্টাইলগত, ন্যারেটিভগত ও থিম্যাটিক এই তিন ধারায় আলোচনা করেও এই গোত্রের ছবিকে শনাক্ত করা মুশকিল। এর কোনো একটি বা একাধিক বৈশিষ্ট্য অন্য ধারার অনেক ছবিতেও থাকতে পারে। আবার এই গোত্রের কোনো একটি ছবিতেও বেশ কিছু বৈশিষ্ট্যের অভাব থাকতে পারে।

গ্রিক চিত্রনির্মাতা থিও অ্যাঞ্জেলোপুলস-এর প্রথম পূর্ণদৈর্ঘ্যের কাহিনিচিত্র *Reconstruction* *ফিল্ম নোয়ার* কাঠামোটিকে গ্রহণ করে। এতে অপরাধ (হত্যা) ও তার তদন্ত (ফ্ল্যাশব্যাক-এর উপর নির্ভর করে) বিষয়বস্তু। অপরপক্ষে পরিচালক এ ছবির কাহিনিবিন্যাস করেন ইস্‌কাইলাস এর একটি ধ্রুপদি নাটকের ফর্ম্যাট-এ। একটি ধ্রুপদি ট্র্যাজেডির মর্ডানিস্ট অ্যাডাপ্টেশনকে বিন্যস্ত করা হল *ফিল্ম নোয়া-র* গঠনশৈলীতে এবং এইভাবেই ছবিটি শ্রেণিবিভাজনকে বাধাদান করে।

এর একটি ক্লাসিক উত্তরাধুনিক দৃষ্টান্ত হল ফরাসি নবতরঙ্গের নন্দিত ও নিন্দিত কালাপাহাড় জঁ-লুক গোদার-এর প্রথম ছবি *ব্রেথলেস*। ছবির বিরামহীন জাম্পকাট ও ন্যারেটিভ-এর মৃত্যু উত্তরসংগঠনবাদী ছবির জন্ম ঘোষণা করল মন্দ্রকণ্ঠে। ছবির নায়কের বেশকিছু 'gestures' বিভিন্ন 'generic' ছবির স্টাইলাইজেশন-এর প্রতিধ্বনি মাত্র আর ছবিটিও হয়ে ওঠে এক উত্তরাধুনিক 'pastiche' প্রায়। *ফিল্ম নোয়া-র* প্রথার ভিতর থেকে তাকে subvert করেন গোদার, মূল জঁরটির প্যারডি করেন। নায়ক (জঁপল বেলমন্দো) অনুকরণ করে তার প্রিয় *নোয়া* অভিনেতাকে আর একটি দৃশ্যে এক প্রেক্ষাগৃহের দেয়ালের পোস্টারে তার দিকে নির্নিমেষ তাকিয়ে থাকেন তার সেই 'ম্যাটিনি আইডল' স্বনামধন্য হামফ্রি বোগার্ট। তবু গোদার-এর নায়ক *নোয়া-র* নায়ক হয়ে উঠতে পারে না, থেকে যায় এক উত্তরাধুনিক 'failed hero' মাত্র।

বাংলা কথাসাহিত্য সমালোচনায় জঁর ক্রিটিসিজম খুব সমাদৃত বিষয় নয়। আভাঁ-গার্দ রচনাশৈলীর কাণ্ডারীরা মুখ্যত কমলকুমার, অমিয়ভূষণ, দীপেন্দ্রনাথ, সন্দীপন, উদয়ন, অরূপরতন, বাসুদেব দাশগুপ্ত ও তাঁর হাংরি জেনারেশন-এর সতীর্থদের রচনা তাঁদের অনেকের স্বকৃত 'generic confusion'-এর জন্যই সমালোচকের কাছে কৌতূহলোদ্দীপক। সুবিমল মিশ্রের 'অ্যান্টি'-নভেলগুলির রচনারীতি, মুদ্রণ, প্রকাশনার ধরন ও তাঁর স্বভাবসিদ্ধ হিউমার প্রত্যেকটিই

উপন্যাসের রীতিনীতির তিক্ততম অন্তর্ঘাত। এঁদের নিজস্ব পাঠককুলের রেসপন্স ও মানসিকতা বিস্তৃততর সমীক্ষার কাজ হলে তা গবেষণায় একটি বিশেষ স্থান পাবে। সত্তরের লেখকদের একটা বড়ো অংশ, যাঁরা বৃহৎ সংবাদপত্র গোষ্ঠীর পরিবর্তে প্রান্তিক অণু পত্রিকাগুলিতে নিজস্ব পাঠক তৈরির চেষ্টায় দীর্ঘকালব্যাপী লড়ে গেছেন, তাঁদের অনেকের রচনাই এ-ব্যাপারে বিশ্লেষণযোগ্য। স্বপ্নময় চক্রবর্তীর কল্পবিজ্ঞানধর্মী বেশ কিছু রচনা বা সাধন চট্টোপাধ্যায়ের জাদুবাস্তবধর্মী উত্তরাধুনিক টেক্সট *সাতপুরুষ ডট্‌কম্* জঁর সমালোচনার ক্ষেত্রে নানা সমস্যা উপহার দিতেই পারে।

আজকের ভারতীয় লেখকদের অনেকেই কুন্দেরা প্রভাবিত। কুন্দেরার প্রথম জীবনের ভাষায় রচিত টেক্সটগুলি ফিকশনাল ন্যারেটিভ-এর ফর্মাট-এ স্থাপন করে প্রভূত দার্শনিক স্পেকুলেশন ও পর্নোপ্রতিম যৌনবর্ণনা। এর যে-কোনো একটির generic বিশ্লেষণই চমৎকার কেস স্টাডির বিষয় হতে পারে।

নবারুণ ভট্টাচার্যের *কাঙাল মালসাট* শুধু ন্যারেটিভ/নন-ন্যারেটিভ-এর মধ্যবর্তী দেওয়ালটিকেই এক ঝটকায় উড়িয়ে দেয় না, অনবরত স্টাইলিস্টিক পরিবর্তনের মাধ্যমে উপন্যাসের সংজ্ঞাটিকেই সমস্যায়িত করে চলে। মিখাইল বুলগাকভ-এর *মাস্টার অ্যান্ড মার্গারিটা*-র সঙ্গে নবারুণের রচনার জঁরগত সাদৃশ্য খুঁজে পেয়েছেন কোনো কোনো সমালোচক, উপন্যাসের একাংশে বুলগাকভ-এর উল্লেখও রয়েছে।

এছাড়া *হারবার্ট*-কে একটি অতীব উল্লেখযোগ্য কেস স্টাডিরূপে বিবেচনা করা যেতে পারে। কোনো একটি নির্দিষ্ট টেক্সট পাঠে জঁর ক্রিটিসিজমের ভূমিকা আলোচনাসাপেক্ষ। নবারুণ ভট্টাচার্যের বহুস্তরীয়, বহুমাত্রিক উত্তরাধুনিক উপন্যাস *হারবার্ট*-এর যে-কোনো একটি পৃষ্ঠা /পরিচ্ছেদের প্রথমাংশটিকে ধরা যাক। উনিশ শতকীয় ইংরেজি উপন্যাসে পরিচ্ছেদের প্রারম্ভে এপ্রিগ্রাফ-এর ব্যবহার আদিযুগের বাংলা উপন্যাসে, বিশেষত, বঙ্কিমী গদ্যে প্রায়শঃই পরিলক্ষিত হয়। নবারুণ তাঁর পরিচ্ছেদ শুরু করেন একই কায়দায়, বেশিরভাগ ক্ষেত্রেই যে উদ্ধৃতি তিনি চয়ন করেন তা বিস্মৃতপ্রায় পূর্বসূরীদের (রঙ্গলাল বন্দ্যোপাধ্যায় প্রমুখ)। এরপরে পরিচ্ছেদের ভাষা কাঠামোটি বিন্যস্ত হয় উনিশ শতকীয় সাধু বাংলা ও আধুনিক স্ল্যাং রক ল্যাঙ্গোয়েজের সংমিশ্রণে। এই আশ্চর্য নির্মাণকৌশল, রচনারীতির অতীতকে স্মরণ প্রচেষ্ট (এপিগ্রাফ ব্যবহারের মাধ্যমে ও চয়নে), জঁরগত সংমিশ্রণ ও সংশয় সৃজনে *হারবার্ট* (বা সমগোত্রীয় অপর কোনো নবারুণিক রচনা) জঁর সমালোচনা বিষয়ে এক স্মরণযোগ্য উদাহরণ হয়ে ওঠে। ফুকো তাঁর সুখ্যাত গবেষণাটিতে আলোকপ্রাপ্তির যুগে স্যামুয়েল টিউক ও ফিলিপে পিনেল তাঁদের 'disciplinary' কাজের মাধ্যমে যুক্তি ও উন্মাদনার মধ্যের সংযোগটিকে কীভাবে বিনষ্ট করেন ও উন্মাদনার আধুনিক ধারণাটির জন্ম দেন সে-বিষয়ে বিস্তৃত আলোচনা করেছেন। ঔপনিবেশিক ভারতে উন্মাদনা ও ইউরোপীয় যুক্তিবাদের সংঘাতের ইতিহাসটি কিছু অন্যপ্রকার (J. H. Mills-এর *Madness, Cannabis and Colonialism* দ্রষ্টব্য)। নবারুণ তাঁর রচনায় শুধু যুক্তির ভাষাকে হিংস্রভাবে আক্রমণই করেননি, উপন্যাস নামক অষ্টাদশ শতকীয় ইউরোপীয় মাধ্যমটির যৌক্তিক কাঠামোটিকেই বর্জন করেন। তাঁর রচনা তাই এই গোত্রের অন্য রচনা (অষ্টাদশ শতকীয় ফরাসি বিশ্বকোষ-প্রণেতা দিদেরো-এ *Raveau's Nephew* থেকে আধুনিক লেখাপত্র পর্যন্ত) থেকে অনেকটাই স্বতন্ত্র। এই টেক্সট জটিল, বহুস্তরীয় ও বহুমাত্রিক, ত্রৈলোক্যনাথ থেকে বহু প্রাচীন রচনারীতির উদ্ধৃতি সম্বলিত এক উত্তরাধুনিক 'pastiche' তো বটেই।

উপসংহার

জঁর ক্রিটিসিজম-এর নটেগাছটি তাই মুড়োয় না। রিডার-রেসপন্স-এর নানা আধুনিক দিক ও দর্শক/পাঠক মানসিকতার সাইকোঅ্যানালিটিক বিশ্লেষণ তাকেও প্রভাবিত করে। ১৯৯০-এর দশকের মার্কিন চলচ্চিত্রের ভায়োলেন্স সমসময়ের স্কুলপড়ুয়াদের দ্বারা সংঘটিত ভয়ংকর হোমিসাইডগুলিকে প্রভাবিত করেছিল কিনা সে-বিষয়ে বিতর্ক আছে। একি মার্কিন জীবনদর্শনের প্রতিচ্ছবি নাকি অস্ত্রের সহজপ্রাপ্যতা ও দারিদ্র্য সমস্যা সমাধানে ব্যর্থ সরকার ও মিডিয়া-র জনতাকে বিভ্রান্ত করার কৌশল?

আবার উত্তর ৯/১১ সময়ে হিংসার বিরুদ্ধে কিছু আন্দোলন হলেও তার অব্যবহিত পরেই সেদেশে 'ওয়র ফিল্ম'-এর প্রভূত জনপ্রিয়তা লক্ষ করা যায়। একি আন্তর্জাতিক রাজনীতিতে আমেরিকার দীর্ঘকালীন স্বকৃত বিচ্ছিন্নতারই ফসল? এসব প্রশ্ন ভবিষ্যতের সংস্কৃতি-গবেষক ও জঁর বিশেষজ্ঞদের জন্য সঞ্চিত রইল।

সহায়ক গ্রন্থপঞ্জি :

১। David Bordwell ও Kristin Thompson সম্পাদিত *Film Art : An Introduction* নিউ ইয়র্ক : ম্যাকগ্র-হিল, ২০০৮, pp. 107–128.

২। Tom Ryall রচিত 'Genre and Hollywood', জন হিল ও পামেলা চার্চ গিবসন সম্পাদিত *The Oxford Guide to Film Studies*-এর অন্তর্গত (অক্সফোর্ড : OUP. ১৯৯৮), pp. 327–341.

৩। লিন্ডা উইলিয়াম-এর *ফিল্ম কোয়ার্টারলি* পত্রিকা-র ১৯৯১-এর গ্রীষ্ম সংখ্যার প্রবন্ধ 'Film Bodies : Gender, Genre and Excess'.

৪। Jonathan Culler-এর *Structuralist Poetics* (লন্ডন : রুটলেজ, ১৯৭৫)।

৫। Fredirc Jameson-এর *New Literary History* পত্রিকার বিশেষ সংখ্যায় প্রকাশিত 'Magical Narratives : Romance as Genre' শীর্ষক প্রবন্ধ।

৬। Tzvetan Todorov-এর *The Fantastic* (Ithaca, Ny : Cormell University Press, 1975).

৭। B. K. Grant সম্পাদিত দুই খণ্ডে বিন্যস্ত *Film Genre Reader.*

৮। Cybertheory ও Film–philosophy শীর্ষক ওয়েবসাইট।

ন্যারেটোলজি তত্ত্বে ও প্রয়োগে
অর্ক চট্টোপাধ্যায়

"What I need now is stories, it took me a long time to know that, and I'm not sure of it."

—স্যামুয়েল বেকেট (*'মলয়'* উপন্যাসে)

"Stories, stories I have not been able to tell them. I shall not be able to tell this one."

—স্যামুয়েল বেকেট (*'মলয়'* উপন্যাসে)

টোডোরভ তাঁর *Grammar of the Decameron* (১৯৬৯) গ্রন্থে প্রথম ব্যবহার করেন 'narratologie' শব্দটি যার ইংরেজি সংস্করণ হল 'narratology.' ন্যারেটোলজির ক্ষেত্র ন্যারেটিভ— সাহিত্যের, ইতিহাসের, সংস্কৃতির। সাহিত্যের পরিসরে ন্যারেটোলজিস্ট একটি টেক্সট-এর ন্যারেটিভ নিয়ে নাড়াচাড়া করেন, তার উপাদান চিত্রায়ণ, তার গাঠনিক মাত্রা নিরূপণ, কাহিনি নির্মাণ ও কথনের পদ্ধতির কৌশল বিশ্লেষণ— প্রভৃতির মাধ্যমে ন্যারেটিভ-এর বিচিত্র চরিত্রায়ণই তার উদ্দেশ্য। কাহিনি ('story') প্লট ('plot'), কাহিনি বৃত্ত ('narrative') ও বাচন ('discourse')-এর সূক্ষ্ম স্বাতন্ত্র্য প্রতিষ্ঠাও এই বিশ্লেষণ পদ্ধতির এক সার্থকতা।

'Theory of narratives' হিসেবে ন্যারেটোলজি বিংশ শতাব্দীর দ্বিতীয়ার্ধে এক স্বাতন্ত্র্য ও বিশিষ্টতা অর্জন করেছে বটে, কিন্তু তার তাত্ত্বিক ক্রমবিকাশের ইতিহাস আদৌ খুব একটা নবীন নয়। অ্যারিস্টটল-এর *Poetics*-ই ন্যারেটিভ-এর আকারগত বিশ্লেষণের গোড়াপত্তন করে। বিংশ শতকের প্রথম দিকে রাশিয়ান ফর্মালিস্টদের মধ্য দিয়ে এবং বিশেষত ভ্লাদিমির প্রপকে কেন্দ্র করে ন্যারেটোলজি-র ন্যারেটিভ-এ নতুন গতির সঞ্চার হয়। পরসি লুবক-এর *The Carft of Fiction* (১৯২১) কথন-দৃষ্টিভঙ্গি বা 'Narrative perspective' -এর তত্ত্বায়নে এক গুরুত্বপূর্ণ পদক্ষেপ নিয়ে আসে। হান্সগিওরগ গ্যাদামার-এর *Truth and Method* (১৯৬০), ডেভিড লজ-এর *The Modes of Modern Writing* (১৯৭৭) এবং প্রধানত জেরাল্ড জিনেট-এর *Narrative Discourse : An Essay in Method* (১৯৭৯) গ্রন্থের আদলে সাম্প্রতিককালে ন্যারেটোলজি-র ইতিহাস পুনর্গঠিত ও পুনঃরচিত হয়েছে। এ ছাড়াও রোলা বার্থ, পিটার ব্রুকস্ এবং আলগিদার্স গ্রেইমাস-রা

ন্যারেটোলজি-র সঙ্গে সম্পৃক্ত করেছেন সাইকো-অ্যানালিটিকাল নানা প্রবণতাকে। সামগ্রিকভাবে বলা যেতে পারে বিংশ শতাব্দীর দ্বিতীয়ার্ধে ন্যারেটোলজি-র এই ব্যাপক বিস্তার আসলে সাহিত্য-সংস্কৃতি ও দর্শনের জগতে সমান্তরালভাবে বেড়ে ওঠা গঠনবাদ (structuralism) চিহ্নবিজ্ঞান (semiotics) এবং কোনো কোনো ক্ষেত্রে উত্তর-আধুনিক সাহিত্য তত্ত্বের দ্বারা প্রভাবিত। 'content' থেকে 'form'-এ মনঃসংযোগের স্থানান্তর এবং তারপর 'form'-এর ভাঙন, বিচ্যুতি, বিনির্মাণ ও কথনপদ্ধতির বক্ররৈখিক জটিলতার উপর অভিনিবেশ তৈরির পরিসরে ন্যারেটোলজি পেয়েছে এক নব্য প্রাসঙ্গিকতা। বাস্তববাদী (realist) সাহিত্যের বিনির্মাণে ন্যারেটিভ ও ডিসকোর্স-এ কণ্ঠরুদ্ধ এবং ক্রমশ অদৃশ্য হতে থাকা উত্তর-আধুনিক ভঙ্গ-বাস্তবতার পৃথিবীতে ন্যারেটোলজি-র এ এক পুনর্জন্ম। ন্যারেটিভ-এর কেন্দ্রীভূত বাস্তবতার (reality) ক্রমিক অনুপস্থিতি কি বি-কেন্দ্রীভূত করেছে ন্যারেটিভ-কে নাকি তাকে দিয়েছে বাস্তবোত্তীর্ণ এক স্বয়ংসম্পূর্ণতা?

ন্যারোটলজি ন্যারেটিভ-এর ব্যাকরণ প্রতিষ্ঠার ক্ষেত্র হতে পারে, তবে বিভিন্ন ন্যারেটোলজিস্ট বিভিন্নভাবে সেই ব্যাকরণ সন্ধান করেছেন। এই ব্যাকরণ তাই কখনই একক নয়। তা বিভিন্ন তাত্ত্বিকের দৃষ্টিতে বিভিন্ন রূপ ধারণ করেছে। কাহিনিবৃত্তের বিশ্লেষণ-পদ্ধতি এক-একজনের কাছে এক একরকম।

আরিস্টটল-এর *Poetics* গ্রন্থে ঘটনা (action) এবং চরিত্রকে (character) কোনো কাহিনির (story) দুটি অনিবার্য উপাদান হিসেবে চিহ্নিত করা হয়েছে। আরিস্টটল-এর মতে 'action' ও 'character'-এর কার্যকারিতা আসলে পরিপূরক। মূল কাহিনি বিভিন্ন 'event' বা ঘটনার যে পারম্পর্যে বিন্যস্ত হয়, সেই বিন্যাস কাহিনির সারাৎসারকে এক গাঠনিক সংসক্তি প্রদান করে। ওই বিন্যাসই হল 'action' নিরূপিত 'plot'। তাই 'plot'-এর 'action' (বাহ্য ঘটনা এবং চরিত্রদের মানসলোকের ঘটনা তথা মানসিক পরিবর্তন-স্বরূপ ঘটনা)-এর পর্যায়গুলিই কোনো চরিত্রের সক্রিয়তার মাধ্যমে এগিয়ে নিয়ে যায় 'action'-কে। plot-character-এর মধ্যে আধিপত্য কার— সে সম্পর্কে আরিস্টটল-এর বক্তব্যও বেশ মুক্ত, জটিল ও অমীমাংসিত।

আরিস্টটল narrative-এর তিনটি গুরুত্বপূর্ণ পর্যায় বিভাজন করেছেন—

(১) The Hamartia.

(২) The Anagnorisis.

(৩) The Peripeteia.

হ্যামারটিয়া (Hamartia) হল ট্র্যাজেডির নায়কের এমন কোনো এক সিদ্ধান্তগত বিচ্যুতি বা ভ্রান্ত পদক্ষেপ যা ট্র্যাজিক ঘটনা-পরম্পরার (action) গোড়াপত্তন করে। অ্যানাগনরাইসিস ট্র্যাজিক নায়কের এক ধরনের সত্যোপলব্ধির মুহূর্ত। ন্যারেটিভ-এর কোনো এক মোড়ে যখন তার ভবিতব্য পরিষ্কার হয়ে ওঠে তার কাছে তখন পরিস্থিতি চালিত ওই সত্যানুভব তার পরিণতিতে এক নতুন মাত্রা জুড়ে দেয়। পেরিপেতিয়া ট্র্যাজিক নায়কের জীবনে নিয়তির এক সামগ্রিক রূপান্তর তথা ওলট পালটকে নির্দেশ করে। একটি সুসংবদ্ধ ন্যারেটিভ-এ পেরিপেতিয়া ও অ্যানাগনরাইসিস-এর মুহূর্তদ্বয়ের সমাপতন বা সময়ের প্রেক্ষিতে পরস্পর নিকটস্থ হওয়া বিশেষ প্রয়োজন বলে মনে করেছেন আরিস্টটল। বস্তুতপক্ষে ভাগ্যের ওই আমূল পট-পরিবর্তনই নায়কের মধ্যে অ্যানাগনরাইসিস-এর আত্মচেতনার জন্ম দেয়।

আরিস্টটলীয় ন্যারেটোলজিতে ন্যারেটিভ তাই মূলত দুটি প্রক্রিয়ায় অগ্রসর হয়। এক ছিদ্রপথ সৃষ্টি করে তথ্যের অনুপ্রবেশ ঘটিয়ে প্লটকে এগিয়ে নিয়ে যাওয়া হয় একদিকে আবার সময়ে সময়ে ওই ছিদ্রপথ বন্ধ করে অর্থাৎ তথ্য গোপন রাখার মাধ্যমে ন্যারেটিভ-এর গর্ভগৃহে এক উৎকণ্ঠিত পরিস্থিতি সৃষ্টি করা হয়। কাহিনি-বৃত্তের বিকাশের পথে পর্যায়-ক্রমিকভাবে তথ্যের আঁধার গোপন রূপ ও তার অনুপ্রবেশ রূপ বহিঃপ্রকাশের আলোয় ন্যারেটিভ-এর মহামুহূর্ত ও চূড়ান্ত পরিণমন উজ্জ্বল হয়ে ওঠে। সাসপেন্স নির্মাণ ও নিরসনের ডায়ালেকটিক্‌ই এই ন্যারেটিভ-এর চালিকা-শক্তি। পাঠকের অপেক্ষাতেই এর বিদ্যমানতা এবং ওই অপেক্ষার অবসানেই এর বৃত্তায়িত সমাপন-মুহূর্ত।

ভ্লাদিমির প্রপ রাশিয়ান ফর্মালিস্ট গোষ্ঠীর অন্যতম প্রধান সমালোচক যাঁর *The Morphology of the Folktale* গ্রন্থে (রাশিয়ায় প্রথম প্রকাশ ১৯২৮) একটি স্বতন্ত্র ন্যারেটোলজিকাল পদ্ধতি ব্যবহার করে তিনি ন্যারেটিভ-এর গঠনতন্ত্রে প্রবেশ করেছেন। প্রপ-এর পদ্ধতি 'মোটিফ'-নির্ভর এবং তিনি একটি ন্যারেটিভ-কে একত্রিশটি ঘটনা-নির্ভর অংশে বিভক্ত করেছেন। একশোটি রাশিয়ান ফোক্‌টেল্‌-কে পর্যবেক্ষণ করে প্রপ এই 'function'-গুলিকে চিহ্নিত করেন। তবে, তার অর্থ এই নয় যে প্রতিটি টেল-এই সবকটি function উপস্থিত থাকবে। এমন হতেই পারে যে কোনো একটি কাহিনিতে যে-কোনো পাঁচটি বা সাতটি বা দশটি function উপস্থিত থাকল। উদাহরণস্বরূপ প্রপ-এর কয়েকটি function দেখে নেওয়া যাক—

১. পরিবারের এক সদস্য তার বাড়ি থেকে নিজেকে অনুপস্থিত করে তুলেছে।
২. হিরোর উপর কোনো এক নিষেধাজ্ঞা তৈরি হচ্ছে।
৩. নিষেধাজ্ঞাটি লঙ্ঘিত হচ্ছে।

প্রপ-এর বিশ্লেষণে ন্যারেটিভ-এর content-ই নানা বিন্যাসে সজ্জিত হয়ে তার একটি form নির্মাণ করে। প্রত্যেক function-এর ভিতরে নানা ধরনের 'sub-function' থাকতে পারে। প্রপ কোনো ন্যারেটিভ-এর প্রেক্ষিতে সাত ধরনের 'spheres of action' অর্থাৎ ঘটনা তথা সক্রিয়তার ক্ষেত্রের কথা বলেছেন। এগুলি প্রধানত সেই সব নির্দিষ্ট ভূমিকার ('role') দ্বারা সংগঠিত যা কোনো ন্যারেটিভ-এর চরিত্ররা পরিস্থিতি বিশেষে পালন করে থাকে—

১. The villain.
২. The doner (provider).
৩. The helper.
৪. The princess (a sought after person) and her father.
৫. The dispatcher.
৬. The hero (seeker or victim).
৭. The false hero.

বিভিন্ন চরিত্র কর্তৃক সম্পাদিত এই ভূমিকাগুলিই ন্যারেটিভ-কে গতিশীল করে তোলে। তবে এক্ষেত্রেও একটি চরিত্র একাধিক ভূমিকা পরিগ্রহ করতে পারে এবং কোনো একটি ন্যারেটিভ-এ প্রতিটি ভূমিকার চরিত্র নাও থাকতে পারে। ভ্লাদিমির প্রপ-এর 'morphology' কোনো ন্যারেটিভ-কে কয়েকটি মূলগত 'type-model'-এর পটপ্রেক্ষায় বিশ্লেষণের এক প্রয়াস যা শুধুমাত্র রাশিয়ান ফোক্‌টেলস্‌ নয়, সকল প্রকার কাহিনিবৃত্তের ক্ষেত্রেই কয়েকটি নির্মাণ-বিন্দুকে চিহ্নিত করে। কোনো ন্যারেটিভ এই মডেলসমূহকে অনুসরণ যদি নাও

করে, সেক্ষেত্রেও ওই প্রতিস্পর্ধী কাঠামোয় প্রপ-এর function-গুলিই থেকে প্রস্থানসমূহ সূচিত হয়।

জেরাল্ড জিনেট-এর *Narrative Discourse* গ্রন্থটিতে জিনেট ন্যারেটিভ-এর ভিতরকার কথন-দৃষ্টিভঙ্গি, কথকের আইডেনটিটি, সময়-চেতনা, ন্যারেটিভ্ 'mode' এবং তার 'packaging' ইত্যাদি বিষয়ের ভিত্তিতে তার আকার বিচার করেছেন। বহু ক্ষেত্রেই তিনি হেনরি জেমস-এর 'point of view'-এর ধারণা ও ন্যারেটিভ-এর বিভিন্ন প্রসঙ্গ নিয়ে পূর্ব-প্রতিষ্ঠিত নানা ধারণাকেই নতুন বাচনিক রূপ দিয়েছেন।

ন্যারেটিভ-কে যে ব্যক্তির দৃষ্টিভঙ্গি থেকে দেখা হয়, সে হল ওই কাহিনির কথক বা 'narrator', কোনো কাহিনি পাঠের সময় ওই কাহিনির শব্দরা পাঠকদের সঙ্গে কথা বলে। এই ডায়ালগ-এই তৈরি হয় পাঠ। কিন্তু প্রশ্ন হল, কাহিনি-স্থিত শব্দেরা কী মাধ্যমহীন প্রত্যক্ষ্যতায় আমাদের সাথে কথা বলে নাকি লেখক-সৃষ্ট কোন চরিত্রের মাধ্যমরূপে উপস্থিত থাকে সেখানে? কাহিনি কথনের এই দৃষ্টিভঙ্গি তথা 'point of view' বা 'narrative perspective'-এর জিনেট প্রদত্ত নতুন নাম 'focalisation', জিনেটে-এর মতে এই 'focalisation' দু-রকম।

(i) Internal.

(ii) External.

'Internal focalisation'-এর ক্ষেত্রে চরিত্রদের মনস্তাত্ত্বিক বিশ্লেষণই প্রধান। অন্যদিকে কোনো একটি ন্যারেটিভ 'externally focalised' হবার অর্থ হল সেখানে চরিত্রগুলির বহিরঙ্গ ও তাদের ক্রিয়াকলাপই মুখ্য। সেখানে কথক বা অন্যান্য কথিত চরিত্রদের মানসলোক অব্যক্তই থেকে যায়। কোনো একটি ন্যারেটিভ-এর focalisation যদি 'zero' হয় তবে তার অর্থ হল সেখানে কথন-দৃষ্টিভঙ্গি কোনো একটি চরিত্রের মধ্যে সীমাবদ্ধ নয়। কথন সেখানে সাধারণ ও সর্বব্যাপ্ত কোনো এক পর্যবেক্ষক-সত্তার হাতে ন্যস্ত। এই ধরনের ন্যারেটর-কে 'covert' বা 'non-intrusive' ন্যারেটর বলা যায়। এই ন্যারেটর কাহিনির কোনো প্রত্যক্ষ অংশ নয়। অন্যদিকে কাহিনির কথক কাহিনির ভিতরকার কোনো এক নির্দিষ্ট চরিত্রও হতে পারে, সেক্ষেত্রে ন্যারেটর 'overt' বা 'intrusive'। কাহিনি-বহির্ভূত কথক, জিনেট-এর ভাষায় হল 'heterodiegetic' এবং কাহিনি-অন্তর্ভুক্ত চরিত্রস্বরূপ কথক হল 'homodiegetic'। শার্লট ব্রন্ট-এর *Jane Eyre* (১৯৪৭) উপন্যাসের কথক হিসেবে জেন 'homodiegetic', কারণ সে ওই কাহিনির অন্তর্গত প্রধান এক চরিত্র। কিন্তু শক্তি চট্টোপাধ্যায়ের *কুয়োতলা* উপন্যাসটি নিরুপমের দৃষ্টিভঙ্গি থেকে লেখা হয়নি। উপন্যাসটির কথক নিরুপম ও অন্যান্য চরিত্রদের প্রথম পুরুষে চিহ্নিত করে। এই কথক জিনেট-এর বিভাজন অনুযায়ী 'heterodiegetic'।

একটি ন্যারেটিভ-এর ভিতরকার সময় ও তার চলনের আকার এবং তার সঙ্গে ন্যারেটিভ-এর বাইরের সময়ের পার্থক্য— এও জিনেট-এর ক্ষেত্রে এক গুরুত্বপূর্ণ প্রসঙ্গ। কখনও ন্যারেটিভ-এর ভিতরকার সময় পশ্চাদ্‌গামী। অর্থাৎ তা পিছু হেঁটে অতীতে ফিরে যায় 'flashback' বা 'analepsis'-এর মাধ্যমে। আবার কখনও বেশ কিছুটা সময় অন্তর্বর্তী রেখে তা খানিকটা এগিয়ে যায় 'prolepsis' বা 'flash forward' পদ্ধতিতে। বহুক্ষেত্রেই কোনো একটি ন্যারেটিভ হঠাৎ মাঝখান থেকে শুরু হয়ে ('in medias res') তারপর সামনে-পিছনে ঘুরে-ফিরে নিজের অনুষঙ্গ-সমূহকে সম্পূর্ণ করে।

জিনেট-এর মতে ন্যারেটিভ-এর 'মোড' প্রধানত দুরকম হতে পারে— (১) mimetic, যেখানে প্রত্যক্ষভাবে যাবতীয় অনুপুঙ্খ খুঁটিনাটি সহ ঘটনা— তথা পরিবেশ-পরিস্থিতি ও

বাতাবরণকে চিত্রকল্প-নির্ভর ভঙ্গিমায় প্রকাশ করা হয়।— (২) 'diegetic' যেখানে কোনো ঘটনা, পরিবেশ বা বাতাবরণকে পরোক্ষ উক্তিতে খুবই স্বল্পাকারে শুধুমাত্র রিপোর্ট করা হয়। কোনো ন্যারেটিভ-এ এই দুটি মোডের একটি সম্পূর্ণভাবে থাকতে পারে না। প্রতিটি ন্যারেটিভ-ই এ দুয়ের মিশ্রণে তৈরি হয়ে থাকে।

কখনও কখনও একটি ন্যারটিভ-এর ভিতর একাধিক পৃথক ন্যারেটিভ থাকে। একটি প্রধান ন্যারেটিভ-এর ('primary narrative') সূত্র-সঞ্চালনায় ওই অন্যান্য 'secondary narrative' সমূহ বিন্যস্ত হয়। ওই অন্তর্ভুক্ত ন্যারেটিভ-গুলি প্রধান ন্যারেটিভ-এর সঙ্গে সম্পর্কযুক্ত হতে পারে আবার ডেভিড মিশেল-এর *Cloud Atlas* উপন্যাসের মতো বিভিন্ন দেশ-কালে অবস্থিত স্বয়ংসম্পূর্ণ এক-একটি কাহিনিও হতে পারে। চসার-এর *The Canterbury Tales* এই ধরনের ন্যারেটিভ-এর এক আদি দৃষ্টান্ত। সেখানে প্রধান ন্যারেটিভ হল তীর্থযাত্রার, কিন্তু তীর্থযাত্রীদের প্রত্যেকের বলা প্রত্যেকটি কাহিনি ওই প্রধান ন্যারেটিভ-এর ভিতর সক্রিয় এবং আপাত বিযুক্ত এক-একটি 'frame-narrative'।

গঠনবাদী ন্যারেটোলজিস্টরা ভাষা-ব্যাকরণ ও ন্যারেটিভ-ব্যাকরণের মধ্যে সেতুবন্ধনের এক চেষ্টা করেন বহুক্ষেত্রে। টোডোরভ বলেছেন "we shall understand narrative better if we know that the character is a noun, the action, a verb." কাহিনির বিকাশের সাথে সাথে কোনো চরিত্রের সঙ্গে যে নব্য-মাত্রাগুলি যুক্ত হয়, সেগুলিও বিশেষণের মতো বিশেষিত করে বিশেষ্যরূপ চরিত্রকে। গ্রেইমাস তাঁর 'Structural Semantics' নামক রচনায় 'actant'-দের ভিতরকার সম্পর্কের সেট্‌গুলি বিভিন্ন রকম বৈপরীত্যের আকারে ফুটিয়ে তুলেছেন। এমনই কয়েকটি সেট্ হল—"subject versus object", "sender versus receiver" প্রভৃতি সাবজেক্ট-অবজেক্ট-এর সম্পর্ক ন্যারেটিভ-এর উৎস-বিন্দুতে থাকা এক সম্পর্ক যা একটি বাক্যের অন্তর্গত 'subject noun' এবং 'object noun'-এর মধ্যেকার সম্পর্কের সঙ্গে তুলনীয়। একটি ন্যারেটিভ-এ কী ঘটছে, শুধু তা-ই গুরুত্বপূর্ণ নয়, তার পাশাপাশি কী ঘটা উচিত ছিল, কী ঘটতে পারত—এ সব কিছুই গুরুত্বপূর্ণ। যেমন স্যামুয়েল বেকেট-এর *Waft* উপন্যাসের সমগ্র কাহিনিটিই একটি বিশেষ পরিস্থিতিতে কী-কী ঘটতে পারতো এবং ঘটেনি সেই সব অনুপস্থিত সম্ভাবনার উপর দাঁড়িয়ে রয়েছে। ন্যারেটিভ-এ অনুপস্থিতি ন্যারেটিভ-উপস্থিতির মতোই গুরুত্বপূর্ণ। (কারণ উপস্থিতিসমূহ লেখকের চয়নের কারণেই উপস্থিত। আর লেখক চয়ন করেন উপস্থিতি ও অনুপস্থিতির এক যুগ্ম একক থেকেই। গ্রেইমাস তাঁর ন্যারেটোলজিকাল বিশ্লেষণে যা করেছেন তা একপ্রকার বিনির্মাণ। ধরা যাক, 'শুভদীপ বই পড়ছে', এই বাক্যটির ন্যূনতম ব্যাকরণগত উপাদান—'শুভদীপ + বই'। 'শুভদীপ + বই'-এর সাবজেক্ট-অবজেক্ট সংযোগ ন্যারেটিভ আকার পাচ্ছে 'শুভদীপ বই পড়ছে'। বাক্যটিতে গ্রেইমাস এই গ্রামাটিক্যাল মডেল-এর সঙ্গে নির্মিত ন্যারেটিভ্ আদলের সম্পর্ক নির্ণয়ে সচেষ্ট। রোলা বার্থ-এর রচনা *The Structural Analysis of Narrative* গঠনবাদী ন্যারেটোলজির পরিসরে এক উল্লেখযোগ্য দলিল। গঠনবাদী ন্যারেটোলজিস্টরা ন্যারেটিভ-এর কাঠামো ব্যাখ্যায় বারংবার ফিরে গেছেন ভাষা-কাঠামোর কাছে এবং ভাষার উপর এই মনোনিবেশ ন্যারেটিভ-এর আবয়বিক নির্মিতিকেই পুনঃপ্রকট করে তুলেছে। ভাষার এই সেল্ফ-রেফারেন্সিয়ালিটিই গঠনবাদী ন্যারেটোলজি-র উত্তরণ-সূত্র।

জাঁক দেরিদা-র উত্তর-গঠনবাদী (post-structuralist) বিনির্মাণের তত্ত্বে ন্যারেটিভিটির এক বৈপ্লবিক বিকেন্দ্রীভবন সূচিত হয়েছে। দেরিদা-র মতে কেন্দ্র ('centre') একাধারে কোনো

গঠন-এককের (structure) ভিতরে ও বাইরে অবস্থান করে। গঠন-এককের ভিতর কেন্দ্রের এই এক ধরনের অনুপস্থিতিই ডিসকোর্স-এর জন্ম দেয়। 'কেন্দ্র' আসলে কাল্পনিক এক ধারণামাত্র যা মানুষ ব্যবহার করে থাকে যে-কোনো 'structure' কে এক সংবদ্ধ নির্মিতি প্রদানার্থে। দেরিদীয় বিনির্মাণের সম্প্রসারণে ন্যারেটিভ-ও এমনই এক বি-কেন্দ্রীভূত গঠন-একক, যার এককত্ব এক সুবিশাল প্রশ্নচিহ্নের সম্মুখীন। ভাষার অন্ধবিন্দুদের ('aporia') দৌলতে থমকে যাওয়া, ভেঙে পড়া, বিলম্বিত এবং অন্তহীন এক সর্পিলতাই উত্তর-গঠনবাদী পৃথিবীতে ন্যারেটিভ-এর একমাত্র অভিমুখ যেন। উত্তর-গঠনবাদী এবং উত্তর-আধুনিক তত্ত্ববিদ জিঁয়ান বদরিলা-র 'simulacrum' বা বাস্তবতাহীন চূড়ান্ত প্রপঞ্চের তত্ত্বে ভাষার যে চূড়ান্ত পরিণতির কথা তিনি বলেছেন, সেখানে শব্দরা শুধু যে কোনো বাস্তবতাকে নির্দেশ করতে ব্যর্থ হবে তা-ই নয়, তারা তাদের কেন্দ্রে বাস্তবতার ওই সামূহিক অনুপস্থিতিকেই ঘোষণা করবে সগর্বে। রিয়ালিটিহীন চূড়ান্ত অ্যাপিয়ারেন্স-এর এই জগতে ন্যারেটোলজি তাই ন্যারেটিভ নির্মাণের ক্রমবর্ধমান সমস্যা ও কাঠিন্যসমূহ নিয়েই চিন্তিত।

রোলা বার্থ-এর ভাবনায় 'textual pleasure' তথা পাঠ-উত্তেজনার সঙ্গে 'sexual pleasure' তথা যৌন উত্তেজনার যে সমীকরণ চিহ্নিত হয়েছে, তার সূত্র ধরে পাঠ-প্রক্রিয়ার এক যৌন অনুষঙ্গ ও পাঠক-লেখক সম্পর্কের এক যৌন আদল তৈরি হয়েছে। ন্যারেটোলজি-র সঙ্গে নারীবাদী প্রতর্কেরও সেতুবন্ধন ঘটেছে। লিঙ্গীয় বিভাজনে একরৈখিক(linear) ন্যারেটিভ-এর বিরুদ্ধ-প্রবণাতাস্বরূপ বহুরৈখিক (multilinear) এবং অ-রৈখিক (non-linear) ন্যারেটিভ নির্মাণকে ফেমিনিস্ট প্রতিস্পর্ধারূপে দেখা হয়েছে।

পিটার ব্রুকস্-এর বক্তব্য ন্যারেটোলজি সাইকো-অ্যানালিটিক মাত্রাগুলিকে প্রকট করেছে। ফ্রয়েড-এর 'repetition–compulsion'-এর ধারণাকে (মানুষের মন যেভাবে শৈশবের নানা ধরনের অভিজ্ঞতাবাদী মানসচিত্রসমূহকে জীবনব্যাপী তার মনোলোকে ফিরিয়ে আনতে বাধ্য হয়) ব্যবহার করে ব্রুকস্ পাঠকের পাঠ-অভীপ্সার (reading desire) স্বরূপ উদ্ঘাটন করেছেন। তাঁর *Psychoanalysis and Storytelling* গ্রন্থে ফ্রয়েড-এর ডোরার কেস্-স্টাডিকে ব্যবহার করে ব্রুকস্ দেখিয়েছেন যে সাইকো-অ্যানলিস্ট ও তার সাবজেক্ট উভয়ই এক অর্থে 'storytellers'। ডোরা ফ্রয়েড-কে যা বলেছেন তা হল তার জীবনের এক ন্যারেটিভ্ এবং ফ্রয়েড তাঁর মনসমীক্ষণ করে যা নির্মাণ করেন তা-ও ডোরা-র জীবনের ফ্রয়েডীয় ব্যাখ্যা সংলিত সম্প্রসারিত ন্যারেটিভ। প্রসঙ্গত জাঁক লাকাঁর "talking cure"-এর পদ্ধতিটি উল্লেখ্য। এই পদ্ধতিতে মানসিক ভাবে রোগগ্রস্ত ব্যক্তিকে দিয়ে তার অভিজ্ঞতার ভাষ্য-নির্মাণ করানোর চেষ্টা করা হয়। ওই 'articulation of self'-ই তার আরোগ্যের পদ্ধতি।

প্রয়োগ-দৃষ্টান্ত—(১) ইটালো ক্যালভিনো-র *If on a Winter's Night A Traveler :*

১৯৭৯-তে প্রকাশিত ইটালির লেখক ইটালো ক্যালভিনো-র উপন্যাসটি শুরু হয় এমনভাবে—" You are about to begin reading Italo Calvino's new novel If on a Winter's Night A Traveler" এবং উপন্যাসটির শেষ বাক্য নিম্নরূপ—"And you say 'just a moment, I've almost finished If on a Winter's Night A Traveller by Italo Cavino." এর মাঝে রয়েছে মোট বাইশটি অধ্যায়, যার একটির শিরোনাম সংখ্যাবাচক ("chapter one") এবং পরেরটি নামবাচক ("If on a winter night a traveler")। সংখ্যা ও নামের পর্যায়ক্রমে এভাবেই নামাঙ্কিত সমস্ত অধ্যায়গুলি। সংখ্যাবাচক অধ্যায়গুলিই একত্রে

এই উপন্যাসের 'primary narrative'। এই ন্যারেটিভ-টির প্রধান বিষয়বস্তু হল জনৈক পাঠকের ক্যালভিনোর *If on a Winter's Night A Traveler* নামক নতুন উপন্যাসটি ক্রয় করে পাঠ করার এক অন্তহীন ও বিফল চেষ্টা। কখনও উপন্যাসটির পাতা মিসিং থাকে, আবার কখনও একটিমাত্র অধ্যায় বাইন্ডিং-এর গণ্ডগোলে বারবার ফিরে আসে। প্রত্যেকবারই পাঠক জানতে পারেন যে তিনি যে উপন্যাসটি পড়ছেন তা তাঁর অভিপ্রেত ক্যালভিনো-র উপন্যাসটি নয়, বরং অন্য কারুর অন্য কোনো উপন্যাস। লুডমিলা নামক এক সহ-পাঠিকার সঙ্গে পাঠক ব্যাপৃত হন এই পাঠ-রহস্যের সমাধান তথা লেখক-সত্তার স্বরূপ উদঘাটনে। নামবাচক শিরোনামের অধ্যায়গুলিতে পাঠকের ভুলবশত পড়া কাহিনিগুলি "frame narratives"-এর আকারে সজ্জিত হতে থাকে। এই কাহিনিগুলি আপাত বিযুক্ত নানা দেশের নানা লেখকের নানা উপন্যাসের অংশবিশেষ। পাঠকের পাঠ প্রতিটি ক্ষেত্রেই বিঘ্নিত হয় বিভিন্ন ধরনের গোলযোগে। উত্তর-গঠনবাদী দৃষ্টিতে এই ন্যারেটিভসমূহ অসমাপ্ত ও অসমাপ্য। অধুনান্তিক এক স্বাক্ষরে তারা সকল প্রশ্নের উত্তর প্রদায়ক একক এক "masfer narrative"-এর প্রতিস্পর্দ্ধী। লেখক-সত্তার বিনির্মাণও উল্লেখ্য এক ফলশ্রুতি।

ক্যালভিনোর প্রপ-প্রভাবিত এই ন্যারেটিভ-গঠন আরও জটিল আকারে পাওয়া যায় তাঁর *The Castle of Cross–Destinies* (১৯৭৭) উপন্যাসটিতেও। বর্তমান উপন্যাসের "frame narratives"-এর প্রতিটিই এক-একটি narrative-type-এর আদলে নির্মিত— কোনোটি ক্রাইম থ্রিলার, কোনোটি আবার পোলিটিকাল নভেল তো অন্যটি সায়েন্স-ফিক্‌শান। প্রত্যেকটি ন্যারেটিভে-এই প্রপ-কথিত 'function' থেকে নানারকম আত্ম-সচেতন প্রস্থান তৈরি করা হয়েছে। ন্যারেটিভ-গুলির ভিতর সময়ের একরৈখিকতা ক্রমাগত ভেঙে পড়েছে। একটি ন্যারেটিভ সভ্যতার আদিপর্বে, একটি আধুনিক ফ্রান্স-এ তো অপরটি অনপনেয় এক ভবিষ্যতে ঘটমান। 'Frame narrative'-গুলির প্রতিটি উত্তমপুরুষে রচিত। কথক প্রতিটি ক্ষেত্রেই 'homodiegetic', অন্যদিকে 'primary narrative'- টি প্রধানত বিরল এক মধ্যমপুরুষ নির্দেশে গড়ে তোলা হয়েছে যেখানে কোনো একক সর্বদ্রষ্টা 'heterodiegetic' কথকসত্তা প্রথম থেকে শেষ পর্যন্ত 'পাঠক' নামক চরিত্রটিকে আদেশ করছে—"so here you are now, ready to attack the first lines of the first page" (পৃ. 9) পাঠক এখানে লেখক-নির্দেশিত এক মধ্যম পুরুষ 'তুমি' মাত্র। সমগ্র উপন্যাস জুড়ে নানা রকমভাবে পরস্পর বিরোধিতার মাধ্যমে যেন 'narrative perspective'-এর প্রত্যয়টিকেই আক্রমণ করা হয়েছে।

সমস্ত উপন্যাসটিতেই ক্যালভিনো একটি ন্যারেটিভ-এর স্তরগুলির ভিতরকার যাবতীয় ব্যবধান অস্পষ্ট করে দিয়েছেন 'metalepsis' নামক অধুনান্তিক ন্যারেটোলজিকাল এক পদ্ধতির মাধ্যমে। জেনেট-এর ভাষায় একটি ন্যারেটিভ-এর 'hypo–diegetic' ও 'hyper-diegetic' যে দুটি পরত থাকে, তাদের ভিতরকার ব্যবধানসমূহকে অস্বচ্ছ করে দিয়ে ক্যালভিনো এক বাস্তবতাহীন ন্যারেটিভ-বিশ্বেরই ইঙ্গিত দিয়েছেন। একজন পাঠকের একটি বই পড়ার প্রক্রিয়াটি যা সবচেয়ে মূলগতভাবে ওই বইয়ের ন্যারেটিভ-বহির্ভূত এক বিষয়, তাকে সমান্তরালভাবে ন্যারেটিভ-এর ভিতর স্থাপন করে ন্যারেটিভ ও একস্ট্রা-ন্যারেটিভ স্তরের মধ্যেকার সীমারেখাটিকে সম্পূর্ণভাবে মুছে দিয়েছেন ক্যালভিনো। ন্যারেটিভ-বহির্ভূত সমস্ত বাস্তবতা 'narrativised' হয়ে বিনির্মিত হয়েছে। 'টেক্সট'-এর কোনো বাহির ('outside') হতে পারে না— দেরিদা-র এই মন্তব্যই যেন ক্যালভিনো-র ন্যারেটিভ বিশ্লেষণের নির্যাস। এমনকি উপন্যাসটির নামবাচক অধ্যায়গুলির শিরোনামগুলিকে একত্র করলে তা-ও এক স্বতন্ত্র কাহিনির ঝালক সংবলিত মিনি-

ন্যারেটিভ তৈরি করে যা বিষয়বস্তুগতভাবে ক্যালভিনো-র সমাপ্তিহীন ন্যারেটিভ বিন্যাসেরই এক আকারগত দ্যোতক। *If on a Winter's Night A Traveler*-এর ক্যালভিনো একাধারে এক সাহিত্যিক এবং এক ন্যারেটোলজিস্ট।

প্রয়োগ-দৃষ্টান্ত—(২) সন্দীপন চট্টোপাধ্যায়ের *ধ্বংসের মধ্যে দিয়ে যাত্রা* :

অচিন্ত্য না সোমনাথ? নাকি সন্দীপন নিজে? কে লেখক, আর কে-ই বা মাধ্যম— চরিত্র? 'ম্যানিক ডিপ্রেশন'-এ শয্যাগত রোগীর কণ্ঠস্বরে কাহিনি নির্মাণের প্রয়োজনীয়তা ও একাধারে কাহিনি-বিনির্মাণের অবশ্যম্ভাবিতার এক ধারাভাষ্য সন্দীপনের উপন্যাসটি। এক সাইকোটিক-এর উত্থান-পতনমূলক স্থান-কাল-ক্রমহীন স্মরণ প্রক্রিয়াই এই উপন্যাসের স্টপ-গ্যাপ ন্যারেশন-এর মেরুদণ্ড। তদুর্ধ্বে স্থাপিত কোনো এক রহস্যময় সর্বব্যাপী 'রেকর্ড' যা সবকিছু লিখে রাখে—"তাছাড়া একজন ইনডিভিজুয়ালের মনে পড়ল কি পড়ল না তাতে কী এসে গেল। রেকর্ড তো কোথাও না কোথাও থেকে যাচ্ছে।" এমন কোনোও এক বহিরাগত লেখক-রূপ নিরূপিত 'মাস্টার ন্যারেটিভ'-এর বিরোধিতা করাই যেন অচিন্ত্য/সোমনাথ-এর ভাঙাচোরা, আঁকাবাঁকা, 'ব্যক্তিগত ন্যারেটিভ' -এর উদ্দেশ্য। 'বিজ্ঞাপন বিরতি' নামক একাদশ অধ্যায়ে মক্-ভঙ্গিমায় তাই আহুত হয়েছেন এক সর্বময় লেখক-সত্তা। তাকে অনুরোধ করা হয়েছে ফ্র্যাগমেন্টেড কাহিনিকে নিয়ন্ত্রণ ও পরিণতি দেবার জন্য। লেখকের সর্বময়তার উচ্চারণও এক ধর্মীয় প্যারডিতে আকীর্ণ—"লেখক ইচ্ছা করলে কী না হতে পারেন। তিনি অনন্তবাহু। শশীসূর্য তার নেত্রে।"

দুবরাজপুরের 'অমলেন্দু বোধ নিকেতন'-এ রোগশয্যাগ্রস্ত পেইন্টার অচিন্ত্য ঘোষালের কাহিনি ক্রমাগতই চিত্রকর ভ্যান-গঘ-এর উন্মাদনা ও আত্মহননের কনটেকস্ট-এ স্থাপিত হয়েছে। দুটি পৃথক দেশ-কাল ও সংস্কৃতির ধারায় এই দুটি ন্যারেটিভ-এর ডায়ালগই উপন্যাসটির কেন্দ্র। তাই হেমবরণ (অচিন্ত্যর গার্ড) আলফ্রেড রাউল হেমব্রম এবং অচিন্ত্যর ভাই অনি ভ্যান গঘ-এর ভাই থিও হয়ে ওঠে। এমনকি অষ্টম অধ্যায়রূপে ভাই থিওকে সেন্ট রেমি মানসিক হাসপাতাল থেকে লেখা ভিনসেন্ট ভ্যান গঘ-এর চিঠিটাও 'ভাই থিও' নামে স্থান পেয়েছে। ভ্যান গঘ-এর কাহিনি সন্দীপন-এর উপন্যাসের ভিতর স্থাপিত এক প্যারালাল ন্যারেটিভ, যেমন ছিল শরদিন্দুর 'রক্তসন্ধ্যা' গল্পটি সন্দীপনের *স্বর্গের নির্জন উপকূলে* নামক উপন্যাসে।

এ ছাড়া বেশ কিছু 'frame narrative' রয়েছে সমগ্র উপন্যাস জুড়ে। উপন্যাসটি শুরু হয়েছে একটি প্রচলিত বিদেশি লোক-কাহিনি অনুসারী এক বিচ্ছিন্ন সংলাপ দিয়ে, দ্বিতীয় অধ্যায়ে সন্দীপন তাঁরই পূর্বলিখিত এক ছোটো গল্পকে মূল-কাহিনি থেকে আপাত-বিচ্ছিন্ন এক ন্যারেটিভ-স্বাতন্ত্র্য দিয়েছেন। এ ছাড়াও সমগ্র ন্যারেশন-টিই বিভ্রান্ত স্মৃতির দৌলতে হয়ে উঠেছে খণ্ড-খণ্ড কোলাজ-এর সমাহার। এই জিগস-পাজল-এর খণ্ডগুলো যতই জুড়তে যান না কেন লেখক, তারা তো জুড়বে না, উপরন্তু ভেঙে দেবে লেখকের নিরূপণময় শরীর।

চিঠি, নাটকীয় সংলাপ, তৈলচিত্র, ফিল্মস্ক্রিপ্ট— কথন ("নীল ধানক্ষেতে একা" শীর্ষক অংশটিতে), ফুটনোট্, চার্ট, প্রবন্ধ ("বিজ্ঞাপন বিরতি" অংশ)— নানা রকম কথন-মাধ্যমের বিক্রিয়ার জন্ম হয়েছে *ধ্বংসের মধ্য দিয়ে যাত্রা'*-র কথনভঙ্গির। অচিন্ত্য / সোমনাথ তার প্রথম পুরুষে লিখেছে সমগ্র কাহিনি। কিন্তু তার স্বীকারোক্তিতে সে শুধুই এক "primary narrator" তাকে তার স্মৃতিভ্রংশের সময়কার সমস্ত ঘটনা সম্পর্কে অবগত করেছে হেমবরণ, যে একপ্রকার "secondary narrator"। আজ অচিন্ত্য/সোমনাথ যা কিছু ন্যারেট করছে তা

সব-ই হেমবরণের ন্যারেশন-এর ফল। অচিন্ত্য/সোমনাথ এবং হেমবরণ— এরা কি সকলেই আসলে কোনো এক বাহ্য 'author-god' কর্তৃক নিয়ন্ত্রিত? সন্দীপনের ন্যারেটিভ সদা আত্মসচেতন এবং আত্মসংশোধনমূলক—"হরিদ্বারে যখন ট্রেন ঢুকছে, তখন ভোরবেলা ঝরঝর করে বৃষ্টি পড়ছে। 'বৃষ্টি পড়ে যাচ্ছে' লিখলে নিঃসন্দেহে বেটার হত।" সন্দীপনের ন্যারেটর তার লেখক-পরিচয় সম্পর্কে অবগত, অবগত তার লেখায় ভাষার স্বতত অনিশ্চয়তা বিরচিত অন্ধবিন্দুগুলি সম্পর্কেও। তাই ব্যঙ্গময় রসিকতার টোনে দেরিদীয় এক বার্তাই সে যেন পৌঁছে দেয়, "উপমা মাত্রই ছেনালিতে ভরা" বলে। অভিজ্ঞতার কাঠামোয় ভাঙন এবং ভাষার মাধ্যমে অভিজ্ঞতা চিত্রণের প্রক্রিয়ায় ভাষার "representational" অপর্যাপ্ততার অধুনান্তিক সমস্যায়নই সন্দীপনীয় ন্যারেটিভ-এর এক উড়ান-চিহ্ন। ইমেজও কমিউনিকেশন তৈরি করতে পারে না এখানে—"এই 'তাহলে তো সবই মনে পড়ল' কে তুমি ক্যানভাসে ফুটাও হে।" অচিন্ত্য/সোমনাথ তার নিজের বউ, হেমন্তদা কিংবা 'অনির প্রেম' নামক অধ্যায়ে মাম্মানের যে-সব মৃত্যুর কথা বলে, তা শুধু মানবমৃত্যু নয়, বরং আরও বেশি করে ন্যারেশন— মোটিফ-এর মৃত্যু— তার গল্পের নটে গাছটি মুড়োনোর ইঙ্গিত। যত লেখে সে, তত এভাবেই ছোটো হতে থাকে তার লিখন-পরিসর মৃতদেহের চাপে, এমন এক স্তূপে যেখানে শেষ শব হিসেবে সংযোজিত হবে সে নিজে। 'যাই হোক লিখে যাও— ডোন্ট স্টপ' থেকে আত্ম-সমাপ্তি ও কথন-সমাপনের যুগ্ম মুহূর্ত পর্যন্ত বিস্তৃত মনোলগরূপ ন্যারেটিভ-বিনির্মাণ—"এমন লেখা কি হতে পারে না যে কেউ পড়বে বলে লেখা হচ্ছে না।" পাঠকের মৃত্যু ও লেখকের পুনর্জন্ম? নাকি তার উত্তর-আধুনিক উলট্‌পুরাণ? সন্দীপনের ফুট-নোট দিয়েই শেষ করা যাক—"এমন কোন টেক্সট হয় না যার সাব-টেক্সট নেই। এমন কোন কাহিনী হয় না, যা আগে থেকে ছিলো না।"

গ্রন্থ-সহায়তা

১. *Beginning Theory*–Peter Barry.
২. *Literary Theory From Plato To Barthes*–Richard Harland.
৩. *Towards a post-modern theory of Narrative*–Andrew Gibson.
৪. *Literature in the Modern World*–Denis Walder (ed.)
৫. *Literary Theory*–Jonathan Culler.
৬. *Literature in Psychonalysis*–Steve Vine (ed.)

অস্তিবাদ ও সাহিত্য
সাহিত্যে অস্তিবাদ
অর্ক চট্টোপাধ্যায়

১. অস্তিবাদ : শিকড় থেকে শাখা-প্রশাখায়

"In default of inexhaustible happiness, eternal suffering at least would give us a destiny. But we do not have even that consolation and our worst agonies come to an end one day." [অ্যালবেয়ার ক্যামু]

"What do I know of man's destiny? I could tell more about radishes."

[স্যামুয়েল বেকেট]

অস্তিবাদের উৎস-সন্ধানের প্রক্রিয়া অন্তরঙ্গেই কূটাভাসগ্রস্ত। কারণ 'উৎস' নিজেই একটি নির্যাসবাদী (essentialist) প্রত্যয়। আর অস্তিবাদ (Existentialism) মূলগত ভাবেই নির্যাসের বদলে অগ্রাধিকার দেয় অস্তিত্বকে— Existence precedes Essence'. অস্তিবাদের রূপরেখা তাই অস্তিত্বের উৎসের থেকেও অনেক বেশি করে অস্তিত্বের অস্তিত্বতা নির্ণয়ের প্রকল্প। এই প্রবন্ধের আলোচ্য অস্তিবাদ ও সাহিত্যের ভিতরকার সম্পর্ক ও তার স্তর-স্তরান্তর, অর্থ-অর্থান্তর। অস্তিবাদ ও সাহিত্যের সম্পর্ক শুধুই দর্শন-তত্ত্ব/প্রণালী ও তার প্রয়োগের নয়, তা' বহুসময়ই দর্শন ও সাহিত্যের একক হয়ে যাওয়া তথা পরস্পরের মধ্যে লীন হয়ে যাওয়ারও সম্পর্ক। সে সম্পর্কে অস্তিবাদ কখনও দর্শন তো কখনও তা' সাহিত্যকর্মের ভিতরকার এক টেক্সট মাত্র। সার্ত্র, উনামুনো, ক্যামু— একাধারে দার্শনিক ও সাহিত্যিক। দর্শন ও সাহিত্য তাঁদের লেখায় পরস্পরের পরিপূরক। বিংশ শতাব্দীর প্রথম পর্বের আধুনিকতা থেকে দ্বিতীয় পর্বের উত্তর-আধুনিক, উত্তর-গঠনবাদী তথা উত্তর-ঔপনিবেশিক প্রেক্ষিত পর্যন্ত সতত পরিবর্তনশীল অস্তিবাদ ও সাহিত্যের এই সংলাপ। অস্তিবাদ কখনও নির্যাসবাদী একরূপতা ও বস্তুনিষ্ঠার বিরুদ্ধে গড়ে ওঠা এক প্রান্তিক (Marginalist) কণ্ঠস্বর, আবার কখনও (বিশেষত বিংশ শতাব্দীর দ্বিতীয়ার্ধে) তা' নিজেই এক সর্বময় প্রতর্ক বা 'master-narrative' এবং সাহিত্যকার তাঁর রচনায় তাকে স্থান দিতে চান নিতান্তই একটি টেক্সট্-রূপে, সর্বময়তার বিরোধিতায়।

বিভিন্ন দেশের সাহিত্যের প্রেক্ষিতে এই ইতিহাস ও তার পর্ব-ছেদ বর্তমান প্রবন্ধের আলোচ্য বিষয়। তবে তার আগে অস্তিবাদী দর্শনের পরিসরটি দেখা নেওয়া জরুরি।

'অস্তিত্ব নির্যাসের পূর্ববর্তী'— খুব সংক্ষেপে এই হল অস্তিবাদের দাঁড়াবার জায়গা। যে কোনো দ্রব্য বা বিষয়-এর সারবত্তা বা নির্যাস (Essence) নয়, তার প্রথম ও প্রধান পরিসর তার অস্তিত্ব (Existence), অর্থাৎ নির্দিষ্ট দেশ-কালে তার অধিষ্ঠান। এই অস্তিত্ব থেকেই পর্যায়ক্রমে নিঃসৃত হয় তার নির্যাস। অস্তিবাদ/অস্তিবাদীর বক্তব্য অনুসারে দেকার্ত-এর 'I think, therefore I am' অর্থাৎ 'আমি চিন্তা করি, সুতরাং আমি আছি', এই বচনটি বদ্‌লে গিয়ে হয়ে ওঠে, 'I am, therefore I think', অর্থাৎ 'আমি আছি, সুতরাং আমি চিন্তা করি'। চিন্তার নির্যাসের পূর্বে এভাবেই স্থাপিত হয় অস্তিত্বশীলতার অমোঘ উচ্চারণ।

২. অস্তিবাদী দর্শন : কিয়ের্কেগার্দ থেকে সার্ত্র :

সোরেন কিয়ের্কেগার্দ-ই কি প্রথম অস্তিত্ববাদী? জাঁ পল সার্ত্রই কি শেষ অস্তিবাদী? সম্ভবত না। নিশ্চয়ই না। অস্তিবাদের ভাবনা-বীজ উপ্ত দর্শনের আদিকালে, গ্রিক নিয়তিবাদে, খ্রিস্টপূর্ব সংশয়বাদী মানুষের মুখের বলিরেখায়, সভ্যতার সূচনা থেকে সূত্রপাত হওয়া মরণশীলতার নিরীক্ষণে, অস্তিত্ব তথা জীবন ও পৃথিবীর অর্থ অনুধাবনে, মৃত্যুর মাধ্যমে অনস্তিত্বের স্বরূপকল্পে। অস্তিত্বের প্রাচুর্য ও অতিরিক্ততা, অসহায়ত্ব ও যন্ত্রণা-সংশয় রূপ পায় অস্তিবাদী ভাবুকতায়। আবার মুদ্রার অন্য পিঠে অস্তিবাদ জীবনের, নৈতিকতার, সক্রিয়তার, মানব ইচ্ছা-শক্তি ও মন্ময়ত্বের প্রতিষ্ঠাকামী এক অনুসন্ধিৎসা।

ডেনমার্ক-এর ধর্মতত্ত্ববিদ সোরেন কিয়ের্কেগার্দ (১৮১৩-১৮৫৫)-এর চিন্তনেই আনুষ্ঠানিকভাবে একালের অস্তিবাদী দর্শনভাবনার গোড়াপত্তন। জার্মান দার্শনিক হেগেল-এর বিরোধিতায় কিয়ের্কেগার্দ-এর বক্তব্য ছিল যে-কোনো চিন্তন-প্রণালীই ব্যক্তির নিজস্ব অভিজ্ঞতাকে ব্যাখ্যা করতে পারে না। কিয়ের্কেগার্দের অস্তিবাদ মূলত ঈশ্বর-বিশ্বাস তথা আস্তিকতার ভিত্তিতে প্রতিষ্ঠিত। ক্যামু, সার্ত্র, হাইডেগারের মতো তিনি ঈশ্বরের অস্তিত্বে অবিশ্বাস করেন নি, যদিও যুক্তিতর্কের মাধ্যমে ঈশ্বরকে জানা যায় না, এমন কথাও বলেছেন, বলেছেন ঈশ্বরকে জানতে প্রয়োজন 'বিশ্বাসের উল্লম্ফন' বা 'leap of faith'। তাঁর Cncluding Unscieniifc Postseript to Philosophicel Fragments'— এ তিনি সব রকমে সত্য (Truth)-কেই মন্ময় ও মন্ময়ত্ব (subjectivity)-কেই সত্যের ধারক ও চালিকাশক্তি রূপে চিহ্নিত করেছেন। তাঁর মতে ঈশ্বরের অনুসন্ধানও এক নিতান্তই মন্ময়-প্রক্রিয়া; ঈশ্বরের বিরাজমানতা বস্তুজগতে নয়, মানুষের চৈতন্যলোকে। বস্তুজগতে ঈশ্বরের খোঁজ পরস্পর বিরোধী অভিজ্ঞতার জন্ম দেয়। সে অভিজ্ঞতা যুগপৎ আশা ও হতাশার, উপস্থিতি ও অনুপস্থিতির অভিজ্ঞতা। ঈশ্বরের অস্তিত্বগত সত্যতাও তাই একেবারেই মন্ময়। হেগেলীয় প্রত্যয়ের বিরোধিতায় "subjectivity' -কেই কিয়ের্কেগার্দ ব্যক্তিমানুষের অস্তিত্বের ভিত্তিরূপে নির্দেশ করেছেন। 'মানবতা' নামক বহুবাচনিকতা থেকে জাতি একক-ছিন্ন একাকী ব্যক্তিমানুষের ওপর দৃষ্টিপাত করেছেন। তাঁর মতে, কোনো এক ব্যক্তিমানুষ কিছুতেই কোনো বিমূর্ত সামান্য (universal) ধারণা নয় যা এক বহুবাচনিক এককত্বে উপলব্ধ হতে পারে। তাঁর কাছে অস্তিত্বের অর্থ (meaning) নিরূপিত হয় অস্তিত্ব ও তার সক্রিয়তার মাধ্যমে, ব্যক্তিমানুষের কর্মনিষ্ঠায়, আবেগনিষ্ঠায়, দায়িত্বপালনে এবং তার প্রাপ্ত স্বাধীনতা (Freedom)-র প্রয়োগে। দেকার্ত-এর বচনকে সংশোধন করেই যেন কিয়ের্কেগার্দ বলেন—'Because I exist and because I think, therfore I think that

I exist...I must exist in order to think.' মানুষের অস্তিত্বকে তিনি তিনটি পর্যায়ে বিভক্ত করেন— (ক) The Aesthetic stage বা নান্দনিক পর্যায়; (খ) The Ethical stage বা নৈতিক পর্যায়; (গ) The Religious stage বা ধর্মতাত্ত্বিক পর্যায়। তাঁর মতে, এই পর্বগুলিই 'অস্তিত্বের দ্বান্দ্বিকত্ব' ('existential dialectic') নির্মাণ করে। তবে তিনি এই পর্বগুলির একটি থেকে অন্যটিতে প্রবেশের কোনো যৌক্তিক প্রসক্তির সংযোগ স্থাপন করতে পারেননি বা চাননি। সার্ত্র-এর মতোই কিয়ের্কেগার্দও মনে করেন যে স্বাধীনতা অস্তিত্বের একটি 'পূর্ব-প্রদত্ত' ('pre-given') অবস্থা। মানুষের ওই স্বাধীনতার দিকে যাত্রা তাই নির্মাণমূলক নয়, অনুসরণমূলক। তবে ওই স্বাধীনতাকে আত্মস্থ করায় প্রক্রিয়া একাধারে সত্তার আত্মজ্ঞানলাভের প্রক্রিয়া এবং অন্যদিকে অস্তিত্বের মাধ্যমে নির্যাস নির্মাণের এক আবশ্যক (necessary) প্রক্রিয়া। কিয়ের্কেগার্দ বলেন—"However freely he develops, an individual can never reach the point where he is absolutely independent because true freedom consists in appropriating what is already given. Consequently the individual is, through freedom, absolutely dependent upon that which is already given." আর এই স্বাধীনতা থেকেই জন্ম 'despair'-এর। কিয়ের্কেগার্দ তাঁর *The Concept of Dread* (1844) এবং *The Sickness unto Death* (1849)-এ এই 'সংশয়' ('angst') নিয়ে আলোচনা করেছেন। প্রদত্ত স্বাধীনতার দ্বারা ঈশ্বরের প্রতি দায়িত্ব পালনে সম্ভাব্য ব্যর্থতার আশঙ্কা থেকেই এই অস্থিরতা ও সংশয় তৈরি হয়। তাঁর *Fear and Trembling* (1843) গ্রন্থে কিয়ের্কেগার্দ 'জেনেসিস'-এ বর্ণিত আব্রাহাম-এর কাহিনিটি ব্যবহার করে ধর্মতাত্ত্বিক বিশ্বাসকে প্রশ্ন করেন জোরালোভাবে। ঈশ্বর যখন আব্রাহামকে আদেশ দিয়েছিলেন তার পুত্র আইজ্যাককে হত্যা করে ঈশ্বরের কাছে অর্পণ করতে, তিনি কি আসলে আব্রাহাম-এর বিশ্বাসের পরীক্ষা নিচ্ছিলেন? আব্রাহামের ঈশ্বরের প্রতি বিশ্বাস ও তাঁর আদেশ পালনের দৃষ্টান্তটি ব্যবহার করে কিয়ের্কেগার্দ ঐশ্বরিক বিশ্বাস ('faith') এবং অ্যাবসার্ডিটির মধ্যে এক সম্পর্ক স্থাপন করেছিলেন। আব্রাহামের বিশ্বাস যে সে নিজের হাতে ছেলেকে হত্যা করার পরেও তার জীবদ্দশায় তাকে ফিরে পাবে। এই বিশ্বাস অ্যাবসার্ডিটিরই নামান্তর। ঈশ্বর-বিশ্বাসের অ্যাবসার্ডিটির এই পর্যবেক্ষণ উত্তরকালে ক্যামুর অস্তিত্ববাদী অ্যাবসার্ডিটির ধারণার এক ইঙ্গিতময় পূর্ব-প্রক্ষেপ।

জার্মান দার্শনিক মার্টিন হাইডেগার (১৮৮৯-১৯৭৬)-এর অস্তিবাদী ভাবুকতা ঈশ্বরবর্জিত। তিনি ঈশ্বরের অস্তিত্বে বিশ্বাসী ছিলেন না। তাঁর কাছে অস্তিত্ব মানেই মানব-অস্তিত্ব। *Existence and Being* (1949)-এ হাইডেগার বলেন, "Man alone exists. Angels are, but they do not exist. Rocks are but they do not exist....God is but he does not exist." ফেনোমেনোলজির প্রবর্তক পূর্বসূরি এড্‌মন্ড হুসার্ল-এর দর্শন প্রণালীর অনুসরণে তাঁর বিখ্যাত গ্রন্থ *Being and Time* (1927)-এ হাইডেগার 'Dasein' বা 'being-in-the-world'-এর কথা বলেন। মানব জন্ম এক অনৈচ্ছিক এবং ইচ্ছার উর্ধ্বে থাকা নিক্ষেপ প্রক্রিয়া। তাই অস্তিত্বের কেন্দ্রে বিরাজ করে 'নিক্ষিপ্ততা' বা 'throwness'-এর চিরস্থায়ী উপলব্ধি। এই 'Dasein' তাই এক পূর্বপ্রদত্ত সত্তা (posited being) যার ওপর জমে থাকে ব্যাখ্যা (interpretations)-র পাহাড়। আমরা শুধু ওই ব্যাখ্যাগুলিকেই ব্যাখ্যা করে থাকি। অস্তিত্ব তথা 'Dasein'-এর প্রকৃত রূপ অনুন্মোচিতই থেকে যায়। তাই ব্যাখ্যার কোনো ক্ষমতা নেই শেষ পর্যন্ত। এ-ও এক ধরনের অ্যাবসার্ডিটি।

হাইডেগার 'Dasein'-এর তিনটি অস্তিত্ব-কাঠামো নির্দেশ করেছেন— (ক) Existenz ; (খ) Facticity ; (গ) Fallenness। তাঁর মতে 'Dasein'-এর প্রকাশের ধারাই হল সময়-ক্ষেপ ('temporality')। হাইডেগার ভাষার গুরুত্বের কথাও স্বীকার করেছেন— 'Language is the house of being'। অস্তিত্বের অর্থ নির্ণয় তাই অস্তিত্বের যথাযথ প্রকাশের জন্য এক ভাষা-সন্ধানও বটে। এই দিক থেকে তাঁর অস্তিবাদ স্যামুয়েল বেকেট বা উইলিয়াম বারোজ-এর রচনার খুব নিকট-আত্মীয়। হাইডেগার-এর অস্তিবাদী অনুসন্ধান এক অত্যন্ত মূলগত প্রশ্নের ওপর দাঁড়িয়ে— 'Why is there Being at all ? সার্ত্র-এর মতো তাঁর প্রশ্ন—কেন অস্তিত্ব আছে, রয়েছে বরাবর, এবং কেন তাকেই বা থাকতে হবে 'nothingness' বা সামুহিক অনস্তিত্বের পরিবর্তে? অস্তিত্ব কি তাহলে শুধুই পূর্ব-প্রদত্ত (given) ও বাধ্যতামূলক?

হাইডেগার তাঁর দার্শনিক পদ্ধতিতে 'অধিবিদ্যা' বা 'metaphysics'-কে অতিক্রম করে যাবার কথা বলেছেন, কারণ 'অধিবিদ্যা' অস্তিত্বকে শুদ্ধ রূপেই স্থাপন করার চেষ্টা করে। কিন্তু হাইডেগার-এর মতে 'Dasein'-এর নিজস্ব ধর্মই হল 'concealedness' বা লুকিয়ে থাকা, বিশ্লেষণের আবরণে। মানব-ভাষার পক্ষে সেই বিশ্লেষণ-কেন্দ্রে পৌঁছোনো অসম্ভব। তাই *The Nature of Language* (1975)-এ এক অন্য ভাষার খোঁজ করেছেন হাইডেগার। অস্তিত্ব তাঁর কাছে হয়ে উঠেছে এক ভাষা-একক। এমনকি মৃত্যুর মধ্যে দিয়ে সৃষ্ট অনস্তিত্বও ভাষার ব্যাপার—"Mortals are they who can experience death as death. Animals cannot do so. But animals cannot speak either. The essential relation between death and language flashes up before us, but remains still unthought." ১৯৪৩-এ *On the Essence of Truth*-এ 'essence of truth'-এর পাশাপাশি হাইডেগার আলোচনা করেছেন 'truth of essence' নিয়ে। নির্যাসের সত্যতা শুধুমাত্র অস্তিত্বে, তার নিরিখে এবং তারই মাধ্যমে "...But in the concept of 'essence', philosophy thinks being". হাইডেগার এভাবেই অস্তিত্বকে নির্যাসের পূর্বে স্থাপন করেছেন।

ফরাসি লেখক-দার্শনিক জাঁ পল সার্ত্র (১৯০৫-১৯৮০) অস্তিত্ববাদী চিন্তা-কাঠামোয় এক নতুন সজীব প্রেক্ষিত তৈরি করেন বিশ শতকের মাঝামাঝি সময় থেকে। অস্তিত্ববাদের এক নতুন আদল গড়ে ওঠে যেখানে এই ডিসকোর্স-এর এক নব্য রাজনৈতিক তথা আর্থ-সামাজিক ভাষা পরিস্ফুট হতে থাকে। সার্ত্র-এর অস্তিত্ববাদ শুধু বিমূর্ত দর্শনভাবনা নয়, তা' সমকালীন রাজনীতি, বামপন্থী মতাদর্শ ও তার সমালোচনা, এবং উত্তর-ঔপনিবেশিক প্রতিবাদ-ভাষ্যের দ্বারা দীক্ষিত এক নতুন প্রায়োগিক অস্তিবাদ। *Nausea* (1938) ও *The Age of Reason* (1945)-এর মতো উপন্যাস বা *No Exit* (1944)-এর মতো নাটকের লেখক সার্ত্র-এর অস্তিত্বের সত্যতা নিরূপণের নানা প্রচেষ্টা। তবে দার্শনিক সার্ত্র-এর প্রধান অস্তিবাদী দর্শন-গ্রন্থ *Being and Nothingness* (1943), যা তাঁর মতে এক ধরনের 'Phenomenological ontology'। অনস্তিত্ব তথা 'nothingness'-ই এই গ্রন্থের আলোচ্য। চেতনা-কাঠামোর নেতিকরণের মাধ্যমেই তৈরি হয় অনস্তিত্বের ও,ই শূন্যতা যা অস্তিত্বের পরিপূরক এক দোসর সত্তায় পরিণত হয় ক্রমশ। সার্ত্র-এর মুখ্য প্রতিপাদ্য হল চেতনা এবং অনস্তিত্ব তথা সর্বময় শূন্যতা (nothingness)-এর সমীকরণ। তাঁর মতে '...consciousness is what it is not and which is not what it is.' চেতনা কোনো বস্তু নয়, যদিও তা কোনো বস্তুকে নির্দেশ করে এবং তার সঙ্গেই একাত্ম হয়ে পড়ে। চেতনা এক ভবিষ্যৎ সম্ভাবনা মাত্র; তা' কখনই

বর্তমানে সীমাবদ্ধ নয়; তার চরিত্র সর্বদাই আত্ম-অতিক্রমকারী। চেতনা সেটাই যেটা তা' নয়। চেতনা এক অনুপস্থিতি পৃথককরণ তথা নেতিকরণের পদ্ধতিতে কাজ করে।

অস্তিত্ব সার্ত্র-এর কাছে দ্বিমুখী— (ক) Being-in-itself ; (খ) Being-for-itself, এবং তাঁর মতে, 'The for itself is perpetualy determinng itself not to be the in-itself.' এই 'in-itself'-এর এক অভাব বা অনুপস্থিতি চেতনার কেন্দ্রে রয়েছে। এই নেতিকরণের প্রক্রিয়াতেই চেতনা নিজেকে সংজ্ঞায়িত করে; চেতনা কোনো বস্তুকে অনুপস্থিত বা অন্যত্র উপস্থিত বলে চিহ্নিত করতেই পারে, এবং তা' থেকেই তৈরি হয় 'nothingness'; আর এই শূন্যতাকে চালনা করে এক স্বাধীনতার অস্তিত্ব-চয়ন বা নির্বাচনের স্বাধীনতা (freedom of choice/selection)। না চয়ন করা ও না-চয়ন-করাকে চয়ন করা আর তাই তা-ও এই স্বাধীনতার পরিধিভুক্ত। কিয়ের্কেগার্দ-এর মতো সার্ত্র-এরও অভিমত, 'Man is condemned to be free'। তাঁর *Existentialism and Humanism* (1946) গ্রন্থে সার্ত্র নির্দিষ্টভাবে অস্তিত্ববাদের গতিমুখগুলি চিহ্নিত করেন, যাবতীয় সমালোচনার প্রত্যুত্তরসহ। তিনি ব্যাখ্যা করেন যে অস্তিবাদ যে ধরনের 'subjectivism' বা মন্ময়বাদের কথা বলে, তাতে ব্যক্তিমানুষের উপর যেমন দৃষ্টি নিক্ষিপ্ত হয় তেমন তা'রই মাধ্যমে আরোহী (inductive) প্রক্রিয়ায় সমগ্র মানবজাতি নিয়েও আলোচনা হয়। সার্ত্র বলেন, 'In fashioning myself I fashion man', অর্থাৎ ব্যক্তিমানুষ তার এককত্ব থেকেই মানবজাতির সমষ্টি নির্মাণ করে। সার্ত্র আরও বলেন যে অস্তিবাদের 'anxiety' বা 'সংশয়' কোনো নৈরাশ্য বা স্থবিরতার সূচক নয়; বরং তার জন্ম হয় ব্যক্তি-মানুষের জাতি-একককে উত্তীর্ণ করার দায়িত্বের এক ঐকান্তিকতা থেকে। ঈশ্বরের অনুপস্থিতি মানুষের ওই দায়বদ্ধতাকে আরও বাড়িয়ে তোলে। সার্ত্র-এর অভিমতে তাই অস্তিবাদ হল এক পরম সক্রিয়তার মতবাদ। তা' মানবতাবাদেরই ভিন্নরূপ মাত্র। তবে সার্ত্র মনে করেন যে এই মানবতাবাদের স্বাতন্ত্র্য হল তা' মানবতাবাদকে কোনো চূড়ান্ত লক্ষ্য বা 'end' বলে ভাবে না। মানুষ সবসময়ই নিজেকে অতিক্রম করতে থাকে; সার্ত্রর ভাষায়— 'Man is his own transcendence '

ফ্রিড্‌রিশ্ নিৎশের (১৮৪৪-১৯০০) নামও উঠে আসে অস্তিবাদী ভাবুকতার ইতিহাস আলোচনায়। এই র‍্যাডিক্যাল জার্মান দার্শনিকের খ্যাতির উৎসে তাঁর *Thus Spake Zarathrusta*, (1891) গ্রন্থ এবং তাঁকে নিয়ে বিতর্কের কেন্দ্রে এই গ্রন্থে নিৎশে-কথিত "God is dead' ঘোষণাটি। ঈশ্বরের মৃত্যু-ঘোষণার প্রেক্ষিতে নিৎসে খ্রিস্টধর্মের নিরঙ্কুশ নৈতিকতাকে 'slave morality' বলে প্রত্যাখ্যান করেন এবং মানুষের নিজেদের মূল্যবোধ নির্মাণের স্বাধীনতার পক্ষে সওয়াল করেন। তাঁর 'Super-man' ('Ubermensch')-এর আদর্শ— যা কিনা মানবজাতির ভবিষ্যৎ— তার মধ্যে দিয়ে তিনি অতিক্রম করে যান 'good and evil' সব সাদা-কালো তক্‌মাকে। তাঁর 'Superman'-এর প্রধান লক্ষণ হল তার 'will to power' যা সে প্রয়োগ করবে দুর্বলচিত্তদের ওপর। নিৎশে-কথিত ঈশ্বরের মৃত্যু নির্যাসের মৃত্যুরই ইঙ্গিতবহ। নৈতিক স্থিতিশীলতার ঊর্ধ্বে তাঁর *Beyond Good and Evil* (1886) তাই নৈতিক নির্যাস নয়, নৈতিকতার অস্তিত্বের কথাই বলে। তাঁর এক খ্যাতিমান পূর্বসূরি, আর এক জার্মান দার্শনিক আর্থার শোপেনহাওয়ার (১৭৮৮-১৮৬০)-এর নৈরাশ্যবাদী বিশ্বদৃষ্টি নিৎশেকে প্রভাবিত করেছিল। প্রসঙ্গত শোপেনহাওয়ার-এর *The World as Will and Idea* (1818) গ্রন্থটি বিশেষভাবে স্মরণযোগ্য।

অস্তিবাদী দর্শনভাবনার পরম্পরা ও বৈচিত্র্যের সন্ধানে আরো যাঁদের কথা নানাভাবে স্মরণযোগ্য তাঁদের মধ্যে আছেন হাইডেগারের ঈষৎ পরবর্তী জার্মান দর্শনবেত্তা কার্ল ইয়াস্‌পার্স (১৮৮৩-১৯৬৯), *Philosophy* (1932) গ্রন্থের রচয়িতা। আছেন স্পেনদেশীয় লেখক মিগুয়েল ডি উনামুনো (১৮৬৪-১৯৩৬), যার *The Tragic Sense of Life* (1913) যুক্তি এবং বিশ্বাস-এর দ্বন্দ্ব নিয়ে লেখা, যা মৃত্যুর নিশ্চয়াত্মকতা এবং তৎসত্ত্বেও অমরত্বের প্রতি মানুষের চিরন্তন বাসনার টানাপোড়েন ও এক সৃজনী অনিশ্চয়তা (creative uncertainty)-র অস্তিবাদী দৃষ্টিভঙ্গিকে ফুটিয়ে তুলেছিল। এ ছাড়াও উল্লেখ করা প্রয়োজন সার্ত্র ও অপরাপর ফরাসি অস্তিবাদী লেখক-দার্শনিক গোষ্ঠীর Simone de Beauvoir ও Maurice Merleau-Ponty-র নাম। সরবোন্ বিশ্ববিদ্যালয়ের দর্শনের শিক্ষক সিমোন দ্যঁ বোভায়া (১৯০৮-১৯৮৬) ছিলেন সার্ত্র-এর সঙ্গিনী, আর মারলিউ-পন্টি (১৯০৮-১৯৬১) ছিলেন হুসার্ল পরবর্তী ফেনোমেনোলজি-র সবচাইতে গুরুত্বপূর্ণ ব্যক্তিত্ব। তাঁর *The Phenomenology of Perception* (1945) গ্রন্থে অভিজ্ঞতা ও চেতনার আলোচনায় তিনি মূল্যবান আলোকপাত করেছেন।

আলোচনার এই পর্বের শেষে অ্যালবেয়ার ক্যামু (১৯১৩-১৯৬০)-র কথা। ক্যামু-র *The Outsider* (1942), *The Fall* (1956), *The Plague* (1947)-র মতো উপন্যাসগুলি অস্তিবাদী সাহিত্যের উল্লেখযোগ্য মাইলফলক বলে গণ্য হলেও সেগুলি বর্তমান প্রবন্ধের অন্যত্র আলোচিত হবে। এখানে আমাদের আলোচ্য ক্যামু-এর দর্শনগ্রন্থ *The Myth of Sisyphus* (1942), যে-বইটির মাধ্যমে অস্তিবাদের বিকাশের ইতিহাসে সংযোজিত হয় 'absurdism'-এর ধারণা। ক্যামু-র মতে অস্তিত্বের গভীরে রয়েছে এমন এক রহস্য যা কোনো একমাত্রিক বা সরলরৈখিক যুক্তিকাঠামোর দ্বারা বিশ্লেষণযোগ্য নয়। মানব-অস্তিত্বের অন্তর্গত অর্থহীনতাই হল 'অ্যাবসার্ডিটি'; মানুষের সঙ্গে তার পৃথিবীর যোগাযোগই হল 'অ্যাবসার্ড'। ক্যামুর চরিত্রেরা এমনই এক অযৌক্তিক মানব-বিশ্বে একাকী ও অপরিচিত— "A world which can be explained, even through reasoning, is a familior one. On the other hand, in a world suddenly devoid of illusion and light, man feels like a stranger." আত্মহননই কি তবে এই অর্থহীন অস্তিত্বযাপন থেকে মুক্তির উপায়? হ্যাঁ এবং না। কারণ ক্যামু এক 'philosophical suicide'-এর কথা বলেন, দস্তয়েভ্‌স্কি-র উপন্যাসের ব্যাখ্যার মাধ্যমে। আক্ষরিক অর্থে আত্মহনন নয়, যৌক্তিক সত্তা থেকে সরে আসা এবং যাবতীয় সাফল্য— চিন্তন থেকে মুক্তিই এই আত্মহত্যার স্বরূপ— "Living the absurd...means a total lack of hope (which is not the same as despair), a permanent rejection (which is not the same as renunciation) and a conscious dissatisfaction (which is not the same as juvenile anxiety)." ঈশ্বরের বিধানে শাস্তিপ্রাপ্ত সিসিফাস-এর একটি বিশাল পাথর নিয়ে পাহাড়চূড়ায় ওঠার পরিশ্রম ও পাথরটির গড়িয়ে নেমে আসা এক অন্তহীন প্রক্রিয়া; ক্যামু-র কাছে সিসিফাস-এর এই দণ্ডাজ্ঞাপ্রাপ্ত অস্তিত্বের ক্রিয়া মানুষের 'absurd action'-এর প্রতীক স্বরূপ। তার অস্তিত্ব এক নিয়ত পুনরাবৃত্ত চক্রের মতো। শেক্‌স্‌পিয়ার-এর নাটকের ম্যাকবেথ চরিত্রের স্বগত কথনে যা আমরা অনেক দিন আগেই শুনেছিলাম— ' To-morrow, and to-morrow, and to-morrow,/Creeps in this petty pace from day to day." তবে ক্যামুর মতে, এই পুনরাবৃত্ত অর্থহীন প্রক্রিয়ার মধ্যেও লক্ষণীয় সিসিফাস-এর সক্রিয়তা। সে কখনই স্থবির নয়; বরং পাহাড়চূড়ায় পৌঁছোবার পর যখন পাথরটি নেমে আসে, তার চিন্তার পরিসরে যেভাবে তার নিয়তির সচেতনতা ও সম্যক জ্ঞান তৈরি হয়, তাই

এই প্রক্রিয়ার সার্থকতা— "It is during that return, that pause, that Sisyphus interests me. A face that toils so close to stonee is already stone itself !...that is the hour of consciousness..., he is superior to his fate. He is stronger than his rock.' ক্যামুর এই 'absurd action'-ও আসলে কূটাভাসে আক্রান্ত; আপাতভাবে অর্থহীন অথচ প্রকৃতপক্ষে আত্ম-চৈতন্য প্রদায়ক—'Each atom of that stone, each mineral flake of that night-filled mountain, in itself forms a world. The struggle itself towards the heights is enough to fill a man's heart. One must imagine Sisyphus happy.' সিসিফাস এই মানব-অস্তিত্বের চলমান ইতিহাসের দিশারী। অস্তিত্বের অর্থ তার চিরন্তন এই যাত্রা, কোনো নির্যাসরূপ লক্ষ্যবস্তু নয়।

৩. অস্তিবাদ ও বিশ শতকের ভাবুকতা : তাত্ত্বিক ও প্রায়োগিক যোগাযোগ

প্রায় গোটা বিশ শতক জুড়ে, কখনও তাত্ত্বিক নৈকট্যে, কখনও লেখকদের বৈচিত্র্যপূর্ণ প্রয়োগে অস্তিবাদ প্রায় প্রতিটি নন্দনভাবনা তথা আন্দোলনের সঙ্গে যুক্ত হয়েছে। হাইডেগার-কে গঠনবাদী (structuralist) এবং উত্তর-আধুনিকতাবাদী (Post-Modernist) বলা হয়েছে। সার্ত্র ঔপনিবেশিক (colonial), নয়া-ঔপনিবেশিক (Neo-colonial) এবং উত্তর-ঔপনিবেশিক (Post-colonial) ভাবুকতার সঙ্গে একাত্মবোধ করেছেন। তিনি লিখেছেন *Colonialism and Neo-colonialism* (1964) নামক গ্রন্থ। ফ্র্যান্টস্ ফ্যানন-এর *The Wretched of the Earth* (1963)-এর মতো উত্তর-উপনিবেশবাদী তত্ত্বভাবনার একটি মাইলফলকের মুখবন্ধও তাঁর লেখা। আসলে সার্ত্র-এর নির্যাস-বিরোধিতা এক বিশেষ তাৎপর্যে ঔপনিবেশিক শাসনের সর্বাত্মক রাষ্ট্র-কাঠামোরও এক বিরোধিতা হয়ে উঠেছে। উত্তর-ঔপনিবেশিক মানুষ রাষ্ট্রের দ্বারা চাপিয়ে দেওয়া ভুয়ো নির্যাসের ভ্রান্ত নিরাপত্তায় তুষ্ট হয়ে থাকবে না। জানান দেবে তার নিজস্ব অস্তিত্ব। এমনটাই আশা করেছেন সার্ত্র। প্রায়োগিক ক্ষেত্রেও উত্তর-ঔপনিবেশিকতা ও অস্তিবাদী প্রবণতার মধ্যে সেতুবন্ধ লক্ষ করা যায় স্যামুয়েল বেকেট ও জে. এম. কয়েট্জির রচনায়। জন্মসূত্রে আইরিশ বেকেট-এর আয়ারল্যান্ড থেকে স্বেচ্ছা-নির্বাসন নেওয়া, প্যারিস-এ থাকা ও ফরাসি ভাষায় লেখার সিদ্ধান্ত এবং সর্বোপরি তাঁর উপন্যাস ও নাটকগুলিতে আইরিশ অস্তিত্ব নির্মাণের প্রক্রিয়ায় ব্রিটিশ ঔপনিবেশিক হস্তক্ষেপ এক অস্তিবাদী রূপকের আশ্রয়ে ব্যক্ত হয়েছে। কয়েট্জির *The Life and Times of Micheel K* (1983) কিংবা *Slow Man* (2005)-এর মতো উপন্যাসেও অস্তিবাদী দর্শনের সঙ্গে মিশে গেছে দক্ষিণ-আফ্রিকা-র অ্যাপারথিড়-পরবর্তী বর্ণ-রাজনীতির উত্তর-ঔপনিবেশিক ডিসকোর্স। সমকালীন বাংলা থিয়েটারে বাদল সরকার তাঁর বিভিন্ন নাটকে মানুষের অস্তিত্বের অ্যাবসার্ডিটি, একাকীত্ব, সংশয় ও অসহায়ত্বকে রাজনৈতিক টেক্সট্ রূপে ব্যবহার করেছেন, যুক্ত করেছেন স্বাধীনতা-পরবর্তী বাংলার অর্থনৈতিক সমস্যা তথা শোষণ ও অনাহারের ইতিহাসের সঙ্গে, যা এক উত্তর-ঔপনিবেশিক প্রতিস্পর্ধার বয়ান নির্মাণ করে। একালের বাংলা উপন্যাসের ব্যতিক্রমী লেখক সন্দীপন চট্টোপাধ্যায় ও নবারুণ ভট্টাচার্যের লেখাও এই সংযোগের সাক্ষ্য বহন করে। এ-বিষয়ে বিশদে কথা হবে এ-আলোচনার পরবর্তী অংশে।

অস্তিবাদের আর এক ধরনের রাজনৈতিক প্রয়োগ দেখা যায় অনিতা দেশাই-এর উপন্যাসে। তাঁর *The Voices in the City* (1965)-তে নিরোদ ও আমলার মধ্যে অস্তিবাদী প্রবণতা লক্ষ করা যায়। তারা ক্রমাগত ওই প্রবণতাকে ভাষ্যরূপ দেয় কাফ্কা-ক্যামু প্রমুখের উদ্ধৃতি ব্যবহার করে। দেশাই-এর অনন্য দৃষ্টিতে এক্ষেত্রে অস্তিবাদ এই ভারতীয় চেতনার কাছে নিজেই হয়ে

ওঠে ইউরোপীয় এবং ঔপনিবেশিক এক নির্মিতি। একই ধরনের প্রয়োগ লক্ষণীয় গিরিশ কারনাড্-এর *বিখ্রে বিম্ব* নাটকটিতে। 'থিয়েটার অব দ্য অ্যাবসার্ড'-এর অন্যতম নাট্যকার ইউজিন আয়োনেস্কোর *The Rhinoceros* (1959)-এ গোটা শহরের সমস্ত মানুষের এক দুর্বোধ্য রোগে গন্ডারে পরিণত হওয়ার মধ্যেও নাৎসি শোষণ-পীড়নের প্রতিফলন দেখা যায়। ফরাসি দেশের আর এক অস্তিবাদী নাট্যকার জাঁ জেনে-ও তাঁর *The Balcony* (1956) বা *The Blacks* (1958) নাটকে রাজনৈতিক সমীকরণ/ভাষ্য নির্মাণ করেছেন।

উত্তর-আধুনিকতার সঙ্গে অস্তিবাদের সম্পর্ক অত্যন্ত নিবিড়। এর কিছু তাত্ত্বিক কারণ রয়েছে। নির্যা·. বা 'Essence'-এর সর্বময়তার যে বিরোধিতা অস্তিবাদের মূল, তা' ও লিওটার্ড-এর ভাষায় এক প্রকার 'meta narrative' বা 'সর্বময় প্রতর্ক'-র বিরোধিতা। লিওটার্ড এই সর্বময় প্রতর্ক-খণ্ডনকেই উত্তর-আধুনিকতার প্রধানতম লক্ষণ বলেছেন। 'ডি-কন্স্ট্রাক্শন' তত্ত্বের পুবোধা ফরাসি দার্শনিক জাক্ দেরিদা তাঁর *Writing and Difference* (1967) গ্রন্থের 'Structure Sign and play in the Discourse of Human Sciences' প্রবন্ধে যে 'উত্তর-গঠনবাদী ছেদ' ('post-structuralist break') তৈরি করেছেন, গঠনের ভিতর কেন্দ্রের অনুপস্থিতি প্রতিষ্ঠার মাধ্যমে, সেখানেও তিনি বারবার উল্লেখ করেছেন হাইডেগার ও নিৎশের কথা। দেরিদা-র মতে, হাইডেগার-এর 'Dasein' আসলে এক অনুপস্থিতি। দেরিদা মনে করেন নিৎশেও বিশ্লেষণ-প্রক্রিয়ার মাধ্যমে কোনো যৌক্তিক সত্যে পৌঁছোনোর অসম্ভাব্যতার কথাই বলেছেন। উত্তর-আধুনিকতার আর এক কারিগর চিন্তাবিদ্ জাঁ বদ্রিলার 'fatal objects'-এর তত্ত্বেও তিনি বারবার উল্লেখ ও ব্যবহার করেছেন কিয়ের্কেগার্দ-এর জার্নালকে। 'simulacrum'-এর চূড়ান্ত প্রপঞ্চের তত্ত্বে অস্তিবাদী নির্যাস-বিরোধিতারই এক উত্তরণ ঘটান বদ্রিলা এমন এক মানব-বিশ্বে যেখানে নির্যাসের মৃত্যু হয়েছে এবং অস্তিত্বও শুধুই প্রপঞ্চের এক সদা-চলমান চিত্রশালায় পর্যবসিত। উত্তর-আধুনিক সাহিত্যে মানব-অস্তিত্বকে বহমান বা 'fluid' বলে মনে করা হয়। অস্তিত্ব বদলাতে থাকে, স্বরূপ বা 'Essence'-এর বিনাশ হতে থাকে প্রতি মুহূর্তে এবং অস্তিত্ব এক অসম্ভব unpredictability অর্জন করতে থাকে। বলাই বাহুল্য যে উত্তর-আধুনিক সাহিত্যে এই ধারণা অস্তিবাদেরই দান। স্যামুয়েল বেকেট-কৃত মনোলগ *Krapp's Last Tape* (1958)-এর প্রধান চরিত্র ক্র্যাপ-এর মনে হয় কয়েকবছর আগে রেকর্ডারে নিজের সম্পর্কে রেকর্ড করা প্রতিটি কথাই ভুল। সময়ের প্রতি পর্যায়ে এতই মৃত ওই পুরোনো ক্র্যাপ, এতই সতত বহমান তার মুসাফির-অস্তিত্ব।

দেরিদীয় 'বিনির্মাণ' (Deconstruction) এবং উত্তর-আধুনিক লেখককুল, বিশেষত বেকেট, বারোজ প্রমুখের ভাষা-বিরোধিতা এবং ভাষার মাধ্যমে বাস্তবতার প্রতিফলনের ব্যর্থতা তথা বিনির্মাণের মাধ্যমে এক অন্য তথা প্রতি-ভাষার অনুসন্ধানেও অস্তিত্ববাদী ভাষাতত্ত্বের প্রভাব অনস্বীকার্য। বারোজ-এর মতে 'Language is most efficiently used when it is most efficiently misused.' বেকেট তাঁর উপন্যাস *How It Is* (1961) বা *Warshward Ho* (1983)-তে কিংবা বেকেট তাঁর *Naked Lunch* (1959)-এ ভাষার যে ভাঙা-গড়ার খেলা খেলেন, তা-ও অস্তিবাদের মতোই অস্তিত্বের প্রকাশে নতুন এক ভাষার খোঁজ।

৪. সাহিত্যে অস্তিবাদ : একটি রূপরেখা

যদিও বিশ শতকের ফরাসি সাহিত্যের সঙ্গে অস্তিবাদের সম্পর্ক বিশেষ নিবিড়, আমেরিকান-স্প্যানিশ-জার্মান এমনকি জাপানি সাহিত্যেও অস্তিবাদী দর্শনের প্রভাব উল্লেখযোগ্য। তবে

প্রতিটি দেশই তার নিজস্ব সাহিত্যধারা, রাজনীতি ও সংস্কৃতির সঙ্গে সংগতিপূর্ণ ভাবেই তুলে ধরেছে অস্তিবাদী ভাবনা। বরং ব্রিটিশ সাহিত্যেই অস্তিবাদী ধারায় লেখালিখি প্রত্যক্ষভাবে কোনো আন্দোলনের রূপ নেয়নি। কখনও এলিয়ট-ইয়েট্স্‌দের কবিতায়, কখনও-বা জয়েস-এর উপন্যাসে তার পূর্বপ্রসঙ্গ পাওয়া গেছে, তবে তা' কখনই সুসংবদ্ধ আকার নেয়নি। এলিয়ট-এর *Murder in the Cathedral* (1935) অথবা *The Family Reunion* (1939)-এর মতো নাটকে বাস্তবতার যে ভাঙন তথা স্বপ্ন ও বাস্তবের সীমারেখার যে অবলুপ্তি দেখা যায়, যেভাবে অস্তিত্বের গভীরে আশ্রিত হয় এক অমোঘ অপেক্ষা 'Still point of the turning world' (1922) এবং আস্তিক্যবোধের দার্শনিক অভিজ্ঞান *Four Quartets* (1943)-এ যথাক্রমে পূর্ণ সত্তা বা আইডেন্‌টিটির খণ্ডীকরণ এবং ভাষা থেকে নৈঃশব্দ্যে প্রশমিত হবার যে যাত্রা অনুভব করা যায়, তা-ও কি অস্তিবাদের ক্ষেত্রে প্রাসঙ্গিক নয়? তাঁর আত্মপ্রক্ষেপময় উপন্যাসে *A Portrait of the Artist as a Young Man* (1916)-এ চৈতন্য প্রবাহ রীতি ('stream of consciousness') প্রয়োগে— স্থান-কাল-ঘটনার অনুক্রমের বিপর্যাস ঘটিয়ে ও মানসিক র‍্যানডম্‌নেসকে অগ্রাধিকার দিয়ে— জয়েসও পদ্ধতিগতভাবে এক নির্যাস-বিরোধী অবস্থান গ্রহণ করেন।

দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধোত্তর ইংরেজি কবিতায় টেড হিউজ তাঁর পতিত প্রকৃতি, খাদক পৃথিবী ও তার আদিম হিংসাত্মক প্রাণীকুলের চিত্রণে এক প্রবল অস্তিবাদী 'angst' এবং যুক্তিহীনতা নির্মাণ করেন। টম্ গান-এর কবিতাতেও অস্তিবাদী ঝোঁক নজরে আসে কখনও উদ্ভট শব্দবন্ধ, কখনও সংশয়ের অনুষঙ্গে, আবার কখনও চরিত্র কিংবা চিত্রকল্পের বিষয়বস্তুতে। তাঁর 'Masturbation' কবিতাটিতে আদিম এবং প্রায় অতিপ্রাকৃত যৌনতা যুক্তির কাঠামোগত ডিসকোর্স-এর এক প্রতিস্পর্ধা তৈরি করে, যার মধ্যে অস্তিবাদী অ্যাবসার্ডিটির ইঙ্গিত টের পাওয়া যায়। হ্যারল্ড পিন্টার-এর *The Birthday Party* (1958) বা *The Caretaker* (1960)-এর মতো প্রথম দিকের নাটকগুলিতে অস্তিত্বের ভেতরে ক্ষতের মতো জেগে ওঠে এক একটা দম বন্ধ করা ঘর, যেখানে ক্রমাগত লড়াই চলতে থাকে বহির্শক্তি ও অন্তর্শক্তির মধ্যে। এই তথাকথিত Comedy of menace (আরভিং ওয়ার্ডাল-এর অভিধায়)-গুলিতে এক উপশমহীন অস্তিত্বের সংশয় তৈরি করেন পিন্টার, যেখানে ভাষাই হয়ে ওঠে অস্তিত্বের পরিপন্থী, 'Menace'-এর একক। স্ট্যানলি তাই শেষ পর্যন্ত তার ভাষাও হারায়—'...eh... gag ... uh... gag...caah ...caah'।

বেকেট, কাফ্‌কা, ক্যামু, সার্ত্রদের প্রতিনিধিত্বমূলক, পুরোধা-অবস্থান অস্তিবাদী সাহিত্যে। এঁদের নিয়ে পৃথকভাবে আলোচনা থাকবে প্রবন্ধের শেষ অংশে। তবে এঁরা ছাড়াও অস্তিবাদের নানা মাত্রা নিয়ে এসেছেন অনেকে। অ্যামেরিকান থিয়েটারে এড্‌ওয়ার্ড অ্যাল্‌বি ও ডেভিড ম্যামেট-দের বিষয় বা বিষয়হীনতার অ্যাবসার্ডিটি অস্তিবাদেব লক্ষণাক্রান্ত। প্রসঙ্গত উল্লেখযোগ্য অ্যাল্‌বি-র *The Zoo Story* (1958) এবং *Who is Afraid of Virginia Woolf* (1962) আর ম্যামেট-এর *The American Buffalo* (1977) ইত্যাদি। নোবেলজয়ী অ্যামেরিকান লেখক সল বেলো- র *Humboldt's Gift* (1975), জন বার্থ-এর প্রায় সমস্ত উপন্যাস, টমাস পিনচ-এর *The Crying of Lot-49* (1966) ইত্যাদিতে অস্তিবাদের ভাবনাবীজ চোখে পড়ে। তবে সল বেলো-কে বাদ দিলে বার্থ-পিনচন-হেলারদের উত্তর-আধুনিকতাবাদী উপন্যাসে অস্তিবাদী অ্যাবসার্ডিটির বিরোধিতাও করেন এক সমান্তরাল অ্যাবসার্ডিটির ব্যবহারে, ঠিক যেমন দেখা যায় টম স্টপার্ড-এর *Rosencrantz and Guildenstern are Deed* (1966) নাটকে।

স্টপার্ড-এর এই নাটকে অস্তিবাদী অ্যাবসার্ডিজম্ ফিরে আসে বেকেট-এর *Waiting for Godot*-র এক 'pastiche' বা রেফারেন্স রূপে। নাটকের প্রধান দুই চরিত্র Rosencrantz ও Guildenstern, *হ্যামলেট* নাটকের দুই পার্শ্বচরিত্র, এখানে বেকেট-এর 'Vladimir' ও 'Estragon'-এর আদলে তৈরি। তাদের সক্রিয়তাও বেকেট-এর নাটকের অপেক্ষার এক প্রতিরূপ। এ-নাটকে অস্তিবাদের প্রয়োগ আত্ম-সচেতন ও অনুসরণমূলক।

জাপান-এর বিশিষ্ট ঔপন্যাসিক হারুকি মুরাকামি-র *Wind up Bird Chronicle* (1992) বা *Kafka on the Shore* (2002)-এ কিংবা ইতালীয় লেখক ইটালো ক্যাল্‌ভিনো-র *The Castle of Cross-Destinies* এবং *If on a Winter's Night A Traveler* উপন্যাসগুলিতে অস্তিবাদী সংশয়, বিভাজন ও নির্যাস-বিরোধী অ্যাবসার্ডিটি-র নানা রূপান্তর দেখা যায়। লুই পিয়ানদেল্লোর উপন্যাস ও নাটকে সার্ত্র-কথিত অপর সত্তা ('other')-র বিকাশ অস্তিবাদের প্রেক্ষিতে গুরুত্বপূর্ণ। পিরানদেল্লো-র *Six Characters in Search of An Author* (1921) নাটকে চরিত্রদের লেখক-সত্তার প্রভুত্বের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ বা *Henry IV* (1921)-এ এক স্বেচ্ছামূলক উন্মাদনার প্রকাশ অস্তিবাদী কাঠামোর বাইরে নয়। পিরানদেল্লোর *Shoot* (1916) উপন্যাসের নায়ক এক ক্যামেরাম্যান যে তার মডেলদের প্রকৃত অস্তিত্ব, যা ক্যামেরার আড়ালেই থেকে যায়, তা'র অনুসন্ধান চালায়। তাঁর প্রথম উপন্যাস *The Late Mattia Pascal* (1904)-এ আমরা দেখি এমন এক মানুষকে যে হঠাৎ সুযোগ পেয়ে যায় প্রথম থেকে নিজের অস্তিত্ব নির্মাণের যখন একটি দুর্ঘটনায় একজনকে ভুলবশত তার পরিচয়ে মৃত বলে ঘোষণা করা হয়। দুটি উপন্যাসেই পরিলক্ষিত হয় নির্যাসরূপ প্রপঞ্চের বিনির্মাণ করে এক অন্য অস্তিত্বের সমীপবর্তী হওয়ার প্রয়াস।

এ ছাড়া অ্যালবের্তো মোরাভিয়া-র *Time of Indifference* (1929) বা এলিও ভিত্তোরিনি-র *The Twilight of the Elephant*-এর মতো উপন্যাসে বিশ শতকের ইতালীয় সাহিত্যে অস্তিবাদের উপস্থিতি জোরদার হয়ে ওঠে। স্পেন-এর সাহিত্যে উনামুনো, পিও বারোজা, র‍্যামন সেন্দের প্রমুখের উপন্যাসে অস্তিবাদী ভাবনার প্রতিফলন লক্ষ করা যায়। রুশ লেখক আন্তন চেখভ-এর শেষ পর্বের নাটক *The Three Sisters* (1900) কিংবা *The Cherry Orchard* (1904)-এ অনেকে অস্তিবাদের পদসংকেত শুনতে পান। চেখভ-এর নাটকে সময়ের এককত্ব, বহুলাংশে তার অনুপস্থিতি, উদ্দেশ্যহীন জীবনে অপেক্ষা ও অন্তহীনতা বহুক্ষেত্রে সিসিফীয় কর্মকাণ্ডের রূপকে পরিণত হয়, যেমন টম স্টপার্ড-এর স্বল্প দৈর্ঘ্যের নাটক *Albert's Bridge* (1967)-এ অ্যালবার্ট-এর সেতু নির্মাণ কখনও শেষ হয় না, যা বারবার ক্যামু-র অ্যাবসার্ডিটিকেই মনে করিয়ে দেয়।

৪. (ক) বাংলা সাহিত্যে অস্তিবাদ : একটি খসড়া

বাংলা সাহিত্যের মূলস্রোতে রবীন্দ্রনাথের *ছিন্নপত্র*-এর এখানে-ওখানে বা মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়ের *পদ্মানদীর মাঝি* ও *দিবারাত্রির কাব্য* উপন্যাসে অস্তিবাদী ইশারা চোখে পড়ে। তবে তা' একাকীত্ব, সংশয়, সাময়িক অর্থহীনতার বোধ ইত্যাদি চিরাচরিত ধারণার মাধ্যমে। ওই সব অংশের অস্তিবাদী পাঠ অসম্ভব না হলেও তা' শেষ পর্যন্ত যে উত্তরণের দিশা লাভ করেছে তাকে অস্তিবাদী অভিমুখ বলা যাবে না। প্রাচ্য দর্শনভাবনায় সম্ভবত একমাত্র বৌদ্ধ চিন্তাধারাই কিয়দংসে ধারণ করতে পেরেছে পাশ্চাত্য অস্তিবাদকে এক স্থানীয় রঙে। বৌদ্ধ ক্ষণিকত্ববাদ

বা কার্য-কারণের ভিতরে আবশ্যক সম্পর্কের অনুপস্থিতির তত্ত্ব খানিক মিলতে পেরেছে অস্তিবাদের বিশ্বাস ও পদ্ধতিসমূহের সঙ্গে।

বিশ শতকের দ্বিতীয়ার্ধে বাংলা ভাষার পরীক্ষাধর্মী সমান্তরাল ধারার সাহিত্যে, ছোটো বড়ো উজান-পত্রকে আশ্রয় করে বা 'হাংরি' জাতীয় শাস্ত্রবিরোধী আন্দোলনে দেখা গেছে এক অস্তিবাদী ঝোঁক। সমীর ও মলয় রায়চৌধুরীর গল্প-গদ্য-কবিতায়, দীপক মজুমদারের অল্প কয়েকটি নাটকে এই ঝোঁক লক্ষণীয়। পাশাপাশি বাংলা সাহিত্যের মূল প্রবাহে এই সময় থেকে অস্তিবাদের মেজাজ ও মনোবীজ অনেক বেশি পরিলক্ষিত হয়েছে কবিতায়, যা ইউরোপ-এর এক বিপরীত চিত্র। জীবনানন্দ দাশ থেকে শুরু করে শক্তি চট্টোপাধ্যায় *ফিরে এসো, চাকার* বিনয় মজুমদার, তুমুল বেহিসেবি তুষার রায় এবং তারও পরে ভাস্কর চক্রবর্তী ও জয় গোস্বামী পর্যন্ত আধুনিক বাংলা কবিতায় অস্তিত্বের বহুস্তর জিজ্ঞাসা বিশেষ তাৎপর্যপূর্ণ। প্রতিষ্ঠার সমান্তরাল রেখায় হেঁটে যাওয়া কবিতার ব্যান্ডমাস্টার তুষার রায় *মরুভূমির আকাশে তারা* (১৯৭৪)-য় লিখেছিলেন জীবন ও অস্তিত্বের যন্ত্রণার কথা তাঁর স্বভাবসিদ্ধ তির্যক কৌতুকে—'খুক খুক করে উঠছে কাশি, না না স্যার যক্ষ্মা নয়/ডিসকলি করবেন না— বলুন স্যার কি করতে হবে/আপোস করতে করতে পাপোশ হতেও পারি এখন/এখন আমি পয়সা পেলে সব করতে পারি, এখন/চাকরি যদি নাও দ্যান স্যার চারটে টাকা অন্তত/দিন, চিনচিনে এই বেঁচে থাকার যন্ত্রণাটা বলে/ফলিডলের গুণপনা, দরখাস্তের মাশুল, তুমি/চাকরি না হোক— চার বেহারার কাঁধে চেপে যাবে'। এরও আগে বেশ কিছু বছর আগে বিনয় মজুমদার ইঙ্গিত করেছিলেন মানব-অস্তিত্বের অনিবার্য নির্যাসশূন্যতার কথা— 'মানুষ নিকটে গেলে প্রকৃত সারস উড়ে যায়'। কবি-স্বভাবে অন্তর্মুখী ভাস্কর চক্রবর্তীর কবিতায় মৃত্যুমগ্নতা তথা জীবনের অসারতার অনুভব অনেকাংশে অস্তিবাদী চিন্তার লক্ষণযুক্ত। তাঁর *শীতকাল করে আসবে সুপর্ণার* (১৯৭১) নাম-কবিতায় 'পার্সোনা' যেভাবে 'ব্যাঙ'-এর মতো এক প্রাণীতে তার শরীরের রূপান্তরের কথা বলে তা' মনে করিয়ে দেয় কাফ্‌কার মেটামরফসিস্'-এর অ্যাবসার্ডিটি— গ্রেগর সামসা-র কোনো এক সকালে হঠাৎ মাকড়সা হয়ে ওঠা। এর অনেক বছর পরে তাঁর *জিরাফের ভাষা* (২০০৫)-য় ভাস্কর লেখেন বেঁচে থাকার প্রশ্নমালা—'বেঁচে থাকা কাকে বলে? মানুষ কি এভাবেই বেঁচে থাকে একা'/খোপে বসে বই পড়ে? চিঠি লেখে? হাঁপায়? আচমকা মরে যায়?'

জীবনানন্দের কবিতায় 'হৃদয়ের শব্দহীন জ্যোৎস্নার ভিতর' অস্তিবাদী বিযুক্তি, সংশয়, অর্থশূন্যতার এক পরাবাস্তব মগ্নজগৎ গড়ে উঠেছিল। তাঁর 'আট বছর আগের একদিন' বা 'ঘোড়া'-র মতো অনেক কবিতায় বাস্তবতার নির্যাস ভেঙে পড়ে এবং তৈরি হয় এক অস্তিবাদী সমান্তরাল বাস্তবতা—'অর্থ নয়, কীর্তি নয়, সচ্ছলতা নয়/আরো এক বিপন্ন বিস্ময়/আমাদের অন্তর্গত রক্তের ভিতরে/খেলা করে'। তিমিরবিনাশে অগ্রসর হয়ে দেখা যায় তিমিরবিলাস; 'পৃথিবীর ক্রমমুক্তি' বিলম্বিত হয়; অন্ধকার ও শূন্যতার বোধে আক্রান্ত কবিসত্তা উত্তরণের ইতিবাচক দিশা খুঁজে পান না—'একি ভোর?/অনন্ত রাত্রির মত মনে হয় তবু'।

শক্তি চট্টোপাধ্যায়ের বহু-পঠিত 'অবনী বাড়ি আছো?' কবিতায় কোনো এক ফেলে আসা অবনী (পৃথিবী?)-র খোঁজ ও নিরন্তর কড়ানাড়াও যেন সিসিফীয় যাত্রার মতো। অবনী বাড়ি নেই; ঘুমিয়ে থাকা লোকালয়ে তবু 'অবনী বাড়ি আছো?' এই ডাক ও কড়ানাড়ার পুনরাবৃত্তি সূচিত করে নির্যাসের জন্য এক নস্টালজিয়া, নির্যাসশূন্যতার উপলব্ধির সঙ্গে সঙ্গে। শক্তির

'জরাসন্ধ' কবিতাটিতেও অস্তিবাদী নিক্ষিপ্ততার উপলব্ধি ব্যক্ত হয় মাতৃসত্তার উদ্দেশে উচ্চারিত জন্ম-প্রত্যাহারের দাবিতে, অস্তিত্বের উৎস মাতৃসত্তাকে অর্থহীন মানব-অস্তিত্ব সৃষ্টি করার জন্য অভিমান ও অভিযোগে—'আমাকে তুই আনলি কেন, ফিরিয়ে নে।/...আমি যখন অনঙ্গ অন্ধকারের হাত দেখি না, পা দেখি না, তখন/তোর জরায় ভর করে এ আমায় কোথায় নিয়ে এলি।' শক্তির 'যেতে পারি কিন্তু কেন যাবো?' অস্তিত্ব-অনস্তিত্বের দুর্মর টানাপোড়েনের বয়ান হয়ে ওঠে। সে টানাপোড়েন অস্তিবাদী ভাবুকতার চমৎকার ভাষ্য রচনা করে অন্যত্র অনেক রচনায়—'অন্ধকার ঘরে সে কি এতদিন থাকে?/পায়ে নখ বড়ো হয়, দীর্ঘ হয় চুল/থাবায় থাবড়ায় মাটি ছিঁড়ে ফেলে নাড়ি— এত দীর্ঘকাল আমি স্থির থাকতে পারি?'

একালের বাংলা উপন্যাসে জীবনানন্দ দাশের *মাল্যবান* ও *জলপাইহাটি,* শক্তি চট্টোপাধ্যায়ের *কুয়োতলা,* শীর্ষেন্দু মুখোপাধ্যায়ের *ঘুণপোকা,* সৈয়দ মুস্তাফা সিরাজের *অলীক মানুষ* ইত্যাদি অনেক লেখাতেই অস্তিবাদী চিন্তার প্রতিফলন নজরে পড়ার মতো। বাংলাদেশের লেখক সৈয়দ ওয়ালীউল্লাহর *কাঁদো নদী কাঁদো* এবং *চাঁদের অমাবস্যা* উপন্যাসগুলিতেও অস্তিত্বের মগ্নজগতের আনাচে-কানাচে ঔপন্যাসিকের চলাফেরা। *চাঁদের অমাবস্যা*-র শেষাংশে আদালতের বিচার-প্রতিক্রিয়ার আপাত-প্রবল যুক্তিময়তার গভীর নেতিকরণ ঘটান লেখক। আমাদের মনে পড়ে ক্যামু-র *The Outsider*-এ মিউরসল্ট-এর বিচারদৃশ্যগুলির কথা।

বাংলা সাহিত্যে অস্তিবাদের আরও কিছুটা বিশদ পরিক্রমায় বিশেষভাবে আলোচিত হবেন ঔপন্যাসিকদের মধ্যে সন্দীপন চট্টোপাধ্যায় ও নবারুণ ভট্টাচার্য এবং নাট্যকারদের মধ্যে বাদল সরকার। প্রবন্ধের পরবর্তী অংশে যুক্ত হবে সে আলোচনা।

৫. অস্তিবাদী সাহিত্যের কিছু অনন্য মুখ : বাংলা ও পাশ্চাত্য সাহিত্য :

(ক) সন্দীপন চট্টোপাধ্যায় : "রাজমোহন যে এতদিন সুইসাইড করেনি তার কারণ মাত্র একটা। কারণ এই যে সে একটা রিভলবার সংগ্রহ করতে পারেনি।...একটা রিভলবার, বলা উচিত, তার হাতে উঠে আসেনি।" [*বিপ্লব ও রাজমোহন*]

আত্ম-স্বীকারোক্তিতে সন্দীপন 'ক্যামু-কাতর', বলেছিলেন, গীতা নয়, চিতায় যেন তাঁর সঙ্গী হয় জয়েস-এর *ইউলিসিস*। তাঁর সমস্ত লেখাই তাঁর শেষ উপন্যাসের শিরোনামের মতো— *ধ্বংসের মধ্য দিয়ে যাত্রা*। এ ধ্বংস নির্যাসমুখী আইডেন্টিটির, একরূপী যুক্তি-প্রক্রিয়ার, কেন্দ্রীয় অর্থ-কাঠামোর। 'বিজনের রক্তমাংস' (*ক্রীতদাস ক্রীতদাসী,* ১৯৬১) নামক তাঁর প্রারম্ভিক গল্পটি থেকে শেষ উপন্যাস পর্যন্ত সন্দীপন তাঁর জীবনে ও সৃজনে সতত অস্তিবাদী। ইউরোপীয় আধুনিকতা/অধুনান্তিকতা জয়েস, ক্যামু, বেকেট-এর রচনা থেকে আত্তীকৃত হয়ে সন্দীপনের গল্প-উপন্যাসে অস্তিবাদী তথা উত্তর-ঔপনিবেশিক বিপন্নতা-সংশয়ের এক চমকপ্রদ কৌতুকময় ভাষ্যে পরিণত হয়েছে। বিজনের আখ্যান থেকে শুরু করে 'এখন জীবন অনেক বেশী সতেজ স্বাস্থ্যে ভরা' (১৯৯৩) বা কিছু বছর পেছিয়ে গিয়ে *এখন আমার কোনো অসুখ নেই* (১৯৭৬) উপন্যাসে বেকেটে-এর *Malone Dies* উপন্যাসের মতো রোগগ্রস্ত ও মৃত্যুমুখী অস্তিত্বের খননকার্যে লিপ্ত হন সন্দীপন। তাঁর নায়কেরা অনস্তিত্ব-চিন্তনে নিমজ্জিত, জীবনের অর্থ নিরূপণে সচেষ্ট ও যুক্তিহীনতায় ক্লিষ্ট। অস্তিত্বের উত্তরকালের অন্বেষণে তারা সার্ত্র-র 'non-being'-এর দৃষ্টান্তের কাছাকাছি পৌঁছে যায়। অস্তিবাদী অ্যালিয়েনেশন সন্দীপনের নায়কদের এক সাধারণ পরিস্থিতি। 'বিপ্লব ও রাজমোহন' (১৯৬৯) গল্পটি ক্যামু-র অ্যাবসার্ডিটির ধারণার দ্বারা বিশেষভাবে প্রভাবিত। রাজমোহন ক্যামু-কথিত 'philosophical suicide'-এর

এক আদর্শ উদাহরণ। আত্মহননের কয়েকটি ব্যর্থ চেষ্টার পরে সে তার ঘরের সব বই পুড়িয়ে ফেলতে চায়। এই দহন তার কাছে জ্ঞানতত্ত্বের এক অন্তর্জলি যাত্রা। শব্দ, ভাষা, জ্ঞান, অর্থের পরিসরগুলো ভেঙে বেরোতে চায় রাজমোহন। এটিই তার কাছে নির্যাস-পরিপন্থী আত্মহত্যা, সমান্তরাল অস্তিত্বের খোঁজ, এবং বিপ্লবও বটে, আইডেন্‌টিটির বিপ্লব। পোড়ে না শুধু অস্তিবাদী একটি text ; অদাহ্য হয়ে থেকে যায় মিগুয়েল ডি উনামুনো-র *The Tragic Sense of Life.*

তাঁর *কুকুর সম্পর্কে দুটো একটা কথা যা আমি জানি* (১৯৯০)-তে যেভাবে সমস্ত মানুষের শারীরিকভাবে কুকুরে পরিণত হবার মহামারীসুলভ এক বাস্তবতাকে ফুটিয়ে তোলেন সন্দীপন তাতে মনে পড়ে কাফ্‌কার 'মেটামরফসিস্'-এ মাকড়সা এবং আয়োনেস্কো-র *দ্য রাইনোসেরস্*-এ গন্ডারে রূপান্তরিত হবার অস্তিবাদী অ্যাবসার্ডিটি। তবে সন্দীপনের উপন্যাসে এই রূপান্তর কাফ্‌কা বা আয়োনেস্কো-র মতো বস্তুনিষ্ঠ বা objective নয়; তা' নায়ক হেমাঙ্গের এক মন্ময় বা subjective দৃষ্টি মাত্র। 'একে পাগলামি মনে করা ভুল। বড় জোর এক ধরণের অনন্যোপায় মনোভাব বা অবসেশন বলা যেতে পারে।' সন্দীপনের এই মন্ময়ত্ব কিয়ের্কেগার্দ ও সার্ত্র-র মতানুসারে অনেক গভীরভাবে অস্তিবাদী। *রুবি কখন আসবে* (১৯৯২) উপন্যাসে রুবির অনুপস্থিতি ও নায়কের রুবির জন্য অপেক্ষায় বেকেট-এর নাটকে গোডোর জন্য প্রতীক্ষার ছায়া ভেসে ওঠে।

সন্দীপনের একটি ছোটদের গল্প 'অন্ধ স্কুলে ঘণ্টা বাজবে কখন' (*সন্দীপন চট্টোপাধ্যায়ের পঞ্চাশটি গল্প*, ১৯৯৩) সম্ভবত তাঁর সবচেয়ে শক্তিশালী অস্তিবাদী রূপকথা। নিজেকে মেরে ফেলতে চেয়ে একটি ইঁদুর শুয়ে থাকে তাকে মারতে অনিচ্ছুক, ঘুমন্ত এক বেড়ালের মুখের মধ্যে। কখন সামনের অন্ধ স্কুলের ছুটির ঘণ্টা বাজবে ও বাচ্চাদের কেউ একজন রাস্তায় পেতে রাখা বিড়ালের লেজে পা দেবে। তখনই বিড়ালটা তার হাঁ মুখ বন্ধ করবে, খেয়ে ফেলবে ইঁদুরটাকে। কিন্তু কোনো বাচ্চাই শেষ পর্যন্ত বিড়ালের লেজে পা দেয় না। চলতে থাকে মৃত্যুর ছায়ায় বন্দি হয়ে থাকার মৃত্যুহীন বিড়ম্বনা, তার অস্তিত্ব। বেকেট-এর মতোই সন্দীপন ছুঁয়ে যান এমন এক পরমবিন্দু যার অবস্থান অনস্তিত্বের বাসনা ও অস্তিত্বের অন্তহীনতার ঠিক মাঝখানে। সন্দীপনের শেষ উপন্যাসের শেষ লাইনগুলো দিয়ে এ-অংশটি শেষ করা যেতে পারে : 'এই ঘরে কতদিন আছি জানি না। জানি না, আর কতদিন থাকব। শুধু জানি আমি আগে এখানে ছিলাম না। আমার আগে যে ছিল সে মরে গেছে। তারও আগে ছিল কেউ। মরে গেছে। এই ঘরে আমার আগে যারা ছিল তারা সবাই মরে গেছে।'

(খ) বাদল সরকার : "আমরাও অভিশপ্ত সিসিফাসের প্রেতাত্মা। আমরাও জানি ও পাথর পড়ে যাবে। যখন *ঠেলে* তুলছি তখনই জানি এ *ঠেলার* কোন মানে নেই। পাহাড়ের ঐ চূড়োর কোন মানে নেই" : নাট্যকার [*এবং ইন্দ্রজিৎ*]।

বাদল সরকারের তৃতীয় ধারার থিয়েটার (থার্ড ফর্ম)-এ অস্তিবাদী মাত্রা মূলত একমুখী, আর তা হল ক্যামু-র সিসিফীয় অ্যাবসার্ডিটি। তবে গুরুত্বপূর্ণ তার বঙ্গীকৃত ও সমসাময়িক প্রয়োগ। সিসিফাস-এর নিষ্ফলতা ও পণ্ডশ্রম থেকেই বাদল সরকার পৌঁছোন বাংলার অর্থনৈতিক সংকট, বেকারত্ব, পুঁজিবাদ, শ্রেণি-বৈষম্য ইত্যাদি রাজনৈতিক বিষয়ে। তাঁর নাটকে অস্তিবাদ তাই ভীষণভাবে রাজনৈতিক। ধরা যাক্ তাঁর *ভোমা* (১৯৭৬) নাটকটির কথা। ভোমা নামে কেউ একজন এই নাটকে আলোচনার কেন্দ্র; তবে সে অনুপস্থিত থাকে বেকেট-এর গোডোর মতো, যদিও গোডো না আসলেও ভোমা আসে নাটকের শেষাংশে; আসে, তবে কোনো

প্রত্যাশিত নির্যাস বা Essence নিয়ে আসে না। সে এক প্রতীক চরিত্র; বুভুক্ষ ও শোষিত মানুষদের প্রতিনিধি। তার শ্রমও এক সিসিফীয় পণ্ডশ্রম, কিন্তু সে অর্থশূন্যতার চেতনাও ভোমার নেই। তাই এখনও সে লড়াই করতে চায়। এ ছাড়া নাটকটির সংলাপে ছন্দ, পুনরাবৃত্তি ধ্বন্যাত্মক শব্দের প্রাচুর্য, সুরসঞ্চার, সবই বেকেট-আয়োনেস্কো-র প্রথম দিক্‌কার নাটককে মনে করিয়ে দেয়।

বাদল সরকারের মনস্তাত্ত্বিক ও নৈতিক সংকটের নাটক *বাকি ইতিহাস* (১৯৬৫)-এও সর্বত্র, বিশেষত শেষাংশে, র‍্যানডম্ শ্বাসহীনতা লক্ষণীয়। নাটকের মহামুহূর্তে যখন শরদিন্দু তার অপর সত্তা সতীনাথের মুখোমুখি হয়, সংলাপ ছাড়াও বিষয়গতভাবে এক সাত্রীয় 'অপরীকরণ' ('othering') তৈরি হয় অস্তিত্বের আশ্রয়ে। অর্থহীনতার উপলব্ধি তীব্র হয়ে ওঠে সতীনাথের কথায়—"বাঁচবার ভান করছে। অর্থ যখন থাকছে না, তখন অভ্যাস সম্বল করে বাঁচবার ভান করছে। যেমন আমি করেছিলাম। যেমন তুমি করেছো।"

তবে বাদল সরকারের অ্যাবসার্ড নাটকের সবচাইতে প্রত্যক্ষ নিদর্শন *এবং ইন্দ্রজিৎ* (১৯৬৩) ও *প্রলাপ* (১৯৬৬)। *এবং ইন্দ্রজিৎ*-এ বাস্তব ও নাটক, এ দুয়ের জগৎ স্বতন্ত্রভাবে চিহ্নিত, পিরান্দেল্লো-র মতো। লেখকও এ নাটকের এক চরিত্র। লেখক লিখছে এক নাটক, কোনো এক ইন্দ্রজিৎকে নিয়ে। তবে এই ইন্দ্রজিৎ ভগ্নপ্রায় অমল-বিমল-এর পর ঝুলে থাকা 'এবং'-এর মতো এক শেষ ইন্দ্রজিৎ। জীবনে অর্থহীনতার এক শিকার, অস্তিত্বের 'অপর' হয়ে ওঠার এক দৃষ্টান্ত। লেখকের কলমেই তার অস্তিত্ব—'ভুলে যাই— বিশ্বব্রহ্মাণ্ডে আমার অস্তিত্ব একটা অদৃশ্য ধূলিকণার চেয়েও অর্থহীন।' এই নিরাশ উপলব্ধি ও তার আশাব্যঞ্জক বিস্মরণের মধ্যেকার লড়াই ইন্দ্রজিৎ-এর চরিত্র-দ্বন্দ্ব। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ-পরবর্তী বিপর্যস্ত ও অপচিত মানব-অস্তিত্ব তার কাছে এক বিভীষিকা। নাটকটিতে সংলাপের অতি-যৌক্তিকতা এক অ্যাবসার্ড মানব-বিশ্বের কথাই বলে। নাটকের সমাপ্তিতে 'তীর্থ নয়, তীর্থপথ আমাদের মনে যেন রয়' কি তৈরি করে ক্যামু-র আত্ম-চৈতন্যমূলক কূটাভাস? ক্যামু যেমন বলেছিলেন, 'The struggle itself towards the heights is enough to fill a man's heart.' *প্রলাপ* নাটকটিতে কোন প্লট নেই; চরিত্রও নেই সুনির্দিষ্ট অর্থে; যারা আছে তারা হল ব্রেখ্‌টীয় আদলের আত্মসচেতন অভিনেতা। অভিনয় চলছে, তারা কথা বলছে। অথচ তাদের অভিনয় করা নাটকের কোনো টেক্সট্ নেই, লেখক নেই। তারা অসমাপ্ত, সদা-সমাপ্য, কিন্তু প্রকৃতপক্ষে অ-সমাপ্য। জীবন ও অস্তিত্ব তাদের কাছে এতটাই অর্থহীন যে তার প্রতিফলনরূপী নাটকের অভিনয়ের ব্যাপারেও তারা উদাসীন। তাদেরই একজন ফটিক নাটক শুরু করে এইভাবে— 'যদি ধরে নেওয়া যায় জীবনের একটা অর্থ আছে, তাহলেও প্রশ্ন উঠতে পারে— জীবনের অর্থ খুঁজে বার করার কোনো অর্থ আছে কিনা'। অন্য একজন নাটক শেষ করে, 'নাটক শেষ হয়ে গেছে'। অস্তিত্ব-অনস্তিত্ব, সূচনা-সমাপ্তি, উভয়ই সমান বিশ্লেষণহীন থেকে যায়।

(গ) নবারুণ ভট্টাচার্য : "*চৌবাচ্চার তেলাপিয়া গঙ্গাসাগরে চলল। দোবেড়ের চ্যাং দেকবি? দোবেড়ের চ্যাং দেকাব? ক্যাট ব্যাট ওয়াটার ডগ ফিশ।*" [*হারবার্ট*]

নবারুণের *হারবার্ট* (১৯৯৩) উপন্যাসের শেষ অধ্যায়ের এপিগ্রাফটি অক্ষয়কুমার বড়ালের কবিতার এই পঙক্তিগুলি— 'বৃথা আসি, বৃথা যাই/কিছুই উদ্দেশ্য নাই'। এ-ও তো মানব-

অস্তিত্বের অ্যাবসার্ডিটি-র বয়ান। গোটা *হারবার্ট* জুড়েই ছড়িয়ে আছে অস্তিবাদী অ্যাবসার্ডিটির এক রাজনীতি-রূপকে পরিণত হবার চিহ্নসমূহ। এক মৃত নকশাল ছাত্রনেতার কাকা মানসিক নিয়ন্ত্রণ-রেখা খোয়ানো হারবার্ট সরকার। তার অবশ্য কোনো রাজনৈতিক অস্তিত্ব নেই। কোনো এক অ-সাধারণ ক্ষমতায় সে 'মৃতের সহিত কথোপকথন' করে উপার্জন করে। নবারুণের এই ব্যতিক্রমী উপন্যাসটি সামগ্রিকভাবে যুক্তিহীনতা ও অর্থহীনতায় আক্রান্ত মানুষের অ্যাবসার্ডিটি ও উন্মাদনার এক পুনর্পাঠ। তাই হারবার্টের উৎকেন্দ্রিক কার্যকলাপের বিরুদ্ধে সক্রিয় যুক্তিবাদী সমিতি, যখন হারবার্ট, বেকেট-এর ভবঘুরেদের মতো, সেলিব্রেট করে এই অ্যাবসার্ডিটি। তার ভাষা যুক্তি-বুদ্ধির চৌহদ্দি-পেরোনো এক দুরূহ কিন্তু মজাদার প্রতি-ভাষা বা 'anti-language'। উপন্যাসের শেষে মৃত হারবার্টকে চুল্লিতে ঢোকাবার পর যেভাবে তার নকশাল ভাইপো-র বহু বছর আগে লুকিয়ে রাখা বোমাগুলো ফাটে হারবার্টের খাটের ভেতর, সেই বিস্ফোরণ ব্যাখ্যার অতীত থেকে যায়, পুলিশ-রাষ্ট্র-হারবার্টের বন্ধুদের কাছেও। বুঝতে পারে শুধু পাঠক— 'হারবার্টের রক্তহীন মৃতদেহ দাহ করবার সময় যে জঘন্য ঘটনা ঘটেছিল তা অবধারিতভাবে এই ইঙ্গিতই দিয়ে চলে যে কখন কীভাবে বিস্ফোরণ ঘটবে এবং তা কে ঘটাবে সে সম্বন্ধে জানতে রাষ্ট্রযন্ত্রের এখনও বাকি আছে।' এই বিস্ফোরণই নবারুণের অ্যাবসার্ড-বিপ্লব।

ফ্যাতাড়ু নামক নাটক বা *কাঙাল মালসাট* উপন্যাসে ফ্যাতাড়ু— চোক্তারদের নিয়ে যে সুকুমার রায়-সুলভ কল্প-বিশ্ব নির্মাণ করেন নবারুণ, তার প্রতি পদেই বাস্তবতার যে বিনির্মাণ ঘটে উত্তীর্ণ ফ্যানটাসি-র এক জগতে, সেখানে যুক্তির পরতগুলো বারবার খসে পড়তে থাকে। বেঁচে থাকে এক মক্-বিপ্লবের সম্ভাবনা ওই অ্যাবসার্ড চৈতন্যলোকে। *মসোলিয়াম* (১৯৯৫) এগিয়ে নিয়ে যায় যুক্তি নিয়ে খেলা করতে থাকা এই অ্যাবসার্ড চেতনাপ্রবাহকে। ভাষা হয়ে ওঠে ননসেন্সধর্মী, অশিষ্ট, কৌতুকময়— 'অ্যাকোয়াটিকায় ভাসে মরা টিকটিকি/পাণ্ডার পোঁছে লাথি, কালিঘাটে সিকি/ব্রেক-ডান্স শুরু হবে, প্যাণ্ডেল তাই/গগনে গরজে মেঘ, বেগুনি প্যাঁদাই।' পুরন্দর ভাটের প্রথম কাব্যসংকলন বের হয় যার নাম *লেতকী*। নিচে লেখা থাকে— 'সূত্র : কেতকীর অর্থ ক্যাওড়া'। এভাবেই নবারুণের কাছে যুক্তির অবরোহী (deductive) পদ্ধতি হয়ে ওঠে এক অ্যাবসার্ড অশিষ্ট হাস্যরস। এই কাহিনিহীন উপন্যাস যেন এগিয়ে চলে মৃত হারবার্টের মসোলিয়াম হয়ে, কল্প-চরিত্রদের বৈপ্লবিক অভিযানে। নবারুণের *লুব্ধক* উপন্যাসে, 'কুকুর-চিন্তা' বা 'অন্ধ বেড়াল'-এর মতো ছোটোগল্পে সর্বদ্রষ্টা রাষ্ট্রশক্তির আরোপিত নির্যাসবাদের বিরুদ্ধে লড়াই চলতে থাকে এক অস্তিবাদী প্রতর্কের। নবারুণ উড়িয়ে দেন অস্তিবাদী অ্যাবসার্ডিটির এক 'হালাল ঝাণ্ডা'।

(ঘ) ফ্রানৎস কাফ্‌কা : "My will is going to be quite simple—a request to you to burn everything."

— Kafka

১৯২১ খ্রিস্টাব্দে কাফ্‌কা তাঁর বন্ধু ম্যাক্স ব্রড-কে লেখা এই নোট-এ তাঁর মৃত্যুর পরে পুড়িয়ে ফেলতে বলেন তাঁর সমস্ত লেখা। সন্দীপনের রাজমোহনের মতো। বিশ শতকের প্রথমার্ধের অস্তিবাদী সাহিত্যের পুরোধা কাফ্‌কা বোধ হয় তাঁর লেখার মাধ্যমে কোনো উত্তর-কালীন পাঠ এবং নিজের এক উত্তর-অস্তিত্ব (post-existence) চাননি। এও এক অস্তিবাদী প্রতীতি যা তাঁকে সার্ত্র-এর মতো বুঝিয়ে দিয়েছিল যে 'create' করা মানেই আরও অস্তিত্ব, আরও 'existence'-এর জন্ম দেওয়া। এ-ও যেন এক অস্তিবাদী সুইসাইড-কামনা। কাফ্‌কার এই অস্তিত্ববাদ তাই গাঠনিক অর্থে তাঁর নিজের টেক্সট্‌-এরই বিরুদ্ধকামী।

কাফ্‌কা-র গল্প-উপন্যাস বিষয়গতভাবে অবশ্যই অস্তিবাদী। অস্তিত্ব ও তার তাৎপর্যের দুরূহতা, বিমূঢ় মানব-সত্তা, অস্তিত্বের অতল থেকে উৎসারিত প্রবল সংশয় এবং সর্বোপরি কার্যকারণহীন অথচ চিরন্তন এক দণ্ডাজ্ঞা-প্রাপ্ত মানব-অস্তিত্ব— এ-সব বিষয় ও প্রসঙ্গই অস্তিবাদী স্বভাবের। তবে 'On Parables' ছাড়া অন্যত্র ততটা বিনির্মিত বিস্ময় ও সংশয়বাদী ভাঙাচোরা দেখা যায় না কাফ্‌কা-র আঙ্গিকে, ভাষায়, শৈলীতে। এক মহাজাগতিক মেটাফিজিক্স থেকেই যায় তাঁর লেখার শরীরে।

"As Gregor Samsa awoke one morning from uneasy dreams he found himself transformed in his bed into a gigantic insect"— এভাবেই শুরু হয় কাফ্‌কা-র অস্তিবাদী অ্যাবসার্ডিটির আকর, 'The Metamorphosis' (1915) নামক বিখ্যাত বড়ো গল্পটি। কোনো এক সকালে গ্রেগর সাম্‌সার এই শারীরিক রূপান্তর অস্তিত্বের কেন্দ্র তথা নির্যাসের প্রতিস্পর্ধী এক বাস্তবতা যেখানে আইডেনটিটি যুক্তিহীন, অননুমেয় (unpredictable) এবং সতত আকস্মিকতায় আকীর্ণ। গ্রেগর-এর বাড়ির সবাই ভাবে তার কিছু হয়েছে। তারা ওই অতিকায় প্রাণীটিকে নিয়ে রসিকতা করে, অত্যাচার করে তার উপর। এক নির্মম, ভাষাহীন, মনুষ্যত্বহীন একাকীত্বে মৃত্যু হয় রূপান্তরিত গ্রেগর-এর। ঠাট্টা করে তার পিঠের উপরে একটি আপেল বসিয়ে যখন তাকে লক্ষ্য করে বারবার জিনিসপত্র ছোঁড়া হয়, তখন যেন কাফ্‌কা-র ন্যারেটিভ ধারণ করতে থাকে 'original sin'-এর ফলশ্রুতি সুলভ পতিত এক অস্তিত্বের মুখোমুখি খ্রিস্ট-এর প্রক্ষালক যন্ত্রণাকে। 'মেটামরফসিস'-এর এই 'অবজেক্টিভিটি' অবাক করে দেয় আমাদের। কাহিনির শেষ পর্বে তার পরিবারের কাছে 'প্রয়োজনহীন' হয়ে পড়া বোধহয় এই ইঙ্গিত দেয় যে গ্রেগর সবসময়ই কীট ছিল। কাফ্‌কা-র 'A common experience' গল্পে A ও B-র পরস্পরমুখী যাত্রায় তাদের কখনও না মিলতে পারার মধ্যে, 'Investigations of a Dog'-এ 'dog'-এর শব্দ-ভ্রান্তির মধ্যে উলটে থাকা 'god'-কে খোঁজার ব্যর্থ চেষ্টার মধ্যে বা 'Penal Colony'-র সদা ঘূর্ণায়মান রাষ্ট্রচক্রের মধ্যে কখনও দার্শনিক নির্লিপ্তিতে, আবার কখনও রাজনৈতিক প্রতিস্থাপনে পাওয়া যায় অস্তিত্ববাদী ভাবনার চিত্র।

তবে কাফ্‌কা-র অস্তিবাদী মাইলফলক নিঃসন্দেহে *The Trial* (1925) যার প্রধান চরিত্র জোসেফ কে-কে হঠাৎ একদিন সকালে গ্রেফতার করা হয় এমন এক অপরাধে যা' সমস্ত উপন্যাসে কোথাও তার কাছে বা পাঠকের কাছেও পরিষ্কার হয় না। আমলাতন্ত্র ও সর্বদ্রষ্টা 'panoptic' রাষ্ট্র-কাঠামোর শোষণ-পদ্ধতি যদি এ কাহিনির রাজনৈতিক স্তর হয়, তবে তার অস্তিবাদী মাত্রা হল জোসেফ-এর এই অতি-যৌক্তিক 'ট্রায়াল'। তার নির্যাসমুখী অস্তিত্বই কি তার অপরাধ? নাকি এ অত্যাচার অস্তিত্বের চোরাবালি থেকেই উৎসারিত? তাই ভীষণই শ্রেয় জোসেফের হত্যা, উপন্যাসের শেষভাগে, জোসেফেরই কাছে। সলোম-এর মতে, 'one might say that the basic difference between Camus and Kafka is that Camus attempts to provide an answer for the problem Kafka sees as inescapable." ক্যামু-র সিসিফাস্ শুধু উপলব্ধি করে না, নিজের চেতনার মাধ্যমে বিদ্রোহও করে অ্যাবসার্ডিটির বিরুদ্ধে; কাফ্‌কা-র জোসেফ শুধুই এক উপলব্ধি। *The Castle* (1926) উপন্যাসেও এক আকস্মিক রূপান্তর। এক আশ্চর্য সকালে মানবহীন, যোগাযোগহীন এক প্রাসাদে নিজেকে খুঁজে পায় জোসেফ কে। ওই প্রাসাদে বসবাসকারী আমলা মিস্টার ক্লামের সাথে যোগাযোগের যাবতীয় চেষ্টা ব্যর্থ হয়। ম্যাক্স ব্রড-এর মতে, উপন্যাসটির প্রধান বিষয় এক ধর্মতাত্ত্বিক সংকট যার বীজ উপন্যাসেও এক অস্তিবাদী উপস্থিতি। তাঁর *Amerika* (1927) উপন্যাসেও কাফ্‌কা

প্রতিষ্ঠা করেন যোলো বছরের কার্ল-এর ভবঘুরে অস্তিত্বের বয়ান। মাতৃভূমি থেকে বিচ্ছিন্ন কার্ল ঘোরে অচেনা-অজানা আমেরিকা-র পথে পথে, চাকরির খোঁজে। এই অসমাপ্ত উপন্যাসেও বহিরাগত অপর-রূপী মানব-অস্তিত্বের ছায়া পড়ে। কাফ্‌কা-র সব উপন্যাসই অসমাপ্ত। হয়তো। এই সম্ভাবনাই তার অনিশ্চয়তা-নীতি; এই অসমাপ্তিতে তাঁর যুক্তির উর্ধ্বে লিখন-অস্তিত্ব। লিখে যাওয়ার ভিতরেই তাঁর অপরাধ-বিচার-শাস্তি। ক্রাইম-ট্রায়াল-পানিশমেন্ট।

(ঙ) অ্যালবেয়ার ক্যামু : "This heart within me I can feel, and I judge that it exists. This world I can touch, and I likewise judge that it exists. There ends all my knowledge, and the rest is construction". —Camus

ক্যামু-র কলমেই মূলত এক 'novel of the absurd'-এর জন্ম, যা প্রধানত তাঁর সিসিফীয় মানব-অস্তিত্ব সম্পর্কিত দৃষ্টিভঙ্গিরই ভাষ্যরূপ। তাঁর *The Fall* (1956) এক ভয়াবহ আত্ম-স্বীকারোক্তি। তার প্রতি পদক্ষেপে ধর্মতাত্ত্বিক, এমনকি মানবিক নৈতিকতারও এক চূড়া বিস্মৃতি ও বিচ্যুতি দেখা যায়। জঁ ব্যাপ্‌টিস্ট ক্ল্যামেস এক নৈতিকতা-উত্তীর্ণ কণ্ঠস্বরে ব্যক্ত করে কীভাবে সে এক ডুবন্ত মানুষের আর্তনাদকেও পাশ কাটিয়ে চলে যায়। তার কাছে ওই ডুবে যাওয়াতেই মানুষটির অস্তিত্বের শাপমুক্তি যেন। মৃত্যুর মাধ্যমে সৃষ্ট অনস্তিত্বেই অস্তিত্বের অর্থ ও তার পূর্ণতাপ্রাপ্তি— "Men are never convinced of your reasons, of your sincerity, of the seriousness of your sufferings, except by your death." তাঁর *The Plague* নামক উপন্যাসে অস্তিবাদী বাস্তবতা ও নিয়তির চিত্রণ এক সমষ্টির এককে। অ্যালজেরিয়ার তটদেশে ওয়ান শহরের প্রত্যেকে বিপন্ন এক মহামারীর প্রকোপে। উপন্যাসের প্রধান চরিত্র ড. রিউ যিনি ওই শহরে আসেন আরোগ্যের প্রয়াস ও প্রতিশ্রুতিতে। গোটা উপন্যাসে ফুটে ওঠে ড. রিউ ও ওয়ানবাসীদের ব্যক্তিক ও সমষ্টিগত অস্তিত্বের এক সমমুখী নিয়তি, তাদের পারস্পরিক এককত্ব। অস্তিত্বের উৎপীড়ন এখানে কোনো নৈতিক মহাবিশ্বের নিয়ন্তারূপী ঈশ্বরের অনুশাসনভুক্ত নয়। এ এমন এক 'suffering' যার নৈতিক কেন্দ্রে কোনো 'doing' নেই। ক্যামুর দুটি নাটক *Caligula* (1938) ও *Cross-Purpose* (1944)-এও অ্যাবসার্ডিটি নানা পরিস্থিতিগত সমাপতনে আইডেনটিটির নানা ভাঙন তৈরি করে, ক্রিয়াকলাপ সবসময় উদ্দেশ্য-বিরোধী ফলাফল তৈরি করতে থাতে ক্রমাগত।

তবে ক্যামুর *The Outsider* (1941)-ই তাঁর মূল অস্তিবাদী ঘোষণাপত্র। এই বইয়ের নায়ক Meursault রাষ্ট্রবিরোধী, যদিও তা কোনো বিপ্লবী পরিচয়ের জন্য নয়। সে রাষ্ট্র-প্রচারিত ও রাষ্ট্র-আরোপিত যাবতীয় প্রাতিষ্ঠানিক হিউম্যান মডেল-এর বিরোধী। কামনা— আবেগ— নৈতিকতাহীনতার এক উদ্ভট রসায়ন সে। জীবনে বেঁচে থাকা তার কাছে চলচ্চিত্রের ঘোরাফেরা করা চিত্রকল্পের মতো। সিনেমা-হলের অন্ধকারে বান্ধবীর স্তনে হাত রাখার 'ঘনিষ্ঠ তাপ' থেকে শুরু করে এক অ্যারাবকে নিতান্ত রহস্যময় এক ব্যক্তিগত হিংসার কারণে হত্যা করা পর্যন্ত Meursault এক আশ্চর্য প্যাশন-এর দ্বারা তাড়িত। রাষ্ট্রের বিচারব্যবস্থার অধীনে তার ট্রায়াল-এর দৃশ্যগুলি যেন অস্তিত্বের দণ্ড-বিচারেরই রূপক মাত্র। এ উপন্যাসের আর এক অস্তিবাদী মাত্রা— নায়কের সঙ্গে তার মায়ের সম্পর্ক। উপন্যাসের প্রথম লাইনটি স্মরণীয়— 'Maman (mother) died to-day or yesterday may be, I don't know.' মায়ের মৃত্যুর খবর পেয়ে সে চিন্তিত কীভাবে তার ওপরওয়ালার থেকে দু'দিনের ছুটি চাইবে। আবার অন্যদিকে উপন্যাসের শেষে কারাবন্দি নায়ক তার নিজের মৃত্যুর আগের রাতে ব্যক্ত করে মার প্রতি তার নিবিড় ভালোবাসা। তার মার মৃত্যু তার কাছে তার মায়ের অস্তিত্বের অর্থবহ ও

সার্থক হয়ে ওঠা। তাই সে দুঃখিত নয়— "So close to death, mother must have felt liberated and ready to live her life again. No one at all had any right to cry over her." তবুও আবেগ ও যুক্তির নির্যাসবাদী চিহ্নায়ন প্রক্রিয়ায় সে মানবিকতা, অস্তিত্ব ও রাষ্ট্রকাঠামো, সবার কাছেই অচেনা এক 'অপর', এক বহিরাগত।

ক্যামু-র অস্তিবাদী অ্যাবসার্ডিটি-র অন্য এক রূপ নজরে আসে তাঁর উপন্যাস *Happy Death* (1936-38)-এ। এখানেও আত্ম-হননের বাহ্য নিয়তির মুখোমুখি সেই Meursault। দীর্ঘদিন ধরে রোজ সন্ধ্যায় মুখের ভিতরে বন্দুকের নল ঢুকিয়ে প্রায় যৌনাঙ্গের মতো চুষতে থাকে সে এক আদিম যৌনতায়। এই যৌনতাই জীবন-মৃত্যু, অস্তিত্ব-অনস্তিত্বের সঙ্গে তার সম্পর্কের স্বরূপ। হ্যামলেট-এর মতো তারও দ্বন্দ্ব 'to be or not to be'। সব সময় সে এক অপরত্বের নজরবন্দি হয়ে সন্ত্রস্ত। অনেকক্ষণ ধরে তার দিকে ভয়ানকভাবে তাকিয়ে থাকা ব্যক্তিটির দৃষ্টি যখন সে ফিরিয়ে দেবার চেষ্টা করে লড়াকু এক বিরুদ্ধ দৃষ্টি দিয়ে, তখন সে বুঝতে পারে তার কল্পিত প্রতিপক্ষ আসলে দৃষ্টিহীন। এভাবেই Meursault লড়াইয়ের স্বাধীনতা ও নিজের নিয়তি সৃজনের অধিকার থেকেও বঞ্চিত। তার মৃত্যু তাই এক কাম্য অর্থ, এক 'happy death'. তবে এরপরেও শেষ হয় না সব কিছু, শেষ হয় না অস্তিত্ব। থেকে যায় এক উৎস-মানুষ, *The First Man* যে নামে ১৯৯৫-এ প্রকাশিত হয়েছিল ক্যামু-র শেষ উপন্যাস। অসমাপ্ত।

(চ) **স্যামুয়েল বেকেট** : "The expression that there is nothing to express, nothing with which to express, nothing from which to express, no power to express, no desire to express, together with the obligation to express."

—Samel Beckett

অস্তিত্বের নির্যাসবাদী ক্লান্তি, ভ্রান্তি ও আরোপের মুখোমুখি দাঁড়িয়ে এবং অস্তিত্বের বিকেন্দ্রীভবনকে অনুভব করেও অস্তিত্বশীল থেকে যাবার বাধ্যতাই স্যামুয়েল বেকেট-এর লেখায় অস্তিবাদী মাত্রা— 'You must go on, I can't go on, I'll go on', যে কথা বলে বেকেট-এর ট্রিলজির শেষ উপন্যাস *The Unnamable* (1955)-এর নামহীন কথক। সে এমন এক সত্তা যার থেকে যাওয়া তার ইচ্ছাশক্তির উর্ধ্বে। তার গতিহীন ক্ষেত্র 'mind' ও 'world'-এর মাঝখানে, এক 'pratition' হয়ে—'I have two surfaces, and no thickness.' স্থান-কালের এক সম্পূর্ণ অনুপস্থিতি তার অস্তিত্বে। সে এখন থামতে চায়। ভাষার নিরূপিত ও নির্যাসময় অর্থ উৎপাদনের গুরুভার তাকে ঠেলে দিয়েছে চূড়ান্ত নৈঃশব্দের দিকে। এখন সে শুধু ধারণ করতে চায় ঐ নীরবতাকে। *Molloy* (1950), *Malone Dies* (1955) এবং *The Unnamable* মিলিয়ে বেকেট-এর ট্রিলজিতে লেখা হয় নির্যাসবাদী সত্তার সশব্দে চূর্ণ-বিচূর্ণ হবার মহাকাব্য। মলয় তাই বলে— 'To restore silence is the role of objects.' বেকেট-এর চরিত্ররা— মলয়, ম্যালোন, মোরান, ম্যাকমান তথা দ্য 'Unnamables'— নির্যাসের কারাগার ভেঙে পৌঁছোয় বাস্তবতার এক ধ্বংসস্তূপে। তারা খোঁজে, অপেক্ষা করে অস্তিত্বের স্বরূপ উদ্‌ঘাটনের এক নতুন ভাষার। কখনও সে ভাষার অনুপস্থিতি তাদের হতাশ করে তোলে। কখনও তারা আলিঙ্গন করে ভাষার 'অপর' (other) এক নৈঃশব্দ্যকে থামাতে চায় সিসিফীয় কথনের পুনরাবৃত্তিমূলক নিষ্ফলতাকে। কিন্তু তারা বলে যায়, তাদের বলতে হয়, তারা বলতে বাধ্য। শেষ পর্বের বেকেট *How It is* (1961) থেকে শুরু করে *Worstword Ho* (1980) পর্যন্ত তাঁর উপন্যাসে তাই বিনির্মাণ করেন প্রচলিত কথন-ভাষাকে। ব্যাকরণ

তথা সিন্ট্যাক্স-বর্জিত এক ধ্বনি ও ছন্দের ভাষা নির্মাণ করেন, তৈরি করেন নতুন শব্দ, পুরোনো উপাদান দিয়ে—'lessness' 'Unmoreable'-এর মতো। তাঁর শেষ পর্বের উপন্যাসে টম কবিন-এর মতে তৈরি হয় এক 'language of the body'; এক শরীরময়তার বাহ্য, শব্দময় ভাষা যা' মনস্তাত্ত্বিক বাস্তবতার ভাষা নয়, যা' কেবল ভাষারই ভাষা, ভাষা নিয়ে ভাষা, ভাষা-ময় ভাষা। এই 'অধি-ভাষা' ('meta-language')-এর মাধ্যমে তিনি অন্তহীন কথনের এক ভাষ্য নির্মাণ করেন। 'Say on'-এর বলা চলতেই থাকে, 'nohow on' অর্থাৎ যেমনভাবেই হোক্। এই 'On' শব্দটি 'Ontology' অর্থে ইঙ্গিত করে অস্তিত্বকেও। অস্তিত্বকে এমন এক নিরঙ্কুশ ভাষা-চরিত্রে পর্যবসিত করাই বেকেট-এর অস্তিবাদী স্বাতন্ত্র্য ও সার্থকতা। বেকেট-এর চরিত্ররা নির্যাসের খোঁজ করলেও সে অনুসন্ধান বারবার ব্যর্থ হয়। মোরান মলয়কে খোঁজে তার সংগঠন-নির্দেশিত আসাইনমেন্টে। ক্রমশ নিজেই পরিণত হতে থাকে এক মলয়ে। নির্যাসের এক 'অপরীকরণ' (othering) ঘটে। বেকেটীয় মানব যুক্তির ডিসকোর্স-এর কোনো উত্তরণ খুঁজে না পেয়ে আদিম, প্রাক্-যৌক্তিক এক ইন্দ্রিয়পরায়ণতার প্রবৃত্তিবাদে নির্যাসের বিনাশের এক ইতিকথায় পৌঁছোয়।

বেকেট-এর সর্বজন পরিচিত নাটক *Waiting for Godot* (1953)-এ উন্মোচিত হয়েছে অস্তিবাদী অ্যাবসার্ডিটির এক গুরুত্বপূর্ণ প্রসঙ্গ। দুই ভবঘুরে ভ্লাদিমির ও এস্ত্রাগন এক প্রান্তরে একটি অর্ধমৃত গাছের নীচে কোনো এক গোডো-র জন্য অপেক্ষা করে। নাটকের দুটি অঙ্কেই তাদের সঙ্গে দেখা হয় লাকি ও পোজো নামক এক প্রভু ও তার ভৃত্যের (যদিও দ্বিতীয় অঙ্কে এই সম্পর্কটি উলটে যায়)। দুটি অঙ্কেরই শেষে এক বার্তাবহ বালক এসে জানায় যে গোডো আজ আসবে না, কাল আসবে, তাদের অপেক্ষা করতে হবে। এই অপেক্ষা যেন অনন্ত অপেক্ষা, অস্তিত্বের অর্থ, সার্থকতারূপী এক ঈশ্বর-সুলভ সত্তার জন্য, জীবনের এক নিরূপিত নির্যাসের জন্য, যা কখনই উপস্থিত হয় না। তৈরি হয় এক সার্ত্রীয় শূন্যতা— 'Nothing happens. Nobody comes. Nobody goes. It is awful'. তবে চলতে থাকে বাধ্যতামূলক এই অনন্ত অপেক্ষার সিসিফীয় বাধ্যবাধকতা, তৈরি হয় গোডোর আসা বা না-আসা নিয়ে এক অস্তিবাদী সংশয়। একদিকে গোডো-র অস্তিত্বের সারাৎসার ভ্লাদিমির ও এস্ত্রাগন-এর প্রতীক্ষায়। গোডো এক সদা অনুপস্থিত মন্ময়ত্ব বা 'subjectivity' যা' অস্তিবাদী আইডেনটিটি-র গর্ভগৃহ। অন্যদিকে এই দুই ভবঘুরের অস্তিত্বের অর্থই হল তাদের প্রতীক্ষার ঐ সক্রিয়তা। পারস্পরিক নানা কাহিনি ও রসিকতার মাধ্যমে এবং ভাষার এক উদ্ভট লুকোচুরি খেলায় ভ্লাদিমির ও এস্ত্রাগন তাদের অ্যাবসার্ড অস্তিত্বকে বজায় রাখে—'Estragon : we always find something, eh Didi, to give us the impression we exist?'— বজায় রাখতে তারা বাধ্য। সার্ত্র ঠিক যেমন বলেছিলেন তাঁর 'Existentialism and Humannism'-এ, গোগো আর দিদি'র আসল সংশয় তৈরি হয় বিশ্ব-মানবতার প্রতিনিধিত্ব করার এই দায়িত্ব-আরোপে— "...But at this place, at this moment of time, all mankind is us, whether we like it or not." এই মানব-সামান্যীকরণ এক ভবিতব্য। অপেক্ষা তথা অস্তিত্বের স্বাধীনতা এখানে কিয়ের্কেগার্দীয় অর্থেই পূর্ব-প্রদত্ত। ভ্লাদিমির ও এস্ত্রাগণ শুধু ওই স্বাধীনতার নির্মিতিতে পৌঁছোনোর চেষ্টা করতে পারে মাত্র। শূন্য থেকে কখনই নির্মাণ করতে পারে না কোনো আত্মজ স্বাধীনতা। নাটকের দুটি অঙ্ক অদৃশ্য এক উত্তরকালে আরও অসংখ্য প্রতীক্ষার অঙ্কের আদল তৈরি করে। বেকেটের ভবঘুরেরা একবার গাছ থেকে দড়ি দিয়ে ঝুলে আত্মহত্যার কথা ভাবে বটে, কিন্তু একজনের একাকীত্বের ভয়ে অন্যজন এবং শেষ পর্যন্ত দুজনেই ক্যামু-র 'philosophical

suicide'-কেই শ্রেয় বলে মনে করে। এস্ত্রাগনের শেষ সংলাপ, 'yes let's go', *কিন্তু তার পরেই বেকেট-এর মঞ্চ-নির্দেশ—* 'They do not move'। তারপর পর্দা পড়ে। এই বিরোধ থেকেই যায় ভাষা ও বাস্তবের অস্তিবাদী এক বিচ্ছেদ-বিন্দুতে।

তাঁর পরবর্তী নাটক *Endgame* (1957)-এ-ও বেকেট অর্থ-নির্মাণ পদ্ধতির এক অস্তিমন্থের কথা বলেন। হ্যাম ও ক্লোভ নিশ্চিত মৃত্যুদিনও ধ্বংসের পারিপার্শ্বিকতায় এক বদ্ধ ঘরের ঘেরাটোপে পূর্ণচ্ছেদ টানতে চায়। দাবা খেলার শেষ চাল তাদের পরম কাম্য। কিন্তু এ খেলা শেষ হবার নয়। অস্তিত্বের পরিসমাপ্তি যা অস্তিত্বকে অর্থবহ করে তুলবে তা কিছুতেই উপস্থিত হয় না। অন্তহীনতার এই নিয়তিতেই ক্লোভ ও হ্যাম-এর অ্যাবসার্ড অস্তিত্ব, তাদের শেষ না হওয়া অর্থহীন অভিনয়—

Hamm : We're not beginning...to...to mean something ?
Clov : Mean something ? You and I mean something ?

ভাষা হয়ে পড়ে কমিউনিকেশন-হীন। ক্লোভ ভাষা-শিক্ষার্থীর অসহায়তা ব্যক্ত করে— "I use the words you taught me. If they don't mean anything any more, teach me others. Or let me be silent". বেকেটীয় অস্তিবাদ পরিচিত হয় অন্য অন্যান্য ভাষার অনুসন্ধান ও চরম ভাষাহীনতার মধ্যেকার এই উদ্ভট চয়ন-পরিণতির সঙ্গে। আর এই পরিণতিই তার 'ক্যাটাস্ট্রফি'।

সহায়ক গ্রন্থপঞ্জি :

1. Eric P. Levy — *Beckett and the Voice of Species : A Study of the Prose Fiction.*
2. Germaine Bree (ed.) — Camus : *A Collection of Critical Essays.*
3. Henri Peyre — Existentialism : *A Literatere of Despair ?*
4. Jeman Brunea — *Existentialism and the American Novel.*
5. Juliam Palley — *Existentialist Trends in the Modern Spanish Novel.*
6. Martin Esslin — *The Theatre of the Absurd.*
7. Martin Grecenbargy — Kafka : *The Terror of Art.*
8. Mrinal Kanti Mhadra — *A Critical Survey of Phenomenology and Existentialism.*
9. Mrinal Kanti Bhadra — *A Critical Study of Sartre's Ontology of Consciousness.*

জীবনীমূলক সমালোচনা

কল্যাণ চ্যাটার্জী

জীবনীমূলক সমালোচনা (Biographical Criticism) শিল্পীর মনস্তত্ত্বের সাথে তাঁর সৃষ্টির সংযোগ খুঁজে বার করতে চায়। এর উদ্দেশ্য : যে-কোনো শিল্প সৃষ্টির রহস্যময় মুহূর্ত ও পন্থাকে আলোকিত করা।[১] সাধারণত জীবনীমূলক সমালোচনা শিল্পীর জীবনী, আত্মজীবনী, চিঠিপত্র, দিনপঞ্জি সাক্ষাৎকার ইত্যাদি থেকে পাওয়া জীবনী-উপাদান (biographical element) পর্যালোচনা করে এবং দেখতে চায় শিল্পীর স্রষ্টা মন কীভাবে প্রভাবিত বা পরিচালিত হয় তাঁর ব্যক্তিমন দ্বারা। জীবনীমূলক সমালোচনার প্রকৃতি সম্পর্কে সুস্পষ্ট ধারণা পেতে বারীন্দ্র বসুর *রবীন্দ্রনাথের বলাকা* গ্রন্থ থেকে 'ছবি' কবিতাটির সমালোচনা উদাহরণ হিসেবে পড়া যেতে পারে।

কবিতাটির অনুপ্রেরণা একটি প্রতিকৃতি— ছবি (Portrait)। ১৯১৪-র অক্টোবর-নভেম্বর মাস। বাংলা ৩রা কার্তিক, ১৩২১। কবি এসেছেন এলাহাবাদে ভাগিনেয় সত্যপ্রসাদ গঙ্গোপাধ্যায়ের পুত্র সুপ্রকাশের বাসায়। সেখানে সম্পূর্ণ অপ্রত্যাশিত পরিবেশে তাঁর মৃত বৌ ঠাকুরাণী কাদম্বরী দেবীর (দাদা জ্যোতিরিন্দ্রনাথের স্ত্রী) ছবি সুপ্রকাশের ঘরে দেখেন।* কিন্তু আচার্য ক্ষিতিমোহন সেনের মতে ছবিখানি কবির পরলোকগতা-পত্নী মৃণালিনী দেবীর। এবং কবি এই ছবি এলাহাবাদে সত্যপ্রকাশের জামাতা প্যারীলাল বন্দ্যোপাধ্যায়ের গৃহে দেখেছিলেন।+

যাই হোক, কার ছবি তা খুব বড়ো কথা নয়। মূল কথা ঐ ছবিকে কেন্দ্র করে কবির অনুভব ও ভাবনা। উক্ত দুইজন নারীই কবির অত্যন্ত প্রিয়, এবং জীবনের সঙ্গে গভীরভাবে বিজড়িত। দুজনেই তাঁর জীবনের প্রেম ও প্রেরণা। দুজনের যে-কোনো জনকে কেন্দ্র করেই এমন অপূর্ব কবিতা সৃষ্টি সম্ভব।

জীবিতকালে ঐ নারী কবির একান্ত প্রিয় সঙ্গিনী ছিলেন। কবির জীবনযাত্রায় ও জীবন-অভিব্যক্তিতে তাঁর প্রভাব ও সাহচর্য কবিকে পূর্ণ প্রাণের আনন্দে ভরিয়ে দিয়েছে, তাঁর চারিপার্শ্বের প্রকৃতিতে নব মাধুর্য সঞ্চার করেছে।

---

*. প্রভাত, পৃ. ১২৬ ; *Rabindranath Tagore : A Biography*, by K. R. Kripalini, Visva-Bharati 2nd ed. P. 255

+. ক্ষিতিমোহন, পৃ. ৬৮।

অথবা, পড়া যেতে পারে সতীনাথ ভাদুড়ী : স্বাতন্ত্র্যের সন্ধান গ্রন্থে সন্তোষ মজুমদার রচিত 'সতীনাথ ও পূর্ণিয়া' প্রবন্ধটির এই অংশটুকু :

> পূর্ণিয়ার গাছপালা, মাটির গন্ধ, পাখী-পাখালির শব্দ সতীনাথের সাহিত্যে স্থান পেয়েছে। এ তো সামান্য, তাঁর উপন্যাস ও গল্পে পূর্ণিয়ার লোকজন ভীড় করে আছেন। 'জাগরী'-তে হর্দ্দা-বাজারের দুবেজী ও দুবেইন, জমিদার অঘোরী সিং, সুরজবল্লীবাবু অতি পরিচিত লোক, পূর্ণিয়া সহরের অনতিদূরে হর্দ্দা বাজার, সেখানে প্রতি বৎসর কার্তিক পূর্ণিমাতে মেলা বসে, সাজও বসে। গান্ধীবাদী দুবেজী হর্দ্দা বাজারের লোক। সুরজবল্লীবাবুর একমাত্র ছেলে আগষ্ট আন্দোলনের সময়ে বন্দুকের গুলিতে মারা যায়। পূর্ণিয়ার রাজনৈতিক নেতা ভূতপূর্ব মন্ত্রী জগলালজীর চিত্ররূপ সুরজবল্লীবাবু, জগলালজীর একমাত্র কিশোর পুত্র আগষ্ট আন্দোলনে, মিলিটারির বন্দুকের গুলিতে নিহত হয়। 'ঢোঁড়াইচরিতমানস'-এ পূর্ণিয়ার কিছু লোকের প্রতিরূপ স্পষ্টতর। সতীনাথ তো 'ঢোঁড়াই' প্রবন্ধে লিখেই গেছেন যে তাৎমাটুলিতে সত্যি একজন ঢোঁড়াই আছে এবং ঢোঁড়াই জানত যে তাকে নিয়ে একটা বই লেখা হয়েছে।

প্রথম উদাহরণটিতে দৃশ্যতই সমালোচক কবির জীবনের সঙ্গে সম্পর্ক স্থাপনের চেষ্টা করেছেন তাঁর কবিতায়। জীবনী-উপাদান খুঁজেছেন প্রভাত কুমার মুখোপাধ্যায়ের প্রামাণ্য জীবনী-গ্রন্থ *রবীন্দ্র-জীবনী* থেকে। নির্দেশ করেছেন জীবন থেকে আহৃত 'প্রেম ও প্রেরণার' প্রভাব কবির সৃষ্টিতে। দ্বিতীয় উদাহরণটিতে সতীনাথের জীবন ও তাঁর সাহিত্যের সংযোগ এতই সুস্পষ্ট যে তাই হয়ে উঠেছে প্রবন্ধের উপজীব্য বিষয়। কিন্তু জীবন ও সৃষ্টির সম্পর্কের সমীকরণ এমন সরল নাও হতে পারে।[১] যেমন, কবি জন কিটসের বিখ্যাত কবিতা 'Ode to a Nightingale' কবিতার[২] এই স্তবকটি :

> Fade far away, dissolve, and quite forget
> What thou among the leaves hast never knows,
> The weariness, the fever, and the fret,
> Here, where men sit and hear each other groan,
> Where, palsy shakes a few, sad, last gray hairs,
> Where youth grows pale, and spectre-thin, and dies ;
> Where but to think is to be full of sorrow
> And leaden-eyed despairs,
> Where Beauty cannot keep her lustrous eyes,
> Or new Love pine at them beyond tomorrow.

স্তবকটির জীবনীমূলক সমালোচনা করতে চাইলে দেখা যাবে এখানে কবির জীবনের সঙ্গে কবিতায় প্রকাশিত ভাবনার সরাসরি সংযোগ স্থাপন সম্ভব নয়। কিন্তু, পৃথিবীর যে গভীর বিষাদ ও বিকারগ্রস্ত রূপের ছবি কবি এখানে এঁকেছেন জীবনীমূলক সমালোচক তাতে খুঁজে পেতেই পারেন কবির সৃষ্টিশীল অথচ ক্ষয়রোগাক্রান্ত শেষ দিনগুলির কোনো এক অন্ধকার মুহূর্ত। অথবা, যৌবনের অকাল বিনাশের বর্ণনায় তিনি ইঙ্গিত পেতে পারেন কবির মনে টম কিটসের অকাল মৃত্যুর গভীর শোকস্পর্শ। প্রসঙ্গত স্নেহের এই ভাইয়ের মৃত্যু (যক্ষ্মা রোগে আক্রান্ত টম মারা যান ১৮১৮-র ১লা ডিসেম্বর) কিটসের জীবনে গভীর রেখাপাত করে এবং কিটসের পাঁচটি বিখ্যাত ওড-এর (ode) প্রায় সবকটিই রচিত হয় ১৯১৯ সালে।[৩] বছরটিকে অনেক সমালোচক কবির 'উর্বর বছর' (fertile year) বলে বর্ণনা করেছেন।

এখানে লক্ষণীয় প্রথম দুটি উদাহরণের সঙ্গে তৃতীয় উদাহরণটির পার্থক্য। প্রথম দুই ক্ষেত্রে লেখকের জীবনী-উপাদান সুস্পষ্টভাবে প্রতিফলিত হলেও তৃতীয় ক্ষেত্রটিতে জীবনী-উপাদানের উপস্থিতি, অনুমান ও আরো বেশি অনুসন্ধান সাপেক্ষ। এই পার্থক্যের সম্ভাব্য কারণ জীবন ও মনস্তত্ত্বের সম্পর্কের দুর্বোধ্য রসায়ন। জীবন কখনও সচেতন মনকে আন্দোলিত করে। কখনও বা অস্বীকৃত, সূক্ষ্ম, দুর্জ্ঞেয় অনুভূতিরূপে অন্তরাল খোঁজে অবচেতনে। অবচেতন অনুভূতি চেতনের পাহারা পেরিয়ে যখন উপস্থিত হয় শিল্পকর্মে, অবশ্যম্ভাবীভাবে তা হয়ে ওঠে ইঙ্গিতবহ। জীবনীমূলক সমালোচক প্রথমক্ষেত্রে সরাসরি জীবনী-উপাদান ও সৃষ্টির মধ্যে সংযোগ স্থাপনের চেষ্টা করেন। অপরক্ষেত্রে তিনি মনঃসমীক্ষার সাহায্য নেন। এক্ষেত্রে তাঁর প্রাথমিক কাজ শিল্পীর জীবনী-উপাদানের সঙ্গে মনস্তত্ত্বের সমন্বয় স্থাপন এবং শেষ পর্যায়ে সেই মনস্তত্ত্বের প্রতিফলন চিহ্নিত ও নির্দেশ করা তাঁর সৃষ্টিতে। এ-ধরনের সমালোচনার ভিত্তি এই বিশ্বাসে যে— (১) শিল্পীমন সর্বদা চেতনের নিয়ন্ত্রণাধীন নয়, এবং (২) শিল্পকর্মে— স্বপ্নের মতো Ã> ¶¿ Î Â ô fantasy ও অবদমিত অনুভূতি। এদের মধ্যে প্রথম বিশ্বাসটির সূত্র খুঁজে পেতে হলে যেতে হবে সুদূর অতীতে— প্লেটোর আয়ন (Ion) রচনায়, যা কবির সৃষ্টিশীলতাকে সচেতন প্রয়াস বলে স্বীকৃতি দেয় না। দ্বিতীয় বিশ্বাসটির উৎস মূলত ফ্রয়েডের মনোবিজ্ঞান আলোচনায় এবং মনঃসমীক্ষণ তত্ত্বে।

জীবনীমূলক সমালোচনা-পদ্ধতির আরেক প্রকারভেদও বর্তমান। এতে লেখকের পাণ্ডুলিপি, খসড়া ইত্যাদির মধ্যে পর্যবেক্ষণের বিষয় হয়ে দাঁড়ায় লেখকের সচেতন পরিবর্তন, শব্দ ও বাক্য সংযোজন, বিয়োজনের মতো আপাত তুচ্ছ ব্যাপার। প্রায়শই এর উদ্দেশ্য পাঠ্য থেকে সচেতন পরিবর্জনের প্রতীকী অথবা অবগুণ্ঠিত প্রত্যাবর্তন চিহ্নিত করা এবং তার দ্বারা উন্মোচিত করা পাঠ্যের অবচেতনকে (the unconscious of the text)। অবশ্যম্ভাবীভাবেই তাতে সংযোগ স্থাপিত হয় লেখকের মন ও তাঁর সৃষ্টির মধ্যে। মন ও জীবনীর পূর্ববর্ণিত সংযোগে গড়ে ওঠে আবারও সেই জীবনী, মনস্তত্ত্ব ও শিল্পের সম্পর্কের ত্রিকোণ।

জীবনীমূলক সমালোচনা পদ্ধতির আলোচনায় মুখ্য হয়ে দাঁড়ায় এ-পদ্ধতির বিরোধী অবস্থানগুলি। বিরোধিতার কারণ সাহিত্য অথবা শিল্পের মূল্যায়নে শিল্পী বা সাহিত্যিকের জীবন, মন, ব্যক্তিত্বের আলোচনার প্রাসঙ্গিকতা বিতর্কের উর্ধ্বে নয়। টি. এস. এলিঅট সম্ভবত ব্যক্তি-নিরপেক্ষ কাব্য-তত্ত্বের প্রবক্তাদের মধ্যে সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ। তাঁর লেখা ১৯১৭ সালে প্রকাশিত "Tradition and the Individual Talent" প্রবন্ধটি এ-প্রসঙ্গে উল্লেখযোগ্য। প্রথম প্রবন্ধটিতে তিনি কবির 'extinction of personality' ও 'depersonalization'-এর কথা বলেছেন। এলিঅটের বক্তব্য শিল্পকর্মে শিল্পীর ব্যক্তিসত্তার বিলোপ অথবা অনুপস্থিতিই উৎকর্ষের লক্ষণ ('The progress of an artist is a continual self–sacrifice, a continual extinction of personality.')। তিনি শিল্পীকে বিভক্ত করেছেন দুটি সত্তায়—'the man who suffers' এবং 'the mind which creates', এবং বলেছেন শিল্পী তাঁর এই দুই সত্তার পৃথকীকরণের মাধ্যমেই অর্জন করেন শুদ্ধতা।

কিটসের 'নেগেটিভ কেপেবিলিটি'র (Negative capability) ধারণাও জীবনীমূলক সমালোচনার বিরুদ্ধ যুক্তি হিসেবে ব্যবহৃত হয়। ১৮১৭-র ডিসেম্বরে লেখা এক চিঠিতে কিটস এই পদটি (প্রথম এবং শেষবার) ব্যবহার করেন।[8] কিন্তু, কবির নিজস্ব ব্যাখ্যার অভাবে এর অর্থ বেশ অস্বচ্ছ। কবির অন্যত্র প্রকাশিত সাহিত্য-চিন্তার সূত্র ধরে M. H. Abrams তাঁর

A Glossary of Literary Terms গ্রন্থে নেগেটিভ কেপেবিলিটির যে দুটি সম্ভাব্য অর্থ নির্দেশ করেছেন সেগুলি হল :

1. to characterise an impersonal, or objective author who maintains aesthetic distance as opposed to a subjective author who is personally involved in a work of literature, and as opposed also to an author who writes in order to make persuasive his or her personal beliefs ; and
2. to suggest that, when embodied in a beautiful artistic form, the literary subject matter, concepts, and characters are not subjects to the ordinary standards of evidence, truth, and morality, as we apply those standards in the course of our practical experience.

প্রথম অর্থ অনুযায়ী নেগেটিভ কেপেবিলিটি হল শিল্পীর তাঁর নিজের শিল্পের সাথে নৈর্ব্যক্তিক দূরত্ব রক্ষার ক্ষমতা; আবার দ্বিতীয় অর্থে নেগেটিভ কেপেবিলিটি পরোক্ষে শিল্পের বিশ্বজনীনতা ও চিরন্তনতারই শর্তমাত্র।

এ-প্রসঙ্গে রবীন্দ্রনাথের ধারণা তাঁর "কবিজীবনী" প্রবন্ধে অংশত প্রকাশিত হয়েছে। টেনিসনের চিঠিপত্র ও জীবনীর সংকলনের পর্যালোচনা করে রবীন্দ্রনাথ এখানে এই সিদ্ধান্তে এসেছেন যে কাব্যে প্রকাশিত প্রসারিত কবিহৃদয়ের খোঁজ কদাচিৎ তাঁর জীবনীতে মেলে। দৈনন্দিন জীবনের নথিমাত্র হল জীবনী। এতে কবির মানবিক ক্ষুদ্রতা ধরা পড়লেও স্রষ্টার মহত্ত্বের খোঁজ পাওয়া দুষ্কর। ভারতের প্রাচীন কবিদের রবীন্দ্রনাথ খুঁজে পেয়েছেন তাঁদেরই কাব্যে, এবং রহস্যময় সৃষ্টিশীলতাকে তিনিও দেখেছেন চেতনের আয়ত্তের বাইরে এক ক্ষমতা হিসেবে। কবিত্বের "মূলে একটি বৃহৎ আবেগের সঞ্চার, যেন একটি আকস্মিক অলৌকিক আবির্ভাবের মতো—তাহা কবির আয়ত্তের অতীত।" কবিসত্তার খোঁজ তাঁর মতে মিললেও মিলতে পারে 'কাব্যগত জীবনচরিত'-এ। অর্থাৎ তথাকথিত জীবনী-উপাদানকে রবীন্দ্রনাথ গুরুত্বপূর্ণ মনে করেননি।

কিন্তু এই বিরুদ্ধমতগুলিও সংশয়াতীতভাবে প্রতিষ্ঠিত নয়। যেমন, এলিঅট শিল্পীর ব্যক্তিসত্তার বিলোপ এবং শিল্পীর ব্যক্তিমন ও স্রষ্টা-মনের মধ্যে দূরত্ব রক্ষার কথা বললেও পরবর্তীকালে ভিন্ন অবস্থান নেন। তিনি নির্দ্বিধায় প্রুফ্রক চরিত্রে তাঁর ব্যক্তিসত্তার উপস্থিতি স্বীকার করে বলেন "(Prufrock) was partly a dramatic creation of a man of about 40...and partly an expression of feeling of my own." (T. S. Eliot...An Interview, *Grantite Review*, 24. no. 3 [1962] P. 17) একইভাবে স্মরণীয় কবির *The Waste Land* সম্পর্কিত স্বীকারোক্তি, যেখানে তিনি বলেন *The Waste Land* জীবনের প্রতি তাঁর অর্থহীন অভিযোগ ও উষ্মার প্রকাশমাত্র : "To me it was only the relief of a personal and wholly insignificant grouse against life; it is just a piece of rhythmical grumbling." (*Waste Land Drafts*, P. 1) জেমস ই. মিলার তাঁর *T. S. Eliot's Personal Waste Land :* Exorcism of the Demand গ্রন্থে এলিঅটের চিঠিপত্র এবং অন্যান্য জীবনী-উপাদান নিরীক্ষণ করে দেখিয়েছেন ১৯১৭-য় "Tradition and the Individual Talent"-এ 'depersonalization' তত্ত্বের কথা লেখার পাশাপাশি কীভাবে এলিঅট সংগ্রহ করছেন ব্যক্তিগত জীবনের নানান অভিজ্ঞতা এবং তা সঞ্চয় করে রাখছেন কাব্যে ব্যবহারের জন্য। একইভাবে কিটসের কাব্যেও ভাই টম কিটস বা প্রেয়সী ফ্যানি ব্রনের মতো তাঁর জীবনের

গুরুত্বপূর্ণ চরিত্রদের অদৃশ্য উপস্থিতি প্রায় অনস্বীকার্য। আবার রবীন্দ্রনাথ জীবনীপাঠের অসারতার কথা বলেও ঐ একই প্রবন্ধে ব্যতিক্রম হিসেবে জীবনীকে প্রেক্ষাপট রূপে পড়ার কথা বলেছেন দান্তের উদাহরণ দিয়ে :

> দান্তের কাব্যে দান্তের জীবন জড়িত হইয়া আছে, উভয়কে একত্রে পাঠ করিলে জীবন এবং কাব্যের মর্যাদা বেশী করিয়া দেখা যায়। তাই সম্পূর্ণরূপে ব্যক্তি-নিরপেক্ষ কাব্য-তত্ত্বর প্রয়োগ যে বিরল সে কথা বলাই যায়।

জীবনীমূলক সমালোচনার বিরোধিতার প্রসঙ্গে এর পরেই এসে পড়ে ক্লিনেথ ব্রুক্স, রবার্ট পেন ওয়ারেন, জন ক্রো র‍্যানসাম প্রমুখ নিউ ক্রিটিকদের সমালোচনাতত্ত্ব। বিংশ শতাব্দীর কুড়ির দশকের মাঝামাঝি আই. এ. রিচার্ডসের *Principles of Literary Criticism* (1924), *Practical Criticism* (1929) এবং টি. এস. এলিঅটের প্রবন্ধগুলি থেকে এই ধারণার জন্ম। ১৯৪৬ সালে প্রকাশিত ডব্লিউ. কে. উইমস্যাট এবং মনরো রিচাডসলে রচিত প্রবন্ধ "The Intentional Fallacy"[৫]ও প্রকাশমাত্রই হয়ে ওঠে নিউ ক্রিকিটদের জোরালো হাতিয়ার। নিউ ক্রিটিকরা মূলত সাহিত্য-সমালোচনায় লেখকের জীবনী, সামাজিক প্রেক্ষাপট, সাহিত্যের ইতিহাস ইত্যাদির চর্চার পরিবর্তে কেবলই সাহিত্য কর্মটির ওপর মনোযোগের দাবি করেন। তবে সূচনালগ্নে আমেরিকায় এই পদ্ধতি প্রবল উৎসাহের সঙ্গে গৃহীত হলেও এর জনপ্রিয়তাও ষাটের দশকের পর থেকে কমতে থাকে। বরং নিউ হিসটোরিসিজম, কালচারাল মেটিরিয়ালিজমের পথ ধরে 'প্রেক্ষাপট' আবার হয়ে উঠতে থাকে গুরুত্বপূর্ণ।

আবার উত্তর-অবয়ববাদী তাত্ত্বিকদের (post-structuralists) অংশগ্রহণে এই বিতর্কের ক্ষেত্রটি আরো প্রসারিত হয়েছে।[৬] কারণ, এই অংশগ্রহণের ফলশ্রুতি স্বরূপ আক্রমণের মুখোমুখি হয়েছে খোদ 'জীবনী' ও 'আত্মজীবনী' জঁ্যর (genre) দুটিই। প্রকৃতপক্ষে সাবেকি 'আত্মজীবনী' ও 'জীবনী' ব্যক্তিসত্তার যে সঙ্গতিপূর্ণ রূপকে সত্য ধরে এগোয় তার প্রধান পৃষ্ঠপোষক হিউম্যানিজম, আর উত্তর-অবয়ববাদীরা প্রশ্ন তুলেছেন হিউম্যানিজম-জাত ব্যক্তিসত্তা ও আত্মসত্তার (self-hood) এই ধারণার যৌক্তিকতা নিয়েই। সন্দেহের আওতায় এসে পড়েছে সত্তার 'সম্পূর্ণতা', 'স্বকীয়তা', 'সঙ্গতিপূর্ণতা' প্রভৃতি প্রতিষ্ঠিত চরিত্রগুলি। এই তাত্ত্বিকদের মতে 'জীবনী' ও 'আত্মজীবনী' জীবনকে সঙ্গতিপূর্ণ করে তোলার ব্যর্থ প্রয়াসমাত্র; কারণ জীবন স্বততই অসঙ্গতিপূর্ণ। এজন্যেই রোলা বার্থ তাঁর আত্মজীবনী *Roland Barthes by Roland Barthes*[৭] গ্রন্থে বারবার বদলান অবস্থান। নিজের জীবন বর্ণনা করেন নিজেকে নানান সর্বনাম (আমি, তুমি, সে ইত্যাদি) দ্বারা সম্বোধন করে। ব্যবহার করেন একাধিক সূচনা ও বারবার ন্যারেটিভকে ভেঙে ফেলে সৃষ্টি করেন খণ্ডচিত্র যা প্রতীকায়িত করে পূর্বোক্ত অসঙ্গতিকেই। আবার আমরা জানি উত্তর-অবয়ববাদী চিন্তায় অবিশ্বাসের অভিমুখ প্রায়শই 'ভাষা' (language)। যে-কোনো জ্ঞান (knowledge) আহরণের মাধ্যম ভাষা হওয়ায় তাই দেরিদা প্রমুখ তাত্ত্বিকরা জ্ঞানের সম্পূর্ণতা নিয়েই সন্দিহান। এই সূত্র ধরেই পল ডি মান তাঁর অনাস্থা জ্ঞাপন করেছেন[৮] 'আত্মজীবনী' জঁ্যরটির প্রতি। কারণ আত্মজ্ঞান (যা কিনা আত্মজীবনী রচনার উদ্দেশ্যবিশেষ) আসে ভাষারই মাধ্যমে, আর ভাষা প্রায়শই দিকভ্রষ্ট করে রচনা করে কল্পসাহিত্যের (Fiction) মরীচিকা। প্রকৃত জ্ঞান থেকে যায় অধরাই। ফ্রয়েড ও লাকার ভাবনায় ব্যক্তিসত্তার ভিত্তিভূমি অবচেতন। ফ্রয়েডের অবচেতন ধারণা হিউম্যানিজম-জাত সত্তার ধারণার পরিপন্থী। ফ্রয়েডের চিন্তার ফলশ্রুতিস্বরূপ স্মৃতির ওপর অবচেতনের নিয়ন্ত্রণ স্বাভাবিক ভাবেই 'জীবনী' ও

'আত্মজীবনী' রচনায় তথ্যের *নির্ভরযোগ্যতা হরণ করে। একথার খুব সুস্পষ্ট সমর্থন* মেলে রবীন্দ্রনাথের *জীবনস্মৃতি*-র 'সূচনায়' :

> স্মৃতির পটে জীবনের ছবি কে আঁকিয়া যায় জানি না। কিন্তু যেই আঁকুক সে ছবিই আঁকে। অর্থাৎ, যাহাকিছু ঘটিতেছে তাহার অবিকল নকল রাখিবার জন্য সে তুলি হাতে বসিয়া নাই। সে আপনার অভিরুচি-অনুসারে কত কী বাদ দেয়, কত কী রাখে। কত বড়োকে ছোটো করে, ছোটোকে বড়ো করিয়া তোলে। সে আগের জিনিসকে পাছে ও পাছের জিনিসকে আগে সাজাইতে কিছুমাত্র দ্বিধা করে না। বস্তুত, তাহার কাজই ছবি আঁকা, ইতিহাস লেখা নয়।
>
> এইরূপে জীবনের বাহিরের দিকে ঘটনার ধারা চলিয়াছে, আর ভিতরের দিকে সঙ্গে সঙ্গে ছবি আঁকা চলিতেছে। দুয়ের মধ্যে যোগ আছে, অথচ দুই ঠিক এক নহে।
>
> আমাদের ভিতরের এই চিত্রপটের দিকে ভালো করিয়া তাকাইবার আমাদের অবসর থাকে না। ক্ষণে ক্ষণে ইহার এক-একটা অংশের দিকে আমরা দৃষ্টিপাত করি। কিন্তু, ইহার অধিকাংশই অন্ধকারে অগোচরে পড়িয়া থাকে। যে-চিত্রকর অনবরত আঁকিতেছে, সে যে কেন আঁকিতেছে, তাহার আঁকা যখন শেষ হইবে তখন এই ছবিগুলি যে কোন্ চিত্রশালায় টাঙাইয়া রাখা হইবে, তাহা কে বলতে পারে।
>
> কয়েক বৎসর পূর্বে একদিন কেহ আমাকে আমার জীবনের ঘটনা জিজ্ঞাসা করাতে, একবার এই ছবির ঘরে খবর লইতে গিয়াছিলাম। মনে করিয়াছিলাম, জীবনবৃত্তান্তের দুই-চারিটা মোটামুটি উপকরণ সংগ্রহ করিয়া ক্ষান্ত হইব। কিন্তু, দ্বার খুলিয়া দেখিতে পাইলাম, জীবনের স্মৃতি জীবনের ইতিহাস নহে— তাহা কোন্-এক অদৃশ্য চিত্রকরের স্বহস্তের রচনা। তাহাতে নানা জায়গায় যে নানা রঙ পড়িয়াছে তাহা বাহিরের প্রতিবিম্ব নহে— সে-রঙ তাহার নিজের ভাণ্ডারের, সে-রঙ তাহাকে নিজের রসে গুলিয়া লইতে হইয়াছে; সুতরাং পটের উপর যে-ছাপ পড়িয়াছে তাহা আদালতে সাক্ষ্য দিবার কাজে লাগিবে না।

আবার লাকার চিন্তায় সচেতন সত্তা, তার অবচেতন অপরের ('other') প্রতিফলনমাত্র। ফলত এই ধারণাকে স্বীকার করলেও দেখা যায় যে সত্তার অস্তিত্ব নিতান্তই কল্পনা-নির্ভর। কাজেই প্রায় অলীক এই সত্তার প্রকৃতি যে রচনায় প্রকাশিত তাও এই তাত্ত্বিকদের কাছে বিশ্বাসযোগ্য নয়। 'জীবনী' ও 'আত্মজীবনী'র প্রতি উত্তর-অবয়ববাদীদের অবিশ্বাসকে মান্যতা দিলে জীবনীমূলক সমালোচনার প্রধান ব্যবহার্য হাতিয়ার 'জীবনী-উপাদান' নির্ভরযোগ্যতা হারিয়ে হয়ে পড়ে অনেকাংশেই অর্থহীন। আর এভাবেই বিপন্ন হয় এই পদ্ধতির গ্রহণযোগ্যতা।

তথ্যসূত্র :

১. *Princetom Encyclopedia of Poetry and Poetics* বইটির 'criticism' শীর্ষক আলোচনাটি দ্রষ্টব্য।

২. Penguin Books প্রকাশিত *The Golden Treasury* গ্রন্থে ২৭৫-৭৬ পৃষ্ঠায় কবিতাটি রয়েছে।

৩. সিডনি কোলভিন (Sidney Colvin)-এর লেখা জন কিটসের জীবনী *John Keats : His Life and Poetry, His Friends, Critics and After--Fame* (1917) গ্রন্থটির ত্রয়োদশ পরিচ্ছেদে কিটসের জীবনের এই অধ্যায়টির আলোচনা রয়েছে।

৪. চিঠিটি কিটস লেখেন জর্জ ও থমাস কিটসকে। অংশটি উদ্ধৃত করা হল—"I had not dispute that a diaquisition with Dilkes on various subjects ; several things dovetailed in my mind, & at once it struck me, what quality went from a Man of Achievement especialhy in literature which Shakespeare possessed so enormously— I mean Negative Capability, that is when man is capable of being in uncertainties, Mysteries, doubts without any irritable reacting after fact & reason.

৫. জেরেমি হথর্নের লেখা *A Glossary of Contemporary Literary Terms*-এর পৃষ্ঠা ১৭৫ দ্রষ্টব্য।

৬. এই অংশের আলোচনায় Routledge থেকে প্রকাশিত লিন্ডা অ্যান্ডারসনের লেখা *Autobiography* বইটির সাহায্য নেওয়া হয়েছে।

৭. *Autobiography* গ্রন্থটির দ্বিতীয় অধ্যায় পৃষ্ঠা ৭০-৭৯।

৮. *Autobiography* গ্রন্থের 'Introduction', পৃষ্ঠা ১২-১৩।

নিউ হিস্টরিসিজম
ইতিহাসচর্চার নতুন তত্ত্ব
সৈকত সরকার

কাসরুমের মধ্যে সাধারণ ভাবে আমরা কোনো টেক্সটের আলোচনা করার সময় ঐতিহাসিক প্রেক্ষাপটের কথা গুরুত্ব দিয়ে ভেবে থাকি। আলোচ্য লেখকের সময়, তাঁর সামাজিক অবস্থান ইত্যাদির প্রেক্ষাপটে তাঁর লেখার জন্ম এমন ভাবনা আলোচকের সামনে স্বাভাবিক ভাবেই এখন উপস্থিত হয়। পাঠক লক্ষ করবেন, এই প্রচলিত আলোচনায় ইতিহাসকে আলোচ্য পাঠের প্রেক্ষাপট হিসেবে বিবেচনা করা হয়। বিংশ শতাব্দীর দ্বিতীয় দশক থেকে আমেরিকার নিউ ক্রিটিকরা কোনো টেক্সট বা পাঠের আলোচনার সময় এই প্রেক্ষাপটের গুরুত্ব অস্বীকার করেন। নিউ ক্রিটিসিজম, বিশেষত আমেরিকার নিউ ক্রিটিসিজম, চল্লিশ এবং পঞ্চাশের দশকে প্রভাবশালী হয়ে ওঠে। জন ক্রো র‍্যানসম, ক্রিয়াম্থ রুকজম, রবার্ট পেন ওয়ারেন প্রমুখ সমালোচকরা ঐতিহাসিক, জৈবনিক, সামাজিক— সব ধরনের প্রেক্ষাপটকেই অপ্রয়োজনীয় বলে দাবি করেন। তারা লেখকের অভিপ্রায় নিয়ে চিন্তা না করে মনোযোগ দেন 'পাঠটি'-র ওপর। নিউ ক্রিটিসিজমের এই অ্যাংলো-আমেরিকান ধারার প্রায় সমকালীন রাশিয়ান ফর্মালিস্টদের ভাবনা-চিন্তাতেও টেক্সটের প্রেক্ষাপটের গুরুত্ব অস্বীকার করে পাঠ-এর মধ্যে মনোযোগ কেন্দ্রীভূত করার প্রচেষ্টা পরিলক্ষিত হয়। তাদের মনোযোগের কেন্দ্রে ছিল সাহিত্যের ভাষা, এবং সাহিত্যগুণ (literariness)। এর পরবর্তী গঠনবাদী ভাবনাধারায় যদিও মনোযোগ টেক্সটের বাইরে প্রক্ষিপ্ত হয়, প্রভাবশালী উত্তর-গঠনবাদী চিন্তায় তা আবার টেক্সটেই কেন্দ্রীভূত হয়। প্রখ্যাত উত্তর-গঠনবাদী চিন্তাবিদ দেরিদার বিখ্যাত উক্তি 'টেক্সটের বাইরে কিছুই নেই'— এরই পরিচয় বহন করে।

সাহিত্যজগতে উত্তর-গঠনবাদী ভাবনার প্রভাবের মধ্যেই সাত-এর দশকের শেষার্ধ থেকে সাহিত্য সমালোচনায় ইতিহাস ভাবনার পুনঃপ্রবেশ ঘটে। ১৯৮০ সালে 'জঁর' পত্রিকাতে এক বিশেষ বিষয়ের কিছু প্রবন্ধের সংকলন হয়। প্রবন্ধগুলির প্রতিপাদ্য বিষয় ছিল রেনেসাঁসের সাহিত্য। এই সংকলনের ভূমিকায় স্টিফেন গ্রিনব্ল্যাট জানান যে সংকলনটির প্রবন্ধগুলি এক 'নিউ হিস্টরিসিজম্' তত্ত্বের সূচনা করেছে। সেই থেকে সাহিত্যতত্ত্ব বা সাহিত্যভাবনা হিসেবে নিউ হিস্টরিসিজম

নামটির প্রচলন হয়। এই সংকলনে যারা প্রবন্ধ লিখেছিলেন তারা অধিকাংশই মার্কিন, এবং তাদের ওপর ফরাসি বুদ্ধিজীবী মিশেল ফুকোর প্রভাব অনস্বীকার্য। ১৯৮০ সালে ক্যালিফোর্নিয়ার বার্কলি বিশ্ববিদ্যালয়ে ফুকো পড়াতে আসেন। ফুকোর চিন্তাজগতে ক্ষমতা কিভাবে কার্যকর হয় তা এক গুরুত্বপূর্ণ স্থান অধিকার করে আছে। ক্ষমতার বহিঃপ্রকাশ যে আর শারীরিক ক্ষমতার ওপর নির্ভর করে না, তা যে ভাষা এবং বয়ান (ডিসকোর্স)-এর মধ্যেই অন্তর্ব্যাপ্ত তা ফুকোর ভাবনাচিন্তায় স্পষ্টভাবে উঠে আসে।

ডিসকোর্স বা বয়ান ফুকোর ভাবনায় একটি গুরুত্বপূর্ণ অংশ। ডিসকোর্স হল একটা system of statements, একটা bounded (বাঁধাই করা) জ্ঞানের ক্ষেত্র যার বহির্ভূত কিছু হয় না। আরেক ভাবে বলা যায় যে ডিসকোর্স হল নিয়মের একটা set, যা আমরা বিনা প্রশ্নে, স্বতঃস্ফূর্তভাবে অনুসরণ করি। যেমন ক্লাসরুমের মধ্যে শিক্ষক আসা মাত্র ছাত্রছাত্রীদের উঠে দাঁড়ানো। এইসব চিন্তাবিদদের মতে মানুষের প্রতিটি মুহূর্ত, প্রতিটি ক্রিয়া সবই রাজনৈতিক। কোনো কিছুই রাজনীতি ব্যতীত নয়। ডিসকোর্স আমাদের জীবনের প্রতিটি স্তরে, প্রতিটি ক্রিয়ায় বিদ্যমান। স্বাভাবিকভাবে কোনো বিষয়ে ডিসকোর্স কি হবে তা সূচিত বা নির্ধারিত হয় তাদের ইচ্ছে বা স্বার্থ অনুযায়ী, যারা ক্ষমতাবান। ক্ষমতা এবং জ্ঞান ফুকোর মত অনুযায়ী ভীষণভাবেই পরস্পরের সঙ্গে সম্পর্কযুক্ত। ফুকো, বিশেষত ১৯৭৯ সালে প্রকাশিত তার *Disipline and Punish* বইতে ক্ষমতার তিনটি পৃথক মাত্রার কথা উল্লেখ করেছেন। সার্বভৌমত্ব (Sovereignty), অনুশাসন (Discipline) আর প্রশাসনিকতা (Governmentality)। সার্বভৌমত্ব প্রাচীন শাসন ব্যবস্থা যেখানে আইন না-মানার শাস্তি শারীরিক ভাবে দেওয়া হয়। তার এই বইতেই অষ্টাদশ শতকে ফ্রান্সের এক আসামীর শাস্তির বীভৎসতার কথা উল্লেখ করেছেন তিনি। পরবর্তী সময়ে এই ধরনের শারীরিক শাস্তির বদলে অনুশাসনের প্রবর্তন হয়। এই শাসন ব্যবস্থায় হাসপাতাল, কারাগার, স্কুল, কারখানা ইত্যাদি প্রতিষ্ঠানগুলি আধুনিক সমাজের প্রতিনিধি হিসেবে কাজ করে। এই সমস্ত প্রতিষ্ঠানগুলি মানুষের অজান্তে তাকে নজরবন্দি করে রাখে। শারীরিক অসুস্থতায় মানুষ হাসপাতাল যায়, শিক্ষার প্রয়োজনে স্কুল ও কলেজে, আইনগত সমস্যায় আদালতে। আর এর মধ্যেই মানুষ নিজের অজান্তে রাষ্ট্রের কাছে নজরবন্দি থাকে। আর নজরবন্দি অবস্থায় তাকে সহজেই অনুশাসনবদ্ধ করে রাখা যায়। সাধারণভাবে এই শাসনব্যবস্থার এক জনমোহিনী রূপ আছে। এখানে ক্ষমতার কেন্দ্রে কেউ নেই, বরং এ এক পরিব্যাপ্ত শাসনব্যবস্থা যেখানে মানুষ স্ব-ইচ্ছায় নিজেকে অনুশাসিত রাখে। ক্ষমতার একটি তৃতীয় মাত্রার কথা ফুকো বলেছেন। সেটি হল Governmentality। এই ব্যবস্থার একটি প্রধান উপাদান হল, সংখ্যাতত্ত্ব বা statistics। জনগোষ্ঠীকে নানাভাবে শ্রেণীবদ্ধ করে তাদের সম্বন্ধে সরকারি তথ্যসংগ্রহ আর তাকে প্রশাসনিক জ্ঞান-ভাণ্ডারের অঙ্গীভূত করে তোলা এই শাসনব্যবস্থার মূল নীতি। এই জ্ঞানভাণ্ডারের ওপর নির্ভর করেই সমাননীতি রচিত হয়। অনুশাসন এবং প্রশাসনিকতা, এই দুই মাত্রাতেই জ্ঞানের সাথে ক্ষমতার এক বিশেষ সম্পর্ক পরিলক্ষিত হয়।

ফুকোর দর্শনে জ্ঞান আর ক্ষমতা ভীষণভাবেই সমার্থক। জ্ঞান কোন সার্বভৌম বস্তু নয়। তা সৃষ্টি করা যায়। এই সৃষ্টির পেছনে একটা human agency আছে। ক্ষমতাবান তার স্বার্থ অনুযায়ী এই জ্ঞান সৃষ্টি করে। এই জ্ঞানেরই একটি রূপ হচ্ছে discourse। ডিসকোর্সের উদাহরণ স্বরূপ ক্লাসরুমে শিক্ষকের প্রবেশমাত্র ছাত্রছাত্রীর উঠে দাঁড়ানোর কথা বলেছিলাম। এতে অনেকেই প্রশ্ন করতে পারেন, বলতে পারেন যে এই শিষ্টাচার আমাদের ভারতীয়

সংস্কৃতির এক অংশ। কিন্তু এটাও ঠিক যে, এই আচরণের সঙ্গে জ্ঞানের রাজনীতির যোগাযোগের কথা অস্বীকার করা যায় না। আসলে রাজনীতি আমাদের জীবনে এতটাই পরিব্যাপ্ত যে অরাজনৈতিক কোনো কিছুর কল্পনা করা খুবই কঠিন। ডিসকোর্সের আরেকটি পরিচিত উদাহরণ হল চিকিৎসা পদ্ধতি সংক্রান্ত। আমরা রোগ নিরাময়ের জন্য বিনা বাক্যব্যায়ে অ্যালোপ্যাথদের কাছে ছুটি। রোগ নিরাময়ের অন্যান্য চিকিৎসা পদ্ধতি, যেমন ইউনানি, আয়ুর্বেদ বা আকুপাংচার, এগুলির প্রতি আমাদের শুধু অনাস্থাই নেই, আমরা অধিকাংশ সময়ে এই সব চিকিৎসা পদ্ধতিকে হাতুড়ে বা অশিক্ষিত বলে ভেবে থাকি। ভেবে দেখলে দেখা যাবে যে আমাদের এই স্বতঃস্ফূর্ত নির্বাচনের পেছনেও একটা রাজনীতি আছে। কোনো বিশেষ ক্ষমতাশীল গোষ্ঠী আমাদের জন্য এই চিকিৎসা সংক্রান্ত ডিসকোর্সটি এমনভাবে তৈরি করে দিয়েছে যে আমরা এর বাইরে আর ভাবতে পারি না।

মিশেল ফুকোর এই ধারণা যে ক্ষমতা ভীষণভাবে ভাষা ও ডিসকোর্সের মধ্যে অন্তর্ব্যাপ্ত আর দেরিদার পূর্বোল্লিখিত ঘোষণা 'there is nothing outside the text'— এই দুইয়ের সংশ্লেষ থেকে নিউ হিস্টরিসিজমের প্রাথমিক প্রতিপাদ্য বিষয়টি উঠে আসে। নিউ হিস্টরিসিস্ট সমালোচকদের মতে ইতিহাস আমাদের কাছে এসে পৌঁছোয় একমাত্র পাঠ বা text-এর মাধ্যমে। পাঠ বা text-এর বাইরে ইতিহাস-এর কোন অস্তিত্ব নেই। পাঠক এখানে মনে রাখবেন যে text বলতে আমরা কিন্তু সাধারণ অর্থে বই বলতে যা বোঝায় তা বোঝাচ্ছি না। গঠনবাদী চিন্তাধারায় টেক্সটকে নৈর্ব্যক্তিক লেখন-এর এক প্রতিভাত রূপ হিসেবে দেখা হয়। তবে সহজ করে বলতে গেলে যা কিছু বিশ্লেষণ করা যায়, টেক্সট হল তাই। তাকে যে নির্দিষ্টভাবে কোনো বই হতে হবে তার কোনো মানে নেই। সংবাদপত্রের কোনো লেখা কোনো ছবি বা আদালতে দেওয়া সাক্ষ্য— সবকিছুই টেক্সট হতে পারে। এই যা কিছু বিশ্লেষণ করা যায় শব্দবন্ধটি খেয়াল করলে দেখা যাবে এতে বিশ্লেষকের ভূমিকাও কিন্তু বেশ গুরুত্বপূর্ণ। এই বিশ্লেষণে human agency-র প্রভাব অনস্বীকার্য। মার্কসীয় তত্ত্বের আইডিওলজিই হোক, বা গ্রামশির হেজিমনি অথবা আলথুজারের আইডিওলজিক্যাল স্টেট অ্যাপারেটাস, বা ফুকোর ডিসকোর্স— সমস্ত তাত্ত্বিকরাই প্রমাণ করেছেন যে ব্যক্তিসত্তা (subjectivity) নির্মাণ করা হয়, তা স্বর্গ থেকে প্রদত্ত নয়। এর থেকে সহজেই অনুমেয় যে বিশ্লেষক তার বিশ্লেষণে তার নিজস্ব মতাদর্শ, যা পক্ষান্তরে তার সামাজিক অবস্থান দ্বারা পরিচালিত, প্রয়োগ করে থাকেন। প্রখ্যাত দার্শনিক নিৎশের উক্তি— fact বলে কিছু নেই, আছে শুধু ব্যাখ্যা— এই প্রসঙ্গে উল্লেখ্য। ইতিহাসচর্চায় এই মানবিক দৃষ্টিকোণ বর্তমান ইতিহাসবিদদের ভাবনায় বারবার উঠে আসে। ঐতিহাসিক কিথ জেনকিনস্ তার বই *রি-থিংকিং হিস্ট্রি*-তে দেখিয়েছেন যে ইতিহাস কোনো পুনরাধিকার নয়, পুনর্নির্মাণ।

ইতিহাস যদি নির্মাণ বা পুনর্নির্মাণ হয় তাহলে তা অবশ্যাম্ভাবী গোপন আর জ্ঞাপনের রাজনীতি দ্বারা জারিত। পাঠ-এ তথ্য কতটা দেওয়া হবে তা প্রায় পুরোটাই নির্ভর করে ঐতিহাসিকের ওপর। লিখিত ইতিহাস প্রতিষ্ঠান দ্বারা স্বীকৃত হলে তার বাইরেও রয়ে যায় আরো নানা তথ্য, নানা মানুষের (বিশেষত যারা প্রান্তবাসী) কথা। নিউ হিস্টরিসিস্টদের দৃষ্টি থাকে এইসব না-শোনা, না-জানা মানুষদের ওপর। এদের না-শোনা, না-জানা গল্পকে এঁরা পুনর্নির্মাণ করতে চান। ফলত যা পুনর্নির্মিত হয় তা হয়ে ওঠে এক বিকল্প ইতিহাস, যা সরকারি আখ্যান-বহির্ভূত। আর এ সমস্ত মানুষদের কথা শুনতে চাওয়া থেকেই তৈরি হয়ে যায় নিম্নবর্গের ইতিহাসচর্চার মঞ্চ। একটি বহুশ্রুত উদাহরণ দিলে ধারণাটা কিছুটা পরিষ্কার হবে।

ধরা যাক কলিঙ্গ যুদ্ধের প্রেক্ষাপটে এক চাষির গল্প। সে সময়ের যুদ্ধ জনপদের বাইরে কোনো ফাঁকা প্রান্তরে হত এবং যুদ্ধরীতি মেনে বা রাতে যুদ্ধ করার উপকরণ না থাকায় অন্ধকার হলে আর যুদ্ধ করা হত না। ধরা যাক, এই চাষিটি যুদ্ধের খবর পেয়ে এবং তা থেকে লাভ করার জন্য নিজের জমিজিরেত বিক্রি করে একটি দোকান করেছে। তার আশা যে এই দোকান থেকে সে প্রভূত পরিমাণ মুনাফা করবে। সরকারি ইতিহাসে এই যুদ্ধের আখ্যান বলে যে অশোক তার ধর্মাদর্শের পরিবর্তন-এর জন্য যুদ্ধটা আর করলেন না। কিন্তু এর বাইরে? সেই চাষির কি হল? তার কথা যে শোনার প্রয়োজন নেই এমন দাবিকে নিউ হিস্টরিসিস্টরা কিন্তু অস্বীকার করেন। নিউ হিস্টরিসিস্টদের নজর থাকে ছোটখাটো, চাপা পড়ে যাওয়া ঘটনা বা anecdote-এর ওপর। গাইলস ডেল্যুজ আর ফেলিক্স গুয়াতারি যেমন তাঁদের বিশ্লেষণের জন্য সবচাইতে ক্ষুদ্রতম মুহূর্তকে বেছে নেন তার মধ্যেকার counter-discursive ক্ষমতাকে আবিষ্কার করার জন্য, নিউ হিস্টরিসিস্টদেরও প্রতিপাদ্য বিষয় থাকে এইসব anecdote-এর মধ্যেকার প্রতিরোধী ক্ষমতাগুলোকে পরিস্ফুট করা। কোনো ঐতিহাসিক কালপর্বের সংহতির চাইতে অনৈক্যর ওপর এরা জোর দেন বেশি। এবং এই অনৈক্যর মধ্যে থেকেই উঠে আসে এক অসমান্তরাল আখ্যান, তৈরি হয় এক বিকল্প ইতিহাস।

'জঁর' পত্রিকার সেই বিশেষ সংখ্যাটি ছাড়া নিউ হিস্টরিসিজম-এর একটি উল্লেখ্য বই হচ্ছে স্টিফেন গ্রিনব্ল্যাট-এর *রেনেসাঁ সেল্ফ-ফ্যাশনিং : ফ্রম মুর টু শেক্সপীয়ার* (১৯৮০) এবং জে. ডবলিউ লিভার-এর ১৯৭১ সালের প্রকাশনা *দি ট্র্যাজেডি অফ স্টেট : স্টাডি অফ জেকোবিয়ান ড্রামা*। শেষোক্ত বইটি ১৯৮৭ সালে জোনাথন ডলিমোর-এর ভূমিকা সহ আবার প্রকাশিত হয়। লিভার-এর বইটি জেকোবিয়ান যুগের নাটকের রক্ষণশীল সমালোচনার বিরোধিতার জন্য বিখ্যাত হয়ে আছে। সেই সময়ের নাটক যে কতটা রাজনীতির সঙ্গে জড়িত ছিল তা তিনি এই বইতে স্পষ্ট করে দেখিয়েছেন। তৎকালীন থিয়েটার প্রজাদের রাজার প্রতি আনুগত্য শেখাত না রাজার কর্তৃত্বকে অবজ্ঞা করতে শেখাত তা নিয়েও সমালোচকদের মতামত দুভাগে বিভক্ত ছিল। টমাস হেউড তার *অ্যাপলজি ফর অ্যাক্টরস* বইতে এ-বিষয়ে সম্যক আলোচনা করেছেন। রাজ্যপাটের সঙ্গে থিয়েটার সম্পর্কের কথা নিয়ে আলোচনা করেছেন রাজা প্রথম জেমস তার *ব্যাসিলিকন ডোরন* (*Basilikon Doron*) বইতে। সেখানে তিনি রাজাকে তুলনা করেছেন এমন একজনের সঙ্গে যে স্টেজের ওপর অবস্থিত এবং যার ক্ষুদ্রতম কার্য বা অঙ্গসঞ্চালন সবার দর্শনের বস্তু এবং সামান্য বিচ্যুতিও বয়ে আনতে পারে অবজ্ঞা মিশ্রিত ঘৃণা যা খুব সহজেই জন্ম দিতে পারে বিদ্রোহের। রাজা বা রানির সঙ্গে থিয়েটারের অঙ্গাঙ্গী সম্পর্কের কথা আরও জানতে পারা যায় রানি এলিজাবেথের শেক্সপীয়ারের *Richard II* নাটকটিকে নিয়ে অস্বস্তির কথা পড়লে। এসেক্স-এ ১৬০১ সালে সংঘটিত বিদ্রোহের আগে লেখা এই নাটকটি খোলা রাস্তায় বা বিভিন্ন বাড়িতে অন্তত চল্লিশবার মঞ্চস্থ হয়। এই নাটকের বারংবার অভিনীত হওয়া এবং বিশেষত খোলা রাস্তায় (যেখানে থিয়েটার হাউস-এর ভেতরের পরিচিত বাস্তব আর কল্পনার মধ্যে বিভাজন থাকে না) অভিনীত হওয়া রানিকে অস্বস্তিতে ফেলেছিল। নিউ হিস্টরিসিস্টদের শেক্সপীয়ারের নাট্যজগতের প্রতি আকর্ষণের একটা কারণ যদি শেক্সপীয়ারের নিজস্ব ইতিহাসধর্মী রচনাগুলি হয়, আরেকটি কারণ হল নাটকগুলিতে তৎকালীন রাজনীতির প্রতিফলন দেখতে পাওয়া।

নিউ হিস্টরিসিজমের একটি মুখ্য প্রতিপাদ্য যদি এই হয় যে টেক্সট ছাড়া ইতিহাসের কোনো অস্তিত্ব নেই, তাহলে আরেকটি মুখ্য প্রতিপাদ্য হল সাহিত্য এবং সাহিত্য নয় এমন টেক্সটকে

সমান্তরাল ভাবে পড়া। ইংরেজি পরিভাষা ব্যবহার করে বলা যায় যে ইতিহাস এখানে আর context (*প্রেক্ষাপট*) *নয়,* co-text (*সহ-পাঠ*)*। যে সাহিত্য এবং সাহিত্য-বহির্ভূত টেক্সটগুলিকে পাশাপাশি রেখে পড়ার কথা এই তাত্ত্বিকরা বলে থাকেন, তাদের কিন্তু এক ঐতিহাসিক* কালপর্বের হতে হবে। সাধারণভাবে কোনো সাহিত্য পাঠের ঐতিহাসিক প্রেক্ষাপটের কথা আলোচনা করার সময় মূল পাঠের সঙ্গে প্রেক্ষাপটের একটা বিভাজন করা হয় যেখানে মূলপাঠকে অনেক বেশি গুরুত্বপূর্ণ ধরা হয়। নব্য ইতিহাসবাদীরা এরকম কোনো বিভাজন করেন না। তারা সাহিত্য এবং সাহিত্য-বহির্ভূত দুধরনের টেক্সটকেই সমান গুরুত্ব দিয়ে আলোচনা করে থাকেন। এই সমান গুরুত্বপ্রদানকে মার্কিন ক্রিটিক লুই মনট্রোজ খুব সুন্দরভাবে বিশ্লেষণ করেছেন। তিনি নিউ হিস্টরিসিজমকে ইতিহাসের পাঠযোগ্যতা এবং পাঠ্যের ঐতিহাসিকতার প্রতি যৌথ উৎসাহ হিসেবে দেখিয়েছেন। স্টিফেন গ্রিনব্ল্যাক-এর কথায় নিউ হিস্টরিসিজম হল অতীতের এক বিশেষ কালপর্বের সমস্ত পাঠ্য সূত্রকে পড়ার তীব্র ইচ্ছা।

নিউ হিস্টরিসিজম হল সাহিত্যচর্চার এমন এক ধারা যেখানে সাহিত্য-পাঠকে অগ্রাধিকার দেওয়া হয় না। সাধারণত এই রীতিতে সাহিত্য পাঠকে কোনো সাহিত্য-বহির্ভূত পাঠ্যের কাঠামোর মধ্যে রেখে তার আলোচনা করা হয়। স্টিফেন গ্রিনব্ল্যাট-এর প্রধান উদ্ভাবন হচ্ছে রেনেসাঁস যুগের নাটকগুলির পাশাপাশি তৎকালীন প্রধান ইউরোপীয় দেশগুলির ঔপনিবেশিক রাজনীতির আলোচনা করা। গ্রিনব্ল্যাট কোনো নাটকের আলোচনার সময় ঐ সময়ের কোনো ঐতিহাসিক রেকর্ডকে বেছে নেন, এমন রেকর্ড যার সঙ্গে আলোচ্য নাটকটির কোনো অংশের সাযুজ্যও আছে। গ্রিনব্ল্যাট এই রকম রেকর্ডকে anecdote আখ্যা দিয়েছেন। সাধারণত নব্য ইতিহাসবাদীদের কৃত সমালোচনা কোনো শক্তিশালী anecdote দিয়ে শুরু হয়। এহেন anecdote এতটাই সবিস্তারে বর্ণিত হয় যে তাতে একটা তথ্যচিত্রের রূপ থাকে। এমন আলোচনার উদ্দেশ্য হচ্ছে ইতিহাসের এক বিকল্প অর্থ সৃষ্টি করা, এমন এক বিকল্প যেখানে সমাজের প্রান্তবাসীদের কথাও উঠে আসে। নিউ হিস্টরিসিজম এই অবহেলিত, অবদমিত মানুষদের বক্তব্য শোনাও প্রয়োজনীয় মনে করে। তারা শেক্সপীয়ারকে ইংরেজি ভাষার মূর্তরূপ মনে না করে তার লিখিত নাটকগুলিকে সমকালীন বিভিন্ন লিখিত পাঠ-এর মধ্যে প্রোথিত থাকতে দেখেন। তাদের পঠনে এই নাটকগুলির মধ্যের অন্তর্নিহিত পিউরিটানদের শিল্পের প্রতি গোঁড়ামি, ক্রীতদাস প্রথা, পুরুষদের উত্থান প্রভৃতি বিষয়গুলি সামনে উঠে আসে। শেক্সপীয়ার সমালোচনার একটি প্রখ্যাত বইয়ের কথা এখানে উল্লেখ্য, ই. এম. ডবলিউ টিলিয়ার্ড-এর *দ্য এলিজাবেথান ওয়ালর্ড পিকচার* (১৯৪৩)। টিলিয়ার্ড তাঁর বইতে তৎকালীন জনগণের সম্মিলিত বা সমবেত মননের কথা বলেছেন। নিউ হিস্টেরিসিস্টরা প্রশ্ন করেন এই সমবেত মনন-এর অস্তিত্বকে।

প্রাচীন বা সাবেকি ঐতিহাসিক দৃষ্টিভঙ্গির সঙ্গে নব্য ইতিহাসবাদীদের দৃষ্টিভঙ্গির একটি মূল তফাৎ হল নব্য ইতিহাসবাদীদের ইতিহাসকে স্রেফ টেক্সট হিসেবে দেখা। ইতিহাস কীভাবে লিখিত তথ্য হিসেবে আমাদের কাছে লভ্য, তাদের উৎসাহ সেখানেই। এর বাইরে ইতিহাস-এর কোনো অস্তিত্ব নেই। কারণ ঐতিহাসিক ঘটনা বা ব্যক্তি চিরতরে হারিয়ে গেছে। আর ইতিহাস যেহেতু লিখিত পাঠ রূপে আমাদের কাছে লভ্য, তাই এই লিখিত টেক্সটগুলিও ততটাই মনোযোগী পঠন দাবি করে, যতটা সাহিত্যের পাঠ করে। দেরিদার উক্তি 'টেক্সট-এর বাইরে কিছু নেই'—এই চর্চায় বিশেষ ভাবে প্রযোজ্য, কারণ অতীতের সমস্ত কিছুই আমাদের কাছে উপস্থিত হয় একমাত্র লিখিত টেক্সট হিসেবেই। আর এই পাঠ্যায়িত ইতিহাস পরিশোধিত হয়

এক ত্রি-স্তরীয় মাত্রায়। প্রথম স্তর হল পাঠ-এর লেখকের সমকালীন ডিসকোর্স, দ্বিতীয় স্তর হল বর্তমান কালপর্বের ডিসকোর্স আর তৃতীয় স্তর হল ভাষার সতত অপসৃয়মান সত্তা। মানে যিনি লিখেছেন বা যিনি পড়েছেন তারা কেউই তো কোনো সার্বভৌম সত্তা নন, তারা তাদের কালপর্বের ডিসকোর্স দ্বারা নিয়ন্ত্রিত। আর ভাষা যে কতটা পিচ্ছিল আর অর্থ তৈরিতে কতটা অপারগ তা সস্যুরে থেকে দেরিদা সবাই দেখিয়েছেন। এহেন বিভিন্ন স্তরের মধ্যে দিয়ে যে পাঠ উঠে আসে তা নতুন করে নির্মিত হয়। সাহিত্য এবং সাহিত্য-বহির্ভূত পাঠকে পাশাপাশি রেখে সমান্তরাল ভাবে পঠন এক নতুন পাঠ নির্মাণ করে। অতীতকে যথাযথ ভাবে উদ্ধার করা এদের প্রতিপাদ্য বা উদ্দেশ্য নয়। এদের উদ্দেশ্য অতীতকে পুনঃস্থাপিত করে এক বিকল্প সত্যের জন্ম দেওয়া।

শেক্সপীয়ারের *টুয়েল্‌ফথ নাইট* নাটকে ম্যালভলিও চরিত্রটির রূপায়ণ তৎকালীন সমাজের পিউরিটানদের সঙ্গে অভিজাত শ্রেণিভুক্ত লোকেদের দ্বন্দ্বের কথা তুলে ধরে। এই রোমান্টিক কমেডির এই বিশেষ পাঠ তৎকালীন সমাজের গোষ্ঠীদ্বন্দ্বকে প্রকট করে। মধ্যবিত্ত শ্রেণির ক্ষমতাশীল হতে চাওয়া— সবকিছুকেই পরিষ্কার করে ফুটিয়ে তোলে। তেমনই *মার্চেন্ট অফ ভেনিস* নাটকে শাইলকের পরাজয় আমাদের আহ্লাদিত করলেও তৎকালীন সমাজের ইহুদিদের অবস্থাও লুকিয়ে থাকে না। এমনই নানাবিধ চুপ করিয়ে দেওয়া মানুষদের কথা, যারা প্রান্তবাসী, নিউ হিস্টরিসিজম আমাদের শুনিয়ে থাকে। পরবর্তী ক্ষেত্রে নিম্নবর্গের ইতিহাস চর্চায় আমরা এমন বিকল্প পাঠের প্রয়োগ দেখতে পাই। রনজিত গুহ, পার্থ চট্টোপাধ্যায়, শাহিদ আমিন, ডেভিড হার্ডিম্যান, জ্ঞানেন্দ্র পাণ্ডে প্রভৃতি সমাজবিজ্ঞানীদের গবেষণায় উচ্চবর্গের মানুষদের দ্বারা নিম্নবর্গের মানুষদের চেতনার নিয়ন্ত্রণের বাস্তবতা ফুটে ওঠে। বিভিন্ন ঐতিহাসিক কালপর্বে এইসব মানুষের কথা কখনো শোনা হয়নি। এদের জীবন প্রতিফলিত হয়নি। নিউ হিস্টরিসিজম এদের কথা শুনে, এদের দৃষ্টিভঙ্গি তুলে ধরে এক বিকল্প সত্য, বিকল্প ইতিহাস রচনা করতে প্রয়াসী হয়, এমন ইতিহাস যা আমাদের নিয়ে যায় এক বৃহত্তর ও গভীরতর জীবনবোধের দিকে।

মূলত মার্কিন এই ইতিহাসচর্চার পাশাপাশি ইংল্যান্ডেও এই সময়ে অন্য এক ইতিহাসচর্চার সূচনা হয়। এর নাম সাংস্কৃতিক বস্তুবাদ। এই ধারার প্রধান ক্রিটিক হলেন রেমণ্ড উইলিয়ামস। এছাড়া গ্রাহাম হোল্ডারনেস, জোনাথন ডলিমোর, অ্যালান সিনফিল্ড-এর নাম উল্লেখযোগ্য। সাংস্কৃতিক বস্তুবাদীরা সংস্কৃতি বলতে কোনো এক বিশেষ সংস্কৃতি বোঝান না। তারা উচ্চ-নিম্ন, শিক্ষিত-অশিক্ষিত সভ্য-অসভ্য এমন কোনো বিভাজন সংস্কৃতির মধ্যে করেন না। এই শব্দবন্ধের দ্বিতীয় শব্দ বস্তুবাদও গুরুত্বপূর্ণ। সাধারণত আমরা বস্তুবাদকে ভাববাদ-এর বিপরীত অর্থে ব্যবহার করে থাকি। ভাববাদ যদি তথাকথিত কোনো বিশেষ সংস্কৃতিকে মুক্তচিন্তার ধারক মনে করে, বস্তুবাদ প্রমাণ করে সংস্কৃতি ভীষণ ভাবে আর্থ-সামাজিক সম্পর্কের ওপর নির্ভরশীল। সাংস্কৃতিক বস্তুবাদীরা ইতিহাসকে বর্তমানের আঙ্গিকে পড়তে চায়, ঐতিহাসিক তথ্যের গোপন ও জ্ঞাপন সংক্রান্ত নির্বাচনকে বিশ্লেষণ করে তারা বর্তমান সমাজের রাজনীতি বিশ্লেষণ করতে চায়। রাজনৈতিক ভাবে দায়বদ্ধ সাহিত্যচর্চার এই ধারা সমাজের পরিবর্তনের সম্ভাবনা নিয়ে অনেক বেশি আশাবাদী।

নয়া ইতিহাসবাদ আর সাংস্কৃতিক বস্তুবাদ-এর আবির্ভাবের সময়কাল প্রায় একই। এদের মধ্যে সাদৃশ্যও অনেক। তবু জ্ঞানচর্চার এই দুই ধারার মধ্যে অমিলও রয়েছে। সমাজবদ্ধ মানুষের সামাজিক প্রতিবন্ধকতা এই দুই ধারার বিশ্লেষণের বিষয় হলেও নয়া ইতিহাসবাদ-এর মনোযোগ কেন্দ্রীভূত প্রতিবন্ধকতা ও তৎসম্পর্কিত রাজনীতির ওপর, আর সাংস্কৃতিক

বস্তুবাদ-এর আগ্রহ এতৎসত্ত্বেও মানুষের নিজের ইতিহাস তৈরি করার ইচ্ছেকে নিয়ে। নয়া ইতিহাসবাদ-এর চাইতে সাংস্কৃতিক বস্তুবাদ বেশি আশাবাদী। এই দুই ধারার মধ্যে আরেকটি পার্থক্য হল যে এরা ইতিহাসবাদী সাহিত্য-বহির্ভূত টেক্সট-এর নির্বাচন সাহিত্যের টেক্সটের সমকালীন কালপর্ব থেকেই করে থাকেন। অন্যদিকে সাংস্কৃতিক বস্তুবাদীর আলোচ্য সাহিত্য-বহির্ভূত পাঠ নির্বাচিত হতে পারে আমাদের বর্তমান কালপর্ব থেকেই। এমন পার্থক্য সত্ত্বেও সমাজ বা ইতিহাসচর্চার এই দুই ধারা তাদের রাজনৈতিক অবস্থান, প্রান্তবাসীদের প্রতি আগ্রহ আর বিকল্প ইতিহাস নির্মাণের ক্ষমতার জন্য বর্তমান জ্ঞানচর্চার জগতে এক বিশেষ স্থান অধিগ্রহণ করতে সক্ষম হয়েছে।

তথ্যসূত্র :

১. নিউ হিস্টরিসিজম সম্বন্ধে প্রাথমিক ধারণার জন্য ম্যাঞ্চেস্টার ইউনিভার্সিটি প্রেস থেকে প্রকাশিত পিটার ব্যারির *বিগিনিং থিওরি* বইটি দ্রষ্টব্য।
২. নিউ হিস্টরিসিজম -এর প্রামাণ্য আলোচনা রয়েছে জোনাথন ডলিমোর আর অ্যালান সিনফিল্ড সম্পাদিত *পলিটিক্যাল শেক্সপীয়ার : এসেজ ইন কালচারাল মেটেরিয়ালিজম* বইতে। এরও প্রকাশক ম্যাঞ্চেস্টার ইউনিভার্সিটি প্রেস।
৩. বাংলায় নিউ হিস্টরিসিজমের আলোচনা জন্য সুধীর চক্রবর্তী সম্পাদিত *বুদ্ধিজীবির নোটবই* বইটি দেখা যেতে পারে। প্রকাশক পুস্তক বিপণি।

তুলনামূলক সাহিত্য অথবা Comparative Literature — এই ধারণাটিকে সংজ্ঞায়িত করতে হলেই বহুধাবিভক্ত মতামতের সম্মুখীন হতে হয়। 'তুলনামূলক সাহিত্য' বললে সাধারণভাবে যে ধারণা হয়, সেটি হল— এক বা একাধিক সাহিত্যের মধ্যে এক তুল্যমূল্য আলোচনা। কিন্তু এই মতের সঙ্গেই যে প্রশ্নগুলি উত্থাপিত হবে, সেগুলি হল কোন্ যুক্তির ভিত্তিতে এক বা একাধিক সাহিত্যকে তুলনার মানদণ্ডে মাপা হবে? বিষয়গত সাদৃশ্য বা বৈসাদৃশ্য, এক বা বহুভাষার উপস্থিতি অথবা অনুপস্থিতি, বর্গগত সাদৃশ্য— তুলনার মানদণ্ডের সূচক ইত্যাদি অনেক কিছুই হতে পারে। কিন্তু সেই বহুসূচকগুলিই বা কীভাবে নির্ধারিত হবে।

পাশ্চাত্য সাহিত্যে ইংরেজি ভাষায় 'Comparative Literature'-শব্দবন্ধটি ব্যবহার করেছিলেন ম্যাথু আর্নল্ড (১৮৪৮)। মনে করা হয় আর্নল্ড পদটি ব্যবহার করেছিলেন Ampére-র 'historic comparative' শব্দটির অনুসরণে। আর্নল্ড, তার বোনকে লেখা এক চিঠিতে (মে, ১৯৪৮) মন্তব্য করেছিলেন, "how plain it is now, though an attention to the comparative literatures for the last fifty years might have instructed any one of it, that England is in a certain sense far behind the continent."

এখানে আর্নল্ডের মন্তব্যের মধ্যে লক্ষণীয় বিষয় হল তিনি এখানে 'Comparative Literature' না বলে, বলেছেন 'Comparative Literatures'। অর্থাৎ বহুবচনের উপস্থিতির মধ্যে দিয়ে তিনি অন্যান্য সাহিত্যকে কষ্টিপাথর হিসেবে ধরে, তাঁর নিজের দেশের সাহিত্য ও লেখকদের উৎকর্ষ মাপতে চেয়েছেন।

অন্যদিকে তুলনামূলক সাহিত্য সম্পর্কে ফরাসিরা ব্যবহার করেছেন 'Litérature Comparé e (এই শব্দবন্ধটি ব্যবহার করেছেন Villemain, ১৮২৯) শব্দটি; আর আন্যদিকে জার্মান ভাষার 'Vergleichande Literaturgeschichete' শব্দগুচ্ছ দ্বারা 'Comparative Literature'-কে সংজ্ঞায়িত করা হয়েছে। Weisstein তাঁর *Comparative Literature and Literary Theory : Survey and Introduction* (1973) গ্রন্থে মন্তব্য করেছেন যে 'Vergleichande

তুলনামূলক সাহিত্য
সংজ্ঞা ও পঠন পদ্ধতি

সোমা মুখোপাধ্যায়

Literaturgeschichte' শব্দগুচ্ছের বদলে 'Vergleichande Literaturwissenschaft' পদগুচ্ছ তুলনামূলক সাহিত্যকে সঠিক ভাবে সংজ্ঞায়িত করে। কারণ 'Literaturwissenschaft' শব্দটি র মধ্যে সাহিত্যিক ইতিহাস (Literary history), সাহিত্যিক সমালোচনা (Literary criticism), সাহিত্যতত্ত্ব ও কাব্যতত্ত্বের ধারণা নিহিত আছে। কিন্তু এই ধারণার মধ্যে সাহিত্যের নন্দনতত্ত্বের ধারণা উপস্থিত নেই। জার্মান এই শব্দগুচ্ছের মধ্যে দিয়ে যে ধারণাটিকে ব্যক্ত করার চেষ্টা করা হয়েছে সেটি হল তুলনামূলক সাহিত্য সম্পর্কে এক আন্তর্জাতিক দৃষ্টিভঙ্গি। যে দৃষ্টিভঙ্গিতে বিভিন্ন সাহিত্যের মধ্যে উপস্থিত আন্তঃসম্পর্ক, সাহিত্যতত্ত্ব, সাহিত্যিক আন্দোলন, বর্গ, যুগ, লেখক সম্পর্কে প্রাচীনকাল থেকে বর্তমান সময় পর্যন্ত ধারণাগুলি উপস্থাপিত হয়েছে।

Comparative Literature সম্পর্কে ইউরোপে প্রচলিত শব্দগুচ্ছগুলির মধ্যে জার্মান শব্দগুচ্ছটি সবচেয়ে বেশি বিবরণমূলক। ইংরেজি ভাষায় ব্যবহৃত পদটি সম্পর্কে ১৯০১ সালে ইংরেজ তাত্ত্বিক H. M. Posnett মন্তব্য করেন, "Comparative Literature designates the object of study rather than the method employed."

Weisstein-এর মতে ফরাসি পদ 'littérature comparée,' ইটালিয়ান পদগুচ্ছ 'Letterature comparata' স্পেনীয় পদগুচ্ছ "literature comparada" এবং পর্তুগিজ পদগুচ্ছ "Litterature comparada" শব্দার্থগত দিক দিয়ে সন্তোষজনক নয়। কারণ তাঁর মতে "'Comparable literature' (= Comparative Literature) and 'literature compared' (Littérature comparée) are only shorthand for designations like the products of one national literature compared with those of one or several others."

তুলনামূলক সাহিত্য বা Comparative Literature সম্পর্কে পরবর্তী আলোচনায় যাবার আগে তুলনামূলক সাহিত্য সম্বন্ধীয় ইতিহাস সম্পর্কে কিছু তথ্য জেনে নেওয়া যেতে পারে।

ফ্রান্সে তুলনামূলক আলোচনার উদাহরণ হিসেবে Dante-এর *De vulgari eloquentia*-এর কথা বলা যেতে পারে। এই রচনাটির নবম অধ্যায়ে Dante, প্রাচীন ফরাসি সাহিত্য (the langue d'oc) এবং প্রাদেশিক সাহিত্যের (the langue d' oil) মধ্যে তুলনামূলক আলোচনা করেছিলেন। জার্মানিতে উদাহরণ হিসেবে দেখা যেতে পারে Johann Elias Schlegel-এর *Vergleichung Shakespeares and Andreas* Gryphs (1742) এবং Lessing-এর *Hamburgische Dramaturgie* (1769) ও A. W. Schlegel-এর ফরাসি ভাষায় Euripides ও Racine-এর *Phaedeas* (1807) তুলনাকে।

ফ্রান্সে তুলনামূলক পঠন পদ্ধতি নিজের জায়গা করে নেয় রক্ষণশীল ও প্রগতিবাদী দলের এবং অনুকরণ ও মৌলিকতার দ্বন্দ্ব ও বিতর্কের মধ্যে দিয়ে। এই বিতর্কের সূচনা হয় Joachim du Bellay-র *Defense et* (1549) *illustration de lg langue francaise*-এর অষ্টম অধ্যায়ে। এই বিতর্ক পরবর্তীকালে চলতে থাকে Corneille-এর *Discours sur les trois unités* (1660)-তে এবং প্রাচীন ও আধুনিক দ্বন্দ্বের (1687-1716, *The Quarrel between the Ancients and the Moderns)* মাধ্যমে। নাটকের ক্ষেত্রে বিদেশী প্রভাবকে প্রতিহত করার চেষ্টা দেখা যায় অষ্টাদশ শতাব্দীতে। Voltaire-এর *Lettres philosophiques* (1734), Diderot-এর *Euloge de Richardson* (1761), Stendhal-এর প্রবন্ধ 'Racine et Shakespeare' (১৮২২)-এ বিদেশী রূপ বা কাঠামোর এক ইতিবাচক উপস্থাপনা লক্ষ করা যায়।

ইউরোপে বিশ্ব সাহিত্যের ধারণার উদ্ভাবন এবং সমাজবিদ্যা ও জীববিদ্যাগত দৃষ্টিভঙ্গির জনপ্রিয়তার ফলেই বিভিন্ন দেশে, যুগ অনুযায়ী শৈল্পিক সৃষ্টির বিভিন্নতাকে গ্রহণ করার এক পরিবাহী চেতনার সূচনা দেখা যায়। Saint Evremond-এর মন্তব্য অনুযায়ী "that the ideal of beauty is not constant throughout the ages and common to all countries, but must necessarily vary according to place and time."

Goethe-র বিশ্বসাহিত্য বা 'Welt literature'-এ যে ধারণার পূর্বসূরী হিসেবে দেখা হয় Madame de Stail-কে এবং তার গ্রন্থ *De L' Allemague* (1810)-কে, সেই গ্রন্থে তিনি মন্তব্য করেন, "The nations must serve each other as guides ....Every country would do well, then, to welcome foreign thoughts, for in such matters, hospitality makes the fortune of the host." কিন্তু একই সঙ্গে Madame de Stail-এর দৃষ্টিভঙ্গী ছিল অনেকটাই সমাজতাত্ত্বিকের দৃষ্টিভঙ্গি। Van Tieghem-এর মতে জার্মান ও ফরাসি সাহিত্যের মধ্যে যে সম্পর্ক বিদ্যমান ছিল, দুটি সাহিত্য পরস্পরের উপর যে প্রভাব বিস্তার করেছিল— সেই বিষয়ে Madame de Stail সে-অর্থে কোনো বক্তব্য পেশ করেননি। পরবর্তী দশকগুলিতেও এই সমাজতত্ত্বগত দৃষ্টিভঙ্গিই বহাল ছিল। এই দৃষ্টিভঙ্গির জনপ্রিয়তার প্রধান স্থপতি ছিলেন Hippolyte Taine। তাঁর উদ্ভাবিত race, milieu ও moment-সম্পর্কিত বক্তব্যে Taine দেখিয়েছেন— প্রত্যেক শিল্প সৃষ্টি একটি জাতির (race) ও তার পারিপার্শ্বিকতার (milieu) উৎপাদিত ফসল। আবার অন্যদিকে জাতিকে পরিবর্তিত করে তার পারিপার্শ্বিকতা, আর সময়ের মধ্যে নিহিত থাকে এক মুহূর্ত (moment), যা সেই সময়ের মধ্যে প্রকাশিত বিশেষ আচরণকে উপস্থাপিত করে। Taine-এর এই তিন উপাদান উনিশ শতকের শেষ পর্যন্ত সাহিত্য বিচার পদ্ধতিতে জনপ্রিয় ছিল। কিন্তু প্রথম বিশ্বযুদ্ধের পর Van Tieghem অনুধাবন করেন যে Taine-এর তিন উপাদান ফরাসি তুলনামূলক সাহিত্য বিচারকে সীমাবদ্ধ করে রেখেছে। কারণ Van Tieghem-এর মতে সাহিত্যিক প্রভাবের ধারণা এই তিন উপাদানের মধ্যে উপস্থিত থাকে না।

এই সময়ে Philaréte Chasles-এর মতো তাত্ত্বিকরা শিল্পের সঙ্গে দর্শন ও সমাজবিদ্যাকে মিশ্রিত করে তাঁদের তত্ত্বকে উত্থাপিত করেছিলেন। তাত্ত্বিক ব্যবস্থা হিসেবে Littérature comparée ফ্রান্সে নিজের স্থান করে নেয় উনিশ শতকের তৃতীয় ও চতুর্থ দশকে। ১৮৪১ সালে প্রকাশিত হয় Jean-Jacques Ampére-র *Histoire da la Littéature francaise an moyen age comparée aux littératures étrangires* এবং *Cours de litterature francaise* (১৮৪৬)-এ ফরাসি ভাষার সম্প্রসারণের কথা বিবৃত হয়েছে। ১৮১৩ সালে প্রকাশিত হয়েছিল Sismonde de Sismondi-র বই *La littérature du midi de L' Europe*। এই বইটিতে লেখক দেখাতে চেয়েছিলেন সাহিত্যের উপর মানুষের রাজনৈতিক ও ধর্মীয় ইতিহাসের প্রভাব এবং মানুষের চরিত্রের উপর আবার সাহিত্যের প্রভাব— অর্থাৎ লেখক এখানে সাহিত্য এবং মানব সমাজের উপর পারস্পরিক উভমুখী প্রভাবের কথা বলেছেন।

Wellek-এর মতে Littérature Comparé— এই শব্দটি প্রথম ব্যবহার করেছিলেন ১৮১৬ সালে Noil ও Laplace তাদের *Cours de littérature comparée* গ্রন্থে। এই গ্রন্থে সংকলিত হয়েছিল প্রাচীন ফরাসি এবং ইংরেজি সাহিত্য।

Ampére এবং Abel Francois Villemain -কে ফ্রান্সের তুলনামূলক সাহিত্যের স্থপতি হিসেবে গণ্য করা হয়। ১৮২৯ সালে Villemain 'Examination of the influence

exerted by French eighteenth century writers on foreign literatures and on the European mind' শীর্ষক একটি বক্তৃতা দেন Sorbonne-এ। ওই একই বিষয়ে ১৮৩২-এ Ampére বক্তৃতা দেন, যার নাম দেন 'Comparative history of literatures'।

ফ্রান্সে তুলনামূলক সাহিত্যের এইসব চর্চা সত্ত্বেও উনিশ শতকের দ্বিতীয়ার্ধেও তুলনামূলক সাহিত্য academic discipline হিসেবে ফ্রান্সে প্রতিষ্ঠা পায় নি। ১৮৯০-এ প্রকাশিত হয় Joseph Texte-এর *Jean Jacques Rousseau et les origins du cosmopolitisme littéraire*। ১৮৯৭-এ Lyon-এ তুলনামূলক সাহিত্যের একটি পদ সৃষ্টি করা হয় যার প্রথম পদাধিকারী হন Texte। প্রাথমিক পর্যায়ে রেঁনেসাসের সময় থেকে ফরাসি সাহিত্যের উপর জার্মান সাহিত্যের প্রভাব সম্পর্কে বক্তৃতা দেন Texte। Texte সম্পর্কে Weisstein মন্তব্য করেছেন, "Texte, for all his scientific precision did not wish to see Comparative Literature be regarded as a discipline comparable to the natural sciences."

Texte কোনোভাবেই সাহিত্যিক ইতিহাসকে (Literary history) পরীক্ষামূলক বিজ্ঞানের সঙ্গে যুক্ত করতে চাননি। তার মতে আর সব ইতিহাসের মতো, সাহিত্যের ইতিহাস প্রকৃত অর্থে বিজ্ঞান নয়। Texte দুটি শর্তের কথা বলেন, যে দুটি শর্তের উপস্থিতি সাহিত্যের ইতিহাসকে বৈজ্ঞানিক করে তুলবে। শর্ত দুটি হল : "(i) that of aspiring to an end higher than being the simple past time of the historian or his audience ; and (ii) that of exhausting all the means for obtaining knowledge of the kind of truth which constitutes its proper goal." তুলনামূলক সাহিত্য সম্পর্কে Texte-র সন্দেহপ্রবণতা সম্পর্কে বলা হয় যে, Texte মনে করেছিলেন 'জাতি এবং মানব প্রকৃতির মনস্তত্ত্ব-র ভিত্তিপ্রস্তর স্থাপন করা হল তুলনামূলক সাহিত্যের কাজ।' তাঁর অনেক উত্তরসূরীর মতে Texte ভুল ব্যাখ্যা করেছিলেন গ্যেটের-এর Weltliteratur ধারণার। তাঁর আশা ছিল, ভবিষ্যতে জাতীয় এবং দেশীয় সাহিত্যগুলি National literature (ইংরেজি, জার্মান, ফরাসি, ইটালীয় সাহিত্য) তাদের নিজস্ব বৈশিষ্ট্যের বদলে এক ধরনের সার্বজনীন আদর্শের প্রতিষ্ঠার মধ্যে দিয়ে, এক সরল ইউরোপীয় সাহিত্য জন্মলাভ করবে। এই একই মতের পূর্বাভাস পাওয়া যায় Fréderic Loliée-র *Histoire des littératures Comparees des Origines an XX Siécle* (1903)-এর শেষ অধ্যায়ে।

১৯০০ সালে প্রকাশিত হয় Louis-Paul Betz-এর *Bibliographic de littéature Comparée*-র প্রথম সংস্করণ। এই বইয়ের ভূমিকাতে Texte তুলনামূলক সাহিত্যের ক্ষেত্রকে কয়েকটি ভাগে বিভক্ত করেন : (১) তাত্ত্বিক প্রশ্ন এবং সাধারণ সমস্যা, (২) তুলনামূলক লোকসাহিত্য (folklore), (৩) আধুনিক সাহিত্যের তুলনামূলক পঠন, (৪) সর্বজনীন সাহিত্যিক ইতিহাস (Van Tieghem-এর *littérature geonérale*-র অনুরূপ এক ধারণা) । Betz-এর বইটি তুলনামূলক সাহিত্যের ইতিহাসে এক বিরাট ভূমিকা গ্রহণ করে এবং তার গ্রন্থটি Baldensperger-Friedrich-এর *Bibliography of Comparative Literature* বইটির ভিত্তি হিসেবে ধরা হয়। ১৯০০ সালেই প্যারিসে সাহিত্যের ঐতিহাসিকরা ষষ্ঠ আন্তর্জাতিক সম্মেলনে মিলিত হন। এই সম্মেলনের বিষয় ছিল 'সাহিত্যের তুলনামূলক ইতিহাস'। এই সম্মেলনে তুলনামূলক সাহিত্যের ইতিহাসের আন্তর্জাতিক সংঘ প্রতিষ্ঠা করার প্রস্তাব করা হয়। এই সম্মেলনের প্রারম্ভিক বক্তৃতাতে Gaston Paris তুলনামূলক সাহিত্যের দ্বিমুখী উদ্দেশ্যের কথা বলেন। তাঁর মতে লিখিত সাহিত্য ও লোকসাহিত্যের সমান্তরাল পঠন তুলনামূলক

সাহিত্যের লক্ষ্য হওয়া উচিত। তিনি মন্তব্য করেন— তুলনামূলক সাহিত্য হল "a new science which touches on folklore, mythology, and comparative mythology, and is strongly interested in the history of the human mind. It transcends the realm of literature proper."

এই সম্মেলনের অন্যতম প্রধান বক্তা Ferdinand Brunetiére-র মতে সাহিত্যকে বিশ্লেষণ করার মানদণ্ড হল সচেতন শৈল্পিক অভিপ্রায়। একই সঙ্গে তিনি ইউরোপীয় সাহিত্যকে, বিশ্ব সাহিত্যের একটি অঞ্চল বলে এবং এই অঞ্চলটিকে বিশ্বসাহিত্যের একটি ছোট ও অকিঞ্চিৎকর অঞ্চল বলে চিহ্নিত করেন। তবে Brunetiére-র মতে ব্যবহারিক কারণের জন্য সাহিত্যের সংজ্ঞাকে একটি ভৌগোলিক অঞ্চলের মধ্যে সীমাবদ্ধ রাখা উচিত, তাহলেই একটি সংস্কৃতির মধ্যেই ক্রিয়াশীল প্রকৃত প্রভাবগুলিকে ও উভমুখী ফলকে সঠিক অর্থে বোঝা সম্ভব। এই সীমারেখাকে অতিক্রম করলে সাহিত্যিক সন্ধান-প্রক্রিয়াটি সাময়িক এবং কিছুটা অপ্রয়োজনীয় বিষয়কে প্রাধান্য দিতে থাকে, ফলে সাহিত্যিক পঠন হয়ে ওঠে অবৈজ্ঞানিক। কিন্তু তুলনামূলক সাহিত্যের উন্নতি ও প্রতিষ্ঠাতে Brunetiére-র অবদান বহু প্রশ্নের সম্মুখীন হয় একটি কারণে। Taine-এর অনুগামী হিসেবে Brunetiére বিশ্বাস করতেন যে অভিব্যক্তির নীতির ক্রমপ্রকাশ ঘটে শিল্প ও সাহিত্যের ক্ষেত্রেও। Brunetiére তার 'ইউরোপীয় সাহিত্য' শীর্ষক প্রবন্ধটি শেষ করেন রেনেসাঁসের সময় থেকে ইটালি, স্পেন, ফ্রাস, ইংল্যান্ড, জার্মানির জাতীয় সাহিত্যের ক্রমপরম্পরার বিবরণ দিয়ে।

১৯১৮ সালে Lyon ও Paris-এর পর Strasbourg-এ তুলনামূলক সাহিত্যের তৃতীয় পদটি সৃষ্ট হয়। এর সঙ্গেই শেষ হয় ফ্রান্সে তুলনামূলক সাহিত্যের প্রথম পর্যায়ের। এর পরে ফ্রান্সে তুলনামূলক সাহিত্যের যে দ্বিতীয় পর্যায়ের সৃষ্টি হয় তার প্রধান স্থপতি ছিলেন Fernand Baldeusperger। তিনি ১৯১০ থেকে Sorbone-এ পড়াচ্ছিলেন। পরবর্তীকালে সেখানে Hazard ও Van Tieghem-এর সঙ্গে তিনি প্রতিষ্ঠা করেন Institute of Modern and Comparative Literatures, যা পরবর্তী কয়েক দশকে তুলনামূলক সাহিত্যের মক্কা বলে পরিচিত হতে থাকে। ১৯২৫ সালে Collége de France-এ তুলনামূলক সাহিত্যের পঠন-পাঠন শুরু হয়। এখানে Latin Philology-র পদটি রূপান্তরিত হয়ে সৃষ্টি হয় 'History of Mediterranean and Latin American Literature'-এর শীর্ষক পদ। এই পদটি গ্রহণ করেছিলেন Marcel Bataillon, যিনি Revue de littérature Comparée-র নির্দেশক ছিলেন। ১৯৩৫-এ Baldensperger আমেরিকাতে আমন্ত্রিত হন। তার স্থানে আসেন Jean-Marie Carré, আর Baldensperger হার্ভাড বিশ্ববিদ্যালয় ও ক্যালিফোর্নিয়ার বিশ্ববিদ্যালয়ে পড়াতে থাকেন। আর মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে Baldensperger-এর উপস্থিতি তুলনামূলক সাহিত্য পঠনকে এক অন্য মাত্রা দান করে।

তুলনামূলক সাহিত্য পঠন-পাঠন ফ্রান্সে যে কয়েকজন তাত্ত্বিকের মাধ্যমে এক ভিন্ন মাত্রা লাভ করে, তাঁরা হলেন Fernand Baldensperger, Paul Van Tieghem, Jean Marie Carré, Marius- Franiois Guyard Baldensperger প্রমুখ। Revue de littérature compareé (যা ১৯২১-এ প্রতিষ্ঠিত হয়)-র প্রথম সংখ্যাটির ('Comparative Literature : The Word and the Thing') ভূমিকাতে Baldensper ger Texte Paris ও Brunetiére-র মতামতকে খণ্ডন করেন। তিনি Brunetiére-এর অভিব্যক্তির তত্ত্বকে প্রত্যাখ্যান করেন, কারণ তাঁর মতে এই তত্ত্ব প্রায় পূর্বনির্ধারিত ভাবে যান্ত্রিকতার সঙ্গে কারণ

ও ফলাফলের মধ্যে থেকে উৎসারিত ঐতিহাসিক ঘটনা পরম্পরাকে এক পরম কারণবাদের দৃষ্টিভঙ্গীর মাধ্যমে উপস্থাপিত করে। Baldensperger একই সঙ্গে খণ্ডন করেন বিষয়গত পঠনকে। তাঁর মতে Taine-এর প্রভাব তুলনামূলক সাহিত্য পঠনের ক্ষেত্রে বিপজ্জনক। *Baldensperger, Revue de littérature comparée-র সম্পাদক হিসেবে আন্তর্জাতিক সংস্কৃতির ক্ষেত্রে mobility-র ধারণাকে গুরুত্ব দেন। তার মতানুযায়ী দ্বিতীয় সারির লেখক* ও তাদের সাহিত্য এবং Triviauiteratur-কে অন্য চোখে দেখতে হবে— "It would be important to recapture the dynamism which impelled not only the distinguished works which we have always held in regard, but also the great mass of creations which sustained them and which are now unknown. We must also recapture the favorable or unfavorable opinion of the public, now considered more or less trustworthy 'witnesses', who received them, and the social trends guided by similar attitudes."

Revue বিষয়সূচী ও তাত্ত্বিক দৃষ্টিভঙ্গির মধ্যে থেকে যে সাধারণ ধারণা পাওয়া যায় সেগুলি হল— Revue de littérature comparée প্রকৃতপক্ষে ফরাসি প্রকাশনা। যে সাহিত্যিক আন্তঃসম্পর্কে প্রেরক, গ্রাহকের ভূমিকায় ফ্রান্স অনুপস্থিত, যে তুলনামূলকবিদের বিষয় ফরাসি সাহিত্য-কেন্দ্রিক নয়— তাদের স্থান Revue-তে অপ্রতুল। প্রাচ্য ও পাশ্চাত্যের মধ্যে আন্তঃসম্পর্ক, আধুনিক সময়ের উপর প্রাচীন সাহিত্যের প্রভাব, মধ্যযুগীয় সাহিত্য বিষয় হিসেবে স্থান পায় কম। নবজাগরণ, ক্লাসিসিজম, রোমান্টিসিজমের আন্তঃইউরোপীয় ঐতিহ্য জায়গা করে নেয় Revue-তে। [Troisieme Table dela "Revue de litterature comparée, 1951—1960-এর উপর ভিত্তি করে Weisstain এই মন্তব্য করেছেন।]

এখন আমরা দেখবার চেষ্টা করব এই ফরাসি তাত্ত্বিকরা কীভাবে তুলনামূলক সাহিত্যকে সংজ্ঞায়িত করতে চেয়েছেন।

Marius-Francois Guyard-এর *La Littérature Comparée*-র সূচনাতে Jean-Marie Carré তুলনামূলক সাহিত্যকে, সাহিত্যিক ইতিহাসের শাখা বলে নির্ধারিত করেছেন "...it is the study of international spiritual relations, or rapports de fait— between Byron and Pushkin, Goethe and Carlyle, Walter Scott and Alfred de Vigney, and between the works, the inspirations and even the lives of writers belonging to different literatures.

এখানে Carré তুলনামূলক সাহিত্যকে কেবলমাত্র সাহিত্যিক ইতিহাসের শাখা হিসেবে দেখে rapports de fait-এর ধারণার প্রতি বেশি গুরুত্ব দিয়েছেন। লক্ষণীয় এবং পরিমেয় সম্পর্ক ও প্রভাবকে বাস্তব তথ্য হিসেবে তিনি স্বীকৃতি দিয়েছেন। কিন্তু Carré-র এই ধারণার সমালোচকরা তথ্য সংগ্রহের উপর তাঁর অতি নির্ভরশীলতাকে সাহিত্যিক সৃষ্টির নান্দনিকতার অপমান বলে মনে করেছেন। কিন্তু সাহিত্যিক প্রভাব ও তার পঠন Carré-র মতানুযায়ী বিপজ্জনক কারণ তা স্পর্শাতীত বিমূর্ত। বরং তার বদলে, Carré-র মতে সাহিত্যিক সৃষ্টির সাফল্য, লেখকের সৌভাগ্য প্রভৃতি পাঠ করা অনেক বেশি কাম্য— "the history of the success of works, of the fortunes of a writer, of the afterlife of a great figure, of the mutual interpretation of various peoples, of travels and of mirages : how we see each other, Englishmen and Frenchmen, Frenchmen and Germans."

আমরা এখানে দেখতে পাচ্ছি যে Carré-র সাহিত্য ইংরেজ, ফরাসি ও জার্মানবিশ্বেই সীমাবদ্ধ হয়ে আছে। কিন্তু সাহিত্যিক প্রভাবের বিপদ থেকে রক্ষা পাওয়ার জন্য Carré লেখক, তাঁর সৃষ্ট সাহিত্যকে 'সাফল্যের' মাপকাঠিতে মেপে ফেলছেন। তিনি সাহিত্যিক কর্মকে ধরতে চাইছেন তথ্যনিষ্ঠতার মধ্যে দিয়ে, যে তথ্য প্রতিষ্ঠিত হবে ডায়েরি, চিঠিপত্রের মাধ্যমে। কিন্তু একই সঙ্গে প্রশ্ন উঠবে কোনো সময়ের মধ্যে অসফল কোন লেখক কি এই সমালোচনা বৃত্তের মধ্যে স্থান পাবে না? আমরা মনে করতে পারি Carré-র পূর্বসুরী Baldensperger কিন্তু অখ্যাত, অনামা সাহিত্য, 'Trivial literature'-কে তাঁর ভাবনাবৃত্তের মধ্যে এনেছিলেন। সাহিত্যের ইতিহাসের সাহায্য নিয়েই বলা হয় Flaubert তাঁর সমসাময়িক রোমান্স লেখক Faydean-এর তুলনায় ছিলেন কম জনপ্রিয়। কিন্তু পরবর্তীকালে Flaubert-এর সাহিত্যিক কৃতি হয়ে ওঠে সাহিত্য সমালোচনার কেন্দ্রবিন্দু। Carre, Baldensperger দুজনের তাত্ত্বিক সিদ্ধান্তের পরিপ্রেক্ষিতে স্বভাবতই প্রশ্ন ওঠে এক কালের জনপ্রিয়তার নিরিখে একই সময়ে 'সফল' ও 'ব্যর্থ' লেখকদ্বয়কে আমরা দেখব কীভাবে? কোন্ লেখক ও তার সৃষ্টিকে আমরা 'তুচ্ছ' বলব অথবা 'সফল' বলব? আর একই সঙ্গে এ প্রশ্নও উঠে যাবে যে, এই আপাত 'সফলতা' ও 'ব্যর্থতা' অথবা 'কালোত্তীর্ণ সফলতা'র কারণ যতটা সামাজিক ও সাহিত্যিক, ততটাই তাত্ত্বিক নয় কি? Baldensperger লোকসাহিত্য ও তার সঙ্গে যুক্ত তথ্যকে তুলনামূলক সাহিত্য পঠন বৃত্তের থেকে দূরে রাখার কথা বলেন। কারণ তাঁর মতে folklore বা stoffgeschichte অনেক বেশি বিষয়কেন্দ্রিক। Van Tieghem-ও একই ধারণার বশবর্তী হয়ে তুলনামূলক সাহিত্য থেকে রূপকথা, মিথ, লেজেন্ড, মহাপুরুষের জীবন উপাখ্যানকে বাদ দেবার কথা বলেন। অজানা, অজ্ঞাতকুলশীল এই ঐতিহ্যগুলি সম্পর্কে Van Tieghem-এর বক্তব্য ছিল এগুলির চরিত্র নৈর্ব্যক্তিক, অন্যদিকে তুলনামূলক সাহিত্যপঠন, ব্যক্তি দ্বারা আরোপিত ক্রিয়া ও প্রভাবকে বিশ্লেষণ করে।

Van Tieghem-এর এই তত্ত্বের বিরোধিতা করে বলা সম্ভব যে লোকসাহিত্যকে, তুলনামূলক সাহিত্য পঠন পদ্ধতির মধ্যে থেকে বাদ দিলে, পৃথিবীর সাহিত্যের ইতিহাসের একটি বড় অংশকে এই পঠনের মধ্যে থেকে বাদ দিতে হয়। সেক্ষেত্রে তুলনামূলক সাহিত্যপাঠ খণ্ডিত থেকে যাবে। কারণ প্রাচ্য সাহিত্য ঐতিহ্যের মধ্যে লিখিত ও কথ্য সাহিত্যের পারস্পরিক সম্পর্ক একটি অনিবার্য সত্য। Weisstein অবশ্য Van Tiegham-এর এই ধারণা সম্পর্কে বলেছেন, "This attitude explains, at least in part, the ostracism of ancient and medieval literature which, though never theoretically grounded, has long been practised at the Sorbonne. For in the writings of those years the author (of, for instance, the Homeric epics or the Nibelungenlied) cannot always be properly identified." এই একই প্রসঙ্গে Wellek ও Warren মৌখিক ও লিখিত সাহিত্যের মধ্যে পারস্পরিক সম্পর্কের কথা স্মরণ করিয়ে দিয়ে বলেছেন যে, মৌখিক সাহিত্যও সাহিত্যিক বিদ্যাবত্তার একটি গুরুত্বপূর্ণ অঙ্গ।

পরবর্তীকালে অবশ্য স্বীকার করে নেওয়া হয়েছিল যে, প্রাচীন ও মধ্যযুগীয় সাহিত্য তুলনামূলক সাহিত্য পঠন পদ্ধতির মধ্যেই পরে।

Rapports de fait-এর ধারণার উপর নির্ভর করে তুলনামূলক সাহিত্যের যে সংজ্ঞা নির্ধারিত হয়, তার বিপরীতে থাকে তথ্যগত সূত্রের বিরুদ্ধতা করে, কেবল অনুরূপতার উপর ভিত্তি করে রচিত সংজ্ঞা। এই প্রসঙ্গে Henry H. H. Remark মন্তব্য করেন যে "The

French desire for literary sécurité is unfortunate at a time which cries....for more (not less) imagination." কিন্তু অন্য দিকে Baldensperger আবার একইসঙ্গে সংজ্ঞা নির্ধারণের জন্য এই দুই বিপরীতধর্মী মনোভাবের মধ্যে নিহিত বিপদ সম্পর্কে সজাগ থাকতে বলেন। কারণ তার মতে একইসঙ্গে স্মৃতি ও ধারণা থেকে স্মরণ করার প্রচেষ্টা এবং সাদৃশ্য (যা অলক্ষিতে মনের খেয়ালে রচিত কিছু অবিন্যস্ত বিষয় হতে পারে) সন্ধানের চেষ্টা— এই দুটি তুলনার ক্ষেত্রে কোনো ধরনের বিশ্লেষমূলকতা স্বচ্ছতা দান করে না।

অন্যদিকে Carré, তুলনামূলক সাহিত্য পঠনক্ষেত্র থেকে অনুরূপতার ধারণাকে বিতাড়িত করার পক্ষপাতী ছিলেন। আর Van Tiegham অনুরূপতার ধারণা থেকে সাধারণ প্রবণতা (Caurant commun)-র ধারণাতে পৌঁছোতে রাজি ছিলেন। অবশ্য এই সাধারণ প্রবণতা নির্দিষ্ট করার মধ্যে littérature générale ধারণার সাদৃশ্য খুঁজে পাওয়া যায়।

তুলনামূলক সাহিত্যের আলোচনার ক্ষেত্রে Etiemble-এর ধারণাকেও গুরুত্ব দেওয়া হয়। Etiemble. ছন্দ, আইকনলজি, আইকনগ্রাফি, স্টাইলিসটিকসের তুলনামূলক পঠনের কথা বলেছিলেন। কিন্তু Weisstein এই জাতীয় পঠনের মাধ্যমে দুটি সভ্যতার সমান্তরাল তুলনা করতে নারাজ। কারণ— তার মতে এই উপাদানগুলি যে-কোনো সভ্যতার সচেতন বা অসচেতন চিন্তা, ভাবনা, কল্পনার ধারক ও বাহক। কিন্তু এই পঠন পদ্ধতি দুটি ভিন্ন সভ্যতার সাহিত্যিক ধারার সাযুজ্য প্রতিষ্ঠার শ্রেয় মাধ্যম হতে পারে না।

আলোচনার এই মুহূর্তে আমরা দেখে নেব Rene Wellek ও Austin Warren কী বলছেন তুলনামূলক সাহিত্য প্রসঙ্গে। তাদের মতে ব্যবহারিক ভাবে তুলনামূলক সাহিত্য বিশেষ পঠনক্ষেত্র এবং বিভিন্ন সমস্যাকে বোঝার চেষ্টা করে। তাদের মতে তুলনামূলক সাহিত্যকে প্রথমে মৌখিক সাহিত্য পঠন ব্যবস্থা হিসেবে ধরা যেতে পারে। লৌকিক ঐতিহ্যের বিষয়, তার পরিযানতা, কখন, কীভাবে সাহিত্যিক ঐতিহ্যের 'উচ্চস্তরীয়', 'শৈল্পিক', 'লিখিত' সাহিত্যের চৌহদ্দীতে প্রবেশ করে, এই দুই সাহিত্যের পারস্পরিক আদানপ্রদান— তুলনামূলক সাহিত্য এই বিষয়গুলিকে পঠনসূচীর মধ্যে নিয়ে আসে। এই প্রসঙ্গে Wellek ও Warren-এর একটি মন্তব্য উল্লেখযোগ্য— "and there is a continuity between oral and written which has never been interrupted."

ফরাসি তুলনামূলক সাহিত্যবিদরা খ্যাতি, পরিব্যাপ্তি, প্রভাব, যশ প্রভৃতি প্রশ্নগুলির উত্তর খোঁজার প্রচেষ্টা করেন তুলনামূলক সাহিত্যে। তুলনামূলক পঠন পদ্ধতি তথ্য (আলোচনা, অনুবাদ, প্রভাব) সংগ্রহের উর্ধ্বে গিয়ে বিশেষ সময়ে বিশেষ লেখকের উপস্থিতি সাহিত্যিক প্রেরণা ও প্রতিগ্রহণের বিভিন্ন উপাদান ও তাদের উপস্থিতির কারণকে নিজের বিচার্য বিষয় করে তোলে। ফরাসি এই তুলনামূলক পঠন পদ্ধতিকে Wellek ও Warren তুলনার বহিঃউপাদান বলে অভিহিত করেছেন। তাদের মতে তুলনামূলক সাহিত্যকে সংজ্ঞায়িত করতে হলে Goethe-র 'Weltliteratur' ধারণার শরণাপন্ন হতে হবে। Goethe তাঁর এই ধারণার মধ্যে এমন এক সাহিত্যকে কল্পনা করেছিলেন যা প্রকৃত অর্থে ভৌগোলিক সীমারেখার উর্ধ্বে বিশ্বসাহিত্য হয়ে উঠবে। S. S. Prawar, তার *Comparative Literary Studies* গ্রন্থে Weltliteratur সম্পর্কে তিনটি ধারণার উল্লেখ করেছেন। প্রথম ধারণা অনুযায়ী বিভিন্ন জাতীয় সাহিত্যের (National Literature) বিভিন্ন পর্ব, ভাগ অথবা বিভিন্ন দেশের সাহিত্যিক আন্দোলন, যুগকে ধরে এক বিশ্ব (অথবা ইউরোপীয়) সাহিত্য ইতিহাস নির্মাণ করা। দ্বিতীয়ত, বিশ্বসাহিত্য বলতে বিখ্যাত ব্যক্তিত্বদের সাহিত্যসৃষ্টিকে একত্রিত করা, Homer, Virgil, Dante,

Cervantes, Shakespeare, Goethe প্রভৃতি সাহিত্যকারের সাহিত্যকে একই দলভুক্ত করা। তৃতীয়ত Goethe-র মতানুয়ায়ী নিজের দেশের সাহিত্যের বাইরে অন্য দেশের সাহিত্য সম্পর্কে সচেতন হওয়া। Goethe নিজের সৃষ্ট সাহিত্যের মধ্যে প্রাচ্য, বিশেষত পারস্য, ভারত প্রভৃতি দেশকে আনতে চেয়েছিলেন। West-ostlicher Divan, Chinesisch-deutsche Jahres-und Tages-Zeiten-Goethe এই লেখাগুলি প্রাচ্য ও পাশ্চাত্যের সাহিত্যিক প্রতিগ্রহণের দৃষ্টান্ত হিসেবে এসে যায়।

তুলনামূলক সাহিত্য সম্পর্কে আলোচনার ক্ষেত্রে জাতীয় সাহিত্য (national literature), সাধারণ সাহিত্য (general literature) এবং বিশ্বসাহিত্যের (world literature) ধারণাগুলিও এসে যায়।

জাতীয় সাহিত্যের প্রসঙ্গ, তুলনামূলক পঠন পদ্ধতির ক্ষেত্রে এসে যায় কারণ, এই প্রসঙ্গ প্রাথমিকভাবে তুলনামূলক আলোচনার একক হয়ে ওঠে। কিন্তু সাধারণভাবে জাতীয় সাহিত্য বলতে আমরা কোন বিশেষ ভৌগোলিক-রাজনৈতিক সীমারেখার কথা বলি। কিন্তু বিশ্ব ইতিহাসের বিভিন্ন অধ্যায় থেকে আমরা জানি যে বিভিন্ন রাজনৈতিক ঘটনা ও পরিস্থিতি দেশীয় ভৌগোলিক মানচিত্রকে বদলে দিতে পারে। উদাহরণ হিসেবে ভাবা যেতে পারে ১৯৪৫-এ জার্মানির বিভাজন এবং ১৯৪৭-এ ভারত বিভাজন প্রসঙ্গ। ১৯৪৫-এ জার্মানি বিভাজনের ফলে কি পূর্ব ও পশ্চিম জার্মানির সাহিত্যিক ঐতিহ্য বদলে যায়? আবার ১৯৪৭-এর বিভাজনের পর পূর্ব বাংলা, পূর্ব পাকিস্তানে পরিণত হয়। এই বিশেষ মুহূর্তে কি ভারতীয় 'পশ্চিমবঙ্গ' এবং পাকিস্তানী 'পূর্ববঙ্গের' সাহিত্যিক ঐতিহ্য বদলে যায় লহমায়? আর জাতীয় আত্মতার মধ্যে ভাষার প্রশ্ন আসে, তখন উঠে আসে আরও অসংখ্য প্রশ্ন। অবিভক্ত এবং বিভক্ত জার্মানির ভাষা জার্মান। তাহলে পূর্ববর্তী ও পরবর্তী সাহিত্যিক ঐতিহ্যকে আলাদা করা হবে কোন ভিত্তিতে? আবার জার্মান লেখক Heinrich Mann ফ্রান্স, চেকোস্লোভাকিয়ার নাগরিকত্ব গ্রহণ করে শেষ জীবন কাটান আমেরিকাতে। তার আত্মতা কীভাবে নির্মিত হবে? তার জার্মান, ফরাসি, চেক, আমেরিকীয় আত্মতার মধ্যে কোন্‌টি গৃহীত হবে। Rilke বা Fernando Pessoa-র মতো দ্বিভাষী সাহিত্যিক কি তুলনামূলক পঠন পদ্ধতির বিচার্য বিষয় হয়ে উঠতে পারেন না? এছাড়া প্রশ্ন ওঠে ফরাসি সাহিত্যের মধ্যে কি বেলজিয়াম, সুইজারল্যান্ড, কানাডা, আফ্রিকার ফরাসি সাহিত্য অধিগৃহীত হবে? আর পৃথিবীর যে-কোনো প্রান্তে ইংরেজি ভাষায় লেখা সাহিত্য কি ইংরেজি সাহিত্যের অংশ হয়ে উঠবে? সংস্কৃতি, সাহিত্যিক ঐতিহ্য অভিজ্ঞতাগত বৈচিত্র্য কি ভাষাগত সাদৃশ্যের চাপে হারিয়ে যাবে? আবার প্রমাণ করাও সম্ভব যে 'সর্বজনগ্রাহ্য' কোনো ভাষা আবার সময় বিশেষ পরিস্থিতি অনুযায়ী হয়ে ওঠে এক অন্য ভাষা। আফ্রিকার বিভিন্ন দেশের যে-সব সাহিত্যিকরা ইংরেজিকে নিজেদের অনুভূতি প্রকাশ করার মাধ্যম হিসেবে নিয়েছেন, তারা কি সেই একই ইংরেজি ভাষা ব্যবহার করেন?

আর একভাষিক পরিস্থিতি থেকে আমরা যখন বহুভাষিক পরিস্থিতির মুখোমুখি হই, তখন তুলনামূলক সাহিত্য পঠন পদ্ধতি হয়ে ওঠে অনিবার্য। সেই আলোচনা আমরা অবশ্য করব পরে। তার আগে আমরা দেখে নেব সাধারণ ও তুলনামূলক সাহিত্যের মধ্যে পারস্পরিক বোঝাপড়াটা কীভাবে হয়।

Van Tieghem তুলনামূলক সাহিত্য সম্পর্কে বলেছিলেন, এই পঠন পদ্ধতি হল "binary links between two elements, whether these elements be individual works and writers, or groups of works and men or entire literature." অন্যদিকে

সাধারণ সাহিত্য সম্পর্কে তিনি বলেছেন— "a discipline which bears on facts common to several literatures, considered as such, be it in their mutual interdependence or by analogy."

যখন আমরা ইউরোপে Petrach-এর সময় থেকে সনেটের অগ্রগতিকে বিশ্লেষণ করছি তখন আমরা সাধারণ সাহিত্যের কথা বলছি কিন্তু যখন আমরা Petrarch ও Shakespeare-এর সনেটের আলোচনা করছি তখন আমরা তুলনামূলক আলোচনা করছি। দুটি সাহিত্যক্ষেত্র যে পরস্পর নির্ভরশীল এবং দুটি ক্ষেত্রকে আলাদা করা যে অসম্ভব তখন তা প্রমাণিত হয়ে যায়।

এক্ষেত্রে অবশ্যম্ভাবী যে প্রশ্ন উঠবে সেটি হল, পূর্ববর্তী নাতিদীর্ঘ আলোচনাও তথ্যসমূহের মধ্যে দিয়ে আমরা কি তুলনামূলক সাহিত্য পঠন পদ্ধতিকে বুঝতে পারছি? কোনো সংজ্ঞার মাধ্যমে এই বিশেষ পদটিকে বোঝা সম্ভব?

এ প্রশ্নের উত্তরে বলা যেতে পারে পূর্ববর্তী তাত্ত্বিকদের ধারণা, সংজ্ঞা, বিতর্ক থেকে আমরা তাদের স্থানিক, কালিক অবস্থানগুলি বোঝার অন্তত প্রচেষ্টা করেছি। আর আলোচনার মাধ্যমে সাহিত্যকে বোঝার, জানার এক প্রয়াস হয়ে উঠেছে লক্ষণীয়। লিখিত ও মৌখিক সাহিত্যের পারস্পরিক সম্পর্ক, আদান-প্রদান, শৈলী, বর্গগত অবস্থান স্থান পেয়েছে তুলনামূলক পঠন পদ্ধতিতে। কেবলমাত্র বিষয়গত সাদৃশ্য নয় বর্গ, শৈলীগত তুলনা হয়ে উঠেছে এই পঠনের বিবেচ্য বিষয়। বিভিন্ন সাহিত্যব্যবস্থা (দেশীয়, জাতীয়, আন্তঃরাষ্ট্রীয়, সর্বজনীন) কেবলমাত্র সামাজিক, মনস্তাত্ত্বিক পরিকাঠামোর মধ্যে নয়, আদান-প্রদান ও প্রতি গ্রহণের জটিল কিন্তু সদা চলনশীল কার্য কারণের ব্যবস্থাপনার মধ্যে দিয়ে সংজ্ঞায়িত হয়ে উঠেছে। সাহিত্যের সারস্বত চিরন্তনতার বদলে এক বহুধাবিভক্ত আত্মতাকে বোঝার প্রচেষ্টা করেছে এই পঠন পদ্ধতি। সামগ্রিকভাবে তুলনামূলক পঠন পদ্ধতি সাহিত্যের পরিপ্রেক্ষিতে আমাদের কিছু প্রশ্ন তোলার অবকাশ করে দেয় আবার একই সঙ্গে এই পদ্ধতিই আমাদের সক্ষম করে তোলে সেই প্রশ্নগুলির উত্তর খোঁজার ক্ষেত্রে।

আমরা এর আগে মন্তব্য করেছিলাম যে বহুভাষিক পরিস্থিতিতে তুলনামূলক পঠন পদ্ধতি অনিবার্য। এখন আমরা বোঝবার চেষ্টা করব এই মন্তব্যের যথার্থতা। সুইজারল্যান্ডের মতো ভারতবর্ষও ভৌগোলিক ও রাজনৈতিকভাবে একটি সীমারেখার মধ্যে সীমাবদ্ধ হলেও তার মধ্যে উপস্থিত আছে অসংখ্য সাহিত্যিক ঐতিহ্য। কিন্তু এই বিভিন্ন সাহিত্যিক ঐতিহ্যগুলিকে কীভাবে আমরা একটি আত্মতা পরিচয়ের মাধ্যমে প্রকাশ করব? কোনো একটি ভাষার আধিপত্য প্রতিষ্ঠাকে বহুভাষিকতার কেন্দ্র-বিরোধী ধারার মধ্যে কীভাবেই বা সাজানো হবে?

এই প্রশ্নগুলির উত্তর খুঁজতে গিয়ে কি আমরা তাহলে বলব যে ভারতীয় সাহিত্য বিভিন্ন ভাষায় লেখা সাহিত্যের এক যোগফল। বাংলা সাহিত্যের ইতিহাস + অসমিয়া সাহিত্যের ইতিহাস + হিন্দি সাহিত্যের ইতিহাস + মরাঠি সাহিত্যের ইতিহাস + তামিল সাহিত্যের ইতিহাস +.....

— এই রকম একটি নিটোল গাণিতিক নিয়মেই কি ভারতীয় সাহিত্যের সংজ্ঞা, মাত্রা নির্ধারণ সম্ভব? আর এই প্রত্যেকটি ভাষা কি স্বতন্ত্র, নিরালম্বভাবে একে অপরের সঙ্গে সম্পর্কহীনতার এক দূরত্ব নিয়ে বাস করে?

এই প্রশ্নগুলির উত্তর খোঁজার জন্য আমরা কয়েকটি সাহিত্যিক তথ্য মনে করার চেষ্টা করব। কালিদাসের *অভিজ্ঞান শকুন্তলম্* নাটকে সংস্কৃত ছাড়াও ব্যবহৃত হয়েছিল শৌরসেনী, মহারাষ্ট্রী, মাগধী— প্রভৃতি প্রাকৃত ভাষা। কিন্তু ভাষার এই বৈচিত্র্য নাটকটির মধ্যে কোন

দুরূহতা সৃষ্টি করেনি। এই প্রসঙ্গে শিশির কুমার দাশ মন্তব্য করেছেন যে "One must not fail to see that such a literary text, as Sakuntala is, could be produced in a complex multilingual situation where different language did not divide people into exclusive groups but could encourage people to interact with one another and to transcend linguistic barrier." আবার মধ্যযুগে বিদ্যাপতি সংস্কৃত, অবহট্ট, মৈথিলি— তিনটি ভাষাতেই সমান দক্ষতার সঙ্গে সাহিত্য সৃষ্টি করেছেন। এর আগে বৌদ্ধ ও জৈন সাহিত্য পালি ও অর্ধ মাগধী ভাষায় লেখা হয়েছে। মধ্যযুগে সিদ্ধাচার্যরা অবভট্ট ও অন্যান্য প্রাকৃত ভাষায় দোহা প্রস্তুত করেছেন।

এই উদাহরণগুলি দিয়ে যে তথ্যে আমরা পৌঁছোতে চেষ্টা করছি, সেটি হল কেবলমাত্র ভাষাগত পরিচয় দিয়ে কোন সাহিত্যের আত্মতাকে প্রতিষ্ঠা করা অন্তত বহুভাষিক ক্ষেত্রে সম্ভব নয়। এই বক্তব্যটিকে আরও পরিষ্কার করার জন্য শিশিরকুমার দাশের আরেকটি মন্তব্যের সাহায্য নেব আমরা, "No literature is conceivable without this language— literature equation, and none has ever denied that. A closer scrutiny, however reveals that this relationship is only a necessary, and not sufficient condition for the identity of literature."

আমরা আগে যে উদাহরণগুলি দেখেছি, সেগুলি প্রাচীন বা মধ্যযুগীয় সাহিত্য থেকে নেওয়া উদাহরণ। কিন্তু আমরা যদি অষ্টাদশ শতকের শেষ বা উনিশ শতকের প্রথমে বঙ্গদেশে ভাষা পরিস্থিতি লক্ষ করি তাহলে দেখব সংস্কৃত ও বাংলা ছাড়াও তখন আরবিও প্রচলিত ছিল। এছাড়া পর্তুগিজ, ইংরেজি ফার্সি, হিন্দি ও উর্দু ভাষার প্রচলন ছিল। Halhed এই ভাষা পরিস্থিতি নিয়ে মন্তব্য করেছিলেন, "Exclusive of the Shanscrit, there are three different dialects applied in the kingdom of Bengal : the Persian, the Hindostanic and the proper Bengalese."

ভাষাতাত্ত্বিকতার তাত্ত্বিক আলোচনার মধ্যে না গিয়েও বলা যায় বাংলাভাষার সঙ্গে তৎকালীন প্রচলিত অন্যান্য ভাষাগুলির আদান-প্রদান খুব স্বাভাবিকভাবেই সম্ভব ছিল। ভারতীয় ভাষা বর্গের মধ্যে অন্য একটি ভাষা ডোগরির দিকে যদি চোখ ফেরানো যায়, তাহলে দেখা যাবে উনিশ শতকের প্রথমে ডোগরি সাহিত্যে তিনটি ভাষার প্রয়োগ ছিল— সংস্কৃত, ব্রজভাষা এবং ডোগরি। পূর্ববর্তী সময়েও এই বহুভাষিকতা ছিল এক বাস্তব ঘটনা। ডোগরি সাহিত্যের ইতিহাসের ওঠাপড়াকে লক্ষ করলে দেখা যাবে ১৯০০-১৯২৫ সময়কালকে ডোগরি সাহিত্যের ইতিহাস রচয়িতারা 'Period of Decline' বলে অভিহিত করেছেন। কারণ এই সময়কালে ডোগরি সাহিত্যে স্থান করে নেয় উর্দু ও পাঞ্জাবি ভাষা। এই দুই ভাষার আধিপত্যের কারণে ডোগরি ভাষা, ডোগরি সাহিত্যক্ষেত্রের মূল স্রোত থেকে দূরে সরে যেতে বাধ্য হয়।

এই ঘটনাসূত্র থেকে আমরা এই সিদ্ধান্তে উপনীত হতে পারি যে, প্রথমত 'ভাষা' কোন স্বতন্ত্র, স্বয়ম্ভু বা বিশুদ্ধ একক নয়। আর তাছাড়া কেবলমাত্র ভাষা পরিচয় দিয়ে কোন সাহিত্যক্ষেত্র বিশেষিত, সংজ্ঞায়িত হয়ে উঠতে পারে না। এই দ্বিতীয় সিদ্ধান্তটি ভারতীয় সাহিত্যক্ষেত্রে সবচেয়ে বেশি প্রযোজ্য।

কিন্তু ভারতীয় সাহিত্যক্ষেত্রে তুলনামূলক সাহিত্যপদ্ধতি কীভাবে প্রয়োজনীয় হয়ে ওঠে, এ প্রশ্নের উত্তর আমরা কীভাবে পাব? ড. অমিয় দেব তাঁর Literary History and Comparative Literature : A Methodological Question" শীর্ষক প্রবন্ধে মন্তব্য করেছেন, "There

are two ways Comparative Literature can perhaps be indispensable to Indian literary history : One, in the fixing of relations and analogies between the different Indian literatures and possibly thus in the compiling of a history of modern Indian literatures.... and two ....in the discerning of structure in the histories of the single Indian literatures..."

একক ভারতীয় সাহিত্যের কাঠামোর মধ্যে উপলব্ধি করার মতো কোন্ কোন্ বিষয় আছে, এবং কেনই বা দাবি করা হচ্ছে সেই বিষয়ের ক্ষেত্রে তুলনামূলক সাহিত্য পঠন পদ্ধতি অপরিহার্য?

কোনো সাহিত্যক্ষেত্রই সৃষ্টির আদিকাল থেকে তার স্বতন্ত্রতার বা বিশুদ্ধতার ছাপ নিয়ে উপস্থিত থাকতে পারে না। আর বহুভাষিক সাহিত্যক্ষেত্রের বিষয়ে এই দাবি আরও বেশি ভাবে অসম্ভব, সে তথ্য আমরা দেখেছি। এবার আমরা যদি বাংলা সাহিত্যের কিছু সাহিত্যিক দৃষ্টান্ত দেখি তাহলে দেখব যে বিদ্যাসাগর, হিন্দি *বেতাল পচ্চিশি* থেকে *বেতাল পঞ্চবিংশতি* রচনা করেছেন, তিনিই আবার কালিদাসের *অভিজ্ঞান শকুন্তলম* অবলম্বনে *শকুন্তলা*, ভবভূতির *উত্তরচরিত* নাটক এবং *রামায়ণ*-এর উত্তরকাণ্ডকে ধরে রচনা করেছেন *সীতার বনবাস*। একই সঙ্গে তিনি সৃষ্টি করেছেন *ভ্রান্তিবিলাস*, শেক্সপিয়ারের *কমেডি অফ এররস*-এর অনুসরণে। মধুসূদন Ovid-এর *epistle*-এর অনুসরণে রচনা করেছেন *বীরাঙ্গনা কাব্য*। কিন্তু তার বীরাঙ্গনারা উঠে এসেছেন ভারতীয় পৌরাণিক কাহিনীর পাতা থেকে। আবার রামায়ণ নতুনভাবে উপস্থাপিত হয়েছে *মেঘনাদবধ* কাব্যে। বঙ্কিমচন্দ্র রচনা করেছেন *কৃষ্ণচরিত্র*। জ্যোতিরিন্দ্রনাথ *মৃচ্ছকটিকম্* এবং *Le Bourgeois gentilhomme*-র অনুবাদ করেছেন। সুধীন্দ্রনাথ দত্তকে নান্দনিক দিক থেকে বলা হয় Mallarme-অনুসারী। বুদ্ধদেব বসু একই সঙ্গে গ্রহণ করেছেন ঋষ্যশৃঙ্গ ও ইলেকট্রার কাহিনীকে তার বিষয় হিসেবে। তাঁর দ্বারা অনূদিত হয়েছে *কালিদাসের মেঘদূত*, Baudelaire, Rilke, Holderlin-এর কবিতা। বিষ্ণু দে রচনা করেছেন *উর্বশী ও আর্তেমিস*।

একটি বিশেষ সাহিত্যক্ষেত্র থেকে নেওয়া এই উদাহরণগুলিকে কীভাবে আমরা দেখব? প্রত্যেক সাহিত্যকারের বিচ্ছিন্ন সাহিত্যসৃষ্টি হিসেবে? কীভাবে বর্গগত পঠন হবে সম্ভব? Shakespeare বা কালিদাসের নাটক কীভাবে হয়ে ওঠে বিদ্যাসাগরের গদ্য উপাখ্যান? প্রত্যেকটি পাঠকে কেবলমাত্র তার মূল পাঠের সঙ্গে এক সরল একরৈখিক সম্পর্কের মধ্যে দিয়ে দেখব কি? বাংলা সাহিত্যের ইতিহাসের ১৯ ও ২০ শতককে জানতে বা বুঝতে কি এই আপাত বিচ্ছিন্ন পাঠগুলি কোনভাবে আমাদের সাহায্য করে না।

এই প্রশ্নগুলির উত্তর খুঁজতে খুঁজতে আমরা দেখতে পাব যে এই আপাত 'স্বতন্ত্র' পাঠগুলির উৎস কখনও ভারতীয় আবার কখনও অভারতীয় বা বিদেশী। কাজেই কেবলমাত্র দেশী বা বিদেশী সাহিত্য পরম্পরাকে আমরা বাংলা সাহিত্যের চৌহদ্দিতে দেখতে চাইছি তা নয়। আমরা দেখতে পাচ্ছি সংস্কৃত-পালি-প্রাকৃত সাহিত্যধারা একদিকে এবং অন্যদিকে বিদেশী সাহিত্যধারা বাংলা সাহিত্যকে পরিপুষ্ট ও পরিবর্ধিত করছে। তুলনামূলক সাহিত্যপঠন পদ্ধতি একটি বিশেষ ভাষাসাহিত্যের মধ্যে এই বিভিন্ন ধারাকে করে তুলেছে নিয়মবদ্ধ। যে নিয়ম আমাদের বুঝতে সাহায্য করছে কেন বিশেষ এক সাহিত্যকার প্রাচীন বা নবীন, দেশী বা বিদেশী সাহিত্যিক ঐতিহ্য থেকে কোনো কাহিনীকে করে তুলেছেন তার সাহিত্যের বিষয়। প্রাচীন কাহিনীর অনুষঙ্গ উপস্থাপিত হচ্ছে নতুন মতাদর্শ, বর্গ, শৈলী, নান্দনিকতার মধ্যে দিয়ে। তুলনামূলক সাহিত্যপদ্ধতি বুঝতে সাহায্য করছে এই সম্পূর্ণ যাত্রাপথকে। অন্যদিকে ভারতীয়

ভাষা সাহিত্যগুলির মধ্যের অনুরূপতা এবং পারস্পরিক সম্পর্ককে বুঝতেও সাহায্য করে তুলনামূলক সাহিত্যপদ্ধতি।

শিশির দাশ তাঁর *History of Indian Literature*, volume VIII-এ উনিশ শতকের ভারতীয় সাহিত্যে কবিতা সম্পর্কে আলোচনার সূচনায় গুজরাটি কবি নর্মদাশঙ্কর ও বাঙালি কবি রঙ্গলাল বন্দ্যোপাধ্যায়ের কবিতা ভাবনা সম্পর্কে সম্বন্ধে আলোচনা করেছেন। শিশির দাশের মতে নর্মদাশঙ্কর তাঁর কাব্যতত্ত্বে অ্যারিস্টটলের ধারণার সঙ্গে ভারতীয় রসতত্ত্বকে মিলিত করেছেন এবং রসকে 'অন্দরনি মজা' বলে অভিহিত করেছেন। রঙ্গলালও তার কবিতার ভূমিকায় *সাহিত্যদর্পণ*-এর অনুসরণে কবিতাকে রসসিক্ত বা Kvymrasatmakam Vākyam বলে সংজ্ঞায়িত করেছেন। দুই কবিই তাদের নিজের ভাষায় এক 'নতুন কবিতা' সৃষ্টি করার আহ্বান জানিয়েছেন। এই সাহিত্যিক উল্লেখ থেকে আমরা বুঝতে পারি পাশ্চাত্য শিক্ষা ও সভ্যতার সংস্পর্শ ও অভিঘাতের ফলে দুটি ভাষাসাহিত্যও সাহিত্যকাররা তাদের সময়ে একভাবে সাহিত্যবোধ ও কল্পনাকে তত্ত্বায়িত করার প্রচেষ্টা করেছেন। কিন্তু তুলনামূলক সাহিত্য ছাড়া এই প্রচেষ্টার বৈশিষ্ট্য বা ব্যাপ্তিকে সম্ভবত অনুধাবন করা সম্ভব হত না।

আবার হিন্দি সাহিত্যের দিকে যদি আমরা চোখ রাখি তাহলে দেখব ১৮৫৭-এর সিপাই বিদ্রোহ, ১৮৭৫-এ আর্য সমাজ প্রতিষ্ঠা, হিন্দি রাজনৈতিক-সামাজিক ক্ষেত্রে এক পুনঃজাগরণের সূচনা করে। *হিন্দি উপন্যাস কা ইতিহাস* গ্রন্থে অধ্যাপক গোপাল রায় জানিয়েছেন যে ১৮৭০-এ পণ্ডিত গৌরীদত্ত প্রকাশ করেন *দেবরানী জেঠানী কী কহানী*, ঈশ্বরীপ্রসাদ-কল্যাণ রায়ের *বার্মাশিক্ষক* (১৮৭২), শ্রদ্ধারাম ফিল্লোরীর *ভাগ্যবতী* (১৮৭৭)। এই সাহিত্যকাররা তাদের সাহিত্যে 'নয়েপন' বা নতুন ধারণার আগমনের কথা স্বীকার করেন। কিন্তু নিজেদের রচনাকে তারা উপন্যাস বা নভেল বলে সংজ্ঞায়িত করেননি। ভারতেন্দু হরিশ্চন্দ্র ১৯৭৫ সালে 'উপন্যাস' শব্দের প্রয়োগ করেন। উপন্যাস বলতে তিনি বোঝাতে চান 'এক কহানী কুছ আপবীতী কুছ জগবীতী পাঠ'। হিন্দি সাহিত্যের ইতিহাস রচয়িতাদের মতে ভারতেন্দু বাংলা থেকে এই শব্দটি বাংলা থেকে গ্রহণ করেন। প্রোফেসর গোপাল রায় বলছেন যে ভারতেন্দু তাঁর অনুগামী লেখকদের উপন্যাস লেখা তথা বাংলা উপন্যাস অনুবাদ ও রূপান্তর করা বিষয়ে প্রেরণা দান করতেন। ১৮৭৩-এ গদাধর সিংহ বাংলা থেকে অনুবাদ করেন বাণভট্টের *কাদম্বরী*। ১৮৭৯-এ গদবির সিংহ, রমেশচন্দ্র দত্তের বাংলা উপন্যাস *বঙ্গবিজেতা*-র অনুবাদ করেন। ১৮৮০-কেশবরাম ভট্ট অনুবাদ করেন বঙ্কিমচন্দ্রের *যুগলাঙ্গুরীয়*। পাঠটির নাম হয় *এক জোড়া অঙ্গুটী*। ১৮৮৩-এ মল্লিকাদেবীর দ্বারা অনূদিত হয় বঙ্কিমচন্দ্রের *রাধারাণী*। রামশঙ্কর ব্যাস ১৮৮১-তে অনুবাদ করেন *মধুমতী*। বঙ্কিমচন্দ্রের *দুর্গেশনন্দিনী* অনুবাদ করে প্রকাশ করেন গদাধর সিংহ (১৮৮২ ও ১৮৮৪)। ভারতেন্দু নিজে অনুবাদ করেন *রাজসিংহ* (১৮৯৪)। এছাড়া বাণভট্টের *হর্ষচরিত*-এর অনুবাদ প্রকাশিত হয় ১৮৮৬-এ। ১৮৮৩-এ কার্তিকপ্রসাদ ক্ষত্রী ইংরেজি উপন্যাস অনুবাদ করে, প্রকাশ করেন *সতীত্বরক্ষিণী* নামে।

এই তথ্যগুলির মাধ্যমে আমরা প্রমাণ করতে চাই না কোনো একটি ভাষা সাহিত্যের আধিপত্য বা উৎকর্ষ। উল্লিখিত সাহিত্যিক তথ্যগুলি আমাদের সামনে তুলে আনে বিভিন্ন ভারতীয় সাহিত্যের মধ্যকার আন্তঃসম্পর্ককে। উনিশ শতকে বাংলা সাহিত্যের ধারার মধ্যে দেখতে পাওয়া যায় অনুবাদ সাহিত্যের এক ধারাকে। পূর্ববর্তী সংস্কৃত সাহিত্য বা মঙ্গলকাব্যধারা থেকে সরে এসে গদ্যসাহিত্য ধারাকে নির্মাণ করতে সাহায্য করে অনুবাদ, অনুসরণ বা অনুকৃতি ধরনের রচনাগুলি। আবার অন্যদিকে হিন্দি সাহিত্যক্ষেত্রে গদ্য ভাষা তৈরির এবং

'খাড়ি বোলি'কে সাহিত্যিক ভাষা মাধ্যম হিসেবে প্রতিষ্ঠিত করার মধ্যবর্তী সময়ে সাহায্য নেওয়া হয় বিভিন্ন ভারতীয় সাহিত্যক্ষেত্র থেকে, সেখানে বাংলা উপন্যাস, কাহিনীর ভূমিকা অপ্রয়োজনীয় একটি বিষয়। কিন্তু পরবর্তী সময়ে হিন্দি সাহিত্যক্ষেত্র নিজস্ব, সহজ গতির মধ্যে দিয়ে এগিয়ে চলে তার নতুন দিকে। কিন্তু থেকে যায় এই আদান-প্রদান ও আন্তঃসম্পর্কের তথ্যগুলি।

তুলনামূলক সাহিত্য পঠনপদ্ধতি তুলে আনে এই অনুরূপতা ও আন্তঃসম্পর্কগুলিকে। আর এই তথ্যগুলি দিয়ে রচিত হয় ভারতীয় সাহিত্যক্ষেত্রের বহুরূপতা ও বৈচিত্র্য। তুলনামূলক সাহিত্য আমাদের সচেতন করে তোলে এ বিষয়ে যে ভারতীয় ভাষাসাহিত্য সম্পর্কহীন বিচ্ছিন্নতার মধ্যে নয়, সম্পর্কের মিথোজীবীত্ব দিয়ে হয়ে ওঠে উদ্ভাসিত। কেবলমাত্র একক বিচ্ছিন্ন সাহিত্য ধারণা দিয়ে অনুরূপতা ও সম্পর্কের মাত্রার গুরুত্ব, অন্তত ভারতীয় সাহিত্য-ক্ষেত্রে বোঝার প্রচেষ্টা নিরর্থক। সেক্ষেত্রে তুলনামূলক সাহিত্য পঠন পদ্ধতি হয়ে ওঠে অনিবার্য, অবশ্যম্ভাবী এক প্রক্রিয়া।

নারীবাদী সাহিত্যতত্ত্ব
একটি নিবিড় পাঠ
মুন্সী মহম্মদ ইউনুস

আলোচনার গোড়াতেই একটি গল্প বলা যেতে পরে। প্রাচীন মিশরের এই গল্পকে পৃথিবীর প্রাচীনতম গল্প বলে অনুমান করা হয়। এই গল্পের কাহিনীটি ছিল এইরকম— "রাজা খুফুর বাবা ছিলেন নেবুকা। দলবল নিয়ে নেবুকা একদিন ত্রাহ্-র মন্দিরে গিয়ে উপনীত হন। সেখানে রাজ-লিপিকার ও জাদুকর-শ্রেষ্ঠ উবার্ডআনের তাঁর মন্দির দর্শনে সহায়তা করছিলেন। জাদুকর-পত্নী দূর থেকে রাজ-পারিষদ্‌দের লক্ষ করছিলেন ; প্রথম দর্শনেই একজন পারিষদের প্রতি তিনি আকৃষ্ট হয়ে পড়েন। পরে পরিচারিকার হাতে মনোহর পরিচ্ছদের পসরা পাঠিয়ে তিনি ঐ পারিষদ্‌কে বরণ-সংকেত জানালেন। ক্রমে হ্রদের ওপর নিভৃত জলগৃহে চল্‌তে লাগল দুজনের অবিরাম অভিসার মিলন। সারাদিন নবীন-প্রিয়ার সান্নিধ্য-চারণ করে রাজ-পারিষদ প্রতি সন্ধ্যায় তপ্ত দেহ শীতল করতেন হ্রদের জলে অবগাহন করে ; আবার চলত উভয়ের নৈশ সংগ্রাম। জলগৃহের রক্ষক একদিন এই খবর জানিয়ে দিলে তার প্রভু জাদুকরের কাছে। উবার্ডআনের তখন মোমের একটি ছোট কুমীর গড়ে তুলে দিলেন পরিচারকের হাতে, বললেন : 'আজ সন্ধ্যায় রাজ-পারিষদ যখন স্নান করতে নাম্‌বে, তখন হ্রদের জলে ছেড়ে দিয়ো এই মোমের কুমীরকে।'

পরিচারক যথাসময়ে প্রভুর আদেশ পালন করল, আর জলে পড়েই মোমের কুমীর জীবন্ত কুমীর হয়ে পারিষদ্‌কে নিয়ে জলের তলায় গেল ডুবে।

জাদুকর তারপরে আরও সাতদিন মন্দিরেই থেকে গেল রাজা নেবুকার সাহচর্যে। সাতদিন পরে রাজাকে সে ডেকে আনল হ্রদের তীরে। উবার্ডআনের আহ্বানে কুমীর এবার রাজ-পারিষদকে নিয়ে জলের তলা থেকে উঠে এল। জাদুকর তাকে স্পর্শ করতেই জীবন্ত কুমীর আবার মোমের ছোট কুমীরটি হয়ে গেল। এবার জাদুকর পারিষদের বিরুদ্ধে নালিশ জানালো রাজার কাছে,— পারিষদ্ তার স্ত্রীর সঙ্গে ব্যভিচার করেছে। সব শুনে রাজা কুমীরকে আদেশ করলেন—'তোমার জিনিস তুমি নিয়ে যাও।' অমনি মোমের কুমীর জীবন্ত কুমীর হয়ে পারিষদ্‌কে নিয়ে আবার জলের তলায় গেল ডুবে।

এবার রাজ-আদেশে ডাক পড়লো জাদুকর-পত্নীর। বিচার-শেষে প্রাসাদের উত্তর দিকে তাকে নিয়ে গিয়ে দগ্ধ করা হল।"[১]

—খাপ্‌রির এই কাহিনী ছোটগল্পের সংরূপ ও প্রাচীনতার দাবিতে গুরুত্বপূর্ণ হলেও আমাদের আলোচনায় এই কাহিনীর শেষ অংশটিই সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ। গল্পটিকে যদি আজকের দৃষ্টিতে দেখা যায় তবে নীতিকথা হিসেবে এর শিরোনাম 'বিশ্বাসঘাতক স্ত্রীর পরিণাম'— এমন কিছু একটা দেওয়া যেতে পারে, কারণ কাহিনীতে জাদুকরের স্ত্রী তার বিশ্বাসঘাতকতারই প্রতিফল পেয়েছে। কিন্তু যখন স্মরণ করা হয়, এই গল্পের রচনাকাল ৩০০০ বছরেরও আগের তখন কিন্তু গল্পের একই পাঠ আর থাকে না। কারণ সময়কালের হিসেবে তৎকালে আদিম মাতৃতান্ত্রিক সমাজ বিদ্যমান ছিল। কৃষির কলাকৌশল আয়ত্তে রাখার দরুণ সম্পত্তিতে অধিকার নারীরই ছিল। মাতৃতান্ত্রিক সমাজে মাতৃ-অধিকার অনুযায়ী মায়ের দিক থেকেই বংশপরম্পরা ধরা হতো, সন্তান মায়ের নামেই পরিচিত হত। ফলে সেই সমাজে নারী প্রকৃত অর্থেই স্বাধীনতা ভোগ করত, যে স্বাধীনতা সম্পদ থেকে যৌনতা সর্বত্রই ক্রিয়াশীল ছিল। কিন্তু সামন্ততান্ত্রিব সমাজের মূলকেন্দ্রে যেহেতু আছে 'পুরুষতন্ত্র' কাজেই তার পক্ষে কোনভাবেই নারীর অধিকারকে মেনে নেওয়া সম্ভব ছিল না। তাই ঐতিহাসিকভাবে সামন্ততান্ত্রিক সভ্যতার বিকাশের সঙ্গে সঙ্গেই নারীবাদী সভ্যতার অবনমন শুরু হয়। এ-কারণেই সামন্ততান্ত্রিক সভ্যতার বিকাশের সঙ্গে সঙ্গে নারীকে চলে যেতে হয় পর্দার অন্তরালে। "ক্ষমতা"র অধিকারী হওয়ার দরুণ পুরুষ নানা ভাবে নারীকে শৃঙ্খলিত করতে সচেষ্ট হয়। সক্ষমও হয়। আর এরই দরুন নারী সরাসরিভাবে পুরুষের সম্পদ বলে চিহ্নিত হয়। ফ্রেডরিক এঙ্গেলস যথার্থই বলেছেন—

> মাতৃ অধিকারের উচ্ছেদ হচ্ছে স্ত্রী-জাতির এক বিশ্ব ঐতিহাসিক পরাজয়। পুরুষ গৃহস্থালীর কর্তৃত্বও দখল করল, স্ত্রীলোক হল পদানত, শৃঙ্খলিত, পুরুষের লালসার দাসী, সন্তান সৃষ্টির যন্ত্র মাত্র।[২]

পূর্ব-আলোচিত খাপরির গল্পের মধ্যে আমরা এই বিষয়টিই দেখতে পাই, যেখানে মাতৃতান্ত্রিক যুগের স্মৃতিযুক্ত স্বাধীন নারী, সামন্ততান্ত্রিক সভ্যতায় পুরুষের সম্পত্তিতে পরিণত হল। যেখানে 'বিচার-ব্যবস্থা' নামক ক্ষমতা সেই পুরুষের হাতে। ফলে এক পুরুষের 'সম্পত্তি' হয়ে অন্য পুরুষে আসক্ত হওয়ার শাস্তি হিসেবে তাকে হত্যা করা হয়।

আজকের উত্তর-আধুনিক তত্ত্ব-বিশ্বে নারীবাদ এক অতি গুরুত্বপূর্ণ এলাকা। এই তত্ত্বের আলোচনা একমুখী বা কোনো এক বিশেষ স্থানে সীমাবদ্ধ নয়। বরং একদিকে যেমন তা মাতৃতান্ত্রিক সভ্যতার প্রাচীন ঐতিহ্যের খোঁজ করে, তেমনই তা হাল আমলের নারীকে ছুঁয়ে থাকা সমস্ত বিষয়ের প্রেক্ষিতে তার অবস্থানকেও (*Gynocritics—Elaine Showalter*) তুলে ধরার চেষ্টা করে। আর এই দুয়ের মধ্যে থাকা ছিন্ন সূত্রকেও খুঁজে বের করারও চেষ্টা করে। যদিও নারীর অবস্থান নিয়ে, তার অধিকার নিয়ে ভাবনাচিন্তার অবকাশ ফরাসি বিপ্লবই তৈরি করেছিল, কিন্তু আধুনিক বিশ্বে তত্ত্বগতভাবে নারীর অবস্থানকে প্রথম বৈপ্লবিকভাবে তুলে ধরেন Simone de Beauvoir তাঁর *The Second Sex* (1953) গ্রন্থে। এরপর Mary Ellmann তাঁর *Thinking about Women* (1968)-এ তাত্ত্বিকভাবে নারীবাদকে উপস্থাপন করেন। সত্তরের দশকে Kate Millett এবং Elaine Showalter নারীবাদী সাহিত্যতত্ত্বকে আরও বেশি তাত্ত্বিক পরিকাঠামোর মধ্যে নিয়ে আসেন যথাক্রমে *Sexual Politics* (1970) এবং *A Literature of Their Own : British Women Novelists from Bronte to*

Lessing (1977) বই দুইটির মধ্যে দিয়ে। পরবর্তীকালে এই ধারার-ই বিশেষ সংযোজনগুলির মধ্যে উল্লেখযোগ্য হল Virginia Woolf-এর *A Room of One's Own* (1981), Monique Wittig-এর *One is Not Born A Woman* (1981), Gayatri Chakravorty Spivak-এর *In other Worlds Essayss in Cultural Politics* (1987) প্রভৃতি গ্রন্থ। আজ একথা নির্দ্বিধায় বলা যেতে পারে উত্তর-আধুনিক তত্ত্ব-বিশ্বে নারীবাদ এক বলিষ্ঠ তথা প্রামাণ্য তত্ত্বরূপ। যেখানে কেবল তিন দশকের মধ্যেই বহুবিদ্ তাত্ত্বিক তাঁদের বিভিন্ন ধারার আলোচনায় নারীবাদকে বহুলাংশে সমৃদ্ধ করেছে। তাই আজ নারীবাদ Post Colonialism, Reader Response, Psychology, Cultural Study প্রভৃতি তত্ত্বে সর্বত্রই নিজের অবস্থান তথা পরিচয়কে গড়ে নিতে পেরেছে।

আলোচনার এই পর্যায়ে পৌঁছে একটি প্রশ্ন আবশ্যিকভাবে উঠে আসে, আর তা হল নারীবাদ বলতে আমরা কি বুঝব? Toril Moi নারী ও নারীবাদী সাহিত্যতত্ত্ব নিয়ে আলোচনা প্রসঙ্গে বলেছেন—

> If feminist criticism is characterised by its political commitment to the struggle against all forms of patriarchy and sexism, it follows that the very fact of being female does not necessarily guarantee a feminist approach. As a political discourse feminist criticism takes its *raison d'etre* from outside criticism itself. It is a truism but it will needs to be said that not all books written by women on women writers exemplify anti-patriarchal commitment.[৩]

Toril Moi তাঁর বক্তব্যে দুটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ে আমাদের দৃষ্টি আকর্ষণ করেছেন। (১) নারী মাত্রই নারীবাদী দৃষ্টিভঙ্গিকে অনুসরণ করবেন, এরকম কোন সহজ সূত্র নেই ; এবং (২) নারীর লেখা মাত্রই যে সংগঠিত পুরুষবাদ এবং ক্ষমতাবান যৌন 'চিহ্নে'র বিরুদ্ধতা করবে এমন কোন নিয়ম নেই।

অন্যদিকে Jasbir Jain নারীবাদ ও তার এলাকা নিয়ে আলোচনা প্রসঙ্গে সরাসরি জানিয়েছেন—

> Feminization here implies a new awareness of power relationships, a surfacing of the hitherto marginalised voices and a widening of the historical imagination.[৪]

আর Ruth Robbins-এর মতে—

> Finally, feminism is always an idealist position, but it remains always in touch with knowledge that real (by definition) is not ideal, that it should change and, indeed, that it could change, if we could think through a way to enacting the necessary revolutions.[৫]

Jasbir-এর বক্তব্য অনুসরণ করলে বলা যেতে পারে তিনি নারীবাদ ও তার এলাকার আলোচনায় অত্যন্ত সংক্ষিপ্ত অথচ মূল বিষয়টিকেই তুলে ধরেছেন। তিনি তাঁর বক্তব্যে যে তিনটি বিষয়ের উপর দৃষ্টি আকর্ষণ করেছেন তা হল, 'ক্ষমতার সম্পর্ক', 'প্রান্তিকতা', এবং 'ইতিহাসের কল্পনা'। আদতে উত্তর-আধুনিক তত্ত্ববিশ্ব কখনো একক সম্পূর্ণতায় বিশ্বাস করে না। এখানে সত্য সব সময় খণ্ডিত, সচল এবং পরিবর্তিত। কাজেই এই তত্ত্ববিশ্বে কোন

কিছুকে বুঝতে গেলে একটি পরিপ্রেক্ষিত অত্যন্ত জরুরি। Jasbir যখন তাঁর আলোচনায় 'ক্ষমতার সম্পর্কে'র কথা বলেন তখন বোঝা যায়, এই সম্পর্ক নারী ও পুরুষের মধ্যে। ঐতিহাসিক ভাবে সামন্ততান্ত্রিক সমাজে প্রাতিষ্ঠানিক পুরুষতন্ত্র সবসময় ক্ষমতার রাশ নিজের হাতেই রাখে। নিজের শাসনের সুবিধার জন্যই সে নারীকে অন্তঃপুরবাসিনী করে রাখে এবং একের পর এক সামন্ততান্ত্রিক মূল্যবোধের পাঠ দিয়ে নারীকে স্থানু করে। অন্যদিকে ধনতন্ত্র তার উপরিকাঠামোয় নারীকে মুক্ত বলে ঘোষণা করলেও ভেতর থেকে তাকে কখনোই স্বাধীন করে না। নারীর কাঙ্খিত অবস্থানকে কখনোই তার সামনে হাজির করে না। একটি ধনতান্ত্রিক সমাজে নারীর অবস্থাকে অনেকটা শ্রমিকের অবস্থানের সঙ্গে তুলনা করা যেতে পারে। বস্তুত একটি ধনতান্ত্রিক আর্থিক পরিকাঠামোয় যে বিষয়টি সর্বদা ক্রিয়াশীল থাকে তা হল 'মুনাফার' উদ্দেশ্যে নিয়োজিত বাণিজ্যিক পুঁজি। পুঁজিবাদ তার মুনাফাকে সুনিশ্চিত করতে কৃষি শ্রমিককে শিল্প শ্রমিকে পরিণত করে, ঠিক একইভাবে নারীকেও সেই বাজার অর্থনীতির কারণেই নিয়ে আসে পাদপ্রদীপের তলায়। বিষয়টিকে প্রাঞ্জলভাবে বোঝার জন্য আমরা visual media-র বিজ্ঞাপনকে উদাহরণ হিসেবে নিতে পারি। একটু লক্ষ করলেই দেখা যাবে আজকের ভারতীয় মিডিয়ায় দেখানো বিজ্ঞাপনের শতকরা পঞ্চাশ শতাংশেরও বেশি নারীদের নিয়ে। কোনো বিজ্ঞাপন বলছে, কোন্ সাবান ব্যবহার করলে গোলাপের পাপড়ির মতো ফরসা হওয়া যাবে, আবার কোন্ ক্রিম এক সপ্তাহের মধ্যে দুধে-আলতায় রঙে রাঙিয়ে দেবে, আবার কোন্ গাড়ি চড়লে সবচেয়ে কাঙ্ক্ষিত মহিলা পাশের সিটে বসবে আর কোন্ সেভিং ক্রিমে নারীর হাতের পেলব পরশ পাওয়া যাবে। উদাহরণ বাড়িয়ে লাভ নেই বরং একটু সচেতনভাবে লক্ষ করলেই বোঝা যাবে এই সমস্ত বিজ্ঞাপনই আদি ও অকৃত্রিম পুরুষের চোখেই নির্মিত যেখানে নারী তার প্রাপ্ত ছদ্মস্বাধীনতায় নিজেকে পুঁজির মধ্যে ন্যস্ত করে আর এই পুরো প্রক্রিয়ায় সমস্ত মুনাফাটাই গিয়ে ওঠে পুঁজিবাদের হাতে। এখানেই খুঁজে নিতে অসুবিধা হয় না 'ক্ষমতার সম্পর্ক' তথা রাজনীতিকে। যেখানে নারীকে ব্যবহারের প্রকৌশলে সামন্ততন্ত্র থেকে ধনতন্ত্র 'প্রান্তিক' করে তোলে, করে তোলে 'ওরা'। যেখান থেকে ইতিহাসের অক্ষরেখায় নিজের ইপ্সিত অবস্থানের কল্পনা ছাড়া আর কিছুই নারীর করার থাকে না। Ruth Robbins যথার্থই বলেছেন যে নারীবাদ আদর্শায়িত হলেও তার সমস্যাগুলি বাস্তব। আর নারীবাদ সচেতনভাবে নারীকে কেন্দ্র করে থাকা এমন সমস্যাকেই নিয়ে আসে বিতর্কের আসরে যেখান থেকে নতুন নির্মাণের পথরেখা প্রস্তুত করা যায়। নারীবাদী তত্ত্বের আলোচনার উপর কথিত বিষয় কেন্দ্রীয় সত্য হলেও আরও বেশ কিছু সূক্ষ্ম বিষয় এর মূল এলাকার মধ্যে বর্তমান থাকে। Rajeswari' Sunder Rajan এবং Yon-me Park যে দিকে আমাদের দৃষ্টি আকর্ষণ করেছেন—

> ...and at the intersections of colonialism and neocolonialism with gender, nation, class, race, and sexualities in the different contexts of women's lives, their subjectivities, work, sexuality, and rights.[৬]

অর্থাৎ, Elaine Showalter 'Feminism'-এর আলোচনায় যে '*Gynocritics*'-এর কথা বলেছেন, আলোচ্য প্রাবন্ধিকদ্বয় প্রকারান্তরে সেদিকেই আমাদের দৃষ্টি আকর্ষণ করেছেন। তাঁরা উত্তর-ঔপনিবেশিক যুগের নারীবাদের এলাকায় লিঙ্গ, জাতি, শ্রেণী, দেশ এবং যৌন সম্পর্কের আলোচনার উপর জোর দিয়েছেন। বলাবাহুল্য, আজকের নারীবাদী তত্ত্বের আলোচনায়

এই প্রতিটি উপাদানই পৃথক ও বিস্তারিতভাবে আলোচনার দাবি রাখে। পরে সে আলোচনায় আসা যাবে।

অবশ্য এখানে একটি বিষয় সবসময় মনে রাখতে হবে, যদিও নারী ও নারীবাদ কখনোই এক বিষয় নয়, কিন্তু নারীবাদের মধ্যে সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ই কিন্তু নারী। নারীর অবস্থানের ব্যাখ্যা ও বিশ্লেষণেই অন্যান্য প্রতিটি বিষয় আসবে বা আসতে পারে। Ruth Robbins ঠিক এই বিষয়টিই লক্ষ করে লিখেছেন—

> What all feminist theories share is a focus on women. That bold statement conceals a multitude of possibilities because the collective noun 'women' disguises, as I suggest above, the many differences between individual women, the differences in individual women within the space of a single life, and the differences between women from different groups. Eve has many faces. The focus on women, however, constitutes feminism's main impetus.[৭]

নারীবাদের আলোচনার ভরকেন্দ্রে থাকা এই নারীকেই ছুঁয়ে আছে এর সঙ্গে সম্পর্কযুক্ত অন্যান্য উপাদানগুলি। নারীবাদী তত্ত্ব দাবি করে নারীবাদ আদতে অর্থনীতি ও মনস্তাত্ত্বিক পরিকাঠামোর উপর দাঁড়িয়ে আছে। নারীবাদী তাত্ত্বিকরা লক্ষ করেছেন, নারীকে সর্বদা এক ধরনের সামাজিক বৈষম্যের শিকার হতে হয়। বলা বাহুল্য, এই বৈষম্য প্রধানত অর্থনৈতিক। কারণ পূর্বের আলোচনায় আমরা দেখেছি, মাতৃতান্ত্রিক সভ্যতা থেকে পুরুষবাদী সমাজ পরিকাঠামোয় পরিবর্তনের সময়ে নারী একদিকে যেমন ক্ষমতার সম্পর্কে তথা রাজনীতিতে 'শোষিতে'র ভূমিকা নিতে বাধ্য হয়েছে তেমনই সামাজিকভাবে প্রান্তবাসী হয়ে 'ওরা'য় পরিণত হয়েছে। নারীবাদী তাত্ত্বিক দৃষ্টিকোণ থেকে আমরা ইতিপূর্বে তা দেখাবার চেষ্টা করেছি এবং পরবর্তীতেও দেখাবার চেষ্টা করব। কিন্তু এক্ষেত্রে সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ যে-কারণটি চিহ্নিত করা যায় তা হল অর্থনীতি। কারণ একথা ভুলে গেলে চলবে না, প্রাচীন মাতৃতান্ত্রিক সভ্যতায় সম্পদের উপর নারীরই অধিকার ছিল। আর সামন্ততান্ত্রিক সমাজে সংগঠিত পুরুষতন্ত্র সেই অধিকার নারীর হাত থেকে কেড়ে নিয়ে নারীকেই পুরুষের সম্পত্তিতে পরিণত করেছে। সত্তরের দশক থেকে উত্তর-আধুনিক তত্ত্ববিশ্বে নারীবাদী তত্ত্বের প্রাসঙ্গিকতা ও আলোচনায় যে জোয়ার এসেছে, সেখানে অর্থনীতি ও শিক্ষাকে বিশেষ গুরুত্ব দেওয়া হয়। এ প্রসঙ্গে Ipshita Chanda লিখেছেন—

> It does not mean that a woman has either access to or means of controlling the property that is supposed to belong to her marital or natal family. She may belong to a propertied household, but unless the property is registered in her name it offers her no security or any benefits apart from what the male member of the family may choose to give her.

ঈপ্সিতা চন্দের বক্তব্যের পারপ্রেক্ষিতে বলা যায় যে, সংগঠিত পুরুষতন্ত্র নারীকে সেই অধিকার দিতে কখনোই রাজি হবে না বা কোনো ক্ষেত্রে কোনো একক ব্যক্তি তা দিতে চাইলেও, পরবর্তী কালে পরিবর্তিত পরিস্থিতিতে নারী পুরুষের সম্পর্কের বিন্যাসটি তখন কী দাঁড়াবে? এ-বিষয়টি বুঝতে আমরা বঙ্কিমচন্দ্রের দ্বারস্থ হতে পারি। *কৃষ্ণকান্তের উইল* উপন্যাসে কৃষ্ণকান্ত রায় তাঁর সম্পত্তি শেষবারের মতো উইল করে সমস্তটাই ভ্রমরকে দিয়ে গেলেন,

গোবিন্দলালকে কিছুই দিলেন না। কৃষ্ণকান্তের মৃত্যুর পর এই উইল বিষয়ে গোবিন্দলাল ও ভ্রমরের কথপোকথন নারী পুরুষের সম্পর্কটি বোঝার পক্ষে বেশ গুরুত্বপূর্ণ—

ভ্র। বিষয় আমার জ্যেষ্ঠ শ্বশুরের নহে, আমার শ্বশুরের। তুমিই তাঁহার উত্তরাধিকারী, আমি নহি। জ্যেঠার উইল করিবার কোন শক্তিই ছিল না। উইল অসিদ্ধ। আমার পিতা শ্রাদ্ধের সময়ে নিমন্ত্রণে আসিয়া এই কথা বুঝাইয়া দিয়া গিয়াছেন। বিষয় তোমার, আমার নহে।

গো। আমার জ্যেষ্ঠতাত মিথ্যাবাদী ছিলেন না। বিষয় তোমার আমার নহে। তিনি যখন তোমাকে লিখিয়া দিয়া গিয়াছেন, তখন বিষয় তোমার আমার নহে।

ভ্র। যদি সেই সন্দেহই থাকে, আমি না হয় তোমাকে লিখিয়া দিতেছি।

গো। তোমার দান গ্রহণ করিয়া জীবনধারণ করিতে হইবে?[৯]

এত কিছুর পরেও ভ্রমর যখন গোবিন্দলালকে সমস্ত সম্পত্তি দানপত্র লিখে দেয় তখন গোবিন্দলালের প্রতিক্রিয়া বিশেষভাবে লক্ষণীয়—

—তোমার যোগ্য কাজ তুমি করিয়াছ। কিন্তু তোমার আমার কি সম্বন্ধ? আমি তোমায় অলঙ্কার দিব, তুমি পরিবে। তুমি বিষয় দান করিবে, আমি ভোগ করিব—এ সম্বন্ধ নহে।[১০]

গোবিন্দলালের এই বক্তব্য কেবল উপন্যাসের একটি চরিত্রের বক্তব্যই নয়, বরং তৎকালীন সামন্ততান্ত্রিক সমাজের প্রাতিষ্ঠানিক পুরুষতন্ত্রের একান্ত আত্মউপলব্ধির কথা। যে-পুরুষতন্ত্র কোনভাবেই অর্থনীতিতে নারীর অধিকারকে মেনে নিতে পারে না। কেননা যে মুহূর্তে নারী অর্থনৈতিকভাবে স্বাধীন হয়ে উঠবে সেই মুহূর্তে পুরুষতন্ত্র শাসনবলয়ের বাইরে চলে যাবে। প্রাতিষ্ঠানিক পুরুষতন্ত্র এটা মেনে নিতে পারে না। তার অভিজ্ঞতায়, সে স্ত্রীকে, দু-চারটি অলঙ্কার উপহার দেবে, কিছু মিষ্টি কথা বলবে আর তাতেই তার স্ত্রী (নারী) অত্যন্ত খুশি হয়ে স্বামীর জন্য ব্রত-উপবাস করবে, সর্বদা স্বামীর চিন্তায় মগ্ন থাকবে·এমনকি তারই চোখের সামনে স্বামী পরনারী আসক্ত হবে—আর স্ত্রী এই সব কিছু মেনে নেবে। কিন্তু মুশকিল হল, যে-মুহূর্তে নারী অর্থনৈতিক ভাবে স্বাবলম্বী হয়ে উঠবে, শিক্ষিত হয়ে উঠবে তখন সে যে কেবল পুরুষতন্ত্রের এই নির্লজ্জ দ্বিচারিতাকে প্রত্যাখ্যান করবে তাই নয়, বরং পুরুষতন্ত্রের প্রাতিষ্ঠানিক ভিতটাই ধ্বসে পড়বে। কাজেই নারীর এই আর্থিক স্বাধীনতার সামান্য আভাসকেও পুরুষ মেনে নিতে পারে না। আর এ-বিষয়ে জমিদার গোবিন্দলালের সঙ্গে দিনমজুর দুখিরামের ('শাস্তি'—রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর) কোন প্রভেদ নেই। এজন্যই দুখিরাম ভাত চাইলে তার স্ত্রী রাধা যখন বলে—

ভাত কোথায় যে ভাত দিব। তুই কি চাল দিয়া গিয়াছিলি। আমি কি নিজে রোজগার করিয়া আনিব?[১১]

তখন দুখিরাম তার স্ত্রীর মাথায় দা'য়ের কোপ বসিয়ে দেয়। মারা যায় রাধা। যদিও রাধার বক্তব্যের ইঙ্গিত যুক্তিযুক্ত ছিল না। অবশ্য দুখিরামকে যে কাজের স্থানে লাঞ্ছিত হতে হয়েছিল তাও রাধার অগোচর ছিল। সেটা জানা থাকলে রাধা নিশ্চয় স্বামীকে ভর্ৎসনা করত না। তবুও এখানে লক্ষণীয় বিষয় হল রাধা দুখিরামের অর্থনৈতিক অক্ষমতাকে দেখিয়ে নিজের অর্থনৈতিক জীবন সূচনার ইঙ্গিতকে দুখিরাম মেনে নিতে পারেনি। এই ধারাতেই পড়া যেতে পারে, নরেন্দ্রনাথ মিত্রের 'সেতার' গল্পটি। নিম্ন মধ্যবিত্ত পরিবারের সুবিমল যক্ষ্মারোগে আক্রান্ত হয়ে হাসপাতালে ভর্তি হয়। অন্য কোনো উপায় না থাকায় তার স্ত্রী নীলিমা শেষ পর্যন্ত গান শেখানোর টিউশন শুরু করে। ধীরে ধীরে শুরু হয় গান শেখানোর সঙ্গে সঙ্গে নিজের সেতার

শেখা ও শেখানো। সে আবিষ্কার করে তার মধ্যে থাকা অপার শিল্পীসত্তাকে। যদিও তার এই সমস্ত প্রচেষ্টার মূলে ছিল স্বামীর চিকিৎসা, তাকে সুস্থ করে তোলা, হাসপাতাল থেকে ফিরে এলে তাকে নিয়ে চেঞ্জে যাওয়া— ইত্যাদি। শেষ পর্যন্ত একদিন সত্যিই সুবিমল সুস্থ হয়ে বাড়ি ফিরল। সেদিন নীলিমার বন্যা দুর্গতদের সাহায্যের জন্য বড় অনুষ্ঠানে বাজাতে যাওয়ার কথা ছিল। কিন্তু সুবিমল তাকে আর যেতে দিল না। বলল—

> তুমি বাজাও নীলিমা, আমি আজই একটু শুনব। তোমাকে সুর বেচে কেবল তুচ্ছ টাকাই এতদিন দিয়েছ, আজ এত অল্পতে ভোলাতে পারবে না। আজ তোমার সেই আসল সুর আমাকে শোনাতেই হবে।[১২]

ভাবতে অবাক লাগে যে স্ত্রী স্বামীকে মৃত্যুর মুখ থেকে ফিরিয়ে আনার জন্য উদয়াস্ত পরিশ্রম করে উপার্জন করে সেই স্বামীই সুস্থ হয়ে বাড়ি ফেরা মাত্র স্ত্রীকে বন্ধ করে দেয় ঘরের চার দেওয়ালের মধ্যে। আসলে সঙ্গীতচর্চার মাধ্যমে নীলিমা কেবল অর্থনৈতিক স্বাধীনতাই পায় নি, একই সঙ্গে সে অর্জন করেছিল নারীর নিজস্ব space, কিন্তু প্রাতিষ্ঠানিক পুরুষতন্ত্রের পক্ষে তাকে মেনে নেওয়া একেবারে অসম্ভব। আর তাই সুবিমল ততদিন পর্যন্ত স্ত্রী-র অর্থনৈতিক জীবন মেনে নিয়েছে যতদিন সে অক্ষম ছিল। যে মুহূর্তেই স্ত্রীর উপার্জিত টাকায় সে সুস্থ হয়ে উঠেছে সেই মুহূর্তেই সে তার স্ত্রীর সমস্ত ব্যক্তিগত দরজাকেই বন্ধ করে দিয়েছে।

কিন্তু স্বামীর যদি সে ক্ষমতাটুকুও না থাকে তাহলেও কি প্রাতিষ্ঠানিক পুরুষতন্ত্র নারীকে তার ঈপ্সিত space-টুকু ছেড়ে দিতে রাজি হয়? সন্তোষকুমার ঘোষের 'কোনও অসতীর কথা' গল্পে দেখতে পাই, স্ত্রী সকাল থেকে রাত্রি পর্যন্ত পরিশ্রম করে অর্থ উপার্জনের জন্য। কেননা স্বামীর চিকিৎসার জন্য তা প্রয়োজন। কিন্তু স্ত্রী-ই যদি কোন একদিন ভুলে যায় স্বামীর জন্য ওষুধ আনতে, তবে তাকে শুনতে হয়—

> .... না। আজই অবশ্য চাই না। আমি একবারেই মরব না। যদি তাই ভেবে থাকো, তবে চালে ভুল করেছ।' বলে হাত ঘড়িটা নামিয়ে রাখল। তুলে নিল মালাটা। দেখলুম, ফুলগুলো ছিঁড়ছে; একটি একটি করে ফুল ছিঁড়ে প্রতিটি পাপড়ি খসিয়ে বুড়ো আঙুল আর তর্জনী নিয়ে চটকে ফেলে দিচ্ছে।[১৩]

সচেতন পাঠকমাত্রেরই ফুল চটকে ফেলে দেওয়ার 'প্রতীক' বুঝতে অসুবিধা হবে না। যদি স্বামীর সে ক্ষমতা থাকতো তবে 'অপরাধে'র শাস্তি হিসেবে তাকেও ঠিক ঐ ভাবে ছিঁড়ে ফেলতো, তা সে স্ত্রী যতোই স্বামীর জন্য উপার্জন করতে যাক না কেন!

উদাহরণের সংখ্যা আর বাড়ানোর প্রয়োজন নেই। এক্ষেত্রে আমাদের নিকট যা স্পষ্ট হয় তা হল, নারীর উপর পুরুষের আধিপত্য স্থাপনের প্রক্রিয়া সর্বদা ক্রিয়াশীল। নারীবাদ এই বিষয়টিই চোখে আঙুল দিয়ে দেখিয়ে দেয়। কেবল এটুকুই নয়, একই সঙ্গে তাত্ত্বিকভাবে সমস্যার মূলে গিয়ে তার সমাধানেরও চেষ্টা করে। ঠিকই বলেছেন Ruth Robbins—

> ....feminist theorists identify patriarchy at work in the home, the state, the church or other religious systems, the law, education, the workplace, in culture at large, and even in women themselves since women often internalize the values they are fed by powerful external institutions.[১৪]

—আর এই উপলব্ধিতে পৌঁছেই আমাদের সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ যে প্রশ্নের মুখোমুখি দাঁড়াতে হয় তা হল কেন, নারীকে সামন্ততন্ত্রের সূচনা থেকে আজ পর্যন্ত প্রাতিষ্ঠানিক পুরুষতন্ত্রের সার্বিক

শোষণের মুখে পড়তে হয়? যদিও উত্তর প্রসঙ্গে নারীর শ্রেণী, জাতি, অর্থনৈতিক অবস্থান, মনস্তত্ত্ব প্রভৃতি কারণ উপস্থাপিতত্র হয়েছে। এগুলি সবই সত্যি, কিন্তু মূল সত্যি আরও গভীরে। আর এখানেই অত্যন্ত প্রাসঙ্গিক হয়ে পড়ে নারী লিঙ্গ পাঠ ও তার রাজনীতিকে (Women Gender Studies and Politics) বোঝার বিষয়টি। তার আগে আমাদের বুঝে নিতে হবে 'নারী' কি? যেমনটা বলেছেন Gayatri Chakravorty Spivak—

> I construct my definition as a woman not in terms of a woman's putative essence but in terms of words currently in use. "Man" is such a word in common usage. Not a word, but the word. I therefore fix my glance upon this word even as I question the enterprise of redefining the premises of any theory.[১৫]

Gayatri Spivak-এর বক্তব্যের মূলে রয়েছে সেই পূর্বোক্ত পরিপ্রেক্ষিতের (perspective) প্রসঙ্গটি। এখানে নারীবাদী তত্ত্বের আলোকে বিষয়টি উপলব্ধি করতে গিয়ে আমরা বলতে পারি—নারী ≠ পুরুষ, অর্থাৎ নারী = যা পুরুষ নয়। কূটাভাষ দীর্ঘসূত্র না করে আমরা সহজভাবে বলতে পারি, নারীর পরিচয় দুভাবে নির্ণীত হয়। একটি দৈহিক (biological body) এবং অপরটি লিঙ্গগত (Gender)। এখানে দৈহিক পার্থক্যের বিষয়টা বোঝা গেল। কেননা নারী ও পুরুষের দেহের বাহ্যিক ও অন্তরগত কিছু পার্থক্য আছে। কিন্তু কেবল এই দৈহিক পার্থক্যটুকুর জন্যই প্রাতিষ্ঠানিক পুরুষতন্ত্র নারীকে দীর্ঘস্থায়ী 'শাসনে'র মধ্য দিয়ে 'ওরা'-য় পরিণত করে রেখেছে, তা তো মেনে নেওয়া যায় না। কাজেই এক্ষেত্রে মূল সমস্যার বিষয়টিই হল লিঙ্গ। এখন এ-বিষয়ে আলোচনার আগে আমরা দুটি উদাহরণ তুলতে চাই—

> ১. সূর্যমুখী আমার—সব। সম্বন্ধে স্ত্রী, সৌহার্দ্দে ভ্রাতা, যত্নে ভগিনী, আপ্যায়িত করিতে কুটুম্বিনী, স্নেহে মাতা, ভক্তিতে কন্যা, প্রমোদে বন্ধু, পরামর্শে শিক্ষক, পরিচর্য্যায় দাসী।.... আমার প্রমোদে হর্ষ, বিষাদে শান্তি, চিন্তায় বুদ্ধি, কার্য্যে উৎসাহ! আর এমন সংসারে কি আছে? আমার দর্শনে আলোক, শ্রবণে সঙ্গীত, নিশ্বাসে বায়ু, স্পর্শে জগৎ।[১৬]
>
> ২. আশা! মহেন্দ্রের মনে হইল নামটি বড় করুণ এবং কণ্ঠটি বড় কোমল। অনাথা আশা।[১৭]

দুটি উদাহরণের প্রথমটি বঙ্কিমচন্দ্রের *বিষবৃক্ষ* এবং দ্বিতীয়টি রবীন্দ্রনাথের *চোখের বালি* উপন্যাস থেকে নেওয়া। *বিষবৃক্ষ*-এ সূর্যমুখী কুন্দনন্দিনীর সঙ্গে স্বামী নগেন্দ্রের বিবাহ দিয়ে যখন নিরুদ্দেশ হয়েছে তখন নগেন্দ্র এইসব কথা ভেবেছে। লক্ষণীয় বিষয় যদিও নগেন্দ্র বেশ কিছু ভাল ভাল কথা সূর্যমুখী সম্পর্কে ভেবেছে, কিন্তু এখানে লক্ষণীয় 'আমার' শব্দটি এবং পাশাপাশি গুণবাচক শব্দগুলি—সৌহার্দ্য, যত্ন, আপ্যায়ন, স্নেহ, ভক্তি, প্রমোদ, পরামর্শ, পরিচর্যা—অর্থাৎ সূর্যমুখী এইসব গুণমণ্ডিত হয়ে 'আমার' অর্থাৎ নগেন্দ্রের ইচ্ছেপূরণ করে এবং বর্তমানে সে নেই—তাই তো নগেন্দ্রের বিলাপ।

পাশাপাশি *চোখের বালি* উপন্যাসে মহেন্দ্র নিজের হঠকারিতায় আশার সঙ্গে বিহারীর সঙ্গে বিবাহ স্থির করতে গিয়ে যখন সে দেখল তার নাম 'করুণ', কণ্ঠ 'কোমল' তদুপরি 'অনাথা', তখন মহেন্দ্র আশার উপর দয়াপরবশত হয়ে তাকে বিয়ে করে—যা একভাবে অন্যের নির্বাচিত হবু স্ত্রীকে ছিনিয়ে নেওয়া। এর মধ্যে দয়া-দাক্ষিণ্যের ভড়ংটুকু তুলে নিলে যা পড়ে থাকে তা হল, এমন অনাথাকেই তো প্রাতিষ্ঠানিক পুরুষতন্ত্রের 'শাসন' করা সবচেয়ে সুবিধা। আর উপন্যাসে মহেন্দ্র তো তাই-ই করেছে।

কিন্তু যদি এর অন্যথা হয়, যদি নারীর মধ্যে পুরুষের কাঙ্ক্ষিত ম্যুদের আবশ্যিক ভাবে তার সংস্কৃতির তাহলে—

> হীরা ক্রোধে অন্ধকার দেখিতে লাগিল। যখন তাহার মস্তক স্থির হইল, তখন সে দে... বৃতে সম্মুখে দাঁড়াইয়া, ভ্রূকুটি কুটিল করিয়া, চক্ষু আরক্ত করিয়া, যেন শতমুখে দেবেন্দ্রকে তিরস্কার করিল। মুখরা, পাপিষ্ঠা, স্ত্রীলোকই যেরূপ তিরস্কার করিতে জানে, সেইরূপে তিরস্কার করিল। তাহাতে দেবেন্দ্রের ধৈর্য্যচ্যুতি হইল। তিনি হীরাকে পদাঘাত করিয়া প্রমোদোদ্যান হইতে বিদায় করিলেন।[১৮]

—ঠিকই, কোন নারী যদি কুটিল ভ্রূকুটি, আরক্ত চোখে পুরুষকে তিরস্কার করে, তবে প্রতিফলে তাকে তো লাথি খেতেই হবে! আর নারীর এই উপরোক্ত বৈশিষ্ট্য তথা তার প্রতি পুরুষের প্রতিক্রিয়ার মধ্যেই লুকিয়ে আছে লিঙ্গ রাজনীতি বা Gender Politics-এর বিষয়টি।

এখানে যে বিষয়টি স্পষ্ট করে বলা জরুরি তা হল একটি মেয়ে জন্মগতভাবে একটা নারীদেহ নিয়েই জন্মায়। সেটা তার দৈহিক পরিচয়। কিন্তু তার যে লিঙ্গগত পরিচয় তা সমাজ ধীরে ধীরে তার প্রয়োজন অনুযায়ী নারীর উপর চাপিয়ে দেয়। সমাজের এই সাম্রাজ্যবাদ তার উপনিবেশ নারীর চেতনার রাজ্যে বিস্তার করে। বলাই বাহুল্য, এই সমাজ পুরুষতান্ত্রিক সমাজ। কাজেই এই সমাজের তৈরি dicta-কে যদি কোন নারী মান্যতা দেয় তবে সে ভাল, আর যদি সেই মেয়ে তা না দেয়, তবে সে মন্দ। আর এই ভাল মেয়ে—মন্দ মেয়ের অভিধানের মধ্যে থেকে একটি নারী বাধ্য হয় পুরুষের কাছে লিঙ্গগতভাবে পরাস্ত হতে, তাকে মান্যতা দিতে। নারীবাদের তাত্ত্বিক পরিকাঠামোয় Gender Studies কেবল 'শব্দ'কেই চিহ্নিত করে না। বরং তাকে ছাপিয়ে তার অর্থ ও তার প্রভাবকেও আলোচনা করে। বিভিন্ন সময় নারীবাদী তাত্ত্বিকরা লিঙ্গগত পরিচয়বাহী শব্দের তালিকা প্রস্তুত করেছেন। আর তারই এক সংক্ষিপ্তরূপ এক্ষেত্রে হাজির করা যেতে পারে—

পুরুষ শব্দাবলী	নারী শব্দাবলী
জ্ঞান	অবজ্ঞা
উচ্চ	নীচ
ভাল, ইতিবাচক	নেতিবাচক, খারাপ
চিন্তা, মাথা	দেহ, রক্ত
যুক্তি	আবেগ, অনুভূতি
ঠাণ্ডা	গরম
প্রতিরোধ	স্বতঃস্ফূর্ত
বস্তুগত	চিত্রকল্প
আলো	অন্ধকার
কঠিন	পেলব
সক্রিয়	নিষ্ক্রিয়
সূর্য	চাঁদ
সংস্কৃতি	প্রকৃতি
বাবা	মা
গভীরতা, বন্ধন	উপরতল, সীমানা
গোষ্ঠী, ইকোলজি	ইকো পদ্ধতি
দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ	নক্ষত্রযুক্ত।[১৯]

—এটুকু উদাহরণ থেকেই ভালোভাবে বোঝাই যায়, কীভাবে লিঙ্গরূপে শব্দের চিহ্নিতকরণ তথা নির্মাণ ঘটে যায়। তবে এখানে পার্থক্য এটুকুই, পুরুষ তার লিঙ্গগত শব্দরূপকে নিজে পছন্দ করে, আর নারী তার লিঙ্গগত শব্দ পরিচয়কে গ্রহণ করতে বাধ্য হয়। তা সেই পরিচয়ের মধ্যে যতই সমাজ আরোপিত গৌরবের বিষয় থাকুক না কেন! আমাদের বাংলাভাষাতেই মেয়েদের সম্পর্কে একটি গুণবাচক বিশেষণ প্রায়শই শুনতে পাওয়া যায়—"লক্ষ্মী মেয়ে"। আপাত নিরীহ এই 'লক্ষ্মী' শব্দটি কোনভাবেই নারায়ণের স্ত্রীকে বোঝায় না, যা বোঝায় তা হল, এই মেয়ে শান্ত, ধীর, স্থির এবং অবশ্যই বাধ্য। পুরুষতান্ত্রিক সমাজ নারীর এই বাধ্যতাকেই তো উপভোগ করে।

নারীবাদী তত্ত্ব ও লিঙ্গ পাঠ (Gender Studies) তাত্ত্বিকভাবে নারীর এই অবস্থান সম্পর্কে তাকে সচেতন করে তোলে। পুরুষবাদের তৈরি করা, সামন্ততান্ত্রিক মূল্যবোধের জাল ছিন্নভিন্ন করে প্রকৃত সত্যকে সূর্যের আলোয় নিয়ে আসে। এখানে আর একটি বিষয় মাথায় রাখতে হবে, নারীবাদ যদিও এই বৈপ্লবিক কাজটি করে, কিন্তু এক্ষেত্রে নারী মাত্রই কিন্তু নারীবাদী নয়। এমন কি কোন নারী যখন সাহিত্যের নির্মাণ করেন তখন তা কিন্তু নির্বিচারে নারীবাদী সাহিত্য হয় না। কারণ তার মধ্যেও পুরুষের কণ্ঠস্বর অনেকক্ষেত্রে শোনা যায়, অবশ্যই সমাজ লিঙ্গগত ক্ষেত্রে। উদাহরণ হিসেবে উনিশ শতকের শেষ পর্বে কামিনী রায়ের লেখা 'আলো ও ছায়া' কাব্যগ্রন্থের দুটি কবিতার কিছু অংশ তুলে ধরা যেতে পারে—

"প্রণয়?"
"ছি!"
"ভালবাসা—প্রেম?"
"তাও নয়।"
"সে কি তবে?"
"দিও নাম, দিই পরিচয়—" [সে কি][২০]

এবং

কেন যন্ত্রণার কথা, কেন নিরাশার ব্যথা
জড়িত রহিল ভবে ভালবাসা সাথে?
কেন এত হাহাকার, এত ঝরে অশ্রু ধারা
কেন কন্টকের কূপ প্রণয়ের পথে?

[প্রণয়ের ব্যথা][২১]

উপরের দুটি কবিতার রচয়িতা একজন নারী হলেও লিঙ্গগত ভাবে পুরুষের পক্ষে সুবিধাজনক তথা উপভোগ্য উচ্চারণকেই কবি হাজির করেছেন। অর্থাৎ একভাবে নিজের অজান্তেই কবি পুরুষের কাঙ্ক্ষিত কণ্ঠস্বরকে রূপ দিয়েছেন। কাজেই এই 'লেখ' নারীর হলেও একে কোনভাবেই নারীবাদী সাহিত্য বলা যাবে না। ঠিকই বলেছেন Toril Moi—

> Thus a woman who refuses to conform can be labelled both unfeminine and unnatural. It is in the patriarchal interest that there two terms (Feminity and Femaleness) stay thoroughly confused. Patriarchy, in other words, wants us to believe that there is such a thing as an essence of femaleness, called femminity, Feminists, on the contrary, have to disentangle this confusion, and must therefore always insists that though women undoubtedly are female, this is no way guarantees that they will be feminine.[২২]

নারীর লিঙ্গগত নির্মাণ ও রাজনীতি বিষয়ে আলোচনার পর আমাদের আবশ্যিক ভাবে আর দুটি বিষয়ের দিকে দৃষ্টি দিতে হবে। আর তা হল নারীর ভাষা ও তার সংস্কৃতির ইতিহাস।

আমরা যদি নারীবাদী দৃষ্টিকোণ থেকে 'নারীর ভাষা'র বিষয়টি নিয়ে আলোচনা করতে যাই, তাহলে দেখতে পাব সামন্ততান্ত্রিক পুরুষতান্ত্রিক সমাজ প্রচলিত ভাষার মূল কেন্দ্রে কখনোই 'নারীর ভাষা'কে স্থান দিতে চায়নি। এখানেই আর একটি প্রশ্ন উঠে আসতে পারে, 'নারীর ভাষা' বিষয়টি আদতে কি? আদৌ কি নারীর জন্য আলাদা করে একটি ভাষার প্রয়োজন? যখন সমাজে ভাষার একটি স্বীকৃতি ও ব্যবহারিক রূপ বজায় আছে। তখন আলাদা করে নারী-ভাষা নির্মাণের কথা বলা কি বাস্তবেই যুক্তিযুক্ত? আমরা যদি বাংলাভাষা ও সাহিত্যেরই উদাহরণ নিই তবে বলতে পারি, চর্যা থেকে *শ্রীকৃষ্ণকীর্তন*, এবং তা থেকে *অন্নদামঙ্গল*—প্রাক-উপনিবেশের মূলধারার সাহিত্যের ভাষার নির্মাণ পুরোপুরি পুরুষের। ব্যতিক্রমী প্রচেষ্টা যে সে সময় ছিল না, তা নয়। কিন্তু তা কখনোই মূল ধারার সাহিত্যের ভাষায় কর্তৃত্ব করতে পারেনি। অন্যদিকে উনিশ শতকের তথাকথিত নবজাগরণের কাল থেকে হাল আমলেও অবস্থার বিশেষ পরিবর্তন ঘটেনি। এর মধ্যে যখনই নারী লিখতে চেয়েছে তখনই তাকে পুরুষের তৈরি ভাষায় লিঙ্গ পরিচয়ের মধ্যে নিজেকে ন্যস্ত করেই তাকে লিখতে হয়েছে। এই বিষয়টিই আমরা কামিনী রায়ের কবিতার মধ্যে দেখেছি। ফলে তা সাহিত্য হয়েছে, কিন্তু কোন ভাবেই নারীবাদী সাহিত্য-নির্মাণ তাতে সম্ভব নয়। এবিষয়ে ফরাসি নারীবাদী তাত্ত্বিক Carolyn Burke বলেছেন—

> The central issue in much recent women's writing in France is to find and use an appropriate female language. Language is the place to begin... In this view, the very forms of the dominant mode of discourse show the mask of the dominant masculine ideology. Hence, when a woman writer or speaks herself into existence, she is forced to speak in something like a foreign tongue, a language with which she may be uncomfortable.[২৩]

অবশ্য আধুনিক বাংলা সাহিত্যে নারীর নিজস্ব ভাষা নির্মাণের এক প্রচেষ্টা সম্প্রতি দেখা যায়। যার সূচনা আশাপূর্ণা দেবীর হাতে, সবচেয়ে বলিষ্ঠ মহাশ্বেতা দেবী এবং এই ধারাবাহিকতায় মল্লিকা সেনগুপ্ত, তিলোত্তমা মজুমদার বা মন্দাক্রান্তা সেনের লেখায় কিছু ঝলক দেখা যায়, কিন্তু তা যথেষ্ট নয়। অথচ আজকের বাংলা সাহিত্যে পুরুষের নির্মিত গদ্যের কেন্দ্রীয় বচনের পাশাপাশি তো একটি নারীর ভাষার বলিষ্ঠ ঐতিহ্য থাকতে পারত। যার সচেতন অস্তিত্ব আমরা দেখতে পাই, নরম সুরে পরিবেশিত হলেও ব্রতকথার মধ্যে।—

তুষ তুষুলি তুমি কে
ধনে ধানে বাড়ন্ত
তোষলো লো তুষ কুণ্ডি

গোহাল—আলো গরু পাব,
সভা—আলো জামাই পাব,
হাঁড়ি মাপা সিঁদুর পাব,
মরব গিয়ে সাগরে।

তোমার কাছে মাগি এই বর
স্বামী পুত্র নিয়ে যেন সুখে করি ঘর।।[২৪]

বা,

....শাউড়ীর জ্বালায় গেলাম ঘরে নন্দাই ঠোক্‌না মারে,
নসের জ্বালায় গেলাম কান্‌ছি, মশা ভিন্‌-ভিন্‌ করে,
মশার জ্বালায় গেলাম গোহাল, গরুতে চাট মারে,
গরুর জ্বালায় গেলাম জলে, কুমীরে দাঁত ঝাড়ে ;[২৫]

পরবর্তীকালে বাউল, সহজিয়া বৈষ্ণবদের পদে কিংবা বটতলার সাহিত্যের আনাচে কানাচে ভাষায় নারীর কণ্ঠস্বর শ্রুত হয়নি বরং তা 'পুঁথিসাহিত্যে'র ভাষা বা উপভাষার মতোই মূলভাষা ক্ষমতার এলাকার বাইরে প্রত্যাখ্যাত হয়েছে কখনো 'গুরুত্বহীনতা'র অভিযোগে, কখনো 'অশিক্ষা'র নামে আর কখনো কেবল মেয়েদের সাহিত্য বলে। আর এই 'ভাষা'র মূল কেন্দ্রে স্বকীয় স্বাধীন স্থান না পাওয়ার জন্যই নারীর নিজ সংস্কৃতির ইতিহাস সেভাবে গড়ে ওঠেনি। তাত্ত্বিক Gerde Lernes এই বিষয়টিই দেখাতে চেয়েছেন—

> Women have been left out of history not because of the evil conspiracies of men in general or male historians in particular, but because we have considered history only in male-centered terms. We have missed women and their activities, because we have asked questions of history which are in appropriate to women. To rectify this, and to light up areas of historical darkness we must, for a time, focus on a woman centered inquiry, considering the possibility of the existence of a female culture within the general culture shared by men and women.[২৬]

—নারী পুরুষ নির্বিশেষে এই সচেতন জিজ্ঞাসা—অনুসন্ধানটা আজকে বড় জরুরি। নারী সংস্কৃতি যে অদৃশ্য তথা গৌণ সংস্কৃতি নয়, বরং মূল এলাকার পাশাপাশি তা সমান শক্তিশালী ও সমান্তরাল এক সংস্কৃতি—এই সত্যকে আজ তুলে আনতে হবে।

কিন্তু কি করে সম্ভব হবে তা? বাইরে থেকে নয় বরং নারীকে ভেতর থেকেই নির্মাণ করতে হবে তাকে। গড়ে তুলতে হবে নিজের Female space-কে। বুঝতে হবে প্রকৃত সমস্যাকে। কারণ পুরুষ কখনোই তার শত্রু বা বিরুদ্ধপক্ষীয় নয়, বিরুদ্ধপক্ষীয় হল পুরুষতন্ত্র। আর এই বিষয়টিই ভাঙার প্রচেষ্টা আমরা দেখতে পাই মহাশ্বেতা দেবীর 'দ্রৌপদী' গল্পে—

> দ্রৌপদীর কালো শরীর আরো কাছে আসে। দ্রৌপদী দুর্বোধ্য। সেনানায়কের কাছে একেবারে দুর্বোধ্য এক অদম্য হাসিতে কাঁপে। হাসতে গিয়ে ওর বিক্ষত ঠোঁট থেকে রক্ত ঝরে এবং সে রক্ত হাতের চেটোতে মুছে ফেলে দ্রৌপদী কুলকুলি দেবার মতো ভীষণ আকাশচেরা তীক্ষ্ণ গলায় বলে, কাপড় কি হবে কাপড়? লেংটা করতে পারিস, কাপড় পরাবি কেমন করে? মরদ তু?[২৭]

এই তীক্ষ্ণ স্বর, এই প্রশ্ন বড় প্রাসঙ্গিক, বড় বলিষ্ঠ যা কাঁপিয়ে দেয় সেনানায়ককেও। ভয় পায় সে।

না, নারীবাদ শেষ বিচারে নিজের কথাটাই বলতে চায়। শত্রু তার পুরুষ নয় বরং পুরুষতান্ত্রিক অভিজ্ঞান। আর সেই অভিজ্ঞানকে চ্যালেঞ্জ জানাতে, ধাক্কা দিতে নারীবাদকে তার নিজের কণ্ঠস্বর শোনাতেই হবে। কেননা—"সুচেতনা, এই পথে আলো জ্বেলে—এ পথেই পৃথিবীর ক্রমমুক্তি হবে।"[২৮]

উৎস ঋণ

১. দ্রষ্টব্য , ভূদেব চৌধুরী, *বাংলা সাহিত্যের ছোটগল্প ও গল্পকার* এবং অরুণকুমার মুখোপাধ্যায়ের, *কথা সাহিত্য-জিজ্ঞাসা,* করুণা প্রকাশনী, শ্রাবণ ১৩৬৮, (১৯৬১) পৃ. ৩৫।

২. ফ্রেডরিক এঙ্গেলস, *পরিবার, ব্যক্তিগত মালিকানা ও রাষ্ট্রের উৎপত্তি,* ন্যাশনাল বুক এজেন্সি প্রা. লি., তৃতীয় সংস্করণ ; আগস্ট ১৯৯৯, পৃ. ৪১।

৩. Toril Moi ; Feminist Literary Criticism ; *Modern Literary Theory* ; 2nd Ed. 1982 London, Ed. by Ann Jefferson & David Robey, Page-206.

৪. Jasbir Jain ; *Post-Colonial Realities : Women Writing History, Interrogating Post-colonialism---Theory, Text and Context.* Ed. by Harish Trivedi and Meenakshi Mukherjee, Indian Institute of Advanced Study Rashtrapati Nivas, Shimla, 1996, Page-162.

৫. Ruth Robbins ; Will the real feminist theory pleane stand up, *Introducing Literary Theories–A Guide and Glossary.* Ed. by Julian Wolfrey's, Edinburgh University Press, 2001. Page–54.

৬. Rajeswari Sunder Rajan and Yon-me Park ; Post-colonial Feminism / Post-Colonialism and Feminism, *A Companion to Post-Colonial Studies.* Ed. by Henry Schwarz and Sangeeta Ray. Page–53.

৭. Ruth Robbins ; Ibid-Page-51.

৮. Ipshita Chanda ; Feminist Theory in Perspective. Post Colonial Feminism / Post Colonialism and Feminism, *A Companion to Post Colonial Studies,* Ed. by Henry Schwarz and Sangeeta Ray. Page–492.

৯. বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়, 'কৃষ্ণকান্তের উইল', *বঙ্কিম রচনাবলী.* (সং). ড. বাঁধন সেনগুপ্ত, [মৌসুমী প্রকাশনী, ১৯৮৪, পৃ. ৪৭৮]।

১০. তদেব, পৃ. ৪৮১।

১১. রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, 'শাস্তি' ; *রবীন্দ্র রচনাবলী,* নবম খণ্ড (গল্প), পশ্চিমবঙ্গ সরকার, ১৯৮, পৃ. ১৪৪।

১২. নরেন্দ্রনাথ মিত্র, 'সেতার' ; *গল্পমালা—নরেন্দ্রনাথ* মিত্র, আনন্দ পাবলিশার্স প্রাইভেট লিমিটেড, সপ্তম মুদ্রণ ২০০৩, পৃ. ৫১।

১৩. সন্তোষকুমার ঘোষ, 'কোনও অসতীর কথা', *গল্প সমগ্র* (২). সন্তোষকুমার ঘোষ, দে'জ পাবলিশিং, জানু' ১৯৯৪, পৃ. ৪৮০।

১৪. Ruth Robbins ; Ibid-Page-51.

১৫. Gayatri Chakravorty Spivak, *Feminism and Critical Theory* (1986). *Contempo-rary Literary Criticism—Literary and Cultural Studies,* Ed. by–Robert Con Davis and Ronand Schleifer, Longman, Third Edition 1994, Page–520.

১৬. বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়, *বিষবৃক্ষ,* প্রাগুক্ত, পৃষ্ঠা-২৭১-২৭২।

১৭. রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, 'চোখের বালি', *রবীন্দ্র রচনাবলী,* সপ্তম খণ্ড (উপন্যাস), পশ্চিমবঙ্গ সরকার, অক্টোবর, ১৯৮৫, পৃ. ১৯৯।

১৮. বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়, *বিষবৃক্ষ*, প্রাগুক্ত, পৃ. ২৭৫।

১৯. দ্রষ্টব্য, Donna Haraway, 'A Cyborg Manifesto : Science, Technology and Socialis'—*Feminism in the Late Twentieth Century* (1985), Ed. by—Robert Con Davis and Ronald Schleifer, Longman, Third Edition, 1994, Page–577. এবং Jasbir Jain ; Ibid-Page-163.

[উপরোক্ত দুই প্রাবন্ধিকের দেওয়া তালিকা থেকে শব্দ নির্বাচন ও প্রতিশব্দের অনুবাদ সম্পূর্ণ আমার নিজের—মু. ম. ই.]

২০. কামিনী রায়, 'সে কি'? *বাংলা গীতিকবিতা উনিশ শতক*, অরুণ কুমার মুখোপাধ্যায়, ওরিয়েন্টাল বুক কোম্পানি (প্রাইভেট) লিমিটেড, মে, ২০০৩, পৃষ্ঠা—৮০।

২১. তদেব, পৃষ্ঠা—৮১।

২২. Toril Moi ; Ibid-Page–209.

২৩. Burke, 'Report From Paris : See—Elaine Showalter, 'Feminist Criticism in the Wilderness', *Modern Criticism And Theory*, Ed. by David Lodge, 1991, Longman, Page-339.

২৪. ড. বরুণকুমার চক্রবর্তী, *বাংলা লোকসাহিত্য চর্চার ইতিহাস*, পুস্তক বিপণি, ২য় সংস্করণ, সেপ্টেম্বর, ১৯৮৬, পৃ. ১৪৮।

২৫. তদেব, পৃ. ১৫১।

২৬. Elanie Showalter ; Ibid-Page-345.

২৩. মহাশ্বেতা দেবী, 'দ্রৌপদী', *অগ্নিগর্ভ*, করুণা প্রকাশনী, ১৩৮৫ (১৯৭৮)।

২৮. জীবনানন্দ দাস, 'সুচেতনা', *জীবনানন্দ দাশের শ্রেষ্ঠ কবিতা*, ভারবি, নভেম্বর ১৯৭৬, পৃ. ৫৯।

গত শতকের প্রথম দিকে সাহিত্য-গবেষণায় নতুন পথের সন্ধান করছিলেন কয়েকজন। যে আত্যন্তিক বৈশিষ্ট্য কোনো রচনাকে সাহিত্য করে তোলে, তার হদিশ চাইছিলেন তাঁরা। সাহিত্যকে দর্শন বা সমাজতত্ত্বের চশমা দিয়ে দেখার প্রচলিত পদ্ধতি নামঞ্জুর করছিলেন। সাহিত্যের যে একটি নিজস্ব চরিত্র রয়েছে এবং সে-চরিত্রের অধ্যয়নই যে সাহিত্যগবেষণার একটি প্রধান ক্ষেত্র হতে পারে, সে-বিষয়ে তাঁরা একমত ছিলেন। তাঁরাই পরিচিত হয়েছিলেন রুশি প্রকরণবাদী বলে। রুশি, কেননা সে-দেশেই রূপ পেয়েছিল তাদের সাহিত্যভাবনা। মস্কো-র লিঙ্গুইস্টিক সার্কেল[১] এবং সেন্ট পিটারসবার্গ-এর সোসাইটি ফর দি স্টাডি অফ পোয়েটিক ল্যাঙ্গুয়েজ[২]— এই দুটিই ছিল তাঁদের গবেষণার প্রাতিষ্ঠানিক কেন্দ্র।[৩] আর ফর্মালিস্ট, কেননা সাহিত্য-গবেষণা সম্পর্কে কিছু মৌলিক প্রত্যয়ের শরিক ছিলেন তাঁরা। সাহিত্যচর্চায় তাঁরা ছিলেন 'ফর্মাল মেথড' (formal'nyj method)-এর উদ্‌গাতা।[৪] উনিশ শতকীয় রোমান্টিক সমালোচনায় গুরুত্ব পেয়েছিল কাব্যিক প্রেরণা, প্রতিভা প্রভৃতি। এর বিরুদ্ধে দাঁড়িয়েই রুশ ফর্মালিজমের যাত্রা। সাহিত্যের নান্দনিক, মনস্তাত্ত্বিক, কিংবা দার্শনিক তাৎপর্য বিশ্লেষণ করার যে পদ্ধতি সাহিত্যসমালোচনায় প্রচলিত, সে-পদ্ধতিকে গুরুত্ব দেননি তাঁরা, বরং একান্তভাবে সাহিত্যের বৈশিষ্ট্য বিশ্লেষণ করার কথাই বলেছিলেন।[৫] এই ধারার অন্যতম প্রধান তাত্ত্বিক শক্লোভস্কি বলেছেন, "in its essence the Formal method is simple— a return to craftsmanship" (দ্র. Steiner : 1984 : 44-5)। এবং সেই বিশ্লেষণ হবে বৈজ্ঞানিক। আইহেনবোম তাঁদের অবলম্বিত বৈজ্ঞানিক পদ্ধতিটির বিস্তৃত এবং সহজ ব্যাখ্যা দিয়েছেন একেবারে শুরুর দিকেই— "We establish concrete principles and adhere to them to the extent they are proved tenable by the material. If the material requires their further elaboration or alteration, we go ahead and elaborate or alter them. In this sense we are relatively detached from our own theories, as indeed a science ought to be, seeing that there is a difference between theory and convictions. There are no

রুশ প্রকরণবাদ সহজ পাঠ

অমিতাভ চক্রবর্তী

ready-made sciences. The vitality of a science is not measured by its establishing truths but by its overcoming errors. (1926 : 3-4) ১৯২৮-এ জেকবসন এবং ত্যানিয়ানোভ সাহিত্যগবেষণাকে 'সুসংবদ্ধ বিজ্ঞান' হিসেবে চিহ্নিত করলেন। রুশ সাহিত্যবোধে ফর্মালিস্টদের অবদান সম্পর্কে মন্তব্য করতে গিয়ে তাঁদের এক অন্যতম বিরোধী, য়েফিমোভ (Yefimov) এই বৈজ্ঞানিকতার কথাই উল্লেখ করেছেন— "Poetics, once a sphere of unbridled impressionism, became an object of scientific analysis, a concrete problem of literary scholarship."[৬]

বৈজ্ঞানিকভাবে সাহিত্যের আত্যন্তিক বৈশিষ্ট্যের সন্ধানী বলেই তাঁদের কাছে প্রথমে সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ হয়ে উঠেছিল সাহিত্যের ভাষা। বিষয়ীগত প্রেরণা বা কাব্যপ্রতিভা, দার্শনিক বীক্ষা, সাহিত্যের আর্থ-সামাজিক প্রেক্ষিত প্রভৃতির বদলে তাঁরা গুরুত্ব দিলেন সাহিত্যের গঠন এবং প্রভাবের ভাষাতাত্ত্বিক বিশ্লেষণে। এই সাধারণ প্রবণতার ফলেই শক্লোভস্কি 'laws of poetic language' (1916a) আবিষ্কারে আগ্রহী ছিলেন; জেকবসন 'সাহিত্যত্ব' (literaturnost)-এ আগ্রহী ছিলেন।[৭] শক্লোভস্কি তাঁর বিখ্যাত প্রবন্ধ 'Art as Technique' (১৯১৭)-এ এই ঘরানার মূল সূত্রগুলির প্রাথমিক উপস্থাপনা করেছিলেন। 'প্রতীকের মাধ্যমে মনন' হিসেবে শিল্পকে দেখার রোমান্টিক প্রবণতার বিরোধিতা করেন তিনি। তাঁর মতে, প্রতীক বা চিত্রকল্পে মনোযোগের প্রবণতার সঙ্গে কবিতায় 'বিষয়'-কে সন্ধান করার মানসিকতার আত্যন্তিক যোগ রয়েছে। তার বদলে, সমালোচককে মনোযোগ দিতে হবে কবিতার প্রকরণে।

রুশ প্রকরণবাদীরা তাঁদের আলোচনার প্রথম পর্বে মেনে নিয়েছিলেন যে সাহিত্য মূলত ভাষিক সৃষ্টি। কিন্তু, সেটুকু মেনে নিলেও তো থেকে যায় প্রশ্ন, কী সেই ধর্ম যা কিছু রচনাকে দেয় সাহিত্যের চরিত্র? প্রথম পর্বে তাঁদের মনে হয়েছিল যে এ-প্রশ্নের উত্তর রয়েছে অভিনবত্বে। শক্লোভস্কি ভেবেছিলেন, যেহেতু শিল্পে ব্যবহৃত হওয়ার আগেই ভাষা সংযোগের মাধ্যম হিসেবে ব্যবহৃত হয়ে থাকে, ফলে তার বিভিন্ন রীতিনীতিও পাঠকের অতি পরিচিত থাকে। এই পরিচিতির ফলে বীক্ষণ হয়ে যায় 'habitual ... automatic'। প্রতিদিনকার অভ্যস্ত বাক্‌রীতি "devours works, clothes, furniture"। এই প্রেক্ষিতে সাহিত্য আমাদের পরিচিত জগতকে নতুন করে দেখায়, অতি-যোগাযোগের কারণে যা খুব পরিচিত হয়ে ওঠে, শিল্প তাকে আবার অভিনব করে তোলে, ফলে, অতি-পরিচিতির কারণে সাধারণত যা আমরা সহজেই চিনে নিতে পারি, তাকে আবার মনোযোগ দিয়ে দেখতে হয়— "art exists so that one may recover the sensation of life ; it exists to make one feel things, to make the stone stony ... The purpose of art is to impart the sensation of things as they are perceived and not as they are known." (Shklovsky : 1917:12)। আর এই নতুনত্বের আভাস দেয়ার জন্যেই ভাষাকে করে তুলতে হয় অপরিচিত বা অভিনব, "defamiliarized" (Shklovsky : 1917:13)।[৮] ফর্মালিস্টরা প্রথমদিকে মূলত জানতে চাইছিলেন সেই প্রক্রিয়াটিকে, যা শিল্পকে এভাবে অভিনব করে তোলে।[৯] নানা প্রযুক্তির ('device') সাহায্যে ভাষাকে 'অভিনব' করে তোলা হয়। কবিতার ক্ষেত্রে এরকম প্রযুক্তির মধ্যে রয়েছে নানা ধরনের পুনরাবৃত্তি, যা মোটেও প্রচলিত ভাষায় ব্যবহার করা হয় না। যেমন, ছন্দ ও স্তবকবিন্যাস, এছাড়া, প্রচলিত ভাষায় ব্যবহার করা হয়, এমন কিছু প্রযুক্তিও কবিতায় ব্যবহার করা হয়। যেমন, রূপক ও প্রতীক। অবশ্য, কাব্যভাষায় এগুলোর ব্যবহারের প্রক্রিয়ায় প্রচলিত ভাষা বা অ-কাব্যিক ভাষার তুলনায় স্বাতন্ত্র্য বজায় রাখা হয়। সাধারণভাবেই

ভাষার মধ্যে দ্ব্যর্থকতার একটি সম্ভাবনা রয়ে যায়। এই প্রযুক্তিগুলির ব্যবহারের মাধ্যমে প্রায় সময় সেই দ্ব্যর্থতার বৈশিষ্ট্যটিকে কাজে লাগানো হয়। একটি দলিল বা প্রবন্ধ যেখানে ভাষার অন্তর্লীন দ্ব্যর্থতাকে কাটিয়ে স্বচ্ছভাবে কোনো অর্থ প্রকাশ করতে চেষ্টা করে, যেখানে কাব্যভাষা শব্দগুলির প্রচলিত ও অপ্রচলিত অর্থ এবং সম্ভাব্য অনুষঙ্গ প্রভৃতির ব্যবহার করে। এই প্রযুক্তিগুলি নিছক কোনো একটি অর্থ প্রকাশ করাতেই নিঃশেষ হয় না, এমনকি অনেক সময় আদৌ কোনো একক অর্থ প্রকাশ করতে এগুলি কোনো বহির্গত বাস্তব বা মনোভাবের দিকে চালিত করার বদলে পাঠককে নিজেদের দিকে আকৃষ্ট করে, অর্থাৎ ভাষার নিজস্ব বৈশিষ্ট্যের দিকে প্রচলিত ভাষারীতি থেকে স্বাতন্ত্র্যের দিকে আমাদের মনোযোগ আকর্ষণ করে। জেকবসন তাই বলেছিলেন যে কবিতা আসলে ভাষার এমন একটি প্রকাশ, যার মূল বৈশিষ্ট্য নিজস্ব রূপকে যাবতীয় আকর্ষণের কেন্দ্রবিন্দু করে তোলা। শিল্পকে অভিনব করে তোলার প্রযুক্তিগুলির আলোচনায় কেবলমাত্র অলংকার ছন্দ প্রভৃতির কথাই বলেননি শক্লোভস্কি। তিনি আখ্যানের বিশ্লেষণ করে দেখান কীভাবে বস্তুর নাম উল্লেখ না করে তার বর্ণনা করে টলস্টয় পরিচিত জিনিসকেও অপরিচিত করে তোলেন। একজন অসামরিক মানুষের চোখে যুদ্ধক্ষেত্রের বর্ণনার মাধ্যমে (War and Peace), বা ঘোড়ার চোখে মানুষের মালিকানা-ব্যবস্থা বর্ণনা করেও (Cholstomer) টলস্টয় সেই অপরিচিতির আবহ সৃষ্টি করেছেন।[১০] এ-ধরনের প্রযুক্তির ফলে "an object is transferred from (the sphere of) its usual perception to that of a new perception. which results in a particular semantic shift." (Sklovsky : 1916a : Art as Device : 31) এই নতুনত্ব তৈরির মধ্যে দিয়ে অতি-পরিচিতির নির্বেদ থেকে আমাদের এক নতুন এবং আন্তরিক অভিজ্ঞতায় পৌঁছে দেয়। শক্লোভস্কির কাছে এটিই শিল্পের উদ্দেশ্য— "The aim of art is to convey the immediate experience of a thing as it is seen instead of recognized ; the device of art is the device of making things strange and the device of the impeded form, which enlarges the difficulty and the length of the perception, as in art the process of perception is self-oriented and must be lengthened ; art is a means to becoming aware of the making of things, but in art the things made are not important." (Sklovsky : 1916a : 15) জাকুবিন্সকি (Lev Jakubinsky) এবং জেকবসনের লেখাপত্রেও একই সিদ্ধান্ত লক্ষ করা যাবে। জেকবসনের কাছে সাহিত্যের ভাবগত দিকটি মূলত ভাষাগত বৈশিষ্ট্যের উপর নির্ভরশীল। জাকুবিন্সকি সিদ্ধান্ত করেছিলেন যে কাব্যভাষার ক্ষেত্রে ভাষার ব্যবহারিক উদ্দেশ্য গুরুত্ব হারিয়ে ফেলে এবং ভাষিক বৈশিষ্ট্য নিজের গুণেই গুরুত্ব অর্জন করে। এমন ক্ষেত্রে ভাষা হয়ে ওঠে বিশিষ্ট এবং কাব্যিক।

এই আলোচনাক্রমে ফর্মালিস্টরাই প্রথম কবিতার ধ্বনিবিন্যাসের কার্যকারিতার নৈর্ব্যক্তিক এবং যুক্তিনিষ্ঠ আলোচনার সূত্রপাত করেন। তাঁদের মতে, কবিতায় শব্দের নির্বাচনে আভিধানিক অর্থের বদলে ধ্বনির ভূমিকাই মুখ্য।[১১] ফর্মালিস্টদের প্রথম সম্মিলিত প্রকাশনায়[১২] ধ্বনিকে কাব্যিক ভাষার কেন্দ্রীয় উপাদানের ভূমিকায় রাখা হয়েছিল। শক্লোভস্কি এবং জাকুবিন্সকি অবশ্য শব্দ চয়নের ক্ষেত্রে ধ্বনির ভাবগত তাৎপর্যের ভূমিকাও স্বীকার করেছিলেন। এইহেনবোম (Eichenbaum) আবার এজন্যে এঁদের দুজনের সমালোচনা করেছিলেন। ওসিপ ব্রিক (Osip Brik) রুশ কাব্যভাষা নিয়ে গবেষণায় ধ্বনির পুনরাবৃত্তির বিভিন্ন ধরন নিয়ে বিস্তৃত আলোচনা করেছিলেন।[১৩] এই প্রেক্ষিতেই কাব্যতত্ত্বের সংজ্ঞা দিতে গিয়ে রোমান জেকবসন কাব্যতত্ত্বের

এমন একটি সংজ্ঞা দিলেন যা ভাষাতাত্ত্বিক আলোচনাকেই গুরুত্ব দিল, কাব্যতত্ত্ব হয়ে উঠল— "the linguistic scrutiny of the *poetic function within* the context of verbal messages in general, and *within* poetry in particular." (Jakobson : 1980 : 23) (A Postscript to the Discussion on Grammar of Poetry) তাঁর মতে, ভাষাকে কাব্য করে তোলে কিছু প্রকরণ, যার মধ্যে রয়েছে ক্ষুদ্র বৈশিষ্ট্য থেকে শুরু করে সার্বিক বিন্যাস। সাহিত্য আসলে প্রচলিত ভাষারীতি থেকে স্বাতন্ত্র্যের মাধ্যমেই সাহিত্য হয়ে ওঠে। সাহিত্য প্রচলিত বাক্‌ধারার ওপর এক সার্বিক হিংস্রতা। সাধারণ পাঠক এই প্রক্রিয়াটিকে ব্যাখ্যা না করতে পারলেও সেও এই ভাষিক বৈশিষ্ট্যগুলি সম্পর্কে সচেতন থাকে— "Speakers employ a complex system of grammatical relations inherent to their language even though they are not capable of fully abstracting and defining them." (Jakobson : 1980:30)[১৪]

অবশ্য, আখ্যানের বিশ্লেষণে শুধুমাত্র এই বিশ্লেষণ যথেষ্ট ছিল না। কেননা আখ্যান কখনো কখনো ভাষারীতির অপ্রচলিত নির্মাণের দিকে মনোযোগ দিলেও, সাধারণভাবে আখ্যানে এমন উদাহরণ কমই পাওয়া যাবে যাতে ভাষারীতির অপ্রচলিত গড়নই প্রধান বা সার্বিক। আখ্যান বরং ভাষার দ্ব্যর্থতার সম্ভাবনাকে এড়িয়ে গিয়ে একটি সুনির্দিষ্ট কাহিনি গড়ে তোলে। স্বাভাবিকভাবেই, ফর্মালিস্টরা 'অপরিচিতিকরণ'(defamiliarization)-এর বৈশিষ্ট্যকে আখ্যানের ভাষার ক্ষেত্রে কাজে লাগাতে পারেননি, সন্ধান করেছিলেন নতুন সূত্র। এই ক্ষেত্রেও অবশ্যই গুরুত্ব পেয়েছিল সার্বিক নিয়মের সন্ধান। ১৯২৫-এ বোরিস তোমাশেভস্কি (Boris Tomashevsky) সিদ্ধান্ত করলেন যে আখ্যানের ক্ষেত্রে প্রচলিত ভাষারীতি থেকে স্বাতন্ত্র্য মুখ্য নয়, এক্ষেত্রে স্বাতন্ত্র্য ঘটে উপস্থাপন রীতিতে। তিনি বিষয়টিকে ব্যাখ্যা করলেন syzhet (বিন্যাস) এবং শক্লোভস্কি ব্যবহৃত fabula (কথামূলযমূল কাঠামো) পরিভাষা দুটির সাহায্যে। Fabula বলতে কোনো বিষয় বা ঘটনার মূল কাঠামোকে বোঝায়, যেমনটি থাকে খবরের কাগজে ; শক্লোভস্কির ভাষায়— "the description of the events" (Shklovsky : 1921 : 297) আখ্যানে এই ঘটনা বা বিষয়ের মূল কাঠামোটিকে নানাভাবে বিন্যস্ত করে নির্মিত হয় তার কাহিনি রূপ। কবিতায় বিভিন্ন প্রযুক্তি যে বিশিষ্টতার জন্ম দেয়, আখ্যানে সেই বিশিষ্টতা গড়ে ওঠে বৃত্তের বিন্যাসে। সে-কারণেই একই ঘটনা বা বিষয়ের বিভিন্ন বিন্যাসে বিভিন্ন কাহিনি গড়ে ওঠে। কথামূল এই বৃত্তের রসদ মাত্র— "the fabula is merely material for the formation of the plot" (Shklovsky : 1921 : 297)। ঠিক যেমন অপরাধ-তদন্ত-সমাধান, এই মূল কাঠামোই থাকে বেশিরভাগ ডিটেকটিভ আখ্যানের, কিন্তু প্রতিটি আখ্যান স্বতন্ত্র হয়ে ওঠে বিন্যাসের বৈচিত্র্যে।[১৫] সে বিন্যাসে পুনরাবৃত্তি, সমান্তরালতা, ক্রমোন্নতি, বিপরীত উন্মোচন প্রভৃতি প্রক্রিয়া গৃহীত হতে পারে, এমনকি সময়ের ক্রম অবিন্যস্তও হতে পারে। আর, ছন্দ ইত্যাদির মতোই, এই বিন্যাস নিজের দিকেই পাঠকের দৃষ্টি আকর্ষণ করে। অবশ্য এও সত্য যে শুধু বৃত্তই সর্বদা গল্পকে বিন্যস্ত করে না, অন্যান্য উপাদানও বিন্যাসের নিয়ন্ত্রক হতে পারে। যেমন, Eichenbaum তাঁর 'How Gogol's 'Overcoat' Was Made' (1918a)-প্রবন্ধে দেখালেন গোগোলের গল্পে কথকের ব্যক্তিগত কথার ভঙ্গিটিই সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ বৈশিষ্ট্য হয়ে উঠেছে। Eichenbaum আরও দেখালেন যে, মৌখিক কথনের উপাদান লিখিত সাহিত্যেও ব্যবহৃত হতে পারে ; এই ছদ্ম-মৌখিক প্রযুক্তিটিকে তিনি অভিহিত করলেন skaz বলে (1918b)। আবার, শক্লোভস্কি দেখালেন যে

Don Quixote-এ সরাইখানাটি অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ ঘটক হয়ে উঠেছে, কেননা তা বহু অধ্যায়ের ক্ষেত্রে, এমন একটি কেন্দ্র যাকে উপন্যাসটির অন্যসব সূত্র একবার না একবার ছুঁয়ে যায় (1925)। তিনিই রোজানোভের লেখার আলোচনায় দেখালেন যে, তাঁর লেখায় এমন একটি সুর থাকে, যাকে বলা যায় 'tone of the confession' (Shklovsky : 1925 : Literature Without Plot : 172)। শক্লোভস্কির বিশ্লেষণে, এমন বলা যায় না যে রোজানোভ সত্যিই তাঁর লেখায় কোনো কনফেসন করছেন, বরং রোজানোভ আসলে "tone of the confession"-কে একটি সাহিত্যিক প্রযুক্তি হিসেবে ব্যবহার করছেন।

এই সাধারণ সূত্রের আলোচনায় একটি সমস্যা ক্রমে উন্মোচিত হল। দেখা গেল যে অপরিচিতি সৃষ্টির ক্ষমতা প্রযুক্তিগুলির আত্যন্তিক বৈশিষ্ট্য নয়, অনেক প্রযুক্তির ক্ষেত্রেই এই অপরিচিতি ঘটে একমাত্র উপযুক্ত প্রেক্ষিতেই। ক্রমে ফর্মালিস্টরা টের পেলেন যে রচনাকে বিশিষ্ট করে তোলার প্রযুক্তিকে সম্পূর্ণ বোঝার জন্যে ভালো করে জানতে হবে সেই বিশেষ রচনার প্রেক্ষিতটিকে। একটি সাহিত্যধারায় কিছু প্রযুক্তি নিয়মিত ব্যবহারের ফলে পরিচিত হয়ে ওঠে। তখন তার ব্যবহার আর অপরিচিতির আবহ তৈরি করতে পারে না, তখন সেই পরিচিত প্রযুক্তিগুলি থেকে স্বতন্ত্র প্রযুক্তিই একমাত্র অভিনবত্ব তৈরি করতে পারে। কোনো কোনো ক্ষেত্রে, পরিচিত প্রযুক্তিগুলির অনুপস্থিতিই সেই কাঙ্ক্ষিত অভিনবত্ব তৈরি করতে পারে। একই কথা সত্য একক সাহিত্যকৃতির অন্তর্গত বিন্যাসের ক্ষেত্রেও, সেক্ষেত্রে একটি প্রযুক্তির বহুল ব্যবহার ঘটলে, ক্রমশ সেই প্রযুক্তিটি অভিনবত্ব সৃষ্টি করতে অক্ষম হয়ে পড়ে। বস্তুত, অত্যন্ত আকর্ষণীয় এবং নতুন প্রযুক্তিও অতি ব্যবহারের ফলে অভিনবত্বের গুণ হারিয়ে ফেলতে বাধ্য। অর্থাৎ, কোনো প্রযুক্তির মধ্যে বিশিষ্টতা জন্মানোর অন্তর্লীন কোনো গুণ নেই, সম্পূর্ণ বিষয়টি নির্ভর করে একটি প্রযুক্তি কীভাবে একটি সাহিত্যধারা বা বিশেষ সাহিত্যকৃতির নিজস্ব প্রেক্ষিতে কার্যকরী হতে পারে। এই বোধ থেকে সাহিত্যকৃতিকে এমন একটি ব্যবস্থা হিসেবে দেখা গেল, যা একটি রচনা-পরিবেশ সৃষ্টি করে, যার মধ্যে বিভিন্ন উপযুক্ত প্রযুক্তির মাধ্যমে অভিনবত্ব সৃষ্টি করা হয়। এই রচনা-পরিবেশই প্রযুক্তির চয়নকে নিয়ন্ত্রিত করে, যে চয়নের ক্ষেত্রে সবচেয়ে নির্ণায়ক হয়ে ওঠে স্বাতন্ত্র্য; ইতোমধ্যে পরিচিত হয়ে ওঠা প্রযুক্তিগুলি থেকে স্বাতন্ত্র্য।

এই উপলব্ধির ভিত্তিতে ফর্মালিস্টরা সাহিত্যের ইতিহাসে সংরূপের রূপান্তর সম্পর্কে একটি তাত্ত্বিক অবস্থানে পৌছোলেন। সাহিত্যের ইতিহাসে কিছু সংরূপ হারিয়ে যায়, অনেক সংরূপের গড়নে রূপান্তর আসে, কিছু নতুন সংরূপও তৈরি হয়। ফর্মালিস্টদের কাছে এই প্রক্রিয়ারও সূত্র রয়েছে অভিনবত্বে। সাহিত্যক্ষেত্রে অভিনবত্বের দাবিতে নতুন সংরূপ গড়ে ওঠে, সংরূপগুলি আবার অভিনবত্বের টানেই নতুন নতুন প্রযুক্তি ব্যবহার করতে করতে রূপান্তরিত হয়। এভাবে সাহিত্যের ইতিহাস আসলে পরিচিতি এবং অভিনবত্বের এক অনন্ত প্রক্রিয়া হয়ে ওঠে।[১৬] এই পর্বেও অবশ্য ফর্মালিস্টরা সংরূপের রূপান্তর বিশ্লেষণে সম্পূর্ণ সাফল্য পাননি। এর জন্য প্রয়োজন ছিল সার্বিকভাবে সাহিত্য ও সংস্কৃতির জগতের যুক্ততা সম্পর্কে একটি ধারণা। সেটি যুক্ত করলেন মূলত য়ুরি্ ত্যানিয়ানোভ (Yuri Tynyanov)। তিনি সাহিত্যক্ষেত্রের বিবর্তনের মধ্যে লক্ষ করলেন বিভিন্ন উপাদানের দ্বন্দ্ব, যার ফলে ঘটে রূপান্তর। আবার, সাহিত্য যেহেতু সাংস্কৃতিক জগতের অংশ, তাই এও মনে রাখতে হবে যে এই সাহিত্যিক দ্বন্দ্ব সাংস্কৃতিক বিবর্তনেরও শরিক। সাহিত্য-বহির্ভূত ঘটনা ও উপাদানের প্রতিক্রিয়ায় সাহিত্যক্ষেত্রেও রূপান্তর ঘটতে থাকে। এই পর্বের সাহিত্যতত্ত্বে বৃহত্তর সংস্কৃতিজগত

গুরুত্ব পেলেও লেখক বা পাঠক অনালোচিতই রয়ে গেলেন। যদিও, যেহেতু রূপান্তরকে অবশ্যম্ভাবী বলার পাশাপাশি এও মানা হয়েছে অভিনবত্ব সৃষ্টির প্রযুক্তিগুলির চরিত্র সম্পর্কে কিছু বলা অসম্ভব, তাই, লেখকের ভূমিকাও ক্রমে গুরুত্বপূর্ণ হয়ে ওঠা স্বাভাবিক ছিল।[১৭]

যাই হোক, ফর্মালিস্টদের এ-সব সিদ্ধান্ত তাঁদের ক্রমশ প্রাগ-ঘরানা এবং আকরণবাদের পূর্বসূরী করে তুলছিল। কুড়ির দশকের শেষের দিকেই প্রাগ বা চেক আকরণবাদীরা তুলনীয় কাজ শুরু করে দিয়েছিলেন[১৮]। ততোদিনে জেকবসন তদানীন্তন সোভিয়েত শাসকদের দমননীতির ফলে পালিয়ে প্রাগে চলে গিয়েছিলেন। একটি সাহিত্যকৃতি যে পরস্পর যুক্ত এবং নির্ভরশীল উপাদান সমূহের আকরণ, এই ধারণাটি প্রাগে আরো বিকশিত হয়। ফর্মালিস্টরা 'অভিনবত্ব'-এর বৈশিষ্ট্যটিকে বিশ্লেষণ করেছিলেন প্রায় পূর্ণাঙ্গভাবে। এর ফলে তাঁরা সাহিত্যিক এবং অন্যান্য রচনার মধ্যকার পার্থক্যকে চিহ্নিত করতে পেরেছিলেন, বিভিন্ন সংরূপের মধ্যকার পার্থক্য এবং একই সংরূপের বিভিন্ন রচনার পার্থক্যের মূলসূত্রটিও চিহ্নিত করেছিলেন। কিন্তু, অভিনবত্বের বৈশিষ্ট্যটিতেই সম্পূর্ণ মনোযোগ দেওয়ার ফলে তাঁরা রচনার অন্যান্য উপাদানকে গুরুত্ব দিয়ে বিশ্লেষণ করতে পারেননি। আকরণবাদীরা সাহিত্যকৃতির সবকটি উপাদানের দিকেই নজর দিলেন। প্রকরণবাদীরা প্রথম দিকে মনে করেছিলেন যে অন্যান্য সাংস্কৃতিক উৎপাদনের কথা মাথায় না রেখে শুধুমাত্র সাহিত্যই আলোচনার বিষয় হতে পারে। প্রাগ চিহ্নবিজ্ঞানীরা এই বিশ্বাসটির বিরোধিতা করেন। তাঁরা সব সাহিত্যিক রচনার পাশাপাশি অন্যান্য রচনার কাঠামোকেও আগ্রহের বিষয় করে তুললেন, সাহিত্যকৃতির নিজস্ব রূপগত বৈশিষ্ট্যের পাশাপাশি গুরুত্ব দিলেন তার অর্থগত দিকটিতেও। তাঁদের মতে, সাহিত্যকৃতি নিঃসন্দেহে মূলত নিজস্ব অভিনবত্বকেই গুরুত্ব দেয়, তার রূপগত দিকটির কেন্দ্রীয়তাই তাকে সাহিত্য হিসেবে চিহ্নিত করে, কিন্তু একই সঙ্গে সেটি বাইরের পৃথিবীর কথাও বলে। আকরণবাদীরা রচনার একাধিক উদ্দেশ্যকে মেনে নিয়ে প্রস্তাব করলেন যে আসলে একটি রচনা তার বহু বৈশিষ্ট্যের মধ্যে কোনো একটিকে প্রধান করে তোলে, যার ফলে অন্য উপাদানগুলি তুলনায় অপ্রধান হয়ে পড়ে। প্রাগ চিহ্নতাত্ত্বিকরা প্রকরণের বদলে গুরুত্ব দিলেন কাঠামোকে। রচনাকে কিছু প্রযুক্তির যান্ত্রিক সমাহার না ভেবে একটি কাঠামোগত সমগ্র হিসেবে দেখা হল। এই পর্বে রয়েছে এই বিশ্বাস যে সাহিত্যকে বৃহত্তর সাংস্কৃতিক জগৎ থেকে বিযুক্ত করে সম্পূর্ণ বোঝা অসম্ভব; এবং, সাহিত্যকৃতি আসলে একটি কাঠামো, যার অন্তর্গত উপাদানগুলি পরস্পর এক সচল সম্পর্কে লগ্ন, যাকে নিছক কিছু প্রক্রিয়ার সমাহার হিসেবে ব্যাখ্যা করা যায় না, কিছু প্রক্রিয়াকে চিহ্নিত করতে পারলেই সাহিত্যের এই সচল বিন্যাসকে বোঝা যায় না। মুকারোভস্কি লিখলেন— "structure is not a stable but a fragile equilibrium, (structure) is a phenomenological and not an empirical reality ; it is not the work itself, but a set of functional relationships which are located in the consciousness of a collective (generation, milieu, etc.)" [Mukarovsky : 1937, cited in Galan : 1985 : 35]

জেকবসন ক্রমে এই চিন্তার শরিক হয়ে উঠলেন। জেকবসনের হাতেই ঘটল প্রকরণবাদের বিবর্তন এবং তৈরি হল ফরাসি কাঠামোবাদের পটভূমি; জেকবসন হয়ে ওঠেন তিনটি পর্বের যোগসূত্র। গালান দেখিয়েছেন যে জেকবসনের দুটি পর্বের আলোচনার বিষয় এবং সিদ্ধান্তগত পার্থক্যই দেখিয়ে দেয় প্রকরণবাদের এবং প্রাগ চিহ্নতাত্ত্বিকের গবেষণার বিষয় সম্পর্কিত বোধ কোথায় আলাদা। জেকবসনের লেখায় ক্রমে গুরুত্ব পেল সাহিত্যকে এক বৃহত্তর

কাঠামোর অংশ হিসেবে দেখা— "although poetry is a totality set apart by a series of specific signs and determined as a totality by its own dominant— namely, poeticity— it is at the same time a part of the higher totalities of culture and of the overall system of social values." (cited in Galan : 1985 : 133) ১৯২৮-এ জেকবসন এবং তিন্যানোভ যখন "Problems of the Study of Literature and Language"-এ তাঁদের ন'টি প্রতিপাদ্য উপস্থাপন করলেন, তখন তার মধ্যেই দেখা গেল প্রকরণবাদের অন্তিম পর্যায়ের চিন্তা এবং প্রাগ ঘরানার প্রারম্ভিক সূত্রগুলি। ১৯৩৩-এ প্রাগে "What is Poetry" শীর্ষক একটি আলোচনায় জেকবসন জানান যে 'সাহিত্যত্ব' বা 'কাব্যত্ব' কবিতার কেবল সেই বৈশিষ্ট্য যা সামগ্রিক কাঠামোর একটি অংশ, অবশ্যই যা প্রধানতম (Dominant)। এই পর্যায়ের জেকবসনের কাজকে সাহিত্যতত্ত্বের ঐতিহাসিক যুক্তিযুক্ত কারণেই 'structural view' (Galan : 1985 : 107) বলেছেন। এই পর্বে তিনি ভাষায় মোট চারটি ক্রিয়া নির্দিষ্ট করেন, যা পরবর্তীতে দাঁড়ায় ছটিতে। এর মধ্যে যেমন রয়েছে বহির্জগতের ঘটনা বা বস্তুকে ব্যঞ্জিত করার ক্রিয়া, রয়েছে আবেগকে (বক্তার) প্রকাশের ক্রিয়া, (পাঠকের পক্ষে) অনুধাবনের ক্রিয়া, ভাষাতাত্ত্বিক ক্রিয়া, ধ্বনিগত ক্রিয়া, তেমনি রয়েছে কাব্যিক ক্রিয়া।[১১] এর সবকটিই সব ধরনের ভাষিক সংযোগে উপস্থিত থাকে, তবে, তার মধ্যে যে-কোনো ক্রিয়া একটি ভাষিক নির্মাণে মুখ্য হয়ে উঠতে পারে। তখন সেই ক্রিয়াটিই ভাষার অন্যান্য ক্রিয়াগুলিকে প্রভাবিত এবং নিয়ন্ত্রিত করে। যখন কাব্যিক ক্রিয়া প্রধান হয়ে ওঠে, তখন "the word is felt as a word and not a mere representation of the object being named or an outburst of emotion, when words and their composition, their meaning, their external and internal form, acquire a weight and value of their own instead of referring to reality." (Jakobson : 1934 : 387) জেকবসনের মতে, আমরা কবিতাকে পাঠ করি ব্যবহারিক ভাষার প্রেক্ষিতে এবং সাধারণভাবে প্রচলিত কাব্যধারার প্রেক্ষিতে। প্রচলিত কাব্যধারা থেকে স্বাতন্ত্র্য, আর ব্যবহারিক বা আবেগাত্মক ভাষা, যা মূলত সংযোগের ভাষা, তার থেকে স্বাতন্ত্র্য, কবিতার পরিচায়ক হয়ে ওঠে। কবিতায় ভাষার সংযোগাত্মক দিকটি তখন একেবারে গুরুত্ব হারিয়ে ফেলে, প্রধান হয়ে ওঠে বাচিক অভিব্যক্তি।

ত্যানিয়ানোভ ইতিমধ্যে তাঁর কিছু প্রবন্ধে এধরনের ভাবনা ব্যক্ত করেছিলেন। তিনি দেখাতে চাইলেন যে কবিতায় শব্দ দুটি ক্ষেত্রের সঙ্গে যুক্ত থাকে; ছন্দ এবং অর্থ। শব্দ চয়নের সময়ে তার দুটি দিকই কবিকে খেয়াল রাখতে হয়। কাব্য এবং গদ্যের শব্দভাণ্ডারের কাঠামোগত (ত্যানিয়ানোভ 'struktura' (structure) শব্দটিই ব্যবহার করেছিলেন) মূল পার্থক্য রয়েছে "the unity and terseness of the poetic series, the dynamic role of the word in a poem and the successiveness of poetical speech"-এ। (Tynyanov : 1924b : 133) কবিতাপংক্তিতে একটি শব্দের অবস্থানের অর্থগত তাৎপর্য থাকতে পারে— "Between words a relationship comes into being on the basis of their (successive) position." (Tynyanov : 1924b:76) এমনটি গদ্যে নেই। ত্যানিয়ানোভ সাহিত্যের সংজ্ঞা দিতে গিয়ে বলেছেন যে সাহিত্য আসলে "এক ভাষিক নির্মাণ, যাকে একটি নির্মাণ হিসেবেই আস্বাদন (experience) করা হয়; অর্থাৎ, সাহিত্য একধরনের সক্রিয় (dynamic) ভাষিক নির্মাণ।" (Tynyanov : 1924a : The Literary Fact : 407-9)

সক্রিয় বলার কারণ, সাহিত্যকৃতি কোনো একক অস্তিত্ব নয়, একটি সাহিত্যধারার এবং সংযোগ-প্রক্রিয়ার অংশ। পাঠককে যদি সাহিত্যকৃতিকে একটি ভাষিক নির্মাণ হিসেবে অনুধাবন করতে হয়, তাহলে সেই নির্মাণের উপাদানগুলিকে পূর্বতন সাহিত্যের উপাদানগুলি থেকে এবং অ-সাহিত্যিক ভাষিক রচনা থেকে স্বতন্ত্র হতে হবে। এই অভিজ্ঞতা সম্ভব সাহিত্যিক এবং সামাজিক ইতিহাসের প্রেক্ষিতেই। এজন্যেই তানিয়ানোভের মতে সাধারণভাবে নান্দনিক অভিজ্ঞতার কথা বলার মানে নেই, নান্দনিকতা আসলে একটি বিশেষ ঐতিহাসিক প্রেক্ষিতে ঘটা একটি নির্দিষ্ট অভিজ্ঞতার ফসল। সাহিত্যের সংরূপও একইভাবে প্রবহমান একটি প্রক্রিয়া, যা কিছু কিছু প্রযুক্তিকে বর্জন করে, আবার কিছু নতুন প্রযুক্তি অর্জন করে। একটি নতুন সংরূপের নতুনত্ব অনুভব্য একমাত্র প্রচলিত সংরূপের প্রেক্ষিতেই। সাহিত্যের ইতিহাসে একটি সংরূপ ক্রমে কেন্দ্র থেকে প্রান্তীয় হয়ে পড়ে, আর নতুন সংরূপ কেন্দ্রীয় হয়ে ওঠে। এসব কারণেই কোনো একটি সংরূপের ইতিহাস আলাদাভাবে বোঝা যেতে পারে না—"The examination of isolated genres is impossible without taking into account the signs of the genre system with which they are in correlation." (Tynyanov : 1927 : On Literary Evolution : 446) এই প্রবন্ধেই ত্যানিয়ানোভ জানান যে, কোনো সাহিত্যকৃতিকে এককভাবে, সামগ্রিক সাহিত্যধারা থেকে আলাদা করে ব্যাখ্যা করা অসম্ভব, আবার, সাহিত্যধারাও সম্পৃক্ত বৃহত্তর সাংস্কৃতিক-সামাজিক ধারার সঙ্গে। তাঁর কাছে এই সম্পৃক্তির সূত্র উভয় ধারাতেই ভাষিক সংযোগের উপস্থিতি।

ত্যানিয়ানোভ এবং জেকবসনের এইসব বক্তব্য আলোচনা করতে গেলে একথা মনে হওয়া অবশ্যম্ভাবী যে এই দুই আলোচক আসলে আকরণবাদী বিশ্বাসেই পৌঁছোচ্ছেন— "If the Formalists viewed literature as a system characterized by the interdependence of its elements, this position must be called *structuralist,* although they rarely used that label before 1927." (Fokkema & Ibsch : 1986 : 20) ১৯২৭-এই বার্নস্টাইন সিদ্ধান্ত করেছিলেন যে শিল্পকৃতির রয়েছে এক সামগ্রিকতা, এমনই সেই সামগ্রিকতা, যে তার প্রতিটি অংশ সেই সামগ্রিকতারই অংশ। শৈল্পিক এই কাঠামোকে তার বিভিন্ন উপাদানের নিরিখে আলোচনা করাই যায়, তবে শিল্প সেই উপাদানগুলির যান্ত্রিক যোগফল মাত্র নয়। Gustav Spet-এর কাঠামোবাদী দর্শন তাঁকে প্রভাবিত করেছিল। বার্নস্টাইন নিজেই জানিয়েছেন সেকথা। স্পেট লিখেছিলেন— "structure is a concrete construction, the various parts of which may change as to dimension and even quality, but no part of the whole *in potential* can be deleted without destruction of the whole." (Spet : 1923:II:11) কাঠামোর বিভিন্ন উপাদানগুলির ক্রিয়াশীলতা নির্ভর করে প্রেক্ষিত আর সেই কাঠামোকে গ্রহণকালীন প্রবণতার উপর। জেকবসন এবং ত্যানিয়ানোভ যেন সেই বিশ্বাসেই ক্রমে থিতু হলেন।

এভাবে তাঁরা কিন্তু তাঁদের ফর্মালিস্ট পরিচিতির প্রতিই বিশ্বস্ত রইলেন। আবারো ফিরিয়ে আনা যাক আইহেনবোমের কথাগুলি যেখানে তিনি ফর্মালিজমের মূল বৈশিষ্ট্য চিহ্নিত করেছিলেন পরীক্ষানির্ভর সূত্রায়নে— "We establish concrete principles and adhere to them to the extent they are proved tenable by the material. If the material requires their further elaboration or alteration, we go ahead and elaborate or alter them." (1926 : 3-4) জেকবসনদের সিদ্ধান্তের বিবর্তন এই পদ্ধতির প্রতি বিশ্বস্ত থাকারই ফল।

অবশ্য, সেই পদ্ধতির প্রতি বিশ্বস্ততার ফলেই ফর্মালিস্টদের কাজের সুযোগ সংকুচিত হয়ে এসেছিল। সোভিয়েতের রাজনৈতিক নেতৃত্বের কাছে ফর্মালিস্টরা খুব আদৃত ছিলেন না। সমাজবাদী বাস্তবতার তত্ত্বই ততদিনে সোভিয়েতের সরকারি তত্ত্ব হয়ে উঠেছে। আর সে তত্ত্বের প্রেক্ষিতে ফর্মালিস্টদের কাজকর্মকে এলিট মনে হয়েছিল তাদের। ট্রটস্কি তাঁর *Literature and Revolution* (1924)-এর শুরুতেই জানালেন যে সোভিয়েত সংঘে একটি মাত্র তত্ত্ব মার্কসবাদের বিরোধী, আর সেটি হচ্ছে ফর্মালিজম। তাঁর মনে হয়েছিল যে ফর্মালিস্টরা কেবল কবিতার শব্দের ব্যুৎপত্তি, বাক্য, স্বর-ব্যঞ্জন এগুলির আলোচনাতেই আগ্রহী, তাঁরা সামাজিক প্রেক্ষিত থেকে শিল্পের সম্পূর্ণ স্বাধীনতায় বিশ্বাসী। ট্রটস্কির আক্রমণের মুখেই ত্যানিয়ানোভ এবং জেকবসন প্রকাশ করেন তাঁদের ন'টি প্রতিপাদ্য (১৯২৮)। ত্যানিয়ানোভের যে বক্তব্য আগে আলোচনা করেছি, তাতে স্পষ্টতই সাহিত্যের বিবর্তন এবং আস্বাদনে বৃহত্তর প্রেক্ষিতের গুরুত্ব মেনে নেওয়া হয়েছে। কিন্তু, সাহিত্য এবং সাহিত্য-বহির্গত এলাকার আলোচনায় উভয় এলাকার নিজস্ব বৈশিষ্ট্যকে বিবেচনায় না রেখে তাদের সম্পর্ক আলোচনা করতে তাত্ত্বিক আপত্তি ছিল তাঁদের। ট্রটস্কির লেখা এবং তার পরবর্তী প্রতিক্রিয়ার সুবাদেই ১৯২৯-এ প্রকাশিত একটি প্রবন্ধে ('Literary Environment') Eichenbaum স্বীকার করে নেন যে প্রথম দিকে ফর্মালিস্টরা সাহিত্যের প্রকরণগত দিকটির আলোচনাতেই বেশি মনোযোগ দিয়েছিলেন, এবং তাঁদের বরং সাহিত্যের বৃহত্তর প্রেক্ষিতের আলোচনাতেও গুরুত্ব দেওয়া উচিত ছিল। তবে তিনি সাহিত্যের সমাজতাত্ত্বিকদের প্রবণতাতেও কিছুটা পরিবর্তন দাবি করেন। তাঁর মনে হয়নি যে সাহিত্যের এবং তার প্রকরণের ইতিহাসের আদি উৎস সন্ধানের কোনো মানে আছে, কেননা "no genetic study, however far it may go, can lead us to the prime origin, as long as the aims envisaged are scientific, and not religious." (1929 : 60-1) তিনি এমনকি নিজের বক্তব্যের সমর্থনে এঙ্গেলসের বক্তব্যও উদ্ধৃত করেছিলেন। সবচেয়ে বড়ো কথা, সাহিত্যের বিবর্তনকে অন্য কোনো ক্ষেত্রের অংশ হিসেবে মেনে নেওয়া তাঁর পক্ষে তাত্ত্বিকভাবেই অসম্ভব ছিল— "literature ... is not generated by facts belonging to other series and therefore cannot be reduced to such facts." (1926 : 61) ক্রমে সোভিয়েতে ফর্মালিস্টদের বিরোধিতা প্রবল হয়ে ওঠে। তাঁদের লেখাপত্র প্রকাশ করা প্রায় অসম্ভব হয়ে পড়ে। জেকবসন প্রাগে চলে যান; অনেকের লেখালেখি প্রায় বন্ধ হয়ে পড়ে, ত্যানিয়ানোভ আখ্যান লিখতে আরম্ভ করেন; ১৯৩০-এ শক্লোভস্কি কোনো তাত্ত্বিক বিশ্লেষণ ছাড়াই স্বীকার করে নেন— "in the last analysis, it is the economic process which determines and reorganizes the literary series and the literary system." (cited in Erlich, 1969-139) কিন্তু তাতেও শেষ রক্ষা হয় না, ১৯৩০-এই মস্কো এবং সেন্ট পিটারসবার্গ— দুটি কেন্দ্রই বন্ধ করে দেওয়া হয়।

জেকবসনের পরিণতি অবশ্য কিছুটা আলাদা হয়। তাঁর গবেষণা চলতে থাকে দেশের বাইরে থেকেই, রাজনৈতিক কারণে প্রাগ-ঘরানার কাজ স্তব্ধ হয়ে যাওয়ার পরেও। ১৯৫০-এও জেকবসন কবিতার নিজস্বতা বা কাব্যত্ব নিয়ে একটি সূত্র উপস্থাপন করেছিলেন। জেকবসনের সূত্র অনুযায়ী— "(The poetic function) projects the principle of equivalence from the axis of selection into the axis of combination." (Jakobson (1960) 1988 : 39, in Bertens : 2008 : 37) মানে, ব্যাকরণ এবং অর্থের বিচারে সমতুল্য শব্দমালা থেকে বেছে নিয়ে (axis of selection); নির্বাচিত শব্দকে বিন্যস্ত করা (axis of

combination), *হয় সমতুল্যতার নীতিতেই। এই সমতুল্যতা সৃষ্টি হয় নানা ধরনের পুনরাবৃত্তি* তৈরি করে, যেমন, ছন্দ, অনুপ্রাস, সমান্তরালতা। আজকের গবেষকের মতে, এটি সাহিত্য সম্পর্কে ফর্মালিস্টদের প্রস্তাবিত বৈজ্ঞানিক মনোবৃত্তির এক অনবদ্য অভিব্যক্তি ।[২০] ২০০৮-এ এই সূত্রের আলোচনা করতে বসে ইউরোপীয় সাহিত্যভাবনার গবেষক বার্টন উচ্ছ্বসিত মন্তব্য করেছেন— "... Jakobson's formula stands as one of the most serious— and, I should add, successful— attempts to capture that which makes the bulk of Western literature, and especially poetry, different from the language we use when we go out shopping." [Bertens : 2008 : 29]

নিজেদের দেশেও ফর্মালিস্টদের বিশ্বাস পুনরুচ্চারিত হয়, তবে তা প্রায় তিন দশকের দুর্দশার পর। ১৯৫০ নাগাদ সোভিয়েতে সাংস্কৃতিক ক্ষেত্রে নিয়ন্ত্রণ কিছুটা শিথিল হলে সাহিত্যের আকরণ নিয়ে গবেষণার ধারা নতুনভাবে গড়ে ওঠে, শক্লোভস্কি প্রমুখ ফর্মালিস্টদের লেখাপত্র পুনর্মুদ্রিত হয়। ১৯৫৩-য় স্তালিনের মৃত্যুর পর সোভিয়েত এবং পূর্ব ইউরোপের দেশগুলিতে আবারো প্রকরণবাদ নিয়ে নতুন করে আলোচনা আরম্ভ হয়, পুরোনো সূত্রগুলিকে নতুনভাবে বিচার করা হতে থাকে, ততদিনে যেসব তত্ত্ব প্রতিষ্ঠিত হয়েছে, তার আলোকে নতুন সূত্র প্রস্তাবিত হয়, সূচনা হয় সোভিয়েত চিহ্নবিজ্ঞানের। বিশেষ করে সাইবারনেটিক্স এবং সংযোগ সম্পর্কিত গবেষণার প্রেক্ষিতে পুরোনো প্রশ্নগুলো নতুনভাবে আলোচিত হতে থাকে। নতুন প্রশ্নের উত্তর খোঁজা শুরু হয়। এই সোভিয়েত চিহ্নবিজ্ঞানে রুশ প্রকরণবাদ এবং প্রাগ চিহ্নবিজ্ঞানের ঐতিহ্যের বিস্তার লক্ষ করেছেন আলোচকরা।[২১] ১৯৫৫-এ সোভিয়েত জার্নাল 'Kommunist' 'On the problem of the Typical Literature and Art': শীর্ষক একটি সম্পাদকীয় ছাপে। তাতে, শিল্পের নিজস্বতাকে গুরুত্ব না দিয়ে তার বৈশিষ্ট্যকে শুধু কয়েকটি সামাজিক শক্তির সঙ্গেও সম্পৃক্ত করে ব্যাখ্যা করে দেখার প্রবণতা সম্পর্কে সাবধান করে দেওয়া হয়। শিল্পের জীবনবোধের সঙ্গে কিছু কিছু ক্ষেত্রে ঐতিহাসিক, দার্শনিক বা অর্থনীতিবিদদের নিজস্ব প্রবণতার সাদৃশ্য থাকলেও, শিল্পের নিজস্ব কিছু বৈশিষ্ট্যও রয়েছে। তাই, শিল্প গবেষণা এমন কিছু উপাদানেরও আলোচনা করে থাকে যেগুলি অন্যান্য বিজ্ঞানের এলাকা-বহির্ভূত। বস্তুত এই সব কথাবার্তায় তিরিশের দশকের ফর্মালিস্টদের সুরের অনুরণন যেন স্পষ্টই শোনা যায়। ট্রটস্কির আক্রমণের মুখে এমন কথাই তো বলেছিলেন জেকবসন-ত্যানিয়ানোভ, আইহেনবোমরা।

এমন অনুরণনের বা পুনঃপ্রতিষ্ঠার প্রেক্ষিত ছাড়াই অবশ্য ইউরোপীয় সাহিত্যচিন্তার ইতিহাসে ফর্মালিজমের গুরুত্ব স্বীকার করে নিয়েছেন আলোচকরা। ফর্মালিজমের প্রভাব রয়ে গেছে প্রাগ-ঘরানার আকরণবাদে, আবার ১৯৬০/৭০-এর ফরাসি আকরণবাদের মধ্যেও রয়ে গেছে তার উত্তরাধিকার।[২২] ১৯৫০-এর শেষদিকে রোমান জেকবসন এবং তাঁর সহকর্মীদের লেখাপত্র ইংরেজিতে অনূদিত হতে আরম্ভ হয়, এবং তখনই ইংরেজ ও আমেরিকান সাহিত্যতাত্ত্বিকরা এ-সম্পর্কে সচেতন হয়ে ওঠেন। সাহিত্যতত্ত্বের গবেষকেরা অনেকেই মনে করেন যে আজকের তাত্ত্বিক আলোচনাতেও রুশ প্রকরণবাদীদের উপস্থিতি নিছক ঐতিহাসিক গুরুত্বের জন্য নয়, তাঁদের প্রস্তাবিত তত্ত্বালোচনার ধরনটি আজো প্রাসঙ্গিক[২৩] ; ইউরোপের সাহিত্যতত্ত্বের প্রায় প্রতিটি ঘরানাকে আজো প্রকরণবাদীদের অবস্থানের প্রেক্ষিতে নিজেদের অবস্থানকে উপস্থাপিত করতে হয়।[২৪] হান্স বার্টেন্স কিছুটা দীর্ঘ এক মন্তব্যে প্রকরণবাদের এই প্রভাবের ধারাবাহিক সূত্রটি উন্মোচন করেছেন— "In spite of the enormous influence of Eliot, Leavis

and the New Critics, our current perspectives on the study of literature owe perhaps more to Continental Europe than to England and America. The continental European tradition of literary studies that is responsible for this begins in Russia, in the second decade of the twentieth century, in Moscow and St Petersburg. It finds a new home in Prague in the late 1920s, when the political climate in Russia has become too repressive, and travels to France (by way of New York City) after World War II, where it comes to full bloom in the 1960s and begins to draw widespread international attention. It is in France, too, that it provokes a counter movement that achieved its full force in the 1970s and 1980s and that is still the dominant presnece in literary—and in cultural— studies." (Bertens : 2008 : 24) এই ধারাবাহিকতার যৌক্তিকতা অস্বীকার করা যাবে না একেবারেই। খুব কম সাহিত্যতাত্ত্বিক ঘরানার ইতিহাসে এতটা দুর্ভোগের পাশাপাশি এত সক্রিয় ধারাবাহিকতা দেখানো যাবে। তবে, এতটা বিস্তৃতভাবে প্রকরণবাদ-প্রাগ চিহ্নবিজ্ঞান-আকরণবাদ-রুশ চিহ্নবিজ্ঞানের যাত্রাপথ যদিবা নাও টানা যেত, তবু মানুষের শিল্পচিন্তার ইতিহাস থেকে ফর্মালিজমের প্রভাব মুছে ফেলা যেত না। কেননা, যতবার কোনো শিল্পজিজ্ঞাসু শিল্পের মূলসূত্রের সন্ধানে নিজের সিদ্ধান্ত আঁকড়ে থাকার থেকেও বেশি গুরুত্ব দেবে উদাহরণের বিশ্লেষণে উঠে আসা সূত্রকে, ততবারই ফর্মালিজমের মূল প্রত্যয়টি কার্যকরী থাকবে। সেই প্রত্যয়, যার নির্ভরে বারবার নিজের সিদ্ধান্তকে পরীক্ষিত হতে দেওয়া যায়, দিতে হয় ; আর, যথেষ্ট প্রমাণ থাকলে নতুন সিদ্ধান্তে পৌঁছোনো যায় অনায়াসে। শিল্পচিন্তার ইতিহাসে এখানেই ফর্মালিজমের শক্তি।

১. ১৯১৫-তে প্রতিষ্ঠিত। এর প্রধান সদস্যরা ছিলেন Roman Jakobson, Peter Bogatyrev এবং G.O. Vinokur।

২. OPOJAZ (Obscestvo Izucenija Poeticeskogo Jazyka), ১৯১৬ সালে প্রতিষ্ঠিত। এটির প্রধান ছিলেন Viktor Shklovsky। lev Jakubinsky, Boris Eichenbaum, Segei Bernstein ছিলেন এর প্রধান গবেষক।

৩. এছাড়া, ১৯২০-তে Viktor Zirmunsky National Institute of Art History-র 'Department for Literary History'-র প্রধান হন। সেখানে ছিলেন Jurij Tynyanov, Boris Tomasevsky, Viktor Vinogradov। Shklovsky এবং Eichenbaum-ও তাঁর পৃষ্ঠপোষকতা পেয়েছিলেন।

৪. অভিধাটি অবশ্য তাঁদের নিজেদের বা তাঁদের কোনো অনুরাগীর উদ্ভাবন নয়, তাঁদের বিরোধী কেউ-ই প্রথম সেটি ব্যবহার করেছিলেন। এই আন্দোলনের শরিকরা নিজেরা এই অভিধাটি খুব পছন্দও করেননি। Boris Eichenbaum-এর মনে হয়েছে যে অভিধাটি সেন্ট পিটারসবার্গস্থ সোসাইটির কার্যকলাপকে যথার্থভাবে চিহ্নিত করতে ব্যর্থ— "It might have been convenient as a simplified battle cry but it fails, as an objective term, to delimit the activities of the "Society for the Study of Poetic Language". [Eichenbaum : 2001]

৫. প্রকরণবাদের সূচনালগ্নে সেটি কেবলমাত্র শুষ্ক জ্ঞানচর্চার বিষয় ছিল না, তার সঙ্গে জড়িয়ে ছিলেন সমকালীন সাহিত্যিকরা এবং সমকালীন সাহিত্যে নতুন রূপের সন্ধান। শক্লোভস্কি ১৯১৪-

তেই লিখেছিলেন— "At present the old art is dead already, whereas the new art is not yet born. Things are dead as well— we have lost a feeling for the world ...... Only the creation of new artistic forms may restore to man awareness of the world, resurrect things and kill pessimism." [Shklovsky : 1914 : 13]

৬. Formalism V Russkom Literaturovedinii'. quoted in Erlich : Russian Formalism : In Perspective : 1954 : 225। প্রচলিত সাহিত্য আলোচকদের তুলনায় ফর্মালিস্টদের স্বাতন্ত্র্য ও তার উৎস বিশ্লেষণ করে স্টেনার মন্তব্য করেছেন— "Traditional critics had not treated literary texts in terms of psychology, sociohistory, or philosophy just to be perversely 'unscientific', but because they saw these works as expressions of the authors' mental lives, documents of their time, or philosophical meditations. The Formalist view was quite different. For them literature was an autonomous reality governed by its own regularity and more or less independent of contiguous spheres of culture. From this perspective the vital issue for literary science was no longer the investigation of other realities that literary texts might reflect, but the description of what it was that made them a *literary* reality." [Steiner : 1984 : 245]।

৭. সাহিত্যের সাধারণ বৈশিষ্ট্যটির সন্ধান অবশ্য তাঁরা করছিলেন বিশেষ সাহিত্যকৃতির আলোচনার মাধ্যমেই। প্রায় সবক্ষেত্রেই তাঁরা একক সাহিত্যকৃতি নিয়ে আলোচনা করেছিলেন, কিন্তু তাঁদের উদ্দিষ্ট ছিল সার্বিক সত্য। এখানেই প্রায় সমকালীন 'প্র্যাকটিক্যাল সমালোচনা' এবং 'নব্য সমীলোচনা' থেকে স্বতন্ত্র এই ফর্মালিস্টরা— "For the New Critics the formal aspects of literary works were not unimportant. However, they were first of all interested in the form in which a poem presented itself because a close scrutiny of its formal aspects would reveal the complex of oppositions and tensions that constituted the poem's real meaning. But the Formalists were after what they considered bigger game and in order to do so ignored literature's referential function, the way it reflects the world we live in, and gave it an autonomous status— or gave at least the aesthetic dimension of literature an autonomous status, as Jakobson qualified their position in 1933 ... Whereas Practical Criticism and the New Criticism focused on the individual meaning of individual texts, Formalism wants to discover general laws— the more general the better." [Bertens : 2008 : 26]

মনে রাখতে হবে, এত বিস্তৃত তুলনার কারণ এটিই যে রুশ ফর্মালিজম এবং অ্যাংলো-আমেরিকান নব্য সমালোচকদের মধ্যে কোনো যোগাযোগ না থাকলেও দুদলই প্রায় সমকালে সাহিত্যের রূপগত দিকটির গবেষণায় গুরুত্ব দিয়েছিলেন। তবে এঁরা পরস্পরের গবেষণা সম্পর্কে অজ্ঞাত ছিলেন এবং এও স্পষ্ট যে এঁদের তাত্ত্বিক প্রবণতাও ছিল ভিন্ন।

প্রকরণের কাজকর্মের বিচারেও রুশ প্রকরণবাদীদের নব্য সমালোচকদের থেকে স্বাতন্ত্র্য টের পাওয়া যায়। সাহিত্যের প্রকরণ-বৈশিষ্ট্যগুলিকে বিশেষ প্রভাবসৃষ্টির উপকরণ হিসেবে দেখেন না নব্য সমালোচকরা, তাঁরা বরং সাহিত্যকে একটি স্বয়ংসম্পূর্ণ রূপ হিসেবে বিবেচনা করেন। তাঁরা বরং অনেক বেশি গুরুত্ব দিয়েছিলেন 'চিত্রকল্প'-এর ওপর। প্রকরণবাদীরা সাহিত্যের বিষয়ের বিশ্লেষণে গুরুত্ব না দিলেও, নব্য সমালোচনায় বিষয়ের গুরুত্ব যথেষ্ট। Cleanth Brooks 'The Language of Paradox'-এ Donne-এর 'The Canonization'-এর আলোচনায় দেখাতে চান যে কূটাভাস

ও তির্যকতারঙ্গ শ্লেষের ব্যবহার আসলে কল্পনার কাঠামোটিকেই প্রতিফলিত করে। (1947 : *The Well-Wrought Urn : Studies in the Structure of Poetry*, London : Methuen) অর্থাৎ, তাঁর ভাবনায় সাহিত্য বস্তুত কল্পনারই ফসল, আর তাই, তার মধ্যে রয়ে যায় কল্পনার কাঠামোটির প্রতিফলন। নব্য সমালোচনায় প্রকরণ হয়ে ওঠে তাৎপর্যের নির্দেশক, অতএব, সাহিত্যের 'বিষয়'। তাঁরা তাই সাহিত্যের প্রকরণের সাহায্যে সাহিত্যের মানেকে যথার্থভাবে, এবং নৈর্ব্যক্তিকভাবে পড়তে চান, সে-রকম পড়ার সম্ভাবনায় বিশ্বাস করেন। প্রকরণের ভিত্তি তাঁদের কাছে সেই নৈর্ব্যক্তিকতাকে সুনিশ্চিত করে। প্রকরণবাদীরা সে-রকম কোনো মানের খোঁজ করেন না, তাঁরা বুঝতে চান, ভাষা-রচনা ঠিক কোন প্রক্রিয়ায় সাহিত্য হয়ে ওঠে— "The formalist critic thus investigates the procedures that help render standard language literary, focusing attention on the laying bare of devices and the realization of verbal structures, but stays away at all cost from anything extraliterary— from biography, psychology, politics or philosophy— for fear of behaving, in Jakobson's provocative simile, like a policeman who arrests the culprit and all the innocent passersby into the bargain." [Galan : 1985 : 107]

৮. বাঙালি পাঠকের এক্ষেত্রে অবশ্যই মনে পড়বে বক্রোক্তিবাদের কথা। দশম শতাব্দীর 'বক্রোক্তি জীবিত'-কার কুন্তক যেন অনুরূপ কথাই বলেছিলেন 'প্রসিদ্ধ প্রস্থান ব্যতিরেকী' বক্রোক্তিকে কাব্যের সর্বস্ব বলে চিহ্নিত করার মধ্য দিয়ে।

৯. "What they wanted to know is how literature works, how it achieves its defamiliarizing effects." [Bertens : 2008 : 26].

১০. বিভিন্ন ধরনের প্রযুক্তির আলোচনা প্রসঙ্গে মনে রাখা যেতে পারে কুন্তকের কথা। তিনি বর্ণ থেকে আরম্ভ করে প্রবন্ধ প্রভৃতি বক্রতার ছ'টি প্রকারভেদের (বর্ণবিন্যাস-পদপূর্বার্ধ-প্রত্যয়াশ্রয়-বাক্যবৈচিত্র্য-প্রকরণ-প্রবন্ধ বক্রতা) কথা বলেছেন, সঙ্গে সেগুলির উপবিভাগের কথাও বলেছেন।

১১. সমালোচকের মতে "In so doing, they initiated a method for the quantitative examination of the linguistic structure of literary texts ; an approach which has proven productive for twentieth century scholarship." [Mandelkar : 1983 : 327]

১২. Sborniki Po Teorii Poeticheskogo Jazyka [Anthology on the Theory of Poetic Language) (1916]

১৩. Zvukovye povtory (Sound Repetitions, 1917) প্রবন্ধটিতে কাব্যভাষার অন্যান্য দিক নিয়েও বিস্তৃত আলোচনা রয়েছে। ব্রিকের অবদান আলোচনা করতে গিয়ে মন্তব্য করা হয়েছে : "his methodological restraint and his conception of an artistic 'uunity' wherein no element is superfluous or disengaged.....serves well as an ultimate model for the Formalist approach to versification study." [Mandelkar : 1983 : 335]

১৪. অবশ্য, যেহেতু এই ভাষিক বৈশিষ্ট্য বিশ্বজনীন বলেই মানতেন তাঁরা, তাই পাঠককে কেন্দ্র করে নতুনভাবে কাব্যভাষার বিচারের প্রয়োজনও আদৌ বোধ করেননি।

১৫. যেমন, শরদিন্দু বন্দ্যোপাধ্যায়ের গোয়েন্দা-কাহিনিগুলিতে অপরাধ-তদন্ত-রহস্য উন্মোচনের মূল কাঠামোটিই নানাভাবে উপস্থাপিত হয়ে থাকে। প্রতিটি ক্ষেত্রে অপরাধীর পরিচয়, অপরাধস্থল, অপরাধের প্রকৃতি, অপরাধ ঘটে যাওয়া থেকে রহস্যের কিনারা হওয়ার ঘটনাক্রম আলাদা হয়।

১৬. এই প্রবণতাতেও ফর্মালিস্টরা নব্য সমালোচকদের থেকে আলাদা। "It tries to give answers to questions of historical change that the New Critics, with their focus on the words on the page, could not even begin to address." [Bertens : 2008 : 33-34]

১৭. "....the mechanism of defamiliarization cannot say anything about the nature of the devices that will be deployed. All it tells us is that change is inevitable. It does not tell us which new course that change will take. Surely the individual author plays a significant role in making a selection from the array of devices that are available or, even better, in creating wholly new ones." [Bertens : 2008 : 34]

১৮. প্রাগ লিঙ্গুইস্টিক সার্কল প্রতিষ্ঠিত হয় ১৯২৬-এ। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধকালীন জার্মান দখল এবং পরবর্তী সোভিয়েত আধিপত্যের ফলে, ক্রমে প্রাগ সেমিওটিক্স-এর ধারাও লোকচক্ষুর আড়ালে চলে যায়। নাতসি দখলের সময়েই গবেষকদের চেকোস্লোভাকিয়া ছাড়তে হয়, অথবা কাজকর্ম বন্ধ করে দিতে হয়।

১৯. Referential Function ; Poetic Function ; Emotive Function ; Conative Function ; Phatic Function ; Metalingual Function.

২০. "it is one of the prime examples of the formal, 'scientific', approach to literature that marks continential European thinking about literature from the 1910s unitil the 1970s." [Bertens : 2008 : 37]

২১. "In spite of the fact that a new generation came to the fore and in spite of all political interference, the three stages of Russian Formalism, Czech structuralism and Soviet semiotics show a clear continuity." (Fokkema & Ibsch : 1986 : 10-11) তবে, তিনটি ধারাবাহিক পর্যায় হিসেবে এই তিনটি ধারাকে আলোচনা করা গেলেও আমাদের এও মনে রাখতে হবে যে এক্ষেত্রে একেবারে একমুখী কোনো ধারা বাহিকতা নেই। উদ্ধৃতিটি লেখকরাই মেনে নিয়েছেন যে রুশ ফর্মালিজম চেক ঘরানার একমাত্র প্রেরণা ছিল না। বিশেষ করে জার্মান ঐতিহ্যের প্রভাব প্রাগ ঘরানায় অনেক বেশি সক্রিয় ছিল। তবে সবমিলিয়ে তিনটি ধারার মধ্যে কিছুটা যোগাযোগ এবং প্রবহমানতা অবশ্যই রয়েছে।

২২. অবশ্য মনে রাখতে হবে, ক্লদ লেভি-স্ট্রস-এর "Structure and Form : Reflection on a work by Vladimir Prop" (১৯৭৬-এর পর ইংরেজিতে অনূদিত) ছাড়া ফরাসি আকরণবাদের প্রথম দিককার লেখাপত্রে মস্কো বা প্রাগের কাজকর্ম সম্পর্কে কোনো সচেতনতা লক্ষ করা যায় না। যুদ্ধের সময়ে নিউইয়র্কে তরুণ লেভি-স্ত্রসের সঙ্গে জেকবসনের দেখা হয়, যে যোগাযোগ লেভি-স্ত্রসকে মানব সংস্কৃতি ব্যাখ্যার এক নতুন পদ্ধতির সঙ্গে পরিচিত করায়।

২২. "And, insofar as the literary-theoretical paradigms which Russian Formalism inaugurated are still with us, it stands not as a historical curiosity but a vital presence in the theoretical discourse of our day." [Steiner : 1995 : 29]

২৩. "Almost every new school of literary theorists in Europe takes its cue from the "Formalist" tradition, emphasizing different trends in that tradition and trying to establish its own interpretation of Formalism as the only correct one." [Fokkema & Ibsch : 1986 : 11]

বইপত্র :

১। ফর্মালিস্টদের লেখালেখি—

Eichenbaum, Boris 1926. Introduction to the Formal Method, in Rivkin, J and Ryan, M (eds) (1998) Literary Theory : An anthology, Malden, MA : Blackwell

The Theory of the Formal Method, in Ladislaw Matkeja and Krystyna Pomorska (eds) Readings in Russian Poetics . Formalist and Structuralist Views, Cambridge, Mass : MIT Press, 1971.

Jakobson, Roman (1929) : Romantic Panslavism–New Slavic Studies in Selected Writings, Vol. 2, Word and Language. The Hauge : Mouton, 1971, 711-12.

(1932) : Is the Film in Decline ? in Jakobson 1987, 458-65

(1934) : What is Poetry ? Trns. M. Heim in Jakobson 1987, 368-78

(1935) : The Dominant, trns. Herbert Eagle, in Jakobson 1987, 41-49

(1936) : Signum et Signatum, trns. M. Heim in Semiotics of Art : Prague School Contributions, ed. Ladislav Matejka and Irwin R. Titunik, Cambridge : Harvard University Press, 1976, 176-87.

(1956) : with Morris Halle : Fundamentals of Language, The Hague : Mouton.

(1960) Linguistics and Poetics, in Jakobson 1987, 62-49

(1968) Poetry of Grammar and Grammar of Poetry, in Jakobson 1987, 121-44

(1980) : A Postscript to the Discussion of Grammar of Poetry, Diacritics 10 : 1, 21-35

(1987) : Language and Literature eds Krystyna Pomorska and Stephen Rudy. Cambridge : Harvard University Press

Shklovsky, Viktor (1917) : Art as Technique in Russian Formalist Criticism : Four Essays, trns. Lee Lemon and Marion Reis. Lincoln : University of Nebraska Press, 1965, 3-24

২। ফর্মালিস্টদের নিয়ে লেখাপত্র—

Bennet, Tony (1979) 2003, Formalism and Marxism, London : Routledge

Bertens, H. 2008. (2nd ed) : Literary theory : The Basics, London : Routledge Erlich, Victor (1969)1981 : Russian Formalism : History-Doctrine, New Haven, CT : Yale University Press.

Fokkema, D. and Ibsch, E (1986) 1978. Theories of Literature in the 20th Century, New York : St Martin's Press.

Galan, F.W. 1985. Historical Structures : The Prague School Project 1928-1946, Austin : University of Texas Press. Mandelker, A. 1983 : Russian Formalism and the Objective Analysis of Sound in Poetry The Slavic and East European Journal 27 : 3, 327-38.

Steiner, Peter (1984) Russian Formalism : A Metapoetics, Ithaca : Cornell University Press (1995) Russian Formalism in The Cambridge History of Literary Criticism. Ed Raman Selden. Vol. 8. Cambridge : Cambridge University Press.

Striedter, Jurij (1989). Literary Structure, Evolution and Value : Russian Formalism and Czeck Structuralism Reconsidered Cambridge : Harvard University Press.

[Elrich, Steiner, Striedter-এর বই এবিষয়ে সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ বই হিসেবে আদৃত। এই প্রবন্ধের জন্য এই বইগুলো ছাড়াও নির্ভর করেছি Bertens, Fokkema-Ibsch-এর বইয়ের ওপর।]

আকরণবাদ ও তার উত্তরকাল

গিনি ভট্টাচার্য

সহি-তত্ত্ব থেকে জন্ম সাহিত্যের আর সাহিত্যের 'সহিত' যথাযথভাবে লগ্ন হবার জন্য, বা যে-কোনো সাহিত্য সৃজনের রসাস্বাদনের জন্য দ্বারস্থ হতে হয় সাহিত্যতত্ত্বের। যদিও তত্ত্ব দ্বারা রসচর্বণ আদৌ সম্ভব কিনা সে বিষয়ে যথেষ্ট সন্দেহ রয়েছে। তবু একথা ঠিক যে, সাহিত্য-তত্ত্বায়নের ফলে বিমূর্ত সাহিত্যকর্মকে নিয়মনির্দিষ্ট, নীতিবদ্ধ পথে ব্যাখ্যা করা সম্ভব। ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণের এই প্রক্রিয়ায় প্রথমেই বিশ্লিষ্ট হয় সাহিত্য মাধ্যম ভাষার আধারটি। তাই যে-কোনো সাহিত্যতত্ত্বের মূল আলোচনার ক্ষেত্র সাহিত্যের ভাষা। পৃথিবীতে ব্যবহার্য ভাষার সংখ্যা কম নয়, অগুণতি এবং তাদের প্রত্যেকটির মাঝের ফারাকও ও যোজনব্যাপী। কিন্তু আধুনিক সাহিত্যতত্ত্ব দাবি করে, বাইরের চেহারায় এক এক ভাষার রূপ এক-এক রকম হলেও, সমস্ত ভাষার অন্তর্নিহিত নিয়মবিধির একটি সাধারণ গড়ন বা কাঠামো আছে। আধুনিক ভাষাতত্ত্বের লক্ষ্য বিবিধ ভাষার বাইরের রূপটাকে নিয়ে চিন্তিত না হয়ে ভাষাগুলির সাধারণ কাঠামো বৈশিষ্ট্যকে আবিষ্কার, একই লক্ষ্যে ভাষাতত্ত্বের দোসর হয়েছে সাহিত্যতত্ত্ব এবং সময়ের সাথে সাথে প্রসঙ্গত আবির্ভূত হচ্ছে আকরণবাদী মতবাদের ন্যায় উত্তর-আধুনিক সাহিত্যতত্ত্ব।

ভাষাতত্ত্বের ইতিহাসে স্যসুর-উদ্ভূত আকরণবাদী মতবাদ যেভাবে আলোচিত ও বিশ্লিষ্ট হয়, তা অভিনব, কারণ এটি সমকালে প্রচলিত দুটি ভাষাতাত্ত্বিক ধারণার বিপরীতে তার অবস্থানকে নির্দিষ্ট করেছিল। লক্ষণীয়, সূচনাতেই 'আকরণবাদ' নামক মতবাদকে ভাষাতত্ত্বের অন্তর্গত করে দেওয়া হচ্ছে, যখন এই মতবাদটির চর্চা সমাজবিজ্ঞানের অন্যান্য শাখাতেও সমান জনপ্রিয় ও উপযোগী, তখন এই গোত্রকরণ বলপূর্বক— এই অভিযোগ উঠতেই পারে। উত্তরে বলা যায় আকরণবাদ ইতিহাস, নৃতত্ত্ব বা সমাজতত্ত্ব যে-কোনো ক্ষেত্রেই প্রযোজ্য হোক না কেন, প্রয়োগের সময় আকরণবাদ তার বিবিধ প্রায়োগিক ক্ষেত্রকে ভাষাগত ক্ষেত্রের সঙ্গে সমতুল করে দেয়, যে কারণটি বক্তব্যের বিষয় হতে পারে, তা হল, আকরণবাদের আলোচনায় প্রাথমিক ভাবেই ভাষা প্রসঙ্গ এসে পড়ে কারণ ভাষা হল যে-কোনো সমাজের কেন্দ্রীয় অধিষ্ঠান এবং আকরণবাদী চিন্তা সামাজিক খাতগুলিকে

আশ্রয় করেই অগ্রসর হয়। ১৯২০ সাল থেকে আকরণবাদের জগতে দুটি শাখার অবস্থান লক্ষ করা যায় : ক. ইউরোপীয়ান, খ. উত্তর আমেরিকান। এই শাখাদুটি কোথাও পারস্পরিক মিলের সঙ্গতি বজায় রেখেছিল আবার কোথাও পার্থক্যে স্বতন্ত্র হয়েছিল। ফলে দুই প্রকার আকরণবাদী তত্ত্বের আলোচনাই বিশেষরূপে নির্দেশাত্মক কিন্তু তার পূর্বে নির্দেশ করা প্রয়োজন উনিশ শতকীয় বা তার পূর্ববর্তী ভাষাতাত্ত্বিক সেই দুই দৃষ্টিকোণকে যার বিরোধিতা আকরণবাদ করেছিল।

১৬৬০ সালে Lancelot ও Arnauld-এর 'Grammaire de port Royal' তত্ত্বে বলা হয়েছিল, ভাষা হল সেই দর্পণ, যেখানে ব্যক্তির চিন্তার ও বক্তব্যের প্রতিফলন ঘটে। মহাজগতিক নিয়মের ওপর গড়ে ওঠা ভাষা মূলগতভাবে যুক্তি-আশ্রয়ী। এই দার্শনিক প্রেক্ষিত থেকে উনিশ শতকীয় ভাষাবিদ্‌রা সরে এলেন, জার্মানীর Wilhelm von Humboldt বা আমেরিকার W. D. Whitney— এই কতিপয় ব্যতিক্রমী ভাষাবিদ্ ছাড়া সকলেই ভাষাতত্ত্বের আলোচনায় অন্তর্দৃষ্টিকোণকে ব্রাত্য করে দিলেন। তাঁদের মনোযোগ বিশেষভাবে আকৃষ্ট হল ভাষার রূপ বিশ্লেষণে ও তার জন্য তাঁরা যাত্রা শুরু করলেন ভাষার উৎস-মূল গোত্র-বংশতালিকা নিরূপণ দিয়ে। ভাষার ইতিহাসকে তাঁরা সবিশেষ গুরুত্ব দিলেন, কারণ তাঁরা বললেন সেই বিবর্তনের স্তরগুলি ভাষার রূপ বিশ্লেষণে সহায়ক হবে। যেমন উদাহরণ স্বরূপ তাঁরা বলেন সংস্কৃতই হল পৃথিবীর প্রাচীনতম ভাষাগুলির মধ্যে অন্যতম এবং সংস্কৃতের মাহাত্ম্য সেখানেই যে এটি বর্তমান ভাষাগুলির মধ্যে যৌগপত্য স্থাপনের সেরা সূত্র। সুতরাং পরিশেষে ভাষা ও তার ইতিহাস হয়ে দাঁড়াল ভাষাবর্গ নির্ণয়, ভাষাপরিবার গঠন ইত্যাদির যান্ত্রিক প্রক্রিয়া এবং এই যান্ত্রিকতারই পরিণাম স্বরূপ ভাষাতত্ত্বে ভিড় করছিল নিও-গ্রামারিয়ান আন্দোলনের প্রবক্তা ফ্রাঞ্জ বোপের গবেষণা ইত্যাদি, যেমন বোপের বিষয়টি ছিল (Uber das Konjugation ssymstemder Sanskrit Sprache) —অর্থাৎ The Conjugation System of the Sanskrit Language." তাই স্যসুরের পঞ্চাশতম মৃত্যুবার্ষিকীতে বঁভনিস্ত স্যসুরের স্মৃতিতর্পণ করতে গিয়ে বলেছিলেন ভাষার রূপবিশ্লেষণে ইতিহাসের সালিশি মানাটা মাত্রা অতিক্রম করে গিয়েছিল।

ভাষার ঐতিহাসিক দৃষ্টিকোণ ভাষা যে মূলগতভাবে 'যুক্তি-আশ্রয়ী'— এই দাবিটিকে বজায় রাখার জন্য এক বিশেষ বক্তব্য উত্থাপন করে। তারা বলেন, ভাষা হল সেই পদ্ধতি, যার দ্বারা বিবিধ বস্তুর নামকরণ প্রক্রিয়া সম্পন্ন হয়। ভাষা শব্দকে যুক্তিগতভাবে বস্তুর সাথে যুক্ত করে, যদিও সেকথা প্রমাণ করতে গিয়ে তাঁরা কোনো অকাট্য যুক্তি দিতে অপারগ, বরং খানিকটা এড়িয়ে যাওয়ার মানসিকতা থেকে তাঁরা বলছেন ঐতিহাসিক বা প্রাক্-ঐতিহাসিকভাবে বস্তু ও তার নামপদটির মাঝে নাকি কোনো অমোঘ ও সহজাত সম্পর্ক বিদ্যমান। যদি সত্যিই কেউ ইতিহাসের পথ ধরে পেছনে হাটে তবে সে দেখবে বস্তুর এই শাব্দিক নামকরণ অনেককাংশেই কাকতালীয় বা যুক্তিহীন। আর স্যসুর সেই সত্যটিই তুলে ধরেন, কারণ তিনি বলেন ভাষা বস্তুত নামকরণের পদ্ধতি তবে সেই নামকরণ প্রক্রিয়া অযৌক্তিক।

১৮৫৭ সালে জেনেভায় জন্ম, স্যসুর ছিলেন সুইজারল্যাণ্ডের অধিবাসী, যার পঠন-পাঠন মূলত জার্মানি ও প্যারিসে, ১৮৯১ সালে জেনিভা বিশ্ববিদ্যালয়ে প্রত্যাবর্তন ও ১৯১৩ সালে মৃত্যু। মাত্র পনেরো বছর বয়সে তিনি ফরাসি, জার্মান, ইংরেজি, ল্যাটিন ও গ্রিক— মোট পাঁচটি ভাষা জানতেন এবং সেই সময়েই তিনি 'Essay on Languages' নামে একটি দুঃসাহসিক প্রবন্ধ রচনায় প্রবৃত্ত হয়েছিলেন যে প্রবন্ধে তিনি সন্ধান করেছিলেন সমস্ত ভাষাতেই

বর্তমান কতগুলি সাধারণ ধ্বনিতাত্ত্বিক কাঠামোর। একুশ বছর বয়সে স্যসুরের 'Dissertation on the Primitive Vowel System in Indo-European' প্রবন্ধে প্রথম তিনি আকরণবাদী দৃষ্টিভঙ্গীর সূচনা ঘটান। সেখানে তিনি বলেন যে, একটি Vowel বা স্বরধ্বনির বিশ্লেষণে অবশ্যম্ভাবী রূপে সবকটি স্বরবর্ণের আলোচনা ও সেই সূত্রে Vowel গুলির অবস্থানগত সাধারণ কাঠামোর আলোচনা অন্তর্ভুক্ত হয়ে পড়ে— "It is clear that in fact it is the **System of Vowel** as a whole that falls within the radius of our observation and whose name must be inscribed on the first page." (*Ferdinand de Saussure, Course de Linguistique Generale*, Preface, ed. Tullio de Manro, P. 327)

জেনেভায় অধ্যাপনার দিনগুলিতে ক্লাসরুমের ছাত্রদের কাছে তিনি নিজস্ব ভাবনা তথা আকরণবাদী প্রকল্প উত্থাপন করেন ও ১৯১৬ সালে তাঁর মৃত্যুর পরে ছাত্ররা ক্লাসনোটস্‌-এর অংশ সংকলন রূপে প্রকাশ করেন। স্যসুর নিজে আকরণবাদ প্রসঙ্গে কোনো প্রবন্ধ জীবিতকালে রচনা করেননি, শুধু ছাত্রাবস্থায় বিক্ষিপ্ত ভাবে রচিত প্রবন্ধগুলিতে বারবার ব্যবহার করেছিলেন যে শব্দবন্ধ, (যেমন—'System of Vowels' ইত্যাদি) সেই 'System'-ই হয়ে দাঁড়াল আকরণবাদের মূল বিষয়।

স্যসুরের অভিনবত্ব এখানেই, যে তিনি ভাষাতত্ত্বের আলোচনার কেন্দ্রবিন্দুটা ভাষার সাধারণ ইতিহাসচর্চা থেকে সরিয়ে কোনো বিশিষ্টভাষার সমকালে প্রচলিত বাহ্যিক গঠন বা কাঠামোর ওপর স্থাপন করছেন। উনিশ শতকীয় ভাষাবিদ্‌রা ভাষার পরিবার তৈরি করে বিভিন্ন ভাষার মধ্যের যে মিশিং লিঙ্কটাকে খুঁজতেন সেই প্রবণতা থেকে স্যসুর সরে আসেন। ঐতিহাসিক নয়, তিনি মনে করেন, ভাষাতত্ত্বের আশ্রিত পথটা হওয়া উচিত-বৈজ্ঞানিক পথ। এর আগে রুশ প্রকরণবাদীরা এরূপ দাবি করেছিলেন কিন্তু তারা বক্তব্যটিকে বিস্তারিতভাবে ব্যাখ্যা করেননি। একথা ঠিক যে প্রকরণবাদীরাই প্রথম কোনো বিশিষ্ট রচনার নির্দিষ্ট গড়ন বা Form নিয়ে ভাবিত হন। কিন্তু তারা আকরণবাদী মতাবলম্বীদের ন্যায় কোনো রচনা নয়, যে-কোনো বিশেষ সাহিত্যকর্মের বা সমস্ত সাহিত্য রচনার নির্মাণে ক্রিয়াশীল সাধারণ গঠনগত বৈশিষ্ট্যগুলির সন্ধানে সচেষ্ট হননি। এ ছাড়াও প্রকরণবাদীরা সাহিত্যের ভাষাকে প্রায়োগিক জগতের ভাষা থেকে স্বতন্ত্র করে দেখতে চেয়েছিলেন, কিন্তু আকরণবাদের প্রবক্তা স্যসুর কখনোই সাহিত্যের ভাষাকে ব্যবহারিক ভাষা থেকে আলাদা করে নেওয়ার পক্ষপাতী ছিলেন না। কোনো ভাষার কাঠামো সম্পর্কে আলোচনা করতে গিয়ে স্যসুর ভাষায় ব্যবহৃত উপদানগুলির পারস্পরিক সম্পর্কের ওপর আলোকপাত করেন, কিন্তু তার অনিবার্যতা বা অমোঘতার প্রশ্নগুলিকে অগ্রাহ্য করে যান। দাবাখেলার উদাহরণ তুলে স্যসুর বলেন, দাবার খেলোয়াড়দের কাছে দাবার ঘুঁটিগুলি বা ঘুঁটিগুলির মূল্য গুরুত্বপূর্ণ নয়, কারণ, যে-কোনো বস্তুই ঘুঁটিগুলির বিকল্পরূপে ব্যবহৃত হতে পারে, যা গুরুত্বপূর্ণ, তা ঘুঁটিগুলির ক্রমপরিবর্তনশীল পারস্পরিক সম্পর্ক যা খেলাটাকে সচল রাখে।

ভাষাতে ব্যবহৃত উপাদানগুলির সম্পর্ককে গুরুত্ব দিতে গিয়ে স্যসুর দুটি মাত্রা বা অক্ষকে গ্রহণ করেছিলেন। ক. ভাষার 'Synchronic' পাঠ, খ. ভাষার Diachronic পাঠ। Diachronic ভাষাবিদ্‌রা সময়ের স্রোতে পরিবর্তিত ভাষার রূপ বিশ্লেষণ করেন, যেখানে Sychronic ভাষাবিদ্‌রা একটা নির্দিষ্ট খণ্ড সময়ে বা সমকালে ভাষার রূপ যেভাবে স্থিরতা পাচ্ছে, তার বিশ্লেষণ করেন, তারা ভাষার অবিরাম বদলে যাওয়ার ক্ষমতা নয়,

স্বীকার করে নেন ভাষার কমবেশি স্থায়ী সংবিধানকে। পার্থক্যটা আরো স্পষ্ট হবে স্যসুরের বক্তব্য উল্লেখ করলে—

> "Synchronic linguistic will be concerned with logical and psychological connexions between co-existing items constituting a system, as perceived bythe same collective consciousness.
>
> Diachronic linguistics on the other hand will be concerned with connexions between sequences of items not perceived by the same collective consciousness, which replace one another without themselves constituting a system."

লক্ষণীয়, প্রথমত, 'Course in General Linguistics'-এর কোথাও কিন্তু 'Srtucture' পদটির উপস্থিতি নেই, 'System' শব্দটি বারবার ব্যবহৃত হয়েছে (আকরণবাদ ইংরেজিতে 'Structuralism' নামেই পরিচিত), তবে যে পদই ব্যবহৃত হোক না কেন, আদতে তা বুঝিয়েছে এক ভাষিক কাঠামোকে যা সমকালে বর্তমান (স্যসুর সমকালীন রূপের নিরিখেই ভাষাকে বুঝে নিতে চেয়েছিলেন)।

দ্বিতীয়ত, সমকালীনতার আলোয় ভাষাকে বুঝতে গিয়ে স্যসুরের দৃষ্টি সংহত হয়েছে 'Collective consciousness' বা সামূহিক সজ্ঞানের ওপর। সামূহিক সজ্ঞান একটি বিমূর্ত ধারণা। আকরণবাদী মতে ভাষাও একটি বিমূর্ত ধারণা, আর সামূহিক সজ্ঞান তথা সমাজের সম্পদ ভাষা হয়ে দাঁড়াল এমন এক কাঠামো যা বিমূর্ত।

স্যসুরের 'Course in General Linguistics' যেমন ইউরোপে, আমেরিকায় তেমনই প্রায় একই সময়ে জনপ্রিয় হয়েছিল লেনার্ড ব্লুমফিল্ডের গ্রন্থ *Book on language* (1933) । ব্লুমফিল্ডের মতে ভাষা আদতে বিবিধ ব্যাকরণের যূথবদ্ধ রূপ, Collective বা human Conscionsuess' নয়, ব্লুমফিল্ড বেশি গুরুত্ব দিয়ে বলেন, বিভিন্ন ভাষার বিভিন্ন ব্যাকরণ সংক্রান্ত তথ্য পর্যাপ্ত পরিমাণে সংগ্রহ করার পর-ই আরোহী পদ্ধতিতে ভষার সাধারণ ধারণায় গিয়ে উপনীত হওয়া সম্ভব—

> The only useful generalisations about language are inductive generalizations. Features which we think ought to be universal may be absent from the very next language that becomes accessible....The fact that some features are at any rate, widespread, is worthy of notice and calls for an explanation; when we have adequate data about many languages, we shall have to return to the problem of general grammar and to explain these sinilarities and divergences, but this study, when it comes, will be not speculative but inductive.

ব্লুমফিল্ডের ভাষাপাঠের সমীকরণে তাই গুরুত্ব পায় আরোহী পদ্ধতি ও ব্যাকরণচর্চা। স্যসুর ভাষার ব্যাকরণসংক্রান্ত কোনো প্রসঙ্গের উত্থাপন করেননি, তিনি বেছে নিয়েছিলেন ভাষার চিহ্নয়ানের তাৎপর্যবাহী ক্ষমতাটিকে। ব্লুমফিল্ড নিজে স্যসুরের সাথে তার মতগত দূরত্ব সম্পর্কে অবগত ছিলেন আর তাই ১৯২৩ সালে স্যসুরের গ্রন্থটির রিভিউ লিখিতে গিয়ে লিখছেন—

> In detail, I should differ from de Saussure chiefly in basing my analysis on the sentence rather than on the word.

আমেরিকান আকরণবাদীরা যেখানে বাক্যপ্রকরণ বা পদবিন্যাস (Syntax) নিয়ে ভাবিত ছিলেন সেখানে স্যসুর শব্দ বা চিহ্ন নিয়ে। নিঃসন্দেহে বাক্যগঠনবিধি বা বাক্য গঠন কাঠামো সংক্রান্ত মতবাদ অনেক বেশি আকর্ষণীয় কারণ স্যসুর ভাষার মধ্যে চিহ্নায়ন সংক্রান্ত যে গুণটা দেখতে পান, তা আদতে বিমূর্ত। আপরদিকে ভাষার উপরি স্তরে তথা 'Surface Structure'-এ দৃশ্যমান রূপে থাকে বাক্যের অন্বয়গত ধারণা, বা বাক্যসজ্জা। ফলে আমেরিকান আকরণবাদ স্যসুরের থেকে খানিক ভিন্নপথে যাত্রা শুরু করে ও সেই পথের যাত্রীরূপে আসেন ভাষাবিদ্ নোয়াম চমস্কি।

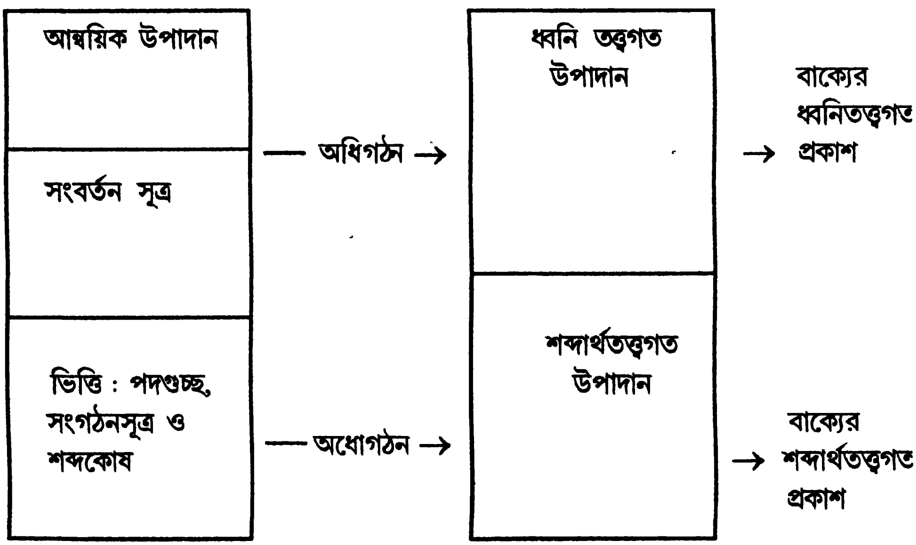
চমস্কিকে নিয়ে আলোচনার পূর্বে জেনে নেওয়া দরকার, 'langue ও 'parole' বলতে স্যসুর কী বুঝিয়েছেন। সাধারণ ভাবে 'langue' ও 'parole' হল 'language' ও 'Speech'— অর্থাৎ যথাক্রমে 'সাধারণ ভাষাগত কাঠামো ও ব্যক্তি প্রযুক্ত ভাষার রূপ'। langue হল স্যসুর-নির্ধারিত সমগ্র ভাষার ধারণা, যা সামূহিক চেতনায় সঞ্চিত রয়েছে, ব্যাকরণ ও শব্দভাণ্ডার langue-র উল্লেখযোগ্য অংশ। আর parole সমগ্র ভাষিক ধারণার ব্যক্তিগত প্রয়োগ। langue-র ধারণা বিমূর্ত, parole-র ধারণা মূর্ত— বৈশিষ্ট্যগত পার্থক্য থাকলেও এই দুটি ধারণা পরস্পর নির্ভরশীল। কারণ ব্যক্তিগত প্রয়োগ যদি না থাকত তবে তার পিছনে ক্রিয়াশীল ভাষিক কাঠামো অনুসন্ধান করা সম্ভব হত না, আবার একটা নির্দিষ্ট কাঠামো না থাকলে ভাষা প্রয়োগ অর্থহীন হত। আকরণবাদের বিশেষ উল্লেখযোগ্য অংশ langue ও parole যথাক্রমে 'code' ও 'message' -এর সঙ্গে সমতুল্য, তবে 'code' যেমন সকলের কাছে উন্মোচিত হয় না, langue সেরকম নয়, বরং সাধারণ ভাষাগত কাঠামো সকল সমাজবাসীর চেতনাতেই স্থান পেয়েছে, ফলে তা যেন স্যসুরের কাছে এক প্রকার সামাজিক চুক্তি রূপে পরিগণিত হয়েছে—

> It is a fund accumulated by the members of the community through the practice of speech, a grammatical system existing potentially in every brain, or more exactly in the brains of a group of individuals, for the language is never complete in any single individual, but exists perfectly only in the collectivity.

ভাবলে অবাক হতে হয় কীভাবে একটা গোটা ভাষাগত কাঠামো বা System প্রত্যেকের মস্তিষ্কে উপস্থিত আছে, এবং তার সম্পর্কে সচেতন না হয়েই দৈনন্দিন ব্যবহারে ব্যক্তি ভাষা প্রয়োগ করে চলছে। স্যসুরের মতো চমস্কিও তাই বিবিধ প্রয়োগের প্রাপ্ত তথ্যের ভিত্তিতে ভাষার একটা তাত্ত্বিক কাঠামো সন্ধান করতে চেয়েছিলেন, শুধু তাঁর ক্ষেত্রে ভাবনার বৃত্তটি ছিল ব্যাকরণগত। চমস্কির সমকালে আমেরিকায় আকরণবাদী ভাষাবিদ্‌রা ভাষাগত তথ্য সংগ্রহ করে তার শ্রেণীকরণ ঘটাতেন, কিন্তু তথ্যের তাত্ত্বিক বিশ্লেষণে বিরত থাকতেন, কারণ ব্লুমফিল্ডের প্রভাবে তাঁদের দৃষ্টিকোণ ছিল 'behaviouristic। তাঁরা মনে করতেন ব্যক্তির ভাষার ব্যবহার অভ্যাসের ফল, ব্লুমফিল্ডের কথায় 'a composite result of what he has heard other people say'. — ব্যক্তি অপরের কথা শুনে সহজেই ভাষাপ্রয়োগ ঘটায় ও অভ্যাসের কারণে সম-সম পরিস্থিতিতে একইভাবে প্রতিক্রিয়া দেখায় তার জন্য 'langue' বলে কোনো ভাষিক কাঠামোর সামগ্রিক অস্তিত্ব বিষয়ে ব্লুমফিল্ড বা আমেরিকান আকরণবাদী ভাষাবিদ্‌রা জিজ্ঞাসু ছিলেন না। কারণ, ভাষা স্বতন্ত্র প্রয়োগের কারণস্বরূপ তারা নির্দেশ করেছিলেন পৃথক ব্যক্তিমানস বা 'mind'-কে নয়, বরং ব্যক্তির 'habit'-কে। চমস্কি, তাঁর ভাষাতাত্ত্বিক আলোচনায় কিন্তু

ব্যক্তিমানসকে গুরুত্ব দেন, কারণ তাঁর যুক্তি, যদি ভাষাপ্রয়োগ অভ্যাসেরই দাসত্ব করে থাকে, তবে ভাষার যে বিশেষ উদ্ভাবনী ক্ষমতা আছে, তাকে অস্বীকার করতে হয়, মানুষ ক্রমান্বয়ে সেইসমস্ত বাক্য ব্যবহার করে, যা সে ইতিপূর্বে শোনেনি বা অনুরূপ কোনো বাক্যও শোনেনি। সুতরাং, ভাষা কোনো অভ্যাসের ফলে অর্জিত বিষয় নয়।

মানুষ কিভাবে তার জীবনে ভাষার অর্জনকে সম্পন্ন করে চমস্কির কাছে সেটাই সবচেয়ে কৌতূহলের বিষয় হয়ে দাঁড়ায়। এবিষয়ে কোনো সন্দেহ নেই যে, ভাষায় কাঠামো বা structure বর্তমান, প্রমাণ— বাক্যপ্রকরণে পদসজ্জার বিন্যাস, চমস্কি যাকে বলেন 'Surface Structure' বা অধিগঠন— কিন্তু সেই অধিগঠনই যথেষ্ট নয়, কারণ অনেকসময়েই বাক্যের অধিগঠন দেখে তার অর্থ বুঝে ওঠা যায় না, একেবারে আপাতভাবে তার যে ধ্বনিগত অর্থ প্রতীয়মান হয়, শব্দার্থতত্ত্বের আলোকে তার ভিন্নতর অর্থ স্পষ্ট হয়। বাক্যের এই শব্দার্থময় অন্তরঙ্গ গঠনকে চমস্কি বলেছেন অধোগঠন বা 'deep structure' আর যে নীতি নিয়মের প্রভাবে বাক্যের এই শব্দার্থময় অন্তর্গঠন ধ্বনিগত প্রকাশ লাভ করে, তাকেই চমস্কি বলেন, 'transformational বা 'generative grammar' বা সংবর্তনী ব্যাকরণ। 'সুতরাং অধিগঠন ও অধোগঠনের স্তর পেরিয়ে যেভাবে বাক্যগঠন পদ্ধতি সচল থাকে, একটি রেখাচিত্রের সাহায্যে তাকে এই ভাবে দেখানো যেতে পারে—



চমস্কির মতে অধিগঠন, অধোগঠনের স্তর পেরিয়ে বাক্যের নির্মাণ হল 'Structure dependent......in the sense that they apply to a string of words by virtue of the organisation of these words into phrases'.

'Transformational grammar'- এর আলোচনা প্রসঙ্গে চমস্কি 'competence' ও 'performance'-এর অবতারণা ঘটান, যার সঙ্গে স্যসুরের 'langue' ও 'parole'-র ধারণাগত মিল খুঁজে পাওয়া যায়। চমস্কি বলছেন, যে-কোনো ভাষার বাক্য বিশ্লেষণের সঙ্গে সম্পর্কিত

সংবর্তনী ব্যাকরণ সম্পর্কে সেই ভাষার বক্তারা অবশ্যই অবগত থাকেন অর্থাৎ ব্যক্তির— চৈতন্যে বাক্যগঠনের সামগ্রিক নিয়মাবলী সংহত ও সুবিন্যস্তভাবে নিহিত থাকে। ভাষার সেই সম্পূর্ণ নিয়মাবদ্ধ রূপটিকেই চমস্কি বলেন ভাষার অধিকার বা 'Competence' আর *Aspects* (১৯৬৫) গ্রন্থে 'Performance' বা ভাষা ব্যবহার বলতে চমস্কি নির্দেশ করেছিলেন— বক্তার কথা বলা, শ্রোতার ভাষাগত বোধ বা উপলব্ধি করার ক্ষমতাকে। চমস্কির এই বক্তব্যে স্যসুরের সঙ্গে তার ধারণাগত মিল থাকলেও স্যসুর, স্বতন্ত্র ব্যক্তিত্ব কিভাবে ভাষার ন্যায় সামূহিক বাচনিক কাঠামোর প্রয়োগে দক্ষতা অর্জন করছে, সেই পদ্ধতিকে ঘিরে খুব একটা প্রশ্ন তোলেন না, চমস্কি এই সমস্যার সম্মুখীন হন। যেমন— কোনো শিশু, তার কাছে খুব স্বল্প তথ্য থাকলেও অতিসহজেই যে-কোনো ভাষাকেই শিখে নিতে পারে। শিশুর ওপর যেকোনো ভাষার ব্যাকরণ, তার প্রায়োগিক শর্ত, নীতি-নিয়ম আরোপিত হোক না কেন, অতি সহজেই শিশু তাকে আত্মস্থ করে ভাষা শিক্ষা করতে পারে। প্রশ্ন হল শিশু যেভাবে দ্রুত যেকোনো ভাষা শিখে নেয়, তার শিখনপদ্ধতির একটা নকল পদ্ধতি তৈরি করলে কি প্রাপ্তবয়স্ক মানুষও দ্রুত যে-কোনো ভাষায় পারদর্শী হতে পারবে? কারণ, শিশু— যত দ্রুততার সঙ্গে ভাষা শেখে, প্রাপ্তবয়স্ক অবস্থাতেও মানুষ তত দ্রুত ভাষা শিক্ষা করতে পারে না। মনে হয়, শারীরিক মস্তিষ্কগত কোনো সহজাত ক্ষমতার কারণেই শিশু তাড়াতাড়ি নির্দিষ্ট ভাষাশিক্ষা সম্পন্ন করে। কিন্তু লক্ষ করলে দেখা যায় কোনো শিশু যত তাড়াতাড়ি ইংরেজিভাষা শেখে, হাজার ফারাক সত্ত্বেও ঠিক তত শীঘ্র জাপানি ভাষা শিখে ফেলে। চমস্কি মনে করেন, মানুষের মধ্যে নিঃসন্দেহে 'Preset' ভাষাগত ধারণা বা একধরনের 'tacit knowledge' বা একপ্রকার 'internalized grammar', তার মগ্নচৈতন্যে অবস্থান করে, তার ফলেই শিশু দ্রুত সেই ভাষাগত ধারণার সাহায্যে ভাষা-শিক্ষা করতে পারে। মানুষ যেহেতু একমাত্র ভাষাব্যবহারকারী জীব, যেহেতু তার ভাষা শিক্ষার একটা জন্মগত প্রস্তুতি আছে, এটাকেই চমস্কি বলেন UG বা Universal Grammar.

আমেরিকান আকরণবাদী পথ অনুসরণ করে চমস্কি যেখানে তাঁর আলোচনা শুরু করছেন বাক্য-কে ভিত্তি করে, স্যসুরের অবলম্বন সেখানে শব্দ বা Sign। স্যসুরের মতে ভাষা হল চিহ্নের কাঠামো। প্রতিটি চিহ্নের দুটি অংশ— Signifier (শব্দের ধ্বনিগত রূপ) ও Signified (তার অর্থগত তাৎপর্য)। যে ভাষাগত ঐতিহ্য এতদিন দাবি করছিল যে বস্তু ও তার নামপদের মধ্যে নির্ধারিত সম্পর্ক বিদ্যমান, স্যসুর তার বিরুদ্ধে গিয়ে বলছেন একেকটি চিহ্নের একেকটি বস্তুর ওপর আপেক্ষিক একাধিপত্য থাকে বটে তবে মূলত Signifier ও Signified-এর সম্পর্ক বিধিবহির্ভূত বা খামখেয়ালি ফলে এই সূত্র শব্দের প্রকৃতিপ্রত্যয় বা মূল ব্যুৎপত্তি সম্পর্কে বিব্রত না হয়ে বিশ্লেষণ করতে চাইল ভাষার তাৎপর্যবাহী বাহ্যিক নক্‌শা ও তার অর্থগত গুরুত্বের সামগ্রিক কাঠামোকে। পৃথিবীর বিভিন্ন ভাষায় বিভিন্ন চিহ্ন নানা বস্তুকে চিহ্নিত করে এবং দেখা যায় ভাষার বিবিধতার কারণে একই বস্তুকে চিহ্নিত করার জন্য আলাদা আলাদা ভাষায় আলাদা আলাদা চিহ্নের সাহায্য নেওয়া হচ্ছে। যেমন— ইংলিশ চ্যানেলের একপারে 'horse' বলতে যে জীববস্তুটিকে বোঝানো হয়, অপরপারে 'cheval' বলতেও সেই জীববস্তুটিকে অভিহিত করা হয়। তবে কি এই স্বাধিকার মানুষ লাভ করে যে, যখন যেভাবে মন চায়, তখন সেভাবে একই বস্তুকে সে নানা চিহ্নের দ্বারা বোঝাতে পারে? না, কোনো একটি ভাষার দীর্ঘ ইতিহাসের স্রোত ধরে যে Sign-টি যে-বস্তুকে নির্দিষ্ট রূপে চিহ্নিত করে, পরবর্তীকালে কম বেশি তাকেই মেনে নিতে হয়, চিহ্নের পরিবর্তন ব্যক্তি ঘটাতে

পারে না। আকরণবাদী মতবাদে ভাষার এই Signification বা চিহ্নায়নের ক্ষমতা বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ, তাই রোলা বার্থ বলছেন— এটি "*Probably the serious resort to the lexicon of signification.....look to see who uses signfier and signified, synchrony and diachrony, and you will know whether the structuralist view of things has taken shape.*"

ভাষার চিহ্নায়নের ক্ষমতাকে অনুধাবন করতে পারলে একথা জোর দিয়েই বলা যায়, ভাষার গতি-প্রকৃতি খামখেয়ালি-র মতো। কোনো দুটি ভাষায় একই নির্দিষ্ট বস্তুকে বোঝাবার জন্য এক চিহ্নকে ব্যবহার করা হয় না আর তাই ভাষাবিদ্ John Parsmore বলেন,— 'Language differ by differentiating differently.' পৃথিবীর নানান ভাষার তাই নানান ভাষিক কাঠামো দেখা যায়, এবং কোনোটি-ই কোনোটির থেকে উৎকৃষ্টতর বা অপকৃষ্টতর এমন মনে করার কোনো সম্ভাবনা নেই। আর এই ভাষিক কাঠামোতে চিহ্নের গুরুত্ব কতখানি তা বোঝাতে গিয়ে এডোয়ার্ড স্যাপির বলেন—

> If I wish to communicate an intelligible idea about a farmer, a duckling and the act of killing. There is no known language that can or does dodge it, anymore that it suceeds in saying something without the use of symbols for the concrete concepts.

সুতরাং, ভাষার কাঠামো ছাড়া মানুষের চিন্তার প্রকাশের কোনো উপায় থাকতনা। স্যসুরের মতামত তাই অনস্বীকার্য যে,

> Psychologically, setting aside its expression in words, our thought is simply a vague shapeless mass. Philosophers and linguists have always agreed that were it not for signs, we should be incapable of differentiating any two ideas in a clear and constant way. In itself thought is like a swirling cloud, where no shape is intrinsically determinate. No ideas are established in advance, and nothing is distinct, before the introducticn of linguistic structure.

স্যসুর-কথিত চিহ্ন বা 'Sign' যেহেতু — গ্রিক 'semeion' শব্দ থেকে উদ্ভূত, ফলে পরবর্তীকালে সেখান থেকে 'Semiotics' ও 'Semiology' নামে দুটি শব্দের উদ্ভব হতে দেখা যায়। প্রথমটির অর্থ করা যেতে পারে 'চিহ্নবিজ্ঞান' আর দ্বিতীয়টি 'চিহ্নতত্ত্ব'। প্রথমটি 'ক্রিয়াত্মক', আর দ্বিতীয়টি 'জ্ঞানাত্মক'। চিহ্নবিজ্ঞানের সাহায্যে পাঠক শব্দ থেকে (siginfier) চিহ্নায়কটিকে খুঁজে পাওয়ার বিশেষ কৌশলকে শেখে, আর চিহ্নতত্ত্ব এই কৌশলের তাত্ত্বিক দিকটাকে ব্যাখ্যা করে। এ প্রসঙ্গে স্যসুরের পরবর্তী ফরাসি রলাবার্থ, জোনাথন কালার ও স্প্যানিশ উমবের্তো একোর নাম উল্লেখ করতে হয়। চিহ্নায়ন ও পাঠকের সাথে সংযোগের পদ্ধতি সম্পর্কে চিহ্ন বিজ্ঞান প্রশ্নাতুর হয়। একো বলছেন, সংযোগ প্রক্রিয়ায় আছে বার্তার এক নির্ধারিত উৎসকেন্দ্র, বার্তার সঞ্চরণ ও নির্দিষ্ট পথে তার যাত্রা অর্থাৎ উদ্দিষ্ট গ্রাহক বা পাঠক বা শ্রোতা। কিন্তু চিহ্নায়ন ও সংযোগের তাৎপর্যবাহী গোটা প্রক্রিয়াটি তখনই সম্পন্ন হয়, যখন বক্তব্য বিষয়ের মধ্যে সংকেত গড়ে ওঠে। বার্তার আবেদন যদি একরৈখিক হয়, তবে চিহ্নায়ন সম্ভব নয় বাচনের মাত্রা যখন বিবিধ ও সাংকেতিক, কেবলমাত্র তখনই চিহ্নায়ন বিকশিত। সমস্যা হল উদ্দিষ্ট গ্রাহক সত্তার কাছে বার্তার আবেদনটির কোনো উপকরণটি গ্রহণযোগ্য হবে সে বিষয়ে ধন্দ থেকে যায়, এমনকি আদৌ গ্রাহক সংকেত বা চিহ্নের নিহিতার্থ সম্পর্কে

অবগত হলেন কিনা ও তাকে মান্য করলেন কিনা সে বিষয়েও নিঃসন্দিগ্ধ হওয়া যায়না। একো বলেন, চিহ্নবিজ্ঞানের কাজ এই সমস্ত সীমাবদ্ধতাকে ভুলে গিয়ে প্রতিটি চিহ্নের ক্রিয়াকে নিয়ম নির্দিষ্ট পথে ব্যাখ্যা করা এবং গোটা চিহ্নায়ন বা সংকেত-কে সংহত করে স্পষ্ট করার জন্য চিহ্নায়নের প্রতিটি উপাদানকে অন্যোন্য সম্পৃক্ত সম্পর্কে আবদ্ধ করা। অতএব চিহ্নবিজ্ঞানের প্রধান উপপাদ্য হল— সংকেতের সংহত ব্যাখ্যা ও চিহ্নের কার্যকরী হওয়ার ও উৎপত্তি পদ্ধতির ব্যাখ্যা। এ বিষয়ে একোর বক্তব্য—

> In principle, a semiotics of signification entails a theory of codes, while a semiotics of commumication entails a theory of sign production. The distinction between theory of codes and a theory of signproduction does not corresspond to the ones between langue and parole, competence and performance, syntactics (and semantics) and pragmatics.

একথা পূর্বেই উল্লেখ করা হয়েছে যে স্যসুরের গ্রন্থের কোথাও 'Structure' শব্দটা ব্যবহৃত না হলেও আকরণবাদ 'structuralism' নামেই সমধিক পরিচিত। ১৯২৮ সালে হ'গে আয়োজিত ভাষাবিদ্দের সম্মেলনে প্রথম 'structure' শব্দটিকে ব্যবহার করেন তিন রাশিয়ান ভাষাবিদ্— রোমান য়্যাকব্সন, এস. কারসেভস্কি ও এন. ট্রাউবেৎসকয়। এই ত্রয়ী ভাষাবিজ্ঞানীরাই তাদের কর্মক্ষেত্র রূপে বেছে নিয়েছিলেন রাশিয়ার বাইরে, প্রাগ শহরকে। ১৯২৯ সালে এই প্রাগ ভাষাবিজ্ঞানীদের যে গবেষণাপত্রটি প্রকাশিত হয়, তার নাম 'Problems of method stemming from the conception of language as a system.' গবেষণাপত্রে তারা গুরুত্ব দেন চিহ্ন বা শব্দার্থতত্ত্বকে নয়, ভাষার ধ্বনিগত কাঠামোকে (phonetic or phonological system of language) এবং যে পথকে তারা ধ্বনিকাঠামোকে বোঝার জন্য বেছে নিল, তা হল 'characterize the phonological system be necessarily specifying the relations existing between the phonemes, that is, by tracing the plan of the structure of the language under consideration.' স্যসুর বুঝেছিলেন ভাষার ধ্বনিতাত্ত্বিক পাঠ দুরকম ভাবে সংগঠিত হতে পারে। ক. ধ্বনির উৎপাদন প্রক্রিয়ার পাঠ, খ. ধ্বনি কিভাবে গৃহীত হচ্ছে, তার পাঠ। বস্তুত ধ্বনির চর্চা বা আলোচনা শারীরবিদ্যায় করা হয়, কারণ বক্তার বাক্‌যন্ত্র কিভাবে ধ্বনি সৃষ্টিতে সক্ষম হয়, সেখানে সেটি গুরুত্ব পায়। কিন্তু ভাষাবিদ্দের কাছে ধ্বনির সৃষ্টির থেকে ধ্বনির বিস্তারের বা সঞ্চরণের প্রকৃতি অর্থাৎ কিভাবে ধ্বনি বা কর্ণেন্দ্রিয়কে এসে আঘাত করছে ও শ্রোতার দ্বারা গৃহীত হচ্ছে, সেই অংশটি বেশি আকর্ষণীয় হয়ে ওঠে।

যে-সব উপাদানের ওপর ভর করে ভাষার ধ্বনিগত কাঠামো রূপ পায় তাকে বলে ফোনিম। যেটি যে-কোনো ভাষার যে-কোনো ধ্বনির সবচেয়ে ক্ষুদ্র একক। এই এককটির বা ফোনিমের ধ্বনিগত পার্থক্যের কারণেই শব্দের ভিন্নতা তৈরি হয়। যেমন ইংরেজিতে 'P' ও 'b' দুটি আলাদা ফোনিম, কারণ, 'pill' ও 'bill' দুটি স্বতন্ত্র শব্দ। একই ভাবে 'i' ও 'u' দুটি আলাদা ফোনিম কারণ 'pill' আর 'pull' দুটি আলাদা শব্দ। আবার 'l' ও 't'-ও দুটি ফোনিম কারণ 'pill' ও 'pit'— পৃথক শব্দ। সুতরাং, শব্দের ধ্বনিসজ্জায় ফোনিমের বদলের কারণে যখন পরিবর্তন আসে তখন তা একটি অন্য শব্দে পরিণত হয়। Phonology বা ধ্বনিতত্ত্বকে যদি শব্দার্থতত্ত্বের সাথে যুক্ত করি, তবে এভাবে বলা যাবে কোনো চিহ্নের অপর চিহ্নে পরিবর্তিত হওয়ার সময় তার যে ধ্বনিগত বদল ঘটে, phonology তাকে নিয়েই

আলোচনা করে। লক্ষণীয় যে, ধ্বনির এই বদলটা কেবলমাত্র আওয়াজের বদল নয়, ধ্বনির পরিবর্তন আসলে উপলব্ধির পরিবর্তন। কারণ চিহ্নায়ন প্রক্রিয়াকে উপলব্ধি করতে হয়, আর— উপলব্ধির হেরফের ঘটে ধ্বনির তারতম্যে। বিভিন্ন ভাষায় ফোনিমের সংখ্যা বেশ কিছু ও এক ভাষার ফোনিমরা অপর ভাষার ফোনিম থেকে স্বতন্ত্র। যেমন য়্যাকবসন দৃষ্টান্ত দেন, ইংরেজিতে 'r' ও 'l' দুটি আলাদা ফোনিম কারণ 'rash' ও 'lash' দুটি আলাদা শব্দ, কিন্তু কোরিয়ান ভাষায় তা নয়, এবং কোরিয়ানরা সহজেই 'r' ও 'l'-কে পরস্পরের বিকল্প রূপে প্রয়োগ করতে পারে, কারণ সেই প্রয়োগে তাদের উপলব্ধির কিছু তারতম্য হয় না। প্রাগে গড়ে ওঠা ধ্বনিতাত্ত্বিক আকরণবাদ তার সূচনার সময় পৃথিবীর সমস্ত ধ্বনিগত তথ্যকে একত্রিত করে একটি সাধারণ ধ্বনি প্রকল্প তৈরি করতে চেয়েছিল, যা পৃথিবীর যে-কোনো ভাষার ওপরই প্রযোজ্য হবে। কিন্তু তাদের এই প্রয়াস সফল হল না, যদিও তাদের সদিচ্ছার অভাব ছিল না। তাই ট্রাউবেৎসকয় বলছেন : "A phonological system is not the mechanical sum of isolated phonemes, but an organic whole whose members are phonemes and whose structure is subject to laws."

কিন্তু প্রাগ ভাষাবিদ্‌রা ফোনিমগুলিকে নিয়মনির্দিষ্ট ও অর্থভিত্তিক পথে পরস্পরের সঙ্গে যুক্ত করতে পারেননি। স্যসুর ফোনিমের বৈশিষ্ট্য আলোচনা করতে গিয়ে তাদের 'Oppositive' বা স্বাতন্ত্র্যধর্মী প্রবণতাকে গুরুত্ব দিয়েছেন, কিন্তু ব্যাখ্যা করতে পারেননি কিভাবে তারা পরস্পরের প্রতিদ্বন্দ্বিতা করছে। ফোনিমের পাস্পরিক সম্পর্ক বিশ্লেষণযোগ্য, স্যাপির এদেরকে 'Symbolic atoms' বলে মনে করলেও আদতে তারা অদৃশ্য অনু-পরমানুর মতো নয়। ১৯৩০ সালে য়্যাকবসন তাদের কতগুলি বৈশিষ্ট্যে শ্রেণীবদ্ধ করেন, যেমন তারা বিশিষ্ট স্বরবিশিষ্ট অর্থাৎ 'Voiced' বা 'Unvoiced', কিনা অথবা 'nasalized' বা 'not nasalized'। উদাহরণস্বরূপ বলা যায়, ইংরেজি 'b' ও 'p' ফোনিমদুটির পার্থক্য কোনো বিশেষ স্বরের উপস্থিতি বা অনুপস্থিতির ওপর নির্ভর করে বা ইংরেজির 'd' ও 't' ফোনিমের ভেদ-ও সেইরূপ। প্রশ্ন উঠতেই পারে, বিশেষ স্বরের উপস্থিতি বা অনুপস্থিতির কারণে 'b' ও 'p' এবং 'd' ও 't'-র যে সামান্য পার্থক্য ঘটছে, তা কি কোনো মূল ফোনিমের খানিক রূপান্তরিত প্রকাশ বা 'version' ? উত্তরে বলা যায় তারা কোনো মূল ফোনিমের প্রতিসরিত রূপ নয়। তারা কোনো সম্পর্কের দুটি পদ-প্রান্ত। সুতরাং ধ্বনিনির্ভর আকরণবাদে বিরোধী ফোনিমযুগল আলোচনার কেন্দ্রীয় বিষয় হয়ে দাঁড়াল; তাই য়্যাকবসন দাবি করলেন, "The oppositions of such differential qualities are real binary oppositions as defined in logic, i. e. they are such that each of the terms of the opposition necessarily implies its opposite."

আকরণবাদী মতবাদের অভিনবত্ব যে সে তার প্রয়োগকে ভাষিক বৃত্তের বাইরেও প্রতিষ্ঠা করতে সমর্থ হয়েছিল। আকরণবাদের উত্থানের ফলে গবেষকরা ঐতিহাসিক ঘটনা-সালিতামামি থেকে দৃষ্টি সরিয়ে মানুষের ক্রিয়া-প্রতিক্রিয়াকে বিশেষ গুরুত্ব সহকারে পর্যবেক্ষণ করতে শুরু করে। ফলে এক্ষেত্রে বিস্তৃত সামাজিক ক্ষেত্র যে-কোনো গবেষণার কেন্দ্র হয়ে উঠল, পাশাপাশি সমাজবাসী, সমাজে প্রচলিত সংস্কৃতি প্রথা-সংস্কারের ধাঁচা টুকুও গুরুত্ব সহকারে বিবেচিত হল। তাই দেখা যায়, সমাজতাত্ত্বিক পিয়েরবোর্দে, নৃতাত্ত্বিক ক্লদ-লেভি-স্ত্রোস, মনোবৈজ্ঞানিক লাকা, প্রভৃতিরা নিজস্ব ক্ষেত্রে উত্তরকালে আকরণবাদের প্রয়োগ দক্ষতার সঙ্গে সম্ভব করছেন। এদের মধ্যে সবচেয়ে উল্লেখযোগ্য ব্যক্তি হলেন ক্লদ লেভি-স্ত্রোস।

সাধারণভাবে কোনো অচেনা মানব সমাজকে চিনতে হলে নৃ-বিজ্ঞানী বা সমাজবিদ্ যে ভাবে সামাজিক বা সাংস্কৃতিক উপকরণকে আলোচ্য বিষয়রূপে গ্রহণ করেন, আকরণবাদেও তেমনই উপকরণে সমন্বিত কাঠামো-ই উপজীব্য বিষয়। কোনো মানবসমাজ সম্পূর্ণ রূপে চেনা বা অচেনা থাকে না, কারণ সেই মানব সমাজটির সাথে গবেষকের নিজের সমাজের বৈশিষ্ট্যের অভিজ্ঞতাগুলির কোথাও অমিল থাকে, কোথাও বা মিল থাকে। মিল থাকেই কারণ দুটি-ই মানব সমাজ, মনুষ্যেতর প্রাণী বা ডাইনোসরের সমাজ নয়। বিশেষত যে-কোনো সমাজই সময়ের সাথে সঙ্গতি রেখে বিবর্তিত হয়, ফলে সমকালীনত্ব সমাজের একটা অপরিহার্য বৈশিষ্ট্য ও সেই সমাজের পাঠ চলা উচিত সমকালে তার বাহ্যিক গঠনকে নজর করেই।। স্মর্তব্য স্যসুরও ঠিক একই ভাবে ভাষার ইতিহাস নয়, তার সমকালীন ও আপাত আপেক্ষিক অবস্থানকে বিশ্লেষণ করতে চেয়েছিলেন। তবে কি নৃতাত্ত্বিকের কাছে পূর্ববর্তী ইতিহাসের কোনোই মূল্য নেই? উত্তরে বলা যেতে পারে ঐতিহাসিক ঘটনা বা সিদ্ধান্তের মূল্য সেখানেই, যেখানে মানুষ সেগুলিকে অনুধাবন করে তার থেকে অভিজ্ঞতা সংগ্রহ করে, বর্তমানে তার করণীয় ভূমিকা স্থির করে নেবে। এটুকুই ইতিহাসের মূল্য। এর বাইরে নৃতত্ত্বের আলোচনা কেন্দ্রিত হবে এককালিক প্রেক্ষাপটের উপরেই। বিশেষত যে পর্যায়ে আকরণবাদ ও সমাজ-নৃতত্ত্ব (Social-Anthropology) সমগোত্রীয় হয়ে পড়ে, তখন তারা উভয়েই এক নির্বস্তুক বা 'absract' কাঠামোকে স্বীকৃতি দেয়। যেহেতু সামাজিক কাঠামো বা 'Social Structure'-এর নথিবদ্ধ প্রমাণ নেই ফলে সামাজিক কাঠামোকে অযৌক্তিক ও কাল্পনিক সন্দেহে নস্যাৎ করার প্রবণতা থাকতেই পারে। কিন্তু একথা অনস্বীকার্য, কোনো মানুষ সামাজিক কাঠামোর ধারণাকে তখন-ই নস্যাৎ করতে চায়, যখন সে নিজে সমাজের প্রথা-সংস্কার-সংস্কৃতি-রীতি-নীতি-আইন-বিধির সঙ্গে নিজেকে জড়াতে চায় না। সুতরাং, সামাজিক কাঠামোর একটা বিমূর্ত রূপ যে-কোনো সমাজেই বর্তমান। মানুষ তাকে স্বীকৃতি দিলেও আছে, না দিলেও আছে। ১৯৪০ সালে লেভিস্ত্রোসের দ্বারা সমাজ-নৃতত্ত্বে আকরণবাদের প্রয়োগের ফলে ইন্দো-ইউরোপীয় নৃতাত্ত্বিকদের সঙ্গে তাঁর একটা বিরোধ গড়ে ওঠে। তাঁরা যেখানে ইতিহাসজাত অভিজ্ঞতার ওপর নির্ভর করে বিভিন্ন মানবসমাজের রীতিনীতির তুলনাত্মক বিশ্লেষণে প্রয়োজনীয় ভিন্নমুখী তথ্যগুলিকে পুঞ্জীভূত করতেন, সেখানে লেভিস্ত্রোস আদর্শগতভাবে একই রকমের তথ্যরাজিকে ব্যবহার করতে চান, কারণ তা বিবিধ সমাজ সংস্কৃতির ভেদ নয়, মৌলিক সমধর্মিতার সাধারণ কাঠামোকে প্রকাশ করবে। মনে পড়ে প্রাগ ভাষাবিদ্‌রা যেমন প্রতিদ্বন্দ্বী ফোনিমযুগলের নিহিত সম্পর্ককে আবিষ্কার করে ভাষার ধ্বনিগত সাধারণ কাঠামোটাকে উদ্ধার করতে চান, লেভিস্ত্রোসও একই রকম ভাবে বিপরীত সমাজসংস্কৃতির মাঝের সাধারণ সম্পর্ক সূত্রকে উন্মোচিত করতে সচেষ্ট এবং তার প্রমাণ হল, য়্যাকবসনের ফোনিম-সম্পর্কিত বক্তব্য শুনে লেভিস্ত্রোস নিজে বলেছিলেন— "What I was to learn from structural linguistics was.....that instead of losing one's way among the multitude of different terms the important thing is to consider the simpler and more intelligible relations by which they are interconnected." সেই অন্তর্নিহিত সম্পর্ককে আবিষ্কার করতে গিয়ে লেভিস্ত্রোস সমাজে প্রচলিত মিথ-আচার-জ্ঞাতিসম্পর্ক বৈবাহিক প্রথা-খাদ্যগ্রহণপ্রথা-বিনোদন ইত্যাদিকে বিশ্লেষণ করতে অগ্রসর হন। ভাষায় যেমন চিহ্নায়ন প্রক্রিয়া স্থান পেয়েছিল লেভিস্ত্রোস তেমনই মিথ-আচারকে মনে করলেন চিহ্ন স্বরূপ। লেভিস্ত্রোসের কার্যপদ্ধতিকে ত্রয়ী তত্ত্বের আধারে শ্রেণীকরণ করা যেতে পারে। ক. 'Alliance theory' বা মৈত্রীতত্ত্ব,

খ. 'Human mental Processes' এবং গ. 'Structural analysis of Myth'। মৈত্রীতত্ত্ব বিশেষভাবে গুরুত্ব দেয় বৈবাহিক সম্পর্ককে— যা পৃথিবীর যে-কোনো মানবসমাজের মধ্যেই স্থাপিত হয়। বৈবাহিক সম্পর্কের কারণেই বিচ্ছিন্ন মানুষরা সংহত হয়, সেই উপলক্ষে উপহার দান-গ্রহণের যে প্রথা চলে তা সমাজকে একতা দেয়। যেহেতু পৃথিবীর যে-কোনো মানবসমাজেই বিবাহ্ প্রথা— বিবাহকে ঘিরে যৌন সম্পর্ক স্থাপনের সুযোগ ও বংশধর আসার সম্ভাবনা— এই ভাবনাগুলি এক সূত্রে গ্রথিত, ফলে সব মানবসমাজেই আসলে সামাজিক রীতি নীতি প্রবর্তনের পেছনে একই ভাবনার কাঠামো (mental process) কাজ করেছে। সেই ভাবনার কাঠামো থেকেই পৃথিবীর সব মানবসমাজে জন্ম নিচ্ছে myth বা পুরাণ বা লোককাহিনী। পৃথিবী জুড়ে প্রচলিত কাহিনীগুলির দুটি স্তরকে লেভিস্ত্রোস নির্দেশ করেন— ক. কাহিনী বা myth-এর surface structure ও খ. Myth-এর deep structure। Myth-এর surface structure বা অধিগঠনে থাকে কোনো narrative বা আখ্যান, আর deep sructure বা অধোগঠনে গুপ্ত থাকে মানব সমাজের পেশা-অভ্যাস-রুচি-পছন্দ-জীবনযাত্রার উপকরণ কীভাবে একটা অন্তর্গত সম্পর্কবদ্ধ কাহিনীর জন্ম দিচ্ছে, সেই পদ্ধতিটি। যেমন সাধারণভাবে বলতে গেলে হিন্দুপুরাণ রামায়ণের মিথ্ গড়ে উঠেছে রাম-রাবণের যুদ্ধকে কেন্দ্র করে। বাইরের আখ্যানে এসেছে রাবণ কর্তৃক সীতার হরণ, রামের সেতুবন্ধন ইত্যাদি নানান আখ্যানভাগ আর অধোগঠনে আসলে তা হয়ে দাঁড়িয়েছে কর্ষণজীবী ও অ-কর্ষণজীবী— দুই বিপরীতধর্মী সংস্কৃতির লড়াই। তাই লেভিস্ত্রোস বলছেন 'deep structure' বিশ্লেষণ করলে অবশ্যম্ভাবী রূপে বেশ কিছু বিপরীতধর্মী উপাদান বা 'binary opposition ধরা পড়বে। ঠিক যেমন ভাবে ফোনিমের বৈপরীত্য ভিন্নতর Sign বা চিহ্নের জন্ম দেয়, একই রকম ভাবে myth-এর অন্তর্গত বিপরীতধর্মী উপাদানের ক্রিয়াশীলতার কারণে myth-এর ভিন্নতার আবেদন তৈরি হয় ও একটা মধ্যস্থতাকারী সমাধান সম্পর্কও প্রয়োজন হয়ে পড়ে। যেমন ইংরেজি সাহিত্যে 'Sleeping Beanty'-র গল্পে দেখা যায়, ভবিষ্যৎবাণী হল যে 'Sleeping Beanty' তার পনেরো বছরের জন্মদিনে মারা যাবে। জীবন মৃত্যু যদি দুটি পরস্পর বিরোধী উপাদান হয়ে থাকে তবে এ গল্পের মূল নিয়ন্ত্রক শক্তি তথা binary opposition হল জীবনের ও মৃত্যুর লড়াই। আর এই বিপরীতধর্মী দ্বন্দ্বের সমাদানসূত্রটা কি? না, 'Sleepimg Beanty'-র মৃত্যুকে পরিণত করা হল একশো বছরের নিদ্রায়। বিপরীতধর্মী উপাদান ও তাদের মধ্যে মধ্যস্থতাকারী এক সমাধানসূত্র তৈরি হল এদের মাধ্যমে myth-এর অধোগঠনের যে রূপটি প্রকাশ পেল— তা হল পৃথিবীর যে-কোনো মানসমাজেই নিদ্রা ও মৃত্যু প্রায় সমধর্মী এবং যে-কোনো সমাজের মানুষই যেন তেন প্রকারে মৃত্যুকে এড়িয়ে যেতে আগ্রহী। তাই পৃথিবীর যে-কোনো সমাজেই 'Sleeping Beauty'-র মতন গল্প প্রচলিত। (রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের 'নিদ্রিতা' বা 'সুপ্তোত্থিতা' কবিতাগুলি এ-প্রসঙ্গে স্মরণীয়) যাই হোক নৃতত্ত্ব বিষয়ে লেভিস্ত্রোসের আকরণবাদী চিন্তাধারা আরও সুদূর প্রসারী, এখানে শুধুমাত্র আকরণবাদী ভাবনার সাথে নৃতত্ত্বের সংযোগ সূত্রটিকে আলোকিত করার চেষ্টা করা হল।

আকরণবাদের উৎপত্তি ও প্রসারের পাশাপাশি সময়ের সঙ্গে সঙ্গে আকরণবাদের পরিবর্তন হতে শুরু করে ও উত্তর-আকরণবাদী চিন্তা তার প্রবাহের খাতকে ভিন্নতর ভাবে সৃজন করে। বিশেষত উত্তর-আকরণবাদী চিন্তায় দর্শনগত ভাবনা বিশেষ কার্যকর হয়ে উঠতে থাকে। স্যসুর কৌতূহলী ছিলেন কোনো একটি লিখিত বাচনের চিহ্নায়িত বা অর্থবহ হয়ে ওটার পদ্ধতির

প্রতি, সেখানে চিহ্নায়িত বা অন্বিষ্ট তাৎপর্য অনেকাংশেই তার গুরুত্ব হারায়। দেরিদা লক্ষ করেন লিখিত বাচনের চেয়ে কথিত বাচন অনেকবেশি গুরুত্বপূর্ণ'। যে-কোনো কথন কোনো একজন কথকের উপস্থিতিকে স্বীকার করে। এই যে কোনো এক কথকের উপস্থিতি তা প্রমাণ করে সত্তার অস্তিত্বকে (সত্তার অস্তিত্ব বা 'idea of being or presene' -এর ধারনাটি যে-কোনো পাশ্চাত্য দার্শনিক, প্লেটো থেকে শুরু করে দেকার্ত পর্যন্ত, দ্বারা স্বীকৃত) সত্তার উপস্থিতি থেকে কথনের যে জন্ম-প্রক্রিয়া, দেরিদা একেই বলেন বাক্-কেন্দ্রিকতা বা 'Logocentrism'। কথক যেহেতু তার অভিপ্রেত অর্থকে নিশ্চিতরূপে প্রকাশ করতে পারে তাই সে হল কেন্দ্র বা Center। (মনে আনতে পারি, যে পূর্বেই বলা হয়েছে স্যসুর প্রস্তাবিত চিহ্নায়ন প্রক্রিয়া কতদূর গ্রাহকসত্তার কাছে গ্রাহ্য হবে, সে বিষয়ে একটা ধন্ধ ছিল) বিশেষত আকরণবাদ যে-কোনো Text বা পাঠের সাধারণ কাঠামো উদ্ধার করতে চেয়েছে, যাতে সে প্রমাণ করতে পারে, যে, গোটা পাঠকৃতিতে বিভিন্ন 'parallels', 'echoes', 'reflections' থাকুক না কেন, আসলে 'the text knows what it wants to do and has directed all its means towards this end. By contrast, the deconstructionist aims to show that the text is at war with itseif : it is a house divided, and disunified.' বিনির্মাণপন্থা তাই পাঠকৃতিতে সামগ্রিকতা নয়, বিচ্ছিন্নতার প্রসঙ্গগুলিকে বেশি গুরুত্ব দিল। আকরণবাদের বক্তব্যকে ছাপিয়ে আরো অগ্রসর হওয়ার ফলে উত্তরকালে তাই পাওয়া গেল দেরিদার বিনির্মাণতত্ত্ব বা deconstruction, বা উত্তরকালে দেখা গেল কি ভাবে থিওডোর আডোর্নো রাজনৈতিক চিন্তাভাবনার সঙ্গে আকরণবাদকে, আলতুস্যের মার্কসবাদের সঙ্গে আকরণবাদকে, লাকাঁ মনোবিজ্ঞানের সঙ্গে আকরণবাদকে সমন্বিত করে ফেলছেন। এত তত্ত্ব, দর্শন, মতবাদের উপস্থাপনার পর ও মনে খানিকটা সংশয় থেকেই যায়, আকরণবাদ যে আকরণগত কাঠামোকে গুরুত্ব দেয়, সমাজ মনোবিজ্ঞান নৃতত্ত্ব তো দূরস্থান, ভাষা-তেই কি এধরণের কোনো বিমূর্ত কাঠামোর অস্তিত্ব আদৌ আছে? উত্তর এভাবে দেওয়া যায়— "Mary has lived in Princeton." এই বর্ণনাত্মক বা নির্দেশাত্মক বাক্যের প্রশ্নবোধক রূপটা হল— "Has Mary lived in Princeton?" কেবলমাত্র 'Mary' এই 'Noun Phrase' টি ও 'Has'–Auxiliary element'-এর পারস্পরিক স্থান পরিবর্তনের ফলে বাক্যটির ভাষিক রূপান্তর সম্ভব হল। প্রশ্ন— কোনো মানুষের ভাষাই কি এধরনের স্বতশ্চল রূপান্তরকে মেনে নিতে পারে যদি তা কোনো একটা নির্দিষ্ট কাঠামো অনুসরণ করে অগ্রসর না হয়?

স্ট্রাকচারাল ইজম
●
পোস্ট-স্ট্রাকচারালইজম
রাতের সব তারাই আছে দিনের আলোর গভীরে

অচ্যুত মণ্ডল

এই আলোচনা 'আধুনিক' পাঠককেও বিব্রত করতে পারে অনায়াসেই সেকথা মনে রেখেই এই প্রশ্নটি তোলা যায় যে, আধুনিক পাশ্চাত্য দর্শনের দিগন্ত থেকে প্রায় মুছে-যাওয়া তারাটির ক্ষীণ আলো দূর বাংলার গ্রামে-গঞ্জে কোথায় কীভাবে কখন কার লেখার টেবিল থেকে নজরে পড়েছিল বা কলমে প্রতিফলিত হয়েছিল, সে-আলোচনা আজকের 'উত্তর-আধুনিক' চিন্তার প্রবল সূর্যালোকে কতটা প্রাসঙ্গিক বা আদৌ প্রাসঙ্গিক কিনা। একটি বহুল পরিচিত পঙ্‌ক্তি উদ্ধার করেই চেষ্টা করব এই সংশয় নিরসনের :

রাতের সব তারাই আছে দিনের আলোর গভীরে।

প্রথমেই বলে নেওয়া উচিত যে 'উত্তর-আধুনিকতা' বা Post-Modernism শব্দটিকে সাহিত্য, আচরণ, জীবন-প্রণালী এমনকী পোশাক-পরিচ্ছদ সম্পর্কে হয়তো যথেচ্ছ-ভাবে ব্যবহার করা সাম্প্রতিক সমালোচনার অভ্যাসে পরিণত হয়ে গেছে, কিন্তু আধুনিক দর্শন বা অনাধুনিক দর্শন বলতে কোনো বিশেষ দার্শনিক পদ্ধতি বা গোষ্ঠীকে বোঝায় না। ফলে 'উত্তর-আধুনিক' বা 'আধুনিকোত্তর' দর্শন একটি অর্থহীন শব্দ প্রয়োগ মাত্র। এই বিশেষ অভিধাটির পেছনে অবশ্য আরও একটি গূঢ় অভিসন্ধির সন্ধান পাওয়াও অসম্ভব নয়। এই অভিধায় পাশ্চাত্য দর্শনের জটিল ও বিচিত্র ধারাগুলিকে সরলীকৃত করে একটি বিশেষ প্রবণতারই বিভিন্ন আকার বলে ধরে নেওয়া হয় ; ফলে পরবর্তী তথাকথিত 'উত্তর-আধুনিক' দর্শনটিকে, পূর্ববর্তী সমস্ত দার্শনিক চিন্তা ও প্রয়োগের বিরোধী এক সম্পূর্ণ নতুন ধারা হিসেবে প্রতিষ্ঠা করা সহজ হয়ে পড়ে। কিন্তু এই সূক্ষ্ম চাতুর্য মেনে নেওয়া অসম্ভব, কেননা নবগঠিত এই দর্শনটিও পূর্ববর্তী দার্শনিক চিন্তা ও প্রয়োগের আধারেই নির্মিত বলে আমাদের বিশ্বাস এবং এ-সম্পর্কিত আলোচনা সেই বিশ্বাসের ব্যাখ্যা ও বিশ্লেষণ ছাড়া কিছুই নয়। 'Post-Modernism'-অভিধাটি তাঁর সম্পাদিত সংকলন গ্রন্থের নামাঙ্কনে ব্যবহার করেও অধ্যাপক লরেন্স কাহুন বইটির ভূমিকায়, প্রায় স্বীকার করেই নিয়েছেন :

> The new philosophers of the 1960s accepted structuralism's refusal to

worship at the alter of the self. But they rejected its scientific pretensions. They saw deep self-reflexive problems in the attempt by human beings to be 'objective' about themselves. They applied the structural cultural analysis of human phenomena to the human sciences themselves, which are, after all, human cultural constructions. Hence they are best named 'poststructuralists'. The import of their work appeared radical indeed. They seemed to announce the end of rational inquiry into truth, the illusory nature of any unified self; the impossibility of clear and unequivocal institutions." pages 5-6, *From Modernism to Post-modernism : An anthology.* [Edited by Lawrence Cahoone]

উপরিউক্ত উদ্ধৃতিটি শুধু আলোচ্য দর্শনটির শ্রেষ্ঠ নাম বেছে নেওয়ার ক্ষেত্রেই জরুরি নয়—কয়েকটি বাক্যের সংক্ষিপ্ত পরিসরে এখানে Structuralist এবং Post Structuralist দর্শনের মূল বক্তব্য যেভাবে প্রাঞ্জল ভাষায় উপস্থিত করা হয়েছে তা সাম্প্রতিক বাংলা আলোচনায় তো বটেই, পশ্চিমি প্রথাগত দর্শনের ঐতিহাসিক গ্রন্থেও দুর্লভ। সাম্প্রতিক বাঙালি আলোচকদের রচনা পড়লে Structuralist বা Post Structuralist দর্শনের মূল বক্তব্যটি সম্পর্কে কোনো স্পষ্ট ধারণা করা প্রায়শই অসাধ্য হয়ে পড়ে। মনে হয় কোনো স্পষ্ট দর্শন না হয়ে সাম্প্রতিক পাশ্চাত্য চিন্তাদুটি, বাঙালি বুদ্ধিজীবীর কাছে শুধুমাত্র সাংস্কৃতিক নৃতত্ত্ব, ভাষা ও সাহিত্যের ক্ষেত্রে বিশ্লেষণপদ্ধতি হিসেবেই প্রতিভাত হয়েছে। অবশ্য একই অভিযোগে অভিযুক্ত করা যায় দর্শনের ঐতিহাসিক Copleston-কেও। তিনিও এই নতুন চিন্তায় নয়া প্রকৃতিবাদী বিশ্লেষণভঙ্গি ছাড়া আর কিছুই খুঁজে পাননি—"One can justifiably speak of a current of thought which differs from both Existentialism and Marxism and which can perhaps be described as a new naturalism, based on reflection in the field of social and cultural anthropology." কিন্তু সামাজিক ও সাংস্কৃতিক নৃতত্ত্বের মাধ্যমেই ক্লোদ লেভি স্ত্রাউসের রচনা একটি দার্শনিক দৃষ্টিভঙ্গি সৃষ্টি করতে সক্ষম হয়েছিল তাতে সন্দেহ নেই। Post-Structuralist দর্শন যেহেতু Structuralism-এর হাত ধরেই পাশ্চাত্য বৌদ্ধিক জগতে প্রবেশ করেছে তাই Structuralism-এর মূল ধারণাটি উপলব্ধি না করে সে-বিষয়ে কোনও আলোচনাই সম্ভব নয়। মূলত অস্তিবাদী দর্শনের ফরাসি প্রবক্তাদের বিরোধিতা করেই Structuralism-এর সূত্রপাত হয়। অধ্যাপক তপোধীর ভট্টাচার্য Structuralism-এর বাংলা করেছেন 'আকরণবাদ'। Structuralism-এর এই বাংলা পরিভাষাটি কতটা সঠিক সেই বিতণ্ডায় না গিয়ে ইংরেজি অভিধাটির আধারেই আমরা বিষয়টি বুঝতে চাইব।

অস্তিবাদের ব্যক্তিসত্তার মাধ্যমে নিজস্ব অভিজ্ঞতায় জগৎকে বুঝতে চাওয়ার চেষ্টাকে, অবৈজ্ঞানিক মনে করেছেন লেভি—স্ত্রাউস "As for the trend of thought which was to find fulfilment in existentialism, it seemed to me to be the exact opposite of true thought, by reason of its indulgent attitude towards the illusion of subjectivity. To promote private preoccupations to the rank of Philosoplical problems is dangerous and may end in a kind of shop girl's philosophy—excusable as an element in teaching procedure, but perilous in the extreme if it leads the philosopher to turn back on his mission." (page-62 Tristes

Tropiques— Claude Levi-Strauss) ব্যক্তিগত সুখ, দুঃখ, বেদনা, আকাঙ্ক্ষার সংমিশ্রণে দোকানি মেয়েটির তুচ্ছ চিন্তা যে দর্শনের বিষয় বা প্রতিপাদ্য হতে পারে, তা স্ত্রাউসপন্থীদের বোঝানোর ব্যর্থ চেষ্টা না করে বরং কুন্দেরার *Unberable Lightness of Being* উপন্যাসটি পাঠ করার পরামর্শ দেওয়াই উচিত। তবে লেভি স্ত্রাউসের দর্শনটি একদিকে যেমন আদিম সমাজজীবনের বা গোষ্ঠী অনুভবের তুচ্ছাতিতুচ্ছ আচরণ ও ক্রিয়াকর্মের মূল্যায়নে নিবিষ্ট, অন্যদিকে তুচ্ছের প্রতি তাঁর অনাস্থাও লক্ষ করার মতো। আসলে সমাজ বা গোষ্ঠী-জীবন তাঁর চর্চার উপলক্ষমাত্র। উদ্দেশ্যটি বোধহয় নিহিত নিয়মগুলির উপলব্ধি এবং বিন্যাসকরণ। আদিম সমাজের অসংখ্য তথ্য কমপিউটারের মতো এক গাণিতিক চেতনায় বিশ্লেষণ করে আরোহী পদ্ধতিতে তিনি পৌঁছতে চেয়েছেন কতকগুলি সাধারণ সমীকরণে। অধ্যাপক তপোধীর ভট্টাচার্য 'আকরণবাদ' বা Structuralism-এর আলোচনা প্রসঙ্গে যথার্থই লিখেছেন—"ভাষা ও সামাজিক কাঠামোর দ্বারা নির্ধারিত হয় ঐ অন্তর্বস্তু এবং ফলে আকরণবাদের সঙ্গে দার্শনিক নিয়ন্ত্রণবাদের একটি গোপন সম্পর্কও তৈরি হয়ে যায়।" (পৃষ্ঠা-২৬, *প্রতীচ্যের সাহিত্যতত্ত্ব*) অধ্যাপক ভট্টাচার্যের সঙ্গে আমরা একমত কিন্তু নিয়ন্ত্রণবাদ ও তথাকথিত 'আকরণবাদ'-এর গোপন সমঝোতাটি আদৌ গোপন নেই। পাশ্চাত্য সমালোচকরা বহু আগেই তা আমাদের গোচরে এনেছেন— "With seeming randomness, Levi-Strauss wove an intricate tapestry out of shreds of myths. One day when the fundamental structural elements of all myths were known, the scientist would have in his computer nothig less than the human mind, the fixed atemporal structure of human consciousness." (page 311, Mark Poster, *Existential Marxism in Post-war France : From Sartre to Althusser*, 1975) সামাজিক নৃতত্ত্বের ক্ষেত্রে স্ত্রাউস যেমন মানুষের স্বাধীনতার উপরে নিহিত নিয়মগুলিকে স্থান দিয়েছেন, সোস্যুর বা বার্থ তেমনই, ভাষার নিহিত নিয়মের অধীন বলে মনে করেছেন লেখককে। ফলে সমাজজীবনে ব্যক্তিমানুষের এবং সাহিত্যে লেখকের অবলুপ্তি, এঁদের রচনায় অবশ্যম্ভাবী পরিণাম হয়ে উঠেছে। ব্যক্তির স্বাধীনতার বিরুদ্ধে, নৃতাত্ত্বিক বা ভাষাতাত্ত্বিক নিহিত নিয়মগুলির সন্ধান— সংক্ষেপে এই হল অস্তিবাদী দর্শনের বিরুদ্ধে স্ট্রাকচারালিজমের প্রতিক্রিয়া। কিন্তু এই প্রতিক্রিয়াও তো অস্তিবাদ-পূর্ববর্তী পাশ্চাত্য যুক্তিবাদেরই নবতর সংস্করণ বলে ব্যাখ্যা করা যায়। দেকার্ত বা লাপলাস যে যান্ত্রিক নিয়মতান্ত্রিক বিশ্বের পরিকল্পনা করেছিলেন, Structuralist-পৃথিবী সেই রকমই নিয়ম খুঁজে বেড়াতে চায় মানবিক ক্রিয়াকাণ্ডের অভ্যন্তরে। পার্থক্য শুধু এই যে কার্তেজীয় চিন্তায় আবিষ্কৃত নিয়মগুলির প্রেক্ষিতে জগৎ ব্যাখ্যাত হয়, আর লেভি স্ত্রাউসের দর্শনে জগৎ বিশ্লেষণ করে আবিষ্কার করার চেষ্টা হয় নিহিত নিয়মের। প্রথমটি অবরোহী গণিতের পদ্ধতি বলে যদি ব্যাখ্যা করা যায় তাহলে আরোহী যুক্তির আকারে নতুন দর্শনটি প্রতিষ্ঠিত। অবশ্য স্ট্রাকচারালিজম পাশ্চাত্য সভ্যতার অসম্পূর্ণতার সমালোচনা করে আদিম জনগোষ্ঠীর জীবন যাপনের অন্তর্নিহিত যুক্তিবিন্যাসকে যেভাবে ব্যাখ্যা ও প্রতিষ্ঠা করেছে তা প্রশংসনীয়। সাম্প্রতিককালের প্রায় সব বুদ্ধিজীবীই পশ্চিমি যুক্তিবাদী ধারার তথাকথিত প্রগতি ও প্রাগ্রসরতার বিপরীতে, আদিম সমাজজীবনের গোষ্ঠীচিন্তা ও নিজস্ব যুক্তি বা বিজ্ঞানকে গুরুত্ব দিয়েছেন। বাঙালি চলচ্চিত্র পরিচালক সত্যজিৎ রায়ের 'আগন্তুক' ছবিটি এই দিকে এদেশের শিক্ষিত সমাজকে ভাবিত করার চেষ্টা করেছে। সাম্প্রতিক এই দৃষ্টিভঙ্গিটি, কখনো কখনো পশ্চিমি যুক্তিবাদের আলোয় চোখ ধাঁধিয়ে যাওয়া বিভ্রান্ত বুদ্ধিজীবীর আদিম সমাজকে

অস্বস্তিকর পিঠ চাপড়ানি মনে হলেও, মূল বক্তব্যটির সঙ্গে আমরাও একমত। তবে Structuralism-কে এই নতুন জীবন-বোধের আবিষ্কর্তার মর্যাদা দিতে আমরা অক্ষম। দার্শনিক হিটগেনস্টাইনের বহু বিক্ষিপ্ত মন্তব্যের মধ্যে একটি বাক্যেই এই নতুন দৃষ্টি নিশ্চিতভাবেই বিধৃত ছিল বলে আমাদের বিশ্বাস। ১৯৪৩ খ্রিস্টাব্দে একটি সেমিনারে হিট্‌গেনস্টাইনের প্রশ্নের জবাবে বক্তা ফ্যারিংটন বলেন— "With all the ugly sides of our civilisation, I am sure I would rather live as we do now than as to live as the cave man did."

মহান দার্শনিকের সংক্ষিপ্ত প্রতিপ্রশ্নটি পরবর্তী বহু চিন্তার সারমর্ম বলে মনে হয়। হিটগেনস্টাইন বলেছিলেন— "Yes of course you would. But would the cave man ?" [page-222, Ludwig Wittgenstein : *Personal Recollections*, edited by Rush Rhees]

যে-কোনো দর্শনের সামাজিক বা রাজনৈতিক প্রতিক্রিয়া থাকে। অবশ্য বিশেষ সামাজিক বা রাজনৈতিক অবস্থার সমর্থন হিসেবেও দর্শন গড়ে ওঠা অসম্ভব নয়। সেক্ষেত্রে গঠিত দর্শনটিই হয়ে ওঠে ওই বিশেষ রাজনৈতিক বা সামাজিক অবস্থার আদর্শগত হাতিয়ার। ফরাসি বিপ্লবের রুশো বা ভোলত্যের-এর দার্শনিক উপস্থিতি বা মার্ক্সীয় দর্শনের প্রভাবে গত শতকের প্রবল রাজনৈতিক অদল-বদল প্রথম ধরনটির প্রকৃষ্ট উদাহরণ। অস্তিবাদকে প্রথাসিদ্ধ মার্ক্সবাদীরা প্রথম থেকেই দ্বিতীয় ধরনের সামাজিক স্থিতাবস্থা বজায় রাখার ধনতান্ত্রিক হাতিয়ার বলেই গণ্য করেছিলেন। অথচ নিট্‌শে বা হাইডেগার-কে নাৎসি রাজনীতির পেছনের আদর্শগত প্রভাব বলে সমালোচনা করতে গিয়ে, প্রকারান্তরে এই দর্শনের ব্যাপক প্রভাবকেও তাঁরা স্বীকার করে নিয়েছেন তাতেও সন্দেহ নেই। দ্বিতীয় অভিযোগটি দুজনের ক্ষেত্রেই ভিত্তিহীন। নিটশের দর্শনের বহুবিধ ব্যাখ্যা সম্ভব, কেননা প্রচলিত অর্থে দার্শনিক পদ্ধতি বা সিদ্ধান্তের বদলে তাঁর রচনায় বিচ্ছিন্ন গুরুত্বপূর্ণ মন্তব্যের সমাহারই তাঁর বৈশিষ্ট্য। সে-ক্ষেত্রে নাৎসিরা তাঁর কোনো রচনার নিজস্ব ব্যাখ্যা করে রাজনৈতিক প্রয়োগ করলে সে দায় নিটশের নয়। তাহলে পারমাণবিক বিস্ফোরণের জন্যে আইনস্টাইন বা বোহরকে দায়ী করাও যুক্তিযুক্ত। আবার ব্যক্তি হাইডেগার রাজনৈতিকভাবে তৃতীয় রাইখের সমর্থন করে থাকলেও তাঁর দর্শন-সংক্রান্ত আলোচনার অন্তর্দৃষ্টি চিরদিনই রাজনৈতিক নেতাদের আয়ত্তের বাইরেই রয়ে গিয়েছিল। ফলে ব্যক্তি হাইডেগারকে রাজনৈতিক দৃষ্টি থেকে সমালোচনা করা গেলেও তাঁর দর্শন ওই অভিযোগের অংশীদার নয়। জাঁ পল সার্ত্র অস্তিবাদীদের মধ্যে সবচাইতে বেশি উদ্যোগী হয়েছিলেন সচেতন ভাবে সমাজ বা রাজনীতির গঠন প্রক্রিয়ায় সক্রিয় অংশগ্রহণে। অস্তিবাদ ও মার্ক্সবাদের মিলনে একটি সামাজিক মুক্তির পথ খুঁজে বার করার প্রয়াস সত্ত্বেও তাঁর ব্যক্তি স্বাধীনতার তত্ত্বকে কম্যুনিস্ট পার্টি তীব্র বিরোধিতাই করেছে। মাঝখানে কিছুদিন সার্ত্র পার্টির ঘনিষ্ঠ হয়ে উঠলেও তাঁর 'Existential Marxism' চরমপন্থী বিচ্ছিন্নতায় বিশ্বাসী বন্ধু কাম্যুর সঙ্গেও যেমন তাঁর সম্পর্কচ্ছেদ ঘটিয়েছে, আবার শেষ পর্যন্ত ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্যে আস্থাশীল থাকায় তিনি কোনদিনই ফরাসি কম্যুনিস্ট পার্টির বিশ্বাসভাজন হয়ে উঠতে পারেননি। কিন্তু সমকালে ইউরোপীয় বুদ্ধিজীবীদের একাংশ সার্ত্রের দ্বারা প্রভাবিত হয়েছিলেন তাতে সন্দেহ নেই। প্রথমে বিরোধিতা করলেও Edger Morin, Henri Lefebvre, Kostas Axelos বা Mascolo-র পরবর্তী 'Arguments Group' যে মূলত সার্ত্রের আদর্শেই নিজেদের চিন্তাকে প্রসারিত করেছিল তাতে কোনো সন্দেহ নেই। কম্যুনিস্ট পার্টি থেকে বহিষ্কৃত বুদ্ধিজীবীরা সার্ত্রীয় ব্যক্তি স্বাধীনতার আদর্শের সঙ্গে মার্ক্সীয় সমাজবদলের চিন্তার মিশ্রণ ঘটিয়ে যে ধারার রচনা করে

চলেছিলেন, অনেক পরবর্তী আলোচকই তাকে Existential Marxism আখ্যা দিতে দ্বিধা করেননি। এ-প্রসঙ্গে ১৯৬৮-র ফরাসি শ্রমিক ও ছাত্রদের সম্মিলিত বিক্ষোভ আন্দোলনটির পেছনে সার্ত্রীয় ও মার্ক্সীয় চিন্তার মিশ্রিত প্রভাবের কথা স্মরণীয়। প্রবল স্বতঃস্ফূর্ত এই আন্দোলন প্রায় বিপ্লবের চেহারা নিলেও, কম্যুনিস্ট পার্টির নেতৃত্বে সংগঠিত না হয়ে বিচ্ছিন্ন ছাত্রগোষ্ঠী ও শ্রমিকদের গণতান্ত্রিক নেতৃত্বে এই আন্দোলন কম্যুনিস্ট ভাবাদর্শে প্রভাবিত হয়েও অন্যান্য যে-কোনোও গণ-আন্দোলনের চেয়ে পৃথক এক তাৎপর্যে মণ্ডিত। ১৯৬৮-র মে মাসের এই ছাত্র ও শ্রমিক অভ্যুত্থান কোনো ক্ষমতার বদলে পর্যবসিত হয়নি তার নিহিত পার্থক্যের কারণেই। একটি শ্রেণীকে ক্ষমতাচ্যুত করে অপর শ্রেণীকে ক্ষমতাসীন করার মার্ক্সীয় শ্রেণীসংঘাতের তত্ত্বকে প্রায় অবজ্ঞা করেই সেক্ষেত্রে ছাত্রসম্প্রদায় ও শ্রমিকশ্রেণী বিক্ষোভে ফেটে পড়েছিল। বাস্তব দাবিদাওয়ার চাইতেও আত্মিক সংকট ও ধনতান্ত্রিক সমাজে অনিবার্য ক্লান্তি ও বিচ্ছিন্নতার সমস্যাই আন্দোলনকারীদের বেশি প্রণোদিত করেছিল বলে মনে হয়। অসংগঠিত গণ-আন্দোলনের এই ভয়াবহ তীব্রতা ও আন্তরিকতা একমাত্র ফরাসি বিপ্লব ও সাম্প্রতিক অতীতে তিয়েন-আন-মেন স্কোয়ারে চীনা ছাত্রদের বিক্ষোভ ছাড়া আর কোথাও দেখা গেছে বলে মনে হয় না। অধ্যাপক Mark Poster তাঁর গবেষণা গ্রন্থটিতে কয়েকটি দেওয়াল লিখন দিয়ে বোঝাতে চেষ্টা করেছেন ৬৮-র আন্দোলনের চরিত্র ও বৈশিষ্ট্য : "Don't change the employers ; change the employment of life" অথবা "Alienated society must die a violent death. We want a new and original world. We reject a world where security against starvation bought for the risk of death by boredom." এইসব দেওয়াল লিখন উদ্ধার ও বিশ্লেষণ করে অধ্যাপক Poster জানিয়েছেন— "What was written on the walls was existential marxism." (page 382-83, *Existential Marxism in Post-war France)* 'দোকানি মেয়েটির দর্শন' গ্রহণ করে হাজার হাজার ছাত্র ও লক্ষ লক্ষ শ্রমিক উদ্বুদ্ধ হয়ে এই নতুন দিকচিহ্নসৃষ্টিকারী আন্দোলনে সক্রিয় অংশগ্রহণ করায় মার্ক্সবাদী বুদ্ধিজীবীদের পাশাপাশি দুঃখ পেয়েছিলেন Structuralist দর্শনের পুরোধা ক্লোদ লেভি স্ত্রাউসও।

'৬৮-র গণআন্দোলন স্তিমিত হয়ে গিয়েছিল সাধারণ নিয়মেই, কেননা শাসনক্ষমতা বদলের আকাঙ্ক্ষা এই বিক্ষোভের উদ্দীষ্ট ছিল না। আধুনিক পাশ্চাত্য জীবনের ক্লান্তি, বিচ্ছিন্নতা এবং প্রতিষ্ঠানিক আধিপত্যের বিরুদ্ধে কিছু দাবি-দাওয়াকে উপলক্ষ করে যে আন্দোলন শুরু হয়েছিল, তার পর্যাবসানে রাজনৈতিক পরিবর্তন ছিল অসম্ভব। কিন্তু রাজনৈতিক ক্ষমতা দখলই সবসময় হয়তো আন্দোলনের বা বিপ্লবের একমাত্র উদ্দেশ্য থাকে না। ৬৮-র আন্দোলন ব্যক্তি ও সামাজিক সম্পর্ক এবং প্রাতিষ্ঠানিক চরিত্রগুলির যে মূলগতভাবে পরিবর্তন করতে সক্ষম হয়েছিল, তা পরে ১৯৮৭ খ্রিস্টাব্দের ২২শে ডিসেম্বরের News Week-এর একটি সাক্ষাৎকারে সুললিত ভাষায় ব্যক্ত করেছেন Umberto Eco— "Even though all visible traces of 1968 are gone, it profoundly changed the way all of us, at least in Europe, behave and relate to one another. Relations between bosses and workers, students and teachers, even children and parents, have opened up, they'll never be the same again" [From the introduction of *Apocalypse Postponed* by Umberto Eco]

'ইওরোপীয় ভাববিশ্বের প্রবণতাগুলি ব্যাখ্যা করে বিভিন্ন সমালোচক এই সিদ্ধান্তে পৌঁছেছেন যে, দার্শনিকেরা একদিকে প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতা, পর্যবেক্ষণ ও নিরীক্ষাধর্মিতার উপর বেশি গুরুত্ব আরোপ করেছেন এবং অন্যদিকে খুঁজেছেন এর নানা ধরনের সম্ভাব্য বিকল্প। ফলে এই দুটি পরস্পরবিরোধী বীক্ষণের সংঘর্ষ ইওরোপের চিন্তার ইতিহাসকে রচনা করেছে। তাঁদের ধারণা, আকরণবাদ ঐ পর্যবেক্ষণপন্থী মতবাদের ধারাকে অনুসরণ করেছে। আর আকরণোত্তরবাদ তাকে রূপান্তরিত করেছে সংশয়বাদে।" [পৃষ্ঠা-৩০ *প্রতীচ্যের সাহিত্যতত্ত্ব*, তপোধীর ভট্টাচার্য]

আলোচ্য বিষয়ের উল্লেখযোগ্য এক বাঙালি সমালোচকের রচনাংশ উদ্ধার করেই আমরা প্রবেশ করতে চাই এ-আলোচনার পরবর্তী পর্যায়ে, যদিও উপরিউক্ত মতকে অধ্যাপক ভট্টাচার্য বিবৃত করেছেন মাত্র—সমর্থন বা বিরোধিতার রাস্তায় হাঁটেননি। মতটি বিবৃত করবার সময়েও সম্ভবত বাংলা পরিভাষার অস্পষ্টতার কারণেই কিছু কিছু বিষয় যথেষ্ট পরিষ্কার হয়নি। পাশ্চাত্য চিন্তায় ঐতিহাসিক ভাবে দুটি পরস্পরবিরোধী বীক্ষণের উপস্থিতি বুঝতে অসুবিধে হওয়ার কথা নয়। মুস্কিলের ব্যাপার এই যে 'প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতা, পর্যবেক্ষণ ও নিরীক্ষাধর্মিতা'র বিপরীত দিকটিকে 'নানা ধরনের সম্ভাব্য বিকল্প' বললে ওই নানা ধরনের মধ্যে একটি বিশেষ প্রবণতা খুঁজে পাওয়া দুস্কর। বিপরীত চিন্তার স্পষ্ট উল্লেখ না থাকায় বাদী চিন্তাটিও হয়ে উঠেছে অস্পষ্টতর। উল্লেখের অভাবে আমরা বুঝতে পারিনি কোন্ কোন্ সমালোচকের দৃষ্টিভঙ্গির কথা অধ্যাপক ভট্টাচার্য বলতে চেয়েছেন। কেননা তথাকথিত 'আকরণোত্তরবাদ' বা Post Structuralism-এর সমালোচনার নানা ধারাই বিদ্যমান। তবু আন্দাজ করা যেতে পারে 'পর্যবেক্ষণ', 'নিরীক্ষণ' ইত্যাদি আপাত বৈজ্ঞানিক শব্দের মাধ্যমে এখানে Structuralism-এর বৈজ্ঞানিক বিশ্লেষণ ও নিহিত সূত্রানুসন্ধানের কথাই বলা হয়েছে। সেক্ষেত্রে 'প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতা' শব্দটির বদলে 'প্রত্যক্ষণ' শব্দ ব্যবহার করাই বোধহয় যুক্তিযুক্ত হত, কেননা অভিজ্ঞতার Uniqueness অস্তিবাদী চিন্তার বিষয়। আকরণবাদ তো ব্যক্তি মানুষের মৃত্যুই ঘোষণা করতে চেয়েছে। ফলে এই 'অভিজ্ঞতা' শব্দটিকে বাদ দিয়ে এবং প্রত্যক্ষণ, পর্যবেক্ষণ, নিরীক্ষার সঙ্গে নিহিত সূত্রানুসন্ধানের উদ্দেশ্যটি যোগ করলেই 'আকরণবাদের' মূল চরিত্রটি স্পষ্টতর হবে বলে আমাদের মনে হয়। কিন্তু এই বীক্ষণ, আমরা আগেই দেখিয়েছি যে প্রাক-অস্তিবাদী যুগের পশ্চিমি যুক্তিবাদের মূল কাঠামোয় ফিরে যাওয়ার চেষ্টা ছাড়া আর কিছুই নয়। আসলে ইউরোপীয় চিন্তার মূল বিভাজনটি Rationality এবং Irrationality-র মাধ্যমেই বুঝতে হবে পদ্ধতিগত ভাবে পৃথক হয়েও Structuralism একটি Rationalist দর্শন। অর্থাৎ মানবগোষ্ঠী ও ভাষায় নিহিত নিয়মগুলি মানুষের পক্ষে যৌক্তিক পদ্ধতিতে খুঁজে বের করা সম্ভব বলেই তাঁরা বিশ্বাস করেন। যৌক্তিক দর্শনের প্রতিক্রিয়া হিসেবেই অস্তিবাদ ইউরোপীয় চিন্তায় প্রাধান্য অর্জন করেছিল। মানুষকে নিয়মের অধীন না ভেবে মানুষকে স্বাধীন সৃষ্টিশীল সত্তা হিসেবেই কল্পনা করেছেন অস্তিবাদী দার্শনিকরা। ফলে স্বাভাবিক ভাবেই অস্তিবাদী দর্শনের মোকাবিলা করেই লেভি স্ট্রাউস নৃতাত্ত্বিক দর্শনটি প্রতিষ্ঠা করেন। এবার বোঝা যাচ্ছে যে Post-Struturalist দর্শন ঐ অর্থে Rationality স্বীকার না করেই Structuralism-এর বিরোধী হয়ে উঠেছে। Post Structuralist বা Structuralist-দের বৈজ্ঞানিক নিয়ম অনুসন্ধানকে, অনিবার্য ব্যর্থ প্রকল্প বলেই মনে করেছেন। কেননা বিষয়ী তার নিজস্ব উদ্‌ভাবন সমাজ, গোষ্ঠী বা ভাষা সম্পর্কে কতটা বিষয়মুখী জ্ঞান লাভ করতে পারবে বা পারা যায় তা এই স্ববিরোধী প্রচেষ্টায় আদৌ সম্ভব কি না এই প্রশ্ন, সংশয়ই Structuralist-দের বিরুদ্ধে তাদের মূল অস্ত্র। এ-বিষয়ে

অধ্যাপক ভট্টাচার্যের রচনা থেকে উদ্ধৃত অংশের শেষ পংক্তিটির সঙ্গে আমরা একমত; যদিও লেখক নিজে তাঁর মতামত উহ্য রাখাই শ্রেয় মনে করেছেন।

কাঠামোর বিভিন্নতা থাকলেও সাধারণভাবে আমরা Structuralist-কে অস্তিবাদের প্রতিক্রিয়া এবং Post-Structuralist দর্শনকে Structuralist দর্শনের প্রতিক্রিয়া হিসেবেই দেখতে চাই। ফলে Post-Structuralist দার্শনিক চেতনায় অস্তিবাদী চিন্তকদের অবচেতন বা সচেতন প্রভাব থাকা অনিবার্য বলেই মনে হয়। এই প্রভাব যে অনেক পশ্চিমি সমালোচক স্বীকার করেও নিয়েছেন সে কথা উল্লেখ করতে অবশ্য অধ্যাপক ভট্টাচার্য তাঁর অন্য একটি গ্রন্থে ভুল করেননি—"তবে এইটে লক্ষ করা যায় যে উইলিয়াম স্পেনোস, রিচার্ড পামার ও জেরোম ম্যাজারো আধুনিকোত্তরবাদের এমন একটি আদল দেখাতে চেয়েছেন যার সঙ্গে হাইডেগার-বিশ্লেষিত অস্তিত্ববাদী দর্শনের সম্পর্ক দূরবর্তী নয় খুব একটা।" [পৃষ্ঠা ১১০, *আধুনিকতা : পর্ব থেকে পর্বান্তর*, তপোধীর ভট্টাচার্য]

আমাদের উদ্দেশ্যও যে উক্ত পাশ্চাত্য সমালোচকদের সমানুপাতিক তা বলাই এখন বাহুল্য, তবু উপায় ও আঙ্গিক হয়তো উদ্দেশ্যের আনুপাতিক সাম্য সত্ত্বেও পৃথক আকার গ্রহণ করতে সক্ষম হবে ভেবেই এই অকিঞ্চিৎকর প্রয়াস। Structuralist চিন্তার মধ্যে প্রায় গৃহীত হয়েও মিশেল ফুকো Post Structuralist দর্শনের একজন পুরোধা হিসেবেই বিবেচিত হয়ে থাকেন। আপাতদৃষ্টিতে ফুকো লেভি স্ত্রাউসের মানুষের অবলুপ্তির ধারণারই যেন পুনরুক্তি করেছেন বলে মনে হতে পারে—"Man would be erased, like a face drawn in sand at the edge of the sea." যদিও লেভি স্ত্রাউস এবং ফুকোর প্রতিপাদ্য কিন্তু এক নয়। একজন ব্যক্তি মানুষের অবলুপ্তিকে মানবিক বিজ্ঞানের প্রাগসরতার পরিণতি বলে মনে করেছেন, অন্যজন মানবিক জ্ঞানচর্চার মাধ্যমে যে মানবিক সত্তার বিকাশ তারই সম্ভাব্য মৃত্যুর কথা ঘোষণা করেছেন। স্ত্রাউসের মানবমৃত্যু বৈজ্ঞানিক সর্বপ্রাণতার পরিণাম, আর ফুকোর মানুষ বিজ্ঞানের অনুসন্ধিৎসার মাধ্যমে গঠিত এমন এক সত্তা, ঐ জ্ঞানের অসম্ভাব্যতার সঙ্গেই যার বিলয় অপরিহার্য। ফলে স্ট্রাকচারালিস্ট আশাবাদী বৈজ্ঞানিক দৃষ্টির বিপরীতে ফুকোর দর্শন এক নিহিত নৈরাশ্যের দ্যোতক। মানবিক অগ্রগমনে জ্ঞান ও বিজ্ঞানের ক্ষেত্রে অথবা সত্যানুসন্ধানের ক্ষেত্রে যে অনিবার্য অসফলতা ও অর্থহীনতা, Post-Structuralist চিন্তার অনেক প্রতিভূকেই তা বিব্রত করেছে, মিশেল ফুকো তাঁদের পথিকৃৎ বললেও অত্যুক্তি হয় না। ফুকো মূলত ইতিহাস বিশ্লেষণ এবং ব্যাখ্যার মাধ্যমেই তাঁর দর্শনকে গঠিত করেছেন। লেভি স্ত্রাউসের নৃতাত্ত্বিক বা সোস্যুরের ভাষাতাত্ত্বিক বিশ্লেষণের মতোই তাঁর দার্শনিক বিশ্লেষণের হাতিয়ার ইতিহাসের বিবর্তন। কিন্তু ইতিহাসের ব্যাখ্যার ক্ষেত্রে ফুকো অনেকাংশেই নিট্‌শের কাছে ঋণী সেকথা তিনি নিজেও স্বীকার করতে দ্বিধা করেননি। তাঁর 'Nictzsche, Genealogy, History' রচনায় চিরাচরিত ঐতিহাসিকদের ইতিহাসে গভীর অনাস্থা ফুটে উঠেছে। নিরপেক্ষতা ও যৌক্তিক বিন্যাসক্রমের ভান ত্যাগ করে, ফুকোও নিটশের মতোই ইতিহাসের অযৌক্তিক উল্লম্ফন এবং নিজস্ব অবিচারের কথাই বলেছেন। ফুকোর ভাষাতেই নিট্‌শের ইতিহাস বিশ্লেষণটি প্রাঞ্জলতর হবে : "Neitzsche's version of historical sense is explicit in its perspective and acknowledges its system of injustice. Its perception is slanted being a deliberate appraisal, affirmation or negation ; it reaches the lingering and poisonous traces in order to prescribe the best antidote. It is not given to a discrect before the objects it observes and does not submit itself to their processes ; nor does it seek laws,

since it gives equal weight to its own sight and to its objects. [Nietzsche, Genealogy History', Michel Foucault, quoted from *Modernism to Post Modernism : An Dnthology*, page-372]

ফুকোর ঐতিহাসিক ব্যাখ্যা ও বিশ্লেষণ মূলত নিট্শের ইতিহাসচিন্তার আধারেই গঠিত বলে বহু সমালোচকই স্বীকার করেছেন। মানব চিন্তা ও কর্মের প্রেরণা হিসেবে শক্তিলাভের বাসনাই যে মূল চালিকা শক্তি, এই নিটশীয় ভাবনাও ফুকো তাঁর দর্শনে গ্রহণ করেছেন তাতে সন্দেহ নেই। ফুকোর এই নিট্শীয় নির্ভরতার জন্যে অনেকে তাঁর দর্শনকে New-Nietzschean আখ্যা দিতেও দ্বিধা করেননি। ফুকোর এই আধুনিক নিট্শীয় দৃষ্টি একদিকে তাঁকে যেমন লেভি স্ত্রাউসের Structuralist দর্শন থেকে পৃথক এবং পশ্চিমি যুক্তিবাদ ও সভ্যতার বিরুদ্ধে আর আক্রমণাত্মক করেছে, তেমনই অস্তিবাদী অন্য চিন্তাবিদদের সঙ্গেও তাঁর প্রতিতুলনা সম্ভবপর হয়েছে মূলত নিটশীয় দৃষ্টিভঙ্গির ব্যাখ্যা প্রসঙ্গেই— Levi Strauss, the founder of French structuralism and its first outstanding 'Kulturkritiker', still cherish the ideal of science and strongly dislikes one of the counter cultures chief idols modern art, both apocalyptic and arcaric. Foucault, the nietzschean Modernist did away with such. 'Positivist' residues. [pages 157, *Foucault J. G. Merquior.*]

নিটশের সঙ্গে ফুকোর মিলের জায়গাটি যদি তাঁকে পৃথক করে লেভি-স্ত্রাউসের স্ট্রাকচারালিস্ট চিন্তা থেকে, তাহলে পরবর্তী পোস্ট-স্ট্রাকচারালিস্ট জাক দেরিদার দৃষ্টির সঙ্গে তাঁর পৃথকীকৃত মনন ও চিন্তার পেছনেও আরেকজন অস্তিবাদীর সন্ধান পেয়েছেন সমালোচক Merquiro। ইতালির সংবাদমাধ্যম ফুকোকে অভিহিত করেছিল 'nuovo Sartre' বলে। যদিও সংবাদ মাধ্যমের 'নতুন সার্ত্র' অভিধাটি মূলত ফরাসি চিন্তাজগতে উভয়ের অপরিসীম প্রভাবের কথা ভেবেই আবিষ্কৃত হয়েছিল তাতে সন্দেহ নেই, তবু দর্শনায়নের ভঙ্গি এবং চিন্তার কিছু সাযুজ্য যে উভয়ের রচনায় রয়েছে তাও অনস্বীকার্য। সার্ত্রীয় দৃষ্টিভঙ্গিই যে তাঁকে পরবর্তী দার্শনিক দেরিদা থেকে অনেকাংশেই পৃথক করেছে এ সিদ্ধান্ত উপস্থাপিত হয়েছে Merquior এর ভাষায়—

> The Sartrean Posture of the philospher as a non-Utopian blesser of radical Revolt is precisely what differentiated Foucault from his main post-Structuralist rival, Jacques Derrida : for in Derrida there is no discourse on power, no rhetoric of revolt ....' Happiness does not exist is a statement by Foucault but it could have been signed by Sartre. [page 158 *Foucault*]

Post-Structuralist দর্শনের সাম্প্রতিক প্রবক্তাদের মধ্যে জাক্ দেরিদা একটি উল্লেখযোগ্য নাম। যদিও লিওতার বা দেলিউজদের তুলনায় দেরিদার দর্শনকে *Post-Modernism* বলতে অনেক পাশ্চাত্য সমালোচকই রাজি হবেন না, তবু বাঙালির চোখে দেরিদার এদেশ ভ্রমণের পর 'উত্তর আধুনিকতা' ও দেরিদা প্রায় সমার্থক শব্দে পরিণত হয়েছে। দেরিদা-র কলকাতায় আগমন এবং তৎকালে প্রদত্ত ভাষণের প্রস্তুতি এবং প্রতিফলন, 'সংস্কৃতিমনস্ক' বাঙালির মননে বা হুজুগে একটি গুরুত্বপূর্ণ স্থান করে নিতে পেরেছে তাতে সন্দেহ নেই। অবশ্য দার্শনিক হিসেবে দেরিদার গুরুত্ব অস্বীকার করবার কিছু নেই, এবং কোনো কোনো বাঙালি আলোচব ঐ দর্শনের উৎস এবং চরিত্র সম্পর্কে সুচিন্তিত মন্তব্যও যে করতে পেরেছেন তাও স্বীকার্য।

'জাক্ দেরিদা' নামাঙ্কিত বিশেষ অনুষ্টুপ সংকলনে, একই নামাঙ্কিত তীর্থপ্রসাদ মুখোপাধ্যায়ের সংক্ষিপ্ত রচনাটি বিশেষ করে মনোযোগের দাবি করতে পারে। তীর্থ এলোমেলো বিচ্ছিন্ন মন্তব্যের মধ্যে না গিয়ে, দেরিদার দার্শনিক মূলটি খুঁজতে চেষ্টা করেছেন সস্যুরে এবং হাইডেগারের মধ্যে। এই দুজনকেই দেরিদা আলোচনাকালে নস্যাৎ করলেও, দেরিদার ভাষা সমালোচনার কাঠামোটির সঙ্গে সস্যুরের এবং দার্শনিক সত্যানুসন্ধানের অনিবার্য অর্থহীনতার ধারণায় হাইডেগারের প্রবল উপস্থিতি তীর্থ সুন্দরভাবে খুঁজে বের করতে পেরেছেন। হাইডেগার ও দেরিদার সম্পর্ক বিষয়ে আলোচনাকালে তীর্থ লেখেন—"হাইদেগার গুরুত্ব পান এ কারণেই যে তিনি পাশ্চাত্য দর্শনের মৌলিক চিন্তাগুলি সম্পর্কে যে সব নাড়া লাগানো প্রশ্ন তুলেছিলেন তাতে একদিকে যেমন বনেদি দর্শন বা মেটাফিজিক্সের আহ্লাদিত হবার সুযোগ ঘুচে গেছে, তেমনি অন্যদিকে দেরিদার মতো আক্রামক চিন্তকদের তা যথেষ্ট ইন্ধন জুগিয়েছে।' [পৃষ্ঠা-২৫, বিশেষ অনুষ্টুপ সংকলন, 'জাক্ দেরিদা']

এর পর তীর্থ মূলত *Being and Time* বইটিতে হাইডেগারের অস্তিত্ব সংক্রান্ত প্রশ্নে, ভাষার অসহায়তা নিয়ে আলোচনা করে দেখিয়েছেন যে ভাষা ছাড়া এ-প্রশ্ন করা অসম্ভব, আবার যে মুহূর্তে এ-প্রশ্ন ভাষার সাহায্যে উপস্থিত হল তৎক্ষণাৎ উপলব্ধি করলাম যে অস্তিত্বশীলতার জ্ঞান আমাদের মধ্যেই আছে। অর্থাৎ যে-বিষয় নিয়ে প্রশ্ন তা প্রশ্নের আগেই চৈতন্যে উপস্থিত ছিল। ফলে প্রশ্নটি হয়ে দাঁড়ায় অবাস্তব এবং অস্তিত্বের জ্ঞানলাভ করা হয়ে ওঠে অসম্ভব প্রয়াসমাত্র। তীর্থ-র সংক্ষিপ্ত আলোচনা থেকে কেউ যদি একথা মনে করেন, যে হাইডেগারের 'Deconstruction' করেই দেরিদা Metaphysics-এর অসম্ভাব্যতার তত্ত্বে পৌঁছেছেন তাহলে বলতে হয় যে হাউডেগার নিজেই এই 'Deconstruction' অন্যভাবে নিজের রচনাতেই অন্যত্র করেছেন। ১৯৪৭ খ্রিস্টাব্দে এক তরুণ ফরাসি দার্শনিকের চিঠির উত্তরে হাইডেগার 'Letter on Humanism' নামে যে রচনাটি লিখেছিলেন, তাতে সার্ত্রীয় অস্তিবাদের সমালোচনার পাশাপাশি যে-কোনো মেটাফিজিক্যাল অস্তিত্ব সংক্রান্ত প্রশ্নের অসম্ভাব্যতাও তিনি স্পষ্টই ঘোষণা করেছেন—"Metaphysics has not only failed up to ask this question, the question is inaccessible to metaphysics as such" [quoted from : *From Modernism to post-Modernism : An Anthology*' page-281]

তাহলে হাইডেগারীয় দৃষ্টিভঙ্গির বিরুদ্ধে দেরিদার আপত্তি কোথায়? দেরিদার রচনার স্পষ্টই বোঝা যায় যে আপত্তি দৃষ্টিভঙ্গির নয়, ভাষাবিন্যাসের। হাইডেগার 'মেটাফিজিক্স'-এর বিরোধিতা করতে গিয়ে, ঐ 'মেটাফিজিক্যাল' শব্দ ব্যবহারের জালেই জড়িয়ে পড়েছেন বলে দেরিদা তাঁর রচনাকেও একই গোত্রের অন্তর্ভুক্ত করে দিতে চেয়েছেন—

> Nietzsche, Freud and Heidegger, for example worked within the inherited concepts of metaphysics. Since these concepts are not elements or atoms, and since they are taken from a syntax and a system, every particular borrowing brings along with it the whole of metaphysics. This is what allows these destroyers to destroy each other reciprocally—for example, Heidegger regarding Nietzsche, with as much lucidity and rigor as badfaith and misconstruction, as the last metaphysician, the last 'Platonist'. One could do the same for Heidegger himself, for Freud, or for a number of others. And today no exercise is more widespread." [*Writing and Difference*, Jacques Derrida]

দেরিদার এই বক্তব্যের সঙ্গে একমত হয়েও একই বিরুদ্ধ যুক্তি যে তাঁর বিরুদ্ধেও প্রযুক্ত হতে পারে সেকথাও বোধ হয় অনুমান করতে পেরেছিলেন তিনি। কেননা প্রাক্তন জিজ্ঞাসা ও দার্শনিক গঠনগুলির বাইরে থেকে সেগুলিকে যে আক্রমণ করা যায় না, তা তিনি নিজেই উল্লেখ করেছেন তাঁর *Of Grammatology'* গ্রন্থের প্রথম অধ্যায়েই—"The movements of deconstruction do not destroy structures from the outside. They are not possible and effective, nor can they take accurate aim, except by inhabiting those structures. Inhabiting them in a certain way, because one always inhabits, and all the more when one does not suspect it. Operating necessarily from the inside, borrowing all the strategic and economic resources of subversion from the old structure, borrowing them structurally, that is to say without being able to isolate their elements and atoms, the enterprise of deconstruction always in a certain way falls prey to its own work."

দেরিদার দর্শনকে খণ্ডন করবার জন্যে অনেক সমালোচকই হয়তো উদ্ধৃতাংশের শেষ পংক্তিটি উদ্ধার করতে চাইবেন। কিন্তু সন্দিগ্ধ দেরিদা নিজেই তো তাঁদের কাজ প্রায় সমাপ্ত করেই রেখেছেন। যে দার্শনিক দর্শনের সামগ্রিক ইতিহাসকে শুধু শব্দের খেলা বলেই দেখতে এবং দেখাতে চান, তিনি সেইসব সমালোচকদের 'ফুলের ঘায়ে মূর্চ্ছা' যে যাবেন না তা তো বলাই বাহুল্য। সেই ব্যর্থ প্রয়াসে আমাদের আস্থা নেই। তবু আমরা এটুকুও বলতে চাই যে 'one always inhabits, and all the more when one does not suspect it.' দেরিদার এই বাক্যটিকেই সামান্য অদল বদল করে একথাও বলা যায় যে 'One always inhabits even when he suspects himself' দেরিদা যদিও নির্ভীকভাবেই তাঁর রচনায় অগ্রসর হয়েছেন, কেননা তত্ত্বহীনতার পথনির্দেশকের পক্ষে পুরোনো বাতিল তত্ত্বের ছায়া থেকে মুক্তি পাওয়ার প্রাণান্ত প্রয়াস অশোভন কিন্তু সমকালীন বহু post-Structuralist চিন্তাবিদ যেন প্রাণপণ চেষ্টা করে গেছেন হাইডেগারীয় দৃষ্টিভঙ্গির বেড়াজাল থেকে নিজেকে পৃথক বলে উপস্থাপন করতে। কখনো কখনো এই আত্মঘোষণাকে নিছকই আর্তির মতো শোনায়। যেমন জাক লাকাঁ ১৯৫৭ খ্রিস্টাব্দে সোরবোন বিশ্ববিদ্যালয়ে প্রদত্ত বক্তৃতার শেষেও গোপন করতে পারেননি এই আত্মরক্ষার তাগিদ—"don't be content. I beg to you to write this off as another case of Heideggeranism, even prefixed by a neo—which adds nothing to the trashcan style in which currently, by the use of his ready-made metal jetsam, one excuses oneself from any real thought."

শুধু হাইডেগার কেন, নিট্শের প্রভাব প্রতিপত্তিও আধুনিক বা 'আধুনিকোত্তর' এই দর্শনে এতই প্রবল যে 'neo' উপসর্গটি তাঁর আগে বসিয়েও এ-দর্শনের নামকরণের প্রয়াস অবাস্তব নয়। অধ্যাপিকা সুপ্রিয়া চৌধুরী 'জাক দেরিদা' নামাঙ্কিত বিশেষ অনুষ্টুপ সংকলনের ৪২ পৃষ্ঠায় তাঁর প্রবন্ধে লিখেছেন—

> স্বাভাবিক ভাবেই তাঁর এই প্রয়াসে, যে দার্শনিক থেকে দেরিদা সবচেয়ে বেশি গ্রহণ করেছেন তিনি নীট্শে। নীট্শের সংক্ষিপ্ত উক্তি, অ্যাফরিজমগুলো ('সোক্রেটিস: সে যে লেখেনা,' 'ভাষার কারাগৃহ') আজকাল খুব ব্যবহৃত হয়, সাহিত্যতত্ত্বে সুঠাম সৌষ্ঠব আনার নিষ্ঠায়।

রাসেলও তাঁর রচিত পাশ্চাত্য দর্শনের ইতিহাসে নিট্শের আলোচনা শেষ করেছিলেন কুরুচির বিরুদ্ধে সুরুচির উত্থানের আশা নিয়ে—"His followers have had their innings

but we may hope that it is coming rapidly to an end." রাসেলের আশা পূর্ণ হলে এ আলোচনার প্রাসঙ্গিকতাই থাকত না। শুধু দেরিদা কেন, প্রায় সব Post Structuralist দার্শনিকই অন্তত প্রকাশভঙ্গি এবং প্রায়শই দার্শনিক হিসেবেও নিট্‌শীয় দৃষ্টি অনুসারী। দার্শনিক সিদ্ধান্ত ও সত্যসন্ধানের বিপরীত যে ব্যবচ্ছিন্ন 'ভাষার খেলা' নিট্‌শীয় দর্শনের বৈশিষ্ট্য, দেরিদার রচনায় দর্শনকে প্রায় তারই সমানুপাতিক বলে ভাবা হয়েছে। দর্শনকে বিশ্লেষণের বিশ্লেষণ বলেই মনে করেছেন দেরিদা। 'Structure' 'Sign' এবং 'Play'-র মাধ্যমে, তিনি মনে করেন Structuralist-রা শেষ পর্যন্ত স্বপ্ন দেখেন সত্য বা উৎসবের পাঠোদ্ধার করার, যা নীট্‌শের সত্যসন্ধানহীন, মানবতার সাধারণ ধারণা বর্জিত, সদাক্রীড়াশীল দর্শনের সম্পূর্ণ বিপরীত। এই দুটি ধারার সমন্বয় বা সংযোগও দেরিদার কাছে সম্ভব বলে মনে হয়নি। যদিও শেষ পর্যন্ত দুটি পথের মধ্যে একটির সুস্পষ্ট নির্বাচন তাঁর রচনার অর্থেরই মতো সম্ভাবিতই রেখেছেন তিনি, তবু মনে হয় এই মধ্যবর্তী অবস্থানেও Structuralist-দের থেকে যতখানি দূরে তাঁর বসবাস, ঠিক ততটাই যেন তিনি নীট্‌শের সমীপবর্তী। নীট্‌শে ও হাইডেগারের মধ্যেও যেন নীট্‌শের দিকেই দেরিদার সমমনস্কতার পাল্লা ভারী বলে মনে হয়। নীট্‌শের হাইডেগারকৃত সমালোচনা হাইডেগারের বিরুদ্ধেও করা যায় বলে তিনি দাবি করেছিলেন *Writing and Difference* গ্রন্থে। *Of Grammatology*-র প্রথম অধ্যায়েই জানান তিনি যে নিট্‌শের হাইডেগারকৃত সমালোচনা পাঠকালে, নিট্‌শের মর্মটি উদ্‌ঘাটিত হওয়ার সম্ভাবনাই তাঁর কাছে গ্রহণযোগ্য—"Therefore, rather than protect Nietzsche from the Heideggerian reading. we should perhaps offer him up to it completely. Underwriting that interpretation without reserve : in a certain way and up to the point where, the content of the Nietzschean discourse being almost lost for the question of being, its form regains it's absolute strangeness, where his text finally invokes a different type of reading, more faithful to his type of writing : Nietzsche has written what he has written. He has written that writing— and first of all his own— not originally is subordinate to the logos and to truth."

Post Structuralist দর্শনের ভিত্তিভূমি হিসেবে যদিও অস্তিবাদী দর্শনকেই মূলত আমরা গ্রহণ করেছি এই আলোচনায়, তবু Ludwig Writtgenestein তাঁর অসাধারণ অন্তর্দৃষ্টি নিয়ে যেমন Structuralist দর্শনেরও ইঙ্গিত দিয়েছেন অকস্মাৎ একটি প্রশ্নের মাধ্যমে, তেমনই post-Structuralist বা Post Modern দর্শনের সামগ্রিক উৎসের অন্যতম উপকরণ তাঁর রচনায় ছড়িয়ে রয়েছে সর্বত্রই। *Tractatus-Logico-Philosopicus* গ্রন্থের ৭৩ পৃষ্ঠায় তিনি লেখেন—"The correct method in philosophy would really be the following : to say nothing except what can be said, i.e. propositions of natural science— i.e. something that has nothing to do with philosophy—and then, whenever someone else wanted to say something metaphysical, to demonstrate to him that he had failed to give a meaning to certain signs in his propositions."

দেরিদার নিবিষ্ট পাঠক সহজেই বুঝতে পারবেন যে হাইডেগার, নিট্‌শে বা অন্য যে-কোনো দার্শনিকের রচনা আলোচনা কালে দেরিদা হ্বিটগেনস্টাইনের উপদেশ অক্ষরে অক্ষরে পালন করেছেন মাত্র। ফলে এই পদ্ধতির উদ্ভাবকের সম্মান তাঁর প্রাপ্য না হলেও অন্তত হ্বিটগেনস্টাইনের ভাষায় দেরিদার দর্শন 'The correct method of philosophy' আখ্যা তো

পেতেই পারে। হিটগেনস্টাইন দর্শনের ইতিহাসে কোনো বিশেষ মতবাদেরই আদ্যন্ত শরিক তিনি নন। কিন্তু সামগ্রিক প্রভাব ও বিশ্লেষণাত্মক অন্তর্দৃষ্টির বিচারে তিনিই গত শতকের 'দার্শনিক জলবিভাজিকা'। 'উত্তর-আধুনিক' চিন্তা যে শেষ বিচারে তাঁর ভাবনারই পরিবর্ধিত প্রয়োগ তা স্বীকার করতে দ্বিধা করেননি 'Post modern' চেতনারই এক পুরোধা জঁ ফ্রসোয়া লিওতার—"Wittgenstein's strength is that he did not opt for the positivism that was being developed by the vienna circle, but outlined in his investigation of language a kind of legitimation not based on performativity. That is what the postmodern world is all about." [quoted from : *Modernism to Post-modernism: An Anthology*, page-493]

দেরিদার চিন্তার পিছনে একধরনের প্রাচ্য আধ্যাত্মিকতার ছাপ ও সাযুজ্য খোঁজার চেষ্টা করেছেন বাঙালি আলোচক অরূপরতন বসু তাঁর *প্রশ্নের খসড়া....পোষ্ট মডার্নিজম* নামের ছোট্ট বইটিতে। আপাতদৃষ্টিতে চমকপ্রদ মনে হলেও পাশ্চাত্য সমালোচকরাও এভাবে প্রাচীন চীনা তাওবাদ বা কনফুসিয়াসের ধর্মতত্ত্বের সঙ্গে দেরিদার চিন্তার সংযোগ খুঁজে পেয়েছেন। আমেরিকান দার্শনিক ডেভিড হল্ তাঁর *Modern China and the Post Modern West* প্রবন্ধে বিষয়টি বিশ্লেষণ করেছেন বিস্তারিত ভাবেই। আলোচ্য প্রসঙ্গে কিছুটা অপ্রাসঙ্গিক বিবেচনা করেই উদাহরণ দিয়ে উদ্ধৃতির ভার বাড়ানো সঙ্গত মনে হয় না।

Post Modern বা Post-Structuralist দর্শনের বিস্তারিত সমালোচনা আমাদের উদ্দেশ্য নয়। মার্ক্সীয় দৃষ্টি থেকে এই সমালোচনা করেছেন জেম্‌সন্, উদারতাবাদী পারস্পরিকতার ঐতিহ্যের দৃষ্টিতে জার্মান দার্শনিক হ্যারেরমাসও একজন উল্লেখযোগ্য সমালোচক। ম্যাকিনটায়ারের সমালোচনাও Post-Structuralist দর্শনের পাশে যুক্তিবাদী ঐতিহ্যের পাশ্চাত্য প্রতিক্রিয়া বলে উড়িয়ে দেওয়া যায় না।

আমাদের মনে হয় এখনই সমালোচনা করে এই নতুন দর্শনচিন্তাকে সরিয়ে দেওয়ার বদলে প্রাক্তন চিন্তাভাবনার নিরিখে এর বিচার করাই অধিকতর প্রাসঙ্গিক। মূলত পাশ্চাত্য দর্শনের বৈচিত্র্য এবং বিন্যাসের সর্বব্যাপীভঙ্গি ইউরোপে যে-কোনো নতুন চিন্তাকে সঙ্কুচিত করে দেওয়ার পক্ষে যথেষ্ট। ফলে নতুন কোনো দর্শনের অবকাশ না পেয়েই, ইউরোপীয় মনন প্রধানত পুরাতনের সমালোচনার মাধ্যমেই হয়তো আত্মপ্রকাশ করতে চেয়েছে। কোনো প্রয়াস সম্পর্কেই শেষ কথা বলবার দায় হয়তো নেই, তবু কথা তো বলাই যায় কিন্তু সে কথাটি শেষে একটু হালকা চালে বলাই বোধহয় ভালো, যেমন বলেছেন Umberto Eco তাঁর *Postscript to the Name of The Rose* বইটিতে :

> I think of the postmodern attitude as that of a man who loves a very cultivated woman and, knows he cannot say to her, 'I love you madly', because he knows that she knows (and that she knows that he knows) that these words have already been written by Barbara Cartland. Still, there is a solution. He can say, 'As Barbara Cartland would put it, I love you madly.

ডি-কনস্ট্রাকশন

নবেন্দু সেন

বিষয়টির পরিচয় প্রসঙ্গে প্রথমেই তার পরিভাষার অস্পষ্টতা স্পষ্ট করা উচিত। প্রচলিত যে-সব পরিভাষা দেখছি সেগুলির যাথার্থ্য ক্রমশ বিচার্য। প্রথমে সেই পারিভাষিক নামগুলি দেখা যাক।

'বিনির্মাণ', 'অবিনির্মাণ', 'ভাঙন' ইত্যাদি শব্দ বিষয়টির পরিভাষা হিসাবে ব্যবহৃত হচ্ছে। কিন্তু 'পরিভাষা' কী সে কূটস্থ পর্যালোচনার মধ্যে না গিয়েও বলা চলে "পরিভাষার প্রত্নতত্ত্বে মিশে আছে ভাষাতাত্ত্বিক এবং জ্ঞানতাত্ত্বিক জিজ্ঞাসার আধেয়। ঐতিহ্যকে তখনি বিনির্মাণ করতে পারি ঈপ্সিত মাত্রায় যখন তাকে জানি। চিন্তার প্রাক ইতিহাস এবং ইতিহাস জুড়ে রয়েছে মানুষের ক্রমাগত স্বাধীন, স্বতন্ত্র ও আত্মদীপ হয়ে ওঠারই আখ্যান। পরিভাষা ভাবনা তার আরো একটি প্রমাণ।"[১]

এই রকম একটি সংজ্ঞার্থক উচ্চারণে, পরিভাষা ধ'রে দিতে পারলে ভালোই হত আপামর জ্ঞানার্থীদের। কিন্তু বক্তব্যে দূরাগত হলেও উঠে আসে মানুষের স্বাধীনতা আর সামাজিক, নৃতাত্ত্বিক ঐতিহ্যবিধৃত নিয়মাধীনতার প্রবহমান দ্বন্দ্ব। কখনো কম্প্যুটার আর মানবজ্ঞানের সময়াতীত কাঠামোর দ্বন্দ্ব যা স্ত্রাউস থেকে সোস্যুর অথবা বার্থকে নৃতত্ত্ব অথবা ভাষার নিয়মাধীনতা ও মানবজ্ঞানের মুক্তিবোধ নিয়ে ভাবিয়েছে।[২]

আমরা এই সব আলোচনার পরিপ্রেক্ষিতে ক্রমশ হয়তো 'ডি-কনস্ট্রাকশন'-এর ভেতরেও পৌঁছে যেতে পারি। কিন্তু তাতে অবতারণায় অসমাপ্তি ঘোষিত হতে পারে। তাই 'পরিভাষা'য় ফিরে যাওয়াই ভালো। আমি পরিভাষা বলতে সেইরকম একটি শব্দকে বুঝি যা একটি বিষয়েরই স্বভাব দ্যোতিত করে। অন্য একটি বিষয়ের স্বভাব দ্যোতিত করে না। যেমন 'চুম্বক' (Magnet) শব্দটি একখণ্ড লোহাকে অভিহিত করে, যা সমধর্মী ধাতুকে অর্থাৎ লোহাকেই আকর্ষণ করে এবং স্থিতাবস্থায় তা উত্তর দিক নির্দেশক হয়।[৩] এই স্বভাবে লোহা সোনার খণ্ডকে আকর্ষিত করবে না এবং আকর্ষিত হবে না। এক্ষেত্রে Magnet এর পরিভাষা 'চুম্বক'। 'Comet'এর পরিভাষা 'ধূমকেতু', Solar—'সৌর'।

তাহলে ইংরেজি Remaking, Rereading, Reconstracting Demeaning, Demantling ইত্যাদি

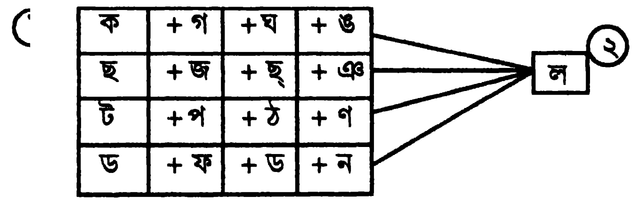
পাশ্চাত্য সাহিত্যতাত্ত্বিক আলোচনায় উদ্ভুত শব্দগুলির ক্ষেত্রে বাংলা পরিভাষার এত অস্পষ্টতা কেন? Rereading 'পুনর্পাঠ' বোঝা গেল; কিন্তু Remaking পুনর্গঠন না হয়ে 'বিনির্মাণ' হল? আবার ঐ একই বাংলা 'Deconstruction'-এর ক্ষেত্রেও ব্যবহার করা হচ্ছে? কেউ কেউ 'অ-বিনির্মাণ'ও ব্যবহার করলেন। আপাত বিরোধ 'অ-' এবং 'বি-' নিয়ে? যুক্তি, প্রতিযুক্তি দুই-ই তোলা যেতে পারে। বি-যুক্ত = অ-যুক্ত হলে বিনির্মাণ = অ-নির্মাণ ধরা যেতেই পারে। তাহলে অ-বিনির্মাণ? অস্পষ্টতা কী স্পষ্টতা পেল? অস্পষ্টতাই স্পষ্টতা পেল। বোধগম্যতা জটিলতর হল। তাহলে? তাহলে অভিপ্রেত স্পষ্টতার অপেক্ষায় বিষয়টি বুঝবার জন্য ভাষান্তরণ আপাতত স্থগিত রেখে মূল ব্যবহারকেই গ্রহণ করা যাক না। আমরা তাই 'ডি-কন্‌স্ট্রাক্‌শন'-ই ব্যবহার করছি।

১.

আধুনিক সমালোচনা চর্চায় 'ডি-কন্‌স্ট্রাক্‌শন' বিষয়টি সম্পর্কে স্পষ্ট অস্পষ্ট, পরিষ্কার আবছায়া ধারণা হয়তো আমাদের অনেকেরই আছে; কিন্তু সাহিত্য সমালোচনা তত্ত্বের নবীন এবং অতি সাধারণ জিজ্ঞাসুদের নিকট বিষয়টি যথাসম্ভব সহজ করে উপস্থিত করার জন্যই এই প্রবন্ধের অবতারণা।

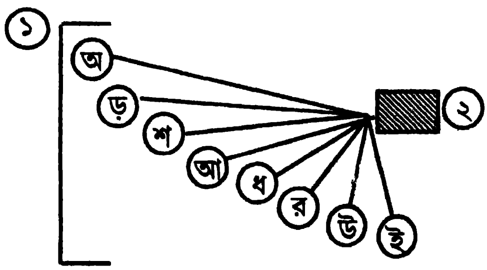
. ডি-কন্‌স্ট্রাকশন একটা কোনো কন্‌স্ট্রাক্‌শনের থেকেই উদ্ভুত। বিষয়টি কি এইভাবে দেখা যায়? ধরা যাক কন্‌স্ট্রাকশন =

র্ক



এখন একে ডি-কন্‌স্ট্রাকট করলে বিষয়টি কি এমন হয়?

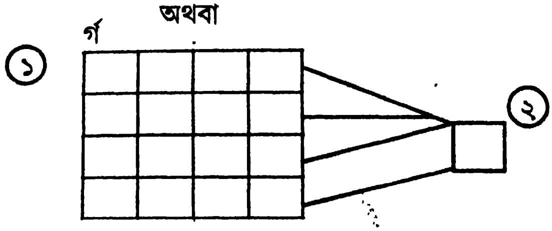
র্খ



প্রথম ক্ষেত্রে কন্‌স্ট্রাকটেড্‌ বিষয় = ল (২) ছিল। দ্বিতীয় ক্ষেত্রে প্রথম ক্ষেত্রের (১)-অন্তর্ভূক্ত 'ক' থেকে + 'ন' (এগুলিকে কন্‌স্ট্রাক্‌শনের উপকরণ ধরা যেতে পারে) কোনটিই আর নেই। র্ক-এর উপকরণ এবং কন্‌স্ট্রাকটেড্‌ বিষয় র্খ-এ নতুন উপকরণ নতুন কন্‌স্ট্রাকটেড্‌ বিষয় দিচ্ছে। কেবল তাই নয়, কন্‌স্ট্রাক্‌শন্‌ও পূর্ব পদ্ধতিতে নয়, নতুন পদ্ধতিতে। সেটা

স্পষ্টত দেখাও যাচ্ছে। নতুন কন্‌স্ট্রাক্‌টেড্‌ বিষয়ও অজানা, অন্ধকারাচ্ছন্ন। র্গ-এর ক্ষেত্রে উপকরণগুলিও সম্পূর্ণ অজানা। কন্‌স্ট্রাকটেড্‌ বিষয়ও অনির্দিষ্ট। তাই সাদা বা খালি।

অথবা



সম্ভবত এই কারণেই কেউ কেউ মনে করছেন, ' "Plus d'une langue" which without a context to fix its meaning can signify both "more than one language" and "no more of one language."'[৪] বস্তুত কোন উচ্চতর ভাষাই নেই যার নিকট সমস্ত বিভেদ মিটিয়ে ফেলে সব কিছু আমাদের নিকট প্রাঞ্জল করে তুলতে পারার আবেদন করা যেতে পারে। আমাদের ক্রমাগত এক ভাষা থেকে অন্য ভাষায় অনুবাদই করে যেতে হয় অথবা একটি ভাষারই বাগধারা থেকে আর একটি বাগধারার অনুবাদ করে যেতে হয়; আমাদের কেবল অনুবাদই করে যেতে হয় এবং হচ্ছে, সেখানে তো কোন মূল ভাষাই নেই; অথবা আমাদের এই অবিরাম অনুবাদের ক্ষেত্রে তো কোনই মূল 'পাঠকৃতি'ই নেই। এই হল ডি-কন্‌স্ট্রাকশন্‌; দেরিদাই বুঝিয়ে দেন, "প্লেটো, হেগেলের দর্শন চিন্তারও নতুনতর দিক নির্ণয় সম্ভব।" লাঁকা সম্পর্কেও তাই অনায়াসে বলতে পারেন, "...the psychoanalyst was entangled in metaphysics when he believed himself to be quite free of it."[৫]

ডি-কন্‌স্ট্রাক্‌শন সম্পর্কে সাধারণ আলোচনার জন্যেও নিৎশে, হেইড্‌গার (অনেকে বাংলায় Heidegger-কে 'হাইড্‌গার'ও লেখেন) দেরিদাকে বাদ দিয়ে এগুনো যায় না।

ফ্রেইড্‌রিক উইলহেল্‌ম্‌ নিৎশের (১৮৪৪—১৯০০)[৬] প্রথম প্রকাশিত কাজ *Die Geburt der Tragodie* (১৮৭২) এযাবৎ কালের স্বীকৃত ধ্রুপদি ঐতিহ্যমুখীন বিদ্যাচর্চাকে প্রথম বিপুল চ্যালেঞ্জ জানিয়েছিল, তীব্র আক্রমণ করেছিল 'অ্যাপোলালাইন' এবং জার্মান বংশোদ্ভূত উইন্‌ কিলম্যান-এর[৭] দৈবী, মহতী ভাবধারায় প্রভাবিত সাহিত্য ও শিল্পকর্মকে। নিৎশে এই ভাবধারার বিপক্ষে উপস্থিত করেছিলেন নৈরাশ্য ও বাসনামুখীনতা। নীৎশের দ্বিতীয় গ্রন্থ *Betrachtungen* (১৮৭৩-৭৬)। এখানেও তিনি বিস্‌মার্কের সময়ের জার্মান সংস্কৃতির আত্মসন্তুষ্টিমূলক সমালোচনার তীব্র নিন্দা করেন। *Morgenrote* (১৮৮১) তাঁর চিন্তার মূলে ছিল অতিমানবীয়তা এবং খ্রিস্ট্রীয় নীতিবোধ বর্জন। 'পাওয়ারে'র মতবাদ *Die frohliche Wissenschaft*, (১৮৮২) গ্রন্থে তাঁর মতবাদ বর্ণিত হয়েছে। এবং সমস্ত মূল্যবোধের পুনর্পাঠ নিয়ে তাঁর দর্শন তৈরি হয়েছিল। প্রথম দিকে শোপেনহাউআরের নৈরাশ্যবাদ এবং একাকীত্ব বোধের দ্বারা প্রভাবিত হলেও অচিরেই তা বর্জন করেন। সেইজন্য Wagner-এর সঙ্গেও তাঁর বিরোধ স্পষ্ট হয়ে ওঠে। নিৎশের ঐতিহ্যবিরোধী, সমস্ত মূল্যের সংশোধনীয় মতবাদ আধুনিক সাহিত্যতত্ত্বের ইতিহাসে, বিশেষত, বিনির্মাণ (অ-নির্মাণ) তত্ত্বের আলোচনায় অবশ্যম্ভাবী আলোচ্য বিষয় হয়ে ওঠে। এই প্রসঙ্গে দেরিদার সেই 'হেইডগার কৃত' নীৎশের সমালোচনা প্রসঙ্গে নিৎশীয়

"অস্তিত্ব বিলুপ্ত" "নতুনতরতার" সমর্থনের কথা স্বভাবতই উঠে এসে আলোচ্য বিষয়ে নীট্‌শের অবদানও স্বীকার করে। স্বভাবতই তাই হ্বিট্‌গেন্‌স্টাইনের কোম্‌তের দৃষ্ট বস্তু সত্য বিরোধী চিন্তা যা তাঁর ভাষার প্রদর্শন-কৌশল (অস্তিত্ব?) অতিরিক্ত একপ্রকার লিখ্য রূপ বা অক্ষর বিন্যাস মাত্র; তা তার সক্রিয়তার উপর নির্ভর করে না— এই ধারণা "New Text"-এর স্তরে পৌঁছে দেয়।[৮] দেরিদার আলোচনাতেও প্রাচীন ধর্মতত্ত্বের অথবা অধ্যাত্মবোধ অন্বেষণ করে আমাদের দেশী, এবং বিদেশী সালোচকেরা পোস্টমডার্ন সমালোচনা তত্ত্ব ও দর্শনের ইতিহাসে আরেক জিজ্ঞাসারও সন্ধান দেন।[৯]

এখান থেকেই আমরা 'ডিকনস্ট্রাকশন'-এর একটা ধারণা করতে পারি। এই ধারণার সঙ্গে অবশ্যই যুক্ত হয়ে আছে জ্যাক্‌স্ দেরিদার নাম। যদিও আধুনিকোত্তর সাহিত্যতত্ত্বের আলোচনায় ডিকন্‌স্ট্রাকশনই সবচেয়ে বেশি উচ্চারিত, সম্ভবত জনপ্রিয় বিষয়ও হয়ে উঠেছে আজ, তবে বিষয়টির উপযোগিতা ও তার সীমাবদ্ধতা নিয়েও আলোচনার শেষ নেই। এবং অবশ্যই দেরিদার ডিকন্‌স্ট্রাকশনের ধারণার নানান সমালোচনার মধ্যেই উঠে আসে বিষয়টির চরিত্র অথবা স্বভাব। প্রসঙ্গত দেরিদার *গ্লাস* (*Glas*, 1974) বইটির প্রাসঙ্গিকতা আলোচনায় হার্টম্যান জ্যোফ্রে-র সেভিং দা টেক্সট্-এর[১০] আলোচনা আজ যথেষ্ট গুরুত্বপূর্ণ হয়ে উঠেছে।

এই তর্কালোচনার ভেতরে প্রবেশের পূর্বে দেরিদার বিশ্লেষণগুলির মধ্যে থেকে ডিকন্‌স্ট্রাকশনের যে ধারণা উঠে আসে সেটিই দেখা যেতে পারে।

> They undertake the deconstruction of metaphysics by showing how a philosophical position is subverted or undone, exposed as a construct, by the workings of the discourse that affirms it.[১১]

পাশ্চাত্য সাহিত্যতাত্ত্বিক চিন্তা দেরিদার *Logo Centrism*-এর উপর নির্ভরশীল। তাতে যে ধারণা উঠে আসে তার একটি ক্রমবিন্যাস লক্ষিত হয়। তাতে অর্থ (*meaning*), সত্য (*Truth*), যুক্তি (*Logic*) এবং শব্দ (*Logos* : *Gk*)[১২] এই বিন্যাস, দেরিদা বলেন অধিবিদ্যার (*metaphysics*) আশ্রয় থেকে উদ্ভূত। এই বোধ এত গভীর ছিল তাঁর যার বিকল্প ছিল অকল্পনীয়।

দেরিদার এই দৃঢ় বিশ্বাস বহু ক্ষেত্রে তীব্র সমালোচনার সম্মুখীন হয়েছিল; বিশেষত দর্শনের জগতে। জোফ্‌রে হার্টম্যান (*Geoffrey Hartman*) এর অন্যতম প্রধান বিরোধী সমালোচক ছিলেন। তিনি এক এক করে দেরিদার ডিক্‌নস্ট্রাক্‌শন থিয়োরির সীমাবদ্ধতা নিয়ে পর্যালোচনাও করেন। তাঁর মতে— একজন যখন ডি-কন্‌স্ট্রাকশনের প্রসঙ্গে কিছু বলতে চান তখন মুখ্যত আবশ্যিক প্রকৃতি (স্বভাব) যা সাধারণত সরল এবং গ্রাহ্য বিষয়ক তারই কথা প্রথম উঠে আসে তারপর যা থাকে তাই জটিল বিষয়। সেগুলোও বস্তুত ডি-কন্‌স্ট্রাকশনেরই উৎসারণ অপলাপও বলা যায়। একটা উদাহরণ দিতে গিয়ে বলছেন, ক্লিন্‌থ্ ব্রুক্‌স্, ওয়েল রট্ আর্নে (Well-Wrought urn) লিখেছেন "একটি কবিতার ঐক্য নির্ভর করে তার ভাব-সমগ্রের একীভবনে যা আসলে সমগ্র ভাব নিয়ন্ত্রকেরই অধীনস্থ উচ্চতম মাত্রা মাত্র।" অর্থাৎ কতকগুলি ভাব যে সমগ্র শীর্ষ সৃষ্টি করছে তাও আবার ঐ ভাবগুলিরই উপর নির্ভরশীল। কাজে কাজেই ধ্বনির নকশা, গঠনভঙ্গী, ভাষার উপকরণ আবশ্যকীয় তখনি হয় যখন এগুলির দ্বারা নির্মিত হয়ে ওঠে ঐ শীর্ষস্থানীয় ঐক্য বা সামগ্রিক একীভবন।

ডি-কন্‌স্ট্রাকশন্ এই সমগ্রতার প্রশ্ন তোলে। কারণ তা (একীভবন/সামগ্রিকতা) ভাষার বহুধা ধর্ম, উপকরণ সমূহ, পাঠকৃতি, একাধিক পাঠ ও তার বুনোটবন্দি যা বহু ক্ষেত্রেই শব্দিত

বলয়ান্তরণ (যেমন শ্লেষ) একীভবনের ব্যাখ্যা না দিয়ে কেবল কতকগুলি সম্ভাবনাময় দিকের নির্দেশ করে :

> It explores how hierarchies are undone, finding that power and pertinence of a work are related to the rigour with which it constructs the philosophy in which it is implicated.[১৩]

কিন্তু এতেও বিরোধী সমালোচনা মুখর হয়ে উঠেছে। জোন্সনের মতো মৌলিক এবং একনিষ্ঠ ডি-কনস্ট্রাকশনের প্রবক্তারও সমালোচনা করেছেন ফিলিপ রহু এবং ফ্রাঙ্ক কারমোডে। তাঁরা বেশ ঝাঁঝের সঙ্গেই বলেন "এই নতুন ডি-কনস্ট্রাকশন-বিদ্‌দের উচ্চারণ সাহিত্য সমালোচনার ইতিহাসে নন্দনতত্ত্ব এবং ফ্যাসিসিজমের লড়াই বলে মনে হয়।" জোন-আর সার্লে বলেন এই উচ্চকিত ডি-কন্‌স্ট্রাকশন সম্পূর্ণ অর্থহীন অস্পষ্টতায় পর্যবসিত হয়েছে; প্রধান সৃষ্টিশীল কাজ সাহিত্য শিল্প থেকে সরে এসে তাত্ত্বিক ধারণায় পর্যবসিত হয়েছে। সত্তল বিলো মনে করেন "ডিকন্‌স্ট্রাকশনের অধ্যাপকেরা এখন ইংরেজি এবং দর্শন উভয় বিভাগেরই নিয়ন্ত্রক।" তার চেয়েও মারাত্মক, বিলো মনে করেন—

> এই নবীন ডি-কন্‌স্ট্রাকশন (নব্য বিদ্যার্থীরা) কক্‌পিটে বসে সহ্‌পাইলটের মতো ডি-কন্‌স্ট্রাক্‌শনের সঙ্গে শেক্সপীয়র, মিল্টন প্রভৃতিকে নিয়ে সমগ্র সাহিত্যই যেন নিয়ন্ত্রণ করছেন। এ যেন, হায় ঈশ্বর! শেকস্‌পীয়রের কোলে বসে কল্পনা করছেন এক বামন তিনি শেকস্‌পীয়রকে উড়িয়ে নিয়ে যাচ্ছেন।[১৪]

কিন্তু এসব সমালোচনা সত্ত্বেও দেরিদা বেশ জোরালো যুক্তিতেই বলেন, আমাদের সমস্ত চিন্তার বীজায়নে যে বস্তুত্ব, তার পূর্ণছেদ অচিন্ত্যনীয়। তাছাড়াও ডি-কনস্ট্রাকশন তো এতদিনকার সাহিত্যায়নের ঈশ্বরত্বের (প্রভুত্বের) উপর পূর্ণ আস্থা অথবা বিশ্বাস রাখতে পারছেনা কারণ তা প্রশ্নাতীত ও অপ্রতিরোধ্য নয়। ডি-কনস্ট্রাকশন বস্তুত্বের সমাপ্তি ঘোষণা করে না স্থানান্তরণ করে। দেখিয়ে দেয় এই স্থানান্তরণ ওই পাঠকৃতির মধ্যেই এমন কতকগুলি কারণ ও উপকরণে কী ভাবে ত্বরান্বিত করে। যে-বিশ্বাসের ভিত্তিতে বস্তুত্ব গড়ে উঠেছিল তা-ই কেমন নড়বড়ে এবং অপ্রয়োজনীয় বলে প্রতিভাত হয় তখন। কিন্তু তাতে প্রতীকতায় ও সাহিত্যায়নে কোন বিপ্রতীপতা সৃষ্টি করেনা। মার্কসীয় সাহিত্যতত্ত্ব, নারীবাদ, সাহিত্যের রাজনীতি ইত্যাদি চিন্তাগুলি অনায়াসেই তাই এসে যেতে পারে। ক্রমশ প্রতিষ্ঠা পায় তখন বহু কণ্ঠস্বর। স্বরান্তর। মাত্রান্তরণ।

এবার একটি উদাহরণ গ্রহণ করা যাক। উদাহরণটি আমাদের বেশ পরিচিত কোন গ্রন্থ অবলম্বনে হলে সকলের পক্ষেই বুঝতে সুবিধা। তাই *পথের পাঁচালী*-ই ধরা যাক। প্রসঙ্গত ধরে নিচ্ছি গ্রন্থটি শুধু আমাদের পড়াই নয়; খুব ভাল করেই পড়া। মনে রাখা দরকার ডি-কনস্ট্রাক্‌শন তত্ত্বের প্রযুক্তিগত বিশ্লেষণই উদাহরণটির বিনির্মিত পাঠ তুলে আনতে পারে। এক সময়ের বহুল জনপ্রিয় গ্রন্থ *পথের পাঁচালী* প্রথম প্রকাশিত হয়েছিল ১৯২৯-এ। ১৯৭২-এ মিত্র অ্যাণ্ড ঘোষ বইটির পেপার-ব্যাক সংস্করণ বের করেন। ১৯৭২ থেকে ১৯৯০ (সম্ভবত আরো বেশি) এই আঠারো বছরের মুদ্রণের ইতিহাস দেখলে দেখা যাবে বইটি দশবার মুদ্রিত হয়েছে। মুদ্রণ সংখ্যা প্রতি বছরে চার হাজার। অর্থাৎ আঠারো বছরে দশবার মুদ্রণে ৪ × ১০ = ৪০ হাজার কপি বইটি মুদ্রিত হয়েছে। এই সংখ্যা, বইটির চাহিদা অনুযায়ী, জনপ্রিয়তার সূচক।

বর্তমান আলোচনা বইটির দশম-মুদ্রণ অবলম্বনে করা হচ্ছে। এই মুদ্রণে বইটি দু'শ পনেরো পৃষ্ঠায় সমাপ্ত। এর মধ্যে অন্তর্ভুক্ত আছে একটি আঠারো পৃষ্ঠার ভূমিকা। বাকী এক'শ সাতানব্বই পৃষ্ঠার মধ্যে অন্তত এক'শ পৃষ্ঠাব্যাপী আমাদের জীবনের একটি অপরিহার্য ব্যবহারিক উপকরণ বার বার উল্লিখিত হয়েছে যা কেবল বিষয় ভিত্তিকই নয়, সমগ্র উপন্যাসটির গতিপথের নিয়ন্ত্রকও হয়ে উঠেছে। কিন্তু সে-সম্পর্কে কোনো পূর্ব-নির্ধারক সূত্রাবলী অবলম্বন না করে কিছুটা আপাত এলোমেলো বিষয় প্রথম দেখা যেতে পারে। এক দগ্ধ গ্রীষ্মে :

> পালিতদের বড় মাচার তলায় গোলার পাশে ইন্দির ঠাকরুণ মরিতে ছিল একথা সত্য। হরিহরের বাড়ি হইতে ফিরিতে ফিরিতে তাহার গা কেমন করে, রৌদ্রে আর আগাইতে না পারিয়া এখানেই শুইয়া পড়ে। ফণী চক্রবর্তীর হাতের গঙ্গাজল তার মুখের ভিতর গেল না...ফণী বুড়ির চোখের পাতা বুজাইয়া দিতেই কোটরাগত অনেকখানি জল শীর্ণ গাল দু'টা বাহিয়া গড়াইয়া পড়িল।

বলা বাহুল্য এই মৃত্যুর শারীরিক নিষ্ক্রিয়তার বর্ণনায় অধিক গুরুত্ব নেই। বস্তুত মৃত্যুর অব্যবহিত পূর্বে যে-কোনো মানুষের শারীরিক অবস্থা এরূপ হতেই পারে। ইন্দির ঠাকরুণ যে-অবস্থার মধ্যে মারা গেলেন সেটিই বরং ভেবে দেখার বিষয়। বৃদ্ধাবস্থায় দু'টো কথা বলার একটু সহানুভূতি দেখানোর সামান্য সেবা যত্ন করার কেউ ছিল না। ছিল না কোনো সুখকর শান্তিময় আশ্রয়। মধ্যরাতে হামানদিস্তায় চালভাজা গুঁড়ো করে খেতে হয়েছে। মাঝে মধ্যে এক-আধটা বিচেকলা ভাগ্যে জুটেছে। নিশ্চিন্দিপুরে হরিহরের যে সংসারে তিনি আশ্রিতা ছিলেন সে-সংসারও দারিদ্র্য-নিষ্পেষিত। গ্রন্থারম্ভেই তার বর্ণনা পাওয়া যায়।

> নিশ্চিন্দিপুরের গ্রামের একেবারে উত্তরপ্রান্তে হরিহর রায়ের ক্ষুদ্র কোঠাবাড়ী। হরিহর সাধারণ অবস্থার গৃহস্থ, পৈতৃক আমলের সামান্য জমিজমার আয় ও দু'চারি ঘর শিষ্য-সেবকের বার্ষিক প্রণামীর বন্দোবস্ত হইতে সাদাসিদেভাবে সংসার চালাইয়া থাকে।...পূর্বদিন ছিল একাদশী। হরিহরের দূর সম্পর্কীয় দিদি ইন্দির ঠাকরুণ সকালবেলা ঘরের দাওয়ায় বসিয়া চালভাজার গুঁড়া জলখাবার খাইতেছে।

পথের পাঁচালী-র 'বল্লালী বালাই' অধ্যায়ের সূচনাতেই আমরা তাহলে আর্থ-সামাজিক কিছু খবর পেয়ে যাচ্ছি। এই সংবাদ থেকে জানা যাচ্ছে যে হরিহরের আর্থিক অবস্থা আদৌ ভালো ছিল না। সামাজিক দিক থেকে দ্বিতীয় দ্বার পরিগ্রহ বিপত্নীকের নিকট সহজ ছিল, ঘরজামাই থাকার রীতি এবং কুলীন ব্রাহ্মণ ও বহু বিবাহ প্রচলিত বিধবা বিবাহ অপ্রচলিত সামাজিক জীবনের ছবি হরিহরের পিতা রামচাঁদ এবং দিদি, ইন্দির ঠাকরুণের জীবনের কথা থেকে জানা যাচ্ছে। জানা যায় "শ্বশুরের মৃত্যুর পর হরিহরের পিতা রামচাঁদের এ গ্রামে...জমিজমাও ছিল না, নগদ টাকাও বিশেষ কিছু" ছিল না। "দুই চারিটি শিষ্য-সেবক এদিক-ওদিক জুটিয়েছিল, তাহাদের দ্বারা কোনো রকমে সংসার চালাইয়া পুত্রটিকে মানুষ করিতে থাকেন।" দেখা যাচ্ছে বর্ণিত সমাজে যজমানি বৃত্তিতে "কোনো রকমে সংসার" চালানোর যে উপায় ছিল তা পরবর্তী প্রজন্মে, হরিহরের জীবনেও দারিদ্র্যের সংগ্রামী হাতিয়ার হয়ে টিকে থাকলেও তার ভাঙন সুনিশ্চিত হয়ে এসেছিল। হরিহরের গ্রাম ছাড়া কাশীর কথকথার জীবন, অপু কর্তৃক পিতার বৃত্তি

গোপন করার চেষ্টার মাধ্যমে এবং আরো পরে অপুর নিজের জীবনে সেই আর্থ-সামাজিক পরিবর্তনের ছবি সত্য হয়ে উঠেছিল।

বস্তুত এখানেই *পথের পাঁচালী*-র বীজ-রূপটি প্রতিভাসিত হয়ে উঠেছে। আর এরই মধ্যে বিত্তবিহীন, বিধবাজীবন ইতিহাসের জীর্ণ ধুলোয় অপ্রয়োজনীয়, দীন, ভার হয়ে ওঠে কেমন করে তা দেখা গেছে।— ইন্দির ঠাকরুণের সম্পদ ও সম্পত্তির মধ্যে ছিল একটি পেতলের ঘটি, একটি মাটির ছোবা ও গুটি কয়েক মাটির ভাঁড় আর একটি ছেঁড়া মাদুর। তাঁকে দরিদ্র বলা যায় না। তারও নীচে আহার প্রার্থিনী ছিলেন। লোহার হামান দিস্তায় চাল গুঁড়ো করে খেতে হত তাঁকে। অথচ তাঁরও ঘরের স্বপ্ন ছিল। কিন্তু বহুবিবাহিত বৃদ্ধ কুলীন ব্রাহ্মণ স্বামীর মৃত্যু হয়েছিল ইন্দিরের যৌবন আসার পূর্বেই। যে-কন্যাসন্তান তাঁর মাতৃত্বের পরিচয় বহন করে এসেছিল সেও দারিদ্র্যের অনিবার্য পরিণতিতে কবে মারা গেছে; বোধহয় তা তার মার ভালো করে আজ আর মনে আসে না। সহায় সম্পদহীনা পরাশ্রয়ী বিধবার কোনো সামাজিক নিরাপত্তাই ছিল না। থাকা সম্ভব ছিল না সেই আর্থ-সামাজিক হাহাকারের মধ্যে।

পথের পাঁচালী-র দ্বিতীয় মৃত্যুর প্রসঙ্গটিও দেখুন। "নিমছাল সিদ্ধ দুর্গা আর খাইতে পারে না, তাহার অসুখ একভাবেই আছে। ঔষধ নাই, ডাক্তার নাই, বৈদ্য নাই। বলে— এক পয়সার সাবু জোটে না, তায় বিস্কুট!

বৈকাল বেলা হইতে আবার ভয়ানক বৃষ্টি নামিল। বৃষ্টির সঙ্গে ঝড়ও যেন বেশি করিয়া আসে— ঘোর বর্ষণমুখর নির্জন, জলে থৈ থৈ, হু হু পুবে হাওয়া, মেঘে অন্ধকার একাকার ভাদ্রসন্ধ্যা।...দরজা জানালা দিয়া ঠাণ্ডা হাওয়ার ঝাপটার সঙ্গে বৃষ্টির ছাট্ হু হু করিয়া ঢোকে— ছেঁড়া থলে ছেঁড়া কাপড়-গোঁজা ভাঙা কবাটের আড়ালের সাধ্য কি যে ঝড়ের ভীম আক্রমণের মুখে দাঁড়ায়। সর্বজয়ার ঘুম আসে না...সে যেন আর বসিয়া থাকিতে পারে না— কয়দিন সে ওলশাক কচুশাক সিদ্ধ করিয়া খাইয়া দিন কাটাইতেছে— নিজে উপবাসের পর উপবাস দিয়া ছেলেমেয়েকে যাহা কিছু সামান্য খাদ্য ছিল খাওয়াইতেছে— শরীর ভাবনায় অনাহারে দুর্বল, মাথার মধ্যে কেমন করে।

"জলের ছাটে ঘর ভাসিয়া যাইতেছে...ঘুমন্ত অপুর গা জলে ভিজিয়া ন্যাতা হইয়া যাইতেছে...পাশ ফিরে শো তো দুর্গা। বড্ড জল পড়ছে...হে ঠাকুর, আজকের রাতটা কোনো রকমে কাটিয়ে দাও, হে ঠাকুর ওদের মুখের দিকে তাকাও।—তখনো ভালো করিয়া ভোর হয় নাই...ব্যস্তভাবে বলিল—ন'দি, একবার বট্‌ঠাকুরকে ডাক দিকি?...দুগ্‌গা কেমন করচে!

"পরবর্তী ঘটনা সংক্ষিপ্ত। নীলমণি মুখুজ্যের চেষ্টায় নবাবগঞ্জ থেকে শরৎ ডাক্তার এসে দেখে ওষুধ দিলেও দুর্গার জ্বর আবার বাড়িল। হরিহরকে দ্বিতীয় পত্র দেওয়া হল। তবু বৃষ্টি থামল। ঝড় বন্ধ হল। শরতের রোদ্দুর উঠল। দুর্গার জ্বর ছাড়ল। অপুকে একদিন রেলগাড়ি দেখানোর কথাও বলল। কিন্তু সকাল দশটায় নীলমণি অপুদের বাড়ির দিক থেকে একটা কান্নার আওয়াজ শুনতে পেলেন। দেখা গেল—

"সর্বজয়া মেঝের উপর ঝুঁকিয়া পড়িয়া বলিতেছে— 'ও দুগ্‌গা চা দিকি— ওমা ভাল করে চা দিকি— ও দুগ্‌গা!...দুর্গা আর চাহিল না'।

"আকাশের নীল আস্তরণ ভেদ করিয়া মাঝে মাঝে অনন্তের হাতছানি আসে—পৃথিবীর... ছেলে মেয়েরা চঞ্চল হইয়া...অনন্ত নীলিমার মধ্যে ডুবিয়া নিজেদের হারাইয়া ফেলে...দুর্গার

অশান্ত, চঞ্চল প্রাণের বেলায় জীবনের সেই সর্বাপেক্ষা বড় অজানার ডাক আসিয়া পৌঁছিয়াছে।"

এই দীর্ঘ উদ্ধৃতি থেকে এবার দেখা যাক শরৎ ডাক্তারের রোগ নির্ণয় ও তৎসম্পর্কিত মৃত্যুর কারণ 'ম্যালেরিয়ার শেষ স্টেজ' খুব জ্বরের পর বিরাম জনিত দুর্বলতায় হার্টফেল, না গল্পের কথকের জীবনবোধ— 'অনন্ত নীলিমার হাতছানি', না কি অন্য কিছু।

অবশ্যই অন্য কিছু। ম্যালেরিয়ায় কি দুর্গা একাই ভুগত? নিশ্চিন্দিপুর গ্রামের অন্য ছেলে মেয়েদের ম্যালেরিয়ায় ভোগার কোনো খবর তো পাওয়া যাচ্ছে না। সুতরাং দুর্গার মৃত্যুর এই কারণ একটি উপলক্ষ মাত্র। তার মৃত্যুর কারণ অন্যত্র। তার অসুখের চিকিৎসায় ডাক্তার, বৈদ্য তো অনেক দূরের কথা, এক পয়সার নোন্‌তা বিস্কুট পর্যন্ত জ্বরমুখে তার জোটেনি। তার মা অন্নাভাবে শাকসিদ্ধ খেতে বাধ্য হয়েছে তাও সবদিনে নয়। উপোষও করতে হয়েছে। তাদের অর্গলহীন ঘর ঝড়ের ঝাপটায়, বৃষ্টির জলে ভেসে গিয়েছে— খড়ের চাল ফুটো হয়ে বৃষ্টির জল অসুস্থ দুর্গাকে বিছানাশুদ্ধ ভিজিয়ে দিয়েছে, বালক অপু রাতে ঘুম চোখে বৃষ্টির জলে ভিজে গেছে। সেই প্রাকৃতিক রুদ্ররোষ থেকে তাদের বাঁচবার কোনো উপায় ছিল না। সীমাহীন দারিদ্র্য মোচনের আশায় হরিহর অনেকদিন দেশে-গাঁয়ের বাইরে। "ঘর সারাবে কি, খাবার নেই ঘরে, নৈলে কি এ রকম আতান্তরে ফেলে কেউ বিদেশে যায়?"

"ঘরে একটা দানা নেই— দু'টোখানি বাসি চালভাজা মাত্র আছে। অপু কান্নাকাটি করে...আমার খিদে পায়না বুঝি— আমি দু'টি ভাত খাব— হুঁ-উ।" "এই ভাঙা ঘর টানা-টানির সংসার— অপু মানুষ হোলে আর এ দুঃখ থাকবে না। ভগবান তাকে মানুষ করে তোলেন যেন।" এই সমস্ত তথ্য বারবার আমাদের বুঝিয়ে দেয় দুর্গা কোনো অলৌকিক অনন্তের হাতছানিতে অন্তহীন নীলিমার মধ্যে হারিয়ে যায়নি। তার ম্যালেরিয়া না হয়ে টাইফয়েড হলেও সে বাঁচত না। সে অসীম দারিদ্র্যের শিকার হয়েছে। সমবয়সী খেলার সাথীদের মতো সে চিনিবাস ময়রার মিষ্টি কিনে খেতে পারেনি। তার নিষ্পাপ সরল ভাইটির সাধ মেটাতে পারেনি। কারণ তারা গরিব। পয়সা ছিল না। সে যে বনে জঙ্গলে ঘুরে ঘুরে আম, জামরুল, বৈঁচি ফল খেয়ে আর সংগ্রহ করে বেড়াত তার কারণ সে চঞ্চল প্রকৃতি-মুগ্ধ এক গ্রামীণ অশান্ত কিশোরীই কেবল নয়, ঐ বয়সটা সব ছেলে-মেয়েদেরই বাড়ার বয়স। সে বয়সে প্রাকৃতিক নিয়মেই যে পরিবর্তন আসে তা কেবল শারীরিক নয়। মানসিকও। কিন্তু সবচেয়ে বড় অদমিত পরিবর্তন আসে ক্ষুধাবোধে। সে খেতে চায়। সর্বজয়ার অভাবের সংসারে তেমন খাবার জিনিস ছিল না। যতটুকু থাকত পুত্র সন্তানের প্রতি যে অযৌক্তিক পক্ষপাতিত্ব আমাদের সমাজে ছিল তার কৃপায় একটু অপুর ভাগ্যেই জুটত। দুর্গার ব্যবস্থা, সে মেয়ে হওয়ায় আরো বেশি করে, নিজেকেই করতে হয়েছে। তার জীবনে নীরেন প্রসঙ্গটিও এই কারণ-সংশ্লিষ্ট।

গ্রামীণ সমাজ ব্যবস্থায় কুলীন-বিবাহের মতো বাল্যবিবাহও যে মেয়েদের মানসিকতা গঠনে একটা গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা নিত তাতে কোনো সন্দেহ নেই। আর্থ-সামাজিক কারণে সেই প্রচলনও মর্মান্তিক রূপ নিত। দুর্গার জীবনে তার অভিঘাত ভয়াবহ হয়ে নেমে এসেছিল। তুলনামূলকভাবে শহুরে নীরেনের সচ্ছলতা দুর্গার স্বপ্ন চূর্ণ করে দেয়। তার অভাবপিষ্ট গ্রামীণ জীবনে নীরেনকে ঘিরে ঘরের স্বপ্ন দেখা আদৌ বাস্তবায়িত হতে পারেনি। অথচ দুর্গাও স্বপ্ন দেখতে চায়। তার মনের গভীরে বিবাহিত নারীর সিঁথির সিন্দূরের ধারণা

সে বয়সেই মূলাশ্রিত হয়ে গিয়েছিল। তাই তো সে সতী নারীর মতো দুর্বিষহ অত্যাচার অপমান হজম করেও চুরি করা সোনার সিন্দুর কৌটোটি তার জীবন থাকতে বের করে দেয়নি। তার লোভ সোনার কৌটোটির প্রতি ছিল না। তার চেয়ে অনেক অনেক মূল্যের বলে প্রাণ দিয়ে আঁকড়ে ধরে ছিল সিঁদুরটুকু, এয়ো জীবনের কী মর্মান্তিক সংস্কার, কী গভীর জীবনস্বপ্ন! অথচ তা দুর্গার জীবনে কখনোই সম্ভাবিত হওয়ার ছিল না। সেই আর্থ-সামাজিক পরিবেশ দু'বেলা দু'মুঠো ভাতই দেয়নি, তার এই রোমাণ্টিক আকাঙ্ক্ষা কী ভাবে চরিতার্থ হবে।

এবার তা হলে স্বীকার করতে হয় *পথের পাঁচালী*-র দ্বিতীয় মৃত্যুর কারণও তীব্র অর্থনৈতিক এবং সামাজিক অভাব ও বৈষম্যজনিত ঘটনা। রোগ, দর্শন মূল কারণ নয়। সমর্থনে আরও বিশ্লেষণ সম্ভব কিন্তু তার প্রয়োজন নেই।— বরং দেখা যাক তৃতীয় মৃত্যুটি। একটু আগে থেকেই দেখা যাক। হরিহর হঠাৎ অসুস্থ। তাকে দেখানোর জন্য নন্দবাবু ডাক্তার এনেছেন। তার ব্রঙ্কো নিমোনিয়া হয়েছে, ভালো পথ্য ও নার্সিং চাই বলে ওষুধের ব্যবস্থাপত্র লিখে দিয়েছেন ডাক্তার। কিন্তু— "বিশেষ কোনো ফল দেখা গেল না। দিন দিন হরিহর দুর্বল হইয়া পড়িতে লাগিল। এদিকে টাকা যে কয়টি ছিল— ভিজিটে ও পথ্যে খরচ হইয়া গেল।" রান্না বন্ধ। ছত্তরের দরিদ্রনারায়ণসেবার খাদ্য অপুর মুখে যায় না। সর্বজয়া অড়হরের ডাল ভিজিয়ে খায়। ওদিকে নন্দবাবুর আসল চরিত্র প্রকাশ পেলে "সর্বজয়া পড়িল মহা ফাঁপরে। বিদেশ জায়গা, এই রোগী ঘরে নিঃসহায়, হাতে একটি পয়সা নাই, একটি পরিচিত লোক কোনো দিকে নাই ছেলের বয়স মোটে এগারো...বুদ্ধি শুদ্ধি নাই,...ঐদিকে এই সব উৎপাত।"

"অপুর মনে হইল বাবা তাহাকে আরও কাছে সরিয়া আসিতে বলিতেছে। অপু সরিয়া আসিতে হরিহর রোগশীর্ণ ক্ষীণ দুই হাতে ছেলের গলা জড়াইয়া ধরিয়া নীরবে তাহার মুখের দিকে অনেকক্ষণ ধরিয়া একদৃষ্টে চাহিয়া রহিল।...বাবার চোখের ওরকম দৃষ্টি কখনো সে দেখে নাই।...রাত্রি দশটার সময়...ঘুম ভাঙিয়া গেল।...বাবার গলার মধ্যে নানা সুরে যেন কি একটা শব্দ হইতেছে। তাহার কেমন ভয় ভয় ঠেকিল।...সব মিলিয়া যেন একটা দুঃস্বপ্ন।...

"শেষরাত্রে তাহার মায়ের ঠেলা পাইয়া তাহার ঘুম ভাঙ্গিয়া গেল। অপু, ও অপু ওঠ, শীগগির গিয়ে ওপর থেকে হিন্দুস্থানী বৌকে ডেকে আন্‌তো— অপু উঠিয়া শুনিল বাবার গলার সেই শব্দটা আরও বাড়িয়াছে। উপর হইতে সুরজ কুঁয়ারী আসিবার একটু পরেই রাত্রি চারটার সময় হরিহর মারা গেল।"

হরিহর রায় তার সারাটা জীবন ধরেই একটা নঞর্থক অব্যয় নিয়ে ছুটতে ছুটতে একসময় মুখ থুবড়ে পড়ে শেষ হয়ে গেল। এই নঞর্থক অব্যয়টি হল অর্থনৈতিক 'না'; দারিদ্র্য। না পাওয়ার হতাশা। দুটো পয়সার আশায় সে গ্রাম ছেড়ে শহরে গেছে। বৌ ছেলে মেয়ের মুখে একটু সুখের হাসি যদি এনে দিতে পারে তার আশায়। কিন্তু সে এ-ও বুঝেছিল সমাজব্যবস্থার একটা পরিবর্তন হচ্ছে। যজমানি করে পৌরোহিত্য করে আর সংসার চালানো সম্ভব নয়। যদিও কৃষ্ণনগরের নিকটে রক্ষিত বাড়িতে সে পূজাপাঠের কাজটুকু তার সম্বল হিসেবে ধরে রেখেছিল কিন্তু এই বামুনগিরি যে বল্লাল সেনের আমল থেকে বৃত্তি রূপে চলে আসছিল তা

পরিবর্তিত সামাজিক অর্থনৈতিক কাঠামোয় বদলে যাচ্ছিল ; এই অমোঘ সত্যটি *পথের পাঁচালী* গ্রন্থে স্পষ্ট হয়েই উঠেছে।

বিধবা বৌদি মেয়ে অতসী ও ছেলে সুনীলকে নিয়ে ভুবন মুখুজ্যের বাড়িতে উঠেছেন। "সুনীলের মা নগদে ও কোম্পানীর কাগজে দশ হাজার টাকার মালিক....সর্বজয়া নির্বোধ হইলেও বুঝিতে পারিল যে, সুনীলের মা তাহাকে ততটা আমল দিতে প্রস্তুত নহেন। তাহার স্বামী চিরকাল বড় চাকুরী করিয়া আসিয়াছেন, তিনি ও তাহার ছেলে মেয়ে অন্যভাবে জীবন যাপনে অভ্যস্ত।....সর্বজয়াদের দরিদ্র সংসারের চালচলন হইতে উহাদের ব্যাপারের বহু পার্থক্য।"

অন্যদিকে দরিদ্র সর্বজয়ার স্বপ্ন : "ছেলে স্কুলে পড়িয়া মানুষ হইবে এ উচ্চ আশা তাহার নাই।....তাহার যে সব শিষ্য বাড়ি আছে, ছেলে আর কিছুদিন পরে সে সব ঘরে যাতায়াত করিবে, সেগুলি বজায় রাখিবে, ইহাই তাহার বড় আশা। আরও একটা আশা...গ্রামের...সকলেই মত প্রকাশ করিয়াছেন যে, তাঁহারা ইহার পর অপুকে দিয়া কাজকর্ম করাইবেন...গ্রামের মনসা পূজায়....তাহাদের আয়োজনের সঙ্গী হইয়া থাকিবে।"

আদ্য শ্রাদ্ধের নিমন্ত্রণে সুনীল ও অপু অন্যদের দেখে ছাঁদা বেঁধে বাড়ি ফিরলে সুনীলের "মা, বলিলেন— অপু আনবে না কেন— ও ফলারে বাঁমুনের ছেলে। ও এরপর ঠাকুরপুজো করে ছাঁদা বেঁধে বেড়াবে— ওই ওদের ধারা।....কুসঙ্গে পড়ে যত কুশিক্ষে হচ্ছে।" কিন্তু পরিবর্তিত সমাজব্যবস্থা অনিবার্য হয়ে উঠেছিল।

হরিহরের মৃত্যুর সঙ্গে এই সব ঘটনার যোগ আছে। পৈত্রিক ভিটা ছেড়ে প্রৌঢ় বয়সে, হরিহর নতুন করে সুখের মুখ দেখার আসায় কাশী এসেছিল। অদৃষ্টের পরিহাসে সেই পুণ্যস্থানেই সে ইহলোক ত্যাগ করে গেল। কাশীর সচ্ছল সুখের জীবনস্বপ্নে হরিহর, সর্বজয়া দু'জনেই আচ্ছন্ন হয়েছিল। কিন্তু কাশী তাদের আশানুরূপ সুখ তো দিল না!

"হরিহরের বাসাটা বিশেষ ভাল নয়। নীচের তলায় স্যাঁতসেঁতে ঘর, তাও মাত্র দু'খানি, এত অন্ধকার যে হঠাৎ বাহির হইতে আসিলে ঘরের কোনো জিনিস নজরে পড়ে না।....স্যাঁতসেঁতে মেঝে ও অন্ধকারে সর্বজয়ার মাথা ধরে। অপু তো মোটেই ঘরে থাকে না।...বদ্ধ ঘরের অন্ধকারে তার প্রাণ হাফাইয়া ওঠে।"

হরিহর তার লেখার চর্চা বাক্স বন্ধ রেখে উপলব্ধি করেছে। "যৌবনের স্বপ্নজাল জীবনমধ্যাহ্নে কুয়াশার মত দিগন্তে মিলাইয়া গেল।" অপু বন্ধুদের নিকট তার বাবার 'কথকঠাকুরে'র নতুন পেশার কথা বলতেও লজ্জাবোধ করেছে। কথকথায় বসে তার বাবা তাকে দেখতে পেয়ে ডাকলেও অপু বন্ধুদের সঙ্গে চলে যায়। বন্ধু জিজ্ঞাসা করে, "চেনে নাকি।" অপুর সংক্ষিপ্ত উত্তর "হ্যাঁ"। পিতৃপরিচয় দিতে তার বাধে। সে বলেছে কাশীতে হাওয়া বদলের জন্য তার বাবা এসেছে। দেশে তাদের মস্ত বড় বাড়ি, জমি জায়গা, তার বাবা কনট্রাক্টারি করেন।

অপুর এই বানানো কথার পেছনে কিন্তু একটা ইন্টার-অ্যাকশান্ অথবা আন্তর বিক্ষোভ কাজ করছিল। উনবিংশ শতকের শেষ দিক থেকে গ্রাম ছেড়ে ভাগ্যান্বেষণে শহরাভিমুখী হয়ে ওঠার একটি সামাজিক আর্থ কাঠামো সক্রিয় ছিল। মধ্যবিত্ত মানসিকতারও জন্ম এখানে। বংশগত বৃত্তির বলয়ে আর ধরে রাখা যাচ্ছিল না সেই জন-মানসিকতা। পাট, কয়লা, বা রেল, অন্যান্য কলকারখানা (যেমন চিনির কল, গেঞ্জির কল বা হোসিয়ারি, বেকারি) শহরে লোক

টানছিল। ১৮৯৭ থেকে ১৯০৬ পর্যন্ত একটি পরিসংখ্যান নিলে দেখা যাবে কীভাবে দলে দলে লোক গ্রাম ছেড়ে শহরাভিমুখী হচ্ছিল তখন। দেখুন—

শিল্প	সাল	শ্রমিক সংখ্যা
পাট	১৮৭৯-৮৭	২৭,৪৯৪
	১৮৯৫-৯৬	৭৮,১১৪
	১৯০২-০৩	১৮,৯০৪
	১৯০৬	১৫৪,৯৬২
কয়লা	১৮৯৪	৩০,৭৭৩
	১৯০৩	৭৪,৫৩৮
	১৯০৪	৭৫,৭৪৯
চা	১৮৯০	৪০৬,০৮৯
	১৯০০	৬৬৬,৮৯৭

এই সমস্ত শিল্প নিয়ে শহর ও শহর উপকণ্ঠের যে মধ্যবিত্ত জন-মানসিকতা গড়ে উঠেছিল তাও কেবল কেরানি জীবনে সীমাবদ্ধ ছিল না। ভোরের বাতাসে কলের চিমনির ধোঁয়ায়, মিলের বাঁশির ডাকে শ্রমিক তথা মেহনতি সমাজের জন্ম হয়েছিল। অর্থনৈতিক অবস্থার বদলে শহর ও উপকণ্ঠের পরিকাঠামোরও বদল আসতে শুরু করেছিল। বড় বড় বাড়ি, কল, কারখানা, স্কুল, কলেজ, হাসপাতাল, পৌরসভা, বাজার, রাস্তা এসব নির্মিত হতে লাগল। সেখানেও শ্রমিকের ও শ্রমিক খাটানোর কন্ট্রাক্টারি'র আর্থ উপযোগিতা 'কথক ঠাকুর' অথবা 'পূজারী বামুনে'র বৃত্তি অপেক্ষা অনেক বেশি সামাজিক সম্মানের বলে মনে হয়েছিল।— আসলে পুরোহিত বৃত্তির বদলে কথকথা, পুরাণপাঠ, ভগবত পাঠ করেও হরিহর তাই ছোট পরিবার প্রতিপালনে অসমর্থ হয়ে উঠেছিল। অপুকে স্কুলে ভর্তি করলেও ছত্তরে গিয়ে তাকে খেতে হয়েছে। অসুখে পথ্য, ওষুধ ও চিকিৎসার ব্যবস্থা ঠিক মতো হয়নি। "একসের দুধ ও অন্যান্য ফল" পথ্য তার কপালে জোটেনি। "সংসারটা গুছিয়ে ব'সে" হরিহর পালাগান লিখবার আর সুযোগ পায়নি। সুতরাং যে মৃত্যু ব্রঙ্কো নিউমোনিয়ায় ঘটেছিল, সম্ভবত এখন স্পষ্ট বোঝা যাচ্ছে, সেটা এক প্রকারের আর্থ-সামাজিক কারণে সংঘটিত মৃত্যু। বস্তুত *পথের পাঁচালী*-র গতিপথটি এই আর্থ-সামাজিক পরিস্থিতির দ্বারাই নিয়ন্ত্রিত। এই বিষয়টিই এখানে 'Power'। একটি অপ্রতিরোধ্য ক্ষমতা। এরই জন্য ইন্দির ঠাকরুণ 'বালাই', এরই জন্য আম আঁটির ভেঁপু মথুরায় গেছে। নিশ্চিন্দিপুর ছেড়ে কাশী, কাশী ছেড়ে কলকাতার উপকণ্ঠে এসেছে ঘটনা, চরিত্র ও তাদের সমস্যা। এরই জন্য ইন্দির-দুর্গা-হরিহরের মৃত্যুর অনিবার্যতা। এখন বুঝতে অসুবিধা হয় না যে *পথের পাঁচালী* কেবল প্রকৃত রোমান্টিক ভালোলাগার 'পাঠ' নয়। এই পাঠে জীবনের যে একটা গভীর বাস্তব সত্যের সন্ধান পাওয়া যায় তাকে তো অস্বীকার করা কিংবা উপেক্ষা করা যায় না। এ সমস্যা কেবল হরিহর সর্বজয়ার সংসারে, অপু-দুর্গার জীবনে, ইন্দির ঠাকরুণের করুণ ভাগ্যের সঙ্গে বিজড়িত কোনো পারিবারিক সমস্যা নয়। এই অর্থনৈতিক সামাজিক সমস্যা একটি 'ইন্টার‍্যাক্‌শান' বা আন্তর বিক্ষোভের তীব্রতাও সৃষ্টি করেছে।

হরিহর সংসার চালানোর জন্য সত্যিই বাউণ্ডুলের জীবনে নিশ্চেষ্ট বসে থাকেনি। সে স্বভাবত হয়তো অবাস্তব কাল্পনিক ছিল; কিন্তু জীবনসংগ্রাম তার চালু ছিল। দশঘড়ার মাতব্বর *পাঁচ-ছ গোলাবাড়ি সম্পন্ন, মোটা পয়সাওয়ালা লোকটা হরিহরকে প্রণাম করে তার নিকট* 'মন্তর' নেবার যে প্রস্তাব করেছিল তার কথা সর্বজয়াকে হরিহর বেশ রসিয়ে কষিয়ে বলেছে। সর্বজয়া স্বামীর অর্থাগমের সম্ভাবনায় খুশি হয়েছে— "হ্যাঁ গা তা মন্দ কি? দাও না ওদের মন্তর? কি জাত? হরিহর সুর নামাইয়া বলিল— ব'লো না কাউকে । সদ্‌গোপ। তোমার তো আবার গল্প করে বেড়ানো স্বভাব।" দেখার বিষয় অর্থনৈতিক অবস্থার জন্য ব্রাহ্মণের বেড়া ভাঙছে। 'মন্তর' আর কেবল উঁচু জাতের গণ্ডীতে আবদ্ধ নয়; তা সদ্‌গোপের মধ্যেও স্থান নিচ্ছে। এবং সেই ভাঙনের পৌরোহিত্য করতে হচ্ছে ব্রাহ্মণকেই। কারণ ব্রাহ্মণ গরিব। সদ্গোপ বিত্তবান। পাওনাদারদের হাত থেকে বাঁচতে, ছেলে-বৌয়ের বস্ত্র-লজ্জা ঢাকতে এখন আর সদ্গোপ আর ব্রাহ্মণের জাত বিচার চলে না। অন্যত্র দেখুন :

"চিনিবাস হরিহরের দুয়ার দিয়া গেলেও ও বাড়ি ঢুকিল না। কারণ সে জানে এ বাড়ির লোক কখনো কিছু কেনে না।

"ভুবন মুখুজ্যে অবস্থাপন্ন লোক বাড়িতে পাঁচ-ছয়টা গোলা আছে।....ভুবন মুখুজ্যের... সেজ ভাইয়ের বিধবা স্ত্রী এ সংসারের কর্ত্রী।.... সেজ-বৌ...চিনিবাসের নিকট হইতে মুড়কী, সন্দেশ, বাতাসা, দশহরা পুজোর জন্য লইলেন। ভুবন মুখুজ্যের ছেলে মেয়ে ও তাহার নিজের ছেলে সুনীল সেখানেই দাঁড়াইয়া ছিল, তাহাদের জন্যও খাবার কিনিলেন।...অপুকে সঙ্গে লইয়া দুর্গা চিনিবাসের পিছন-পিছন....উঠানে আসিয়া দাঁড়াইয়া আছে।..... সেজবৌ নিজের ছেলে সুনীলের কাঁধে হাত দিয়া একটু ঠেলিয়া দিয়া বলিলেন— যাও না, রোয়াকে উঠে গিয়ে খাও না।.... দেখতে পারিনা বাপু, ছুঁড়িটার যে কী হ্যাংলা স্বভাব.... লোকের দোর দোর...যেমন মা তেমনি ছা।"

এই 'ছা'য়েদের সম্পর্কে কথকের কণ্ঠস্বর শোনা যায়—"জন্মিয়া পর্যন্ত ইহারা কখনো ভালো জিনিস খাইতে পায় নাই। অথচ পৃথিবীতে ইহারা নূতন আসিয়াছে, জিহ্বা ইহাদের নূতন,— তাহা পৃথিবীর নানা রস, বিশেষত মিষ্ট রস আস্বাদ কবিবার জন্য লালায়িত। সন্দেশ মিঠাই কিনিয়া সে পরিতৃপ্তি লাভ কবিবার সুযোগ ইহাদের ঘটে না ..লুব্ধ দরিদ্র ঘরের বালক বালিকাদের জন্য তাই করুণাময়ী বনদেবীরা তুচ্ছ ফুল ফল মিষ্টি মধুতে ভরাইয়া রাখেন।"

স্পষ্টতই আর্থিক বৈষম্যজনিত বঞ্চনা ও সমৃদ্ধির দু'টি শ্রেণীর দ্বন্দ্বচিত্র *পথের পাঁচালী*-র একটা জোরালো বক্তব্যই হয়ে উঠেছে। ক্ষমতা তাদের যাদের অর্থবল বেশি। নন্দবাবুদের কামনার কুৎসিত হাত অনায়াসেই দরিদ্র সর্বজয়াদের প্রতি এগিয়ে আসে। কাশীর অন্ধকার ঘরের তুলনায় আরো অন্ধকার স্যাঁতসেঁতে অন্ধকার দুর্গন্ধ যুক্ত ঘরে অপুরা থাকতে বাধ্য হয়।

"...নীচের এই ঘরগুলো কর্তৃপক্ষ মনুষ্যবাসের উপযুক্ত করিয়া তৈয়ারী করেন নাই, সেইজন্যই এগুলিতে চাকর-বাকর রাঁধুনিরা থাকে।" কর্তৃপক্ষের বাড়িটা অবশ্য প্রকাণ্ড হলদে রঙের। রাঁধুনির কাজে বহাল হওয়া সর্বজয়া রান্নার বিরাট কাণ্ডকারখানা দেখে হতবাক হয়ে যায়। দু'বেলা তিনসের তেল ঘী'র খরচ! যদিও বাড়ির মত! নিশ্চিন্দিপুরের গ্রামীণ দরিদ্র ঘরের সর্বজয়ার অভিজ্ঞতার বাইরে ছিল এসব। এই বিরাট বাড়ির লোকজন, আসবাবপত্র, ব্যবস্থা, উৎসব-অনুষ্ঠান সবই সর্বজয়াদের জীবনের বাইরের। সে বাড়ির ছেলেরা অপুকে

চাকরের মত দেখে। খেলতে নেয় না। অকারণে বাড়ির বাবুরা প্রচণ্ড প্রহার করেন। গিরিশ সরকার বাড়ির বিবাহ উপলক্ষে অনুষ্ঠিত থিয়েটারের আসর থেকে ছেলেমানুষ অপুকে "হাতের নড়া ধরিয়া জোরে ঝাঁকুনি দিয়া উঠাইয়া দিয়া বলিল ... জ্যাঠা ছোকরা কোথাকার, জ্ঞান নেই, একেবারে সামনে— বাবুরা বসবেন, উনি রাঁধুনির ব্যাটা এসেছেন মুখের কাছে বসতে। যা এখান থেকে যা, ওই থাম টামের কাছে বস্‌গে যা কোথাও—" প্রচণ্ড অমানুষিক বেত্রাঘাতে জর্জরিত অপুকে শুনতে হয়েছে "বুড়ো ধাড়ী বয়াটে ছোক্‌রা কোথাকার, আজ তোমাকে সাবধান করে দিচ্ছি, ফের যদি শুনি এ বাড়ীর কোনো ছেলের সঙ্গে মিশেচ, কান ধ'রে তক্ষুণি বাড়ী থেকে বিদেয় ক'রে দেবো।"

সর্বজয়া বুঝতে পেরেছে এতদিন দরিদ্র সংসারের রাজরানী ছিল সে। সেখানে তার হুকুম এ বাড়ির গিন্নি এবং বৌ-রানীদের চেয়ে কম কার্যকরী ছিল না। এখন এখানে সে তো পরাধীন। চোরের মতো। দাসী। অপমানিত, লাঞ্ছিত প্রহৃত অপু, সর্বজয়া নিশ্চিন্দিপুরে ফিরে গিয়ে বংশের পৌরোহিত্য বৃত্তিই গ্রহণ করে দিন কাটাবে কিনা ভেবেছে। ভেবেছে যাত্রার দলে পালা লিখবে কিনা। চিন্তিত হয়েছে সহায় সম্বলহীন দীন, জীর্ণ ভিটের ঘরটুকুর কথা ভেবে। নিদারুণ, অন্ধকার অর্থনৈতিক সমস্যার খোলা দিগন্তে তারা এসেছে। সামাজিক পরিস্থিতিতে তারা রাঁধুনি ও তার ছেলে রাঁধুনির ছেলে। 'বাবু'দের নিকট তারা দাসী, অপাংক্তেয়। নিশ্চিন্দিপুরের স্মৃতি 'নস্টালজিয়া' নয়। বাঁচার জন্য ভাবনা।

সমস্ত *পথের পাঁচালী* জুড়ে এই ধনী ও দরিদ্র, বঞ্চিত ও ভাগ্যবানদের শোষণ ও পেষণের কথা উচ্চারিত হয়েছে। নিশ্চিন্দিপুর— কাশী— কাশীর বাইরের শহরে অপুদের বিবিধ অবস্থা— বিপর্যয়ের মধ্যে যে এগিয়ে যেতে হয়েছে সে তো অর্থনৈতিক কারণে। যার পরিণতিতে সমাজের সচ্ছল ও দরিদ্রের জীবনের টানাপোড়েন চলেছে। *পথের পাঁচালী*-র মানবীয়তা ও প্রকৃতির সৌন্দর্য ও গভীরতা, সেক্ষেত্রে, বলতেই হয় একমাত্র বিষয় নয়। আমাদের অর্থনৈতিক সামাজিক জীবনের নিদারুণ সত্য। সমস্যা। *পথের পাঁচালী*-র একটি অনিবার্য বিষয় তার দার্শনিকতা কীনা তা নিয়ে বড় তর্কের প্রয়োজন আছে কি না জানি না। কিন্তু তার সঙ্গে মানবীয়তা ও প্রাকৃতিক বিশিষ্টতা মিশিয়ে বাস্তব সমস্যা উপেক্ষা পর্যন্ত পর্যায়ক্রমে এই আর্থ-সামাজিক সমস্যারই চিত্রায়ণ। *পথের পাঁচালী* বস্তুত এই সমস্যারই পাঁচালী। গ্রন্থটির কাহিনীপথের সূত্রটিও এই সমস্যা-বিধৃত। কেবল ভাবালুতায় অতি সরলীকরণে এতবড় সত্যটি উপেক্ষিত হয়ে এসেছে। অথচ গ্রন্থের মধ্যেই সর্বত্র ছড়িয়ে আছে এই আর্থ-সামাজিক সমস্যার জটিল জিজ্ঞাসা। এ গ্রন্থের হিউম্যানাইজেশন যদি খুঁজতে হয় তাও এই আর্থ-সামাজিক সমস্যার মধ্যেই খুঁজে পাওয়া যাবে। একটি উদাহরণ দেখুন। সর্বজয়া যে বাড়িতে রাঁধুনির কাজ করত, সেই বাড়ির বিবাহোৎসবের শেষ দিকটায় তটস্থ হয়ে সিঁড়ির দিকে তাকিয়ে সর্বজয়া দেখল—

"একজন পঁয়ষট্টি-সত্তর বছরের বৃদ্ধা সিঁড়ি বাহিয়া নামিতেছেন, পাশাপাশি গৃহিণী, পিছনে দুই বৌ-রাণী ও এ বাড়ীর মেয়ে অরুণা ও সুজাতা। সকল ঝি চাকরের দল তটস্থ অবস্থায়....উঁকি মারিয়া দেখিতে লাগিল। সর্বজয়া ক্ষেমি ঝিকে চুপি চুপি বলিল, কে ক্ষেমি মাসী? ক্ষেমি ঝি ফিস ফিস করিয়া কি বলিল— কোথাকার রাণী মা...বিদায় আপ্যায়নের বিনিময় হইল, বহু বিনীত হাস্য বিস্তার লাভ করিল...ঝি চাকরের দল....গড় হইয়া প্রণাম করিয়া.....মাটির সঙ্গে মিশিয়া রহিল।..... ষোল বেহারার পাল্কীটা খিড়কীর ফটকেই ছিল, বৃদ্ধাও পাল্কীতে উঠিলেন।

মাসীমা রুটির ঘরে আসিয়া চুপি চুপি বলিলেন—পয়সা রে বাপু, দেখলে তো পয়সার আদরটা।....দু'লাখ টাকা দান করেছেন, বাঙলাদেশের কোথাকার কলেজের জন্যে....।

এই দৃশ্যটি সর্বজয়ার মনে অতীতের একটি ঘটনা উদ্‌ভাসিত করে—

অনেকটা এইরকম চেহারার ও এই রকম বয়সের— সেই তাহার বুড়ী ঠাকুরঝি ইন্দির ঠাকরণ, সেই ছেঁড়া কাপড় গেরো দিয়া পরা, ভাঙা পাথরে আমড়া ভাতে ভাত। তুচ্ছ একটা নোনা ফলের জন্য কত অপমান, কেউ পোঁছে না, কেউ মানে না, দুপুর বেলায়, সেই বাড়ী হইতে বিদায় করিয়া দেওয়া, পথে পড়িয়া সেই দীন মৃত্যু.....।"

সর্বজয়ার চোখ ফেটে জল পড়েছে। অন্তরের দেবতার নিকট অপরাধের প্রায়শ্চিত্ত করতে চেয়েছে। কিন্তু এসব সেন্টিমেন্টাল মানবীয়তার উপরে রূঢ় বাস্তবের যে কঠিন প্রস্তর চেপে বসে আছে তার মর্মমূল তো আর্থ-সামাজিক কারণ। এই ধনীগৃহের সম্পদশালিনী বৃদ্ধার সঙ্গে ইন্দির ঠাকরুণের যে ভয়ঙ্কর পার্থক্য তা তো মানবীয় আচরণাবদ্ধ নয়। আর্থ-সামাজিক অবস্থাবদ্ধ মানবিকতা।

ইন্দির ঠাকরুণের যদি আর্থিক বল থাকত তাহলে তিনিও হরিহরের ঘরের রাজরানি, নিশ্চিন্দিপুরের রাজ-মাতা হয়ে থাকতেন। সম্ভবত তাহলে *পথের পাঁচালী*-র গতিপথও অন্যরকম হত। পথটাই হয়তো বদলে যেত। সে পথের পাঁচালীও স্বতন্ত্র হতো তাহ'লে। যদি হরিহরের আর্থিক সচ্ছলতা থাকত তাহলেও পথ এরূপ হত না। সর্বজয়ার সংগ্রাম করতে হত না। (অন্তত এই দীন লাঞ্ছিত দরিদ্র জীবনের সঙ্গে তো নয়ই) দুর্গা, অপুর ছেলেবেলাটা, সেই সঙ্গে তাদের বড় হয়ে ওঠার সুযোগটাও অন্যরকম হত। হয়তো তারা কাশী সত্যিই বেড়ানোর জন্য যেত। 'পথের দেবতা' অন্যসুরে ডাকতেন হয়তো। অপুকে অমন অমানবিক ভাবে মার খেতেও হত না। হরিহর রায়ের স্ত্রী, সর্বজয়াকে শত অপমান সহ্য করে ঝি/ রাঁধুনির কাজ করতে হত না। অর্থাৎ গ্রন্থের গঠনই যেত বদলে।

বিশ্লেষণ অনুযায়ী গ্রন্থের নির্মিতি যে অন্য রূপের হত সেটুকু বোঝা যাচ্ছে। এবার দেখা যাক গ্রন্থের অন্যান্য কয়েকটি বিষয়। দেখুন গ্রন্থে ব্যবহৃত শব্দাবলী। ২১৪ (মিত্র ও ঘোষ : ১০ সং, ১৯৯১) পৃষ্ঠায় মোট গড়পড়তা প্রতি পৃষ্ঠার চারশ শব্দের হিসাবে ৮,৫৬০ শব্দ আছে। এর মধ্যে ১৮ × ৪০ = ৭২০টি শব্দ বাদ যাচ্ছে কারণ প্রথম ১৮ পৃষ্ঠা ভূমিকা, যা লেখকের নয়। তাহলে ৭,৮৪০টি শব্দে *পথের পাঁচালী* গ্রন্থটি রচিত। এর মধ্যে পূর্বে বিশ্লেষিত বিষয়ে ব্যবহৃত ৪,৫৫২টি শব্দের বিন্যাস :

১. পরিচ্ছেদ : বল্লালী-বালাই : পৃ. ১৯ শব্দ ৩০ : 'হরিহর...খাইতেছে।' পৃ. ২০ শব্দ ৭৯: 'রামচাঁদ....মানুষ করিতে থাকেন।' পৃ. ২১ শব্দ ৬৩ : কখনো দিন গিয়াছে/ 'বুড়ি....কাটাইত' । পৃ. ২২ শব্দ ৭৪ : হরিহরের.... ছেঁড়া থান/এক পাশে...কাপড় বাঁধা বেতের পেঁটরার...খায়'।

৪. পরিচ্ছেদ : বল্লালী-বালাই : পৃ. ৩০ শব্দ ৪৭ : 'রাত্রিতে...আসিল।'/'পরে সে...করিয়াছে সে।' পৃ. ৩১ শব্দ ১৯ : 'এই তো....দিনে।'

৫. পরিচ্ছেদ : পৃ. ৩৩ শব্দ ৬৬ : 'তোমার কাছে...জন্যি'। 'ও রাজ....এখানা'/'বহুদিন...দাম।' পৃ. ৩৪ শব্দ ২৯ : 'কাঙাল...আর না।'

৬. পরিচ্ছেদ : বল্লালী-বালাই : পৃ. ৩৪ শব্দ ২৮ : 'ও পাড়ার....এসো।' পৃ. ৩৫ শব্দ ১২৩ : 'তিন কাল.....খাওয়াব'। 'বুড়ীর সুখ...গিয়ে পয়সা'/'তোমায়ও বলি...দিও।'

৮. পরিচ্ছেদ : আম আঁটির ভেঁপু : পৃ. ৪৪ শব্দ ৩২ : 'হরিহরের...বাঁধা আছে।' পৃ ৪৫ শব্দ ২৬ : 'দশঘরা...সদগোপ।' পৃ. ৪৬ শব্দ ১৩৬ : 'তা হোক গে...যাই।' 'এ গাঁয়ে...থাকা'/ 'আর এখন...দাঁড়ায়।'

৯. পরিচ্ছেদ : আম আঁটির ভেঁপু : পৃ. ৫০-৫১ শব্দ ১৮৭ : 'চিনিবাস...পারে'/'সেজ-বৌ...বসবে'/'ইহাদের...দিদি।'

১০. পরিচ্ছেদ : আম আঁটির ভেঁপু : পৃ. ৫৩-৫৪ শব্দ ০৬৫ : 'বলি...দিচ্চি'। 'কেবলই....দিবে না।'

১১. পরিচ্ছেদ : পৃ. ৫৯-৬১ শব্দ ১৪৩ : 'জন্মিয়া...রাখেনি'। 'চুপি চুপি...যাবো'/'সত্যিই যদি/তুমিও যেমন।'

১২. পরিচ্ছেদ : আম আঁটির ভেঁপু : পৃ.৬২ শব্দ ৯ : 'কম দামের...বলিত'। পৃ. ৬৪ শব্দ ৮৬ : 'কি হোল?....কম কষ্ট।'

১৫. পরিচ্ছেদ : আম আঁটির ভেঁপু : পৃ.৮০-৮১ শব্দ ৬৮ : 'মা শিগ্গীর...কিন্তু'। 'গরীবের...গরম'। পৃ. ৮২ শব্দ ০১৬ : 'বলিল....এখন'। পৃ. ৮৫, ৮৭, ৮৮ শব্দ ২৪৭ : 'ও কত...বড়লোক তো'/'এত কী....থাকেনা'/'যেন...হয়না'। 'অমলার... বেশী'/ 'তাহার....বাঁদর'/'লুচি....কখনো'।

১৬. পরিচ্ছেদ : আম আঁটির ভেঁপু : পৃ. ৯৭ শব্দ ০৪৪ : 'দুর্গার মন....দিন'।

১৭. পরিচ্ছেদ : আম আঁটির ভেঁপু : পৃ. ১০০-১০৩ শব্দ ৩০৫ : 'মুঠ...বলবো।' 'এখন ওই...নাম'/ 'চল্লিশ টাকার.. নে'/ 'কব্‌রেজের বৌ...করুণ' 'কনে ম্লান...স্নান'/ 'ওর ছেলে....যা'। 'বুধবার... হোক' 'দ্যাখ তো...পয়সাই নেই'।

২১. পরিচ্ছেদ : আম আঁটির ভেঁপু : পৃ. ১২৪ শব্দ ০৩৮ : 'তাহার অমন...হয় মনে'। পৃ. ১২৫ শব্দ ১১৩ : 'হাতে পাত্র ছি ছি.... কেমন করে'।

২৩. পরিচ্ছেদ : পৃ. ১৩৫ শব্দ ৪৪ : 'যাইবার সময়...কাপড়'। 'আহা.....মাগো'।

২৪. পরিচ্ছেদ : আম আঁটির ভেঁপু : পৃ. ১৩৫-১৩৭ শব্দ ৩১১ 'হরিহর বাড়ী...আবার হয়'/ 'সর্বজয়া....লিখিয়াছে'/ 'তুমি কি....পুঁছবেন'/'পাড়ার....যাইবে'/ 'সকলের.... লাগবে না'।

২৫. পরিচ্ছেদ : আম আঁটির ভেঁপু : পৃ. ১৩৯-১৪২ : শব্দ ২৫৯ 'হরিহরের....করবি।'/'ঘরে একটা...জল যে'/'সাতটা নয়...তোলেন যে'/'তোরা...ভানচিস না'/'তাই গিয়ে....যাবি'/'টাকা নিয়ে পড়িচি মা'/'আসবো....বড্ড মোটা'/'নিমছাল সিদ্ধ....বিস্কুট'/'বৃদ্ধির....মুখে দাঁড়ায়'।: পৃ. ১৪৪ শব্দ ০৩৯ : 'হরিহরটাও...বিদেশে যায়'?

২৬. পরিচ্ছেদ : পৃ. ১৪৬ শব্দ ০৯৪ : 'হরিসভায়....হইল'/'সারাদিন কিছু....চলিতেছে'।

২৭. পরিচ্ছেদ : পৃ. ১৪৯-১৫২ শব্দ ১২৮ : 'সর্বজয়া বড় মানুষ বাধ্য হইল'। 'ছেলে....'আশা'/নিষ্পাপ পায়'। পৃ. ১৫৫ শব্দ ০২৪ : 'ছেলে....হরিহরের...মনে হইত না'। পৃ. ১৫৬ শব্দ ০২৯ : 'এ ভিটেতে....হয়ে যায়'।

এই ভাবেই দেখা যায় ২৭ সংখ্যক পরিচ্ছেদের নিমন্ত্রণ খেতে গিয়ে অপু ও সুনীলের ছাঁদা বেঁধে আনায় সুনীলের মা ও অপুর মায়ের আর্থ-সামাজিক অভিজ্ঞান সম্পূর্ণ বিপরীত বলয়ের। এবং সেখানে ৪৬টি উক্ত প্রাসঙ্গিক শব্দের প্রয়োগ হয়েছে। একই পরিচ্ছেদের

শেষাংশে ১৬২ পৃষ্ঠায় অপু 'বঙ্গবাসী' কাগজের পুরোনো সংখ্যাগুলিতে বহু বিদেশী খবর পড়তে পড়তে সেই সব দেশে যাবার ও সেখানকার খবর জানবার জন্য স্বপ্ন দেখে; কিন্তু সঙ্গে সঙ্গে রূঢ় বাস্তবের সত্যটাও চোখের সামনে তার ভেসে ওঠে। এই প্রসঙ্গেও ৪৬টি শব্দ ব্যবহৃত হয়েছে যা আর্থিক ও সামাজিক অবস্থার চিত্র তুলে ধরে। ২৮ এবং ২৯ পরিচ্ছেদে যথাক্রমে গ্রাম ছেড়ে কাশীতে গিয়ে বাস করলে আর্থিক স্বাচ্ছন্দ্য আসবে এরূপ কল্পনায় যখন হরিহর ও সর্বজয়া মগ্ন তখন উক্ত বিষয়ক ৫৫টি শব্দ + ১৬৭ পৃষ্ঠার গুল্‌কীর প্রতি তার জ্যেঠিমার ব্যবহার বিষয়ক ৯৪টি শব্দ এবং আতুড়ী বুড়ির মৃত্যু প্রসঙ্গে ১৭০ পৃষ্ঠায় ৭৫টি শব্দের প্রয়োগ করা হয়েছে।

'অক্রুর সংবাদ'-এ গঙ্গার উপর দিয়ে যাবার সময় 'মা গঙ্গা'কে ডেকে সর্বজয়ার পুত্রকল্যাণ কামনার সঙ্গে 'যে জন্যে যাওয়া তা যেন হয়, যেন আশ্রয় হয় মা'— প্রার্থনায় ১০টি শব্দ, কাশীর বড় বড় বাড়ি দেখে সর্বজয়ার বিস্ময়মূলক ১৫টি শব্দে আর্থিক অসাম্যের কথাতে, হরিহর পুঁথিপাঠ করে অর্থাগম করতে পারে যাতে সেই বিষয়ে সর্বজয়ার কথায় ২০টি শব্দ, হরিহরের স্বল্প আয়, তার কথকথার সিধে, হরিহরের সংসার গুছিয়ে বসার স্বপ্ন (১৮১ পৃ.), প্রসঙ্গে ব্যবহৃত ৬৩টি শব্দ, ১৮২ পৃষ্ঠা হরিহরের যৌবনের কাশী আর মধ্যাহ্নের স্বপ্নভঙ্গ দিনগুলির কষ্ট, অপু ও পণ্টুর কথাবার্তায় 'শিষ্যবাড়ি' প্রসঙ্গের ১৮টি শব্দ, ১৮৩ পৃষ্ঠায় কথকঠাকুরের আর্থিক অবস্থা সূচক ২৬টি শব্দ। ৬১ পরিচ্ছেদে হরিহরের কাশীর ভাড়া বাড়ির বর্ণনায় ৭৩টি শব্দ, ১৮৮-১৮৯ তে ৩৯টি শব্দে অপুর লেখা ছাপাবার প্রসঙ্গ, ১৯০-১৯১ পৃষ্ঠায় বর্ণিত অপুর ছত্তরে খাওয়ার প্রসঙ্গে ব্যবহৃত ৪০টি শব্দ, ১৯২ পৃষ্ঠায় আটটি শব্দে সর্বজয়ার দুর্ভাগ্যের কথা, ৩২ পরিচ্ছেদে সর্বজয়ার আর্থিক সঙ্কট ও রাঁধুনির কাজের প্রসঙ্গে ব্যবহৃত ১১০টি শব্দ, ঐ দুর্দশা এবং বড়লোক ও গরিব রাঁধুনিরা যে চাকর ও মালিকের উঁচু-নিচুর স্তরে বিন্যস্ত তার প্রকাশ ঘটেছে, এমন শব্দ সংখ্যা ৮৭ + ৮২ (৩২ সংখ্যক পরিচ্ছেদে) ৩৩ সংখ্যক পরিচ্ছেদে ২৩৬টি শব্দ, ৩৪ পরিচ্ছেদে 'দাশু রায়ের পাঁচালী' থেকে অপু যে ছড়া মুখস্থ শুনিয়েছে তাতেও ১৭টি শব্দ, ৬৫ সংখ্যক পরিচ্ছেদে লীলার মায়ের অপুকে উপহার দেওয়া পোশাক প্রসঙ্গে ২১টি শব্দ, ২০৭ পৃষ্ঠা থেকে ২১৩ পৃষ্ঠা পর্যন্ত এই আর্থ-সামাজিক বিষয়ক শব্দের প্রয়োগ সংখ্যা ১৫৮টি। অর্থাৎ *পথের পাঁচালী*-তে এই বিষয়কে প্রকাশিত করেছে এমন শব্দ সংখ্যা ৪,৫৫২টি। ৭,৮৪০ মোট শব্দ সংখ্যা থেকে ৪,৫৫২ শব্দ বাদ দিলে ৩,২৮৮টি শব্দ, তাহলে পথের বাকি বিষয়গুলির বর্ণনা করেছে। দেখা যাচ্ছে সংখ্যায় বেশি শব্দ *পথের পাঁচালী*-র আর্থ-সামাজিক সমস্যাটিকেই ফুটিয়ে তুলতে সাহায্য করেছে।

এবার গ্রন্থটির অন্যান্য কয়েকটি বিষয়ও দেখে নেওয়া যাক। দেখা যাক এর বিবৃত বিষয়। *পথের পাঁচালী*-র 'আখ্যানশৈলী'তে (Narratology) একটা বেশ মজার ব্যাপার আছে। সাধারণভাবে রুশ ভাষাবিজ্ঞানীরা শৈলীবিজ্ঞানের ক্ষেত্রে বহু দিক থেকেই অগ্রসর। এ সত্য আজ আর অজানা নেই। এখানেও ভি. এন. বোলোশিনফ্-এর *মার্কসইজম্ ইন ফিলোসোফিয়া* (১৯২৯) গ্রন্থে যে বিবৃত সংলাপ প্রসঙ্গের অবতারণা করেছেন তার থেকে আমরা মূল্যবান যে বিষয়টি জানতে পেরেছি তা হল :

> Language reflects, not subjective, psychological vacillation, but stable social interrelationships among the speakers. এবং The mechanism of this process is located, not in the individual soul, but in society.

এই প্রসঙ্গে মিখাইল বাখতিনের কারনিভালইজ্‌মের (উৎসবায়ন) কথাও স্মরণীয়। ব্যাপারটি দেখা যাক, অপু নন্দবাবু কী বলেছিলেন— সেটা সর্বজয়াকে যখন বলেছে তখন প্রকৃতপক্ষে কয়জনের ক্রিয়া প্রক্রিয়ায় সংঘটিত একটা ভাষাশৈলী তৈরি হচ্ছে। অনেকটা এই ভাবে—

নন্দবাবু = বক্তা১
↓
অপু = শ্রোতা১
↓
অপু = বক্তা২
↓
সর্বজয়া = শ্রোতা২

এইবার উদাহরণটি দেখা যাক। "অপু বাড়ী আসিয়া মাকে বলে— নন্দবাবু বেশ লোক মা— তোমার কথা রোজ জিজ্ঞেস করে—

—আমার কথা? আমার কথা কি জিজ্ঞেস্ করে—

—বল্‌ছিল তোমার মাকে বোলো, আমি তার কথা জিজ্ঞেস করি টরি— বেশ লোক"

এখানে লক্ষ করা যাচ্ছে (১) নন্দবাবু বক্তা হয়ে অপুকে বলছিল = নন্দবাবু বক্তা১।

(২) অপু সর্বজয়াকে নন্দবাবুর বক্তব্য জ্ঞাপন করল = অপু বক্তা২

তাহ'লে ১নং-এ অপু নির্বাক শ্রোতা। ২নং-এ অপু সবাক বক্তা। সর্বজয়া শ্রোতা২। তিনজনে চারজনের কাজ করছে। ১ম পক্ষে নন্দ (বক্তা) + অপু (শ্রোতা)। ২য় পক্ষে অপু (বক্তা) + সর্বজয়া শ্রোতা। কিন্তু অপু-যখন বক্তা সে তখন নন্দবাবুর বক্তব্য + নিজের ভাল/মন্দ ধারণাও ব্যক্ত করছে। এইখানে বিবৃর্ত সংলাপের যে কৌশল তা ধরা যাচ্ছে। 'বেশ লোক' বিণ্-টি অপুর নন্দবাবু বিষয়ক ধারণা। তার জগতে তার মায়ের সম্পর্কে কেউ কিছু জিজ্ঞাসা করলেই সে 'বেশ লোক' হয়ে যাবে। সর্বজয়া তথা ঐ পরিবেশের (আর্থ-সামাজিক) সব অসহায় রমণীরই ভাবনার জগত স্বতন্ত্র। সেখানে 'নন্দবাবু'রা অনভিপ্রেত। *পথের পাঁচালী*-র সংলাপ বিশ্লেষণে এই সমাজবোধটি প্রত্যয়িত হয়ে ওঠে। কেবল তাই নয়। 'অপু' সংবাদ-বাহক/বক্তারূপে প্রত্যক্ষভাবে নন্দবাবুর 'বক্তব্য' অবলম্বনে তার সম্পর্কে যে ভালো ধারণা সে করেছে তার কারণও বিবৃত করে। এখানে বাংলা উপন্যাস তথা কথাসাহিত্যের সাধারণ কৌশল অবলম্বিত হয়েছে। অর্থাৎ [অপু ↔ বলে] এই কর্তা এবং ক্রিয়া রূপের ব্যবহার হয়েছে। কিন্তু তার পরবর্তী বাক্যেই বিদ্রোহ। "আমার কথা?...করে—" সর্বজয়ার এই উক্তি যে Narratology-র সন্ধান দেয় তা প্রাসঙ্গিকতায় সম্পৃক্ত সংলাপধর্মী কথাসাহিত্যে বিশ শতকের তিরিশের পাদে বিরল ছিল না। কিন্তু *পথের পাঁচালী*-তে সেরূপ একটি বিশিষ্ট রীতিরূপে ব্যবহৃত হয়নি। বরং [← ক্রিয়া] এই রূপের ব্যবহার একটি রীতিকে স্পষ্ট করছিল। হঠাৎ তার মধ্যে বক্তা প্রত্যক্ষভাবে তার চিন্তা, প্রশ্ন, ভাব সোজাসুজি প্রকাশ করল। এতে প্রসঙ্গটি পাঠকের নিকটতম হল। রীতির মিশ্রণ ঘটল যদিও।

আপদ বালাই, টাকার জোগাড়, নোনা, ছেঁড়তলা, পিদিমের তেল, বড় মানুষ আর দরিদ্র, দরিদ্রের সংসারই বড়। তার সাক্ষী, পরম আত্মীয়, গভীর দীন মৃত্যুযন্ত্রণার শরিক যে পৃথিবী তা প্রকৃতির নীরব, মূক বধির সান্নিধ্যে সন্তপ্ত হয়েছে। বিণ্-গুলিও তাই সেই সংবাদ জ্ঞাপন

করে যা বিষণ্ণতায় ভরা। যা করুণ। যা সংগ্রামী। যা আর্থ-সামাজিক কাঠামোর অন্তঃসারশূন্য ফাঁকা মানবীয়তাকে ব্যঙ্গ করে। মজা পুকুর। রৌদ্রের ঝাঁজ, তুচ্ছ সার্থকতা, ছেঁড়া কাঁথা, তুচ্ছলাভ, পোড়া ঝিমুনি, আপদ বালাই, রোগা মেয়েটা, দীন মৃত্যু।

বিণ. থেকে বিশেষ্য যখন হয়েছে তখনও এই ভেতরকার দৈন্য, হাহাকারই ফুটে উঠেছে। 'নিরাশ্রয়তা' এবং 'গৃহহীনতা'র মধ্যে তা ধরা যায়।

খুব বড় বড় সমাস ও সন্ধিযুক্ত শব্দের ব্যবহার নেই বললেই চলে। বি +ষষ্ঠী অথবা বিণ্. + ষষ্ঠী'র ব্যবহারে একটা সরলতা সহজিয়া বহতারূপ বজায় থেকেছে দেখা যায়। বাঁশের বাঁশি, মাঝের পাড়ার স্টেশন, মাটির ভেতর, মাথা গোঁজবার জায়গা, গানের সুর, এক পয়সার বাঁশি, সর্বজয়ার মন, মানুষের অন্তর বেদনা, নারকেলের ফোঁপল, ঘোড়ার গাড়ি, সুনীলের মা, খেজুরের ডাল, বাতাসের গন্ধ ইত্যাদি শব্দ দেখলেই তা বোঝা যায়। বোঝা যায় এই সরলতা বাক্যের গঠনেও। যেখানে দীর্ঘ বাক্য সেখানে গঠনের জটিলতা নেই। একটি উদাহরণ :

> টেবু অপুর অপেক্ষা বয়সে ছোট বলিয়া তাহার কৃত অপমানের দরুনই হউক বা সকলের ঠাণ্ডা বিদ্রুপের জন্যই হউক— অপুর মাথা কেমন বেঠিক হইয়া গেল— সে ঝাঁকুনি দিয়া ঘাড় ছিনাইয়া লইয়া টেবুকে এক ধাক্কা মারিতেই টেবু ঘুরিয়া গিয়া দেওয়ালের উপর পড়িয়া গেল— কপালটা দেওয়ালে লাগিয়া খানিকটা কাটিয়া রক্তপাত হইতে টেবু সঙ্গে সঙ্গে বিকট চীৎকার করিয়া কাঁদিয়া উঠিল।

বাক্যটি মূলত তিনটি স্বাধীন বাক্যের সমাহার। "টেবু অপুর....গেল" পর্যন্ত ১নং বাক্য "সে ঝাঁকুনি... গেল" পর্যন্ত ২নং বাক্য, "কপালটা উঠিল" পর্যন্ত ৩নং বাক্য। তিনটি বাক্যই 'ড্যাশ্' চিহ্নে লিখিত। (পূর্ণচ্ছেদ চিহ্নের পরিবর্তে 'ড্যাশ্' চিহ্ন রবীন্দ্রগদ্যে ব্যাপকভাবে ব্যবহৃত হয়েছে, যা পরবর্তী কালে বুদ্ধদেব বসুর রচনাতেও বেশ চোখে পড়ত) প্রথম বাক্যে 'অপু/মাথা/বেঠিক হইয়া গেল' এই ক্রমে বাংলা গদ্যের ক্রমটির স্বাভাবিকতা স্পষ্ট। তার পূর্বাংশ, অর্থাৎ "টেবু হউক' অ্যাডভারবিয়াল ক্লস্/ক্রি. বিণ্. অংশ (উপবাক্য) রূপে ব্যবহৃত। এবং ঐ উপবাক্যেও 'কৃত অপমানের দরুনই হউক' /এবং "সকলের ঠাট্টা বিদ্রুপের জন্যই হউক' (শব্দগুচ্ছ) দুটিই গঠনের দিক থেকে সমগোত্রীয়। অপমানের, বিদ্রুপের দরুনই/জন্যই, এবং হউক/হউক কে যদি ১ + ২ + ৩ এইভাবে চিহ্নিত করা যায় তাহ'লে ১। ১, ২। ২, ৩। ৩, এই 'সজ্জারূপ' পায়। দ্বিতীয় বাক্যের দৈর্ঘ্য অসমাপিকা ক্রিয়ার বহতাধর্মে বিধৃত। "সে....মারিতেই টেবু....পড়িয়া গেল"— এই গঠনে টেবু....গেল বাংলা বাক্যে স্বাভাবিক ক্রম বজায় আছে, পূর্বাংশ 'কারণ' সম্পর্কিত। অর্থৎ ক্রি. বিণ্. বাক্যাংশ। কিন্তু 'দিয়া'/'ছিনাইয়া'/'লইয়া'/'মারিতেই' এই চারটি অসমাপিকা ক্রিয়ার বাক্যটি দৈর্ঘ্য লাভ করেছে, তার মধ্যে অপুর কৃতিত্ব জ্ঞাপিত হয়েছে। পরের বাক্যেও 'টেবু....কাঁদিয়া উঠিল' প্রধান বাক্যাংশ কর্তা/কর্ম/ক্রিয়া/রূপে স্বাভাবিক গঠন লাভ করেছে। তার পূর্বাংশ লাগিয়া/কাটিয়া/করিয়া/কাঁদিয়া চারটি অসমাপিকা ক্রিয়ার বহতাধর্মী হয়ে উঠেছে।

কিন্তু এগুলি বড় কথা নয়। বড় কথা ভাষার প্রত্যক্ষগুণ। সরলতা। চেনা জগতকে অথবা অচেনা জগতকে চেনার অসাধারণ গুণের মধ্যে *পথের পাঁচালী*-র মূল সমস্যাটি বিধৃত। খুব সহজে। সরলতায়। সে সহজ ভাব দুঃখের প্রকাশেও। আনন্দের অভিব্যক্তিতেও। তাই তো

অপুকে ভালো লাগে। দুর্গাকে চিনি। হরিহরকে বুঝি। নন্দবাবুকে চেনা যায়। লীলা, সুনীল, নীরেন, টেবু, বড়বাবু, কথকঠাকুর, চিনিবাস, ইন্দির ঠাকরুণ, অজয়, সেই সমাজকে চিত্রিত করে, যে সমাজ আমরা চিনি। পথের পাঁচালী দর্শনের গণ্ডি ছাড়িয়ে মানুষের সমস্যার জগতে উত্তরিত এক সামাজিক সত্যের সাহিত্যিক দলিল রূপে বিবেচিত হবার দাবি অবশ্যই রাখে। শৈলীবিজ্ঞানের বিনির্মাণে সেই দাবি যে গ্রহণযোগ্য বর্তমান আলোচনায় সেটুকু সম্ভবত বোঝা গেছে। বোঝা গেছে এই সঙ্গে সাহিত্য সমালোচনায় এই নব বিনির্মাণের প্রাসঙ্গিকতা কতটা।

আশা করি এই বিশ্লেষিত উদাহরণটি আমাদের ডি-কনস্ট্রাকশন তত্ত্বটি বুঝতে যথেষ্ট সহায়ক হয়ে উঠেছে।

একটি প্রচলিত পাঠ ভেঙে আমরা পৌঁছে গেছি আর একটি সম্ভাব্য পাঠে। এই প্রক্রিয়ায় সংযুক্ত হয়েছে সমাজচিত্র, আর্থ-সামাজিক সত্য, ভাষা, এক ধারণা থেকে অন্য ধারণার চলাচল, স্বরান্তরণ, হয়ে ওঠার নিরন্তর স্তর, বলয় থেকে বলয়ান্তরে প্রবেশ এবং সেখান থেকেও অন্য স্বরের সন্ধান— এই ক্রমাগত রূপান্তরেই ডি-কনস্ট্রাকশনের পরিচয়। কাজেই এই বিশ্লেষিত *পথের পাঁচালী*-র পাঠ-ই গ্রন্থের চূড়ান্ত স্বর নাও হতে পারে। এই অনির্বাণ "নিউনেস্'-ই ডি-কনস্ট্রাকশন।

তথ্যসূত্র :

১. তপোধীর ভট্টাচার্য, প্রাক্‌কথন, *সাহিত্যতত্ত্ব ও ভাষাতত্ত্ব পরিভাষা কোষ*, দিব্যাংশু মিত্র, ১৯৯৯/২য় সং. ২০০১, পৃ. ১১।

২. স্ত্রাউস সামজিক নৃতাত্ত্বিকতার ক্ষেত্রে মানবীয় মুক্তিবোধের উপরে নিহিত নিয়মগুলির স্থান দেন। স্যোসুর এবং বার্থ অবশ্য লেখককে ভাষার অন্তস্থ নিয়মের অধীন বলে মনে করেছেন। দ্র. অচ্যুত মণ্ডল, 'রাতের সব তারাই আছে দিনের আলোর গভীরে', *সত্তা ও শূন্যতার পঙ্‌ক্তি*; অস্তিবাদী দর্শনের প্রেক্ষিতে রবীন্দ্রপরবর্তী বাংলা কাব্যবিচার ২০০৫, পৃ. ১২৭-১৩০।

৩. "a piece of iron capable of attracting iron and pointing north when suspended". *Collins Gen. Dictionary*, (1992-'07) Edn. Webster, *Oxford Dictionary*-ও এই তথ্যই দেয়।

৪. Kevin Hart, *Postmodernism : a beginner's Guide*, England, (2006) P. P. 4-5.

৫. Ibid, P. 5.

৬. Nietzsche, Friendrich Wilhelm ; A German Philosopher and Poet, educated at the ancient grammar school of Schulpforta and appointed as Professor of Classical Philology at Basel. *Oxford Companion to Eng. Lit.*, Sir Paul Henrey.

৭. Winkelmann, Johann Joachim (1717-68) জার্মান বংশজাত, গ্রিক সাম্রাজ্যে বিদ্যাচর্চার পুরোধা, সাহিত্য ও দর্শনচিন্তক।

৮. অচ্যুত মণ্ডল, *সত্তা ও শূন্যতার পঙ্‌ক্তি*, (২০০৫), পৃ. ১৪০।

৯. তদেব, অরূপ রতন বসু, (প্রশ্নের খসড়া...পোস্ট মডার্নইজম্) এবং ডেভিড হল। *Modern China and the Post Modern West*, পৃ. ১৪০।

১০. Hartman, Geoffrey, *Saving the text* : Literature/Derrida/philosophy, Baltimore . Johns Hopkins University Press, (1981) on Glas (1974) and the *Possibilities of Commentary*

১১. Jonathan Culler, Hertman and Derride *Ibid*, P. 27

১২. লোগোস শব্দের সাধারণ অর্থ বিশ্ব-নিয়ন্ত্রক শক্তি।

১৩. Hartman and Derrida, *Deconstruction : A Critique* (1981), P 275

১৪. *Deconstruction · A Critique*, P. 98

গ্রহণতত্ত্ব (Reception Theory) ও আধুনিক বাংলা সাহিত্য

মহুয়া দে

সাহিত্যকে কেন্দ্র করে তাত্ত্বিক ভাবনার ক্রমবিকাশের যে ইতিহাস, তা অগণন তত্ত্ব ও ধারায় সমৃদ্ধ। অসংখ্য তার রূপ, রীতি ও প্রকৃতি। বিশ্বসাহিত্যের ইতিহাস যত দীর্ঘকালের সাহিত্যতত্ত্বের রূপান্তরণও ততকালের, শতাব্দীর পর শতাব্দী ধরে সাহিত্য ও সাহিত্যতত্ত্বের এই ক্রমবিকাশের ধারা প্রবহমান থেকেছে এবং একে অপরের পরিপূরক হয়ে উঠেছে। তবে দেশে দেশে তার দৃষ্টিভঙ্গিগত ও মাত্রাগত পার্থক্য তো আছেই। এছাড়াও রয়েছে আঞ্চলিকতা, জাতীয়তা, আন্তর্জাতিক সাহিত্যের সম্পর্ক বিন্যাস, পারস্পরিক টানাপোড়েন, সম্পর্কের প্রত্যক্ষ-পরোক্ষ রূপ ও তার প্রকৃতি বিচার, সাহিত্য ও সাংস্কৃতিক ঐতিহ্যের পূর্বজ ও পরিবর্তিত রূপান্তরণ, নবায়ন ইত্যাদি আরও অনেক কিছু, যার পরিব্যাপ্ত ক্ষেত্রে আলোচনা সমালোচনা বিচার পদ্ধতির অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ ধারা হল 'গ্রহণ তত্ত্ব' (Reception Study/Theory)।

লেখক পাঠক এই দুই মৌল উপাদানের পারস্পরিক ক্রিয়া-প্রতিক্রিয়ায় যেমন আদিমতম কাল থেকে 'সাহিত্য রচনা' নামক রাসায়নিক যৌগটি নির্মিত হয়েছে, তেমনি সাহিত্য ও মানবসমাজের সম্পর্কও প্রথমাবধিই 'সাহিত্য নির্মাণ' নামক রাসায়নিক যৌগসৃষ্টির প্রক্রিয়ায় অনুঘটক রূপে বর্তমান থেকেছে। প্রকৃত অর্থে দেশ, কাল, সমাজ, ব্যক্তি, বা পরিবার; সাহিত্যের সঙ্গে এমনই অঙ্গাঙ্গীসূত্রে জড়িত যে, এদের মধ্যেকার যে-কোন পরিবর্তনের ফলশ্রুতিতেই, প্রভাবিত হয় সাহিত্যও। পরিবর্তনই যেহেতু গতিশীলতার একটি অন্যতম লক্ষণ, সেইহেতু, সাহিত্য ও সাহিত্যপাঠের, সাহিত্য/পঠন ও পাঠনের, লেখক ও পাঠকের, স্রষ্টা ও ভোক্তার সম্পর্কের নানা বিন্যাস নিয়ে আলোচনা সমালোচনা করতে করতেই, সাহিত্য সমালোচনা ও সাহিত্যতত্ত্বের তথাকথিত প্রচলিত প্রভাব পদ্ধতি থেকে নবায়িত 'গ্রহণ' তত্ত্বের আবির্ভাব ঘটেছে। অত্যাধুনিক তাত্ত্বিক দৃষ্টিভঙ্গিতে 'দাতা' তত্ত্বের প্রাধান্যের স্থলে 'গ্রহীতা' তত্ত্বের প্রাধান্য প্রতিষ্ঠিত হয়েছে। উল্টোরথের এই পালায় 'গ্রহণকারী সাহিত্য' বলে যাকে চিহ্নিত করা হচ্ছে, তাকে বিশ্লেষণী দৃষ্টির আলোয় ফেলে চলেছে, তার অনুপুঙ্খ বিচার। 'গ্রহীতা সাহিত্য' কেন অন্য সাহিত্য থেকে 'গ্রহণ' করছে? গ্রহণ সংক্রান্ত পরিস্থিতি তৈরি হওয়ার পশ্চাদপট শর্তগুলো কি কি?

কোন সাধর্মের মিল 'গ্রহীতা সাহিত্য'কে 'দাতা সাহিত্য' থেকে গ্রহণের জন্য উৎসাহিত করেছে? 'গ্রহণ' ক্রিয়ার ফলশ্রুতিই বা কত প্রকার? কি তার রূপ, কি তার বৈচিত্র্য? তারতম্যেরই বা কারণ কি? এ-সমস্ত প্রশ্নকেই একত্রে 'গ্রহণতত্ত্ব' আখ্যা দিয়ে, সেই তত্ত্বের প্রেক্ষাপটে তুলনাত্মক ভাবে দুটি সাহিত্য ধারার পারস্পরিক সম্পর্ককে তুল্য-মূল্য বিচার করা সম্ভব, এবং দেখানো সম্ভব কোনো সম্পর্কই কার্যকারণ সূত্র ছাড়া গড়ে ওঠে না। তাই 'দাতা' বা 'গ্রহীতা' এই সম্পর্কগুলি আসলে আপেক্ষিক, দৃষ্টিভঙ্গির তফাতে তা পালটে যেতে পারে। এভাবেই 'প্রভাব'-জাত আলোচনা সমালোচনাকে প্রতিস্থাপিত করে আধুনিক কালে 'গ্রহণ' তত্ত্বের প্রতিষ্ঠা ঘটেছে।

"The question of perspective is important in any study of transcultural contact and more ......There are various possibilities in any study of reception......This law works in accordance with the cultural and literary system of the receipient, with the inherent traditions interacting with the needs of the moment. And the foreign element, before being assimilated or rejected as the case may be, undergoes a transformation, an interpretation if one may so put it, that is prompted by the ideologies and the general tendencies in operation in the system at any given moment. Reception Studies here then do not merely lead to discoveries of diffuse, universal and timeless manifestation of welt-literature." সাহিত্যকেন্দ্রিক এই অত্যাধুনিক তাত্ত্বিক মতবাদটি মুলত বিংশ শতাব্দীরই অবদান এবং আধুনিক সাহিত্য সমালোচনার অন্যান্য ক্ষেত্রের মতো 'গ্রহণতত্ত্ব'-র আবির্ভাবও প্রতীচ্যে। *Rezeptionsasthetik* বা 'Aesthetics of Reception' নামে পরিচিত Reception Theory' বা 'গ্রহণতত্ত্ব'-র সূচনা ১৯৬৭-তে জার্মানির কনস্টাইন বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষাসংস্কার সূত্রে। 'হ্যানস্ রবার্ট' ইয়ার্উস্' (Hans Robert Jauss) এবং 'উলফ্যাঙ্গ ইজের' (Wolfgang Izer) এই তত্ত্বের প্রবক্তা। স্বাভাবিক ভাবে এই তত্ত্ব প্রতিপাদিত করতে কম করে দুটি পক্ষের দরকার পড়ে। যেমন দর্পণে প্রতিবিম্বের জন্য প্রতিবিম্বন-যোগ্য উপাদান দরকার এবং দর্পণ ও উপাদান যেমন আবার পরস্পরের কাছাকাছি না হলে প্রতিবিম্ব সৃষ্টি হয় না, তেমনি দুটি স্বতন্ত্র সাহিত্যধারা একে অপরের কাছাকাছি না হলে 'গ্রহণতত্ত্ব'-ও নির্মিত হতে পারে না। প্রসঙ্গত উল্লেখ্য, বিভিন্ন কার্যকারণ সম্পর্কসূত্রের বিচারে 'গ্রহণতত্ত্ব'-র দ্বৈত সাহিত্যধারার একটিকে 'দাতা' (Emitter), অন্যটিকে 'গ্রহীতা' (Receiver) রূপে চিহ্নিত করা যায়। তুলনীয়তার এই দুটি পক্ষের অবিচ্ছেদ্য যোগসূত্রেই রয়েছে 'গ্রহণতত্ত্ব-র গুরুত্ব। যা কিছু বাইরের তা 'আমারই চেতনার রঙে' রঞ্জিত হয়ে ওঠে। কখনও হয় 'স্বীকরণ' (Assimilation), কখনও হয় 'অনুকরণ' (Imitation) ইত্যাদি। সেগুলি মূলত 'গ্রহণতত্ত্ব'-র ভিন্ন ভিন্ন মাত্রা মাত্র।

জার্মান শিক্ষাবিদ ও সাহিত্যতাত্ত্বিক 'ইয়ার্উস' এবং 'ইজের' গ্রহণতাত্ত্বিক সমালোচনার দৃষ্টিভঙ্গিকে দুটি ভিন্ন প্রেক্ষিতে উপস্থাপিত করেছিলেন। উভয়েই প্রচলিত পাঠ-পদ্ধতি প্রচলিত সাহিত্যসৃজন-প্রক্রিয়া ও সাহিত্যস্রষ্টার সম্পর্কের গুরুত্বের থেকে পঠন প্রতিক্রিয়া, পাঠক ও পাঠক প্রতিক্রিয়াকে প্রাধান্য দিয়েছিলেন। গ্রহণতত্ত্বের তাত্ত্বিক যাঁরা, তাঁরা, সাহিত্যপাঠ, পাঠক ও সমাজের সম্পর্কের মধ্যে যে বৈশিষ্ট্যটিকে প্রধানভাবে গ্রহণ করেন, তা হল, সাহিত্যকর্ম কখনও ব্যক্তিগতভাবে, কখনও সামগ্রিকভাবে, তার উপভোক্তার দ্বারাই গৃহীত এবং নির্মিত

হয়। পূর্বতন সাহিত্যসমালোচনা পদ্ধতিতে সাহিত্যস্রষ্টার ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্যের যে একাধিপত্য প্রতিষ্ঠিত ছিল তার পরিবর্তে সাহিত্যপাঠ নির্মাণে পাঠকের সর্বাতিশায়ী ভূমিকা স্বীকৃতি পেল 'গ্রহণতত্ত্ব'-এ।

১৯৬৭ খ্রিস্টাব্দে ইয়ার্ডস্ কনস্টাইন বিশ্ববিদ্যালয়ে বক্তৃতা প্রদানকালে, প্রায় দ্বিশতাব্দী পূর্বকালের 'ফ্রেডারিক শিলার'-এর সাহিত্যের প্রতিক্রিয়া সংক্রান্ত ভাবনাকে সামনে রেখে 'What is and for what purpose does one study literary history'-তে, সাহিত্য ও ইতিহাসের পারস্পরিক সম্পর্কের অন্তর্বয়নকে উদঘাটিত করতে চেয়ে সামাজিক চেতনার এক নতুন দিগন্ত উন্মোচিত করলেন। তিনি পাঠকের অভিজ্ঞতার মূল্যায়নে সাহিত্য ও সাহিত্যতত্ত্বের ক্রম-পরিবর্তনকে তুলে ধরলেন, প্রসঙ্গত উল্লেখ্য, ইয়ার্ডসের তাত্ত্বিক প্রতিবেদনের সঙ্গে রাশিয়ান অবয়ববাদী (structuralism) রোমা য়্যাকবসনের (Roman Jakobson) বক্তব্যের সাদৃশ্য রয়েছে। অবয়ববাদীরা সাহিত্য ও সাহিত্যতত্ত্বের সামগ্রিকতা (Organic whole) কে পরিদৃষ্ট করতে চান। সাহিত্যস্রষ্টা যে সাহিত্য সৃজন করেন বা যে পাঠ নির্মাণ করেন, তাতে থাকে বাহ্যিক উপাদান ও মানসিক উদ্দেশ্য। এই উপাদান ও উদ্দেশ্য থেকে তিনি গড়ে তোলেন একটি অবয়ব (structure)। 'অবয়বিক শৃঙ্খলা' ও 'বর্ণনাগত শৃঙ্খলা' উভয়ের একত্রিত রূপ থেকেই জাত হয় যে নান্দনিক অনুভূতি, তা শুধু লেখকেরই দক্ষতার পরিচায়ক, এমন নয়, পাঠকের মননাভূতিও তাকে নির্মাণ করে। 'গ্রহণতত্ত্ব'-র ব্যবহারিক ক্ষেত্রে সমকালীন অন্যান্য তত্ত্ব যেমন 'অবয়ববাদ' (structuralism), 'বিনির্মাণ তত্ত্ব' (deconstructionism) 'পাঠক-প্রতিক্রিয়াবাদ' (Reader-Response Theory) বা 'নারীবাদ' (Feminism) ইত্যাদিও অন্তর্ভুক্ত হয়ে পড়ে এবং এসবের মধ্যে দিয়ে প্রসঙ্গত উদঘাটিত হয় যে, আসলে লেখকও প্রথমে একজন পাঠক এবং পরে লেখক। লেখকের পাঠকসত্তার এই আবিষ্কারের সঙ্গে সঙ্গে 'গ্রহণতত্ত্ব'-র বিশ্ব আরো ব্যাপ্ত হয়ে পড়ে।

ইয়ার্ডস্-এর এই 'গ্রহণ'-কেন্দ্রিক সাহিত্যতাত্ত্বিক সমালোচনাকে আরো পূর্ণতর মাত্রা দিয়ে পুনর্নির্মাণ করলেন কনস্টাইন বিশ্ববিদ্যালয়েরই আর এক সাহিত্যতাত্ত্বিক 'উলফ্যাঙ্গ ইজের' বিংশ শতাব্দীর ষাটের দশকের শেষে যখন ইউরোপীয় সমাজ নানা অস্থিরতার আলোড়িত, যখন বিশ্বযুদ্ধোত্তর পটভূমিকায় মানুষের অন্তর্জগতে ঘটে গেছে বিপুল পালাবদল, প্রতিষ্ঠিত ও প্রচলিত সম্পর্কে জাগিয়ে তুলেছিল নানা প্রশ্ন, নতুন পথ ও পাথেয় এর জন্য ব্যাকুলতা; তখন সময়ের পরিবর্তন থেকে অর্জিত নতুন অভিজ্ঞতা, নতুন উপলব্ধিকে অবলম্বন করেই ইয়ার্ডস্ ও ইজের নির্মাণ করলেন মানুষের নতুন মনন অভিব্যক্তির রূপ।

ইয়ার্ডস্ তাঁর তত্ত্বে *Rezeptionsgeschichte* (history of reception) এবং *Rezeptionsaesthetik* (aesthetics of reception) এই দ্বৈত ভাবনাকেই প্রতিষ্ঠিত করেছিলেন এই ভাবে যে, কাল পরিবর্তনের সঙ্গে সঙ্গে নির্দিষ্ট সাহিত্যপাঠও পরিবর্তিত হয়। এই রূপান্তরের সূত্র অন্তর্নিহিত থাকে সামাজিক ইতিহাসের চলিষ্ণুতায়। দার্শনিক মননশীলতার পট পরিবর্তনের মানবিকী-নৈতিক ও সাংস্কৃতিক ঐতিহ্যের রূপান্তরণের মধ্যে এবং অবশ্যই পাঠকের মননে চিন্তনে। ইয়ার্ডস্ কোন সাহিত্যপাঠকে ঘিরে পাঠকের সংবেদনশীলতার পূর্বজ ও পরজ রূপকে, বিশ্লেষণী দক্ষতাকে 'প্রত্যাশার দিগন্ত' (the horizon of expectations) এই শব্দে চিহ্নিত করেছিলেন এবং তাঁর বক্তব্য অনুযায়ী কিন্তু পাঠকের গ্রহণ ক্ষমতা এবং পারিপার্শ্বিকতার কারণে এই প্রত্যাশার দিগন্ত কখনও প্রসারিত কখনও সংকুচিতও হতে পারে এমনকি, সাহিত্যের প্রাকরণিক চরিত্রও অনেকাংশে নিয়ন্ত্রিত হয় এই 'প্রত্যাশার দিগন্ত' দ্বারা।

"*For works that are less directly evocative of expectations, Jauss suggests theree general approachess to constructing the horizon : First through familiar norms or the immanent poetics of the genre; second, through the implicit relationships to familiar works of the literary historical surroundings; and third, through opposition between fiction and reality between the poetic and the practical function of language which is always available to the reflective reader during the reading as a possibility of comparison.*"

'ইয়ার্ডস্' তাঁর সাহিত্যতত্ত্ব ভাবনায় 'প্রত্যাশার দিগন্ত' এই শব্দবন্ধ প্রয়োগের মাধ্যমে সাহিত্য সমালোচনার যে বৈশিষ্ট্যগুলিকে তুলে ধরতে চাইলেন। সেগুলি হল :

প্রথমত, প্রকরণের প্রচলিত আদর্শ ও অন্তর্নিহিত তত্ত্বরূপের বিশ্লেষণ ও তৎজাত গ্রহণ।

দ্বিতীয়ত, সাহিত্য-শিক্ষা ইতিহাসের পরিপ্রেক্ষিতে পরিচিত সাহিত্যকর্মের মধ্যেকার অন্তর্লীন সম্পর্কসূত্রের বিন্যাসজাত বিশ্লেষণ এবং গ্রহণ।

এবং তৃতীয়ত, কল্পনার ও বাস্তবতার বিপ্রতীপকতার মধ্যে কাব্যিক ও ব্যবহারিক ভাষা পার্থক্যের সাহায্যে গ্রহণ।

অবশ্যই সাহিত্যপাঠের এই গ্রহণ নির্মিত হয় পাঠকের পঠন প্রতিক্রিয়া এবং সাহিত্যপাঠের সম্ভাব্যরূপের তুলনামূলকতার মধ্য দিয়ে।

'ইয়ার্ডস্' সাহিত্যের 'প্রত্যাশার দিগন্ত'-এ যে-তিনটি বৈশিষ্ট্যকে উপস্থাপিত করলেন, তার মধ্যে দিয়ে প্রথমত প্রচলিত পাঠ, দ্বিতীয়ত প্রতিষ্ঠিত পাঠ এবং তৃতীয়ত পরিবর্তিত পাঠ-এর তুলনা নির্ণীত হল। কোনও সাহিত্যপাঠ তার সমকালে পাঠকের কাছে যে মূল্য বা তাৎপর্যে গৃহীত হয়, কাল পরিবর্তনের সঙ্গে সঙ্গে সেই তাৎপর্যমূল্যও পরিবর্তিত হয়ে যায়। ফলশ্রুতিতে, সমকালের পাঠকের 'প্রত্যাশার দিগন্ত' যেভাবে গড়ে ওঠে, বা বলা যায় কোনও একটি সাহিত্য পাঠকে পাঠক যেভাবে নির্মিত করেন বা রসাবেদন নিষ্কাশন করেন, পরিবর্তিত সময়ে তা অন্য রূপ বা অন্য মাত্রা লাভ করে আরও পরিপূর্ণ হয়ে ওঠে। অবশ্য এমন মনে করা সঙ্গত নয় যে, কোনও একটি নির্দিষ্ট কালপর্বে কোনও একটি নির্দিষ্ট সাহিত্য পাঠ সমস্ত পাঠকের কাছে একই ভাবে উন্মুক্ত হবে। একবাচনিক প্রক্রিয়ার মধ্য দিয়ে কোনও সময়াতীত তাৎপর্যকে লাভ করা সম্ভব নয় বলেই নির্দিষ্ট কোনো সময়ে নির্দিষ্ট কোনো সাহিত্যপাঠের চূড়ান্ত মূল্যায়নই তার শেষ কথা হতে পারে না। যেমন, উদাহরণ হিসেবে বলা যায় বিংশ শতাব্দীর প্রথম দশকে বাংলা সাহিত্যের কবি-নাট্যকার দ্বিজেন্দ্রলাল তাঁর সমকালের আর এক শ্রেষ্ঠ কবি-সাহিত্যিক রবীন্দ্রনাথের *চিত্রাঙ্গদা* কাব্যনাট্যের যে তাৎপর্য নির্ণয় করেছিলেন, তা তার যুগেই বিতর্কিত হয়ে উঠেছিল এবং পরবর্তীকালেও উক্ত পাঠকৃতির নানামূল্য নিরূপিত হয়েছিল। এই ঐতিহাসিক সত্যকে সামনে রাখলেই বোঝা যায় যে, *চিত্রাঙ্গদা*-র এই পাঠকৃতির মধ্যেকার বহুস্বরতাকে দ্বিজেন্দ্রলালের মতো মনস্বী পাঠকও তৎকালে অনুধাবন করতে পারেননি বা হয়তো চাননি। এই 'না-পারা' বা 'না-চাওয়া' উভয়ই পাঠকের গ্রহণ ক্ষমতার দ্বারা নির্ধারিত এক কালিক সত্যমাত্র।

আবার সাহিত্য পাঠের মূল্যায়নে পাঠকদেরও একটা গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা থাকে। কোনও সাহিত্যপাঠের যে পূর্বজ 'প্রত্যাশার দিগন্ত' নির্মিত হয়, তা পরবর্তীকালের পাঠকদের পাঠ অভিজ্ঞতায় ভিন্ন হয়ে যায় বা হয়ে যেতে বাধ্য হয়। কারণ, পাঠকের গ্রহণক্ষমতায় সঞ্চারিত হয়ে যাওয়া

সমকালীনতা পুনঃপাঠের মধ্যে দিয়ে ভিন্নতর হয়ে যায়। ফলে 'প্রত্যাশার দিগন্ত'-ও পরিবর্তিত হয়ে যায়। এমনকি এও হতে পারে যে, প্রথম পর্যায়ের পাঠকেরা সাহিত্যপাঠ থেকে যা আবিষ্কার করতে পারেননি বা গ্রহণ করতে পারেননি অথচ সমকালীনতার ঐতিহাসিক প্রেক্ষাপটের এই মূল্যায়ন পরবর্তীকালের পরিবর্তিত পটভূমিকায় তা উদ্ভাসিত হয়েছে এবং গৃহীত হয়েছে। উদাহরণ হিসেবে উল্লেখ্য উনবিংশ শতাব্দীর বাংলা সাহিত্যের অন্যতম শ্রেষ্ঠ রচনা মাইকেল মধুসূদনের *মেঘনাদবধ কাব্য* বিংশ শতাব্দীতে এসে যে সর্বজন গ্রাহ্যতা লাভ করেছিল, তা পূর্বতন সময়ে সম্ভব হয় নি; এর দ্বারাই প্রমাণিত হয় গ্রাহকসত্তার গুরুত্ব এবং গ্রহণতত্ত্বের যাথার্থ্য।

ইয়ার্ডস্ তাঁর 'গ্রহণতত্ত্ব'-এ এটাই প্রমাণ করেন যে, ইতিহাস ও সাহিত্যতত্ত্ব চিরচলিষ্ণু। কোনো সাহিত্যকৃতিরই সম্পূর্ণ অর্থ কখনই আবিষ্কৃত হয় না এবং সাহিত্যকৃতির যারা উপভোক্তা তথা পাঠকসমাজ তাদের গ্রহণ ক্ষমতার বহুরূপতার দ্বারাই পাঠকের 'প্রত্যাশার দিগন্ত'ও ইতিহাসের প্রেক্ষাপটে ক্রম রূপান্তরিত হয়ে চলে।

"The Original horizon of expectations only tells us how the work was valued and interpreted when it appeared, but does not establish its meaning finally. In Jauss's view it would be equally wrong to say that a work is universal, that its meaning is fixed forever and open to all readers in any period. 'A literary work is not an object which stands by itself and which offers the same face to each reader in each period. It is not a monument which reveals its timeless essence in a monologue'. This means, of course, that we will never be able to survey the successive horizons, which flow from the time of a work down to the present day and then, with an Olympian detachment, to sum up the work's final value or meaning."

সাহিত্য পঠনের ক্ষেত্রে ইয়ার্ডস্-কৃত পাঠপদ্ধতির প্রয়োগের বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ দিকটি হল অতীত পাঠের মধ্যে নতুন পাঠ সম্ভাবনাকে খুঁজে পাওয়া, অতীত পাঠের নতুন ভাষ্য উপস্থাপন, বর্তমানের নতুন রূপে তার অনুবাদকরন, বা যে সম্ভাব্য অভিজ্ঞতা লুকিয়ে রয়েছে পাঠের মধ্যে তার আবিষ্করন। পাঠকের এই 'প্রত্যাশার দিগন্ত' নির্মাণের ক্ষেত্রে সামাজিক ইতিহাসের একটি গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রয়েছে। যেমন, বঙ্কিমচন্দ্রের *বিষবৃক্ষ* বা *কৃষ্ণকান্তের উইল*- কে লেখক স্বয়ং এবং তাঁর সমকালের পাঠকরা যেভাবে পাঠ করেছিলেন, পরবর্তীকালের লেখক-পাঠক শরৎচন্দ্র ওই পাঠের যে অন্য ভাষ্য করেছিলেন, তা সম্ভব হয়েছিল সামাজিক ইতিহাসের রূপান্তরিত রূপের কারণেই। পাঠকৃতির নিহিতার্থকে ভিন্ন ভিন্ন কালে ভিন্ন ভিন্ন 'প্রত্যাশার দিগন্ত' দিয়ে গ্রহণ করার ফলে পাঠতাৎপর্যও ক্রমশ পরিবর্তিত হয়ে চলে এবং চলতেই থাকে। এই সম্ভাবনা কখনই সমাপ্ত হয় না। অতীত ও বর্তমানের দ্বিবাচনিকতায় এভাবেই 'প্রত্যাশার দিগন্ত' ক্রমপরিবর্তিত হয়ে গৃহীত হয় পাঠক তথা গ্রাহকের কাছে। ইয়ার্ডস্ এইভাবেই দেখিয়েছেন, উৎকৃষ্ট সাহিত্য হোক বা জনপ্রিয় সাহিত্য, সকল ক্ষেত্রেই পাঠ্যরূপের প্রত্যক্ষতার মধ্যেও গ্রাহক সবসময়েই খুঁজে নিতে পারেন পাঠ-অন্তর্নিহিত তাৎপর্যকে বা 'প্রত্যাশার দিগন্ত'কে।

"..........Jauss outlines three specific methodological exigencies for fourth paradigm :

1. The mediation of aesthetic/formal and historical/reception–related analysis, as well as art, history, and social reality;

2. The linking of structural and hermeneutical methods (which hardly take note of their respective procedures and results);
3. The probing of an aesthetics (no longer related solely to description) of effect (Wirkurg) and a new rhetoric, which can equally well account for 'high class' literature as well as popular literature and phenomena of the mass media."

'গ্রহণতত্ত্ব' যেহেতু সাহিত্যরূপের অভ্যন্তরীণ সত্যকে প্রকাশিত করে, তেমনি সমাজ, রাজনীতি, অর্থনীতি সংস্কৃতি— যাবতীয় মানবিক বিষয়ে লেখক-পাঠক-সমালোচক-এর পারস্পরিক সম্পর্কের বিন্যাসটিকেও উদ্ঘাটিত করে। অর্থাৎ সাহিত্যের সঙ্গে যা কিছু যুক্ত এবং যা কিছু যুক্ত করে সাহিত্য নির্মিত হয়, তার সবটুকুই ধরা পড়ে 'গ্রহণতত্ত্ব'-এ। একারণেই, প্রথাসিদ্ধ সাহিত্যরূপের মধ্যে যেমন 'গ্রহণতত্ত্ব' উপলব্ধ হতে পারে, তেমনি প্রথাবহির্ভূত সাহিত্যরূপের উপাদানও 'গ্রহণতত্ত্ব'-র প্রামাণ্যতা প্রতিপন্ন করতে পারে। তাই, শুধু কাব্য কবিতা উপন্যাস পাঠ বা পঠন নয়, সাহিত্য সমালোচনা, প্রবন্ধাদি নয়; 'গ্রহণতত্ত্ব'-র প্রতিপাদ্য হতে পারে অনুবাদ, চিঠি, দিনলিপি, উৎকীর্ণ উক্তি, সম্পাদকীয়সমালোচনা ইত্যাদির মতো বিচিত্র সাহিত্যরূপও।

পৃথিবীর আধুনিক সাহিত্যতত্ত্বে 'গ্রহণতত্ত্ব'-এর প্রয়োগ খুব বেশি দিনের পুরোনো নয়, কিন্তু এর অন্তর্নিহিত যুক্তির সত্যতা কোনো কালের সীমায় সীমাবদ্ধ নয়। কারণ তা মানবিকী অনুভূতির সেই সত্যকে উদ্ভাসিত করে যা মানুষকে তার স্বরূপত্ব ও স্বকীয়তাকে খুঁজে পেতে সাহায্য করে। এই অনুসন্ধিৎসাই 'গ্রহণতত্ত্ব'-র মূলকথা। তাই, 'গ্রহণতত্ত্ব'-এ কোন কর্তৃত্বের ভাব থাকা অসম্ভব বা সাংস্কৃতিক বোধ বা মননজগতের ওপর ক্ষমতা প্রদর্শনও তার পক্ষে অপ্রয়োজনীয়। দ্রুত পরিবর্তনশীল আধুনিক সাহিত্যতত্ত্ববিশ্বের জগতে 'গ্রহণতত্ত্ব' তাই আজ এক অপরিহার্য উপাদান।

হান্স রবার্ট ইয়ার্ডস্-এর 'Reception Theory' বা 'গ্রহণতত্ত্ব'- কে একটু ভিন্ন দৃষ্টিকোণে ব্যাখ্যা করলেন উলফ্যাঙ্গ ইজের। তাঁর তত্ত্ব মূলত 'পাঠক প্রতিক্রিয়াবাদ' বা 'Reader Response Theory' নামে অভিহিত। আপাত দৃষ্টিতে 'গ্রহণতত্ত্ব' এবং 'পাঠক প্রতিক্রিয়াবাদ'-এর মধ্যে বহুলাংশে সমরূপতা লক্ষিত হলেও, মৌলধর্মে এই দুই তত্ত্বের মধ্যে রয়েছে পার্থক্য। আসলে, গ্রহণতত্ত্বের 'পাঠক' প্রতিক্রিয়াবাদের মাধ্যম হলেও, প্রতিপাদ্য মূলত সাহিত্যপাঠ। সাহিত্যকৃতির অন্তর্বয়নকে উদ্ঘাটিত করার প্রচেষ্টায় 'পাঠক প্রতিক্রিয়াবাদ' মূলত পাঠকসমাজের শ্রেণীবিভাজনসহ বিভিন্ন শ্রেণীর পাঠকের প্রতিক্রিয়া অর্থাৎ সাহিত্যপাঠ-কেন্দ্রিক ভাবনাচিন্তাকে প্রকাশিত করে। ইয়ার্ডস্ এবং ইজের-এর চিন্তাধারার মধ্যেকার প্রধান পার্থক্যটি হল ইতিহাসকেন্দ্রিক। ইয়ার্ডস্ 'গ্রহণতত্ত্বে' ইতিহাসকে পাঠক ও সাহিত্যপাঠের ক্ষেত্রে গুরুত্ব দান করেছিলেন। ইজের ইতিহাসের আওতা থেকে সাহিত্যপাঠ ও পাঠককে সরিয়ে আনতে চেয়েছিলেন।

'উলফ্যাঙ্গ ইজের'-এর *Die Appellstruktur der Texte* (Indeterminacy and the Reader Response in Prose Fiction) প্রথম প্রকাশিত হয় ১৯৭০ খ্রিস্টাব্দে। যদিও তাঁর তাত্ত্বিক মতামত প্রধানভাবে প্রকাশিত হয়েছিল ১৯৭৮ খ্রিস্টাব্দে প্রকাশিত *The Act of Reading : A Theory of Aesthetic Response*-এ। ইজের-এর মতানুযায়ী, প্রতিটি সাহিত্যপাঠের অভ্যন্তরে কিছুটা 'শূন্যায়তন' প্রচ্ছন্ন থাকে। পাঠক তাকে আবিষ্কার করে এবং

অর্থদ্যোতনা দিয়ে পূর্ণ করে তোলে। কথিত বয়ানেই সাহিত্যপাঠ সম্পূর্ণ হয় না কখনও, অকথিত বয়ানকে উদ্ভাসিত করতে পারলেই তার সম্পূর্ণতা সম্ভব। সাহিত্যভাষ্য ও বিশ্লেষণ, অকথিত বয়ানকে উদ্ঘাটিত করে। সাহিত্যপাঠের সেই 'শূন্যায়তন'-কে ক্রমাগত পূর্ণ করে চলে। এই নির্মাণে পরিশীলিত পাঠক তার মনন ও জীবনাভিজ্ঞতা নিয়ে এক গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা গ্রহণ করে। সাহিত্যকৃতির নিজস্ব অবস্থা ও পাঠকের স্বাধীন অবস্থান, এই দুই-এর টানাপোড়েন জাত সাহিত্য পঠনের মাধ্যমে পাঠক ও সাহিত্যপাঠের মধ্যে যে দ্বিবাচনিক সম্পর্ক তৈরি হয়, তার প্রধান কাজ হল পাঠকৃতির সম্ভাব্য সত্যকে রূপমূর্তি দান করা। কারণ, সমস্ত সাহিত্যপাঠের গভীরেই লুকিয়ে থাকে 'সম্ভাব্য পাঠ'। 'সম্ভাব্য' কেননা শেষকথা বলে কিছু নেই। পাঠকের প্রতিক্রিয়া যেমন ভিন্নকালে, ভিন্ন পরিসরে ভিন্ন ভিন্ন পথগামী, তেমনি পর্ব থেকে পর্বান্তরের সাহিত্যপাঠে নানা ধরনের তাৎপর্য উদঘাটিত হয়ে, বহুরূপে অন্তর্নিহিত 'শূন্যায়তন'কে পরিপূর্ণ করে তোলে এবং দ্বিবাচনিক প্রক্রিয়ার মধ্যে দিয়ে পাঠক পৌঁছে যায় পাঠকৃতির বহুস্বরতায়।

"Iser insists that the literary text does not point to a referential reality (as does a document) but represents a pattern 'a structured indicate to guide the imagination of the reader.'... . This set of instructions, however, is incomplete full of 'gap's or 'blanks' or 'indeterminacies' which must be filled by the reader, both according to his disposition and to the perspectives offered by the text."

এইভাবেই পাঠকৃতির 'শূন্যায়তন'-কে পূর্ণ করতে করতে, পাঠক 'পাঠক প্রতিক্রিয়াবাদ' এর মাধ্যমে পৌঁছে যায় 'গ্রহণতত্ত্ব'-র 'প্রত্যাশার দিগন্তে'। 'গ্রহণতত্ত্বে'র আলোকে 'পাঠক প্রতিক্রিয়াবাদ' উদ্‌ভাসিত হয়ে ওঠে। তবে 'গ্রহণতত্ত্ব'-র সঙ্গে 'পাঠক প্রতিক্রিয়াবাদের' মূল পার্থক্য এটাই যে 'পাঠকপ্রতিক্রিয়াবাদ' সেখানে ব্যক্তিক, 'গ্রহণতত্ত্ব' সেখানে অনেক বেশি সামাজিক। 'পাঠকপ্রতিক্রিয়াবাদ'-এ পাঠক শ্রেণীর বৈচিত্র্য ও বৈশিষ্ট্যই প্রধান আলোচ্য বিষয় হয়ে উঠে। যেমন— প্রকৃত পাঠক, (actual Reader) আদর্শ পাঠক (ideal Reader), প্রতীত পাঠক (implied Reader) ইত্যাদি প্রকারের পাঠকসত্তার পাঠোপলব্ধিই 'পাঠকৃতি'-র অন্তর্বর্তী 'শূন্যায়তন'কে পূর্ণ করে তোলে ভিন্ন ভিন্ন ভাবে। পাঠকভেদে একই পাঠকৃতির ভাষ্য ভিন্ন ভিন্ন মাত্রা পায়, এই বক্তব্যই পাঠকপ্রতিক্রিয়াবাদের মূল প্রতিপাদ্য। যেমন রবীন্দ্রনাথের *ঘরে বাইরে*-র পরিণতি সম্পর্কে বা মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়ের *পদ্মানদীর মাঝি*-র 'হোসেন মিয়া ও তার ময়নাদ্বীপ' প্রসঙ্গে ভিন্ন ভিন্ন পাঠকের (তথা সমালোচকের) ভিন্ন ভিন্ন মতামত বাংলা সাহিত্যের পাঠকসমাজ-এর জ্ঞাত বিষয়। নির্দিষ্ট পাঠকৃতির এই বহুমাত্রিক মূল্যায়নের নির্মাতা পাঠকসমাজের গুরুত্ব প্রতিষ্ঠাই পাঠক প্রতিক্রিয়াবাদের লক্ষ্য এবং পন্থা।

বাংলাসাহিত্যে 'পাঠক-প্রতিক্রিয়াবাদ'-এর আধারে 'গ্রহণতত্ত্ব'-র রসায়নের একটি অসাধারণ দৃষ্টান্ত হল দ্বিজেন্দ্রলাল রায়*কৃত এই প্রবন্ধটি, যেটি আধুনিক সাহিত্যতত্ত্ববিশ্বে পাঠক-প্রতিক্রিয়াবাদের আলোচনা শুরুর বহু পূর্বেই লিখিত হয়েছিল আধুনিক বাংলাসাহিত্যে।

"কাব্যের স্থূলতঃ দুইরকম উপভোগ আছে। এক জড়িত উপভোগ আর এক প্রবুদ্ধ উপভোগ। জড়িত উপভোগ আমি তাকেই বলছি যে উপভোগ কাব্যের ভাবটা ধরবার জন্য উৎসুক নয়। একটা আনন্দ পেলেই হোল। সে আনন্দের উৎপত্তি কোথায় বা সে কি প্রকারের আনন্দ তাও সে জানে না। সে একরকম নিশ্চেষ্ট, তন্দ্রাবিজড়িত উপভোগ,...ইংরাজিতে যাকে passive

enjoyment বলে। প্রবুদ্ধ উপভোগ হচ্ছে কাব্যের অর্থ বুঝে উপভোগ। সেই কাব্যের ভাব বুঝে সেটাকে অনুমোদন করে, সেই কাব্যের মধ্যে আপনাকে অনুভব করে, তার মধ্যে আনন্দের উৎস কোথায় তা আবিষ্কার করে যে উপভোগ, (যাকে ইংরেজিতে active enjoyment বলা যেতে পারে) তাকেই আমি প্রবুদ্ধ উপভোগ বলছি। এই দ্বিতীয় রকম উপভোগে সমালোচনার সৃষ্টি।

...জয়দেবের গীতগোবিন্দ পড়তে অনেকের বেশ ভালো লাগে। পাঠক 'ললিত লবঙ্গলতা' কি 'বদসি যদি কিঞ্চিদপি' ইত্যাদি পড়েই তার ছন্দোমাধুর্য্যে এত অভিভূত হন, যে তার অর্থ পরিগ্রহ সম্বন্ধে একরকম উদাসীন হয়েন। এই উপভোগ প্রথমোক্ত শ্রেণীর উপভোগ। দ্বিতীয়য়োক্ত শ্রেণীর পাঠক অর্থাৎ প্রবুদ্ধ পাঠক তার অর্থ খুঁজবেন ও তাতে উচ্চ বা মধুর অর্থের অভাব অনুভব করে হতাশায় একটা দীর্ঘ নিঃশ্বাস ফেলবেন।

গীতগোবিন্দের ত অর্থ সুন্দর না হোক...অর্থ আছে। যে কবিতার অর্থ নাই, সেরূপ কবিতা প্রথমোক্ত শ্রেণীর পাঠককে উপভোগ কর্ত্তে দেখা যায়। কেননা তারা ত অর্থ খোঁজেন না। কারণ তাতে শ্রম ও শিক্ষা উভয়েরই প্রয়োজন। তাঁরা ধরেই নেন, যে কবিতাটির একটা অর্থ আছে যদি কবিতাটির ছন্দ মধুর হয়।...আবার ঠিক উল্টাও দেখা যায়। সাধারণ পাঠক Shelley-র Epipsychidion যে পরিমাণে উপভোগ করেন প্রবুদ্ধ পাঠক তাহার শতগুণ উপভোগ করেন। সাধারণ পাঠক ওয়ার্ডস্‌ওয়ার্থের Ode on immortality of the soul—হয়ত বুঝবেনই না। কিন্তু দ্বিতীয় শ্রেণীর পাঠক তার ভাবমাধুর্য্যে অভিভূত হয়ে যাবেন। কেউ যেন মনে না করেন যে আমি মিষ্ট ছন্দোবন্ধের বিরোধী। কবিতার ভাবের উপযোগী ভাষা ও ছন্দও চাই। তবে সেটি কবিতার রূপ। ভাবই কবিতার প্রাণ।

...আমি পূর্বে বলেছি যে প্রবুদ্ধ উপভোগ থেকে সমালোচনার সৃষ্টি। আমাদের দেশে সমালোচনা জিনিষটা বড় একটা নাই। তাই আমার বোধহয়, আমাদের দেশে কাব্যের প্রবুদ্ধ উপভোগও বড় বেশী নাই। শিক্ষিত সমাজে শতাংশের একাংশ কবিতা পড়েন কিনা সন্দেহ। আবার সেই ভগ্নাংশের শতাংশের একাংশ ব্যক্তি কবিতা বুঝে পড়েন কিনা সন্দেহ।"

উল্লিখিত বয়ানে পাঠকের কাব্যরসোপভোগের ক্ষমতার উল্লেখসহ পাঠকসত্তারও শ্রেণী বিভাজন করেছেন লেখক। পাঠকের গ্রাহকসত্তার স্বীকৃতির পাশাপাশি এখানে একজন পাঠক তথা গ্রাহক হিসাবে রচনাকারের পাঠকসত্তার প্রতিক্রিয়াও দ্রষ্টব্য এবং সেই সঙ্গে লক্ষণীয় তাঁর গ্রাহকসত্তার বৈশিষ্ট্যও।

'গ্রহণতত্ত্ব'-র দৃষ্টিকোণে আধুনিক ভারতীয় সাহিত্যকে বিচার করলে দেখা যাবে যে, আধুনিক ভারতীয় সাহিত্য প্রধানত গড়ে উঠেছে ঔপনিবেশিক ভাবধারার পরিমণ্ডলে, পাশ্চাত্যের উপনিবেশবাদী সাম্রাজ্যশক্তি ব্রিটিশদের প্রদর্শিত ও প্রভাবিত পথে আধুনিক ভারতীয় সাহিত্যের পদচারণা শুরু। ঔপনিবেশিক শাসকশক্তির প্রতিষ্ঠিত শিক্ষা পদ্ধতি, প্রদর্শিত সাহিত্যসম্ভার এবং নির্দেশিত ভাষামাধ্যমের সাহায্যেই আধুনিক ভারতীয় সাহিত্যের সূচনা। যদিও এই আধুনিক ভারতীয় ধারণাটিও বিতর্কিত। তবুও যদি প্রচলিত ঐতিহাসিক ধারণাকে গ্রহণ করা যায়, তাহলে দেখা যাবে যে স্বাভাবিক ভাবেই আধুনিক ভারতীয় সাহিত্যের প্রাথমিক রূপ নির্মিত হয়েছে বাংলা সাহিত্যে এবং পরবর্তীকালে অন্যান্য ভারতীয় ভাষা ও সাহিত্যে। কারণ ঔপনিবেশিক বণিকশক্তি ও রাজশক্তির প্রথম অধিকৃত ক্ষেত্র ছিল বাংলাদেশ বা তদানীন্তন কালের বৃহত্তর 'সুবা বাংলা' বা বাংলা, বিহার, ওড়িশার একত্রিত ভৌগোলিক সীমারেখা এবং রাজধানী হয়েছিল কলকাতা। তাই কলকাতা তথা বাংলাকে কেন্দ্র করে গড়ে ওঠা শিক্ষা,

সাহিত্য, সংস্কৃতি, সকল কিছুই, অন্যান্য প্রাদেশিক ভাষা সাহিত্য নির্মাণের ক্ষেত্রেও পথিকৃতের ভূমিকা পালন করেছিল।

যেহেতু উনবিংশ শতাব্দীতে আধুনিক বাংলা সাহিত্যের সূচনা ঔপনিবেশিক পরিমণ্ডলে তাই আধুনিক বাংলা সাহিত্যতত্ত্বেরও সূচনা হয়েছিল ঔপনিবেশিক ভাবধারা ও মননচিন্তাকে সামনে রেখে। প্রাচ্য সাহিত্যতত্ত্বের ঐতিহ্য এবং পাশ্চাত্য সাহিত্যতত্ত্বের বহুমুখীন দৃষ্টিভঙ্গির বৈচিত্র্য, কোন্‌টি গ্রহণীয়, কোন্‌টি গ্রহণীয় নয় বা কতটা গ্রহণীয়, কতটা গ্রহণীয় নয়, গ্রহণ-বর্জনের ক্ষেত্রে এই পরস্পর বিরোধী টানাপোড়েনের মধ্যে দিয়েই ধীরে ধীরে গড়ে উঠেছে বাংলা সাহিত্যতত্ত্ব ভাবনার নিজস্ব রূপ। পাশ্চাত্য সাহিত্যতত্ত্বের সঙ্গে বাঙালি বিদগ্ধ সমাজের মনন চেতনার গ্রহণজাত ক্রিয়া-প্রতিক্রিয়ার ফলশ্রুতিতেই আধুনিক বাংলা সাহিত্যতত্ত্বের এই নবরূপায়ণ সম্ভব হয়েছিল।

'গ্রহণতত্ত্ব' হল আধুনিকতম সাহিত্যতত্ত্বগুলির এমন একটি অন্যতম স্তম্ভ যার মূল বৈশিষ্ট্য হল একাধিক ভিন্নদেশীয়, ভিন্ন প্রকৃতিযুক্ত বা ভিন্নকালের সাহিত্যের মধ্যেকার সম্পর্কের বিচিত্র টানাপোড়েনের রূপকে উদঘাটিত করা। এই বিচিত্র টানাপোড়েনের উদঘাটনকালে 'গ্রহীতা' পক্ষের ভাববৈচিত্র্য ও বৈশিষ্ট্যকে ব্যাখ্যাত করার চেষ্টা করে এই তত্ত্ব। কিন্তু ভারতীয় তথা বাংলা সাহিত্যে প্রাচ্য-পাশ্চাত্যের সম্পর্ক বিন্যাসজনিত তুলনামূলক সমালোচনার ধারা মূলত নির্ণীত হয়েছিল 'প্রভাবজাত দৃষ্টিকোণে', 'দাতা'র সম্পর্কের দিক দিয়ে। কারণ ঔপনিবেশিকতার প্রভাবে প্রভাবিত উপনিবেশের জনসমাজের মনন, চিন্তন, সংস্কৃতি, সাহিত্য, সকল কিছুতেই প্রভুশক্তির প্রভুত্বের ছাপ পড়ে, এবং সেই 'প্রভাব' এত গূঢ়াতিশায়ী যে, তা উপনিবেশোত্তর কালেও পরোক্ষ উপনিবেশবাদকে প্রতিষ্ঠিত রাখে। তাই বাংলা সাহিত্যেও, ভারতবর্ষের স্বাধীনতা-উত্তরকালেও যে ঔপনিবেশিক প্রভাব থাকবে, এতে আশ্চর্য হওয়ার কিছু নেই, আধুনিক বাংলা সাহিত্য সমালোচনার ক্ষেত্রে 'দাতা'র প্রভাবও এই সূত্রেই আগত।

প্রচলিত ভাবে এটাই প্রতিষ্ঠিত মতামত যে পাশ্চাত্য সাহিত্য তথা বিশেষভাবে ইংরেজি সাহিত্যের সঙ্গে সম্পর্কের সুবাদে যে আধুনিক বাংলা সাহিত্য নির্মিত হয়েছে তাতে ইংরেজি সাহিত্যেরই ভূমিকা সর্বাধিক গুরুত্বপূর্ণ। কারণ ইংরেজি সাহিত্যই আধুনিক বাংলা সাহিত্যকে বিকশিত করেছে, সমৃদ্ধ করেছে, এমনকি সৃজনও করেছে। এমনই মনে হয় যেন আধুনিক বাংলাসাহিত্যের কোনও আত্মসত্তা, কোনও ঐতিহ্যচেতনা, কোন স্বকীয়তা নেই। উপনিবেশবাদী 'প্রভাবজাত' ভাবধারার দ্বারাই এইভাবে, প্রাথমিকভাবে ব্যাখ্যাত হয়েছে বাংলাসাহিত্যের ঐতিহাসিক ক্রমবিকাশের ধারাটি :

> ....আকস্মিক ও আশ্চর্য পরিবর্তন এল উনবিংশ শতাব্দীর বাংলা সাহিত্যে, ইংরেজ শাসনকালে ইংরেজী ভাষার মারফতে মধ্যযুগীয় ও ঘরকুনো বাঙালীর চেতনায় ভূগোল-ইতিহাসের সীমা সহসা বেড়ে গেল।.......পাশ্চাত্য সাহিত্যের জীবনবাদী প্রেরণা এবং বাস্তব ও ভূমিচারী চেতনার ফলে উনবিংশ শতাব্দীর বাঙালীর চেতনা প্রবাহ যা পল্বলে পর্যবসিত হয়েছিল, তা কোটালের বানে ভরে উঠল। মধ্যযুগের পদাবলী পাঁচালী ও দেবদেবীর লীলাকীর্তন ছেড়ে বাঙালী সাহিত্যিক মাটির বুকে নামলেন, মৃত্তিকাতলচারী মানবজীবনের অপার বিস্ময় উপলব্ধি করলেন। এই মানবধর্ম যা সমাজদর্শনে মানবতাবাদ নামে পরিচিত, য়ুরোপীয় সাহিত্য থেকে সে আদর্শ পাশ্চাত্য শিক্ষিত উনিশ শতকের বাঙালী মনে প্রাণে গ্রহণ করল।.......কাব্য ও কাহিনী, উপন্যাস ও নাটক শিল্পের প্রতিটি চত্বরে দেবতার পবিত্র চরণরেণুর স্থলে দুঃখদুর্ভর মানবজীবনের অশ্রুবেদনা ও পুলকানুভূতি পূর্ণ বাস্তব কাহিনী

অধিকতর আগ্রহে স্বীকৃত হল। এইখানে মধ্যযুগীয় বাংলা সাহিত্যের সঙ্গে আধুনিক অর্থাৎ উনিশ শতকের বাংলা সাহিত্যের প্রধান ব্যবধান ঘটে গেল।

এই ধরনের প্রচলিত 'প্রভাব'-সংক্রান্ত ধারণা থেকে সরে এসে ঠিক তার বিপ্রতীপ দৃষ্টিভঙ্গিতে অবদমিত বা আপাতভাবে গুরুত্বহীন সাহিত্যধারার বৈশিষ্ট্যকে বিশ্লেষণ করে, তার স্বকীয়তাকে চিহ্নিতকরণ বা 'আত্মসত্তা'র অনুসন্ধান এবং আবিষ্কারই 'গ্রহণতত্ত্ব'-র সাধ্য ও সাধন। প্রসঙ্গত এর সঙ্গে যুক্ত হয়ে পড়ে লেখক-পাঠক সম্পর্ক। স্রষ্টা-রসগ্রাহী, দাতা-গ্রহীতা, যে নামেই অভিহিত করা হোক না কেন, সৃষ্টিকে কেন্দ্রস্থলে রেখে সাহিত্যস্রষ্টা ও তার উপভোক্তার বিচিত্র সম্পর্কবিন্যাসের বিচিত্রতর মাত্রা ও ভূমিকা নির্ণয়ই 'গ্রহণতত্ত্ব'-র উদ্দিষ্ট। এই তত্ত্বে পাদপ্রদীপের আলোয় এসেছে গ্রহীতা, তথা পাঠক— রসগ্রাহী শ্রেণী। উদাহরণ হিসেবে উল্লেখ্য আধুনিক বাংলাসাহিত্য সম্পর্কিত এই মূল্যায়নটি, যেটি 'বঙ্গদর্শন' পত্রিকার প্রাজ্ঞ, বিদগ্ধ সম্পাদক-সমালোচক, রসস্রষ্টা বঙ্কিম স্বয়ং ঊনবিংশ শতাব্দীতেই করেছিলেন :

> ভারতবর্ষীয়েরা শেষে আসিয়া একটি এমন প্রদেশ অধিকার করিয়া বসতি স্থাপন করিয়াছিলেন যে, তথাকার জলবায়ুর গুণে তাঁহাদিগের স্বাভাবিক তেজ লুপ্ত হইতে লাগিল।............এই উচ্চাভিলাষশূন্য অলস, নিচেষ্ট গৃহসুখপরায়ণ চরিত্রের অনুকরণে এক বিচিত্র গীতিকাব্য সৃষ্ট হইল। সেই গীতিকাব্যও উচ্চাভিলাষশূন্য, অলস ভোগাসক্ত, গৃহসুখপরায়ণ। সে কাব্যপ্রণালী অতিশয় কোমলতাপূর্ণ, অতি সুমধুর।.......অন্যসকল প্রকারের সাহিত্যকে পশ্চাতে ফেলিয়া এই জাতিচরিত্রানুকারী গীতিকাব্য সাত-আটশত বৎসর পর্যন্ত বঙ্গ দেশে জাতীয় সাহিত্যের পদে দাঁড়াইয়াছে। এই জন্য গীতিকাব্যের এত বাহুল্য।

এই প্রতিবেদন 'গ্রহণ'-জাত সমালোচনা। তত্ত্বগত দিক দিয়ে যা বাংলা সাহিত্য নির্মাণে বাঙালির অন্তর চেতনার বৈশিষ্ট্যকে চিহ্নিত করে এবং প্রমাণিত করে। খ্যাতকীর্তি এই সাহিত্যস্রষ্টা ঊনবিংশ শতাব্দীর শিক্ষিত সাহিত্যসচেতন বাঙালি সমাজ ও বাঙালি মানসের প্রতিনিধি-স্থানীয় চরিত্রই শুধু ছিলেন না, ছিলেন স্থপতিও। তাই তৎকালে বা তৎপরবর্তীকালে বাঙালির রোমাণ্টিক চেতনার ব্যাপ্ত প্রকাশ, একান্তভাবে কোন পাশ্চাত্য ভাবধারার প্রভায় প্রভাবিত সৃষ্টি, বহুশ্রুত এই মূল্যায়ন সঠিক নয়।

গ্রাহক সাহিত্যের বৈশিষ্ট্যকে এভাবে উদঘাটিত ও বিশ্লেষিত করতে পারে একমাত্র 'গ্রহণতত্ত্ব'। গ্রহণতত্ত্বের যাথার্থ্য দিয়ে গ্রাহকসত্তার গুরুত্বের প্রামাণ্য নিদর্শনের আরও একটি উদাহরণ হল আধুনিক বাংলা কাব্যধারার পাশ্চাত্য সাহিত্যের অভিঘাতজনিত প্রেক্ষাপটটি। এটি প্রমাণ করে গ্রহণতত্ত্বের গুরুত্বপূর্ণ ক্রিয়া-প্রতিক্রিয়াকে। লক্ষণীয়, আধুনিক বাংলা কাব্যধারায় পাশ্চাত্য সাহিত্যের অভিঘাত গৃহীত হয়েছিল দ্বৈতভাবে— প্রত্যক্ষ গ্রহণের দ্বারা এবং পরোক্ষ গ্রহণের দ্বারা। 'প্রত্যক্ষ গ্রহণে' সরাসরি স্বীকৃতি। যেমন আধুনিক বাংলা কাব্যধারায় ইংরেজি সাহিত্যের কবি 'টেনিসন' গৃহীত হয়েছিলেন নানাভাবে। তাঁর রচনাদির বহুল অনুবাদ বা তাঁকে নিয়ে রচিত অসংখ্য প্রবন্ধাদি, এরই প্রমাণ দেয়। 'পরোক্ষ গ্রহণ' অভ্যন্তরীণ বৈশিষ্ট্যকে উদঘাটিত করে। আধুনিক বাংলাসাহিত্যে 'পরোক্ষ গ্রহণের নিদর্শন রূপে চিহ্নিত করা যায় রোমান্টিক কাব্যাদর্শের বহুল ব্যবহারকে। রোমান্টিকতার প্রতি বাঙালির সহজাত আকর্ষণের কারণেই বাঙালির সাহিত্যচেতনায় ইংরেজি সাহিত্যের রোমান্টিক যুগ, রোমান্টিক কবিদের জনপ্রিয়তা সর্বাধিক। বাঙালির আন্তর-প্রবণতা রোমান্টিক কাব্যাদর্শকে সহজেই গ্রহণ থেকে আত্মস্থীকরণের দিকে নিয়ে গিয়েছে। তাই বাংলা কাব্যধারায় একসময়ে অনেক কবিকেই চিহ্নিত করা হয়েছিল 'বাংলার শেলি' বা 'বাংলার বায়রণ' বলে। আশ্চর্যের বিষয় এই যে, সে সময়ে কেউ কিন্তু

চিহ্নিত হননি 'বাংলার টেনিসন' বলে। কারণ, *টেনিসন গৃহীত হয়েছিলেন প্রধানত বহিরাঙ্গিক* দিক দিয়ে। ইংলণ্ড-এর রাজকবি টেনিসন স্বাভাবিক ভাবে রাজনৈতিক কারণেই শাসিত জাতির কাছে গৃহীত হয়েছিলেন। বিপরীতে শেলি, কিটস্‌, বায়রন বা ওয়ার্ডস্‌ওয়ার্থ গৃহীত হয়েছিলেন অন্তরাঙ্গিক দিক দিয়ে। প্রসঙ্গত উল্লেখ্য, রোমান্টিক যুগের অন্যতম খ্যাতনামা কবি হওয়া সত্ত্বেও, বাঙালি মানসের কাছে 'কোলরিজ' ততটা গৃহীত হয়নি, যতটা হয়েছিলেন অন্যান্যরা; কারণ কোলরিজের কাব্যভাবনা বাঙালি মননের অনুকূল ছিল না। বাঙালির সাহিত্যচেতনা তাঁর কাব্যধারায় মানস-সাযুজ্য খুঁজে পায়নি। তাই রোমান্টিক যুগের অন্যান্য কবিদের তুলনায় বাঙালির গ্রাহক মানসিকতার কাছে কোলরিজ উপেক্ষিতই থেকে গেছেন। গ্রাহক সাহিত্যের বৈশিষ্ট্যকে এভাবেই উদ্‌ঘাটিত ও বিশ্লেষিত করে 'গ্রহণতত্ত্ব'।

'গ্রহণতত্ত্ব'-র এই দৃষ্টিভঙ্গিতেই ব্যাখ্যা করা যায় আধুনিক বাংলা সাহিত্যের ও সাহিত্যতত্ত্বের সমালোচনার নানা বৈশিষ্ট্য :

> ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্তের রচনায় স্বয়ং বঙ্কিমচন্দ্র যে খাঁটি বাঙালি 'কবি'র লক্ষণ দেখতে পেয়ে তাঁর স্বাদেশিকতার প্রশংসা করেছিলেন, এইজন্যে সমকালীন প্রত্যাশার চরিত্রই দায়ী। আজকের পরিবর্তিত পরিস্থিতিতে যেহেতু প্রত্যাশার দিগন্ত আমূল রূপান্তরিত হয়ে গেছে, ঈশ্বরগুপ্তের বাঙালিত্ব মেনে নিয়েও তিনি খাঁটি কবি কিনা— এই মৌলিক প্রশ্ন উঠতে পারে। তেমনি হেমচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়ও একসময় মধুসূদনের চেয়ে বড়ো কবি বলে বিবেচিত হয়েছিলেন। বাঙালি মধ্যবিত্ত বর্গের প্রথম উন্মেষের পর্বে তাঁর সীমাবদ্ধতাও পড়ুয়াদের জীবনের তালে লয়ে মিশে গিয়েছিল। কিন্তু বিশ শতকের মাঝামাঝি থেকেই একথা আর কেউ বলছেন না। আবার এই শতকের মাঝামাঝি পর্যন্ত জীবনানন্দ নিষ্ঠুর ব্যঙ্গ কটাক্ষ উপহাসের মুখোমুখি হয়েছিলেন, আজ তিনি কিংবদন্তিতে পরিণত এর কারণ পাঠকের প্রত্যাশার দিগন্ত ইতিমধ্যে সামাজিক ইতিহাসের অনিবার্য প্রেরণায় আমূল রূপান্তরিত ও প্রসারিত হয়ে গেছে।

আধুনিক বাংলা সাহিত্যকে ঘিরে এই রকম অজস্র প্রশ্ন উঠে আসে যার সম্ভাব্য উত্তর পাওয়া একমাত্র সম্ভব 'গ্রহণতত্ত্ব'-র দ্বারা, গ্রহীতা পক্ষের দৃষ্টিভঙ্গিই দিতে পারে এই সব প্রশ্নের সঠিক উত্তর। যেমন আধুনিক বাংলা সাহিত্যের সর্বক্ষেত্রে রোমান্টিকতার প্রকাশ এত ব্যাপ্ত কেন? মধুসূদনের ক্লাসিক কাব্য *মেঘনাদবধ*-এ রোমান্টিকতার সুর খোঁজে কেন বাঙালি? কেন উনবিংশ শতাব্দীর পর আধুনিক মহাকাব্য রচনা প্রায় লুপ্ত হয়ে যায়? চণ্ডীমঙ্গল কাব্যের ঔপন্যাসিক বাস্তবতার স্বরূপ বৈশিষ্ট্য কি? বৈষ্ণব পদাবলী ও *ভানুসিংহ ঠাকুরের পদাবলী*-র আন্তঃসম্পর্ক কতখানি? বাঙালির স্বাদেশিক চেতনায় পাশ্চাত্য স্বদেশভাবনার গুরুত্ব কিরূপ? রবীন্দ্রোত্তর কালের কবিদের কাছে রবীন্দ্রসাহিত্যের মূল্যায়ন কিরূপ? ইত্যাদি ইত্যাদি। প্রকৃত অর্থে আধুনিক বাংলা সাহিত্য, সাহিত্য সমালোচনা, সাহিত্যের ইতিহাস সবকিছুই 'গ্রহণতত্ত্ব' দ্বারা ব্যাখ্যাত হবার অপেক্ষায় রয়েছে। যার সূচনা ঘটেছে বটে, কিন্তু কাজ অনেক বাকি।

উল্লেখপঞ্জি :

১. Dasgupta, Chakraborty, Subha — *A Bibliography of Reception World Lite-rature in Bengali Periodicals, 1890-1900*. Calcutta : Jadavpur University. 1st Pub. August 1992, p. 1-2

২. Holub, Robert C. ...... *Reception Theory : A Critical Introduction,* London and New-York : Methuen & Co. Ltd. 1st Pub. 1984. p. 60

৩. Selden, Raman *A Reader Guide to Contemporary Literary Theory* : London : The Harvester Press Ltd. 1st Pub. 1985, p. 115

৪. Holub, Robert C.. *Reception Thory : A Critical intro duction,* London and Newyork. Methuen & Co Ltd. 1st Pub. 1984. p. 4.

৫. Freund, Elizabeth *The Return of the Reader* : Reader Response Criticism, Newyork : Methuen & Co. Ltd. 1st Pub. 1987 pp. 141-42

৬. রায়, দ্বিজেন্দ্রলাল কাব্যের 'উপভোগ' বঙ্গদর্শন (সাময়িক পত্র), মাঘ সংখ্যা, বঙ্গাব্দ ১৩১৪, ৭ম বর্ষ, পৃ. ৪৯৬-৫০৫

৭. বন্দ্যোপাধ্যায়, অসিতকুমার *বাংলা সাহিত্যের সম্পূর্ণ ইতিবৃত্ত,* খ্রিস্টীয় দশম-বিংশ শতাব্দী, কলকাতা: মডার্ন বুক এজেন্সি প্রা. লি. সংশোধিত ষষ্ঠ সং, শ্রাবণ ১৩৯০, পৃ. ১৭৭-৭৯

৮. চট্টোপাধ্যায়, বঙ্কিমচন্দ্র 'বিদ্যাপতি ও জয়দেব' বিবিধ প্রবন্ধ, *বঙ্কিম রচনাবলী,* ২য় খণ্ড, সম্পা. যোগেশচন্দ্র বাগল, কলিকাতা : সাহিত্য সংসদ, ৮ম মুদ্রণ, শ্রাবণ ১৩৯০ পৃ. ১৯১

৯. ভট্টাচার্য, তপোধীর *প্রতীচ্যের সাহিত্যতত্ত্ব,* মেদিনীপুর : অমৃতলোক সাহিত্য পরিষদ, ২য় পরিবর্ধিত সংস্করণ, ফেব্রুয়ারি ২০০২, পৃ. ৭৩-৭৪

বাগর্থতত্ত্ব
সাহিত্যের অনুষঙ্গে

রমাপ্রসাদ দে

'I speak because I want to be heard'—*বলেছেন একজন ভাষাবিজ্ঞানী। কিন্তু অন্যে আমার কথা শুনুক এটা আমি চাই কেন? চাই তার কারণ কথা* শুনলে আমার বলার বিষয়টা উদ্দিষ্ট ব্যক্তি বা ব্যক্তিরা বুঝতে পারবেন। অর্থাৎ আমি যা বলেছি তার একটা মানে আছে। যদি মানে না থাকত তাহলে আমার উচ্চারিত ধ্বনিগুলি বৃক্ষের মর্মর কিংবা নদীর কলধ্বনির মতো মানবকণ্ঠ নিঃসৃত অর্থহীন ধ্বনিতেই পর্যবসিত হত। কিন্তু মানুষের কথা তো বিচিত্র অর্থবহ। ভাষার এই অর্থগত অধ্যয়ন নিয়ে গড়ে উঠেছে বাগর্থতত্ত্ব বা Semantics।

ভাষাতত্ত্বে যেমন ধ্বনির আলোচনা থাকে, অন্বয়ের আলোচনা থাকে, তেমনই শব্দগত, বাক্যগত অর্থ নির্ধারণও গুরুত্বপূর্ণ। নীচের তালিকাটি লক্ষ করা যাক—

ধ্বনি ↔ ধ্বনিতত্ত্ব ↔ অন্বয় ↔
অর্থতত্ত্ব ↔ চিন্তা

রেখাঙ্কন থেকে বোঝা যাচ্ছে ভাষার আলোচনা প্রকৃতপক্ষে অর্থের আলোচনাই। এর একপ্রান্তে চিন্তা, অন্য প্রান্তে ধ্বনি। চিন্তার সঙ্গে অন্বিত হলেই উচ্চারিত ধ্বনি-পরম্পরা অর্থময় হয়ে ওঠে। অর্থ নিহিত থাকে ভাষার প্রতিটি স্তরে।— ধ্বনিগত, রূপগত কিংবা অন্বয়গত স্তরগুলি অতিক্রম করে আমরা শেষপর্যন্ত পৌঁছে যাই 'অর্থে'। ড. শিশিরকুমার দাশ লিখেছেন, "ভাষার ধ্বনিসজ্জা, তার রূপমূলসজ্জা, তার অন্বয় সবই তো শেষ পর্যন্ত একজনের কাছ থেকে অন্যজনের কাছে 'অর্থ' পৌঁছে দেওয়া"। আমরা যখন কোনো শব্দের অর্থ বুঝি না, অভিধান খুলে বসি, শব্দটির একটি পরিচিত প্রতিশব্দ থেকে অর্থ বুঝে নিই। যেমন শ্রীল শব্দের মানে শ্রীযুক্ত বা সৌন্দর্যযুক্ত। 'শ্রী' কথার অর্থ 'সৌন্দর্য' আর 'ল' বলতে বোঝায় 'যুক্ত'। কিন্তু এমন অনেক শব্দ আছে যার অর্থ আভিধানিক নয়, ব্যাকরণিক। নিম্নরেখ শব্দগুলি লক্ষ করা যাক—

আকাশ <u>থেকে</u> পুষ্পবৃষ্টি হতো।

গাছের <u>উপর দিয়ে</u> পাখিটা উড়ে গেল।

সেই <u>তো</u> আমি বসে আছি, তোমার আসার সময় হল না।

রেখাঙ্কিত এই শব্দগুলিরও অর্থ আছে, কিন্তু গাছ পাথর জল প্রভৃতি শব্দের মতো প্রতি-শব্দে এদের অর্থ নির্দেশ করা যায় না। এদের অর্থ বুঝে নিতে হয় বাক্যের অন্বয়গত গঠন থেকে। বাগর্থতত্ত্ব শুধুমাত্র কিছু শব্দের অর্থ নিয়েই আলোচনা করে না, ধ্বনি, রূপ, শব্দ, অন্বয়— এককথায় বাক্যের মধ্যে দিয়ে জগৎ ও জীবন সম্পর্কে আমাদের অভিজ্ঞতা/উপলব্ধি বাক্যের বিভিন্ন স্তরে কীভাবে আভাসিত হয়, বাগর্থতত্ত্ব তাই নিয়ে আলোচনা করে। সাদা রঙ যেমন সাতটি রঙের সমষ্টি, একটি বাক্যের বা একটি গঠনের অর্থ তেমনই বহুতল বিশিষ্ট।

আলোচ্য নিবন্ধে আমরা প্রধানত তিনটি দিক থেকে বাগর্থতত্ত্বের আলোচনা করব—

১. ধ্বনিগত ;

২. শব্দগত ; এবং

৩. অন্বয়গত।

ভাষা মানুষের আচরণগত দিক। মনোবিদ জে. বি. ওয়াটসন মানুষের সমস্ত আচরণকে দুটি ধারণার সাহায্যে ব্যাখ্যা করেন— উদ্দীপনা (stimulus) ও প্রতিক্রিয়া (response)। ভাষা যেহেতু মানব আচরণের অন্তর্গত তাই মার্কিন দেশের সাংগঠনিক ভাষাবিদ ব্লুমফিল্ড ভাষাকে ব্যবহারিক আচরণবাদী দৃষ্টিকোণ থেকে দেখেছেন। ভাষার ব্যবহার ব্যাখ্যা করতে গিয়ে তিনি তাঁর বিখ্যাত *Language* (১৯৩৩) বইটিতে একটি গল্পের অবতারণা করেছেন। গল্পটি এইরকম : 'জ্যাক আর জিল হাঁটছিল রাস্তা দিয়ে। যেতে যেতে বোন জিল দেখতে পেল একটি গাছে দুলছে আপেল। সে ছিল ক্ষুধার্ত। তাই সে ভাইকে অনুরোধ করে একটি আপেল পেড়ে দিতে— অর্থাৎ সে তার স্বরযন্ত্র, জিভ, ঠোঁট ইত্যাদির সাহায্যে কতগুলো ধ্বনি সৃষ্টি করল। তার ফলে জ্যাক গাছে উঠে আপেল পাড়ে, জিলকে দেয়, জিল খায়।'— এই ঘটনায় ব্লুমফিল্ড তিনটি পর্যায় লক্ষ করেন।

(A) প্রাক্ বাচনিক ক্রিয়া : আপেল দেখা, ক্ষুধার্ত বোনের আপেল খাওয়ার ইচ্ছা ইত্যাদি।

(B) বাচনিক ক্রিয়া।

(C) বাচনিক পরবর্তী অ-বাচনিক ক্রিয়া : আপেল পাড়া।

ব্লুমফিল্ড এই ঘটনার 'A' পর্যায়টিকে ব্যাখ্যা করেছেন এইভাবে : "The events in A concern mainly the speaker, Jill. She was hungry ; that is, some of her muscles were contracting, and some fluids were being secreted, especially in her stomach. Perhaps she was also thirsty : her tongue and throat were dry. The light-waves reflected from the red apple struck her eyes. She saw Jack by her side. Her past dealings with Jack should now enter into the picture ; let us suppose that they consisted in some ordinary relation, like that of brother and sister or that of husband and wife. All these events, which precede Jill's speech and concern her, we call the speaker's stimulus." অর্থাৎ জিল ক্ষুধার্ত ছিল। তাই তার পেশির সংকোচনে কিছুটা তরল পদার্থের নিঃসরণ ঘটেছিল পাকস্থলিতে। লাল আপেল থেকে প্রতিফলিত আলোকতরঙ্গ সে-মুহূর্তে জিল-এর চোখকে স্পর্শ করল। জিল-এর পাশেই ছিল জ্যাক। তার সঙ্গে অতীত সম্পর্কের ভিত্তিতে সে তাকে আপেলটা পেড়ে আনতে বলল। গাছের ডালে ঝুলে থাকা আপেল জিল-এর উদ্দীপনার কারণ। এই উদ্দীপনায়

সে স্বরাঞ্চলের গ্রন্থিগুলিকে সক্রিয় করে তুলেছে। জিল ওষ্ঠ, তালু ইত্যাদির মাধ্যমে ধ্বনি উৎপাদন করেছে। অর্থাৎ উদ্দীপনার(s) পরিণামে সে Practical Reaction (R) না ঘটিয়ে ভাষাগত বা বাচনিক প্রতিক্রিয়া জ্ঞাপন করেছে। অর্থাৎ এখানে জিল-এর বাস্তব প্রতিক্রিয়ার বদলে দেখা দিয়েছে বিকল্প প্রতিক্রিয়া বা substitute reaction। উদ্দীপক ও বাস্তব প্রতিক্রিয়ার সম্পর্ককে ব্লুমফিল্ড নির্দেশ করেছেন এইভাবে :

$$S \longrightarrow R$$

কিন্তু জ্যাক পাশে থাকায় জিল নিজে আপেল পাড়েনি। অর্থাৎ তার আচরণে স্বাভাবিক প্রতিক্রিয়া (R) ঘটেনি। সে কাজটা করতে চেয়েছে বিকল্প প্রতিক্রিয়া (r) তথা ভাষা ব্যবহারের মাধ্যমে। এই বিকল্প ভাষিক প্রতিক্রিয়ার বিষয়টিকে ব্লুমফিল্ড দেখাতে চেয়েছেন এইভাবে—

$$S \longrightarrow r$$

জিল-এর কণ্ঠ-উদ্‌গীর্ণ ধ্বনি-ঢেউ বাতাসকে আন্দোলিত করে জ্যাক-এর কানে আঘাত করেছে। এই আঘাত বা শোনা জ্যাক-এর দিক থেকে উদ্দীপনা। আর তার বাস্তব প্রতিক্রিয়া হল গাছ থেকে ফল পেড়ে আনা। সম্পূর্ণ ব্যাপারটা ব্লুমফিল্ড দেখিয়েছেন এইভাবে :

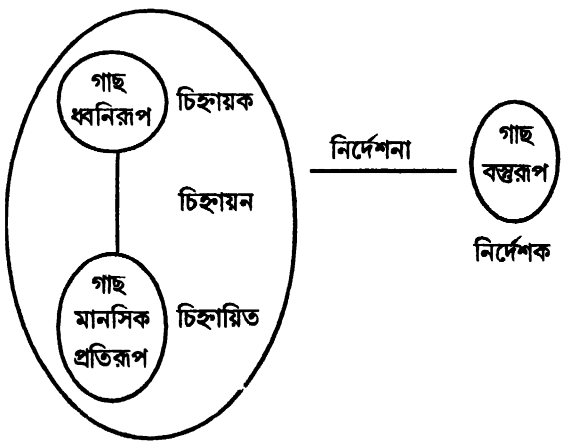
$$S \longrightarrow r \ldots\ldots\ldots\ldots\ s \longrightarrow R$$

এই রেখাঙ্কনে S হল স্বাভাবিক উদ্দীপনা, r বিকল্প তথা বাচনিক প্রতিক্রিয়া। মধ্যবর্তী s হল বাচনিক উদ্দীপনা এবং R হল বাস্তব তথা অ-বাচনিক প্রতিক্রিয়া। ভাষাতত্ত্বের কাজ মধ্যবর্তী এই বাচনিক প্রতিক্রিয়া ও বাচনিক উদ্দীপনা অর্থাৎ এইখানে ভাষা ও অর্থের জগৎ। s ও r-এর মধ্যবর্তী যে বিন্দুসমষ্টি তা নির্দেশ করছে বক্তা ও শ্রোতার মাঝে শূন্যস্থান, দুটি বিচ্ছিন্ন ব্যক্তিকে সংযুক্ত করছে ধ্বনি তরঙ্গ। ব্লুমফিল্ড-এর ভাষায়, 'The gap between the bodies of the speaker and the hearer—the discontinuity of the two nervous systems—is bridged by the sound-waves,' এই ধ্বনিতরঙ্গের প্রকৃতপক্ষে কোনো মূল্য নেই, ভাষার এই উপাদান মূল্যময় হয়ে ওঠে তখনই যখন তা অর্থের সঙ্গে যুক্ত হয়। অর্থ বলতে ব্লুমফিল্ড বুঝেছিলেন বাচনিক ক্রিয়ার সঙ্গে যুক্ত অ-বাচনিক প্রতিক্রিয়া তথা বাস্তব জগতে মানুষের আচরণ। বাচনিক ক্রিয়া মানুষের সর্বাঙ্গীণ আচরণের একটি অঙ্গমাত্র। ভাষার বাইরে বাস্তব জগৎ সম্পর্কে আমাদের ধারণা যতদিন না সম্পূর্ণতা পাচ্ছে ততদিন পূর্ণ অর্থ জানাও আমাদের পক্ষে সম্ভব নয়। আর তাই অর্থ সম্পর্কে ব্লুমফিল্ড ছিলেন হতাশাগ্রস্ত আর তার প্রভাব পড়ে সাংগঠনিক (structural) ভাষাতত্ত্বের উপর। ব্লুমফিল্ড-এর নির্দেশিত পথে ভাষার রূপ বা গঠনের উপরে সমধিক গুরুত্ব দেন পরবর্তীরা। অর্থ থেকে যায় ভাষা বিশ্লেষণের প্রান্তিক সীমানায়।

ফের্দিনাঁ দ্য সোস্যুর'-এর (১৮৫৭-১৯১৩) *কুর দ্য ল্যাঁগিস্তিক জেনেরাল* (*Cours de Linguistique Generale*) প্রকাশিত হয়েছিল ১৯১৬ খ্রিস্টাব্দে। মরণোত্তর এই বইটি মানুষের *চিন্তার জগতে যে আলোড়ন এনেছিল, সে সম্পর্কে* Roy Harris *লিখেছেন, এই বইটি হল* "without doubt one of the most farreaching works concerning the study of human cultural activities to have been published at any time since the

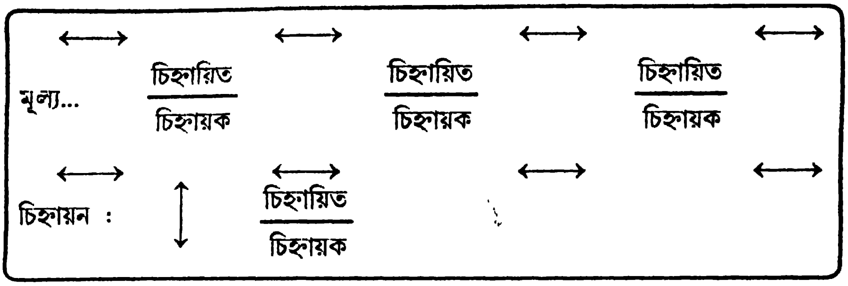
Renaissance." *সোস্যুর চেয়েছিলেন সামাজিক চিহ্নের অর্থসন্ধানী একটি শাস্ত্র গড়ে উঠুক* যার নাম হবে Semiology। ভাষাতত্ত্বকে তিনি সেমিওলজি-র অন্তর্গত করে দেখতে চেয়েছেন। তিনি লিখেছেন, 'Linguistics is only a part of the general science of Semiology ; the laws discovered by semiology will be applicable to linguistics'...সোস্যুরের ভাবনা ছিল সুদূরপ্রসারী। Semantics বা বাগর্থতত্ত্বে তা গভীর ভাবে অনুভূত হয়। ভাষা তৈরি হয় শব্দ দিয়ে। স্যোসুর শব্দকে ভাষিক চিহ্ন (Linguistic sign) হিসাবে দেখেছেন। চিহ্নের দুটো দিক— চিহ্নায়ক ও চিহ্নায়িতের তথা ধ্বনিরূপ ও ধারণার মধ্যে কোনো অন্তর্লীন সম্পর্ক নেই। দৃষ্টান্ত হিসাবে বাড়ি শব্দটি নেওয়া যাক। ব্ আ ড়্— এদের মিলিত ধ্বনিরূপের সঙ্গে বাড়ির ধারণার কোনো প্রাকৃতিক সম্পর্ক নেই। আর তা নেই বলেই ভিন্নভাষায় ভিন্ন চিহ্নায়কের ব্যবহার লক্ষ করা যায়। বাংলায় বাসস্থান বোঝাতে যে 'বাড়ি' কথাটি আমরা ব্যবহার করি, বাসগৃহের সেই ধারণাটি  প্রকাশ করতে ফরাসি-তে বলা হয় maison, স্প্যানিশে বলা হয় casa। বাসস্থানের সঙ্গে শব্দগুলির সম্পর্ক তাই আপতিক। নিম্নরূপ রেখাঙ্কনের দিকে তাকানো যাক—

চিহ্ন : গাছ



সোস্যুরীয় চিহ্নতত্ত্বে নির্দেশকের (referent) স্থান গুরুত্বপূর্ণ নয়। চিহ্নায়ক ও চিহ্নায়িতের অনুশীর্ষক (vertical) সম্পর্কের মধ্য দিয়ে যে চিহ্নায়ন (signification) ঘটছে, তাতেই এখানে বাড়ির একটি মানসিক প্রতিরূপ তৈরি হচ্ছে বস্তু-নিরপেক্ষভাবেই। কিন্তু এক একটি চিহ্ন কীভাবে অর্থপূর্ণ হয়ে ওঠে? সোস্যুর বলবেন এককভাবে কোনো চিহ্নের মূল্য নেই। একটি চিহ্ন তখনই মূল্য পায় যখন তা একটা system বা সংবিধির অন্তর্গত হয়ে ভিন্ন একটি চিহ্নের পাশে অবস্থান করে। অর্থাৎ একটি চিহ্ন আর একটি চিহ্নের পাশে এসেই অর্থপূর্ণ স্বাতন্ত্র্য অর্জন করে। আর এই পৃথকত্ব আসে অবশ্যই দুটি চিহ্নের পার্থক্যের থেকে। 'জল' আর 'জট' যে পৃথক তার কারণ এক ক্ষেত্রে /ল/ আর এক ক্ষেত্রে /ট/-এর পার্থক্য। বোঝা যায় চিহ্নায়ক ও চিহ্নায়িতে যেখানে চিহ্নায়ন দেখা দিচ্ছে, সেখানে চিহ্নের অর্থের উৎস হিসাবে আমরা তাকাই অনুভূমিক (horizontal) সম্পর্কের দিকে।

এই অনুভূমিক সম্পর্কের যে তাৎপর্য, তা-ও শেষ পর্যন্ত নির্ভর করে ভাষাপ্রবাহে চিহ্নগুলির পারস্পরিকতায় :



লক্ষণীয়, চিহ্নের মূল্য যেখানে নির্ধারিত হচ্ছে চিহ্নায়কের সঙ্গে চিহ্নায়কের এবং চিহ্নায়িতের সঙ্গে চিহ্নায়িতের সমতলিক রৈখিক বিন্যাসে সেখানে চিহ্নায়ন ঘটছে চিহ্নায়ক ও চিহ্নায়িতের উঁচুনীচু বা অনুশীর্ষক সম্পর্কের মাধ্যমে। চিহ্নগুলির বিন্যাসে আরও একটি দ্বিভাজনের প্রসঙ্গ এনেছেন সোস্যুর— বৈকল্পিক (paradigmatic) ও পারস্পরিক (syntagmatic)। আমরা যখন কোনো একটি ভাষাচিহ্নকে বাক্যের অন্তর্গত করি তখন একাধিক চিহ্ন ব্যবহারের সম্ভাবনা থেকে সেই একটিমাত্রকেই নির্বাচন করি। অর্থাৎ এখানে নির্বাচন প্রক্রিয়া হল—

এই^{১} অথবা এই^{২} অথবা এই^{৩} অথবা...

এই^{২} অথবা এই^{৩} যদি আমাদের নির্বাচনে না আসে, তাহলে এই^{১}-এর সঙ্গে তাদের সম্পর্ক হল অনুপস্থিতির সম্পর্ক। কারণ তাদের বিকল্প হিসাবেই এই^{১} এখানে প্রযুক্ত হচ্ছে। কিন্তু পারস্পরিকতা দেখা দেয় চিহ্নগুলির রৈখিক বিন্যাসে। সেখানে বিন্যাস প্রক্রিয়া এইরকম—

এই^{১} এবং এই^{২} এবং এই^{৩} এবং...

অর্থাৎ এখানে উপস্থিতির সংযোগ ও সমন্বয়ের প্রক্রিয়া। চিহ্নের মূল্য নিরূপিত হয় এই উপস্থিতি ও অনুপস্থিতির অন্তর্বয়নে।

সোস্যুর শুধুমাত্র প্রতীক চিহ্নগুলোকেই স্বীকৃতি দিয়েছেন কিন্তু চার্লস স্যান্ডর পার্স-এর (১৮৩৯-১৯১৪) বিভাজনে চিহ্নায়ক ও চিহ্নায়িতের সম্পর্কে পরিমাণগত পার্থক্য নির্দেশিত হয়েছে। চিহ্নের ত্রিধা বিভাজন করেছেন পার্স— icon (প্রতিম), index (সূচক) ও symbol (প্রতীক)। প্রথাবদ্ধ চিহ্নায়ন যেখানে প্রতীকী অর্থ বহন করে, সেখানে প্রতিম ও সূচক চিহ্ন স্বয়ংপ্রকাশ অর্থবহ। প্রতিম চিহ্নের (ফটোর সঙ্গে সংশ্লিষ্ট ব্যক্তির কিংবা মানচিত্রের সঙ্গে ভূসংস্থানের) ভিত্তি চিহ্নায়ক ও চিহ্নায়িতের নিকট-সাদৃশ্য। গঠনের দিক থেকে তা মেটাফরিক। সূচক চিহ্নে (ধোঁয়ায় যেমন আগুন বোঝা যায়) সাদৃশ্যের বদলে থাকে নির্দেশকের লক্ষণ। এখানে লক্ষণীয় হয়ে ওঠে মেটাফর নয় বরং মেটনমিক সম্পর্ক। আর প্রতীক চিহ্নের ভিত্তি চিহ্নায়ক ও নির্দেশকের আপতিক সম্পর্ক, বিশেষ জনগোষ্ঠীর পাতানো সম্পর্ক। বলা যায়, প্রেষণা (motivation) তথা চিহ্ন-প্রতীকতার একটি দৃঢ় ভিত্তি প্রতিষ্ঠা করেছেন পার্স।

সাংগঠনিক চিহ্নবিজ্ঞানের বিস্তার ঘটালেন হিয়েলমস্লেভ ও ইয়াকবসন। চিহ্নবিজ্ঞানীরা চাইলেন সংগঠনের অন্তরালে 'মগ্ন সংগঠনে' পৌঁছে যেতে। লেভি স্ট্রস মিথ টোটেম ও পারিবারিক সম্পর্কে, লাঁকা অবচেতনায়, গ্রেইমাস আখ্যানের ব্যাকরণে এই মগ্ন সংগঠন খুঁজে পেলেন। Émile Benveniste তো স্পষ্টই বললেন, 'language is the interpreting system of all other systems, linguistic and non-linguistic' আর ক্লদ লেভি স্ট্রস

লক্ষ করলেন 'language is the semiotic system par excellence ; it cannot but signify, and exists only through signification.' রোলাঁ বার্ত (১৯১৫-১৯৮০) তো স্পষ্টই জানালেন, perhaps we must invert Saussure's formulation and assert that semiology is a branch of linguistics.' অন্বয়ের ক্ষেত্রে শব্দের পাশে শব্দের অর্থের ক্রিয়া-প্রতিক্রিয়ায় যেমন একটি নতুন অর্থ জেগে ওঠে যা প্রথম শব্দে নেই, দ্বিতীয় শব্দেও নেই, ভাষার বাইরে অন্যান্য শিল্পও একইভাবে অর্থপূর্ণ হয়ে ওঠে। চলচ্চিত্রে আমরা লক্ষ করি বিচ্ছিন্ন চিত্রকল্পের দ্বন্দ্বের মধ্য দিয়ে বক্তব্য কীভাবে শৈল্পিক সুষমা অর্জন করে। দ্যোতকায়ন অবশ্যই একটি বড়ো দিক। ভাষা কীভাবে অভিধেয় অর্থ (denotation) থেকে দ্যোতনা-অর্থে (connotation) পৌঁছে যায় তার একটি মডেল দিয়েছেন রোলাঁ বার্ত। অভিধেয়-চিহ্নের প্রকাশস্তর থেকে দ্যোতনা-চিহ্নের প্রকাশস্তরে উত্তরণের ছকটি তিনি এভাবে দেখিয়েছেন—

Secondary sign	connotation	expression$_2$	(R$_2$)	content$_2$
Primary sign	denotation	experssion$_1$ (R$_1$) content$_1$		

বার্ত প্রাথমিকভাবে চিহ্নকে দেখেছেন ERC-র সমবায়। E, an expression (or signifier), in relation (R) to c, a content (or signified) : ERC চিহ্নের এই প্রাথমিক পর্যায় উপরিতল চিহ্ন-ব্যবস্থার উপাদান। দ্বিতীয় পর্যায়ে চিহ্নের এই প্রাথমিক E_1 R_1 C_1-কে আমরা পাব চিহ্নায়কের অবস্থানে যার পরিণাম E_2 (= E_1 R_1 C_1) R_2 C_2। এক্ষেত্রে প্রাথমিক পর্যায়টি হল denotative এবং দ্বিতীয় পর্যায় connotative semiotics। বার্ত দৃষ্টান্ত দিয়েছেন 'Paris-Match' পত্রিকার ১৯৫৫-র দিকে প্রকাশিত একটি সংখ্যা থেকে। প্রচ্ছদ চিত্রে একটি তরুণ কৃষ্ণাঙ্গ সৈনিক— পরনে ফরাসি সৈন্যবাহিনীর পোশাক, চেয়ে আছে ফ্রান্স-এর জাতীয় পতাকার দিকে। এখানে ফটো (= expression$_1$) যাতে দেখানো হয়েছে (denotates) আফ্রিকান এক কৃষ্ণাঙ্গ ফরাসি সৈন্যের ইউনিফর্ম পরিহিত অবস্থায় ফ্রান্স-এর পতাকাকে অভিবাদন করছে— তাই হল content। কিন্তু এই denotative চিহ্নের (E_1 R_1 R_1) বাইরে আরও একটি content আছে (C_2) আর তা হল 'এক মহান ঔপনিবেশিক শক্তি যেখানে সৈন্যবাহিনীর কৃষ্ণাঙ্গরাও অনুগত।' তাই বলা হয়েছে "This content (C_2) is the content of a new (connotative) sign. Its expression (E_2) is the whole of the denotative sign E_1 R_1 C_1." *Elements of Semiology* বইটিতে বার্ত লিখেছেন, "This is the case which Hjelmslev calls Connotative semiotics ; the first system is then the plain of denotation and the second system (wider than the first) the plain of connotation."

দৃষ্টান্ত হিসেবে চলচ্চিত্রের প্রসঙ্গ আনা যেতে পারে। অভিধা ও দ্যোতনা— চলচ্চিত্রে কোন্ বিষয়টি প্রথম মনোযোগ আকর্ষণ করে? অবশ্যই অভিধা— দৃঢ়তার সঙ্গে জানিয়েছেন ক্রিশ্চিয়ান মেট্জ, চলচ্চিত্রের একজন প্রধান চিহ্নবিজ্ঞানী। একটি ফিল্ম কী মানবিক আবেদন বহন করে আনছে, কোন দার্শনিক চিন্তায় পৌঁছে দিচ্ছে আমাদের— এসব জানা জরুরি, কিন্তু তার আগে বোঝা দরকার এর অভিধেয় অর্থ কী। কারণ ছায়াছবির যা মূল উপাদান সেই ধ্বনি ও চিত্রকল্প

আমাদের সামনে ক্রমাগত মেলে ধরে এমন সব টুকরো টুকরো ঘটনা যার সংকলন ফিল্মের কাহিনি বা প্লট। ছায়াছবির এটাই অভিধেয়। এই অভিধেয় অর্থ থেকেই ছায়াছবির দ্যোতিত অর্থ আমাদের ধারণায় আসে। এখানে যা কিছু ঘটে, তার একটা তাৎপর্য আছে। এই তাৎপর্যই হল দ্যোতনা। দ্যোতনা চিহ্নায়ক থেকে চিহ্নায়িতে উত্তরণ।

চলচ্চিত্রের ভাষা কীভাবে অভিধেয় অর্থ (denotation) থেকে দ্যোতনা-অর্থে (connotation) পৌঁছে যায়, ক্রফোর একটি ছবিতে তা লক্ষ করা যাক। ফরাসি দেশের বিখ্যাত ফিল্ম পত্রিকা 'কাইয়ে দ্যু সিনেমা'-র একজন চিত্রসমালোচক ছিলেন ফ্রাঁসোয়া ক্রফো। তাঁর ছবি *400 Blows*-এর শেষ দৃশ্যে Freeze-এর একটি শট ব্যবহার করা হয়। দেখানো হয় একটি ছেলে সংশোধনাগার থেকে পালিয়ে যাচ্ছে সমুদ্রের দিকে। তার ধারণা সমুদ্রে পৌঁছোলেই সব সমস্যার ইতি। "প্রায় চার মিনিটব্যাপী এই দৌড়ের দৃশ্য একটিমাত্র Tracking shot-এ নেওয়া হয়েছে। সমুদ্রের কাছাকাছি পৌঁছোলে পর শট পরিবর্তন হয়। এবার ছেলেটির সঙ্গে ক্যামেরা 'প্যান' করে (অর্থাৎ হাতল ধরে ঘুরিয়ে) দেখানো হয় সমুদ্রের ঢেউ যেখানে এসে আছড়ে পড়ছে, সেই পর্যন্ত এসে সে থেমে গেল। আর এগোনোর পথ নেই। তাকে ফিরতে হবে। কয়েক মুহূর্ত দাঁড়িয়ে থেকে উলটোমুখে ঘুরে ছেলেটি এবার যেন আমাদের দিকেই (অর্থাৎ ক্যামেরার দিকে) দৌড়ে আসে। দৌড়ের মাঝখানে হঠাৎ শট্‌টি freeze করে (অর্থাৎ স্থিরচিত্র হয়ে যায়)। এইভাবে দর্শকদের দিকে চেয়ে দৌড়োনোর ভঙ্গিতে স্থির অবস্থাতেই ছবি শেষ হয়।" সত্যজিৎ রায় লিখছেন, "বোঝাই যাচ্ছে, এখানে freeze-এর ব্যবহার শুধু চমকপ্রদই নয়, গভীরভাবে অর্থপূর্ণ বটে— যাকে বলা যায় stroke of genius। ছেলেটির যাবার আর কোনো পথ নেই। সুতরাং সে যতই ছুটুক না কেন, সেটা থেমে থাকারই সামিল। তার ছোটার ইচ্ছা এবং পরিচালকের 'ছুটে লাভ নেই' বলার ইচ্ছে একই সঙ্গে এই freeze-এ বলা হয়েছে। এখানে দর্শকদের দিকে চেয়ে থাকারও একটা মানে আছে। তবে মনে হয় যেন ছেলেটি বলতে চাইছে— তোমরাই— অর্থাৎ সমাজই আমার এই অসহায় অবস্থার জন্য দায়ী, তোমরাই ভেবে বার কর আমার মতো ছেলের সমস্যা মিটবে কী করে।"—freeze-এর ছবিটা তাহলে অভিধেয় অর্থের মধ্যেই হিমায়িত হয়ে থাকছে না, ফ্রিজ-এর তাৎক্ষণিক ব্যক্ত-অর্থ সমস্তটাই হাইজ্যাক করে নিচ্ছে দ্যোতনাগত অর্থ—"তোমরাই অর্থাৎ অর্থাৎ সমাজ আমার এই অসহায় অবস্থার জন্য দায়ী।" আর এখানেই আসে ideology বা ভাবাদর্শের প্রশ্ন।

একজন ভাষাতাত্ত্বিক যেমন ভাষিক বিষয়টা কিছুটা অবগত হবার পরেই বিষয়ের শৈলী, উপস্থাপনা ইত্যাদি দ্যোতনাগত দিক সম্পর্কে সচেতন হন, সিনেমা চিহ্নতত্ত্বেও সেটাই ঘটে। চলচ্চিত্রের চিহ্নতত্ত্ব নিয়ে দীর্ঘদিন কাজ করেছেন মেট্‌জ্। তাঁর বিখ্যাত বই *The Imaginary Signifier*-এ উপস্থাপিত একটি তুলনা এখানে উল্লেখ করি। কাহিনিচিত্রের পর্দায় সচল চিত্রকল্পগুলোকে তিনি তুলনা করেছেন দ্রষ্টার মনের পর্দায় ভেসে ওঠা স্বপ্নের সঙ্গে। অবশ্য পার্থক্য আছে, স্বপ্নদ্রষ্টার পক্ষে বোঝা সম্ভব নয় যে সে স্বপ্ন দেখছে, কিন্তু প্রেক্ষাগৃহে দর্শকের অন্তত এই ধারণাটুকু থাকে সে একটা ফিল্ম দেখছে। দর্শক যা দেখছে সেইসব ছায়াচিত্র সংরক্ষিত, ইচ্ছে হলেই আবার দেখা সম্ভব, কিন্তু স্বপ্নদ্রষ্টার অন্তর্লীন চিত্রকল্পগুলি বিলীয়মান। চলচ্চিত্রের বয়ান চলচ্চিত্র-নির্মাতার আখ্যান গ্রন্থনের সচেতন প্রয়াস, সেখানে স্বপ্ন হল স্বতঃস্ফূর্ত আর অনিবারণীয়। তবু দুইয়ের মধ্যে মিলও কিছু কম নয়। স্বপ্ন (rêve) না হোক অন্তত দিবাস্বপ্নের (rêverie) সংগঠনের সঙ্গে ফিল্মের মিল আছে। এই মিল দিবাস্বপ্নে দ্রষ্টার অর্ধচেতন মনের সঙ্গে চিত্রদর্শকের অর্ধচেতন মনের মিল।

মেট্‌জ-এর অনুধাবন সংগঠনবাদের অন্তর্গত। কাল্পনিক চিহ্নায়কের আলোচনায় তিনি মেটাফর / মেটনমির প্রসঙ্গ এনেছেন। লাকাঁর মনস্তাত্ত্বিক দৃষ্টিকোণ থেকে ফিলমিক মেটাফর ও মেটনমিকে দেখছেন। তাঁর মতে, স্বপ্নে যেমন, চলচ্চিত্রেও তেমনই ঘনীভবন (মেটাফর) ও স্থানবদল (মেটনমি) গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা নেয়।

মেট্‌জ-এর অবদানকে লঘু করে দেখেননি পিটার ওলেন (Peter Wollen)। কিন্তু তিনি denotation-এর অগ্রাধিকার মেনে নিতে পারেননি। চিত্রভাষা আলোচনায় মেট্‌জ্ বলতে চেয়েছেন "the denotation— the series of events of plot portrayed is what is signified directly by the raw material-images and sound of the film, whereas connotation is what is signified by the events protrayed plus the way they are signified." প্লটের যে-কোনো স্তরে যা কিছু ঘটছে, তার একটা তাৎপর্যপূর্ণ দিকও কি একই সঙ্গে মনে আসে না?— ফিল্মে কে উদ্দিষ্ট চরিত্র, কোথায় সে যাচ্ছে, কাকে ভালোবাসছে অথবা কার কাছে সে বিশ্বাসঘাতক এসব কেবলমাত্র ধ্বনি ও চিত্রকল্পেই আভাসিত হচ্ছে তা নয়, প্লটের দিক থেকেও আলো এসে পড়ছে। আর এভাবেই চলচ্চিত্রে ছড়িয়ে পড়ে কবিতার সৌরভ। ওলেন মনে করেন একজন চিহ্নবিজ্ঞানীর প্রাথমিক কাজ হল 'to uncover the codes exploited in films in producing the sort of poetry that films can produce.' ভাষিক সমান্তরতার উপর অতিরিক্ত জোর দেওয়ায় আরও একটি বিষয় মেট্‌জ্ লক্ষ করেননি। ভাষায় শব্দচিহ্নগুলি প্রথাসিদ্ধ প্রতীকের কাজ করে। মেট্‌জ্‌ও চলচ্চিত্রায়ণে প্রথাসিদ্ধ প্রতীক বা কোড লক্ষ করেছেন। কিন্তু ওলেন-এর অনুধাবন "In the cinema, it is quite clear, indexical and iconic aspects are by far the most powerful. The symbolic is limited and secondary." স্মরণযোগ্য, পার্স-এর চিহ্নতত্ত্বে চিহ্নের তিনটি দিক নির্দেশিত হয়েছে : প্রতিম (iconic) সূচক (indexical) এবং প্রতীকী (symbolic)

"এক একটি শট এক একটি বাক্য বা শব্দের মতো। কথার মতোই শট-এর ভাষা আছে, যেটা একান্তই ছবির ভাষা, দৃশ্য বস্তুর ভাষা।"— এই ছিল প্রতিভাবান মার্কিন পরিচালক ডি. ডব্লিউ গ্রিফিথ-এর অনুধাবন। গ্রিফিথ-এর এডিটিং-এর অনুসরণে রুশ পরিচালক আইজেনস্টাইন-এর মন্তাজ রীতির উদ্ভাবনা। সত্যজিৎ লেখেন, 'Montage চলচ্চিত্রের ভাষায় একটি অবিচ্ছেদ্য অংশ।' আইজেনস্টাইন-এর পরম বন্ধু ছিলেন *মাদার*-এর পরিচালক পুদোভকিন। দুজনের মধ্যে আবার ঝগড়াও ছিল। ঋত্বিক ঘটক চমৎকারভাবে এই ঝগড়ার বিবরণ দিয়েছেন।

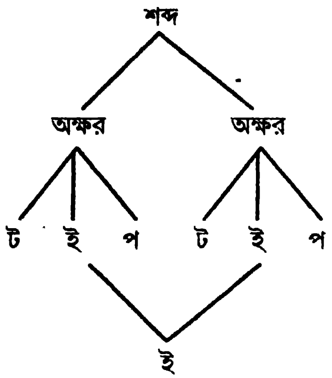
"আইজেনস্টাইন বললেন, এভরি শট ইজ ইন কনফ্লিক্ট্ উইথ দি আদার, দ্বন্দ্বের সাহায্যে তৈরি হয়। একটা শট, তার নিজস্ব মানে নেই। পরের শটটারও নিজস্ব কোন মানে নেই, কিন্তু দুটো মিলে একটা তৃতীয় মানে তৈরি হয়। সোজা কথায় থিসিস, অ্যান্টিথিসিস, সিন্থিসিস। এখানেই আসে ডায়লেকটিক্স, এইখানে আসে কার্ল মার্কসের 'অ্যাপ্রোচ টু রিয়েলিটি' ; একটা এদিকে একটা ওদিকে দুটো মিলিয়ে একটা তৃতীয় মানে তৈরি করে।" অর্থাৎ 'ক' এবং 'খ' যদি হয় পরপর দুটি শট তবে তাদের সহ-সন্নিবেশের সম্পর্ক হবে দ্বন্দ্বের, সংযুক্তির নয়। ক + খ = গ নয়, ক × খ = গ। প্রথম ধারণাটি পুদোভকিন-এর, দ্বিতীয়টি আইজেনস্টাইন-এর। ঋত্বিক ঘটক লিখছেন, "রাতের পর রাত তাঁদের ঝগড়া হোত। যখন বরফ-ঝরা মস্কোতে না ছিল কাঠ, না ছিল জ্বালানি। খাবার পাওয়া যেত না। সেই সময় এই দুজনে যে ঝগড়া করে গেলেন, তার দ্বারা আমরা মানুষ হলাম।"

।। ধ্বনিগত স্তর ।।

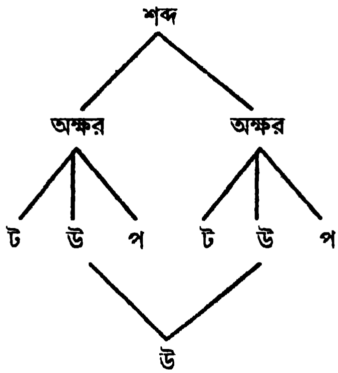
আমরা যখন চলচ্চিত্রের 'ভাষা' কথাটা বলি তখন বোঝা যায় আমাদের মূল অবস্থান ভাষাই। ভাষার আঙিনায় দাঁড়িয়ে আমরা মানুষের সংস্কৃতির বিভিন্ন দিক পর্যালোচনা করি। এই পর্যালোচনা semiotics-এর অন্তর্গত। কিন্তু একান্তভাবে যখন ভাষার ব্যবহার ও তার তাৎপর্য আমাদের অনুধাবনের বিষয় তখন তাকেআমরা বলি semantics। অর্থাৎ সিম্যানটিক্স হল সেমিওটিক্স-এর অন্তর্গত একটি ভাষিক ক্ষেত্র। আমাদের আলোচনার এই পর্যায়ে আমরা প্রথমত ধ্বনি ও অর্থের সম্পর্কের দিকটা লক্ষ করব। সাধারণভাবে ধ্বনির কোনো অর্থ নেই, ধ্বনি শব্দের সেবায় নিয়োজিত। ধ্বনি বিন্যাসের মাধ্যমে আমরা শব্দ গড়ে তুলি। শব্দ অর্থপূর্ণ। কিন্তু ধ্বনিও কখনও কখনও স্বয়ং অর্থপূর্ণ হয়ে ওঠে না কি? পৃথিবীর সব ভাষাতেই এমন বহু শব্দ আছে যাদের অন্তর্গত ধ্বনির সঙ্গে অর্থের নির্ধারিত যোগাযোগ লক্ষ করেছেন গবেষকরা। ধ্বনির এই ভাবদ্যোতকতাকে বলা হয়েছে sound symbolism। ফার্দিনান্দ দ্য সোস্যুর-এর অনুসরণে একটি পরিভাষা বানাতে পারি phono-signifier বা স্বন-চিহ্নায়ক। যেমন নীচের এই শব্দগুলিতে—

টিপটিপ করে বৃষ্টি পড়ছে **টুপটুপ** করে বৃষ্টি পড়ছে **টপটপ** করে বৃষ্টি পড়ছে

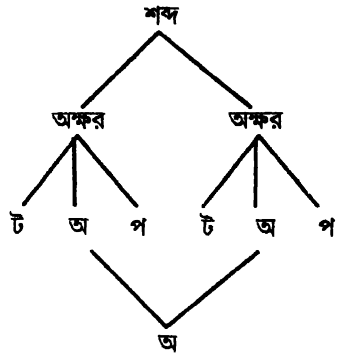
স্থূলাক্ষর শব্দগুলিতে ব্যঞ্জনধ্বনির কোনো পার্থক্য নেই, সব ক্ষেত্রেই আছে ট এবং প ধ্বনির উপস্থিতি। সুতরাং ব্যঞ্জনিকতা এখানে অর্থ-পার্থক্যের নির্ধারক নয়। এখানে এই পার্থক্য স্বরধ্বনি-নির্ভর। দৃষ্টান্তগুলিতে আমরা পাচ্ছি তিনটি স্বন-চিহ্নায়ক। যেমন—



স্বন চিহ্নায়ক ঃ ই

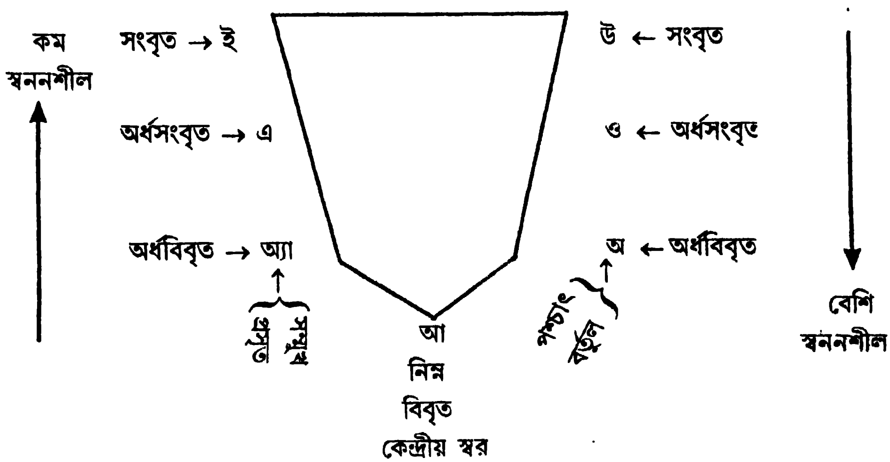


স্বন চিহ্নায়ক ঃ উ



স্বন চিহ্নায়ক : অ

টিপ্‌টিপ্ করে যখন বৃষ্টি পড়ে তখন বৃষ্টি যেন অত্যন্ত আলতোভাবে উপস্থিত, বৃষ্টির ফোঁটার কোনো আকৃতি তখন আমাদের চেতনায় থাকে না। কিন্তু যখন টুপ্ টুপ্ করে বৃষ্টি পড়ে বলি, তখন, আমাদের মনের চোখে গোল গোল খুব ছোটো ছোটো ফোঁটায় বৃষ্টি পড়ার ছবিটা ভেসে ওঠে। আর যখন 'টপ্ টপ্ করে বৃষ্টি পড়ছে' এমন কথা বলি, তখন বুঝতে পারি বৃষ্টির ফোঁটার ওই বর্তুল আকৃতি আর ছোটো নয়, বড়ো। অর্থাৎ এসব ক্ষেত্রে ধ্বনি ও অর্থের একটি মেলবন্ধন গড়ে উঠছে। আর তাই ধ্বনি থেকে সহজেই আমরা অর্থে পৌঁছে যেতে পারি। রবীন্দ্রনাথ এই ধ্বনি-প্রতীকতা লক্ষ করেছিলেন 'ভাষার ইঙ্গিত' প্রবন্ধে। দৃষ্টান্ত সহ দেখিয়েছেন, বাংলা ভাষায় 'উ-কারে অব্যক্ত-প্রায় প্রকাশ, আ-কারে পরিস্ফুট প্রকাশ।' আ-ধ্বনি কেন স্ফুট এবং উ-ধ্বনি কেন অস্ফুট অর্থব্যঞ্জনা আনে, তার কারণ অবশ্য তিনি নির্দেশ করেননি। বর্তমান আলোচকের ধারণা স্বরধ্বনির এই ধ্বনি-প্রতীকতার মূলে আছে Sonority বা স্বননশীলতা। 'The Sonority of a sound depends on the volume of air made to vibrate'— লিখেছেন একজন আলোচক। মুখবিবরের শূন্যতার পরিসর যত বেশি, স্বরধ্বনিও তত বেশি স্বননশীল (sonorous)। উচ্চারণের দিক থেকে মুখবিবরে স্বরধ্বনিগুলির অবস্থানের যে প্রতীক-চিত্র আমরা পাই, সেদিকে একালে স্বনন-স্কেল সম্পর্কিত ধারণাটা স্পষ্ট হয়। যেমন :



চি চি শব্দ শুনলে কেন বুঝি ছোটো পাখি ডাকছে, আর চ্যাঁ চ্যাঁ শব্দে বুঝি বড়ো পাখির ডাক, তা এই চিত্র থেকে সহজেই অনুধাবন করা যায়। সংবৃত ই-ধ্বনির তুলনায় অর্ধবিবৃত

ছোটো-বড়ো, আলো-অন্ধকারের এই আপেক্ষিক মূল্য নির্ধারণে নিউম্যান ব্যবহার করেছিলেন দুশো ছাব্বিশটা কৃত্রিম শব্দযুগ্ম। উদ্দেশ্য— প্রতিক্রিয়া জানাতে গিয়ে যাতে কেউ নিজের ভাষার শব্দে মিল খুঁজে না পায়। দুটি পরীক্ষাতেই পরিসংখ্যানগত তথ্য ছিল সন্তোষজনক। রোজার ব্রাউন তাই লিখেছেন, "Perhaps there is something natural and inevitable in these associations of sound, size and brightness. Perhaps all people, whatever their linguistic training, would make the same judgements."

আবার শুধু ধ্বনি নয়, ধ্বনির স্বলক্ষণও (distinctive feature) হতে পারে অর্থবহ— এমন কথা বলেছেন রোমান ইয়াকবসন। আসলে স্বলক্ষণের নিজস্ব কোনো অর্থ নেই, নেই স্বলক্ষণ সমবায়েরও (অর্থাৎ স্বনিমের)। কিন্তু সংবেদনের স্নায়ব মনস্তাত্ত্বিক সূত্রে শব্দে সমর্পিত ধ্বনিও খুলে দিতে পারে সুর, রং, ঘ্রাণ প্রভৃতি অনুভূতির জগৎ। তীক্ষ্ণ বা acute ধ্বনির ক্ষেত্রে স্বরাঞ্চলে লক্ষ করা যায় 'a concentration of acoustic energy in the higher frequencies'। সম্মুখস্বর, দন্ত্য, দন্ত্যমূলীয় ও তালব্য ব্যঞ্জনগুলি [+ acute]। অন্যদিকে grave ধ্বনিগুলিতে থাকে 'a concentration of acoustic energy in the lower frequencies'। পশ্চাৎস্বর, ওষ্ঠ্য ও কণ্ঠ্যব্যঞ্জন [+ grave]। কিন্তু শুধু আলো-অন্ধকার নয়, তীক্ষ্ণ জলদ বৈপরীত্যে হালকা-ভারী ইত্যাদি প্রতীতির কথাও বলেন ইয়াকবসন : "the opposition between acute and grave phonemes has the capacity to suggest an image of bright and dark, of pointed and rounded, of thin and thick, of light and heavy, etc. This 'sound symbolism', as it was called by one of the original investigators, Edward Sapir, this inner value of the distinctive features, although latent, is brought to life as soon as it finds a correspondence in the meaning of a given word and in our emotional or aesthetic attitude towards this word and even more towards pairs of words with two opposite meanings."

শব্দের ধ্বনির এই নান্দনিকতা প্রসঙ্গে আসে কবিতার কথা : "In poetic language, in which the sign as such takes on an autonomous value, this sound symbolism becomes an actual factor and creates a sort of accompaniment to the signified." চেক den দিন আর noc রাত শব্দযুগ্মে স্বরধ্বনির তীক্ষ্ণ-জলদ বৈপরীত্যে মধ্যদিনের উজ্জ্বলতা এবং রাত্রির তমসার চমৎকার সহযোগ। মালার্মে লক্ষ করেছেন ফরাসি শব্দ jour 'দিন' আর nuit 'রাত' শব্দজোড়ে এই সহযোগ নেই। সেক্ষেত্রে কবিরা কী করেন? ইয়াকবসন-এর অনুধাবন : "poetry successfully eliminates this discordance by surrounding the word jour with actute vowelled vocables and the word nuit with grave vowelled vacables ; or alternatively it highlights semantic contrasts which are in harmony with that of the grave and acute vowels, such as that between the heaviness of the day and the mildness of the night." ধ্বনির এই ভাবদ্যোতকতা সম্পর্কে আমাদের দেশের কবিরাও সচেতন হবেন, এটাই স্বাভাবিক। 'অক্ষর সংগীত ও কাব্য' শীর্ষক আলোচনায় কবি করুণানিধান বন্দ্যোপাধ্যায় লক্ষ করেছেন, 'ঐ এবং ঔ মানুষের মনকে উর্ধ্বে তোলে। যেমন—

ঐ আসে ঐ অতি ভৈরব হরষে
জলসিঞ্চিত ক্ষিতি সৌরভ রভসে

ঘন গৌরবে নবযৌবনা বরষা।

আবার যেখানে মৃদু ভাবের প্রকাশ—

আজিকের নিশি ভুল না
ফুলশাখে বাঁধ ঝুলনা।

সেখানে উ দেখা যায়। উ আদর প্রকাশ করে, দরদ মেশায়।'

।। শব্দগত স্তর ।।

একটি দৃষ্টান্ত নেওয়া যাক— nitakupenda। পূর্ব আফ্রিকার সোয়াহিলি ভাষার একটি শব্দ। এই একটি শব্দের মধ্যে চারটি অর্থগত উপাদান আছে। যেমন—

ni–ta–ku–penda
'I' 'will' 'you' 'love'

অর্থাৎ 'আমি তোমাকে ভালোবাসব।'— একটি শব্দের মধ্যে একটি বাক্য। সব ভাষায় অবশ্য এমন হয় না, তবে শব্দের মধ্যে এক বা একাধিক অর্থগত উপাদান থাকে। এই উপাদানগুলোকে বলা হয় রূপিম্ বা morphemes। রূপিমের বিন্যাসে পাই শব্দার্থ। একটি বাংলা শব্দ নেওয়া যাক— চলমানতা। এই শব্দে আমরা পাচ্ছি তিনটি রূপিম— চল + মান + তা। এই তিনটি অর্থগত উপাদান সমন্বিত করে 'চলমানতা'র অর্থ বোঝা যায়। চল— to move, মান— continuity, তা— idea ; সব মিলিয়ে চলমানতার অর্থ The idea of continuity of movement। এখানে দু-রকমের রূপিম আমরা পাচ্ছি—মুক্ত ও রুদ্ধ রূপিম (free and bound morpheme)। মুক্ত রূপিমের দৃষ্টান্ত চল, রুদ্ধ রূপিমের দৃষ্টান্ত মান, তা। মুক্ত রূপিম এককভাবে শব্দ গঠন করতে পারে। কিন্তু রুদ্ধ রূপিম শব্দগঠনে সর্বদাই মুক্ত রূপিমের আশ্রয়প্রার্থী। তবে শব্দের অর্থ নির্ধারণে রুদ্ধ রূপিমও যে গুরুত্বপূর্ণ এখানে তার কিছু দৃষ্টান্ত আমরা সংকলন করছি।

নিঃ
ভিতর থেকে বাইরে
বিহীনতা

নিঃ একটি রুদ্ধ রূপিম। এই উপসর্গটির মূল ভাব— বহির্গামিতা। দ্বিজেন্দ্রনাথ ঠাকুর লক্ষ করেছেন—"নিঃ উপসর্গের বহিষ্কার অর্থ বিহীনতা অর্থে পরিণত হয়; কিন্তু সে বিহীনতা বহিষ্কারেরই ফলস্বরূপ।" এর সমতুল্য ইংরেজি উপসর্গ ex এবং জার্মান hin। রবীন্দ্রনাথ লিখেছেন, "সংস্কৃতে যেমন 'নি' ভিতর এবং 'নিঃ' বাহির বুঝায়, জার্মান ভাষায় সেইরূপ ein ভিতর এবং hin বাহির বুঝায়। Einfahren অর্থ ভিতবে আসা, hinfahren অর্থ বাহিরে লইয়া যাওয়া।"

।। দৃষ্টান্ত ।।

১. নির্বাসন	নিঃ বাসন বাসস্থান থেকে বহিষ্করণ
২. নির্ঝর	নিঃ ঝর বহিরুদ্‌গত ঝরণা
৩. নির্মোক	নিঃ মোক মোক যা চর্ম যা বাইরে পরিত্যক্ত, খোলস

৪.	নির্গত	নিঃ গত বাইরে গত, নিঃসৃত, বেরিয়ে এসেছে এমন
৫.	নিরীক্ষণ	নিঃ ঈক্ষণ লক্ষ বস্তুকে আশপাশের বস্তু থেকে আলাদা করে দেখা
৬.	নিশ্বাস	নিঃ শ্বাস বহির্গামী শ্বাস, নাক বা ফুসফুস থেকে নির্গত বায়ু
৭.	নিষ্কাশন	নিঃ কাশন বহিষ্করণ, জল, রস ইত্যাদি তরল পদার্থ বাইরে বের করা
৮.	নিরতিশয়	নিঃ অতিশয় অতিশয়কে অতিক্রম করে যাওয়া, অত্যন্ত বেশি
৯.	নিঃসীম	নিঃ সীম সীমার বাইরে, সীমাহীন
১০.	নির্ভয়	নিঃ ভয় ভয়ের বাইরে, ভয়শূন্য
১১.	নির্দয়	নিঃ দয় দয়ার বাইরে, দয়াহীন
১২.	নিস্পৃহ	নিঃ স্পৃহ স্পৃহা বা বাসনার বাইরে, বাসনাহীন, নিরাসক্ত

-দ/-দা

দেয় যে

জল দেয় যে = জলদ, অর্থাৎ মেঘ। জলের যে-কোনো প্রতিশব্দের শেষে দ যোগ করে যে সব শব্দ আমরা পাই, তাদেরও অর্থ হবে মেঘ। যেমন— অম্বুদ, বারিদ, নীরদ ইত্যাদি। স্ত্রীবাচক শব্দে দ-এর বদলে আসবে-দা।

॥ **দৃষ্টান্ত** ॥

১.	বিষদ	বিষ দ বিষ দেয় যে, বিষদায়ক
২.	ক্ষণদা	ক্ষণ দা কালের অংশবিশেষ যে দেয়, রাত্রি
৩.	অন্নদা	অন্ন দা অন্নদানকারিণী, অন্নপূর্ণা
৪.	সুখদা	সুখ দা সুখ দেয় যে নারী, সুখদায়িনী
৫.	করদ	কর দ অপরকে (বিশেষত অন্য রাষ্ট্রকে) কর দেয় এমন
৬.	ধনদ	ধন দ ধন দেয় যে, ধনদানকারী, ধনের অধিদেবতা কুবের

৭.	প্রাণদ	প্রাণ দ
		প্রাণ দেয় যে, জীবন রক্ষাকারী
৮.	যশোদ	যশঃ দ
		যশ দেয় যে, কীর্তিদায়ক, যশস্কর
৯.	যশোদা	যশঃ দা
		খ্যাতিদায়িনী, শ্রীকৃষ্ণের পালিকা মাতা, নন্দের স্ত্রী

অব-

নীচু অধোগতি

॥

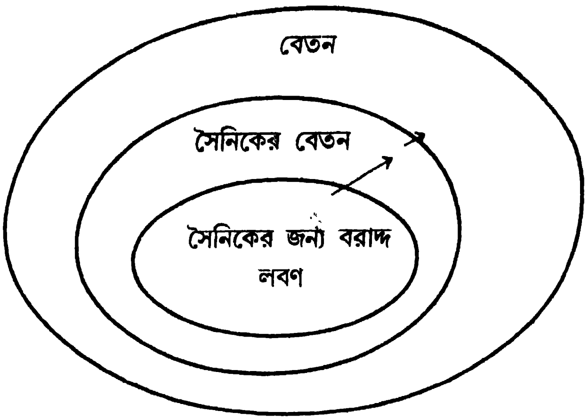
১.	অবক্ষয়	অব ক্ষয়
		নিয়মিত ক্ষয়প্রাপ্তি, নিম্নগতি
২.	অবগাহন	অব গাহন
		জলে নেমে শরীর ডুবিয়ে স্নান, গভীরে প্রবেশ
৩.	অবচয়	অব চয়
		জিনিষপত্রের দাম কমা, মূল্যহ্রাস
৪.	অবচেতনা	অব চেতনা
		বাইরের চেতনার অন্তরালে অস্পষ্ট চেতনা
৫.	অবতল	অব তল
		মধ্যভাগ নীচু এমন উপরিতল বিশিষ্ট,
৬.	অবতারণ	অব তারণ
		উঁচু থেকে নীচে নামানো, অবরোহণ
	অবতীর্ণ	অব তীর্ণ
		অবতরণ করেছে বা নেমেছে এমন।

উল্লিখিত দৃষ্টান্তগুলি লক্ষ করলে আমরা দেখব বহু ক্ষেত্রে রুদ্ধ রূপিমের মূল অর্থের বিসারণ ঘটেছে। ভাষা ব্যবহারে এভাবেই মূল অর্থকে ঘিরে বহু প্রান্তিক অর্থ সৃষ্টি হয়।

শব্দের জীবন : শব্দের ফসিল

সত্তর ছুঁই ছুঁই একটি মানুষের চেহারার সঙ্গে তাঁর সাত বছর বয়সের ছবি মেলে না। এতে প্রমাণ হয় মানুষটার সাত বছরের চেহারার অনেক বদল হয়েছে। আরও প্রমাণ হয় তিনি বেঁচে আছেন আর বেঁচে আছেন বলেই তাঁর চেহারার এই পরিবর্তন। অস্তিত্বের একটি অর্থ অবশ্যই পরিবর্তনশীলতা। শব্দার্থের ক্ষেত্রেও কথাটি খাটে। ঐতিহাসিক ভাষাবিজ্ঞানীরা দেখিয়েছেন একই শব্দের অর্থ ক-যুগ থেকে খ-যুগে, খ-যুগ থেকে গ-যুগে কীভাবে বদলে গেছে। একটি চমৎকার দৃষ্টান্ত দিয়েছেন হুমায়ুন আজাদ তাঁর *তুলনামূলক ও ঐতিহাসিক ভাষাবিজ্ঞান* বইটিতে। ইংরেজি salary শব্দটির অর্থ বেতন। শব্দটির উদ্ভব লাতিন সালারিউম (salarium) থেকে। সালারিউম বলতে বোঝানো হত সৈনিকদের বেতন হিসাবে পাওয়া লবণ। পরে অর্থ দাঁড়াল সৈনিকদের বেতন অর্থাৎ অর্থের পরিবর্তন দেখা দিল। ইংরেজিতে শব্দটির অর্থ আরও পরিবর্তিত হল, salary বলতে আমরা শুধু 'বেতন' বুঝি, সৈনিকদের বেতন নয়। সময়ের

সঙ্গে সঙ্গে এভাবে শব্দটির অর্থের প্রসরণ ঘটেছে। নীচের বৃত্ত-প্রসরণ চিত্রে বিষয়টা স্পষ্ট হবে :



শব্দের অর্থ পরিবর্তনের তিনটি ধারা উল্লেখ করেছেন ড. সুকুমার সেন— (ক) অর্থবিস্তার (খ) অর্থসংকোচ এবং (গ) অর্থসংশ্লেষ। তিনটি ধারাই ঐতিহাসিক।

(ক) **অর্থবিস্তার (Expansion of meaning)** : শব্দের মূল অর্থ যখন কোনো কারণে নির্দেশক অর্থের (Referential meaning) সীমাবদ্ধতা অতিক্রম করে নির্দেশক-নিরপেক্ষ হয়ে দাঁড়ায় তখনই অর্থের বিস্তার ঘটে। এককালে কালো রঙের লেখার মূল উপাদান ছিল 'কালি'। এখন রঙের প্রসার ঘটায় লাল কালি, সবুজ কালি আমরা ব্যবহার করি। ফলাহার বলতে শুধুমাত্র ফলের আহার এখন আর বুঝি না আম, দই, চিঁড়ে, কলা দিয়ে যে খাদ্য তৈরি হয় সেই ফলাহার > ফলারকেই আমরা বুঝি। বিশেষ একটি নদী 'গঙ্গা' থেকে জাত 'গাঙ' যে-কোনো নদী অর্থেই ব্যবহৃত হয়। যার ধন আছে তিনিই ছিলেন 'ধন্য' এখন সৌভাগ্যবান অর্থে যে কেউ ধন্য হতে পারেন। অনেক সময় ব্যক্তির নাম ব্যক্তি-নিরপেক্ষ হয়ে একটি বিশেষভাবের দ্যোতনা নিয়ে আসে। বিভীষণ-মীরজাফর নামকে বিশ্বাসঘাতকতার প্রতিশব্দরূপে ব্যবহারের মধ্য দিয়ে শব্দের অথবিস্তার লক্ষ করা যায়।

(খ) **অর্থের সংকোচ (Restriction of meaning)** : অর্থসংকোচ বলতে আমরা বুঝি বিশিষ্ট অর্থের প্রকাশ। কোনো শব্দ যখন সাধারণ অর্থ ত্যাগ করে বিশিষ্ট অর্থ প্রকাশ করে তখন শব্দের অর্থ সংকুচিত হয়েছে বলা যায়। √অদ (খাওয়া) থেকে নিষ্পন্ন অন্ন শব্দটি যে কোনো খাদ্যবস্তুকে বোঝাত। কিন্তু বাংলায় যেহেতু ভাতই প্রধান খাদ্য, তাই শব্দটির অর্থ হচ্ছে ভাত। মন্দির শব্দের মূল অর্থ ছিল গৃহ। সে অর্থে আমরা সকলেই মন্দিরে বাস করি। কিন্তু এখন মন্দির বলতে শুধু দেবগৃহকেই বোঝায়। আর তাই শব্দটির ঘটেছে অর্থসংকোচন। গৃধ্র শব্দের মূল অর্থ ছিল লোভী, পরে এর অর্থ হয় শকুন। ফারসি শব্দ মুর্গ নির্দেশ করে 'পাখি' কিন্তু ভারতীয় ভাষাগুলিতে এর অর্থ বিশেষিত হয়ে উদ্ভূত হয়েছে মোরগ বা মুরগি শব্দ। গোস্বামী শব্দের একদা অর্থ ছিল গোরুর মালিক। পরে অর্থের বিশেষীকরণে শব্দটির অর্থ দাঁড়ায় 'বৈষ্ণব গুরু'।

(গ) **অর্থ সংশ্লেষ (Transfer of meaning)** : অর্থের ক্রমান্বয় প্রসার ও সংকোচের ফলে এমন একটা অবস্থা তৈরি হতে পারে যাতে মধ্যবর্তী অর্থটা লুপ্ত হয়ে যায় আর তার ফলে

মূল অর্থের সঙ্গে বর্তমান অর্থের সংযোগ দুর্লক্ষ্য হয়ে পড়ে। অর্থের এহেন রূপান্তরকে বলা হয় অর্থসংশ্লেষ। সংস্কৃতে 'ঘর্ম' শব্দের অর্থ ছিল গরম বাংলায় শব্দটির অর্থ ঘাম। গরম থেকে শরীরের উপর গরমের প্রভাব হল ঘাম অর্থাৎ শব্দটির অর্থ মূল অর্থ থেকে সরে এসেছে। এই ধরনের পরিবর্তনই হল অর্থসংশ্লেষ। আর একটি দৃষ্টান্ত নেওয়া যাক। সংস্কৃতে 'পাত্র' বলতে বোঝাত 'পান করার আধার' তা থেকে অর্থবিস্তারের ফলে বোঝানো হল 'যে কোনো রকমের আধার।' কিন্তু এখানে অর্থ স্থির থাকে না, পরবর্তী পর্যায় আসে অর্থসংকোচের, তখন শব্দটির অর্থ দাঁড়ায় 'কন্যা দান করার আধার' যা এখন অর্থের বিশেষীকরণে 'বর'। যেহেতু মূল অর্থের সঙ্গে বর্তমান অর্থের সংযোগ ছিন্ন, তাই এর শব্দার্থকে বলতে পারি অর্থসংশ্লেষ। সন্দেশ শব্দেও অনুরূপ প্রক্রিয়া লক্ষ করা যায়। শব্দটির মূল অর্থ হল 'সংবাদ'। আগেকার দিনে যখন ডাকব্যবস্থার প্রচলন ছিল না, কোনো-না-কোনো ব্যক্তিকে সংবাদ পৌঁছে দিতে হত আত্মীয়ের বাড়িতে। যেহেতু আত্মীয় বাড়ি তাই খালি হাতে না গিয়ে কিছু মিষ্টদ্রব্য সঙ্গে নিতেন। এভাবে শব্দটির অর্থ দাঁড়ায় 'মিষ্টি'। তবে যে-কোনো রকম মিষ্টি নয়, এখন বোঝায় এক বিশেষ ধরনের মিষ্টি যাকে আমরা বলি সন্দেশ। অর্থাৎ এখানে আবারও অর্থের সংকোচ ঘটছে। 'হাতা'র একটি ছোটো সংস্করণ হল চামচে। কিন্তু বর্তমানে চলিত বাংলায় শব্দটির অর্থ দাঁড়িয়েছে 'তোষামোদকারী' বা 'অতি অনুগত ব্যক্তি'। বোঝাই যায়, এটিও অর্থসংশ্লেষের দৃষ্টান্ত।

অর্থের উন্নতি অবনতি (Elevation of Meaning এবং Degeneration of Meaning) : শব্দার্থের শুধু বিস্তার ও সংকোচন ঘটে না, পরিবর্তন ঘটে তাদের মূল্যমানেরও। মন্দ অর্থে ব্যবহৃত শব্দ ভালো অর্থবোধক হতে পারে, আবার উন্নত অর্থবোধক শব্দ আনতে পারে হীন অর্থের দ্যোতনা। বলাবাহুল্য সামাজিক মানদণ্ড এখানে কাজ করে, সমাজই নির্ধারণ করে কোন্‌টি ভালো আর কোন্‌টি মন্দ। কোনো শব্দের অর্থ যদি এভাবে বদলে যায় যাতে শব্দের মূলভাব বা বস্তুর তুলনায় বর্তমানে আদৃত বা সম্মানিত ভাব বা বস্তুকে বোঝাচ্ছে তাহলে তাকে আমরা বলব অর্থের উন্নতি। যেমন 'বাতুল' শব্দের মূল অর্থ ছিল বায়ুগ্রস্ত তথা উন্মাদ বা পাগল কিন্তু বাতুল > বাউল শব্দের অর্থ এখন 'বিশেষ ধর্ম সম্প্রদায়'। এরকম আরও কিছু দৃষ্টান্ত।

শব্দ	মূল অর্থ	উন্নত অর্থ
মন্দির	গৃহ, ঘর	দেবালয়
গবেষণা	গো-এষণা, গোরুর অন্বেষণ	তত্ত্বানুসন্ধান
দুহিতা	দুগ্ধ দোহনকারিণী নারী	কন্যা
মণ্ডপ	মণ্ড তৈরির স্থান, সমবেত হওয়ার স্থান	বেদী
উৎকৃষ্ট	উত্তমরূপে কর্ষিত	শ্রেষ্ঠ
ধর্ম	ধারণ করা	ঈশ্বর-বিষয়ক জ্ঞান বা তত্ত্ব

একসময় যে শব্দ ভালো অর্থে ব্যবহৃত হত এখন যদি তার ব্যবহার মন্দ অর্থে হয় অর্থাৎ সদর্থক থেকে হীনার্থকে পরিণত হয় তাহলে আমরা বলতে পারি সেক্ষেত্রে অর্থের অবনতি ঘটেছে। নাগর শব্দের অর্থ একদা ছিল 'নগরবাসী' কিন্তু কালক্রমে নগরবাসীদের চারিত্রিক অবনয়ন শব্দের অর্থটিকেও পালটে দেয়, ভদ্র পরিবেশে শব্দটির ব্যবহার এখন অপ্রচল। তেমনই গ্রাম্য শব্দ বলতে বোঝানো হত গ্রামের বাসিন্দা, কিন্তু এখন শব্দটির অর্থ দাঁড়িয়েছে

অসংস্কৃত বা অমার্জিত। এভাবে কালে কালে শব্দের সদর্থকতা বদলে গিয়ে অর্থের নেতিবাচক অবনয়ন ঘটে। এরকম আরও কিছু দৃষ্টান্ত—

শব্দ	মূল অর্থ	অবনত অর্থ
ঝি	দুহিতা, কন্যা	দাসী, পরিচারিকা
মহাজন	মহৎ ব্যক্তি	সুদখোর, কুসীদজীবী
জেঠামি	জ্যেষ্ঠের মতো আচরণ	পাকামি
অর্বাচীন	অপ্রবীণ	অপরিণত বুদ্ধি
ভূত	অতীত	মৃত ব্যক্তির আত্মা
বিদ্যেধরী	বিদুষী	অল্প বিদ্যাসম্পন্না, দুষ্ট মতিসম্পন্না
প্রজাপতি	সৃষ্টিকর্তা	বিশেষ শ্রেণির পতঙ্গ
দীর্ঘোদর	দীর্ঘ উদর সম্পন্ন ব্যক্তি	পেটুক
বেদে	বৈদ্য	যাযাবর জাতি

শব্দার্থের পরিবর্তনশীলতার মধ্যে যেমন শব্দের জীবনীশক্তির পরিচয় আমরা পাই তেমনই কোনো কোনো শব্দ তৎকালীন শব্দার্থ নিয়ে ক্রমশ অপ্রচলিত হয়ে যায়। এসব অপ্রচল শব্দকে ভাষার ফসিল বলা যেতে পারে। যেমন বাসা বা বাস ধাতু আড়াইশো বছর আগেও বাংলা ভাষায় ব্যবহৃত হত, যার অর্থ ছিল অনুভব করা। যেমন ভয়বাসা, ঘৃণাবাসা, দুঃখবাসা, লজ্জাবাসা। কিন্তু এখন এসব শব্দ তাদের অর্থসমেত প্রস্তরীভূত। বাস ধাতু নিষ্পন্ন একটি শব্দ অবশ্য এখনও প্রচলিত আছে— ভালোবাসা। শব্দটির তৎকালীন অর্থ ছিল 'ভালো করে অনুভব করা' বর্তমানে ইংরেজি 'Love' অর্থে শব্দটি ব্যবহৃত হয়। ভাষাচার্য সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায় জানিয়েছেন, "ভালোবাসা অর্থে অন্য খাঁটি বাংলা শব্দ চৈতন্য-পূর্বযুগের ভাষায়, সম্ভবত খ্রিস্টীয় পঞ্চদশ শতকে, অজ্ঞাত।" বড়ু চণ্ডীদাসের *শ্রীকৃষ্ণকীর্তন*-এ দেখা যায় কৃষ্ণ ও রাধা পরস্পরের প্রতি '*নেহ*' বা '*নেঁহা*' করছেন। সপ্তদশ শতকে *স্নেহ* থেকে জাত এই শব্দের আর চল ছিল না। তখন প্রীতি শব্দ থেকে নিষ্পন্ন পিরীত বা পিরিতি শব্দের প্রচলন দেখা যায়। সহজিয়া চণ্ডীদাস লিখেছেন, 'পিরীতি বলিয়া এ তিন আখর', ইত্যাদি। পিরিতি লোকপ্রিয়তা হারায় সপ্তদশ শতক শেষ হবার আগে। শব্দটি এখন ফসিলে পরিণত হয়েছে। কিছু প্রচলিত শব্দ আবার বিদেশি ভাষার সংস্পর্শে এসে হারিয়ে গেছে। যেমন কেদারা শব্দটি আমরা আর বলি না এখন, বলি চেয়ার। তেমনই দোকানে যাই না পশম কিনতে, কিনি উল। বাংলা কবিতার ক্ষেত্রে আমরা লক্ষ করি একালের কবিতায় কিছু কিছু শব্দ আর ব্যবহার করা হয় না। রবীন্দ্রনাথের প্রথম গদ্যকবিতার সংকলন প্রকাশিত হয় ১৯৩২ সালে। সেখানে কবি লেখেন, "অসংকুচিত গদ্যরীতিতে কাব্যের অধিকারকে অনেক দূর বাড়িয়ে দেওয়া সম্ভব এই আমার বিশ্বাস এবং সেই দিকে লক্ষ রেখে এই গ্রন্থে প্রকাশিত কবিতাগুলি লিখেছি। এর মধ্যে কয়েকটি কবিতা আছে তাতে মিল নেই, পদ্যছন্দ আছে, কিন্তু পদ্যের বিশেষ ভাষারীতি ত্যাগ করবার চেষ্টা করেছি। যেমন 'তরে' 'সনে' 'মোর' প্রভৃতি যে সকল শব্দ গদ্যে ব্যবহার হয় না সেগুলিকে এই সকল কবিতায় স্থান দিই নি।'

বিপরীতার্থকতা (Antonymy)

বাগর্থের দুটি প্রধান ভাগ— শব্দগত ও অন্বয়গত বাগর্থ। অন্বয়গত আলোচনায় পরে আসব। শব্দগত ক্ষেত্রে ধারণাগত সম্পর্ক নির্ধারণে কতিপয় পরিভাষা আমাদের জানা দরকার।

একটি খুব পরিচিত ধারণাগত সম্পর্ক হল বিপরীতার্থকতা (Antonymy)। ছোটোরাও শব্দের বিপরীত অর্থ সহজেই বুঝে নিতে পারে। যেমন, সাদার বিপরীত কালো, আলোর বিপরীত অন্ধকার। বিপরীতার্থকতা মূলগতভাবে পরিপূরক, এক ক্ষেত্রে যা থাকে, অন্য ক্ষেত্রে তা থাকে না। যেমন,

দরজাটি হয় খোলা আছে, নয় বন্ধ আছে।

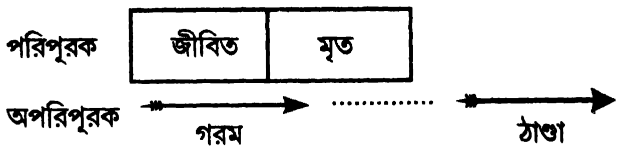
দরজাটি যদি খোলা থাকে, তবে তা বন্ধ নয়।

দরজাটি যদি বন্ধ থাকে, তবে তা খোলা নয়।

এমন ধারণা আমাদের হয় না যে দরজাটি একই সঙ্গে খোলাও আছে, বন্ধও আছে। কুকুরটা জীবিতও বটে, মৃতও বটে। কিংবা কুকুরটা জীবিতও নয়, মৃতও নয়। কিন্তু এই প্রান্তিক বিভাজন থেকে আমরা সরে আসতে পারি নিম্নরূপ দৃষ্টান্তে :

ভদ্রলোক খুব একটা লম্বাও নয়, খাটোও নয়। এখন জল খুব গরমও নয়, ঠাণ্ডাও নয়। তার বক্তৃতা খুব একটা ভালোও হয়নি, মন্দও হয়নি।

—এসব দৃষ্টান্তে দুই প্রান্তিক অবস্থান বিরুদ্ধতা থেকে সরে এসে মাঝামাঝি কোথাও মিলিত হচ্ছে। রেখাঙ্কনে এভাবে দেখানো যাক—



অপরিপূরক শব্দের আরও সূক্ষ্ম বিভাজন সম্ভব। বিরুদ্ধতার দুই প্রান্তে আমরা পাই প্রান্তিক বিরুদ্ধতা বা বিপরীতার্থকতা। যেমন ভারী / হালকা, উঁচু / নীচু, দ্রুত / ধীর, প্রশস্ত / সংকীর্ণ। যেন একটি স্কেল-এর দুই প্রান্তে দুটি বিরুদ্ধ ধারণা।

ভারী / হালকা	ওজন
উঁচু / নীচু	উচ্চতা
দ্রুত / ধীর	গতি
প্রশস্ত / সংকীর্ণ	পরিমাপ

এভাবে প্রতিটি প্রান্তিক শব্দযুগলের জন্য একটি সাধারণ বা নিরপেক্ষ শব্দ আছে যেমন ভারী/হালকা-র জন্য ওজন, উঁচু / নীচু-র জন্য উচ্চতা ইত্যাদি। যদি প্রশ্ন করা যায় 'কতটা উঁচু', তাহলে কথাটা সাধারণভাবে বলা হল, জিনিসটা উঁচুও হতে পারে নীচুও হতে পারে। কিন্তু যদি বলি 'কতটা নীচু', তাহলে জিনিসটি নীচুই হবে উঁচু হবে না। এরকম ক্ষেত্রে উঁচু অচিহ্নিত, নীচু চিহ্নিত (marked)। উঁচু বা নীচুর জন্য কোনো আদর্শ পরিমাপ নেই, এটা সম্পূর্ণতই আমাদের ধারণাগত ব্যাপার।

সাহিত্যে এই বিপরীতার্থকতার শৈলীগত ব্যবহারে অর্থের বৈচিত্র্য আমরা লক্ষ করি। প্রসঙ্গত উল্লেখ করা যায় লাতিন কবি কাতুল্লুস-এর বিখ্যাত উক্তি odi et amo অর্থাৎ আমি ঘৃণা করি, আমি ভালোবাসি। সংশ্লিষ্ট অংশটি এইরকম—

I hate and love.
You ask how that can be?
I do not know, but know it tortures me.

এখানে আমরা পাচ্ছি ঘৃণা ও ভালোবাসার দুটি বিপরীত ধারণার সংমিশ্রণ। আর রবীন্দ্রনাথের 'সন্ধ্যা ও প্রভাত'-এ বৈপরীত্য এসেছে প্রতিসাম্যের চমৎকারিত্বে।—

এখানে নামল সন্ধ্যা। সূর্যদেব, কোন দেশে, কোন সমুদ্রপারে, তোমার প্রভাত হল।

অন্ধকারে এখানে কেঁপে উঠছে রজনীগন্ধা, বাসরঘরের দ্বারের কাছে অবগুণ্ঠিত নববধূর মতো; কোনখানে ফুটল ভোরবেলাকার কনকচাঁপা।

জাগল কে। নিবিয়ে দিল সন্ধ্যায়-জ্বালানো দীপ, ফেলে দিল রাত্রে গাঁথা সেঁউতিফুলের মালা।

এখানে একে একে দরজায় আগল পড়ল, সেখানে জানলা গেল খুলে। এখানে নৌকো ঘাটে বাঁধা, মাঝি ঘুমিয়ে; সেখানে পালে লেগেছে হাওয়া।

॥ সমার্থবাচকতা (Synonymy) ॥

ক. রিমা গোবিন্দবাবুর কন্যা।

খ. রিমা গোবিন্দবাবুর মেয়ে।

এই দুটি বাক্যে যদি আমরা ধরে নিই গোবিন্দবাবু একই ব্যক্তি তাহলে সহজেই বলা যায় ক-বাক্যটি সঠিক হলে খ-বাক্যও সঠিক; অথবা বলা যায় খ-বাক্যটি সঠিক হলে ক-বাক্যটিও সঠিক; আর দুটি বাক্যের যে-কোনো একটি যদি সঠিক না হয়, তবে অপরটিও ভ্রান্ত। আমাদের এমন অনুমানের কারণ কন্যা ও মেয়ে দুটি শব্দই সমার্থক। দুটি শব্দ একজনকেই নির্দেশ করছে।

সমার্থক শব্দ বিশেষ্য হতে পারে কিংবা বিশেষণ, ক্রিয়াবিশেষণ বা ক্রিয়াও হতে পারে।

১ ক. পাহাড়টা বৃহৎ

১ খ. পাহাড়টা বড়ো

২ ক. গাড়িটা তাড়াতাড়ি যাচ্ছে

২ খ. গাড়িটা দ্রুত যাচ্ছে

৩ ক. ট্রেনটা ঠিক সময়েই ছেড়েছে

৩ খ. ট্রেনটা ঠিক সময়েই যাত্রা করেছে

দুটি বাক্য [ক] এবং [খ] যে পৃথক তা শুধুই প্রতিশব্দের জন্য। বাক্যগুলি ঠিক অথবা ঠিক নয়। অর্থাৎ তাদের সত্য-সম্পর্ক আমরা এভাবে দেখাতে পারি

$$ক \rightarrow খ$$

$$এবং\ খ \rightarrow ক$$

[অর্থাৎ ক অভ্রান্ত হলে খ অভ্রান্ত এবং তার বিপরীতটাও সঠিক]

$$আবার,\ \sim ক \rightarrow \sim খ$$

$$এবং\ \sim খ \rightarrow \sim ক$$

[অর্থাৎ ক যদি ভ্রান্ত হয়, খ-ও ভ্রান্ত এবং তার বিপরীতটাও সঠিক]

একের সঙ্গে অপরের বিনিময়ধর্মিতা প্রতিশব্দ বা সমার্থবাচকতার বৈশিষ্ট্য। তাই একটি বাক্য ঠিক হলে অন্যটিও ঠিক, ভুল হলে অন্যটিও ভুল। অর্থাৎ—

ক	খ
সত্য	সত্য
মিথ্যা	মিথ্যা

এই সারণি থেকে আমরা বুঝে নিতে পারি বাক্যে প্রতিশব্দের সংযোজন আলাদা কোনো অর্থগত মাত্রা আনতে পারে না। যেমন— পাহাড় বৃহৎ এবং বড়ো

বৃহতের প্রতিশব্দ বড়ো। 'এবং' শব্দ দুটিকে সংযুক্ত করেছে। এই দ্বিরুক্তি বা অনুলাপ (tautology) তাৎপর্যহীন। কিংবা যদি লেখা যায়

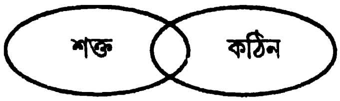
পাহাড়টা বৃহৎ কিন্তু বড়ো নয়

তাহলেও বাক্যটি স্ববিরোধী অর্থহীন হয়ে যায়। কখনও দেখা যায় একটি শব্দ অর্থের দিক থেকে অন্য একটি শব্দের অনুরূপ মনে হয়, কিন্তু অবিকল এক নয়। যেমন—

অঙ্কটা ভীষণ শক্ত

অঙ্কটা ভীষণ কঠিন

আপাত দৃষ্টিতে মনে হয় শক্ত ও কঠিন একে অন্যের প্রতিশব্দ। যেহেতু একের বদলে অন্যকে একই অর্থে ব্যবহার করা যাচ্ছে। কিন্তু সর্বত্রই কি শক্ত ও কঠিন বিনিময়ধর্মী? আমরা বলি, শক্ত চেয়ার, শক্ত মাটি, শক্ত বাঁধন ইত্যাদি। এসব ক্ষেত্রে শক্তের বদলে কঠিন শব্দ কি ব্যবহারযোগ্য? বোঝা যায় শব্দ দুটি একে অন্যকে বিনিময় করছে সীমিত ক্ষেত্রে, সর্বত্র নয়। রেখাঙ্কনে বিষয়টা স্পষ্ট হবে।



অভিধানে এক-একটি শব্দের পর্যাপ্ত প্রতিশব্দ পাওয়া যায়, কিন্তু একটি শব্দ কি আর একটির যথার্থ সমশব্দ হতে পারে? কারণ এক একটি শব্দকে ঘিরে অর্থের যে আবহ তৈরি হয়, অন্য একটি প্রতিশব্দে ঠিক তেমনটা না থাকা স্বাভাবিক। ছন্দের প্রয়োজনে সংস্কৃত ভাষার কবিরা প্রায়শ প্রতিশব্দ ব্যবহার করেছেন। বুদ্ধদেব বসু বলেছেন সংস্কৃত কবিতার এটা একটা দুর্বলতার দিক। একটি কবিতায় জীবনানন্দ দাশ যখন লেখেন, 'তোমার মতন এক মহিলার কাছে', তখন 'মহিলা' শব্দ নারীর নামান্তর মাত্র থাকে না, তাতে সমকালীনতার ধারণা ছড়িয়ে পড়ে। সংস্কৃতে স্ত্রী, বধূ, কামিনী, বনিতা বিন্দুমাত্র অর্থভেদ সূচিত করে না, প্রতি ক্ষেত্রে শুধু নারীকেই বোঝায়। "কিন্তু বাংলায় 'বধূ' বলতে নববধূ বা পুত্রবধূকেই বোঝায়, 'স্ত্রী' বলতে বিবাহিত পত্নী— আর 'রমণী' বা 'কামিনী' শব্দ আমরা ব্যবহারই করব না, যদি না রূপের রমণীয়তা বা কামের প্রবণতা বোঝাতে চাই।" সমশব্দের এই অর্থগত সূক্ষ্ম পার্থক্যের মধ্যে ভাষার দুর্বলতা নয়, শক্তিরই পরিচয় পাই আমরা।

ভৌগোলিক ব্যবধানে একই ভাষার উপভাষাগত বৈচিত্র্য দেখা দেয়। ফলে একই চিহ্নায়িতের জন্য ভিন্ন ভিন্ন চিহ্নায়ক শব্দ লক্ষ করা যায়। অর্থাৎ উপভাষাগত কারণে একই শব্দের বিভিন্ন প্রতিশব্দ তৈরি হয়ে যায়। কামিনীকুমার রায় লক্ষ করেছেন তাঁর এক আত্মীয়ের বাড়িতে একই তরকারি ফলকে গিন্নি বলেন 'মিঠা লাউ', বড়ো বউ বলে 'বৈতাল', ছোটো বউ বলে 'ডিংলা', ঝি বলে 'কুমড়া'। বোঝা যাচ্ছে একই বাড়িতে চারটি উপভাষার প্রতিনিধির সমাগম ঘটেছে। 'মিঠা লাউ' বলতে অভ্যস্ত পরিবারে এসেছে 'বৈতাল' ব্যবহারকারী অঞ্চলের এক বধূ, আবার এই পরিবারে আর এক বধূর পিত্রালয় সেই অঞ্চলে যেখানে মিঠা লাউ 'ডিংলা' নামে পরিচিত। এই বাড়িতে কাজ করে যে কাজের মেয়ে সে ওই 'বৈতাল' বা 'ডিংলা'কে আশৈশব 'কুমড়া' নামেই জানে। এভাবে অঞ্চলভেদে একই বস্তুর বিভিন্ন নামের প্রচলন। কিন্তু এখানে কি সূক্ষ্ম অর্থপার্থক্য নেই? ভিন্ন ভিন্ন অঞ্চলের বৈশিষ্ট্য ধরা পড়াই স্বাভাবিক। ফলে একই বস্তু, একই প্রাণী বা একই বিষয় নানা নাম-রূপ গ্রহণ করে। মূষিকের আকৃতি একটি প্রাণীকে কোনো একটি অঞ্চলে যখন বলা হয় 'চিকা', তখন মনে হয় প্রাণীটির চিক চিক শব্দ থেকেই ওই

নামকরণ। কিন্তু 'চিকা' শুধু শব্দই করে না, এটা ওটা খাবারে মুখ দেওয়াও তার স্বভাব। এই স্বভাবের দিক থেকে অন্য একটি অঞ্চলে তাকে বলা হয় ছুঁচো। প্রসঙ্গত একটি জালের দৃষ্টান্ত দিয়েছেন আঞ্চলিক ভাষার এই গবেষক। তিনি বলেছেন, একটি জালের বিভিন্ন দিক "কখনও কোনো একটি শব্দে প্রকাশ করা যায় না, তাই কোনো একটি অঞ্চলের মানুষ জালের নিক্ষেপ করার দিকটার ওপর জোর দিয়ে তার নাম দিয়েছে 'খেপলা জাল'। বাংলায় নিক্ষেপ করা অর্থে ফিকা শব্দেরও প্রচলন আছে। তাই কোথাও কোথাও বলা হয় 'ফিকা জাল'। শরীরে একটু ঝাকুনি দিয়ে ফেলতে হয় বলে একে 'কনুই জাল'-ও বলা হয়। মুঠ করে ফেলতে হয় বলে কোনো কোনো অঞ্চলে এর নাম 'মুঠ জাল'। ঘুম্মিয়ে উড়িয়ে দূরে নিক্ষেপ করতে হয় বলে 'ঘূর্ণিজাল', 'উড়াজাল', নামেরও প্রচলন আছে।" শব্দগুলি একই বস্তুর ব্যবহারের বিভিন্ন বৈশিষ্ট্য-প্রকাশক। বিভিন্ন অঞ্চলে বিভিন্ন মানুষের চোখে বস্তুটির ব্যবহারগত বৈচিত্র্যের এক একটি দিক ধরা পড়েছে। তাই নামকরণও বিভিন্ন রকম। একটি নাম যে আর একটি নামের হুবহু প্রতিশব্দ নয়, তা বলাই বাহুল্য।

ধর্মীয় কারণেও প্রতিশব্দের ব্যবহার লক্ষ করা যায়। বাংলায় দুই প্রধান ধর্মীয় বিভাজন—হিন্দু ও মুসলমান। হিন্দুরা 'জল' শব্দ ব্যবহার করেন, মুসলিমরা বলেন 'পানি'। আত্মীয়তাবাচক শব্দে এই পার্থক্য আরও প্রকট। নীচে একটি সংক্ষিপ্ত তালিকা দেওয়া যাক।

হিন্দু সম্বোধন	মুসলিম সম্বোধন
বাবা	আব্বা, বা'জান
মা	আম্মা
কাকা	চাচা
কাকিমা	চাচি
মাসিমা	খালা
মেসোমশাই	খালু
দাদা	ভাইয়া, ভাইসাব, মিয়াভাই
বৌদি	ভাবি
দাদু	নানা
দিদিমা	নানি
পিসেমশাই	ফুপা
পিসিমা	ফুপু
জামাইবাবু	দুলাভাই
[illegible]	[illegible], [illegible]
মাসতুতো ভাই	খালাতো ভাই

অনেকার্থতা (Polysemy) :

একই শব্দে যখন নানা অর্থের প্রতিধ্বনি শুনি, তখন শব্দটিকে অনেকার্থতার দৃষ্টান্ত ধরে নিতে পারি। সব দেশের ভাষাতেই শব্দের অর্থবহুত্ব লক্ষ করা যায়। এর একটা উপযোগিতার দিক নির্দেশ করেছেন ভাষাতাত্ত্বিক উলমান। একটি শব্দের জন্যে যদি একটিই অভিধেয় অর্থ তাহলে ভাষার শব্দের সংখ্যা এমন একটা জায়গায় পৌঁছোত যা আমাদের স্মৃতির পক্ষে

হত দুর্বহ। স্মৃতি বিধ্বংসী সেই গুরুভার থেকে আমরা বেঁচে গেছি শব্দের অর্থবহুত্বের কারণেই। উলমান লিখেছেন,

> If it were not possible to attach several senses to one word, this would mean a crushing burden on our memory : we wolud have to possess separate terms for every conceivable subject we might wish to talk about. Polysemy is an invaluable factor of economy and flexibility in language...

আলংকারিকরা শ্লেষ অলংকার প্রসঙ্গে একই শব্দের একাধিক অর্থের বিভিন্ন দৃষ্টান্ত দিয়েছেন। যেমন—

পূজাশেষে কুমারী বলল, ঠাকুর আমাকে একটি মনের মতো বর দাও।

এখানে 'বর' একটি শব্দ, একবার মাত্র উল্লেখিত হয়েছে, কিন্তু দুরকম অর্থ প্রকাশ করছে—

১. আমাকে মনের মতো একটি আশীর্বাদ দাও।
২. আমাকে আমার মনের মতো স্বামী দাও।

আর একটি দৃষ্টান্ত—

'বাজে পূরবীর ছন্দে রবির শেষ রাগিণীর বীণ'

—এখানে 'পূরবী' এবং 'রবি' দুটি শব্দেই আছে দ্ব্যর্থকতা। যেমন—

শব্দ	১ম অর্থ	২য় অর্থ
পূরবী	গোধূলির রাগ	'পূরবী' নামক রবীন্দ্রনাথ রচিত কবিতা
রবি	সূর্য	কবি রবীন্দ্রনাথ

আর বাংলা বাগধারায় এক একটি শব্দ যে কত বিচিত্র অর্থের আলোছায়া তৈরি করে তা হয়তো সঠিক নির্দেশ করাও সম্ভব নয়। ভাষার জীবনীশক্তির প্রকাশ এখানে আমরা লক্ষ করি। একটা উদাহরণ, কেবল 'মাথা' শব্দের সহযোগে যখন আমরা বাক্য গঠন করি, শব্দটি তখন কত বিভিন্ন অর্থেই না প্রযুক্ত হয়! এখানে কয়েকটি দৃষ্টান্ত সংকলন করি—

১. মাথা উঁচু করা (স্বাধীন, সগৌরবে চলা)
'শেখালে হয়ত সেও একদিন তোমারই মতো মাথা উঁচু করে দাঁড়াবে।'
— শরৎচন্দ্র [রমা]

২. *মাথা কেনা (কাউকে ব্যক্তিত্বহীন করা)*
'আবার কে? মক্কেল! এরা মনে করে আমি যেন চব্বিশ ঘণ্টাই তাদের অধীন। ফি দিয়ে মাথা কিনেছে যেন।' — বনফুল [*শ্রীমধুসূদন*]

৩. মাথা কোটা (কৃতকর্মের জন্য অনুশোচনায় অধীর হওয়া)
'ভূপতি ভাবিত, বলিবার কথা কিছুই নাই অথচ কত কথা অনর্গল বানাইয়া বলা সে তো আমি মাথা কুটিয়া মরিলেও পারিতাম না।' — রবীন্দ্রনাথ ['নষ্টনীড়'] [*গল্পগুচ্ছ*]

৪. মাথা খাওয়া (বুদ্ধি নষ্ট করা)
'আমার বন্ধুদের মধ্যে তোকেই সে সবচেয়ে বেশি ভয় করে। তার বিশ্বাস তুই আমার মাথাটি খেয়েছিস।' —রবীন্দ্রনাথ

৫. মাথা গলানো (প্রবেশ করা)
'—চিঠিপত্রের আদান-প্রদানটা একটা ব্যক্তিগত ব্যাপার, অথবা আপিস-সংক্রান্ত হলে আরো বেশি গোপনীয়। বাইরের লোকের সেখানে মাথা গলাতে যাওয়াটা ধৃষ্টতামাত্র।'
—'ভারতবর্ষ', ১৩৫৪, শ্রাবণ

৬. মাথা ঠাণ্ডা করা (উত্তেজনা প্রশমিত করা)
'—বড়ো বড়ো ক্রিয়াকর্মের সময় মাথা ঠাণ্ডা ভারী দরকার।' —রবীন্দ্রনাথ

৭. মাথা ঠেকানো (মাটিতে কিংবা পায়ে মাথা স্পর্শ করে প্রণাম করা)
—'ও আমার দেশের মাটি, তোমার পরে ঠেকাই মাথা।' —রবীন্দ্রনাথ

৮. মাথা পেতে নেওয়া (বিনা প্রতিবাদে গ্রহণ করা)
'তখন সমাজ দণ্ড দিতো, এবং সে দণ্ড অপরাধীকে মাথা পেতে নিতে হতো।'
—শরৎচন্দ্র [*রমা*]

বাক্যে আলংকারিক প্রয়োগের একটি উদ্দেশ্য মিতব্যয়িতা। শরীরের উন্নত অংশ মাথার রূপসাম্যে আমরা বলি লাঠির **মাথা**, ছাতার **মাথা** বা পেরেকের **মাথা**। এভারেস্টের **মাথা** বা গাছের মাথা ইত্যাদি বাক্যাংশেও সেই একই অর্থান্তর লক্ষ করা যায়। আবার যখন বলি তিনি গ্রামের **মাথা** তখন **মাথা** কথাটির অর্থ দাঁড়ায় 'প্রধান'। কিংবা যখন বলি তোমার কথার কোনো মাথা নেই তখন মাথার মূল শব্দার্থের বিকিরণ (Radiation) ঘটিয়ে আমরা বলতে চাই— তোমার কথার কোনো সারবত্তা নেই কিংবা তোমার কথা মূল্যহীন।

আবার অর্থবহুত্বের কারণে যে Ambiguity বা অর্থের অস্পষ্টতা তৈরি হয়, তা বলাই বাহুল্য। এখানে একটি সংলাপ উদ্ধৃত করি। রামবাবু তাঁর মেয়ের সঙ্গে কথা বলছেন। ওদের কথাবার্তার একটি অংশ এইরকম—

'রামবাবু : বিপ্লব দীর্ঘজীবী হোক।
ঠিক এ সময় শ্যামবাবুর প্রবেশ। তাঁর বিস্মিত উক্তি—
শ্যামবাবু : ওকি রাম তুমি বুড়ো বয়সে বিপ্লবী হয়ে উঠলে নাকি?
রামবাবু : আরে না না, আমি আমার নাতির কথা, বিপ্লবদাদুর কথা, বলছিলাম।'

বোঝাই যাচ্ছে 'বিপ্লব দীর্ঘজীবী হোক' কথাটি এখানে দ্ব্যর্থক। এই দ্ব্যর্থকতার উদ্ভব ঘটে যখন কোনো কিছু আমরা প্রসঙ্গ-মুক্তভাবে গ্রহণ করি। প্রসঙ্গ যুক্ত হলে অনভিপ্রেত অর্থের বিভ্রান্তি আসে না।

অভ্যন্তরতা (Hyponymy)

শব্দনিচয়ের গঠনগত সম্পর্কের একটি দিক অভ্যন্তরতা। ফল ও আপেল, গাড়ি ও সাইকেল, আঘাত করা ও চড় মারা— ইত্যাদি শব্দযুগল লক্ষ করলে বোঝা যায় দ্বিতীয়টি প্রথমটির অন্তর্গত। এই সম্পর্ককে আমরা বলি Hyponymy বা অভ্যন্তরতা। আপেল ফলের অন্তর্ভুক্ত, সাইকেল গাড়ির মধ্যেই পড়ে, আঘাত করা একটি সীমিত অর্থে চড় মারা। আমরা বলি—

১ ক. ঝুড়িতে আপেল আছে।
১ খ. ঝুড়িতে ফল আছে।
২ ক. ফুলদানিতে রজনীগন্ধা আছে।
২ খ. ফুলদানিতে ফুল আছে।

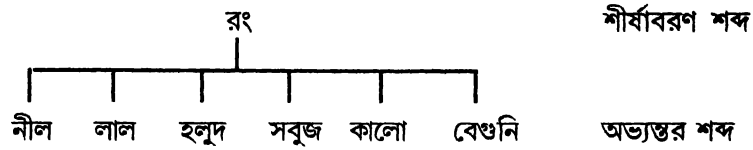
এখানে আমরা একটা সম্পর্ক পাচ্ছি যাকে বলা হয় Entailment বা অনুসারী সম্পর্ক। ১ ক. বাক্যটি যদি সঠিক হয় তাহলে ১ খ-ও সঠিক হবে আর মিথ্যা হলে পরবর্তী বাক্যটি মিথ্যাই হবে।

অভ্যন্তরতা যদিও সম্পর্কের দিক থেকে বৈকল্পিক (Paradigmatic), এর একটা পরস্পর (syntagmatic) বিন্যাসও আছে। নীচের উদাহরণ লক্ষ করা যাক

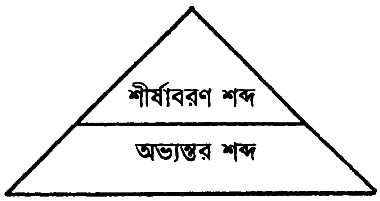
আপেল আর অন্যান্য ফল

? ফল আর অন্যান্য আপেল

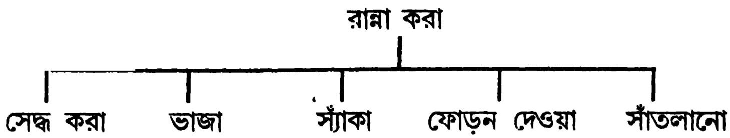
দ্বিতীয় বাক্যটি আমরা ব্যবহার করি না। অভ্যন্তরতাকে আমরা এভাবে প্রকাশ করতে পারি X হল Y-এর অন্তর্গত একটি শ্রেণি। প্রথম বাক্যটি সহজেই আমাদের সেই প্রত্যাশা পূরণ করে, দ্বিতীয়টি বাধাপ্রাপ্ত হয়। অভ্যন্তরতার ক্ষেত্রে ঊর্ধ্ব ধারণাটিকে বলা হয় superordinate বা শীর্ষাবরণ। যেমন নীল-লাল-সবুজ-হলুদ নানারকম রং শুধুমাত্র 'রং'-এর ধারণার অন্তর্গত হতে পারে।



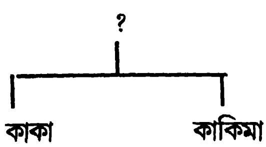
শীর্ষ ও অভ্যন্তরের সম্পর্ক নীচের ত্রিভুজে এভাবে দেখানো যায়।



পরিভাষা হিসেবে শীর্ষাবরণ শব্দের স্থান ওপরে, অভ্যন্তর শব্দগুলি স্বভাবতই তার অন্তর্গত। রঙের মতো বিমূর্ত ধারণার ক্ষেত্রেই শুধু এই স্তরক্রম লক্ষণীয় তা নয়, রান্না করার মতো ক্রিয়াপদের মধ্যেও আমরা বেশ কিছু অভ্যন্তর শব্দ পেতে পারি। যেমন—



তবে কিছু কিছু ক্ষেত্রে শীর্ষাবরণ শব্দ আমরা পাই না। যেমন—



বাংলায় পাই না, কিন্তু অন্য ভাষায় থাকতেই পারে। যেমন—স্প্যানিশ শব্দ Tion কাকা ও কাকিমার শীর্ষাবরণ শব্দ।

ভাষার শব্দসম্ভার আলোচনায় অভ্যন্তরতা একটি বিশেষ শ্রেণিগত সম্পর্ক নির্দেশ করে। অনেকসময় inclusion বা 'অন্তর্গত' শব্দেও এই ধারণাকে নির্দেশ করা হয়। যদি নির্দেশক

ক (ধরা যাক রং) নির্দেশক খ (ধরা যাক কালো)-কে অন্তর্গত করে, তাহলে খ ক-এর অভ্যন্তর শব্দ বলে বিবেচিত হবে। প্রতিদিনের কথাবার্তায় এরকম বাক্য আমরা প্রায়শ বলি; খ হচ্ছে ক-এর একটি শ্রেণির নাম (যেমন লাল এক ধরনের রং)।

উপাদানগত বিশ্লেষণ (Componential analysis)

ধ্বনির স্বলক্ষণ (distinctive feature) তত্ত্বের সাহায্যে এক একটি বাক্ ধ্বনির বিশিষ্টতা নির্ধারণ করা হয়। যেমন ক খ গ ঘ প্রতিটি ধ্বনি যে বিশিষ্ট, একে অন্যের থেকে পৃথক, ধ্বনির স্বলক্ষণের সাহায্যে তা এভাবে দেখানো যায়

	ক	খ	গ	ঘ
মহাপ্রাণতা	–	+	–	+
ঘোষতা	–	–	+	+
কণ্ঠতা	+	+	+	+

ক খ গ ঘ প্রতিটি ধ্বনি যে বিশিষ্ট (distinct), তা বোঝা যাচ্ছে উপরে উল্লিখিত স্বলক্ষণের বিন্যাস থেকে। ক যেখানে $\begin{bmatrix} - \\ - \\ + \end{bmatrix}$, খ সেখানে $\begin{bmatrix} + \\ - \\ + \end{bmatrix}$, গ $\begin{bmatrix} - \\ + \\ + \end{bmatrix}$ এবং ঘ $\begin{bmatrix} + \\ + \\ + \end{bmatrix}$ অর্থাৎ মহাপ্রাণতা, ঘোষতা ও কণ্ঠতার নিরিখে একের সঙ্গে অপরের অবিকল মিল নেই। আর সেজন্যে তারা প্রত্যেকে এক একটি পৃথক ধ্বনি।

শব্দের অর্থের বিশিষ্টতাও কি এভাবে নির্ধারণ করা সম্ভব? দেখা যাচ্ছে শব্দের অর্থের ক্ষেত্রেও ভাষাতাত্ত্বিকেরা যে উপাদানগত বিশ্লেষণ পদ্ধতি উপস্থাপন করেছেন, তা অনেকটা স্বলক্ষণ তত্ত্বের ধারণার অনুরূপ। দেখা যাক নর-নারী, বালক ও বালিকা এই চারটি শব্দের অর্থগত বিশিষ্টতা কী হতে পারে? অর্থগত বিনির্মাণ (semantic decomposition) বা উপাদানগত বিশ্লেষণ (componential analysis)-এর সাহায্যে ভাষাবিদরা এই বিশিষ্টতা নির্ধারণ করেন এইভাবে—

নর	বালক
+ মানবিক	+ মানবিক
+ পুরুষ	+ পুরুষ
+ প্রাপ্তবয়স্ক	– প্রাপ্তবয়স্ক

নারী	বালিকা
+ মানবিক	+ মানবিক
– পুরুষ	– পুরুষ
+ প্রাপ্তবয়স্ক	– প্রাপ্তবয়স্ক

'+' চিহ্ন কোনো একটি উপাদানের উপস্থিতি, '—' চিহ্ন অনুপস্থিতি। তিনটি উপাদানের উপস্থিতি-অনুপস্থিতির নিরিখে নর-নারী, বালক-বালিকা, শব্দগুলির অর্থগত বিশিষ্টতা বা পার্থক্য আমরা অনুধাবন করতে পারছি। আর সেটা সম্ভব হচ্ছে চারটি ক্ষেত্রে একটি সাধারণ

উপাদান 'মানবিক'-এর উপস্থিতিতে। যেমন ক খ গ ঘ-এর ক্ষেত্রে আমরা পেয়েছি [+ কণ্ঠতা]। ক খ গ ঘ যেমন একটি বর্গের অন্তর্গত তেমনই নর-নারী, বালক-বালিকাকেও আমরা একটি বর্গের অন্তর্গত ভাবতে পারি। অর্থাৎ এ ধরনের বিশ্লেষণ তখনই সম্ভব হচ্ছে যখন শব্দগুলিতে একটি সাধারণ উপাদান [এখানে + মানবিক] উপস্থিত থাকছে। মিতকথন বা economy-র দিক থেকে এ ধরনের বিশ্লেষণ উপযোগী।

কিন্তু এ জাতীয় বিশ্লেষণের একটি সীমাবদ্ধতাও আছে। ধরা যাক 'নীল' শব্দটি। রঙের দিক থেকে নীল, কালো সবুজ হলুদ থেকে আলাদা। কিন্তু কীভাবে নীলের নীলত্ব আমরা নির্ধারণ করব? এখানেই দেখা দেয় সমস্যা। আর তাই আমরা যেখান থেকে যাত্রা শুরু করেছিলাম, সেখানেই ফিরে আসি। অর্থ শেষ পর্যন্ত অনর্থই থেকে যায়।

ধারণার শব্দায়ন : চলিষ্ণু ক্রিয়া :

বাক্যের মধ্যে ক্রিয়াপদের একটি গুরুত্বপূর্ণ অবস্থান আছে। বাক্য প্রধানত বিশেষ্যপদ ও ক্রিয়াপদের সংগঠন। পৃথিবীর যে-কোনো ভাষাতে একটি বাক্য হল বিশেষ্যগুচ্ছ ও ক্রিয়াগুচ্ছের মিলিত উপস্থাপনা। এই পর্যায়ে আমরা লক্ষ করব ক্রিয়াপদের মধ্যে ধারণার শব্দায়ন (The lexicalization of concepts) কীভাবে ঘটছে।

দৃষ্টান্ত হিসাবে চলিষ্ণু ক্রিয়ার প্রসঙ্গে আসা যাক। স্পেন-এর ভাষার কয়েকটি চলিষ্ণু ক্রিয়া উল্লেখ করি—

El globo'	bajó	por la chimenea
'The ballon	moved-down	through the chimney.'
El globo	subió	por la chimenea.
'The balloon	moved-up	through the chimney.'
La botella	volvió	a la orilla.
'The bottle	moved back	to the bank'.
La botella	cruzó	el canal.
'The bottle	moved-across	the canal.'
La botella	salió	de la cueva.
'The bottle	moved-out	from the cave.'

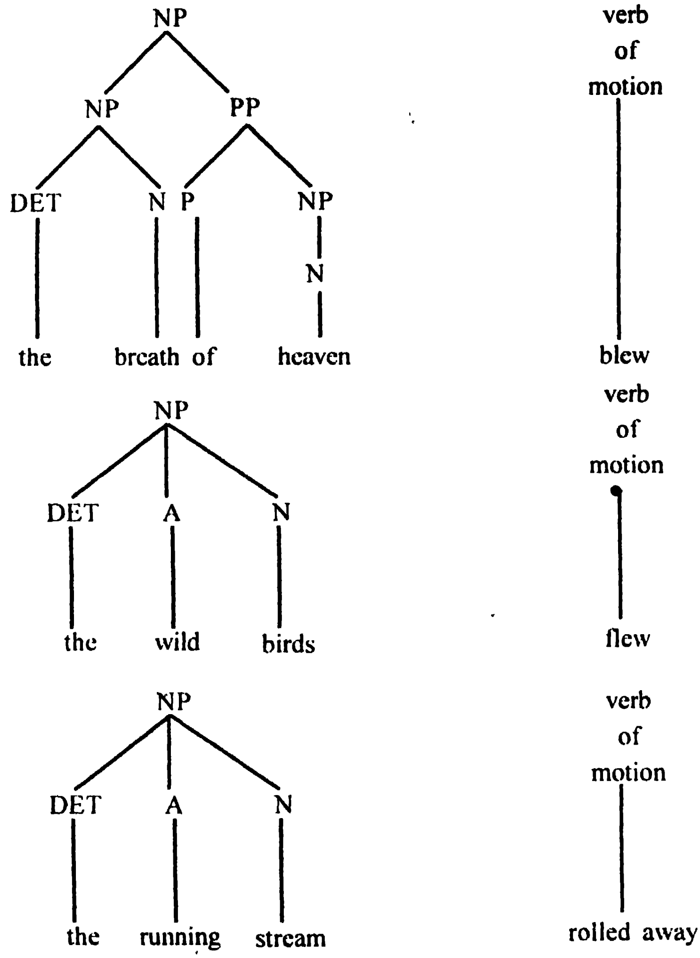
লক্ষণীয় ক্রিয়াপদগুলি শুধুমাত্র movement বা গতিশীলতাই বোঝাচ্ছে না, একটা দিক নির্দেশনাও সেইসঙ্গে যুক্ত হচ্ছে। বাংলা ভাষাতেও আমরা 'উঠে আসা', 'নেমে যাওয়া', 'ফিরে আসা' প্রভৃতি ক্রিয়ায় একই সঙ্গে চলিষ্ণুতা ও দিক নির্দেশনার দৃষ্টান্ত পাই।

সাহিত্যে বিশেষ্য পদগুচ্ছের সঙ্গে চলিষ্ণু ক্রিয়ার সংযোগ যখন ঘটে তখন বিশেষ্য পদগুচ্ছ চলিষ্ণুতার অন্তর্গত হয়ে যায়। দৃষ্টান্ত হিসাবে দুটি কবিতার অংশবিশেষ আমরা উল্লেখ করি— হেনরি লুই ভিভিয়ান ডিরোজিয়ো Freedom to the Slave কবিতায় লিখেছেন—

He looked above the breath of heaven
Around him freshly blew ;

He smiled exultingly to see
The wild birds as they flew.
He looked upon the running stream
That'neath him rolled away;

উদ্ধৃত অংশে বিশেষ্য পদগুচ্ছ ও চলিষ্ণু ক্রিয়ার সামীপ্য লক্ষ করা যাক—



বিশেষ্য পদগুচ্ছের সঙ্গে চলিষ্ণু ক্রিয়ার অন্বয় এখানে ক্রীতদাসের মুক্ত জীবনের বার্তাবহ হয়ে উঠেছে। রবীন্দ্রনাথ যখন তাঁর একটি গানে লেখেন,

সুরের আলো ভুবন ফেলে ছেয়ে,
সুরের হাওয়া চলে গগন বেয়ে,
পাষাণ টুটে ব্যাকুল বেগে ধেয়ে
বহিয়া যায় সুরের সুরধুনী।

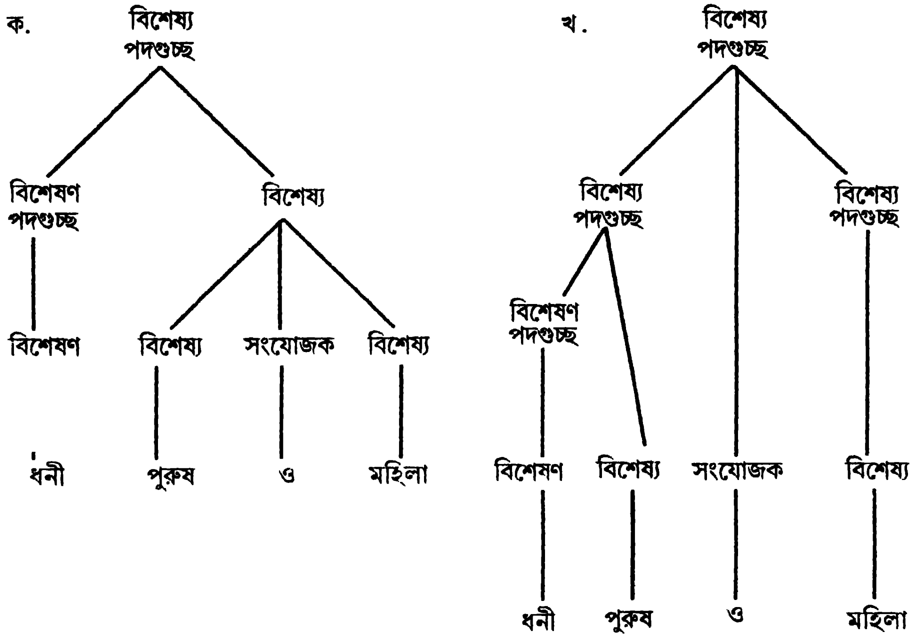
তখন **ফেলে ছেয়ে, চলে বেয়ে, বহিয়া যায়** ইত্যাদি ক্রিয়াপদ যথাক্রমে **ভুবন গগন** ও **পাষাণের** সঙ্গে যুক্ত হয়ে সামগ্রিকভাবে চলিষ্ণুতার অর্থান্তর ঘটায়।

।। বাক্যগত স্তর ।।

সাংগঠনিক দ্ব্যর্থকতা

বাক্যের অর্থ নির্ভর করে বাক্যের অন্তর্গত শব্দগুলির উপর এবং শব্দগুলি কীভাবে বিন্যস্ত হচ্ছে তার উপর। বাক্যের অন্তর্গত শব্দগুলি অর্থের দিক থেকে একে অপরের সঙ্গে যুক্ত হতে পারে। এই সংযোগসূত্রে দেখা দেয় দ্ব্যর্থকতা। দ্ব্যর্থকতা বা ambiguity শব্দগত নয়, শব্দের বিন্যাসগত।

উদাহরণের সাহায্যে বিষয়টি স্পষ্ট করা যাক—'ধনী পুরুষ ও মহিলা'। এই বাক্যাংশে ধনী বিশেষণটি কেবলমাত্র পুরুষের জন্য প্রযুক্ত হতে পারে অথবা পুরুষ ও মহিলা উভয় ক্ষেত্রে। যেমন, ক ও খ রেখাঙ্কন থেকে বোঝা যাচ্ছে 'ধনী পুরুষ ও মহিলা' একটি দ্ব্যর্থক বাক্যাংশ।



বাঁ দিকের সংগঠন স্পষ্ট নির্দেশ করছে পুরুষ ও মহিলা উভয়ের ধন আছে কিন্তু ডান দিকের সংগঠন থেকে স্পষ্ট হচ্ছে শুধু পুরুষই ধনবান। ধনী শব্দের জন্য x পুরুষের জন্য y এবং মহিলার জন্য z মূল্যমান (value) যদি আরোপ করি তাহলে ক-এর সংগঠন হবে $x(y+z) = xy + xz$ আর খ-এর সংগঠন হবে $xy + z$। সংগঠনের দিক থেকে বাক্য দুটি যে আলাদা এক্ষেত্রেও তা স্পষ্ট।

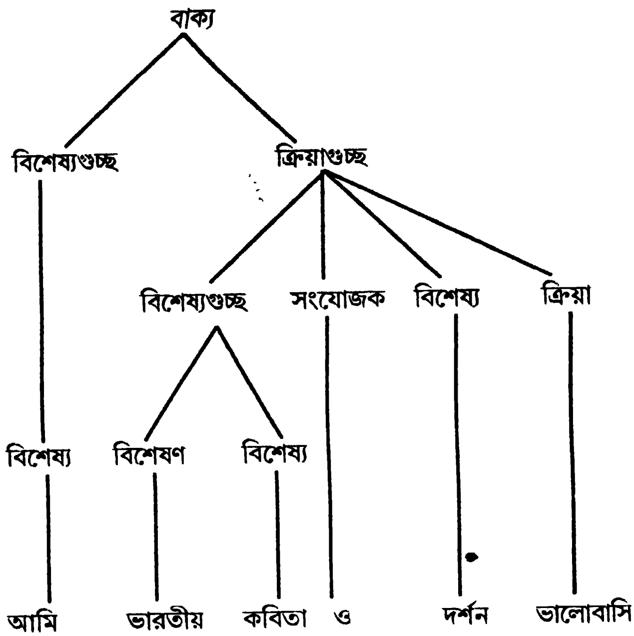
কয়েকটি বাক্য নেওয়া যাক—

১. আমি ভারতীয় কবিতা ও দর্শন ভালোবাসি

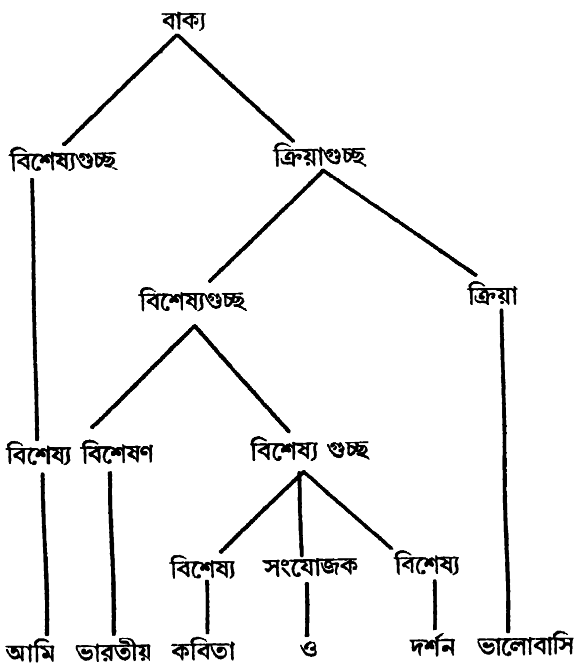
বাক্যটির দুটি অর্থ হতে পারে।

ক. আমি ভারতীয় কবিতা এবং দর্শন (ভারতীয় হতেই হবে এমন নয়) ভালোবাসি।
খ. আমি ভারতীয় কবিতা ও ভারতীয় দর্শন ভালোবাসি। ফলে অধোগঠনে (deep structure) পার্থক্য আসবে।

ক.



খ.



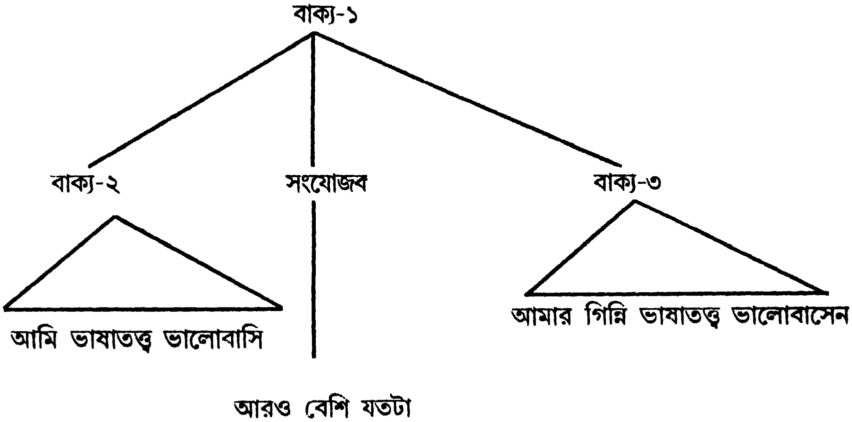
নীচের বাক্যটি লক্ষ করা যাক—

আমার গিন্নির থেকেও আমি ভাষাতত্ত্ব আরও বেশি ভালোবাসি।— এই বাক্যের দুটি অর্থ হতে পারে

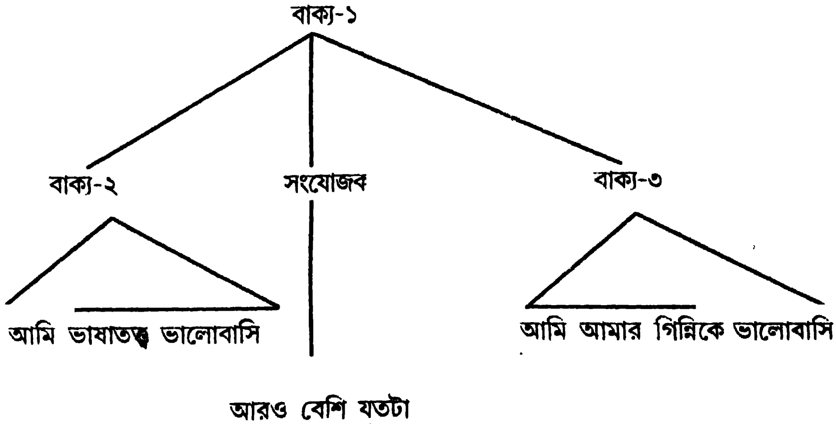
ক. আমার গিন্নি ভাষাতত্ত্ব যতটা ভালোবাসেন, আমি ভাষাতত্ত্ব তার চেয়েও বেশি ভালোবাসি।

খ. আমি আমার গিন্নিকে যতটা ভালোবাসি, তার চেয়েও বেশি ভালোবাসি ভাষাতত্ত্ব।

ক-এর জন্য বৃক্ষচিত্র হবে এ রকম—

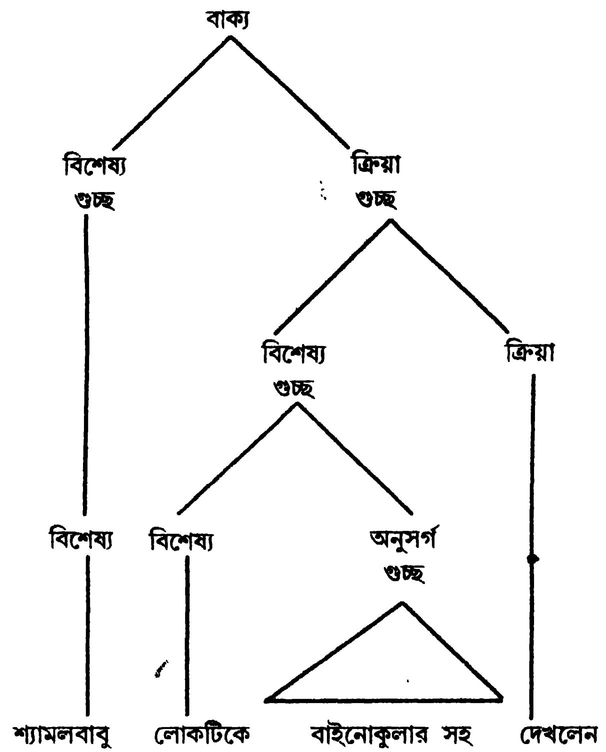


খ-এর জন্য বৃক্ষচিত্র—

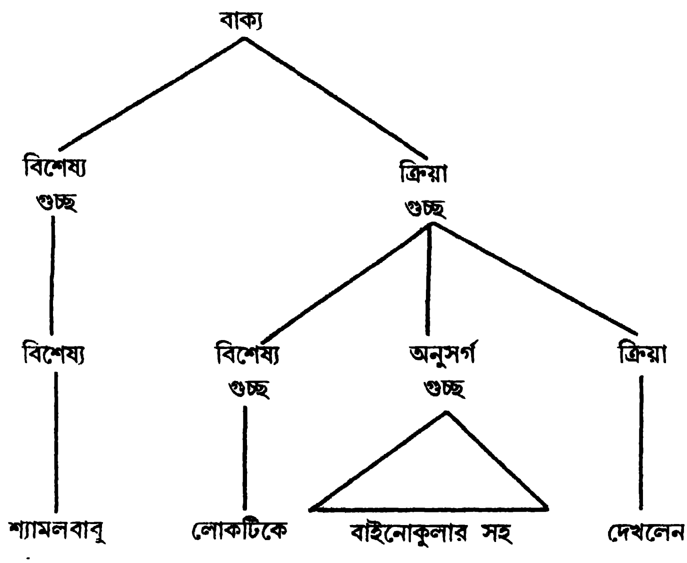


একটি বাক্য নেওয়া যাক—শ্যামলবাবু বাইনোকুলার সহ লোকটিকে দেখলেন। বাক্যটিকে দুরকম রেখাচিত্রে আমরা সাজাতে পারি—

ক.



খ.



বাক্যটির প্রথম সংগঠন (ক) থেকে বোঝা যাচ্ছে লোকটির হাতে বাইনোকুলার আছে। কিন্তু দ্বিতীয় সংগঠন (খ) থেকে বোঝা যায় বাইনোকুলার আছে শ্যামলবাবুর কাছেই। অর্থাৎ শ্যামলবাবু কীভাবে লোকটিকে দেখলেন, অনুসর্গগুচ্ছের অবস্থানের সাহায্যে তা আমরা বুঝে নিতে পারি।

অর্থগত দ্ব্যর্থকতার কারণে বৃক্ষচিত্রের চেহারাও যে বদলে যাচ্ছে, তা বলাই বাহুল্য।

বাক্য ও যুক্তি :

বাক্যের বিধেয় অংশ অনেক সময় একটিমাত্র নির্দেশকের সঙ্গে সম্পর্কিত হয়। এমন বিধেয়কে আমরা বলতে পারি এক-স্থানিক বিধেয়। আবার দুই স্থানিক বিধেয়-ও থাকতে পারে। সে-সব ক্ষেত্রে বিধেয় সম্পর্কিত হয় দুটি নির্দেশক শব্দের সঙ্গে। সেক্ষেত্রে এই দুই নির্দেশকের মধ্যে কিছু-না-কিছু সম্পর্ক নির্ধারণ করা যায়। দুই স্থানিক বিধেয় এভাবে symetric বা সম্মিতিসূচক হতে পারে। যেমন, আমরা বলি—

a বিয়ে করেছে b-কে

তাহলে

b বিয়ে করেছে a-কে

R-কে যদি সম্পর্কের প্রতীক হিসাবে ধরে নিই তবে সূত্রটিকে এভাবে সাজাতে পারি

$$\forall X \forall y\,(xRy \rightarrow yRx)$$

অর্থাৎ সকল x এবং y-এব ক্ষেত্রে বলা যায় যদি x y-এর সঙ্গে সম্পর্কিত (R) হয়, তবে y সম্পর্কিত (R) হবে x-এর সঙ্গে। এই সম্পর্ক সম্মিতিসূচক।

আবার বিধেয় হতে পারে সকর্মক। যেমন আমরা যদি বলি—

a আছে b-এর সামনে

এবং

b আছে c-এর সামনে

তাহলে

a আছে c-এর সামনে

এক্ষেত্রে বিধেয়টিকে আমরা উপস্থাপন করতে পারি নিম্নরূপসূত্রে—

$$\forall X \ \forall y \forall z\,((xRy \,\&\, yRz) \rightarrow (xRz))$$

অর্থাৎ সকল x এবং সকল y এবং সকল z-এর ক্ষেত্রে যদি x সম্পর্কিত (R) হয় y-এর সঙ্গে এবং y সম্পর্কিত (R) হয় z-এর সঙ্গে, তাহলে x সম্পর্কিত (R) হবে z-এর সঙ্গে। এই সম্পর্ক transitive বা সকর্মক।

কিছু দুই-স্থানিক বিধেয়র ক্ষেত্রে আমরা লক্ষ করি আবর্তন (converse) সম্পর্ক। যেমন

a হল b-এর বাবা

তাহলে

b হল a-এর ছেলে

সূত্রাকারে লেখা যায়

$$\forall x \ \forall y\,(xRy \rightarrow yR'x)$$

অর্থাৎ সকল x এবং সকল y এর ক্ষেত্রে, যদি x সম্পর্কিত (R) হয় y-এর সঙ্গে তাহলে y সম্পর্কিত (R') হবে x-এর সঙ্গে। এই আবর্তনে আমরা লক্ষ করি একের সঙ্গে অপরের সম্পর্কগত বৈপরীত্য।

দুই স্থানিক সম্পর্কের ক্ষেত্রে সমার্থবাচকতাও লক্ষণীয়। 'তিনি জীবিত নেই' বাক্যের 'জীবিত নেই' অংশটিকে আমরা সমার্থবাচক মৃত শব্দে প্রকাশ করতে পারি— তিনি মৃত। এই বিকল্প বাক্যাংশ যে সমার্থবাচক (synonymous) তা বলাই বাহুল্য। সমার্থবাচকতা সম্পর্ক হবে এইরকম। যেমন—

সকল f হল g

তেমনই—সকল g হল f

অভ্যন্তরতার ক্ষেত্রে আমরা লক্ষ করি একটি শীর্ষাবরণ শব্দের আড়ালে অভ্যন্তরীণ শব্দগুলো জায়গা করে নেয়। তাদের একের সঙ্গে অপরের সম্পর্ক সহ আভ্যন্তরিক (co-hyponyms)। যেমন 'ফুল' একটি শীর্ষাবরণ পরিভাষা আর তার অন্তর্গত বেল জুঁই মালতি চামেলি সহ-আভ্যন্তরিক। আর ফুলের সঙ্গে বেল, জুঁই, মালতি কিংবা চামেলির সম্পর্ক অভ্যন্তরতার (hyponymy)।

যেমন, x এক ধরনের y

অন্বয়ের দিক থেকে একে শীর্ষাবরণ পরিভাষার অন্তর্গত করে আমরা দেখতে পারি। যেমন গোলাপ বাগান এক ধরনের বাগান।

মেটাফর :

মেটাফরকে বাংলায় আমরা রূপক বলি। রূপক ও উপমা শুধু সাহিত্যে নয়, এই অলংকার দুটি প্রতিদিনের ভাষা ব্যবহারেও প্রাসঙ্গিক। একজনের হাত ধরে হয়তো কেউ বলল একদিন— 'তোমার হাতটা বরফের মতো ঠাণ্ডা', অন্যদিন সে হয়তো বলল 'তোমার হাতটা বরফের টুকরো।' তথ্য হিসাবে দুটি বাক্য একই কিন্তু অলংকার হিসাবে আলাদা— প্রথমটি উপমা, দ্বিতীয়টি রূপক। দুটি ক্ষেত্রেই আছে হাতের সঙ্গে বরফের তুলনা। হাত এখানে বর্ণনীয় বিষয় তথা উপমেয়, বরফের প্রসঙ্গ এসেছে তুলনার সূত্রে, বরফ তাই উপমান আর দুই-এর মধ্যে তুলনার ভিত্তি হল ঠাণ্ডা বা শীতলতা। ঠাণ্ডা এখানে দুই-এর মধ্যে তুলনার সেতু বা সাধারণ ধর্ম। হাতকে যদি x ধরি আর বরফকে y তাহলে উপমা x হল y-এর মতো আর রূপক x = y। I. A. Richards-এর পরিভাষায় হাত হল tenor, বরফ vehicle, আর সাধারণ ধর্ম ground। উপমায় তুলনা যেমন প্রকাশ্য, রূপকে তেমন নয়। রূপককে তাই নিহিত উপমা বলা যেতে পারে।

নৌকার মাঝির একটি গানের সূচনা—

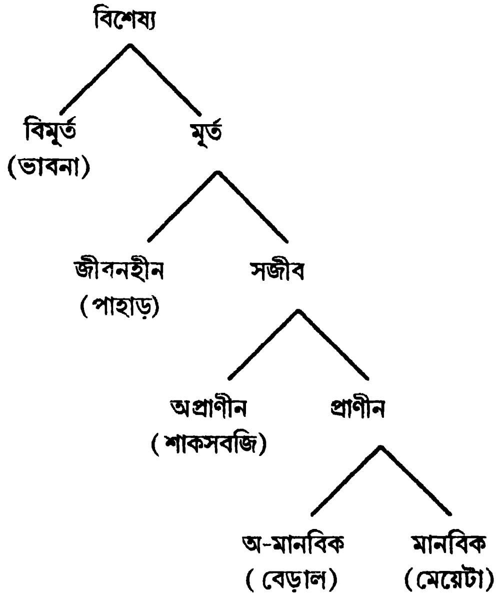
মনমাঝি তোর বইঠা নেরে— আমি আর বাইতে পারলাম না।

মনমাঝি রূপক অলংকার, মন আর মাঝিকে এখানে এক করে ভাবা হচ্ছে। আর এই তুলনাসূত্রেই এসেছে বইঠার প্রসঙ্গ। মাঝির সাথে বইঠার যে শব্দ-সাযুজ্য (collocation), মনের সঙ্গে বইঠার তা নেই। তা ছাড়া মন বিমূর্ত, মাঝি মূর্ত, সুতরাং মনের কাছে বইঠা পৌঁছে দেওয়া আদৌ সম্ভব নয়। রূপক এই অসম্ভবকে সম্ভব করে পরিচিত ধারণার অপরিচিতিকরণের মধ্যে দিয়ে। উপমায় যে সাধারণ ধর্ম (ground) উপস্থিত থাকতে পারে রূপকে তা থাকে না।

রূপক সর্বদাই যে বিশেষ্য-নির্ভর, এমন নয়, ক্রিয়াপদকে আশ্রয় করেও রূপকের ব্যঞ্জনা আনা সম্ভব। নীচের উদ্ধৃতি লক্ষ করা যাক—

এখন ট্রেনের মধ্যে আমার পাশেই
যে মহিলা ফুটেছেন, তার
চোখমুখ কথার পাপড়িগুলো
ছড়ায় নিবিড় :

শব্দ-সাযুজ্যের দিক থেকে ফুলের সঙ্গে ফোটার সম্পর্ক। কিন্তু যখন বলা হল—'যে মহিলা ফুটেছেন' তখন ফুলের কথা বলা না হলেও ফুলের গুণাবলি মহিলার উপর আরোপিত হল। ফুটন্ত ফুলের সঙ্গে তুলনীয় হয়ে উঠলেন মহিলাটি। আর তাই ফুলের বৈশিষ্ট্যের অনুরূপ 'চোখমুখ কথার পাপড়িগুলো ছড়ায় নিবিড়।' বিষয়টি বিশ্লেষণের জন্য আমরা চমস্কি-কথিত শব্দ নির্বাচনের বিধি-নিষেধের (Selection Restriction) কথা আনতে পারি। প্রসঙ্গত বিশেষ্যের বৈশিষ্ট্যগুলি লক্ষ করা যাক—



ভাবনা বিমূর্ত। যদি লেখা যায় 'সামনে নির্বাচনের ভাবনা কড়া নাড়ছে', তাহলে ভাবনা আর বিমূর্ত থাকে না, ভাবনা তখন [+ মূর্ত] এবং [+ মানবিক], অর্থাৎ একটি বিমূর্ত ধারণা মানবিক গুণসম্পন্ন বলেই তার পক্ষে দরজায় কড়া নাড়া সম্ভব হচ্ছে। দরজায় কড়া নাড়া মানুষের কাজ। Personification বা সমাসোক্তির মাধ্যমে সেই কাজটা অর্পিত হয়েছে ভাবনার উপর। + মানবিক হলেই কড়া নাড়া যায়, শব্দ নির্বাচনের এই সীমাবদ্ধতা ভেঙে গেছে রূপকের ক্ষেত্রে। বাস্তব ক্ষেত্রে Selection Restriction বা শব্দ নির্বাচনের বিধি-নিষেধ মেনেই আমাদের কথা বলতে হয়। আমরা বলতে পারি 'মেয়েটা চেক লিখছে' কিন্তু বলতে পারি না 'বেড়ালটা চেক লিখছে।' কারণ চেক লেখা [+ মানবিক]। রূপক রচনায় এই বিধি-নিষেধ লঙ্ঘন করা হয়, তা বলাই বাহুল্য। চমস্কি বিসংগত বাক্যের একটি নমুনা দিয়েছিলেন—'Colourless green ideas sleep furiously' (বিবর্ণ সবুজ ভাবনা ঘুমায় ভয়াল)। ব্যাকরণিক এই সংগত বাক্যটি বাগর্থের দিক থেকে বিসংগত। কারণ তা শব্দ নির্বাচনের বিধি-নিষেধ লঙ্ঘন করেছে। আবার সে কারণেই এই বাক্যটি রূপকের দিক থেকে একটি দ্যোতনাসঞ্চারী বাক্য হিসেবে উল্লেখযোগ্য।

জীবনের অভিজ্ঞতার রূপায়ণ কীভাবে রূপকের ইমেজ গড়ে তোলে তার পরিকল্প (schemes) উপস্থিত করেছেন লেকফ ও জনসন। বেশ কিছু চিত্রকল্প আমাদের প্রাত্যহিক অভিজ্ঞতার সংকলন। যখন বলা হয় 'তর্ক একটি যুদ্ধ' তখন প্রাত্যহিক একটি অভিজ্ঞতার মধ্যে

আমরা যুদ্ধের প্রতিফলন লক্ষ করি। এই রূপকের উৎস-এলাকা (source domain) হল যুদ্ধ আর লক্ষ্য এলাকা (target domain) হল তর্ক। যুদ্ধ জয় কিংবা পরাজয়ে শেষ হয়, তেমনই তর্কও শেষ হয় জয়ে কিংবা পরাজয়ে। যারা এই ধরনের রূপক ব্যবহার করেন যুদ্ধের অভিজ্ঞতা তাদের থাকতেই হবে এমন নয়। কিন্তু যুদ্ধ সম্পর্কে তাদের একটা ধারণা থাকে আর তাই এ ধরনের রূপক নির্মাণ সম্ভব হয়। লেকফ ও জনসন এই জাতীয় রূপকের একটি ভিন্ন নাম দিয়েছেন— Conceptual metaphors. বা ধারণাগত রূপক। মাও-ৎসে তুঙ্ যখন লেখেন—

রাজনীতি হল নীরক্ত যুদ্ধ
আর যুদ্ধ হল রক্তাক্ত রাজনীতি

—তখন একজন রাজনীতিকের অভিজ্ঞতার ধারণাগত সংহত রূপায়ণ আমরা পাই এই দুটি রূপকের দৃষ্টান্তে।

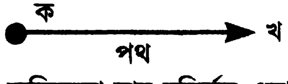
সময়ের ধারণাটিকে নেয়া যাক। সময়কে বস্তু, স্থান, দূরত্ব এবং গতি হিসাবে দেখা হয়। সময় বস্তুনিচয়, সময়ের চলমানতা হল গতি, সময়ের প্রসরণ হল দূরত্ব। ভবিষ্যৎ সময় দ্রষ্টার সম্মুখে, অতিক্রান্ত সময় দ্রষ্টার পেছনে— এভাবেই সময়কে আমরা দেখি। সময়ের প্রসরণ লক্ষ করি দুভাবে— বক্তা/দ্রষ্টা চলিষ্ণু অথবা স্থির (কখনও দ্রষ্টা স্থির, সময় চলমান; কখনও সময় স্থির, দ্রষ্টা চলমান)।

ক. ঘটনা স্থির, দ্রষ্টা চলিষ্ণু :
আমরা ঠিক পরীক্ষার সময়েই আসছি।
জানি না পরের সপ্তাহ পার হয়ে কী অবস্থায় থাকব?

খ. ঘটনা চলিষ্ণু, দ্রষ্টা স্থানু :
ধর্মঘটের দিনটা শান্তিপূর্ণভাবে কাটল।
পরীক্ষার দিন যত এগিয়ে আসছে ততই আমার ভাবনা বাড়ছে।

রৈখিকতা তুলনীয় হয় হয় পথের সঙ্গে, নীচের রূপক দৃষ্টান্তগুলি যেমন—
সুনীল ক্লাসের ছেলেদের মধ্যে সবচেয়ে এগিয়ে আছে।
সুশীল যেমন পড়াশুনা করছে মনে হয় খুব শিগগিরই ওকে ধরবে। পড়াশুনার সামর্থ্যে সুনীল কিন্তু এখনও অনেকটা পথ এগিয়ে আছে।

—উপরের অনুচ্ছেদে পথের এই পরিকল্প ঘুরে ফিরে এসেছে—



নৈকট্য ও দূরত্ব : স্থানের অভিজ্ঞতা স্থান-বহির্ভূত এলাকায় আমরা প্রয়োগ করি। যেমন নীচের দৃষ্টান্তটি—

আমাদের এই ছেলেটি, বড়ো ভালো, ভাত খায় এতটুকু।
আর ওদের ওই দস্যি ছেলেটা, ভাত খায় এতগুলো।

লক্ষণীয় 'টি' এবং 'টা' এখানে রূপকধর্মী। 'টি' সম্পর্কের নৈকট্য আর 'টা' বোঝাচ্ছে সম্পর্কের দূরত্ব।

উঁচু ও নীচু : উচ্চ ও নীচের আলম্ব ধারণা জীবনের অন্যবিধ এলাকায় আমরা প্রয়োগ করি। যেমন উচ্চবংশ, নীচু জাত, উচ্চাশা, উচ্চ রক্তচাপ, উচ্চশিক্ষা, নিম্ন মধ্যবিত্ত, নিম্নচাপ ইত্যাদি।

সম্মুখ ও পশ্চাৎ : এই জাতীয় রূপক মানুষের শারীরিক অভিজ্ঞতার সঙ্গে জড়িত। আমাদের শরীরের সম্মুখভাগে প্রধান ইন্দ্রিয়গুলি, বিশেষ করে চোখের অবস্থান সামনের দিকে।

এগিয়ে যেতে সম্মুখভাগের ধারণাই আমাদের মধ্যে কাজ করে। ভবিষ্যৎকে ভাবি সম্মুখ, অতীতকে পশ্চাৎ। যেমন জীবনের সম্মুখ দিকে যখন তাকাই সেটা ভবিষ্যৎ, আর পেছনের দিকে যখন তাকাই সেটা অতীত।

আমাদের ইন্দ্রিয়ঘন অভিজ্ঞতাগুলোও কি রূপকধর্মী? আমরা বলি মাঠ ধূ-ধূ করছে, রৌদ্র ঝাঁ-ঝাঁ করছে, শূন্য ঘর গম গম করছে, ভয়ে গা ছম্‌ছম্ করছে— এসব দৃষ্টান্তে একই সঙ্গে আমাদের একাধিক ইন্দ্রিয় সক্রিয়। একই ইন্দ্রিয়ের অনুভূতিকে যখন আমরা অন্য ইন্দ্রিয়ের মাধ্যমে প্রকাশ করি তাকে বলি 'synaesthesia' বা সহসংবেদন। সহসংবেদন রূপকের বৈচিত্র্যের একটি দিক। প্রতিদিনের কথাবার্তায় আমরা এ ধরনের রূপক হামেশাই ব্যবহার করি। যেমন— তিনি মচকান কিন্তু ভাঙেন না। সহসংবেদনের এই সাধারণ ব্যবহারই কাব্যের ভাষায় বিশিষ্ট হয়ে ওঠে। আমরা রবীন্দ্রনাথের *গীতাঞ্জলি* থেকে একটি দৃষ্টান্ত তুলে আনি।

সুরের আলো ভুবন ফেলে ছেয়ে
সুরের হাওয়া চলে গগন বেয়ে
পাষাণ টুটে ব্যাকুল বেগে ধেয়ে
বহিয়া যায় সুরের সুরধুনী

সুরের সঙ্গে মিশে যাচ্ছে আলো-হাওয়া আর নদীর প্রবাহ, আমরা পৌঁছে যাচ্ছি সহসংবেদনের ভিন্ন অভিজ্ঞতার জগতে।

সুর > আলো : শ্রুতি > দৃষ্টি
সুব > হাওয়া : শ্রুতি > স্পর্শ
সুর > সুরধুনী : শ্রুতি > দৃষ্টি

একদিক দিয়ে দেখতে গেলে আমাদের প্রতিদিনের সাধারণ কথাবার্তাও আলংকারিক। বিশেষত রূপক অলংকার আমরা এত সহজে ব্যবহার করি যে, বক্তা বা শ্রোতা কেউই সচেতন হন না সাধারণ কথাগুলি কখন আলংকারিক পর্যায় পৌঁছে গেছে। একালে আমরা খুবই সময়-সচেতন। সময়কে নিয়ে কতরকম কথা বলি।

তুমি সময় নষ্ট করছ কেন?
জানি না কতটা সময় ওকে দিতে হবে?
ধন্যবাদ, আমার অনেকটা সময় তুমি বাঁচিয়ে দিলে।
কেমন করে সময় কাটাচ্ছ আজকাল?
ওর জন্য আমি অনেক সময় ব্যয় করেছি।

এসব দৃষ্টান্তে সময়কে মনে হচ্ছে একটা পণ্য যা কখনও ব্যয় করা হচ্ছে, কখনও নষ্ট করা হচ্ছে, কখনও বা অপরকে দেয়া হচ্ছে। এই জাতীয় বাক্যগুলি যে রূপকধর্মী, তা আমরা ভেবেও দেখি না। আসলে এসব কথার লুকোনো রূপক ব্যবহারে অস্পষ্ট হয়ে গেছে। সূর্য ডোবে, চাঁদ ওঠে ইত্যাদি কথাগুলোও তো রূপকধর্মী। আর এভাবে দেখতে গেলে অলংকারবিহীন সাধারণ কথার অস্তিত্বই বোধ হয় খুঁজে পাওয়া যাবে না। তাই সাধারণ কথার নিহিত রূপককে ভাষাবিদরা বলেছেন মৃত রূপক— এককালের সজীব রূপক প্রতিদিনের কথাবার্তায় জীর্ণ হয়ে অন্তর্হিত হয়েছে।

ভাষার ভিতর দিয়ে যখন দেখি ভুবনখানি :

ছেলেবেলা থেকে শব্দ দিয়েই আমরা পৃথিবীটাকে চিনি। ছোটো শিশু হয়তো জল বলছে না, বলছে 'দল' কিন্তু ওই শব্দটির মধ্য দিয়েই জল সম্পর্কে একটা বস্তুগত ধারণা ক্রমশ আর

মনে দানা বাঁধে। সে বড়ো হয়, শব্দের সংগ্রহও তার বাড়ে। আর শব্দের সঞ্চয় মানেই জগৎ সম্পর্কে তার অভিজ্ঞতার সঞ্চয়।

শব্দের পরবর্তী পর্যায়ে শব্দের গ্রন্থনা। শিশু প্রথম আকৃষ্ট হয় রঙে, তাই শৈশবে সে যে ধরনের কথা বলে তা প্রধানত এইরকম—

দুধ সাদা
আগুনের রং লাল
আকাশ নীল
গাছের পাতা সবুজ ইত্যাদি।

অর্থাৎ এই পর্যায়ে তার সহজ সরল বাক্যে বস্তুর গুণাবলি প্রকাশ পায়। পরবর্তী পর্যায়ে আসে পরিমাপ। একজন কিশোরকে বলতে শোনা যাবে 'দুধের চেয়ে সাদা জিনিস আর হয় না' কিংবা 'গন্ধরাজের গন্ধ কী মিষ্টি, অন্য ফুলের গন্ধ কি এতটা?' এই পর্যায়ে পাই একটা তুলনার মনোভাব। কৈশোর ও যৌবনের সন্ধিলগ্নে তার অভিজ্ঞতায় ধরা দেয় কার্যকারণ সম্পর্কের ধারণা। একজন তরুণকে বলতে শোনা যায়— এত গরম, বরফ গলবে না? ঘাস ভিজে আছে বোধ হয় রাতে বৃষ্টি হয়েছিল। কার্যকারণের ভাবনাসঙ্গে আরও একটি ধারণা তাকে অধিকার করে বসে। সে ভাবতে শেখে সবকিছুর অন্তরালে বোধ হয় কিছু না কিছু উদ্দেশ্য আছে। পাখির গায়ে পালক কেন? প্রকৃতি তাকে পালক দিয়েছে ঝড় বৃষ্টি থেকে নিজেকে রক্ষা করার জন্য। ফুল এত রঙিন কেন? প্রজাপতি যাতে আকৃষ্ট হয়। এভাবে মানুষের মনে পৃথিবীর প্রতিটি ঘটনার অন্তরালে কোনো-না-কোনো উদ্দেশ্য আছে, এমন ধারণা তৈরি হয়, এমন ধারণা তার নিজেকে নিয়েও। কে আমি, এই পৃথিবীতে কী আমার স্থান, কী আমার জীবনের সার্থকতা—ইত্যাকার নানা প্রশ্ন তার মনে। এসব প্রশ্নের জবাব যদি সে না পায়, ভাবতে শুরু করে জীবনটা তার অর্থহীন, তার জীবনের কোনো মানে নেই।

প্রশ্ন হল বাস্তব জীবনের অভিজ্ঞতাই কি আমাদের ভাষার নিয়ন্ত্রক অথবা ভাষার মধ্যে দিয়েই আমাদের বাস্তববোধ নিয়ন্ত্রিত হয়? আমরা বাংলা ভাষায় 'গোল' শব্দ দিয়ে বর্তুলাকার বস্তু নির্দেশ করি। কিন্তু পৃথিবীতে এমন ভাষাও আছে যেখানে 'গোল' কথাটির কোনো প্রতিশব্দ নেই। যেমন অস্ট্রেলীয় কোনো কোনো ভাষায় 'মেয়েটার মুখটা গোল' সোজাসুজি বলা যায় না, বলতে হয় 'মেয়েটার মুখটা চাঁদের মতো' অর্থাৎ চাঁদের অনুষঙ্গে মেয়েটির মুখের আকৃতি বোঝানো হল। মেয়েটা সম্পর্কে subjective attitude বা আত্মগত ধারণা এতে প্রকাশ পাচ্ছে হয়তো বা।

ভাষার মধ্য দিয়ে মানুষ কীভাবে জগৎকে দেখে, তার অভিজ্ঞতা হয়েছিল এডওয়ার্ড স্যাপির (১৮৮৪-১৯৩৯) এবং বেঞ্জামিন লি হোর্ফ (১৮৯৭-১৯৪১) নামের দুই ভাষাবিদের। ফ্রান্স বোয়াস (১৮৫৮-১৯৪২) তাঁর *Handbank of American Indian Languages* বইটিতে জানিয়েছিলেন ভাষাতাত্ত্বিকের কাজ হবে ভাষাবিশেষের ব্যাকরণিক গঠনের আবিষ্কার এবং তার যথাযথ বর্ণনা। আমেরিকা ভূখণ্ডের প্রাচীন অধিবাসীদের এমন কিছু ভাষা আছে যেখানে আমাদের ভাষার একবচন/বহুবচন কিংবা অতীত/বর্তমানের ধারণা কাজ করে না। আবার এমন কিছু ভাষিক বৈশিষ্ট্য আছে আমাদের কাছে যা অভিনব। ১৯০০ খ্রিস্টাব্দে স্যাপির আসেন বোয়াস-এর সংস্পর্শে। ১৯০৫ খ্রিস্টাব্দ থেকে আমেরিকান-ইন্ডিয়ান ভাষা নিয়ে তিনি ক্ষেত্র সমীক্ষা শুরু করেন। তিনি উপলব্ধি করলেন ভাষা ও সংস্কৃতিকে পৃথকভাবে আলোচনা করা যায় না কারণ একে অপরের সঙ্গে ঘনিষ্ঠভাবে সংশ্লিষ্ট। হোর্ফ ভাষাতাত্ত্বিক ছিলেন না,

তিনি নিযুক্ত ছিলেন Fire Insurance company-তে অগ্নি নির্বাপণের একজন ইঞ্জিনিয়ার হিসেবে। ১৯৩১ সাল থেকে স্যাপির-এর অন্তরঙ্গ সান্নিধ্যে তিনি আমেরিকান-ইন্ডিয়ান ভাষা-গবেষণায় যুক্ত হলেন। হোপি-দের অভিনব ব্যাকরণ থেকে তিনি এই ধারণায় উপনীত হলেন যে পৃথিবীকে দেখার বিশেষ দৃষ্টিভঙ্গি ভাষা থেকেই গড়ে ওঠে। হোর্ফের এই ধারণা স্যাপিরের ধারণার সমধর্মী। হোর্ফ আমেরিকান-ইণ্ডিয়ান ভাষা 'হোপি'র মধ্যে এমন সব বৈশিষ্ট্য লক্ষ করলেন যা ইংরেজিতে নেই। যেমন কালের ধারণা নেই তাদের ভাষায়, নেই স্থানগত ও কালগত দূরত্বের পার্থক্য। বিশেষ্য ও ক্রিয়ার মধ্যেও পার্থক্য অস্পষ্ট। আমাদের ভাষার অনেক বিশেষ্যই সেখানে ক্রিয়ারূপে প্রকাশ পায়। শিশিরকুমার দাশ লিখেছেন—"দশদিন বা ten day's-এর মতো পদগুচ্ছ হোপিতে সম্ভব নয়। তারা এখানে দশদিন ছিল এই ধরনের বাক্য হোপিতে বলা হবে না। বলা হবে হয় তারা এখানে একাদশ দিন পর্যন্ত ছিল কিংবা তারা দশম দিনের পর চলে গেল। বলা যাবে না 'Ten days are greater than nine days' বলা হবে 'the tenth day is later than the ninth'। ইংরেজিতে the length of time এই পদগুচ্ছে যে দৈর্ঘ্য-বোধ আছে, তা হোপিতে নেই, সেখানে দুটি ঘটনার মধ্যে যে 'বিলম্ব' [দূরত্ব নয়] তার সম্পর্কের বোধ আছে। ইউরোপীয় ভাষাগুলিতে সময়ের বোধকে একটি বস্তুর ছকে ফেলে দেখা হয়েছে, হোপিতে সময়ের ওপর কোন বস্তুর ছক বা pattern আরোপ করা হয়নি।"

একথা ঠিক জীবনযাপন ও ভৌগোলিক অবস্থানগত কারণে একটি ভাষার শব্দসম্ভারের অবিকল প্রতিশব্দ আর একটি ভাষায় মেলে না। আমরা বাংলায় 'কুকুর' বলি, কুকুরের বৈচিত্র্য নির্দেশক শব্দগুলি আমাদের ভাষায় নেই বললেই চলে। কিন্তু স্প্যানিশ-এ কুকুরের অনেকগুলি নাম—pero, perrazo, perillo, perrito, perrezno আর perrico। "এর মধ্যে কেবল প্রথমটাই বাংলায় 'কুকুর' এই কথা দিয়ে মোটামুটি বোঝানো যায়। বাকিগুলিতে আছে নানা রং, নানা সংস্কার। perrazo (পেররাথো) ধুমসো বাঘা কুত্তা যেন, perrillo (পেররিয়ো) যেন 'বেচারা এতটুকু কুত্তা'। শেষের শব্দটির কৌতুক নাকি অনুবাদ করা আদপেই সম্ভব নয়। এইসব শব্দকে চলতি কথায় culture-term বলা হয়। এগুলির প্রতিশব্দ অন্য ভাষায় পাওয়া যাবে না, তার বদলে বর্ণনা দিয়ে এগুলির অন্তর্লীন ধারণাকে বোঝাতে হবে। এক সংস্কৃতির সব ধারণা হুবহু অন্য সংস্কৃতিতে রূপান্তরিত করা যায় না, কাছাকাছি ধারণাতে সেসব ফুটিয়ে তুলতে হয়।"

ভাষার গঠনের সঙ্গে বিশ্বদৃষ্টির ধারণা সমান্তরাল, এমন চূড়ান্ত দাবি অবশ্য করেননি স্যাপির ও হোর্ফ। তবে বিশ্বদৃষ্টি যে অনেকটাই ভাষানির্ভর এমন কথা তাঁরা জোরের সঙ্গেই বলেছেন। ভাষিক এই আপেক্ষিকতাবাদ স্যাপির-হোর্ফ প্রাক-কল্পনা (Sapir-Whorf-hypothesis) নামে পরিচিত। অবশ্য স্যাপির-হোর্ফ-এর এই ধারণা আজকের দিনে অনেকেই সমর্থন করেন না। কারণ স্যাপির-হোর্ফ তত্ত্ব মানলে ভাষায় ভাষায় অনুবাদ কখনই সম্ভব হত না। আবার একথাও ঠিক ভিন্ন ভাষাভাষীদের মধ্যে বিশ্বসম্পর্কিত ধারণা প্রকাশে ভাষার অনুরঞ্জন যে বিশেষ বিশেষ ক্ষেত্রে অনেকটাই ক্রিয়াশীল একথা অস্বীকার করা যায় না। বলতে হয় ভাষা-বিশেষের মাধ্যমেই বাস্তবের তাৎপর্য এক একটি জনগোষ্ঠীর কাছে ভিন্ন রূপে ধরা দেয়। রবীন্দ্রনাথের অনুপম পঙক্তি শিরোনামে আমরা কিছুটা বদলে নিয়েছি, এজন্য ক্ষমাপ্রার্থী। তবে একথা তো ঠিক গানের ভিতর দিয়ে আমরা যেমন পৃথিবীর ভিন্ন অর্থ পাই, ভাষার ভিতর দিয়ে তেমনই অর্থান্তর ঘটতে পারে।

কবিতার ভাষা সাংগঠনিক কাব্যতত্ত্ব

দেবাঞ্জন দাস

১.০১ : একদা স্বপ্নের সঙ্গে ছিল লুকোচুরি
অহরহ কবিতার চোর চোর বুড়ি বুড়ি খেলা
এখন শব্দের সঙ্গে খেলা
চৌমাথার ভিড় থেকে ফুসলিয়ে ভুলিয়ে ভালিয়ে
একটি শব্দকে ধরে কোনভাবে ঘরে নিয়ে
আসা।[১]

'স্বপ্নের কবিতা'কে নিয়ে উপরের কবিতাটি কবি তারাপদ রায়ের। কবির আক্ষেপ মাধুর্যময় স্বপ্নলোক থেকে কবিতার ছিন্ন হয়ে যাওয়া নিয়ে। তিনি কবিতার শরীরে এমন এক স্বপ্নের ভুবনকে কামনা করেন যেখানে আমরা আমাদের নির্জ্ঞান অস্তিত্বের ঘুম থেকে জেগে উঠি। প্রত্যহের ধূলিমলিন পৃথিবী থেকে চলে যাই দিব্যানুভূতির এক চির শুভ্র জ্যোতির্লোকে; চলে যাই সকল সুখনিধান অতীতের স্বপ্নচারিতায়। কিন্তু কথাময় পৃথিবী থেকে সে স্বপ্ন হারিয়ে গেছে। বরং এখন 'শব্দকে ধরে কোনভাবে ঘরে নিয়ে' আসতে হয়। ভুলিয়ে 'ভালিয়ে' এমনকি 'ফুসলিয়ে'ও।

কবিতাটিতে কোথাও কি কোনো বক্রোক্তির চাবুক আছে? আপাত তরল পরিহাসপ্রিয়তার আড়ালে কোথাও কি লুকিয়ে আছে কোনো শ্লেষের সায়ক? অন্তত আবু সৈয়দ আইয়ুব যখন বলেন, "আধুনিক কবিদের কাছে আমারও সেই একই নিবেদন— শব্দের খেলা নিয়ে এত মাতামাতি করবেন না; বাল : ক্রীড়তি।....আমি কাব্যরসাস্বাদনকে জীবনের মহত্তর উপলব্ধির অন্যতম জ্ঞান করি। এরূপ জ্ঞান করাটা হয়ত সেকেলে। তা হোক একেলে হবার জন্য সর্বস্বান্ত হতে 'আমার মন নয় রাজি'।"[২] তখন তো তাঁর চিন্তার সাযুজ্য সম্বন্ধে কবিতাটির সহজ ভঙ্গি নিমেষে আক্রমণের তরবারিতে সংবর্তিত হয়ে যায়। চৈতন্যের মর্মমূলকে গভীরভাবে নাড়িয়ে দেয়। প্রশ্ন তোলে সত্যিই কি কবিতায় শব্দ বাহুল্য মাত্র? নাকি শব্দশক্তিই কবিতাকে তিলোত্তমা করে— স্বপ্ন না শব্দ কোন্‌টি কবির কাব্য রচনার পরাসিদ্ধির বীজমন্ত্র? বর্তমান নিবন্ধে আমাদের অনুসন্ধেয় শব্দের ভূমিকা না-ভূমিকা নিয়েই।

তবু স্বপ্নের সঙ্গে লুকোচুরি কবিরা হয়তো এখন খেলেন। খেলেন 'কবিতার চোর চোর বুড়ি বুড়ি খেলা' কারণ স্বপ্ন তাঁদের দেখতে হয় দেখাতে হয় কিন্তু সে-স্বপ্ন শব্দবিবিক্ত নয়, বরং তাঁকে তৈরি করতে হয় 'শব্দের অ্যালকেমি'। সে অ্যালকেমি কবিকল্পনার রসায়নাগারে বিস্ময়ের তাপে প্রেমের পাত্রে সংগঠিত হয়। অর্থাৎ মূর্ত ভাষার মধ্যেই স্বপ্নকে প্রতিফলিত করে দেখতে হয়। মূর্তির মধ্যেই ধরতে হয় বিমূর্ততাকে। কারণ কবির মানসলোক যা অভিজ্ঞতার জগৎ সরলরেখ নয়— কৌণিক। সেই অভিজ্ঞতা যখন ভাষায় রূপান্তরিত হয়ে যায় তখনই উন্মোচিত হতে থাকে বহুমুখী সম্ভাবনা। ভাষার মধ্যে এই বহুমাত্রিক সৃষ্টিশীলতা আছে বলেই ঘোমটার পর ঘোমটা খুলে কবিতাকে বিভিন্ন রূপে প্রত্যক্ষ করার চেষ্টা করি। তাই এক মুখের নানা মুখ হয়ে যাওয়া ; অখণ্ডের ভগ্নাংশতে পরিণতি ঘটে বলেই শব্দশক্তি সূক্ষ্মভাবে যা ধ্বনিশক্তি তার উপর নির্ভর করেই সে ডানা মেলে দেয় অভিজ্ঞাপনের বহুতলিক ব্যঞ্জনার জগতে। মূর্তের মধ্যেই দেখতে হয় যাপনের ছবি। এমনকি কখনো-কখনো মুখোশ ছেড়ে মুখের দিকে, পুতুল ছেড়ে মানুষের দিকে দৈনন্দিন বিজ্ঞাপনী ভুবনকে ছেড়ে যে সত্যে পৌঁছোই তা তো মূর্ত জগতের উপর ভর করেই, অর্থাৎ নির্ভর করে ভাষায়।

কবিতায় স্বপ্নলোক গড়ে উঠুক বা না উঠুক কবিতার আলোচনা থেকে সমস্ত স্বপ্নময়তার আয়োজন তুলে দেবার দায়িত্ব কাঁধে তুলে নিলেন বিশ শতকের দ্বিতীয় দশকের ভাষাবিজ্ঞানীরা। বিশেষ করে রোমান ইয়াকবসন ও ইয়ান মুকারোভস্কি। নির্মোহ, নৈর্ব্যক্তিক নিরাসক্ত দৃষ্টি নিয়ে কাব্য সমালোচনায় তাঁরা ভাষাতত্ত্বকে করে তুলতে চাইলেন অমোঘ অস্ত্র। একান্তই তন্ময় (objective) তাঁদের দৃষ্টি। সাংগঠনিক ভাষাবিজ্ঞানের ব্যাখ্যা ও বিশ্লেষণের মধ্যে।

১.০২ : সাংগঠনিক ভাষাবিজ্ঞানের দৃষ্টি ছিল ভাষার বহিঃরঙ্গে অর্থাৎ ধ্বনি, রূপ প্রভৃতিতে এবং নিরাসক্ত নৈর্ব্যক্তিক ভাবে তা বর্ণনা করতে চেয়েছিল বিভিন্ন ভাষাবস্তুর শরীর বিন্যাস। সাংগঠনিক ভাষাবিজ্ঞান কিছুটা ঐতিহাসিক ভাষাতত্ত্ব ও ব্যাকরণের প্রথাগত ধারণার প্রতিক্রিয়াজনিত ফল। প্রথাগত ব্যাকরণ আর্থ ও অনুশাসনিক। কিন্তু সাংগঠনিকরা ঘৃণা করতেন অর্থ ও অনুশাসনকে, আর ঐতিহাসিক ভাষাতত্ত্ব ভাষার বিবর্তন রচনায় উৎসাহী। কিন্তু সাংগঠনিক ভাষাতাত্ত্বিকেরা উৎসাহী হয়েছিলেন এককালিক একটি ভাষার বিশেষ অবস্থা বর্ণনায়। সাংগঠনিক ভাষাবিজ্ঞানের উৎস ও আদিপুরুষ ফার্দিনান্দ দ্য স্যোসুরে (১৮৫৭—১৯১৩)। আমরা এখানে সূত্রাকারে তাঁর ভাষাচিন্তার সমীকরণগুলি উপস্থাপিত করব। যা পরবর্তীকালে শৈলী বিজ্ঞানের সম্ভাবনাকে করেছিল উন্মুক্ত।

১. 'লা পারোল' ও 'লা লাঙ'-এর স্বাতন্ত্র্য নির্দেশ। 'লা পারোল' হল মানুষের মুখের ভাষা যা ব্যক্তিভেদে পৃথক। 'লা লাঙ' ভাষার সামাজিক রূপ, ভাষার সমস্ত নিয়মের একত্রিত রূপ। প্রথমটি ব্যক্তিগত ও ব্যবহারিক। দ্বিতীয়টি বিমূর্ত। শৈলীর সম্ভাবনা তাই প্রথমটির মধ্যেই থেকে যায়।
২. কালানুক্রমিক ও কালকেন্দ্রিক ভাষাবিদ্যার মধ্যে পার্থক্য নির্দেশ।
৩. 'আনুষঙ্গিক' ও 'বাক্যিক' সম্পর্কের মধ্যে স্বাতন্ত্র্য নির্দেশ।
৪. আধার ও আধেয় স্বাতন্ত্র্য। আধার বলতে স্যোসুরে বুঝেছেন ভাষার শরীর-উপাদান, আর আধেয় হল অর্থ যা সব ভাষাতেই এক। তাঁর মতে যে সমস্ত উপাদানে আধারতল গঠিত তার গুরুত্ব সামান্য; মূল্যবান হচ্ছে আধারতলের বস্তুরাশির ব্যবহার বিধি।

৫. চিহ্নতত্ত্বের প্রবর্তন। চিহ্নকে তিনি নিছক শব্দসমষ্টি বলে মনে করেন নি। মনে করেছেন প্রত্যয় বা concept। এগুলি মনস্তাত্ত্বিক সত্তা। একই সঙ্গে যা স্থিতি ও গতি ধর্মকে নিজের স্বলক্ষণ করে তুলেছে। গতিশীল বলেই এদের মধ্যে আসে পরিবর্তন। স্থিতিশীল বলেই এগুলি এক প্রজন্ম থেকে আর এক প্রজন্মে প্রবহমান।

৬. তাঁর মতে ভাষার চিহ্ন বা 'sign'— absolute নয়। পরিবর্তনীয়। স্বাধীন। স্যোসুরে একেই বলেন 'কথার যদৃচ্ছা' বা 'sign is arbitrary'। তাঁর কথায়, "The link between signal and significance is arbitrary. Since we are treating a sign as the combination in which a signal is associated with a signification, we can express this more simply as a linguistic sign is arbitrary."[৩]

১.০৩ : গ্রিক দর্শনে ও কাব্যতত্ত্বে আমরা এরই অনুরূপ ধারণাকে প্রতিফলিত হতে দেখি। চরম স্বভাববাদী ক্রাটাইলুস মনে করতেন যে শব্দ এবং শব্দার্থ শাশ্বত সম্পর্কে জড়িত, তাই প্রতিটি শব্দের জন্য তার অর্থ অত্যন্ত স্বাভাবিক ও শাশ্বত। "Cratylus maintains that there must be a natural fitness of names to things among Greek and barbarians. He can not or will not define his meaning further."[৪] ক্রাটাইলুসের বিশ্বাস কোনো বস্তুর নাম তার নিজের স্বভাব প্রকৃতির বাস্তব প্রতিফলন, সুতরাং ভাষা স্বাভাবিক কারণেই অর্থবহ। এ তত্ত্বানুসারে কোনো শব্দের ধ্বনি সংগঠনে প্রতিফলিত হয় বস্তুর স্বীয় গঠন ; তাই আমরা শব্দরাশিকে পরীক্ষা করে বস্তুর সত্য মিথ্যা বুঝে নিতে পারি। এ তত্ত্ব অনুসারে তাই প্রতিটি বস্তুরই থাকবে একটি মাত্র শুদ্ধ নাম, আর সে নাম ব্যবহৃত হবে সর্বত্র। এ তত্ত্ব থেকেই উৎসারিত হয়েছে বুৎপত্তি শাস্ত্র।

'ক্রাটাইলুস' সংলাপে প্রথাবাদী হচ্ছেন হের্মোগেনেস। তাঁর মতে বস্তুনাম ও বস্তুর মধ্যে কোনো শাশ্বত সম্পর্ক নেই। নাম ও বস্তুর সম্পর্ক নিছক সামাজিক প্রথাগত । এ একরকম সামাজিক চুক্তি : "Hermogenes has never been able to convince himself that names rest on any other basis than convention and agreement. We are as free to change the names of things as we are to give new names to our servants, and whatever we call a thing is its name."[৫] এ চুক্তি পরিবর্তনশীল, তাই যে-কোনো শব্দই শুদ্ধ শব্দ, যতক্ষণ পর্যন্ত না ভাষাভাষীরা ওই শব্দের অর্থ সম্পর্কে দ্বিমত পোষণ করেন।

সক্রেটিস উভয় মতামতের গুণাগুণ বিচারে প্রবৃত্ত হন। তাঁর মতে নাম (ওনোমা) হচ্ছে পদ বা পদসমষ্টি বা বাক্যের (লোগোস) ক্ষুদ্রাংশ যার সাহায্যে বিভিন্ন বস্তুকে পৃথক করা যায়। কোনো কোনো মানুষ আছেন যাঁরা নাম উদ্ভাবনদক্ষ। সুতরাং আমরা মনে করতে পারি যে তাঁরা বস্তু সম্পর্কে বিশেষ জ্ঞান লাভ করার পরই বস্তুর নামকরণ করেন। সক্রেটিস দু শ্রেণির নাম— সরল ও জটিল নিয়ে আলোচনা করেছেন। তাঁর মতে জটিল নামকে বিভিন্ন খণ্ডাংশে ভাঙা সম্ভব, এবং এই খণ্ডাংশগুলিতে লক্ষ করা সম্ভব বস্তুর প্রকৃতি। সরল নামকে বিভিন্ন অংশে ভাঙা অসম্ভব। সরল নামকে ভাঙলে পাওয়া যায় বিভিন্ন বর্ণ যাদের ভাগ করা যায় স্বর ও ব্যঞ্জনে। কিন্তু ওই স্বর ও ব্যঞ্জন কী নির্দেশ করে? শব্দগঠনে অংশী বর্ণ বা ধ্বনির কোনো অর্থ নেই। সক্রেটিস এই সিদ্ধান্ত করেছেন যে ভাষা প্রথাগত। "We can conceive of no rational explanation of language except on the hypothesis that elementary

letters in some way imitate the essences of things. The alternative is to admit Hermogenes' view *that language is a purely arbitrary convention.*"[৬]

প্লেটোর 'ক্রাটাইলুস' সংলাপ পুরোপুরি হিরাক্লিটাসের দর্শন ভাবনার (জগতের সমস্ত কিছুই পরিবর্তনশীল। এবং এমনকি স্থিরতম বস্তুতেও অদৃশ্য গতি এবং চলতা আছে) উপর প্রতিষ্ঠিত। "....there was nothing stable and fixed in the nature of things. So they made all words of good meaning imply *motion and fostering motion,* and all terms disparagement suggest repose and the checking or thwarting of the stream of change."[৭] ক্রাটাইলুস সংলাপের মুখ্য বিষয়ই হচ্ছে ভাষা, চিন্তা এবং বস্তুর মধ্যে সম্পর্কের স্বরূপ সন্ধান। এবং এই আলোচনা হিরাক্লিটাসের গতি দর্শনের একটু ভিন্ন মাত্রিক উপস্থাপন। "The conclusion points directly to the theory of transcendental ideas as the only escape from the flux."[৮] এই motion এবং flux চরিত্রটির প্রকৃতির এবং ভাষার বিলক্ষণ লক্ষণ। প্রকৃতিরূপী ভাষা idea অর্থাৎ absolute-এর সঙ্গে অবিরাম মিলতে চাইছে। কিন্তু তাদের সম্পূর্ণ মিলন কখনই সম্ভব নয়। কারণ প্রথমত, এরা একতলিক নয় এবং দ্বিতীয়ত, idea এবং language-এর মিলন ঘটলেই ভাষার অন্তর্লীন বহুস্তরীভূত ব্যঞ্জনা থেমে যাবে। এখানে *meaning*-টা হয়ে উঠেছে idea, কিন্তু আইডিয়ায় ভাষা কখনই পুরোপুরি পৌঁছোতে পারে না। প্লেটোর মতো অ্যারিস্টটলের ভাবনাও ছিল অনুরূপ। তাঁর *কাব্যতত্ত্ব*-এর ২০ তম অধ্যায়ে ধ্বনি এবং অর্থের তলকে আলাদা ভাবেই দেখানো হয়েছে।

খ্রিস্টপূর্ব চতুর্থ শতক থেকে দ্বিতীয় শতকের শেষ পর্যন্ত দর্শন ও ব্যাকরণ চর্চায় প্রাধান্য বিস্তার করেছিলেন স্টোয়িকরা। তাঁরা ছিলেন অ্যারিস্টটলের অনুসারীদের বিরোধী। তাঁরা পার্থক্য নির্দেশ করেন ভাষার যৌক্তিক ও ভাষাতাত্ত্বিক বিশ্লেষণের মধ্যে এবং ব্যাখ্যার জন্য উদ্ভাবন করেন প্রচুর পরিমাণ পারিভাষিক শব্দ। ভাষার অর্থবহ রূপ সমূহ বিশ্লেষণের জন্য তাঁরা তিনটি পরস্পরনির্ভর অথচ স্বতন্ত্র বৈশিষ্ট্য নির্দেশ করেন।

১. সিমাইনন (প্রতীক, সংকেত)— ধ্বনি বা ভাষাশরীর
২. সিমাইনোমেনন বা লেকতন
(যা উক্ত হয়েছে)— অর্থ
৩. প্রাগমা (নির্দেশিত বস্তু) — প্রতীক দ্বারা নির্দেশিত বস্তু।

অর্থ নয় বরং ধ্বনি এবং ধ্বনির দ্বারা নির্দেশিত বস্তুকে তাঁরা নির্দেশ করতেন ভাষাশরীর বলে। ধ্রুপদি কাব্যতত্ত্বের এই প্রেক্ষাপটকে সামনে রাখলে আমরা বুঝতে পারি কেন ফার্দিনন্দ দ্য স্যোসুরে 'sign object'-কে 'arbitrary' বলেছেন।

১.০৪ : প্রাগ সাংগঠনিক চিন্তাধারার মাধ্যমে স্যোসুরের ভাষাতত্ত্ব এবং রুশ আঙ্গিকবাদ এক তাত্ত্বিক নির্মাণে সংযুক্ত হয়েছিল। কিন্তু এই সংযোগ-সম্পর্ক এবং পুনঃসূত্রায়ন সমস্তই বীজাকারে সুপ্ত ছিল রুশ আঙ্গিকবাদের মধ্যে। তাই প্রাগ-সংগঠনপন্থীদের চিন্তাধারা বা কাব্যতত্ত্ব বোঝার আগে আমাদের মুখ ফেরাতে হবে রুশ আঙ্গিকবাদে। এখানে আমরা কখনও সংক্ষেপে কখনও সূত্রাকারে রুশ আঙ্গিকবাদের স্বরূপ উদ্ঘাটিত করব।

দুটি ছোটো গোষ্ঠীর আলাপ-আলোচনা এবং রচনা থেকে রুশ আঙ্গিকবাদী সাহিত্যতত্ত্বের উদ্ভব। এদের একটি পিটার্সবার্গ-কেন্দ্রিক 'অপোইয়াজ চক্র'। এই চক্রের পুরো নাম ছিল 'The

Society for the Study of Poetic Language'। অন্যটি 'মস্কো ভাষাতাত্ত্বিক কেন্দ্র' (Moscow Linguistic Circle)। দ্বিতীয় কেন্দ্রের সদস্যরা মূলত ভাষাতত্ত্ববিদ। এঁদের লক্ষ্য ছিল ভাষাতত্ত্বকে তার সংকীর্ণ সীমা থেকে মুক্তি দিয়ে কাব্যভাষা পর্যন্ত বিস্তৃত করার দিকে। অর্থাৎ কবিতার ভাষা বিশ্লেষণে ভাষাতত্ত্বকে এঁরা করে তুলতে চাইলেন এক অমোঘ অস্ত্র। দ্বিতীয় কেন্দ্রের মধ্যমণি ছিলেন সুপরিচিত ভাষাতাত্ত্বিক রোমান ইয়াকবসন।

বিংশ শতাব্দীর শেষ দিকে বিকশিত সাংগঠনিক সাহিত্যতত্ত্বের মূলস্রোতে চেক প্রস্থান কোনো গুরুত্বপূর্ণ পরিবর্তন আনেনি। তাদের কাজে রুশ আঙ্গিকবাদীদের শেষদিককার চিন্তা চেতনারই প্রতিফলন দেখা যায়। আমরা সূত্রাকারে রুশ আঙ্গিকবাদীদের চিন্তাগুলিকে সাজিয়ে নিচ্ছি।

১. আঙ্গিকবাদীরা সাহিত্য ছাড়া সব বিষয় সম্পূর্ণ ত্যাগ করেছিলেন। ইংরেজি ও মার্কিন সমালোচনায় জীবন ও সাহিত্যের মধ্যবর্তী বিবিধ সম্পর্ক উন্মোচনের প্রয়াস নেওয়া হয়েছিল। অন্যপক্ষে আঙ্গিকবাদীরা জীবন ও সাহিত্যকে দুটি স্বতন্ত্র এবং পরিপূরক বিষয় হিসেবে দেখেছিলেন।
২. রুশ আঙ্গিকবাদীদের প্রয়াস ছিল সাহিত্যের একটি স্বতন্ত্র স্বাধীন অস্তিত্ব নির্ধারণ করা।
৩. আঙ্গিকবাদের প্রধান বিষয় ছিল, প্রকৃতপক্ষে সাহিত্য পঠনপাঠনের বিষয় কী হওয়া উচিত তা নির্ধারণ করা। কীভাবে সাহিত্য পাঠ করতে হবে তা নয়।
৪. আঙ্গিকবাদ তাই সযত্নে পরিত্যাগ করতে বলে সমস্তরকম অনুকরণবাদী এবং প্রকাশবাদী সংজ্ঞার্থকে। এমনকি সাহিত্যকর্মকে লেখকের ব্যক্তিত্বের প্রকাশ হিসেবেও তাঁরা দেখতে চান না। কেননা তাহলে স্বতন্ত্র সাহিত্যটি নয়, ঝোঁক পড়বে জীবনী বা মনস্তত্ত্বের উপর।
৫. সাহিত্যে ভাব বা idea-র অবস্থানও আঙ্গিক ঐতিহ্যে সমর্থিত নয়। তাৎপর্য আঙ্গিকবাদীদের কাছে বিশেষ সমস্যা হিসেবে দেখা দেয়নি। নিও-ক্রিটিসিজম্‌ও সাহিত্যকে ঐতিহাসিক ও জীবনীমূলক প্রেক্ষাপট থেকে পৃথক করে দেখতে চেয়েছে। কিন্তু এঁদের কাছে সাহিত্যের অস্তিত্বের অর্থ হল তাৎপর্য সঞ্চার করা। তাই এঁরা শৈল্পিক রূপ প্রকরণের যান্ত্রিক পদ্ধতিকে ব্যবহার করেন সাহিত্যের অযৌক্তিক তাৎপর্যের ঘোমটা উন্মোচনের জন্য। কিন্তু আঙ্গিকবাদীদের কাছে তাৎপর্য বা ধারণার স্থান কোথাও নাই। ইয়াকবসনের মতে, আঙ্গিকবাদীদের কাজের মর্মসার চিন্তাকে নিয়ে নয়, বাচনিক ঘটনাবলীকে নিয়ে। রুশ আঙ্গিকবাদে বিষয় (আধেয়) নয়, গুরুত্ব পায় শৈল্পিক প্রকরণ (আধার)। প্রকরণ বিষয় দ্বারা নির্ধারিত হয় না, নির্ধারিত হয় অন্যান্য প্রকরণের দ্বারা। বিষয় এবং প্রকরণের পারস্পরিক আন্তঃসম্পর্ক, বিভিন্ন প্রকরণের বিষয়ের উপর ক্রিয়া, এবং বিষয়কে বিশেষ ভাবে ব্যবহার তার বাহ্যরূপকে বদলে দেয়। এই কারণেই একই বিষয় নিয়ে শুধু প্রকরণগত পার্থক্যে গড়ে উঠতে পারে দুটি ভিন্ন কবিতা। তুলনীয় রবীন্দ্রনাথের 'বধূ' আর সুভাষ মুখোপাধ্যায়ের 'বধূ'।

বলাই বাহুল্য এই সংজ্ঞাগুলি অপূর্ব ভাবে পৃথক নয়। বরং পরস্পরের উপর নির্ভরশীল। এই সূত্রগুলির উপর নির্ভর করে আমরা সাহিত্যের আঙ্গিকবাদী সংজ্ঞাকে এভাবে চিহ্নিত করতে পারি— পৃথকত্বধর্মী বা বিপরীতমুখী অন্যান্য ঘটনার ন্যায় থেকে পৃথক একটি শৃঙ্খলার দ্বারা সাহিত্য গঠিত। 'সাহিত্য বিজ্ঞানে'র উদ্দেশ্য কোনো নির্দিষ্ট বিষয়ের অভিমুখী নয় বরং একটি পৃথকত্বের দিকে তার অগ্রগমন। এই বিজ্ঞান নিয়োজিত হবে সেই সব বিশেষ বিষয় চর্চায় যা সাহিত্যকে অন্য যে-কোনো বস্তু থেকে স্বতন্ত্র বলে নির্দেশ করবে।

১.০৫ : আঙ্গিকবাদী সাহিত্যতত্ত্বের শুরু হয়েছিল কবিতা দিয়ে এবং তারই ফলে অনিবার্যভাবে সাহিত্যগুণের স্বাতন্ত্র্যমূলক সংজ্ঞা তৈরি হয়েছে। সাধারণভাবে কবিতার ভাষার একটি বিশেষ চরিত্র তৈরি হয় প্রত্যেক দেশের সাহিত্যেই। শৈলী বিজ্ঞানীদের মতে তা 'সর্বাধিক বিচ্যুত চরিত্র' (Maximally deviant)। রুশ আঙ্গিকবাদীরাই প্রথম এই বিসারণ তত্ত্ব তৈরি করেছিলেন। রোমান ইয়াকবসন কবিতাকে বলেছিলেন 'ভাষার সুসংহত বিস্ফার'— 'organized violation of language।[৯] এই সংহত বিস্ফারকে ইয়াকবসন ভাষার মধ্যে সংগঠিত পরিকল্পিত লঙ্ঘনও বলেছেন। রুশ আঙ্গিকবাদীদের মতে প্রধান তিনটি ক্ষেত্রে এই 'সংহত বিস্ফার' সংঘটিত হয়।

ক. ধ্বনি অনুষঙ্গ।

খ. বাক্যতত্ত্ব ও ছন্দস্পন্দ।

গ. অর্থতত্ত্ব।

১.০৬ : (ক) **ধ্বনি অনুষঙ্গ** : সাধারণ কথ্যভাষায় বড়োজোর সংপ্রেষণের বা জ্ঞাপনের কাজ চলতে পারে। কিন্তু কবিতার প্রকাশক্ষমভাষা অতিসংপ্রেষণের শর্তকে মান্য করে 'প্রমুখনে'র মাধ্যমে পরিকল্পিত লঙ্ঘন বা বিস্ফার ঘটায়। চেক ভাষাবিজ্ঞানী ইয়ান মুকারোভস্কিও এই বিষয়টির উপর গুরুত্ব আরোপ করেছেন। তাঁর মতে সৌন্দর্যসৃষ্টির বিশেষ শৈল্পিক প্রকরণে কবিতার ভাষা শিষ্ট মৌখিক ভাষার আদর্শ [norm] থেকে দূরে সরে যায়। তিনি বলেছেন— "Poetic language is thus not a brand of the standard. This is not to deny the close conncetion between the two, which consists in the fact that, for poetry, the standard language is the background against which is reflected the aesthetically intentional distrotion on the linguistic components of the work, in the other words the intentional violation of the norm of the standard."[১০] আদর্শ বলতে মুকারোভস্কি মুখের ভাষার প্রচলিত বিমূর্ত রূপকেই বুঝিয়েছেন। আর সরে যাওয়ার ব্যাপারটা হল 'বিচ্যুতি' বা deviation ঘটানো। যেমন নীচের বাক্যটির শিষ্ট চলিত বাংলায় রূপ হবে এই রকম—

আমাকে	রৌদ্রের	জাদু	সুদূর	স্বপ্নের	সম্মুখে	(আর)
a	b	c	d	e	f	g
বহুদূর	থেকে	ময়ূরকণ্ঠী	মেঘ	এনে	দিত	
h	i	j	k	l	m	

কবিতায় এর বিচ্যুত ক্রম :

'রৌদ্রের	জাদু	আমাকে	সুদূর
b	c	a	d
স্বপ্নের	সম্মুখে	এনে	দিত
e	f	l	m
আর	বহুদূর	থেকে	ময়ূরকণ্ঠী
g	h	i	j
মেঘ।'[১১]			
k			

[a b c d e f (g) h i j k l m] → [b c a d e f l m g h i j k]

চেক ভাষাবিজ্ঞানীরা একেই 'বিশেষভাবে চিহ্নিত' (highly marked) ভাষা বলেছেন। কারণ এই কবিতাংশে দৈনন্দিন বাক ব্যবহারে অনুমোদিত নয় এমন শব্দবন্ধের প্রয়োগ ঘটেছে।

মুকারোভস্কি এর নাম দিয়েছিলেন 'aktualisace' ইংরেজিতে 'Foregrounding' এবং বাংলায় 'প্রমুখন'। কবিতার ভাষার কাজই হল ভাষার উপাদানগুলির সর্বোচ্চ স্তরে প্রমুখন সৃষ্টি করা—"....the function of the poetic language consists in the maximum foregrounding of utterence."[১২] যদিও স্পিৎজার মনে করেন যে কবিতা হল এক বিশেষ মানসিক উত্তেজনার ফল, আর সেই মানসিক উত্তেজনার জন্যই ভাষায় কিছু কিছু বিচ্যুতি ঘটে যায়। তাঁর ভাষায় "....a mental excitement which from the normal habitus of our normal life must have a co-ordinate linguistic deviation from normal usage."[১৩] তবু আমাদের মনে হয় 'ভাষাগত বিচ্যুতি' বা 'Lingustic deviation' শুধু মানসিক উত্তেজনারই স্বতঃস্ফূর্ত প্রকাশ নয়। বরং অনেক সময় কবি তাঁর বক্তব্যকে পাদপ্রদীপের আলোকে উদ্ভাসিত করতে চান; আর সেই চাওয়া থেকেই আসে সচেতনতা যা তাঁকে সরিয়ে দেয় দৈনন্দিন কথ্য ভাষার নির্দিষ্ট শৃঙ্খলা থেকে। ফলত যে ভাষাবোধ নিয়ে পাঠক গদ্যে লেখা প্রতিবেদন পড়েন সেই ভাষাবোধ কবিতা পাঠে ততটা সহায়ক হয় না। হয় না এই জন্যই যে কবিতায় ভাষা ব্যবহারে আছে এক ধরনের ভিন্নতা, সেই ভিন্নতাকে বুঝে নেওয়ার মধ্যেই থাকে কবিতাটির উন্মোচনের চাবিকাঠি। কবি অরুণ মিত্র এ বিষয়ে বলেন, "কোন কবি যখন তাঁর চকিত দৃষ্ট স্বপ্নালোকিত মনোজগৎকে দেখতে চান তখনই ভাষার স্বাভাবিক ও সাধারণ প্রক্রিয়াগুলোর সীমাবদ্ধতা ও অপ্রতুলতার কথা মনে হয় তাঁর। আর তখনই তাঁকে নানা অস্বাভাবিক উপায় অবলম্বন করতে হয়। এই অস্বাভাবিক প্রক্রিয়াগুলোর মধ্যে প্রধান দুটো হল বিপ্রতীপ বিন্যাস ও আপাত অসম্ভবের সাধনা।"[১৪] মুখের ভাষায় বা গদ্যের ভাষায় যা ঘটে তা ঠিক প্রমুখনের বিপরীত। প্রতিক্রিয়া। এর নাম automatization বা বিষয়বদ্ধতা। এখানে ভাষা পৃথকত্বের দাবি নিয়ে উপস্থিত হয় না পাঠকের সামনে। পাঠক সরাসরি অর্থে পৌঁছে যায়। ফলে কবিতার ভাষা যা "highly patterned or organized mode of verbal expression"[১৫] তা হয়ে উঠেছে গদ্য ভাষা থেকে বহু দূরবর্তী এক অনুপম রূপ প্রকরণ।

তবে কবিতার ভাষা গড়ে ওঠে যে সামগ্রিক ধ্বনিগত অনুষঙ্গে তা কেবল গীতিশোভন সাধারণ বাচ্য নয়। আঙ্গিকবাদীরা মনে করেন কবিতার বহুস্তরীভূত শৈল্পিক প্রকরণ রয়েছে। এই শৈল্পিক প্রকরণ উচ্চারণের উপল-বন্ধুরতা (roughening) এবং সন্নিহিত বাধার (impending) আবহ আনয়ন করে। কবিতার ভাষা সাধারণ ভাষা থেকে কেবল পরিসংখ্যানগত ভাবে পৃথক নয়, বরং আরও গুরুত্বপূর্ণ হল ব্যবহারিক ভাষায় সাধারণভাবে অবহেলিত ধ্বনি উপাদান কবিতার ভিন্ন শিল্পরূপের দ্বারা প্রমুখিত হয়।

১.০৭ : (খ) **বাক্যতত্ত্ব ও ছন্দস্পন্দ** : কবিতার ভাষায় শব্দ স্থাপনের মাত্রার তফাতে ছন্দোস্পন্দের অনিবার্য প্রভাবে এক ধরনের আততি বা tension সৃষ্টি হয়। কারণ কবিতার ভাষার অন্বয় কেবলমাত্র বাচনিক প্রকরণগুলির শৃঙ্খলানির্ভর অবস্থান নয়। অন্বয় হয়ে ওঠে উচ্চারণের অভিজ্ঞতা। আর এই উচ্চারণ নির্ভরশীল বাক্‌স্পন্দে। কবিতার প্রকাশ ঘটেছে অনেক পরে তার আগে তৈরি হচ্ছে বাক্‌স্পন্দ বা Rhythmic form। কীভাবে কবি এই স্পন্দ তৈরি করেন? তার উত্তর দিতে গিয়ে কবি-সমালোচক শঙ্খ ঘোষ বলেন, "বস্তুত প্রত্যেক

মুহূর্তেই ভাষার একটা ইতরীকরনের কাজ চলতে থাকে দেশ জুড়ে। কবির কাজ হল সেই ভাসমান স্তর ভেদ করে খুঁজে দেখা, কোথায় দেশীয় বাক্‌রীতির মৌলিক তেজ। সেখান থেকেই কবি তুলে নেবেন তার বাক্‌স্পন্দ। তাও এও একটা হাতে পেয়ে যাওয়া ফল মাত্র নয়, এ হল দুরূহ চেষ্টায় আবিষ্কার করে নেওয়া এক সামগ্রী।"[১৬]

কবিতার অন্বয়ে ধ্বনির কাজ ভাষাকে 'Patterned Energy' বা বিন্যাস শক্তির দিকে নিয়ে চলা এবং এই বিন্যাসে ভাষাকে অর্থের শৃঙ্খলা থেকে বিশৃঙ্খলায় পৌঁছে দেওয়া। এই বিশৃঙ্খলাই কবিতার শরীরে সাংগীতিক অনুরণন জাগিয়ে তোলে। স্বরপ্রক্রম বাক্‌স্পন্দে গতির ভিতর যে বিরাম বা যতি তৈরি করে তাই কবিতার ভাষায় উচ্চারণ শক্তিকে বিন্যাস শক্তিতে সংবর্তিত করে দেয়। কবিতা যখন অন্বয়কে ভেঙে-চুরে নতুন অন্বয় গড়ে তখন তার পিছনে কবির একটি বিশেষ উদ্দেশ্য ক্রিয়াশীল থাকে।

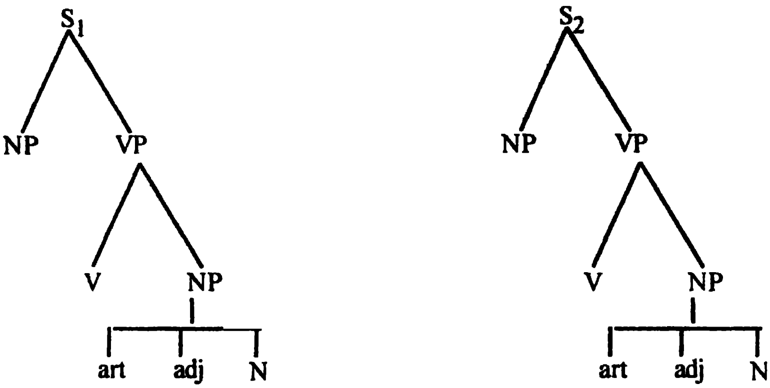
কবিতার ভাষা মূর্ত প্রত্যক্ষ ভাষা। গদ্যের মতো তা meta-language নয়। তাই তার সর্বক্ষণের জন্য নির্দিষ্ট বিন্যাস বা অন্বয় নেই। কেননা কবিতাতে ভাষা কেবল প্রকাশ মাধ্যম নয় বরং শেষ পর্যন্ত কবিতাই ভাষাকে নতুন করে সৃষ্টি করে নেয়। টি. ই. হিউম তাঁর ১৯২৪ সালে প্রকাশিত *Speculation* বইতে স্পষ্ট করে বলে দেন— "মূর্ত বস্তু কতগুলি ভাষাতাত্ত্বিক চিহ্নের [Linguistic Sign] সাহায্যে অভিব্যক্ত হয় গদ্য ভাষায়। যেমন প্রক্রিয়া দেখা যায় বীজগণিতেও। এদের উভয়কেই মানতে হয় নির্দিষ্ট গাণিতিক শৃঙ্খলা। কিন্তু উভয়েই থেকে যায় অপ্রত্যক্ষ অস্তিত্বে। প্রত্যেকটি নির্দিষ্ট অবস্থার জন্য গদ্যভাষার শব্দসজ্জা নির্দিষ্ট এবং তা বীজগণিতের function-এর মতোই চলতা ধর্মকে আশ্রয় করে অন্য বিন্যাসে সংবর্তিত হতে পারে। শুধু x ও y জাতীয় চিহ্নগুলি মূর্ত বস্তুর বিকল্পে ব্যবহৃত হয়, শেষে সেই বস্তুগুলির সঙ্গে চিহ্নগুলিকে সম্পর্কান্বিত করতে পারলেই হল।" কিন্তু কবিতার এই মূর্ত বস্তুকে চিহ্নিত করার দায় নেই। কারণ কবিতার ভাষা কোনো 'Counter Language' নয়, এ এক মূর্ত, প্রত্যক্ষ ভাষা। হিউম সংগত কারণেই বলেন, "Syntax assists explanation, but explanation is unfolding, and intensive manifolds, which should be poetry's main concern, cannot be unfolded ; hence it appears that syntax is out of place in poetry." আসলে অন্বয় বা extensive manifold-এর প্রকাশ উপরিতলে, সেখানে গদ্যের ছাপ। কিন্তু কবিতা রয়েছে 'intensive manifold'-এর অন্তর্মুখিনতায়। যা আমাদের intuition-এর জগৎটাকে খুলে দিচ্ছে পরতে পরতে। হয়ে উঠেছে পুরোপুরি অনির্ণেয় জগৎ। অর্থাৎ কবিতার ভাষায় রয়েছে এমন এক pattern বা বিন্যাস যা উপরিতলের অন্বয়ের কাঠামোকে আশ্রয় করেই গড়ে ওঠে। তবে সে অন্বয়ের কাঠামো সাধারণ গদ্য ভাষা নয়, এ এমন এক ভাষা যাকে চেক ভাষাবিজ্ঞানীরা বলেছিলেন, "highly marked language" বা বিশেষভাবে চিহ্নিত ভাষা। তবে সে ভাষা নির্মাণেই তার ক্রিয়াশীলতা শেষ নয়। শেষ পর্যন্ত তা অন্বয়ের জগৎকে ভেঙে এক অন্য জগতে পৌঁছে দেয় আমাদের।

১.০৮ : সাধারণভাবে মনে হতে পারে প্যাটার্ন-এর অর্থ ভাষায় আবর্তিত পরিকল্পমাত্র। বা ভাষিক উপাদানের সম আবর্তন। যে উপাদান ধ্বনিগত, অন্বয়গত বা পদগুচ্ছ সংগঠনগত যাই হোক না কেন তার আবর্তিত রূপ। যেমন—

বাক্য ১. we are the hollow men.

বাক্য ২. we are the stuffed men.[১৭]

দুটি বাক্যের পরিকল্প সমান্তরাল। অধিগঠনে সাজালে বৃক্ষচিত্রটি দাঁড়ায়—



এদের কিন্তু সৌন্দর্যতত্ত্বের বিচারে pattern বা সজ্জা বলা উচিত হবে না। প্যাটার্ন হচ্ছে 'imposition of an intellectual form on sensuous body.' কবিতার body বা শরীর হচ্ছে meaning, অর্থযুক্ত ভাষার নিরূপিত সজ্জাই প্যাটার্নে পৌঁছে যায়। যেমন এই কবিতাংশটির ক্ষেত্রে—

তোমার কোন বন্ধু নেই তোমার কোন বৃত্তি নেই
কেবল বন্ধন
তোমার কোন ভিত্তি নেই তোমার কোন শীর্ষ নেই
কেবল তক্ষক
তোমার কোন নৌকা নেই তোমার কোন বৈঠা নেই
কেবল ব্যাপ্তি
তোমার কোন উৎস নেই তোমার কোন ক্ষান্তি নেই
কেবল ছন্দ।[১৮]

এই কবিতায় সমান্তরতাই নিয়ন্ত্রক শক্তি। প্যাটার্ন গড়া হয়েছে সেই নিয়ামককে কেন্দ্র করে। যেমন :

x		a_1b	x	y_1b
	c_1			
x		a_2b	x	y_2b
	c_2			
x		a_3b	x	y_3b
	c_3			
x		a_4b	x	y_4b
	c_4			

একই ধরনের এই আবর্তনই কবিতার ভারসাম্যকে বজায় রেখেছে। এই ভারসাম্যই তাকে পৌঁছে দিচ্ছে 'sensuous body' অর্থাৎ অর্থে। সেখানে স্বজনহীন, বৃত্তিহীন, ভিত্তিহীন,

মস্তিষ্কহীন, চলতাহীন, উৎসহীন এক জীবনবোধের মধ্য থেকেই তৈরি হচ্ছে বন্ধন থেকে ব্যাপ্তি ও ব্যাপ্তি থেকে ছন্দে। আর সেই ছন্দই শেষ পর্যন্ত হয়ে উঠেছে একটি পূর্ণ সত্তার জাগরণ। এখানে pattern হয়ে উঠেছে, 'representation of reality in art'—তা সমগ্র কবিতা থেকে বিচ্ছিন্ন ভাষাতাত্ত্বিক পরিকল্প মাত্র নয়। বরং ভাষাতাত্ত্বিক পরিকল্পটি এখানে প্যাটার্নে রূপান্তরিত হয়েছে কেননা তা কবিতার অন্তর্গত সংগঠনের অঙ্গ হয়ে গেছে।

গদ্যের অন্বয়ও সংগীতে উপনীত হয় তখনই যখন সেই অন্বয়ের যৌক্তিক শৃঙ্খলাকে ভেঙে কবি pattern বা সজ্জা তৈরি করেন। তখনই তা চলে যেতে পারে অতি সংপ্রেষণের বহুতলিক ব্যঞ্জনার জগতে। এবং সেই গদ্য ভাষা সাধারণ গদ্য ভাষা থেকে তৈরি করে তার পৃথকত্বের মাত্রা। আসলে অন্বয় নির্দিষ্ট গদ্যভাষার মূল লক্ষ্য Communication বা সংপ্রেষণ। তাই তার pattern-নিরূপিত রূপ গড়ে ওঠে না। কিন্তু কবিতার ভাষা Extra-Communication বা অতি-সংপ্রেষণ, যার ধর্ম সে ধ্বনির আবর্তেই তৈরি করে নেয় pattern। পাউন্ডের কাছে তাই কবিতা ভাষাও নয় অর্থও নয় 'pattern made visible by the language.'[১৯] 'Inscape' বা প্যাটার্ন-বিশ্ব নিয়ে পাউন্ডের আগেই ভেবেছিলেন হপকিন্স। কবিতা আমাদের কোথায় পৌঁছে দেয়— এই ভাবনা থেকে হপকিন্স পৌঁছে ছিলেন এই সিদ্ধান্তে যে কবিতা আমাদের পৌঁছে দেয় 'inscape' বা প্যাটার্নের জগতে। "...what strikes me most of all in music and design in painting, so design, pattern or what I am in the habit of calling 'inscape' is what above all aim at in poetry."[২০]

বাক্যতত্ত্ব সাধারণ বিমূর্ত কথ্য ভাষার তীব্রতা নির্ধারণ করে এবং ছন্দস্পন্দ কবিতায় দ্বিতীয় এক নির্ধারণ নীতি তৈরি করে। কবিতাকে সামগ্রিকভাবে বোঝার ক্ষেত্রে এই দ্বৈত নীতির কার্যকারিতা রয়েছে। কারণ কথ্য ভাষাকে হিসেবের মধ্যে না ধরলে কবিতা বিশ্লেষণ করা অসম্ভব হয়ে ওঠে। কারণ সেক্ষেত্রে সাধারণ বাচ্য থেকে সাংগীতিক প্রতিভাসে উত্তীর্ণ কবিতার সংবর্তন উপেক্ষা করতে হয়। তেমনই কবিতার নিজস্ব আয়ামকে অস্বীকার করলে সাধারণ ভাষার শব্দে লুকিয়ে থাকা অজস্র বাচনিক সম্পর্কের মধ্যে যে কাব্যিক সত্যরূপটি রয়েছে তাকে অস্বীকার করা হবে। কাজেই এখানে আবার জোর দেওয়া হচ্ছে কবিতা ও বিমূর্ত কথ্য ভাষার প্রভেদের উপর। এবং তাদের সংযোগ সম্বন্ধের উপরেও।

১.০৯ : (গ) **অর্থতত্ত্ব** : কবিতা বিমূর্ত কথ্যভাষার অর্থতত্ত্বকে অস্বীকার করতে চায়। অতি সংপ্রেষণের বহুস্তরীভূত জগতে, তাকে পেরিয়ে চলে যেতে চায়। কোনো শব্দের একাধিক অর্থকে পর্যায়ক্রমে নয় যুগপৎ দ্যোতিতকরণের মাধ্যমে কবিতার ভাষা সাধারণ ভাষা থেকে পৃথক হয়ে ওঠে। এ প্রকরণ সংপ্রেষণের পরিপন্থী। সংপ্রেষণ শব্দের দ্ব্যর্থহীনতার উপর নির্ভরশীল। ফলত শব্দের একটি মাত্র অর্থই দাঁড়িয়ে যায়। একটি উদাহরণ নিলেই আমাদের বক্তব্য স্পষ্ট হয়ে উঠবে। রবীন্দ্রনাথের *বলাকা*-র ৩৬ নং কবিতার প্রথমাংশে যেখানে রবীন্দ্রনাথ বলেন— "সন্ধ্যারাগে ঝিলিমিলি ঝিলমের স্রোতখানি বাঁকা/আঁধারে মলিন হল যেন খাপে ঢাকা/বাঁকা তলোয়ার ;"[২১] সেখানে উৎপ্রেক্ষা থেকে মুক্ত করলে এই কবিতাংশটিতে অর্থের ভূমিকাই প্রধান হয়ে ওঠে। কারণ একটি নির্দিষ্ট সংবাদ জানানোর মাধ্যমে জ্ঞাপনের মাত্রাতেই লগ্ন হচ্ছে তা। এই অংশের ভাষা আমাদের প্রাত্যহিকতার সঙ্গে সম্পৃক্ত। এখানে কাব্য মূলত সংবাদ। কিন্তু কবিতা যখন পৌঁছে যায় "পর্বত চাহিল হতে বৈশাখের নিরুদ্দেশ মেঘ ;/তরুশ্রেণী চাহে, পাখা মেলি/মাটির বন্ধন ফেলি/ওই শব্দরেখা ধরে চকিতে হইতে দিশাহারা,/আকাশের খুঁজিতে কিনারা।"[২২] তখনই তৈরি হয়ে যায় ধাঁধা। এই ভাষা তো আমার প্রতিদিনের বহতা জীবনের

চর্যার সঙ্গে লগ্ন হতে পারছে না। কারণ যাকে আমরা অর্থ বলি অর্থাৎ যা ধ্বনির সঙ্গে বস্তুর পারস্পরিক সম্পর্ক [one-one corespondence] তৈরি করে হয়ে ওঠে অভিধেয়বান, এখানে সেই প্রার্থিত অর্থে উপনীত হবার উপায় নেই। এখানে ভাষা দিয়ে তৈরি ছবিগুলি আমার প্রতি-দিনের বহতা জীবনের চর্যার সঙ্গে লগ্ন নয়। ধ্বনিতে বাণীতে মিলে মিশে তৈরি হয়ে ওঠা গতির ধারণাকে কেবল অনুভব করা যায়, জ্ঞাপিত করা যায় না। গদ্য এখানে 'highly marked language'। অল্পমাত্র কথাকে আশ্রয় করে এই যে অনুভব তা অনেকটা ধ্রুপদি সংগীতের মতো ; চেতনায় সঞ্চারিত হয়ে যাওয়াই যার ধর্ম। এ সঞ্চরণ জ্ঞাপন থেকে অতিজ্ঞাপনের জগতে। আসলে শুদ্ধ কবিতা যা 'না কথায়' পৌঁছোয়, সে তো যাত্রা শুরু করে কথাবিশ্ব থেকেই। কেবল একটি লক্ষ্যকে সামনে রেখে তার পথ চলা। সে উদ্দেশ্য ভাবের পরমতায় পৌঁছোনোর মধ্যে নিহিত। এভাবে শব্দ যখনই কবিতার পঙ্‌ক্তিতে স্থান লাভ করে তখন সে তার সাধারণ তাৎপর্য হারিয়ে ফেলে তার পরিচিত অবস্থান থেকে বেরিয়ে আসে এবং এক নতুন তাৎপর্য-আবহে মণ্ডিত হয়ে ওঠে। একে এম্পসন-কৃত দ্ব্যর্থকতা বা উইমসাট্-কৃত কূটাভাস বলে মনে করা ভুল হবে। কারণ এম্পসন এক অর্থকে ছেড়ে আর এক অর্থে পৌঁছোতে চেয়েছেন। আঙ্গিকবাদীদের কাছে কবিতার অর্থ তাৎপর্য— অর্থহীন। সাধারণ অর্থতত্ত্বকে অগ্রাহ্য করে তাঁরা কবিতাকে বিমূর্ত কথ্য ভাষা থেকে পৃথক করতে চান। পৌঁছোতে চান অতিসংপ্রেষণের বহুস্তরীভূত জগতে। অর্থতত্ত্বসহ তাঁরা প্রতি স্তরেই কবিতার ভাষাকে ব্যবহারিক ভাষা থেকে পৃথক হিসেবে সংজ্ঞায়িত করেন।

২.০০ : ১৯২৯ সালে প্রাগে 'Prague Linguistic Circle' একটি সম্মেলন অনুষ্ঠিত করে। এই সম্মেলনে পঠিত প্রবন্ধাবলীর মধ্যেই রয়েছে প্রাগ ভাষাতাত্ত্বিক প্রস্থানের সূত্রগুলি। এই সম্মেলনে পঠিত প্রবন্ধে মুকারোভস্কি ভাষা ও সাহিত্য সম্পর্কিত বক্তব্যে জোর দেন 'সংগঠন' এবং 'সাংগঠনিক' শব্দ দুটির উপর। তাঁর মতে ভাষাবিজ্ঞানের চর্চিত বিষয় হওয়া উচিত ভাষিক পদ্ধতিগুলির সাংগঠনিক সূত্রাদি অর্থাৎ ভাষায় ন্যস্ত বিভিন্ন উপাদানের পারস্পরিক সম্পর্ক বিষয়ে চর্চা। কবিতাকেও সংগঠন হিসেবে গণ্য করতে হবে। কারণ কবিতার বিভিন্ন উপাদানকেও সমগ্র থেকে বিচ্ছিন্ন করে অনুধাবন করা যায় না। 'সংগঠন' যতক্ষণ পর্যন্ত ভাষার সঙ্গে সম্পর্কিত ততক্ষণ তা স্যোসুরের সম্পর্ক-বিষয়ক ধারণার বিকল্প মাত্র। আসলে 'সংগঠন' হল সম্পর্কের একটি বিন্যাস বা সামগ্রিকতা। প্রাগ সংগঠনপন্থী প্রস্থানে কবিতাচর্চায় আঙ্গিকবাদের 'প্রকরণ' এবং শৈল্পিক প্রকরণকে প্রতিস্থাপিত করেছে সংগঠন। আঙ্গিকবাদের শৈল্পিক প্রকরণ [বিষয়ের চেয়ে যা মুখ্য] এবং প্রচলিত অর্থে প্রকরণ এই উভয় ধারণার চাইতে সংগঠনের ধারণা বৃহত্তর। যে সমস্ত বিষয় প্রাত্যহিক পরিচয়হীন [defamiliaresed] এবং যে বিষয়গুলি অপরিচিত নয় সেগুলি এবং ধ্বনি থেকে শুরু করে বিষয়বস্তু পর্যন্ত— সাহিত্য কর্মের সমস্ত বিষয়ই সংগঠনের অন্তর্ভুক্ত। সংগঠন হিসেবে কোনো সাহিত্যকর্ম যখন সংজ্ঞায়িত হয় তখন একে দেখা হয় স্যোসুরীয় চিহ্ন সমূহের এমন একটি সন্নিবেশ হিসেবে যেখানে ধ্বনি প্রতীক [দ্যোতক/signifier] এবং ধারণা [দ্যোতিত/signified] উভয়ে নিয়ন্ত্রিত হয় বিবিধ সম্পর্কের একটি একক জটিল পদ্ধতি দ্বারা। প্রকরণ সম্পর্কে সনাতন ধারণা এবং শৈল্পিক প্রকরণ সম্পর্কে আঙ্গিকবাদীদের বক্তব্যের বিপক্ষে এই প্রস্থানে আমাদের দৃষ্টি আকর্ষিত হয় সংগঠনের ধারণায়। যেখানে সাহিত্যকর্মের সমগ্রতার সঙ্গে এর উপাদানগুলির গঠনের প্রতিও ঝোঁক পড়েছে। ফলত কোনো সাহিত্যকর্মের মধ্যে স্থিত সম্পর্কসমূহের সামগ্রিকতাই হয়ে ওঠে সাহিত্যকর্মটির সংগঠন। কবিতা সম্পর্কেও এই একই বক্তব্য প্রযোজ্য।

২.০১ : কবিতার ভাষায় ধ্বনির ভূমিকা নিয়ে মুকারোভস্কি বিস্তৃত আলোচনা করেছেন। তাঁর বক্তব্যকে আমরা সংক্ষেপে বিবৃত করব। কারণ প্রাগপন্থীদের ধ্বনি ভাবনাই ধ্বনির নন্দনতত্ত্বের পূর্বসূত্র হিসেবে সাংগঠনিক সমালোচনায় পরবর্তীকালে ব্যবহৃত হয়েছে। এবং এই চিন্তন ধ্রুপদি ধ্বনিভাবনার সঙ্গেও গড়ে তুলেছে তার সংযোগসূত্রটি।

ক. মুকারোভস্কি-র মতে কবিতার ভাষা সর্বদা আলংকারিক প্রকাশমাত্র নয়। বরং কতগুলি পর্যায়ে এর মধ্যে Expression content এবং Linguistic expression-এর দ্বিধাভক্তির চরিত্রলক্ষণ দেখা যায়। আবার কখনও এই দুই উপাদান তাদের স্বতন্ত্র সত্তা ত্যাগ করে সমন্বিত হয়, হয়ে ওঠে কবিতার বাচনিক প্রকাশের চরিত্রগত লক্ষণ।

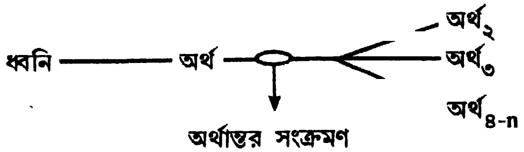
খ. ধ্রুপদি যুগের কবিরা কবিতার ভাষা থেকে মুছে ফেলতে চাইতেন চরিত্রগত স্বাতন্ত্র্যের চিহ্নকে। ব্যক্তিগত উদ্ভাবনের সীমায়িতকরণের এই চেষ্টায় সব কবিই ব্যবহার করতেন কতগুলি বিশেষ শব্দ ও ছবি। এর লক্ষ্যমাত্রা হল কবিতার ভাষার বিমূর্তায়ন। "poetic language avoids individuality of expression. Thus for instance, in periods of classicism it is usually established which words, indeed even which in ages, can be used in poetry in order to limit individual invention."[২৩] রবীন্দ্রনাথও প্রায় একই ধরনের কথা বলেছিলেন— "যে সাধু সাহিত্য একদা আমাদের দেশে প্রচলিত ছিল তাতে ব্যক্তির বর্ণনা ছিল শিষ্ট সাহিত্যে প্রথাসম্মত, শ্রেণীগত। তখন ছিল কুমুদকহ্লার শোভিত সরোবর, যুথীজাতি, মল্লিকা মালতী বিকশিত বসন্ত ঋতু। তখনকার সকল সুন্দরীরই গমন গজেন্দ্রগমন, তাদের অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ বিম্ব-দাড়িম্ব সুমেরুর বাঁধা ছাঁদে। শ্রেণী কুহেলিকার মধ্যে ব্যক্তি অদৃশ্য।"[২৪] কাব্যিক অলংকারের প্রাতিস্বিকতাও প্রভাবিত হত পূর্বনির্দিষ্ট কতগুলি সূত্রের সাহায্যে।

গ. কিন্তু মুকারোভস্কির মতে কোনো একটা বিশেষ উপকরণ কবি-ভাষার স্থায়ী লক্ষণ হতে পারেনা। ক্রিয়াত্মকতা দিয়েই কবি-ভাষা হয় চিহ্নিত : "poetic language is permanently characterized only by its function."[২৫] কবিতার ভাষায় ব্যবহৃত উপকরণগুলিই ক্রিয়াত্মক নয়, তাদের ব্যবহারের বৈশিষ্ট্য হল 'ক্রিয়া'।

ঘ. তাঁর মতে কাব্যিক সত্যের উদ্দেশ্যই হল নান্দনিক সত্যে পৌঁছোনো। এবং যে নান্দনিক ক্রিয়া কবিতার ভাষাকে নিয়ন্ত্রিত করে, তা আসলে ভাষিক চিহ্নগুলির শ্রেণিকরণ এবং সাংগঠনিক কর্ম। এই ভাষিক চিহ্নের উপস্থিতিই সাধারণ সংবাদের ভাষা থেকে কবিতার ভাষাকে পৃথক করে। সাধারণ সংবাদের ভাষা যাকে আমরা Statement বলছি সেখানে ধ্বনি এবং অর্থের সম্পর্ক প্রত্যক্ষ। প্রত্যেকটি ধ্বনির (expression aspect) সেখানে একটি মাত্র নির্দিষ্ট অর্থ (content aspect) থাকে। অর্থাৎ এখানে—

ধ্বনি : অর্থ = 1 : 1

কবিতার শরীরে অস্তিত্ববান ধ্বনি একটি মাত্র অর্থের দ্যোতনা করে না। সেখানে ধ্বনির বা 'experssion aspect'টির সরাসরি অর্থ বোঝানোর ক্ষমতা থাকলেও তা অর্থান্তরে সংক্রমিত হয়ে বহুতলিক ব্যঞ্জনার সৃষ্টি করে। রেখাচিত্রে বিষয়টা অনেকটা এই রকম।—



অর্থাৎ এখানে, ধ্বনি : অর্থ = 1 : n

এই কারণে মুকারোভস্কি বলেন : "Aesthetic effect is the goal of poetic expression. However, the aesthetic function, which thus dominates in poetic language (being only a concomitant phenomenon in other functional languages), concentrates attention on the linguistic sign itself— hence it exactly the opposite of a real orientation towards the expression itself."[২৬] তাই প্রকাশই নান্দনিক বোধে পৌঁছোনোর অন্যতম শর্ত হয়ে ওঠে। এবং তা প্রতি মুহূর্তেই সংপ্রেষণের মাত্রা থেকে দূরে সরে যায়। ফলত ভাষার যৌক্তিকক্রম এবং নান্দনিক ক্রমের মধ্যে স্পষ্টতই একটি বিভেদ রেখা চিহ্নিত হয়।

ঙ. ভাষিক চিহ্ন অনুযায়ী উপাদানগুলিকে তিনি দুটি শ্রেণিতে বিন্যস্ত করেছেন। প্রথম শ্রেণিতে রেখেছেন সেই উপাদানগুলিকে যেগুলি ইন্দ্রিয়সংবেদ্য অনুভূতির দ্বারা বোধগম্য হয় (কিন্তু যদিও সেগুলি নিঃশর্তভাবে সংগঠিত হয় না)। সুতরাং সেগুলি হচ্ছে এমন এক বাস্তবতা যা ভাষিক চিহ্নের বিমূর্ত অর্থের বহনকারী। স্যোসুরেই প্রথম ভাষিক চিহ্নের মৌলিক কাঠামো নির্ধারণ করেন এবং তাদের বলেন 'signified', একে 'phonological component' বলা যায়। কিন্তু সমগ্র কবিকর্মকেই এই phonological component-এর পরিসীমাতে ধরা যায় না। কবির ভাষার মধ্যে তার অতিরিক্তও কিছু থেকে যায়, যেমন চিহ্ন— "phonological component does not exhaust the entire range of the sound aspect of poetic language which also includs components not belonging to the phonological system e. g. timber."[২৭] দ্বিতীয় শ্রেণিতে তিনি রেখেছেন সেই সব উপকরণগুলি যার মধ্যে মৌল ইন্দ্রিয়গম্যতা নেই। এগুলি শব্দার্থগত উপাদান। স্যোসুরে এগুলির জন্য 'signifier' পরিভাষাটি ব্যবহার করেন। এই দুটি ধারণা অবশ্য পারস্পরিক। Sound Component- এর মধ্যেই তার semantic nature-টি রয়ে গেছে।

চ. স্যোসুরে এই ভাষিক চিহ্নের অর্ন্তগঠনকে আবিষ্কার করে কাব্যতত্ত্বের পথকে উন্মুক্ত করে দিয়েছেন। এর ফলে কবিতার অধ্যয়ন চিরকালের জন্য উন্মুক্ত হয়ে গেল এই অসংগত সংস্কার থেকে যে কবিতা সবসময় শ্রবণজাত অনুভূতির উপর নির্ভর করে। "Above all, the study of poetry was forever after freed from an unjustified belief in the direct dependence of the poetic work on an acoustic realization."[২৮] এমনও কবি আছেন যাঁদের মনের মধ্যে লিখিত অনুচ্চারিত কবিতার অস্তিত্ব থাকে। "there are poets (not only readers) in whose minds a written, not spoken work has its existence."[২৯] ফলত কবিকৃতি অস্পর্শিত থাকে দুটি বিষয় থেকে— প্রথমত বাস্তবের সার্বত্রিক সম্পর্ক থেকে, যে বাস্তব বিষয় দ্বারাই প্রকাশিত হয় এবং দ্বিতীয়ত লেখক-পাঠকের সংশয়হীন মানসিক ক্রিয়া-নির্ভরতা থেকে অর্থাৎ জ্ঞাপনের মাত্রা থেকে। "The poetic work was untangled both from a too unequivocal connection with the reality expressed by its content and from an unambiguous dependence upon the mental processes of the authore and the reader."[৩০] তাই কবিতা বিচারে ঝোঁক পড়ল কবিতার অন্তর্গঠনের উপর বিষয় বিবিক্ত হয়ে।

কাব্যভাষার একটা বড়ো অংশ বা উপাদান ধ্বনি এবং অর্থের সঙ্গে ধ্বনিকে মিলিয়ে দেওয়া ঠিক নয়। কারণ Sound Aspect-টি Subjective নয় Objective সংঘটনা। তা আবৃত্তিকার এবং অর্থবিষয় নিরপেক্ষ।

২.০২ : মুকারোভস্কি-র এই নন্দন চিন্তাকে প্রতি-প্রশ্নের সামনে দাঁড় করিয়ে দেন কোনো কোনো সমালোচক। "মুকারোভস্কির এই কথা আজ সম্পূর্ণই মানা চলে কিনা সন্দেহ। ইলিয়াস, শোয়ার্টস [Elias Schwarts] নামে সমালোচক তাঁর একটি বইয়ে [*The forms of Félling*, 1972, New York, London (National University Publications) pp.–20-28] খুব জোরালো একটি দৃষ্টান্ত উপস্থাপিত করেছেন। তিনি রবার্ট ফ্রস্ট-এর সেই বিখ্যাত "Stoping by the Woods" কবিতাটি তুলে বলেছেন, এর ভাষায় এমন কী আছে যা শুধু ভাষাতে আমাদের আটকে রাখতে পারে? কিছুই না। কেবল প্রথম লাইনে (Whose woods are these I think I know) একটি বিপর্যাস আছে। তা ছাড়া দেখি, লাইনগুলি ছন্দে বাঁধা— কিন্তু কবিতার ভাষা হিসেবে এর ভাষায় তো কোনো চমৎকারিত্ব বা মনোহারিত্ব নেই। কাজেই ভাষা নয়, কবিতার পুরো সংগঠন, তার ছন্দ, তার প্রতীকিতা (এখানে যেমন একটি মৃত্যুর গভীর প্রচ্ছায়া অনুভব করা যায়), তার অভিজ্ঞতা ও অনুভব— সব মিলিয়েই কবিতাটি কবিতা হয়ে ওঠে। ভাষা বাহনের কাজ করে এবং ভাষার প্রয়োগের পিছনে থাকে আদিম ও মৌলিক প্রেরণা ভাবের বা অর্থের। কাজেই মুকারোভস্কির লক্ষণ নির্ণয় কেবল বাইরের দিক থেকে, ভিতরের বা সৃষ্টির দিক থেকে নয়। কোনো কবি সচেতনভাবে norm থেকে সরে আসার চেষ্টা করেন বলে তাঁর কবিতা কবিতা হয় না; তাঁর কবিতা কবিতা হয়ে ওঠার পর দরকার মতো norm থেকে সরে যায় মাত্র।"[৩১]

২.০৩ : কিন্তু আমাদের বক্তব্য হল প্রথমত ভাষা ভাবের বাহন হয়ে ওঠে বিষয়-ভিত্তিক সমালোচনায়। সেখানে বিষয় সাপেক্ষে ভাষা বিশ্লেষিত হতে থাকে। কিন্তু মুকারোভস্কির আলোচনা বিষয় বা বস্তুতাকেন্দ্রিক নয় বরং একান্ত ভাবেই ভাষাতাত্ত্বিক। সাংগঠনিক। এই দৃষ্টিকোণে ভাষা সাপেক্ষেই বিষয়টি বিশ্লেষিত হয়। ভাষারই এখানে সর্বাতিশায়ী প্রাধান্য। বিষয়ের প্রাধান্য প্রভূত্ব অনেক কম। বিষয়ভিত্তিক আলোচনায় প্রকল্পটি দাঁড়িয়েছে বিষয় → ভাষা। সাংগঠনিক আলোচনায় যা ভাষা → বিষয়। এখানে বিষয়ের প্রশ্ন শুধু নগণ্যতা কেন্দ্রিক নয়; বিষয়ের ভাষায় বিগলন, শিল্পের শিল্প হয়ে ওঠার মৌল শর্ত। অর্থাৎ ভাষার বাইরে শিল্পের কোনো অস্তিত্ব নেই।

দ্বিতীয়ত বিষয়ভিত্তিক সমালোচনায় জ্ঞাপনই অন্তিম প্রার্থিত লক্ষ্য। মুকারোভস্কির কাব্য সমালোচনার বীজ ধ্রুপদি নন্দনতত্ত্বের মাটিতে গভীরভাবে প্রোথিত। অভিজ্ঞাপনই সেখানে কবিতার একমাত্র উদ্দেশ্য। তাই এখানে ভাষার আলোচনাই মুখ্য হয়ে ওঠে। কারণ একথা সত্যি যে শিল্পীমাত্রই বাস্তবকে ভেঙেচুরে উপস্থাপিত করেন। যে শিল্প বা কবিতা বাস্তবের হুবহু প্রতিকৃতি (x = x যেখানে) তা শিল্প নয়। [স্মরণীয় বুচার তাই 'মাইমেসিস'কে 'a creative art' বলেছেন।] কবির মনে দৃশ্যমান বস্তুর দ্রুত অপসৃয়মান অস্তিত্বের যে রূপটি আবেদন জাগাল সে আবেদন, সে অনুভূতির একটা নির্দিষ্ট তাড়না আছে, তার মধ্যে সংজ্ঞাতীত রূপের একটা আভাস আছে, যা ক্রমাগত কবির চেতনায় আঘাত হানে। খাঁটি কবি সে অনুভূতির অবয়বহীনতা থেকে মহৎ ভাস্করের মতো ঈপ্সিত অবয়বটিকে খোদাই করে নেবেন ঠিকই, কিন্তু ভাষার অনুভূতিকে সংহত করতে গিয়ে তিনি প্রয়োজন মতো বাস্তবের এবং ভাষারও স্বাভাবিক ক্রমের ভাঙচুর করবেন এটাই নিয়ম। টিলিয়ার্ডও স্বীকার করেছেন যে সোজা কবিতা আসলে কবিতাই নয়। "The terms 'direct' and 'oblique' poetry are false contrast. All poetry is more or less oblique : there is no direct poetry."[৩২] অর্থাৎ বাক্যকে না-

বাঁকিয়ে কাব্য করা যায় না। *এই ভাঙচুর এই বক্রতাকে নিয়ন্ত্রণ করে কবিতার শরীরে* অস্তিত্ববান ধ্বনির বিন্যাস। কারণ ধ্বনিরই একমাত্র শক্তি আছে সংবর্তিত হওয়ার, অর্থের নয়। সরস্বতীর মানবী রূপে আমরা মুগ্ধ হই ঠিকই; কিন্তু তাকে শিল্পী গড়েছেন মানবীর চেয়ে একটু বেশি সুষমা দিয়ে। এটা যেমন ভাঙচুর বা নন্দনতত্ত্বের পরিভাষায় 'ডিস্টরশন'; তেমনই মোজেসের মাথায় মিকেলাঞ্জেলা যে দুটি শিং বসিয়েছেন কল্পনার রং চড়িয়ে শিল্পতত্ত্বের পরিভাষায় তাও 'ডিস্টরশন'। ধ্বনির অর্থের দিকে অগ্রসরতা বা পশ্চাদপসরণও 'ডিস্টরশন'। লক্ষ্য একটাই union বা মিলন। এই 'ডিস্টরশন' ছাড়া কবির কবিতা সার্থক হতে পারে না।

ফলত কবিকে ভাঙচুরের জন্য সচেতন ভাবেই নর্ম থেকে সরে যেতে হয়। সেখানে অসচেতনতা বা স্বতঃস্ফূর্ততার ধারণা যুক্তিহীন। আবছা-অস্পষ্ট। তাই মুকারোভস্কির কাব্যতত্ত্বের দার্শনিক ভিত্তিভূমির উপর নজর না দিয়ে তাঁর সমালোচনা করলে তাঁর উপর অবিচারই করা হবে।

তৃতীয়ত মুকারোভস্কির সংগঠন চিন্তা একান্তভাবেই objective সেখানে বিষয়কেন্দ্রিকতা বা subjectivity প্রত্যাশিত নয়। আর subject-object এই দুই বিপ্রতীপ বিন্দুকে একসঙ্গে মেলাতে গেলে যে দার্শনিক প্রস্থান থেকেই ছিন্ন হয়ে যেতে হয়। যেভাবে শিকড় হারিয়ে ফেলেন র‍্যোম্যান্টিক কাব্যতাত্ত্বিকরা। কারণ রোমান্টিক কাব্যতত্ত্বের প্রথম উদ্‌গাতা কান্ট বস্তুতা নয় শিল্পবিচারে 'রূপ'-এর উপরেই বলেছিলেন নির্ভরশীল থাকতে, অথচ রোমান্টিকরা গুরুত্ব দেন বিষয়ের উপরেই। আবার তাঁরাই তাঁদের শিল্পকর্মের সমর্থনে 'শিল্প শিল্পের জন্য' (art for art's sake) এই আপ্ত বাক্যটি যে প্রচার করেন তাও তো এক নিরর্থক শূন্যতায় পর্যবসিত হয়; সামাজিক মঙ্গলময়তার সঙ্গে অনাবশ্যক সংযুক্তিকরণের দ্বারা। স্মরণীয় শেলি বলেছিলেন, "poets are unacknowledge legisletor of world" এই 'legisletor' শব্দটির মধ্যেই তো নীতি নিয়মের কথা আছে। রবীন্দ্রনাথও ১৯৩৩ সালের পৌষমাসে প্রকাশিত 'সৌন্দর্যবোধ' প্রবন্ধে জানালেন "সৌন্দর্যমূর্তিই মঙ্গলের পূর্ণ মূর্তি এবং মঙ্গল মূর্তিই সৌন্দর্যের পূর্ণ স্বরূপ।" অথচ সৌন্দর্যের কাছে সামাজিক মঙ্গল অমঙ্গলের কোনো বাছ বিচার নেই। অমঙ্গলেরও সৌন্দর্য আছে, সে সৌন্দর্যও শিল্পের বিচার্য বিষয়। মাঝে মধ্যেই তাই দার্শনিক সত্যের উপর নির্ভরতা হারিয়ে মধ্যপন্থা অবলম্বন করেন এঁরা। Subjective–Objective এই দুই বিপ্রতীপ বিন্দুকে মেলাতে চান। এবং তার পিছনে তৈরি করেন তাত্ত্বিক সমর্থন। মুকারোভস্কি অন্তত শেষ পর্যন্ত দৃঢ়ভাবে দাঁড়িয়েছিলেন নিজস্ব বিশ্বাসের স্থির বিন্দুতে। সেইখানে তাঁর সাফল্য। কোনো সংকর কাব্য সমালোচনাপ্রকরণ তাঁকে অন্তত গড়ে তুলতে হয়নি।

চতুর্থত মুকারোভস্কির সংগঠনের ধারণার মধ্যেই রয়েছে অদ্ভুত স্থিতিস্থাপকতা। তিনি যখন কবিতাকে একটি সংগঠন হিসেবে দেখতে চান এবং বলেন যে বিষয়বস্তু সমেত সমস্ত ভাষিক উপকরণ বা চিহ্নগুলি ওই সংগঠনের অন্তর্ভুক্ত তখন তো কবিতাকে সমগ্র ভাবেই দেখতে বলেন। কবিতার আবেদনকে তার সমগ্রতায় খুঁজতে বলেন। তাঁর ধারণার সঙ্গে ভারতীয় রসবাদের ধারণাও তো কোথাও অদ্ভুত সাযুজ্য রচনা করে। যে বিভাব, অনুভাব, সঞ্চারী ভাবগুলি পৃথক ভাবে একত্রিত হয়ে রস তৈরি করে না বরং রসই প্রকাশিত হওয়ার জন্য এই উপাদানগুলিকে একত্রিত করে নেয়।

আসলে প্রাগ চিন্তাধারার প্রধান বিষয় হল কোনো নির্দিষ্ট সাহিত্যকর্মের সংগঠন। এতে কোনো নির্দিষ্ট সাহিত্যকর্মকে একটি পদ্ধতি হিসেবে দেখা হয়। তাই মুকারোভস্কি বলেন, "কাব্যিক সাহিত্যকর্মের উপাদানগুলির পারস্পরিক সম্বন্ধ, প্রমুখিত এবং প্রমুখিত নয়—উভয় ধরনের সম্বন্ধই 'সংগঠন' গঠন করে। এ এমন একটি গতিশীল সংগঠন যা একই সঙ্গে 'কেন্দ্রানুগ এবং কেন্দ্রাতিগ'। এই সংগঠন একটি অবিভাজ্য শৈল্পিক সমগ্রতা তৈরি করে, কারণ এর প্রতিটি উপাদানই সমগ্রের সঙ্গে সম্পর্কের সূত্রে নিজস্ব মূল্যে মূল্যায়িত হয়।"৩৩

এই সাংগঠনিক বিশ্লেষকের প্রাথমিক কৃত্য হল সাহিত্য কর্মটির প্রচলিত ভাষিক ও সাহিত্যিক আদর্শ থেকে (norm) যে বিচ্যুতি ঘটে তাকে চিহ্নিত করা এবং তারপর সমগ্রভাবে সাহিত্যকর্মটির সংগঠনকে ব্যাখ্যা করার জন্য সেই বিচ্যুত ক্রমকে অন্যান্য পর্যায়ের সংগঠনের সঙ্গে যেমন ছন্দ, স্বর, গঠন, বিষয়বস্তুর বিভিন্ন দিক ইত্যাদির সঙ্গে যুক্ত করা। এভাবে সাংগঠনিক বিশ্লেষণে কেবল সাহিত্যকর্মটির ভাষার যথাযথ বর্ণনাই অঙ্গীভূত হচ্ছে না, তার বিষয়বস্তুও ব্যাখ্যাত হচ্ছে। তাই প্রাগ চিন্তাধারার সাংগঠনিক তত্ত্ব কোনো সাহিত্যকর্ম তার সমগ্রতার মধ্যে যে সৌন্দর্য সৃষ্টি করে তারই পদ্ধতিগত ব্যাখ্যা উপস্থাপন।

২.০৪ : রোমান ইয়াকবসন-এর 'closing statement' প্রাগ চিন্তাধারার ও কাব্যতত্ত্বের একটি পরিণত রূপ। প্রাগ ভাষাবিজ্ঞান কেন্দ্রের প্রবন্ধসংকলন এবং ইয়ান মুকারোভস্কির বক্তব্যের সঙ্গে ইয়াকবসনের কবিতার ভাষার ধারণার পার্থক্য উল্লেখযোগ্য। সাহিত্যকর্মকে 'সংগঠন' বলে চিহ্নিতকরণের মাধ্যমে বিষয়বস্তুসহ সাহিত্যকর্মের বিভিন্ন উপাদানগুলির মধ্যে এক অন্তর্গত শৃঙ্খলা তৈরির প্রয়াসে সাহিত্যকে সমগ্রভাবে দেখার চেষ্টা করেছিলেন—প্রাগ সংগঠনপন্থীরা। ইয়াকবসন 'closing statement'-এ এই বক্তব্যকে একেবারে বাতিল করে দেননি। বরং বক্তব্যটির পূর্ণ রূপায়ণের কাজে নিজে উল্লেখযোগ্য ভূমিকা নিয়েছিলেন। তাঁর মতে কবিতা এবং কবিতা নয় এমন সাহিত্যকর্মের পার্থক্য ভাষাতাত্ত্বিক দৃষ্টিকোণ থেকে ব্যাখ্যা করা সম্ভব। তাঁর মতে কাব্যতত্ত্ব ভাষাতত্ত্বেরই অবিচ্ছিন্ন অংশ। এবং কোনো বাচনিক সংবাদকে কীভাবে মণ্ডনকলায় পরিণত করা যায় কাব্যতত্ত্ব প্রধানত এ সমস্যার সঙ্গে জড়িত। এবং এই সমস্যার সমাধান লুকিয়ে আছে ওই সংবাদের বাচনিক সংগঠনেই। এভাবেই ইয়াকবসনের রচনায় উন্মোচিত হয়েছে ভাষাতত্ত্বের সঙ্গে সাহিত্যচর্চার প্রবল দাবি।

প্রাগ সংগঠনপন্থীদের বক্তব্য অনুযায়ী কবিতার সঙ্গে অন্যান্য রচনার পার্থক্য তৈরি হয় মূলত রীতির ভাষণকে কেন্দ্র করে। অবশ্য ইয়াকবসন কাব্যিক ভূমিকার সংজ্ঞার্থের জন্য 'একটি অভিজ্ঞতাবাদী ভাষিক মানদণ্ড' প্রস্তাব করেছেন। তাঁর মতে কাব্যিক ভূমিকা মূলত সংগ্রহের দিক থেকে সমন্বয়ের দিক পর্যন্ত একটি equivalance বা সদৃশতার নীতিকেই তুলে ধরে। এই সদৃশতা কোনো বাক্যের অন্বয় কাঠামোর বা sequence-এর মধ্য দিয়েই শিল্পপ্রকরণে উন্নীত হয়। স্যোসুরে ভাষার পদরূপমূলক ও আনুষঙ্গিক বা অনুপস্থিত এবং বর্তমান সম্পর্কের মধ্যে যে পার্থক্যের কথা বলেছিলেন ইয়াকবসনের সংগ্রহপ্রবণ ও সমন্বয়প্রবণ এর মধ্যবর্তী পার্থক্য তারই অনুরূপ।

Fundamentals of Language (1956) গ্রন্থে স্যোসুরে-কে পুনঃসূত্রায়ণের সাহায্যে ইয়াকবসন দেখিয়েছেন প্রতিটি ভাষিক বাচনই দ্বৈত ক্রিয়ার ফল। ১. বাচনিক সংবাদে অনুপস্থিত কিন্তু সংকেতে বা langue বা language system-এ উপস্থিত আনুষঙ্গিক ভূমিকার সংগ্রহ।

২. বাক্য প্রকরণে নির্বাচিত বিষয়সমূহের সমন্বয় বা মিলন। বাক্য প্রকরণে উপস্থিত বিভিন্ন উপাদানের সম্পর্ক যখন নৈকট্য লাভ করে তখন অনুপস্থিত বিভিন্ন সম্পর্ক তার সমতুল্য হয়ে ওঠে। অর্থাৎ তারা একে অপরকে প্রতিস্থাপিত করতে পারে। ইয়াকবসন নৈকট্যপ্রাপ্ত সম্পর্ককে যুক্ত করেছেন বাক্যালংকার বা লক্ষণার সঙ্গে এবং সমতুল্য সম্পর্ককে রূপক এবং উপমা অলংকারের সঙ্গে।

ইয়াকবসন-এর 'closing statement'-এর মূল কথা হল কাব্যভাষায় সমতুলনীয় বা সদৃশ সম্পর্ক কেবল অনুপস্থিত বিষয়ের সঙ্গে যুক্ত থাকে না, মুখের ভাষাতেও তা উপস্থিত থাকে এবং কখনো কখনো ভাষার অধিগঠন নির্মাণের প্রধান কারণ হিসেবেও কাজ করে। তাঁর মতে এ হল 'ভাষার দ্বিপ্রান্তিক সংগঠন'। বিষয়টিকে তিনি এভাবে ব্যাখ্যা করেছেন : কোনো কবিতার বাক্যগুলিতে ব্যবহৃত উপাদানের সংগঠন ও বিচিত্রধর্মী রূপতাত্ত্বিক উপাদানের শ্রেণিকরণ নির্বাচন, বণ্টন এবং তাদের সম্পর্কের নৈর্ব্যক্তিক, নিরাসক্ত, মনোযোগী, অনুপুঙ্খ এবং সামগ্রিক বর্ণন— কবিতা-পাঠক বা কবিতা-সমালোচককে বিস্ময়াভিভূত করে। এই বিস্ময়ের কারণের মধ্যে পড়ে নিম্নলিখিত বিষয়গুলি :

১. অপ্রত্যাশিত কোনো উপাদানের সন্ধান বা তাদের সজ্জা।
২. উজ্জ্বল সুমিতি বা symmetry.
৩. উপাদানের সংগঠনগত ভারসাম্যতা।
৪. মুখ্য বিরোধাভাসগুলি।
৫. সমতুলনীয় বৈচিত্র্যময় রূপপ্রকরণ। যা প্রধানত উপমা ও রূপক অলংকারের আশ্রয়ে গড়ে ওঠে।
৬. রূপতাত্ত্বিক উপাদান (Morphological element) ব্যবহারের জন্য নির্দিষ্ট ব্যাকরণগত নিয়মাবলীর মান্যতা ও তার লঙ্ঘন।
৭. এমন বিশেষ উপাদানের নির্বাচন বা নিষ্কাষণ যা প্রমুখিতউপাদানগুলির (Foregrounded elements) আন্তঃলীলার চমৎকারিত্বকে বোধগম্য করে তোলে।

লক্ষণীয় এগুলি পর্যায়ক্রমে বা যুগপৎ প্রযুক্ত হয়েও পাঠকের বিস্ময়ের কারণ হয়ে ওঠে।

দৈনন্দিন বাক্ ব্যবহারে অনুমোদিত নয় এমন অজস্র ভাষিক উপাদান (ধ্বনিমূলক, পদমূলক, বাক্যমূলক) কবিতার শরীরে ব্যবহৃত হয়। ইয়াকবসন যাকে 'কবিতার ব্যাকরণ' বলেন সেখানে এ ধরনের বাক্ ব্যবহারের অনুমোদন রয়েছে। ভাষার ব্যাকরণের কিছু নির্দিষ্ট নিয়মকানুন আমাদের মান্য করতে হয়। এর আবার একটি উদারতর অংশ আছে— যাকে আমরা দৈনন্দিন মুখের ভাষার ব্যাকরণ বলি; সেখানে আমাদের নির্বাচনের স্বাধীনতা স্বীকৃত হয়। এর উপরে আছে কবিতার ব্যাকরণ— যেখানে নির্বাচনের স্বাধীনতা আরও ব্যাপক। কখনো-কখনো এই ব্যাকরণ মৌখিক ভাষার ব্যাকরণকেও অতিক্রম করে যেতে পারে। কবিতার ভাষা লিখিত ভাষার অনড় ব্যাকরণকে কবিতার প্রয়োজনে ব্যবহার করবে। মুখের ভাষার উদারতর ব্যাকরণকে কবিতার প্রয়োজনে ব্যবহার করবে, আবার কখনও তাকে অতিক্রম করে গড়ে তুলবে নিজস্ব এক ব্যাকরণ।

ইয়াকবসন কবিতাকে অন্যান্য সাহিত্যকর্ম থেকে পৃথক করেন এবং তার উপাদানগুলির শ্রেণিকরণ করতে চান। এই শ্রেণিকরণ যে সম্পর্কের উপর নির্ভরশীল তা দ্বিস্তরিক। প্রথমত শোনা বা দেখায় তাৎক্ষণিকভাবে উপলব্ধ হয় ভাষিক সংগঠনের যে সাদৃশ্য। দ্বিতীয়ত

সাহিত্যকর্মের বিভিন্ন ভাষিক উপাদান যাদের ব্যাকরণগত এবং অন্যান্য শ্রেণিভিত্তিক দলসমূহে (ছন্দ, অলংকার, সুর প্রভৃতি) শ্রেণিকরণ করা যায়, যা পাঠকের সামর্থ্যের উপর নির্ভরশীল। প্রথম রীতির সংগঠন কবিতার আবহ সৃষ্টিতে সাহায্য করে। কিন্তু প্রশ্ন ওঠে দ্বিতীয় রীতির সংগঠনকে নিয়ে, যা কাব্যগুণের সঙ্গে প্রায় সম্পর্কহীন। তা কি সাধারণ পাঠকের চেতনাকে যান্ত্রিক করে তোলে না?

এ সম্পর্কে ইয়াকবসন-এর বক্তব্য স্পষ্ট— তাঁর মতে ভাষা যাঁরা ব্যবহার করেন তাঁদের প্রত্যেককেই অসচেতনভাবে হলেও সংগঠনের মধ্যে প্রবিষ্ট উপাদানগুলির শ্রেণিকরণ পদ্ধতি অবশ্যই জানতে হবে। তাঁর কবিতা বিশ্লেষণে পাঠকের মনের প্রতিক্রিয়াকে উপস্থাপিত করা হয় না বরং পাঠকের উপর কবিতার যে প্রভাব এমনকি যা হয়তো পাঠকের কাছেও অজ্ঞাত সেই প্রভাবের বৈশিষ্ট্য নির্ধারণ করা হয়। ইয়াকবসন কবিতার ভাষার সামগ্রিক প্রভাবের একটি পারিভাষিক ব্যাখ্যা উপস্থাপন করেছেন। দ্বিতীয় রীতির সংগঠন (ব্যাকরণগত উপাদান এবং অন্যান্য দলসমূহ) অর্থাৎ শ্রেণি সমূহের সদৃশতা অকাব্যিক ভাষাতেও পাওয়া যায়। তাই প্রয়োজন একটি যথেষ্ট নমনীয় শ্রেণিকরণ পদ্ধতি। কিন্তু এই নমনীয় পদ্ধতির সম্ভাব্যতা প্রমাণিত নয় এখনও। তাই একে অস্বীকার করে ইয়াকবসন বলেন— সমস্ত কবিতার ভাষায় না হলেও বেশির ভাগ কবিতার ভাষারই একটি স্বতন্ত্র বৈশিষ্ট্য তৈরি করে উপরোক্ত দ্বৈত সদৃশতা। এই ধরনের বৈশিষ্ট্য বিষয়গত ভাবে উপস্থিত কিনা তা বিবেচ্য নয়। বরং বিবেচ্য এ ধরনের দ্বৈত সদৃশতা কবিতার শরীরে উপস্থিত থাকলে তার ভূমিকা এবং তাৎপর্য কী?

অন্তঃমিল এবং ছন্দ— দুই-ই বা এর কোনো একটির উপস্থিতি যে-কোনো সাহিত্যকার্যকে যে কবিতা করে তোলেনা এ সত্য আজ সর্বজনবিদিত। তেমনই কবি কর্মের বিভিন্ন স্তরে দ্বৈত সদৃশতার উপস্থিতি সেই কলা-প্রকরণটিকে যত জটিল ও প্রাচুর্যপূর্ণ করে তুলুক না কেন তা যে সেই সাহিত্যকর্মটির আবশ্যিক শর্ত নয় একথাও কবিতা বিশ্লেষণে ধরা পড়ে। ইয়াকবসনের বিশ্লেষণ মূলত সমতুল্য উপাদানের সম্পর্কের উপস্থিতি— অনুপস্থিতি নিয়ে ভাবিত। এদের তাৎপর্য বিশ্লেষণে তাঁর মনোযোগ আশ্চর্যজনকভাবে অনুপস্থিত।

'Closing statement'-এ তিনি আরও বলেছেন এই সদৃশতার দ্বারা কাব্যিক বাচন আলোকিত হয় এবং বৈপরীত্যের মধ্য দিয়ে বিস্ময় এবং অবকাশের আবহ তৈরি করে। এই ভাবে তাঁর চিন্তা অনুযায়ী চিহ্ন তার অনুভবময়তা ও স্পষ্টতা নিয়ে বিষয়ের সঙ্গে নিজের দ্বিবিভাজন (dichotomy)-কে গভীর করে তোলে। মুকারোভস্কি অবশ্য ভাষার প্রচলিত রীতি থেকে দূরে সরে আসাকেই কবিকর্মের আবশ্যিক শর্ত বলতে চান। তাঁর মতে এর ফলে কাব্য বাচনে 'বিন্যাস' আনা হয়। ইয়াকবসনের মতে এ হল 'কাব্য' সাহিত্যের বিচিত্র সুমিতি বা কেন্দ্রাভিসারের ফসল। অবশ্য তাঁরা উভয়েই মনে করেন যে কবিকর্মের এই তাৎপর্যময় সংগঠনের দ্বারা বাস্তবকে নতুনভাবে ফলিয়ে দেখা যায়। গড়ে ওঠে এক পুনর্গঠিত কাব্যরূপ।

চিহ্ন সম্পর্কে এই নতুন চেতনার তাৎপর্য বলতে গিয়ে ইয়াকবসন বলেন— কেবল ধ্বনির বিন্যাস নয়, অর্থের বিন্যাসও কবিতায় এক ধরনের সমীকরণ তৈরির দায়িত্ব নেয়। তাৎপর্যের সদৃশতা বা অসদৃশতার পরিপ্রেক্ষিতে কবিতায় কোনো দৃষ্টি-আকর্ষক বিশিষ্ট ধ্বনি মূল্যায়িত হয়। ভাষিক সংগঠনের পর্যায়ে যে তুলনা এবং সুমিতিগুলি গঠিত হয় তাই স্বাভাবিক ভাবে পাঠককে কবিতার তাৎপর্যের তলে আলো ফেলতে সাহায্য করে। এবং এর ফলে রহস্যময়তা তৈরি হয়। যদিও সাধারণ ভাষায় (যা কবিতার ভাষা নয়) তুলনা এবং সুমিতিগুলি এভাবে

সম্পর্কিত থাকে না। নৈকট্যের মধ্যে আরোপিত সাদৃশ্য কবিতার প্রতীকী বহুস্তরী অর্থ ব্যঞ্জনার মধ্যে বিভক্ত হয়ে যায়। নির্দেশক ভূমিকার উপর কাব্যিক ভূমিকার প্রাধান্য বাচনিক সংবাদকে ক্ষয়িষ্ণু করে তোলে না বরং রহস্যময় করে তোলে। এডগার অ্যালেন পো-র 'Raven' কবিতার শেষের স্তবকের উল্লেখ করেছেন ইয়াকবসন এ প্রতিক্রিয়ার উদাহরণ হিসেবে।[৩৪]

ইয়াকবসনের পদ্ধতিকে মান্য করে আমরাও একটি কবিতার অনুরূপ বিশ্লেষণ এখানে উপস্থাপিত করছি।

পাথরের উপর খড় বিছানোর শব্দ
বুকে তোমার হাত
পাথরের উপর খড় বিছানোর শব্দ
বুকে তোমার হাত
তরাই থেকে উঠে আসে রাত্রি
শিখর থেকে গড়িয়ে আসে নিঃশ্বাস
মস্ত এক চাকার নীল ঘূর্ণি
বুকে তোমার হাত
পাথরে ঐ খড়ের হেম নিশ্চল।[৩৫]

বাবরের প্রার্থনা কাব্যগ্রন্থের এমন এক কবিতার সামনে এসে এখন দাঁড়িয়েছি আমরা যেখানে কবিতার শরীরে রয়েছে অগোচর আত্মখণ্ডন। এক সীমাহীন স্তব্ধতায় আবৃত কবিতার শরীর। নৈঃশব্দ্যের অন্তর্লীন পথ ধরেই এ কবিতার মধ্যে পৌঁছোতে হয়। পৌঁছোনোর পরেও মনে হয় এখনই বোধহয় শুরু হবে সত্যি সত্যি পথ চলা। অন্তরের মধ্যে যে অন্তরতম রয়েছে পৌঁছোতে হবে তারও গভীরে। আবার এখানে রয়েছে 'মস্ত এক চাকার নীল ঘূর্ণি' বা এ কবিতার উপর থেকে নীচে এবং নীচ থেকে উপরে ছড়িয়ে থাকা নিঃশব্দের ভুবনে এক শব্দময় অনুভব। সে অনুভব পাথরের মতো স্থির-প্রাণহীন-কঠিন ও নিষ্ঠুর শীতল। আর এই জীবনহীন-কঠিন-ধ্রুব-শীতার্ত অনুভবই কবিতার অন্তরতম তলে পৌঁছোনোর চাবিকাঠি। ড়-ধ্বনি (/ṛ/) এবং র ধ্বনির (/r/) 'খড় বিছানোর শব্দ'কে তার শারীরিক সংবেদনে ধরেছে। পুনরাবৃত্ত 'বুকে তোমার হাত' হয়ে উঠেছে 'খড় বিছানোর শব্দ'-র প্রায় সমান্তরাল। একটি প্রতীয়মানোৎপ্রেক্ষা সৃষ্টি হয়েছে এই ভাবে [(যেন) 'বুকে তোমার হাত'] শেষ পঙ্ক্তিটি 'পাথরে ঐ খড়ের হেম নিশ্চল' একটি বিপরীত আবর্তন। ধ্বনির বিন্যাসেই তা ধরা পড়েছে। জীবনের অপ্রতিরোধ্য গড্ডলিকা স্রোতে একটি শাশ্বত মুহূর্ত 'পাথরে ঐ খড়ের হেম নিশ্চল'। স্থির হয়ে যাচ্ছে একটি ব্যক্তিক অনুভূতি। শেষ (→ নিশ্চল/niśсal) 'ল' ধ্বনির (/l/) তারল্য এই পরিবর্তনটিকে মূর্ত করেছে। 'খড়' বিছানোর শব্দের রুক্ষতা বিগলিত হচ্ছে ওই তারল্যে। তখন খড় তার আভাটুকু বজায় রাখে, সেই আভা 'হেম'। ওই 'হেম'ময় আভা আসলে প্রেম। ধানের রুক্ষ সোনালি ঢেউ প্রগাঢ় সংহতিতে 'তরাই থেকে উঠে' আসা রাতে জমাট পাথর চাপা বুকের উপর হয়ে যায় 'খড় বিছানোর শব্দ'। নিষ্প্রাণ, প্রেমহীন, পাথরের মতো অনুভবহীন বুকের শুশ্রূষাময় 'খড় বিছানোর' মধুর শব্দ, জাগিয়ে তোলে মনের অগোচরে দৈনন্দিন যাপনের আপাত সুখের ছবি। জাগিয়ে তোলে প্রেমের শুশ্রূষাময় অনুভূতি : 'বুকে তোমার হাত : পাথরে ঐ খড়ের হেম নিশ্চল।' প্রেম

এক দৈবী দিব্য বিভাময় অনুভব। তখন খড় আর খড় নয়, খড় হয়ে ওঠে তার 'হেম'। স্থির হয়ে যায় এক অবিচল দিব্যমুহূর্ত। ক্ষণকালীনতা থেকে একটি মৃত্যুহীন চিরকালীনতায় পৌঁছে যাবার অমর স্বাধীনতা পেয়ে যায় কবিতাটি।

আর তখনই সমগ্র কবিতাটি হয়ে ওঠে ব্যক্তিগত প্রেমের সাপেক্ষে আশ্রয়ের এক নির্ভার, তপ্ত অথচ অনিবার্য উচ্চারণ। এ কবিতায় অর্থের মাত্রা এক ধরনের শৃঙ্খলা তৈরি করেছে। জ্ঞাপনের মাত্রায় চারিয়ে দিচ্ছে বক্তব্যকে। আর ধ্বনির তল তৈরি করছে অন্য এক বিশৃঙ্খলা। এই টানাপোড়েনে কবিতা প্রধাবিত হয়েছে অতিজ্ঞাপনের বহুস্তরীভূত জগতে। ফলে পাঠকের মন সরল দোলকের মতো একবার 'রূপ' থেকে বিষয়ের দিকে দুলে যায়। আবার সেখান থেকে রূপের দিকে ফিরে আসে। কাব্যপাঠকের রসানুভব যতক্ষণ স্থায়ী হয়, এ দোলা ততক্ষণই চলতে থাকে। অর্থাৎ কবিতা x বিন্দু থেকে যাত্রা শুরু করে x^n বিশ্বে পাখা মেলে দিচ্ছে। আবার মুহূর্তের জন্য ছুঁয়ে যাচ্ছে x বিন্দুটিকে। [x □→ x^n] বিশৃঙ্খলার মধ্যেই তৈরি করছে শৃঙ্খলার এক অনুপম মুখচ্ছবি। কথার মধ্য থেকে যাত্রা শুরু করে না-কথার দিকে এগিয়ে যাচ্ছে কবিতা। কথা আর না-কথার ঘূর্ণনে ভাষাশক্তি বিন্যাস শক্তিতে হয়ে যাচ্ছে সংবর্তিত। ভাষার সুসংহত বিস্ফারের জন্য কবি সচেতনভাবেই নর্ম থেকে সরে যাচ্ছেন।

১. তরাই থেকে উঠে আসে রাত্রি → রাত্রি তরাই থেকে উঠে আসে।

২. শিখর থেকে গড়িয়ে আসে নিঃশ্বাস → নিঃশ্বাস শিখর থেকে গড়িয়ে আসে।

'রাত্রি' ও 'নিঃশ্বাস' বিপর্যাস সংবর্তনে যে আবর্তন তৈরি করে দিচ্ছে তাই কবিতাকে না-কথার দিকে নিয়ে যাচ্ছে। কোথাও কবির বিলোপন সংবর্তনের ভাবনা— যেমন কবিতা পঙ্ক্তি ১ এবং ৩-এ 'কর্তা বিশেষ্য' ২, ৪, ৭, ৮, ৯ বাক্যে ক্রিয়াপদের বিলোপন ব্যক্তিগত মাত্রাকে ছিন্ন করে হয়ে উঠেছে সমস্ত সংশয়ী প্রেমের বিপ্রতীপে আশ্রয়ের নির্ভার এক তপ্ত উচ্চারণ। স্থান কালের মাত্রাকে অস্বীকার করে অনুষঙ্গ থেকে কবিতা চলে যাচ্ছে অতি অনুষঙ্গায়নের দিকে। এও তো একভাবে স্বপ্নের জগৎ। কিন্তু এ স্বপ্নকে শব্দ বা ভাষা দিয়েই জানতে হয়, ছুঁতে হয়। এ-স্বপ্নে নেই কোনো খেয়ালিপনার চাপল্য। নেই 'কবিতার চোর চোর বুড়ি বুড়ি খেলা'। শব্দকে 'ফুসলিয়ে ভুলিয়ে ভালিয়ে নিয়ে' আসা নয়; বরং কবির ধ্বনি বিন্যাসের যৌক্তিক গাণিতিক শৃঙ্খলা ধ্বনিকে কবিতার শরীরে নির্দিষ্ট ক্রমে সাজাচ্ছে নিপুণ ভাস্করের মতো। ধ্বনির পরিসংখ্যান নয় বরং ধ্বনির সচেতন সজীব বিন্যাসে কবিতাটি অলোকসামান্য হয়ে উঠেছে। এই কবিতায় বাইরে একটা আপাত অন্বয়ের শৃঙ্খলা আছে বটে তবে তা ব্যাকরণের শৃঙ্খলা নয়। কর্তা-কর্ম-ক্রিয়ার সার্বত্রিক বন্ধনে তা আবদ্ধ নয় কোথাও। বরং শব্দগুলি যেন মুক্ত। অন্তরীপধর্মিতাই যেন তার বৈশিষ্ট্য। আব সেই দ্বীপময় শব্দের মধ্যে লুকোনো সংযোগ তৈরি হয়েছে বাক্‌স্পন্দ বা উচ্চারণের দ্বারা। কারণ "...that articulation seems to take place only in idea-closed system they were concerned only with each-other."[৩৬] ভাষার নিয়মিত নিরূপিত আবর্তনের ফলেই যেন জেগে উঠেছে এক অবচেতনার বিশ্ব— স্বপ্নের জগত। একদিকে যার শিকড় রয়েছে বাস্তব পৃথিবীতে। আর তা যেন 'as marvellous as music or algebra.'[৩৭]

এই ধরনের বিশ্লেষণ হয়তো সর্বজনমান্য নয়, এমনকি হয়তো অনেক সমালোচক এর উপযোগিতা নিয়েও প্রশ্ন তুলবেন, কিন্তু এ কথা দ্বিধাহীন ভাবে বলা যায় সাদৃশ্যের এই রূপগত

বিন্যাস তাৎপর্যের সঙ্গে যুক্ত হয়ে কবিতাকে অনেক বেশি সুন্দর করে তুলেছে। অবশ্য এই সংযুক্তিকরণকে কবিতার প্রাকরণিক সংগঠনের অনিবার্য ফলশ্রুতি ভাবলে ভুল হবে। এ বিশ্লেষণ পাঠকের উপর কবিতার যে প্রভাব প্রতিক্রিয়া তাকেই উপস্থাপিত করেছে। এবং অবশ্যই তা একটি নির্দিষ্ট অর্থ-তাৎপর্যে সীমাবদ্ধ নয়। তাই ইয়াকবসনের তত্ত্বের গুরুত্বপূর্ণ দিক হল তত্ত্বের বিপুল ভার থাকা সত্ত্বেও স্বীকৃত হয়েছে সাহিত্যের ভাষার শক্তি ও ক্ষমতা। যিনি ভাষাতাত্ত্বিক দৃষ্টিতে কবিতাকে দেখেন না, যাঁদের কাছে সাংগঠনিক বৈশিষ্ট্য প্রামাণিক নয় তাঁদের জন্য নির্ধারিত হয়েছে আবহ সৃষ্টির গুরুত্বপূর্ণ উৎস। অন্যদিকে ভাষার সাংগঠনিক বিশ্লেষণ যা উপাদানগুলির অংশ-বিশেষকে ব্যাখ্যা করে, সমগ্র সাহিত্যকর্মের সঙ্গে তার সংযুক্তির ভূমিকাও নির্দিষ্ট হয়ে যায় এই বিশ্লেষণে।

প্রাগ সংগঠনপন্থীরা কবিতার অবয়ব সন্ধান করতে গিয়ে ভাষাবিজ্ঞানের মডেলটিকেই গ্রহণ করেছিলেন। পরে যাঁরা সংগঠনতত্ত্বের মূল সূত্রটিকে গড়ে তুলেছিলেন সেই ফরাসি মনীষীরা ক্রবৎস্কোয় ইয়াকবসনের ধ্বনিতত্ত্বের আদলটিকেই তাদের সাংগঠনিক ভাবনা-সূত্র গড়ে তোলার কাজে ব্যবহার করেন। তোদোরভও সাহিত্যিক ভাষারই বিশেষ রূপের কথা বলতে গিয়ে পল ভালেরির কথা উদ্ধার করেছিলেন— "Literature is and can be nothing other than, a kind of extension and application of certain properties of language."[৩৮]

ভাষা বিশ্লেষণের স্বরূপ বর্ণনা করতে গিয়ে জন লায়নস যে কথা বলেছিলেন তার মধ্যেই প্রাগ সংগঠনপন্থীদের সাংগঠনিক ভাবনার সূত্র লুকিয়ে আছে। লায়নসের মতে ভাষা একটি জটিল প্রণালী। তা কতগুলি নির্দিষ্ট 'একক' দিয়ে তৈরি। তবে সেই 'একক'-গুলিকে বিচ্ছিন্ন ভাবে আমরা বুঝতে পারি না। অন্য এককের সঙ্গে তাদের সংযোগ সম্পর্কের নিরিখেই তাদের স্বরূপকে বুঝে নিতে হয়— "Every distinct Language is a unique relational structure ; and of the units which we identify in describing a particular language— sounds, words, meanings etc.— are but points in structure, or net work of relation."[৩৯]

কবিতায় যে বাচনিক সংবাদ ব্যবহৃত হয় তার উপাদানগুলির শ্রেণিকরণ এবং তাদের আন্তর সম্পর্কটিকে খোঁজার মধ্যে দুটি স্বতন্ত্র বিষয়কে পাওয়া যায়— সমগ্রের সঙ্গে বৃহত্তর প্রেক্ষাপটের বা অন্য সমগ্রের সম্পর্ক এবং অংশগুলির পরস্পরের সম্পর্ক। ইয়াকবসন কবিতার ভাষাশরীরের বিশ্লেষণে এই সাংগঠনিক পদ্ধতিকে অত্যন্ত দক্ষতার সঙ্গে সূক্ষ্মভাবে ব্যবহার করেছেন। ভাষাতত্ত্বকে কাব্য সমালোচনায় বা কবিতা বিশ্লেষণে ব্যবহার করার ফলে তাঁর সমালোচনাতে দেখা গেছে এক নৈর্ব্যক্তিক নিরাসক্ত বিশ্লেষণ এবং কাব্যিক উচ্ছ্বাসের পরিবর্তে অনুপম শৃঙ্খলাবোধ। সাহিত্য সমালোচনায় এই ভাষাতাত্ত্বিক পদ্ধতির প্রয়োগ একান্ত তন্ময়ভাবে ভাষার উপাদানগুলিকে গ্রহণ করে তার অন্তর্লীন প্যাটার্নকে আবিষ্কারের চেষ্টা এবং দৃষ্টান্ত থেকে সিদ্ধান্তে উপনীত হওয়ার প্রবণতা মন্ময় সমালোচনার উচ্ছ্বাসপ্রবণতাকে বহু অংশেই রুদ্ধ করে সমালোচনাকে করে তুলেছে প্রায় গণিতেরই মতো অভ্রান্ত এক বিষয়।

॥ নির্দেশিকা ॥

১. রায় তারাপদ—'স্বপ্নের কবিতা', দেশ, ১ এপ্রিল, ১৯৬৭।
২. আইয়ুব আবু সৈয়দ—*আধুনিকতা ও রবীন্দ্রনাথ*, ১৯৮৩, দে'জ পাবলিশিং; পৃ. ১৩৫।
৩. Lodge David–*Modern Criticism and Theory*, Longman, 1988, P-14.
৪. Shorey Paul–*What Plato Said*, The University of Chicago Press, 1968, P-260.
৫. ৪ নং টীকা P–260.
৬. ৪ নং টীকা P–265.
৭. ৪ নং টীকা P–263.
৮. ৪ নং টীকা P–267.
৯. Zhiromunsky. V. M.–*Selected Writings*, 1985, Moscow, Progressive Publishers, P–364.
১০. Freeman Donaldc (Ed.)–'Standard Language and Poetic Language'–Jan Mukarovsky in *Linguistics and Literary Style*, University of Massachusettes, 1970, P–42.
১১. মৃধা তন্ময়—'কিংবদন্তী', *হাওয়াবাড়ী*, প্রমা প্রকাশনী; ১৯৯৬, পৃ. ৫৬-৫৭।
১২. ১০ নং টীকা P–43.
১৩. Rene Wellek and Austin Warren : *Theory of Literature*, Penguin Books, 1982. P–181.
১৪. ভট্টাচার্য সুভাষ : 'শব্দের আঁধার আলো', *শতসানুদেশ*, দেবেশ রায় (সম্পাদিত) দে'জ, ২০০৩, পৃ. ১২৫।
১৫. Culler, Jonathan–*Structuralist Poetics*, London and Henly, Routledge & Kegan Poul, 1975, P-56.
১৬. ঘোষ শঙ্খ— *ছন্দের বারান্দা*, অরুণা প্রকাশনী, ১৯৩৮, পৃ. ১০৮।
১৭. T. S. Eliot–The Hollow Men, *Selected Poems*, Oxford University Press, 1997, P–69.
১৮. ঘোষ শঙ্খ : 'তক্ষক', *কবিতা সংগ্রহ-১*, দে'জ, ১৯৯৭, পৃ. ২১১।
১৯. Hugh Kenner–*Knot and Vortex*, 1972, P–146.
২০. Abbott. C. C. (Ed.)–*The Letters of G. M. Hopkins to Robart Bridges*, P–66.
২১. *রবীন্দ্র রচনাবলী*, বিশ্বভারতী সুলভ সংস্করণ, ষষ্ঠ খণ্ড, বৈশাখ ১৩৯৫, পৃ. ২৮৩।
২২. তদেব।
২৩. Burbank John,Peter Steiner (Tr/Ed.) 'The Words And Verbal Art', *Selected Essay* by Jan Mukarovsky, New Haven and London, Yale University, Press/ 1977/P–10.
২৪. ঠাকুর রবীন্দ্রনাথ—'সাহিত্য বিচার', *সাহিত্যের পথে*, বিশ্বভারতী ১৩৯৪, পৃ. ৯৩।
২৫. ২৩ নং টীকা। P–9.
২৬. ২৩ নং টীকা। P–9.
২৭. ২৩ নং টীকা। P–23.
২৮. ২৩ নং টীকা। P–24.

২৯. ২৩ নং টীকা। P–24.
৩০. ২৩ নং টীকা। P–24.
৩১. সরকার ড° পবিত্র—*গদ্যরীতি পদ্যরীতি*, সাহিত্যলোক, কলকাতা ১৯৮৫, পৃ. ১২-১৩।
৩২. E. M. W. Tillyard–*Poetry : Direct and Oblique.*
৩৩. Garvin Paul (Ed.)–*A Prague School Reader on Aesthetics, Literary Structure and Style,* Washington 1964, P–22.
৩৪. Sebok. Thomas A (Ed.)–*Style in Language*, Cambridge, The M. I. T. Press, 1960, pp.–371-72.
৩৫. ঘোষ শঙ্খ—'খড়', *কবিতা সংগ্রহ—১* ; দে'জ ২য় সংস্করণ, পৃ. ২১৮।
৩৬. David Donald–*Articulate Energy,* 1977, Routledge & Kegan Paul, London, P–11.
৩৭. ৩৬ নং টীকা। P–4.
৩৮. সরকার ড° পবিত্র—*শৈলী বিজ্ঞান* : স্ট্রাকচারালিস্ট প্রাগভূমিকা, কবিতার ভাষা বিশেষ সংকলন, *গাঙ্গেয়পত্র,* ১০, ১৯৮৭, পৃ. ১৩০।
৩৯. Robey D. (Ed.)–*Structuralism : An Introduction— Structuralism and Linguistics, John Lyons,* Wolfson College Literature, 1972, Oxford, Clarendon Press, 1973, P–6.

* এই প্রবন্ধের ২.০৫ অংশের আলোচনায় আফজালুল বাসারের *বিশশতকের সাহিত্যতত্ত্ব* (বাংলা একাডেমী, ঢাকা, ১৯৯১) অনুবাদ গ্রন্থটির কিছু অংশ এবং Roman Jakobson-এর *On Language* (Harvard University Press, 1995)-এর কিছু অনূদিত-অংশ ব্যবহার করা হয়েছে। এছাড়া ১.০৯ অংশের প্যাটার্ন ও অতিজ্ঞাপনের তাত্ত্বিক অংশটুকু শ্যামাপ্রসাদ ভট্টাচার্যের *কবিতার অন্বয়: সাংগীতিক প্রতিহাস* (চিরায়ত, ১৯৯৫) গ্রন্থটিকে কেন্দ্র করে গড়ে উঠেছে। তবে ব্যাখ্যা, বিশ্লেষণ ও উদাহরণ প্রাবন্ধিকের, এখানে পূর্বোক্ত গ্রন্থ তিনটির কোন দায় নেই।

পোস্টমডার্ন ভাবনা ও সাহিত্য

অমিতাভ চক্রবর্তী

পোস্টমডার্ন তত্ত্ব এবং সাহিত্য সাম্প্রতিক জ্ঞানচর্চায় অতি পরিচিত এবং বহু আলোচিত। বিশ শতকের শেষ তিন দশকে এই ভাবকল্পটি প্রতীচ্যে শিল্প ও তত্ত্বের প্রতিটি পরিসরকে প্রভাবিত, প্রায় ক্ষেত্রেই আমূল রূপান্তরিত, করেছে। বাঙালির মননেও এই ধারণা আলোড়ন তুলেছে, কেউ কেউ এমনকি পোস্টমডার্নপন্থী হিসেবেও পরিচিত হয়ে উঠছেন। এই প্রবণতার একটি প্রাথমিক পরিচয় রয়েছে এই প্রবন্ধে।

পোস্টমডার্ন, পোস্টমডার্নিটি, পোস্টমডার্নিজম নিয়ে আলোচনা বহু বিষয় এবং বহুতর বিষয়ীর উপস্থিতিতে এতটাই জটিল রূপ নিয়েছে যে একটি প্রবন্ধে সে আলোচনার প্রাথমিক পরিচয়টুকুও দেয়া যাবে না। মূল ধারণাগুলির সংজ্ঞা; এই বৈশিষ্ট্যগুলির আর্থসামাজিক পটভূমির স্বরূপ সন্ধান ; পৃথিবীর বিভিন্ন অংশে এই ধারণাগুলির উপস্থিতি অথবা আত্তীকরণের প্রক্রিয়ার বিশ্লেষণ ; দর্শন-সাহিত্য-সমালোচনাতত্ত্ব-বিদ্যাচর্চা-শিল্প-স্থাপত্য প্রভৃতি বিভিন্ন ক্ষেত্রের বিচিত্র অভিজ্ঞতা— এসব নিয়ে বিস্তৃত আলোচনা হয়েছে এবং হয়ে চলেছে। এর ফলে পোস্টমডার্ন ধারণাটির একটি প্রাথমিক সংজ্ঞা দেওয়াও প্রায় অসম্ভব হয়ে উঠেছে। এই অসম্ভাব্যতা সম্পর্কে সচেতনতা অবশ্য সেই আশির দশক থেকেই রয়েছে। ১৯৮০-তেই পোস্টমডার্ন সাহিত্যিক এবং তাত্ত্বিক জন বার্থ লিখেছিলেন : 'a principal activity of postmodern critics...writing in postmodernist journals or speaking at postmodernist symposia, consists in disagreeing about what postmodernism is or ought to be." (Barth, J : 1980) ১৯৮৮-তে ডিক হেবিগ আরও স্পষ্ট করে লিখলেন : "It becomes more and more difficult as the 1980 wear on to specify exactly what it is that postmodernism is supposed to refer to as the term gets streched in all directions across different disciplinary and discursive boundaries, as different fractions seek to make it their own, using it to designate a plethora of incommensurable emergences." (Hebdig, D : 1988 : 181) আশ্চর্যের নয় যে ১৯৯১-এ পোস্টমডার্ন-এর লক্ষণ নির্দেশক বহুবিধ চিন্তার বিশ্লেষণ

করতে গিয়ে মার্গারেট রোজ এই মন্তব্যটিকেই প্রথম অধ্যায়ের শুরুতে উদ্ধৃত করলেন। (ছষড়ন, খ : ১৯৯১ : ৩) কেননা, রোজ নিজেও কোনো একক সংজ্ঞাকে যুক্তিসংগতভাবে সার্বিক বলে মেনে নিতে পারেননি। এসব সংজ্ঞায় যেখানে এমনকি একই বৈশিষ্ট্য স্বীকৃত, সেখানেও চরম বিপ্রতীপ ব্যাখ্যার অভাব নেই। যেমন, বহু উৎস থেকে গৃহীত উপাদানকে একসঙ্গে সাজিয়ে দেওয়ার প্রবণতাকে পোস্টমডার্ন-এর বৈশিষ্ট্য বলে স্বীকার করেছেন জেনক্স ও জেমসন দুজনেই, কিন্তু জেমসন-এর ব্যাখ্যায় এই প্রবণতা পণ্যায়নের গভীরতাহীনতার সঙ্গে যুক্ত হয়েছে আর জেনিক্স-এর ব্যাখ্যায় গৃহীত হয়েছে শিল্পের জনতন্ত্রীকরণ এবং ইতিহাসলগ্নতার সঙ্গে; ইগলটন এবং জেমসন উচ্চসংস্কৃতি ও জনসংস্কৃতির সীমানা বিধ্বস্ত হওয়ার মধ্যে লক্ষ করেন পণ্যায়নের সর্বগ্রাসী বিস্তার, জেনক্স লক্ষ করেন উচ্চসংস্কৃতি ও স্থানীয় সংস্কৃতির কাম্য যৌথতা। (দ্র. Wagh, P : 1992) টয়েনবি ১৮৭৫ থেকে পোস্টমডার্ন-এর সূচনা লক্ষ করেন ; জেনক্স ১৫ জুলাই, ১৯৭৭ থেকে পোস্টমডার্ন-এর সূচনা চিহ্নিত করেন ; মার্টিন ট্রেভার্স বেকেট-এর *Murphy* (1938), জয়েস-এর Finnergan's Wake (1939) ; কামু-র The Myth of *Sisyphus* (1942)-কে পোস্টমডার্ন সাহিত্যের অন্তর্গত করেন ; আবার উমবের্তো একো মনে করেন যে পোস্টমডার্নিজম-কে কালপরম্পরার কোনো একটি পর্যায়ের সঙ্গে যুক্ত করে দেখা উচিত নয়, বরং একে প্রতিটি কালপর্বেই উপস্থিত একটি রচনা-প্রবণতা হিসেবেই গ্রহণ করা উচিত। এই ব্যাখ্যাবৈচিত্র্য এবং বহু পারস্পরিক বিপ্রতীপতা যে পরিস্থিতির জন্ম দিয়েছে, তা মনে রেখেই Chris Snipp-Walmsley মন্তব্য করেছেন : "Theories and definitions of postmodernism are everywhere. It is dramatic break from Modernism and a continuation of it ; it is a progressive development from Marxism and a denial and renunciation of Marxism's basic tenets ; it is radically left wing and neo-conservative ; it is both radical and reactionary ; it advocates the dissolution of the grand narratives and, is, in itself, the grand narrative of the end of the grand narratives ;" (২০০৬ : ৪০৫-৪০৬) মন্তব্যটি আরও দীর্ঘ, কিন্তু উদ্ধৃত অংশ থেকেই টের পাওয়া যায় যে পোস্টমডার্নিজম-এর আত্যন্তিক বৈশিষ্ট্য খুব সহজে নির্ধারণ করা যাবে না। অতএব, ব্যাখ্যা-বৈচিত্র্য এবং সার্বিক ও সর্বমান্য সংজ্ঞার অভাবকে মনে রেখেই এই আলোচনায় পোস্টমডার্নিজম-এর কয়েকটি বৈশিষ্ট্য উল্লিখিত হচ্ছে। মনে রাখতে হবে, এই প্রবন্ধে পোস্টমডার্নিজম-এর সবকটি সূত্রের উপস্থাপনাও সম্ভব নয়, বিশ্লেষণ ও যৌক্তিক বিচার তো নয়ই। তাই এই আলোচনাকে পোস্টমডার্নিজম সম্পর্কে একেবারে প্রাথমিক পরিচিতি মূলক একটি আলোচনা হিসেবেই গ্রহণ করতে হবে।

পোস্টমডার্ন শব্দটি ব্যবহারের ইতিহাস অতি দীর্ঘ। ১৮৭০-এ ইংরেজ চিত্রশিল্পী জন ওয়াটকিনস্ চ্যাপম্যান ফরাসি ইমপ্রেশনিস্ট শিল্পের থেকে অগ্রণী (আভাঁ গার্দ) শিল্পকে পোস্টমডার্ন চিত্র হিসেবে চিহ্নিত করেছিলেন। ১৯১৭-তে জার্মানে প্রকাশিত Dei Krisis der Europaischen Kultur-এ 'রুডলফ্ প্যানউইটজ' এই শব্দটি ব্যবহার করেন ইউরোপীয় সংস্কৃতিতে উদ্ভূত নতুন ব্যক্তিত্বের পরিভাষা হিসেবে। এই নতুন ব্যক্তিত্ব আসলে এক ধরনের ফ্যাসিস্ট মানসিকতা। ধর্মতাত্ত্বিক বার্নাড ইডিংস্ বেল ১৯২৬ এবং ১৯৩৯-এ যথাক্রমে *Postmodernism and Other Essays* এবং *Religion for Living* : a *Book for Postmodernists* শীর্ষক দুটি বই প্রকাশ করেন। বেল-এর কাছে পোস্টমডার্নিস্ট হচ্ছে এমন এক ধর্মপ্রাণ মানুষ যে আধুনিক যাবতীয় রাজনৈতিক পথকে বাতিল করে দিয়েছে : "Such

a man is the Postmodern–intellectually humble and spiritually hungry. He who writes this book is one of the breed, who thanks God for the finding of that treasure which his soul desired." (Bell : 1939 :. xvi) আর্নল্ড টয়েনবি তাঁর রচিত *A Study of History*-র প্রথম ছয় খণ্ডের একটি সংক্ষিপ্ত সংস্করণে (১৯৪৭) পাশ্চাত্যের ইতিহাসকে চারটি পর্যায়ে ভাগ করেন। এই পর্যায় বিভাজন অনুযায়ী ৬৭৫-১০৭৫ হচ্ছে ওয়েস্টার্ন—১ (অন্ধকার যুগ) ; ১০৭৫-১৪৭৫ ওয়েস্টার্ন— ২ (মধ্য যুগ) ; ১৪৭৫-১৮৭৫ ওয়েস্টার্ন— ৩ (আধুনিক); আর ১৮৭৫ থেকে শুরু হচ্ছে ওয়েস্টার্ন —৪, যার অভিধা দিতে গিয়ে টয়েনবি লিখেছেন "পোস্ট-মডার্ন"। ১৯৫৪-এ টয়েনবি তাঁর বইয়ের নবম খণ্ডে পোস্টমডার্ন পর্বের বৈশিষ্ট্য আলোচনা করতে গিয়ে বললেন এক দুঃসময়ের কথা, যখন একশো কুড়ি বছরের বিরতির (১৬৭২, ১৭৯২, ১৯১৪) বদলে পঁচিশ বছরের ব্যবধানেই (১৯১৪, ১৯৩৯) যুদ্ধ বাধছে ; পাশ্চাত্যের শক্তিধর রাষ্ট্রগুলিতে বেড়ে চলেছে মৃত্যুহার। ১৯৫৯-এ সমাজতাত্ত্বিক সি রাইট মিলস্ ইউরোপ-এর ইতিহাসে এক নতুন সাংস্কৃতিক পর্যায়ের আবির্ভাব লক্ষ করলেন, যাকে তিনি বললেন পোস্টমডার্ন, এবং যার আত্যন্তিক বৈশিষ্ট্য নির্ধারণ করতে গিয়ে তিনি বললেন যে "The ideological mark of the Fourth Epoch...is that ideas of freedom and of reason have become moot ; that increased rationality may not be assumed to make for increased freedom." (*The Sociological Imagination* : 1959 : P. 167) ক্রমে আরও অনেক তাত্ত্বিকের আলোচনায় পোস্টমডার্ন সম্পর্কে ভাবনা বিবর্তিত হয়েছে, সে বিবর্তনে বেল বা টয়েনবি আলোচিত বৈশিষ্ট্য আদৌ গুরুত্ব পায়নি, নতুনভাবে উপস্থাপিত হয়েছে পোস্টমর্ডার্ন। টয়েনবি-দের ঐতিহাসিক গুরুত্ব মনে রেখেও আমাদের তাই নজর দিতে হবে পরবর্তী আলোচকদের বক্তব্যের প্রতি, যার সঙ্গে বরং মিলস-এর বক্তব্যের কিছুটা যোগ রয়েছে।

পোস্টমডার্ন বৈশিষ্ট্যের আলোচনায় গুরুত্ব পেয়েছে অনির্ণেয়তা, আপেক্ষিকতা, সংকরত্ব, মহাআখ্যানের প্রতি বিরূপতা। *The Cambridge Dictionary of Philosophy*-তে বলা হয়েছে "postmodern philosophy typically opposes foundationalism, essentialism, and realism." (Magnus, B in Robert Audi ed CDP : 1999 : P. 725) জাঁ-ফ্রাঁসোয়া লিওতার পোস্টমডার্নিজম-এর সংজ্ঞা দিতে গিয়ে 'মহাআখ্যানের প্রতি বিরূপতা'-কে পোস্টমডার্নিজম-এর অন্যতম বৈশিষ্ট্য হিসেবে চিহ্নিত করেছিলেন। মহাআখ্যান বলতে লিওতার বুঝেছিলেন এমন সব তত্ত্বকে যা জীবন-শিল্প-ইতিহাসের সার্বিক ব্যাখ্যা হিসেবে কার্যকরী হতে চায়। এর বিপ্রতীপে তিনি তাঁর সমকালে নানা ছোটো ছোটো আখ্যানের উপস্থিতি লক্ষ করেছেন। এইসব 'ছোটো আখ্যান' ঘটনা বা বিষয়ের স্থানীয় ব্যাখ্যা যা স্থান-কাল-পাত্রের স্থানিকতাকে ছাপিয়ে সার্বিক ব্যাখ্যা হয়ে উঠতে চায় না। এমনকি, বিভিন্ন আখ্যানের মধ্যকার যৌক্তিক বিশ্লেষণের জন্য, বৈধতা বিচারের জন্য, বৃহত্তর কোনো ভিত্তির সম্ভাবনাও অস্বীকৃত এই পরিস্থিতিতে। এই চরম আপেক্ষিকতাই পোস্টমডার্ন জ্ঞানতত্ত্বের আত্যন্তিক বৈশিষ্ট্য হয়ে উঠেছে। বাস্তব এবং তার অনুকৃতির মধ্যে যে পার্থক্য দীর্ঘদিন মানা হয়েছে, তার বিলুপ্তিকে পোস্টমডার্ন সময়ের আর একটি বৈশিষ্ট্য হিসেবে চিহ্নিত করা হয়েছে। বদ্রিলার চিহ্নের ইতিহাসে চারটি ঐতিহাসিক পর্যায় চিহ্নিত করেছেন। প্রথম পর্যায়ে রয়েছে সত্য বা বাস্তব, যা নিষ্ঠার সঙ্গে উপস্থাপিত হয় ; দ্বিতীয় পর্যায়ে সেই সত্য/বাস্তব বজায় থাকে, তবে উপস্থাপনার মধ্য দিয়ে তা আবৃত বা বিকৃত হয় ; তৃতীয় পর্যায়ে সেই সত্য/বাস্তবটি অবলুপ্ত

হয়ে পড়ে, যদিও আমরা এই অবলুপ্তিকে ঢেকে রাখতে চাই ; আর চতুর্থ পর্যায়ে চিহ্ন এবং বাস্তবের কোনো যোগাযোগ অবশিষ্ট থাকে না, কেননা 'বাস্তব' বলে কিছু আর আমাদের চেতনায় থাকে না। বদ্রিলার-এর মতে পাশ্চাত্য সমাজে এসেছে এই চতুর্থ পর্যায়, 'অতিবাস্তব'-এর পর্যায়। বদ্রিলার দেখিয়েছেন কীভাবে ইলেকট্রনিক গণমাধ্যমের তথা বিজ্ঞাপনের সর্বব্যাপ্ততার কল্যাণে আমাদের চেতনায় প্রতিকৃতি ছাড়া কোনো 'বাস্তব'-এর উপস্থিতি অসম্ভব হয়ে পড়েছে, অনুকৃতিই হয়ে উঠেছে 'বাস্তব' সম্পর্কে আমাদের বোধের নিয়ন্তা। বিজ্ঞাপনে বা গণমাধ্যমে যে প্রতিকৃতি বা অনুকৃতি উপস্থাপিত হয়, তাই শেষ পর্যন্ত 'মূল' বা 'বাস্তব'টি সম্পর্কে আমাদের বোধের প্রাথমিক এবং একক উৎস হয়ে ওঠে। উমবের্তো একো-র মন্তব্য : 'technology can give us more reality than nature can' (Eco, Umberto : 1993 ; P. 203) আর, এই বোধের মূলে কোনো 'গভীরতা' বা 'অর্থে'র উপস্থিতিতে পোস্টমডার্ন বিশ্বাসী নয়। জেমসন দেখিয়েছেন যে বাহ্যিক রূপ ও অন্তর্গত তাৎপর্যের সম্পর্কে বিশ্বাস বিশ শতকে পাশ্চাত্য চিন্তাজগতে প্রভাবশালী হয়ে থেকেছে। (Jameson উ : ১৯৯৩ : ৭০) মার্কস্‌বাদ, মনোবিশ্লেষণ, অস্তিত্ববাদ, চিহ্নতত্ত্ব— প্রতিটি প্রস্থানই দাঁড়িয়ে আছে ভিত্তি ও বহিঃপ্রকাশের উপস্থিতি মেনে, তাদের মধ্যকার সম্পর্কের উন্মোচন-সম্ভাবনায় বিশ্বাসের নির্ভরে। পোস্টমডার্ন এমন কোনো পার্থক্যের উপস্থিতিতে অবিশ্বাসী। বিভিন্ন উৎস থেকে নেওয়া কৃতিকে অলংকৃতি হিসেবে ব্যবহার করা হয় পোস্টমডার্ন শিল্পে। এক্ষেত্রে উদ্ধৃতি বা প্যারডি কোনো স্বতন্ত্র তাৎপর্যের আয়োজন করে না; বরং তাৎপর্যের অনুপস্থিতিতেই তার বৈশিষ্ট্য। (দ্র. Jameson : ১৯৯২, ১৬৬-৭) চার্লস জেনক্স পোস্টমডার্ন স্থাপত্যের এই বৈশিষ্ট্যকে "radical Eclecticism" (Jencks : 1993 : 283) বলে চিহ্নিত করেছেন। লিওতার এই বৈশিষ্ট্যের মধ্যেই লক্ষ করেছেন সমকালীন সংস্কৃতির আত্যন্তিক বৈশিষ্ট্য : "Eclecticism is the degree zero of contemporary general culture : one listens to reggae, watches a western, eats McDonald's food for lunch and local cuisine for dinner, wears Paris perfume in Tokyo and retro clothes in Hong Kong ; knowledge is a matter for TV games." (Lyotard 1992, 145) তাৎপর্যের তাই অনির্ণেয়তা পোস্টমডার্নিজমের অন্যতম বৈশিষ্ট্য। যৌক্তিকতা এবং যুক্তিহীনতার যে বিভাজন আমাদের সিদ্ধান্তগুলিকে নিয়ন্ত্রণ করে, পোস্টমডার্ন ভাবনায় এই বিভাজনকে লুপ্ত করে দেওয়া হয়। ফলে, যে-কোনো তাৎপর্যের বোধ, যে-কোনো ধারণা, অনিশ্চিত অনির্ণীত হয়ে থাকে ; স্থান-কাল-সত্তার যৌক্তিক পারম্পর্যে ফাটল তৈরি করা হয়।

পোস্টমডার্ন নন্দনেরও অন্যতম ভিত্তি আপেক্ষিকতা, বাস্তব এবং অনুকৃতির বিভেদলুপ্তি, স্থান-কাল-সত্তার পারম্পর্য-রিক্ততা, অনির্ণেয়তা। ফলে পোস্টমডার্ন সাহিত্যে সংরূপগত পার্থক্য ভেঙে পড়ে। জন ফোলেস-এর *The French Lieutenant's Woman* (1969)-এ একটি প্রেমের কাহিনি বলা হয় ইতিহাসের পাঠ্যবইয়ের ধরনে ; ডি এম থমাস-এর *The White Hotel* (1981)-এ কবিতা এবং মনোবৈজ্ঞানিক কেস-স্টাডির মিশ্রসংরূপ দেখা যায়। ১৯৬৩ সালে *র‍্যাউএলা*-তে কোর্তাজার সমান্তরাল দুটি আখ্যানকে এমনভাবে সাজিয়ে নিয়েছিলেন যাতে একটি আখ্যানের একটি পঙ্‌ক্তি বা অর্ধপঙ্‌ক্তির সঙ্গেই যুক্ত হয়ে ছিল অপর আখ্যানের পঙ্‌ক্তি বা তার অংশ। যেমন : "In September of 1880, a few months after the demise of my AND the things she reads, a clumsy novel, in a cheap edition father, I decided to give up my business activities, transferring besides, but

you wonder how she can get interested in things." ইতালো ক্যালভিনো *উনা নোত্তে দ্য ইনভের্নো উন ভিয়াগ্গোতোর-এ* (১৯৭৯) পাঠকের জন্য এক-দুটি নয়, দশ-দশটি আখ্যান সাজিয়ে দিয়েছিলেন। অথচ কোনো আখ্যানই পূর্ণাঙ্গ নয়, প্রতিবার পাঠকের মনে হয় যে সম্পূর্ণ নতুন চরিত্র ও ঘটনাযুক্ত একটি আখ্যান শুরু করেছেন লেখক। কিন্তু প্রতিটি ক্ষেত্রে দেখা যায় একটি আখ্যানের প্রথম অধ্যায় শেষ হওয়া মাত্র আর একটি আখ্যানের প্রথম অধ্যায় শুরু হয়— সব মিলিয়ে কোনো একক পূর্ণাঙ্গ আখ্যান আর গড়ে ওঠে না। গোটা বই থেকে শুরু করে বাক্য পর্যন্ত সমস্ত স্তরে এধরনের প্রকরণ ব্যবহৃত হয়েছে। বেকেট-এর *মলি*-তে কাহিনি শুরু হয় "It is midnight. The rain is beating on the windows." অথচ, কাহিনি শেষ হয় এই মন্তব্যে "It was not midnight. It was not raining." রোব্যে-গ্রিলে সৃষ্টি করেছেন অনির্ণেয় বাক্য, যেমন : "I am alone here now, safe and shelterd. Outside it is raining...outside it is cold, the winds blows between the bare branches...Outside the sun is shining, there is not a tree." (1959) ; "The door of the apartment is ajar, the apartment door is wide open, despite the late hour, the apartment door is closed." (1965) জি . গর্ডন আবার ন্যূনতম বাক্যাংশের অর্থসম্ভাবনাও নষ্ট করে দেন : "a man a woman a man and a woman lovers a couple a son a family a man a woman a man and a woman lovers a couple a son a family a man a woman a man and a woman lovers a couple a son a family a man a woman a man and a woman lovers a couple a daughter a family." (১৯৭৩) জাতীয় শব্দসজ্জার মাধ্যমে। আসলে, সব মিলিয়ে পোস্টমডার্ন শিল্প অনিঃশেষভাবে অনির্ণেয়তার সন্ধানী। লিওতার-এর একটি মন্তব্য এক্ষেত্রে উদ্ধৃতিযোগ্য : "The postmodern would be that which, in the modern, puts forward the unrepresentable in presentation itself ; that which denies itself the solace of good forms, the consensus of a taste which would make it possible to share collectively the nostalgia for the unattainable...the artist and the writer, then, are working without rules in order to formulate the rules of what will have been done. Hence the fact that work and text have the characters of an event...Postmodern wolud have to be understood according to the paradox of the future (post) anterior (modo)." [Lyotard, 1992, 140-50]

মনে রাখা প্রয়োজন, পোস্টমডার্নিজম কোনো সর্বস্বীকৃত তত্ত্ব নয়। ফ্রেডরিক জেমসন যখন পোস্টমডার্ন সংস্কৃতিকে পুঁজিবাদের সাম্প্রতিকতম স্তরের সঙ্গে সম্পৃক্ত করে ব্যাখ্যা করেন তখন তিনি পোস্টমডার্ন জ্ঞানতত্ত্বের বিরুদ্ধে দাঁড়িয়েই তথাকথিত মহাআখ্যান রচনা করেন। ডিক হেবিজ, য়্যুরগেন হাবেরমাস, টেরি ইগলটন, ক্রিস্টোফার নরিস প্রমুখ একের পর এক যুক্তি সাজিয়ে পোস্টমডার্ন জ্ঞানতত্ত্বের বিরোধিতা করেছেন, পোস্টমডার্নদের দাবিকে নস্যাৎ করতে চেয়েছেন। চরম আপেক্ষিকতাবাদের জ্ঞানতাত্ত্বিক কূটাভাসটির স্বরূপ উন্মোচন করতে চেয়ে নর্মান গরাস লিখেছেন : (আপেক্ষিকতাবাদীরা) "democratically cut everybody off from access to what could meaningfully be called either truth or objectivity with the single exception, dear to all relativist, of themselves. Overtly denying that there is any being-as-such, any in-itself, in terms of which competing

discourses might be adjucated they install somewhere out of sight a secret tribunal of truth, mysterious in its ways, which allows them to judge here : as essentialist, hence wrong about the nature of the world ; as economists, thus unable to understand the reality of the social ; as detreminist, there misconstructing history's actual openess etc. ; which allows them to employ a language of external reference, of objectivity, of truth...which allows them that long, that tireless, that never ending "this is how it is" with which the relativist tells you only you can not say "this is how it is." (Geras, N: 1990 : 163, Q : Norris, C : 1993 : 292) আপেক্ষিকতার প্রয়োজনীয়তা আলোচনা করতে গিয়ে অনেকেই দেখিয়েছেন যে সত্য, বাস্তব, যুক্তিবাদে বিশ্বাস মানুষের ইতিহাসে নিপীড়নের সহায়ক হয়েছে। ক্যাথারিন ব্যালসে এই যুক্তি দিতে গিয়ে বলেছেন : "the Enlightenment commitment to truth and reason, we can now see, has meant historically a single truth and a single rationality which have conspired in practice to legitimate the subordination of black people, the non-western world, women...None of these groups has any political interest in clinging to the values which have consistently undervalued them. The plurality of the postmodern, by contrast discredits on the part of any single group. It celebrates difference of all kinds, but divorces difference from power." (Belsey, C : 1991 : pp. 257-70, Q. Norris, C : 1993 : 287) নরিস এই যুক্তির উত্তর দিতে গিয়ে দেখিয়েছেন যে যেহেতু পোস্টমডার্ন আপেক্ষিকতা কোনো ঘটনা বা প্রবণতাকে আত্যন্তিকভাবে অত্যাচারী বা অন্যায় বলে বিচারের কোনো সম্ভাবনা স্বীকারই করে না, তাই পোস্টমডার্নিজম ব্যালসে উল্লিখিত অন্যায়গুলির প্রতিরোধে কোনো কার্যকরী ভূমিকা পালন করতে অক্ষম। বিজ্ঞানের সূত্রের নির্ভরেও আপেক্ষিকতা এবং অনির্ণেয়তার তত্ত্বকে প্রতিষ্ঠা দেওয়ার চেষ্টা করা হয়ে থাকে। অনেক বিজ্ঞানী এ ধরনের যুক্তির সমালোচনা করেছেন। অ্যালান সোকাল এবং জাঁ ব্রিকমো পোস্টমডার্নদের রচনায় বৈজ্ঞানিক ধারণাগুলির বিকৃতি সম্পর্কে বিস্তৃত আলোচনা করেছেন। পোস্টমডার্ন ভাবুকরা অনেকসময় অনির্ণেয়তা এবং আপেক্ষিকতার তত্ত্বকে বৈজ্ঞানিক আবিষ্কারের নির্ভরে বৈধতা দিতে চেয়েছেন। সোকাল এবং ব্রিকমো দেখিয়েছেন যে পোস্টমডার্নবাদীদের বিজ্ঞানবোধ প্রায়শই ভুল। এ-বিষয়ে একটি আলোচনা প্রকাশিত হয়েছিল 'জিজ্ঞাসা' পত্রিকায়। লেখক বিজ্ঞানী অমিতাভ চক্রবর্তী। সোকাল-ব্রিকমোর আলোচনা নিজস্ব মন্তব্যসহ উপস্থাপন করেছেন তিনি। তিনি লিখেছেন :

(ক) "(পল ভালেরি লিখেছেন) "It seems to be necessary to reconsider the importance of the notions of ACCELERATION and of DECELERATION (positive and negative velocities according to physicists)" (*in Rethinking Technologies*, Univ. of Minnesota Press, 1993) গতিবেগের দিক (pos. and neg. vol) এবং ত্বরণের তফাত সম্পর্কে অজ্ঞান এই ভদ্রলোক। আমি সহকর্মীদের এটি পড়ে শোনালাম। তারা হাসতে গিয়ে ঘাবড়ে থেমে গেল— 'অজ্ঞতা এত দূর?'...সোকাল এই উদাহরণের পরে এই সম্পর্কে উচ্ছ্বসিত রিভিউ থেকে উদ্ধৃতি দিয়েছেন : "This work contradicts definitively those who think that postmodernism is only a fashionable word or snobbism." [অমিতাভ চক্রবর্তী : ১৮০৫ : ২০৬]

(খ) "উত্তর আধুনিকদের 'নূতন বিজ্ঞান' আবিষ্কারের এক বিচিত্র উদাহরণ লিওতার-কৃত বায়ুর ঘনত্ব পরিমাপ (measurement of density) বিষয়ক আলোচনা। Statistical mechanics প্রথমেই বলে দেয় ঘনত্ব, তাপমাত্রা প্রভৃতির সংজ্ঞা একটি (এমনকি অতি অল্পসংখ্যক) অণু সম্পর্কে প্রযোজ্য নয়। এগুলি বহুসংখ্যক অংশীদারের emergent quantities এবং statistical average-এর মাধ্যমে নির্ধারিত হবে। লিওতার এই প্রাথমিক নিয়ম সম্পর্কে অচেতন মনে হয়। তিনি বলেছেন একটি অণুর পরিমাপের ভল্যুম বেছে নিয়ে সেইটুকুর ঘনত্ব মাপা যাক। যখন সেটি একটি অণুদ্বারা অধিকৃত থাকবে তখন ঘনত্ব অতি উচ্চ এবং সেই অণুটি সরে গেলেই সহসা ঘনত্ব শূন্য হয়ে যাবে। এই ঘনত্ব নির্ধারণ যে অর্থহীন তা বিজ্ঞানীরা বহুকাল থেকে জানেন। কিন্তু তাই সব নয়। লিওতার বলেছেন এইভাবে দেখা যায় কোয়ান্টাম মেকানিক্স্ ও microphysics কীভাবে বিজ্ঞানকে unstability পূর্ণ করে দিয়েছে। এই উদাহরণ ও যে পুস্তকের কথা (Jean Perrin লিখিত *Les Atomes*) লিওতার এই প্রসঙ্গে উল্লেখ করেছেন তার কোয়ান্টাম মেকানিক্স-র সঙ্গে সংশ্রব নেই। পেরাঁর আলোচ্য বিষয় Brownian movement— একটি ক্ল্যাসিক্যাল বিষয়।" [তদেব : ২০৪]

বিজ্ঞানী স্ক্যাফারও দেখাতে চেয়েছেন যে বিজ্ঞানের এসব সূত্রের প্রয়োগক্ষেত্র আমাদের দৈনন্দিন বাস্তব থেকে বহু দূরে এবং বিজ্ঞান নিজেও ওই সব তত্ত্বের প্রেক্ষিতে সত্য বা বাস্তবের ধারণাকে বিসর্জন দিয়ে দেয়নি। অনির্ণেয়তার প্রয়োগক্ষেত্র সম্পর্কে আলোচনা করতে গিয়ে একটি আকর্ষণীয় উদাহরণ দিয়েছেন স্ক্যাফার : "Suppose we take a Honda Civic Automobile (weight about one ton) and specify its velocity to within one-billionth of a mile per hour (i.e. 0.000000001), obviously much greater precision than currently measurable. Given this uncertainity in the velocity, what is the uncertainity in the postion of the vehicle? The Heisenberg principle tells us that the position of Honda Civic is uncertainity by about one-billionth of a meter (i.e. 0.0000000000000000000000000001)." (Seaefer, H. F. : 2002)

আর বাস্তবের আপেক্ষিকতা সম্পর্কে তাঁর মন্তব্য : "molecules emit and ebsorb photons wheather anyone observs them or not. Atmoseric chemistry took place long before the technique of modern chemical kinetics were developed. Molecules existed in intersteller space billions of years before the appearance of humankind etc. etc." (Scaefer, H. F. : 2002)

অমিতাভ চক্রবর্তী তাঁর নিজস্ব অভিজ্ঞতা থেকে উপরোক্ত প্রবন্ধে মন্তব্য করেছেন যে বিজ্ঞানীরা স্বয়ং তাঁদের গবেষণায় চরম মহাতত্ত্বের সন্ধান ছেড়ে দেননি, চরম সত্যতা বা ব্যাখ্যার সম্ভাবনা মেনে নিয়ে সে সন্ধান চালিয়ে যাচ্ছেন : 'Standard model, M-theory' প্রভৃতি সবই চরম master-theory অন্বেষণের পথে লব্ধ ফলাফল।...তাই বলি, বিজ্ঞানের লক্ষ্যের বিষয়ে incredulous যে হতে চায় সে হোক কিন্তু বিজ্ঞান কোনো এক অর্থে 'postmodern', হয়ে পড়ে final-theory অন্বেষণ-বিমুখ এই ধারণা বিজ্ঞান সম্পর্কে পরিচিতি ও বোধের অভাব ব্যতীত অন্য কিছু নয়।' (অমিতাভ চক্রবর্তী : ১৪০৫ : ১৭২) সবচেয়ে বড়ো কথা, সাহিত্যে এখনও এমন বহু কৃতি প্রকাশিত হচ্ছে যা পোস্টমডার্ন অনির্ণেয়তাকে আশ্রয় করে না। এমনকি যেসব রচনায় পোস্টমডার্ন লিখনপ্রযুক্তির ব্যবহার রয়েছে, সেসব রচনাও অনেক ক্ষেত্রে পোস্টমডার্ন বিশ্বাস জগতের বিপ্রতীপে দাঁড়িয়ে তাৎপর্যের সন্ধান করছে।

তবে, জ্ঞানতত্ত্ব, বিশেষ করে বৈজ্ঞানিক অনুসন্ধানের ক্ষেত্র ছেড়ে দিলে, নান্দনিক অভিজ্ঞতা, শৈল্পিক নির্মিতি, এবং দার্শনিক পরিপ্রশ্নের জগতে পোস্টমডার্ন ভাবনা যথেষ্ট প্রভাবী হয়ে রয়েছে।

তবে, সাহিত্যের প্রকরণে অনির্ণেয়তার আয়োজন কীভাবে হয়, সেই অনির্ণেয়তার সঙ্গে বিষয় বা ভাবাদর্শের সম্পর্কের বিন্যাস কেমন হতে পারে, তা বোঝার জন্য কয়েকটি সাহিত্যকৃতি এখানে বিস্তৃতভাবে বিশ্লেষণ করা প্রয়োজন।

জাপানের হারুকি মুরাকামি পোস্টমডার্ন সাহিত্যিক হিসেবে পরিচিত ব্যক্তিত্ব। ইহাব হাসান-এর মতো পোস্টমডার্ন-গুরু হারুকি মুরাকামি এবং ইয়াসুয়ো তানাকাকে পোস্টমডার্ন সাহিত্যিক হিসাবে চিহ্নিত করেছেন। মুরাকামি-র গোয়েন্দা সাহিত্য *A Wild Sheep Chase* (Hitsuji O meguru boken, 1982) পোস্টমডার্ন সাহিত্য হিসেবে ইতোমধ্যে প্রায় ক্লাসিকের মর্যাদা অর্জন করেছে। বইটির মলাটেই জানিয়ে দেওয়া হয়েছে—"A postmodern detective novel in which dreams, hallucinations and wild imagination are more important than actual clues." পোস্টমডার্ন সাহিত্য হিসেবে একে চিহ্নিত করতে গিয়ে সমালোচকরা লক্ষ করেছেন, এর মধ্যে জনসাহিত্য ৎসুজোকু-শোৎসৎসু এবং বিশুদ্ধ সাহিত্য বা জুসবাংগুকুর মধ্যবর্তী সীমানা এমনভাবে ভেঙে দেওয়া হয়েছে যে এর স্থান কোন্ ঘরানায় হবে, তা অনির্ণেয় হয়ে পড়েছে।

উপন্যাসটির নায়কই এর কথক 'আমি' বা বোকু। একটি বিজ্ঞাপন সংস্থার মালিকানার অংশীদার ছিল সে। কিন্তু এক দক্ষিণপন্থী প্রভাবশালী সেক্রেটারির চাপে সে বাধ্য হয়েছে মালিকানার অংশ ছেড়ে দিয়ে একটি ভেড়ার সন্ধানে বেরিয়ে পড়তে। ভেড়াটির পিঠে তারকার মত একটি জন্মচিহ্ন রয়েছে। নায়ক এই ভেড়াটিরই ছবি ব্যবহার করেছিল এক ইনস্যুরেন্স কোম্পানির বিজ্ঞাপনে। ছবিটি তার এক বন্ধুর তোলা। এই বন্ধু আবার বহু বছর আগে নিখোঁজ হয়ে গিয়েছিল এবং আপাতত যতটুকু জানা গেছে, সে হোক্কাইডোতে উদ্দেশ্যহীন ভাবে ঘুরে বেড়াচ্ছে। বোকুকে এই ভেড়ার সন্ধানে একবার হোক্কাইডো দৌড়াতে হয়। এই সন্ধানে বেরিয়েই সে এক অদ্ভুত পরিস্থিতির সম্মুখীন হয়। কিছু অদ্ভুত চরিত্রের সঙ্গে দেখা হয় তার, তারা তাকে শোনায় তারকাচিহ্নিত ভেড়াটির আত্মার কাহিনি, যে আত্মা নাকি ক্রমে একাধিক মানুষের মধ্যে প্রবিষ্ট হয়েছে, এর মধ্যে সেই দক্ষিণপন্থী নেতা রয়েছে, রয়েছে বোকুর সেই বন্ধুও। গোটা আখ্যানের বয়ন পদ্ধতিতে কার্য-কারণ পরম্পরা বারবার বিধ্বস্ত করে দিয়েছেন লেখক। যেমন, প্রথম অধ্যায়টির বিষয়বস্তুর সঙ্গে মূল কাহিনির কোনো যোগাযোগ নেই। অধ্যায়টিতে বর্ণিত হয়েছে বোকুর সঙ্গে তার কলেজ জীবনের এক মহিলার সম্পর্কের কথা, যার অন্ত্যেষ্টিতে কয়েকদিন আগেই বোকু অংশ নিয়েছে। মূল কাহিনির ইঙ্গিত পাওয়া যায় দ্বিতীয় অধ্যায়ে, ইঙ্গিতপূর্ণভাবে ইংরেজি অনুবাদে যার শিরোনাম "July, Eight years Later"। কাহিনিতে এধরনের ব্যর্থের আয়োজনেই লেখক গোয়েন্দা কাহিনির চরিত্রধর্মটিকে যেন এক অনিশ্চিতিতে ফেলে দেন।

বোকুর সত্তায় কোনো লগ্নতার আয়োজন করেননি লেখক। তাই দেখি পরিবারের স্মৃতি তার সত্তার গঠনে কোনো ভূমিকা পালন করে না। এমনকি তার প্রাক্তন স্ত্রীর স্মৃতিও তার সত্তার অবয়বে কোনো ভূমিকা রাখে না। এসব বৈশিষ্ট্যের ফলেই, বোকুর পূর্ণাঙ্গ অবয়ব সম্ভাবনাই একধরনের প্রশ্নের মুখোমুখি হয়। তার সত্তায় এর ফলে একধরনের

অর্থসম্ভাবনাশূন্যতা বা অন্যার্থের সৃষ্টি হয়, তার সত্তার কোনো সার্বিক নিশ্চিত অবয়ব অনুমান করা এই প্রেক্ষিতে অসম্ভব হয়ে পড়ে। তাই তার বাচনেও এক ধরনের অর্থহীনতাই প্রবলতম থাকে। তার স্ত্রীর সঙ্গে বিবাহবিচ্ছেদকালে বিতর্কে তার মন্তব্য—"আমি ব্যাখ্যা করছি না, শুধু কথা বলছি", বাচনের নিরর্থকতাই প্রতিষ্ঠা করে। এই বিবাহবিচ্ছেদও তার সত্তার বিবর্তনে কোনো ভূমিকা পালন করে না, সে কিছুটা দুঃখিত হয়, তারপর গোটা ব্যাপারটাই যেন তার চেতনা থেকে মুছে যায়। এভাবেই তার চরিত্র অর্জন করে বিভিন্ন স্তরের মধ্যে অসম্বন্ধের বৈশিষ্ট্য। শেষ পর্যন্ত বোকুকে তার বন্ধুর আত্মা জানায় যে সে-ই ভেড়াকে হত্যা করেছে।

সব মিলিয়ে অবশ্য এই কাহিনির কোনো নির্ণেয় তাৎপর্য আবিষ্কার করা সম্ভব হয় না। কেন যে ভেড়াটির আত্মা সেই দক্ষিণপন্থী নেতার মধ্যে ঢুকে পড়ে, কেন সেই নেতার সচিব জাপান-এ ভেড়ার আমদানির ইতিহাস বর্ণনা করে, কেন সেই আত্মা নেতার মৃত্যুর ঠিক আগে সেই বন্ধুর মধ্যে আশ্রয় নেয়— এসব প্রশ্নের কোনো নিশ্চিত উত্তর কাহিনি থেকে উদ্ধার করা সম্ভব নয়। এমন নয় যে সমালোচকরা এর কোনো ধরনের তাৎপর্য নির্ণয়ের চেষ্টা করেননি। মিৎসুও সেক্কি-র ব্যাখ্যায় ভেড়াটি খ্রিস্টীয় প্রতীচ্য সমাজের প্রতীক, জাপান যাকে আত্মস্থ করতে চেয়েছে তার আধুনিকীকরণের প্রচেষ্টায়। তার মৃত্যু আসলে আধুনিকতার মৃত্যুরই প্রতীক। আবার কাজুও কুরোতি-র মতে এই কাহিনি আসলে বোকুর হারানো যৌবনকে সন্ধানেরই কাহিনি। তবু অনির্ণেয়তার যাবতীয় উপাদানকে এই আলোচনাগুলোতে ব্যাখ্যা করা সম্ভব হয়নি। আসলে এই রচনায় অনির্ণেযতার উপাদানগুলির পাশাপাশি এমন একটি আখ্যান সম্ভাবনা যুক্ত করা হয়েছে, যাতে কিছু ব্যাখ্যা সম্ভাবনা তৈরি হয়, কিন্তু বোকু-র চরিত্রে অর্থশূন্যতার পরিসর এত প্রবল, কাহিনির ভেড়াটির তাৎপর্য এত অনিশ্চিত যে শেষপর্যন্ত সব মেলানো নিশ্চিত ব্যাখ্যায় আর পৌঁছোনো হয়ে উঠে না।

লক্ষণীয় মুরাকামি স্বয়ং তাঁর এই গ্রন্থ বৈশিষ্ট্যের সঙ্গে কোনো সামাজিক ভাবাদর্শকে যুক্ত করেননি, বরং নান্দনিক নিরীক্ষাব তাগিদই স্বীকার করে নিয়েছেন। মুরাকামি নিজেই জানিয়েছেন যে ভেড়াটিকে এই কাহিনির চাবিকাঠি হিসেবে ব্যবহার করার পেছনে কোনো গভীর তাৎপর্যের ভাবনা ছিল না। (দ্র. Iwamoto, y : 1993)

এই অনির্ণেয়তার বৈশিষ্ট্যই কিন্তু কযেকজন সাহিত্যিকের রচনায় ব্যবহৃত হয়েছে নির্ণেয় তাৎপর্য্য সৃষ্টিতে এবং সোচ্চাব সামাজিক ভাবাদর্শ প্রকাশের তাগিদে।

কার্ল ফিলিপস-র *Crossing the River*-এ অপক্রমের ব্যবহার খুবই স্পষ্ট। ফিলিপস্ নিজেই *Crossing the River* সম্পর্কে মন্তব্য করেছেন যে সেটি "novel which is fragmentary in form and structure, polyphonic in its voices, which means that a lot of my reading and a lot of the people whose work I've enjoyed have made their way in." [Q Megnnis, G]

উপন্যাসটিতে সময়গত অপক্রম প্রচুর। আফ্রিকায় ন্যাশ-এর বাবার, ন্যাশ, মার্থা এবং ট্রাভিস-কে দাস হিসেবে বিক্রি করার মধ্যে দিয়ে কাহিনির আরম্ভ। তারপর কাহিনির প্রথম পর্বে আমেরিকায় ন্যাশ-এর জীবন, মধ্যপর্বে মার্থা-র জীবন বর্ণিত। মার্থার কাহিনি উপন্যাসটির গঠনে গুরুত্বপূর্ণ। দাসপ্রথার সময় এবং তারপরও আমেরিকা-য় মার্থা-র বেঁচে থাকার কাহিনি বিবৃত হয়েছে; যে কাহিনির অঙ্গ দাসী হিসাবে তার কন্যা এলিজা-র বিক্রি হয়ে যাওয়া, এমনকি

নিজের স্বামী লুকাস-এর সঙ্গেও তার বিচ্ছেদ, যার পর সে "no longer possessed either a husband or a daughter, but her 'memory' of their loss was clear" দাসপ্রথার অবসানের পরও সে আমেরিকান সমাজের অন্তর্লীন দাসপ্রথা-বিশ্বাস থেকে মুক্তি পায় না, দাসত্বের স্মৃতি তার সত্তার সঙ্গে জড়িয়ে থাকে, চেস্টার-এর সঙ্গে তার দ্বিতীয় বিবাহের পরবর্তী সুখী জীবনেও। তার উক্তি—"I was free now...I was more contended, not on account of no emancipation proclamation, but on account of my Chester." কিন্তু চেস্টার খুন হয় এবং মার্থা-র জীবনে দাসত্বের স্মৃতি জাগরূক থাকে। অন্তিমে থাকে ট্রাভিস-এর প্রেমিক জয়েস-এর কাহিনি। জয়েস এক শ্বেতাঙ্গিনী, যে ট্রাভিস নামক এক কৃষ্ণাঙ্গর প্রণয়িনী, যে ট্রাভিস আসলে মার্থা-র ভাই, দাস হিসেবে বিক্রিত ট্রাভিস-এরই প্রতিরূপ। এই অন্তিম পর্বেই দেখি সময়-রেখার অপক্রম। জয়েস-এর 'জার্নাল'-এর প্রথম তারিখ-জুন ১৯৪২, দ্বিতীয় তারিখ— জুন ১৯৩৯, তৃতীয় তারিখ— আগস্ট ১৯৩৯ ; এভাবেই ১৯৬৩ পর্যন্ত সময়রেখা বর্ণিত হয়। কিন্তু, এই অপক্রম শেষ পর্যন্ত কাহিনিকে কোনো চরম অনির্ণেয়তার দিকে ঠেলে দেয় না, বরং লগ্ন থাকে আফ্রিকান দাসদের লাঞ্ছিত ইতিহাসের নব নির্মাণ প্রয়াস। সম্ভব হয় তাই সমালোচকের মন্তব্য—

"It is abvious that Carlyl Phillips chooses not to rely on a traditional linear narrative to convey the principle meaning of the book...Phillips's book does not defy linear narrative to the extent that "meaning" itself is sacrificed..." [McInnis, Y]

ভাবাদর্শগতভাবে বিচার করলে ফিলিপস-এর এই রচনায় ইতিহাসে প্রান্তিকায়িত বর্গের সঙ্গে সংলগ্নতার প্রবণতাই স্পষ্ট হয়ে উঠে। ইতিহাসে যারা এতদিন জায়গা পায়নি, তাদের কথা বলার ঐতিহ্যেই বোধ্য ফিলিপস-এর রচনাটি।

অর্থাৎ, সাহিত্যকৃতিতে অনির্ণেয়তার উপস্থিতির মাত্রা বিচিত্র, তার ভাবাদর্শগত সংলগ্নতাও বহুমুখী, সুতরাং খুব সরলরৈখিক ভাবে পোস্টমডার্ন প্রকরণ, পোস্টমডার্ন ভাবাদর্শ এবং অন্যান্য ভাবাদর্শের সম্পর্ককে অনড় ধরে নিলে আমরা ভুল করব, এদের সম্পর্কের জটিলতা সম্পর্কে আমাদের সচেতন থাকতে হবে।

পোস্টমডার্নিজম মূলত প্রতীচ্য তত্ত্বভাবনা। লিওতার 'পোস্টমডার্ন পরিস্থিতি' লক্ষ করেছেন 'অতি উন্নত সমাজগুলির জ্ঞান-বিজ্ঞান ও প্রযুক্তিতে'। অন্য তাত্ত্বিকরাও মূলত প্রতীচ্যের সামাজিক এবং নান্দনিক অভিজ্ঞতার ভিত্তিতেই পোস্টমডার্নকে অনুভব এবং উপস্থাপিত করেছেন। বদ্রিলার চিহ্নের যে ইতিহাস রচনা করেছেন, তাতে পাশ্চাত্য সমাজে চিহ্ন এবং বাস্তবের সম্পর্কের সম্পূর্ণ বিচ্ছেদ, বাস্তবের লুপ্তি এবং চিহ্নের সর্বব্যাপ্তির কথাই বলা হয়েছে। কিন্তু প্রতীচ্যে উদ্ভূত অন্য যে-কোনো তত্ত্বের মতোই পোস্টমডার্নিজমও, সাম্প্রতিক বিশ্বের কেন্দ্রীয় সমাজগুলিতে গুরুত্ব পাওয়ার ফলে, কেন্দ্রের উপর নির্ভরশীল পরিধিগুলিতেও গৃহীত হয়েছে। বাঙালির ভাবনায়ও তাই পোস্টমডার্নিজম গুরুত্ব অর্জন করেছে। একদল আলোচক যেমন পোস্টমডার্নিজমকে নানাভাবে বিশ্লেষণ করে চলেছেন নিজেদের তাত্ত্বিক এবং সাংস্কৃতিক পটভূমিতে, তেমনি আবার আরেকদল পোস্টমডার্নবাদী অবস্থান গ্রহণ করেছেন। 'কবিতা পাক্ষিক', 'কালিমাটি', 'দধীচি', 'ছন্নছাড়া', 'হাওয়া ৪৯'-এর মতো ছোটো পত্রিকার আশ্রয়ে বাংলায় পোস্টমডার্নিজম লালিত হচ্ছে। মলয় রায়চৌধুরী, সমীর রায়চৌধুরী, প্রভাত সরকার

প্রমুখ বাংলায় পোস্টমর্ডানিজম চর্চা করে চলেছেন। নিয়মিতভাবে বাংলায় পোস্টমডার্ন তাত্ত্বিকদের এবং তত্ত্বসূত্রগুলির পরিচায়িকা প্রবন্ধ প্রকাশ করে চলেছেন এঁরা। এঁরা পোস্টমডার্ন পরিস্থিতিকে বিশ্বপরিস্থিতি এবং একমাত্র গন্তব্য হিসেবে উপস্থাপন করতে চেয়েছেন। সমীর রায়চৌধুরীর কাছে "পোস্টমডার্নিজমকে এড়িয়ে যাওয়া সম্ভব নয়, সে যে এই সময়ের কালধর্ম।" জহর সেন মজুমদার মনে করেন "আমরা সরে এসেছি পোস্টমডার্ন যুগে।" উন্নততম প্রথম বিশ্বের সম্পূর্ণ ভিন্ন পরিবেশের বিশ্লেষণে পরিকল্পিত একটি তত্ত্ব কীভাবে তৃতীয় বিশ্বের একটি দেশের সংস্কৃতির অভিধা হয়ে উঠতে পারে, সে-সম্পর্কে কোনো বিতর্কে না-গিয়েই এসব সূত্র উচ্চারিত হয়েছে; মূল তাত্ত্বিক ধারণাগুলিকে দেশ-কালের পটভূমিতে বিচার বা পরিবর্তনের কোনো উদ্যোগও নেওয়া হয়নি। সাহিত্যক্ষেত্রেও পোস্টমডার্ন সাহিত্যের প্রেরণায় এঁরা বাংলা সাহিত্যে নতুন সুর সংযোজন করতে চেয়েছেন। আবার, পোস্টমডার্নপন্থী হিসেবে চিহ্নিত বাঙালি সাহিত্যিক এবং ভাবুক ছাড়াও অনেকে পোস্টমডার্নিজম সম্পর্কে সচেতন থেকেছেন। প্রদীপ বসু, তপোধীর ভট্টাচার্য, পার্থপ্রতিম বন্দ্যোপাধ্যায়, সালাহউদ্দিন আইয়ুব, সত্যজিৎ বন্দ্যোপাধ্যায় প্রমুখ কখনও পোস্টমডার্ন প্রস্থানকে নিজেদের বিশ্লেষণী আয়ুধ হিসেবে ব্যবহার করেছেন, কখনও পোস্টমডার্ন ভাবনার বিশ্লেষণ করেছেন স্বতন্ত্র প্রেক্ষিতে। পোস্টমডার্নিজমের উদ্ভবের পটভূমি এবং তৃতীয় বিশ্বের বাস্তবতায় পোস্টমডার্নিজমের প্রাসঙ্গিকতা বিশ্লেষণ এঁদের আলোচনার অন্যতম বিষয়। প্রদীপ বসু পোস্টমডার্ন ভাবানাসূত্রের সাহায্যে নকশালপন্থীদের সঙ্গে মূলস্রোতের বামপন্থীদের এবং নকশালদের নিজেদের মধ্যকার মতাদর্শগত সংগ্রামকে ব্যাখ্যা করতে চেয়েছেন। এই সংগ্রাম তাঁর ব্যাখ্যায় প্রাধান্যকারী ভাষ্য এবং প্রান্তিক ভাষ্যের দ্বন্দ্ব। পোস্টমডার্ন প্রকল্পের আকর্ষণীয় এবং প্রয়োজনীয় দিকগুলি সম্পর্কে সচেতন থেকেও সালাহউদ্দিন আইয়ুব গুরুত্ব দিয়েছেন এই সত্যটিতে যে পোস্টমডার্ন-এর "ডিসকোর্সে তৃতীয় বিশ্ব এবং আমরা একটা বিশাল অনুপস্থিতি মাত্র"। তপোধীর ভট্টাচার্যও মানেন যে প্রাচ্য ও প্রতীচ্যের 'ইতিহাস নির্দিষ্ট অবস্থানগত ভিন্নতা'র পটভূমিতে বিবেচনা এবং আত্তীকরণ করতে হবে প্রতীচ্যের পোস্টমডার্ন ভাবনাকে। পার্থপ্রতিম বন্দ্যোপাধ্যায় এবং সত্যজিৎ বন্দ্যোপাধ্যায়ও দেশজ বাস্তবে দাঁড়িয়ে পোস্টমডার্ন উপাদানগুলির 'প্রভাব ও তজ্জনিত প্রতিক্রিয়াকে' বুঝে নেওয়ার কথা বলেন। এঁরা পোস্টমডার্নের অভিযাত্রায় এক আধিপত্যবাদের বিস্তার লক্ষ করেছেন। সত্যজিৎ লক্ষ করেছেন যে পোস্টমডার্ন তত্ত্বে লালিত অনির্ণেয়তা কোনোভাবেই বাস্তব অর্থনীতির আধিপত্যবাদকে প্রভাবিত করে না : "ধনতন্ত্রের আধুনিকোত্তর পর্বেও তৃতীয় দুনিয়ার দেশগুলিতে বহুজাতিক পুঁজির অনুপ্রবেশ ও নিয়ন্ত্রণ-প্রক্রিয়া কোনও অনির্দেশ্যতার সামনে দাঁড়িয়ে নেই।" পার্থপ্রতিম মনে করেন যে পোস্টমডার্ন আসলে "তথাকথিত তৃতীয় বিশ্ব সম্পর্কে উদাসীন, এ বিশ্বের শোষক প্রথম বিশ্বের নিজ ইতিহাসগত একটি প্রক্রিয়া"। তৃতীয় বিশ্বে পোস্টমডার্ন-এর বিস্তারের মধ্যে তিনি লক্ষ করেন পশ্চিমের নব্য ঔপনিবেশিক বিস্তার "ঠিক রেনেসাঁসের ধারণার ক্ষেত্রে আমরা যেমন সমাজ ইতিহাস রাজনীতি নিরপেক্ষ ভাবে ভেবেছিলাম, এখানেও তাই : দুঃস্থ সব উপনিবেশের ভাঙন ও নৈরাজ্যের মধ্যে পোস্টমডার্নের উপমা খুঁজছি...।" বর্তমান বিশ্বব্যবস্থায় প্রথম বিশ্ব এবং তৃতীয় বিশ্বের বিন্যাস কীভাবে তত্ত্বের ইতিহাসকেও প্রভাবিত করে, সে সম্পর্কে সচেতন বলেই এই সমালোচকরা পোস্টমডার্ন ধারণাগুলির প্রাসঙ্গিকতা বিচার করতে চান সতর্কভাবে, তার চলনের রাজনীতিকে উপলব্ধি করতে চান আপন দেশ-কালগত অবস্থানের পটভূমিতে।

পোস্টমডার্ন ভাবনার পাশাপাশি পোস্টমডার্ন সাহিত্যের আত্যন্তিক প্রকরণও বাংলা সাহিত্যে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ হয়ে উঠেছে। দেবীপ্রসাদ সিংহের 'একদুপুর' গল্পে দেখা যায় আদি-মধ্য-অন্তের কাঠামোটি বজায় রেখেও অযুক্তি আর ক্রমভঙ্গের সাহায্যে গল্পটাকে ঠেলে দেওয়া হয় চরম অনির্ণেয়তার দিকে। 'সে', প্রদীপ, ঘোষদার দোকান ঘিরে গল্পের আবহ তৈরি হয়; 'সে' সেখানে মূল কথক। ঘোষদার দোকান থেকে 'সে' বেড়িয়ে পড়ে 'কৃষ্ণার ওখানে' যাবার সংকল্প জানিয়ে। তারপরই তৈরি হয় মেয়েটির গল্প। বল-ফেরত-চাওয়া কিছু শিশুকণ্ঠের সূত্রে জানতে পারি যে মেয়েটির নাম কৃষ্ণাই। অথচ হঠাৎ করে তার ঘরে আসে, 'সে' নয়, অমিতাভ বচ্চন; দুজনের মিলন হয়। তারপর দেখি মেয়ের ধর্ষণের খবর পান মা হেমলতা। তখন তিনি তাঁর প্রতিক্রিয়ার বর্ণনায় লেখা হয় : "হেমলতা চশমার কাচ মুছে টেবিলে নামিয়ে রাখলেন। তারপর সমবেত শিক্ষক-শিক্ষিকা মণ্ডলীকে বললেন— এই তো অবস্থা, দেশের! আমার মেয়েকে বাড়িতে একা পেয়ে একটা লোক —। সবাই হেসে উঠল। মুচকি হেসে হেমলতা বসে পড়ে বললেন— এই জন্যই তো বন্ধুগণ আমি বলি সামনের মাস থেকে আমাদের পে স্কেল চেঞ্জ না করলে এই পরিস্থিতির আমূল পরিবর্তন অসম্ভব। সমবেত করতালিতে তাঁর গলা ডুবে গিয়েছিল।" সুবিমল মিশ্রের *সত্য উৎপাদিত হয়* বা *ওয়ান পাইস ফাদার মাদার* জাতীয় উপন্যাসে আবার আদি-মধ্য-অন্তের আদলটুকুও থাকে না। *সত্য উৎপাদিত হয় শীর্ষক* রচনাটির একেবারে প্রথম পৃষ্ঠাতেই রচনাটির সংরূপ নিয়ে সংশয় গড়ে তোলা হয়; লেখা হয় "হয়তো/গল্প/হয়তো/উপন্যাস/হয়তো/উপন্যাসের/মৃত্যুও।" তারপর ১০৯ পৃষ্ঠা জুড়ে আছে অসংলগ্ন-অসম্বন্ধ উপাদানের সজ্জা। ব্যবহৃত হয় মানদা দেবীর 'শিক্ষিতা পতিতার আত্মচরিত' থেকে বহু অংশ, বিভিন্ন ভাষা ও লিপি, যেগুলি সম্পর্কে স্বয়ং গ্রন্থকার জানিয়েছেন "কোনো ভাষাই আমি জানিনা, শুধু তাদের শারীরী রূপ চিনি মাত্র।" পর্নোগ্রাফির টুকরো, যৌনকর্মীদের সন্তানদের সমসা বিষয়ক সংবাদ, যৌন প্রতিবন্ধীদের সম্পর্কে গুরুগম্ভীর রচনা, পারভারসনের কেতাবি সংজ্ঞা— সবই এই রচনায় ব্যবহৃত হয়, এদের অসংবদ্ধ সজ্জাই এই রচনা, যার সবকটি উপাদান মিলিয়ে কোনো একরৈখিক কাহিনি বা নির্ণেয় বক্তব্যে পৌঁছোনো যাবে না। *ওয়ান পাইস ফাদার মাদার*-এ তো একেবারে নয়টি শিরোনাম সাজিয়ে দেন সুবিমল, যার থেকে পছন্দমতো একটি বেছে নেয়া যাবে। এখানেও অসম্বন্ধ উপাদান সাজানো থাকে অসংলগ্নভাবে। অবশ্য, দুটি উপন্যাসেই একটি সাধারণ সাদৃশ্য আছে ; উপন্যাস দুটির উপাদানগুলি মূলত সভ্যতার পীড়ন ও বিকৃতির সঙ্গে সম্পৃক্ত কোনো-না-কোনো ভাবে। সুবিমল তাঁর এই রচনাগুলির মধ্য দিয়ে এক প্রতিবাদী স্বরকে নির্মাণ করতে চান। দেবীপ্রসাদ জানিয়েছেন "আমার ভালো লাগে রাজনীতি ও সমাজের সাথে, ইচ্ছায়/অনিচ্ছায় জড়িয়ে থাকা মানুষের কাহিনি। ভালো লাগে ফর্ম নিয়ে ফিচলেমি, শব্দ নিয়ে খেলা, গল্প, বলার অরৈখিক শৈলী, উন্মুক্ত অন্ত, অ্যামবিগুইটি।" সুবিমলের সাহিত্যবোধে কিন্তু কোনো 'খেলা নেই', সম্পূর্ণভাবে প্রতিবাদী ভাবাদর্শ-পরিসর থেকে তাঁর যাবতীয় রচনাপ্রয়াস। তাঁর লেখা, তাঁরই ভাষায়, "প্রতিবাদের সাহিত্য।" তাঁর লেখায় যৌনতা ও হিংসার উপাদান ব্যবহৃত হয় বাঙালি মধ্যবিত্তের সামনে তার কুশ্রী চেহারাটা তুলে ধরার উদ্দেশ্যে ; "যাতে নিজেদের অবস্থা দেখে আমরা মধ্যবিত্তেরা, নিজেরাই শিউরে উঠতে পারি, নিজেরাই ভাঙতে শুরু করতে পারি নিজেদের এই সব বস্তাপচা সমাজ ব্যবস্থা।" নবারুণ ভট্টাচার্যের ফ্যাতারুর বোম্বাচাক বা *কাঙাল মালসাট*-এর মতো রচনাও স্থান-কাল-সত্তার যাবতীয় ক্রম এবং যৌক্তিকতা ভেঙে

দেয়। এক্ষেত্রেও যেন সক্রিয় থাকে সমকালের চেহারাকে তির্যকভাবে চিনিয়ে দেওয়ার তাগিদ। মলয় রায়চৌধুরীর কাছে কিন্তু আবার পুরোটাই খেলা। 'ডুবজলে যেটুকু প্রশ্বাস', 'জলাঞ্জলি', 'নামগন্ধ' ইত্যাদি রচনায় মলয় সুবিমলের মতো নিছক উপাদানগুলোকে সাজিয়ে দেন না, বরং গ্রন্থনার কৌশলে অনির্ণেয়তায় যাত্রা করেন ; আর এই অনির্ণেয়তার উদ্দেশ্যও সুবিমল থেকে স্বতন্ত্র। পোস্টমডার্ন পরিসরে "কারুর আত্মপরিচয় নেই"— এই বিশ্বাস থেকে মলয় যে অনির্ণেয়তার আয়োজন করেন, তাতে তাৎপর্যের বদলে থাকবে 'আহ্লাদ'— এটাই মলয়ের কাম্য। মলয়ের কাছে হিব্রুদের 'কার্যকারণহীন আনন্দোৎসব' 'হল্লা, হৈ-চৈ, মৌজমস্তি'র অভিধা 'ক্রুহাহা'-ই তাই পোস্টমডার্ন শিল্পের উদ্দিষ্ট। সুবিমল যেখানে রচনার অনির্ণেয়তাকে ভাবাদর্শগত চয়নের ফলে প্রতিবাদমুখর করে তুলতে চান, মলয় সেখানে রচনার অনির্ণেয়তাকে আশ্রয় দিতে চান 'আহ্লাদ'-কামী নান্দনিকতায়। এভাবেই, নানা মাত্রায় এবং নানা ভাবাদর্শের সংলগ্নতায় গড়ে ওঠছে বাংলা পোস্টমডার্ন সাহিত্যের এক মিটিংয়ে। পরিসর যা নিশ্চিতভাবেই দাবি করতে পারে পাঠকের মনোযোগ।

উত্তর-আধুনিকতা ও তৃতীয় বিশ্ব

পবিত্র সরকার

১. প্রথম দু-একটা কথা[১] :

উত্তর-আধুনিকতা নাকি বিশ্বের সদ্যতম এক শিল্পের আদর্শ, কারও কারও মতে সমস্ত মতবাদ ও আদর্শকে খতম করে দিতে তার উদ্ভব। শুধু শিল্প কেন, জীবনের সমস্ত প্রকাশকে সে ধরতে চায়। বাংলাতেও একাধিক লেখা নিজেকে উত্তর-আধুনিক হিসেবে চিহ্নিত করার জন্য বুক ঠুকে এগিয়ে এসেছে। সমীর রায়চৌধুরী, কখনও 'আধুনিকতা' নাম দিয়ে নানা পর্যায়ে তার তত্ত্ব ব্যাখ্যা করেছেন।[২] তবে এই লেখকের নিজের অসম্পূর্ণ অধ্যয়ন থেকে যা মনে হয়েছে, এঁরা সকলেই উত্তর-আধুনিকতার লক্ষণ উদ্ধার এবং নিজেদের ও অন্যদের লেখায় সেই লক্ষণ প্রতিষ্ঠা বা সন্ধানে যত ব্যস্ত, উত্তর-আধুনিকতার আর্থ-সামাজিক-বৈশ্বিক ভূমিকা সম্বন্ধে তত আগ্রহী নন। এ-নিবন্ধে তারই প্রয়াস করা হচ্ছে।

আমরা তাই এখান থেকেই কথাটা শুরু করব যে, উত্তর-আধুনিকতা (পোস্টমডার্নিজম) বলে কোনো সংহত, সুনির্দিষ্ট, সীমাপ্রগাঢ় স্থাপত্যঘন তত্ত্ব নেই। এ-সম্বন্ধে মোটামুটি সকলেই একমত। এর কোনো স্থিতসংবদ্ধ গোষ্ঠী নেই— যার সদস্যরা অন্তত বুক বাজিয়ে বলতে থাকবে, 'আমরা বিশুদ্ধ ও নির্ভেজাল উত্তর-আধুনিক; বাকিরা হয় পরিষ্কার না-উত্তর-আধুনিক — সম্পূর্ণ ভিন্ন দল, নিছক, 'অপর' না হয় আমাদের মতো খাঁটি উত্তর-আধুনিক নয়। ওদের কথায়, কেউ কান দিয়ো না।' এ থেকেই বোঝা যাবে যে, উত্তর-আধুনিকতা একটা সময়ে উঠে-আসা নানা ভাবনা ও বিশ্বাসের একটা জোড়াতালি-দেওয়া তত্ত্ব। কিন্তু খুব শক্তিশালী তত্ত্ব, কারণ সাহিত্যরচনা থেকে শুরু করে স্থাপত্য, ভাস্কর্য, চিত্রকলা, ফোটোগ্রাফি, বৈদ্যুতিন মাধ্যম ও বিনোদন, দর্শন— সমস্ত কিছুতেই তার লক্ষণ ছড়িয়ে গেছে, সমস্ত কিছুতেই নাকি এক ভাবনার প্রকাশ দেখা যাচ্ছে। আর পশ্চিমের আর্থনীতিক-সাংস্কৃতিক বিকাশ এই তত্ত্বের জন্মসূত্র। তবে ভাবতে আশ্চর্য লাগে যে, যারা এটিকে এ-সময়ের চূড়ান্ত এক তত্ত্ব বলে দাবি করে তারাও খেয়াল করে না যে, এটিকে তারাও এক 'বৃহদাখ্যান' বা 'grand narrative' করে তুলতে চাইছে। [পরে বৃহদাখ্যান সম্বন্ধে আলোচনা দেখুন]

এই বহুমুখী ও বহুস্তরীয় ভাবপুঞ্জের কোনো বড়ো একক দার্শনিকও নেই, যার দর্শনকে এই তত্ত্বগুচ্ছের একমাত্র ভিত্তি বা উৎস বলা যায়। সাম্যবাদী-সমাজতান্ত্রিক দর্শনের উদ্‌গাতা যেমন ছিলেন কার্ল মার্কস ও ফ্রিডরিক এঙ্গেল্‌স, কিংবা ধনবাদী দর্শনকে সংহত রূপ যেমন দিয়েছিলেন জন মেনার্ড কিন্‌স। উত্তর-আধুনিকতার দার্শনিক হিসেবে যাঁদের নাম করা হয়, যেমন নিটশে বা হাইডেগার বা জঁ ফ্রাঁসোয়া লিয়োতার (Lyotard) বা জঁ বোদ্‌রিয়ার (Baudrillard)— তাঁরা উত্তর-আধুনিকতার উদ্গাতা নন, এর কোনো কোনো লক্ষণের ব্যাখ্যাতা মাত্র। জাক্ দেরিদা-ও আবির্ভূত হয়েছেন উত্তর-অবয়ববাদী (পোস্ট-স্ট্রাকচারালিস্ট) হিসেবে, তিনিও বিশেষভাবে উত্তর-আধুনিকদের কেউ নন। কখনও কখনও মিশেল ফুকো (Foucault) বা জাক লাকাঁ (Lacan)-র নামও উচ্চারিত হয় উত্তর-আধুনিকতার সূত্রে, কিন্তু তাঁরাও নিছক উত্তর-আধুনিক নন। অবশ্য সকলেই উত্তর-আধুনিকতার অসংবদ্ধ ঘটনাকে কোনো-না-কোনোভাবে প্রভাবিত করেছেন, যেমন অন্য কালের বা অন্য দেশের আরও কেউ কেউ করেছেন।

২. শব্দার্থ সন্ধান :

'পোস্টমডার্নিজম' নামটির বয়স আজ একশো ত্রিশ বছরের মতো হল। উত্তর-আধুনিক স্থাপত্য ও শিল্প-বিশেষজ্ঞ চার্লস জেংক্‌স (Jencks) খবরের কাগজে চিঠি লিখে জানিয়েছিলেন যে, ১৮৭০-এ তিনি কথাটির সবচেয়ে পুরোনো উল্লেখ লক্ষ করেছেন। সে সময়কার এক ইংরেজ শিল্পী জন উইলকিন্‌স চ্যাপম্যান ফরাসি নব্য-ইম্প্রেশনিস্ট ক্লোদ মনে আর ওগুস্ত্ রেনোয়ার-এর ছবি দেখে এই পোস্ট-উপসর্গবিশিষ্ট শব্দটি প্রয়োগ করেছিলেন। তিনি যেন বোঝাতে চেয়েছিলেন যে এরা 'আধুনিক' ইম্প্রেশনিজ্‌ম-কে উত্তীর্ণ হয়ে আরও এগিয়ে গেছে।

এ থেকেই বোঝা যায় যে, আজ পোস্ট-মডার্নিজম কথাটার যে অর্থ, প্রথম প্রয়োগে তার সে অর্থ ছিল না। প্রথম কেন, পরবর্তী আরও বহু প্রয়োগে বিভিন্ন সময়ে বিভিন্ন অর্থ প্রকাশ করা হয়েছে (Ward, 2003 : 7-9)। ওয়ার্ড ১৯১৭, ১৯৪৭, ১৯৫৭, ১৯৬৪, ও ১৯৬৮-তে এর আরও সব প্রয়োগ লক্ষ করেন, এবং সব প্রয়োগই ভিন্ন অর্থে। ১৯১৭-তে জার্মান লেখক রুডল্‌ফ পেন্‌ভিট্‌স এ কথা প্রয়োগ করেন ইউরোপীয় 'আধুনিকতা'র বন্ধনমুক্ত মানুষ সম্বন্ধে, ১৯৪৭-এ আর্নল্ড টয়েনবি-র প্রয়োগের অর্থ ছিল 'শিল্পবিপ্লব ও বৃহৎ শিল্পায়নের পরবর্তী যুগ'। মার্কিন সংস্কৃতিতাত্ত্বিক বার্নার্ড রোজেনবার্গ ১৯৫৭-তে বলেন প্রযুক্তির আধিপত্যে সার্বিক সমতা-চাপানো এক জীবনযাপনের কথা, যার আংশিক প্রতিধ্বনি হয়তো শুনতে পাওয়া যায় হার্বার্ট মার্কিউজ-এর 'একমাত্রিক মনুষ্য' বা One-dimensional man 'কথাটি'র মধ্যে। ১৯৬৪-তে লেসলি ফিডলার উচ্চকোটির মূল্যবোধ প্রত্যাখ্যানের মধ্যে পোস্টমডার্ন-এর অর্থ খোঁজেন; তাঁর মনে নিশ্চয়ই ছিল তৎকালীন হিপি, ফ্লাওয়ার চিলড্রেন ও কালো মানুষদের নতুন প্রতিবাদী আচরণবিধি ও নন্দনতত্ত্বের কথা— যা WASP বা White Anglo-Saxon Protestant-দের আচরণবিধি ও নন্দনতত্ত্বকে প্রত্যাখ্যান করে।[৩] ১৯৬৮-তে লিয়ো স্টাইনবার্গ-এর অভিপ্রেত অর্থ শিল্পতত্ত্বের সঙ্গে জড়িত। মার্কিনদেশে পপ (পপুলার) ও অন্যান্য নতুন শিল্প পোস্টমডার্ন, কারণ তা আগেকার এলিট শিল্পতত্ত্বকে বাতিল করতে চায়।

অবশ্যই এ সব প্রয়োগ বিত্তবৈভবশক্তিধর 'উন্নত' পাশ্চাত্যদেশগুলির সামাজিক-বাণিজ্যিক-আর্থনীতিক-সামরিক-প্রাযুক্তিক-নান্দনিক ইতিহাসের সঙ্গে যুক্ত। তৃতীয় বিশ্বের এখানে এক অর্থে কোনো ভূমিকা নেই। কিন্তু অন্য নানা গভীরতর অর্থে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা আছে। যে-ধনতান্ত্রিক ব্যবস্থার সদ্যতন পর্যায়ে এই তত্ত্বের উদ্ভব বলে ফ্রেডরিক জেম্‌সন জানিয়েছেন,

সেই ধনতান্ত্রিক ব্যবস্থা তৃতীয় বিশ্বকে শোষণ করেই বেঁচে আছে এবং বৃদ্ধি পাচ্ছে। এই ব্যবস্থার সাম্রাজ্যে আমরা অধীনস্থ প্রজা, তাই এ-নিয়ে আমাদের মাথাব্যথা করতেই হয়। পৃথিবীর এখন এমন এক অবস্থা দাঁড়িয়েছে যে, আমেরিকা-ইউরোপ-এর সর্দি লাগলে আমরাই আগে হাঁচতে শুরু করি। পোস্টমডার্নিজম এই নব্য ধনব্যবস্থার প্রতিচ্ছায়া, কাজেই এই উত্তর-আধুনিকতাকে বুঝতে নতুন ধনব্যবস্থাকেও আমরা আরও বুঝতে পারব— এও একটা যুক্তি। এ-ব্যবস্থা আমাদের তৃতীয় বিশ্বের দেশ ও সমাজকে আষ্টেপৃষ্ঠে বিশ্বায়নের বজ্র-আঁটুনিতে জড়িয়ে ধরছে, তারই দর্শন ও সংস্কৃতির প্রতিফলন ঘটছে পোস্টমডার্নিজম-এ।

বঙ্গভাষী অঞ্চলে আর-একটা কথাও হয়তো বলে নেওয়া দরকার। গত শতকের আশির বছরগুলিতে পশ্চিমবাংলায়— কলকাতায় বলাই ভালো— অঞ্জন সেন সম্পাদিত 'গাঙেয়পত্র' এবং আরও দু-একটি পত্রিকায় উত্তর-আধুনিকতা বলে একটি মূলত কবিতার আন্দোলন শুরু হয়েছিল। 'সাম্প্রত' ও অন্যান্য পত্রিকার একাধিক সংখ্যাতেও এ-নিয়ে আলোচনা দেখেছি। তার সঙ্গেও পশ্চিমি উত্তর-আধুনিকতার কোনো সম্পর্ক নেই। এই আন্দোলনের সঙ্গে ছিলেন বর্তমানে ভারতের কেন্দ্রীয় ভাষা সংস্থানের (CIIL–Central Institute of Indian Languages) অধ্যক্ষ এবং মৈথিল ভাষার প্রখ্যাত কবি উদয়নারায়ণ সিংহ, কবি অমিতাভ গুপ্ত প্রভৃতি। ভারতের সাহিত্য অকাদেমির তখনকার সচিব ইন্দ্রনাথ চৌধুরী এঁদের নিয়ে *Indian Literature* পত্রিকাতেও লিখেছিলেন।[৪] কিন্তু পশ্চিমি উত্তর-আধুনিকতার আঁচ এসে পৌঁছোনোর পর এঁরা খুব সযত্নে তা থেকে নিজেদের অবস্থানকে পৃথক করতে থাকেন। এঁরা বলেন এঁদের উত্তর-আধুনিকতা মূলত দেশীয় ঐতিহ্যের সঙ্গে যুক্ত থাকার আকাঙ্ক্ষা, ঐতিহ্যের সঙ্গে বিচ্ছিন্ন হয়ে নয়। এঁরা কবিতার শৈলী ও রূপ নিয়ে পরীক্ষা-নিরীক্ষাও করেছেন, কিন্তু আগেকার স্মৃতিলোককে প্রত্যাখ্যান বা খেলাচ্ছলে তার খাবলা-খাবলা ব্যবহার এঁদের পরিকল্পনায় ছিল না।

তৃতীয় আর-একটা কথাও মনে হয় প্রথমেই বলে রাখা দরকার— সেটা খুব গোড়ার কথা। আমাদের সাহিত্য ও শিল্পতত্ত্বে বহুবিধ 'ইজম' বা 'বাদ'-এর প্রচার ও আস্ফালনের ইতিহাস আমরা পড়তে বাধ্য হই। ক্লাসিক, রোমান্টিক, নিওক্লাসিকাল, 'আধুনিক' ইত্যাদি ছাপ্পার আড়ালে সাহিত্য ও কাব্যবিচারের মূল এই প্রশ্নটা আড়ালে পড়ে যায় যে, একটা 'নাম' একটি রচনার উৎকর্ষের সঙ্গে কী যোগ করে? আদৌ কি তার উপভোগ্যতা বাড়ায়? উৎকর্ষ আর উপভোগ্যতার সমীকরণ এখানে আমাদের লক্ষ্য নয়। কিন্তু দুয়ের কোনোটাই কি সুনিশ্চিত হয়? নাকি একটা লেবেল ওই রচনাটির সময় ও সৃষ্টিপটভূমিকাকেই শুধু চিহ্নিত করে দেয়, আর কিছু নয়? 'বাদ' সম্বন্ধে অনভিজ্ঞ পাঠক কি রচনাটি থেকে কিছু প্রত্যাশা করবেন, না করবেন না? আমরা মাথামোটা সাধারণ পাঠকেরা শিল্প থেকে একই সঙ্গে আনন্দ, জীবনকে একটু-আধটু বুঝে নেওয়া, মানুষ (কখনও অন্য প্রাণীর, এমনকি প্রাণ সম্পন্ন উদ্ভিদ বা প্রাণদ প্রকৃতির) বাঁচা-মরা অস্তিত্বের সুখ-দুঃখের বড়ো কোনো একটা অভিজ্ঞতা, বিচিত্র পৃথিবী সম্বন্ধে জানা, কিছু অগ্রগতির নিশানা, কিছু সংগ্রামের নির্দেশ— এসব হয়তো প্রত্যাশা করি শিল্প থেকে, কিন্তু পোস্টমডার্ন জাতীয় লেবেল কি আমাদের প্রত্যাশাকে পূর্ণ করে? বাড়িয়ে দেয় বা সমৃদ্ধতর করে? লুসি (২০০০) যাকে 'non-appreciationist' বা উদ্দেশ্যবাদী শিল্পতত্ত্ব বলেন তার কথা আমরা এখানে বলছি না। তাতেও শিল্পের উৎকর্ষ বা উপভোগ্যতার অমোঘ আশ্বাস নেই।

এগুলি খুব সরলচিত্ত প্রশ্ন, কারণ তাত্ত্বিকভাবে এ-প্রশ্নগুলির বিরুদ্ধতা করে বলাই যায় যে, ভালো লাগা, মন্দ লাগার কোনো নিরপেক্ষ নির্বিশেষ মাত্রা নেই। এটা যেমন এক দিকের কথা;

তেমনই আর একদিকের কথা হল যে, অনেক শিল্পতত্ত্ব শুধু ভালো লাগাতেও চায় না, চায় একটা কোনো প্ররোচনা দিতে বা কোনো কাজে উদ্দীপনা জাগাতে। শিল্পসৃষ্টি একটা লক্ষ্য, তাই আমাদের গন্তব্য— নাকি তা অন্য কোনো গন্তব্যে পৌঁছোবার একটা রাস্তা, একটা উপায়— লুসি-র কথায়, 'appreciationist' আর 'non-appreciationist'— এই দুটো মতে নন্দনতত্ত্ব প্লাতো-র সময় থেকে বিভক্ত হয়ে গেছে। সেখানে পাঠকের/দর্শকের/শ্রোতার ভালো লাগা, মন্দ লাগার বিষয়টি যেন তাত্ত্বিক প্রাবল্য হারিয়ে ফেলে। আর পরে তো আমরা দেখব যে, উত্তর-আধুনিকতা তো শিল্পের 'শিল্পত্ব,' নিয়ে বাহাদুরি করার অধিকারকেই স্বীকার করে না, ফলে তার আবার ভালো-মন্দ কী? তবে যতই দুর্বল হোক আমাদের প্রশ্নগুলি, তা তুলে রাখতে দোষ নেই, কারণ এ প্রশ্ন মাত্র দু-চারজনের নয়।

৩. কখন শুরু, কখন শেষ?

উত্তর-আধুনিকতা অবশ্যই এখনও চলছে পাশ্চাত্যে, অর্থাৎ তাকে বাতিল করে এখনও কোনো নতুন সাংস্কৃতিক তত্ত্ব, দর্শন ও আন্দোলন শুরু হয়নি। এ থেকে বোঝা যায়, একটির পর একটি আন্দোলনের উদ্ভব ও বিলয়ের মধ্যে একটি দ্বান্দ্বিকতা বা ক্রিয়া-প্রতিক্রিয়ার সম্পর্ক আছে। বেশির ভাগ তত্ত্ব বা আন্দোলনই শুরু হয় সমসাময়িক বা অব্যবহিত পূর্ববর্তী অন্য তত্ত্ব বা আন্দোলনের প্রতিবাদ বা প্রতিক্রিয়া থেকে। সেই কারণে কোনো আন্দোলনের আরম্ভ ও শেষের একটা মোটামুটি সময় নির্দেশ করা যায়। মোটামুটিই সেটা সম্ভব, কারণ তার আরম্ভ ও শেষের প্রান্ত পূর্বাপর বিচ্ছিন্ন ও সুনির্দিষ্ট থাকে না। আবার তার কেন্দ্রীয় প্রাধান্যের সময়েই হয়তো তার বিরুদ্ধে প্রতিক্রিয়ার একটা ক্ষীণ স্রোতের জন্ম হয়, পরে যা শক্তিশালী হয়ে তাকে সরিয়ে দিতে এগোয়। অর্থাৎ যে-কোনো সময়ে সংস্কৃতি বা ইতিহাসের একাধিক ছোটোবড়ো স্রোত পাশাপাশি চলে, তারমধ্যে একটি প্রধান হয়ে ওঠে। ফ্রেডরিক জেম্‌সন-এর (Jameson, 1991: 158-59 ও অন্যত্র) 'Cultural dominant' কথাটি থেকে এই বিষয়টির প্রতি ইঙ্গিত আমরা বুঝতে পারি।[৫]

জেম্‌সন এক নব্য মার্কসবাদী, মার্কিনদেশের বিশ্ববিদ্যালয়গুলিতে মার্কসবাদের চর্চার একটা সম্ভ্রান্ত জায়গা মূলত তাঁর এবং তাঁর সহযোগীদের চেষ্টায় গড়ে উঠেছে। জেম্‌সন-এর এই কথাটির পেছনে মার্কস-এর ইতি-নেতি-সমন্বয় বা থিসিস-অ্যান্টিথিসিস-সিনথেসিস তত্ত্ব যে কাজ করছে তাতে কোনো সন্দেহ নেই। হেগেল-এর উদ্ভাবিত ইতিহাসব্যখ্যানের এই সূত্রকে মার্কস তার ভাববাদী ভিত্তি থেকে ছিনিয়ে এনে বস্তুবাদের উপর প্রতিষ্ঠা করেছিলেন। এই তত্ত্ব আমাদের বলে যে, প্রতিটি সমাজে প্রচলিত প্রধান ব্যবস্থা আগের ব্যবস্থাকে ধ্বংস করে নিজের প্রতিষ্ঠা করে। কিন্তু এক সময় তারও বিপরীত প্রতিক্রিয়া (antithesis) তৈরি হয়। শেষে দুয়ের সংঘাতে তৃতীয় একটি ব্যবস্থার উদ্ভব ঘটে। এইভাবে ইতিহাসের অগ্রগতি হয়। অর্থনৈতিক রাজনৈতিক বিপ্লব হয়তো অল্প সময়েই ঘটে, কিন্তু তারই ফলে অতীতের সাংস্কৃতিক বিশ্বাস ও ব্যবস্থাগুলির সঙ্গে বিচ্ছেদ ঘটিয়ে রাতারাতি নতুন সাংস্কৃতিক বিশ্বাস ও ব্যবস্থার উদ্ভব ঘটে না। বিপ্লবে ছেদ মূলত ঘটে উৎপাদন-ব্যবস্থা ও উৎপাদন সম্পর্কের— অর্থাৎ উৎপাদনের পুঁজি প্রযুক্তি, প্রতিষ্ঠান ও ব্যবস্থাপনার মালিক কোন্ শ্রেণি, তারা কীভাবে কাদের শ্রম কেনে, যাদের শ্রম কেনে তাদের উপরের উপাদানগুলিতে অধিকার কতটা, সৃষ্টি ও বিনোদনের অবসর কাদের কতটা ইত্যাদি নানা বিষয়ের উপর। মার্কসবাদ অনুসারে ভিত্তি মার্কস— তার ভাববাদী ভিত্তি (Base) ও অধিগঠনের Sperstructure সম্পর্কটি ধ্রুব, কিন্তু খুব প্রত্যক্ষ নয়, সরলও নয়।

তাই অর্থনৈতিক-রাজনৈতিক প্রশাসনিক পরিবর্তন ঘটলেও সংস্কৃতির ক্ষেত্রে রাতারাতি কোনো পরিবর্তন ঘটা সহজ নয়। এই কারণেই বিপ্লবের পর নতুন সাংস্কৃতিক বিপ্লবের দরকার হয়। আর বিপ্লব যখন বা যেখানে হয় না, সেখানে এই ভিত্তির পরিবর্তনও এক দীর্ঘস্থায়ী প্রক্রিয়া।

যাই হোক এই 'Cultural dominant'-এর সূত্রটি ধরেই উত্তর-আধুনিকতার উদ্ভব ও বিকাশকে আমাদের চিহ্নিত করতে হবে। এবং দেখতে হবে, কোন্ ভিত্তি বা 'Base' থেকে, অর্থাৎ কোন্ অর্থনৈতিক-রাজনৈতিক ব্যবস্থার আশ্রয়ে এই উত্তর-আধুনিকতার জন্ম হয়েছে।

এখানেও জেম্‌সন-এর নির্দেশই সবচেয়ে কার্যকর। জেম্‌সন অনুসরণ করেছেন জার্মান দার্শনিক মান্ডেলকে, যিনি তাঁর *Late Capitalism* (1986) বইয়ে ইউরোপ-এর উৎপাদন ব্যবস্থা ও উৎপাদন-সম্পর্কের নানা পর্যায়ের এইরকম বিভাগ করেছেন : শিল্পবিপ্লবের ফলে বাজারনির্ভর ধনতন্ত্র বা মার্কেট ক্যাপিটালিজম হল প্রথম পর্যায়। দ্বিতীয় পর্যায় হল সাম্রাজ্যবাদ অথবা একচেটিয়া উৎপাদনের ধনতন্ত্র—এটাকেই ভুল করে পোস্ট-ইন্ডাস্ট্রিয়াল ক্যাপিটালিজমও বলা হয় (দ্র. Homer, 1988 : 107)। এ সকলেরই শিকারক্ষেত্র যে তৃতীয় বিশ্ব তা আমাদের মনে রাখা দরকার। মান্ডেল-এর মতে বাজারভিত্তিক ধনতন্ত্র বা পুঁজিবাদের কাল শিল্প বিপ্লবের পর ১৮৪৭ পর্যন্ত। তারপর ১৮৪৭ থেকে ১৮৯০-এর সময়খণ্ডে, তার পরে দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধে (১৯৩৯-৪৫), এবং দ্বিতীয় মহাযুদ্ধ থেকে আজ পর্যন্ত— সব মিলিয়ে যে মোট চারটি পর্ব পাই, তাদের সময় জুড়ে ইউরোপ-আমেরিকা-র শিল্প-বাণিজ্যে প্রযুক্তিগত নানা বিপুল পরিবর্তন ঘটেছে। তার ফলে ঘটেছে মানুষের সামাজিক-শারীরিক অস্তিত্ব ও জীবনযাপনে আমূল বিপ্লব। প্রথমটিতে কারখানায় শ্রমিকদের হাতে-তৈরি বা ব্যক্তিগত চেষ্টায় নির্মিত বাষ্পচালিত যন্ত্রের আধিপত্য, দ্বিতীয় পর্বে নানা উৎপাদন-প্রক্রিয়ায় যন্ত্রনির্মিত বাষ্পীয় যন্ত্রের ব্যাপক ব্যবহার। এই দ্বিতীয় পর্বের ঘটনাটিই মান্ডেল-এর মতে প্রথম প্রযুক্তিগত বিপ্লব। এর পরে এল তৃতীয় পর্ব এবং দ্বিতীয় প্রযুক্তি-বিপ্লবের মুহূর্ত। এই কালখণ্ডে মোটর ইঞ্জিনের, অর্থাৎ পেট্রোল ডিজেল ইত্যাদির দহনে শক্তিসঞ্চারিত স্বয়ংক্রিয় ইঞ্জিনের— সার্বিক ব্যবহার দেখা গেল। ১৯৪৫ থেকে শুরু হয়েছে তৃতীয় প্রযুক্তি-বিপ্লব— এ-সময়ে ঘটেছে কম্পিউটার প্রযুক্তির বৈশ্বিক ও সর্বাঙ্গীণ ব্যবহার।[৬]

একটু সরল করে আমরা মান্ডেল-এর এ ইতিহাসকে ছকে বিন্যস্ত করি :

আর্থ-সামাজিক পর্যায়	**প্রযুক্তি বিপ্লব**
১. বাজার-ভিত্তিক ধনতন্ত্র (সাম্রাজ্যবাদের শেষ বিস্তার) শিল্পবিপ্লব—১৮৪৭	১. প্রথম প্রযুক্তি বিপ্লব
২. ১৮৪৭—১৮৯০	২. দ্বিতীয় প্রযুক্তি বিপ্লব
৩. ১৮৯০—১৯৪৫	৩. তৃতীয় প্রযুক্তি বিপ্লব
৪. ১৯৪৫— বর্তমান কাল	

জেম্‌সন মান্ডেল-এর শেষ তিনটি পর্বের তিন ধরনের উৎপাদন ব্যবস্থা ও উৎপাদন-সম্পর্কের ভিত্তি থেকে তিনটি পৃথক সাংস্কৃতিক অধিগঠনের সম্পর্ক এইভাবে নির্ণয় করেন—

প্রথম প্রযুক্তি বিপ্লব— বাস্তববাদ [রিয়্যালিজম]

দ্বিতীয় প্রযুক্তি বিপ্লব— আধুনিকবাদ [মডার্নিজম]

তৃতীয় প্রযুক্তি বিপ্লব— উত্তর-আধুনিকতা [পোস্টমডার্নিজম]

তৃতীয় প্রযুক্তি বিপ্লব ঘটেছে ১৯৪৫-এর পরে, এখান থেকেই সদ্যতন বা 'late capitalism' -এর সূত্রপাত।[৭] এখানে লক্ষণীয় যে, জেম্‌সন তাঁর বইয়েরই নাম দিয়েছেন *Postmodernism : or the Cultural Logic of Late Capitalism* [Jameson, 1991].

ডেভিড হার্ভে (দ্র. Harvey, 1989) উত্তর-আধুনিক পটভূমি বা পোস্টমডার্ন কন্ডিশন সম্বন্ধে আর একটু ব্যাখ্যান করে লিখেছেন যে, এই সদ্যতন ধনতন্ত্রবাদে বাজার যেমন নানা জায়গায় বহুলভাবে ছড়িয়ে গেছে বহুজাতিক সংস্থার কল্যাণে, তেমনই উৎপাদন-উৎসও আর এক কেন্দ্রে বা একটিমাত্র দেশে সীমাবদ্ধ নেই। পৃথিবীর নানা দেশের বর্ধিষ্ণু মধ্যবিত্ত শ্রেণি হয়ে উঠেছে ভোগ্যপণ্য ও সেবা প্রদানকারী বহুজাতিকগুলির লক্ষ্য। ক্রয়বিলাসী মধ্যবিত্তের সংখ্যাও নানা দেশে বহুজাতিকের বিপণন ও উৎপাদনে উৎসাহ দিচ্ছে, ব্যবস্থার বিকেন্দ্রীকরণ ঘটাচ্ছে। বহিরুৎপাদন বা আউটসোর্সিং-এর কল্যাণে একটি পণ্যের মূল নকশা যেখানে তৈরি হচ্ছে তা তার চূড়ান্ত রূপে (উৎপাদিত পণ্যে) পৌঁছোবার আগে নানা দেশের নানা কারখানায় খণ্ড খণ্ড ভাবে অঙ্গ নির্মাণের পর অন্য কোথাও এক সঙ্গে জোড়া হচ্ছে। আগেকার ফোর্ড-পদ্ধতি বা 'ফোর্ডিজম'-এর এককেন্দ্রিক উৎপাদন ব্যবস্থাকে বাতিল করেই সদ্যতন ধনতন্ত্রের উৎপাদন ব্যবস্থা এসেছে। অবশ্য ফোর্ডিজমও সম্ভবত এখন এসব কালোচিত পরিবর্তন স্বীকার করে নিয়েছে।

৪. আধুনিকতাকে প্রত্যাখ্যান :

আধুনিকতাকে প্রত্যাখ্যানের নানা রূপ ও উত্তর-আধুনিকতা পোস্টমডার্নিজম নিয়ে হই-হট্টগোল মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রেই প্রথম শুরু হয়েছে, একথা বললে অত্যুক্তি হবে না। তবে তা সবসময় হালের উত্তর-আধুনিকতার চেহারা পায়নি। বার্টেনস-এর বইয়ের (Bertens, 1995 : 20-36) দ্বিতীয় অধ্যায়ে নানা ধরনের আধুনিকতা-বিরোধের মধ্যে তার উদ্ভব ও বিবর্তনের একটা ছবি পাওয়া যায়।

বার্টেন্‌স লক্ষ করেন, ১৯৫০-এর দশকে মার্কিন সাহিত্যসমালোচক চার্লস অল্‌সন সমকালীন মার্কিন কবিতায় আধুনিকতা-বিরোধী প্রবণতার কথা বলছেন এবং তাঁর লেখা ও বক্তৃতায় পোস্টমডার্ন কথাটা ঘন ঘন ব্যবহার করছেন। ১৯৫১-তে অল্‌সন-এর পড়ানোর জায়গা ব্ল্যাক মাউন্টেন কলেজে এক অদ্ভুত অভিকরণের[৮] ব্যবস্থা হয়েছিল। তাতে চিত্রকর রশেনবার্গ (Rauschenberg), নৃত্যশিল্পী মার্সি কানিংহাম (Cunninghum)-এঁর নাচ আমরা কলকাতায় দেখেছি এবং স্বল্পতর খ্যাত আরও কিছু শিল্পী 'যে যেমন খুশি করো' সৃষ্টি ও প্রদর্শনের লেখায় মেতেছিলেন। কেউ জানতেন না অন্যরা পরমুহূর্তে কে কী করবেন। বার্টেনস-এর বিবরণে এটিই প্রথম দিককার সবচেয়ে প্রসিদ্ধ আধুনিকতা-বিরোধী সাংস্কৃতিক বিদ্রোহের ঘটনা। শিল্পগুলির নিজস্ব সীমানা ভেঙে পরস্পরের সঙ্গে আদান-প্রদানের খেলায় যোগ দেওয়ারও এটি একটি বড়ো ঘটনা।

তার আগে থেকেই সমালোচনার তত্ত্ব ও নন্দনতত্ত্বে অল্‌সন নতুন এক বিকল্প অভিজ্ঞতার কথা বলে এসেছেন। ১৯৫১-তেই তিনি মার্কিনি ইন্ডিয়ানদের অঞ্চল ইয়ুকাতান্‌-এ কিছুদিন বাস করেন। তার পরে লেখা তাঁর 'হিউম্যান ইয়ুনির্ভস' বলে প্রবন্ধে পাশ্চাত্যের গ্রিক-ইহুদি-খ্রিস্টীয় যুক্তি পরম্পরা[৯] ও ভাববিন্যাসের সুশৃঙ্খল মননপটভূমি বিসর্জন দিয়ে শিল্পে তিনি এক নতুন অভিজ্ঞতা প্রকাশের কথা বলেন। যাতে উঠে আসবে স্বাভাবিক 'প্রাকৃতিক' অভিজ্ঞতা, নিজের কোনো আরোপিত ভাষা বা সংগঠন তার শরীরে থাকবে না। ইউরোপীয় 'এন্‌লাইটেন্‌মেন্ট'-

এর আত্মম্ভরী যুক্তিবাদের এক বিকল্প যেন তিনি খুঁজে পেয়েছিলেন ইন্ডিয়ানদের ওই ভাববিশ্বে। এতে কতটা রোমান্টিকতা ছিল, একটাকে পুরো প্রত্যাখ্যান করে আর একটাকে আঁকড়ে ধরার দ্বিভাজিত বা binary প্রবণতা কতটা যুক্তিযুক্ত সে তর্ক এখানে তুলছি না আমরা। কেবল একটি ঐতিহাসিক মুহূর্তকে চিহ্নিত করতে চাইছি।

এতে উত্তর-আধুনিকের দুটো চিন্তা উঠে আসছে দেখতে পাই। একদিকে একটা বৃহৎ ও প্রভুত্বপ্রতাপী কেন্দ্র থেকে সরে গিয়ে margin বা প্রান্তিকতায় নির্বাসিত যে-সব অভিজ্ঞতা ছিল, ইউরো-কেন্দ্রিক বা পাশ্চাত্য বিশ্বভাবনা বৃত্তের বাইরে যে জগৎ পড়ে ছিল, তাকে গ্রহণ করার একটা ইচ্ছা। আর একটা হল, শিল্পীর বা স্রষ্টারও প্রভুত্ব বা authority বিলোপ। পরে আমরা দেখব যে, পোস্টমডার্ন-এর নানা সূত্রের মধ্যে এ দুটিও খুব মূল্যবান সূত্র হয়ে উঠবে।

সেই সঙ্গে অলসন ইউরোপ-এর উদারনৈতিক মানবতাবাদের যুক্তিশৃঙ্খলকে[১০] এবং ইউরোপীয় প্রজ্ঞাযুগ বা এনলাইটেনমেন্ট-এর আত্মতৃপ্ত প্রগতি ও উন্নতির ধারণাকেও বর্জন করতে চান। তাঁর যুক্তি সম্ভবত এই যে, অন্তত তৃতীয় বিশ্ব থেকে তাই আমাদের ভাবতে ইচ্ছে হয়— এই ধারণাগুলি, এদের নানা ভালো ও মানবিক মূল্য সত্ত্বেও, একসময় ইউরোপের সাম্রাজ্যলিপ্সা এবং তার অনুষঙ্গী নানা লুণ্ঠন অত্যাচার, হত্যা ও নির্লজ্জ শোষণ থেকে খুব দূরবর্তী ছিল না। অল্‌সন হাইডেগার ও দেরিদা-র দার্শনিক মতবাদের দ্বারা প্রভাবিত বলে জানা যায়। তাঁর নিজস্ব পোস্টমডার্নিজম-এর নাম তাই হয়েছে অস্তিত্ববাদী বা 'এগজিস্টেনশিয়ালিস্ট' পোস্টমডার্নিজম। বার্টেন্‌স অল্‌সন-এর সঙ্গে মার্কিন সমালোচক আরভিং হাউ (Howe)-এর মতামতেরও উল্লেখ করেন। ১৯৫৯-এ হাউয়ের প্রবন্ধ 'Mass socicty and postmodern fiction' বেরোয়, যাতে সল বেলো, নর্মান মেলার, জে. ডি. স্যালিঞ্জার ও বার্নার্ড মেলামড্-কে তিনি উত্তর-আধুনিককালের কথাসাহিত্যিক বলে উল্লেখ করেন। পরে ১৯৮০-র দশকে জেম্‌সন ও বোদরিয়ার-এর মতামতের কিছুটা পূর্বাভাস হাউ-এ পাওয়া যাবে। এঁরা সকলেই বিশেষত জেম্‌সন, যেমন 'উন্মত্ততা ও স্বেচ্ছাচারের' বিরুদ্ধে শেষ লড়াই করছেন বলে বার্টেন্‌স-এর মনে হয়েছে। কিন্তু সংস্কৃতির চরিত্র ও মেজাজ বদলের লক্ষণগুলি তাঁরা চিহ্নিত করতে ভুল করেননি।

১৯৬৩ থেকে ১৯৬৭-র মধ্যে উত্তর-আধুনিকতা 'really took off' বলে বার্টেন্‌স-এর মনে হয়েছে। যেসব তাত্ত্বিক ও সমালোচক এই নব্য সংস্কৃতির অভ্যর্থনা করেন তাঁরা হলেন লেনার্ড বি. মেয়ার, ইহাব (মার্কিন উচ্চারণে 'ইয়াব') হাসান, সুজান সন্‌ট্যাগ, নেসলি ফিড্‌লার প্রভৃতি। বিশেষ করে রবার্ট ভেনচুরি-র (Venturi) প্রবন্ধ 'Justification for a Pop architechture' প্রবন্ধে নগরস্থাপত্যে উত্তর-আধুনিকতার তত্ত্বে দৃষ্টিগ্রাহ্য পরিসর বা space-এর কথা বিশেষভাবে উঠে আসে। কথাসাহিত্যের আখ্যানতত্ত্ব (narratology) বা কাহিনিকৌশল মূলত কাল বা 'টাইম'-এর সঙ্গে যুক্ত, তার কাজ সময়ক্রম নিয়ে।[১১] সময়ক্রমে সাজানো ঘটনার নানা পরীক্ষানিরীক্ষা আখ্যানকলার নতুন প্রয়াসের অঙ্গ, কিন্তু চিত্রকলা ও স্থাপত্যে-ভাস্কর্যে আসে স্থান বা পরিসরের কথা। ভেনচুরি এই দিকটিতেই দৃষ্টি আকর্ষণ করেন। আমরা এঁদের কিছু প্রবন্ধের নাম পাশাপাশি সাজিয়ে দিচ্ছি— এইসব নাম থেকেই এঁদের আশ্বাস, বিশ্বাস, আশঙ্কা, সংশয় ইত্যাদির বিমিশ্র চরিত্রটি স্পষ্ট হয়ে উঠবে. হয়তো বিশদ ব্যাখ্যার প্রায়োজন হবে না : ইহাব হাসান— 'The dismembrment of Orpheus : reflections on modern culture, language and literature': সুজান সন্ট্যাগ— 'Against interpretation' ; এরিক কালার (Kahler, 1968)-এর বই *The Disintegration of*

Form in the Arts । ফিড্‌লার একটু উৎসাহ নিয়েই উত্তর-আধুনিকতা প্রসঙ্গে 'apocalyptic, anti-varistic', 'anti-serious' ইত্যাদি আখ্যা ব্যবহার করেছেন।

এ কথাগুলি উদ্ধৃত করে হয়তো আমরা আগে থেকেই একটা পক্ষপাতী ঝোঁক দেখিয়ে ফেললাম। যাইহোক, পোস্ট-মডার্নিজম-এর বামপন্থী দক্ষিণপন্থী, দু-ধরনের সমালোচনা বা সমর্থনই মার্কিনদেশে লক্ষ করা যায়। এরমধ্যে দুই ফরাসি দার্শনিক লিয়োতার ও বোদ্‌রিয়ারও তার নানারকম ভাষ্য ব্যাখ্যা দেন। গত শতকের আশির বছরগুলিতে জেম্‌সন একটু সংশয় নিয়ে 'দেখি না ব্যাপারটাতে কী আছে' ভেবে এগিয়ে এলেন। তখন থেকে উত্তর-আধুনিকতা বিষয়ে আলোচনায় অনেকটা গভীরতা এসেছে বলে মনে হয়।

৫. লক্ষণগুলি কী কী : প্রাগ্ উত্তর-আধুনিক

যে-কোনো প্রাথমিক পরিচয়-পুস্তকে উত্তর-আধুনিকতার লক্ষণগুলিকে সাজিয়ে দেওয়া হয়, সেগুলি আমরা একটু পরে দেখব। কিন্তু এ-সম্বন্ধে একটা সাধারণ কথা যেন এই যে, (বা এটা বোঝানোর চেষ্টা করা হয় যে), উত্তর-আধুনিকতা যেন সংস্কৃতির ক্ষেত্রে পশ্চিমি গণতন্ত্রের পরাকাষ্ঠা। অর্থাৎ এখানে ব্যক্তির সৃষ্টি ও সম্ভোগের অধিকারে কোনো আটক রাখা হয়নি। পৃথিবী শেষ হয়ে আসছে, কাজেই আর কোনো ব্যাটার পরোয়া করি না, এইরকম একটা মনোভাব যেন এর পেছনে তাড়া করছে।

অবশ্যই 'আধুনিকতা'-র সঙ্গে তুলনায় গিয়ে এই উত্তর-আধুনিকতাকে বোঝাবার চেষ্টা করা হয়েছে। আধুনিকতার কালক্রম পর্যন্ত পৃথিবীর নিরবচ্ছিন্ন অগ্রগতিতে পাশ্চাত্যের একটা বিশ্বাস ছিল। তবে তৃতীয় বিশ্বের হয়ে আমরা বুঝতে পারি— এই 'অগ্রগতি' ও উন্নতির ধারণাকে পাশ্চাত্য নিজের স্বার্থের দৃষ্টিকোণ থেকেই অনেকটা বুঝতে চেয়েছে, তাদের প্রভুত্বের— রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক প্রভুত্বের শর্তেই, তার বাইরে গিয়ে নয়। কিন্তু উনিশ ও বিশ শতকের নানা দর্শন তাদের এই আত্মতৃপ্ত বিশ্বাসে কিছুটা চিড় তৈরি করে। এর মধ্যে নিট্‌শে, (১৮৪৪-১৯০০) হাইডেগার (১৮৮৯-১৯৭৬) ও অন্যান্য নানা বর্ণের অস্তিত্ববাদীদের চিন্তা বিশেষ উল্লেখযোগ্য। যেটাকে ব্যক্তিস্বাধীনতার চূড়ান্ত প্রকাশ বলে দেখানোর চেষ্টা করা হয় তার অপর পিঠ হল একটা দৃঢ় কেন্দ্র বা একটা বিশ্বাসের বন্ধনের অভাব[১২]— যার ফলে ব্যক্তিরা বিস্ফোরণে ভেঙে যাওয়া নক্ষত্রের টুকরোর মতো চূর্ণ চূর্ণ নক্ষত্রখণ্ড হয়ে নিজের নিজের কক্ষে থিতু হয়ে নিজের অক্ষের চারপাশে ঘুরতে থাকে। বিশ্বাসের জায়গায় পড়ে থাকে একটা কালো গহ্বর। আগেই সোরেন কিয়ের্কেগার্ড (১৮১৩-১৮৫৫) ঈশ্বর, সত্য— সব কিছুর অস্তিত্ব সম্বন্ধেই প্রশ্ন তুলেছিলেন। পরে নিট্‌শে-র *দাস স্পোক জরথুস্ট্র* বইয়ে 'ঈশ্বর মৃত'— এই ঘোষণা থেকেই পশ্চিমি দুনিয়ার সংশয় ও অনিশ্চয়ের সময় শুরু হয়েছিল, জীবনের 'terror and horror'-কে বাস্তব ধরে নিয়েছিলেন এই দার্শনিক।[১৩] তারপর প্রথম মহাযুদ্ধ এসে পশ্চিমের আরও অনেক বিশ্বাস ধ্বংস করে, এলিঅটীয় 'পোড়ো জমি'-র বুকে যে শূন্যতার ছবি ফুটে ওঠে তা ওই অনিশ্চয়েরই রূপকল্প। তার পরে আমেরিকার অর্থনৈতিক ধস, দ্বিতীয় মহাযুদ্ধ— ইত্যাদির মধ্যে দিয়ে উত্তর-আধুনিকদের 'পূর্বাবস্থা না-মানবার' বহুবিধ শর্ত তৈরি হয়। বিশ শতকের সত্তরের বছরগুলিতে জাক দেরিদা-র (১৯৩০-২০০৫) উত্তর-অবয়ববাদ বা পোস্ট-স্ট্রাকচারালিজম-এর তত্ত্ব, বিশেষ করে শব্দ ও অর্থের সম্বন্ধকে গুলিয়ে দিয়ে 'ভাষার মানে কিছুই দাঁড়ায় না'-র তত্ত্ব আধুনিকতার কফিনে শেষ পেরেকটি পুঁতে দেয় বলা চলে।

আধুনিকতার সঙ্গী যে-সব শিল্প, সমাজ ও ইতিহাসের তত্ত্ব, পুঁজিবাদ, মার্কসবাদ, ফ্রয়েডীয় মনোবিকলনের নানা শাখা, আচরণবাদ (স্ট্রাকচারালিজম), কিংবা তার পূর্বসূরি আঙ্গিকবাদ (ফর্ম্যালিজম)— সকলেরই মূল্যে যেন এই বিশ্বাসগুলি বর্তমান ছিল—

(১) শিল্প চারপাশের বাস্তবের প্রতিফলন ঘটাতে পারে। অর্থাৎ বাস্তব বা সত্য বলে একটা কিছু আছে। জ্ঞানে তা মানুষ জানতে পারে— অন্তত এতদিনকার জ্ঞানতত্ত্ব (এপিস্টেমোলজি) মানুষকে সেই আশ্বাস দিয়ে এসেছে, মাঝেমধ্যে সংশয়বাদীদের প্রশ্ন তোলা সত্ত্বেও। আবার মানুষ এও বিশ্বাস করে এসেছে যে, মানুষের সাহিত্য চিত্রকলা, ভাস্কর্য ইত্যাদি সেই বাস্তবের ছবি মোটামুটি বিশ্বাস্যভাবে তুলে ধরতে পারে। অর্থাৎ রচনা কল্পিত হলেও তা থেকে (দেখে বা পড়ে বা শুনে) মানুষ ভাবতেই পারে যে, 'হ্যাঁ, এরকমই তো আছে, এরকমই তো ঘটে।' মনস্তত্ত্ববিজ্ঞানও মানুষের মনের সত্য ছবি প্রকাশ করতে পারে, মনোজগতের বাস্তবও মানুষের আয়ত্তে এসেছে। অবশ্যই কোনো কোনো শিল্পতত্ত্ব এই প্রথাগত বাস্তবের ভাঙচুর করেছে— উন্মত্ততা, মনোবিকার, স্বপ্ন ইত্যাদির বিনষ্ট বিকৃত বাস্তবকে আশ্রয় করে,— যেমন কিউবিজ্‌ম, সুররিয়ালিজ্‌ম দাদাবাদ ইত্যাদি— কিন্তু নন্দনতত্ত্বের বাস্তবনির্ভরতা পুরোপুরি অস্বীকৃত হয়নি, যেমন দর্শনে সত্য নিয়ে বড়ো প্রশ্ন ওঠেনি।

(২) ভাষাতে বাক্যে ব্যবহৃত শব্দ আর বাক্যে শব্দগুলির অর্থও যে পৃথিবীতে উপস্থিত শারীরিক, অনুভবগত বা কল্পিত বাস্তবকে নির্দেশ করে— তাও মোটামুটি ধরে নেওয়া হয়েছিল। অর্থাৎ শব্দ ও অর্থের সম্বন্ধ মোটামুটি নিত্য ও ধ্রুব। আমরা কথা বলে পরস্পরকে বুঝতে, বোঝাতে পারি। এ-নিয়েও প্রশ্ন উঠেছে, দার্শনিক আইরিস মারডক ভাষাকে খোলা কাচের সঙ্গে তুলনা করেছেন গত শতাব্দীতে। ১৯৫০-এর পর থেকে পাশ্চাত্যে অ্যাবসার্ড বা কিম্ভূত নাটকে দেখানোই হয়েছে যে, মানুষের ভাষা ক্রমশ তার সংগত অর্থ প্রকাশের ক্ষমতা হারিয়ে ফেলছে (দ্র. সরকার, ২০০১)। তা সত্ত্বেও অন্য নাট্যকাররা বাস্তবকে প্রকাশের জন্য নাটক লিখতে দ্বিধা করেননি।

(৩) আধুনিক সময় পর্যন্ত এই বিশ্বাস পোষণ করা হয়েছে যে, সমাজে অর্থনীতি-রাজনীতির উপর নির্ভর করে সভ্যতা মোটামুটি একমুখী অগ্রগতি ধরে চলে। অর্থাৎ তার একটা 'টেলিয়োলজিক্যাল' অভিমুখিতা আছে। এ পর্যন্ত উন্নতি, অগ্রগতি, 'ক্রমমুক্তি'— ইত্যাদি সম্বন্ধে বিশ্বাস একেবারে লুপ্ত হয়নি। অবশ্যই ধনতন্ত্রের উন্নতি ও অগ্রগতির ধারণা (মূলত আরও বড়ো বাজার, আরও বেশি লাভ, ফলে আরও বেশি উৎপাদন এবং তা থেকে আরও আরও লাভ), আর সমাজতন্ত্র-সাম্যবাদ বা মার্কসবাদের উন্নতির ধারণা এক ছিল না। দ্বিতীয়টি প্রশ্ন করে কার উন্নতি, কীসের উন্নতি, এবং বঞ্চিত শ্রেণির দৃষ্টিকোণ থেকে উন্নতি-অগ্রগতির হিসেব করে। কিন্তু তারও প্রত্যাশা আছে যে, 'মানুষের ক্রমমুক্তি' ঘটবে।

(৪) এও ধরে নেওয়া হয়েছে যে, শিল্পে উচ্চ-নীচের ভেদ আছে। বহুচর্চা ও পরিশীলনের ফলে গড়ে ওঠা বা সৃষ্ট যে-শিল্প, যার পিছনে দীর্ঘদিনের নন্দনতত্ত্ব আর সক্ষম প্রযুক্তির সমর্থন আছে— তার সঙ্গে পার্কের পাঁচিলে টাঙানো বা রাস্তার ধারে সাজিয়ে বসা ছুটির দিনে সাধারণ লোকের কাছে বিক্রির 'শিল্পের' তুলনা হয় না, যেমন তুলনা হয় না রবীন্দ্রনাথের *গীতাঞ্জলি*-র সঙ্গে হাটের ছড়া-কিস্‌সার।

শিল্প যে উচ্চাঙ্গের, তা ঠিক করে দেয় কে? ঠিক করে দেয় নন্দনতত্ত্ব এবং নন্দনতত্ত্বের ধ্বজাধারী শিল্পসমালোচকের দল। একমাত্র তাদেরই সুপারিশে যেন স্থির হয়ে যায় যে, এই ছবিটা বা ভাস্কর্য বা লেখা সুন্দর ও মূল্যবান। দর্শক উপভোক্তাদের বিচার গণ্য করবার মতোই

নয়। হার্বার্ট রিড এ-প্রসঙ্গে বলেন এক 'natural taste'-এর কথা (Read, 1963: 93) যে 'natural taste'-ই নাকি ঠিক করে দেয় শিল্পকর্মের কোন্‌টা ভালো কোন্‌টা তত ভালো নয়, এবং কোনটা অত্যন্ত খারাপ।

অবশ্যই 'natural taste' বলতে কিছু নেই। রিড তাঁর মতো শিক্ষিত শিল্পবোদ্ধাদের taste-কে স্বাভাবিক রুচি বলে দেখাতে চাইলেও সংস্কৃতিতত্ত্বে তা গৃহীত হতে পারে না— অর্থাৎ যে সংস্কৃতিতত্ত্ব natural ও culture-কে বিরোধী অবস্থানে দাঁড় করায় তাতে। এ থেকে বোঝা যায় যে নন্দনতত্ত্বের একটা প্রভুত্ব আছে, তা উপর থেকে 'সর্বসাধারণের' জন্য ঠিক করে দেয় কোন্‌টা ভালো কোন্‌টা মন্দ। মাঝে মধ্যে এমন সন্দেহও অবশ্য ওঠে যে আড়ালে থাকা ছবি মূর্তি ইত্যাদির ব্যবসায়ী ও দালালরা অনেক সময় এই নন্দনতত্ত্বকে প্রভাবিত করে— শিল্প যেহেতু এখন বাজারের পণ্যও বটে। গল্প-উপন্যাসের ক্ষেত্রে যেমন বড়ো পত্রিকার ঢাক-পেটানো বিজ্ঞাপন। সেটাও আর একটা প্রভুত্বের জায়গা তো বটেই।

এই 'natural taste'-এর বিষয়ে প্রশ্ন থেকে সাহিত্যে যৌনতার প্রশ্নটিও এসে যায়। 'আধুনিকতায়' ডি এইচ. লরেন্স এক ধরনের সহজ যৌনতার স্থান করে দিয়েছিলেন। কিন্তু উত্তর-আধুনিক বলে স্বীকৃত হেনরি মিলার তাঁর নানা উপন্যাসে (*Tropic of Concer, Nexus, Plexus* ইত্যাদি) যৌনতার যে নিরঙ্কুশ ছড়াছড়ি করেছেন তাতে natural taste-এর প্রবক্তাদের শিউরে ওঠার কথা। বস্তুতপক্ষে লুসি (Lucy, 200 : 1-41) যেমন বলেছেন, যৌনতা নিয়ে এক ধরনের ছেলেখেলা পোস্টমডার্ন-এর শিল্পতত্ত্ব-ধ্বংসী মনোভাবের একটা লক্ষণ।

(৫) শিল্পসৃষ্টির ক্ষেত্রে মানুষ দীর্ঘদিন ধরে বহুবিধ শিল্পরূপ তৈরি করেছে— সাহিত্য, নৃত্যকলা, চিত্রকলা ইত্যাদি। আরিস্টটলই সর্বপ্রথম স্পষ্ট করে এই সব শিল্পের মিল ও সাদৃশ্য দেখান। কিন্তু তাঁর মূল কথা হল, প্রত্যেকটা শিল্প, আঙ্গিক, উপকরণে ও করণকৌশলে পৃথক হবে, পৃথক হবে বিষয়বস্তু ও দৃষ্টিভঙ্গিতে। খ্রিস্টপূর্ব চতুর্থ শতাব্দীতে আরিস্টটল-এর করা চারুশিল্পের প্রাথমিক বিভাগের পরে আরও অনেক বিস্তার এবং সংশোধনও ঘটেছে তা বলাই বাহুল্য। কিন্তু মৌলিক নীতিটি এখনও একই আছে যে, শিল্পগুলি আলাদা আলাদা সাহিত্য, সংগীত বা ভাস্কর্যের মধ্যে কোনো মৌলিক যোগ নেই। এবং প্রত্যেকটি থেকে মানুষের পাওয়া 'রসে'-এরও তফাত ঘটে। এই ভাগ আধুনিকতায় এসে একটু দুর্বল হলেও আধুনিকতা এই সীমাগুলিকে সম্পূর্ণ ভেঙে দেওয়ার কোনো চেষ্টা করেনি।

(৬) একই সঙ্গে আধুনিক সময় পর্যন্ত এ-বিষয়টাও স্বীকার করা হয়েছে যে, কোনো বিশেষ শিল্পের মধ্যে একাধিক সংরূপ বা জাঁর (genre) তৈরি হয়ে যায়। সাহিত্যে যেমন উপন্যাস, গীতিকবিতা, মহাকাব্য, ছোটোগল্প ইত্যাদি। এদের মাঝখানে যে দেওয়াল তোলা হয়েছিল, তাও আধুনিকতা পর্যন্ত মোটামুটি অটুট ছিল। যদিও দেওয়াল ভাঙার কিছু কিছু চেষ্টা অবশ্যই হয়েছে, উত্তর-আধুনিকতা নানা শিল্পের দেওয়াল যেমন ভাঙছে তেমনই জাঁর বা সংরূপের সীমানাও মানছে না। কীভাবে, তা আমরা পরে দেখব।

(৭) শিল্পে নন্দনতত্ত্ব যেমন একটা প্রভুত্বের পরিসর তৈরি করে তেমনই চিত্রকলা, ভাস্কর্য, স্থাপত্য, সংগীত, কবিতা গল্প ইত্যাদির উপর তার স্রষ্টারও একটা প্রভুত্ব থাকে। সে যেহেতু স্রষ্টা— তার সৃষ্টি, তার ব্যক্তিত্বের ঐকান্তিক চিহ্ন বহন করে— সেটাই তার ব্র্যান্ড। পিকাসো-র ছবি পিকাসো-রই, শাগাল-এর ছবি তাঁরই। মৌলিকতা বা originality-র প্রশ্নটি এখানে বিবেচ্য। এই ব্র্যান্ডমূল্য— অর্থাৎ কে সৃষ্টি বা রচনা করেছে তার উপরেও তার বাজারের দাম

তৈরি হয়ে যায়। স্রষ্টার নাম অনুযায়ী সৃষ্টির বাজারদরের হেরফের ঘটে, জনপ্রিয়তা এবং ফ্যাশন হুজুগেরও তারতম্য হয়।

(৮) শিল্পে বিশেষত চিত্রকলা, ভাস্কর্য, স্থাপত্য দৃশ্যকলায় প্রতিটি সৃষ্টি একক (unique) ও দোসরহীন। এই অনন্যত্বও শিল্পসৃষ্টির মূল্যবত্তা ও মহার্ঘতার সঙ্গে যুক্ত হয়। এর ফলে বিত্তবান সংগ্রাহকেরা প্রচুর দাম দিয়ে শিল্পবস্তু নিজেরা কিনে ঘর সাজায়, নিছক মূল্যবান সংগ্রহের অহংকার দেখায়, যেন দক্ষিণ আমেরিকা বা আফ্রিকার নৃমুণ্ড শিকারিদের মতো শিকার করা মাথা ঘরে ঝুলিয়ে রাখে, নাহলে বাজারের জন্য নিলামের দর চড়ায়। সাধারণ মানুষের কাছে এসব শিল্পবস্তু অনায়ত্তই থেকে যায়। বিত্তের এই একচেটিয়া প্রভুত্ব দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের সময় যামিনী রায় একভাবে ভেঙেছিলেন, অসংখ্য যিশুখ্রিস্ট বা গণেশের ছবি এঁকে নানাজনের কাছে বিক্রি করেছেন। পরে আমরা দেখব, উত্তর-আধুনিকতা অন্যভাবে একক শিল্প সৃষ্টির উপর এই একচেটিয়া দখলদারি ভাঙবার চেষ্টা করে।

(৯) শিল্পতত্ত্ব ও নন্দনতত্ত্বের অগ্রগতি ঘটেছে মূলত আগেকার এসব তত্ত্বকে প্রত্যাখ্যান ও সংশোধন করে। অবশ্যই রাতারাতি আমূল পরিবর্তন হয়নি। এক্ষেত্রেও হেগেল-মার্কস-এর ইতি-নেতি-সমন্বয়ের সূত্র কার্যকর থেকেছে। কিন্তু কুন্ (Kuhn, 1963) যাকে বলেছেন আদর্শ-বিক্ষেপ ('প্যারাডাইম শিফট') তার দৃষ্টান্ত অধিগঠন বা সুপার স্ট্রাকচার-এর ক্ষেত্রে যেমন ঘটেছে, তেমনই ভিত্তি বা বেস-এর ক্ষেত্রেও ঘটেছে। বাষ্পীয় থেকে মোটর ইঞ্জিন, এবং তা থেকে কম্পিউটার প্রযুক্তি ও বৈদ্যুতিন যন্ত্রের এসে যাওয়া এইরকম ভিত্তির আদর্শ-বিক্ষেপের উদাহরণ। এখানেও জেম্সন-এর 'কালাচারাল ডমিন্যান্ট'-এর বিষয়টি দেখা দেয়নি তা নয়।

অবশ্যই হার্বার্ট রিড[১৪] এবং আঙ্গিকবাদীদের অনেকে সাহিত্যের ইতিহাসে একমুখী অগ্রগামিতার চেয়ে এক ধরনের পুনরাবৃত্তি লক্ষ করেন (দ্র. Wellek & Warren, 1963 : 252-71)। রিড যেমন বলেন ইংরেজি কবিতার ইতিহাসে ক্লাসিকাল ও রোমান্টিকের পর্যায়ক্রমিক আবর্তনের কথা। অবশ্য রিড ও ওয়েলেক-দের পুনরাবর্তনের ধারণা এক নয়। রিড ইংরেজি কবিতার ইতিহাসের পর্যালোচনায় বলেন সুনির্দিষ্ট কাব্যতত্ত্বের (ক্লাসিক্যাল ও রোমান্টিক) পুনরাবর্তনের কথা; আর ওয়েলেক-রা বলেন পুরোনো আদল (Norm) বা প্রথা (Convention) ভেঙে নতুন আদলের জন্মের কথা।[১৫]

যাইহোক, আগের নন্দনতত্ত্বকে বাতিল বা বর্জন করে নতুন নন্দনতত্ত্বের উদ্ভব— এই একমুখী অগ্রগতির ছকটাও উত্তর-আধুনিকতা ভাঙে। তার শিল্পতত্ত্ব অতীতের প্রতি 'নস্টালজিক'— অর্থাৎ প্রায়ই কাল উল্লম্ফন করে অতীতের শৈলীকে গ্রহণ করে, কিংবা নানা দেশের শৈলীর বিষম ভঙ্গিকে মিলিয়ে দেয়। বিশেষ করে স্থাপত্যে— যে শিল্পকে জেমসন পোস্টমডার্নজম-এর 'Privileged Art' বলেন— তাতে অতীতের বা দূরদেশের সব শৈলীর কিম্ভূত মিশ্রণ ঘটতে পারে। কিন্তু আধুনিকতা-চিহ্নিত স্থাপত্য ছিল ছিমছাম, বিশাল ও কার্যকর। অল্প জায়গা ব্যবহার করে সবচেয়ে বেশি সুবিধে আদায়ই ছিল তার লক্ষ্য। পায়রার খোপের মতো বহুতল বাড়ি তার চিহ্ন। অবশ্যই ফ্রাঙ্ক লয়েড রাইট বা লে কর্বুশিয়ের তার মধ্যে কিছুটা সৌন্দর্য এনেছিলেন, কিন্তু তাতে বাহুল্য ছিল না। উত্তর-আধুনিকতা বাহুল্যে উল্লসিত।[১৬]

এবার আমরা এই প্রাগ্-উত্তর আধুনিক পর্বের চিহ্নগুলিকে ভিত্তি করে উত্তর-আধুনিকের চরিত্র নির্ধারণ করবার চেষ্টা কবর।

৬. উত্তর-আধুনিক : চিহ্ন ও চরিত্র :

উপরে আমরা নটি ক্ষেত্র নির্দেশ করেছি যেগুলিকে দুটি ভাগে ভাগ করা যায়। কতকগুলি ক্ষেত্র এই সদ্যতন ধনতন্ত্রের অধীন সমস্ত নাগরিককেই প্রভাবিত করে, আর কতকগুলি ক্ষেত্র বিশেষভাবে শিল্পস্রষ্টাদের সৃষ্টির অধিকার, স্বাধীনতা ও ব্যাপ্তির সঙ্গে জড়িত। দুয়ের যোগও ঘনিষ্ঠ। অর্থাৎ আমাদের চারপাশের বাস্তবের চেহারাটা ঠিক কী (বিশ্বাস ১)— এটা সাধারণ নাগরিকের প্রশ্ন যেমন, তেমনই যে শিল্পী বা টেলিভিশনের সংবাদদাতা এই নাগরিকের কাছে বাস্তবের কোনো-না-কোনো চেহারা সাজিয়ে দেন— এটা তাঁরও প্রশ্ন। উপরে তালিকাবদ্ধ বিশ্বাসের মধ্যে ৪, ৫, ৬, ৭, ৮ সাধারণ মানুষের সামাজিক জীবন, শিল্পের অনন্যতা, উপভোগ, বাজার ও মূল্যনির্ধারণ ইত্যাদির সঙ্গে জড়িত। কিন্তু ১ মূলত শিল্পস্রষ্টার সমস্যা, ৯-ও অংশত তাই। ৯ আবার বিশেষজ্ঞের বা শিল্প-ইতিহাসকারেরও সমস্যা— সাধারণ মানুষ, এমনকি শিল্পীরাও তাতে প্রতিদিন লিপ্ত হবে এমন সম্ভাবনা নেই। অর্থাৎ সূত্রগুলি মূলত সামাজিক ভোক্তা মানুষ এবং বিশেষজ্ঞ বা স্রষ্টা মানুষের মধ্যে বিভাজিত। যদিও উপরেই আমরা দেখেছি যে কোথাও কোথাও তা উভয়েরই সমস্যা। কিন্তু দুপক্ষের সমস্যার চরিত্র পৃথক— এও আমরা দেখব।

৬.১ প্রথম গন্ডগোল— বাস্তব কী?

বাস্তবকে জানার আমাদের দুটো উপায় আছে, একটা প্রত্যক্ষ— নিজের ইন্দ্রিয়ের সূত্রে একেবারে সামনে দেখছি শুনছি গন্ধ নিচ্ছি ছুঁচ্ছি ইত্যাদি। এখানে আমরা বলতেই পারি যে, 'হ্যাঁ, এ আমার চাক্ষুষ অভিজ্ঞতা'।

আর একটা উপায় হল মধ্যস্থতা ভাষার মধ্যস্থতা। তারও আবার দুটি চেহারা— একটি মৌখিক, আর একটি লিখিত বা মুদ্রিত। মৌখিক কথা কারও মুখ থেকে আসতে পারে, আবার তা মুদ্রিত কণ্ঠস্বর হিসেবে ক্যাসেট, সিডি, রেডিও ইত্যাদির অধিকন্তু এক মধ্যস্থতাসূত্রে আমার কানে পৌঁছোতে পারে। আর লিখিত/মুদ্রিত মধ্যস্থতা সাজিয়ে রাখা হয় বইয়ে, খবরের কাগজে, সাময়িকপত্রে।

ইদানীংকালে বাস্তবকে জানার আর একটি গুরুত্বপূর্ণ মধ্যস্থ বা উপায় হয়ে উঠেছে টেলিভিশন ও চলচ্চিত্র অর্থাৎ গতিশীল ও সমন্তব্য বৈদ্যুতিন উপায়ে প্রক্ষেপ করা দৃশ্যাবলি। এর আগে মুদ্রিত ছবিও দেখেছি। এখনও ভ্রমণের বা ইতিহাসের রঙিন ছবিওয়ালা বইয়ের পাতা উলটে আমরা তাতে পরিবেশিত বাস্তব সম্বন্ধে ধারণা করার চেষ্টা করি। বৈদ্যুতিন দৃশ্যাবলি মৌখিক ভাষাকেও ব্যবহার করে, ফলে তা অনেক বেশি জীবন্ত। তবে দৃশ্যাবলি সচল হোক বা অচল হোক, সাধারণভাবে আমরা এই বিশ্বাস নিয়ে থাকি যে, যা এগুলিতে দেখছি সেসব ঘটনা বা দৃশ্য ওখানে ঘটছে বা আছে। অর্থাৎ এগুলিই বাস্তব। মধ্যস্থতার সূত্রে এলেও বাস্তব।

উত্তর-আধুনিকতায় পা রেখে দার্শনিক বোদরিয়ার (baudrillard, 1983) এখানেই একটা বিদঘুটে প্রশ্ন তোলেন। বিশেষ করে টেলিভিশনে দেখা সংবাদ সম্বন্ধে। এতে দর্শকদেরও যেন একটা দায়িত্ব এসে যায়। প্রথমত, পোস্টমর্ডান দর্শকেরা কী আছে বা কী ঘটছে— সে-সব নিয়ে কি খুব একটা জানতে-বুঝতে আগ্রহী? এই যে টিভি-র সামনে বসে, অজস্র চ্যানেলের বিকল্পের সুযোগ নিয়ে তারা রিমোট হাতে নিয়ে 'জ্যাপ' (Zap) করে একটা চ্যানেল থেকে আর একটা চ্যানেল-এ লাফিয়ে লাফিয়ে যায়— তাতে কী এটা প্রমাণ হয় যে দর্শকেরা কী আছে কী ঘটছে সে সম্বন্ধে খুব জানতে চায়? দর্শকদের যদি দায়ী নাও করি, তবু বলতে পারি যে, উত্তর-

আধুনিক ব্যবস্থা তাদের এমন একটা জায়গায় বেঁধে ফেলেছে যে, তারা এখন বাস্তব-বিমুখ। বাস্তবে একটানা মনোনিবেশ করার ধৈর্য তাদের নেই। এতে উপভোগবিলাসী ও উপভোগ-বিক্রেতা ধনতন্ত্রেরই সুবিধে, কারণ তারা টিভি-র দর্শকের অবিরাম ও একাগ্রভাবে বিনোদন-সন্ধানী করে তুলেছে। উত্তেজনার অনন্ত সরবরাহ তাদের চাই। উত্তর-আধুনিক বিনোদন ব্যবস্থা সেই লক্ষ্য নিয়ে নিরন্তর খেটে চলেছে।

বোদ্‌রিয়ার বলেন একটা কিম্ভূত কথা। তিনি বলেন, টেলিভিশন-এ, বিশেষত পাশ্চাত্যের টেলিভিশন-এ যা দেখানো হয়, সবই বানানো ছবি বা semulcra (semulcrum-এর বহুবচন) বা simulations। তাঁর মতে ৯০-এর বছরগুলির গোড়ায় ইরাকের যুদ্ধ আদৌ ঘটেনি, বাগদাদে স্কাড্ ক্ষেপণাস্ত্র আদৌ নিক্ষেপ করা হয়নি, লোকজন মারা যায়নি, ঘরবাড়ি ধ্বংস হয়নি, প্রাচীন সভ্যতার নিদর্শন লুট হয়নি— সবই নাকি বৈদ্যুতিন মাধ্যমের বানানো। কম্পিউটারে এখন যে-কোনো ছবি তৈরি করা যায়। 'স্টার ওয়ার্স্' জাতীয় ছবি মূলত কম্পিউটার-এ সিমিইউলেশন করেই তৈরি হয়। বোদ্‌রিয়ার-এর কথার মধ্যে বাড়াবাড়ি আছে, এমনকি ইরাকযুদ্ধ সম্বন্ধে তাঁর কথাবার্তা একটু নিষ্ঠুর ও অবিবেচকের মতো বলেই মনে হয়। কিন্তু তাঁর মূল কথা হল যে, টেলিভিশন-এর পর্দায় হাজার হাজার ছবির মিছিল দ্রুত দৌড়ে যায়, ফলে দর্শকের বোধ কিছুই ধরে রাখতে পারে না। তারই ফলে ছবির আড়ালে যে ঘটনা, অর্থাৎ মধ্যস্থতাকারী দৃশ্যের reference point— তার যোগাযোগ সম্পূর্ণ নষ্ট হয়ে গেছে। বোদ্‌রিয়ার (1988 :170) "an effect of frantic self-referentiality" বলতে এটাই বুঝিয়েছেন; অর্থাৎ টেলিভিশন-এর দৃশ্যাবলি নিজেরাই নিজেতে বদ্ধ। তারা বাইরের কোনো দৃশ্য বা ঘটনার প্রতিফলন নয়।[১৭]

অর্থাৎ সোজা বা সরলীকৃত কথায়, আমরা বাস্তব সম্বন্ধে আগ্রহী যেমন নই, তেমনই বাস্তবের সত্য ছবি পাবার রাস্তাও আমাদের জানা নেই। আমরাও নিজেরা একটা hyperreal বা অধিবাস্তব জগতে বদ্ধ বা বন্দি, এবং তার দেওয়াল ভেঙে বৃহৎ বাস্তব পৃথিবীর সুখদুঃখের সত্যে ঢুকে পড়ার ক্ষমতা আমাদের নেই। পরের প্রসঙ্গে আমরা দেখব যে, বাস্তবের আর এক প্রাচীন মধ্যস্থ— অর্থাৎ শব্দ (words) বা ভাষা সম্বন্ধেও দেরিদা একই প্রশ্ন তুলেছেন। ভাষা আমাদের সত্যে পৌঁছে দেয়, না সত্যকে আড়াল করে? উপরের ১০ নম্বর সূত্রে যে 'metanarrative' বা 'grand narrative' (মূলত Lyotard -এর শব্দাবলি) -এর কথা আছে, টেলিভিশন-মায়া পৃথিবীর নাগরিকদের অস্তিত্ব যে তাকেই চূর্ণ-বিচূর্ণ করতে সাহায্য করে, এই আত্মবদ্ধ দর্শক যে-কোনো বৃহৎ প্রত্যয় বা আদর্শ বা সংগঠনের অধীন হতে চায় না (আসলে কথাটা সত্য নয়)— এ দুটো পরস্পর সম্পর্কিত। পরে এ সম্বন্ধে আমরা আরও বলব।

৬.২ শব্দ আর অর্থ

এই জায়গাটায় একটা বড়ো ধাক্কা দিলেন উত্তর-অবয়ববাদী (পোস্ট-স্ট্রাকচারালিস্ট) জাক দেরিদা। তিনি বললেন, ভাষায় শব্দ তোমাকে যে অর্থ দেয় সেটা নিছক আপাত অর্থ, খাঁটি অর্থ নয়। খাঁটি অর্থ পাবার জন্য শব্দের ইতিহাস-ভূগোল-বুৎপত্তি বিভঞ্জন (deconstruction) করে তোমাকে অর্থ খুঁজতে হবে। (দ্র. Derrida, 1976) তা করলেও দেখবে কোনো সাফল্য নেই, কারণ পেঁয়াজের খোসা ছাড়াতে ছাড়াতে শেষ পর্যন্ত পেঁয়াজের অন্তর্দেশ বলে কিছুই থাকে না।

গত শতাব্দীর গোড়ায় ফের্দিনাঁদ দ্য সোস্যুর-এর উচ্চারণ 'linguistic symbols are arbitrary' অর্থাৎ ভাষার প্রতীকের সঙ্গে তা যার প্রতীক (ভাষার ধ্বনিগঠিত শব্দ অর্থে প্রতীক, লিখিত শব্দ উচ্চারিত শব্দের প্রতীক) তার কোনো নিত্য, ধ্রুব ও অপরিহার্য সম্বন্ধ নেই। তা প্রথার দ্বারা আরোপিত সম্বন্ধ মাত্র (Baskin, 1965)। সেই সূত্রের উপর ভিত্তি করে দেরিদা তিলকে তাল করেছেন বলা যায়। তিনি এই সমাধানে পৌঁছেছেন যে, শব্দ (উচ্চারিত হোক, লিখিত হোক) আর অর্থের সম্বন্ধ ভয়ংকর গোলমেলে, ফলে সত্যকে জানবার ভাষাগত কোনো উপায় নেই। দেরিদা-র সমালোচকেরা বিপরীত অবস্থানে দাঁড়িয়ে বলেন, তা যদি হয়, তাহলে দেরিদা-র বইয়ের ভাষায় যে সত্য আছে যা তিনি 'সত্য' বলে বোঝানোর চেষ্টা করছেন, তা আমরা জানব কী করে? তার অর্থও (অর্থাৎ সত্যও) তো আমাদের আয়ত্তে আসবে না সহজে, তার misreading-এর সম্ভাবনা তো থেকেই যাচ্ছে। মার্কিনদেশে দেরিদা-অনুগামী খ্রিস্টোফার নরিস-ও শেষ পর্যন্ত স্বীকার করতে বাধ্য হয়েছেন যে, না, এই বিষয়টাতে 'celebrants of deconstruction' একটু বেকায়দায় আছে এটা তারা 'have not been sufficiently willing to address' [Norris; 1985: 219]

বিভঞ্জন বা deconstruction তত্ত্বের হয়তো একটা খুব বড়ো দার্শনিক গুরুত্ব আছে। দার্শনিকদের প্রথা ও প্রচলিত বিশ্বাসের উলটো দিকে দাঁড়িয়ে প্রশ্ন করতে হয় এবং প্রচলিত বিশ্বাসকে ধরে প্রবল ঝাঁকানি মাঝে মাঝেই দিতে হয়। দেরিদা তাই দিয়েছেন। অব্যবহিত পূর্ববর্তী অবয়ববাদের বিরুদ্ধে তাঁর আপত্তির প্রধান কারণ এবং লেভি স্ত্রোস্ প্রভৃতির সঙ্গে তর্কের মূলও এইখানে যে, অবয়ববাদীরা মনে করেন পৃথিবীতে এখনও 'সত্য'-কে উদ্ধার করা যায়, তা উচ্চারিত ভাষা বা লিখিত ভাষা থেকেই হোক, কিংবা তার কোনো একটা নির্মিত অবয়ব থেকেই হোক।

উত্তর-আধুনিকতার বাস্তব ও সত্যের যে ধারণা— তাতে বলা হয় যে, এ দুইই আমাদের আয়ত্তের বাইরে, কিংবা সে-সব আমাদের আয়ত্ত করতে দেওয়া হয় না। দেরিদা-র তত্ত্ব তাকে পুষ্ট করেছে। আমাদের মতে দেরিদা-র তত্ত্বের দার্শনিক গুরুত্ব যতই থাক, সাধারণ মানুষের দৈনন্দিন জীবন ও প্রয়োজনের পক্ষে তা অপ্রাসঙ্গিক ও গুরুত্বহীন। আমাদের কোনো একটা বিশ্বাসের সন্ধান করতেই হয়, একটা সত্যকে আঁকড়ে ধরতেই হয়। সে সত্যকে আমরা মূলত ভাষার মধ্যে দিয়েই পাই। অন্যান্য শিল্পের ভূমিকাও তাতে অগ্রাহ্য করার মতো নয়।

৬.৩ মনস্তত্ত্বের বাস্তব

বাইরের বাস্তবকে আমাদের নানাভাবে প্রত্যক্ষ করার উপায় থাকলেও মনস্তত্ত্বের বাস্তব আমাদের কাছে প্রত্যক্ষ নয়। মনস্তত্ত্বের রোগী ডাক্তারের শোয়ানো চেয়ারে বসে মূলত ভাষায় বলে তার স্বপ্ন, অনুভব ইত্যাদির কথা। ভাষার সত্যপ্রকাশের ক্ষমতা যদি আমরা অস্বীকার করি তাহলে বহির্জগতের বাস্তব যেমন, তেমনই মনোজগতের বাস্তবকেও জানবার সম্ভাবনাকে আমাদের অস্বীকার করতে হয়। পোস্টমডার্ন বাহির এবং অন্তরের দুরকম সত্য বা বাস্তব নিয়েই প্রশ্ন তোলে, প্রশ্ন তোলে সময় ও স্থানের সংহতি ও ধারাবাহিকতা সম্বন্ধে, বাস্তবের সংগঠন সম্বন্ধে।

৬.৪ সমাজ ও সভ্যতার অগ্রগতি বা অভিমুখীনতা

উত্তর-আধুনিকতার সমালোচকেরা প্রায়ই এক সাংস্কৃতিক তত্ত্ব সম্বন্ধে 'apocalyptical' কথাটিকে ব্যবহার করেন, অর্থাৎ উত্তর-আধুনিকতা হল সভ্যতা-সংস্কৃতির শেষ লগ্নের, বলা

যায় চূড়ান্ত ধ্বংসকালীন সময়ের তত্ত্ব। আবার একে বলা হয়েছে 'কল্পলোকাশ্রিত' 'utopian'। দুটোতেই ইতিহাসের ভূমিকা অস্বীকৃত। প্রথমটায় ইতিহাসের সমাপ্তি ঘোষণা ফুকুয়ামা যেমন সোল্লাসে করেছেন; দ্বিতীয়টাতে ইতিহাস থেকে সম্পূর্ণ বিচ্ছিন্ন হয়ে যাওয়া। অ্যালান ওয়াইল্ড-এর (Wilde 1981 : 131) মতে উত্তর-আধুনিকেরা এমন এক পৃথিবীর কথা বলে যে-পৃথিবী 'beyond repair'। আধুনিকতা কিন্তু বলে সেই পৃথিবীর কথা যা হল 'a world in need of mending'। অর্থাৎ মানুষের সভ্যতার প্রগতি বা অগ্রগতি সম্বন্ধে মাথা ঘামানোর দায় বা বাধ্যবাধকতা উত্তর-আধুনিক তত্ত্বের নেই, এ তত্ত্ব নিজের চমকপ্রদ সাক্ষাৎকারে মুগ্ধ। জেমসন (1991 : 368) এর 'fantastic historiography'-র কথা বলেন। অন্যদিকে উত্তর-আধুনিকরা যত বলেন অতীতের নানা নন্দনতত্ত্বে 'return'-এর কথা, কখনও তত বলেন না এখান থেকে কোথায় যাবেন। না ইতিহাস, না নন্দনতত্ত্ব, না শিল্পের মহত্ত্ব ও প্রভুত্ব, না বৃহৎ আদর্শের বন্ধন ও বিশ্বাস— এই একগাদা 'না'-এর উপর দাঁড়িয়ে থাকেন তারা, তৈরি করে তোলেন এক বৃহৎ আত্মবদ্ধ, বিচ্ছিন্ন ও সংকীর্ণ বৃত্তের 'হ্যাঁ'। অবশ্যই উত্তর-আধুনিককালের কিছু কিছু ইতিবাচক অভিক্ষেপও ঘটেছে, তার একটি হলো প্রান্তিকায়িত গোষ্ঠীগুলির স্বীকৃতি ও সম্ভাষণ— যেমন কালো মানুষদের কথা, রেড ইন্ডিয়ান ও অন্যান্য আদিবাসী মানুষদের কথা। বিশেষভাবে নারীদের কথা। পরে আমরা লিয়োতার-এর 'metanarrative' (grand narrative, master narrative) প্রত্যাখ্যানের আলোচনায় এসব কথা বলব।

৬.৫ শিল্পতত্ত্ব সংক্রান্ত অবস্থান : উচ্চাঙ্গের শিল্প, জনপ্রিয় শিল্প

ইউরোপ-এ কান্ট তাঁর *Critique of Judgement* বইয়ে যে নতুন নন্দনতত্ত্ব গড়ে তুলেছিলেন তাতে শিল্পের একটা মহদ্‌বোধ বা sublime-এর ধারণা গড়ে তোলার কথা বলা হয়েছিল। নিট্‌শে এসে তাকে অস্বীকার করেন। তা সত্ত্বেও ইউরোপ-এর নন্দনতত্ত্বে উচ্চাঙ্গের শিল্প আর সস্তা শিল্পের একটা তফাত বরাবরই স্বীকার করা হয়েছে। আবার হার্বার্ট রিড-এর কথা আমরা উদ্ধার করি— ওই 'taste' প্রসঙ্গে তাঁর কথা হল "Taste is formed by a continuous assessment of quality such as all craftsmen instinctively direct towards each others work. In society as a whole a critical attitude of this kind produces a progressive awarenss of the formal beauty of human artifacts and this is the true meaning of 'taste' (পূর্বোল্লেখ)।" আগেই তিনি শিল্পের ক্ষেত্রে 'Suncapped Peaks'-এর রূপক ব্যবহার করেন।

উত্তর-আধুনিকতা শিল্পের এই উচ্চতা-নীচতার ভেদ স্বীকার করে না। এমনকি কোন্‌টা শিল্প তার কোনটা না-শিল্প— তার তফাতও তার কাছে গুরুত্বপূর্ণ নয়। উত্তর-আধুনিকতা সম্বন্ধে আর-একটি প্রারম্ভিক বইয়ে (*Appignanesi and Garratt*; 1995:51-55) অন্যভাবে সাজানো 'না-শিল্পের' এই শিল্প হিসেবে ন্যায্যতা বা 'legitimation'- এর দৃষ্টান্ত হিসেবে মার্সেল দুশাঁ (Marcel Duchamp) নামে নব্য 'দাদা'বাদী এক শিল্পীর কথা বলা হয়েছে। ইনি ১৯১৪ নাগাদ একটি প্রস্রাবপাত্রকে প্রদর্শশালার দেয়ালে লটকে দিয়ে 'installation art' হিসেবে জাহির করেছিলেন। নাম দিয়েছিলেন 'ঝরনা' বা Fountain। অবশ্য একথা বলা যেতেই পারে যে, স্নানঘরে প্রস্রাব-পাত্রের যে স্থান ও ভূমিকা, সে জায়গায় সে প্রস্রাবপাত্রই। কিন্তু প্রদর্শনীকক্ষে ভিত্তির উপরে তাতে বসিয়ে দিলে এবং দর্শকের দৃষ্টির সামনে তাকে স্থাপন করলে তা প্রত্যাশিত পরিপ্রেক্ষিত থেকে বিচ্ছিন্ন হল, তার ভূমিকাও বদলে গেল। ফলে তা আর নিছক

প্রস্রাবপাত্র রইল না। অবশ্য তার মধ্যে শিল্পীর মৌলিক 'সৃষ্টি'-অংশ কতটা, অভিনব কল্পনার অংশ কতটা, সৃষ্টি সে কল্পনাকে সমৃদ্ধ করছে, না কল্পনা সৃষ্টিকে সমৃদ্ধ করছে, তাতে 'সৌন্দর্য' কিছু তৈরি হচ্ছে কিনা,— এসব নিয়ে তর্ক চলতেই থাকবে। কিন্তু দেখা যাচ্ছে যে, আধুনিকোত্তর শিল্পের সঙ্গে 'না-শিল্পের' আদানপ্রদানের পথটি বেশ প্রশস্তই। জেম্‌সন এ বিষয়টি বোঝানোর জন্য ভ্যান গখের চাষির একজোড়া বুটজুতোর ছবি আর নব্য মার্কিন শিল্পী অ্যান্ডি ওয়ারহল-এর 'ডায়মন্ড ডাস্ট শুজ' ছবিদুটির তুলনা করেন। প্রথম ছবিতে জেম্‌সন (পূর্বোক্ত 7-8) "The whole object of agricultural misery, of stark ruarl poverty, and the whole ordimentary human world of backbreaking peasant toil a world reduced to its most brutal and menaced, primitive and marginalized state" লক্ষ করেন, সেখানে ওয়ারহল-এর ছবি সম্পর্কে বলেন...'it does not really speak to us at all'। অন্যদিকে ওয়ারহলের ছবির বাণিজ্যিক বিজ্ঞাপনের চরিত্র, ফোটোনেগেটিভ-এর ছাঁচ যেন এর অন্তর্নিহিত অর্থকে একটা 'flatness or dipthlessness, a new kind of superficiality'-র ধরন এনে দেয়।

না-শিল্পের সঙ্গে শিল্পের পার্থক্যকে যেমন উত্তর-আধুনিকতা আচ্ছন্ন করতে চায়, তেমনই সে চায় উচ্চ শিল্পের সঙ্গে বাজারি শিল্পের বা সস্তা সাধারণ রুচির শিল্পের তফাত নষ্ট করতে। শুধু তাই নয়, pop art বা mass art-কে তার সংস্কৃতির উপযুক্ত শিল্পশস্য বলে প্রমাণ করতে। পরে আমরা এ-বিষয়ে আর একটু বলব। তার আগে আনুষঙ্গিক আরও দু-একটি কথা সেরে নিই।

উচ্চ বা উন্নত শিল্পসৃষ্টি সম্বন্ধে উত্তর-আধুনিকরা প্রথম যে প্রশ্নটা করে তা এই; এটা যে উঁচুদরের শিল্প তা কে ঠিক করল? যদি কেউ উত্তর দেয় যে, তা ঠিক করেছে শিল্পতাত্ত্বিকরা, শিল্প সমালোচকরা— তারা বলবে, ফুঃ! আমরা ওসব authority বা প্রভুত্ব মানি না। ক্লাইভ বেল্ শিল্পকে 'organized form' বলুন আর রিড (পূর্বোল্লেখ পৃ. ৪) উন্নত শিল্পকে' "something beyond self-expression...which might be called life-expression" বলুন না কেন, উত্তর-আধুনিক বলবে, 'লাইফ-ই বা কী, আর self-ই বা কী— দুয়ের অস্তিত্ব কী তাই তো জানি না।'

দ্বিতীয়ত, আগেই উল্লেখ করেছি, চিত্রশিল্পের এক-একটি ছবি যে একটি অনন্য, স্বতন্ত্র শিল্পসৃষ্টি, এবং টাকা দিয়ে কেউ ব্যক্তিগত সম্পত্তি হিসেবে সেটি দখলে রাখতে পারে, তারও বিরুদ্ধে দাঁড়ায় উত্তর-আধুনিকেরা। একদিকে যেমন স্রষ্টা শিল্পীর একক originality, authority বা প্রভুত্বে এঁদের আপত্তি, তেমনই এঁরাই আবার সে শিল্প যে একটিমাত্র ধনী ক্রেতার একমাত্র অধিকারে থাকবে তাতেও আপত্তি জানায়। এতে মনে হতে পারে যে, ধনীর সঞ্চয় ও সম্পত্তি সমাবেশে, একক মালিকানায় এঁদের আপত্তি। তা কিন্তু নয়। এঁরাই যখন কোটি কোটি টাকা খরচ করে বেহিসেবি ও অনর্থক অপ্রয়োজনীয় অলংকরণের উত্তর-আধুনিক স্থাপত্যের জন্য উচ্ছ্বাস করে তখন এঁদের স্ববিরোধ প্রকট হয়। কারণ অতুল বৈভব ও অলজ্জ অপচয় ছাড়া ও ধরনের স্থাপত্য আদৌ সম্ভব হত না— সে-প্রসঙ্গ তারা মনেই রাখে না।

যাই হোক, ছবির শিল্পীর নামচিহ্নিত অনন্যতা, সমালোচক-নির্দিষ্ট দামের প্রতিবাদে উত্তর-আধুনিকরা হাজার হাজার ছবির নকল সস্তা দামে বাজারে বিক্রি করার পক্ষপাতী। ১৯৭৮-এ হুল্টার বেন্‌ইয়ামিন বলেন এই পরিপ্রেক্ষিতে ফোটোগ্রাফির বিশেষ গুরুত্বের কথা (Benjamin, 1978), বলেন তা নন্দনতত্ত্বের গোড়া ধরে নাড়া দেবে। কারণ ফোটোগ্রাফ অজস্র কপি করে বিক্রি করা যায়।

সাহিত্যে ডিটেকটিভ উপন্যাস, প্যারোডি এইসব জনপ্রিয় রচনা বা Kitsch হয়ে ওঠে এই সময়ের প্রতিনিধিত্বমূলক শিল্পকর্ম। কারণ এই সংস্কৃতিকাল সত্যে অবিশ্বাসী, অবিশ্বাসী সুন্দরেও। নন্দনতত্ত্ব নামক শাস্ত্রের ন্যায্যতা নিয়েই প্রশ্ন তুলছে এরা। পিয়ের বুর্দো (Bourdiew, 1993) বিশেষ করে উচ্চ ও জনপ্রিয় শিল্পের তফাত ভাঙার কথা বলেন।

৬.৬ শিল্পতত্ত্বে দ্বিতীয় আখ্যান : শিল্পে শিল্পে দেওয়াল— সীমারেখা; অন্যদিকে একটা শিল্পের মধ্যে নানা সংরূপ বা genre-এর খোপ খোপ ভাগ সম্বন্ধে সিদ্ধান্ত

হ্যাঁ, এই দুটো বেড়াই ভাঙতে চাইছেন উত্তর-আধুনিকরা। প্রথমত, শিল্পে শিল্পে মাঝখানে যে দেওয়াল থাকে, সাহিত্য আর চিত্রকলা, চিত্রকলা ও সংগীত, চিত্রকলা ও স্থাপত্য বা ভাস্কর্য— এই কলাবিদ্যার দেওয়াল-ভাঙা আধুনিকতার যুগেই শুরু হয়েছিল, কিন্তু উত্তর-আধুনিকতা এটাকেই কাম্য বলে মনে করে। মিক্সড মিডিয়া বলে যে কথাটা আমরা ইদানীং হরহামেশা শুনি, তা যেন চারুশিল্পে উত্তর-আধুনিকতার বিশেষ অবলম্বন। এবং ভিডিয়ো বা সিডি-তে দৃষ্টি ও শ্রুতি দুয়েরই উপজীব্য থাকে বলে ভিডিয়ো-তে সাহিত্য, চিত্রকলা, সংগীত, নাটক সবই মিশে যেতে পারে। সেই কারণেই জেম্‌সন-রা ভিডিয়ে-কে বিশেষভাবে উত্তর-আধুনিক প্রযুক্তির অন্তর্গত করে দেখেন। লুসি (Lucy, 2000) বলেছেন এক ধরনের ছবিওয়ালা 'picture novel'-এর কথা, বয়স্কপাঠ্য উপন্যাসে যা দীর্ঘদিন দেখা যায়নি, যদিও পিটার ভাইস প্রভৃতির দু-একটি উপন্যাসে আমরা ভাষার আখ্যান ও ছবির অন্তর্বয়ন দেখেছি বলে মনে হয়। পরে দেখা যাবে লিয়োতার-এর বয়ান— বিজ্ঞানের শাখাগুলিরও দেওয়াল ভাঙছে। আমরা প্রবন্ধের প্রথম দিকে অলসন-এর ব্ল্যাক মাউন্টেন কলেজে কবি চিত্রকর নৃত্যশিল্পী সকলে মিলে যে অদ্ভুত অভিকরণের কথা বলেছিলাম— তাই যেন উত্তর-আধুনিকের উচ্চারণ— 'দ্যাখো আমরা শিল্প বলতে কী বুঝি!'

আবার একটি শিল্পের মধ্যেও উপন্যাস-কবিতা-নাটক গোছের সংরূপ বা genre-এর খোপ খোপ ভাগ উত্তর-আধুনিকরা ভেঙে দিতে চান। এ-কাজ তাঁরা শুরু করেননি, কিন্তু তাঁরা শেষ করতে ইচ্ছুক। জেমসন্ (পূর্বোল্লেখ, ৩৭৩) চমৎকারভাবে এই genre-hopping -কে দর্শকদের টিভি-র এক চ্যানেল থেকে অন্য চ্যানেল-এ পর পর লাফিয়ে যাওয়ার সঙ্গে তুলনা করেছেন। তাঁর কথায়— "Thus the movement from one generic classification to another is radically discontinuous like switching channels on a cable television set; and indeed it seems appropriate to characterize the strings of items and the compartments of genres of their typologization as so many "chanels" into which the new reality is organized." এর অনেক আগেই জেমসন উত্তর আধুনিক পৃথিবীতে "the language of forms or genres"-এর সন্ধান বৃথা হবে বলে রায় দিয়েছেন (p. 67)।

সুতরাং শিল্প সৃষ্টি ও শিল্পতত্ত্বের ক্ষেত্রে উত্তর-আধুনিকতা বেশ জোর গলায় এই দাবি হাজির করেছে— উচ্চ কোটির নন্দনতত্ত্বের মহিমা ভেঙে উচ্চ শিল্প ও জনপ্রিয় শিল্পের তফাত স্বীকার করা যাবে না, শিল্পে, বিশেষত চিত্রশিল্পে শিল্পীর নাম ও স্বাক্ষরের জুলুম, অন্যদিকে তারই জোরে ধনীর সেই চিত্রে একচ্ছত্র মালিকানা স্বীকার করা যাবে না। এ ছাড়া, শিল্পে শিল্পে তাত্ত্বিক পাঁচিল ভাঙতে হবে এবং একই শিল্পে, যথা সাহিত্যে সংরূপ বা genre -এর কক্ষভাগ চলবে না।

সাহিত্যে, বিশেষত কথাসাহিত্যে, অ্যাখ্যানকলা বা narration-এর ভঙ্গি যে এই পর্বে একেবারেই অন্যরকম তাও বলে রাখা দরকার। চিত্রকলা তো আধুনিক পর্বে এসেই বিমূর্ততার আশ্রয় নিয়ে গল্প বলা ছেড়ে দিয়েছে; তা হয়েছে আত্মনির্দেশক বা self-referential। অর্থাৎ সে বলছে, খানিকটা কথাহীন, উচ্চাঙ্গ সংগীতের মতো করেই— 'শুধু আমাকেই দ্যাখো, আমার বাইরে আর কিছু নেই'। উত্তর-আধুনিকতা এটাকেই শিল্পের একমাত্র কাজ বলে মনে করে, এই আত্মনির্দেশনাকে। গল্পে-উপন্যাসে গল্প বলার একটা দায় আধুনিক পৃথিবী মুদ্রণযুগে এসে তুলে নিয়েছিল। তারও আগে ছিল মৌখিক গল্প, কাব্যের সম্ভার। কিন্তু উত্তর-আধুনিকেরা গল্প বলাতে আখ্যান-বর্ণনার প্রাচীন ঢং সম্পূর্ণ বর্জন করেছে, ফলে সময় অনুসারে ঘটনাক্রম, বাস্তবতা বা বিশ্বাস্যতার মাত্রা রক্ষা, যুক্তি ও ঔচিত্যের লক্ষণ বজায় রাখা— কিছুই আর স্বীকার করতে রাজি নয়। কাপ্‌লান-এর সম্পাদিত সংকলনে ফ্রেড ফাইল (Pfeil, 1988) দুটি উপন্যাসের আলোচনা করেছেন, যে দুটি তাঁর কাছে উত্তর আধুনিকতার সার্থক প্রতিনিধি বলে মনে হয়েছে। টমাস ডিশ (Disch) -এর *The Businessman: A Tale of Terror,* আর ডেনিস জনসন-এর *Fiskadoro*। প্রথম বইটিতে স্ত্রীকে স্বামী খুন করে পালাচ্ছে, কবর থেকে উঠে স্ত্রীর ভূত স্বামীকে ধরতে ছুটছে— এইরকম বহুজটিল এক অ্যাখ্যান, কার্যকারণহীন কিন্তু মজাদার এক পরম্পরা তৈরি করছে। এবং তার বিচিত্র, যার একটু নমুনা বঙ্গানুবাদে দেখা যেতেই পারে—

> আপনার বউকে খুন করা খুব কঠিন কাজ এমন মনে নাও হতে পারে, আর বব গ্ল্যাভিয়ারের ক্ষেত্রে এটা জলের মতো সোজা হয়ে দাঁড়াল, কর্মসূচি : দুজনে মিলে লাস ভেগাসে উড়ে যাও। কেডি লাক্ মোটর লজে ঢোকো, বউয়ের গলা টিপে শেষ করো। তারপর মিনেসোটার প্লেন ধরো আর সেখানে উঁচু তলার এগজিকিউটিভ হয়ে জীবন আবার শুরু করো। পরে যা দাঁড়াল তা অবশ্য এত সহজ নয়।

সমালোচকদের মতে টেলিভিশন-এ ফিল্‌ম-এ ভূত প্রেত দৈত্যি দানোর বীভৎস ও কিম্ভূত রসের অ্যাখ্যানগুলি মূলত উত্তর-আধুনিক পর্বেরই প্রার্থনার ফল। এরমধ্যে একটা লঘু ক্রীড়া চাপল্যের ব্যাপার আছে। রলাঁ বার্তে (Barthes) যাকে বলেন 'jouissance'। এই লঘু চাপল্য উত্তর-আধুনিকতার নিজস্ব মেজাজ। উত্তর-আধুনিকতায় যৌনতা নিয়েই এই 'jouissance' লক্ষ করি আমরা। কিছুই সম্ভ্রমযোগ্য নয়, কিছুই গ্রাম্ভারি বা ধানদুব্বো হাতে নিয়ে দেখাশোনার মতো নয় আর। হয়তো 'apocalyps' বা শেষ ধ্বংসের আগেকার এটাই একটা লক্ষণ।

স্থাপত্যের ব্যাপারে আবার একটা বিচিত্র ব্যাপার ঘটে। এই বিষয়টার উপর স্থপতি ও স্থাপত্য-সমালোচক চার্লস জেংক্‌স সবচেয়ে বেশি করে বলেছেন। উত্তর-আধুনিক স্থাপত্যে প্রচুর জায়গা নিয়ে অদ্ভুত ও বিচিত্রদর্শন গঠন ও নির্মাণে কোনো বাধা নেই। শিল্পকে তারা সস্তা করে নকল করে বা কপি করে সাধারণ মানুষের মধ্যে বিলিয়ে দিতে পক্ষপাতী, কিন্তু স্থাপত্যে তারা বাহুল্যপ্রেমী ও অপচয়ী বলে মনে হয়। জেমসন তাঁর বইয়ে সান্টা মনিকা-র ফ্রাংক গেরি হাউস-এর (পৃ. ১০ আর ১১-র মধ্যবর্তী সপ্তম ছবি, এবং ১১০-১১২ পৃষ্ঠায় তার অন্যান্য দিক ও নকশা দিয়েছেন। ১১৪ পৃষ্ঠাতে রান্নাঘরের ছাদের ছবিও) কথা বলেন, বলেন লস এঞ্জেলস-এর 'বোনাভেঞ্চার' হোটেলের বিশাল বাড়িটির কথা। আম্মান-এর রাজপ্রাসাদের কথাও আসে। নিউ ইয়র্ক-এর এটিটি বিল্ডিং, আটলান্টা জর্জিয়ার পিচট্রি সেন্টার ইত্যাদি অনেক বাড়ির কথা আসে। লাস ভেগাস-এর নানা রকমের সাইকাডেলিক আলোকসজ্জিত কিম্ভূত দর্শন বাড়িগুলির কথাও আসে, যেগুলিতে পাশ্চাত্যের সঙ্গে আরবের শৈলীও মিশে যায়, চলে

আসে মধ্য ইউরোপ-এর দুর্গ-স্থাপত্য। (মাইক ডেভিস, পূর্বোক্ত পৃ. ৮৬) লস এঞ্জেলেস-এর নাগরিক প্রতিবেশে বোনাভেঞ্চার হোটেলের আরোপকে 'savagery' বলে বর্ণনা করেছেন। শুধু 'savagery' নয়, তাতে স্পর্ধা, বেপরোয়াভাব, ছেলেখেলা, দেখনদারি বা আদেখলেপনা— সবই আছে। আছে kitsch বা প্যারোডির প্রবণতা। পাওলো পোরটোগেসি বলে আর-এক স্থাপত্যবিশারদ এই কারণে এ-স্থাপত্যকে "paradoxical and ambiguous but vital" বলে বর্ণনা করেছেন (Portoghesi, 1983: 10-11) । যাইহোক, তৃতীয় বিশ্বে বসে আমরা এর বিপুল খরচের কথা কেবল কল্পনাই করতে পারি।

৬.৭ বৃহদাখ্যানের বিচূর্ণন :

দার্শনিক লিয়োতার (Lyotard, 1984)-এর যে অংশটি সাইডম্যান (Seidman 1994) ছেপেছেন তার প্রথম বাক্যই হল 'I define postmodern as an incredulity toward metanarratives' (p. 27)। মেটান্যারেটিভ বা বৃহদাখ্যান কী? বৃহদাখ্যান হল সেই সব আদর্শ বা ইডিয়োলজি যা বিশ্বের বহু মানুষকে কোনো একটা বড়ো বিশ্বাসে বাঁধে, কোনো সামূহিক লক্ষ্য নির্দেশ করে এবং সেই লক্ষ্যে এগোনোর জন্য কর্তব্য-অকর্তব্য নির্দেশ করে, উজ্জীবিত করে। ধর্ম একটি বৃহদাখ্যান, ফ্যাসিবাদ মার্কসবাদ (সমাজতন্ত্রবাদ, সাম্যবাদ)— সবই এক-একটি বৃহদাখ্যান। কোনোটি মানুষের মুক্তির জন্য, কোনোটি মানুষের বশ্যতা আদায়ের জন্য। এক বৃহদাখ্যান হল বিজ্ঞান। আবার দর্শনগুলিও এক ধরনের বৃহদাখ্যান।

উত্তর-আধুনিক দর্শনের তত্ত্বের অংশ এত সংগঠিত ও সুবিন্যস্ত হয়নি। তার প্রয়োগকলা বা praxis-অংশও এই সুবিস্তারিত চরিত্র লাভ করেনি। যাই হোক, মার্কসবাদের এবং অন্যান্য বৃহদাখ্যানের প্রতিপক্ষ অবস্থানে দাঁড়িয়ে লিয়োতার সব কিছুর চূর্ণন লক্ষ করেন এবং বলেন, 'Consensus has become an outmoded and suspect value' (p. 37) । এ-বিষয়ে মতানৈক্যপন্থী হাবেরমাস-এর সঙ্গে তাঁর মতানৈক্য নেই।

বৃহদাখ্যান ভেঙে ছোটো ছোটো আখ্যান বা খণ্ডাখ্যান (Petit recit) তৈরি হচ্ছে। এই ভাঙার ঘটনার যতটা সত্য না হোক, পাশে বা আড়ালে পড়ে থাকা প্রান্তিক জীবন উঠে আসছে সামনে। মেয়েদের কথা, আদিবাসী-উপজাতিদের কথা, সমকামী বা নপুংসকদের কথা— এরকমই আরও অনেক অন্তেবাসী জীবন ও তাদের বঞ্চনা মধ্যবিত্ত পৃথিবীর চোখ ও চেতনাতে এসে ধাক্কা দিচ্ছে। মুদ্রণ ও বৈদ্যুতিন মাধ্যমের যে বিস্ফোরণ ঘটেছে তাতে এমন হওয়া অস্বাভাবিক ছিল না। ইউরোকেন্দ্রিক বা পাশ্চাত্যকেন্দ্রিক পৃথিবীর দেওয়ালে ফাটল দেখা দিয়েছে, বিদেশি অভিবাসীদের মতো তার মধ্যে আড়ালে থাকা অস্তিত্বগুলিও এসে ভিড় করছে। উত্তর-আধুনিকের এইটি এক ইতিবাচক দিক। কিন্তু বৃহদাখ্যান সব ভেঙেচুরে শেষ হয়ে গেছে, তাদের আর কোনো ভবিষ্যৎ নেই— একথাও এখনই বুক ফুলিয়ে বলা যাচ্ছে না। টেরি ইগ্‌লটন একটু মজা করেই লিখেছেন, (Eagleton, 1986: 144) .....the obituary notices are greatly exaggerated'।

অবশ্যই পোস্টমডার্নিজম-এর ব্যাখ্যানে আরও অনেক কথা আসে। কিন্তু আপাতত এইটুকু পেশ করা গেল। এই তত্ত্ব যে সম্বন্ধে লিন্ডা হাচন (Hutcheon, 1988: 23) খুব জোর দিয়ে বলেন, "Postmodernism is a fundamentally contradictory enterprise : its art form (and its theory) at once use and abuse, install and then destabilize convention in parodic ways, self-consciously pointing both their own inherent

paradoxes and provisionality and, of course, to their critical or ironic re-reading of the art of the past." কিন্তু এই সচেতনভাবে স্ববিরোধী এবং আত্মগণ্ডগোলে উল্লসিত তত্ত্ব দক্ষিণ এশিয়া বা তৃতীয় বিশ্বের সাধারণ মানুষের জন্য কোনো বড়ো আশ্বাস বহন করে আনে না। জেমসন যেভাবে তাদের সদ্যতন শিল্পব্যবস্থার সঙ্গে যুক্ত করেছেন— সে শিল্পব্যবস্থা তৃতীয় বিশ্বে কী ভূমিকা নিচ্ছে সে-বিষয়ে তারা অবহিত কিনা জানি না। এখনও যে পৃথিবীতে কোটি কোটি মানুষ আধপেটা খেয়ে থাকে, যুদ্ধে, দুর্ভিক্ষে ও মহামারীতে পালে পালে মরে, অশিক্ষা ও কুসংস্কারে ডুবে থাকে (বিশ্বকাপের ভারচুয়ল রিয়্যালিটি সত্ত্বেও) সেই রিয়্যালিটিকে অস্বীকার করতে চায় যে-মতবাদ তা সাহিত্যতত্ত্ব, শিল্পতত্ত্ব, নীতিতত্ত্ব— যে রূপ ধরেই আসুক না কেন, তার সম্পর্কে আমাদের একটা অবস্থান নিতেই হবে। খ্রিস্টোফার নরিস অবশ্য জানিয়েছেন যে, (দ্র. Norris, 1993) লিয়োতার শ্রেণির দার্শনিকেরা আউস্‌ভিট্‌স-এ সহস্র ইহুদি-নিধনকেও 'textuality'— বা 'ভাষাপাঠ' হিসেবে দেখেন; ফলে তার সত্যতা সম্বন্ধেও তাঁরা প্রশ্ন তোলেন। কারণ ভাষা বাস্তবের নিখুঁত প্রতিলিপি, একথা তাঁরা মানতে রাজি নন। এই চূড়ান্ত সংশয়বাদীদের কাছে (নরিস-এর মতে 'নামবাদী' বা nominalist অবস্থান) যুদ্ধ, অনাহার, মহামারী কতটা সত্য বলে গণ্য হবে কে জানে? উত্তর-আধুনিকতাকে অবশ্যই বুঝতে চাইব না এমন নয়, কিন্তু আধুনিক পাশ্চাত্যে তৈরি তত্ত্ব মানেই চূড়ান্ত ও চরম, আমাদের তাতে মুগ্ধ হয়ে আত্মসমর্পণ করতে হবে, এই প্রয়াসের মধ্যে একটা লজ্জাকর হীনম্মন্যতা আছে বলে অন্তত এই লেখকের ধারণা।

টীকা :

১. এই লেখক দেশি-বিদেশি কোনো উত্তর-আধুনিকতার নাগরিক বা সদস্য নয়, এ ধরনের কোনো আন্দোলনে সে অংশ নেয়নি। ফলে তার উত্তর-আধুনিকতা সম্বন্ধে জ্ঞান কেবল পুথিগত, যদিও উত্তর-আধুনিক স্থাপত্য, চিত্রকলা, রচনা ইত্যাদির নমুনা অল্পস্বল্প সে দেখেছে। এ সম্বন্ধে পড়াশোনা করতে গিয়ে প্রাথমিক, অগ্রসর সব ধরনের বইই (হাতের কাছে যা সে পেয়েছে) সে পড়েছে। তা থেকে যতটুকু বুঝেছে তারই সাক্ষ্য এই নিবন্ধ। এ-বিষয়ে যাঁরা প্রাজ্ঞতর তাঁরা এতে ত্রুটি বা অসম্পূর্ণতা পেতেও পারেন, সে জন্য ক্ষমা চেয়ে রাখছি। এসব ত্রুটি বা অসম্পূর্ণতার কথা তাঁরা যদি এ-লেখককে জানান, সে প্রভূত কৃতজ্ঞ বোধ করবে।

২. সমীরের এ-ধরনের রচনার শেষ উদাহরণ বিনয় মজুমদারের কবিতার আলোচনা, *কবিতীর্থ* -৩৬, পৃ. ৫৫-৭৮।

৩. সাদা অ্যাংলো-স্যাক্সন ক্যাথলিক বা প্রেসবিটারিয়ান বা মেথডিস্টদের আচরণবিধি কী অর্থে প্রোটেস্টান্টদের চেয়ে ভালো, তা অবশ্য আমরা জানি না।

৪. ইন্দ্রনাথ চৌধুরীর অনুরূপ একটি বাংলা লেখা দিল্লির 'দিগঙ্গন' পত্রিকায় ছাপা হয়েছিল। সম্প্রতি 'দিগঙ্গন'-এর রজতজয়ন্তী সংকলনে (২০০৬) পুনর্মুদ্রিত হয়েছে।

৫. Cultural dominant-এর ধারণাটিকে নিয়ে প্রশ্ন তুলেছেন মাইক ডেভিস (Mike Davis, 1988: 80-1) তাঁর 'Urban renaissance and the spirit of Postmodernism' প্রবন্ধে (দ্র. *Ann Kaplan*, 1988) বলেছেন, অন্তত মার্কিন স্থাপত্যের প্রবণতা দেখে এ-ধারণাটিকে খুব সংগত বলে মনে হয় না। তাঁর মতে, এটি reductionism বা সরলীকরণের উদাহরণ। এখানে সে তর্কে যাবার সাধ্য বা সাধ আমাদের নেই।

৬. আমাদের এটাও খেয়াল রাখা দরকার যে, তথ্য প্রযুক্তি ও শিল্পায়নের এই ব্যাপক ও ঘনিষ্ঠ ব্যবহার মূলত পাশ্চাত্যের সমাজকে যেভাবে আচ্ছন্ন করেছে এবং তাদের চৈতন্যে প্রভাব ফেলেছে সেটা পৃথিবীর সব দেশের সব সমাজের সম্বন্ধে এখনও সত্য নয়। আবার এই প্রাচ্যে

জাপান-এ যতটা সত্য, সেখানে চিনে-ভারতে বা বাংলাদেশে সবক্ষেত্রে ততটা সত্য নয়। আমাদের এসব অঞ্চলকে Late Capitalism এখনই গ্রাস করেছে এমন কথা বলা যাবে না। প্রাচ্যে অনেক জায়গায় অনাধুনিক উৎপাদন-ব্যবস্থা ও উৎপাদন সম্পর্ক এখনও টিকে আছে, উত্তর-আধুনিকতার ধাক্কা বাঁচিয়ে।

৭. মার্কিউস-এর *One-Dimensional Man,* (1964)-এর নামপত্রে তিনি 'Advanced Capitalism' কথাটা ব্যবহার করেছেন। আমার মনে হয় 'Post Industrial Society' বা 'Late Capitalism' প্রয়োগ দুটির চেয়ে সেটি সার্থকতর নাম।

৮. অবশ্যই এই ঐতিহ্যের সবটাই rational বা প্রখরভাবে যুক্তিভিত্তিক ছিল তা বলা যাবে না। গ্রিকদের দিয়োসুনস্ বন্দনা ও উৎসবে নানা ধরনের উন্মত্ততায়, ইহুদি মারণ উচাটন বশীকরণ ডাইনিতন্ত্রের খবরও আমরা রাখি। (দ্র. Dodd, 1966) এখানে জেমসন-এর 'Cultural dominant'-এর তত্ত্ব ধরেই হয়তো আমাদের বলতে হবে এক ধরনের যুক্তি ও বিশ্বাসের ভারসাম্য এ পরম্পরার প্রধান লক্ষণ।

৯. দ্র. Oloson, Charles, 1967

১০. এটা সকলেই জানেন যে, প্রথাগত সমস্ত শিল্পকেই স্থানকেন্দ্রিক (spatial) এবং কালকেন্দ্রিক (temporal) এই দু-ভাগে ভাগ করা যায়। চিত্রকলা স্থাপত্য-ভাস্কর্য মূলত space বা স্থানের শিল্প। আর ভাষা ও ধ্বনিনির্মিত সমস্ত শিল্প-সাহিত্য (তার মধ্যে নাটক, চলচ্চিত্র আসতেই পারে) ও সংগীত মূলত কালবদ্ধ শিল্প। ভেন্‌চুরি-র আলোচনায় স্থান প্রাধান্য পেয়েছে।

১১. পশ্চিমিরা এমন কথা বলেন, কিন্তু এই ধরনের আলাভোলা সরলীকরণের কোনো মানে হয়? একজন একটা কথা বলল আর তার থেকেই ইতিহাসের গতি বদলে গেল— একথা কদাচিৎ খাটে। নিট্‌শে কথাটা বলতে বাধ্য হয়েছিলেন তার কারণ তখন ইউরোপের ইতিহাস ঈশ্বরকে অগ্রাহ্য করার দিকে এগোচ্ছিল।

১২. পরে আমরা দেখব যে দার্শনিক লিয়োতার এই ব্যাপক তত্ত্ব ও দর্শনগুলিকে, ব্যাপকতর মানবজীবনকে একটি সার্বিক বিশ্বাস ও সংকল্পের আওতায় এনে তাদের জীবন ও দৃষ্টিভঙ্গিকে প্রভাবিত পরিবর্তিত করার সূত্রগুলিকে 'metanarratives' বা 'grand-narratives' বলেছেন। এই বৃহদাখ্যানকে বাতিল করে বহু ক্ষুদ্র আখ্যানের প্রতিষ্ঠাই লিয়োতার-এর মতে উত্তর-আধুনিকতার একটা লক্ষণ।

১৩. দ্র. রিড-এর *Phases of English Poetry* (উল্লেখ অসম্পূর্ণ)

১৪. ফলত ওয়েলেকদের প্রস্তাবের তাত্ত্বিক গভীরতা অনেক বেশি এবং তাকে পুনরাবৃত্তির ধারণা থেকে সহজেই বিচ্ছিন্ন করা যায়। ওয়েলেক-দের ধারণার পিছনে সম্ভবত কাজ করছে রুশ আঙ্গিকবাদীদের (automatization) ও প্রমুখন (aktualisace বা foregrounding)-এর সূত্র, যার উল্লেখ তাঁরা নিজেরাও করেছেন। এর মানে হল, ইতিহাসের একটা পর্যায়ে সাহিত্যের আদর্শগুলি যান্ত্রিক প্রথানুসরণে পর্যবসিত হয়, তাতে আর কোনো নবত্ব বা উজ্জ্বলতা অবশিষ্ট থাকে না। তখন নতুন স্রষ্টা সেসব আদল ভেঙে আবার নতুন রূপ ও ভঙ্গি এনে সাহিত্যকে পাঠকের প্রবল মনোযোগের কেন্দ্রে নিয়ে আসেন।

১৫. অবশ্যই বাহুল্য ও অবান্তর অলংকরণে স্থাপত্যে যে বিপুল অর্থব্যয় হয় তা একমাত্র ধনী দেশের নিরঙ্কুশ অপচয়ের সংস্কৃতিতেই সম্ভব। তৃতীয় বিশ্ব হয়তো সাহিত্য রচনায় পোস্টমডার্ন লম্ফঝম্প করতে পারে— পোস্টমডার্নিজম-এর নানা লক্ষণ ধার করে নিজেদের রচনায় ঢুকিয়ে; এমনকি হয়তো চিত্রকলা বা ভাস্কর্য বা সংগীতে বা মিশ্র-মাধ্যমে কিছু পরীক্ষা-নিরীক্ষা করতে পারেন— ভিডিয়ো-শিল্পও তার অনায়ত্ত হবে না। কিন্তু উত্তর-আধুনিকতা যে তৃতীয়

বিশ্বের নিজস্ব ফসল নয় তার প্রমাণ এই যে, উত্তর-আধুনিক স্থাপত্যের ব্যাপক গ্রহণের কথা এ-বিশ্বের ভাবার ক্ষমতাই নেই। সরকারি বা বহুজাতিকের টাকায় এখনও 'আধুনিক' স্থাপত্যেরই বাড়বাড়ন্ত।

১৬. বোদ্‌রিয়ার এটা ভাবেননি, কিন্তু টিভি সংবাদের বানানো চরিত্র আমাদের অভিজ্ঞতা থেকেও খানিকটা বেরিয়ে আসে। স্কুলের পুরস্কার বিতরণ হয়ে গেল, তার অনুরোধে আবার ভি. আই. পি-কে সেই পুরস্কার বিতরণের 'অভিনয়' করতে হল। জানি না, বোদ্‌রিয়ার একেই 'hyper-reality' বলবেন কি না।

সূত্র নির্দেশ :

চক্রবর্তী, উৎপল (সম্পা), ২০০৬, 'কবিতীর্থ'-৬৬ জ্যৈষ্ঠ ১৪১৩ ব.

রায়চৌধুরী, সমীর, ২০০৬, 'খাসমাতা রাধা আর গোপগোপিনীর সহনাচের কোরিওগ্রাফি', দ্র. চক্রবর্তী, উৎপল, (সম্পা), জ্যৈষ্ঠ ১৪১৩ ব. পৃ. ৫৫-৭৮

সরকার, পবিত্র, ১৯৯০, 'নাট্য সংলাপের বিবর্তন ও অ্যাবসার্ড নাট্য-সংলাপ', দ্র. সরকার, ১৯৯০, পৃ. ৩৫১-৭২—, ১৯৯০ *নাট্যমঞ্চ, নাট্যরূপ* দ্বিতীয় সং, কলকাতা প্রমা প্রকাশনী।

Ann Kaplan, E (Ed), 1988, *Postmodernism and its Discontents,* London & New York, Verso.

Appignanesi, Rechard & Chris Garret, 1995 *Postmodernism for Beginners,* Thumpington, Cambridge, Icon Books.

Bartens, Haits, 1995, *The Idea of Postmodernism,* London & New York, Routledge.

Baudrillard, Jean, 1983, *Simulations,* New York, Semicontext......1988 *Selected Writings*, Cambridge, Polity Press.

Baurdicu, Pierre, 1979, *Distinction : A Social Critique of the Judgement of Taste.* (English Translation, 1984), London & New York Routledge & Kegan Paul.

Benjamin, Walter, 1978, *Reflections,* New York, Harcourt Brace Jovanovich.

Cuncliffe, Marcus, (ed.), 1975 *American Literature since* 1900, London Sphere books.

Davis, Mike, 1988, 'Urban Renaissance and the spirit of Postmodernism', in *Ann Kaplan* (ed.), 1988 pp. 79-87.

Derrida Jaques, 1976, of *Grammatology,* Baltimore. Md. John Hopkins University Press.

Dodds. A. 1966, *The Greeks and the Irrational,* Berkley and Los Angeles, University of California Press.

Eagleton, Terry, 1986, *Against the Grain,* London, Verso.

Fiedler, Leslie 1965, 'The new mutants', *Partisan Review,* 32: 505-25

......1975. 'Cross the border-close that gap : *Postmodernism' in Cuneliff.* 1975, pp. 244-66.

Harvey, David, 1989, *The Condition of Postmodernity : an Enquiry into*

the Origins of Cultural Change, Oxford & Cambridge, Ma Blackwell.

Homer, Sean, 1998 *Fredric Jameson,* Cambridge, Polity Press.

Hutcheon, Linda : 1988, *A Poetics of Postmodernism*, New York & London, Routledge.

Jameson, Fredric, 1991, *Postmodernism or the Cultural Logic of Late Capitalism,* London & New York, Verso.

Kahler, Eric 1968, *The Disintegration of Form in the Arts,* New York, Braziller.

Kuhn, T. 1963, *The Structure of Scienific Revolution,* Chicago, University of Chicago Press.

Lucy, Niall (ed.), 2000, *Postmodern Litarary Theory,* Oxford & Merlin (Mass) Blackwell.

Lyotard, Jean-Francios, 1994, *The Postmodern condition' in Seidman* (ed.). 1994. pp.27-34.

Mercuse. Herbert, 1964, *One-Dimensional Man,* London & New York, Routledge.

Murdoch, Irish, 1963, *Sartre,* Oxford, Oxford University Press,

Norris, Christopher, 1985, *The Contest of Faculties,* London & New York, Methuen.

....1993 *The Truth about Postmodernism,* Oxford, UK + Cambridge, U.S.A., Blackwell.

Olson, Charles, 1967, *Human Universe and Other Essays,* Ed. Donald Allen. New York, Grove Press.

Pfeil Fred. 1988 Potholders and Subcisions : On The Businessman Fiscadoro and Postmodern Paradise' in *Ann Kaplan*, 1988. pp. 59-78.

Portoghesi, Paolo, 1983 *Postmodernism : The Architecture of Postindustrial Society,* New York, Rizzoli.

Read, Herbert, 1963, *To Hell with Culture,* New York Schocken Books.

Seidman Steven (ed.). *The Postmodern Turn,* Cambridge, Cambridge University Prees.

Ward Glenu, 2003 *Postmodernism,* Teach Yourself Series

Wellek, Rene & Austin Warren, 1949 *Theory of Literature,* Middlesex, Penguin Books.

Wilds Alan. 1981. Horizons of Ascent : *Postmodrnism and the Ironic Imagination,* Baltimore, ed. John Hopkins University Press.

প্রথাগত ইতিহাসের প্রতিস্পর্ধী নিম্নবর্গীয় চেতনার বয়ান তারাশঙ্করের 'অরণ্যবহ্নি'

প্রসূন ঘোষ

ইতালির মার্কসবাদী দার্শনিক আন্তোনিও গ্রামশি মুসোলিনির কারাগারে অবরুদ্ধ থাকাকালীন যে *Prisons Note Book* নামক গ্রন্থটি লেখেন সেখানে 'সাবল্টার্ন' শব্দটি প্রথাগত অর্থের বাইরে কিছুটা রূপান্তরিত তথা প্রসারিত অর্থে প্রয়োগ করেন। এর আগে এই শব্দটি ইংরেজি ভাষায় ব্যবহৃত হত সেনাবাহিনীতে, ক্যাপ্টেনের অধস্তন অফিসারদের বোঝাতে। গ্রিক দার্শনিক অ্যারিস্টটলও কোনো প্রতিজ্ঞার অন্তর্গত নির্দিষ্ট প্রতিজ্ঞার ক্ষেত্রে এই পরিভাষাটি প্রয়োগ করেন। কিন্তু গ্রামসি দেখালেন যে, পুঁজিবাদী সমাজ ব্যবস্থায় শ্রমিক শ্রেণি বুর্জোয়া শ্রেণির অধীন এবং শ্রমিক শ্রেণির ওপর বুর্জোয়া শ্রেণি নানাভাবে কর্তৃত্ব তথা প্রভুত্ব করে অর্থাৎ শ্রমিকশ্রেণিরা নানাভাবে শাসিত হয়। এই প্রবল আধিপত্য বা 'হেজিমনি' কেবলমাত্র রাষ্ট্রীয় শক্তিকে অবলম্বন করেই তৈরি হয় না, বরং শ্রমিক শ্রেণির সম্মতিক্রমেই সাংস্কৃতিক পরিমণ্ডলকে কেন্দ্র করে এক ধরনের নৈতিক ভিত্তি রচনার দ্বারাও তা সৃষ্ট হয়। উপরন্তু, গ্রামশি নিম্নবর্গের ধারণাটি যেমন কেবলমাত্র শ্রমিক শ্রেণির মধ্যে সীমাবদ্ধ রাখেননি, তেমনি আবার আধিপত্যের সময়সীমাকেও শুধুমাত্র পুঁজিবাদী সমাজব্যবস্থার মধ্যেই নির্দিষ্ট করলেন না। বরং গ্রামসি বললেন যে, রাষ্ট্রনিয়ন্ত্রিত ইতিহাসের নানা পর্বে যে-কোনো শ্রেণিবিভক্ত সমাজব্যবস্থায় ক্ষমতাবিন্যাসের ক্ষেত্রে আধিপত্য সৃষ্টিকারী শক্তির বিপরীতে অবস্থান করে সাবল্টার্ন শ্রেণি।[১]

উত্তর-ঔপনিবেশিক কালের পাঠক সাবল্টার্ন সম্পর্কিত চর্চা আটের দশকে শুরু করেন। এ সম্পর্কিত সম্মেলন প্রথম অনুষ্ঠিত হয় ১৯৮৩ খ্রিস্টাব্দে, তারও এক বছর আগে অর্থাৎ ১৯৮২ খ্রিস্টাব্দে এ সম্পর্কিত গ্রন্থ রচিত হয় এবং এর অনেকগুলি সংকলনও প্রকাশিত হয়। রণজিৎ গুহ, শাহিদ আমিন, ডেভিড আর্নল্ড, পার্থ চট্টোপাধ্যায়, ডেভিড হার্ডিম্যান, জ্ঞানেন্দ্র পাণ্ডে প্রমুখ ইতিহাসবিদরা প্রচলিত ইতিহাস রচনার ক্ষেত্রে সাবল্টার্ন সম্পর্কিত আলোচনার মাধ্যমে ঐতিহাসিকের বীক্ষাগত পরিবর্তনের কথা বলে যে অভিঘাত সৃষ্টি করেন, কালক্রমে তা ভারতবর্ষ ছাড়িয়ে যায় এবং দক্ষিণ-এশিয়া এমনকি লাতিন আমেরিকা-আফ্রিকার মতো দেশগুলিতেও সে আলোড়ন

বিস্তৃত হয়। এই ইতিহাসবিদরা এই মত প্রকাশ করেন যে, প্রথাগত ইতিহাসে কখনোই নিম্নবর্গের প্রেক্ষিত তথা বীক্ষা ঠাঁই পায় না। তাঁদের মতে ভারতবর্ষের জাতীয়তাবাদী আন্দোলনের ইতিহাস রচনার ক্ষেত্রে উপনিবেশবাদী এলিট ও জাতীয়তাবাদী বুর্জোয়া তথা উচ্চবর্গদের আধিপত্য পরিলক্ষিত। একদিকে কিছু উপনিবেশশক্তির ঐতিহাসিকদের তথা ইংল্যান্ড-আমেরিকার মতো আধিপত্যবাদী দেশের ইতিহাসবিদদের দৃষ্টিভঙ্গিতে ভারতীয় জাতীয়তাবাদ কিছু এলিট ভারতীয়দের ক্ষমতায় বসার উপায়মাত্র। তাঁদের মতে এই জাতীয়তাবাদী এলিট ভারতীয়রা ভারতীয় জনতাকে ক্রমাগত কাজে লাগিয়ে গেছে জাতীয়তাবাদকে মূলধন করে। অন্যদিকে জাতীয়তাবাদী বুর্জোয়া ঐতিহাসিকগণ স্বাজাত্যপ্রেমিক নেতাদের দেশসেবার কথা, ব্যক্তিজীবনের স্বার্থত্যাগের কথা এবং বৃহত্তর জনতার শরিক হওয়ার প্রসঙ্গটিও বলেন। কিন্তু সাবল্টার্ন সম্পর্কিত চর্চা শুরু করেন যে সমস্ত ঐতিহাসিকগণ, তাঁরা বলেন যে, এই বিপরীতধর্মী ঐতিহাসিক বীক্ষায় নিম্নবর্গের অবদানের কথাকে উপেক্ষা করা হয়েছে। সাবল্টার্ন-সম্পর্কিত পাঠে ঐতিহাসিকরা বলতে চান যে ভারতবর্ষের কৃষক আন্দোলনে অংশগ্রহণকারী কৃষকদের তথা নিজ দেশের আন্দোলনে অংশগ্রহণকারী নিম্নবর্গীয় বৃহত্তর জনতার নিজস্ব চরিত্র আছে। তাঁরা কেবলমাত্র উচ্চবর্গীয় নেতাদের নির্দেশমতো তাঁদের ক্ষমতা দখলের মেসিনারির পার্টস হিসাবে কাজ করেননি। অর্থাৎ আধিপত্যবাদী দেশের বা উপনিবেশ শক্তির দেশের ঐতিহাসিকদের ধারণাটি ভ্রান্তিপূর্ণ। আবার জাতীয়তাবাদী নেতাদের দেশপ্রেমের আদর্শে ও প্রেরণায় নিম্নবর্গীয় বৃহত্তর জনতা ভেসে যায়নি। এদিক দিয়ে জাতীয়তাবাদী ঐতিহাসিকদের সিদ্ধান্তও একপেশে এবং যথেষ্ট আধিপত্যময়। বরং, নিম্নবর্গীয়দের নিজস্ব শাসকবিরোধী জেহাদ, বিদ্রোহ তথা আন্দোলনের প্রকৃতি ও চরিত্র, তাৎপর্য ও প্রস্তাবনা, ধরন ও পরিকল্পনা কিছুতেই এলিট উচ্চবর্গীয় নেতাদের জাতীয়তাবাদের বা সুপরিকল্পিত আন্দোলনের মতো নয়, বরং সমান্তরাল। সুতরাং ঔপনিবেশিক ঐতিহাসিকদের আধিপত্যমূলক ইতিহাস অনুযায়ী ভারতীয় জাতীয়তাবাদ যথাক্রমে ইউরোপীয় শিক্ষার ফল কিংবা জাতীয়তাবাদী নেতাদের ক্ষমতা লাভের কৌশলমাত্র নয়, তেমনি তা উচ্চবর্গীয় এলিটদের অবদানমাত্রও নয়। অর্থাৎ সাবল্টার্ন পাঠে প্রচলিত পাঠের বীক্ষাগত বদল লক্ষিত হয় এবং নিম্নবর্গের অবদানের কথা মনে রেখে সেই প্রেক্ষিত থেকে দেখলে সম্পূর্ণ ভিন্নমাত্রা লক্ষিত হয়। আসলে যুগে যুগে ডমিনান্ট বা হেজিমনিক বা আধিপত্যকামী শক্তির মতাদর্শের তলায় চাপা পড়ে যায় সাবল্টার্নের চেতনা আর এই কারণে কৃষকচেতনা যেমন প্রাণহীন ও পরাধীন তেমনি বিচ্ছিন্ন ও খণ্ডিতও বটে— "Gramsci claimed that the history of the subaltern classes was just as complex as the history of the later is usually that which is accepted as 'official' history. For him, the history of subaltern social groups is necessarily fragmented and episodic since they are always subject to the actively ruling groups, even when they rebel clearly they have less access to the means by which they may control their representation and less access to cultural and social institutions."[২]

এখন প্রশ্ন, সাবল্টার্ন সম্পর্কিত চর্চার পরেই কী এই বিশেষ বীক্ষায় বা এই বিষয়টিকে উপজীব্য করে বাংলা উপন্যাস লেখার সূত্রপাত হয়? কিংবা এর আগে কী এই বিষয়টি বা এই বীক্ষাগত দিকটি বাংলা উপন্যাসে ধরা পড়েনি? এর উত্তরে বলা যায়, অবশ্যই নিম্নবর্গ-

সম্পর্কিত চর্চার পর থেকেই উপন্যাসে এই বিষয়টিকে অবলম্বন করার একটি প্রবণতা দেখা যায়। আবার একথাও বলতে হয় যে, নিউটন মাধ্যাকর্ষণ সূত্র আবিষ্কার করার পূর্ব থেকেই আপেল নিম্নদিকে তথা পৃথিবীর দিকেই পড়ত, কিন্তু মাধ্যাকর্ষণের মতো সর্বজনীন সূত্র আবিষ্কৃত হওয়ার পর এ সম্পর্কে সকলের দৃষ্টি সজাগ হয়, আলাপ-আলোচনাও বাড়ে। প্রকৃতপক্ষে, সাহিত্য রচনার পরই সেই সাহিত্য অনুসরণে ব্যাকরণ বা অলংকারশাস্ত্র রচিত হয়, বিধি ও রীতি গড়ে ওঠে ; আবার তার পরেও সাহিত্যিক অলংকারশাস্ত্র সম্পর্কে অবহিত হয়ে সাহিত্য সৃষ্টি করেন। ঠিক তেমনি চিরকালের সমাজেই উচ্চমঞ্চে সমাসীন ব্যক্তি, শ্রেণি বা গোষ্ঠীর কাছে অপেক্ষাকৃত নিম্নে থাকা ব্যক্তি, শ্রেণি বা গোষ্ঠী অত্যাচারিত, শোষিত, লাঞ্ছিত ও উপেক্ষিত হয়েছে আর যুগে যুগে সমাজসচেতক সাহিত্যিক তা নিয়ে সাহিত্যও গড়ে তুলেছেন।

সাবল্টার্ন চর্চার অন্যতম চিন্তক রণজিৎ গুহ তাঁর একটি তাৎপর্যপূর্ণ প্রবন্ধে বলেছেন : "উচ্চবর্গ বলতে আমি বোঝাতে চাই তাদেরই, ইংরেজশাসিত ভারতবর্ষে যারা প্রভুশক্তির অধিকারী ছিল।"[৩] কিন্তু সাবল্টার্ন চর্চার বা পাঠের ক্ষেত্রটি যেমন কেবলমাত্র ভারতবর্ষে নয়, পৃথিবীর নানাদেশে প্রসারিত, তেমনি উচ্চবর্গ এবং নিম্নবর্গ সম্পর্কিত ধারণাটি প্রতিপন্ন করার ক্ষেত্রে সময়সীমাটি আমাদের দেশের ইংরেজ শাসনকালের সময়সীমার মধ্যে আবদ্ধ করে রাখা যায় না। বিশেষত উত্তর-উপনিবেশকালেও যেহেতু আধিপত্য সমমাত্রায় কিংবা অধিক সুপরিকল্পিতভাবে ও তীব্রমাত্রায় বহমান, সুতরাং একথা বলা যায় যে তার মাত্রাগত বদল ঘটেছে মাত্র। কেননা, উপনিবেশবাদে ক্ষমতা প্রতিষ্ঠার বেলায় বলপ্রয়োগ করা হত আর উত্তর-উপনিবেশকালে আধিপত্য প্রতিষ্ঠার সময় অত্যন্ত সুপরিকল্পিতভাবে নানা কৌশল প্রয়োগ করা হয়। লেনিনের প্রবাদপ্রতিম সেই উক্তি ধনতন্ত্রের শেষ স্তর সাম্রাজ্যবাদ-কে মনে রেখে ঘানার প্রাক্তন রাষ্ট্রপতি কোয়ামি নক্রুমা ১৯৬৫ খ্রিস্টাব্দে লেখেন *নিও কলোনিয়ালিজম : দ্য লাস্ট স্টেজ অফ ইম্পিরিয়ালিজম* গ্রন্থটি। কোয়ামি নক্রুমার বক্তব্য ঘানার ক্ষেত্রে বিশ্বের উপনিবেশ-উত্তর সব দেশগুলির ক্ষেত্রেই কমবেশি প্রযোজ্য। অর্থাৎ এই দেশগুলির স্বাধীনতা নামে মাত্র, প্রকৃতপক্ষে তারা উপনিবেশ শক্তি কিংবা বৃহত্তর ক্ষমতাধর দেশগুলির আধিপত্যের অধীন। ব্যবসায়ী সংগঠন, বহুজাতিক সংস্থা, বিশ্বব্যাঙ্ক প্রভৃতি নানা কিছুর মধ্য দিয়ে উপনিবেশ-উত্তর নামে স্বাধীন দেশগুলির বাজার নিয়ন্ত্রিত হয়, তারা অর্থনৈতিক স্বয়ম্ভরতা তথা স্বাধীনতা কখনোই অর্জন করতে পারে না। বস্তুত উপনিবেশের শাসনমুক্ত হওয়ার পরেও উপনিবেশ-উত্তর বর্তমানের আপাতমুক্ত মানুষজন উপনিবেশ শক্তির বহুমাত্রিক প্রভাবকে এড়িয়ে যেতে পারে না। কেননা, ঔপনিবেশিককালে উপনিবেশশক্তি উপনিবেশের মানুষগুলিকে তাদের দেশজ ধারা যা ইতোপূর্বে প্রবাহিত ছিল, তাকে ঘৃণা করতে শিখিয়েছিল, বর্জন করতে শিখিয়েছিল এবং এই শেখানোর মধ্যে প্রকৃতপক্ষে সেই দেশের মনন-চৈতন্য তথা ভাবজগৎকে ধ্বংস করেছিল। সুতরাং উত্তর-উপনিবেশকালে আধিপত্যকামী শক্তির কিংবা উপনিবেশ শক্তির প্রভাব কেবলমাত্র আর্থনীতিক নয়, তা সামাজিক ও সাংস্কৃতিকও বটে। ঔপনিবেশিক শক্তির শাসনকালে, তাদের অধীন দেশের মানুষদের নতুনভাবে গড়ে তোলা হয়েছিল, তাদের রুচি-মনন-চৈতন্য-মূল্যবোধকে ধ্বংস ক'রে শাসক শ্রেণির রুচি-মনন-চৈতন্য-মূল্যবোধকে বলপ্রয়োগে ও কৌশলে তাদের মধ্যে অনুপ্রবিষ্ট করে দেওয়া হয়েছিল। সুতরাং, ঔপনিবেশিক শক্তির চলে যাওয়ার সঙ্গে সঙ্গে উত্তর-উপনিবেশকালের মানুষজনের পক্ষে পূর্ব-শাসকের সংস্কৃতি বিসর্জন দেওয়া সম্ভব হয় না, আবার শ্রদ্ধাভরে তা মেনে নিতেও পারে না, কিংবা জটিল বাস্তবের

প্রেক্ষাপটে তা রক্ষা করাও যায় না। সুতরাং, এক অষ্টাবক্র অবস্থার সৃষ্টি হয়, অভিনব প্রতিক্রিয়ার জন্ম হয়।

উত্তর-উপনিবেশকালে আধিপত্য সৃষ্টি করার ক্ষেত্রে বহুমাত্রিক কৌশল অবলম্বন করা হয় এবং সেক্ষেত্রে কন্‌টেক্সট অনুযায়ী উচ্চবর্গের প্রভুত্বকামী দিকটির নানা বদলও পরিলক্ষিত হয়। উপরন্তু, উত্তর-ঔপনিবেশিক চেতনায় প্রভুত্ব-আধিপত্য-দাপট প্রভৃতি ক্ষমতার নানামাত্রিক দিকগুলি বিশ্লেষণের ক্ষেত্রে প্রান্তিকতা বা মারজিনালিটি শব্দটি প্রযুক্ত হয়, যার উৎপত্তি ঘটেছে প্রান্তিক বা মারজিনাল (Marginal) শব্দ থেকে। আপাতভাবে প্রান্তিক শব্দটির অর্থ যা প্রান্তে অবস্থান করে, কিন্তু প্রকৃতপক্ষে এই সহজ-সরল সংজ্ঞায় তাকে ব্যাখ্যা করা যায় না। আধিপত্য তথা প্রভুত্বকামী শক্তি দাপটকে ক্রিয়াশীল করতে নানা কৌশলকে অবলম্বন করে, তাই এই শক্তি সর্বদা বৈপরীত্যমূলক অথবা বাইনারি (Binary) ভাবনা তৈরি করে এবং কেন্দ্র ও পরিধির মধ্যে বৈষম্য গড়ে তোলে। সাম্রাজ্যবাদ, পিতৃতন্ত্র প্রভৃতি বৈপরীত্যমূলক ভাবনা জনমনে তারা প্রোথিতও করে দেয় এবং দেখা যায় আধিপত্যকামী শক্তির বিপরীতে অবস্থানকারীর মনের মধ্যেও এই ধারণাগুলি প্রগাঢ় শিকড় গেড়ে বসে থাকে। দাপটের অধীনস্থ মনের মধ্যে গেঁথে দেওয়া হয় যে কেন্দ্রের প্রভুত্ব অত্যন্ত স্বাভাবিক এবং তা মেনে না-চলাটা স্বাভাবিকতার হানি ঘটায়। উত্তর-উপনিবেশকালে কিংবা উত্তর-আধুনিককালে আধিপত্য শক্তি ও আধিপত্যাধীন শক্তির বিভাজন তথা কেন্দ্র ও পরিধির বৈষম্য পাটিগণিতের সরল সমীকরণ কিংবা জ্যামিতির সহজাতবোধ অনুযায়ী ঘটে না। কেননা আধিপত্যকামী শক্তির মনে সর্বদা এই ধারণা ক্রিয়াশীল যে ইতিহাসে পরিধিতে অবস্থানকারী আধিপত্যাধীন মানুষগুলি বারে বারে ক্ষমতাকেন্দ্রের বিরোধিতা করেছে এবং আধিপত্যকে খর্ব করতে চেয়েছে, সুতরাং এই শক্তি জ্যামিতির প্রথা-নির্দিষ্ট সরলতাকে ত্যাগ করে। জ্যামিতিতে একটি কেন্দ্রের নির্দিষ্ট দূরত্বে অবস্থিত একটি পরিধি থাকে কিন্তু উত্তর-উপনিবেশ পর্বে কেন্দ্রশক্তি রহস্যময় জটিল 'রাইজোমেটিক' পদ্ধতিতে পরিধিকে অধীন করে রাখে। এই বহুমাত্রিক পদ্ধতিতে কেবলমাত্র একটি ক্ষমতাকেন্দ্র থাকে না, বহু ক্ষমতাকেন্দ্র নির্মিত হয়। উদ্ভিদবিদ্যায় 'রাইজোম'-জাতীয় উদ্ভিদের কথা বলা হয়, যে উদ্ভিদগুলির কেবল একটি মূল থাকে না, অসংখ্য শিকড় থাকে এবং সেই বহু শিকড় থেকে রস শোষিত হয়। অন্যদিকে, আধিপত্যকামী শক্তির বহু ক্ষমতাকেন্দ্র থাকায় মূল ক্ষমতাকেন্দ্রটিকে আড়ালে রাখা সম্ভব হয়। শুধু তাই নয়, মূল ক্ষমতাকেন্দ্রের নিজস্ব প্রকৃতি তথা চরিত্রটিকে অস্পষ্ট ও গোপন রাখাও সম্ভব হয়। আবার বহু শক্তিকেন্দ্র থেকে দাপটকে ক্রিয়াশীল করার উপায়টিও প্রথাগত পদ্ধতির বলপ্রয়োগ বা শাসন-অত্যাচারের ধারাবাহিক উপায় নয়। শিক্ষা-সংস্কৃতি প্রভৃতি উপরিসৌধের মধ্য দিয়ে আধিপত্যাধীন মানুষের ভাবজগৎকে দখল করে, মানসিক জগতের রন্ধ্র-প্রতিরন্ধ্রের মধ্যে আধিপত্য শক্তির প্রতি এক অনুকূল মনোভাব জাগিয়ে তোলা হয়। অর্থাৎ, কেন্দ্র চতুর উপায়ে, অভিনব কৌশলে পরিধিকে ক্ষমতাকেন্দ্রের মধ্যে রেখে দিতে প্রয়াসী হয়। এই ক্ষমতাকেন্দ্রের বাইরে অবস্থানকারীরা অর্থাৎ পরিধিতে অবস্থানকারীরাই হল প্রান্তিক।

সুতরাং, যেহেতু উত্তর-ঔপনিবেশিক পর্বেও আধিপত্য শক্তির ক্রিয়া সমানভাবে অব্যাহত ছিল, তাই উচ্চবর্গের সংজ্ঞা নিরূপণের ক্ষেত্রে সময়সীমাকে কেবলমাত্র ইংরেজ শাসনকালের মধ্যে সীমাবদ্ধ রাখা যায় না। উপনিবেশ ও উত্তর-উপনিবেশ পর্বের সময়সীমার নিরিখে উচ্চবর্গের সীমাটিকে নির্দিষ্ট করা যেতে পারে। ছকের আকারে বিষয়টি ব্যাখ্যা করা যেতে পারে।

উচ্চবর্গ	নিম্নবর্গ
(১) ইংরেজ ইংরেজ শাসক ইংরেজ বেনিয়া বা ব্যবসায়ী	(১) আধিপত্যাধীন ভারতীয় জনগণ।
(২) বর্ণহিন্দু [সাধাণত উচ্চবর্ণের ব্রাহ্মণ-কায়স্থরা, পরবর্তী-কালে বৈশ্য-শূদ্ররাও]	(২) আধিপত্যাধীন নিম্নবর্ণের মানুষ (অন্ত্যজ/আদিবাসী)
(৩) সুদখোর-মহাজন-জমিদার-অর্থবান [অধিকাংশ ক্ষেত্রে ব্রাহ্মণ-কায়স্থরা]	(৩) অর্থ ঋণ নিতে বাধ্য হওয়া নিরীহ জনসাধারণ।
(৪) শহরের মানুষ [অধিকাংশ ক্ষেত্রে ঔপনিবেশিক শিক্ষায় শিক্ষিত মানুষ। অনেকক্ষেত্রে গ্রাম থেকে প্রজা শোষণের অর্থে শহরকে পুষ্ট করা হত]	(৪) গ্রামের মানুষ [কলকাতা ব্যতিরেকে বৃহত্তর গ্রামের মানুষ, এরা ঔপনিবেশিক শিক্ষার স্পর্শহীন মানুষ]
(৫) পুরুষ [পিতৃতান্ত্রিক ভাবনা জাগিয়ে তোলে এরা]	(৫) নারী [পিতৃতান্ত্রিক ভাবনা এই নারীদের অহরহ নিপীড়িত করে]
(৬) সংখ্যাগুরু [সার্কভুক্ত দেশগুলিতে ধর্ম আধিপত্যের গুরুত্বপূর্ণ হাতিয়ার]	(৬) সংখ্যালঘু
(৭) রাজনৈতিক নেতা/পাড়ার দাদা/ মস্তান /পুরাতন বাসিন্দা/তোলাবাজ	(৭) প্রান্তিক জনগণ [উত্তর-উপনিবেশ কালে গণতান্ত্রিক পদ্ধতিতে নির্বাচিত শাসকদের বহু শাসনকেন্দ্র থাকে। আধিপত্য করা হয় রাইজোমেটিক পদ্ধতিতে]
(৮) রাষ্ট্রশক্তির প্রতিনিধি—আমলা কিংবা উচ্চমন্যতাবোধের অধিকারী মানুষ ইংরেজ শাসকের অধীন অধস্তন ভারতীয় কর্মচারী ইংরেজি জানা শিক্ষিত ভদ্রলোক [উচ্চবর্গের এরাই উপনিবেশের কালে নিজের সংস্কৃতিকে বর্বর অভিধায় ভূষিত করেছিল। উত্তর-উপনিবেশ কালের চেতনায় নিজেদের সংস্কৃতিকে উদ্ধারের প্রচেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছেন ভারতবর্ষ ছাড়াও লাতিন আমেরিকা, আফ্রিকার শিল্পী-লেখকেরা]	(৮) ঔপনিবেশিক শিক্ষার আলোক-বহির্ভূত মানুষ।

উচ্চবর্গ	নিম্নবর্গ
(৯) পুরোহিত/যাজক/মিশনারি/মৌলবি/ইমাম [ধর্মের নানা প্রথা তথা রিচুয়ালকে অবলম্বন করে ধর্মভীরু মানুষকে বিভ্রান্ত করা হয় এবং এই কৌশলের দ্বারা তাদের অধীনে রাখা হয়।	(৯) ধর্মভীরু মানুষ [নানা সময়ে ধর্মান্তরিতকরণের মধ্য দিয়ে বৈপরীত্যমূলক ভাবনা জাগিয়ে তোলা হয়। ইতিহাসে বিভিন্ন ক্ষেত্রে এর বিরোধিতা করা হয়েছে। একালে গণতান্ত্রিক নির্বাচন পদ্ধতিতেও এই আধিপত্যকামীশক্তির কৌশলে অনেকাংশে পরিধিতে অবস্থানকারী নিম্নবর্গ নিয়ন্ত্রিত হয়। এই আধিপত্যাধীন নিম্নবর্গ হল প্রান্তিক জনগণ অর্থাৎ ধর্মভীরু মানুষ, বিশেষত নারী]

সাবল্টার্ন সম্পর্কিত আলোচনার পরিপ্রেক্ষিতে বলা যায় যে, পোস্টমডার্ন পিরিয়ডে কোনো একটি একক গ্র্যান্ড ন্যারেটিভকে স্বীকার হয় না, তার অন্তরালে অবস্থিত অসংখ্য মাইক্রোন্যারেটিভের কথাও বলা হয়। আধুনিককালে যুক্তি-মানবিকতা-ইহমুখিতা নির্ভর যে মেটা-ন্যারেটিভ রচিত হচ্ছিল দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ সমকালে ন্যাৎসি বাহিনীর আক্রমণ কিংবা হিরোসিমা-নাগাসাকিতে বোমা বিস্ফোরণ সেই মেটা-ন্যারেটিভকে তীব্রভাবে চ্যালেঞ্জ জানায়। উপনিবেশ-উত্তর তৃতীয় বিশ্বের জনগণ এক দ্বিমাত্রিক সংকটের সম্মুখীন। একদিকে উপনিবেশের শাসকের গড়ে তোলা ভাবজগৎ তার অন্তরভূমিতে রাজত্ব করছে, অন্যদিকে সেই ভাবজগৎ অনুযায়ী লহমা যাপন করা বাস্তবে তার পক্ষে সম্ভব হচ্ছে না। তীব্র প্রতিক্রিয়ার সম্মুখীন জনগণের এই দিকটির প্রতি লক্ষ রেখেই তাত্ত্বিকেরা গুরুত্ব দিয়েছেন অসংখ্য মাইক্রোন্যারেটিভকেও। এই মাইক্রোন্যারেটিভগুলি উপনিবেশ-পর্বে ঘৃণিত-বর্বর অভিধায় ভূষিত হয়েছিল। উপন্যাসের প্রকরণ নির্মাণের ক্ষেত্রেও উত্তর-উপনিবেশ পর্বের তৃতীয় বিশ্বের দেশগুলিতে তাই নানা জিজ্ঞাসা উদ্ভূত হয়েছে। লাতিন আমেরিকা-আফ্রিকার মতো দেশগুলির ঔপন্যাসিকগণ প্রাক-উপনিবেশ পর্বের ভাবজগৎকে উপন্যাসের আধারে নিয়ে আসতে চাইছেন। বাংলা উপন্যাসের আলোচনায় এ প্রশ্ন দেখা দিয়েছে যে বাংলা উপন্যাসের আঙ্গিক কী নিজস্ব? না কী পাশ্চাত্য রীতি থেকে ধার করা মাত্র? শুধু তাই নয় পাশ্চাত্য রীতি অনুসরণ করে রচিত হওয়ার ফলে আমাদের নিজস্ব কথা-নির্মাণের যে পরম্পরা প্রাক-উপনিবেশ পর্বে ছিল তা কী আমরা হারিয়ে ফেলেছি? উনিশ শতকের বাংলাদেশে ঔপনিবেশিক শাসক ইংরেজরা বল ও কৌশল প্রয়োগের দ্বারা জনগণের একটি অংশকে পৃথকভাবে গড়ে তোলার উপযোগী ইন্ধন জুগিয়েছিল, ইংল্যান্ডের সংস্কৃতির অনুকরণে এদেশের সংস্কৃতিকে গড়ে তুলতে চেয়েছিল সেই পরোজীবী ও পরাশ্রয়ী শ্রেণি। সেই ঔপনিবেশিক শিক্ষায় শিক্ষিত মধ্যবিত্ত শ্রেণিই পরবর্তীকালে উপন্যাসের মতো ন্যারেটিভ নির্মাণ করেছেন। কিন্তু এই ন্যারেটিভই কেবলমাত্র পরমুখী ও পরাশ্রয়ী হয়ে ওঠেনি—বিগত প্রায় সার্ধশত বৎসর যাবৎ এই সৃজিত শিল্পকর্মটির উত্তরোত্তর সৃজ্যমান দিকটি এবং তা নিয়ে নানামাত্রিক আলাপ-আলোচনার দিকটি এই সত্যটিকেই বারংবার প্রমাণ করে। তারাশঙ্করের মতো ঔপন্যাসিক যদিও উনিশ শতকের আধুনিকতার ভাবচৈতন্য সম্পর্কে সর্বৈব অবহিত, তবুও একথা অস্বীকার করা যায় না যে উপন্যাসের প্রথাগত আঙ্গিকের বাইরে এক অন্য আঙ্গিক নির্মাণ করতে সক্ষম হয়েছিলেন তিনি। তারাশঙ্কর তাঁর নিজের উপন্যাসেও তাই আধুনিকতার প্রাগুক্ত ন্যারেটিভকে বারংবার চ্যালেঞ্জ জানিয়েছেন অসংখ্য মাইক্রোন্যারেটিভ

নির্মাণের দ্বারা। এই মাইক্রোন্যারেটিভ নির্মাণ করেন তিনি *হাঁসুলীবাঁকের উপকথা* উপন্যাসে লোককথা-আশ্রয়ী সুচাঁদের মিথ-নির্ভর জগত অঙ্কনের দ্বারা। *নাগিনী কন্যার কাহিনি* উপন্যাসে বিষবেদেদের সম্পর্কে কল্পকথা সৃজনের দ্বারা বিচিত্র সংস্কৃতি সম্পর্কে অবহিত ঔপন্যাসিক ঐ মাইক্রোন্যারেটিভ নির্মাণ করেন। *আরোগ্যনিকেতন* উপন্যাসে এ দেশের নিজস্ব চিকিৎসাপদ্ধতি ও হারিয়ে যাওয়া ভেষজ চিকিৎসাপদ্ধতির স্বরূপ অঙ্কনেও তৈরি হয় এই মাইক্রোন্যারেটিভ। আবার *মঞ্জুরী অপেরা* উপন্যাসে দেশজ যাত্রা পদ্ধতি কিংবা *কীর্তিহাটের কড়চা* উপন্যাসে পাঁচালী-কড়চার আদল সামনে রেখে এই ন্যারেটিভ নির্মাণের দ্বারা গ্র্যাণ্ড ন্যারেটিভকে চ্যালেঞ্জ জানাতে সক্ষম হন ঔপন্যাসিক।

সাবল্টার্ন সম্পর্কিত চর্চায় বিশেষজ্ঞরা পাশ্চাত্য ঐতিহাসিক ও জাতীয়তাবাদী ঐতিহাসিকদের গড়ে তোলা গ্রাণ্ড ন্যারেটিভকে চ্যালেঞ্জ জানান। তারাশঙ্কর তাঁর *অরণ্য বহ্নি* উপন্যাসে এদেশের সাঁওতালদের গড়ে তোলা জেহাদকে অঙ্কন করেন তাঁর নিজস্ব দৃষ্টিতে। কিন্তু এ কেবল তাঁর নিজস্ব দৃষ্টির প্রতিফলনমাত্র নয়, পরবর্তীকালে পোস্টমডার্ন-পোস্টকলোনিয়াল সাবল্টার্ন সম্পর্কিত চর্চার ফলে একালের পাঠকের কাছে তার নানামাত্রা বারংবার আবিষ্কৃত হয়। আমাদের এ-বাংলার ক্ষেত্রে এ-উপন্যাসের তাৎপর্য বহুমাত্রিক হয়ে দাঁড়ায় সত্তরের দশকের নকশাল আন্দোলনকালীন প্রেক্ষাপটটি স্মরণে রাখলেও। ১৯৬৭ খ্রিস্টাব্দের মার্চ মাসে শিলিগুড়ি মহকুমার অন্তর্গত নকশালবাড়ি এলাকায় কৃষককে শোষণমুক্ত করার অভিপ্রায়ে এ আন্দোলনের সূত্রপাত, অচিরেই যা পরিবর্তিত হয় হিংসাত্মক আন্দোলনে। উচ্চবিত্ত কিংবা প্রতিক্রিয়াশীলদের ক্ষমতাকে চূর্ণ করতে চেয়েছিল এ-আন্দোলন। জোতদারদের আধিপত্য ধ্বংস ও কৃষকদের কর্তৃত্ব প্রতিষ্ঠার লক্ষে এ-আন্দোলন অগ্রসরও হয়েছিল। গ্রামাঞ্চলে কৃষকদের বিপ্লবকে গুরুত্ব দিয়ে দেশের 'অদ্ভুত অসুখ'-কে নিরাময় তথা জড় অবস্থাকে নির্মূল করাই ছিল আন্দোলনকারীদের সাধনা। একথা স্বীকার করতেই হয় যে, এই আন্দোলন জেহাদকারীদের নিজস্ব লক্ষ্য পূরণে সফল হয়নি। কিন্তু একথাও অস্বীকার করা যায় না যে, নকশাল আন্দোলন মধ্যবিত্ত শ্রেণিটির বিবরবিলাসী মনোভঙ্গিটিকে তীব্রভাবে হাতুড়ির আঘাত দিয়েছিল, বাঙালির সুপ্তাবস্থা মোচন করেছিল, তাকে করেছিল প্রবলভাবে সচেতন, যার প্রভাব পড়েছিল পরবর্তীকালের রাজনৈতিক-অর্থনৈতিক ও সামাজিক ক্ষেত্রেও। *অরণ্য বহ্নি* উপন্যাসে প্রকাশিত সাঁওতালদের ক্ষোভ আর নকশাল আন্দোলনকালে কৃষক-শ্রমিকদের ক্ষোভের কনটেক্সট যদিও এক নয়, কেননা উপনিবেশ পর্বে সাঁওতাল বিদ্রোহে সাঁওতালদের ক্ষোভ প্রকাশিত আর উত্তর-উপনিবেশ পর্বে স্বাধীন দেশে নকশাল আন্দোলনের মধ্য দিয়ে প্রকাশিত হয়েছিল কৃষকদের ক্ষোভ ; তবুও এই দুই বিপ্লবেই যে আধিপত্যের বিরুদ্ধাচারণ করা হয়েছিল এই সত্যকে ভুলে গেলে চলবে না। অবশ্য এই দুই আন্দোলনেই আন্দোলনকারীদের নিজস্ব লক্ষ্য পূরণ হয়নি, তবুও এই দুই আন্দোলনের নিজস্ব চরিত্রকে অস্বীকার করা যায় না। তাই আশির দশকে যখন সাবল্টার্ন চর্চার সূত্রপাত হয় তখন সে সম্পর্কিত মূল কথাগুলির অনুসরণে আমরা, পাঠকেরা অনুধাবন করতে পারি যে, এই ধরনের আন্দোলনের অর্থাৎ সাঁওতাল বিদ্রোহের যথার্থ স্বরূপটি যেমন শিক্ষিত মধ্যবিত্তের নেতৃত্বে গড়ে ওঠা আন্দোলনের সমগোত্রীয় নয়, তেমনি তাকে উপনিবেশ-পর্বের শাসক ঐতিহাসিকদের দৃষ্টিতেও দেখা যায় না। এই আন্দোলন যেমন স্বতঃস্ফূর্ত, তেমনি এর নিজস্ব বীক্ষাও আছে। সে বীক্ষাকে অধিগত করতে গেলে তাই পটকথার দ্বারস্থ হতে হয়, গ্রামীণ বাংলায় ছড়িয়ে থাকা মঙ্গলকাব্য-পাঁচালীকে হৃদয়ঙ্গম করতে হয়, লোককথাকে উপেক্ষা না ক'রে তাকে আত্মস্থ করতে হয়, নয়ন পালের যথার্থ মানসিকতা সম্পর্কে জ্ঞাত হতে হয়।

এই কারণেই *অরণ্য বহ্নি* উপন্যাসের নির্মাতা প্রথাগত সর্বজ্ঞ রীতিকে আশ্রয় করেননি। প্রথাগত ইতিহাসকারের মতো গতানুগতিক বীক্ষাকে আশ্রয় না ক'রে চৈতন্যের দ্বন্দ্বমথিত রূপকে আশ্রয় করতে গিয়ে লেখক আত্মকথন রীতির বীক্ষাকে বেছে নেন। আবার সেই রীতিটির প্রথাবদ্ধতাকেও দূর করেন মধ্যমপুরুষ কথন রীতির মতো পাঠককে সঙ্গী করার মধ্য দিয়ে। সংস্কৃতসাহিত্যে 'কথা' শব্দ গল্পের বিকল্প হিসাবেই প্রযুক্ত হত আর এই 'কথা' কিংবা 'কথম্' সমার্থক শব্দ হিসাবেই পরিগণিত হত, যার অর্থ ছিল কেন বা কেমন করে। অর্থাৎ লেখক গল্প বলে যাবেন আর পাঠক তাঁকে জিজ্ঞাসা করবেন এ কেন ঘটছে বা কেমন ক'রে ঘটছে আর এইভাবেই গল্প এগিয়ে যাবে, তার পূর্ণাবয়ব রূপটিও গড়ে উঠবে। আমাদের উনিশ শতকের আধুনিকতা উপনিবেশের কালেই গড়ে উঠেছে আর এই আধুনিকতার নির্মাণ সম্ভব হয়েছে পাশ্চাত্যের ইংরেজ তথা ইউরোপীয়দের প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষ প্রণোদনায়। তাদের শিক্ষা সংস্কৃতিকে চাপিয়ে দেওয়ার মাধ্যমে আমরা আলোকদশা প্রাপ্ত হয়েছি, এমন ধারণা আমাদের মনের মধ্যে বদ্ধমূলও হয়েছে। কিন্তু আজ একথা অস্বীকার করা যায় না যে, এই আধুনিকতা সমগ্র নয়, সম্পূর্ণ নয়, এ আধুনিকতা বৃহত্তর জনমনবিচ্ছিন্ন, আমাদের সুদূর-প্রোথিত প্রাচীন শিক্ষা-সংস্কৃতি এই আধুনিকতা থেকে বিচ্ছিন্ন। তারাশঙ্করের মতো লেখক, যিনি এই বৃহত্তর জনমনবিচ্ছিন্ন আধুনিকতার শরিক. আবার বৃহত্তর জনমন সম্পর্কেও অবহিত; সেই কারণেই ইতিহাসের প্রথাবদ্ধ ন্যারেটরমাত্র হতে পারেন না। উপন্যাসের প্রারম্ভে তাই তিনি প্রাচীন গল্প পরম্পরার কথন-রীতিটি আশ্রয় করেন, মঙ্গলকাব্য পাঁচালীর গল্প বলার রীতিটির পথেই হাঁটেন। এক বিশেষ স্থানকালে বদ্ধ লেখক তাঁর নিজের স্থান কালে বদ্ধ পাঠককে উপন্যাসের স্থানকালের অংশীদার করতে চান। উপন্যাস শুরু হয় তাই— "আমার সঙ্গে একশো বারো বছর পিছনে চলুন"— এই বাক্যের দ্বারা সেই বিশেষকাল সম্পর্কে পাঠককে প্রারম্ভেই অবহিত করেন লেখক। লেখকের সঙ্গী পাঠক পৌঁছে যায় সেই ক্ষেত্রভূমিটিতে, যে-ক্ষেত্রভূমিটি বীরভূম জেলার ময়ূরাক্ষীর উত্তর ও সমগ্র সাঁওতাল পরগণা ও দেওঘর নিয়ে গড়ে উঠেছে, অর্থাৎ যা ভাগলপুর থেকে রাজমহল পর্যন্ত বিস্তৃত। তারপর পাঠককে স্মরণ করিয়ে দেন ঔপনিবেশিক কালের কথা : "১৮৫৪ সন। আজ ১৯৬৬ সন— এখন থেকে একশো বারো বছর আগের কথা। তখন ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানির আমল।"[৪] কিংবা "ইংরেজের দেওয়ানীর পর পারমানেন্ট সেটেলমেন্টের সময় থেকে এসব অঞ্চলে বন কেটে চাষের ক্ষেত তৈরী হচ্ছে।" অথবা ওদিকে গঙ্গার স্রোতকে পূর্বদিকে রেখে তার সঙ্গে প্রায় সমান্তরাল রেখায় রেললাইন বরাবর কাজ চলছে পুরোদমে। মধ্যে মধ্যে নীলকুঠি বসিয়েছে সাহেবানেরা, তার সঙ্গে রেশমকুঠি। খ্রীস্টান মিশনারীরা পার্বত্য এলাকায় মিশন গেড়ে বসেছে।" অর্থাৎ যথার্থই এ দেশের মানুষের পরিচয় দিতে গিয়ে এবং ঔপনিবেশিক আধিপত্যের প্রতিস্পর্ধী নির্মাণ করতে গিয়ে ঔপনিবেশিক শাসক ও তাদের ক্রিয়াকলাপকে উপস্থাপিত করলেন লেখক।

পাশ্চাত্য নভেলাইজেশনের মধ্যমপুরুষ কথন রীতির বীক্ষাকে আশ্রয় করে এদেশীয় পাঠক-শ্রোতার নিজস্ব পরম্পরার বীক্ষায় পৌঁছোতে চান লেখক। তাই তিনি শ্রোতাকে উদ্দেশ্য ক'রে বলতে পারেন : "কিন্তু মুগ্ধ হয়ে স্থান কাল ভুলে যাবেন না।" শ্রোতার সঙ্গে ধারাবাহিক কথোপকথনের মধ্য দিয়ে সাঁওতাল পরগনার পার্বত্য অরণ্য অঞ্চলের হেঁড়োল, নেকড়ে, হায়েনা, চিতাবাঘ, গুলবাঘা, ঝিঙেকুলি চিতা, ভালুক, পাহাড়ে চিতা প্রভৃতি অরণ্য-প্রাণীদের অনায়াস গতিবিধির কথা বলেন। আবার ঔপনিবেশিক শিক্ষার অধিকারী শহুরে মানুষদের মনে আপাতভাবে ভীতির সঞ্চার ক'রে সেই অরণ্য প্রকৃতির সঙ্গে ওতপ্রোত সম্পৃক্ত মানুষগুলির

পরিচয় দিলেন। এ যাবৎকাল যাদের দূরে সরিয়ে রেখে দিয়েছিলেন উনিশ শতকীয় আধুনিকতার স্পর্শযুক্ত উচ্চবর্গের অহমিকাযুক্ত মানুষ, যারা এই সমস্ত অঞ্চলে সচরাচর আসেন অ্যাডভেঞ্চারের জন্য, সেই উচ্চবর্গের মানুষের অরণ্যপথে পড়া চরমতম বিপদ-সংকটে সহায়তা করে দূরে সরে থাকা অপাংক্তেয় আপাতবর্বর মানুষগুলিই। নিরীহ এই বর্ণনায় লেখক উনিশ শতকের আধুনিকতার অসম্পূর্ণতাকেই দেখান— "চিৎকার শুনে জন্তুজানোয়ারও ঘাবড়াবে এবং সঙ্গে সঙ্গেই সাড়া মিলবে, পাহাড়ের মাথায় সাঁওতালদের গ্রাম থেকে পাহাড়িয়া সাঁওতালদের এবং নীচে নতুন আবাদী 'ডামিন' বা 'জব্দি' এলাকার গ্রাম থেকে সাঁওতালদের সাড়া পাবেন। কিছুক্ষণের মধ্যেই তারা দল বেঁধে কাঁড় তীর আর তিন হাত লম্বা মোটা বাঁশের ধনুক এবং বল্লম হাতে ছুটে আসবে আপনাদের সাহায্যে। সঙ্গে করে আপনাদের পার করে এগিয়ে দেবে খানিকটা। আপনি খুশী হয়ে টাকাপয়সা দিলে তারা নেবে এবং খুশীও হবে, কিন্তু তার থেকেও তারা খুশী হবে আপনি যদি তাদের কিছু পুঁতির মালা দেন, রূপদস্তার গয়না দেন কিংবা রঙিন সুতোর 'চাবকি' দেন। সব থেকে খুশী হবে ওদের যদি দু-চার সের নুন দেন। নুনের ওদের বড়ো অভাব। নুন ছাড়া খাওয়ার জন্য ওদের কেনবার কিছু নেই। বিদায় নেবার সময় ওদের হাতে হাত মিলিয়ে কপালে ঠেকিয়ে বলবেন–– জোহর, জোহর মাঝি হেঙ্গ— অর্থাৎ নমস্কার, নমস্কার মাঝিমশায়। ওরা বিগলিত হয়ে যাবে।" অর্থাৎ *অরণ্য বহ্নি*-র ঔপন্যাসিক এবং উপন্যাসের কথক তথা ঔপনিবেশিক শিক্ষায় শিক্ষিত 'আমি' তার সমগোত্রীয় মানুষদের একজন হয়েই শিক্ষিত মানুষদের গড়ে তোলা ইতিহাসকে চ্যালেঞ্জ জানানোর মুখপত্রটি যেন এইভাবেই বয়ন করেন। অর্থাৎ, সাঁওতাল পরগণার অরণ্য অধিবাসীরা যে নিছক বর্বর নয়, তাদেরও যে নিজস্ব সংস্কৃতি আছে, যে সংস্কৃতি মধ্যবিত্ত ইংরেজি জানা ভদ্রলোকদের সংস্কৃতির মতো বিচ্ছিন্ন ও একক নয়, বরং সমান্তরাল ও প্রতিস্পর্ধী— সেই দিকটি তিনি চিহ্নিত করেন : "এরা বাঘ মারে, ভালুক মারে, কিন্তু এরা চোর নয়, লুঠেরা নয়; বাঘ ভালুক সাপ ছাড়া এ অঞ্চলের মানুষের কাছে কোন ভয় নেই।" কিংবা "রঙিন ফুলের সঙ্গে পুঁতির মালা আর একফালি আড়াই হাত লম্বা উজ্জ্বল রঙের কাপড় যদি দিতে পারেন তবে তো কথাই নেই। তবে ভাববেন না সে আপনার প্রেমে পড়বে ; সে শুধু ফিক্‌ফিক্ করে হাসবে এবং বলবে— দিকু তু বড় ভালএ!— তু বড় ভাল!" বিংশ শতাব্দীর দ্বিতীয়ার্ধে স্বাধীনতা পরবর্তীকালে তথা উত্তর-উপনিবেশকালে উপন্যাসের নির্মাণ করতে গিয়ে এবং প্রথাগত ইতিহাসকে চ্যালেঞ্জ জানাতে গিয়ে তারাশঙ্কর কেবল উপনিবেশকালের তথা অতীতের এনলাইটেনমেন্টের তলায় অন্ধকারের মানুষগুলির অবস্থান ভূমিটিকেই চিহ্নিত করেন না তাদের যথাযথ ইতিহাস নির্মাণ করতে গিয়ে তিনি পটকথা-লোককথা-মিথ-কথকতার দ্বারস্থ হন। তাই ঔপনিবেশিক শিক্ষায় শিক্ষিত কথক তাঁর বৈপরীত্যে অবস্থিত অপর এক কথক যিনি সেই মানুষগুলির যথার্থ পরিচয় উদ্‌ঘাটন করতে পারবেন তাঁরই শরণাপন্ন হন, কথক হিসাবে তাকেই চয়ন করেন। অর্থাৎ উপন্যাসে 'আমি'-র বদল ঘটে। এ 'আমি' নব্বই বছর বয়সের, বৃদ্ধ প্রতিমা কারিগর নয়ন পাল। শুধু তাই নয়, তাঁর পরিচয় দিতে গিয়ে ঔপন্যাসিক ইংরেজি জানা শিক্ষিত তথাকথিত সভ্য মানুষগুলির আপাত আবরণের অন্তরালে অবস্থিত উৎসভূমিটি চিহ্নিত করলেন, যে উৎসভূমি একান্তই দেশজ, যার শিকড় রয়েছে এদেশের অসংখ্য গ্রামগুলির মধ্যে। এই কারণেই তিনি পিসিমার প্রসঙ্গকে শ্রোতার দরবারে উপস্থাপিত করলেন। সেই পিসিমা, বেঁচে থাকলে যাঁর বয়স হত পঁচানব্বই বছর, অর্থাৎ তিনি নব্বই বছর বয়স্ক নয়ন পালের সমসাময়িক, তিনি সাঁওতাল হাঙ্গামার কুড়ি বছর পর জন্মগ্রহণ করেন, তিনি এই কাহিনি

শুনেছিলেন বাল্যকালে তাঁর দিদিমার কাছে। অর্থাৎ, এ কাহিনি শ্রুতি পরম্পরায় বাহিত, সুতরাং এ কাহিনি যথার্থ। বস্তুতপক্ষে, ঔপনিবেশিক শাসকবর্গের লেখা ইংরেজদের ইতিহাসের প্রতিস্পর্ধী ইতিহাসের বক্তা নয়ন পালের কথা যে মিথ্যা নয়, তা প্রতিষ্ঠিত করতে চান ইংরেজি শিক্ষিত মধ্যবিত্ত 'আমি'। তাই তিনি উল্লেখও করেন তাঁর যৌবনের প্রারম্ভে পড়া ছড়া ও পাঁচালির প্রসঙ্গ, যা তিনি পেয়েছিলেন বীরভূমের প্রত্ন নিদর্শনের সংগ্রাহক শিবরতন মিত্র মহাশয়ের সংগ্রহশালায়। এই ছড়া-পাঁচালী রচনা করেছিলেন কবি রাইকৃষ্ণ দাশ, যাঁর বিবরণ পিসিমার উচ্চারণেই প্রতিধ্বনিত হত। নিম্নবর্গের এই যথার্থ ইতিহাসকথা ধরা পড়ে না ঔপনিবেশিক শাসকদের রচিত ইতিহাসকথায়। উপন্যাসের 'আমি' তাই এদেশের মানুষদের অন্তরে প্রোথিত সেই প্রথাগত, দাপুটে ইতিহাসকথাকে সঙ্গে সঙ্গেই উপস্থাপিত করেন। তাই তিনি সংবাদ-প্রভাকরের ৫৩০০ সংখ্যার উল্লেখ করেন : "কিন্তু অসভ্যজাতিরা প্রজাপুঞ্জের প্রতি অতিশয় অত্যাচার করিতেছে। তাহারা যে গ্রাম দিয়া আসিতেছে সেই গ্রাম লুট ও অগ্নির দ্বারা দগ্ধ করিতেছে, শত শত মনুষ্যের প্রাণ নষ্ট করিতেছে।......... দুরাচারীরা স্ত্রীলোকদিগের আভরণ ও পরিধেয় বস্ত্র পর্যন্ত লইয়া গিয়াছে, জননীর ক্রোড় হইতে শিশুসন্তানকে গ্রহণ করিয়া তাহার সম্মুখেই বিনষ্ট করিয়াছে।........ বারকূপ গ্রামের সাঁওতালরা গর্ভিণী স্ত্রীলোকের উদর চিরিয়া তন্মধ্যস্থিত শিশু সন্তান বাহির করিয়া হত্যা করে।" উনিশ শতকের শিক্ষিত মধ্যবিত্ত শ্রেণির এ ইতিহাস যে যথার্থ স্থান থেকে দেখা ইতিহাস নয়, বরং তা উচ্চবর্গীয় আধিপত্যবোধপ্রসূত, অর্থাৎ উপর থেকে নীচের দিকে তাকিয়ে রচিত আর সেই কারণেই সে ইতিহাস অন্তঃসারশূন্য— তাই-ই লেখক বোঝাতে চান। উপন্যাসের 'আমি' এযাবৎকাল প্রথাগত ইতিহাসের পাঠক হিসাবে নিজেও ছিলেন এই একপেশে সিদ্ধান্তের শরিক : 'ইতিহাস পড়ে একটি আদিম উন্নত জাতির বর্বর অভ্যুত্থান ছাড়া আর কিছুই পাইনি।" কিন্তু এই ইতিহাসের বিপরীত অবস্থান-ভূমিটিকে লেখক চিহ্নিত করেন 'আমি'-র অভিজ্ঞতা অর্জনের মধ্য দিয়ে। 'আমি' দুমকা থেকে সাহেবগঞ্জ, সাহেবগঞ্জ থেকে ভাগলপুর এই রাস্তা মোটরে যেতে চান এবং যাওয়ার পথে তাঁর মোটর খারাপ হয়। ঔপন্যাসিক তাঁর বায়োগ্রাফিক্যাল সময়ে দাঁড়িয়ে লক্ষ করেন একদা সাঁওতাল বিদ্রোহে অংশগ্রহণ করা সেই তথাকথিত 'আদিম' জাতির প্রজন্মান্তরের কার্যকলাপকে। অসহায় 'আমি'কে তাঁরা অবলীলায় সাহায্য করে এবং তার বিনিময়ে শিক্ষিত মধ্যবিত্ত 'আমি' তাঁর নিজ বংশপরম্পরায় প্রবাহিত রেওয়াজ অনুসারে কৃপাপরবশ হয়ে এই দরিদ্র মানুষগুলিকে কিঞ্চিৎ অর্থ সাহায্য দিতে গেলে তারা তা গ্রহণ না করে অনায়াসে বলতে পারে : "বারণ করে গেইছে আমাদের শুভোবাবু। সিধু আর কানহু আমাদের শুভোবাবু ছিল। সাঁওতালরা যখন হুলু করলে, মানে হল হাঙ্গামা করলে, সাহেবদের সঙ্গে লড়াই করলে তখন তারা বলে গেইছে কি— দেখ্ মানুষের যখন বিপদ হবে তখন তাঁকে বাঁচাবি, রাখবি, নিজের জানটা দিবি, কিছু লিবি না তার কাছে; রাতে মানুষ ঠাঁই চাইলে তাকে ঘর ঠাঁই দিবি, নিজে বাহার শুবি। আমাদিগে টাকা লিতে নাই বাবু।" ঔপনিবেশিক শিক্ষায় শিক্ষিত 'আমি'-কে ডাকবাংলোয় থাকার ব্যবস্থা করে দেয়, তাকে একা থাকতে হবে একথা জানায়। কারণ তাদের জাতিগোষ্ঠী মাহাতো সম্প্রদায়ের মানুষটি তাদের নিজস্ব ইতিহাসকথা তথা লোককথার পরম্পরাগত বিশ্বাসের ভিত্তিটিকেই 'আমি'-কে দেখায়— "রাতে আমাদের উই পুজোর জাগায় কিসব হয়। ডর লাগে।" 'আমি'-কে তারা শোনায় লোককথা-নির্ভর তাদের নিজস্ব বিশ্বাসের সত্য কথাটি : তাদের শুভোবাবু সিধু-কানু আজও আসে, আজও তাদের জহর স্থান তথা দেবস্থানে ঘুরে বেড়ায়, কিন্তু তারা কখনো কারও ক্ষতি করে না।

ঔপনিবেশিক শিক্ষায় শিক্ষিত 'আমি' ঔপনিবেশিক শাসক রচিত, পাশ্চাত্য জাতি লিখিত ইংরেজি ইতিহাস কথার সঙ্গে একথার সামঞ্জস্যকে খুঁজতে চান : "Carried off Brahman priests to perform the great October festival (Durgapuja)"। এই ইতিহাসকথাকে এবং অসহায় অবস্থায় সাহায্যকারী সাঁওতালদের বিশ্বাসের কথাকে ভিত্তি করে এবং পিসিমার কাছে শোনা অতীতকথাকে নির্ভর করে আমি নিজেও পৌঁছে যাই স্মৃতিনির্ভর এক জগতে, যেন বা নির্মাণ করেন এ বাস্তবের সমান্তরাল অবচেতন জগৎ-আশ্রয়ী ও স্বপ্ন-আশ্রয়ী আর এক কুহকী বাস্তব। অতীতকালাশ্রয়ী সাঁওতাল বিদ্রোহের মাঝে দুর্গাপুজোর সমারোহের কল্পনা এবং 'আমি'-র নিজের দেখা বিজয়া দশমীর দিন একালের সাঁওতাল জাতির মহোৎসবের চিত্র, সাঁওতাল পরগনার বনভূমির আবহ তাঁকে লোককথা-আশ্রয়ী জগতে নিয়ে যায়, নিয়ে যায় প্রথাগত ইতিহাসের পরম্পরা-নির্ভর নির্দেশের বাইরে অন্য এক ইতিহাস-কথার জগতে। 'আমি' ধ্যানমগ্নের মতো দীর্ঘকাল এক কালো মানুষকে দেখেন, কল্পনার জগৎ আর হান্টারের ইতিহাসকথার জগৎকে মনে করে 'আমি' ঘুমিয়ে পড়েন, সেখানেও শোনেন প্রথাগত ইতিহাসের প্রতিস্পর্ধী কণ্ঠস্বর : 'barbaric chivalry'-র আভাসের অতিরিক্ত— "আর কিছু দেখলি না তু?" অবচেতন স্বপ্নের আর সজ্ঞান স্মৃতির, কল্পনার পটের আর বাস্তবের চিত্রের, প্রথাগত ইতিহাসকথার আর লোককথার, আপাত সভ্য ঔপনিবেশিক কৌশল রপ্ত ভদ্রলোকদের মননের আর আপাত অসভ্য বর্বর সাঁওতালদের কর্মের, রাত্রির অন্ধকার কালের আর দিবসের সূর্যালোকিত সময়ের— যুগপৎ প্রতিস্পর্ধী জগতের অংশীদার 'আমি' যুক্তি ও বুদ্ধি দিয়ে তার কল্পনাজাত ভ্রমটির উৎসভূমি নির্ণয় করেন ও লক্ষিত হন— "বুঝতে পেরেছিলাম ওই গাছের ছায়াকে ছায়ামূর্তি মনে করে, সাঁওতাল হাঙ্গামার কথা ভাবতে ভাবতে ঘুমিয়ে পড়েছিলাম। ফলে স্বপ্ন দেখেছি। স্বপ্নে সিধু এসে সামনে দাঁড়িয়েছিল।" এবং "যে মাঝারি একটি গাছের ছায়া বড়ো একটি শালগাছের গায়ে কালো মানুষের মতো নিত্য ছায়া ফেলে, সেটিকেও আবিষ্কার করেছিলাম।" দিনাবসানের পর রাত্রিতে সেই শালগাছ দেখে 'আমি'-র সিধু বলে আর ভ্রম হয়নি বটে কিন্তু তার মনে জেগেছিল, তাদের কথা, তাদের হাঙ্গামার-বিদ্রোহের প্রসঙ্গ : "এবং ছায়া জেনেও, স্বপ্ন জেনেও সেই কষ্টিপাথরে গড়া মূর্তি— সে সিধু হোক বা না হোক— তাকে ভুলতে পারিনি।" এই অনুষঙ্গে যুক্তিবাদী 'আমি' তাঁর নিজ শ্রেণির লেখকের লেখা ইতিহাস পাঠ করেন, 'সংবাদ প্রভাকর' পত্রিকার পাতা ওল্টান এবং ৫৩০০ সংখ্যায় লেখা সংবাদটি পড়েন : "জিলা ভাগলপুরের অন্তঃপাতি পর্বতসকলে সাঁওতাল নামে অগণ্য বন্য জাতি বাস করে। অতি অল্প দিবস হইল রাস্তাবন্দির সাহেবরা রাজমহলের নিকট ঐ বন্য জাতির তিনজন স্ত্রীলোককে বলপূর্বক অপহরণ করাতে তাহারা কতকগুলি লোক একত্র করিয়া উক্ত সাহেবদিগের প্রতি আক্রমণ করতঃ তিনজন সাহেবকে হত্যা করিয়া স্ত্রীগণকে উদ্ধার করে। অন্যান্য সাহেবরা ভয়ে পালায়।"

"এমত জনশ্রুতি যে ঐ সাঁওতালদিগের মধ্যে এক ব্যক্তি বুজরুক লইয়া (তিতুমীরের মতো) আপন শিষ্যদিগের প্রতি আদেশ করে যে আমার প্রতি প্রত্যাদেশ হইয়াছে যে আমাদিগের রাজ্য হইবেক। অতএব তোমরা সাহসপূর্বক অস্ত্রধারণ করিয়া ইংরেজদিগের সহিত যুদ্ধে প্রবৃত্ত হও।" সূর্য করোজ্জ্বল দিনের আলোয় উনিশ শতকের সংস্কারপন্থী যুক্তিবাদীদের উত্তরাধিকারী 'আমি' এই দুটি ঘটনার সত্যতাকে অস্বীকার করতে পারেন না, কারণ এ তাঁর শ্রেণি-উত্থিত ইতিহাসকথা। তাঁর যুক্তিবাদী মন এ ঘটনা থেকেই সাঁওতাল সিধু-কানুর অভ্যুত্থানের সূত্র অনুসন্ধান করতে চায়। তাঁর মনে হয় যে; যে ঔপনিবেশিক শাসকদের তখন সারা দেশের

লোক দেবতা বলে পূজা করত, তাঁদের বন্দুক-কামান দেখে কিংবা রেলপথ নির্মাণের কাজ দেখে এ দেশের লোক তখন আশ্চর্য হয়ে স্তবগান করত, সেই সময়ে তাদের বিরুদ্ধে কোন্ ক্রোধবহ্নির তাড়নায় এরা প্রতিবাদে অগ্রসর হল। এই অনুষঙ্গেই 'আমি'-র মনে পড়ে তাঁর পিসিমার কথা। এই পিসিমাই 'আমি'-কে বলতেন যে, মানুষের অন্তরে থাকে হীরের খনি, যম নিয়ে যায় সেই খনি আর তখন তার অন্তর হয়ে যায় 'খাণ্ডার' তথা শূন্য গহ্বর। পিসিমা নিজ জীবনেই সে অভিজ্ঞতা অর্জন করেছিলেন, কেননা চব্বিশ ঘণ্টার মধ্যেই মৃত্যু হয়েছিল তাঁর স্বামী ও পুত্রের। তিনি তখন আত্মহত্যা করতে চেয়েও পারেননি, হয়ে গেছিলেন উন্মাদ। একথা 'আমি' বাল্যাবস্থাতেই পিসিমার কাছে শুনেছিলেন, কিন্তু তা 'আমি'-র হৃদয়ে তীক্ষ্ণভাবে গেঁথে ছিল যখন নিজ সন্তানের মৃত্যুর পর সেকথা আবার শুনেছিলেন। এ ভাবেই তারাশঙ্কর পুনঃপুনঃ এপিসোড নির্মাণের দ্বারা আমাদের পাঁচালী-কথকতা-মঙ্গলকাব্যের শ্রুতিপরম্পরার দিকটি নির্মাণ করেন। এই শ্রুতিবাহিত হয়েই আবহমানকাল থেকে নির্মিত হয়ে আসছে লোকপরম্পরাগত অভিজ্ঞতাগুলি তথা কথাগুলি। 'আমি' তাঁর স্বকীয় বায়োগ্রাফিক্যাল জগৎ, অতীত সময়ের নারীর অভিজ্ঞতার জগৎ প্রভৃতির মাধ্যমেই পৌঁছোন আর এক প্রত্ন সময়ের তথা লোকসময়ের সামূহিক বচনের কাছে তথা নয়ন পালের কাছে। এ উপন্যাসে তারাশঙ্কর যেন দেখাতে চান যে ঔপনিবেশিক শাসকের কাছে কিংবা উনিশ শতকের বুর্জোয়া সমাজের নাগরিক শিক্ষিত মধ্যবিত্ত শ্রেণির কাছে এক কাল কেমন ভিন্ন ভিন্ন ভাবে প্রতিভাত হয়, আবার সেই কালটিই নিম্নবর্গীয় সমাজের কাছে কেমন স্বতন্ত্ররূপে ধরা দেয়। ঔপনিবেশিক প্রতাপ কিংবা ঔপনিবেশিক শিক্ষাপ্রাপ্ত এদেশীয় মানুষের দাপট সময়কে যেভাবে দেখে, সে দেখা ঔপনিবেশিক শিক্ষা বহির্ভূত জাতির তথা ঔপনিবেশিক এবং এদেশীয় প্রতাপসৃষ্টিকারী যুগপৎ মানুষের আধিপত্যাধীন জাতির সমষ্টিগত পর্যবেক্ষণ থেকে বহু দূরবর্তী। এই সামূহিক বচনের সন্ধানে, সময়কে অন্য এক সমান্তরাল দৃষ্টিকোণ থেকে দেখা সমষ্টি মানুষের সন্ধানে উপন্যাসের 'আমি' তাই গ্রামের পর গ্রাম ঘোরেন, প্রবীণ লোকদের জিজ্ঞাসা করেন। তিনি যান ফুলকুড়ি গ্রামে, পরে যান আবদারপুর গ্রামে, সেখানে প্রবীণ বৃদ্ধ ধ্বজু মল্লিকের পরামর্শে আবারও রামচন্দ্রপুরে যান হরিশ ভট্টাচার্যের সঙ্গে দেখা করতে। হরিশ ভট্টাচার্যের সঙ্গে তাঁর দেখা হয়নি, কারণ তিনি প্রয়াত হয়েছেন। তাঁর বড় পৌত্র হরি ভট্টাচার্য, যিনি এখনও বংশগত পেশা বজায় রেখেছেন, তাঁর শিষ্য সেবকও আছে। তিনিই 'আমি'কে প্রথম চরণপুরে যাওয়ার কথা বললেন। হরিশ ভট্টাচার্যের অন্য পৌত্রদের মতো হরি ভট্টাচার্য আধুনিক হননি। লক্ষ করার বিষয়, 'আমি' বারে বারে তাঁর শিষ্যসেবক আছে, তিনি আধুনিক হননি— এই প্রসঙ্গগুলির উল্লেখ করেন। প্রকৃতপক্ষে, তারাশঙ্কর আধুনিকতার প্রতিস্পর্ধী নির্মাণ করতে গিয়ে একেবারে আমাদের দেশজ কাঠামোর প্রত্ন নির্মাণের দিকেই ফিরে যান। তিনি দেখাতে চান যে, আধুনিকতার আলোপ্রাপ্ত নির্মাণ কতটা নির্মোক পরানো।

"সেখানে প্রতিমা কারিগর নয়ন পাল আছে ; প্রায় নব্বুইয়ের কাছাকাছি বয়স। তার বাপ হাঙ্গামার সময় জোয়ান মানুষ ছিল, তার ঠাকুরদা ছিল নামী কারিগর। আমার বৃদ্ধ পিতামহের বড় ভাই ত্রিভুবন ভট্টাচার্য ছিলেন তাঁর গুরু। নয়ন পালের এই ঠাকুবাবা গড়েছিল সাঁওতালদের প্রতিমে আর গুরু ত্রিভুবন ভট্টাচার্য করেছিলেন পুজো। নয়ন পাল আপনাকে বলতে পারবে। আমি জানি তাদের বাড়িতে পট আঁকা আছে সাঁওতাল হাঙ্গামার। আগে গান গেয়ে পট দেখাতো। বলবেন আমার নাম করে। সে বলবে।" — ঔপনিবেশিক বৃত্তের বাইরে এক নতুন বৃত্ত বা ডিসকোর্সের নির্মাণ করতে গিয়ে উপন্যাসের শিক্ষিত মধ্যবিত্ত 'আমি'-কে

কথকের ভূমিকা থেকে দর্শক ও শ্রোতার ভূমিকায় অধিষ্ঠিত করেন তারাশঙ্কর। দর্শক 'আমি' প্রায় নব্বই বছরের শক্ত সমর্থ নয়ন পালকে প্রত্যক্ষ করেন। নয়ন পাল তাঁকে বসতে বলেন, দীর্ঘনিশ্বাস ফেলে জানতে চান তিনি কি সিধু-কানুর কথা শুনবেন। কেন তিনি তা শুনবেন— তাও জানতে চান। তিনি ব্রাহ্মণ একথা জেনে প্রণাম করেন। তিনি ব্রাহ্মণ, তিনি গুরুবাড়ির আজ্ঞা নিয়ে এখানে এসেছেন : একথা জেনে নয়ন পাল তাঁর পট দেখাতে সম্মত হন। লক্ষণীয়, উপন্যাসের দেশজ স্ট্রাকচার নির্মাণ করতে গিয়ে বারবার 'ব্রাহ্মণ', 'গুরুবাড়ির আজ্ঞা' ইত্যাদি উল্লেখের মধ্য দিয়ে লেখক যেন মধ্যবিত্তের পরজীবী অস্তিত্বের অন্তঃসারশূন্য দিকটিকেও দেখাতে চান। বুর্জোয়া নাগরিক সমাজের পরাশ্রয়ী মধ্যবিত্তের প্রতিস্পর্ধী অবস্থান যেন নয়ন পালের। তাই নয়ন পালের 'আমি'-কে দিয়ে লেখক আঘাত করেন প্রথাগত ডিসকোর্সের বিরুদ্ধে : "তারপর একটু চুপ করে থেকে বললে— কি নিকবেন— এই অসভ্য কালো অসুরের মত সাঁওতালেরা কত মানুষ কেটেছিল? কত ঘর পুড়িয়েছিল? হায় হায় বাবা, তাই লোকে বলে।" শুধু তাই নয়, উপন্যাসের শিক্ষিত মধ্যবিত্ত 'আমি' পট দেখাতে চাইলে নয়ন পাল বলে ওঠেন : "ও কাউকে দেখাই না। বাবা, সে তো সোজা দব্য লয়। মনে করুন— বংশের কলঙ্ক আছে, আমাদের হিন্দু মহাজন জোতদারদের পাপের কথা আছে, সাহেব লোকের অত্যাচারের কথা আছে। দেখাতে নিজের লজ্জা হত। আবার আমাদের হিঁদু ভাইরা রাগ করত। সাহেবদের কালে তো বার করবার জো ছিল না। শুনতাম পট কেড়ে নিয়ে গিয়ে পুড়িয়ে দেবে, ঘরদোর তছনছ করবে, কোমড়ে দড়ি বেঁধে নিয়ে যাবে। তা সায়েবরা গিয়েছে, হিঁদু ভাইরা আছে, নিজেদের কলঙ্ককথা আছে— তুলে রেখেছি মাচানে।" অর্থাৎ নয়ন পালের কথা দিয়ে তারাশঙ্কর স্পষ্ট করে দিলেন যে, পটের বয়ান প্রথাগত বয়ানের বিপরীত। এ বয়ান দুই কালপর্বের— ঔপনিবেশিক এবং উত্তর-ঔপনিবেশিক দুই ডিসকোর্সেরই বিপরীত। আবার তিনি এ-ও দেখান যে দুই পর্বেই নিম্নবর্গীয় জেহাদকথা, পরাধীনতার শৃঙ্খল মোচনের কিংবা প্রতাপ মুক্ত হওয়ার নিজস্ব কথা উপেক্ষিতই। শুধু তাই নয়, তাকে রুদ্ধ করে রাখতে বাধ্য করা হয়েছে। ঔপনিবেশিক পর্বে উপনিবেশের শাসকেরা প্রবল প্রতাপান্বিত অথচ কৌশলময় নিজেদের ডিসকোর্স নির্মাণ করেছে আর উত্তর-ঔপনিবেশিক পর্বেও শিক্ষিত মধ্যবিত্ত শ্রেণি অন্য এক সমান্তরাল আধিপত্যময় ডিসকোর্স নির্মাণ করেছে এবং তারাও লোকসমাজের স্বতঃস্ফূর্ত কথাকে চাপা দিতে বাধ্য করে। নয়ন পাল 'আমি'-কে কবিকঙ্কণের কথা বলেন, তাঁর সৃষ্ট চরিত্র কালকেতু ব্যাধের কথা বলেন। কবিকঙ্কণের *চণ্ডীমঙ্গল*-এর কালকেতু প্রসঙ্গ এক্ষেত্রে দুদিক দিয়ে তাৎপর্যময়। প্রথমত, ব্রাহ্মণ মুকুন্দ কালকেতুকে রাজা করে নিম্নবর্গীয় কথাকে নির্মাণ করেছিলেন— সে-কথা নয়ন পাল স্মরণ করিয়ে দেন। দ্বিতীয়ত *চণ্ডীমঙ্গল* কাব্যের উল্লেখের দ্বারা ঔপনিবেশিক নির্মাণের বদলে দেশজ নির্মাণ ঔপন্যাসিক করতে চান— তা-ই যেন বলতে চান। তাই দেখি, নয়ন পাল তাঁর কথারম্ভ মঙ্গলকাব্যের আদলে দেবী বন্দনা দিয়েই শুরু করেন। এর আগেই ঔপন্যাসিক শিক্ষিত মধ্যবিত্ত 'আমি'-র স্বপ্নাদেশকে নির্মাণ করেছেন— "এবং ছায়া জেনেও, স্বপ্ন জেনেও সেই কষ্টিপাথরে গড়া মূর্তি— সে সিধু হোক বা না হোক— তাকে ভুলতে পারিনি।" আবার সিধু কানুর পরিচয় খুঁজতে দিয়ে তাদের কথা সম্পর্কে জ্ঞাত লোককবি নয়ন পালের পরিচয়ও দেন। নয়ন পাল নিজেও যেন দেন তাঁর পরিচয় : "আমার এক জেঠা ছিল— সে বাবা সিধু কানুর সঙ্গে এই রঙ্গে মেতেছিল, বুঝেছেন। সিউড়ী আদালতে বিচার হয়ে তার জেহেল হয়েছিল সাত বছর। নফর পাল নাম ছিল।" অর্থাৎ এ উপন্যাসে নিম্নবর্গীয় প্রতিস্পর্ধী বয়ান তারাশঙ্কর গড়ে তোলেন দেশীয়

মঙ্গলকাব্যের আদলেই। তাই দেববন্দনা, স্বপ্নাদেশ তথা আত্মপরিচয় অংশও যেন তিনি নির্মাণ করেন এ উপন্যাসে তাঁর নিজস্ব কালের তথা খণ্ডিত কালের প্রেক্ষিতে। তাই দেখি, পাঁচালী মঙ্গলকাব্যের মতোই নয়ন পাল পট দেখিয়ে যান আর 'আমি' তা শুনে যান। কথকের বদল ঘটে— আবার এ বদলও যেন উপন্যাসের মধ্যমপুরুষ কথন রীতি থেকে পাঁচালী-মঙ্গলকাব্যের গায়ক কথক ও শ্রোতা দর্শকের বদলের মতোই। কেননা, পাঁচালী-মঙ্গলকাব্যে শ্রোতাকে উদ্দেশ্য করে গল্প বলা হত। মঙ্গলকাব্যের আত্মবিবরণীর মতোই নয়ন পালের পরিচয় দেওয়ার এবং পিসিমার উল্লেখের মধ্য দিয়ে মঙ্গলকাব্যের কবির মতোই একালের ঔপন্যাসিক কোথায় কোন্ সূত্র পেয়েছেন তাও শ্রোতা পাঠকদের জানিয়ে দেন। আবার, পটের উল্লেখের দ্বারা একদিকে ঔপনিবেশিক কাঠামোর বিপরীতে দেশজ নির্মাণকে গুরুত্ব দেওয়া হল ; অন্যদিকে পটে সবকিছুই গোটানো থাকে, অন্তরালে থাকে, প্রকৃতপক্ষে যেন জানিয়ে দেওয়া হল এক প্রবল আধিপত্যময় ইতিহাসকথার অন্তরালে অথবা দাপুটে ইতিহাসকথার অন্তরালে কেমন করে নিম্নবর্গীয় কথা অন্তরালে থাকে, আবার তাকে সম্পূর্ণভাবে ধবংস করাও যায় না।

তাই দেখি, নয়ন পালের জবানিতে নিম্নবর্গের আখ্যান নির্মাণ করতে গিয়ে তারাশঙ্কর আধিপত্যের নানা মাত্রাকেও চিহ্নিত করেন। নয়ন পাল তাঁর প্রথম পটে দেখান ঔপনিবেশিককালের দেশকালকে এবং সেই দেশকালে নিম্নবর্গীয় সাঁওতালদের অবস্থানকে। তারা পাহাড় কেটে জমি বানিয়ে কৃষিকাজ করতে শিখছে, ছোটো গ্রামে নিজেদের বসতি গড়ে তুলছে। এই গ্রামের বিপরীতে রয়েছে বাজার। নিম্নবর্গীয়দের প্রতিস্পর্ধী অবস্থানে রয়েছে সমাজের উচ্চবর্গ, যেখানে রয়েছে মহাজন কেনারাম ভকত, রয়েছে মহেশ দারোগা। সাঁওতালরা বাজার করতে যায় লিটাপাড়ার দিকে বারহেটের বড়ো বাজারে, যেখানে আছে ধান-চাল-ডালের আড়ত, বড়-বড় কাপড়ের দোকান, নুন-মশলা-তেল থেকে শুরু করে কাঠ-লোহা প্রভৃতি নানা সামগ্রীর সম্ভার। ওখানেও আছে বাঙালি দিকুদের অর্থাৎ উচ্চবর্গীয়দের আধিপত্যের চিত্র:মহেশ ভকতের প্রতাপের চিত্র। সিধু এই বাজারেই প্রত্যক্ষ করে তাদের অর্থাৎ নিম্নবর্গীয়দের যথার্থ অবস্থানকে। সিধু ও তাদের গ্রামের কয়েকজন যুবক সাঁওতাল মূলত লবণ ক্রয় করার জন্যই গিয়েছিল সে বাজারে। তারা দ্রব্যের বিনিময়ে দ্রব্য নেবে ; তারা অরণ্য থেকে সংগ্রহ করেছিল ঘি, ময়ূরের পালক, চিতা বাঘের নখ— এসব কিছুর বদলে তারা লবণ কিনতে চেয়েছিল আর কিনতে চেয়েছিল তাদের প্রিয় সন্তানদের জন্য বালা কিংবা প্রিয়তমা স্ত্রীদের জন্য রূপদস্তার গহনা। কিন্তু তারা তাদের দ্রব্যের যথার্থ মূল্য পায়নি, আবার যে পরিমাণ দ্রব্য নিয়ে গিয়েছিল তাও মহাজনের মাপ অনুসারে অনেক কমে গিয়েছিল, অথচ দ্রব্য ক্রয় করার সময় পরিমাপের একক ও পদ্ধতি বদলে গিয়েছিল, সুতরাং মাপ হয়েছিল ভিন্ন রকমের। ফলে, যে পরিমাণ দ্রব্য পাওয়ার কথা তাও তারা পায়নি। অন্য সাঁওতালরা তাদের দীর্ঘদিনের দেখে আসা রেওয়াজ অনুসারে এ দৃশ্য সহজে মেনে নিলেও সিধু তা পারেনি। সিধু প্রত্যক্ষ করেছিল শোষণের বহুমাত্রিক কৌশলকে— তারা মূল্যে প্রতারিত হয়েছিল, তারা ওজনে প্রবঞ্চিত হয়েছিল। আবার নিমু হাঁসদার মতো ব্যক্তি ও তার স্ত্রী সাত বছর বিনা পারিশ্রমিকে ভকতের যাবতীয় হুকুম অনুযায়ী কাজ করার পরেও পিতার ঋণের দশ টাকা পরিশোধ করতে পারে না। সেদিন বারহেটে বাজারে সিধু দেখে ভকতের মতো মহাজনের নগ্ন প্রতারণার চিত্র আর বাজার থেকে ফেরার পথে সে শোনে ভীম মাঝির কথা। আসলে, লেখক দেখান যে, আধিপত্যবাদী শক্তির কাছে নিম্নবর্গীয়দের কোনো ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্যবোধ থাকে না, তাদের তাই থাকে না নিজস্ব কোনো ভাষাও। নিমু হাঁসদার মতো মূক মানুষকেও যেমন বছরের পর বছর দাসত্ব করে যেতে হয়,

তেমনি ভীম মাঝির মতো প্রতিবাদী মানুষকেও কারাজীবন যাপন করতে হয় অর্থাৎ ভাষাহীন হতে হয়। কারি নেলসন ও লরেন্স গ্রসবার্গ সম্পাদিত গ্রন্থ *মার্ক্সইজম অ্যান্ড দ্য ইন্টারপ্রিটেশন অফ কালচার*- এ গায়ত্রী চৌধুরী স্পিভাক লিখেছিলেন, 'ক্যান দ্য সাবল্টার্ন স্পিক' নামক প্রবন্ধ। নিম্নবর্গের ইতিহাস চর্চাতেও নিম্নবর্গদের ভাষাহীন হওয়াকেই দেখায়, তা আসলে উচ্চবর্গেরই কণ্ঠস্বর। ভীম মাঝি কেনারাম ভকতের কাছে বারো শলি ধান ধার নিলে তা সুদে-আসলে বেড়ে দাঁড়ায় একশো শলি। কিন্তু ঋণ শোধ দিলেও পরের বছরেও তা খাতায় লেখা হয় না, ঋণ থেকে যায় সেই একশো শলিই। কেনারাম ভকতের মতো মহাজন ধর্মের দোহাই দিয়ে দরিদ্র সাঁওতালদের কাঁধে ঋণের বোঝা চাপিয়ে তাদের সর্বস্বান্ত করে— জমি কেড়ে নেয়, গোরু-বাছুর জোর করে নিয়ে যায়। কেনারামের মতো শোষকদের সাহায্য করে মহেশ দারোগার মতো শাসকরা। মদ্য ও নারীবিলাসে মগ্ন এই শাসকেরা। দরিদ্র নারীদের কেনারামের মতো শোষকরা কিনে নেয় এবং মহেশ দারোগার মতো শাসক তাদের দিয়ে নিজের দেহ লালসাকে চরিতার্থ করে। ১৯৮৩ খ্রিস্টাব্দে অ্যালিস ওয়াকার *ইন সার্চ অফ আওয়ার মাদার্স গারডেন্স : উম্যানিস্ট প্রোজ* নামক গ্রন্থে অ্যালিস ওয়াকার 'ফেমিনিস্ট' শব্দের বদলে 'উম্যানিস্ট' শব্দটি প্রয়োগ করেন। পরবর্তীকালে ক্যাতি জি. ক্যানন, এমিলি এম. টাউনেস প্রমুখ লেখিকারাও এই শব্দটি ব্যবহার করেন। তাঁরা কেবল শ্বেতাঙ্গ নারীবাদীদের সঙ্গে তাঁদের স্বাতন্ত্র্যকেই চিহ্নিত করলেন না, কৃষ্ণাঙ্গ নারীদের দ্বিমাত্রিকভাবে শাসিত হওয়ার দিকটিকেও দেখালেন— যার উল্লেখ এক্ষেত্রে অত্যন্ত জরুরি বলে মনে হয়। অর্থাৎ লক্ষণীয়, যুগ যুগ ধরে আধিপত্যময় সমাজে নারী নিম্নবর্গ রূপে পরিগণিত।

লক্ষ্মণের মতো সাঁওতাল নিরুপায় হয়ে বলে ওঠে : "সাঁওতালরা বাঁচবেক নাই হে। মরবেক। বিলকুল সব মেরেই ফেলাবে হে। এক রক্ষে কিরিস্তান হলে। পাদরী বাবারা খানিক অদেক দেখে।" কিন্তু সিধুর মতো সাঁওতাল নিজ ধর্মকে বর্জন করে খ্রিস্টান হওয়ার পলায়নী মনোবৃত্তিতে সাঁওতালকুলের শক্তিকে দেখতে পায়নি, বরং তাতে তাদের ভীরু কাপুরুষোচিত মনোভঙ্গিটিকেই সে প্রত্যক্ষ করেছে। এর আগেই সাঁওতালদের আদি রমণী চূড়া মাঝির মা সিধুর মতো তাবৎ সাঁওতালকুলকে শুনিয়েছিল দরিদ্র সাঁওতাল নারীদের দুর্দশা ও লাঞ্ছনার কথা : "আমি কুছু জানছি না— তু কুছু জানিস না— সেখানে ডবকা ডবকা মেয়েগুলাকে লিয়া ওই পুরখানা শালারা দাড়িওলা শালারা কি করছে তুরা জানিস না। .... তুরা দু ভাই সাদী করলি না— পিরীত করলি লিটিপাড়ার বিশু মাঝির দুটো মেয়্যার সঙ্গে। কি হল? তাদের বাবা খাটতে গেল রাস্তাবন্দিতে— মেয়্যা দুটোকে লিয়ে গেল সোঙ্গে। দেখগা কি হল তাদের?— আক্কাই হল না?"— এই 'আক্কাই' অর্থাৎ অমঙ্গল অন্যদিক দিয়ে প্রত্যক্ষ করছে *হাঁসুলীবাঁকের উপকথা* উপন্যাসের কাহার গোষ্ঠীর আদি রমণী সুচাঁদ। সেখানে সুচাঁদ ধর্মীয় দিক দিয়ে অমঙ্গল প্রত্যক্ষ করলেও সাঁওতাল গোষ্ঠীর আদি রমণীর মতো প্রত্যক্ষভাবে উচ্চবর্গীয়দের আধিপত্যকে তর্জনী নিক্ষেপ করে দেখায়নি। চূড়া মাঝির মায়ের জিজ্ঞাসার উত্তর সিধু খুঁজেছে, সে তা পায়নি, উপরন্তু তার মনেও জেগেছে আরও অসংখ্য জিজ্ঞাসা। সে শুনেছে রুকনী টুকনী খ্রিস্টান হয়েছে, তার একমাত্র বোন আর ভগ্নিপতিও ধর্মান্তরিত হয়েছে। খ্রিস্টান পাদরিরা সাঁওতালদের দারিদ্র্যের সুযোগ নিয়ে তাদের নিজ ধর্ম ত্যাগে বাধ্য করে, তারা ছলে-বলে-কৌশলে তাদের আধিপত্যকে বজায় রাখে। সাঁওতালরা নিজ ধর্ম বিসর্জন দিচ্ছে— এ সংবাদ সোনার পর নিজ উৎসভূমি থেকে চ্যুত হওয়ার যন্ত্রণা সিধু উপলব্ধি করে। নয়ন পালের পটেও

ধরা পড়ে সিধু কানুর পিতা চুনারের মর্মবেদনা, এ মর্মবেদনা নিজ অন্বয় থেকে চ্যুত হওয়ার যন্ত্রণাজনিত :

চুনার বলে— শুন কুন্তী মুর্মুঠাকুর রাজগুন্ঠী
মরংবোঙ্গার ছিষ্টি— অদৃষ্টের দোষে এই দশা—
প্রথমে দিকুরা তাড়ে তুরুকেরা তার পরে
বনে বনে ঘুরে ঘুরে হাতী থেকে হইলাম মশা।
তথাপি ধরমে মানি দিন খাই দিন আনি
দিকু করে টানাটানি দিনরাত সব কিছু ধরে—
সব দিই দিই না ধর্ম মুর্মু বোঝে তার মর্ম—
করে নাক ছোট কর্ম সাঁওতালে এই মান্য করে।

অর্থাৎ সিধু-কানু-চুনার-চূড়া মাঝির মা— নিমু হাঁসদা-রুকনি-টুকনি-লাল মাঝির মতো সাঁওতালরা কেবলমাত্র কেনারাম-মহিন্দর ভকতের মতো মহাজনদের প্রতাপে লাঞ্ছিত নয়, মহেশ দারোগার মতো শাসকের আধিপত্যে অত্যাচারিত নয়, খ্রিস্টান ধর্মগুরুদের দ্বারাও নানাভাবে নিজ ধর্ম-চ্যুত হওয়ার যন্ত্রণাতেও দগ্ধ। আবার খ্রিস্টান হওয়ার পরই তারা মুক্তি পায় না, তাদের নারীদের উপরও হয় প্রবলের অত্যাচার। তাই দেখি, রুকনী ও টুকনী ইংরেজদের দ্বারা কেবল অপহৃতই হয় না, অত্যাচারিতও হয়। যে-কোনো কালের ঔপনিবেশিক সমাজে দেখা যায় চূড়ান্তভাবে আধিপত্য বিস্তার করা হয়, এমনকি অত্যাচারও করা হয় দুর্বলের উপর এবং মূলত দু'ধরনের দুর্বলের উপর— এরা হল নিম্নবর্গ ও নারী। আবার দেখা যায়, পুরুষের আশ্রয়হীন নারীরা সমাজে একা সুরক্ষিত থাকে না— তারাই বেশি অত্যাচারিত ও লাঞ্ছিত হয়। তাই দেখি, রুকনী ও টুকনীর মতো কিংবা মানকীর মতো নিম্নবর্গীয় সমাজের নারীরাই নয়, ত্রিভুবন ভট্টাচার্যের নিষ্ঠাবতী সন্ন্যাসিনী বাল্যবিধবা কন্যাটিও পশুপুরুষ ঔপনিবেশিক শাসকদের অধঃস্তন কর্মচারী ডিউইয়ের দ্বারা অত্যাচারিত হয়, ধর্ষিত হয়। বিভ্রান্ত-জ্ঞান রহিত এই নারী আত্মহত্যা করতে চেয়েও পারেনি, উপাস্য পাষাণ প্রতিমা কালীকে মুহূর্তের ভ্রমবশত পশুসম অত্যাচারী ভেবে বিনষ্ট করে। তাই দেখি, পাষাণ প্রতিমার সাধনা আর নয়, এবার নারী বের হল অত্যাচারিত ও অবহেলিত মানুষের সাধনায়, বের হল নৃশংস নির্মম শাসকদের অত্যাচার ও লাঞ্ছনার বিরুদ্ধে প্রতিশোধস্পৃহায়। অর্থাৎ, তারাশঙ্কর এ উপন্যাসে নিম্নবর্গীয় সমাজের নির্মাণের প্রতিস্পর্ধী অবস্থানে উচ্চবর্গীয় আধিপত্যকে চিহ্নিত করেছেন। সে আধিপত্য কখনো দিকুদের শোষণের মধ্যে প্রতিফলিত, কখনো ইংরেজ শাসকদের নারীদের প্রতি লাঞ্ছনায় প্রতিবিম্বিত, কখনো ঔপনিবেশিক শাসকদের অধস্তন কর্মচারীদের অত্যাচারের মধ্যে চিহ্নিত।

অন্যদিকে নিম্নবর্গীয় মানুষগুলি উচ্চবর্গীয় আধিপত্যবাদের বিরুদ্ধে যে আন্দোলনে প্রয়াসী হয়েছে, তারও নিজস্ব স্বরূপকে যথাযথভাবে পরিস্ফুট করেছেন ঔপন্যাসিক। নিম্নবর্গ সম্পর্কিত চর্চাকারী ঐতিহাসিকগণ এই সত্যটিকে প্রতিষ্ঠিত করতে চেয়েছেন যে, নিম্নবর্গীয় জাতীয়তাবাদী সমাজ তথা কৃষক শ্রমিকের দল ঔপনিবেশিক শিক্ষায় শিক্ষিত মধ্যবিত্ত কিংবা উচ্চবিত্ত তথা উচ্চবর্গীয় নেতাদের নির্দেশমতো আন্দোলনে অংশগ্রহণ করেনি। এ আন্দোলন স্বতঃস্ফূর্ত তো বটেই, উপরন্তু এ আন্দোলনের নিজস্ব চরিত্র আছে। তারাশঙ্কর এ উপন্যাসে যে কালটিকে ধরেছেন এবং যে কালে এ উপন্যাসে সাঁওতালদের আধিপত্যের বিরুদ্ধে আন্দোলনকে দেখিয়েছেন, সে সময়ে জাতীয়তাবাদী ভারতীয় নেতাদের আন্দোলন শুরু হয়নি ; এমনকি সিপাহি বিদ্রোহ,

যা প্রথম মহাবিদ্রোহ নামে পরিচিত সংঘটিত হয়েছে এর তিন বছর পর আর ঔপনিবেশিক শিক্ষায় শিক্ষিত তাত্ত্বিক আন্দোলন তো শুরু হয়েছে বিশ শতকের প্রারম্ভে। অন্যদিকে ১৮৫৫ খ্রিস্টাব্দেই সিধু-কানুর মতো ঔপনিবেশিক শিক্ষার আলোহীন আপাতবর্বর মানুষগুলির স্বাভিমান ধরা পড়েছে, আধিপত্যকামী শক্তির বিরুদ্ধে গণক্ষোভ স্বতঃস্ফূর্ত তথা সোচ্চার আন্দোলনের মধ্য দিয়ে প্রকাশিত হয়েছে, যা প্রকারান্তরে জাতীয়তাবাদী আন্দোলনে আর একটি সুস্পষ্ট ও সমান্তরাল ধারা বলা চলে। সিধু আর কানু এ আন্দোলনে নেতৃত্ব দিয়েছে। কিন্তু এ আন্দোলন এক লহমায় উদ্ভূত হয়নি, শাসক-শোষক ও আধিপত্যকামী উচ্চবর্গীয়দের বিরুদ্ধে তাদের ক্ষোভ ধীরে ধীরে ধূমায়িত হয়েছে, ক্রমশ তা গণক্ষোভে রূপায়িত হয়েছে, পরবর্তীকালে যা আন্দোলনের রূপ নিয়েছে। দাপুটে ইতিহাসের প্রতিস্পর্ধী ইতিহাস নির্মাণ করতে গিয়ে তারাশঙ্কর লোককথাকে ভিত্তি করে সিধু এবং কানুর সাবল্টার্ন নেতা রূপে গড়ে ওঠার দিকটিকে দেখান। দুটি পদ্ধতির আশ্রয়ে ঔপন্যাসিক এই নির্মাণ সম্পূর্ণ করে তুলতে প্রয়াসী হয়েছেন। প্রথমত, এই উপন্যাসে তিনি প্রভুত্ব তথা উচ্চবর্গের বিপরীতে অবস্থানকারী সাঁওতাল সমাজের রীতি-নীতি-সংস্কার প্রভৃতিকে যথাসম্ভব বিশ্বাসযোগ্যভাবে উপস্থাপিত করেছেন। এক্ষেত্রে স্মরণীয়, গ্রামশি তাঁর *Prisons Note book* গ্রন্থে বলে গেছেন নিম্নবর্গীয় সমাজের প্রতিটি পল-অনুপল সম্পর্কে পূর্ণাঙ্গভাবে নির্মাতা বা নেতৃস্থানীয়ের জ্ঞাত হওয়া প্রয়োজন। দ্বিতীয়ত, এই উপন্যাসে তারাশঙ্কর সাবল্টার্ন সমাজের উপযোগী মেটাফর তথা চিত্রকল্পও নির্মাণ করেছেন। একদিকে ঔপনিবেশিক শিক্ষাভিমানের বিপরীতে এদেশের গ্রামীণ সমাজের ঐতিহ্যলালিত সহজাত কবিত্বের অধিকারী নয়ন পালের পট দেখছেন উপন্যাসের 'আমি', তিনি শুনছেন— "কেনারাম এক নয়! প্রতি গাঁয়ে গাঁয়ে রয়" অন্যদিকে, তাঁর ব্যাখ্যায় প্রতিভাত হচ্ছে— সিধু কীভাবে উচ্চবর্গীয় তথা বর্ণহিন্দুদের প্রবঞ্চনাকে প্রত্যক্ষ করছে, ডমিন্যান্টদের ক্ষমতার নানা মাত্রাকে দেখতে পাচ্ছে। সিধুর অভিজ্ঞতা অর্জনের এটি যদি একটি দিক হয়, তবে অন্যদিকটি হল ১৮৩৪ খ্রিস্টাব্দের বৈশাখ মাসের ঝড় থেকে পাওয়া প্রত্যাদেশজনিত লোকবিশ্বাস। প্রকৃতির প্রবল ঝঞ্ঝার মদমত্ত কালে যেমন ত্রিভুবন ভট্টচার্যের ভৈরবী-কন্যা অত্যাচারিত হয়েছিল, তেমনি সাঁওতালরাও শুনেছিল বাগানডিহি গ্রামের জহর সর্নায় বজ্রপাতের শব্দ। তারাশঙ্কর সাঁওতাল সমাজের উৎকণ্ঠার মাত্রাটিকে চিহ্নিত করার জন্য সম সময়ের কালীঘাটের মন্দিরের কলসচূড়ার বজ্রপাতের ঘটনার উল্লেখ করেন এবং দেখান : "১৮৫৪ সনের বৈশাখ মাসে ভাগনাদিহির জহরসর্নার সব থেকে উঁচু শালগাছের মাথায় বাজ পড়েছিল— তাতে সাঁওতালরা হায় হায় করে সেখানে ছুটে এসেছিল স্বাভাবিকভাবে।" বড় পাথরের ফাটলকে প্রত্যক্ষ করেছিল চুনার মাঝির মতো সাঁওতাল, তা থেকে 'আক্কাই আক্কাই' পাপকে দেখেছিল চুড়া মাঝির মায়ের মতো সাঁওতাল রমণী। তাদের অস্তিত্ব, তাদের অন্বয়, তাদের অবস্থান সম্পর্কিত জিজ্ঞাসায় মুখর হয়েছিল গোটা সাঁওতালকুল। মারংবোঙ্গার মঙ্গল-অমঙ্গলের অভিপ্রায় তারা যথার্থ ভাবে বুঝে উঠতে পারেনি, কিন্তু দিকুদের আর দারোগাদের অত্যাচারে জর্জরিত হৃদয়ের যন্ত্রণাকে উপলব্ধি করেছিল। এই কারণেই তারা মাঝে মধ্যেই এসব কিছু নিয়ে মিলিতও হয়— "বুলছি এই তো শনিচর বারে ইখানকার সব আমাদের মাঝির গাঁয়ের সদ্দারেরা পরগণাতরা আসবেক ; জমবে সব লিটিপাড়ায়। এই যে আমরাপাড়ার কেনা ভকতের নতুন দিকুরা সাঁওতালদের সব লিছে কেড়েকুড়ে, দারোগার সঙ্গে জোট বেঁধেছে, তার লেগে সাহেবের কাছে দরখাস্ দিবে, আর ফিরতি পথে লিটিপাড়ার জঙ্গলের ধারে আমাদের জমায়েত হবেক। শলা হবেক।..." অন্যদিকে দিকুদের অত্যাচারে জর্জরিত সিধুর মতো সাঁওতাল পেয়েছিল

বুঙ্গবাবার ইশারা— "আবার একবার বিদ্যুৎ চমকাল। সিধু দেখলে কালো মেঘের গায়ে জ্বলন্ত রূপালী আঁকা বাঁকা হিজিবিজি দাগে কত কিছু যেন লেখা হয়ে গেল।" দিগন্ত থেকে আসা ইশারা ও ইঙ্গিতে সিধু আসন্ন ঝড়কেই প্রত্যক্ষ করেছিল।

দাপুটে ইতিহাসে অঙ্কিত ঝড় আর লোকায়ত পটে নির্মিত ঝড়ের আশ্রয়ে তারাশঙ্কর তাঁর *অরণ্য বহ্নি* উপন্যাসে যে ঝড়ের চিত্র অঙ্কন করেন তা বহুমাত্রিক হয়ে ওঠে। ডিউইয়ের মতো পশুসম পুরুষের দ্বারা অত্যাচারিত হয় নারী এই ঝড়ের রাত্রিতেই, পুষ্পিত নারী হয়ে ওঠে আন্দোলনের প্রতিভূ। সাঁওতালরা অমঙ্গল ও মঙ্গলের বার্তাকে পাঠ করতে চায় প্রকৃতি থেকে, সিধুর মতো সাঁওতাল পায় ইশারা, উপলব্ধি করে ঝড় আসবে। ঝড় তাই হয়ে ওঠে সাঁওতাল বিদ্রোহেরই প্রতিমূর্তি। এ উপন্যাসে বারে বারে আগুন তথা বহ্নির উল্লেখও রয়েছে— যে বহ্নি প্রকৃতপক্ষে আরণ্যক মনে জমে থাকা দীর্ঘলালিত অসন্তোষেরই প্রতিরূপ মাত্র। সিধু তার কাঁড় দিয়ে বিঁধে ফেলে খড়গোশ গ্রাসে উদ্যত বনবিড়ালকে। খড়গোশ আর বনবিড়াল যথাক্রমে দিকু অর্থাৎ শোষক মহাজন আর সাহেব অর্থাৎ ঔপনিবেশিক শাসককুলের প্রতীক হয়ে ওঠে। পীড়ন থেকে মুক্ত হওয়ার বাসনায় সিধু মারংবোঙ্গার যেন বা আশীর্বাদ পায় আর নিজেদের সঙ্গে শক্তিহীন অথচ লোলজিহ্ব কুকুরদের তুলনা করে। কেননা, খড়গোশ পাখি মেরে খায় আর কুকুর তা কেবল দেখে বেড়ায়; তাদের কোনো সাধ্য নেই। সিধু একথা ভেবে অবাক হয় যে, তাদের জাতি কোনো রাগ করতেও জানে না। পীড়িত সাঁওতাল সমাজের যথার্থ প্রতিনিধি যন্ত্রণাদগ্ধ সিধু চতুর্দিকের কৌশলী শোষণ, চতুর অবহেলা ও নির্মম লাঞ্ছনাকে প্রত্যক্ষ করে আর রাগে ক্ষোভে পরিপূর্ণ হয়ে ওঠে তার অন্তর। লেখক সিধুর অসন্তোষে পরিপূর্ণ অন্তরটিকে চিত্রকল্প সংযোজনের মধ্য দিয়ে যথার্থভাবে উপস্থাপিত করেছেন : "অরণ্যবাসী আদিম মানুষের মন— তার ওপর বাল্যকাল হতে দুরন্ত দুর্দান্ত সিধু। প্রতিহিংসা ক্রোধ সেখানে কালো কেউটে সাপের মত নিষ্ফল আক্রোশে ছোবল মারছে মাটির উপর পাথরের উপর। তার থেকে ঝড়ছে সেই কামনার বিষ।"

সুতরাং, সেই ধূমায়িত ক্ষোভ কোন এক লহমায় উদ্ভূত হয়নি। যুগ যুগ ধরে তারা ব্রাত্য ও অবহেলিত, তাদের অবস্থানও তাই নগর-জনপদ থেকে দূরবর্তী স্থানে, আলো-বর্জিত স্থানে। ঔপন্যাসিক যথার্থভাবে তাদের ঘনান্ধকারময় পটভূমিটি চিহ্নিত করেন : "সুদীর্ঘকাল পূর্বে ভারতবর্ষের ঐতিহাসিক রঙ্গমঞ্চের প্রকাশ্য দৃশ্যপট নগর জনপদ থেকে অরণ্য অন্ধকারে নেপথ্যে জীবনকাল শেষ করে নগর জনপদের প্রত্যন্ত এলাকায় এসে বসেছে এইসব সাঁওতালের দল।" কিন্তু দুটি প্রজন্ম অতিক্রান্ত হতে না হতেই তারা নৃশংস আক্রমণের শিকার হল। ঔপন্যাসিক বনের হাতির পালের আক্রমণ কিংবা নেকড়ের দলের আক্রমণের চিত্রকল্পের দ্বারা সেই নিষ্ঠুরতাকে চিহ্নিত করেছেন। লিটাপাড়ার দরবারে তারা আবেদন জানাতে এসেছিল ক্রীতদাসত্বের বিরুদ্ধে, মিথ্যা মামলায় বিনা অপরাধে জেলে যাওয়ার বিরুদ্ধে এবং ধর্ম হারানোর বিরুদ্ধে। বিশু উন্মাদের মতো তার কন্যাদের ফিরে পেতে চেয়েছিল, চুনার নানা অন্যায়ের বিরুদ্ধে প্রতিবাদে অক্ষম হওয়ায় দীর্ঘশ্বাস ফেলতে ফেলতে মৃত্যুমুখে পতিত হয়েছিল। এইসব দৃশ্য দেখে ও শুনে সিধু-কানু-বিশু নিয়েছিল শপথ। সিধু প্রতিজ্ঞা করেছিল তাদের দেবস্থানে তথা জহর সর্নায় তিন নারীকে উদ্ধার করে নিয়ে আসবে। এই অঙ্গীকারই ছিল তাদের আন্দোলনের অগ্নিমন্ত্র । যুগ যুগ সঞ্চিত অসন্তোষ ও ক্ষোভই জন্ম দিয়েছিল তাদের সেই জেহাদ বহ্নির।

এই প্রসঙ্গে একটি জিজ্ঞাসার উল্লেখ করা যায়— নিম্নবর্গীয়দের জাতীয়তাবাদী আন্দোলনের যথার্থ ইতিহাস কি লেখা হয়েছে? বিশেষত ভারতবর্ষের মতো তৃতীয় বিশ্বের দেশের ক্ষেত্রে? এই জিজ্ঞাসাই *অরণ্য বহ্নি* উপন্যাসের নির্মাণের মূলে রয়েছে। এই উপন্যাসে সাঁওতালদের তথা নিম্নবর্গীয় জাতীয়তাবাদী আন্দোলনের নিজস্ব ধরনটিও রূপায়িত হয়েছে। তাদের মজলিসের পর মজলিসে শালপাতার মাধ্যমে বার্তা পাঠিয়ে গ্রামে গ্রামে জানানো হয়— দিকুদের কাছে টাকা ধার না নেওয়ার কথা, জমির খাজনা বেশি না দেওয়ার কথা, খ্রিস্টান পাদরিদের কথায় নিজ ধর্ম বিসর্জন না দেওয়ার কথা, নিজ অস্ত্রকে মজবুত করার কথা এবং তাদের ধর্মদেবতা বোঙ্গার ইশারার কথা। ঔপন্যাসিক দেখিয়েছেন, অত্যাচারিত নারী ভৈরবী প্রেরণা দিয়েছেন সিধু ও কানুকে আর বহু যুগ সঞ্চিত অসন্তোষের বহিঃপ্রকাশ লহমার মধ্যে ঘটেছিল— "মুহূর্তে বিস্ফোরণ ঘটে গিয়েছিল। প্রায় পঞ্চাশ বছরের প্রখর উত্তপ্ত শোষণে এই সরল মানুষগুলির হৃদয়— যা কাজল কালো জলে ভরা সরোবরের মত— তা নিঃশেষে শুকিয়ে কঠিন শুষ্ক পঙ্কস্তরে পরিণত হয়েছিল— সেই পঙ্কস্তর কেটে গিয়ে একটা আগ্নেয়গিরির অভ্যুদয় হল।" সাঁওতালরা একত্রিত হয়ে তিনজন সাহেবকে হত্যা করে ও নারীদের উদ্ধার করে এবং তারপর তারা গভীর অরণ্যের মধ্যে আশ্রয় নেয়। পরবর্তীকালে সেখান থেকে চলে গিয়ে রাজমহল অঞ্চলের সাঁওতাল এলাকায় একত্রিত হতে শুরু করে। সিধু-কানু সকলের কাছে বোঙ্গার হুকুম পাঠায়, 'হুল'-এর জন্য তৈরি হতে বলে। তারা ঘোষণা করে— তাদের মা ভৈরবী মারংবোঙ্গা বলেছেন 'নেওতা' অর্থাৎ নিমন্ত্রণ আসবে, সে নিমন্ত্রণ আসবে সাদা খাতায়। সেই মতো সাদা কাগজের গুচ্ছ খাতা এল। সিধু কানুর মতো সাঁওতাল স্পষ্টতই ঘোষণা করল : "এ আমাদের দেশ। আমরা রাজা।" লক্ষ করার বিষয় 'আমাদের দেশ' এই শব্দসমষ্টির প্রয়োগ অভিনব, তখনও আমাদের জাতীয়তাবাদী নেতাদের কণ্ঠে এ উচ্চারণ ধ্বনিত হয়নি। সিধু ও কানুর প্রদত্ত এই বাণী প্রচারিত হল চতুর্দিকে—"তাদের ঘোড়সওয়ার ভাগনাডিহির ধারে জঙ্গলের ভিতর দিয়ে গ্রামের পথে গেল, তাদের ডোমন কুর্তা পরে পাগড়ি বেঁধে, টাঙি বলুয়া কাঁড় ধনুক নিয়ে দীর্ঘ পদক্ষেপে নারাণপুর হয়ে ছুটে গেল, তাদের ভোলা মাঝি মাঝখানের অঞ্চল দিয়ে বাঁশলই নদীর কিনারা দিয়ে পশ্চিমমুখে ছুটে গেল। পাঁচকোঠিয়ার অশ্বত্থগাছের নীচে রাখালি মায়ের থানের সামনে থেকে তাদের হুল শুরু হল, তারা ধিতাং ধিতাং ধিতাং ধিতাং মাদল বাজিয়ে বারহেটের বাজার লুণ্ঠন করতে শুরু করল। তারা সিধু আর কানুকে শুভোবাবু ঘোষণা করে এবং বলে "কোন সাঁওতাল খাজনা দেবে না কোন জমিদারকে। কোন হুকুম মানবে না 'কমনি'-র (কোম্পানির)। লুঠ কর বাজার। কাট দিকুদের জ্বালিয়ে দাও বাড়িঘর, বরবাদ করে দাও সরকারী থানা— লুঠ কর নীলকুঠি রেশমকুঠি।" বারহেট থেকে লীলাতেড়, ভাকেতা, লাহেড়িয়া, হাগামা প্রভৃতি নানা স্থানের মধ্য দিয়ে দেশজুড়ে সাঁওতাল হাঙ্গামা শুরু হল। মহাজনদের একটি একটি করে তারা আঙুল কাটত, জমিদারদের তারা চারদিক থেকে তীর মেরে বিঁধে ফেলত, সুদখোর বামুনদের গুরু ঠাকুরকে দেখিয়ে হত্যা করত এবং তারা প্রতিহিংসারপরায়ণ হয়ে নীলকুঠি লুণ্ঠন করত। এইভাবেই তারা সাহেবগঞ্জ থেকে ময়ূরাক্ষীর তীর পর্যন্ত নিজদেশ বলে ঘোষণা করেছিল। বাউড়ি, বাগদি, ডোম, ধোপা প্রভৃতি তথাকথিত নিম্নজাতিভুক্ত মানুষগুলিকে কিছু করত না, কামারেরা তীরের ফলা জোগাত বলে তাদেরও কিছু করত না। তাদের অধিকৃত অঞ্চল থেকে ব্রাহ্মণ-কায়স্থ-বৈদ্য-সদগোপ জাতির ভদ্রলোকেরা প্রাণভয়ে চলে গিয়েছিল। সিধু-কানুর বেপরোয়া হুকুমে বিদ্রোহীরা অত্যাচারী পুরুষকে হত্যা করেছে, কিন্তু নারীদের কিছু করেনি। পথের দুধারে সাঁওতাল মেয়েরা ভিড় করে

দাঁড়ালে যুবতী সুঠাম দেহের সাঁওতাল রমণীকে রুকনি শুভো বাবুদের পালকিতে তুলে দিত, তাদের শুভোবাবুরা কপালে দিত সিঁদুর। তারা বাজার থেকে ধান, টাকা, বস্ত্র, সোনার অলংকার, তীর-ধনুক-টাঙি প্রভৃতি অস্ত্র লুঠ করত, নিজেদের কাছে রাখত ; কিন্তু বন্দুক কিংবা কার্টিজ-বারুদ নিত না, কেন না তার প্রয়োগ ও ব্যবহার সম্পর্কে জ্ঞাত ছিল না তারা। অরণ্য সন্তান সাঁওতালরা প্রকৃতিকে পাঠ করতে পারত। তাই তারা বুঝেছিল বর্ষা আসন্ন, কিন্তু ইংরেজ ফৌজরা তা বোঝেনি, পিয়ালপুড়ের পাহাড়ের লড়াইয়ে তারা তাই একরকম ভেসে গিয়েছিল। তারা বোঙ্গার পুজো দিত, মোরগ বলি দিত, বুক চিরে রক্ত দিত হোমের আগুনের সামনে আর বোঙ্গাকে 'দোয়া' করার কথা বলত। তারা ভৈরবী মায়ের কাছে শুনেছিল দুর্গাপুজোয় রাম রাবণকে বধ করেছিল। সেই মতো তারাও দুর্গাপুজো করেছিল। নয়ন পালের পিতামহ গড়েছিলেন ঠাকুর, ত্রিভুবন ভট্টাচার্য করেছিলেন পুজো। পুরোহিত ব্রাহ্মণ ত্রিভুবন ভট্টাচার্য ইংরেজদের সুনিশ্চিত জয়ের কথা বলেছিলেন, তারাও বিজয়া দশমীর পুজো শেষ ক'রে সানন্দে পিয়ালপুরের পাহাড়ে ফিরে গিয়েছিল। তার কয়েকদিন পরে ইংরেজদের সঙ্গে তাদের যে যুদ্ধ হয়েছিল, সে যুদ্ধে পরাস্ত হয়েছিল সিধু কানুর দল। সেই পরাজয় সম্পর্কে নয়ন পাল ত্রিভুবন ভট্টাচার্যের অভিমতের সঙ্গে সহমত পোষণ করেছে : "মিছা হায় মন্ত্রতন্ত্র কিছু নাই"। কিন্তু ঔপন্যাসিকের যথার্থ যুক্তি বাদী ঐতিহাসিকের মতো সিদ্ধান্ত : "কি করে পালকে আমি বোঝাব। সংগ্রামপুরের যুদ্ধের পরাজয়— ইংরেজ ফৌজের জয় শুধু বুদ্ধির চাতুর্যে আর বন্দুকের শক্তিতে। সাঁওতালরা হারলে অন্ধবিশ্বাস আর কৌশলের অভাবে। ওদের বিশ্বাস ছিল দেবতার বর ওরা পেয়েছে। ওরা জিতবে। কানু সিধু বিজয়ার দিন বলেছিল— গুলিইবার আর আমাদের গায়ে বিঁধবে না।"

ভারতবর্ষের জাতীয়তাবাদী ইতিহাসে শিক্ষিত মধ্যবিত্ত ও উচ্চবিত্ত শ্রেণির তথা উচ্চবর্গীয়দের আন্দোলনকে যে মর্যাদায় ভূষিত করা হয়েছে, কৃষক-শ্রমিক-নিম্নবর্গীয়দের জেহাদ কিংবা আন্দোলনকে যথার্থ দৃষ্টিকোণ থেকে তেমন গুরুত্ব দেওয়া হয়নি। তারাশঙ্কর অপরাপর নানা লেখার মধ্যে সাঁওতালদের অভ্যুত্থানকে দেখিয়েছেন, সেখানে কোনও কোনও ক্ষেত্রে শিক্ষিত মধ্যবিত্ত শ্রেণির কোনো সহৃদয় নেতার নেতৃত্বে তারা বিদ্রোহ করেছে। কিন্তু *অরণ্য বহ্নি* উপন্যাসে সাঁওতালদের হুলে নেতৃত্ব দিয়েছে সিধু-কানুর মতো ঔপনিবেশিক শিক্ষার স্পর্শ রহিত সাঁওতাল। তারা মারংবোঙ্গার ইশারায় আন্দোলনে নেমেছে আবার দেবতার আশীর্বাদে তাদের জয় সুনিশ্চিত জেনেছে, অথচ বাস্তবে পরাজিত হয়েছে। তারাশঙ্কর যথার্থ বীক্ষায় এ আন্দোলনের স্বরূপকে চিহ্নিত করেছেন। এ বীক্ষা ঔপনিবেশিক শক্তির ঐতিহাসিকদের তাচ্ছিল্যব্যঞ্জক দৃষ্টি নয়, আবার এদেশের জাতীয়তাবাদী ঐতিহাসিকদের কৃপা-দাক্ষিণ্যপুষ্ট দৃষ্টিও নয়। উপন্যাসে স্বরের নানা অবস্থান তাই লক্ষ করার মতো। তিনি একদিকে ইংরেজ ঐতিহাসিক হান্টারের ইতিহাসকথার উল্লেখ করেন, অন্যদিকে উনবিংশ শতাব্দীর ঔপনিবেশিক শিক্ষায় শিক্ষিত মানুষের বক্তব্যের বাহক সংবাদপ্রভাকর পত্রিকার বক্তব্যকে উপস্থাপিত করেন। আবার তাদের সমান্তরালে বাংলার লোককথার পটচিত্রের মধ্যে লুক্কায়িত ইতিহাসের মূল বাণীটিকে উদ্ধার করেন। তিনি সাঁওতালদের দ্রোহ সম্পর্কে পিসিমার কাছে শোনা কথাকে বলেন, গ্রামের লোকদের অন্তরে প্রোথিত বিশ্বাসকে তুলে ধরেন, ত্রিভুবন ভট্টাচার্যের পাঁচালীর উল্লেখ করেন, আবার নয়ন পালের পটকথার ছবি ও ব্যাখ্যাকে উপস্থাপিত করেন। তাই, ঔপনিবেশিক শিক্ষায় শিক্ষিত 'আমি', বাংলার বহু শতাব্দীর পুরাতন ঐতিহ্য সম্পর্কে সচেতন 'আমি' যেন নিজ অস্তিত্বটিকে পরখ করেন। ইতিহাসকথার আধিপত্য ও দাপট সম্পর্কে সেই 'আমি'

অবহিত, যুগ-যুগ ধরে গ্র্যান্ড ন্যারেটিভের দাপটে হারিয়ে যাওয়া মাইক্রোন্যারেটিভের উদ্ধারের জন্য তিনি নয়ন পালের দ্বারস্থ হন। নয়ন পাল নিম্নবর্গীয়দের উত্থান প্রসঙ্গে মুকুন্দের *অভয়ামঙ্গল*-এর ব্যাধখণ্ডের মূল চরিত্র কালকেতু-ফুল্লরার কথা বলেন, মঙ্গলকাব্যের মতো কাব্য লেখার কথা বলেন। অর্থাৎ, এ বাংলার নিজস্ব আঙ্গিকের পুনঃ পুনঃ স্মরণের মধ্য দিয়ে তারাশঙ্কর উপন্যাসের দেশজ আদলটিকেই ফিরিয়ে আনেন। আবার, দাপুটে ইতিহাসকথার প্রতিস্পর্ধী মাইক্রোন্যারেটিভের নির্মাণে তিনি আধুনিক খণ্ডিত কালটিকেও কখনোই ভুলে যান না। তাই, অরণ্যসন্তান সাঁওতালরা যে বিশ্বাসে বিশ্বাসী, মধ্যযুগের পাঁচালীর আদলে এ কালের পাঁচালী নির্মাণে প্রয়াসী ত্রিভুবন ভট্টাচার্য যে বিশ্বাসে বিশ্বাসী, গ্রামের পটকথা বিশ্লেষণে সচেষ্ট নয়ন পাল যে বিশ্বাসে বিশ্বাসী তাতে আস্থা স্থাপন করতে পারেন না আধুনিক কালের ঔপন্যাসিক কিংবা এ কালের উপন্যাসের কথক। এই খণ্ডিত কালে তিনি প্রতিনিয়ত আদর্শের মুখ থুবড়ে পড়াকেই দেখেন, উপন্যাসেও তাই বাস্তব আর স্বপ্নের জগতের ব্যবধানকেই দেখান। উপন্যাসের 'আমি'-র তাই বারে বারে অবস্থান বদল ঘটে— তিনি উনিশ শতকের যুক্তিবাদের জগতে তথা বিজ্ঞানবাদী আধুনিকতার জগতে ফিরে যান, আবার যুক্তিবাদের অন্তঃসারশূন্যতায় হতাশ হয়ে লোককথার জগতের বাসিন্দা নয়ন পালের দ্বারস্থ হন। আসলে, তারাশঙ্কর যে কালে এ উপন্যাস লিখেছিলেন, সেই বিশ শতকের ষাটের দশকের শূন্যগর্ভ কালের শরিক ঔপন্যাসিক নিজ সময়ের পৌনঃপুনিক প্রয়োগের মধ্য দিয়ে নিম্নবর্গীয় কথার যথার্থ নির্মাণ সম্পূর্ণ করেন। সাবল্টার্ন সম্পর্কিত চর্চার আলোড়ন সৃষ্টির পূর্বেই এ উপন্যাসের নির্মাণ তাই বাংলা উপন্যাসের জগতে বীক্ষাগত দিক দিয়ে এক নতুন দিশা দেয়।

সূত্রনির্দেশ :

১। *নিম্নবর্গের ইতিহাস*, সম্পাদনা— গৌতম ভদ্র ও পার্থ চট্টোপাধ্যায়, আনন্দ, ১৯৯৮ এবং *Subaltern Studies*, Oxford University Press প্রকাশিত বিভিন্ন খণ্ডগুলি পড়ে উপকৃত হয়েছিল এই অংশটি লেখার সময়।

২। *Key Concepts in Post-colonial Studies*, Bill Ashcraft, Gareth Griffiths, Helen Tiffin, Routledge, 1998, Page–216.

৩। *নিম্নবর্গের ইতিহাস*, রণজিৎ গুহ, পৃ. ৩২, তদেব-১।

৪। 'অরণ্যবহ্নি' উপন্যাসসংক্রান্ত উদ্ধৃতিগুলি *রচনাবলী, তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায়*, অষ্টাদশ খণ্ড, মিত্র ও ঘোষ পাবলিশার্স প্রা. লি., ভাদ্র, ১৩৮৭ (বঙ্গাব্দ) থেকে গৃহীত।

ঔপনিবেশিকতাবাদ ও উত্তর-ঔপনিবেশিকতাবাদ

হিমাদ্রি লাহিড়ী

বর্তমানে সাহিত্য সমালোচনায় ঔপনিবেশিকতাবাদ ও উত্তর-ঔপনিবেশিকতাবাদ একটি বড় পরিসর দখল করে আছে। শুধুমাত্র সাহিত্যচর্চাতেই নয়, মানববিদ্যার নানা শাখায় এর আবেদন উল্লেখযোগ্য। গত পাঁচ-ছয় দশক ধরে, বিশ্বের প্রেক্ষাপটে যে রাজনৈতিক-অর্থনৈতিক পটপরিবর্তন চলেছে, তার প্রভাব আমাদের চিন্তাভাবনায় পড়বে, তাতে আশ্চর্য হওয়ার কিছু নেই। ইউরোপীয় সাম্রাজ্যের বিলোপসাধনের সঙ্গে সঙ্গে ঔপনিবেশিকতাবাদ রাজনৈতিকভাবে দুর্বল হয়ে পড়তে পারে, কিন্তু আমাদের মানসজগতে এর প্রভাব বিলীন হয়ে গেছে তা ভাবলে ভুল হবে। কারণ ঔপনিবেশিক মনস্তত্ত্ব অত্যন্ত জটিল প্রক্রিয়া, উপনিবেশ চলে যাওয়ার পরেও অধীনস্থ ব্যক্তিমানসে তার প্রভাব সূক্ষ্মভাবে বিরাজ করতে থাকে। এডোয়ার্ড সাইদ্ (Edward Said) *Culture and Imperialism* গ্রন্থে তা-ই বলেছেন, ক্লাসিকাল সাম্রাজ্যবাদ, যা এরিক 'হব্সবম-কথিত' 'সাম্রাজ্যের যুগে' ('age of empire') পরিণতি পেয়েছিল ও দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধোত্তর ঔপনিবেশিক কাঠামোর ভাঙনের মাধ্যমে যা অবসিত হয়েছিল, তা বর্তমান সময়ের উপরও কোনো-না-কোনোভাবে প্রভাব ফেলেছে (পৃ. ৬)। সময় পরিবর্তনের পরিপ্রেক্ষিতে 'সাম্রাজ্যের' প্রভাবের প্রকারভেদ পরিলক্ষিত হয়। যে কারণে সাহিত্যের ছাত্রছাত্রীদের কাছে ঔপনিবেশিকতাবাদ (Colonialism), উত্তর-ঔপনিবেশিকতাবাদ (Post-Colonialism), বি-উপনিবেশীকরণ (de-colonisation) ও নয়া ঔপনিবেশিকতাবাদের (neo-colonialism) সংজ্ঞা ও তাদের পারস্পরিক সম্পর্কের বিষয়গুলিও আগ্রহ সৃষ্টি করে।

বর্তমান আলোচনায় উপরে উল্লেখ করা অভিধাগুলির বিষয়ে স্বল্প পরিসরে ব্যাখ্যা করার চেষ্টা করব। যে ঐতিহাসিক অবস্থার ভিতর দিয়ে ঔপনিবেশিকতাবাদ ও উত্তর-ঔপনিবেশিকতাবাদের উদ্ভব ও বিকাশ সাধিত হয়েছিল তা যেমন আমরা আলোচনা করব, তেমনি আলোচনা করব এর তত্ত্বগতদিকটিরও। শুরু করব ঔপনিবেশিকতাবাদ দিয়ে।

পঞ্চদশ শতক থেকে ইউরোপীয় দেশসমূহের সাম্রাজ্য বিস্তারের যুগ শুরু হয়। শুরু হয় অধীনস্থ দেশগুলির অর্থনৈতিক ও সাংস্কৃতিক শোষণ। রেনেসাঁস পরবর্তী-যুগে আধুনিক পুঁজিবাদী অর্থনৈতিক বিনিময়-প্রথা উন্নত হতে থাকে, যার অনিবার্য প্রভাবে উপনিবেশ স্থাপন প্রাধান্য পেতে থাকে। উপনিবেশগুলি ছিল কাঁচামালের যোগানদার, তাই উপনিবেশ স্থাপন ঔপনিবেশিক শক্তির অর্থনৈতিক বিস্তারের সঙ্গে ওতপ্রোতভাবে যুক্ত ছিল। ঔপনিবেশিক শক্তি ও উপনিবেশের মধ্যে অসমান আর্থ-সামাজিক ও সাংস্কৃতিক সম্পর্ক বিদ্যমান ছিল (Ashcroft, *Key Concepts* ৪৬)। এই অবস্থা পঞ্চদশ শতাব্দীর আগের উপনিবেশ স্থাপনের প্রচেষ্টার মধ্যে দেখা যায় নি। সেই জন্য 'ঔপনিবেশিকতাবাদ' কথাটি পঞ্চদশ শতাব্দী ও তার পরবর্তী প্রচেষ্টাগুলির ক্ষেত্রেই ব্যবহৃত হতে দেখা যায়।

এডোয়ার্ড সাইদ্ তাঁর *Culture and Imperialism* গ্রন্থে সাম্রাজ্যবাদ ও ঔপনিবেশিকতাবাদের সম্পর্ক বিশ্লেষণ করেছেন। তিনি বলেছেন :

> As I shall be using the term, 'imperialism' means the practice, the theory, and the attitudes of a dominating metropolitan centre ruling a distant territory ; 'colonialism', which is almost always, a consequence of imperialism, is the implanting of settlements on distant territory..... In our time, direct colonialism has largely ended, imperialism ... lingers where it has always been, in a kind of general cultural sphere as well as in specific political, ideological, economic, and social practices.[৮]

সাম্রাজ্যবাদকে সাইদ্ মূলত তত্ত্ব, মতাদর্শ (ideology) ও দৃষ্টিভঙ্গির পর্যায়ে রেখেছেন, এর দ্বারা চালিত হয়ে সাম্রাজ্যবাদী শক্তি দূরবর্তী দেশে উপনিবেশ (colony) স্থাপনে উদ্যোগী হয়। ঔপনিবেশিকতাবাদ তাই সাম্রাজ্যবাদের ফলস্বরূপ, দূরদেশে বসতিস্থাপন যার উদ্দেশ্য। বর্তমানে প্রত্যক্ষ ঔপনিবেশিকতা মৃতপ্রায় হলেও সাম্রাজ্যবাদের ছায়া আগের মতোই প্রাক্তন উপনিবেশগুলির উপর পড়ছে। তাই ঔপনিবেশবাদকে সাম্রাজ্যবাদের অবিচ্ছেদ্য অংশ হিসেবেই দেখা হয়।

জন ম্যাকলিয়ড John McLeod-ও সাম্রাজ্যবাদকে 'মতাদর্শগত ভাবনা' ('ideological concept') হিসাবে দেখেছেন। এই ভাবনা এক দেশের উপর আর এক দেশের অর্থনৈতিক ও সামরিক কর্তৃত্বকে গ্রহণযোগ্যতা দেয়। তাঁর মতে, ঔপনিবেশিকতা সাম্রাজ্যবাদের মতাদর্শ থেকে উদ্ভুত, এবং তার 'ব্যবহারের একটি রূপ' ('one form of practice') মাত্র। এর উদ্দেশ্য, নতুন বসতিস্থাপন (৭)। সাম্রাজ্যবাদ যেভাবে বসতিস্থাপনের মাধ্যমে তার কাজ করে, সেই সম্পর্কিত ঐতিহাসিক অভিজ্ঞতাই ঔপনিবেশিকতাবাদ। কিন্তু ঔপনিবেশিকতাবাদ যেহেতু সাম্রাজ্যবাদের একমাত্র রূপ নয়, সেহেতু সাম্রাজ্যবাদ অন্যরূপেও কাজ করে যেতে পারে। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের মতো দেশ যেমন অর্থনৈতিক আগ্রাসনের মাধ্যমে সম্পদ ও ক্ষমতা বিস্তার করে যাচ্ছে বিশ্বের বিভিন্ন প্রান্তে।

নৈতিক দায়িত্ব ও ডিসকোর্সের (discourse) মাধ্যমে তাই সাম্রাজ্যবাদ ও ঔপনিবেশিকতাবাদের পুঁজিবাদী পরিচয় গোপন করার চেষ্টা করা হয়। ঔপনিবেশিত (colonised) মানুষজন সম্পর্কে নানান স্টিরিওটাইপ (stereotype) চালু করা হয়। পৃথিবীকে 'west' ও 'rest'-এ বিভক্ত করে তাদের মেরুকরণ (binary) করা হয়। পাশ্চাত্য (Occident) উন্নত, প্রাচ্য (Orient) অনুন্নত— এই মতাদর্শ সৃষ্টির জন্য চালু করা হয় নানান

ডিসকোর্স। প্রাচ্যের লোকেরা নিকৃষ্ট, বর্বর, শিশুসুলভ, নারীসুলভ, নিজেদের ভালমন্দ দেখাশুনায় অপারগ— এইরকম নানা স্টিরিওটাইপ তৈরি করা হয় ঔপনিবেশিত জনগণ সম্পর্কে। তৈরি করা হয় তত্ত্ব (theory), তাকে দেওয়া হয় বৈজ্ঞানিক সত্যের মর্যাদা। নৃতাত্ত্বিক সত্য গঠন করে আর এক 'সত্য' প্রতিষ্ঠা করা হয়— যেহেতু প্রাচ্যের মানুষ নিজেদের দেখাশুনায় অক্ষম, সেহেতু দরকার শ্বেতাঙ্গ মানুষের। উন্নত পাশ্চাত্যের মানুষের দায়িত্ব, অনুন্নত প্রাচ্যের মানুষকে 'মানুষ' করা, লালন-পালন করা, সভ্যের পর্যায়ে উন্নীত করা। এই নৃতাত্ত্বিক পৃথকীকরণের ভিত্তিমূল হল জাতিতত্ত্ব (race theory)। এইভাবেই পশ্চিম/অ-পশ্চিমের 'দ্বন্দ্ব'-কে ঔপনিবেশিকতাবাদ দাঁড় করিয়ে দেয় শ্বেতকায়/অশ্বেতকায় মানুষের বিভেদের কাঠামোর মধ্যে। এই বিভেদ-সৃষ্টির মাধ্যমেই সৃষ্টি করা হয় 'অপরের' ('other')। প্রাচ্যের মানুষের অপরায়নের ('otherisation') মাধ্যমে পশ্চিমি শ্রেষ্ঠত্ব তাত্ত্বিকভাবে প্রতিষ্ঠিত হয়, 'অপর'কে শাসন করার জমি প্রস্তুত করা হয়। 'অপর' জনতার কাছে সভ্যতার বাণী পৌঁছে দেওয়ার অজুহাত তৈরি করা হয়। অনেক ক্ষেত্রে ধর্মের মুখোশে প্রবেশ ঘটে উপনিবেশকারীর, ধর্মের মুখোশই হয়ে দাঁড়ায় 'বিজয়ের মুখোশ' ('mask of conquest'), কখনও-বা 'বণিকের মানদণ্ড', শেষ পর্যন্ত দেখা দেয় 'রাজদণ্ড' রূপে। কিপলিং (Rudyard Kipling)-এর বিখ্যাত উক্তি 'Take up the White Man's Burden' এই মতাদর্শের আয়নায় দেখতে হবে।

ঔপনিবেশিক শাসন-শোষণের ভিতর থেকে গড়ে ওঠে প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষ প্রতিরোধ। উনবিংশ শতাব্দীর শেষ থেকে তা রাজনৈতিকভাবে সুসংগঠিত হতে থাকে। এশিয়া, আফ্রিকা, লাতিন আমেরিকায় ঔপনিবেশিত শক্তির বিরুদ্ধে প্রতিরোধ দানা বাঁধে। বিংশ শতাব্দীর দ্বিতীয় অর্ধে উপনিবেশগুলি স্বাধীনতা অর্জন করতে থাকে। উত্তর-ঔপনিবেশিক পর্যায় শুরু হয়।

প্রথম দিকে, দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধোত্তর সময়ে, 'উত্তর-ঔপনিবেশিকতাবাদ' ('post-colonial-ism') কথাটি ছিল কালসূচক; উপনিবেশ চলে যাওয়ার, তার ঐতিহাসিকঅবস্থা থেকে মুক্তির অভিজ্ঞতা বোঝাতেই শব্দটি ব্যবহার করা হত। অনেকেই এই কালসূচক অর্থে কথাটির ব্যবহারের বিরুদ্ধাচারণ করেছেন। তাঁদের যুক্তি, উত্তর-ঔপনিবেশিকতার মানসিকতা শুরু হয় উপনিবেশ অবসানের পরিণতিতে নয়, উপনিবেশ স্থাপনের প্রারম্ভেই (Gandhi ৩)। ১৯৭০-এর দশকের শেষের দিকে সমালোচকেরা কথাটি ব্যবহার করতে থাকেন ঔপনিবেশিকতার বহুবিধ সাংস্কৃতিক প্রভাব বোঝাতে। ঔপনিবেশিক পরিস্থিতিতে যে অসাম্য ও অনৈতিকতা থাকে তার বিরুদ্ধাচারণ ও উপনিবেশিত মানুষের নিজস্ব পরিচয় স্থাপনের লড়াই বোঝাতেও কথাটির ব্যবহার দেখা যায়। ঔপনিবেশিকতার রাজনীতির বিরুদ্ধ রাজনীতি হল উত্তর ঔপনিবেশিকতাবাদ। রবার্ট জে. সি. ইয়ং (Robert J. C. Young) তাঁর *Postcolonialism : A Very Short Introduction* গ্রন্থে বলেছেন, "Postcolonialism names a politics and philosophy of activism that contests the disparity, and so continues in a new way the anti-colonial struggles of the past." (8) ইয়ং উত্তর-ঔপনিবেশিকতাবাদকে উপনিবেশমনস্কতাবিরোধী বৈপ্লবিক কার্যকলাপের অংশরূপে দেখেছেন। উত্তর-ঔপনিবেশিকবাদ তাই অসাম্যের রাজনীতির বিরোধী এক শক্তি, এটি একটি সক্রিয় রাজনীতি ও দর্শন। তাঁর মতে, এই রাজনীতি ও দর্শনের যুগোপযোগিতা এখনও অব্যাহত আছে। সাম্প্রতিক ইতিহাসে আফগানিস্তান ও ইরাকের ঘটনাই এর সাক্ষী। ইয়ং ব্যাপক অর্থে কথাটির ব্যবহার করেছেন। উত্তর-ঔপনিবেশিক পৃথিবীর বিভিন্ন স্থানে তাঁর দৃষ্টি পরিভ্রমণ করেছে, তিনি তুলে এনেছেন কিছু কর্কশ ছবি, এগুলিকে রেখেছেন পাশাপাশি। জাতি-বর্ণ-ধর্ম-

লিঙ্গ ইত্যাদি নানা ক্ষেত্রে যেসব বৈষম্য বিরাজ করছে, সেগুলিকে তুলে ধরেছেন এই বই-এ, বিশ্লেষণ করে দেখিয়েছেন ঔপনিবেশিক মানসিকতা আজও কিভাবে প্রকট, কিভাবে ক্ষমতা নানা স্তরে কাজ করে যাচ্ছে। বলেছেন, উত্তর-ঔপনিবেশিকতাবাদের বিষয় হল, সংগ্রামের মাধ্যমে পরিবর্তিত বিশ্ব সম্পর্কিত জ্ঞান আহরণ : "Postcolonialism is about a changing world, a world that has been changed by struggle and which its practitioners intend to change further."(৭)

আমরা এই আলোচনায় মূলত বিংশ শতাব্দীর শেষ অর্ধের বি-উপনিবেশীকরণ সংক্রান্ত চিন্তাভাবনার তাত্ত্বিক দিক বোঝাতে হাইফেন-বিহীন 'উত্তরঔপনিবেশিকতাবাদ' (postcolonialism) কথাটি ব্যবহার করব। একে আন্তর্বিষয়ক বৌদ্ধিক প্রকল্প (interdisciplinary intellectual project) হিসেবে দেখব। এর জন্ম বিশ্ববিদ্যালয় প্রাঙ্গণে। ইতিহাস, রাজনীতি, অর্থনীতি, সমাজতত্ত্ব, মনস্তত্ত্ব, দর্শন, সাহিত্য, ইত্যাদি নানা ক্ষেত্র থেকে নেওয়া বিশ্লেষণের মাধ্যমে উঠে এসেছে উপনিবেশ-উত্তর এই 'বাদ' বা তত্ত্ব। এর আলোচনার কেন্দ্রবিন্দুতে আছে উপনিবেশমনস্কতার দর্শন ও মনস্তত্ত্ব, তার প্রকাশরীতি ও ব্যবহারের নানান ক্ষেত্র, আগ্রাসনের প্রকৃতি ও অজুহাত ইত্যাদি সম্পর্কে বিশ্লেষণ ও এর মতাদর্শের থেকে মুক্তির উপায় সন্ধান। বিশ্লেষণের মাধ্যমে ঔপনিবেশিকতার আকর্ষণ-বিকর্ষণের রহস্য উন্মোচন করে, কিভাবে উপনিবেশকারী উপনিবেশিত মানুষের মধ্যে ভয় ও ভক্তির, শত্রুতা ও প্রীতির সম্পর্ক তৈরি করে তা দেখানো। উত্তরঔপনিবেশিকতাবাদ খোঁজবার চেষ্টা করে, কীভাবে উপনিবেশকারী অধীনস্থর চিন্তাজগৎকে সূক্ষভাবে প্রভাবিত করে, কীভাবে তার 'উন্নত' সংস্কৃতির সুফল সম্পর্কে উপনিবেশিত মানুষকে অবহিত করা হয়। অতীত খনন করে তুলে আনে উপনিবেশকারীর বিরুদ্ধে সংগ্রামের ইতিহাস ও গল্প-কাহিনী। ঔপনিবেশিকতাবাদ যেমন বিস্মৃতির (amnesia) প্রচেষ্টায় রত থাকে, উত্তর ঔপনিবেশিকতাবাদ তেমনি স্মরণের (anamnesic) সংস্কৃতি তৈরি করতে চায়।

উত্তরঔপনিবেশিকতাবাদের প্রবক্তারা দেখিয়েছেন, কিভাবে উপনিবেশিত গোষ্ঠী উপনিবেশকারীর মতাদর্শ আত্মীকরণ করে থাকে। উপনিবেশিত মানুষের মনোভূমি দখল করার লড়াই ঔপনিবেশিকতাবাদের প্রথম লক্ষ্য। দুটি উপায়ে এই জয়ের চেষ্টা করা হয়: উপনিবেশিতর মনে আত্মঘৃণা ও আত্মগ্লানি সৃষ্টি করে ও তার মধ্যে দৃঢ় বিশ্বাস প্রোথিত করা হয়.এই ভাবে যে, উপনিবেশকারীই শ্রেষ্ঠ, তার সংস্কৃতিই উন্নত সংস্কৃতি, সাম্রাজ্যের জগৎ ও ঔপনিবেশিক মতাদর্শই সত্য ও বাস্তব। অধীনস্থ মানুষও এই 'সত্য' আত্মীকরণ করতে থাকে। এই আত্মীকরণের প্রক্রিয়া প্রকৃতপক্ষে ক্ষমতাবিচ্যুতিকরণের (disempowerment) প্রক্রিয়া, আত্মশ্লাঘার প্রক্রিয়া। নিজের গোষ্ঠী, নিজের সংস্কৃতি, নিজস্ব চিন্তা-ভাবনা সবকিছুকেই নেতিবাচক দৃষ্টিতে দেখতে শেখানো হয় (McLeod ১৯)। ফরাসিদেশে জাতিবিদ্বেষের শিকার হবার অভিজ্ঞতা বর্ণনা করে ফানো (Franz Fanon) বলেছেন :

> On that day, completely dislocated, unable to be abroad with the other, the white man, who unmercifully imprisoned me, I took myself far off from my own presence, far indeed, and made myself an object. What else could it be for me but an amputation, an excision, a haemorrhage that spattered my whole body with black blood? But I did not want this revision, this thematisation. All I wanted was to be a man among other men. [McLeod কর্তৃক উদ্ধৃত, ২০]

উক্তিটি ফানোর *Black Skin, White Masks* গ্রন্থ থেকে নেওয়া। শ্বেতাঙ্গের দৃষ্টির (**'white gaze'**) প্রভাবে নিজেকে হেয় করার প্রবণতা, এবং আত্মিক সংকটের উদাহরণ ফানোর বর্ণনায় স্পষ্ট। ব্যক্তি থেকে বস্তুতে পরিণত হওয়ার এই ঘটনা ঔপনিবেশিকতাবাদের ব্যক্তিত্ব ধ্বংসকারী প্রভাবের নির্দেশক। ফানো মনে করেন, ঔপনিবেশিকতাবাদের সমাপ্তির অর্থ শুধুমাত্র রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক পরিবর্তনই নয়, এর অর্থ মানসিক পরিবর্তনও বটে।

ঔপনিবেশিকতাবাদের কু-প্রভাবের আর এক দিক—উপনিবেশকারীর মতাদর্শ আত্মীকরণের দিক—এই নিয়ে আলোচনা করেছেন ত্রিনিদাদীয় লেখক সেলভন (Sam Selvon)। স্মৃতিচারণা করতে গিয়ে ছেলেবেলার এক অভিজ্ঞতার কথা বলেছেন তিনি। Sammy নামক এক ভারতীয় বংশোদ্ভুত মৎসজীবী সেলভনের পাড়ায় আসত। আংশিকভাবে পক্ষাঘাতগ্রস্ত ছিল সে। ছেলেমেয়েরা তার পেছনে লাগত, তাকে উত্তক্ত করত। একদিন Sammy সঙ্গে নিয়ে আসে এক শ্বেতাঙ্গ সহকারীকে। সে সম্ভবত জেলপালানো আসামী ছিল। সেলভন এই ঘটনায় Sammy-র উপর খুব ক্ষুব্ধ হয়েছিল, কারণ তার ধারণায় শ্বেতাঙ্গ সর্বদাই কর্তৃত্বে থাকবে, অধস্তন অবস্থায় কখনই নয়। ছেলেবেলার এই স্মৃতি বর্ণনার মাধ্যমে বোঝাতে চেয়েছেন কিভাবে অল্পবয়সেই উপনিবেশকারীর মতাদর্শ তিনি অবচেতনে আত্মস্থ করেছিলেন:

> When one talks of colonial indoctrination, it is usually about oppression or subjugation...But this gut feeling I had as a child, that the Indian was just a piece of cane trash while the white man was to be honoured and respected—where had it come from? I don't consciously remember being brain-washed to hold this view either at home or at school. [McLeod কর্তৃক উদ্ধৃত, পৃ. ১৭]

এইভাবেই 'দৃষ্টি' (gaze) তৈরি করে দেয় ঔপনিবেশিকতাবাদ, আর কিভাবে নিঃশব্দে তা তৈরি করা হয় সেটাই চোখে আঙুল দিয়ে দেখায় উত্তরঔপনিবেশিকতাবাদ।

আর এই চোখে আঙুল দিয়ে দেখানোর ব্যাপারটা এডোয়ার্ড সাইদ্ *Orientalism* গ্রন্থে সুন্দরভাবে ব্যাখ্যা করেছেন। সাইদ্ ইটালিয়ান বুদ্ধিজীবী আন্তনিও গ্রামসি (Antonio Gramsci) ও ফরাসি লেখক মিশেল ফুকোর (Michel Foucault) চিন্তাভাবনার দ্বারা প্রভাবিত হয়েছিলেন। তিনি 'রিপ্রেজেনটেশনের' (representation) ক্ষমতার কথা বলেছেন, যার মাধ্যমে বাস্তবকে নির্দিষ্টভাবে দেখার চোখ তৈরি করে দেওয়া হয়। প্রাচ্যদেশ সংক্রান্ত জ্ঞান আহরণ, মতামত গঠন ও তার প্রচারের উদ্দেশ্যে পশ্চিমি দুনিয়া প্রাচ্যবাদের পঠনপাঠন শুরু করে, এবং এই বিদ্যার বিকাশ সাধনে যত্নবান হয়। পশ্চিমি বিদ্যাপ্রতিষ্ঠানের চৌহদ্দি থেকে এর জন্ম। প্রাচ্যবাদ প্রাতিষ্ঠানিক জ্ঞানের স্বীকৃতি পায়। এই জ্ঞান আহরণ ও তার গঠন ক্ষমতা অর্জনের জন্য ব্যবহার করা হয়। অধীনস্থ মানুষকে স্টিরিওটাইপ করা হয়, এবং তারাও সংগঠিত এই জ্ঞান আত্মীকরণ করে। প্রাচ্যবাদ ও ঔপনিবেশিকতাবাদের ক্ষেত্রে নতুন জ্ঞান উৎপাদনের এক বিশেষ ভূমিকা আছে।

ফানো ও সাইদের প্রভাবশালী লেখা ১৯৮০-র দশক ও তার পরবর্তীকালে জন্ম দেয় বেশ কয়েকজন বিশিষ্ট সমালোচকের। তাঁরা পূর্বসূরীদের কাজকে আরও গভীরে নিয়ে যান এবং উত্তরঔপনিবেশিকতাবাদের দৃষ্টিকোণ থেকে অন্যান্য অনেক দিক উন্মোচন করেন। এঁদের অনেকের লেখা তাত্ত্বিক ও আন্তর্বিষয়ক। এঁরা 'রিপ্রেজেনটেশনের' উপর গুরুত্ব স্থাপন

করেছেন। সাইদ্ দেখিয়েছেন কিভাবে রিপ্রেজেনটেশনের মাধ্যমে প্রাচ্যের নিকৃষ্টতা সৃষ্টি করেছিল পশ্চিমি দুনিয়া। হোমি ভাবা (Homi Bhabha) ও গায়েত্রী চক্রবর্তী স্পিভাকের (Gayatri Chakraborty Spivak) মতো সমালোচকেরা দেখিয়েছেন এই রিপ্রেজেনটেশনের মধ্যে টেনশনের (tension) দিকগুলি। ঔপনিবেশিক ভাবনাকে ভাবা বহুমাত্রিক, বিভক্তি ও অস্থির বলে ব্যাখ্যা করেছেন। তিনি যেমন 'অনুকৃতি'র ('Mimicry') কথা উল্লেখ করেছেন। উপনিবেশকারী তাকে অনুকরণ করার আদর্শ উপনিবেশিত মানুষের সামনে রাখে, কিন্তু সেই অনুকরণ কখনোই সঠিক হয় না। বরঞ্চ তা বিপজ্জনক হতে পারে। 'অনুকৃতি' ('Mimicry') কথাটির মাধ্যমে অসম্পূর্ণতা ও অস্থিরতার দিকটা তুলে ধরেছেন ভাবা। শব্দটির মধ্যে ব্যঙ্গ -বিদ্রুপ-শ্লেষের বোধ পুরোমাত্রায় বর্তমান। উপনিবেশিত মানুষকে নিয়ন্ত্রণ করার ব্যর্থতার দিকটি আছে। অনুকরণ হয় 'প্রায় একরকম, কিন্তু সম্পূর্ণ একরকম নয়' ('almost the same, but not quite'), বলেছেন ভাবা (পৃ. ৮৬)। 'অনুকৃতি' তাই যেমন একদিকে মিল, সামঞ্জস্য, অন্যদিকে তেমনি গরমিল, সংকট। 'অনুকৃতি'র, মধ্যে প্রত্যক্ষ প্রতিরোধ নেই, কিন্তু লুকোনো বিপদ আছে, যা সামঞ্জস্যের আড়াল থেকে উপনিবেশকারীর নিয়ন্ত্রণ ক্ষমতাকে নাড়িয়ে দিতে পারে। স্পিভাকও একইভাবে রিপ্রেজেনটেশনের অন্য অসম্পূর্ণতা দেখিয়েছেন। ব্যক্তির নিজের পরিস্থিতি, তার নিজের ধর্ম, বর্ণ, লিঙ্গ, শ্রেণীগত অবস্থান তার লেখাকে প্রভাবিত করে। অন্যশ্রেণী, বর্ণ বা লিঙ্গের ব্যক্তিকে তিনি কতখানি 'রিপ্রেজেন্ট' করতে পারেন? প্রশ্ন তুলেছেন স্পিভাক। 'Can the Subaltern Speak?' প্রবন্ধে তিনি বলেছেন, এমনকি শিক্ষাপ্রাঙ্গণের লিবারাল নারীবাদও 'স্বদেশী নারী'-কে ('native woman') রিপ্রেজেন্ট করতে গিয়ে তার কণ্ঠস্বর হরণ করে নিচ্ছে। স্পিভাকের ভাষায় :

> Between patriarchy and imperialism, subject-construction and object formation, the figure of the woman disappears, not into pristine nothingness, but a violent shuttling which is displaced figuration of the 'third-world woman' caught between tradition and modernisation. [৩০৬]

তৃতীয় বিশ্বের এই মহিলাকে আমরা কথা বলতে শুনি না, সে এক মাধ্যমমাত্র। নানান ভাবনা তার মাধ্যমে প্রতিভাত হয়, অথচ সে নিজে লেখায় নিশ্চুপ থেকে যায়। "Three Women's Texts and a Critique of Imperialism" প্রবন্ধে তিনি শার্লট্ ব্রন্টির (Charlotte Bronte) *Jane Eyre* উপন্যাসটি বিশ্লেষণ করে দেখিয়েছেন কিভাবে রিপ্রেজেনটেশন 'অপর'-কে প্রান্তিক অবস্থানে পাঠাতে পারে উপন্যাসের পরিধির মধ্যেও। এই উপন্যাসের নায়িকা শ্বেতাঙ্গ ব্রিটিশ জেন, আত্মনিয়ন্ত্রণ ও ব্যক্তিস্বতন্ত্রতার মাধ্যমে নায়ক রচেস্টারের সঙ্গে তার সম্পর্ক সম্পূর্ণতা পায়। স্পিভাক্ দেখিয়েছেন, উপন্যাসে নায়িকার এই উত্তরণ সম্ভব হয়েছে রচেস্টারের প্রথমা স্ত্রী বার্থার প্রান্তিকতার মাধ্যমে। বার্থাই হচ্ছে "the mad woman in the attic', জামাইকার এই ক্রিয়ল (creole) মহিলাকে জেন অ্যাটিকে বদ্ধ অবস্থায় দেখে, প্রথম দর্শনে পশুসদৃশ মনে হয় তাকে। উপন্যাসে তাকে মানবসত্তা দেওয়া হয় নি, তাঁর কোনো কণ্ঠস্বর শোনা যায় না, তার ভয়ংকর হাসি তাকে অস্বাভাবিকতার পর্যায়ে রাখে। উপন্যাসে প্রকৃতপক্ষেই বার্থা এক 'অপর'। এক্ষেত্রে উল্লেখযোগ্য, রীজ্ (Jean Rhys) তাঁর *Wide Sargasso Sea* নামক উপন্যাসে এই ক্রিয়ল মহিলাকে প্রান্তিক অবস্থান থেকে কেন্দ্রবিন্দুতে নিয়ে এসেছেন, তাকে ব্যক্তিসত্তা প্রদান করেছেন।

এইভাবে উত্তরঔপনিবেশিক পাঠের মাধ্যমে স্বীকৃত সাহিত্যকর্মগুলির পুনর্মূল্যায়ন করা হয়েছে। দেখার চেষ্টা করা হয়েছে, লেখকেরা কতখানি ঔপনিবেশিক চিন্তাভাবনা দ্বারা চালিত হয়েছেন। যোশেফ কনরাডের উপন্যাস *Heart of Darkness* এই সূত্রে বহুপঠিত। কনরাডের এই উপন্যাসে অনেকে যেমন উপনিবেশ বিরোধিতার দিক দেখিয়েছেন, অন্যান্যরা তেমনি দেখিয়েছেন কীভাবে কনরাড নিজেই ঔপনিবেশিক প্রকল্পের মধ্যে জড়িয়ে গেছেন, ঔপনিবেশিক মতাদর্শ কীভাবে তার লেখার মধ্যে প্রভাব ফেলেছে। চিনুয়া আচিবের (Chinua Achebe) প্রবন্ধ 'Images of Africa' এ-প্রসঙ্গে উল্লেখযোগ্য। এখানে আচিবে বলেছেন, কনরাডের রিপ্রেজেনটেশনে আফ্রিকাবাসী মূক, কণ্ঠস্বরবিহীন, বর্বর। সভ্যতা তাকে ছোঁয় নি। কনরাডের উপন্যাসটিকে তাই কঠোরভাষায় তিনি সমালোচনা করেছেন।

The Empire Writes Back : Theory and Practices in Post-colonial Literatures (1989) গ্রন্থটির উল্লেখ করে এই আলোচনা সমাপ্ত করব। বইটি লিখেছিলেন বিল অ্যাশক্রফট্ (Bill Ashcroft), গ্যারেথ গ্রিফথ্স (Gareth Griffiths) এবং হেলেন টিফিন (Helen Tiffin)। 'Writing back' বা প্রত্যুত্তর দেওয়ার তত্ত্বের উপর নির্ভর করে এই বইটি লেখা হয়। 'কমনওয়েলথ সাহিত্য'র ধারণা থেকে সরে এসে উত্তরঔপনিবেশিকতাবাদের ধারণাকে এখানে গুরুত্ব দেওয়া হয়েছে। আঞ্চলিকভাবে ইংরেজিতে লেখা সাহিত্য যেখানে গড়ে উঠেছে, সেখানে আঞ্চলিকতার প্রভাবই মুখ্য, ইংরেজি বা কোনো উপনিবেশকারীর ভাষায় লেখা সাহিত্য এর মডেল নয়। বিষয়বস্তুর দিক থেকেই কেবলমাত্র নয় ভাষা ব্যবহারেও আঞ্চলিকতার প্রভাব আছে। ইংরেজি ভাষাকে পুনর্বিন্যাস করে আঞ্চলিক বিষয়-ভাবনাকে আশ্রয় করে প্রাক্তন উপনিবেশ থেকে উঠে আসছে যে সাহিত্য, তাকেই নতুন মাত্রা দিয়েছেন এই গ্রন্থের লেখকেরা। প্রান্তিক হয়ে উঠেছে কেন্দ্র, পূর্ণ সাহিত্যের মর্যাদা নিয়ে, অনুসৃত (derivative) সাহিত্য হিসেবে নয়। এইখানেই এই গ্রন্থের গুরুত্ব ; উত্তরঔপনিবেশিকতাবাদকে দৃঢ়ভাবে দাঁড় করিয়ে গেছেন এই লেখকেরা।

টীকা :

১. সাইদ Harry Magdoff -কে অনুসরণ করে পরিসংখ্যান দিয়েছেন যে ১৮০০ সালে পশ্চিমি ক্ষমতাশালী দেশগুলি পৃথিবীপৃষ্ঠের ৫৫ শতাংশ তাদের অধীনস্থ বলে দাবি করত, যদিও আসলে তা ছিল ৩৫ শতাংশ ; ১৮৭৮ সাল নাগাদ এই সংখ্যা দাঁড়ায় ৬৭ শতাংশে, যার অর্থ বছরপ্রতি বৃদ্ধির হার ৮৩,০০০ স্কোয়ার মাইল। ১৯১৪ সাল নাগাদ বাৎসরিক হার দাঁড়ায় ২৪০,০০০ স্কোয়ার মাইল। অর্থাৎ ইউরোপ পৃথিবীপৃষ্ঠে ৮৫ শতাংশ কলোনি, প্রটেক্টরেট, ডিপেনডেন্সি, ডোমিনিয়ন ও কমনওয়েলথ হিসেবে দখলে রাখে (সাইদ্ ১৯৯৩ : ৬)।

২. এই নতুন ধরনের 'উপনিবেশীকরণ'কে বলা হয় 'নবউপনিবেশবাদ' ('neo-colonialism')। স্বাধীন ঘানার প্রথম রাষ্ট্রপতি কোয়ামে এনক্রুমা (Kwane Nkrumah) তাঁর *Neo-colonialism : The Last Stage of Imperialism* গ্রন্থে কথাটি ব্যবহার করেন। প্রাক্তন ঔপনিবেশিক শক্তিগুলি এবং মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের মতো 'সুপারপাওয়ার'-গুলি অধুনা স্বাধীনতাপ্রাপ্ত দেশগুলির উপর নিয়ন্ত্রণ রাখার চেষ্টা করে নানান উপায়ে। আন্তর্জাতিক আর্থিক সংস্থাসমূহের মাধ্যমে, আন্তর্জাতিক বাজারে দাম নির্ধারণের মাধ্যমে, বহুজাতিক সংস্থার মাধ্যমে এবং বিভিন্ন শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান ও সাংস্কৃতিক সংস্থার মাধ্যমে এই নিয়ন্ত্রণ বজায় রাখা হয়। স্বাভাবিকভাবেই, এই নিয়ন্ত্রণ প্রক্রিয়া খুব সূক্ষ্ম ও আরও ভয়ংকর, যেহেতু এগুলি বোঝা এবং

প্রতিরোধ করা দুষ্কর। (Ashcroft, *Key Concepts* ১৬২-৬৩)। নবউপনিবেশবাদের অন্যান্য রূপও আছে, তবে সেগুলি নিয়ে আলোচনা থেকে বিরত থাকা হচ্ছে কারণ সেগুলি এখানে প্রযোজ্য নয়।

গ্রন্থপঞ্জি :

Ashcroft, Bill, Gareth Griffiths and Helen Tiffin, *The Empire Writes Back : Theory and Practices in Post-colonial Literatures* ; London : Routledge. 1989.

---*Key Concepts in Post-colonial Studies* ; London : Routledge, 1998. *Key Concepts* বলে উদ্ধৃত হয়েছে।

Bhabha, Homi K, *The Location of Culture* ; London, Routledge, 1994

Fanon, Franz, *Block Skin White Masks* ; Trans. Charles Laui Markwann, 1952 London : MacGibbon and Key,1986.

Gandhi, Leela. *Postcolonial Theory : A Critical Introduction* ; New Delhi : OUP, 1998.

McLeod, John. *Beginning Postcolonialism* ; Manchestor : Manchestor UP, 2007.

Said, Edward, *Culture and Imperialism* ; Vintage, 1993

---*Orientalism* ; 1978, London, Penguin 1991

Spivak Gayatri Chakraborty, 'Can the Subaltern speak?' *Colonial Discourse and Post- colonial Theory*, Harvester Wheatsheaf 1993, 66-111.

---Three, Woman's Texts and a Critique of Imperialism. *Race, Writing and Difference*, ed.......Henry Louis, Goates, Jr. Chicago : Il of Chicago Press, 1985, 262-80

Young, Robert J.C. *Postcolonialism : A Very Short Introduction* ; New Delhi, OUP 2001

বাংলা কবিতার উত্তর ঔপনিবেশিক পাঠ কিছু এলোমেলো উদ্ভাস

তপোমন ঘোষ

১৯৮৩ খ্রিস্টাব্দে বেনেডিক্ট অ্যান্ডারসন তাঁর *ইমাজিনড্ কমিউনিটি : রিফ্লেকশনস্ অন দ্য ওরিজিন অ্যান্ড স্প্রেড অফ ন্যাশনালিজম* বইতে জাতীয়তার (নেশন) স্বরূপ উন্মোচিত করার ক্ষেত্রে 'কল্পনা' (ইমাজিনেশন)-র ভূমিকার কথা প্রথম জোরের সঙ্গে উল্লেখ করেন। তার আগে পর্যন্ত, সমাজবিদ্যা-বিষয়ক সমস্ত রচনায় জাতীয়তাবাদ সংক্রান্ত বিশ্লেষণের ক্ষেত্রে 'কল্পনা'র ভূমিকা একেবারেই অনালোচিত ছিল। অ্যাণ্ডারসনই প্রথম বলেন, 'কল্পনা'কে 'মিথ্যা'র প্রতিশব্দ হিসাবে কোনোমতেই গ্রহণ করা উচিত নয়। 'কল্পনা' যেমন বাস্তবকে নির্মিত করতে পারে, তেমনই করতে পারে অতিনির্ণীত। অবশ্য এর ইঙ্গিত ছিল এডওয়ার্ড সাইদ-এর লেখাতেও— যেখানে পাশ্চাত্যের নির্বিশেষায়িত কাঠামোর বাইরে প্রাচ্যকে একভাবে দেখবার ও দেখাবার চেষ্টা করা হয়েছিল। সাইদ-এর যুগান্তকারী বই *ওরিয়েন্টালিজম্* প্রথম প্রকাশিত হয়েছিল ১৯৭৮ খ্রিস্টাব্দে। বস্তুতপক্ষে, এই বইটিকেই উত্তর-ঔপনিবেশিক বিদ্যাচর্চার সূত্রনির্দেশক বই হিসাবে গণ্য করা যায়। অনেক পরবর্তীতে, নব্বয়ের দশকের গোড়ার দিকে যখন ইতিহাসচর্চার ধারায় 'নিম্নবর্গের ইতিহাস' বা 'সাবঅল্টার্নাস স্টাডিজ' এক গুরুত্বপূর্ণ বিষয় হিসাবে আত্মপ্রকাশ করে— তখন এই বিশেষ ঘরানার ঐতিহাসিকদের গবেষণা ও রচনাও উত্তর-ঔপনিবেশিক বিদ্যাচর্চার নতুন দিগন্ত উন্মোচিত করতে থাকে।

প্রাচ্য ও পাশ্চাত্যের জীবনবীক্ষা যে সম্পূর্ণ পৃথক, তা অবশ্য বহু আগে, একেবারে নিজস্ব আঙ্গিকে উপস্থাপিত করেছিলেন কবি রাডিয়ার্ড কিপলিং, স্পষ্ট বলেছিলেন— "... দ্য টোয়াইন শ্যাল নেভার মিট" কিন্তু নৌ-অভিযানের মাধ্যমে প্রাচ্যের একের পর এক দেশ যখন পাশ্চাত্যের কতিপয় দেশের উপনিবেশে পরিণত হতে থাকে, তখন শুধু পণ্যের আদানপ্রদানই চলতো না — আদানপ্রদান ঘটত চিন্তা-চেতনারও। অবশ্য 'আদানপ্রদান' শব্দটি এখানে আক্ষরিক অর্থে প্রয়োগ হতে পারে না— কেননা, ঔপনিবেশিক প্রভু এবং উপনিবেশিত প্রজার আদান ও প্রদানের তুল্যাঙ্ক অনুপাত কখনোই কোনো নির্দিষ্ট অঙ্ক মেনে চলেনি। ইতিহাসচর্চার প্রাচীন ধারায় 'এনলাইটেনমেন্ট' বা আলোকপ্রাপ্তির ধারণা যে নিতান্তই একপেশে একটি বিষয়— তা নিয়ে সাইদ ইঙ্গিত

করেছিলেন, রণজিৎ গুহ-পার্থ চট্টোপাধ্যায়েরা নিম্নবর্গের ইতিহাস লিখনের সময় এই বিষয়টিকেই দৃঢ়তর যুক্তিকাঠামোর উপর স্থাপন করলেন। আসলে, উপনিবেশের প্রজাদের উপনিবেশের প্রভুরা ছলে-বলে-কৌশলে বুঝিয়ে দিলেন, এই নবাগত এপিস্টেমগুলি (খণ্ড জ্ঞানাংশ) আসলে তাঁদেরই। এইভাবেই সংস্কৃতির উপর নিজেদের কায়েমিস্বত্ব প্রতিষ্ঠা হলো— আর চিন্তার দখলই তো শ্রেষ্ঠ দখল। এরপর কলোনাইজার (উপনিবেশের প্রভু) সেভাবে চিন্তা করল, কলোনাইজড্ (উপনিবেশের প্রজা)-ও অনায়াসে সেইভাবে চিন্তা করতে লাগলো— পৃথক চিন্তাপরিসর তৈরি হওয়ার কোনো প্রবণতা দেখা গেলো না। উত্তর-ঔপনিবেশিক পাঠ এই চিন্তাপরিসর তৈরির প্রক্রিয়াকেই স্বাগত জানায়। কলোনাইজার যখন কলোনাইজড্-এর জ্ঞানের উপর প্রভুত্ব বিস্তার করে, সেই প্রভুত্ব চলে আসে বাচনেরও মধ্যে— শিল্প-সাহিত্যের মধ্যেও তার প্রকাশ লক্ষণীয়। উদাহরণ হিসাবে, রবীন্দ্রনাথের *পুনশ্চ* কাব্যগ্রন্থের 'বাঁশি' কবিতাটি ধরে নেওয়া যেতে পারে। কিনু গোয়ালার গলির ক্লেদাক্ত পরিসরে আকণ্ঠ নিমজ্জিত 'সদাগরি আপিসের কনিষ্ঠ কেরানি'র হঠাৎই মনে হয়— "এ গলিটা ঘোর মিছে/দুর্বিষহ মাতালের প্রলাপের মতো।" এই মনে হওয়ার পিছনে কাজ করে যায় কান্তবাবুর কর্নেট-এ বাজানো সিন্ধুবারোঁয়া-র তান। কবিতাটির নাম 'বাঁশি', যা একটি গ্রামীণ বাদ্যযন্ত্র—কিন্তু একটি ইউরোপীয় বাদ্যযন্ত্র, কর্নেট, কবিতাকে একটি বিশেষ তুঙ্গমুহূর্তে পৌঁছে দিল— হরিপদ কেরানির সেই না-পাওয়া অথচ পেতে-চাওয়া জগতের সঙ্গে যোগসূত্রে বেঁধে দিল। অর্থাৎ, প্রাচ্যের হরিপদ কেরানির কল্পনা অতিনিয়ন্ত্রিত হল একটি পাশ্চাত্য বাদ্যযন্ত্রের মাধ্যমে— অবশ্য তাতে বাজানো হল প্রাচ্য সুর— সিন্ধুবারোঁয়া। যথার্থ ঔপনিবেশিক চিন্তাপরিসর এইভাবেই একজন যুগন্ধর স্রষ্টার সৃষ্টিকে প্রভাবিত করে চলে— ঐতিহাসিক পার্থ চট্টোপাধ্যায় তাঁর *প্রভিন্সিয়ালাইজিং ইউরোপ* বইয়ের 'নেশন অ্যান্ড ইমাজিনেশন' শীর্ষক অধ্যায়ে এমনই মতামত ব্যক্ত করেছেন।

রবীন্দ্রনাথকে যদি আধুনিক কবিতার সূত্রপাত হিসাবে ধরে নেওয়া হয়, তবে এটা মোটামুটি নিশ্চিতভাবে বলা যায়— এই কবিকে তার পরবর্তী সমালোচকরা যতটা 'ললিত বাণী'-কর্তা হিসাবে দেখিয়েছেন, তিনি ততটা ললিত ছিলেন না। তবু রবীন্দ্রনাথের কাব্যেও যে দ্রোহের বহিঃপ্রকাশ ঘটেছিল, তার চরিত্র অন্যরকম। রবীন্দ্রনাথ তাঁর উপর পরবর্তীদের লাগানো তকমা 'জন্ম রোম্যান্টিক' মেনে নিয়েও লিখেছিলেন--

যেথা ঐ বাস্তব জগৎ
সেখানে আনাগোনার পথ
আছে মোর চেনা,
সেথাকার দেনা
শোধ করি— সে নহে কথায় তাহা জানি
তাহার আহ্বান আমি মানি।
দৈন্য সেথা, ব্যাধি সেথা, সেথায় কুশ্রীতা,
সেথায় রমণীর দস্যুভীতা—
সেখানে উত্তরি ফেলি বর্ম;
সেথায় নির্মম কর্ম;
সেথা ত্যাগ, সেথা দুঃখ, সেথা ভেরি বাজুক 'মাভৈঃ'
শৌখিন বাস্তব যেন সেথা নাহি হই।

সেথায় সুন্দর যেন ভৈরবের সাথে
চলে হাতে-হাতে।

[রোম্যান্টিক : *নবজাতক*]

১৯৩৮ নাগাদ রচিত এ কবিতায় সুন্দর আর ভৈরবের সম্মিলনের কথা বলা হয়েছে। কবি তাঁর অন্তর্নিহিত 'সুন্দর'কে ত্যাগ করতে না পারলেও আহ্বান জানিয়েছেন এক বৈনাশিক ভৈরবকে— যে ভৈরব নিহিত ছিল তাঁর স্বদেশচিন্তারই মধ্যে। তাই রবীন্দ্রনাথকে এক বিশেষ অ্যান্টি-কলোনিয়াল বাচনের নির্মাতা হিসাবে বিবেচনা করা যেতে পারে। নিজের রোম্যান্টিক কবিস্বভাব সম্পর্কে সম্পূর্ণ সচেতন রবীন্দ্রনাথ 'বাস্তব'কে পাশে সরিয়ে অনেকসময়ই 'সুন্দর'কে দেখেছিলেন— তবে তা অচেতনভাবে নয়। আবার, একেবারেই বিপরীতক্রমে *সানাই* কাব্যগ্রন্থের 'অপঘাত' কবিতাটির কথা মনে করা যেতে পারে। এই কবিতায় কবি প্রায় একজন চিত্রীর ঢঙে গ্রামীণ পরিবেশের এক শান্ত বিজনতাকে বর্ণনা করতে প্রবৃত্ত হয়েছেন— সময় যেন শ্লথগতিতে গড়িয়ে চলেছে সেই গ্রামের মধ্য দিয়ে। আসল চমক কবিতার অন্তিম স্তবকে; মাত্র দুই পঙ্‌ক্তির একটি স্তবক :

টেলিগ্রাম এল সেইক্ষণে
ফিনল্যাণ্ড চূর্ণ হল সোভিয়েত বোমার বর্ষণে।

রবীন্দ্রচেতনায় বহমান সুন্দরকে এখানে যে 'অপঘাত'-টি চূর্ণ করেছে, তা হল আধুনিক প্রযুক্তি— টেলিগ্রাম; টেলিগ্রামবাহিত হয়েই এসেছে যুদ্ধ ও ধ্বংসের সংবাদ। যুদ্ধ, ধ্বংস আর প্রযুক্তি যেন এখানে একেবারে সমতলে অবস্থান করেছে। এ বিচিত্র বঙ্কিম কশাঘাত কবিতাটিকে রসোত্তীর্ণ করে তুলেছে। এই কশাঘাত কবির 'প্রগতি'র প্রতি অনীহা থেকে সঞ্জাত— যে 'প্রগতি' একান্তভাবেই প্রযুক্তির। আর এক্ষেত্রে কবিচেতনার রোম্যান্টিকতা নিঃসন্দেহে প্রকৃতির প্রতি গমন। এই অতি-চেনা ইউরোপীয় কাঠামোর মধ্যেই নিহিত ছিল উপনিবেশ-বিরোধের বীজ। এই উপনিবেশ বিরোধের বীজ থেকেই উঠে এসেছে রবীন্দ্রনাথের দ্রোহ তথা ক্রোধের উদাহরণগুলি, যা ছড়িয়ে আছে তাঁর 'স্বদেশ' পর্যায়ের গান থেকে আরম্ভ করে 'ঝড়ের খেয়া' কবিতায়, 'স্বদেশী সমাজ' থেকে আরম্ভ করে 'সভ্যতার সঙ্কট' প্রবন্ধে, রয়েছে *মুক্তধারা* ও *রক্তকরবী*-র মতো নাটকে। এই রচনাগুলি থেকেই বোঝা যায়, রবীন্দ্রনাথ বহুলাংশেই 'আধুনিকতা', 'প্রগতি' ও 'ঔপনিবেশিকতা'কে একই সূত্রে গ্রথিত হতে দেখেছিলেন, হয়তো সেকারণেই মেজাজে পূর্ণ ইওরোপীয় রোম্যান্টিক হয়েও তিনি রোম্যান্টিকতার পলায়নী মনোবৃত্তিকে চালিত করছিলেন দেশীয় ঐতিহ্য আর শাশ্বতর দিকে, ভারতীয় বেদান্ত দর্শনের চিরায়তের দিকে। রবীন্দ্র পরবর্তীরা কবি হিসাবে রবীন্দ্রনাথকে পূর্ণ রোম্যান্টিক হিসাবে দেখাতে চাইলেও রবীন্দ্রনাথের চৈতন্যে ঔপনিবেশিক শাসনে দীর্ণ স্বদেশের পাশাপাশি এক শাশ্বত, চিরায়ত স্বদেশও ছিল, যা একান্তভাবেই তাঁর অন্বিষ্ট—

এ গান যেখানে সত্য
অনন্ত গোধূলি লগ্নে
সেইখানে
বহি চলে ধলেশ্বরী
তীরে তমালের ঘন ছায়া;

আঙিনাতে যে আছে অপেক্ষা করে, তার
পরণে ঢাকাই শাড়ী, কপালে সিঁদুর।

[*বাঁশি* / *পুনশ্চ*]

রবীন্দ্রনাথের 'বাঁশি' কবিতার নায়ক সওদাগরি অফিসের কনিষ্ঠ কেরানি হরিপদ তার তিক্ত নাগরিক জীবন থেকে পালায় এই জগতে, যেখানে অনন্ত গোধূলি লগ্নে অবারিত ধারায় এক বয়ে-চলা নদী; যার তীরে স্থির ছায়া আর অনন্ত প্রতীক্ষারতা এক নারী— যার পরনে ঢাকাই শাড়ি, কপালে সিঁদুর যা বাঙালির, হিন্দু বাঙালির, এক চিরায়ত নারী কল্পনা।

এমন সুস্থির ছবিকেই ধ্বংস করে প্রগতি, প্রযুক্তি, আধুনিকতা ইত্যাদি। যার সূত্রপাত ঔপনিবেশিক শাসনে। তাই কবিচেতনায় এই ঘটনাবলী নিতান্তই 'অপঘাত', যা ডেকে আনে অমঙ্গল। আর রবীন্দ্রচেতনায় কোনো অমঙ্গল সুন্দর বা অসুন্দর মঙ্গলের ধারণা নেই— এ তো নিশ্চিতভাবেই বলা যায়।

১৯৩৮-৩৯-এর মতো সালগুলিতে সত্যিই ভারতবর্ষের উপর ঘনীভূত ছিল অনেকরকম অমঙ্গলের ছায়া। ১৯২৯ থেকেই প্রবল অর্থনৈতিক মন্দা, বিশ্ব রাজনীতিতে নাৎসিবাদের ঝটিকাগতিতে উত্থান, দেশের ভিতরেও গান্ধিবাদী দুটি বৃহৎ আন্দোলনের ব্যর্থতা, উপনিবেশ বিরোধী সংগ্রামে বারংবার ছেদ, বিপ্লবাকাঙ্ক্ষীদের আশার সমাধি আর ক্রমশ সাম্প্রদায়িক রাজনীতির ছায়াপাত এবং অবশেষে যুদ্ধের দামামা অজস্র অমঙ্গলকে ঘনীভূত করে তুলেছিল বাংলার ভাগ্যাকাশে। তাই বুদ্ধদেব, সুধীন্দ্রনাথ কিংবা জীবনানন্দ রবীন্দ্রবাচন থেকে নিজেদের চৈতন্যকে মুক্ত করে নিতে তৎপর ছিলেন।

এই তিনজন কবির চেতনা ও কাব্যবীক্ষায় উত্তর-ঔপনিবেশিকতা কীভাবে প্রভাব বিস্তার করেছে, তা বিস্তৃতভাবে আলোচনার পরিসর আপাতত নেই— তবে জীবনানন্দকে নিয়ে কিছু কথা আলাদাভাবে বলা যেতেই পারে। সুধীন্দ্রনাথের 'নাস্তি'র প্রতি বিশ্বাসের কথা প্রায় সর্বজনবিদিত— আর জীবনানন্দের কবিস্বভাব বহুলাংশেই বিপরীত। একই এপিস্টেমের মধ্যে সুধীন্দ্রনাথ ও জীবনানন্দের অবস্থান ছিল সম্পূর্ণ বিপরীত, কিন্তু উভয়েই যে একই বিশ্বকে দেখেছিলেন তা নিয়ে কোনো সন্দেহের অবকাশ নেই। জীবনানন্দের কাছে হেমন্ত ঋতুর পূর্বাভাস সুধীন্দ্রনাথকে মনে পড়ায়। কিন্তু সুধীন্দ্রনাথের 'হেমন্ত' এমন এক শীতের বার্তাবহ, যে শীত অনন্ত, যা বস্তুত তাঁর 'নাস্তি'র প্রতীক। কিন্তু জীবনানন্দ আপাতভাবে হেমন্তকে ধ্রুব ধরলেও জানতেন শীত ক্ষণস্থায়ী। আর জীবনানন্দের চেতনায় 'প্রগতি'র ধারণাও ছিল ভিন্নতর। দেবীপ্রসাদ বন্দ্যোপাধ্যায় তাঁর বিখ্যাত রচনা 'জীবনানন্দ দাশ, তাঁর কবিতা' (*জীবনানন্দ দাশের কাব্যসংগ্রহ*-র ভূমিকা)-তে দেখিয়েছিলেন, জীবনানন্দীয় চেতনার ইতিহাস ক্রমাগ্রসর নয়, বরং তা পুনরাবৃত্তিময়। সংকটের সময়কে উত্তীর্ণ করে সুসময় একদিন আসবে, এমন বিশ্বাস তাঁর ছিল :

১. এখন অপর আলো পৃথিবীতে জ্বলে
কী এক অপব্যয়ী অক্লান্ত আগুন!
তোমার নিবিড়কালো চুলের ভিতরে
কবেকার সমুদ্রের নুন
তোমার মুখের রেখা আজও
মৃত কত পৌত্তলিক খ্রিস্টান সিন্ধুর

অন্ধকার থেকে এসে নব সূর্যে জাগার মতন
কত কাছে— তবু কত দূর।

[সবিতা / *বনলতা সেন*]

২. মাটি পৃথিবীর টানে মানব জন্মের ঘরে কখন এসেছি,
না এলেই ভাল হত অনুভব করে;
এসে যে গভীরতর লাভ হল সেসব বুঝেছি
শিশির শরীর ছুঁয়ে সমুজ্জ্বল ভোরে
দেখেছি যা হল হবে মানুষের যা হবার নয়—
শাশ্বত রাত্রির বুকে সকলি অনন্ত সূর্যোদয়।

[সুচেতনা /*বনলতা সেন*]

৩. তবু এই পৃথিবীর সব আলো একদিন নিভে গেলে পরে
পৃথিবীর সব গল্প একদিন ফুরাবে যখন,
মানুষ রবে না আর, রবে শুধু মানুষের স্বপ্ন তখন,
সেই মুখ আর আমি রব সেই স্বপ্নের ভিতরে।

[স্বপ্ন /*মহাপৃথিবী*]

পৃথিবীর নিভে-আসা আলো, পৃথিবী জুড়ে চলা অপব্যয়ী আগুন ইত্যাদি দেখে মানবজন্মের ঘরে না-এলেই ভালো হত এমন অনুভব সত্ত্বেও জীবনানন্দ সেই বোধ পেয়েছিলেন, যেখানে একদিন 'শাশ্বত রাত্রির বুকে সকলি অনন্ত সূর্যোদয়।' এ তো তাঁর প্রত্যয়ের জায়গা— কিন্তু এই প্রত্যয়ের আগে তিনি দেখেছিলেন সেইসব 'অপব্যয়ী অক্লান্ত আগুন'কে— জীবনানন্দের এই দর্শন ছিল বিস্তৃত এবং বাঙালি চৈতন্যে অভূতপূর্ব।

সম্ভবত জীবনানন্দই সেই কবি যাঁর কবিতায় বারবার উঠে এসেছে সমুদ্রের গল্প। বাংলা সমুদ্রকবিতার অন্যতম পথিকৃৎ তিনিই। কিন্তু সমুদ্রের নন্দনটুকুই নয়, সমুদ্রকে কাব্যোপকরণ হিসাবে প্রয়োজনও ছিল তাঁর। দেবীপ্রসাদ বন্দ্যোপাধ্যায় তাঁর *জীবনানন্দ : বিকাশ-প্রতিষ্ঠার ইতিবৃত্ত* বইতে দেখিয়েছিলেন, প্রাচীন ভারতের নৌশক্তি বিস্তারের ইতিহাস জীবনানন্দকে আকৃষ্ট করেছিলো। তাই তাঁর রচনায় বারবার বিভিন্ন সমুদ্রের উল্লেখ পাওয়া যায়, আর পাওয়া যায় সমুদ্রের তীরে গড়ে ওঠা সভ্যতাগুলির কথা। জীবনানন্দের অধিকাংশ কবিতাতেই কথক যেন এক ক্লান্ত নাবিক। সে যেন 'অপব্যয়ী আগুনে'র পৃথিবী থেকে বহু দূরে কোথাও 'দারুচিনি বনানীর ফাঁকে' নির্জনতার সন্ধানী। বস্তুত এই 'অপব্যয়ী আগুন' ঔপনিবেশিকতা ছাড়া আর কিছু নয়। সমুদ্রপথ— যে-পথে বিস্তৃত হয়েছিল উপনিবেশ, জীবনানন্দ সেই পথেই অনুসন্ধান করেছিলেন তাঁর দ্বিতীয় স্বভূমিকে। উপনিবেশ স্থাপনের বর্ণনা তাঁর রচনায় বারবার বর্ণিত।

উদ্ধৃত অংশটির প্রথমটিতে উল্লেখ রয়েছে ঔপনিবেশিকতার 'মৃত কত পৌত্তলিক খ্রীষ্টান সিন্ধুর/অন্ধকার' থেকে 'নবসূর্যে জাগার' চেষ্টায় তিনি নিরত।

শ্যামলী, তোমার মুখ সেকালের শক্তির মতন;
যখন জাহাজে চড়ে যুবকের দল
সুদূর নতুন দেশে সোনা আছে বলে,

মহিলারই প্রতিভায় সে ধাতু উজ্জ্বল
টের পেয়ে, দ্রাক্ষা দুধ
ময়ূরশয্যার কথা ভুলে
সকালের রূঢ়রৌদ্রে ডুবে যেত কোথায় অকূলে

তোমার মুখের দিকে তাকালে এখনো
আমি সেই পৃথিবীর সমুদ্রের নীল,
দুপুরের শূন্য সব বন্দরের ব্যথা,
বিকেলের উপকণ্ঠে সাগরের চিল,
নক্ষত্র, রাত্রির জল, যুবাদের ক্রন্দন সব—
শ্যামলী, করেছি অনুভব।
অনেক অপরিমেয় যুগ কেটে গেল;
মানুষকে স্থির-স্থিরতর হতে দেবে না সময়;
সে কিছু চেয়েছে বলে এত রক্তনদী।
অন্ধকার প্রেরণার মতো মনে হয়
দূর সাগরের শব্দ— শতাব্দীর তীরে এসে ঝরে :
কাল কিছু হয়েছিল— হবে কি শাশ্বত কাল পরে।

[শ্যামলী / *বনলতা সেন*]

শ্যামলীর মুখ 'সেকালের শক্তির মতো'। কোন্ কাল? না, সেই কাল যখন জাহাজে চড়ে যুবার দল 'সুদূর নতুন দেশে' সোনা খুঁজতে গিয়ে টের পেত 'মহিলারই প্রতিভায় সে ধাতু উজ্জ্বল'। এমন এক অতীতকে জীবনানন্দ উপস্থাপিত করলেন, যখন ভারতের, বাংলার সমুদ্র-অভিযান অব্যাহত ছিলো, অব্যাহত ছিল সুদূর নতুন দেশের সঙ্গে 'সোনা'র বাণিজ্য আর বাণিজ্যের অভিপ্রায়ে সেই সুদূর দেশে গিয়ে সেইসব যুবা খুঁজে নিত 'মহিলা'। তারা ভুলে যেত 'দ্রাক্ষা দুধ ময়ূরশয্যার' মাতৃভূমিকে, আর বলাই বাহুল্য— তারা সৃষ্টি করত উপনিবেশ। 'সোনা' আর 'মহিলা' দুই-ই এখানে বিশেষভাবেই উপনিবেশবাদের সামগ্রী— 'সোনা' আর 'মহিলা' কার্যকারণ সূত্রে আবদ্ধও বটে। উপনিবেশবাদের গূঢ় অন্তর্বাক্যটিই যেন উঠে এসেছে জীবনানন্দের কলমে। উঠে এসেছে সেই যুগ— শৈলেন্দ্র বংশের কাল অথবা কিংবদন্তির বিজয় সিংহের সমুদ্র অভিযানের সময়।

কবি তাঁর উদ্দিষ্টকে এরপর বলেছেন যে, তার মুখ কবিকে সেই ট্রানসেনডেন্স দেয়, যেখানে কবি অনুভব করেন— 'পৃথিবীর সমুদ্রের নীল', 'দুপুরের শূন্য বন্দরের ব্যথা', 'সাগরের চিল' থেকে শুরু করে 'যুবাদের *ক্রন্দন*' পর্যন্ত। এমন ক্লান্ত, শূন্য, রিক্ত ছবি কেন অনুভূত হয়? হয়তো তা বঙ্গীয় সমুদ্রবাণিজ্যের ক্রমাবলুপ্তি, যেখানে একদা বিজয়ী যুবারা ক্রন্দনরত। এমনও হতে পারে যে, সেই উপনিবেশবাদের মধ্যেও ক্লান্তি ছিল, ছিল ক্ষমতার আস্ফালনের পর রিক্ত উপনিবেশের শূন্য বন্দরে যুবাদের ক্লান্তি ও ক্রন্দন।

কিন্তু যে যুগও তো কেটে গেছে— এখন সময় মানুষের যে-কোনো স্থিরতার বিরুদ্ধে। সে কিছু চাইলেই রক্তনদী, হিংসা, অথচ— 'অন্ধকার প্রেরণার মত মনে হয়/দূর সাগরের শব্দ-শতাব্দীর তীরে এসে ঝরে।' নাবিকের কাছে সমুদ্রই প্রেরণা। সোনা-মহিলার লুব্ধ যুগ পার হয়ে ঔপনিবেশিত দেশের মানুষ রাত্রির অন্ধকার সমুদ্রের শব্দের কাছেই যেন প্রেরণা

পেয়েছে, মনে হচ্ছে— 'কাল কিছু হয়েছিল— হবে কী শাশ্বত কাল পরে।' 'কাল' কি হয়েছিল তা কবিতাতে বিধৃত। অর্থাৎ উপনিবেশ বিস্তার ও ক্রমপরাজয়ের বৃত্তান্ত, কিন্তু 'শাশ্বতকাল' পরে? 'শাশ্বত' শব্দটি কবিতার সব থেকে ধাঁধা-উদ্রেককারী শব্দ। বিগতদিনের সঙ্গে বর্তমানের বৈপরীত্যের চমক এই 'শাশ্বত' শব্দটি সহজেই বহন করে নিয়ে আসে। কিন্তু শুধুই কি চমক? অন্তত জীবনানন্দের থেকে 'চমক' আশা করা যায় না। 'শাশ্বতকাল' পরে কি সেই বোধ আসবে, যা দূর অন্ধকার সমুদ্রের পারের সোনা, মহিলা ইত্যাদিকে অতিক্রম করে এক শাশ্বত সত্যের সন্ধান দিতে পারবে? সন্দেহ হয়, জীবনানন্দ হয়তো এখানে উপনিবেশ-উত্তীর্ণ কোনো বোধের কথা বলছেন। তবে যাই হোক, কবিতাটিতে ধারাবাহিক ইতিহাসের কোনো অংশের প্রতি কবির গমন দেখলেই বোঝা যায়— উপনিবেশের চরিত্রকে বেশ স্পষ্টভাবেই উপলব্ধি করতে পেরেছিলেন তিনি। উপনিবেশকে তিনি শুধু ফিজিক্যাল অর্থেই দেখেননি, দেখেছেন এক বিশেষ এপিস্টেমোলজিক্যাল শক্তি হিসাবে— দেখেছেন এক কালের শাশ্বত বোধের উপনিবেশকে গোধূলি আলোয় ক্রমে লুপ্ত হয়ে যেতে। বোধের ক্লান্তি, রিক্ততা, শূন্যতা— সবই তাঁর কাছে প্রতীয়মান ছিল। অসম্ভব আশাবাদী কবি পুনরায় আশা করছেন নবতর বোধকে, যা তাঁর কবিতায় অন্যতম ধ্রুব 'সমুদ্র'র কাছ থেকেই লাভ করা সম্ভব।

উপনিবেশবাদের প্রতি জীবনানন্দের এই বোধ অন্যত্রও লভ্য—

যেন সব অন্ধকার সমুদ্রের ক্লান্ত নাবিকেরা
মক্ষিকার গুঞ্জনের মতো এক বিহ্বল বাতাসে
ভূমধ্যসাগর নীল দূর এক সভ্যতার থেকে
আজকের নব সভ্যতায় ফিরে আসে;—

[সুরঞ্জনা / *বনলতা সেন*]

পুনরায় 'অন্ধকার সমুদ্র' আর নাবিকী ক্লান্তি। মাছির গুঞ্জনের মতো এক বিহ্বল বাতাস, যা বিরক্তিরই দ্যোতক, 'ভূমধ্যসাগরনীল দূর এক সভ্যতার থেকে/আজকের নব সভ্যতায় ফিরে আসে'— জীবনানন্দ যে অনুভব করেছিলেন ভারতীয় তথা বঙ্গীয় চৈতন্যের জ্ঞানতাত্ত্বিক সমস্যাটিকে, সে বিষয়ে কোনো সন্দেহ নেই। যে এপিস্টেম লুপ্ত তাকেও তিনি জানতেন—

মনে পড়ে কবে এক তারা ভরা রাতের বাতাসে
ধর্মাশোকের ছেলে মহেন্দ্রর সাথে
উতরোল বড়ো সাগরের পথে অন্তিম আকাঙ্ক্ষা নিয়ে প্রাণে
তবুও কাউকে আমি পারিনি বোঝাতে
সেই ইচ্ছা সংঘ নয় শক্তি নয় কর্মীদের সুধীদের বিবর্ণতা নয়,
আরও আলো; মানুষের তরে এক মানুষীর হৃদয়।

[সুরঞ্জনা / *বনলতা সেন*]

এ সেই জ্ঞানজগৎ যাকে বোঝানো আর সম্ভব নয়। 'বড়ো সাগর'-এর এই বোধ 'ভূমধ্যসাগরলীন' কোনো দূরতর সভ্যতার চাপে লুপ্ত। 'বড়ো সাগর'-এর পাশে 'ভূমধ্যসাগরীয় প্যারডি'টি লক্ষণীয়। আজকের নব সভ্যতায় ধর্মাশোকের এপিস্টেম-এর কোনো স্থান নেই, তাই ক্লান্তি। তাই 'নবতর ভোর'-এর অপেক্ষা।

কিন্তু ক্লান্তিই কী শেষ? ক্লান্তিই কী একমাত্র অন্বিষ্ট? এর উত্তর খোঁজা যেতে পারে তাঁর রচনার অন্যত্র—

আগুন বাতাস জল : আদিম দেবতারা তাদের সর্পিল পরিহাসে
তোমাকে দিল রূপ—
কী ভয়াবহ নির্জন রূপ তোমাকে দিল তারা;
তোমার সংস্পর্শের মানুষের রক্তে ছিল মাছির মতো কামনা

আগুন বাতাস জল : আদিম দেবতারা তাদের বঙ্কিম পরিহাসে
আমাকে দিল লিপি রচনা করবার আবেগ:
যেন আমিও আগুন বাতাস জল,
যেন তোমাকেও সৃষ্টি করছি।

তোমার মুখের রূপ যেন রক্ত নয়, মাংস নয়, কামনা নয়,
নিশীথ দেবদারু দ্বীপ;
কোন দূর নির্জন নীলাভ দ্বীপ;

স্থূল হাতে ব্যবহৃত হয়ে তবু
তুমি মাটির পৃথিবীতে হারিয়ে যাচ্ছ;
আমি হারিয়ে যাচ্ছি সুদূর দ্বীপের নক্ষত্রের ছায়ার ভিতর

আগুন বাতাস জল : আদিম দেবতারা তাদের বঙ্কিম পরিহাসে
রূপের বীজ ছড়িয়ে চলে পৃথিবীতে,
ছড়িয়ে চলে স্বপ্নের বীজ।

অবাক হয়ে ভাবি, আজ রাতে কোথায় তুমি?
রূপ কেন নির্জন দেবদারু-দ্বীপের নক্ষত্রের ছায়া চেনে না—
পৃথিবীর সেই মানুষীর রূপ?
স্থূল হাতে ব্যবহৃত হয়ে— ব্যবহৃত-ব্যবহৃত-ব্যবহৃত-ব্যবহৃত হয়ে

ব্যবহৃত-ব্যবহৃত—
আগুন বাতাস জল : আদিম দেবতারা হো হো করে হেসে উঠল :
'ব্যবহৃত-ব্যবহৃত হয়ে শুয়ারের মাংস হয়ে যায়?'
হো হো করে হেসে উঠলাম আমি! —
চারিদিককার অট্টহাসির ভিতর একটা বিরাট তিমির মৃতদেহ নিয়ে

অন্ধকার সমুদ্র স্ফীত হয়ে উঠল যেন;
পৃথিবীর সমস্ত রূপ অমেয় তিমির মৃতদেহের দুর্গন্ধের মতো,
যেখানেই আমি যাই সেই সব সমুদ্রের উল্কায় উল্কায়
কেমন স্বাভাবিক, কী স্বাভাবিক!

[আদিম দেবতারা / *মহাপৃথিবী*]

'আগুন', 'বাতাস', আর 'জল'— এই তিনটি এলিমেন্ট-এর দেবকল্প যেন টোটেম সভ্যতার এক কাল, যেখানে কবির উদ্দিষ্টা তার 'রূপ' পায়। এই 'রূপ' আবার একাধারে 'ভয়াবহ' ও 'নির্জন'। সব মিলিয়ে কবিতাটির প্রথম স্তবকেই এমন এক আবহ তৈরি হয়েছে যে, মনে হয়: কোনো এক সুদূর দ্বীপের কথা বলা হয়েছে, যেখানে তখনও আগুন, বাতাস আর জলের মতো আদি ত্রিশক্তির উপাসনারত কোনো এক বিশেষ জনগোষ্ঠী, তখন সেই 'রূপ' সেখানে 'নির্জন'। আবার ঐ 'ত্রিশক্তি'ই কবিকে দিয়েছে 'লিপি রচনা করার আবেগ'। 'লিপি'— যা কিনা সেই রূপের মধ্যে, সেই দ্বীপের মধ্যে ছিলো না। লিপির পরিচয়হীন সভ্যতায় যেন প্রবেশ করছে এক লিপির পরিচয়ঋদ্ধ সভ্যতা— ঔপনিবেশিক শক্তি যেভাবে প্রবেশ করে উপনিবেশের মধ্যে। আর সেই নবাগত সভ্যতা মনে করছে লিপি রচনার শক্তিতে যেন আদি ত্রিশক্তি থেকে শুরু করে সেই 'নির্জন' রূপটিকেও সেই সৃষ্টি করেছে— যেভাবে উপনিবেশের প্রভু মনে করে উপনিবেশিত প্রজাদের সে/তারা এনলাইটেন্ড করে চলেছে।

কবিতার এই আলেখ্য যে-কোনো ঔপনিবেশিক বিস্তৃতির কথাই বলে চলে। ঔপনিবেশিক সাম্রাজ্যবাদ যেখানে প্রবেশ করে, তার পার্সেপশনকে প্রথমেই সে লিপিবদ্ধ করে। ইওরোপীয় ঔপনিবেশিক বিস্তৃতির যুগে যে অসংখ্য ন্যারেশন রচিত হয়েছিল, সেই ন্যারেশনগুলি ক্রমশ হয়ে দাঁড়ায় উপনিবেশ সংক্রান্ত বিষয়ে পদ্ধতিবদ্ধ বাচন। যা কিনা ঔপনিবেশিক শক্তির কাছে সেই উপনিবেশ সংক্রান্ত বিষয়ে পরিপূর্ণ জ্ঞান, যাকে ব্যবহার করে উপনিবেশ টিকে থাকবে, টিকে থাকবে সাম্রাজ্যবাদ। তাই লেখা হয় পরবর্তী পঙ্‌ক্তিগুলি—

> তোমার মুখের রূপ যেন রক্ত নয়, মাংস নয়, কামনা নয়
> নিশীথ দেবদারু দ্বীপ;
> কোন দূর নির্জন নীলাভ দ্বীপ

তৃতীয় স্তবকে এসে 'রূপ' সম্পূর্ণভাবেই 'দ্বীপ'-এর আকৃতি পায়। তার বিবরণ থেকে 'ভয়াবহ' শব্দটি বাদ পড়ে। ঔপনিবেশিক বাচন-নির্মাতার কাছে সেই 'রূপ', যা এই মুহূর্তে 'দ্বীপ', তা অনেকটাই জ্ঞাত। সুতরাং, তার 'ভয়' আর নেই। এর পরের পঙ্‌ক্তিটি 'কোনো দূর নির্জন নীলাভ দ্বীপ'— স্পষ্টত রোম্যান্টিক উচ্চারণ। যে রোম্যান্টিকতা একেবারেই ইওরোপীয়, যা রবীন্দ্রনাথের হাতে 'সুনীল সাগরের শ্যামল কিনারে' রূপে ব্যক্ত। এমনটাই ঘটে ঔপনিবেশিক ন্যারেশন-এ। ন্যারেশন রচনা করার পর কথকের আর প্রয়োজন নেই। সে হারিয়ে যায় 'সুদূর দ্বীপের নক্ষত্রের ছায়ায়'। কিন্তু তার বর্ণিত সেই দ্বীপ, তাকে ব্যবহার করতে থাকে অসংখ্য স্থূল হাত, আর সে হারিয়ে যায় 'মাটির পৃথিবীতে'— মূল ভূখণ্ডে অথবা জ্ঞানের বাচন নির্মাতার জগতে, অর্থাৎ ইওরোপে।

'রূপ' আর 'নির্জন দেবদারু দ্বীপের ছায়া' চেনে না, কারণ 'রূপ'— যাকে ভেবে ঔপনিবেশিক শক্তি এসেছিলো, তার ন্যারেশনে তাকে জানা গেল 'দ্বীপ' হিসাবে। 'রূপ' স্থগিত রইল শুধু ন্যারেটরের স্মৃতিতে। যা কিনা হারিয়ে গেছে 'সুদূর দ্বীপের নক্ষত্রের ছায়ার ভিতর'। তখন সেই 'রূপ', সেই 'দ্বীপ' শুধুমাত্র 'স্থূল হাতে' ব্যবহৃত হতে থাকে। ভারতীয় মননে ক্রিয়াবৃত্তি এক পূর্ণায়তের ধারণা বহন করে আনে— কিন্তু এখানে বারবার 'ব্যবহৃত' শব্দটির ব্যবহার এবং তার মধ্যে একটি করে ড্যাশ— এ শুধু ব্যবহৃত হওয়ার পৌনপুনিকতা জানায় না, জানায় এক দীর্ঘ সময়কেও। আর অনন্ত ব্যবহারচক্রে সেই 'রূপ', সেই 'দ্বীপ' এরও

রূপান্তর ঘটে। আদি ত্রিশক্তি, যা এই কবিতায় অনড় ও অটল সত্তা হিসাবে উপস্থাপিত, তা ছুঁড়ে দেয় এক পরম ক্রোধের উচ্চারণ। অট্টহাসির সঙ্গে সংযুক্ত হয়ে এক শ্লেষাত্মক পঙ্‌ক্তি হয়ে দাঁড়ায় শুধুমাত্র এক ক্রোধের উদ্‌গার—

> ব্যবহৃত ব্যবহৃত হয়ে শুয়ারের মাংস হয়ে যায়?

সমস্ত রোম্যান্টিক মোহ ছিঁড়ে 'শুয়ারের মাংস'র মতো এক গ্রোটেস্ক-এর উপস্থাপনে ধরা পড়ে ঔপনিবেশিকতার স্বরূপ, যেখানে ক্রোধ ছাড়া আর কিছুই ব্যক্ত করার নেই। সেই ক্রোধ, সেই অট্টহাসি সংক্রামিত করে সেই ন্যারেটরকে, যে আজ 'সুদূর দ্বীপের নক্ষত্রের ছায়ায়' লুপ্ত। সেই অট্টহাসি ছড়িয়ে পড়ে চতুর্দিকে। ঔপনিবেশিকতার রোম্যান্টিক মায়ার জগৎ ছিন্ন করে এক বিরাট তিমির মৃতদেহ যেন সেই ঔপনিবেশিক বাচনের শব— যার দুর্গন্ধে টের পাওয়া যায় সমস্ত 'রূপ'ই ছিলো মেকি— শুধুমাত্র বিশেষ উদ্দেশে বর্ণিত। এ সেই 'অন্ধকার সমুদ্র', যা জীবনানন্দীয় কল্পে সমস্ত সম্ভাবনাকে ধরে আছে। এই 'অন্ধকার সমুদ্র' যেন সেই চৈতন্য, যা ক্রমেই ধরতে পারছে উপনিবেশবাদের সূক্ষ্ম থেকে সূক্ষ্মতর চালাকিগুলিকে; আর এই পদ্ধতির মধ্যেই তার চোখে-লাগানো ঔপনিবেশিক রোম্যান্টিকতার বিলোপ ঘটছে। অন্ধকার সমুদ্রের উপর তবু উল্কার আলো চমকায়। সেই ছিন্ন, খণ্ড ক্ষণপ্রভায় সবকিছু মনে হয় 'স্বাভাবিক, কী স্বাভাবিক'— এই শেষ শব্দগুলি হয়ে ওঠে নিষ্ফল ক্রোধের দাঁত-চাপা উচ্চারণ।

অনুবাদ তত্ত্ব ও বাংলা সাহিত্যে অনুবাদ ভাবনা

মহুয়া দে

সাহিত্যের মাধ্যমে মানবের মানসিক ও শৈল্পিক অনুভবশক্তিকে ব্যাপ্ত করার একটি প্রয়াস 'অনুবাদ'। ভাষান্তরের বাধা পেরিয়ে, ভৌগোলিক দূরত্বকে জয় করে বিশ্বমানবের সঙ্গে সংযুক্ত হওয়ার সুযোগ এনে দেয় অনুবাদ। অচেনা ভাষার অপরিচয় থেকে চেনা ভাষায় রূপান্তরণের মধ্যে দিয়ে মানবাভিজ্ঞতার যে বৈচিত্র্যের সঙ্গে পরিচয় ঘটে, তা শুধু হৃদয়কে প্লাবিত করে না, অনুচ্চারিত এই সত্যটিও প্রমাণ করে যে মানববিশ্ব এক এবং অবিভাজ্য, মানবসৃষ্ট সাহিত্যও তাই দেশকালোত্তীর্ণ। তবে এর অর্থ এই নয় যে, আধুনিক 'বিশ্বায়ন' সংস্কৃতি যেভাবে এক ছাঁচে ঢেলে সাহিত্যের মহনীয়তাকে ছোট মাপের মধ্যে ধরার চেষ্টা করছে, সেভাবে নয়। বরং, সাহিত্যের বৈচিত্র্য বহুমুখিতা ও বহুস্বরতার মধ্যেও মানবিক সংবেদনার এক পরম ও চরম সত্যকে উপলব্ধি করানোর চেষ্টা করে অনুবাদ। মানবিক ভাবনার যে পরিচয় বহন করে মৌলিক সাহিত্য, অনুবাদের মাধ্যমে তা প্রচারিত ও সঞ্চারিত হওয়ার যে প্রক্রিয়া, তার রূপভেদ ও স্বরূপধর্ম নিয়ে মতানৈক্যের অভাব নেই। অনুবাদ কি, কেন, এবং কিভাবে— এই প্রশ্নময়তাই অনুবাদসম্পর্কিত সাহিত্যিক পাঠ-এর গুরুত্বকে প্রমাণিত করে। জিজ্ঞাসা যদি মানুষের এগিয়ে চলার পাথেয় হয়, তবে অনুবাদ- কেন্দ্রিক এইসকল প্রশ্নাবলীর আবহমানতাই অনুবাদকে প্রক্রিয়া থেকে তত্ত্বে রূপান্তরিত করে। সে ইতিহাস দীর্ঘকালের।

সুতরাং সত্য এটাই যে, মানবসৃষ্ট সাহিত্য যতকালের অনুবাদও প্রায় ততকালের। এই সাহিত্যিক প্রকরণজাত জিজ্ঞাসাও তাই বহু প্রাচীন। কিন্তু শুধু প্রাচীন ঐতিহ্যকে স্মরণ করা নয়, যুগ ও কাল পরিবর্তনের ফলশ্রুতিতে বিচিত্র থেকে বিচিত্রতর রূপান্তরের মধ্য দিয়ে তার অগ্রসরণ, অতীতের সঙ্গে বর্তমান ও ভবিষ্যতকে সাঙ্গীকৃত করে এগিয়ে চলার মধ্যেই রয়েছে তার স্বারূপ্যের অনশ্বরত্ব।

> With the development of Translation Studies as a discipline in its own right with a methodology that draws on comparatistics and cultural history. Translation has been a major shaping force in the development of world culture and no study of Comparative literature can take place without regard to translation.[১]

সুতরাং অনুবাদ ছিল, আছে এবং থাকবে। সংশয় নেই তুলনামূলকতার প্রয়োগেও। তুলনামূলক সাহিত্যতত্ত্ব এবং গ্রহণ-প্রক্রিয়ার মধ্যে দিয়ে পাঠক-লেখক-সমালোচক অনুবাদের অনিবার্যতাকে স্বীকার করতে বাধ্য হয়েছে। যদিও অনুবাদের স্বরূপ সম্বন্ধে বা প্রক্রিয়া সম্পর্কে পাঠক-লেখক-সমালোচকদের অভিব্যক্তি ভিন্ন ভিন্ন। খ্রি. পূর্ব. সময় থেকে বর্তমান সময় পর্যন্ত ক্রমাগত চড়াই-উৎরাই-এর পথ বেয়ে 'অনুবাদ' আজ পদ্ধতি থেকে তত্ত্বে রূপান্তরিত। এই দীর্ঘসময় ইতিহাসের রূপ কিছু কম বিচিত্র নয়। সূচনা থেকে মোহনা পর্যন্ত এই সুদীর্ঘ পথ পরিক্রমার সূচনায় কিভাবে কোন্ প্রয়োজন সাধনার্থে এর আবির্ভাব ঘটেছিল, সেই ঐতিহাসিক তথ্য অনুমান-নির্ভর। তবে, এর প্রাচীনত্ব নিয়ে কোন সংশয় নেই।

পাশ্চাত্য সাহিত্যের ইতিহাসে সম্ভবত প্রথম অনুবাদ গ্রন্থ *বাইবেল* এবং হোমার রচনাবলী, আর অনুবাদের প্রবক্তা হলেন রোমানরা। 'অনুবাদতত্ত্ব' নিয়ে প্রথম আলোচনা করেন সম্ভবত সিসেরো (খ্রি. পূ. ১০৬-৪৩) এবং হোরেস (খ্রি. পূ. ৬৫-০৮)। গ্রিক সাহিত্য ও সাহিত্যতত্ত্ব নিয়ে আলোচনাকালে 'অনুবাদতত্ত্ব'-ও তাঁদের সমালোচ্য বিষয় হয়ে উঠেছিল এবং অনুবাদ প্রক্রিয়ার ক্ষেত্রে তারা আক্ষরিক অনুবাদ অপেক্ষা ভাবানুবাদকেই প্রাধান্য দিয়েছিলেন। সেক্ষেত্রে 'উৎসপাঠ' থেকে অনূদিত পাঠের মধ্যে দিয়ে রূপান্তরিত পাঠকে তাঁরা তুলনা করেছিলেন বসন্তে বৃক্ষের পর্ণমোচনের সঙ্গে। একই বৃক্ষ পর্ণমোচনকালে যেমন নবরূপ লাভ করে, অনূদিত পাঠও তেমনি প্রকৃতিগত দিক থেকে এক হলেও রূপগত দিক থেকে নতুন বলে প্রতিভাত হয়। অনুবাদ সহ 'অনুবাদতত্ত্ব' প্রসঙ্গে কবি-সমালোচক হোরেস-এর এই মন্তব্য 'অনুবাদতত্ত্ব' প্রসঙ্গে প্রথম এক গুরুত্বপূর্ণ প্রাপ্তি।

রোমান ক্লাসিসিজমের অন্যতম তাত্ত্বিক লন্‌জাইনাস (খ্রি. পূ. ১ম শতক) আক্ষরিক অনুবাদের অন্ধ অনুকরণত্ব থেকে কাব্যসাহিত্যকে মুক্তি দেওয়া উচিত বলে মনে করেছিলেন। লক্ষণীয়, অনুবাদ ক্ষেত্রে কাব্যসাহিত্য, কাব্যতত্ত্ব-র পাশাপাশি ধর্মগ্রন্থও একটা প্রধান ভূমিকা গ্রহণ করেছিল। খ্রিস্টধর্মের প্রভাব ও প্রসারোপলক্ষে *বাইবেল* অনুবাদ একটি বিশিষ্ট ধারা হয়ে উঠেছিল। এবং শুধু ধর্মীয় ক্ষেত্রে নয়, সমাজ সংস্কৃতি পরিবর্তনের ক্ষেত্রেও এর একটি নির্ধারক ভূমিকা লক্ষ করা গিয়েছিল এবং এক্ষেত্রেও আক্ষরিক অনুবাদ না ভাবানুবাদ কোন্‌টি সার্থকতর প্রয়োগ, তা নিয়ে বিতর্ক সৃষ্টি হয়েছিল। এই বিতর্কের মধ্যে দিয়ে ধরা পড়েছে সাহিত্যিক অনুবাদের ওপর সমাজসংস্কৃতি সম্পৃক্ত পরিবর্তনের প্রভাব, এবং এর মধ্যে দিয়ে অনুবাদের সঙ্গে তুলনামূলকতার অঙ্গাঙ্গী সম্পর্কটিও ধরা পড়ে। দুটি ভিন্ন দেশীয় ভাষার মধ্যে সম্পর্কস্থাপনের মাধ্যমরূপে অনুবাদপাঠ বা দুটি ভিন্নকালের মধ্যে সম্বন্ধ নির্মাণের সূত্ররূপে অনুবাদপাঠ তুলনামূলকতার অপরিহার্য শর্ত হয়ে ওঠে। সেক্ষেত্রে 'উৎসপাঠ' থেকে 'উদ্দিষ্ট পাঠ'-এর রূপান্তরণ প্রক্রিয়ায় অনুবাদকের ভূমিকা, তার পাঠকসত্তার প্রতিক্রিয়াও কম গুরুত্বপূর্ণ নয়। সেখানে অনুবাদক তথা পাঠক কিভাবে 'উৎসপাঠ'-কে গ্রহণ করছে এবং 'উদ্দিষ্টপাঠ' নির্মাণে সেই গ্রহণ কী ভূমিকা পালন করছে, এটিও অনুবাদের ক্ষেত্রে একটি প্রধান আলোচ্য বিষয়। যেমন, পাশ্চাত্যের অন্যতম সমৃদ্ধ সাহিত্যশাখা ইংরেজি সাহিত্যের আধুনিকতার জনক মহাকবি চসার (খ্রি. ১৩৪০-১৪০০), তাঁর অনুবাদে স্বাধীন আত্মীকরণ ও সচেতন 'ঋণগ্রহণ'-কে প্রতিষ্ঠিত করে যেমন 'উৎসপাঠ'-এর নবায়ন ঘটিয়েছিলেন, তেমনি আবার মহাকবি দান্তে (খ্রি. ১২৬৫—১৩২১) অনুবাদের মধ্যে 'উৎসপাঠ'-এর যথারূপতার ওপর গুরুত্ব আরোপ করেছিলেন। আসলে অনুবাদের প্রাথমিক কাল থেকেই অনুবাদকের দক্ষতার প্রশ্নটি অন্যতম

প্রধান বিবেচ্য বিষয় হয়ে উঠেছিল। অনুবাদকের স্রষ্টাসম ভূমিকার দ্বারাই তখন অনুবাদের শিল্পোৎকর্ষের মানদণ্ড নির্ধারিত হয়েছিল।

চর্তুদশ শতাব্দীর পরবর্তী সময় থেকেই সচেতন ভাবে অনুবাদতত্ত্ব সম্পর্কিত ভাবনাচিন্তার প্রকাশ ঘটতে শুরু করে। ফরাসি তাত্ত্বিক এতিয়েন দোলে (খ্রি. ১৫০৯-৪৬) অনুবাদের ব্যবহারিক তত্ত্ব সম্পর্কে একটি সংক্ষিপ্ত প্রতিবেদন প্রকাশ করেন। ফরাসি প্রবন্ধটির নাম ছিল 'La maniere de bien traduire d' une language a une autve' (How to translate well from one language into another)— এই প্রবন্ধে তিনি অনুবাদের বিশিষ্টতাকে বিশ্লেষণ না করে অনুবাদকের বিশিষ্টতার বিশ্লেষণ করেছিলেন। তিনি প্রধানত অনুবাদকের ভূমিকার যে বৈশিষ্ট্যগুলিকে চিহ্নিত করেছিলেন, তার মধ্যে উল্লেখযোগ্য হল—

(১) অনুবাদক অবশ্যই উৎসপাঠ এবং উদিষ্টপাঠ সম্পর্কে নিখুঁত জ্ঞানের অধিকারী হবেন।

(২) অনুবাদ করার পূর্বে অনুবাদককে উৎসপাঠের অর্থ ও ভাব— এই উভয়দিক সম্পর্কে সম্পূর্ণভাবে উপলব্ধি করতে হবে এবং মূলের দুর্বোধ্যতাকে ব্যাখ্যা করার স্বাধীনতা অনুবাদকের থাকবে।

(৩) অনুবাদক অবশ্যই আক্ষরিক অনুবাদকে এড়িয়ে চলার স্বাধীনতা পাবেন। যদিও উৎসপাঠের মূলসুরটিকে যথাযথভাবে উপস্থাপনার দিকে দৃষ্টি রাখতে হবে।

স্বাভাবিক ভাবেই দোলে-র বক্তব্য অনুযায়ী আদিলেখক ও প্রথম পাঠ অপেক্ষা অনুবাদক এবং অনূদিত পাঠের গুরুত্বই প্রধান হয়ে ওঠে। এক্ষেত্রে অনুবাদকের পাঠকসত্তার স্বীকৃতিই পরোক্ষে উত্থাপিত হয়। 'অনুবাদকের স্বাধীনতা'— এই বিতর্কিত বিষয়টির অন্তরালে অনুবাদকের পাঠকসত্তার প্রতিক্রিয়াই যেন সমর্থিত হয়। এই ধারণার প্রয়োগ পাশ্চাত্যের বেশকিছু কবি সাহিত্যিক তাত্ত্বিকদের রচনায় ও ভাবনায় লক্ষণীয়ভাবে ফুটে উঠেছিল পরবর্তীকালে। বিখ্যাত হোমার-অনুবাদক জর্জ-চ্যাপম্যান (খ্রি. ১৫৫৯-১৬৩৪) বা এলিজাবেথীয় যুগের প্রথমার্ধের কাব্যভাবনায় নবজাগরণের পথিকৃৎ-কবি ওয়াট (খ্রি. ১৫০৩-৪২) বা সারে (খ্রি. ১৫১৭-৪৭) যখন পেত্রাকীয় সনেট অনুবাদ করেন, বা অনুবাদতাত্ত্বিক ফিলমন হল্যাণ্ড (খ্রি. ১৫৫২-১৬৩৭)-এর রচনা 'translator general'-এ যে ভাবনার অনুবর্তন লক্ষ করা গেল তা তুলনাত্মক 'গ্রহণ'-এর নামান্তর বলা যায়।

রেনেসাঁর জ্ঞানদীপ্তি সামাজিক ও সাংস্কৃতিক ভাবনায় দ্রুত রূপান্তরণ, রাজনৈতিক-অর্থনৈতিক এবং শিল্পগত ক্ষেত্রে পরিবর্তন এবং উন্নয়ন, সাহিত্যক্ষেত্রকেও প্রভাবিত করেছিল। 'অনুবাদতত্ত্ব'-ও তার ব্যতিক্রম ছিলনা। তাই যখন দেকার্ত (খ্রি. ১৫৯৬-১৬৫০) তাঁর তাত্ত্বিক পদ্ধতির মধ্য দিয়ে এই বক্তব্যকে প্রতিষ্ঠিত করার চেষ্টা করলেন যে, প্রাচীন ঐতিহ্যের অনুকরণ, আসলে একধরনের নবরূপায়ণও তখন তা বিদ্বৎসমাজে স্বীকৃতি লাভ করল। দেকার্ত-এর তত্ত্বই অনুসরণকারী জন ডেনহ্যাম (খ্রি. ১৬১৫-৬৯) এই মতামত প্রতিষ্ঠিত করার চেষ্টা করলেন যে, মৌলিক স্রষ্টা ও অনুবাদক— সৃষ্টি ক্ষেত্রে উভয়ের অবদান সমতুল্য। পার্থক্য কেবল দেশকালগত পটভূমিকায়। তাঁর মতানুযায়ী মূল পাঠের সারনির্যাসকে অনূদিত পাঠে প্রতিস্থাপিত করতে গেলে, তাকে নবায়িত করা অনুবাদকের কর্তব্য হয়ে পড়ে। অর্থাৎ বক্তব্যে অনুবাদকের পাঠকসত্তার গুরুত্বের সঙ্গে সামাজিক প্রেক্ষাপটের গুরুত্বও স্বীকৃতি পেল। আব্রাহাম কাউলি (খ্রি. ১৬১৮-৬৭) আর একটু অগ্রসর হয়ে বললেন যে, অনুবাদের ক্ষেত্রে গ্রহণ বর্জন বা সংযোজন— সব ধরনের স্বাধীনতাই অনুবাদকের ইচ্ছাধীন। এ যেন লেখকের মৃত্যু, পাঠকের উত্থান।

'কাউলি' অনুকরণকৃত অনুবাদকে একেবারে অগ্রাহ্য করলেও সমসাময়িক কালের কবি ড্রাইডেন (খ্রি. ১৬৩১-১৭০০) বা পোপ (খ্রি. ১৬৮৮-১৭৪৪) অনুবাদ সমস্যা সংক্রান্ত তাত্ত্বিক বিতর্কের দুই চূড়ান্ত বিপরীত মেরুর মধ্যবর্তী এক পন্থাকে শ্রেয় বলে গ্রহণ করেছিলেন। ড্রাইডেন অনুবাদ পদ্ধতিকে তিনটি ধারায় বিভক্ত করেছিলেন—

(১) Metaphrase (রূপান্তর/ শব্দান্তর) : প্রতিশব্দ এবং প্রতি পঙ্‌ক্তি ধরে আক্ষরিক অনুবাদ করা।

(২) Paraphrase (পল্লবিত ভাষান্তর/ ভাবানুবাদ) : মূলের অর্থ অপরিবর্তিত রেখেও শব্দান্তরে অর্থপ্রকাশ বা পল্লবিত করে অনুবাদ করার প্রচেষ্টা। প্রধানত 'ভাব থেকে ভাবে' অনুবাদ করা।

(৩) Imitation (অনুকরণ/অনুসৃত অনুবাদ) : মূল সাহিত্যের প্রেরণায় সদৃশ সাহিত্য সৃষ্টি বা অনুবাদ। আত্মীকরণ (Adaptation) ভাবনার দ্বারা প্রধানত এ ধরনের অনুবাদ-কর্ম নির্মিত হয়ে থাকে।

ড্রাইডেন মধ্যপন্থাকেই যথাযথ বলে গ্রহণ করেছিলেন। আলেকজাণ্ডার পোপ-ও এই অনুবাদ ভাবনাকেই মূলত অনুসরণ করেছিলেন। আসলে এই সময়ের 'অনুবাদতত্ত্ব' ভাবনায় সমসাময়িককালের পাঠকসমাজের প্রতি দায়বদ্ধতাই অনুবাদকের নৈতিক দায়িত্ব হয়ে উঠেছিল।

অষ্টাদশ শতাব্দীতেই জার্মান কবি-সাহিত্যিক ও সাহিত্যতাত্ত্বিক গ্যেটে (খ্রি. ১৭৪৯-১৮৩২) অনুবাদতত্ত্বের বৌদ্ধিক ও ব্যবহারিক মূল্যে কিছু যৌক্তিক পরিবর্তন আনলেন। গ্যেটের অনুবাদতত্ত্ব সংক্রান্ত চিন্তনের উল্লেখযোগ্য বিশেষত্ব হল যে, তিনি একই সময়ে ও একই ভাষা-মাধ্যমে অনূদিত প্রতিটি সাহিত্যকর্মকেই অনুবাদকৃত্যকের তিনটি স্তরের মধ্যে দিয়ে অতিক্রান্ত হতে হয়, এই বক্তব্যকে উপস্থাপিত করলেন। প্রথম স্তরটি হল— বিদেশী সাহিত্যকে দেশীয়স্তরে পরিচিতি করানো; দ্বিতীয় স্তরটি হল উপযুক্ত প্রতিস্থাপন ও পুনর্গঠন, যেখানে অনুবাদক বিদেশী সৃষ্টির মূল অনুভবটিকে আত্মস্থ করে, তাকে নিজস্ব ভাষায় (অনুবাদক যে ভাষায় অনুবাদ করছেন) পুনর্নির্মাণ করবেন এবং তৃতীয় স্তরে 'উৎস পাঠ' ও 'অনূদিত পাঠ'-কে নিখুঁত স্বকীয়তায় প্রতিষ্ঠিত করাই হবে অনুবাদকের প্রধান উদ্দেশ্য। এই স্তরটি সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ— কারণ এই স্তরে অনুবাদকের উদ্দেশ্য থাকে মূলের অনন্যত্ব বজায় রেখেও অনূদিত পাঠ-কে এক নবরূপ ও গঠন প্রদান করা। আর এইভাবেই সম্ভব হয় সাহিত্য সৃষ্টির ক্ষেত্রে এক নতুন ধারার প্রবর্তন করা। অনুবাদতত্ত্ব সম্পর্কে 'গ্যেটের' এই বক্তব্যের তাৎপর্য ছিল সুদূর- প্রসারী।

> Goethe is arguing for both a new concept of 'Orginality' in translation together with a vision of universal deep structures that the translator should strive to meet. The problem with such an approach is that it is moving dangerously close to a theory of untranslatability.[২]

১৭৯১ খ্রি. অনুবাদতত্ত্ব ও অনুবাদ প্রক্রিয়ার ওপর প্রথম পূর্ণাঙ্গ সংকলন *প্রিন্সিপলস্ অফ ট্রানস্লেশন* শীর্ষক গ্রন্থটি প্রকাশ করেন আলেকজাণ্ডার ফ্রেসার টাইটলার (খ্রি. ১৭৪৭—১৮১৩)। ইংরেজি ভাষায় রচিত এই সংকলন-গ্রন্থটি অনুবাদ বিষয়টির পদ্ধতি থেকে তত্ত্বে রূপান্তরণের প্রথম ধাপ বলা যায়। টাইটলার অনুবাদের ক্ষেত্রে তিনটি প্রধান সূত্রকে চিহ্নিত করেন—

(১) অনুবাদ মূল সৃষ্টি সম্পর্কে একটি পরিপূর্ণ ধারণাকে উপস্থিত করবে।

(২) মূলের প্রকৃত চরিত্রকে অনুবাদেও একইভাবে লিখনশৈলী ও ধারার মধ্য দিয়ে উপস্থাপিত করতে হবে।

(৩) অনুবাদে মূলের সকল বিন্যাসই রাখতে হবে।

টাইটলার পূর্বজ অনুবাদতাত্ত্বিকদের তত্ত্বগত দ্বান্দ্বিকতা থেকে কিয়দংশে গ্রহণবর্জন করে অনুবাদতত্ত্বের সেই রূপকে উপস্থাপিত করলেন, যাতে অনূদিত সাহিত্যে স্রষ্টার মৌলিকতাটুকু ধরা পড়ে, একই সঙ্গে অনুবাদকেরও উৎস পাঠ থেকে অনূদিত পাঠে আসার সময় কোনো দুরূহতা বা দুর্বোধ্যতাকে দূর করার জন্য সংযোজন বা বিয়োজনের স্বাধীনতাও থেকে যায়। টাইটলার মূলত মধ্যপন্থা অবলম্বন করে পুনরায় অনূদিত পাঠে স্রষ্টার আধিপত্যকে স্বীকার করে নিলেন।

ঊনবিংশ শতাব্দী চিহ্নিত হয় রোমান্টিকতার ভাবাতিরেক এবং প্রথানুগত্যের বন্ধনমুক্তির জন্য। পুরাতনের নবরূপায়ণ পাশ্চাত্যের পূর্বতন সাহিত্যতত্ত্বেও আমূল পরিবর্তন নিয়ে এল। রোমান্টিক যুগের মহাগ্রন্থ *লিরিক্যাল ব্যালাডস্* (খ্রি. ১৭৯৮-এ প্রকাশিত)-এ নির্মিত হল এক অন্যতর কাব্যপৃথিবীর রূপ। অনুবাদের ক্ষেত্রও এর বাইরে রইল না। কোলরিজ (খ্রি. ১৭৭২-১৮৩৪) রচিত *বায়োগ্রাফিয়া লিটারেরিয়া* (প্রকাশিত ১৮১৭ খ্রি.) বা শেলির (খ্রি. ১৭৯২-১৮১২) *দি ডিফেন্স অফ পোয়েট্রি* (১৮২০ খ্রি. প্রকাশিত)-তে 'কাব্যানুবাদ'-কে নিম্নমানের সাহিত্যকৌশল বলে চিহ্নিত করা হল, এবং আলোচনাক্রমে অনুবাদতত্ত্ব সম্পর্কে জার্মান ও ইংলণ্ডীয় ভাবনা একসময়ে দুটি ভিন্ন ধারায় প্রবাহিত হল। অনুবাদতত্ত্ব সম্পর্কিত আলোচনায় গ্যেটে-র অভিনব তত্ত্ব, তার রূপরীতি, আঙ্গিকগত চেতনা যখন অনুবাদ সাহিত্যধারাকে প্রায় নবসৃষ্টির মর্যাদা দিচ্ছে, তখন ইংলণ্ডের রোমান্টিক কবিকুলের কাছে তা শুধুমাত্রই অনুকরণ-প্রিয়তার নিদর্শন বলে চিহ্নিত হল। এই সময় থেকেই সেই বিতর্কিত প্রশ্নটি উভয়দেশীয় সাহিত্যতাত্ত্বিকদের মধ্যে প্রধান আলোচ্য বিষয় হয়ে উঠেছিল যে 'অনুবাদ' বিচার্য কোন্‌দিক দিয়ে— সৃষ্টিরূপে না পরিবর্ত রচনারূপে?

আশ্চর্যের বিষয় এই যে, অনুবাদ প্রসঙ্গে যে-সময়ে এই বিতর্ক চলছিল, সেই সময়েই বহু অনুবাদকের আবির্ভাব এবং অনুবাদের সংখ্যাবাহুল্য দেখা গেল। সেই সময়ের সাহিত্যতাত্ত্বিকদের মধ্যে আবার অন্য একটি সমস্যার উদ্ভব ঘটল যে, 'অনুবাদতত্ত্ব' ও 'প্রভাবতত্ত্ব'-র মধ্যে পার্থক্য কতখানি বা অনুবাদকের স্বীকরণদক্ষতা অনূদিত পাঠে কিভাবে প্রকাশিত হচ্ছে? এই বিতর্কে আরও একটা জিজ্ঞাসা উচ্চারিত হল যে, অনূদিত পাঠে অনুবাদকের স্বীকরণ বা আত্মস্বীকরণের ক্ষেত্রে 'গ্রহণতত্ত্ব' কতখানি কার্যকরী এবং গ্রাহকের প্রকৃতি কি কোনোভাবে অনুবাদকে প্রভাবিত করে? ঊনবিংশ শতাব্দীর প্রথমার্ধে এই সকল প্রশ্ন উত্থাপিত হওয়ার মূলে ছিল 'অনুবাদতত্ত্ব' সম্পর্কে দুই জার্মান তাত্ত্বিকের মতাদর্শ।

এ. ডব্লু. শ্লেগেল (খ্রি. ১৭৬৭-১৮৪৫) মানবিক যাবতীয় কথোপকথন ও লেখনের মধ্যেই অনুবাদ-ক্রিয়াকে লক্ষ করলেন। বললেন, যোগাযোগ প্রক্রিয়ার প্রাকৃতিক রূপই যেন এক অনুবাদ। যেমন প্রেরিত বার্তা গ্রহণের ক্ষেত্রে ভাষান্তরণের একটি ভূমিকা আছে, তেমনই আবার বক্তব্যের মূলকে ধরে রাখার প্রয়াসও বর্তমান থাকে। অনুবাদেও এই প্রক্রিয়া বর্তমান রয়েছে।

'অনুবাদতত্ত্ব'-র এই প্রাকৃত ভাবনাকে আরও একটু ক্রমপ্রসারিত করে ফ্রেডারিক শ্লেগেল (খ্রি. ১৭৭২-১৮২৯) ব্যাখ্যা করলেন যে, কোন ভাষা বা সাহিত্যের অনুবাদ শুধু যোগাযোগ প্রক্রিয়ার এক মাধ্যম নয়, তা চেতনারও এক বিন্যাস। ফ্রেডারিকের এই বক্তব্যে পথিকৃৎ জার্মানতাত্ত্বিক গ্যেটের অনুবাদ ভাবনার আরও পরিশীলিত রূপ পাওয়া গেল।

আসলে ঊনবিংশ শতাব্দীর অনুবাদতত্ত্বের এই দ্বিমুখীনতার কারণ হিসেবে দুটি বিষয়ের উল্লেখ করা যায় ; তা হল— অনুবাদক্ষেত্রে বেশ কিছু প্রতিভাদীপ্ত সাহিত্যিকদের আবির্ভাব,

যাঁদের লেখনীস্পর্শে শুধু মৌলিক সাহিত্যধারাই সমৃদ্ধ হয়নি, অনুবাদধারাও প্রায় মৌলিক সাহিত্যের গৌরব অর্জন করেছিল। অবশ্য এই সময়ে বহুসংখ্যক অদক্ষ যান্ত্রিক অনুকরণও 'অনুবাদ' বলে পরিচিত হয়েছিল। এই পার্থক্য অনুবাদের ক্ষেত্রে 'গ্রহণতত্ত্ব'-র গুরুত্বকে স্পষ্ট করে তুলল। অনুবাদের ক্ষেত্রে 'গ্রহণতত্ত্ব'-র গুরুত্ব ও প্রয়োজনীয়তা আরো দুটি দিক দিয়ে বিবেচ্য হয়ে উঠল : প্রথমত কোনো কবিপ্রতিভার অসামান্যতা অনুবাদের ক্ষেত্রে কিরূপে প্রকাশ পায়, দ্বিতীয়ত কাব্যানুবাদের আক্ষরিকতাকে ছাড়িয়ে তা কতখানি মূল কবিতার ব্যঞ্জনাময়তাকে উপস্থাপিত করতে সক্ষম হয়। কারণ, কবিতা তো শুধু বাচনিক বা পঠনীয় নয় সেখানে লুকোনো থাকে অনেক অনির্বচনীয় গভীর গম্ভীর নৈঃশব্দ্যও।

অনুবাদতত্ত্ব নিয়ে এই বাদানুবাদের প্রেক্ষাপটে ফ্রেডারিক শ্লাইয়ের মাহের (খ্রি. ১৭৬৮-১৮৩৪) তো অনুবাদের জন্য এক পৃথক 'ভাষারূপ' নির্মাণ করারই প্রস্তাব করেন। রোমান্টিব যুগের পরবর্তী সময়ে অনুবাদতত্ত্বে বহু প্রবক্তা এসেছিলেন, ফলে অনুবাদ নিয়ে পক্ষে বিপক্ষে বহু বিপরীতধর্মী মতামতের উদ্ভব ঘটেছে। ফ্রেডারিক শ্লাইয়ের মাহের, ডব্লু নিউম্যান (খ্রি. ১৮০৫-১৮৯৭) টমাস কার্লাইল (খ্রি. ১৭২৫-১৮৮১), উইলিয়াম মরিস (খ্রি. ১৮৩৪-১৮৯৬), ডি. জি. রসেটি (খ্রি. ১৮২৮-১৮৮২) প্রমুখ সাহিত্যিক অনুবাদক ও অনুবাদতাত্ত্বিকদের অনুবাদ ভাবনার বিপ্রতীপতা এতটাই লক্ষণীয় যে, সাম্প্রতিক কালের সমালোচকরাও, অনুবাদতত্ত্ব আলোচনাকালে সে বিষয় উত্থাপন না করে পারেন নি।

> ....Pre Raphaelite concept of Translation, therefore is an interesting paradox. On the one hand there is an immense respect, verging on adulation, for the original, but that respect is based on the individual writer's sureness of its worth. In other words, the translator invites the intellectual, cultivated reader to share what he deems to be an enriching experience either on moral or aesthetic grounds.[৩]

ম্যাথিউ আর্নল্ড (খ্রি. ১৮২২-৬৪)-এর অনুবাদ সংক্রান্ত ধারণা থেকে উৎসপাঠ ও অনূদিত পাঠ বা উদ্দিষ্ট পাঠে পাঠকসমাজের গুরুত্ব যেভাবে স্বীকৃত হল, তা থেকেই পরবর্তী কালে 'গ্রহণতত্ত্ব' বা 'পাঠক প্রতিক্রিয়াবাদ'-এর তাৎপর্য আরও অনেকবেশি উদ্‌ঘাটিত হল। কারণ, অনুবাদক যখন কোনো একটি মূল পাঠ ভাষান্তরিত করেন, তখন তার সামনে থাকে উদ্দিষ্ট পাঠের পাঠকসমাজ। উদ্দিষ্ট পাঠ যে ভাষায় পরিবর্তিত হচ্ছে, সেই ভাষানুগামী পাঠকসমাজের গ্রহণ অনুকূল করেই অনুবাদককে উৎসপাঠটি রূপান্তরিত করতে হয়। পাঠের ক্ষেত্রেও পাঠকসমাজের বিভিন্ন শ্রেণীর কথা অনুবাদককে মনে রাখতে হয়। কারণ সাধারণ একভাষিক পাঠক ও বহুভাষিক পাঠকদের মধ্যেকার বৈদগ্ধ্যের পার্থক্য, অনুবাদের শিল্পিত মান বোঝার ক্ষেত্রেও পার্থক্যের সূচনা করে। সুতরাং পাঠকসমাজের শিল্পবোধজনিত মাত্রার পার্থক্যের কারণে যে বিচিত্র শ্রেণীর পাঠকসমাজ সৃষ্টি হয়, তাদের কাছেও আবার অনুবাদ এবং অনুবাদকের শিল্পবোধজনিত সৃষ্টিক্ষমতার পার্থক্যও সমভাবে বিচার্য হয়ে ওঠে। তখন অনুবাদকের দক্ষতা এবং ক্ষমতার পার্থক্যও অনুবাদের ক্ষেত্রে একটা গুরুত্বপূর্ণ নির্ধারক হয়ে ওঠে।

তাই, আর্নল্ডের মতানুযায়ী অনুবাদককে প্রথমেই উৎসপাঠ সম্পর্কে সম্পূর্ণ জ্ঞান লাভ করতে হবে এবং অনূদিত পাঠকে এমনভাবে উপস্থাপিত করতে হবে, যাতে উদ্দিষ্ট পাঠক উৎসপাঠ সম্পর্কে একটা ধারণা তৈরি করতে পারে। সেই অনূদিত পাঠকে আবার অনূদিত

বা উদ্দিষ্ট ভাষার সাহিত্যচেতনার অনুগামী হয়েই নির্মিত হতে হবে, যাতে উদ্দিষ্ট পাঠক সহজেই সেই অনুবাদকে গ্রহণ করতে সক্ষম হয়। প্রয়োজনে তুলনামূলক মূল্যায়নের জন্য দুটি পাঠকেই পাশাপাশি রাখার কথা বললেন তিনি।

সমসাময়িক কালের আর এক কবি-অনুবাদক এইচ. ডব্লু. লংফেলো (খ্রি. ১৮০৭-৮১)-র দৃষ্টিভঙ্গি অনুযায়ী অনুবাদকের ভূমিকা হবে একজন কুশলী 'কারিগর'-এর; না সাহিত্যস্রষ্টার না ধারাভাষ্যকারের। যার নির্ধারিত সীমায়িত কাজ সম্পর্কে পরিষ্কার ধারণা আছে। অর্থাৎ অনুবাদক হবেন এমন একটি চরিত্র যিনি অনুবাদের মধ্যে রচনাকারকেও খুঁজে নেবেন, আবার নিজেকেও চেনাবেন।

রুশ সাহিত্যিক গোগল (খ্রি. ১৮০৯-১৮৫২)-এর মতানুযায়ী আদর্শ অনুবাদককে হতে হবে একটি স্বচ্ছ কাচের মতো। কাচটি এতটাই স্বচ্ছ হবে যে পাঠক লক্ষই করবে না যে সেখানে একটি কাচ আছে। আসলে, এইসকল বক্তব্যের মধ্যে দিয়ে অনুবাদের ক্ষেত্রে মূলের প্রতি বিশ্বস্ত থাকাই যে অনুবাদকের লক্ষ্য হওয়া উচিত সেই মতামতকেই প্রতিষ্ঠিত করার প্রয়াস রয়েছে।

কিন্তু অনুবাদের এই তথাকথিত ত্রুটিহীন ক্ষেত্রে উপনীত হওয়া বাস্তবে প্রায় অসম্ভব। মূলের প্রতি বিশ্বস্ততার আধিক্য অনেক ক্ষেত্রেই অনুবাদকে হাস্যকর করে তোলে। আবার বিশ্বস্ত থাকার কোনো দায় না-থাকা অনুবাদও দেখা যায়। এরকমই এক বিপ্রতীপ ধারণা নিয়ে উপস্থিত হয়েছিলেন ই. ফিটজেরাল্ড (খ্রি. ১৮০৯-৬৩)। ফিটজেরাল্ড উৎসপাঠ থেকে উদ্দিষ্ট পাঠকে সমসাময়িক সাহিত্যিক ঐতিহ্য ও ভাবনার ছাঁচে ফেলে নির্মাণ করলেন। সেটাই তাঁর কাছে ছিল 'বাস্তবের অধিকার'— তাঁর এই আগ্রাসী মতবাদের মূলে ছিল তাঁর উগ্র ঔপনিবেশিক চেতনা। উদাহরণ হিসেবে উল্লেখ করা যায় ফিটজেরাল্ড-এর বিখ্যাত অনুবাদ *রুবাইয়াৎ-ই-ওমর খৈয়াম*-এর প্রসঙ্গ। যে-অনুবাদে মধ্যযুগের পারসি কবিতা সম্পূর্ণভাবেই ভিক্টোরিয়ান যুগের বৈশিষ্ট্যের দ্বারা গ্রস্ত হয়ে এক নবরূপ লাভ করেছিল।

প্রসঙ্গত, স্মর্তব্য যে, ঊনবিংশ শতাব্দীর রোমান্টিক ভাবধারার পরবর্তী সময়ে পাশ্চাত্যের বাণিজ্যকেন্দ্রিক ধনবাদী অর্থনৈতিক চেতনার প্রতিষ্ঠা লাভ এবং ঔপনিবেশিক রাজনৈতিক আগ্রাসনের সাফল্য প্রথম বিশ্বযুদ্ধ পূর্বকালীন সময় পর্যন্ত সাহিত্যিক ঐতিহ্যকে যেভাবে অনুপ্রাণিত করেছিল তার প্রভাবে অনুবাদতত্ত্বও প্রভাবিত হয়েছিল। সে সময়ের প্রধান কয়েকটি 'অনুবাদতত্ত্ব' সংক্রান্ত ভাবনাকে পর্যায়ক্রমিকভাবে চিহ্নিতকরণ করা যায় এইভাবে—

প্রথমত — উদ্দিষ্ট পাঠের তুলনায় উৎসপাঠের উৎকর্ষ প্রতিপাদন এবং ফলশ্রুতিতে 'বিদগ্ধ' পাঠক-কে উৎসপাঠ সম্পর্কে উৎসাহিত করে তোলা।

দ্বিতীয়ত — প্রতি 'অনুবাদক'-ই উৎসপাঠকে উদ্দিষ্ট পাঠকের সামনে নিজের মতো করে উপস্থাপিত করতে পারেন, কারণ উৎসপাঠকে উন্নত করাই হয়ে ওঠে অনুবাদকের লক্ষ্য।

তৃতীয়ত — অনুবাদ হল উদ্দিষ্ট পাঠের পাঠকের কাছে সেই সাহায্যসূত্র, যার মাধ্যমে উদ্দিষ্ট পাঠে উপস্থাপিত উৎসপাঠের স্বকীয়তাকে পাঠক (উদ্দিষ্ট পাঠের পাঠক) বুঝতে পারে এবং উৎসপাঠ সম্পর্কে আগ্রহী হয়ে ওঠে।

এখানে লক্ষণীয় যে, 'অনুবাদতত্ত্ব'-র ভাবনায়, প্রথম বৈশিষ্ট্যটিতে অনুবাদ অপেক্ষা গবেষণা তথা গবেষকের প্রাধান্য; দ্বিতীয়টিতে অনুবাদকের ব্যক্তিগত দক্ষতা ও তার স্বাধীনতারই সমধিক গুরুত্ব। তৃতীয় বৈশিষ্ট্যের মধ্যেই অনুবাদের প্রকৃত বৈশিষ্ট্যের ছোঁয়া পাওয়া যাচ্ছে।

সাম্প্রতিক কালে অনুবাদতত্ত্ব যেভাবে আলোচিত হচ্ছে সেখানে ভাষাতত্ত্ব, সাংস্কৃতিক ইতিহাস, দর্শন প্রভৃতির সঙ্গে সাহিত্যতত্ত্বের নানা ধারা শুধু সম্মিলিত হয়নি, নানামাত্রায় বিশ্লেষিতও হয়েছে। যেমন বিংশ শতাব্দীর দ্বিতীয়ার্ধে ইভান জোহর (খ্রি. ১৯৩৯) অনুবাদের সঙ্গে সমাজতত্ত্বকে যুক্ত করে দেখালেন যে, তুলনামূলকভাবে দুর্বল, প্রান্তিকায়িত সাংস্কৃতিক আবহে অনুবাদের প্রবণতা অনেক বেশি হয়ে থাকে। একটি নির্দিষ্ট কালপর্বে, নির্দিষ্ট সাংস্কৃতিক পরিসরে অনূদিত পাঠকৃতির মূল্যায়নে মূলসাহিত্যের সমাজতত্ত্ব নির্ণয়ও অনুবাদচর্চার একটা প্রধান প্রতিপাদ্য বিষয় ওঠে। কারণ সামাজিক সাংস্কৃতিক রাজনৈতিক বাধ্যবাধকতার নানা রূপ সূক্ষ্ম ও ব্যাপকভাবে অনুবাদের বিষয় ও শৈলীকে প্রভাবিত করে। আবার অনুবাদ প্রভাবিত করে ভাষাসাহিত্য ও সংস্কৃতিকে।

অনুবাদচর্চায় উপনিবেশোত্তর ভাবনাকে প্রতিষ্ঠিত করে আফ্রিকার অন্যতম আধুনিক সাহিত্যস্রষ্টা ও সাহিত্যতাত্ত্বিক ওলেসোয়েস্কা (খ্রি. ১৯৩৪) দেখিয়েছেন যে অনূদিত পাঠে কিভাবে ঔপনিবেশিক প্রভাবের অভিব্যক্তি সর্বাতিশায়ী হয়ে উদ্দিষ্ট সাহিত্যের নিজস্ব প্রেক্ষিত ও ঐতিহ্যকে গ্রাস করে নেওয়ার চেষ্টা করে। ফলে, শাসিতবর্গের পাঠক শাসকবর্গের ভাবনাকেই আত্মভাবনার প্রকাশরূপ বলে ধরে নেয় এবং বিভ্রান্ত হয়।

জাঁক্ দেরিদা (খ্রি. ১৯৩০-২০০৪) 'অনুবাদ'কে সহবাসের রূপকল্পে ব্যাখ্যা করে বলেছেন যে, 'অনুবাদ প্রক্রিয়া' প্রায়শই 'মৌলিক পাঠকৃতি' নির্মাণ করে। কারণ অনুবাদ প্রক্রিয়ার মধ্যে দিয়ে কোনো পাঠকৃতি যখন সময় ও পরিবেশের ব্যবধান পেরিয়ে এক সংস্কৃতি থেকে অন্য সংস্কৃতিতে রূপান্তরিত হয়, তখন তা হয়ে ওঠে এক বিশিষ্ট পুনর্নির্মাণ বা পুনর্লিখন। দেরিদার মতে, সার্থক অনুবাদ আসলে চেতনার পুনর্বিন্যাস এবং তিনি 'অনুবাদ'কে মৌলিক রচনা বলে মনে করেন এই কারণে যে, অনুবাদ ক্রমাগত রূপান্তরিত হতে পারে। যে-সব পাঠকৃতি ভিন্ন ভিন্ন যুগ বা সময়ে বারংবার অনূদিত হতে থাকে তখন প্রমাণিত হয় যে সেই সব উৎসপাঠের মধ্যে কালান্তরের অনুবাদকেরা এমন প্রাণসত্তার সন্ধান পেয়েছেন যে প্রাণসত্তা ক্রমশ নিজেকে সঞ্চারিত করতে সক্ষম।

> the translation will truly be a movement in the growth of the original which will complete itself in enlarging itself.[8]

অনুবাদতাত্ত্বিকেরা এও লক্ষ করেছিলেন যে, অনুবাদচর্চায় অনুবাদকের মানসবৈশিষ্ট্য ও সামাজিক প্রেক্ষিত যথেষ্ট গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে। অনুবাদক যখন সমস্ত ধরনের নিয়ন্ত্রণকে অস্বীকার করতে চান, তখন অনুবাদ তার হাতে বিশেষ ধরনের অস্ত্র হয়ে ওঠে, যার সাহায্যে আরোপিত সামাজিক ও সাংস্কৃতিক স্তরবিন্যাসের বিরুদ্ধে যেতে পারেন তিনি। যদিও এই প্রক্রিয়া সম্পূর্ণভাবে অনুবাদকের উপলব্ধির ওপরই নির্ভরশীল হয়ে থাকে।

অনুবাদে অনুবাদকের ভূমিকা প্রসঙ্গে আলোচনা করতে গিয়ে ওয়ালটার বেঞ্জামিন (খ্রি. ১৮৯২-১৯৪০) 'অনুবাদ' ও 'মৌলিক' এই দুটি শব্দের নতুন তাৎপর্য উদ্ভাবন করেছিলেন। তাঁর মতে, লেখকের স্বকীয়তা অভিব্যক্ত হয় বলেই কোনো রচনা 'মৌলিক' হয় না। বরং সেই রচনার কালোত্তীর্ণ হওয়ার সম্ভাবনার প্রতি দৃঢ় বিশ্বাস সচেতনভাবে জ্ঞাপন করা যায় বলেই তাকে 'মৌলিক' বলা হয়, বা তা 'মৌলিক' পদবাচ্য হয়ে ওঠে। স্বাভাবিকভাবেই, এই বিশ্বাসের জোরেই 'মৌলিক' রচনা অনুবাদযোগ্য হয়ে ওঠে। ফলে একটি রচনার জীবনসীমা প্রসারিত হয়ে তা পেয়ে যায় এক নতুন জীবন। বেঞ্জামিন এই প্রক্রিয়াটিকে চিহ্নিত করেছিলেন পাঠকৃতির

'after life' অর্জন হিসেবে। নিরবধি কালের প্রেক্ষিতে কিছু কিছু পাঠকৃতি যে ক্রমাগত রূপান্তরিত হয়ে চলে, এরকম উদাহরণ বিশ্বসাহিত্যে প্রচুর। এইভাবে বিংশ শতাব্দীতে অনুবাদতত্ত্বকে একাধিক দৃষ্টিভঙ্গি থেকে বিশ্লেষণ করার ফলে বর্তমানে 'অনুবাদতত্ত্ব' মানে শুধু এই নয় যে, কীভাবে অনুবাদ করা হচ্ছে তার অনুপুঙ্খ ব্যাখ্যা বা অনুবাদকদের মানবিচার, এর সঙ্গে যুক্ত হয়েছে অনুবাদ কীভাবে পড়া হচ্ছে বা কীভাবে গ্রহণ করা হচ্ছে— সেই পদ্ধতিরও বিশ্লেষণ। যেহেতু অনুবাদপাঠে সমাজসংস্কৃতি ইতিহাসের বহুমাত্রিক রূপান্তর ও সম্ভাবনা মূর্ত হয়ে ওঠে, তাই উৎসপাঠ থেকে উদ্দিষ্ট পাঠে পৌঁছোতে পৌঁছোতে অনুবাদ হয়ে ওঠে নানা সম্ভাব্যতার প্রতিরূপ। এই কারণেই পল দ্য মান (খ্রি. ১৯১৯-১৯৮৩) প্রতিটি অনূদিত পাঠকৃতিকেই দার্শনিক ও রূপকমূল্য দিতে চেয়েছিলেন।

আধুনিককালের অনুবাদতাত্ত্বিকরা অনুবাদতত্ত্বের বিচিত্র অবভাসকে চিহ্নিত করতে করতে, এও লক্ষ করেছেন যে, পাঠকৃতির সমস্ত অংশ সবসময় অনুবাদ করা যায় না। বিশেষ করে কবিতার অনুবাদের ক্ষেত্রে উৎসপাঠে এমন অনেক অংশই থাকে, যা অনুবাদের অসাধ্য। শুধুমাত্র সংবেদনশীলতার কাছেই যার আবেদন গ্রাহ্য। যে-বিষয়টি লক্ষ করার মতো, তা হল যে-কবিতার শিল্পোৎকর্ষ যত বেশি সে-কবিতার অনুবাদ করা তত কঠিন। তবে শুধু কবিতা নয়, গল্প, উপন্যাস নাটক প্রভৃতি সাহিত্যের অন্যান্য ধারার পাঠকৃতির ক্ষেত্রেও এ-বিষয়টি অনেকাংশে সত্য। এ-ক্ষেত্রে অনুবাদকের গ্রহণক্ষমতা একটা বড় ভূমিকা গ্রহণ করে, এবং গ্রহণক্ষমতায় ঋদ্ধ অনুবাদকের হাতে 'অনুবাদ' তখন আর শুধুমাত্র অনুবাদ ভাবনার মধ্যে সীমাবদ্ধ না থেকে হয়ে ওঠে এক রূপান্তরিত সৃষ্টি। উৎকৃষ্ট অনুবাদ 'রূপান্তর' হিসেবে গণ্য হওয়াই শ্রেয়। কারণ, অনুবাদক এখানে উৎসপাঠ,-এর যে-সব অংশের অনুবাদ অসাধ্য সেইসব অংশকে নিজের মতো করে নির্মাণ করে নেন। আত্মীকরণের এই প্রক্রিয়ায় 'গ্রহণতত্ত্ব'-ই তখন যেমন প্রধান হয়ে ওঠে তেমনি সংযোজন-বর্জনও অবশ্যম্ভাবী হয়ে পড়ে। আর এর ফলে তখন অবধারিত ভাবেই অনূদিত পাঠ রূপান্তরিত হয়ে যায়। কারণ কোনো শব্দকে অনুবাদ করা যায় কিন্তু শব্দের সঙ্গে যে নৈঃশব্দ্য থাকে, তার অনুবাদ অসাধ্য। এই 'অনুবাদ অসাধ্য' কাজটিকে শুধুমাত্র সঞ্চারিত করে দিতে হয়। সেই কাজটি কিন্তু আক্ষরিক অনুবাদ বা ভাবানুবাদে সম্ভব নয়। কারণ, অনুবাদ যদি উৎসপাঠের অনুগামী হয়, তাহলে তার সার্বিক সৌন্দর্যকে প্রাধান্য দিয়ে অনুবাদকে সার্থক করে তুলতে গেলে তা উৎসপাঠ থেকে স্বতন্ত্র ও স্বাধীন হয়ে পড়ে। এইজন্যই 'অনুবাদ'কে আধুনিক সমালোচকগণ 'সুন্দরী অসতী'র সঙ্গে তুলনা করেছেন। অনুবাদের ক্ষেত্রে সৌন্দর্য ও আনুগত্য একই সঙ্গে মেলানো সম্ভব নয়।

এইভাবে বিংশ শতাব্দীর শেষার্ধ পর্যন্ত পাশ্চাত্যে 'অনুবাদ' ও 'অনুবাদতত্ত্ব' সংক্রান্ত যত আলোচনা হয়েছে তার দ্বারা অনুবাদ সম্পর্কিত এত তত্ত্ব উত্থাপিত হয়েছে যে, তাতে জিজ্ঞাসা বেড়েই চলেছে এবং উত্তর খুঁজতে খুঁজতে অনুবাদতত্ত্বের শীর্ণকায়া নদীটি বিংশ শতাব্দীর শেষার্ধে পৌঁছে এতটাই স্ফীতকায়া হয়ে উঠেছে যে, তাকে সাহিত্য প্রকরণের অন্যতম প্রধান ধারা রূপে স্বীকৃতি দিতে হয়েছে। বর্তমানে অনুবাদতত্ত্ব তার তাত্ত্বিক সীমাবদ্ধতা ছাড়িয়ে 'অধ্যয়ন'-এর সীমাহীন ক্ষেত্রে আত্মপ্রকাশ করেছে। এখন সাহিত্যের বিভিন্ন ক্ষেত্রকেও অনুবাদতত্ত্ব দিয়ে ব্যাখ্যা করা হয়। সমগ্র বিংশ শতাবদী জুড়েই পাশ্চাত্য সাহিত্যে 'অনুবাদতত্ত্ব' নিয়ে যে গভীর চর্চা হচ্ছে তার বিস্তৃত অনুপুঙ্খের মধ্যে প্রবেশ না করেও বলা যায় যে, এর মূলে রয়েছে

সাহিত্যবিশ্বে অনুবাদের গুরুত্ব ও তার সম্ভাবনা সম্পর্কে লেখক ও পাঠকের প্রত্যাশা। একবিংশ শতাব্দীতে অনুবাদ ছাড়া সাহিত্যকে ভাবাই যায় না। কারণ—

> A theory of translation, a theory of semantic transfer ; must mean one of two things. It is either an intentionally sharpened. hermeneutically oriented way of designating a working model of all meaningful exchanges of the totality of semantic communication ....or it is a subsection of such a model with specific reference to interlingual exchanges, to the emission and reception of significant messages between different languages.. ..The 'totalizing' designation is the more instructive, because it argues the fact that all procedures of expressive articulation and interpretative reception are translational, whether intra or interlingually. The second usage–translation involves two or more languages has the advantage of obviousness and common currency.[৫]

অনুবাদ নিয়ে খ্রি. পূ. কাল থেকে এবং 'অনুবাদতত্ত্ব' নিয়ে কয়েক শতক ধরে পাশ্চাত্য সাহিত্যে যে আলোড়ন দেখা যায়, তার সামান্যতম রেশও পরিলক্ষিত হয় না ভারতীয় সাহিত্য তথা বাংলা সাহিত্যে। অথচ প্রাচীন ভারতীয় সাহিত্য বা প্রাদেশিক সাহিত্যে অনুবাদ যে অপরিচিত ছিল এমন নয়। বরং *রামায়ণ, মহাভারত*, প্রভৃতি মহাকাব্য বা ধর্মীয়তত্ত্ব-বিষয়ক গ্রন্থসমূহ অনূদিত হয়েছে কালে কালে বিভিন্ন অঞ্চলে। যদিও এইসকল অনুবাদগুলি যত না উৎসানুসৃত তার থেকে অনেক বেশি অঞ্চল-প্রভাবিত। ফলত প্রাচীন ও মধ্যযুগীয় ভারতীয় সাহিত্যে অনুবাদ 'অনুবাদ' না হয়ে স্বাধীন ভাবানুসৃত সৃষ্টি বলেই প্রতিভাত হয়েছে; বাংলা সাহিত্যে অনুবাদের প্রাথমিক স্তরেও এর ব্যতিক্রম দেখা যায় না। অন্যান্য আঞ্চলিক সাহিত্যের মতোই আদি এবং মধ্যপর্বে প্রাচীন ও প্রচলিত সাহিত্যসম্ভার থেকে যে অনুবাদগুলি হয়েছিল— 'কৃত্তিবাসী রামায়ণ' বা 'কাশীদাসী মহাভারত' বা মালাধর বসুর 'ভাগবতানুবাদ'— এ সবগুলিই অনূদিত হয়েছিল গণমানসের চাহিদার দিকে লক্ষ রেখে। মূলত সমকালীন রাজনৈতিক, আর্থসামাজিক পটপরিবর্তনের পরিপ্রেক্ষিতে আপন পূর্বজ সংস্কৃতিকে জানার আগ্রহ থেকেই এইসকল লোকপ্রিয় গ্রন্থগুলির ভাবানুবাদ হয়েছিল।

অনার্য অধ্যুষিত বাংলাদেশে খ্রিস্টীয় পঞ্চম শতাব্দী থেকে গুপ্তসাম্রাজের অধীনে শাসিত হওয়ার ফলে আর্য প্রভাবের যে ক্রমবিস্তার ঘটেছিল তা দ্বাদশ-ত্রয়োদশ শতাব্দীতে তুর্কি বিজয়ের দ্বারা বাধাপ্রাপ্ত হল। বহিরাগত শক্তির প্রভাব ও দেশীয় অভ্যন্তরীণ অব্যবস্থার পরিপ্রেক্ষিতে সমকালীন শ্রেণীবিভক্ত সমাজের উচ্চবর্গীয় সম্প্রদায় প্রাচীন ধর্মগ্রন্থ প্রচার ও প্রসারের মধ্যে সামাজিক ভাঙন ও সাংস্কৃতিক আগ্রাসন থেকে পরিত্রাণ পাবার পথ খুঁজে নিতে চাইলেন। কারণ, এছাড়া তাদের নিজেদেরও অস্তিত্ব রক্ষার অন্য কোনো উপায় ছিল না। সেই সময়ে শাসক সম্প্রদায়, অভিজাত শ্রেণী ও পুরোহিততন্ত্রের শাসনে অবদমিত নিম্নবর্গের মানুষদের মনে ক্ষোভের সৃষ্টি হয়েছিল— রাজনৈতিক পট পরিবর্তনের সুযোগে অবদমিত এইসব মানুষেরা নিজেদের আত্ম-অধিকারকে প্রতিষ্ঠিত করার জন্য উন্মুখ হয়েছিল। তাকে প্রতিহত করতে এবং বিদেশী শাসকদের বিরুদ্ধে নিজেদের অস্তিত্ব রক্ষার তাগিদে নিম্নবর্গের মানুষদের সামাজিক প্রত্যাশার সাহিত্যিক রূপ হিসেবে যেমন মঙ্গলকাব্যধারার সৃষ্টি হল, তেমনি ভাবেই এরই বিপরীতে বিত্তবান উচ্চশ্রেণীর মানুষেরা ঐতিহ্যমণ্ডিত ভারতীয় সাহিত্যের অনুবাদ করতে শুরু করলেন। সেই সময়ের অনুবাদ সাহিত্য রচনার মূলে ছিল একদিকে বিদেশী শাসক শক্তিকে প্রতিরোধ করার প্রয়াস, অন্যদিকেস্বাধিকার অর্জনে উন্মুখ নিম্নবর্গীয় সামাজিক শ্রেণীর ক্রমবর্ধমান

চাহিদাকে লক্ষ্যচ্যুত করতে এবং প্রতিষ্ঠিত আর্থসামাজিক স্থিতাবস্থার ভাঙনকে রুখতে উচ্চবর্গীয়দের প্রাণপণ চেষ্টা।

পঠন-পাঠন ও শিক্ষাসংস্কৃতির ক্ষেত্রে অভিজাতবর্গের যে একাধিপত্য ছিল তৎকালীন সময়ে তাকে কিছুটা ক্ষুণ্ন করে, শিক্ষার অমৃতস্বাদ থেকে সামান্য প্রসাদ দেওয়ার ভঙ্গিতেই অনুবাদকর্মের সূচনা। লোক বুঝাবার তরে[৬] যে অনুবাদ নির্মিত হল, তার দ্বারা সাধারণ মানুষকে প্রাচীন ঐতিহ্যের প্রতি পুনরায় আকর্ষণ করার উদ্দেশ্যই ছিল প্রধান। তাই তাতে মূলানুগত্য অপেক্ষা আঞ্চলিকতাই যে প্রধান হয়ে উঠবে এটাই ছিল স্বাভাবিক। মধ্যযুগের বাংলা অনুবাদে সেটাই দেখা গেল। সাধারণ মানুষের মানসিকতার উপযোগী করে কখনও সম্পূর্ণ ভাবানুবাদ যেমন 'কৃত্তিবাসী' বা 'কাশীদাসী' রচনা, কখনও-বা নির্বাচিত সংক্ষিপ্ত সরলানুবাদ, যেমন, মালাধর বসু বা কবীন্দ্র পরমেশ্বরের রচনা অনূদিত হল। এইসকল অনুবাদের ক্ষেত্রে অনুবাদকের সমাজমনস্কতাকে একটি গুরুত্বপূর্ণ বৈশিষ্ট্যরূপে চিহ্নিত করা যায়। যে-সময়ে পাশ্চাত্য সাহিত্যে অনুবাদের তত্ত্বগত রূপ নিয়ে আলোচনা-সমালোচনা চলছে সেই সময়ে ভারতীয় তথা বাংলা সাহিত্যে অনুবাদের তত্ত্ব নয়, তার প্রয়োগগত সার্থকতাই প্রধান বিবেচ্য বিষয় হয়ে উঠেছে। 'অনুবাদ' কী, 'অনুবাদ নয় কেন' এই প্রশ্নের উত্তরই নিহিত রয়েছে বাংলা সাহিত্যের মধ্যযুগের অনুবাদধারায়।

সাহিত্যের সঙ্গে সামাজিক প্রয়োজনের সংযুক্তিসাধন এবং প্রয়োগের মাধ্যমে উদ্দেশ্যসাধন, এই অতি বাস্তবতাও যে সাহিত্যনির্মাণের অন্যতম নিয়ন্তাশক্তি এই সত্য প্রতিষ্ঠিত মধ্যযুগের বাংলা অনুবাদ-মাধ্যমে। এটা ছিল প্রকৃতপক্ষেই অভিনব অভূতপূর্ব। এর ফলশ্রুতিও ছিল সুদূরপ্রসারী। লক্ষণীয় এই অনুবাদধারার সূত্রেই বিজাতীয় বিধর্মী শাসকশক্তির সঙ্গে স্বদেশী স্বজাতীয় শাসিতশক্তির এক শান্তিপূর্ণ প্রীতির সম্পর্ক গড়ে ওঠে। ফলে বিদেশী বিধর্মী শাসকসম্প্রদায় এদেশীয় সমাজ সংস্কৃতি সাহিত্যকে গ্রহণ করে ক্রমশ এদেশীয় হয়ে উঠতে শুরু করেন। এবং ধর্মীয় ভেদাভেদ থাকলেও এক শান্তিপূর্ণ সামাজিক সহাবস্থানের সূচনা হয়। অন্যদিকে নিম্নবর্গীয় ও নিম্নবর্ণের সাধারণ মানুষের প্রত্যাশাকে সামান্যভাবে হলেও স্বীকৃতি দেওয়ার মধ্যে দিয়ে তাদের ক্ষোভকে প্রশমিত করা সম্ভব হয়। এরই পরবর্তী স্তরে মঙ্গল-সাহিত্যের লোকায়ত দেবদেবীদের ক্রমাগত আর্যীকরণ এবং কালানুক্রমিকভাবে নিম্নবর্গের ও বর্ণের পূজক সম্প্রদায় থেকে উচ্চবর্গ ও উচ্চবর্ণের পূজক সম্প্রদায়ের সৃষ্টি হওয়া; এমনকি মঙ্গলকাব্য রচয়িতাদের শ্রেণী পরিচয়ের ক্রমান্বয়িত পরিবর্তনও এই তথ্যকে প্রমাণিত করে। পাশাপাশি এটাও লক্ষণীয় যে, পূর্বের অনুবাদে পৌরাণিক সংস্কৃতির মধ্যে লোকায়ত সমাজজীবনের যে চিহ্ন বর্তমান ছিল, তা ক্রমশ লুপ্ত হতে থাকে। অন্যভাবে বলা যায় যে, পৌরাণিক সাহিত্যের প্রভাবে ক্রমশ লোকায়ত সাহিত্যসম্ভারের গুরুত্ব ক্রমে কমে আসতে থাকে।

> পঞ্চদশ ও পরবর্তী শতাব্দীর হিন্দুসমাজ ও সংস্কৃতির পুনঃগঠনে অনুবাদ সাহিত্য বিশেষভাবে সাহায্য করেছিল। কারণ, দু'শ বৎসরব্যাপী (১২-১৪শ শতাব্দী) পাঠান শাসনে বাংলার হিন্দুসমাজে যে ভাঙন ধরেছিল তাকে গড়ে তুলতে হলে ব্রাহ্মণ্য সংস্কৃতির মূলকেন্দ্র রামায়ণ মহাভারত ভাগবতের আদর্শ, নীতি, তত্ত্ব ও কাহিনীর পুনঃপ্রচারের আবশ্যকতা সে যুগের সমাজনেতারা নিশ্চয়ই বুঝতে পেরেছিলেন। তাঁরা আরও বুঝতে পেরেছিলেন, শুধু জীমূতবাহনের স্মৃতিশাস্ত্রের অযুত বাঁধনে বাঁধলে, হিন্দু সমাজকে দুর্গতির হাত থেকে রক্ষা করা যাবে না। হিন্দুসমাজের সর্বশ্রেণীর মধ্যে নিজ নিজ ধর্ম ও সংস্কৃতির প্রতি আস্থা ফিরিয়ে আনতে হলে পৌরাণিক সাহিত্য, বিশেষতঃ রামায়ণ মহাভারতের প্রচার অত্যাবশ্যক। তাই তারা জনসমাজে অনুবাদের মারফতে রামায়ণ, মহাভারত ও অন্যান্য পৌরাণিক সাহিত্যের

মূল নির্যাস প্রচারে ব্রতী হয়েছিলেন।.........এইভাবে বাংলায় আর্যসংস্কারের প্রভাব না পড়লে বাংলাসাহিত্য কোনদিনই লোকসাহিত্যের সীমা ছাড়াতে পারত না। বাংলা সাহিত্য যে মধ্যযুগ থেকে আধুনিককালের মধ্যে একটি সুগঠিত সাহিত্যকর্মরূপে সম্মানিত হয়েছে, তথাকথিত ব্রাহ্মণ্য সংস্কারের ছাপ না পড়লে এ সাহিত্যের এই ধরণের বিকাশ হতে পারত না বলে অনুমান করি। তাই বাঙালীসমাজের পুনঃগঠনের জন্য এবং বাঙালী ঐতিহ্যর সর্বভারতীয় প্রাণধারার সঙ্গে যোগ স্থাপনের জন্য রামায়ণ মহাভারতের অনুবাদাশ্রয়ী প্রভাবেরও প্রয়োজন ছিল।[৭]

সিদ্ধান্তটি বিতর্কিত সন্দেহ নেই। কারণ আর্য সংস্কারের এই কৌলীন্যকে প্রতিষ্ঠিত করার প্রয়াসের মধ্যে পক্ষপাতিত্বের একাধিপত্য। যুক্তি অপেক্ষা আবেগের প্রাধান্য, আধুনিক সমালোচকশ্রেণীর উচ্চবর্গীয় ও উচ্চবর্ণীয় গোষ্ঠীভুক্ত হওয়ার মানসিকতাকেই পরোক্ষে সমর্থন করে। এক্ষেত্রে আদি লোকসাহিত্যের অবমূল্যায়ন ও উন্নাসিক আর্যামির তথা হিন্দুত্ববাদের পুনঃপ্রতিষ্ঠার বিষয়টি বিতর্কের উর্ধ্বে না হলেও উপরোক্ত উদ্ধৃতিটি থেকে এই সত্যটি পরিস্ফুট হয় যে, মধ্যযুগের বাংলাসাহিত্যের অনুবাদধারা উদ্দেশ্যপ্রণোদিত সৃষ্টি।

আধুনিক বাংলা সাহিত্যেও অনুবাদচর্চার সূত্রপাত হয় একই ধরনের উদ্দেশ্যমূলকতাকে সামনে রেখে। তৎকালীন প্রত্যক্ষ কিছু প্রয়োজনসিদ্ধি এবং পরোক্ষ ও বৃহত্তর উদ্দেশ্য ছিল বিশ্বের বিভিন্ন সাহিত্যের সঙ্গে পরিচয় সাধন করার প্রয়াস, যাতে সমকালীন বাঙালি সমাজের শিক্ষার মান, বোধবুদ্ধি, চেতনা ও মননকল্পনার বিস্তার ঘটে। প্রথমোক্ত কারণ অবশ্যই ঔপনিবেশিক শাসনের সুবিধার্থে এবং পাশ্চাত্য শিক্ষাবিস্তারের প্রয়োজনে পাঠ্যগ্রন্থাদির অনুবাদ বা রাষ্ট্রশাসনের পক্ষে অপরিহার্য আইনকানুন, রীতিনীতি, নির্দেশনামা ইত্যাদির অনুবাদ বা ধর্মপ্রচারের উদ্দেশ্যে ধর্মগ্রন্থাদির অনুবাদ সংঘটিত হয়েছিল। উদাহরণ হিসেবে উদ্ধৃত করা যায় উনবিংশ শতাব্দীর প্রবাদপুরুষ পণ্ডিত ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর-কৃত *কথামালা*-র বিজ্ঞাপন সূত্রটিকে—

> রাজা বিক্রমাদিত্যের পাঁচ ছয়শত বৎসর পূর্ব্বের গ্রীসদেশে ইসপ নামে এক পণ্ডিত ছিলেন। তিনি কতকগুলি নীতিগত গল্পের রচনা করিয়া আপন নাম চিরস্মরণীয় করিয়া গিয়াছেন। ঐ সকল গল্প ইঙ্গরেজি প্রভৃতি নানা য়ুরোপীয় ভাষায় অনুবাদিত হইয়াছে এবং য়ুরোপের সর্ব্বপ্রদেশেই অদ্যাপি আদরপূর্বক পঠিত হইয়া থাকে। গল্পগুলি অতি মনোহর। পাঠ করিলে, বিলক্ষণ কৌতুক জন্মে এবং আনুষঙ্গিক সদুপদেশ লাভ হয়। এই নিমিত্ত শিক্ষাকর্ম্মাধ্যক্ষ শ্রীযুক্ত উইলিয়ম গর্ডন ইয়ঙ মহোদয়ের অভিপ্রায় অনুসারে, আমি ঐসকল গল্পের অনুবাদে প্রবৃত্ত হই। কিন্তু এতদ্দেশীয় পাঠকবর্গের পক্ষে সকল গল্পগুলি তাদৃশ মনোহর বোধ হইবেক না। এজন্য ৬৮টি মাত্র আপাতত অনুবাদিত ও প্রচারিত হইল।[৮]

শ্রীরামপুর মিশন ও ফোর্ট উইলিয়াম কলেজেব প্রধান রূপকার উইলিয়াম কেরী যিনি অনুবাদকে ধর্মপ্রচারের প্রধান উপায় বলে মনে করতেন এবং যে কারণে, তিনি নিজে বা তাঁর পরিচালনায় ৪০টি এশীয় ভাষায় আংশিক বা সম্পূর্ণ *বাইবেল* অনুবাদ করে প্রকাশ করেছিলেন। খ্রি. ১৮০০-১৮২৬ পর্যন্ত এই অনুবাদকর্ম চলেছিল এবং তারপর ঘোষণা করা হয় :

> Serampore intended to devote the remainder of their lives to new and more correct editions of the translations atready made.[৯]

দ্বিতীয়ত, আধুনিক বাংলাসাহিত্যে যে বৃহত্তর উদ্দেশ্যকে সামনে রেখে অনুবাদচর্চার সূচনা হয়েছিল, তার মূল কারণ ছিল শিক্ষিত পাঠক সমাজের মননচিন্তনের সঙ্গে বিশ্বের বৃহত্তর সাহিত্যজগতের পরিচয় ঘটানো এবং এই কারণেই কাব্যকাহিনী উপাখ্যান জাতীয় রসসমৃদ্ধ ও

ইতিহাস দর্শন বিজ্ঞান ইত্যাদি বিষয়ক মননসমৃদ্ধ রচনার অনুবাদ শুরু হয়েছিল। এর মধ্য দিয়েই আধুনিক বাংলা সাহিত্যের সঙ্গে পাশ্চাত্যসাহিত্যের সংযোগ ও সম্পর্কের সূচনা। এর ফলে প্রত্যক্ষভাবে বাংলা সাহিত্যধারায় তুলনামূলক সাহিত্যচেতনার প্রতিষ্ঠা ঘটে। লক্ষণীয় এই সময়েই বাংলা অনুবাদচর্চায় পাঠক তথা গ্রাহকসমাজ বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা গ্রহণ করেছিল। উদ্দিষ্ট পাঠকসমাজের রুচি মনোভাব দেশজ সংস্কৃতির সঙ্গে মানানসই করেই অনুবাদক অনুবাদ করতে সচেষ্ট হতেন বা বলা যেতে পারে গ্রহণকারীর মানসিকতার উপযোগী করেই অনুবাদযোগ্য উপাদানগুলিকে নির্বাচিত করতেন। *কথামালা*-র বিজ্ঞাপন সেই সচেতনতারই পরিচায়ক। আসলে ঊনবিংশ শতাব্দীর অনুবাদচর্চায় 'অনুবাদতত্ত্ব' বা 'অনুবাদবৈশিষ্ট্য' নিয়ে প্রত্যক্ষ আলোচনা না থাকলেও পরোক্ষে তা যে বর্তমান ছিল, সে-বিষয়ে কোনো সন্দেহ নেই।

এক্ষেত্রে আরও দ্রষ্টব্য যে, পাশ্চাত্য সাহিত্য থেকে আধুনিক বাংলা সাহিত্যে অনুবাদের সূচনা হয় দু'ধরনের উদ্দেশ্য সফল করতে। প্রথমটি হল, শাসকশক্তির সহায়করূপে, প্রাতিষ্ঠানিক আকারে এবং সচেতন প্রয়াসের মাধ্যমে। যে-ধরনের উদ্দেশ্যমূলকতাকে সামনে রেখে 'শ্রীরামপুর মিশন' বা 'ফোর্ট উইলিয়াম কলেজ'-এর প্রতিষ্ঠা, সেই একই ধরনের প্রবণতা থেকে খ্রি. ১৮৫১-তে 'বঙ্গভাষানুবাদকসমাজ'-এর প্রতিষ্ঠা হয়। বঙ্গভাষানুবাদকসমাজের প্রতিষ্ঠার উদ্দেশ্য সম্বন্ধে বলা হল—

> 1851, the Vernacular Literature Committee.....in Bangla, the society was called Bangabhasanubadak Samaj or Society for Bangla translation. In the Preface to the first text published by the Society, Lord Clive (1852), the author Harachandra Dutta writes that "the object of the association is distinctly stated to be, not only to translate but to adopt English authors into Bengali."[১০]

অর্থাৎ বাংলাদেশের বিদগ্ধ সমাজের সঙ্গে ইংরেজি সাহিত্য বা সাহিত্যিকদের শুধু পরিচিত করানোর উদ্দেশ্যেই নয়, 'গ্রহণ' করানোর প্রয়োজনেই এই সংস্থার উদ্ভব। যদিও শেষ পর্যন্ত সাহিত্যের বিকাশ থেকেও রাজশক্তির প্রতি দায়বদ্ধতাই প্রধান হয়ে উঠেছিল এই সংস্থার। এই সংস্থা-কৃত অন্যান্য অনুবাদ গ্রন্থের তালিকা পরিদৃষ্টে এ-কথাই প্রমাণিত হয়।

> সমাজ এইসব ইংরেজি গ্রন্থের বাংলা অনুবাদ প্রকাশের প্রস্তাব গ্রহণ করেছিলেন—রবিনসন ক্রুশো, বেকন সাহেবের প্রবন্ধ। আবারক্রাম্বি সাহেবের রচিত মনোগুণ, চেম্বার্স ও নাইট সাহেবের ও পেণি ম্যাগাজিনে প্রকাশিত নানাবিধ বিদ্যাবিবরণাদি সংগৃহীত এক পুস্তক। মহাপীটরের আয়ুর বিবরণ কলম্বস আয়ুর বিবরণ, ক্লাইভ সাহেব ও ওয়ারেণ হেস্টিংস সাহেবের বিষয়ে মার্কলি সাহেবের প্রবন্ধ বাক্য, পরিকল্পনামত রে. জে. রবিন্সন 'রবিনসন ক্রুশো', ড. বোয়ার ল্যামস্ টেলস ফ্রাম সেকসপীয়র, হরচন্দ্র দত্ত মেকলের 'লাইফ অফ ক্লাইভ' তর্জমা করেন এবং ১৮৫৬ খ্রী. সেগুলো প্রকাশিত হয়।[১১]

অর্থাৎ, ঔপনিবেশিক শাসকশক্তি তার নিজ প্রয়োজনে 'অনুবাদ'কে শুধু ব্যবহার করেনি, শাসিত শ্রেণীর থেকে অনুগত এক অনুবাদক-গোষ্ঠীও সৃষ্টি করেছিল। এই অনুবাদক-গোষ্ঠী যে সব সময়ে সচেতনভাবে ঔপনিবেশিক রাজশক্তির সহায়তা করেছিলেন তা নয়। কিন্তু অবচেতনই হোক বা চেতনেই হোক, ঔপনিবেশিক শাসকশক্তির দ্বারা তাঁরা যে ব্যবহৃত হয়েছিলেন, সে-বিষয়ে কোন সন্দেহ নেই।

বিপরীতে শাসিত শ্রেণীও যে অনুবাদকে সাদরে গ্রহণ করেছিল, তার অন্যতম কারণ ছিল নবোন্মেষিত বিশ্বসাহিত্য সংক্রান্ত ধারণা সম্পর্কে সম্যক জ্ঞান লাভ করার আকাঙ্ক্ষা। রাজনৈতিক কারণে যে সুযোগ তাদের সামনে এসেছিল, তার পূর্ণ সদব্যবহার করার ব্যাপারে তারা যথেষ্ট

আগ্রহী ছিল, কারণ দীর্ঘকাল ধরে প্রচলিত সাহিত্যচর্চার চর্বিতচর্বণ তাদের মানসিকভাবে ক্লান্ত করে তুলেছিল। আর এর থেকে মুক্তি পাওয়ার আকাঙ্ক্ষা এবং সুযোগ দুই-ই অনুবাদ সাহিত্যের মাধ্যমে তারা পেয়েছিল। তৎকালীন সময়ের অনুবাদধারার সূচনা ও ক্রমবিকাশে নির্ণায়ক হয়ে উঠেছিল এই দুটি কারণ। তাই বলা যায় :

> Translation then, during this period, had a dual role, serving the interests of both Colonizer and the Colonized.[১২]

এই দুই বিপ্রতীপ চাহিদার টানাপোড়েনে সমকালীন অনুবাদ ধারায় তৃতীয় যে বৈশিষ্ট্যটি ধীরে ধীরে বিকশিত হচ্ছিল তা হল ঔপনিবেশিক শক্তির বিরুদ্ধে অনুবাদধারাকে ব্যবহার করার প্রবণতা। অবশ্য এটিও যে প্রথম থেকেই সচেতনভাবে সৃষ্টি হয়েছিল এমন নয়। বরং বলা যায় রাজনৈতিক ও আর্থসামাজিক পরিবেশ পরিস্থিতি থেকে উদ্ভূত হয়েছিল এই দুই বিপ্রতীপ চাহিদার টানাপোড়েন। স্বাধীনতা আন্দোলনের বীজ যেমন সুপ্ত অবস্থায় ছিল কংগ্রেস প্রতিষ্ঠার মধ্যে, তেমনই অনুবাদধারার মধ্যেও ঔপনিবেশিক শাসকশক্তির বিরুদ্ধতার বীজ শাসিতদের অবচেতনে অন্তর্নিহিত ছিল, যার পরিপূর্ণ রূপ বিকশিত হয়ে ওঠে বিংশ শতাব্দীর প্রারম্ভে।

প্রসঙ্গত উল্লেখ্য প্রতীচ্যে অনুবাদচর্চার প্রাথমিক পর্যায়ে অনুবাদের মধ্যে দেশকালের সীমাত্তীর্ণ মানবমনের 'কান্নাহাসির দোলদোলানো পৌষ ফাগুনের পালা'-কেই রূপে ধরার প্রয়াস ছিল প্রধান। প্রাচ্যে কিন্তু তা সামাজিক দায়বদ্ধতার মধ্যে দিয়েই শুরু হয়। 'আপনাকে এই জানার' প্রয়োজনের সঙ্গে সঙ্গে 'তোমায় চেনা'-ই প্রাচ্য অনুবাদচর্চায় প্রধান হয়ে ওঠেনি। মানবিক হৃদয়বৃত্তির প্রকাশরূপকে ধরার পাশাপাশি তাকে তাৎক্ষণিক প্রয়োজনের কাজে ব্যবহার করার জটিল সাংগঠনিক চাহিদাও সেখানে বিশেষ ভূমিকা পালন করেছিল। মধ্যযুগে যা ছিল সমাজশক্তির নিয়ন্ত্রণে, ইতিহাসের আধুনিক পর্বে তা সমাজশক্তি, শাসকশক্তি উভয়ের দ্বারাই নিয়ন্ত্রিত হল। এবং আরও পরে অত্যাধুনিককালে তা ব্যক্তিমন ও মননের প্রকাশরূপের অন্যতম হাতিয়ার হয়ে উঠল। অতি আধুনিক সময়ে, একবিংশ শতাব্দীর অনুবাদতত্ত্ব ভাবনায় তাই প্রকৃত অর্থেই বিশ্বায়নের ছোঁয়া, বিশ্বসাহিত্যকে সংহত করার অভূতপূর্ব প্রয়াস লক্ষণীয়।

অনুবাদতত্ত্ব ভাবনার পাশাপাশি যদি এর প্রয়োগগত মাত্রাবিন্যাস লক্ষ করা যায়, তাহলে দেখা যাবে আবহমানকাল ধরেই অনুবাদের গতিপ্রকৃতি নির্ধারিত হয়েছে কয়েকটি ধারানুযায়ী যার প্রথমটি হল আক্ষরিক অনুবাদ, দ্বিতীয়টি হল ভাবানুবাদ। আধুনিককালে এর সঙ্গে যুক্ত হয়েছে কবিতানুবাদ এবং রূপান্তর। এছাড়'ও আংশিক অনুবাদ অনুকরণ বা অনুসরণ ইত্যাদি প্রয়োগপদ্ধতিকেও অনুবাদ সাহিত্যের বিকাশধারার বৃহত্তর ক্ষেত্রে অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে। তবে অতিসাম্প্রতিক কালে কবিতানুবাদ ও রূপান্তরকেই প্রধানভাবে গুরুত্ব দেওয়া হয়। কারণ আক্ষরিক অনুবাদের প্রাধান্য আধুনিক বাংলা সাহিত্যের সূচনাপর্বে যতটা ব্যাপ্ত ছিল যত সময় এগিয়েছে আক্ষরিক অনুবাদ ততই জনপ্রিয়তা হারিয়েছে। 'আক্ষরিক' অনুবাদের প্রধান বৈশিষ্ট্য হল মূল পাঠকে হুবহু উপস্থাপিত করা কিন্তু এই প্রচেষ্টায় উৎসপাঠের শব্দ ও তার নিজস্ব প্রয়োগগত অর্থ বজায় থাকলেও শুধুমাত্র ভাষান্তরিত করার ফলে মূল পাঠের ভাষাতীত সৌন্দর্যকে উদ্দিষ্ট পাঠে বা অনূদিত পাঠে পাওয়া সম্ভব হয় না। ফলে তা অনেক সময় সহজ-বোধ্যতা হারায়। একারণেই অনেকে আক্ষরিক অনুবাদকে অনুকরণ-এর সমতুল্য বলে মনে করেন। বাংলাসাহিত্যে ফোর্ট উইলিয়াম কলেজের লেখকগোষ্ঠীর অনেকেই আক্ষরিক অনুবাদ করেছিলেন। পরবর্তীকালে আক্ষরিক অনুবাদ অপেক্ষা ভাবানুবাদ-ই প্রধান হয়ে ওঠে। আধুনিক বাংলা সাহিত্যে অনুবাদচর্চার সূচনা থেকে বর্তমানকাল পর্যন্ত যত অনুবাদ হয়েছে, তার বেশির

ভাগই হল 'ভাবানুবাদ'। ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর থেকে রবীন্দ্রনাথ পর্যন্ত বা রবীন্দ্রনাথের পরবর্তী সময় থেকে বর্তমানকাল পর্যন্ত যাঁরা প্রধানত অনুবাদচর্চায় আগ্রহ দেখিয়েছেন তারা হলেন, হেমচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়, নবীনচন্দ্র সেন, রবীন্দ্রনাথ, দ্বিজেন্দ্রলাল রায়, সত্যেন্দ্রনাথ দত্ত, বুদ্ধদেব বসু, বিষ্ণু দে, উৎপল দত্ত, মানবেন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় প্রমুখ। এঁদের মধ্যে অনেকেই 'ভাবানুবাদ'কেই প্রাধান্য দিয়েছেন কারণ ভাবানুবাদে অবিকল অনুকরণের প্রয়োজন হয় না। প্রয়োজন পড়ে অনুসরণের। সেখানে প্রধানত উৎস পাঠ-এর ভাব বজায় রেখে উদ্দিষ্ট পাঠে ভাষান্তরিত করা হয়। শব্দ ও অর্থের যথাযথতা বজায় রাখার দায়বদ্ধতা সেখানে নেই। ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর *ভ্রান্তিবিলাস* শেক্সপীয়রের *কমেডি অফ এররস* নাটকের সরল স্বচ্ছন্দ ভাবানুবাদই করেছিলেন। এখানে তিনি উৎসপাঠকে উদ্দিষ্ট পাঠে রূপান্তরিত করেছিলেন বলা যায়।

আসলে ভাবানুবাদের মাত্রা ভেদেই অনুসরণ বা রূপান্তর হয়ে থাকে। উৎসপাঠের যথাযথতা যে অনুবাদে অনেকাংশেই রক্ষিত হয় তাকেই বলা হয় অনুসরণ। আর যেখানে উৎসপাঠ থেকে সরে অনুবাদক প্রয়োজনানুয়ায়ী উদ্দিষ্ট পাঠে পরিবর্তন, পরিবর্জন, পরিবর্ধন, এমনকি নতুন অর্থ আরোপ পর্যন্ত করেন সেখানেই ঘটে 'রূপান্তর'। এই 'রূপান্তর' প্রক্রিয়ায় অনেকসময়ই মনে হতে পারে যে, মূল পাঠ এবং অনূদিত পাঠ সম্পূর্ণ পৃথক দুটি সৃষ্টি। কিন্তু আসলে তা নয়। 'রূপান্তর' প্রক্রিয়ায় মূল পাঠের একটি পরিবর্তিত নিজস্ব রূপ তৈরি হয় এবং সেই নিজস্বতা অনুবাদকের 'স্বকীয়তা'কে প্রতিষ্ঠিত করে, ফলে এটি প্রায় মৌলিক রচনা হয়ে ওঠে। তাই এই না মৌলিক না পূর্ণাঙ্গ অনুবাদ সাহিত্যরূপকে রূপান্তর আখ্যা দেওয়া হয়। আধুনিক কালের ভাষায় কৃত্তিবাসের রামায়ণ অনুবাদকে 'ভাবানুবাদ' না বলে 'রূপান্তর' বলাই বাঞ্ছনীয়। 'রূপান্তর'-এর ক্ষেত্রে প্রথম স্রষ্টা অপেক্ষা অনুবাদকই উৎস বা মূল পাঠের মধ্যে চেতনার পুনর্বিন্যাস ঘটিয়ে অনূদিত পাঠকে শুধু সমকালীনতা দান করেন না তাকে পরবর্তীকালের জন্যও গ্রহণযোগ্য করে তোলেন। অর্থাৎ মূল বা উৎসপাঠের অভ্যন্তরীণ অবকাশকে ক্রমাগত পূর্ণ করে তোলার সম্ভাবনাকে প্রতিষ্ঠিত করেন। এখানেই রূপান্তর প্রক্রিয়ার সঙ্গে 'গ্রহণতত্ত্ব'-র একটি সাযুজ্য পরিলক্ষিত হয়; 'অনুবাদতত্ত্ব' ও 'গ্রহণতত্ত্ব' একে অপরের পরিপূরক হয়ে ওঠে।

লক্ষণীয় সব ধরনের সাহিত্যানুবাদের মধ্যে কাব্যানুবাদ-ই সর্বাধিক দুরূহ, কারণ, কাব্যানুবাদ কেবলমাত্র ভাষান্তরণের মধ্যে সীমাবদ্ধ নয়। তাকে হতে হয় সংবেদনশীল। কারণ কাব্যগত বক্তব্যকে অনূদিত করার সঙ্গে সঙ্গে তাকে কাব্যের অন্তর্নিহিত অকথিত বক্তব্যকেও উপস্থিত করার দায় বহন করতে হয়। বচনীয়তা ও অনির্বচনীয়তাকে একসঙ্গে গ্রথিত করেই কবিতার অবয়ব নির্মিত হয়, ফলত প্রাথমিক ভাবে কবির হৃদয়সংবেদনাকে অনুবাদের মধ্যে স্পন্দিত করাই শুধু নয়, তার যথাযথ রূপায়ণও বাঞ্ছনীয় হয়ে ওঠে। সার্বজনীন মানবিক মূল্যবোধ ও হৃদয়ানুভূতির প্রকাশ মূলত এক হলেও, দেশকালপাত্র অনুসারে জীবনযাত্রার ধরন ও জীবনাভিজ্ঞতার প্রকৃতিগত পার্থক্য থাকেই। সেই স্বকীয়তা সঞ্চারিত হয় সাহিত্যে। তাই, যখন সেই স্বকীয়তায় ঋদ্ধ কবিতা অনূদিত হয়, তখন তার মধ্যে একই সঙ্গে মূলানুগত্যের সততা ও ভাষান্তরণের সৌন্দর্যকেও বাঙ্ময় করে তুলতে হয়। সে বড় সহজসাধ্য কাজ নয়। জাদুকরের সরু রশির ওপর পদচারণার মতোই তা পরিমাপ ও পরিমাণের খেলা। অর্থাৎ অনুবাদকের দক্ষতার উপরই নির্ভর করে অনুবাদের তুল্যমূল্য রূপায়ণ। অনুবাদকের দক্ষতার তারতম্যে অনুবাদের মানদণ্ডেরও তারতম্য ঘটে যায়। আবার অনুবাদকের দক্ষতা নির্মিত হয় তার

পাঠকসত্তার গ্রহণকারী শক্তি ও তার লেখকসত্তার সৃজনী শক্তির দ্বৈতমিলনে। শুধু এই নয়, আধুনিক কালের অনুবাদককে বহন করতে হয় আরও অনেক গুরুভার দায়িত্ব। যেমন—

> Translators are always hard at work but they are producing translations not translation commentary. Criticism or theory they appear as aesthetically sensitive amateurs or talented craftsmen, but not critically self conscious writers who develop an acute awareness of the cultural and social conditions of their work. The contemporary translator is a paradoxical hybrid, at once dilettante and artisan.[১৩]

ফলত, দক্ষতা ও প্রকৃতির তারতম্যে অনুবাদকদের মধ্যেও মাত্রা ও শ্রেণীগত পার্থক্য নির্মিত হয়। সাধারণ অনুবাদক, সৃজনদক্ষ অনুবাদক, সাহিত্যিক অনুবাদক, আদর্শ অনুবাদক ইত্যাদি বিচিত্ররকমের অনুবাদক দৃষ্ট হয়। অনুবাদকের গ্রহণদক্ষতার তারতম্যে সৃষ্ট এই শ্রেণীবিভাজনবে 'অনুবাদতত্ত্ব' অপেক্ষা 'গ্রহণতত্ত্ব'-র পরিধিভুক্ত বলেই গণ্য করতে হয়।

আধুনিক বাংলা কবিতানুবাদের ক্ষেত্রে ছন্দের জাদুকর সত্যেন্দ্রনাথ দত্তের নাম সর্বজন পরিচিত, কারণ তাঁর মতো এত বহুল পরিমাণে কবিতানুবাদ তাঁর পূর্বে আর কেউ করেননি। পরবর্তীকালে অনেকে তাঁর পদাঙ্ক অনুসরণ করে বাংলা কবিতানুবাদকে ক্রমসমৃদ্ধ করেছিলেন। তাঁর কবিতানুবাদের মধ্যে 'অনুবাদতত্ত্ব'-র প্রায় সকল বৈশিষ্ট্যই লক্ষণীয়। লক্ষণীয় ভিন্ন অনুবাদ পদ্ধতিও। যেমন তাঁর সমকালীন সময়ের বিপ্লবী এবং সাধক-কবি শ্রীঅরবিন্দের (খ্রি. ১৮৭২—১৯৫০) 'সাগরের প্রতি' কবিতাটির যে অনুবাদ তিনি করেছিলেন তাকে যে স্বাভাবিক ভাবেই আক্ষরিক অনুবাদ বলা যায়, তা মূল ও অনূদিত কবিতাংশের কিয়দংশ উদ্ধৃত করলেই বোঝা যাবে।

মূল ইংরেজি কবিতা :

O grey wild sea
Thou hast a message, thunderer for me.
Their huge wide backs
Thy monstrous billows raise, abysmal cracks
Dug deep between
One pale boat flutters over them, hardly, seen
I hear thy roar
Call me, "Why dost thou linger on the shore"[১৪]

সত্যেন্দ্রনাথ দত্ত-কৃত অনুবাদ :

হে পিঙ্গল মত্ত পারাবার
মোর তরে মন্দভাষী তুমি এনেছ এনেছ সমাচার
বিপুল বিস্তৃত পৃষ্ঠ তুলি
চলেছে তরঙ্গভঙ্গ তব মাঝে মাঝে ক্রোড়সন্ধিগুলি
অতল পাতাল গুহা প্রায়।
তারি পরে অস্পষ্ট সুদূরে তরী চলে স্পন্দিত পাখায়
শুনি আমি গর্জন তোমার,
কহ তুমি, "তীরে বসি বিলম্ব করিছ কেন মিছে আর?"[১৫]

অনুবাদটি এখানে যতটা আক্ষরিক, ততটা হার্দিক নয়। মূলের প্রায় প্রতিটি শব্দের যথাযথ অর্থ রক্ষা করে অনুবাদ করেছিলেন অনুবাদক, তবুও কোথাও যেন প্রাণের ছোঁয়ার অভাব রয়েছে। মূল কবিতাটি সহজসারল্যে যতটা হৃদয়গ্রাহী, অনুবাদ যেন তার তুলনায় অনেক ভারবহুল এবং নিষ্প্রাণ। তাই এই কবিতানুবাদটি যে মূলানুগ বা আক্ষরিক, সে বিষয়ে দ্বিমতের অবকাশ নেই।

আবার কবি সত্যেন্দ্রনাথের অনুবাদকসত্তা ও মৌলিক স্রষ্টা সত্তার সম্মিলনে হেনরী লুই ভিভিয়ান ডিরোজিও (খ্রি. ১৮০৯-১৮৩১) লিখিত 'Sister-in law' কবিতাটির অনুবাদ মূলানুগত্য-কে ছাপিয়ে যে প্রায় মৌলিক হয়ে উঠেছে তার প্রমাণ পাওয়া যাবে মূল ও অনুবাদের পাশাপাশি উপস্থাপনে—

মূল ইংরেজি কবিতা :

A sistr-in law, my sister dear
A sister-in law for thee?
I'll bring thee a star from where angels are.
Thy sister-in law to be.

For thou art as pure the lights that burn
In the palace of bliss eternally.
And thy sister-in-law must be like an urn
Containing the essence of purity.[১৬]

অনূদিত পাঠ :

বৌদিদি চাস? বোনটি আমার
বৌদিদি তোর চাই?
তারার হাটে খুঁজব এবার
দেখব যদি পাই।
তুই যে মোদের পুণ্যপ্রভা।—
ঠাকুরঘরের দীপ
তোর মতোটিই আনতে হবে
পুণ্য হোমের টিপ।[১৭]

সত্যেন্দ্রনাথের এই অনুবাদে কাব্যিক সুষমার যে বিকাশ তা মূলকে ছাড়িয়ে এক নবতর ব্যঞ্জনা সৃষ্টি করেছে। তাই এটিকে অনায়াসেই ভাবানুবাদের এক সার্থক নিদর্শন হিসেবে উল্লেখ করা যায়।

সত্যেন্দ্রনাথের কবিতানুবাদে অনুবাদ পদ্ধতির অন্যতর ধারার প্রয়োগও দ্রষ্টব্য। ফরাসি কবি ভিকটর হুগো (খ্রি. ১৮০২-৮৫) 'জিন' কবিতাটি অনুবাদ করার সময় অনুবাদক সত্যেন্দ্রনাথ মূলপাঠটির সংক্ষিপ্তকরণ ঘটিয়েছিলেন।

এই কবিতাটিতেও সত্যেন্দ্রনাথ অনেকসময়ই অনেক কথা বাদ দিয়ে অনুবাদ করেছেন। হুগোর 'জিন' কবিতাটির 'Murs Ville 'হতে' 'Tout dort' পর্যন্ত স্তবকটির অনুবাদ করলে দাঁড়ায়.......

মূল ফরাসি পাঠ	ইংরেজি অনূদিত পাঠ	বাংলা অনুবাদ
Murs Ville	Wall, Town	নিরজন
Et Port	Port, Steep	নিদপুর
Asile	Death's Own	নিকেতন
De Mort	Dark Keep	মৃত্যুর
Mer grise	Gray seas	বায়ু হায়

মূল ফরাসি পাঠ	ইংরেজি অনূদিত পাঠ	বাংলা অনুবাদ
O'u brise	Where is	মূরছায়
La brise	Slow breeze	ঢেউ নেই
Tout dort	All sleep	সিন্ধুর

"সত্যেন্দ্রনাথের দেখা যাচ্ছে তিনি Wall, Town ইত্যাদিকে বাদ দিয়ে শেষ পংক্তির 'Tout dort' বা 'all sleep' বা 'নিরজন নিদপুর'-কে প্রারম্ভে রেখে 'Asile de Mort' 'নিকেতন মৃত্যুর' ভয়াবহ নিস্তব্ধতা বোঝাতে চেয়েছেন।"[১৮]

সত্যেন্দ্রনাথের এই অনুবাদটিতে আধুনিক অনুবাদতত্ত্বের ভাষায় 'রূপান্তর' বলেই অভিহিত করতে হয়। যদিও এই ধরনের বিভাজন অত্যাধুনিক অনুবাদতত্ত্বের নিরিখে অবান্তর বলেই চিহ্নিত। কারণ, অনুবাদতত্ত্বের বিবর্তনধারায় অনুবাদ-বিষয়ক এই প্রচলিত পদ্ধতিকে বিবর্জিত করে, অত্যাধুনিক সাহিত্যতত্ত্বের পরিভাষায় অনুবাদ প্রকরণকে একটি সমষ্টিগত প্রক্রিয়ার সমাহার বলা হচ্ছে, যাতে বিনির্মাণতত্ত্ব গ্রহণতত্ত্ব ইত্যাদির মতো সাহিত্যতত্ত্বের নানা সম্ভাবনা উদ্‌ভাসিত হয়ে উঠছে। তাই এটি আজ শুধুমাত্র একটি পদ্ধতি হিসেবে বিবেচ্য না হয়ে অধ্যয়ন রূপে বিবেচ্য হচ্ছে। আর যেহেতু অধ্যয়ন কোনো নির্দিষ্ট সীমার মধ্যে সীমাবদ্ধ হতে পারে না, তাই এক্ষেত্রে শ্রেণী-বিভাজনও অযৌক্তিক ও অপ্রাসঙ্গিক হয়ে পড়ছে।

অতএব 'অনুবাদ' সংক্রান্ত এই নাতিদীর্ঘ আলোচনায় তথ্যের সাহায্যে অন্তত এইটুকু প্রমাণ করার চেষ্টা করা গেল যে, আধুনিক সাহিত্যবিশ্ব অনুবাদ ছাড়া অচল, আর সেক্ষেত্রে বর্তমান বাংলাসাহিত্যও অনুবাদের অপরিহার্য গুরুত্বকে স্বীকার করে এই ধারা ক্রমসমৃদ্ধ করার লক্ষ্যে অগ্রসরমান। আলোচ্য প্রবন্ধ তারই এক সামান্য কণিকামাত্র।

উল্লেখপঞ্জি :

১. Bassnett, Susan and Lefevere, Andre ed. — *Translation History and Culture*. London : Printer, 1990 p.12

২. Bassnett, Susan — *Translation Studies*. London: Routledge. Revised Ed. 1st Pub, 1991, Reprinted in 1992, 1994, p.63

৩. Ibid — Ibid, pp. 68-69

৪. Derida, J. — *Difference in Translation*, London : Cornell University Press, 1985, p. 188.

৫. Steiner, George — *After Bable Aspects of Language and Translation*, London : Oxford University Press, 1975 p. 279.

৬. কৃত্তিবাস — *কৃত্তিবাসী রামায়ণ* সম্পাদিত বেণীমাধব শীল, কলিকাতা: অক্ষয় লাইব্রেরি, ১৯ শ্রাবণ, সন ১৩৯৪, পৃ. ৩০

৭. বন্দ্যোপাধ্যায়, অসিতকুমার — *বাংলা সাহিত্যের সম্পূর্ণ ইতিবৃত্ত*, কলিকাতা : মর্ডান বুক এজেন্সি প্রা. লি. সংশোধিত ৬ষ্ঠ সং শ্রাবণ ১৩৯০, পৃ. ৩৯

৮. বিদ্যাসাগর ঈশ্বরচন্দ্র — 'বিজ্ঞাপন কথামালা' *বিদ্যাসাগর রচনাবলী*, কলিকাতা, পাত্রজ পাবলিকেশন অখণ্ড ২য় সং ১৯৯১, পৃ. ১৭৪

৯. চ্যাটার্জি সুনীলকুমার	*ডা. উইলিয়ম কেরী, বাংলার নবজাগরণে উইলিয়াম কেরী ও তাঁর পরিজন*, কলিকাতা: রত্না প্রকাশন ১ম প্রকাশ ১৩ই আশ্বিন ১৩৮১, ৩০শে সেপ্টেম্বর ১৯৭৪, পৃ. ৪৭
১০. Dasgupta. Chakraborty Subha	The 'Self' and the'other' in translation : *Perspectives from Bengal, Unpublished entry*. p. 2
১১. পোদ্দার, অরবিন্দ	*রেনেসাঁস ও সমাজমানস*, কলিকাতা : উচ্চারণ, ১ম প্রকাশ ৬ আশ্বিন ১৩৯০, ২৩ সেপ্টেম্বর, ১৯৮০ পৃ. ১১১
১২. Dasgupta. Chakraborty Subha	The 'Self' and the 'other' in translation : *Perspectives from Bengal, Unpublished entry*. p 3
১৩. Venuti. Lawrence,	*Introduction Rethinking Translation Discourse, Subjectivity Idelogy*, ed. by Lawrence Venuti. London & Newyork. Routledge, 1st Pub. 1992. p. 1
১৪. ঘোষ অরবিন্দ	'To the Sea' (কবিতা) *অমর অনুবাদক সত্যেন্দ্রনাথ* : সুধাকর চট্টোপাধ্যায় কলিকাতা, এ মুখার্জী অ্যাণ্ড কোম্পানি প্রা. লি. ১ম সং, আশ্বিন ১৩৬৪, পৃ. ৩৬
১৫. তদেব	'সাগরের প্রতি' (কবিতা) অনুবাদক সত্যেন্দ্রনাথ দত্ত, প্রবাসী (সাময়িকপত্র) এলাহাবাদ: শ্রাবণ ৪র্থ সংখ্যা বঙ্গাব্দ ১৩১৬, ৯ম ভাগ, পৃ. ২৩৪-৩৫
১৬. ডিরোজিও, হেনরী লুই ভিভিয়ান	'Sister in Law' *ঝড়ের পাখি : কবি ডিরোজিও*, পল্লব সেনগুপ্ত কলিকাতা: পুস্তক বিপণি, ২য় সং ডিসেম্বর ১৯৮৫, পৃ. ১৪২
১৭. তদেব	'বৌদিদি' ডিরোজিয়োর কবিতা, অনুবাদক সত্যেন্দ্রনাথ দত্ত, ভারতী (সাময়িক পত্র) কলিকাতা : আষাঢ় ৩য় সংখ্যা বঙ্গাব্দ ১৩১৭, ৩৪ বর্ষ, পৃ. ২৪৯-৫০
১৮. চট্টোপাধ্যায় সুধাকর	*অমর অনুবাদক সত্যেন্দ্রনাথ*, কলিকাতা : এ মুখার্জী অ্যাণ্ড কোম্পানি প্রাইভেট লি. ১ম সং আশ্বিন ১৩৬১, পৃ. ৮৭-৮৮

ইকোক্রিটিসিজম

সঞ্চিতা বসু

সাহিত্য-সমালোচনার সাম্প্রতিক ধারাগুলির মধ্যে অন্যতম ধারাটির নাম ইকোক্রিটিসিজম (Ecocriticism)। পাঠকদের কাছে এই নামটি এতই নতুন যে আলোচনা শুরুর আগে জানা দরকার যে ইকোক্রিটিসিজম বলতে আসলে কী বোঝায়। ইকোক্রিটিসিজম-এর আলোচনাগুলিকে যখন প্রথম বই আকারে রূপ দিলেন C. Glotfelty ও H. Fromm, তখন সেই বইটির ভূমিকায় তাঁরা ইকোক্রিটিসিজম-কে ব্যাখ্যা করেছিলেন এইভাবে—

"What then is ecocriticism ? Simply put, ecocriticism is the study of the relationship between literature and the physical environment. Just a feminist criticism examines language and literature from a gender-conscious perspective, and Marxist criticism brings an awareness of modes of production and economic class to its reading of texts, ecocriticism takes an earth-centred approach to literary studies."[১]

ইকোক্রিটিসিজম সংক্রান্ত বিস্তারিত ব্যাখ্যায় আমরা পরে যাব। তার আগে জেনে নেওয়া দরকার সাহিত্য-সমালোচনার এই ধারাটির সূত্রপাত কবে থেকে। মোটামুটিভাবে ধরে নেওয়া হয় ১৯৯০-এর দশক থেকে ইকোক্রিটিসিজম নিয়ে আলোচনাগুলি সাহিত্য-সমালোচনার একটি ধারা হিসেবে স্বীকৃতি লাভ করে। যদিও কিছু আগে থেকেই, অর্থাৎ ১৯৭০-৮০-র দশক থেকেই গবেষকরা চেষ্টা করছিলেন ইকোক্রিটিসিজম-কে আলাদা একটি সংরূপ হিসেবে তুলে ধরার। ১৯৯০ সালে Cheryll Glotfelty, রেনোর university of Nevada-তে অধ্যাপক হিসেবে এমন একটি পদ পান, যে পদটির সঙ্গেও ইকোক্রিটিসিজম-এর জয়যাত্রার একটি যোগ ছিল। Glotfelty-র পদটির নাম ছিল Professor of Literature and the Environment।[২] পরবর্তীকালে অধ্যাপক Glotfelty এবং Harold Fronm ইকোক্রিটিসিজম সংক্রান্ত লেখাগুলিকে একত্রিত করে ও সম্পাদনা করে একটি বই সংকলন করেন— *The Ecocriticism Reader : Landmarks in Literary Ecology*। ১৯৯৬ সালে, ইউনিভার্সিটি অভ্ জর্জিয়া

প্রেস থেকে বইটি প্রকাশিত হয়। এই বইটির প্রকাশ থেকেই ইকোক্রিটিসিজম সাহিত্যসমালোচনার নতুন ধারা হিসেবে পাকাপাকিভাবে আত্মপ্রকাশ করল।[৩] এই প্রসঙ্গে আরও একটি বইকে আমরা পথিকৃৎ ভাবতে পারি— ১৯৯৫ সালে হারভার্ড ইউনিভার্সিটি প্রেস থেকে প্রকাশিত Lawrence Buell-এর *The Environmental Imagination : Thoreau, Nature Writing, and the Formation of American Culture* বইটি।[৪] অবশ্য 'Ecocriticism' এই পরিভাষাটির প্রথম ব্যবহার হয় আরও আগে, ১৯৭৮ সালে, William Rueckert-এর একটি প্রবন্ধে—'Literature and Ecology : An Experiment in Ecocriticism'।[৫]

১৯৯২ সালে প্রতিষ্ঠিত হল ASLE, 'অর্থাৎ The Association for the Study of Literature and Environment'। বর্তমানে সংস্থাটির শাখা ছড়িয়ে পড়েছে জাপান, জার্মানি, ইউনাইটেড কিংডম, আর কোরিয়া-তেও। নানা কাজের মাধ্যমে সংস্থাটি ইকোক্রিটিসিজমকে ক্রমশ পরিচিত করে তুলছে সমগ্র পৃথিবীতে। ASLE বছরে দুবার ASLE NEWS এবং 'Inter-disciplinary Studies in Literature and Environment' (ISLE) নামের একটি জার্নালও প্রকাশ করে থাকে।[৬] *ISLE*-র মাধ্যমে অতি-দ্রুত ইকোক্রিটিসিজম সংক্রান্ত আলোচনার পরিধি ও বিস্তার বাড়ছে; তাছাড়া এই ধরনের কাজকে উৎসাহ দেওয়ার জন্য নানারকম স্কলারশিপ-এর আয়োজনও এঁরা করেছেন। ASLE এখন সারা পৃথিবীতেই পরিবেশবিদ্যা, এই সংক্রান্ত গবেষণা, গবেষণাধর্মী প্রবন্ধের প্রকাশ ও পরিবেশ-সংক্রান্ত সচেতনতা গড়ে তোলার জন্য একটি বিশিষ্ট নাম।

সাহিত্যের পরিধির মধ্যেই ইকোক্রিটিসিজম-এর কাজকে আবদ্ধ রাখা হয়েছিল গোড়ার দিকে। মনে করা হত, রোমান্টিক কবিতা, nature writing আর wilderness narrative নিয়ে আলোচনা করাই এর কাজ।[৭] কিন্তু সাম্প্রতিককালে মূলত ASLE-র প্রেরণায় ইকোক্রিটিসিজম-এর পরিধি অনেক বিস্তার লাভ করেছে। শেষ কয়েক বছরে নতুন যে দিকগুলির প্রতি দৃষ্টিপাত করা হয়েছে এবং ইকোক্রিটিসিজম-এর অন্তর্গত অঞ্চল হিসেবে ভাবা হচ্ছে, সেগুলি হল[৮]—

১. জনপ্রিয় বৈজ্ঞানিক প্রবন্ধ
২. চলচ্চিত্র
৩. টেলিভিশন
৪. শিল্প
৫. স্থাপত্য
৬. পার্ক, চিড়িয়াখানা, শপিং মল ইত্যাদি

এত বিস্তৃত পরিধির মধ্যে না গিয়ে আমরা যদি শুধুমাত্র সাহিত্যের দিকেই তাকাই, তাহলেও ইকোক্রিটিসিজম-এর মধ্যে কোন্ কোন্ দিককে বিশেষভাবে গুরুত্ব দেওয়া হয়, তা জেনে নেওয়া দরকার। যেহেতু এটি একটি intrerdisciplinary সাহিত্যসমালোচনার ধারা, তাই অনেকগুলি ধারার সমন্বয় এর মধ্যে লক্ষ করা যাবে। মূলত, চারটি বিষয় ইকোক্রিটিসিজম-এর আলোচনার মধ্যে থাকা উচিত—

১. নান্দনিক দিক
২. সামাজিক দিক
৩. বৈজ্ঞানিক দিক
৪. সাংস্কৃতিক দিক

কার্যত, ইকোক্রিটিসিজম-এর আলোচনা একারণেই interdisciplinary, যেহেতু এতগুলি discipline-এর প্রক্ষেপ এসে পড়তে পারে এর মধ্যে। ইকোক্রিটিসিজম-এর কাজটাই যেহেতু মূলত সাহিত্যভিত্তিক, তাই একটি নান্দনিক দিক এর মধ্যে থাকতেই হবে। প্রকৃতি তার সৌন্দর্য, তার আদিমতা, জটিলতা নিয়ে অবস্থান করবে সাহিত্যে। আর দেখতে হবে মানুষের সঙ্গে এই প্রকৃতির অবস্থান কেমন— মানুষ কীভাবে প্রকৃতিকে দেখে, দেখে মুগ্ধ হয়। আবার, সামাজিক দিক থেকে দেখা দরকার মানুষ প্রকৃতিকে কীভাবে মূল্যায়ন করে, বা অবমূল্যায়ন করে। কীভাবে গড়ে তোলে প্রকৃতিকে, কীভাবেই বা নষ্ট করে তাকে। অন্যদিকে, বিজ্ঞানের সঙ্গেও প্রকৃতি যুক্ত হয়ে আছে অঙ্গাঙ্গীভাবে, কাজেই প্রকৃতির সঙ্গে মানুষের সম্পর্কের মধ্যে, মূল্যায়নের মধ্যে বিজ্ঞান এসে পড়বেই, সুতরাং ইকোক্রিটিসিজম-এর আলোচনা মানেই বিজ্ঞানের সঙ্গে এর ওতপ্রোত সংযোগ। আর, সমস্ত আলোচনার বহির্বলয়ে থাকবে একটি সাংস্কৃতিক মূল্যবোধের প্রক্ষেপ— প্রকৃতিকে তার যথার্থ মর্যাদায় ভাবতে হবে আমাদের।

ইকোক্রিটিসিজম-এর প্রথাগত বিশ্লেষণের পদ্ধতি মূলত এরকম[৮]—

১. নির্দিষ্ট সময়ে, জনজীবনে, মানুষের কল্পনায় প্রকৃতির ভূমিকা কেমন।
২. প্রকৃতির ধারণা কীভাবে সংজ্ঞায়িত হচ্ছে।
৩. প্রকৃতি সংক্রান্ত ধারণার মধ্যে কোন্ কোন্ মূল্যবোধকে আরোপ করা হচ্ছে বা অস্বীকার করা হচ্ছে।
৪. মানুষ ও প্রকৃতির সম্পর্ককে কীভাবে দেখানো হচ্ছে।
৫. সাহিত্যে প্রকৃতিকে কীভাবে ব্যবহার করা হচ্ছে।

ইকোক্রিটিসিজম-এর আলোচনার মধ্যে বারবার 'Nature' বা প্রকৃতির কথা এলেও আমাদের বোধহয় 'environment' শব্দটির প্রতি বেশি জোর দিতে হবে যেহেতু 'Nature' মানে বিশুদ্ধ প্রকৃতি, বন্যতাকে বোঝায়। আর 'environment' আরও বড়ো ও বিমূর্ত একটি ধারণা, এর মধ্যে প্রকৃতি ও মানুষ সৃষ্ট পরিবেশ, দুটোই থাকে। যেহেতু, ইকোক্রিটিসিজম-এর পরিধি অত্যন্ত বিস্তৃত, কেবলমাত্র 'Nature writing' বা প্রকৃতি বর্ণনার মধ্যেই এর আলোচনা আর আবদ্ধ নেই, একটি সামাজিক, সাংস্কৃতিক দৃষ্টিকোণও ইকোক্রিটিসিজম-এর সঙ্গে জড়িত, তাই ইকোক্রিটিসিজম-এ 'environment' বা পরিবেশ শব্দটির প্রতিই আমাদের বেশি জোর দিতে হবে।

The Ecocriticism Reader-এ C. Glotfelty যে বিষয়গুলি বেছেছিলেন—তার থেকেও ইকোক্রিটিসিজম নিয়ে আলোচনার পরিধি কতটা হবে, তার একটা ধারণা আমরা পেতে পারি। মোট পঁচিশটি প্রবন্ধ এই সংকলন গ্রন্থে জায়গা করে নিয়েছিল, যার বিষয়গুলি ছিল এরকম[৯]—

১. American Studies
২. Regionalism
৩. Pastoralism
৪. Frontier
৫. Human ecology
৬. Science and literature
৭. Nature in literature
৮. Landscape in literature

American Studies-কে বাদ দিলে বাকি বিষয়গুলি যে-কোনো দেশের ইকোক্রিটিসিজম-এরই বিষয়বস্তু হতে পারে। এই বিষয়সূচী থেকে একটি বিষয় স্পষ্ট যে প্রকৃতির ভূমিকা

ইকোক্রিটিসিজম-এ যথেষ্ট গুরুত্বপূর্ণ, কিন্তু বিজ্ঞানকেও আলাদা করে স্থান দেওয়া হয়েছিল এই সংকলনে। ফলে বিজ্ঞান আর সাহিত্য একে অন্যের পরিপূরক হয়ে দাঁড়িয়েছিল এই আলোচনায়— যদিও *The Ecocriticism Reader* প্রকাশিত হওয়ার আগে সাহিত্যের নান্দনিক দিকটির প্রসঙ্গই ইকোক্রিটিসিজম-এর আওতাভুক্ত হত ; বৈজ্ঞানিক দিকগুলি নয়। কিন্তু, এই মুহূর্তে এই সমস্যাটির সম্মুখীন আর হতে হয় না ইকোক্রিটিসিজম-কে।

বর্তমানে ইকোক্রিটিসিজম-এ যে বিষয়ের প্রতি সর্বাধিক গুরুত্ব দেওয়া হয়, তা হল নৈতিক অবস্থান (ethical stand), প্রকৃতির প্রতি দায়বোধ, মানুষ ও প্রকৃতির মধ্যে যোগাযোগের সেতুকে দৃঢ় করা।[১০] কাজেই শুধুমাত্র সাহিত্যে প্রকৃতির ভূমিকাকে পর্যবেক্ষণ বা বিশ্লেষণ করলেই ইকোক্রিটিসিজম-এর কাজ শেষ হয়ে যাবে না— প্রকৃতি সম্পর্কে সচেতনতা, প্রকৃতিকে রক্ষা করার চেষ্টা ও নীতিগত দায়বোধ, মানুষের সঙ্গে সমগ্র প্রকৃতি ও মানব-বহির্ভূত জীবজগতের সংযোগ সাধনের প্রতিও ইকোক্রিটিসিজম আগ্রহী।

সাহিত্যের ক্ষেত্রে এইমুহূর্তে ইকোক্রিটিসিজম-এর লক্ষ্য মূলত— "expression of human experience primarily in a naturally and consequently in a culturally shaped world : the joys of abundance, sorrows of diprivation, hopes of harmonious existence, and fear of loss and disaster."[১১]

যতই দিন যাচ্ছে, ইকোক্রিটিসিজম-এর নৈতিক দায় বোধহয় ততই বাড়ছে, যেহেতু পরিবেশ দূষণ, পৃথিবীর তাপমাত্রা ইত্যাদি নানা প্রাকৃতিক বিপত্তি বাড়ছে। পৃথিবীকে ধ্বংসের হাত থেকে বাঁচাতে ইকোক্রিটিসিজম-এর ভূমিকা যথেষ্ট গুরুত্বপূর্ণ হয়ে উঠছে। আর, তাই বোধহয় সাহিত্যের সীমানাতেও 'fear of loss and disaster'— এই অনুভূতির প্রকাশও ঘনীভূত হচ্ছে বেশি করে। প্রাকৃতিক সম্পদ আর প্রাচুর্য যত কমছে, নানা ধরনের 'global threat'-র সংখ্যা ও আশঙ্কা বাড়ছে— সাহিত্যেও তার ছায়া পড়ছে। ফলে, ইকোক্রিটিসিজম-এ সব থেকে বেশি গুরুত্ব পাচ্ছে নৈতিক দৃষ্টিভঙ্গি বা অবস্থান, যা পৃথিবীকে, প্রাকৃতিক পরিবেশকে বাঁচিয়ে রাখতে সহায়তা করবে।

১৯৭৪ সালেই, John Passmore তাঁর *Man's Responsibility for Nature* গ্রন্থে দুটি পরিভাষার প্রতি দৃষ্টি আকর্ষণ করেছিলেন[১২]—

১. 'Problems in ecology'

২. 'Ecological problems'

প্রথমটিকে তিনি সম্পূর্ণ বৈজ্ঞানিক বিষয় ও দ্বিতীয়টিকে সামাজিক বিষয় হিসেবে স্বীকৃতি দিয়েছিলেন। Greg Garrard-এর মতে— "...ecocriticism cannot contribute much to debates about problems in ecology, but it can help to define, explore and resolve ecological problems in this wider sense."[১৩]

বৈজ্ঞানিক দৃষ্টিভঙ্গি ইকোক্রিটিসিজম-এর মধ্যে থাকলেও, সামাজিক সমস্যাগুলির প্রতিই এর নজর বেশি। তার মানে এই নয় যে, বিজ্ঞান-ভিত্তিক সমস্যাগুলিকে ইকোক্রিটিসিজম খারিজ করে দেয়— বিজ্ঞান-বিষয়ক সমস্যাগুলিকে ইকোক্রিটিসিজম অনেক সময় সামাজিক সমস্যা হিসেবেও গণ্য করে ; যেমন পরিবেশ দূষণ। পরিবেশ দূষণ নিঃসন্দেহে বিজ্ঞানভিত্তিক সমস্যা, কিন্তু সাহিত্যে যখন পরিবেশ দূষণ নিয়ে আলোচনা হয় তখন বিশুদ্ধ বিজ্ঞান-ভিত্তিক সমস্যার থেকেও সাহিত্যিকের সামাজিক দৃষ্টিভঙ্গির প্রক্ষেপে পরিবেশ দূষণ তখন অনেকাংশে একটি সামাজিক সমস্যাও হয়ে উঠে। যেহেতু সাহিত্যিক বৈজ্ঞানিক নন, বিশুদ্ধ বিজ্ঞান তাঁর

বিষয়গত আওতায় পড়ে না তাই পরিবেশ দূষণকে তাঁর পক্ষে সামাজিক সমস্যা হিসেবে গ্রহণ করাই স্বাভাবিক।

অবশ্য, এর উল্টোটাও ঘটতে পারে কোনো কোনো সময়ে। ১৯৬২ সালে Rachel Carson *Silent Spring* বইতে কীটনাশকজনিত দূষণ, কৃষিকার্যে কীটনাশকের ব্যবহার নিয়ে সচেতনতা আনতে চেয়েছিলেন। সচেতনভাবে, কোনো সাহিত্য সৃষ্টি করার অভিপ্রায় তাঁর ছিল না, কিন্তু অনেকেই *Silent Spring* বইটিকে বিজ্ঞানের বই হিসেবে মানতে চাননি প্রথমে। কারণ, এতে নাকি বিশুদ্ধ বৈজ্ঞানিক দৃষ্টিভঙ্গির বদলে সাহিত্যেক দৃষ্টিকোণ বেশি ছিল। Greg Garrard বিষয়টিকে ব্যাখ্যা করেছিলেন এইভাবে— "The great achievement of the book was to turn a (scientific) problem in ecology into a widely perceived ecological problem that was then contested politically, legally and in the media and popular culture."[১৪]

বস্তুত, ইকোক্রিটিসিজম যেহেতু interdisciplinary একটি সাহিত্যসমালোচনার ক্ষেত্র, তাই সাহিত্য বা বিজ্ঞানের অঞ্চলের মধ্যে জলঅচল একটি ভাগ করা বোধহয় অসম্ভব। তা-ছাড়া, আমাদের মনে রাখতে হবে, সাহিত্যিক কখনই সাহিত্য-সমালোচনার কথা মনে রেখে সাহিত্য সৃষ্টি করেন না। কাজেই, সাহিত্য-সমালোচনার একটি নির্দিষ্ট ধারার সমস্ত লক্ষণ একটি সাহিত্যকর্মের মধ্যে খুঁজে পাওয়া সত্যিই শক্ত। তবু, সাহিত্যিকরা নিজের অজান্তেই এমন কিছু সাহিত্য সৃষ্টি করে ফেলেন, যাতে সমালোচক হয়তো সাহিত্যসমালোচনার ধারাটির সবকটি বৈশিষ্ট্য খুঁজে পেতে সক্ষম হন।

এবার ফিরে তাকানো দরকার আমাদের বাংলা সাহিত্যের দিকে। বাংলা সাহিত্যের প্রতিটি ধারায়, এমনকি প্রতিটি লেখক, কবি, প্রাবন্ধিকের লেখাতেই প্রকৃতি বা পরিবেশের ব্যবহার লক্ষ করা সম্ভব, এবং তা সংখ্যায় অগণিত। শুধু বাংলা সাহিত্যেই নয়, বৈদিক যুগের সাহিত্যের মধ্যেও প্রকৃতির ব্যবহার অপরিসীম। বেদে বিশ্বপ্রকৃতিকে পুজো করা হত দেবতা জ্ঞানে। জাহ্নবীকুমার চক্রবর্তী জানাচ্ছেন—

> ভয়, বিস্ময়, সৌন্দর্যবোধ হইতেও দেবসত্তার কল্পনা করা হয়। প্রয়োজন-প্রেরণাই মুখ্য। ভূলোকে প্রয়োজনীয় অগ্নি, সোমলতা, জল অপ্। তাই অগ্নি, সোম, অপ দেবতা। দ্যুলোকে অতি প্রত্যক্ষ সূর্য ও সৌরজগৎ। সূর্যের অয়নে আবির্ভূত হয় রাত্রি, উষা— তাই সূর্য, রাত্রি, উষা দেবতা। অন্তরিক্ষ লোকে প্রবহমান মাতরিশ্বা বায়ুর প্রভাবও অপরিসীম, তাই তিনি দেবতা।[১৫]

বৈদিক যুগে মনে করা হত বিশ্বপ্রকৃতির সমস্ত উপাদানই কোনো-না-কোনোভাবে মানুষের প্রাণধারণের চালিকাশক্তি। ঋগ্বেদ-এ বলা হয়েছে—

> পুন র্নো অসুং পৃথিবী দধাতু
> পুন র্দৌ দেবী পুনরন্তরিক্ষং।
> পুন র্নঃ সোমস্তন্বং দদাতু
> পুনঃ পুষা পথ্যাং যা স্বস্তি।। [ঋ. ১০. ৫৯. ৬]

অর্থাৎ "পৃথিবী পুনরায় আমাদের জীবন দান করুন। দ্যুলোক ও অন্তরীক্ষ পুনরায় জীবন দান করুন। সোম পুনরায় আমাদের দেহ দান করুন, আর শুভকারী পুষা পুনরায় আমাদের বাক্য দান করুন।"[১৬]

কেবলমাত্র দেবতা হিসেবেই নয়, নিসর্গ বিশ্বের মধুক্ষারয়িত্রী বাতাস, নদ-নদী, রজনী-উষা, বনস্পতি, ধূলিকণা-র মধুর রূপও বৈদিক ঋষির চোখ এড়িয়ে যায়নি। প্রকৃতির সঙ্গে যুক্ত মানুষ অনেক সহজেই, স্বতঃস্ফূর্তভাবে এই শ্লোকগুলি রচনা করতে পেরেছিলেন। তাঁদের সম্পূর্ণ অজ্ঞান্তেই শ্লোকগুলির মধ্যে নান্দনিক দৃষ্টিকোণ তো বটেই, কোথাও কোথাও বৈজ্ঞানিক সত্যও আমরা খুঁজে পেয়ে যাব। তবে, ইকোক্রিটিক-দের কাছে এই শ্লোকগুলির মধ্যে সবথেকে লক্ষ করার বিষয় বোধহয় মানুষ ও বিশ্বপ্রকৃতির পারস্পরিক সহাবস্থান। প্রকৃতির কাছ থেকে বৈদিক ঋষিরা যা পেয়েছেন— সে সম্পর্কে তাঁরা সম্পূর্ণ ওয়াকিবহাল, আর দেবতারূপে পুজো করার কারণ বোধহয় বিশ্বপ্রকৃতির প্রতি তাঁদের কৃতজ্ঞতা বোধ।

বৈদিক যুগের পরবর্তী পর্যায়ে, আমরা যদি মহাকাব্যগুলির দিকে তাকাই, আমরা কিন্তু আর প্রকৃতিকে দেবতার আসনে পাব না। অর্থাৎ, বিশ্বপ্রকৃতির সঙ্গে বৈদিক যুগের মানুষের যা যোগ ছিল, সেখান থেকে সময়ের সঙ্গে সঙ্গেই সরতে শুরু করেছিলাম আমরা। তবে, দেবত্ব-বিরহিত বিশ্বপ্রকৃতিকে খুঁজে পাব আমরা পরবর্তী সময়েও। প্রকৃতি সেখানে জীবনের প্রতিটি শ্বাস-প্রশ্বাসের সঙ্গে জড়িত নিত্য অপরিহার্য কোনো বিষয় নয়। পুরাণ, *রামায়ণ* ও *মহাভারত*-এর মহাকবিরাও প্রকৃতির যে বর্ণনা দিয়েছিলেন, তা মূলত নিসর্গ প্রকৃতিই।

মহাকবি কালিদাস তাঁর কাব্যে প্রকৃতি বর্ণনা করেছেন— তবে তা মূলত প্রেমভাবের উদ্দীপক। কেবলমাত্র নিসর্গের বর্ণনা নয়— মানুষের মনের ওপর বিশ্বপ্রকৃতির প্রভাবও কোনো কোনো সময়ে জায়গা করে নিয়েছে। কালিদাসের *ঋতুসংহার* কাব্যে ছয়টি সর্গে, ছ-টি ঋতু এক একটি রতিভাবের উদ্দীপক। আবার, *মেঘদূতম্* কাব্যে প্রকৃতিই যেন চরিত্র। কিন্তু, শ্রীবিষ্ণুপদ ভট্টাচার্য তাঁর *কালিদাস ও রবীন্দ্রনাথ* বইতে *মেঘদূত*-এর একটি 'আবহতাত্ত্বিক ব্যাখ্যা'-র উল্লেখ করেছিলেন।[১৭] শ্রীভট্টাচার্য ১৩৪২ বঙ্গাব্দের আষাঢ় সংখ্যায় 'ভারতবর্ষ' পত্রিকায়, আলিপুর আবহতাত্ত্বিক বিভাগের তৎকালীন প্রধান অধ্যক্ষ ডক্টর এস. এন. সেন-এর লেখা 'মেঘদূতের আবহতত্ত্ব' নামক একটি প্রবন্ধের উল্লেখ করেছিলেন। ড. সেন আবহতাত্ত্বিকের দৃষ্টিকোণ থেকে দেখাতে চেয়েছিলেন, কালিদাস মেঘের যে যাত্রাপথের বর্ণনা দিয়েছিলেন, তা কোনো কাল্পনিক যাত্রাপথ নয়— বৈজ্ঞানিকভাবেও সঠিক। ড. সেন তাঁর প্রবন্ধে বলেছিলেন[১৮]—

> ...এখানে বলা প্রয়োজন যে সাধারণতঃ মেঘকে রামগিরি হইতে অলকা যাইতে হইলে উজ্জয়িনী ঘুরিয়া যাইতে হয় না। এই জন্য মহাকবি 'পূর্বমেঘ'-এর অষ্টবিংশতি শ্লোকে মেঘকে রাজধানী দর্শনের নানারূপ লোভ দেখাইতে ছাড়েন নাই। বৈজ্ঞানিকের দিক দিয়া দেখিতে গেলে উজ্জয়িনীর পথে পূর্বমেঘকে টানিয়া আনিতে হইলে কোনো বিশেষ কারণের প্রয়োজন হয়। এ কারণ সাধারণতঃ বাদল ঝড়ের অভিযান। যখন এইরূপ কোনো ঝড় উৎকল হইতে গুর্জর অভিমুখে অগ্রসর হয় তখন রামগিরি অঞ্চলে বর্ষা প্রবল হয় এবং পূর্বমেঘের রামগিরি হইতে উজ্জয়িনী হইয়া অলকা অভিমুখে যাওয়া খুবই সম্ভব হয়। অতএব দেখা যাইতেছে যে কালিদাস পূর্বমেঘকে বিজ্ঞানসম্মতভাবেই তাহার পথ-নির্দেশ করিয়াছিলেন।..."

ড. সেনের এই ব্যাখ্যাকে শ্রীভট্টাচার্য অবশ্য মানতে চাননি। তবে অভিনব বলে স্বীকার করেছিলেন। কালিদাসের পক্ষে সত্যিই আবহতত্ত্ব জানা সম্ভব নয়, আর মেঘের গতিপথ সত্যিই বৈজ্ঞানিকভাবে ঠিক ছিল কিনা, এই বিষয়টিও বিতর্কসাপেক্ষ। কালিদাসের মেঘের গতিপথ আর আবহতত্ত্বের মেঘের গতিপথের এই মিল সম্পূর্ণতই কাকতালীয়। তবে, সংস্কৃত সাহিত্যের কবি কালিদাসের একটি কাব্যের এমন একটি আবহতাত্ত্বিক ব্যাখ্যা হয়তো ইকোক্রিটিসিজম-এর পক্ষে খুবই উৎসাহব্যঞ্জক হবে। কালিদাসের *মেঘদূতম্* কাব্যের নিসর্গবিশ্ব

বা নান্দনিক দৃষ্টিকোণ আমাদের সকলের জানা, কিন্তু অতিপরিচিত প্রাচীন কাব্যের এমন একটি আবহতাত্ত্বিক বিশ্লেষণ সত্যিই অভিনব।

কুমারসম্ভব-এ অকালবসন্ত, *মেঘদূতম্*-এ বর্ষা, *রঘুবংশম্*-এ শরৎ, *ঋতুসংহার*-এ ছ-টি ঋতুরই বর্ণনা দিয়েছিলেন কালিদাস। বাংলাসাহিত্যের প্রাচীনতম নিদর্শনেও আমরা পেয়ে যাব বসন্ত বর্ণনার ছবি[১৯]—

গাণা তরুবর মৌলিল রে
গঅণত লাগেলী ডালী [চর্যাপদ, ২৮ নং]

আবার, মানবদেহ আর গাছকে মিলিয়ে দেওয়া হয়েছে কোথাও[২০]—

কাআ তরুবর পঞ্চ বি ডাল" [চর্যাপদ, ১নং]

কোথাও আবার মনের সঙ্গে তরুকে মেলানো হয়েছে[২১]—

মন তরু পাঞ্চ ইন্দি তসু সাহা।
আসা বহল পাত ফল বাহা॥ [চর্যাপদ, ৪৫ নং]

বৈষ্ণব পদাবলীর অভিসার পর্যায়ে বা মঙ্গলকাব্যের বারোমাস্যাগুলিতে আবার আমরা পাব ঋতুপর্যায়ের চিত্র। গ্রীষ্মাভিসার, বর্ষাভিসার, হেমন্তাভিসার, হিমাভিসার, ইত্যাদি ঋতুপর্যায় অনুযায়ী রাধার পোশাক-সাজসজ্জা পরিবর্তিত হয়েছে—তার বিস্তারিত বর্ণনা রয়েছে বৈষ্ণবপদাবলীতে। বিদ্যার বারোমাস্যা বা ফুল্লরার বারোমাস্যাতেও এসেছে ঋতুপরিবর্তনের দীর্ঘ বর্ণনা। কিন্তু দুই কবির প্রকৃতি বর্ণনার অভিমুখ এখানে আলাদা। রাজসভার কবি ভারতচন্দ্র, তাঁর অভিজাত নায়িকা বিদ্যার বারোমাসের কাহিনির ছবি এঁকেছেন কামশাস্ত্র অনুযায়ী। ঋতুগুলি এখানে বিদ্যার ভালোবাসার উদ্দীপক। কিন্তু জীবনের নানা ঘাত-প্রতিঘাতে আঘাত পেতে পেতে, জীবিকার সন্ধানে ঘুরতে থাকা মধ্যবিত্ত অথচ অন্য এক রাজসভার কবি মুকুন্দরামের দরিদ্র নায়িকা ফুল্লরার বারোমাস্যায় রতিভাব নেই, বরং প্রতিটি ঋতুতে ফুল্লরাকে সংগ্রাম করতে হয় বেঁচে থাকার। ভাদ্রমাসে যখন বিদ্যা বলেন[২২]—

ঝরঝরি জলের বায়ুর খরখরি।
শুনিব দুজনে শুয়ে গলাগলি করি॥

তখন ফুল্লরাকে বলতে হয়[২৩]—

ভাদ্রপদ মাসে রামা দুরন্ত বাদল
নদনদী একাকার আটদিকে জল।
মাঁসের পসরা লৈয়া ফিরি ঘরে ঘরে
আনলে পোড়এ অঙ্গ ভিতরে বাহিরে।

চৈত্র মাসে বিদ্যা বলছেন[২৪]—

মধুর সময় বড় চৈত্র মধুমাস।
জানাইব নানামত মদন বিলাস॥

ফুল্লরার কপালে কিন্তু তখনও দুঃখ। মুকুন্দরাম বর্ণনা দিচ্ছেন[২৫]—

মধুমাসে মলয়মারুত মন্দ মন্দ
মালতিয়ে মধুপান করে মকরন্দ।
বনিতা পুরুষ অঙ্গ পিড়এ মদন
আমার পীড়িত অঙ্গ উদর দহন।

মুকুন্দরামের *চণ্ডীমঙ্গল* কাব্যে আমরা কিন্তু এতক্ষণের দেখা প্রকৃতির মধুর রূপ থেকে বেরিয়ে এলাম। একই বারোমাস, একই ঋতুপর্যায়— কিন্তু দুই কবির দৃষ্টিভঙ্গি সম্পূর্ণ আলাদা, দুই কবির দুই নায়িকার সামাজিক অবস্থানও আলাদা। সামাজিক দৃষ্টিকোণ যে সত্যিই প্রকৃতি সম্পর্কে কবির ভাবনাকে বদলে দিতে পারে বিদ্যা আর ফুল্লরার বারোমাস্যা দুটি তার প্রমাণ। বিদ্যার কাছে তাঁর সামাজিক অবস্থানের জন্য ভাদ্র আর চৈত্রের এক রূপ, আর ফুল্লরার কাছে ভাদ্র আর চৈত্রের রূপ একই, কিন্তু তাৎপর্য আলাদা। ইকোক্রিটিসিজম-এর বৈশিষ্ট্য অনুযায়ী নান্দনিক দৃষ্টিকোণ ছাড়াও সামাজিক আর সাংস্কৃতিক দৃষ্টিকোণের যে প্রয়োজনীয়তা— তা আমরা ভারতচন্দ্র আর মুকুন্দরামের প্রকৃতি বর্ণনার এই অংশ থেকে বুঝতে পারি।

মধ্যযুগের বাংলা সাহিত্যের গণ্ডি পেরিয়ে আমরা যতই আধুনিক সাহিত্যের অন্দরে প্রবেশ করব, দেখব প্রায় সমস্ত কবি-লেখক-প্রাবন্ধিকদের লেখাতেই প্রকৃতি বা পরিবেশ এসেছে কোনো-না-কোনো ভাবে। আসলে, প্রকৃতিকে বা পরিবেশকে এড়িয়ে গিয়ে বোধহয় কারও পক্ষেই লেখা সম্ভব নয়। কিন্তু আধুনিক সাহিত্যে প্রকৃতির ব্যবহার মূলত অনুষঙ্গ হিসেবেই এসেছে অধিকাংশ ক্ষেত্রে। হয় নিসর্গ-প্রকৃতির বর্ণনা, নয়তো নারীরূপের উপমা হিসেবে আমরা প্রকৃতির বহুল ব্যবহার খুঁজে পাব প্রায় সমস্ত সাহিত্যিকের কলমেই। তার বিস্তারিত ব্যাখ্যায় আমরা যাব না। কিন্তু ব্যতিক্রমও ছিল। আর, আমাদের আলোচনার প্রধান লক্ষ্য সেগুলিই।

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, জীবনানন্দ দাশ আর বিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায়ের লেখায় প্রকৃতি বা পরিবেশের ব্যবহার আমাদের কারোরই অজানা নয়। কিন্তু এই তিনজনের লেখায় ও প্রকৃতিভাবনায় একটি বিশেষ মিল ছিল। তিনজনেই তাঁদের অস্তিত্বকে মিলিয়ে নিতে চেয়েছিলেন জল-মাটি-ঘাস-আলোর সঙ্গে। রবীন্দ্রনাথের লেখা *ছিন্নপত্রাবলী*-র চিঠি আমাদের খুবই পরিচিত[২৬]—

> ...এই পৃথিবীর সঙ্গে, সমুদ্রের সঙ্গে, আমাদের যে-একটা বহুকালের গভীর আত্মীয়তা আছে, নির্জনে প্রকৃতির সঙ্গে মুখোমুখি করে অন্তরের মধ্যে অনুভব না করলে সে কি কিছুতেই বোঝানো যায়! পৃথিবীতে যখন মাটি ছিল না, সমুদ্র একেবারে একলা ছিল, আমার আজকেকার এই চঞ্চল হৃদয় তখনকার সেই জনশূন্য জলরাশির মধ্যে অব্যক্তভাবে তরঙ্গিত হতে থাকত; সমুদ্রের দিকে চেয়ে তার একতান কলধ্বনি শুনলে তা যেন বোঝা যায়।
>
> [৯১ নং, শিলাইদহ, মঙ্গলবার, ২ মে ১৮৯৩]

ছিন্নপত্রাবলী-র ৭০ নং চিঠিটি বোধহয় আমাদের আরও পরিচিত[২৭]—

> ... আমার এই চেতনার প্রবাহ পৃথিবীর প্রত্যেক ঘাসে এবং গাছের শিকড়ে শিকড়ে শিরায় শিরায় ধীরে ধীরে প্রবাহিত হচ্ছে, সমস্ত শস্যক্ষেত্র রোমাঞ্চিত হয়ে উঠছে এবং নারকেল গাছের প্রত্যেক পাতা জীবনের আবেগে থর্‌থর্‌ করে কাঁপছে।
>
> [৭০নং, শিলাইদহ, ২০ আগস্ট, ১৮৯২]

রবীন্দ্রনাথ নিজের চেতনাকে মিশিয়ে দিতে পেরেছিলেন পৃথিবীর ঘাসে, গাছের শিকড়ে, শস্যক্ষেত্রে, সমুদ্রের জলস্রোতে। জীবনানন্দ দাশও নিজেকে অনুভব করেছিলেন ঘাসের শরীরে[২৮]—

> ঘাসের ভিতর ঘাস হয়ে জন্মাই কোনো এক নিবিড় ঘাস-মাতার/শরীরের সুস্বাদ অন্ধকার থেকে নেমে। ["ঘাস"/ *বনলতা সেন*]

ধূসর পাণ্ডুলিপি কাব্যগ্রন্থের পিপাসার গান কবিতায় জীবনানন্দ বলছেন[২৯]—

> নক্ষত্রের পানে যেতে যেতে
> পথ ভুলে বারবার পৃথিবীর ক্ষেতে
> জন্মিতেছি আমি এক সবুজ ফসল।

বা *বেলা অবেলা কালবেলা* কাব্যগ্রন্থ-এর 'সূর্য-রাত্রি নক্ষত্র' কবিতায় অস্তিত্বকে দেখছেন একটু অন্যভাবে[৩০]—

নিরবধি কাল নীলাকাশ হয়ে মিশে গেছে আমার শরীরে

বিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায় আবার নিজের আত্মার মুক্তি অনুভব করেছিলেন মহাজাগতিক বিশ্বের সঙ্গে[৩১]—

...আমার মন পৃথিবীর গণ্ডী ছাড়িয়ে বহুদূর কোনপথে গেল উড়ে— আমি যে গ্রহলোকের জীব, আমার বাসস্থান যে বিশাল শূন্যের মধ্যে, অন্য আরও গ্রহ ও অগণ্য তারাদলের মধ্যে, কত কোটি সূর্য সেখানে দীপ্যমান, কত নীহারিকাপুঞ্জ, কত দৃশ্য-অদৃশ্য শক্তি, বিদ্যুৎ, কসমিক রে,— এদের সঙ্গে আমার আত্মা যেন এক হয়ে গেল। আমার অর্থলিপ্সু বৈষয়িব আত্মা মুক্তিলাভ করলে অল্প কয়েক মুহূর্তের জন্যে, ওই শুক্র তারার আলোর পথ বেয়ে উড়ে চলে গেল অসীম দ্যুতিলোকের মধ্যে।

পৃথিবীর সঙ্গে এই অবিচ্ছিন্নতাবোধের মধ্যে প্রকৃতপক্ষে লুকিয়ে আছে রবীন্দ্রনাথ, জীবনানন্দ বা বিভূতিভূষণের সংবেদনশীলতা। জন্ম-রোমান্টিক এই কবি ও সাহিত্যিকরা নিজেদেরকে যে অনুভব করেছেন প্রকৃতির মধ্যে, মহাবিশ্বের মধ্যে—এর মধ্যে তাঁদের মনের কোনো সচেতন বিজ্ঞানমনস্কতা হয়তো ছিল না। তাঁরা কবিতায়, চিঠিতে বা দিনলিপিতে নিজেদের অনুভূতি, প্রকৃতির সঙ্গে তাঁদের তন্ময়তার কথাই প্রকাশ করেছিলেন। কিন্তু, এই সাহিত্যকর্মগুলির মধ্যে রয়ে গেছে কিছু বৈজ্ঞানিক সত্য। কারণ, সত্যিই তো একদিন মানুষের জন্ম হয়েছিল এই মহাজাগতিক বিশ্ব থেকে, পৃথিবীর মানুষের আদিমতম প্রাণকণাটি তো একদিন, কোনো এক আদিযুগে লীন হয়েছিল পৃথিবীর মাটি-জল-বাতাসে! বস্তুত, কবি তো সচেতনভাবে বিজ্ঞান জেনে লেখেন না— কিন্তু কোনো কোনো মুহূর্তের ক্ষণিক উদ্ভাসে তাঁদের লেখায় ধরা পড়ে যায় বৈজ্ঞানিক সত্য; ইকোক্রিটিসিজম চর্চার ধারায় যা গ্রহণযোগ্য।

প্রকৃতি বা পরিবেশ নিয়ে রবীন্দ্রনাথের কথা বলতে বসলে তা আর শেষ হবে না। দীর্ঘ লেখক জীবনে রবীন্দ্রনাথ নানা লেখায় প্রকৃতির সঙ্গে নিজের সত্তাকে মিলিয়ে নিতে চেয়েছিলেন বারবার। *বনবাণী* গ্রন্থের ভূমিকায় রবীন্দ্রনাথ বলেছিলেন—'

আমার ঘরের আশেপাশে যে-সব আমার বোবা-বন্ধু আলোর প্রেমে মত্ত হয়ে আকাশের দিকে হাত বাড়িয়ে আছে তাদের ডাক আমার মনের মধ্যে এসে পৌঁছল।......মনের মধ্যে যে-সাড়া ওঠে সেও ওই গাছের ভাষায়,—তার কোনো স্পষ্ট মানে নেই, অথচ তার মধ্যে বহু যুগযুগান্তর গুনগুনিয়ে ওঠে।

[*রবীন্দ্ররচনাবলী*, দ্বিতীয় খণ্ড, জন্মশতবার্ষিক সংস্করণ, পশ্চিমবঙ্গ সরকার, ১৩৬৮, পৃ. ৮৩৭]

'তাদের ডাক' 'মনের মধ্যে' পৌঁছেছিল বলেই এই কাব্যগ্রন্থে জায়গা করে নিল 'দেবদারু', 'আম্রবন', 'নারিকেল', 'চামেলি-বিতান', এমনকি 'নীলমণিলতা', 'শাল', 'কুরচি', 'মধুমঞ্জরি' নাম্নী কবিতাগুলি। প্রকৃতির সান্নিধ্যে রবীন্দ্রনাথ তাঁর নিজের ভেতরেই যে 'বহু যুগযুগান্তরের গুণগুনিয়ে' ওঠাকে অনুভব করেছিলেন, তার প্রমাণ ছড়িয়ে আছে *চৈতালী*, *নৈবেদ্য*, *উৎসর্গ*, *বনবাণী*, *পত্রপুট*, *জন্মদিনে* ইত্যাদি গ্রন্থের নানা কবিতার বিভিন্ন অংশে, এমনকি বিভিন্ন চিঠি ও প্রবন্ধেও।

শান্তিনিকেতনে, ১৯২৮ সালে বর্ষামঙ্গল অনুষ্ঠানটিকে কবি রূপ দিয়েছিলেন বৃক্ষরোপণ উৎসবে। এই উপলক্ষে নতুন কবিতা লেখা হল— যা পরবর্তীকালে *বনবাণী* কাব্যগ্রন্থে জায়গা

করে নিয়েছে। 'বলাই' গল্পটিও এই উৎসবকে কেন্দ্র করেই লেখা হল। বৃক্ষরোপণ অনুষ্ঠানের পরদিন শ্রীনিকেতনে অনুষ্ঠিত হল হলকর্ষণ উৎসব।

পরিবেশ দূষণের ফলে এখন মানুষের মধ্যে যে সচেতনতার প্রকাশ ক্রমে লক্ষ করা যাচ্ছে, রবীন্দ্রনাথ কিন্তু বহু বছর আগে সেই সচেতনতার প্রমাণ দিয়েছিলেন। ১৩৪৫ বঙ্গাব্দের কার্তিক মাসে প্রবাসী পত্রিকায় প্রকাশিত হয় 'অরণ্যদেবতা' প্রবন্ধটি, যেটি মূলত বৃক্ষরোপণ উৎসবেরই ভাষণ। তৎকালীন পরিবেশসংক্রান্ত সমস্যা ও তার থেকে নিষ্কৃতির উপায়কে রবীন্দ্রনাথ তখনই চিহ্নিত করেছিলেন সঠিক ভাবে—

> মানুষ অমিতাচারী। যতদিন সে অরণ্যচর ছিল ততদিন অরণ্যের সঙ্গে পরিপূর্ণ ছিল তার আদান প্রদান ; ক্রমে যখন নগরবাসী হল তখন অরণ্যের প্রতি মমত্ববোধ হারালো ;......আজকের ভারতবর্ষের উত্তর অংশ তরুবিরল হওয়াতে সে অঞ্চলে গ্রীষ্মের উৎপাত অসহ হয়েছে।......মানুষ গৃধ্নুভাবে প্রকৃতির দানকে গ্রহণ করেছে। তার ফলে আবার মরুভূমিকে ফিরিয়ে আনবার উদ্যোগ হয়েছে। ভূমির ক্রমিক ক্ষয়ে এই-যে বোলপুর ভাঙার কঙ্কাল বেরিয়ে পড়েছে, বিনাশ অগ্রসর হয়ে এসেছে— এক সময়ে এর এমন দশা ছিল না, এখানে ছিল অরণ্য— সে পৃথিবীকে রক্ষা করেছে ধ্বংসের হাত থেকে, তার ফলমূল খেয়ে মানুষ বেঁচেছে। সেই অরণ্য নষ্ট হওয়ায় এখন বিপদ আসন্ন। তাই বিপদ থেকে রক্ষা পেতে হলে আবার আমাদের আহ্বান করতে হবে সেই বরদাত্রী বনলক্ষ্মীকে— আবার তিনি রক্ষা করুন এই ভূমিকে, দিন্ তাঁর ফল, দিন্ তাঁর ছায়া।

[*পল্লীপ্রকৃতি/রবীন্দ্র রচনাবলী*, ত্রয়োদশ খণ্ড, জন্মশতবার্ষিক সংস্করণ, পশ্চিমবঙ্গ সরকার, ১৩৬৮, প. ৫৩১]

প্রভাতকুমার মুখোপাধ্যায় *রবীন্দ্রজীবনী* (চতুর্থ খণ্ড, বিশ্বভারতী, শ্রাবণ— ১৩৬৩, পৃ. ১৪১) গ্রন্থে জানিয়েছেন কবির এই ভাষণ শুধুমাত্র মুখের কথা হিসেবে থেকে যায়নি; কালীমোহন ঘোষ ও সুকুমার চট্টোপাধ্যায়ের উদ্যোগে বহুবিধ গাছ গ্রামে বিতরণ করা হয় এবং শ্রীনিকেতনে জ্বালানি কাঠের অভাব হওয়াতে ফল, শাক-সব্জির সঙ্গে জ্বালানি কাঠের চারাও বিতরণ করা হত নিয়মিত। সুতরাং বলা বাহুল্য, ইকোক্রিটিকরা সাধারণ মানুষের মধ্যে যে সচেতনতা তৈরি করতে চান বর্তমান যুগে; রবীন্দ্রনাথ তার থেকে বহু আগেকার মানুষ হয়েও, একজন পরিবেশ সচেতন মানুষ হিসেবে পরিবেশকে বাঁচানোর জন্যে যথার্থ উদ্যোগটিই গ্রহণ করতে পেরেছিলেন— শুধুমাত্র লেখাতেই নয়— হাতে কলমে, কাজেও।

জীবনানন্দ বা বিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায়ের লেখায় আরও একটি মিল আমাদের চোখে পড়ে। জীবনানন্দ ও বিভূতিভূষণ বাংলাদেশের জল, মাটি, গাছপালা, জীবজন্তুর সঙ্গে এতই পরিচিত ছিলেন যে দুজনের লেখাতেই (জীবনানন্দের কাব্যে এবং বিভূতিভূষণের গদ্যে) বাংলাদেশের গাছপালা, ফুল, ফল, এমনকি কীট-পতঙ্গের অনুপুঙ্খ বর্ণনা আমাদের মুগ্ধ করে দেয়। *রূপসী বাংলা*-র যে-কোনো কবিতার দিকে তাকালেই আমরা পেয়ে যাব এমন সব ছবি, এমন অনেক গাছ বা মাছ, পোকার নাম যা হয়তো আমরা কবিতায় লক্ষ করিনি কখনও[৩২]—

> ...নীল বুকে আছে তাহাদের
> গঙ্গাফড়িঙের নীড়, কাঁচপোকা, প্রজাপতি, শ্যামাপোকা ঢের,
> হিজলের ক্লান্ত পাতা—বটের অজস্র ফল ঝরে বারে বারে
> তাহাদের শ্যাম বুকে— পাড়াগাঁর কিশোরেরা যখন কান্তারে

বেতের নরম ফল, নাটাফল খেতে আসে, ধুন্দুল বীজের
খোঁজ করে ঘাসে ঘাসে... [৮নং কবিতা, *রূপসী বাংলা*]

ইছামতী উপন্যাসের একেবারে শেষ-অংশে বিভূতিভূষণের বর্ণনায় আমরা পাই[৩৩]—

> ইছামতীর বাঁকে বাঁকে বনে বনে নতুন কত লতাপাতার বংশ গজিয়ে উঠলো। বলরাম ভাঙনের ওপরকার সোঁদালি গাছের ছোট চারাগুলো দেখতে দেখতে কয়েক বছরের মধ্যে ঘন জঙ্গলে পরিণত হয়ে ওঠে, কত অনাবাদী পতিত মাঠে আগে গজালো ঘেঁটুবন, তারপর এল কাকজঙ্ঘা, কুঁচকাঁটা, নাটা আর বনমরচের জঙ্গল, ঝোপে ঝোপে কত নতুন ফুল ফুটলো, যাযাবর বিহঙ্গকুলের কত কি কলকূজন।

অন্যদিকে জীবনানন্দের কবিতায় হিজল, অশত্থ, ফণিমনসা, শটিবন, চাঁদামাছ, শরপুঁটি, ইত্যাদির ছড়াছড়ি। বিভূতিভূষণের লেখাতেও কুমুরে লতা, কাঁটাবাঁশ, বনচালতা, গুলঞ্চলতা, মটরফল, ঘেঁটুফুল, গেঁয়ো, গরাণ, সুঁদরি গাছ, কেওড়া গাছ, পিটুলি, গামার, তিত্তিরাজ গাছ, ওকড়াফল—ইত্যাদির সন্ধান আমরা পাব। মনে হয়, প্রকৃতির সঙ্গে তন্ময়তার যে বোধ এঁদের মধ্যে ছিল, সেই বোধের জন্যই এঁরা প্রকৃতিকে খুঁটিয়ে পর্যবেক্ষণ করেছিলেন, বা বলা যায়, মানুষ ছাড়াও মানবেতর যে জীবজগৎ, যাকে হয়তো এখন জীববিজ্ঞান বা উদ্ভিদবিজ্ঞানের বই ছাড়া অন্য বইয়ের মধ্যে খুঁজে পাওয়া সম্ভব নয়— তাদের সাহিত্যে স্থান দেওয়ায় বোঝা যায় প্রকৃতিকে দেখার চোখ এঁদের ছিল। অ-নামি ফুল-লতা-পাতা এমনকি কীট-পতঙ্গকে বাংলা সাহিত্যে জায়গা করে দেওয়ার মতো সাহিত্যিকের সংখ্যা হাতে গোনা বিভূতিভূষণ ও জীবনানন্দ তাদের মধ্যে অন্যতম প্রধান অবশ্যই। ইকোক্রিটিক-রা মানুষের সঙ্গে non-human life-এর যে যোগের কথা বলেন, সেই যোগ এই দুজন সাহিত্যিক তাঁদের লেখায় ঘটাতে সক্ষম হয়েছিলেন। কাজেই জীবনানন্দের *রূপসী বাংলা*-র কবিতা এবং বিভূতিভূষণের উপন্যাস বা দিনলিপি C. Glotfelty-এ কথিত 'nature in literature' বা 'landscape in literature' হয়ে 'human'-এর চোখে দেখা 'non-human' জগতের ছবি নির্মাণে তা এক অন্য মাত্রা পায়।

বাংলা সাহিত্যে পরিবেশকে বা প্রকৃতিকে কেন্দ্র করে বেশ কিছু লেখাও আছে, যাকে আমরা বলতে পারি সচেতন পরিবেশকেন্দ্রিক লেখা। বাংলা সাহিত্যে আঞ্চলিক উপন্যাস, নদীকেন্দ্রিক উপন্যাস, জঙ্গলকেন্দ্রিক উপন্যাস বা জার্নালগুলিকে আমরা এর আওতায় ফেলতে পারি। আঞ্চলিক বা নদীকেন্দ্রিক উপন্যাসগুলির পটভূমিতে আছে প্রকৃতি। চরিত্রগুলির সঙ্গে হয়তো অধিকাংশক্ষেত্রেই প্রকৃতির যোগ জীবিকাসূত্রে। কখনও কখনও বাসস্থানও যোগাযোগের প্রধান কারণ। সমরেশ বসুর *গঙ্গা* উপন্যাসে গঙ্গার স্রোতের সঙ্গে মিলে যায় জেলেদের জীবনের সুখদুঃখের স্রোত— "জোয়ার কখনো দুখের, কখনো সুখের। মাছমারারা তার মনের সঙ্গে মিলিয়ে দেখে গঙ্গার সুখ দুঃখ।"[৩৪]

মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়ের *পদ্মা নদীর মাঝি* উপন্যাসেও পদ্মার সঙ্গে জেলেদের সম্পর্ক জীবিকার কারণেই। পদ্মাই তাদের আশ্রয়দাত্রী আবার পদ্মাই ভয়াল ও ভয়ংকর হয়ে ওঠে সময়ে সময়ে। গঙ্গাকে বা পদ্মাকে যদি সরিয়ে নেওয়া হয় উপন্যাস থেকে তাহলে কিন্তু উপন্যাসের ভিতরটাই নড়ে যাবে। নদীর সঙ্গে উপন্যাসের চরিত্রদের সম্পর্ক মূলত সামাজিক আবার প্রাকৃতিকও। আঞ্চলিক উপন্যাসের বৈশিষ্ট্য এটাই যে, সেই অঞ্চলটিকে সরিয়ে নিলে উপন্যাসটিই অর্থহীন হয়ে পড়ে। পাঁচু বা কুবেরের জীবন থেকে যদি নদীকে সরিয়ে নেওয়া হয়, তাহলে উপন্যাসের অস্তিত্বই আর থাকবে না।

দেবেশ রায়ের *তিস্তাপারের বৃত্তান্ত* উপন্যাসটিকে তিস্তা নদীর সঙ্গে নদীপারের মানুষ বাঘারু একাত্ম; আবার একই সঙ্গে তিস্তাকে কেন্দ্র করে সামাজিক জটিল সমস্যাও উপন্যাসের অঙ্গ। এই উপন্যাসে কেবল প্রকৃতি আর চরিত্রের সহাবস্থানকেই আমরা পাব না, তাকে আমরা পাব সামাজিক সমস্যার সাপেক্ষে। এই উপন্যাসে প্রকৃতির রদবদল, সেই উপলক্ষে রাজনৈতিক এবং সামাজিক সংঘাত সবই জায়গা করে নিয়েছে। উপন্যাসের একেবারে শেষে প্রাকৃতিক পরিবর্তন, সামাজিক ও আঞ্চলিক পরিবর্তন এবং বাঘারুর ব্যক্তিগত সমস্যা মিলে যায় এক বিন্দুতে—

> যে-কারণে তিস্তাপার ও আপলচাঁদের শালবন উৎপাটিত হবে—সেই কারণেই বাঘারু উৎপাটিত হয়ে গেল। যে-কারণে তিস্তাপার ও আপলচাঁদের হরিণের দল, হাতির পাল, পাখির ঝাঁক, সাপখোপ চলে যাবে— সেই কারণেই বাঘারু চলে যায়। তার ত শুধু একটা শরীর আছে। সেই শরীর এই নতুন তিস্তাপারে, নতুন ফরেস্টে বাঁচবে না। এই নদীবন্ধন, এই ব্যারেজ, দেশের অর্থনীতি বদলে দেবে, উৎপাদন বাড়াবে। বাঘারুর কোনো অর্থনীতি নেই। বাঘারুর কোনো উৎপাদনও নেই। বাঘারু এই ব্যারেজকে, এই অর্থনীতি ও এই উন্নয়নকে প্রত্যাখ্যান করল।...[৩৫]

আঞ্চলিক বা নদীকেন্দ্রিক উপন্যাসগুলি অনেক সময়েই একটি সামাজিক পরিবর্তনের প্রক্রিয়ার মধ্যে দিয়ে শেষ হয়। তার সঙ্গে সঙ্গে অঞ্চলটির বিশেষ বৈশিষ্ট্য, সেখানকার ভূ-প্রকৃতি, পরিবেশ— সবেরই বদল ঘটে যাবার চিহ্ন চোখে পড়ে পাঠকের। সাহিত্য যত আধুনিক হচ্ছে এই সমস্যা বা লক্ষণগুলি ততই প্রবল হচ্ছে। সচেতন পরিবেশকেন্দ্রিক সাহিত্যগুলির ক্ষেত্রে এটাই চোখে পড়ে যে প্রকৃতি আর আগের মতো থাকছে না, সমাপ্তিতে গিয়ে প্রকৃতি আর মানুষের বিযুক্তিতেই কাহিনি শেষ হচ্ছে। বিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায়ের লেখা *আরণ্যক* উপন্যাসেও ভাগলপুরের অরণ্য অঞ্চলের ভূ-প্রকৃতির শেষ পর্যন্ত বদলে যাওয়ার গল্পই লেখা হয়েছিল। তবে, এ ক্ষেত্রে অন্য কয়েকটি বৈশিষ্ট্য আমাদের চোখে পড়বে।

সত্যচরণ ভাগলপুরের জঙ্গলে ম্যানেজারির চাকরিতে বহাল হলেন। কলকাতার ছেলে সত্যচরণ বন্ধু, লাইব্রেরি, থিয়েটার, সিনেমা, গানের আড্ডা ছেড়ে চাকরি করতে এলেন জঙ্গলে এবং প্রথম দিনদশেক তাঁর কেবলই মনে হতে লাগল— "অবিনাশের অনুরোধে কি ভুলই করিয়াছি এই জনহীন জঙ্গলে আসিয়া, এ-জীবন আমার জন্য নয়।"[৩৬]

এ প্রসঙ্গে স্মর্তব্য রবীন্দ্রনাথের 'পোস্টমাস্টার' গল্পটি। কলকাতার ছেলে পোস্টমাস্টারও চাকরির জন্য উলাপুর গ্রামে এসেছিলেন, গ্রামের পরিবেশে মানিয়ে নিতে না পেরে শেষপর্যন্ত কবিতা লিখেছিলেন, যাতে এমন ভাব প্রকাশ করেছিলেন যে আরব্য উপন্যাসের কোনো দৈত্য এসে যদি গাছগুলি কেটে কংক্রিটের রাস্তা, পাকা বাড়ি বানিয়ে দেয়, তবে তিনি নবজীবন লাভ করেন। বাংলা সাহিত্যে কবিতায়, গদ্যে প্রকৃতির বর্ণনার ছড়াছড়ি—কিন্তু সেইসব কবিদের যদি সত্যিকারের পল্লীপ্রকৃতিতে ছেড়ে দেওয়া হয়, তাহলে বোধহয় তাদের এই পোস্টমাস্টারের দশাই হবে! এই পোস্টমাস্টারটি শেষ পর্যন্ত চাকরি ছেড়ে দিয়ে কলকাতায় চলে এসেছিলেন। সত্যচরণ তা করেননি। তিনি ক্রমশই ভালোবেসেছিলেন অরণ্যপ্রকৃতিকে। অরণ্যের সঙ্গে লিপ্ত মানুষগুলিকেও। শেষকালে এই অরণ্য ছেড়ে যেতে তাঁর কষ্ট হয়েছিল, এবং একটা গ্লানিবোধও তাঁর ছিল যে এই অরণ্যপ্রকৃতি তাঁর হাতেই নষ্ট হয়েছে। অরণ্যপ্রকৃতিকে অনুভব করার ও তাকে নষ্ট করার নৈতিক দায় তিনি নিজের কাঁধেই নিয়েছিলেন। প্রকৃতির নষ্ট হয়ে যাওয়ার চিত্র বাংলা সাহিত্যে অনেকই আছে, কিন্তু কথককে তার দায় নিতে বড়ো একটা দেখা যায় না। *আরণ্যক*-এ

অরণ্যপ্রকৃতি ও আরণ্যক মানুষ, তাদের সামাজিক উৎসব, বিশ্বাস সবই যেন এক সূত্রে গাঁথা। সমগ্র উপন্যাসটিকে নান্দনিক, সামাজিক, নৈতিক দৃষ্টিকোণের সহাবস্থান ঘটেছে একই সঙ্গে।

বিজ্ঞান সাহিত্যে অসচেতনভাবে স্থান করে নিলেও কখনও কখনও সচেতন ভাবেও জায়গা করে নিয়েছে। জয় গোস্বামীর *সূর্য পোড়া ছাই* বইটিতে বিজ্ঞান আর সাহিত্যের এক অভিনব সহাবস্থান ঘটেছে। সৌরজগৎ, বিশেষত সূর্য থেকে পৃথিবী সৃষ্টির আদি মুহূর্তটির প্রতি মনোযোগ আকর্ষণ করেছেন কবি এই বইতে—

ফ্যাকাশে হলদেটে সূর্য বিরাট চাকার মতো ছড়িয়ে রয়েছে
৭০০ কোটি বছরের পরের আকাশে
সমস্ত জ্বালানি পুড়ে শেষ।

বালির সমুদ্রখাতে আমি হাত জোড় করে দাঁড়াই
আমার কপালে এসো, ঝরে পড়ো,
রৌদ্র নয়— সূর্য-পোড়া-ছাই।[৩৭]

বা, অন্য আর একটি অংশে চোখে পড়ে আদিম পৃথিবী, আদিম সরীসৃপ প্রাণী, এবং পৃথিবী ধ্বংসের ছবি—

...তারাখণ্ড সমুদ্রে পড়েছে
তার আগে আকাশে লম্বা আগুনের ল্যাজ— এক পলক
তার আগে ঝলকে সাদা গাছপালা ভূখণ্ড পাহাড়— এক পলক
উড়তে উড়তে ফ্রিজ করছে সরীসৃপ পাখি
পৃথিবী ধ্বংসের ঠিক এক পলক দেরি
মৃত্যুর আগের স্বপ্নে এই দৃশ্য ফিরে আসে, সেই থেকে সব পাখিদেরই[৩৮]

'সূর্যসাগর তীরে' কবিতায় জীবনানন্দ দাশও এমনই এক ছবি তুলে ধরেছিলেন যদিও তা ছিল পৃথিবীর সৃষ্টি মুহূর্তের প্রাণের জন্মের ছবি—

অনাদি যুগের অ্যামিবার থেকে আজিকে মানবপ্রাণ
সূর্য তাড়সে ভ্রূণকে যদিও ঢের করে ফলবান,
তবুও আমরা জননী বলিব কাকে?
গড়িয়া উঠিল মানবের দল সূর্যসাগরতীরে
কালো আত্মার রহস্যময় ভুলেরা বুনুনি ঘিরে।[৩৯]

প্রাণ সৃষ্টির মতোই, প্রাণ এমনকি পৃথিবী ধ্বংসের ছবিও আজকাল প্রায়ই জায়গা করে নিচ্ছে সাহিত্যে। পরিবেশ দূষণ, অতিরিক্ত তাপমাত্রা বৃদ্ধি, গাছ কেটে ফেলা, ইত্যাদির প্রতি দৃষ্টি আকর্ষণ করতে শুধু বড়োদের নয় ছোটোদেরকেও সচেতন করার চেষ্টা চলছে বিভিন্ন ভাবে। কখনও কল্পবিজ্ঞান, কখনও রূপকথা তার বহিরাবরণ, কিন্তু ভেতরে ভেতরে তা আসলে পরিবেশ সম্পর্কে ছোটোদের সচেতনতা গড়ে তোলারই এক পাঠ। ছোটোদের কল্পবিজ্ঞানের কাহিনি *বাতাস বাড়ি*-তেও লীলা মজুমদার গল্পের ছলে ছুঁয়ে গেছেন পৃথিবীর মানুষের আসন্ন বিপদকে, বিজ্ঞানের ভাষায় যা 'global threats'—

নীচে দিনে দিনে লোক বাড়বে, তারপর একদিন এমনি হবে যে, লোকেদের খাবার শস্য-খেত আর থাকবার বাড়ি তৈরি করার জন্য এক ফালি জায়গাও বাকি থাকবে না। তাছাড়া মাটির নীচের তেল, কয়লা ফুরুবে, মাটির ওপরের কাঠ পুড়ে সব খাক্ হবে। সরকার গাছ কাটা বন্ধ করে দেবে। সব গাছ কেটে ফেললে বৃষ্টি বন্ধ হয়, ধান চাল তখন হবে কোত্থেকে?[৪০]

কিন্তু ছোটোদের কল্পকাহিনিই শুধু নয়, পরিবেশের এই ভারসাম্যহীনতা বাস্তবিকই যখন ছিন্নভিন্ন করে দেয় মানুষের জীবনকে, তখন তার পরিণাম হয় মারাত্মক। স্বপ্নময় চক্রবর্তী 'ফুল ছোঁয়ানো' গল্পে এমনই এক বিপর্যয়কে দেখিয়েছেন। গল্পে, স্ক্রিপ্ট রাইটার হীরক তাঁর স্ক্রিপ্ট হারিয়ে ফেলে, ফেরত নিতে গিয়েছিলেন এক গ্রামের আসগর আলির কাছে। নিতে গিয়ে জানতে পারেন, আসগর তো বটেই গোটা গ্রামের প্রায় সকলেই আর্সেনিক-এর দূষণে আক্রান্ত, দূষণমুক্ত জল গোটা অঞ্চলে কোথাও নেই। বাচ্চাদের জন্য আনা মিষ্টির বাক্স বাচ্চাদের হাতে দিতে গেলে তিনি জানতে পারেন বাচ্চারা বাড়ি নেই, তারা সকলেই ফুল ছোঁয়াতে গেছে। কিন্তু ফুল ছোঁয়ানো ব্যাপারটা কী? আসগরকে জিজ্ঞেস করলে সে বলে—

> ...ফুল ছোঁয়ানো জানেন না? ফুলি ফুলি আঙুল ছোঁয়াতি হয়। এখানে ড্যাঙা জমিতে এখন পটল চাষ চলতিছে। পটলের ফুল এল। এখন তো আর অত প্রজাপতি টজাপতি ফড়িং টড়িং নেই, পোকা মারার বিষে সব শেষ। এ ফুলের রেণু ও ফুলি না লাগালে বীজ হবে কী করে? বাচ্চারা তাই কচি কচি আঙুলে ফুল ছোঁয়ায়। এ ফুল থেকে ও ফুলে। পয়সা পায়। আমাদের মোটা আঙুলে ও কম্ম হবে না। আমার কোলে যে বাচ্চাটারে দেকিছিলেন ছ্যার, ফতিমা, ওরে পুষ্যি নিতে চেয়েছিলাম।......তা দিল না। ক্যান জানেন? ওর তো রিকেট, ওই বাচ্চার হাত কখনও পুরুষ্টু হবে না, আঙুল কোনওদিন মোটা হবে না। সরু সরু আঙুলে ফুল ছোঁয়াতি পারবে। এখনি ফুল ছোঁয়াবার কাজ করে ফতিমা।"[৪১]

পরিবেশ দূষণের সব থেকে ভয়াবহ দৃশ্য বোধহয় এই গল্পে আমরা পেলাম। আর্সেনিক-এর দূষণই শুধু নয়, ভবিষ্যতে ফুল ফোটানো বা ফল ধরানোর জন্য মানুষের সরু আঙুলের প্রয়োজন হবে, কোনো প্রাকৃতিক, স্বাভাবিক পদ্ধতিতে আর ফসল ফলবে না এই ভাবনা বোধহয় সত্যিই আমাদের মনে 'fear of loss and disaster' জাগিয়ে তোলে। এই গল্পটির মধ্যে আমরা ইকোক্রিটিসিজম-এর সবকটি বৈশিষ্ট্যকেই খুঁজে পাব। যদিও, ইকোক্রিটিসিজম-এর সবকটি বৈশিষ্ট্য কোনো একটি লেখার মধ্যে খুঁজে পাওয়া সত্যিই শক্ত। কিন্তু, আমরা যত আধুনিক হচ্ছি, পরিবেশগত সমস্যাগুলির সংখ্যা ক্রমশ বাড়ছে, আর ক্রমশই যেন একটা ধ্বংসের মুখোমুখি হওয়ার আয়োজন চলছে প্রকৃতিতে। এর হাত থেকে বাঁচার একটাই উপায়— পরিবেশ ও প্রকৃতি সম্পর্কে যত্নশীল হওয়া, সাধারণ মানুষের মধ্যে সচেতনতা বাড়ানো। ছোটোদের জন্য লেখার মধ্যে এই সচেতনতা তৈরি করার চেষ্টা চলছে। কিন্তু বড়োদের লেখায় যেন ভবিষ্যতের ধ্বংসের মুখোমুখি হওয়ার ভয়টাই প্রধান হয়ে উঠছে। সৃষ্টির আদি-লগ্নের প্রকৃতিসংলগ্নতা ক্রমে যতদিন গেছে, সভ্যতার অগ্রসরণের সঙ্গে সঙ্গে রূপ নিয়েছে প্রকৃতি-বিচ্ছিন্নতায়। অরুণ মিত্র তাঁর 'অমরতার কথা' কবিতায় প্রকৃতির দিক থেকে প্রতিশোধের কাহিনি শুনিয়েছেন—

> কাঠকুটো আসবাব আবার বন্য হ'য়ে উঠবে। ওরা কচি পাতার ঝিলিমিল
> মুড়ে ঝিমোয়, ভিতরে ভিতরে কোথায় হারিয়ে থাকে অঙ্কুরের ঝাপটানি।
> তবু সূর্য ডুবলে আমার চোখে বারবার ঘনিয়ে আসে বন।
>
> ওরা আবার বন্য হ'য়ে উঠবে। আমার ছাত দেয়াল মেঝের শূন্যতা ভ'রে
> অরণ্য জাগবে। সবুজের প্রতাপে এই শুকনো কাঠামো চূর্ণ হবে। সেই ধ্বংসের
> গহনে খুঁজে নিয়ো আমার বসতি, সেখানে পোড়া-মাটি ইটের ভিতর রস ছিলো
> অমৃতের মতো।[৪২]

যেভাবে বন কেটে একসময় শহর তৈরি হয়েছিল, সেভাবেই ধ্বংসের প্রাকমুহূর্তে সমস্ত সভ্যতা আবার ঢেকে যাবে বনে। অরণ্য থেকে শহর, আবার শহর থেকে অরণ্যে ফিরে যাবার ঠিক এমনই একটি ছবি জায়গা করে নিয়েছিল বিদেশি সাহিত্যিক Hermann Hesse-এর কলমে। একটি অরণ্য অঞ্চলকে শহর করে তোলার এবং আবার সেই শহরের ক্রমে অরণ্যে পরিণত হবার গল্প 'The City'। যেভাবে ক্রমে জনশূন্য একটি অরণ্য অঞ্চল শহরে পরিণত হল এবং ক্রমে আবার নির্জন প্রকৃতি সেই নির্জন শহরকে ঢেকে ফেলল, তা যেন সত্যিই প্রকৃতির প্রতিশোধ। গল্পের একেবারে শেষের অংশ এরকম—

> But the forest climed farther down from the mountains to the praire. Lakes and rivers sprang up and dried out, and the forest moved on and gradually took over and covered the entire country, the remains of the old street walls, the palaces, the temples, and the museums. Foxes and pine marten, wolves and bears inhabited the isoiated spot.[৪৩]

শহরে, দূষিত পরিবেশের প্রতি প্রকৃতির এই প্রতিশোধের চিত্র বোধহয় সব দেশের লেখকের কলমে একই!

বাস্তব জীবনে আমরা যেমন প্রকৃতি থেকে দূরে সরে গেছি সভ্যতার অগ্রসরণের সঙ্গে সঙ্গে, বিজ্ঞানের অগ্রগতির সঙ্গে সঙ্গে, তেমনই সাহিত্যেও আমরা প্রকৃতির সঙ্গে একাত্মতার বদলে বিষয় হিসেবে বেছে নিতে বাধ্য হচ্ছি পরিবেশ সংক্রান্ত সমস্যাগুলিকে। নান্দনিক দৃষ্টিভঙ্গির বদলে ইকোক্রিটিসিজম-এ তাই বড়ো হয়ে উঠছে সামাজিক, সাংস্কৃতিক সমস্যাগুলি। পরিবেশের পরিবর্তন সমাজ ও সংস্কৃতিকেও বদলে দিচ্ছে, ফলে সামাজিক ও সাংস্কৃতিক সমস্যার সম্মুখীন হতে হচ্ছে স্থানীয় মানুষকে। সেই ছবি ক্রমাগত ধরা পড়ছে সমসাময়িক সাহিত্যে। বেশ কিছুদিন আগে পর্যন্ত সাহিত্যে পরিবেশ মানে প্রকৃতি-পর্যবেক্ষণই বোঝাত, কিন্তু ইদানীং সাহিত্যে প্রকৃতির ভূমিকার চরিত্র বদল হয়েছে। বর্তমানে শুধুমাত্র প্রকৃতি-ই নয়, পরিবেশের ভারসাম্যহীনতার সমস্যা-ই যেন মূল লক্ষ্য হয়ে উঠেছে প্রকৃতিকেন্দ্রিক সাহিত্যের। আর, সেজন্যই ইকোক্রিটিসিজম-এর বৈশিষ্ট্য মেনে সাহিত্যে আমাদের নৈতিক অবস্থানকেও গুরুত্ব দেওয়া হচ্ছে। যে দায়বোধ থেকে সত্যচরণ ভাগলপুরের অরণ্যপ্রকৃতির ধ্বংসের দায় নিজের কাঁধে নিয়ে নেন, সেই দায় কি আমাদের সাধারণ মানুষদেরও নেই? 'ফুল ছোঁয়ানো'-র অভিশাপই কি অপেক্ষা করছে না আদতে আমাদের জন্য? যে ধ্বংসের ছবি ক্রমশ স্থান করে নিচ্ছে সাহিত্যে, তার হাত থেকে রক্ষা পাওয়ার উপায় হিসেবে নিতান্ত কল্পকাহিনি-ই লিখেছিলেন লীলা মজুমদার। যেখানে 'বড়লামা' চরিত্রটি ছোটোদের জন্য, তার ডায়েরির পাতায় দিয়ে গিয়েছিল একটি সমাধান সূত্র-- সাহস জুগিয়ে গিয়েছিল সকলকে—

> পৃথিবীতে যখন মানুষ থাকবার জায়গা কুলোবে না, কয়লা ফুরুবে, তেল ফুরুবে, তখনো যেন কেউ ভয় না পায়। এই আমি রেখে গেলাম আরো ভালো বাতাস বাড়ির নক্সা; এই রইল সূর্য-কলের নিয়ম-কানুন; খিদের বড়ির রন্ধন-প্রণালী; যে কাপড় ছেঁড়ে না বা পোড়ে না, গায়ের সঙ্গে সঙ্গে বাড়ে কমে। রোজ যার রঙ বদলায়, তার গোপন তথ্য। পৃথিবীর দুঃখ ঘুচে যাক। সবাই সুখী হোক।...[৪৪]

আমাদের জন্য, পৃথিবীর সব দুঃখ ঘোচাবার জন্য সত্যিই কি আছে কোনো 'বাতাস বাড়ি'? পরিবেশকে সুন্দর-সুস্থ-প্রাণবন্ত-দূষণমুক্ত করে তোলার কোনো গোপন তথ্য?

তথ্যসূত্র :

১. C. Glotfelty and H. Fromm (eds), *The Ecocriticism Reader : Landmarks in Literary Ecology,* Londen : University of Georgia Press, 1996.

২. *Ecocriticism. Wikipedia*, the free encyclopedia-Windows Internet Explorer, F 〈F:/ecology/Ecocriticism-wikipedia. the free encyclopedia. mht.〉

৩. তদেব

৪. তদেব

৫. তদেব

৬. Simon C. Estok, 'A Report Card on Eco-criticism', *AUMILA*–The Journal of the Australian Universities Language and Literature Association 96 (Nov. 2001) : 220–38, 17-08-2008, 〈http : //www. asle. umn, eduarchiveintro estok. html. mht〉

৭. Greg Garrard, *Ecocriticism, New Critical Idiom* 2007 Indian Print, Routledge. P. 4.

৮. Ursula K. Heise, Science and Eco-criticism, The American Book review 18.5. (July-August 1997), ASLE (Introduction to Ecocriticism) 〈http : // www. asle. umn. eduarchiveintroestok. html. mht.〉

৯. Simon C. Estok, A Report Card on Eco-criticism, AUMLA-The Journal of the Australian Universities Language and Literature Association 96 (Nov. 2001) : 220–38, 17-08-2008, 〈http . // www. asl. umn. eduarchiveintroestok. html. mht.〉

১০. তদেব

১১. Michael P. Cohen, Blues in the Green : Ecocriticism Under Critique, Environmental History 9.1 (Jan, 2004) : 9–36, 〈http : // www. asle. umn. eduarchiveintrocohen. html. mht.〉

১২. Greg Garrard, *Ecocriticism, New Critical Idiom*, 2007 Indian Print, Routledge, P. 5.

১৩. Ibid P. 6

১৪. Ibid P. 6

১৫. জাহ্নবীকুমার চক্রবর্তী, *প্রাচীন ভারতীয় সাহিত্য ও বাঙালির উত্তরাধিকার*, প্রথম খণ্ড, ডি. এম. লাইব্রেরি, জানুয়ারি, ২০০৪, পৃ. ৪৫-৪৬

১৬. তদেব পৃ. ১৪

১৭. বিষ্ণুপদ ভট্টাচার্য, *কালিদাস ও রবীন্দ্রনাথ*, জিজ্ঞাসা, নভেম্বর ১৯৭৮, পৃ. ৯১-১১৫

১৮. তদেব পৃ. ৯৬-৯৭

১৯. সৌমেন্দ্রনাথ সরকার, *চর্যাগীতিকোষ*, রত্নাবলী, জানুয়ারী, ২০০১, পৃ. ৯৫

২০. তদেব পৃ. ৩

২১. তদেব পৃ. ১৫১

২২. রায়গুণাকর ভারতচন্দ্র, *ভারতচন্দ্রের গ্রন্থাবলী*, বসুমতী কর্পোরেশন লিমিটেড, অক্টোবর, ১৯৯৭, পৃ. ৭২

২৩. চারুচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় প্রণীত, তরুণ মুখোপাধ্যায় সম্পাদিত, *কবিকঙ্কণ চণ্ডী : চণ্ডীমঙ্গল বোধিনী*, প্রথম ভাগ, সাহিত্যলোক, অক্টোবর ২০০০, পৃ. ৭৭

২৪. রায়গুণাকর ভারতচন্দ্র, *ভারতচন্দ্রের গ্রন্থাবলী*, বসুমতী কর্পোরেশন লিমিটেড, অক্টোবর, ১৯৯৭ পৃ. ৭২
২৫. চারুচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় প্রণীত, তরুণ মুখোপাধ্যায় সম্পাদিত, *কবিকঙ্কণ চণ্ডী : চণ্ডীমঙ্গল বোধিনী*, প্রথম ভাগ, সাহিত্যলোক, অক্টোবর ২০০০, পৃ. ৭৮
২৬. রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, *ছিন্নাপত্রাবলী*, বিশ্বভারতী, চৈত্র ১৩৯৯, পৃ. ১৪২
২৭. তদেব পৃ. ১১০
২৮. জীবনানন্দ দাশ, *কাব্যসমগ্র*, দেবীপ্রসাদ বন্দ্যোপাধ্যায় সম্পাদিত, গতিধারা, ১৯৯৯, পৃ. ১১৬
২৯. তদেব পৃ. ১০৪
৩০. তদেব পৃ. ২৯৩
৩১. বিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায়, ঊর্মিমুখর, *বিভূতি রচনাবলী*, পঞ্চম খণ্ড, মিত্র-ঘোষ, জন্মশতবার্ষিকী সংস্করণ, ভাদ্র ১৪০৩, পৃ. ৩৮৭
৩২. জীবনানন্দ দাশ, *কাব্যসমগ্র*, দেবীপ্রসাদ বন্দ্যোপাধ্যায় সম্পাদিত, গতিধারা, ১৯৯৯, পৃ. ২৪৩
৩৩. বিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায়, ইছামতী, *বিভূতির রচনাবলী*, নবম খণ্ড, মিত্র ঘোষ, জন্মশতবার্ষিকী সংস্করণ, ভাদ্র ১৪০৩, পৃ. ২১৩
৩৪. সমরেশ বসু, গঙ্গা, মৌসুমী প্রকাশন, আষাঢ় ১৩৮৭, পৃ. ৩৮
৩৫. দেবেশ রায়, *তিস্তাপারের বৃত্তান্ত*, দে'জ, জুন ১৯৯৯, পৃ. ৫০৪
৩৬. বিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায়, আরণ্যক, *বিভূতি রচনাবলী*, পঞ্চম খণ্ড, মিত্র-ঘোষ, জন্মশতবার্ষিকী সংস্করণ, ভাদ্র ১৪০৩, পৃ. ৮
৩৭. জয় গোস্বামী, *কবিতাসংগ্রহ*, তৃতীয় খণ্ড, আনন্দ, আগস্ট ২০০০, পৃ. ১৯৭
৩৮. তদেব পৃ. ২০০
৩৯. জীবনানন্দ দাশ, মহাপৃথিবী, *কাব্যসমগ্র*, দেবীপ্রসাদ বন্দ্যোপাধ্যায় সম্পাদিত, গতিধারা, ১৯৯৯, পৃ. ১৫৮
৪০. লীলা মজুমদার, *বাতাসবাড়ি*, আনন্দ, ২০০৭, পৃ. ৪২-৪৩
৪১. স্বপ্নময় চক্রবর্তী, *শ্রেষ্ঠ গল্প*, দে'জ, জানুয়ারী, ২০০৩
৪২. বুদ্ধদেব বসু, *আধুনিক বাংলা কবিতা*, এম. সি. সরকার, জুলাই ১৯৮৩, পৃ. ২১১
৪৩. Hermann Hesse, *The Fairy Tales of Hermann Hesse*, Bantam Books, Nov, 1995, P. 49
৪৪. লীলা মজুমদার, *বাতাস বাড়ি*, আনন্দ, ২০০৭, পৃ. ৭৫

> তাঁদের পক্ষে অনিবার্য ছিলো রবীন্দ্রনাথের অনুকরণ, এবং অসম্ভব ছিলো রবীন্দ্রনাথের অনুকরণ। রবীন্দ্রনাথের অনতি-উত্তর তাঁরা, বড্ড বেশি কাছাকাছি ছিলেন; এ-কথা তাঁরা ভাবতে পারেননি যে গুরুদেবের কাব্যকলা মারাত্মকরূপে প্রতারক, সেই মোহিনী মায়ার প্রকৃতি না বুঝে শুধু বাঁশি শুনে ঘর ছাড়লে ডুবতে হবে চোরাবালিতে।.....সুর শুনে যে-ঘুম ভাঙবে সেই ঘুমই তাঁদের রমণীয় হ'লো;
>
> এঁরা রবীন্দ্রনাথের মোহন রূপে ভুলে থাকলেন না, তাঁকে কাজে লাগাতে শিখলেন, সার্থক করলেন তাঁর প্রভাব বাংলা কবিতার পরবর্তী ধারায়।.....রবীন্দ্রনাথের কাছে কত ঋণী এঁরা, আর সে-কথা পাঠককে জানতে দিতেও সংকোচ করেন না, কখনো-কখনো আস্ত-আস্ত লাইন তুলে দেন আপন পরিকল্পনার সঙ্গে মিলিয়ে। এই নিষ্কুণ্ঠতা, এই জোরালো সাহস— এটাই এঁদের আত্মবিশ্বাসের স্বাবলম্বিতার প্রমাণ।

আন্তর্বয়ান থেকে আন্তর্বয়ন

রাজীব চৌধুরী

রবীন্দ্র-পরবর্তী বাংলা কবিতার ইতিহাস লেখার খসড়া বলে ধরা যেতে পারে বুদ্ধদেব বসুর যে অতি পরিচিত 'রবীন্দ্রনাথ ও উত্তরসাধক' প্রবন্ধটিকে, তারই দুটি আলাদা আলাদা অংশ থেকে উদ্ধৃত অংশদুটিতে রবীন্দ্রসাহিত্য পরিগ্রহণের দুটি স্বতন্ত্র দিকের কথা বলা হয়েছিল। প্রথম অংশে চিহ্নিত কবিদের লেখায় আক্ষরিকভাবে অনুপস্থিত থেকেও শেষপর্যন্ত রবীন্দ্রনাথ কতটা স্পষ্ট অথচ দ্বিতীয় ভাগে আলোচিত কবিদের লেখায় রবীন্দ্র-রচনা উদ্ধৃত হয়েও অঙ্গীকৃত হয় কবিতারই শিল্পরূপে। এটাও স্পষ্ট যে, বুদ্ধদেব বসুর মতে দ্বিতীয় ধারার কবিরাই সফল এবং যথার্থ উত্তরসূরি।

এই আলোচনাটির মধ্যে উল্লিখিত এই দুটি পক্ষের কাব্যসাধনার বৈশিষ্ট্য বোঝাতে গিয়ে একটি সাধারণ বিষয় আমাদের চোখে পড়ল। সাফল্য অথবা ব্যর্থতা— দুই-ই নিরূপিত হল আসলে যে নন্দন সূত্রটিকে ভর করে তা হল আন্তর্বয়ন (Intertextuality)। আন্তর্বয়ন যেমন সামর্থ্য বুঝিয়ে দিতে পারে; তেমনই বিপদও ডেকে আনতে পারে। এর পাশাপাশি এটাও বোঝা গেল যে, সচেতন এবং স্বেচ্ছাকৃত আন্তর্বয়ন যেমন হতে পারে, তেমনই অলক্ষ্য অথচ অলঙ্ঘ্য নিয়তিও হতে পারে তা! আমাদের উদ্ধৃত অংশদুটিতে আরও একটি বিষয় লক্ষ করার মতো। দুটি অংশেই প্রবন্ধের বক্তব্যকে

তীক্ষ্ণ করার জন্যে বুদ্ধদেব বসুও আশ্রয় নিয়েছেন রবীন্দ্রসঙ্গীতের আন্তর্বয়নে। প্রথম অংশে "তোমার সুর শুনায়ে যে ঘুম ভাঙাও সে ঘুম আমার রমণীয়" এবং দ্বিতীয় অংশটিতে "তোমার মোহনরূপে কে-রয় ভুলে"— এই গানদুটি। দুটি ক্ষেত্রেই উৎস গানদুটির অন্বয়কে ভেঙে এবং মধ্যম পুরুষ একবচনে 'তুমি' অর্থে রবীন্দ্রনাথকেই বুঝিয়ে বক্তব্যের দ্বন্দ্বকে জারিয়ে দেওয়া হয়েছে লিখনকৌশলেও। বুদ্ধদেব বসুর এই পাঠটির পর্যালোচনা স্থগিত রেখে এই প্রবন্ধটিরই সূত্রে আমরা এবার এর পাশে রাখতে চাই কাব্য তথা সাহিত্য বিশ্লেষণে টি. এস. এলিঅট-এর একটি দৃষ্টিকোণকে :

> We may expect the language to approach maturity at the moment when men have a critical sense of the past, a confidence in the present, and no conscious doubt of the future. In literature, this means that the poet is aware of his predecessors, and that we are aware of ancestral traits in a person who is at the same time individual and unique. ['What is a Classic?']

ঐতিহ্যকে বরণ করেই ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্য; ঐতিহ্য-নির্ভরতা অথবা বিরোধিতা নয় বরং ঐতিহ্য এবং ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্যের যোগসূত্রেই কবিতা— এলিঅট-এর প্রস্তাবিত সূত্র, যার সম্বন্ধে অন্য প্রবন্ধে তিনি বলেছিলেন, "I mean this as a principle of aesthetics"— সেই মূল সূত্রটি আগে উদ্ধৃত কথাটিরই অন্য পিঠ —

> ....if we approach a poet without his prejudice we shall often find that not only the best, but the most individual parts of his work may be those in which the dead poets, his ancestors, assert their immortality most vigorously.... No poet, no artist of any art, has his complete meaning alone. His significance, his appreciation is the appreciation of his relation to dead poets and artists. ['Tradition and the Individual Talent']

'রবীন্দ্রনাথ ও উত্তরসাধক' প্রবন্ধটির পাঠক এবার সাজিয়ে নিতে পারবেন বুদ্ধদেব বসুর পরিকল্পনাটির এলিঅটীয় বিন্যাসকে। বুঝতে পারবেন 'predecessor' রবীন্দ্রনাথের 'উত্তরসাধক'দের জয়-পরাজয়ের ছকটিকে। এই বিশ্লেষণও তাহলে এক ধরনের আন্তর্বয়নই আসলে। স্থূলভাবে যে-জাতীয় বিন্যাসকে অনেকসময়ই 'প্রভাব' বলে বাংলা সাহিত্যের আলোচনায় আমরা চিহ্নিত করতে বা পাঠ করতে অভ্যস্ত।

যে শতাব্দীতে এলিঅট "Impersonal theory of poetry"-র পক্ষে সওয়াল করতে গিয়ে কবিকে 'Catalyst' বলে উল্লেখ করে বলেন, "Poetry is not a turning loose of emotion, but an escape from emotion; it is not expression of personality, but an escape form personality." (পূর্বোক্ত প্রবন্ধ) সেই শতাব্দীতেই রলা বার্থ সেই সূত্রটিকেই প্রসারিত করে মন্তব্য করবেন, ".... we know that to give writing its future, it is necessary to overthrow the myth : the birth of the reader must be at the cost of the death of the Author." (The Death of the Author) লেখক যেখানে কেবলই অনুঘটক অথবা পাঠক সেখানে বয়ান (text)-এর নির্মাতা, সেক্ষেত্রে বয়নকৌশলের

নানা দিকই চলে আসতে চায় সামনে এবং তারই পাঠে আন্তর্বয়ন হয়ে ওঠে একটি আকর্ষণীয় পর্যালোচনা, অনুসন্ধান ও ক্রমপাঠের ক্ষেত্র।

বাংলা পরিভাষা প্রয়োগের ক্ষেত্রে প্রথমেই সচেতন থাকা যেতে পারে 'আন্তর্বয়ান' এবং 'আন্তর্বয়ন' শব্দ দুটির পার্থক্য বিষয়ে। 'Intertext'-এর বাংলা পরিভাষা হিসেবে 'আন্তর্বয়ান', আর 'Intertextuality'-র ক্ষেত্রে 'আন্তর্বয়ন' শব্দের প্রয়োগ করা যেতে পারে। আন্তর্বয়ন অর্থে প্রাথমিকভাবে যে-কোনো একটি পাঠ বা বয়ানের সঙ্গে অপর পাঠ বা বয়ানের পারস্পরিক সম্পর্কের বহুবিচিত্র সম্ভাবনার ক্ষেত্রটিকে বোঝায়। এ সম্বন্ধে বলা হল, "The concept of intertextuality is prevalant in modern critical theory as a means of mapping the interelationhips between texts."

[*Encyclopedia of Literary Critics and Criticism.*
Vol I; Ed. Chris Murray]

এই দুটি বিষয় যে আসলে পরস্পর নির্ভর, তার কারণ একটি হল প্রকাশ এবং অন্যটি পদ্ধতি বা বৈশিষ্ট্য— তা বোঝা যাবে, দুটি শব্দেরই পরিপূরক উল্লেখের মধ্যে। Intertextuality-র সংজ্ঞায় একটি সাহিত্যকোষ লিখছে— "A relation between two or more texts which has an effect upon the way in which the Intertext (that is the text within which other texts reside or echo their presence) is read."

[*A Glossary of Contemporary Literary Theories*
Jeremy Hawthorn]

তাহলে আন্তর্বয়ান হল এমন একটি বয়ান যার মধ্যে অন্য এক বা একাধিক বয়ান নিহিত থাকছে অথবা প্রতিধ্বনিত হচ্ছে। 'আন্তর্বয়ান' সম্বন্ধে এই ধারণাটিই যদি স্থির এবং মান্যতাপ্রাপ্ত হত, তাহলে সমস্যা ছিল না। ঠিক এর বিপরীত ধারণাটিকেও দেখছি এই একই শব্দ দিয়ে বোঝাতে চাওয়া হচ্ছে। সেক্ষেত্রে 'Intertext' মানে, "A text (or set of texts) that is cited, rewritten, prolonged, or generally transformed by another text and that makes the latter meaningful. Homer's Odyssey is one of the intertexts of Joyce's Ulysses, and Intertextuality obtains between the two."

[*Dictionary of Narratology* ; Gerald Prince

এখানে তাহলে লক্ষ করা যাচ্ছে যে, পরিগ্রহণকারী বয়ানটিকে নয়; বরং পরিগৃহীত বয়ানটিকেই 'আন্তর্বয়ান'-এর আখ্যা দেওয়া হচ্ছে। অবশ্য জেমস জয়েস-এর *ইউলিসিস* উপন্যাসটির প্রেক্ষিত বা নির্ভরেই একমাত্র হোমার-এর *ওডেসি* মহাকাব্যটিকে একটি আন্তর্বয়ান হিসেবে চিহ্নিত করা হচ্ছে। কিন্তু আন্তর্বয়ান সম্পর্কিত এই দ্বিতীয় ধারণাটিতে ব্যাপারটা মিটছে না জেরাল্ড প্রিন্স-এর অভিধানটিতেই বলা হচ্ছে এ-বিষয়ে তৃতীয় একটি দৃষ্টিভঙ্গির কথাও— "A set of texts that are intertextually linked : given that intertextuality obtains between Homer's Odyssey and Joyce's Ulysses, the two texts would be said to constitute an intertext."

এই দৃষ্টিভঙ্গি অনুযায়ী *ইউলিসিস* এবং *ওডেসি* সম্মিলিতভাবে তৈরি করছে একটি 'আন্তর্বয়ান' এর সঙ্গে অনেকটাই মিলে যাচ্ছে আমাদের পূর্বোক্ত 'আন্তর্বয়ন'-এর ধারণাটি। আন্তর্বয়নকেই

যেন এখানে আন্তর্বয়ানের সঙ্গে এক করে ফেলা হচ্ছে। এই তিনটি ভাবনাকেই একটা ত্রিক-এর মতো পর পর সাজালে উঠে আসবে সমস্যাটির চেহারা।

	ওডেসি	ইউলিসিস	পদ্ধতি
প্রস্তাবনা ১		আন্তর্বয়ান	আন্তর্বয়ন
প্রস্তাবনা ২	আন্তর্বয়ান		আন্তর্বয়ন
প্রস্তাবনা ৩	আন্তর্বয়ান ⇌	আন্তর্বয়ান	আন্তর্বয়ন

একটু স্থূলভাবে বললে তাহলে সমস্যাটি হল, উৎসটিকে আন্তর্বয়ান বলব না গ্রহণকারী লেখাটিকে বলব, নাকি উৎস আর গ্রহণকারীর সাযুজ্যটিকে! তৃতীয় ভাবনাটিই যে এরমধ্যে পরবর্তী তাত্ত্বিক আলোচনাকে উসকে দেবে তা লক্ষ করা যায় বিশ শতকের আশির দশকের গোড়াতেই এ-বিষয়টিকে নিয়ে কয়েকটি তাত্ত্বিক পর্যবেক্ষণে।

১৯৮০-তে জুলিয়া ক্রিস্তেভা যে-কোনো বয়ানকেই চিহ্নিত করতে চাইলেন, "A permutation of texts, an intertextuality : in the space of a given text, several utterances, taken from other texts, intersect and neutralize one another" বলে (*Desire in Language : A Semiotic Approach to Literature and Art*) । তাহলে কোনো বয়ানই আসলে স্বাধীন, স্বয়ম্ভু, স্বনির্ভর নয়; বরং পরস্পরছেদী অন্য অসংখ্য উচ্চারণ বা বয়ানাংশের এক ভারসাম্যময় রূপ। কোন্ বয়ানটি আন্তর্বয়ান— উৎসবয়ান না গ্রাহকবয়ান— এই মীমাংসার চেষ্টা থেকেই এক্ষেত্রে সরে গেল আলোচনা, কারণ বয়ানমাত্রেই আন্তর্বয়ান। ক্রিস্তেভা-র এই লেখাটির তিনবছর আগেই ১৯৭৭-এ রলা বার্থ একটি লেখার উপর অন্য লেখার 'প্রভাব', 'অভিঘাত' জাতীয় শব্দগুলিকে আক্ষরিকভাবে উড়িয়ে দিয়ে আন্তর্বয়ন-এর বিষয়ে লিখেছিলেন, "The intertextual in which every text is held, it itself being the text-between of another text, is not be confused with some origin of the text : to try to find the 'sources', the 'influences' of a work is to fall in with the myth of filiation ; the citations which go to make up a text are anonymous, untraceable, and yet already read : they are quotations without inverted commas." [*From Work to Text* ; 'Image-Music-Text']

যে-উদ্ধৃতিচিহ্ন মনে করিয়ে দেবে উৎস-র স্বাতন্ত্র্যের কথা, সেটাই তাৎপর্যহীন। বাঁধনবিহীন যে বাঁধন— সেই মুক্ত শিল্পীর আন্তর্বয়নের কথাই মনে করিয়ে দিলেন বার্থ। কোনো লিখনই স্বাধীন, মুক্ত একমেবাদ্বিতীয়ম নয় আসলে— এই ধারণায় পৌঁছোলেই বোঝা যাবে যে, নানা পুনরাবৃত্তি এবং পুনর্বয়ন এবং পুনর্নির্মাণই যে-কোনো বয়ানের বৈশিষ্ট্য। এই অবিরত পুনর্নবীকরণ প্রক্রিয়াটিতে বিচিত্র উপাদান তার স্বাতন্ত্র্য নিয়েও সমন্বিত একাকার হয়েই থাকে। ক্রিস্তেভা-র পূর্বোল্লিখিত বইটির পরের বছরই, ১৯৮১-তে মিখাইল বাখতিনও এই বিষয়টিরই বৈচিত্র্যের সম্ভাবনাগুলির দিকে ইঙ্গিত করে লিখলেন,

> The role of the other's word was enormous at that time : there were quotation, that were openly and reverently emphasized as such, or that were half-hidden. completely hidden, half-conscious, unconscious, correct, intentionally distorted, unitentionally distorted, deliberately

> reinterpreted and so forth. The boundary lines between someone else's speech and one's own speech were flexible, ambiguous, often deliberately distorted and confused. Certain kinds of texts were constructed like mosaics out of texts of others."
>
> [From the Prehistory of Novelistic Discourse ; *The Dialogic Imagination*]

বার্থ-এর 'quotations' কেন উদ্ধৃতিচিহ্নহীন আন্তর্বয়ানের জন্ম দেয় তারই ব্যাখ্যা পাওয়া গেল বাখতিন-এর বিশ্লেষণে। আরও গুরুত্বপূর্ণ যেটা, সেটা হল সচেতন বা অসচেতন ভাবেই এসব উপাদানের আনাগোনা কখনও অবিকৃত কখনও ইচ্ছাকৃত বিকৃতি বা অনিচ্ছাকৃত বিকৃতিসহ, কখনও অর্ধগোপন বা পুরোপুরি গোপনভাবে এবং এমনই আরও কত বিচিত্রভাবে একাধিক বয়ানের যোগাযোগগুলি তৈরি হয়। এমনকি সেটা সচেতন না অসচেতন— তা নিয়েই তৈরি হতে পারে ধন্দ। জোসেফ কনরাড-এর *The Shadow-Line*-এর আলোচনা প্রসঙ্গে ডেভিড লজ কোলরিজ-এর 'The Rime of the Ancient Mariner'-এর সঙ্গে সাদৃশ্যের সূত্রগুলি দেখিয়েও বলেন,

> Whether Coard consciously intended these allusions cannot be proved from the text, and though it might be interesting to try and find out, the answer wouldn't make much difference. The echoes are evidence that he knew Coleridge's poem, but he might have reproduced them unconciously (though I personally doub• it), just as they may have a subliminal effect on readers who have read the poem and forgotten, it, or know it only through selective quotation."
>
> [*Intertextuality ; The Art of Fiction*]

এর মধ্যে 'allusion' অর্থাৎ পুনরুল্লেখ-এর মতো প্রকরণের কথা থাকলেও শেষপর্যন্ত আন্তর্বয়ানের কোনো সরলীকৃত সমীকরণও তৈরি করতে পারলেন না ডেভিড লজ, অথবা আন্তর্বয়নের শিল্পায়নকেই প্রকারান্তরে প্রশংসা করতে হল এভাবে। বয়ন আর বয়ান-এর মধ্যে ফারাকরেখাটা ক্রমশই যে কমে আসতে আসতে আন্তর্বয়ান এবং আন্তর্বয়ন প্রায় সমার্থক হয়ে উঠছে, সেটাই বোধহয় এক্ষেত্রে লক্ষণীয়। আসলে Intertext বলে কোনোকিছুকে যদি বুঝতে হয় তা শেষ পর্যন্ত কোনো একটি রচনার পরিসরে যেমন আমাদের ধরা দিচ্ছে না, তেমনই Text বলতে সাধারণভাবে একটি 'বয়ান'-এর মধ্যেও যে Intertextuality রয়েছে সেটাও সুনির্দিষ্ট কোনো কাঠামো নয়। এই কারণেই Intertext বলতে প্রায় Intertextual বা Intertextuality-ই বোঝানো হয়। অনেকেই Pastiche, Parody, Spoof, Sequel. Travesty, Plagiarism, Echo. Allusion-এর মতো পরিচিত সাহিত্য প্রকরণ বা সাহিত্যে কৌশলগুলির মধ্যে আন্তর্বয়ান-এর হদিস দেখতে চেয়েছেন; কিন্তু এ ছাড়াও আরও অসংখ্য পদ্ধতিতেই আন্তর্বয়ন ঘটে থাকে।

এই আন্তর্বয়নের আলোচনার পরিধিটিকে আরও প্রসারিত করলেন মূলত আখ্যানতাত্ত্বিক বলে পরিচিত জেরার্দ জেনেট। ১৯৯৭-তে প্রকাশিত *Palimpsests : Literature in the Second Degree* বইটিতে এ-জাতীয় পরস্পরসম্পর্কিত বয়নের পাঁচটি শ্রেণির কথা তিনি বললেন। তিনি ব্যবহার করলেন Transtextuality শব্দটি, এবং এর অন্তর্গত পাঁচটি শ্রেণি হল— 'Intertxtuality. Paratextuality, Architextuality, Metatextuality, এবং Hypertextuality', আন্তর্বয়ন

বলতে যে ক্রমশই বয়ান নির্মিতির যাবতীয় সম্ভাবনা এবং কৃৎকৌশলগুলিই বোঝানো হচ্ছিল, Transtextuality বা সার্ববয়ন ধরতে চাইল এরই বৈশিষ্ট্যগুলিকে।

Paratextuality অর্থাৎ সহবয়ন বা উপবয়ন বলতে মূল বয়ানটির আনুষঙ্গিক উপাদানগুলির সঙ্গে বয়নগত সম্পর্কসমষ্টিটিকেই বোঝাতে চেয়েছেন জেনেট। যেমন শিরোনাম, উপশিরোনাম, মুখবন্ধ, অধ্যায়সূচনার উদ্ধৃতি, উৎসর্গ, ঋণস্বীকার, পাদটীকা, অলংকরণ থেকে প্রচ্ছদে গ্রন্থ পরিচিতির মতো উপাদানগুলি অনেকক্ষেত্রেই নান্দনিকভাবে মূল বয়ানটির সঙ্গে আন্তর্সম্পর্কে বিভিন্ন ধারণাকে স্পষ্টতর করতে পারে।

Architextuality বলতে বর্গবয়ন বা সংরূপবয়ন বোঝাতে চেয়েছেন জেনেট। নির্দিষ্ট সাহিত্যবর্গ বা সাহিত্যপ্রকরণের সম্পর্কে যে তাত্ত্বিক ধারণা তৈরি হয়, তার মধ্যে একটি নির্দিষ্ট বয়ানের অবস্থানটা ঠিক কোথায়, অথবা একাধিক প্রকরণকে একটা বয়ান আত্মস্থ করার চেষ্টা করছে কিনা, অথবা এই জাতীয় চেনা ছকগুলির বাইরে নতুন কোনো সম্ভাবনার জন্ম দিচ্ছে কিনা কোনো একটি বয়ান, সেটাই এক্ষেত্রে বিবেচ্য। কাব্যনাট্য বা নাট্যকাব্য, পত্র-উপন্যাস বা গদ্যলিরিক, আত্মজীবনীমূলক উপন্যাস বা বীরব্যঙ্গকাব্য— এরকমই অসংখ্য একক বা মিশ্র প্রকরণগুলির যে কাঠামো ও বৈশিষ্ট্য, তার মধ্যে কোথায় এবং কীভাবে একটি বয়ান নিজেকে আঁটিয়ে নিচ্ছে তার নির্ণয় হচ্ছে সেই প্রকরণটির অন্যান্য বয়ানগুলির সঙ্গে আন্তর্সম্পর্ক বিচারের মধ্যে দিয়ে। অবশ্য একই বয়ানকে পাঠকভেদে ভিন্ন ভিন্ন প্রকরণের প্রকোষ্ঠে চিহ্নিত করার বৈচিত্র্যের কথাও জেনেট বিবেচনায় রেখেছেন।

Metatextuality-কে বোঝাতে চাওয়া হয়েছে ভাষ্যবয়ন হিসেবে। একটি বয়ান যখন পূর্ববর্তী কোনো বয়ানের ভাষ্য বা মন্তব্য হিসেবে পূর্ণ বা আংশিকভাবে গড়ে উঠছে, সেখানে আন্তর্সম্পর্কটা ভাষ্যবয়নের। এক্ষেত্রে আলোচনা বা সমালোচনা যেমন স্পষ্ট, দ্ব্যর্থহীন এবং সুনির্দিষ্ট হতে পারে, তেমনই অপর বয়ানকে উহ্য রেখে কেবল ইঙ্গিতবাহিতার মধ্যে দিয়েই বিষয়টি ফুটিয়ে তোলা যেতে পারে। মূলত সাহিত্যতত্ত্ব বা সাহিত্য-সমালোচনামূলক বয়ানেই এজাতীয় আন্তর্পাঠ তৈরি হতে পারে বলে জেনেটের ধারণা।

Hypertextuality নিয়েই জেনেট বিশেষ গুরুত্বসহকারে আলোচনা করেছেন। একে বলতে পারি পরিগ্রহবয়ন। এক্ষেত্রে Hypertext অর্থাৎ গ্রাহকবয়ান এবং Hypotext অর্থাৎ উৎসবয়ান-এর মধ্যে এমন আন্তর্সম্পর্কের কথা বলা হচ্ছে যেটা ইচ্ছাকৃত বা অভিপ্রায়িক— "forms of literature which are intentionally inter-texual." উৎসবয়ান এবং গ্রাহকবয়ান আলাদা আলাদা লেখকেরই হতে হবে এমন কোনো বাধ্যবাধকতা নেই। একই বয়ানের একাধিক পাণ্ডুলিপি, মুদ্রিত সংস্করণ, পত্রিকাপাঠ ও গ্রন্থভুক্ত পাঠের ভেদ থেকে বিভিন্ন সংস্করণের পাঠভেদগুলির আন্তর্সম্পর্কও এক্ষেত্রে বিবেচ্য। জেনেট এক্ষেত্রে 'Self-expurgation', 'Excision', 'Reduction', 'Amplification' জাতীয় বিভিন্ন রূপান্তরে Hypotext-এর Hypertext হয়ে ওঠার কথা বলেছেন।

বিশোধন বা পরিশোধন গোছের একটা রূপান্তর যেমন হতে পারে তেমনই একটা অংশ বাদ দিয়ে কিংবা অংশবিশেষকে সংক্ষিপ্ত করে বা প্রসারিত করে গ্রাহকবয়ানগুলি উৎসবয়ানগুলিকে নানাভাবে রূপান্তরিত করে নেয়।

মূলত আন্তর্বয়নকেন্দ্রিক বিচার বা বিশ্লেষণে এই জাতীয় খুঁটিনাটি দিকগুলিরও এহেন প্রকোষ্ঠ-বিভাজন গুরুত্ব পাবার অন্যতম কারণ হল পাঠক প্রতিক্রিয়াকেন্দ্রিক সাহিত্যতত্ত্ব আর পাঠ-পরিগ্রহণের নন্দনতত্ত্বের চর্চা। গূঢ়োল্লেখ-উদ্ধৃতি-প্রভাব-অভিঘাত-গ্রহণ থেকে সাহিত্যে চুরি

জাতীয় বিষয়ের আলোচনা বা পর্যালোচনা মূলত লেখক এবং লেখাটিকে কেন্দ্র করেই আবর্তিত হয়েছিল। চিহ্নবিজ্ঞানের প্রাথমিক সূত্রাবলি এবং এর বৈচিত্র্যমুখর পুনরালোচনা ফার্দিনান্দ দ্য সস্যুর-এর প্রস্তাবিত যুগ্ম-বৈপরীত্য সূচকগুলির অন্তর্নিহিত সম্ভাবনাগুলিকেই শুধু বিকশিত করে নি, পাঠ বা বয়ান-এর একক এবং একমুখী নির্মিতি সম্পর্কিত মিথ-কেও নানাভাবে ভাঙার পথ প্রশস্ত করেছে। একটি শব্দের মতো ছোটো একক থেকে শুরু করে পাঠক্ষেত্র হিসেবে কোনো বয়ান বা সামূহিক ধারণার মতো থেকে যাওয়া কোনো মহা-আখ্যান (Grand-narrative) পর্যন্ত সর্বত্রই পাঠক, দর্শক, শ্রোতা অংশগ্রহণ করে চলেছে নিজস্ব পাঠ বা ধারণাগুলি তৈরি করে নিতে নিতে। এইভাবেই 'langue-parole', 'Synchrony-Diachrony', 'Signifier-Signified', 'Paradigmatic-Syntagmatic'— জাতীয় 'binany-opposite'-গুলি কোনো বয়ানের ক্ষুদ্রতম এককের সঙ্গে বয়ানটির সম্পর্ক থেকে কোনো মহা-আখ্যানের ধারণার সঙ্গে বয়ানটির সম্পর্ক বিষয়ে নানাধরনের আন্তর্সম্পর্কের সীমাহীন সম্ভাবনাগুলির কথাই বুঝিয়ে দিতে চায়। 'syntagmatic' আন্তর্সম্পর্কে অনুভূমিক অক্ষে বয়ানের বিভিন্ন পর্ব এবং উপাদানগুলির পারস্পরিক সম্বন্ধটি তৈরি হলে 'paradigmatic' আন্তর্সম্পর্কে উল্লম্ব অক্ষে ওই বয়ানের কোনো পর্ব বা উপাদানের সঙ্গে অন্য কোনো বয়ানের বা বয়ানাংশের সম্বন্ধটি তৈরি হয়। অনুভূমিক অক্ষের উপাদানগুলি সম্বন্ধে ধারণা আবার উল্লম্ব অক্ষের উহ্য বা পরা উপাদানগুলির সাপেক্ষে রূপান্তরিত হয়ে অনুভূমিক উপাদানগুলির পরস্পর সমীকরণটিকে বদলে দিতে পারে। এই বিষয়ে বলা হয়েছে, "Temporally, syntagmatic relations refer *intratextually* to other signifiers *co-present* within the text, while paradigmatic relations refer *intertextually* to signifiers which are *absent* from the text. The 'value' of a sign is determined by both its paradigmatic and its syntagmatic relations." [*Semiotics : The Basics* ; Daniel Chandler]

এই 'absent' বা অনুপস্থিত উপাদানগুলির সঙ্গে বয়ানের উপাদানগুলির সম্পর্ক পাঠক-শ্রোতা-দর্শক ভেদে নানাধরনের আন্তর্বয়নগুলির বোধই জাগিয়ে তোলে। এছাড়াও উপস্থিত বা উহ্য উপাদানগুলির কথাও যদি মাথায় রাখি, তাহলে পরিগ্রহণকারী কোনো বয়ানের অসংখ্য পাঠ-সম্ভাবনা তৈরি হয়। তাহলে যখন তাত্ত্বিকরা ভাবাচ্ছেন যে, বয়ানের নির্দিষ্ট কোনো স্থির-পাঠ হয় না; সেখানেই আন্তর্বয়ান অনেক অনেক সম্ভাবনাপূর্ণ কতগুলি পাঠ-সমীকরণের দিকে আমাদের প্ররোচিত করে। পাঠ-পরিগ্রহণের এই দিকটির কথা বলতে গিয়ে আলোচক মনে করেছেন, "A literary work, even when it appears to be new, does not present itself as something absolutely new in an informational vacuum, but predisposes its audience to a very specific kind of reception by announcements, overt and covert signals, familiar characteristics, or implicit allusion.... The new text evokes for the reader (listener) the horizon of expectations and rules familiar from earlier texts, which are then varied, corrected, altered, or even just reproduced." [*Literary History as a challenge to Literay Theory;* Hans Robert Jauss]

কোনো একক শব্দের বা চিহ্নের অর্থগত এক বিস্তার-সম্ভাবনাটিকে চিহ্নতাত্ত্বিকরা 'denotation' থেকে 'connotation'-এর দিকে প্রসার বলে বোঝাতে চেয়েছেন। আমরা প্রথমটিকে 'অভিধা' এবং দ্বিতীয়টিকে 'লক্ষণা' ও 'ব্যাঞ্জনা' বলে নির্দেশ করতে পারি। শব্দের যে ধ্বনিগত অংশ 'দ্যোতক' (signifier) এবং তার অর্থ 'দ্যোতিত' (signified)— দুয়ের

জোড়ে তৈরি হচ্ছে শব্দ বা চিহ্ন। প্রাথমিক এই সস্যুরীয় গঠনটি 'denotation'-এর। কিন্তু প্রথম স্তরে তৈরি হওয়া সেই শব্দ বা চিহ্নটিই যখন হয়ে ওঠে দ্বিতীয় স্তরের 'দ্যোতক', তখন আর একটি নতুন 'দ্যোতিত'-র ধারণা মিলে তৃতীয় স্তরে তৈরি হয় 'connotation'-এর তলটি। এই সম্পর্কটি নিম্নরূপ —

<table>
<tr><td>দ্যোতক   দ্যোতিত</td><td></td></tr>
<tr><td>চিহ্ন
দ্যোতক</td><td>দ্যোতিত</td></tr>
<tr><td colspan="2">চিহ্ন</td></tr>
</table>

তৃতীয় তলটিতে যে 'চিহ্ন'-টিকে পাওয়া যাচ্ছে তা আন্তর্বয়নের প্রক্রিয়াকরণ সঞ্জাত। প্রসঙ্গত মনে রাখা যেতে পারে যে, তৃতীয় তল-এর এই 'চিহ্ন' আবারও নতুন একটি 'দ্যোতক' হয়ে চতুর্থ তল-এর আর একটি চিহ্ন হয়ে উঠতে পারে। এইভাবেই যে-কোনো পরবর্তী বয়ান তার অব্যবহিত পূর্ববর্তী একটিই বয়ানকে নয়; বরং পূর্ব-পূর্ব অসংখ্য বয়ানকেই এ জাতীয় ক্রমপাঠে আত্মস্থ করে নেয়। আমরা এবার একটি দৃষ্টান্ত দিয়ে বিষয়টিকে ধরবার চেষ্টা করি।

ভারতীয় ধ্রুপদি সংগীত সুরসপ্তকের তৃতীয় সুর 'গা', মার্গীয় পরিভাষায় 'গান্ধার'। এই সুরের কোমল বা কড়ি রূপটি হল 'কোমল গান্ধার'। রবীন্দ্রনাথের *পুনশ্চ* কাব্যগ্রন্থে এই নামেই একটি কবিতা রয়েছে, যার প্রথম পঙ্‌ক্তিটি হল, "নাম রেখেছি কোমল গান্ধার, মনে মনে।" এই পঙ্‌ক্তিটিই হয়ে গেছে কবি বিষ্ণু দে-র একটি কবিতার নাম, এবং কাব্যগ্রন্থটির নাম *নাম রেখেছি কোমল গান্ধার*। এই কাব্যগ্রন্থের প্রচ্ছদে আঁকা পটধর্মী লাইন ড্রয়িংটিতে রয়েছে একটি নারীর ছবি, যে তানপুরা বাজাচ্ছে। রবীন্দ্রনাথের কবিতাটিতে ছিল, "ওর জীবনের তানপুরা যে ওই সুরেতেই বাঁধা,/ সেই কথাটি ও জানে না!"— মিলে যায় এই আপাতসংযোগটি। এর পরে ঋত্বিক ঘটক তার 'কোমল গান্ধার' চলচ্চিত্রটিতে দুটি চরিত্র ভৃগু আর অনুসূয়ার কথোপকথনে ভৃগু সরাসরিই উল্লেখ করে রবীন্দ্রনাথের কবিতাটির। *পুনশ্চ*-র কবিতাটিতে একটি সুরের ভুবনের কেন্দ্রে রবীন্দ্রনাথ এঁকেছিলেন এক নারীর করুণ মূর্তিকে— বিষয় আর বিষয়ী সেখানে পরিপূরকভাবে একাকার। সেই নারীটির, "চলায় বসায় সব কাজেতেই ভৈরবী দেয় তান"— এই অংশে যে রাগিণীর উল্লেখ রয়েছে, রবীন্দ্রনাথের গানে ধরা আছে তার বিশ্লেষ—"সকালবেলার আলোয় বাজে বিদায়ব্যথার ভৈরবী"। ১৮৯১-তে সাজাদপুর থেকে লেখা *ছিন্নপত্র*-র একটি চিঠিতে পাচ্ছি, "সকাল বেলাকার রৌদ্র এবং নদীতীর এবং সমস্ত এমন গভীর বিষাদে পূর্ণ বোধ হতে লাগল। সকাল বেলাকার একটা অত্যন্ত হতাশ্বাস করুণ রাগিণীর মতো। মনে হল, সমস্ত পৃথিবীটা এমন সুন্দর অথচ এমন বেদনায় পরিপূর্ণ। .....বাস্তবিক, আমাদের দেশের করুণ রাগিণী ছাড়া সমস্ত মানুষের পক্ষে, চিরকালের মানুষের পক্ষে, আর কোনো গান সম্ভবে না।" 'সংগীতচিন্তা'-তে রবীন্দ্রনাথ যেমন রাগ-রাগিণীর গায়নকালের সুনির্দিষ্ট ধারণাটির বাইরে গিয়ে রাগগুলির ভাবরূপের ওপরেই জোর দিতে চেয়েছিলেন; এই টুকরো টুকরো উল্লেখগুলিতে ভৈরবী সম্বন্ধে বিমূর্ত তেমন কোনো বোধের কথাই উঠে আসতে চেয়েছে এবং কবিতাটি সেই করুণের আভাসবাহী হয়ে উঠছে কোমল গান্ধার সুরটি। বিষ্ণু দে-র কাব্যগ্রন্থে উল্লিখিত কবিতাটির পরের কবিতা এবং কাব্যগ্রন্থের শেষ কবিতাটি '২৫শে

বৈশাখ'। এই কবিতার তথা সমগ্র কাব্যগ্রন্থের শেষ পঙ্‌ক্তিটি হল, "সাগরে যে গঙ্গা আনি সে তোমারই আনন্দভৈরবী"। রবীন্দ্রনাথের উত্তরসূরির এই পংক্তিটিতে কেবল 'ভৈরবী'-র সূত্রে কোমল গান্ধারের সঙ্গে যোগ নয়; বিষ্ণু দে-র এই স্বীকৃতির গভীরতলে যে ভগীরথের মর্ত্যভূমিতে গঙ্গা আনয়নের পুরাণপ্রতিমাও রয়েছে; তা 'চিহ্ন' নির্মিতির মগ্নতলটিকেও মনে করিয়ে দেয়। বিষ্ণু দে-র 'নাম রেখেছি কোমল গান্ধার মনে মনে' কবিতাটিতে সম্বোধিত 'তুমি' সত্তাটি প্রত্যক্ষভাবে হয়তো "সমুদ্র বাংলা আমাদের বাংলার সমুদ্র"; কিন্তু পরের কবিতাটিতেও (২৫শে বৈশাখ) সমধর্মী চিত্রকল্পগুলিতে ঢেউ, নদীর স্রোত, সমুদ্র— এগুলিরই সূত্রে 'তুমি'-টি কিন্তু 'রবীন্দ্রনাথ'! এই বাংলা দেশ আর এই রবীন্দ্রনাথ — দুইয়েরই সমীকরণ ঘটে গেল ঋত্বিক ঘটকের 'কোমল গান্ধার'-এ। কিন্তু দেশভাগের দ্বিখণ্ডিত বাংলার প্রকৃতির অভিব্যক্তিতে যে করুণ ভাবটি তার কেন্দ্রবিন্দুতে অনুসূয়াকে রেখে রবীন্দ্রনাথের বিমূর্ত 'কোমল গান্ধার'-কে মাতৃরূপের আদিকল্পের অনুরণনেই ধরতে চাইলেন ঋত্বিক। এইভাবেই দ্যোতিত বদলের মধ্যে দিয়ে অনবরতই বিভিন্ন আন্তর্বয়ন পূর্ববর্তী ও পরবর্তী স্তরগুলির মধ্যে সেতু সংযোগ করেই চলে।

আন্তর্বয়ন সম্পর্কিত আলোচনা— তাত্ত্বিক অথবা ফলিত-প্রয়োগধর্মী— উভয় ক্ষেত্রেই শুধু বয়ানের সঙ্গে বয়ানের সম্পর্ক নির্ণয় নয়, বরং এর গুণগত এবং কৌশলগত দিকগুলির প্রতিও উৎসাহ দেখায়। একই লেখকের একাধিক লেখার মধ্যেও কোনো একটি বৈশিষ্ট্য বা উপাদানের আন্তর্বয়ন ঘটে থাকে। কোনো একটি 'theme' বা মূল ভাবের সূত্রে একই সময়ের নানা লেখা অথবা বিভিন্ন সময়ের লেখাগুলিতে আন্তর্বয়ন তৈরি হয়ে ওঠে। ইঙ্গিত এবং আভিপ্রায়িক আন্তর্বয়নের ক্ষেত্রে তো উৎসগুলিকে কখনও সরাসরি, কখনও বা বিভিন্ন ধরনের রূপান্তরের মধ্যে দিয়ে যেতে দেখা যায়। নোয়ম চমস্কি তাঁর রূপান্তরমূলক সঞ্জনধর্মিতার তত্ত্বে (Transformational-Generative-Theory) বাক্যনির্মাণের ক্ষেত্রে মগ্নগঠন (Deep-structure) থেকে প্রাতিভাসিক গঠনে (Surface-structure) যে চার ধরনের আন্বয়িক রূপান্তরের কথা বলেছিলেন, আন্তর্বয়ন-এর ক্ষেত্রে সেই রূপান্তর পদ্ধতিগুলি বিশ্লেষণ-সহায়ক হতে পারে। উৎসের সঙ্গে উপাদান সংযোজিত হয়ে (১), উৎসের উপাদান বিযোজিত হয়ে (২), উৎসটির বিকৃতি বা রূপবদল ঘটিয়ে (৩) কিংবা উৎসের উপাদানগুলির স্থানান্তর বা ক্রমবদল ঘটিয়ে (৪) আন্তর্বয়নকে বোঝানো যেতে পারে। আন্তর্বয়ন যে দুটি বয়ানের ক্ষেত্রে উপরোক্ত পদ্ধতিগুলির কোনো একটিকেই অনুসরণ করবে, এমন নয়; বরং প্রায় সব ক্ষেত্রেই একাধিক পদ্ধতিতেই রূপান্তর চোখে পড়ে। এর প্রতিটি ক্ষেত্রেই আবার মনে রাখা যেতে পারে 'degrees of intertextuality'-র কথা। একটিই উৎস-নির্ভর আন্তর্বয়ন, একাধিক উৎস নির্ভর আন্তর্বয়ন, উৎস-বয়ানটির উপর পর্যাপ্ত নির্ভরশীলতা অথবা ন্যূনতম নির্ভরতা, উৎস-বয়ানটির প্রতি উৎসাহ-শ্রদ্ধা-তাচ্ছিল্য বা আরও অসংখ্য বোধের তারতম্যে আন্তর্বয়ন কোনো সুনির্দিষ্ট প্রণালী বা গঠন-নির্দেশী নয়, বরং বহুমুখিতাকেই সামনে তুলে ধরে।

আন্তর্বয়নের গঠনগত রূপান্তরধর্মিতাকে কয়েকটি বয়ানের অংশবিশেষ নিয়ে চিহ্নিত করা যেতে পারে। রবীন্দ্রনাথ এবং বিষ্ণু দে-র দুটি কবিতার ছোটো দুটি অংশকে ধরে তুলনা করা যাক—

নামে সন্ধ্যা তন্দ্রালসা সোনার আঁচল-খসা
হাতে দীপশিখা রবীন্দ্রনাথ

নামে সন্ধ্যা তন্দ্রালসা, তার
সোনার কবরীখসা একটি কুসুমে
তোমায় সাজাব কবে সম্পূর্ণ দিনের শেষে প্রিয়া
পরিচ্ছন্ন ঘুমে। [বিষ্ণু দে]

বিষ্ণু দে-র প্রথম দুটি ছত্রের সঙ্গে রবীন্দ্রনাথের ত্রিপদীটির আন্তর্বয়নগত যে যোগাযোগ তৈরি হয়েছে, তাতে দ্বিতীয় কবিতাটির তৃতীয় ও চতুর্থ ছত্র সংযোজনের দৃষ্টান্ত। 'সোনার আঁচল-খসা' রূপান্তরিত হয়েছে 'সোনার কবরীখসা'-তে প্রতিস্থাপন বা রূপবদল ঘটিয়ে। 'হাতে দীপশিখা'— উৎসের এই অংশটি সম্পূর্ণই বর্জিত হয়েছে। সুতরাং এই অংশটুকুতেই গঠনগতভাবে তিন ধরনের আন্তর্বয়নের নমুনা পেয়ে যাওয়া গেল। বাকি রইল স্থানান্তর বা ক্রমবদল জাতীয় আন্তর্বয়নের নমুনা। এর জন্য রবীন্দ্রনাথের 'বধূ' এবং সুভাষ মুখোপাধ্যায়ের 'বধূ' কবিতা দুটির কয়েকটি পঙ্ক্তিকে পাশাপাশি সাজিয়ে দেওয়া হল—

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর	সুভাষ মুখোপাধ্যায়
১. হায় রে রাজধানী পাষাণকায়া ২. হেথাও ওঠে চাঁদ ছাদের পারে ৩. সবার মাঝে আমি ফিরি একেলা	১. পাষাণ-কায়া, হায় রে, রাজধানী ২. ছাদের পারে হেথাও চাঁদ ওঠে ৩. সবার মাঝে একলা ফিরি আমি

আমাদের লেখাটির শুরুতেই বুদ্ধদেব বসুর যে প্রবন্ধটির উল্লেখ ছিল, সেখানে বিষ্ণু দে ও সুভাষ মুখোপাধ্যায়— দুজনেরই কবিতার পর্যালোচনায় রবীন্দ্রনাথের যে আন্তর্বয়নের প্রসঙ্গ এসেছিল; সেই সূত্রদুটি এরকম :

১. "দেখা যাবে, বিষ্ণু দে ব্যঙ্গানুকৃতির তির্যক উপায়েই সহ্য ক'রে নিলেন রবীন্দ্রনাথকে....."

২. " 'বেলা যে পড়ে এল জলকে চল'-এর বদলে 'গলির মোড়ে বেলা যে পড়ে এলো', আর 'কলসী লয়ে কাঁখে পথ সে বাঁকা'র বদলে 'কলসি কাঁখে চলেছি মৃদু তালে'— এই রকম আক্ষরিক অনুকরণেরই উপায়ে একটি উৎকৃষ্ট এবং মৌলিক কবিতা লেখা সুভাষ মুখোপাধ্যায়ের পক্ষে সম্ভব হয়েছিলো এঁদের উদাহরণ সামনে ছিলো ব'লেই;"

একটি বয়ানের মধ্যে অন্য একটি বয়ানের নির্মাণগত যে রূপান্তর আমরা দেখিয়েছি আন্তর্বয়নের নান্দনিকতা বোঝার ক্ষেত্রে তা যে নেহাতই বাহ্যিক বিষয়; একই কবিদের প্রসঙ্গে বুদ্ধদেব বসুর আলোচনাটি থেকেই বোধহয় বিষয়টি স্পষ্ট হয়ে যায়। রবীন্দ্রনাথের কবিতার পঙ্ক্তিগুলির সুভাষ মুখোপাধ্যায় শুধু উপাদানগত ক্রমপরিবর্তন করেন নি, ছন্দটাই বদলে ফেলায় পরিচিত শব্দাবলির রেশটা এখানে উৎসের কথা মনে করিয়ে দিয়েও বারে বারেই তা ভেঙে ফেলছে। তা ছাড়াও আন্বয়িক স্তরে এজাতীয় উপাদান বিপর্যাসে অর্থটা না বদলালেও অর্থের তাৎপর্য বদলে যায় বইকি! এ ছাড়াও 'বধূ' কবিতাদুটির ক্ষেত্রে এরকম পঙ্ক্তিনির্ভর আন্তর্বয়ন নয়, সমগ্র বয়ানদুটিরই তুলনা আবশ্যক হয়ে ওঠে।

উৎস এবং গ্রাহক বয়ানদুটির মধ্যে আন্তর্বয়নে উৎসের উল্লেখ, বিনা-রূপান্তরেই অনেক সময় তাৎপর্যবাহী হয়ে ওঠে; আবার উৎসের রূপান্তর ঘটিয়েও অনেকসময় গ্রাহক-বয়ানটিকে নেহাতই তাৎপর্যহীন বলেও মনে হতে পারে। পরশুরামের 'নির্মোক নৃত্য' গল্পটিতে উর্বশীর সঙ্গে ইন্দ্রের কথোপকথনে উর্বশী বলেছে সে আর স্বর্গলোকে থাকতে চায় না, কারণ, "মানুষের কাছে ঢের বেশী আদর পাই।" মর্ত্যের এক কবি লিখেছেন, "মুনিগণ ধ্যান ভাঙি দেয় পদে তপস্যার ফল, তোমারি কটাক্ষঘাতে ত্রিভুবন যৌবনচঞ্চল"। অমরাবতীর কোন্ কবি এমন

লিখতে পারে? রবীন্দ্রনাথের *চিত্রা* কাব্যগ্রন্থের 'উর্বশী' কবিতার চতুর্থ স্তবক থেকে পৌরাণিক চরিত্র উর্বশীর এমন নিখুঁত উদ্ধৃতি, প্রথমত উলট পুরাণ-এর কৌতুক যেমন সৃষ্টি করেছে তেমনই উৎস সম্পূর্ণ অনাহৃত রাখা সত্ত্বেও এই অপ্রত্যাশিত কালানৌচিত্যই এখানে আন্তর্বয়নের সাফল্য নির্দেশ করে। এই কবিতা থেকে তো অন্য যে-কোনো দুটি ছত্রই পরশুরাম উদ্ধৃত করতে পারতেন। কিন্তু এই গল্পে তিন মুনিকে নির্মোক নৃত্য দেখিয়ে পরাভূত করার চেষ্টায় প্রাথমিক সাফল্যের পর, শেষে উর্বশীর পরাজয় প্রসঙ্গই উঠে আসবে বলে উৎসের এ-দুটি পঙ্‌ক্তি গুরুত্বপূর্ণ হয়ে ওঠে। এই অংশটিতে কিন্তু মূল কবিতার বাকি অংশটির প্রতি, অর্থাৎ অনুচ্চারিত উপাদানের প্রতি আগ্রহ জাগানোর কোনো অভিপ্রায় নেই বলেই উৎস এখানে গ্রাহকবয়ানে প্রায় মিশে যাচ্ছে। আন্তর্বয়নে কিন্তু এর উলটোটাও ঘটে থাকে। একই উৎসটির ভিন্নতর একটি প্রয়োগের পর্যালোচনা করে বিষয়টি বোঝা যেতে পারে। *চিত্রা*-র কবিতাটি লেখা হয়েছিল ১৩০২ বঙ্গাব্দে এবং এর সাঁইত্রিশ বছর পরে ১৩৩৯ বঙ্গাব্দে রবীন্দ্রনাথেরই 'সাধারণ মেয়ে' কবিতাটিতে (*পুনশ্চ*) মালতী চরিত্রটি একটি চিঠি লিখেছে সাহিত্যসম্রাট শরৎবাবুকে। নরেশ সেনের মন ছুঁয়েছিল মালতীর কাঁচা বয়সের মায়া। কিন্তু বিলেতে গিয়েই সে বিদেশিনী বান্ধবীদের পেয়ে মালতীকে চিঠিতে লিখেছে সেই অভিজ্ঞতার কথা তাকে অপমান করার উদ্দেশ্য নিয়ে। নরেশ সেই চিঠিটিকে পরোক্ষে উদ্ধৃত করেছে মালতী যেখানে বিদেশিনী বান্ধবী লিজির সমুদ্রস্নান করে উঠে আসার বর্ণনা করতে নরেশ 'উর্বশী' কবিতাটি থেকেই উদ্ধৃতি দিয়েছিল। মালতীর চিঠিতে নরেশের উদ্ধৃত অংশটি নেই; বিষয়টিকে সে লিখেছে এভাবে—

> গেল মেলের চিঠিতে লিখেছে
> লিজির সঙ্গে গিয়েছিল সমুদ্রে নাইতে।
> বাঙালি কবির ক-লাইন দিয়েছে তুলে,
> সেই যেখানে উর্বশী উঠছে সমুদ্র থেকে।

এখানে লক্ষ করা যাচ্ছে যে, গ্রাহক-বয়ানটি উৎসের আভাস দিচ্ছে মাত্র; অংশটিকে সরাসরি তুলে আনছে না। এই আন্তর্বয়নটি কিন্তু উৎস-অভিমুখী। সম্ভবত নরেশ রবীন্দ্রনাথের যে পঙ্‌ক্তিগুলি উদ্ধৃত করেছিল সেগুলি হল,

> আদিম বসন্তপ্রাতে উঠেছিলে মন্থিত সাগরে
> ডান হাতে সুধাপাত্র বিষভাণ্ড লয়ে বাম করে,
> তরঙ্গিত মহাসিন্ধু মন্ত্রশান্ত ভুজঙ্গের মতো
> পড়েছিল পদপ্রান্তে উচ্ছ্বসিত ফণা লক্ষশত
> করি অবনত।

রবীন্দ্রনাথেরই লেখাতে রবীন্দ্রসাহিত্যের পর্যাপ্ত আন্তর্বয়নের নমুনা অবশ্য *পুনশ্চ*-র কবিতার আগেই *শেষের কবিতা* উপন্যাসে আমরা পেয়ে গেছি। উৎসকে বিনা-রূপান্তরেই প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষ উল্লেখের মধ্যে দিয়ে যেমন তাৎপর্যবাহী হয়ে উঠতে দেখলাম এই দুটি দৃষ্টান্তে; তার পাশাপাশি এবার দেখে নেওয়া যেতে পারে যে, উৎসের রূপান্তর ঘটিয়েও কীভাবে গ্রাহক বয়ানটি আন্তর্বয়নকে গভীরতাহীন, তাৎপর্যহীন এক অবস্থানে দাঁড় করিয়ে রাখে। যতীন্দ্রনাথ সেনগুপ্তের *মরুমায়া* কাব্যগ্রন্থের 'নূতন পথে' কবিতাটিতে রাজপথ ছেড়ে পল্লির জনজীবনে এক 'পাওটা-পথের পথিক' সত্তা জানাচ্ছে—

> ভরা ভাদরে
> মাঠ ভরে আদরে

যবে বাদর-হাওয়ার সুখে
তরুণ ধানের বুকে
চিক্কণ শ্যাম ঢেউ চোল্‌কে উঠে;

স্পষ্টতই বিদ্যাপতির মাথুর পর্যায়ের পদে রাধার বিরহকাতর উক্তি "এ ভরা বাদর, মাহ ভাদর, শূন্য মন্দির মোর" অংশটির অনুরণন রয়েছে। কিন্তু উৎসটির সঙ্গে গ্রাহক বয়ানটির ভাবগত প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষ— কোনোরকম যোগাযোগই তৈরি হচ্ছে না। আন্তর্বয়নের ক্ষেত্রে এমন সরল সমীকরণ করাটা বিপজ্জনক, কারণ কোনো পাঠক হয়তো এর মধ্যেই কোনো যোগসূত্র প্রত্যক্ষ করতেও. পারেন! তবে আমাদের মতে যতীন্দ্রনাথের কবিতাটির বিষয়ের সূত্রে এই শব্দগুলি উৎসটি সম্বন্ধে আদৌ ভাবিত নয়!

আন্তর্বয়নে বয়ানের সঙ্গে বয়ানের সম্পর্ক যেমন প্রত্যক্ষ হতে পারে, তেমনই পরোক্ষ আন্তর্বয়নই যে অধিক সম্ভাবনাময় সে-বিষয়ে সন্দেহ নেই। তবে প্রত্যক্ষ সম্পর্কও যে বৈশিষ্ট্যগত কারণে কত বৈচিত্র্যপূর্ণ হওয়া সম্ভব তার দৃষ্টান্তও প্রচুরই রয়েছে। যতীন্দ্রনাথ সেনগুপ্তেরই 'শরতে বঙ্গভূমি' কবিতাটি রবীন্দ্রনাথের *কল্পনা* কাব্যগ্রন্থের 'শরৎ' কবিতাটির একটি ব্যঙ্গরূপ বলা যায়। *মরুশিখা* কাব্যগ্রন্থের অন্তর্ভুক্ত এই কবিতায় দুঃখবাদী কবির কাব্যভাবনা পল্লিজীবনের নিসর্গ-আশ্রিত চেনা ছন্দের দোলায় অচেনা কথার চমক লাগায়—

আজি কি তোমার বিধুর মুরতি
হেরিনু শারদ প্রভাতে!
হে মাতঃ বঙ্গ মলিন অঙ্গ
ভরি গেছে খানা ডোবাতে।

প্যারডি অধিকাংশ ক্ষেত্রেই স্থূলতা-দোষে দুষ্ট। তবে মূল বয়ানটির সঙ্গে নির্মিত বয়ানটির সম্পর্ক এক্ষেত্রে অদ্ভুত। মূল লেখাটির এমন কিছু বৈশিষ্ট্যকে পরবর্তী লেখাটি আশ্রয় করে যে, অর্থ বা তাৎপর্যগতভাবে মূলেব সম্পূর্ণ বিরোধী ভাবনা প্রকাশ করেও তা মূলের একটি উহ্য বাতাবরণ সৃষ্টি করেই রাখে! এই জাতীয় আন্তর্বয়ন কোনো সুনির্দিষ্ট একটি বয়ানকেই আশ্রয় না করে ঐতিহ্যকেও আশ্রয় করতে পারে। *কবিজীবনী*-র রচয়িতা ও বাংলা কাব্যসংগীতের একটি পর্বের অন্যতম সংগ্রহকারক কবি ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্ত তাঁর কবিতায় মহারানি ভিক্টোরিয়ার প্রশস্তি যে ভঙ্গি ও অনুপ্রাসের বাহুল্যসহ তুলে ধরেছিলেন তা কবিওয়ালাদের গান এবং শাক্তপদাবলীর ভক্তের আকুতি পর্যায়ের কিছু সংগীতের কথাই মনে করিয়ে দেয়। এমনই আর-এক ঐতিহ্য রূপকথা কথনের। বলার সেই ভঙ্গিটিকেও আত্মস্থ করে নিয়ে লেখা সুভাষ মুখোপাধ্যায়ের কবিতায় পাই—

তারপর যে-তে যে-তে যে-তে....
দেখি বনের মধ্যে
আলো-জ্বলা প্রকাণ্ড এক শহর!

যতীন্দ্রনাথের এই রবীন্দ্রকবিতার প্যারোডিটির পাশে আর এক রবীন্দ্রপরবর্তী বিদ্রোহী নজরুলের এই ধরনের একটি লেখাকে পাশাপাশি রাখলে প্রয়োগগত সাদৃশ্য সত্ত্বেও আন্তর্বয়নের উদ্দেশ্যগত পার্থক্যটি বুঝে নিতে অসুবিধে হবে না। 'ধূমকেতু' পত্রিকায় 'আনন্দময়ীর আগমনে' কবিতাটির জন্যে রাজদ্রোহের অভিযোগে যখন তিনি কারাবন্দি, তখন রবীন্দ্রনাথের "তোমারি গেহে

পালিছ স্নেহে, তুমি ধন্য ধন্য হে" গানের একটি প্যারোডি লেখেন। এই লেখাটি রবীন্দ্রনাথকে বা তাঁর কাব্যভাবনাকে ব্যঙ্গ করে নয়; বরং কারা কর্তৃপক্ষের জুলুমের বিরুদ্ধে লেখা—

তোমারি জেলে পালিছ ঠেলে তুমি ধন্য ধন্য হে।
আমার এ গান তোমারি ধ্যান তুমি ধন্য ধন্য হে।
রেখেছ সান্ত্রী পাহারা দোরে
আঁধার-কক্ষে জামাই আদরে
বেঁধেছ শিকল প্রণয়-ডোরে
তুমি ধন্য ধন্য হে। [*ভাঙার গান*]

এক রবীন্দ্রনাথের কবিতাকেই পরবর্তী কবিদের লেখায় যত অজস্র কৌশল ও উদ্দেশ্যে পুনরুচ্চারিত হতে দেখা গেছে তা অত্যন্ত কৌতুহলজনক। অনাগত যুগে তাঁর কবিতার পাঠকের কল্পনায় কবির ভাবনা থেকে যখন *চিত্রা* কাব্যগ্রন্থের '১৪০০ সাল' কবিতাটি রচিত হয়েছিল, পরবর্তীকালে সুধীন্দ্রনাথ দত্তের 'কৈফিয়ৎ' কবিতায় তার আন্তর্বয়নটি অভিনব।

সুদূর শতাব্দীশেষে, জানি আমি, কোনও সপ্তদশী
আমার পুঁথির পানে নতমুখে বাতায়নে বসি,
লবে না উদ্দীপ্ত করি ম্রিয়মান দিনান্তের কালি,

প্রায় অনুরূপ চিত্র এবং চিত্রকল্পে রবীন্দ্রকবিতাটির কবির প্রত্যাশা ও ভাবনাকে এখানে বিপরীত দৃষ্টিভঙ্গি থেকে উচ্চারিত হতে দেখি। নজরুল ইসলাম-এর একটি কবিতার মধ্যেও কৈফিয়ত দেবার প্রসঙ্গ রয়েছে ('আমার কৈফিয়ৎ') এবং রবীন্দ্রনাথের প্রসঙ্গকেই সামনে রেখে সেখানে বলা হয়েছিল, "যেমন বেরোয় রবির হাতে সে চিরকেলে বাণী, কই, কবি?" অথবা আরও স্পষ্ট ভাষায় "অমর কাব্য তোমরা লিখিও, বন্ধু, যাহারা আছ সুখে!" সুধীন্দ্রনাথের 'কৈফিয়ৎ'-এ রবীন্দ্রকবিতার ভাবনাটিরই শুধু নয় শব্দেরও উল্লেখ পাই— কিন্তু প্রত্যাশার পরিবর্তে এক নেতিবাচক ভঙ্গিতেই কবির বাস্তবকে যেন এখানে মেনে নিতে চাওয়া হয়েছে। অথচ সুধীন্দ্রনাথ *তন্বী* কাব্যগ্রন্থ রবীন্দ্রনাথকেই উৎসর্গ করে তার মুখবন্ধে জানিয়েছিলেন : "সত্য বলতে কি, সমস্ত বইখানা খুঁজে, যদি কোনওখানে কিছুমাত্র উৎকর্ষ মেলে, তবে তা রবীন্দ্রনাথের রচনারই অপহৃত ভগ্নাংশ ব'লে ধরে নেওয়া প্রায় নিরাপদ। তবু এই চুরির জন্য আমি লজ্জিত নই, কেননা শুধু সুন্দরের মোহ যে-চোরকে পাপের পথে ডাকে, সে নিশ্চয়ই নীতিপরায়ণ নয়, কিন্তু রূপজ্ঞ বটে।" রবীন্দ্ররচনা থেকে অংশবিশেষের এহেন অপহরণ বা চুরির কথা কাব্যগ্রন্থের ভূমিকায় এই সোচ্চারভাবে উচ্চারণের দিকটি বস্তুতপক্ষে এক কৌশলবিশেষ। রবীন্দ্ররচনার অপহৃত ভগ্নাংশ যা আদৌ নয় তাকে সেই বলে ধরে নেওয়াটাই প্রায় নিরাপদ! এই প্রায় নিরাপদ কথাটির মধ্যেই কোথাও স্পষ্ট হয়ে ওঠে একদল পাঠক বা আলোচকের প্রতি কটাক্ষ! এবং পরবর্তী বাক্যেই অবধারিতভাবে উল্লেখ করা হয় 'চুরি'-র কথা। এ কৈফিয়ৎ রবীন্দ্রনাথের কাছে নয়, তা বোঝাই যায়— বরং আন্তর্বয়নের নান্দনিক গুরুত্ব ও তাৎপর্যের কথাই উচ্চারিত হয় উক্তিটির শেষ কথাগুলিতে।

আন্তর্বয়নের যে সব দৃষ্টান্ত নিয়ে নাড়াচড়া করা গেল, সেগুলি সাহিত্যিক বয়ানের সঙ্গে সাহিত্যিক বয়ানেরই আন্তর্সম্পর্ক বিষয়ে। মূলত বিশ্লেষণের ক্ষেত্রে এই জাতীয় আন্তর্বয়নের দৃষ্টান্তই সাধারণত বেশি পাওয়া গেছে। কিন্তু আন্তর্বয়ন আসলে ইতিহাস, দর্শন, বিজ্ঞান থেকে শুরু করে অন্য যে-কোনো বিষয়ের সঙ্গেই কোনো একটি সাহিত্যিক গ্রাহক-বয়ানের যোগাযোগও আলোচনা করতে চাইবে। লোকসংস্কৃতি এবং মধ্যযুগের বাংলা সাহিত্য ও সংগীতের নানা

উৎসগুলিকে আন্তর্বয়ন সম্পর্কে স্থাপন করে বাংলা উত্তর-আধুনিক কবিতা আন্দোলনের শরিকরা একসময় একটি সচেতন সাহিত্যাদর্শ হিসেবে একে দাঁড় করাতে প্রয়াসী হয়েছিলেন। 'বাংলা কবিতার প্রাকৃতায়ন' এই সংকলনে শুধু নয় স্বতন্ত্র আরও কতগুলি প্রবন্ধে অঞ্জন সেন সাংস্কৃতিক অন্তর্বয়ন, আন্তঃসাংস্কৃতিক বয়ন-এর আলোচনা সূত্রে বাংলাভাষায় প্রথম 'আন্তর্বয়ন' বিষয়টির একটি দিক নিয়ে পর্যাপ্ত আলোচনা করেছিলেন। মিথ, পুরাণ এবং বাংলা সাহিত্যে তার বিচিত্রমুখী প্রতিগ্রহণ বিষয়ে অসংখ্য আলোচনা নানাদিক থেকেই করা হয়েছে। পাঠ-পাঠান্তর বিষয়ক পর্যালোচনা, অনুবাদ ও অনুসৃজনের পর্যালোচনা— এ সবের সূত্রে আন্তর্বয়ন নিয়েই নানা অভিমুখী আলোচনাও অনেক ক্ষেত্রেই হয়েছে। ১৯৮০-৮১ থেকে 'আন্তর্বয়ন'-এর আলোচনা যে বিস্তৃততর একটি তাৎপর্য এবং পরিধি অভিমুখী হতে চাইছিল সে কথা আমরা আগেই বলেছি। ১৯৮১-তেই প্রকাশিত জোনাথন কালার-এর *The Persuit of Signs* বইটিতে "Presupposition and Interextuality' অধ্যায়টিতে এই দিকটির কথাই মনে করিয়ে দেওয়া হয়েছে— "Intertextuality thus becomes less a name for a work's relation to particular prior texts than a designation of participation in the discursive space of a culture ; the relationship between a text and the various languages or signifying practices of a culture and its relation to those texts which articulate for it the possibilities of that culture. The study of intertextuality is thus not the investigation of sources and influences as traditionally conceived ; it casts its net wider to include anonymous discursive practices, codes whose origins are lost, that make possible the signifying practices of later texts."

আন্তর্বয়ন সম্পর্কিত আলোচনার সম্ভাবনাটি বেড়ে যায় এই কারণেই। তবে মূলত সাহিত্যিক আন্তর্বয়নগুলিরই যা এবং যতটা আলোচনা হয়েছে, তাতে মুখ্যত সাহিত্যতত্ত্বেরই আওতার বাইরে এখনও আন্তর্বয়ন সম্পর্কিত সচেতন আলোচনাগুলি খুব একটা যায় নি। কেবলই সাহিত্যিক বয়ানগুলির আন্তর্সম্পর্ক বিচার আন্তর্বয়ন নয়— এমন ধারণা প্রতিষ্ঠিত হয়ে যাবার পরেও ২০০২-তে প্রকাশিত উমবার্তো একো-র *On Literature* বইটিতে 'Intertextual irony and levels of reading' প্রবন্ধটিতে লেখক লিখছেন, "Unlike more general cases of double coding, intertextual irony, by bringing into play the possibility of a double reading, does not invite all readers to the same party. It selects them, and privileges the more intertextually aware readers, but it does not exclude the less aware." আন্তর্বয়নের সাম্প্রতিক এবং এপর্যন্ত সর্বশেষ সংজ্ঞাটিও একো-র লেখাটিতেই পাচ্ছি, যেখানে আন্তর্বয়নকে বলা হয়েছে, "......the general allusion to the endless dialogue that goes on between texts." 'আন্তর্বয়ান' অর্থাৎ 'Intertext'-এর অস্তিত্ব নিয়ে যে আলোচনার সূচনা হয়েছিল, শেষপর্যন্ত দেখা গেল যে, 'আন্তর্বয়ন' অর্থাৎ Intertextuality-র সম্পর্ক বা কৌশলটিই এক্ষেত্রে বেশি গুরুত্বপূর্ণ হয়ে উঠেছে।

প্রয়োগের নিরিখে : পরশুরাম আর বাখতিন

রামকৃষ্ণ ভট্টাচার্য

মিখাইল বাখতিন (১৮৯৫-১৯৭৫)-এর নাম বাঙালি পাঠক-পাঠিকার অচেনা নয়। তাঁর বেশ কিছু বই ও লম্বা প্রবন্ধ রুশ থেকে ইংরিজিতে অনুবাদ হয়েছে (এখনও অবধি বাঙালির কাছে ইংরিজিই জগতের জানালা)। গত কয়েক বছরে তাঁকে নিয়ে বাঙলাতেও ছোটো-বড়ো বই, পত্রিকার বিশেষ সংখ্যা ইত্যাদি বেরিয়েছে।

যাঁদের নিয়ে বাখতিন লিখেছিলেন— ফিওদর দস্তয়েভ্স্কি ও অন্যান্য ইওরোপীয় লেখক— তাঁদের কেউ কেউ আমাদের চেনা, কিন্তু ভালোমতো জানা নন। এমনকি ফরাসি বা রুশ সাহিত্য নিয়ে যাঁরা নিয়মিত চর্চা করেন, মূলেই পড়ে থাকেন, তাঁদের সকলেই যে ঐসব লেখকের বিষয়ে বিশেষজ্ঞ— এমনও বলা যায় না। এছাড়া ধ্রুপদী ও মধ্যযুগীয় লাতিন কাব্যও বাখতিন-এর আলোচনায় আসে। সে তো আরও অকূল পাথার। ইংরিজি তর্জমায় একবার বা দুবার এঁদের কিছু রচনা হয়তো অনেকেরই পড়া। কিন্তু তার ভিত্তিতে কোনো সমালোচনার মূল যাচাই করা যায় না। (কোনো কোনো পণ্ডিত দেখি অকুতোভয়ে তা-ও করেন!)

তবে বিবরণতত্ত্ব, narratology-র সঙ্গে যুক্ত একটি বিষয়, যে-কোনো ভাষার সাহিত্যপাঠকের পক্ষে বিচার করা সম্ভব। সেটি হলো বাখতিন-এর বহুস্বর (polyphony)-তত্ত্ব। গল্পে-উপন্যাসে অনেক চরিত্র আসে, তাদের মধ্যে নানা মত-অমত দেখা যায়। বাখতিন চান : প্রতিটি চরিত্রই তার নিজের মতো কথা বলুক, কোনো চরিত্রর ভেতর দিয়েই যেন লেখকের ভাবনা ফুটে না বেরয়। এরই দৃষ্টান্ত হিসেবে এসেছেন দস্তয়েভ্স্কি, যিনি এই রীতির সার্থক রূপকার। তাঁর চরিত্ররা স্রষ্টার নিজের ছাঁচে ঢালা নয়।

এর ঠিক উল্টো পিঠে থাকেন তলস্তয়। বাখতিন মনে করেন : তাঁর গল্পে-উপন্যাসে সবার গলা ছাপিয়ে একটি গলাই শোনা যায়। সেটি লেখকের নিজের। দস্তয়েভ্স্কি সে-দিক দিয়ে আদর্শ হরবোলা।

বাখতিন যে বহুস্বর-এর কথা বলেছেন, তা মূলত কথাসাহিত্যর ক্ষেত্রে। নাটকে তো লেখকের সশরীরে হাজির হওয়ার সুযোগ থাকে না। সেখানে প্রতিটি চরিত্রই নিজের স্বভাব ও পরিস্থিতি অনুযায়ী কথা বলবে—

এমনই আশা করা যায়। গল্প-উপন্যাসের লেখক কিন্তু ইচ্ছে করলেই নিজের মতামত জানাতে পারেন— নিজের কথায় বা কোনো চরিত্রের মুখ দিয়ে।

তবু নাটকের ক্ষেত্রেও একস্বর-বহুস্বর-এর তফাত করা যায়। শেক্‌সপিয়র-কে যদি বহুস্বর-এর শিল্পী বলে ধরা হয় (চের্নিশেভ্‌স্কি তেমনই ধরেছিলেন— বাখতিনও বারবার তাঁর কথা তোলেন),[২] বার্নার্ড শ-কে ধরা যায় একস্বর-এর প্রবক্তা বলে (শ-এর কথা অবশ্য এ প্রসঙ্গে বাখতিন একবারও বলেন নি)। তাঁর নাটকে প্রায়ই একটি চরিত্র থাকে যার বকলমে শ তাঁর নিজের মত প্রচার করেন, নিজেরই পছন্দ-অপছন্দ জানান।

কথাগুলো নতুন নয়, শেক্‌স্‌পিয়র-এর ক্ষেত্রে কিট্‌স-ও লক্ষ্য করেছিলেন এক নঞর্থক ক্ষমতা (negative capability)। একই সঙ্গে খলনায়ক ইআগো আর সচ্চরিত্রতার প্রতিমূর্তি ইমোজেন-কে তিনি হাজির করতেন সমান বিষয়নিষ্ঠ (objective) ভাবে, নিজে তাদের কোনোটাই না-হয়ে।[৩]

লেখকের নিজের মতামত যত চাপা থাকে ততই ভালো, ঘটনা ও পরিস্থিতি থেকেই সেগুলো বেরিয়ে আসুক— এমনই চেয়েছিলেন ফ্রেডরিক এঙ্গেলস।[৪] নাটকের মতো উপন্যাসেও যে বহুস্বর থাকে, তার সবকটিই যে লেখকের নিজের নয়— এ তো স্বতঃসিদ্ধ। প্রশ্ন হলো : লেখকের গলা না-শুনতে পাওয়াই কি কথাসাহিত্যের সবচেয়ে বড় গুণ, বা তার বিচারের প্রথম/প্রধান শর্ত?

এই প্রশ্নটিই আমরা পরখ করে দেখতে চাই অন্য এক লেখকের ক্ষেত্রে। বাখতিন জীবনে তাঁর নামও শোনেন নি। তিনি পরশুরাম (১৮৮০-১৯৬০)। যাঁরা মনে করেন তত্ত্বর মূল্য তত্ত্ব হিসেবেই, প্রয়োগের ক্ষেত্রে তা মিলল কিনা সে-খবর না-জানলেও চলে, তাঁরা যদি এই আলোচনাটি আর না-পড়েন তাহলে অখুশি হব না। একটা তত্ত্ব খাড়া করা হচ্ছে, তার সপক্ষে দু-একটি দৃষ্টান্ত দেওয়া হচ্ছে, কিন্তু তার বাইরে তত্ত্বটি আর কোথাও খাটে কিনা— সেটাও তো যাচাই করা চাই। যদি এমন হয় যে, অন্যান্য লেখকের বেলায়ও তত্ত্বটি খাপ খাচ্ছে, তবেই বলা যায় : হ্যাঁ, তত্ত্বটির মধ্যে অন্তত কিছু সারবস্তু আছে।

পরশুরামের গল্পর ক্ষেত্রে বহুস্বর-তত্ত্ব নিয়ে আলোচনায় যাওয়ার আগে বাখতিন সম্পর্কে কিছু ভুল ধারণা কাটানো দরকার। যেমন, কেউ কেউ মনে করেন সাহিত্য-সমালোচনায় সঙ্গীতের জগৎ থেকে 'পলিফোনি' শব্দটি বাখতিনই প্রথম আমদানি করেন। আদৌ ঠিক নয় কথাটা। উনিশ শতকেই Polyphoner Dialog (বহুস্বর সংলাপ) শব্দদুটি লিখেছিলেন অটো লুডভিগ। ভি. কোমারোভিচ যে বহুস্বর সঙ্গীতের সঙ্গে দস্তয়েভ্‌স্কি-র উপন্যাসের শিল্পগত সমগ্রতার তুলনা করেছিলেন— তার উল্লেখ করেছেন বাখতিন নিজেই। 'কাউন্টারপয়েন্ট' বলতে লেওনিড গ্রোসমান-ও একই ব্যাপার বুঝিয়েছেন।[৫]

দ্বিতীয় কথা, বাখতিন-এর এই তত্ত্বটিকে নামান্তরে ডায়ালজিক (dialogic) বলা হয়।[৬] এটিও অভিনব নয়, তাঁর আগেই কথাটি ব্যবহার করেছেন অটো লুডভিগ। ইংরিজিতে *ডায়ালজিক ইম্যাজিনেশন* নাম দিয়ে বাখতিন-এর একটি প্রবন্ধ-সঙ্কলন বেরিয়েছে (১৯৮১)।[৭] রনে ওয়েলেক দাবি করেছেন : বাখতিন-এর নিজের লেখায় কোথাও 'ডায়ালজিক' আর 'ইম্যাজিনেশন' শব্দদুটি পাশাপাশি বসে নি। 'কল্পনা' কথাটাই তাঁর বইটিতে সর্বসাকুল্যে একবার মাত্র এসেছে।[৮] বাখতিন-এর মৃত্যুর পর তাঁর অনেককটি প্রবন্ধ জড়ো করে *সাহিত্য ও নন্দনতত্ত্বর প্রশ্নাবলি* নামে একটি রুশ সঙ্কলন বেরিয়েছিল। তার থেকে চারটি প্রবন্ধ বেছে নিয়ে ইংরিজি তর্জমা

করা হয়েছে, আর সঙ্কলনটির নাম দেওয়া হয়েছে *ডায়ালজিক ইম্যাজিনেশন*। এই নামকরণের দায়িত্ব বাখতিন-এর নয়, অনুবাদক মাইকেল হলকুইস্ট আর কারিল এমারসন-এর (যদিও বিস্তর লোক মনে করেন ঐ আখ্যাটি বাখতিন-এরই কপিরাইট)।[৯]

তৃতীয় কথা, বাখতিন-এর বহুস্বর-তত্ত্ব কি দস্তয়েভ্স্কি-র কথাসাহিত্যের ক্ষেত্রেও খাপ খায়? *যাঁরা বেশ খুঁটিয়ে দস্তয়েভ্স্কি পড়েছেন তাঁদের কেউ-কেউ কিন্তু মনে করেন : শেক্স্পিয়র-এর নাটকের মতোই, দস্তয়েভ্স্কি-র উপন্যাসেও শুধু অন্যদের গলাই শোনা যায় না, লেখকের মতামতও দিব্যি ধরা পড়ে।*[১০] *শেক্স্পিয়র যে ইআগো-র পক্ষে নন, তাঁর সহানুভূতি ডেসডিমোনা-র দিকে— অন্তরে কালা না-হলে যে কেউই তা বোঝেন।*

শেষ কথা, চের্নিশেভ্স্কি-র মত নিয়ে আলোচনার সময়ে বাখতিন নিজেই বলেছেন : লেখকের কোনো অবস্থান ছাড়াই উপন্যাস হয়— চের্নিশেভ্স্কি কখনোই এমন ভাবেন নি। "সাধারণভাবে এমন উপন্যাস অসম্ভব।"[১১] *এই প্রসঙ্গে ভিনোগ্রাদোভ-এর একটি উক্তি তিনি সমর্থন করেছেন*: উপন্যাসের গড়ন যতই বিষয়মুখী (objective) হোক না কেন, তার সবই আসলে লেখকের বিম্ব (image) গড়ারই এক বিশেষ, কিন্তু সহযুক্ত (correlative) নীতি। বাখতিন লিখেছেন : লেখকের কোনো অবস্থান নেই— এমন নয়, *তাতে এক আমূল পরিবর্তনই হলো আসল কথা*[১২] গ্যয়টে-র প্রমিথিউস-এর মতো দস্তয়েভ্স্কি কিছু বোবা দাস সৃষ্টি করেন না (যেমন করেন জিউস), তাঁর সব চরিত্রই *স্বাধীন* মানুষ, তাদের স্রষ্টার *পাশে* তারা দাঁড়াতে পারে, তাঁর সঙ্গে একমত না-হতে পারে, এমনকি তাঁর বিরুদ্ধে বিদ্রোহও করতে পারে[১৩]— বাখতিন-এর এইসব কথাকে যত গুরুত্ব দেওয়া হয়, চের্নিশেভ্স্কি-র সম্পর্কে তাঁর মন্তব্যগুলি ততটাই চাপা পড়ে যায়।

তলস্তয়-দস্তয়েভ্স্কি-র প্রতিতুলনা (আর কোনো দিক দিয়ে নয়, শুধু একস্বর-বহুস্বর-এর নিরিখে) মেনে নিলেও একটি প্রশ্ন থেকে যায়। সেটি হলো : বহুস্বর থাকলেই কি শিল্পকর্মটি আরও ভালো উতরোয়? *স্রেফ* ডায়ালজিক হওয়ার দৌলতে, দস্তয়েভ্স্কি কি মোনোলজিক তলস্তয়-এর চেয়ে সফল লেখক? বাখতিন নিজেও বোধহয় স্পষ্ট করে সে-কথা বলতে দ্বিধা বোধ করতেন। তবে তাঁর গোটা বই জুড়ে এমন একটি ধারণাই লুকোচুরি খেলে। ১৯৫৪-তেই পার্সি লাবক বলেছিলেন উপন্যাস লেখার দুটি পদ্ধতির কথা : নাটকের মতো করে আর ছবির মতো করে।[১৪] দস্তয়েভ্স্কি আর তলস্তয়-কে এমন দুটি ধারার প্রতিনিধি বলে মানতে কোনো বাধা নেই। কিন্তু এ দু-এর মধ্যে তারতম্য করে, বহুস্বর-কে 'আরও ভালো' বলতে চাইলে আপত্তি উঠবে। বহুস্বর থাকলেই যে গল্প উতরোয় না, বরং লেখকের গলা বলে কিছু না-থাকায় গল্প ঝুলে যায়— পরশুরামের রাজনৈতিক গল্পগুলি তার জাজ্বল্যমান দৃষ্টান্ত। এবার সেই আলোচনায় যাওয়া যাক। ছোটোগল্পর ক্ষেত্রে বাখতিন-কে টানায়, আশা করি, কোনো আপত্তি উঠবে না। তলস্তয়-এর একটি ছোটো গল্প, "তিনটি মৃত্যু", নিয়ে বাখতিন নিজেই লম্বা আলোচনা করেছেন।[১৫]

জাতীয় ও আন্তর্জাতিক রাজনীতি নিয়ে, ১৯৪৫ থেকে ১৯৬০-এর মধ্যে মোট তেরোটি গল্প লিখেছিলেন পরশুরাম।[১৬] প্রতিটি গল্পই চরিত্রবহুল, সংলাপপ্রধান আর— পরিণতিহীন। স্বদেশ তথা বিশ্বর আর্থিক ও নৈতিক উন্নতি, শান্তির সম্ভাব্য উপায় ইত্যাদি নিয়ে অনেক কথা আসে। চরিত্রদের একে অন্যকে দোষ দেন, উদ্ভট সব পরিকল্পনা হাজির করা হয়। সেগুলো সবই চরিত্রদের পক্ষে মানানসই। হনুমান যেমন পরামর্শ দেন : দেশনেতারা খালি হাতে মারপিট করে

হারজিত ঠিক করুন, সেনা দিয়ে লড়ে নয়। ভার্গব পরশুরাম ভাবেন : আবার কুঠার দিয়ে পৃথিবীকে— শুধু নিঃক্ষত্রিয় নয়, যাবতীয় পাপী, অকর্মণ্য ও দুর্বলদের তিনিই খতম করবেন ("গন্ধমাদন-বৈঠক")। কিন্তু কোনো ফয়সালা হয় না। ব্রহ্ম, আল্লা ও গড্-এর সঙ্গে শয়তান কোনো চুক্তিতে আসতে পারে না ("তিন বিধাতা")। গল্পগুলো যেখান থেকে শুরু হয়েছিল, শেষ হয় সেখানেই এসে। দাবাখেলার পরিভাষায় যাকে বলে, 'ব্যাক টু স্কোয়্যার ওয়ান', প্রথম ঘরে ফিরে যাওয়া। গল্পের মধ্যে উজ্জ্বল হয়ে থাকে কিছু অসাধারণ সংলাপ, আর কিছু নয়।

কেন এমন হয়? কারণ একটাই : সমস্যাগুলো লেখক জানেন, কিন্তু সমাধানের ব্যাপারে তাঁর কোনো সুনির্দিষ্ট মত নেই। কংগ্রেসি ও কমিউনিস্ট ভাবাদর্শ, পুঁজিবাদী ও সমাজবাদী রাষ্ট্রব্যবস্থা— সবকিছুরই তিনি সমালোচক। কিন্তু কানাগলি থেকে বেরনোর পথ তাঁর জানা নেই। অন্যকথায়, তাঁর নিজের কিছুই বলার নেই।

বহুস্বর সৃষ্টির জন্যে পরশুরাম বিচিত্র সব জমায়েতের আয়োজন করেছিলেন : সর্বজাতীয় সম্মেলন ("গামানুষ জাতির কথা"), সাত চিরজীবীর বৈঠক ("গন্ধমাদন বৈঠক"), পার্কের আড্ডা ("শোনা কথা"), প্রেতচক্র ("রামরাজ্য"), ঘরোয়া আলাপ ("সিদ্ধিনাথের প্রলাপ") শীর্ষসম্মেলন ("তিন বিধাতা"), ইত্যাদি। লৌকিক-অলৌকিক, মানুষ-অতিমানুষ, ঈশ্বর-শয়তান— কিছুই বাদ পড়ে নি। এত বৈচিত্র্যেও খুশি না-হয়ে তিনি দুটি খ্যাপার কথাও শুনিয়েছেন : অধ্যাপক সিদ্ধিনাথ ভট্টাচার্য আর ড. প্রেমসিন্ধু খাগুারী ("সাড়ে সাত লাখ")।

কিন্তু শেষরক্ষা কিছুতেই হয় না। প্রতিটি গল্পই শেষ হয় বক্তব্যহীন এক শূন্যতায়। অনেকে অনেক প্রস্তাব দেন, কিন্তু কোনোটাই মানার যোগ্য বলে গণ্য হয় না। 'ক'-এর কথা কাটেন 'খ', 'খ'-এর কথা কাটা পড়ে 'গ'-এর হাতে— পড়ে থাকে শুধু গোলামচোর! লেখকের নিজের অবস্থান বলতে যেহেতু কিছু নেই (এক নেতিবাদ ছাড়া), গল্পগুলিও তাই পাঠককে কোথাও পৌঁছে দেয় না, বরং ছেড়ে দেয় খোলা মাঠে। যেমন, দূরদর্শনের বিতর্কর বেলায় তর্কর মীমাংসা হয় না। ব্যাকটু স্কোয়্যার ওয়ান।

এতেও আপত্তির তত কিছু ছিল না— যদি গল্পগুলো উতরোত। তাও তো হয় না। আসলে সমস্যাপ্রধান গল্প-উপন্যাস-নাটক থেকে যদি পরিষ্কার একটি মত বেরিয়ে না-আসে— সে-মত পাঠকের পছন্দ হোক আর না হোক, তবে সংলাপ আর চরিত্রর চমক দিয়ে সে-ঘাটতি পূরণ করা সম্ভব নয়।

বহুস্বর তো পরশুরামের গোড়ার দিকের অনেক গল্পেই ছিল। বংশলোচনবাবুর বৈঠকখানায় কত গলাই তো শোনা যায়। কেমন উদ্ভট সব গল্প বলা হয় সেখানে! বাইরে থেকে পরশুরাম তার বিবরণ দেন, কিন্তু নিজেও অপ্রকাশ্যে হাজির থাকেন বিনোদ উকিলের মধ্যে।[১৭] অলৌকিক গল্পর শেষে সেই অলৌকিক নিয়ে ঠাট্টাও করা হয় "দক্ষিণরায়"-এর ফ্রেম গল্পে। বহুস্বরের মধ্যে লেখকের গোপন স্বরই গল্পটিকে সংহত রূপ দেয়। তাঁর পক্ষপাত যে অলৌকিকের দিকে নয়, লৌকিকের দিকে— পাঠক সেটি ধরতে পারেন অনায়াসে।

অথবা ভাবুন "মহাবিদ্যা" ও "উলটপুরাণ"-এর কথা। দুটি গল্পেই লেখক কোনোভাবেই হাজির থাকেন না, সর্বজ্ঞ বিবরণদাতা হিসেবেও নয়, কোনো মুখপাত্রস্বরূপ চরিত্রর ভেতরেও নয়। প্রথমটি পুরোপুরি সংলাপের আকারে লেখা, দ্বিতীয়টিতে তার সঙ্গে আছে নানা পত্রপত্রিকার টুকরো খবর ও সম্পাদকীয়-র অংশ। অথচ লেখকের মত বলে একটা ব্যাপার আছে বলেই না বিশ্ব সাম্রাজ্যবাদের (ও তার ধামাধরাদের) আসল চেহারাটা অমন স্পষ্ট রঙে-রেখায় ফুটে ওঠে। 'গড্ডলিকা'-'কজ্জলী'-'হনুমানের স্বপ্ন'-র পাশে পরশুরামের পরের

পর্বের অনেক গল্পই ম্লান লাগে। অনেক গলা মিলে শুধু কোলাহলই ওঠে, কোনো নির্দিষ্ট বক্তব্য বেরিয়ে আসে না।

রাজনৈতিক গল্প ছেড়ে অন্য দুটি গল্প দেখা যাক : "ভবতোষ ঠাকুর" আর "দীনেশের ভাগ্য"। "ভবতোষ ঠাকুর"-এ নিখিলবাবুর মধ্যে পুরনো পরশুরামকে চেনা যায়; কিন্তু তিনি এ গল্পের প্রধান কণ্ঠ নন, ভবতোষ ঠাকুর বসে থাকেন অন্য পাল্লায়। 'দীনেশের ভাগ্য"-য় শেষ কথা বলেন গোলোকবিহারী, যিনি জীবনকৃষ্ণর মতো চার্বাকপন্থী নন। এঁরা দুজনেই অল্পবিস্তর অজ্ঞেয়বাদী (agnostic)। অর্থাৎ অন্ধবিশ্বাসের পাশাপাশি আরও দুটি গলা এখানে শোনা যায়— পরিষ্কার নেতিবাদ নয়, কেমন যেন দ্বিধা। "দক্ষিণরায়" আর "জাবালি"-র সঙ্গে কত তফাত!

তাহলে বাখতিন-এর বহুস্বর-তত্ত্ব পরখ করে আমরা এই সিদ্ধান্তে আসতে পারি যে, বহুস্বর থাকা বা না-থাকা কোনো গল্পর আসল গুণ নয়; বরং লেখক নিজে যদি বিভ্রান্ত হন, তবে গল্পও আর দাঁড়ায় না। একস্বরই হোক আর বহুস্বরই হোক, একটি গলাকে প্রধান হতেই হয়। কোনো কোনো ক্ষেত্রে হয়তো লেখকের অভিপ্রায় (intention)-এর উল্‌টোটাই দেখা দেয় (যেমন বালজাক-এর ক্ষেত্রে লক্ষ্য করেছিলেন এমিল জোলা ও এঙ্গেলস)।[১৮] কিন্তু যেটা বেরিয়ে আসে সেটাও একটা নির্দিষ্ট ধারণা, বহু ধারণার টানাটানিতে ত্রিশঙ্কুর অবস্থান নয়।

বাখতিন ধরে নিয়েছিলেন : কথাসাহিত্য থেকে একাধিক মতামত বেরিয়ে আসবে, লেখকের মতামতও তার মধ্যে থাকতে পারে, কিন্তু সেটি (তাঁর নিজের বয়ানে বা কোনো চরিত্রর বকলমে) অন্যদের মতকে ছাপিয়ে যাবে না। দস্তয়েভ্‌স্কি-র উপন্যাসেই তিনি খুঁজে পেলেন (বা ভাবলেন তিনি খুঁজে পেয়েছেন) তাঁর এই প্রত্যাশার সার্থক রূপায়ণ।

আসলে, বহুস্বর সঙ্গীতের রূপকটি সাহিত্যে কোনো কাজে দেয় না— বক্তব্যশূন্য আঙ্গিক-সর্বস্বতার সপক্ষে একটা ভুল তাত্ত্বিক ভিত্তি জোগান দেওয়াই এর একমাত্র ভূমিকা। সার্থক শব্দ আর সঙ্গীতের স্বর এক ব্যাপার নয়। শব্দ থাকলে অর্থ থাকবেই— পরস্পরবিরোধী অর্থ হলে বাকি সব বাতিল হয়ে একটি পড়ে থাকবে— অথবা সবগুলিই বাতিল হয়ে যাবে।

তাই মনে হয় : বাখতিন-এর বহুস্বরতত্ত্ব-র আদর্শ দৃষ্টান্ত আবোল তাবোল (nonsense) -মার্কা গল্প। লিউইস ক্যারল-এর দুটি অ্যালিস-কাহিনি ('আজব দেশে অ্যালিস' আর 'আয়নার মধ্যে দিয়ে') ও সুকুমার রায়-এর 'হ য ব র ল'-র কথা ভাবুন। কত না চরিত্র একের পর এক হাজির হয়— প্রত্যেকেই বাকি সকলের থেকে আলাদা, কারু সঙ্গে কারু ভাবনার মিল নেই। ক্যারল ও সুকুমার রায় কিন্তু সকলকেই সমান গুরুত্ব দেন। তবু এর ভেতর দিয়েই খোঁচা মারা হয় বিচারব্যবস্থাকে,[১৯] খোরাক হয় নানা ব্যক্তি ও প্রতিষ্ঠান। আবার এ-ও দেখবার: নানা বয়েসের নানা পাঠক-পাঠিকা নিজের নিজের মতো করে এই সব বই পড়েন ও বোঝেন: সকলের বোঝা কখনোই এক রকমের হয় না। সব ব্যঙ্গ, সব প্যারডি সকলে ধরতেও পারেন না।[২০]

মুশকিল হলো : তিনটি বই-ই বাচ্চাদের জন্যে লেখা, মজা দেওয়াই সেগুলির একমাত্র উদ্দেশ্য।[২১] তার মধ্যেও নিশ্চয়ই বয়স্ক লোকে বিস্তর সূক্ষ্ম তত্ত্ব আবিষ্কার করতে পারেন (ক্যারল নিয়ে নাকি তিনশর ওপর ওয়েবসাইট আছে!)। কিন্তু ঘটনা হচ্ছে : বই তিনটি বক্তব্যপ্রধান নয়, নিছক কৌতুকই সেগুলির শেষ কথা। তার জন্যেই ওগুলি থেকে যে যার

মর্জিমাফিক বক্তব্য আবিষ্কার (বা উদ্ভাবন) করতে পারেন। কিন্তু লেখক যেখানে একটি সংহত বক্তব্য হাজির করতে চান সেখানে, হাজার সাবধান হলেও, একটি গলা অন্য সবার চেয়ে চড়া হবেই। আর লেখক যদি নিজেই না জানেন তিনি ঠিক কী বলতে চান, তাহলে পরস্পরবিরোধী কথাগুলো পাশাপাশি সহাবস্থান করবে, কোনো ফয়সালাই হবে না— যেমন হয় না পরশুরামের রাজনৈতিক গল্পে।

টীকা

১. এ বিষয়ে বাখতিন-এর মূল বক্তব্য পাওয়া যাবে দস্তয়েভ্স্কি বিষয়ে তাঁর বইটিতে (১৯২৯)। ইংরিজিতে এর দুটি অনুবাদ পাওয়া যায়। আমি ব্যবহার করেছি *Problems of Dostoevsky's Poetics*, ed. and trans. Caryl Emerson, Manchester : Manchester University Press, 1984। মিনেসোটা বিশ্ববিদ্যালয় প্রেস থেকে একই বছরে এর মার্কিন সংস্করণ বেরিয়েছিল (বইটিকে পরে সংক্ষেপে PDP বলে উল্লেখ করা হবে)।

যাঁদের পক্ষে বইটি জোগাড় করা সহজ নয়, তাঁরা Pam Morris (ed.), *The Bakhtin Reader : Selected Writings of Bakhtin. Medvedev, Voloshinov*, London : Edward Arnold, 1994 দেখতে পারেন। এ বিষয়ে বিস্তৃত আলোচনা আছে Sue Vice, *Introducing Bakhtin*, Manchester : Manchester University Press, 1997-এ। খুব সংক্ষেপে বিষয়টি নিয়ে চমৎকার লিখেছেন M. H. Abrams, *A Glossary of Literary Terms*, Bangalore : Prism Books, 1993, pp. 230-32।

২. PDP, pp. 65-67. বাখতিন-এর বইটির প্রথম (১৯২৯) রুশ সংস্করণের এক অনুকূল সমালোচনায় সোভিয়েত যুক্তরাষ্ট্রের প্রথম শিক্ষামন্ত্রী, আনাতোলি ভাসিলিয়েভিচ লুনাচারস্কি (১৮৭৩-১৯৩৩) -ও শেকস্‌পিয়র ও বালজাক-এর কথা তোলেন। Anatoly Lunacharsky, 'Dostoyevsky's "Plurality of Voices", *On Literature and Art*, Moscow : Progress Publishers. 1965, pp. 109-115 দ্র. (১৯৬৭-তে এই প্রবন্ধটি প্রথম পড়ার সময়ে বাখতিন সম্পর্কে অবশ্য কিছুই জানতুম না) লেখাটির অতিসংক্ষিপ্ত সারানুবাদ পাওয়া যাবে *এবং এই সময়*, বাখতিন বিশেষ সংখ্যা, গ্রীষ্ম ১৪০৩, পৃ. ১-৮-এ। প্রসঙ্গত বলে রাখি, *PDP*, পৃ. ৪৫ টী ৪২-এ ইংরিজি তর্জমার ১৯৭৩ সংস্করণের উল্লেখ করা হয়েছে। কেউ যে না মনে করেন ঐটিই তার প্রথম সংস্করণ।

৩. Letter to George and Thomas Keats, 21, 27 (?) December, 1817; Letter to Richard Woodhouse, 27 October 1819. Robert Gittings (ed.), *Letters of John Keats. A Selection*. Oxford : Oxford University Press, 1975, pp. 43, 157-58. এ বিষয়ে বিস্তৃত আলোচনার জন্যে আমার 'Beyond Negative Capability', *Rabindra Bharati Patrika*, Annual No.1996-97, pp. 9-18 দ্র.।

৪. Engels to Margaret Harkness, Beginning of April, 1888, Marx-Engels, *On Literature and Art*, Moscow : Progress Publishers, 1976, p. 91; Engels to Minna Kautsky, 26 November, 1885, ibid., p. 88.

৫. René Wellek, *A History of Modern Criticism*, (1750-1950). Vol. 7, New Haven : Yale University Press, 1991, p. 357; *PDP*, p. 21.

৬. Chris Baldick, *The Concise Oxford Dictionary of Literary Terms*. Oxford and New York : Oxford University Press, 1990, p. 173 : 'it (sc. polyphonic) is equivalent to dialogic.' এছাড়া ঐ বই-এর 'dialogic or dialogical', p. 56 দ্র.। এর সঙ্গে এই আলোচনার শেষে 'পরিশিষ্ট' দ্র.।

৭. *The Dialogic Imagination : Four Essays,* trans. Caryl Emerson and Michael Holquist, ed. Michalel Holquist, Austin, Texas : University of Texas Press, 1981. আমি দেখেছি এর পেপারব্যাক সংস্করণ (একাদশ মুদ্রণ, ১৯৯৮)।

৮. ওয়েলেক (টী. ৫), পৃ. ৩৭০ : 'Nowhere, by the way, does Bakhtin use the phrase "dialogic imagination"— I find only one reference to imagination (348), and that in a totally different context concerning Socrates.'

৯. ওয়েলেক-এর রচনাটিতে (টী. ৫) Caryl নামটি প্রত্যেকবারই ভুল করে Carol ছাপা হয়েছে (পৃ. ৩৫৭, ৩৬৪, ৪৪০)।

১০. এ-বিষয়ে বিস্তৃত আলোচনা করেছেন ওয়েলেক। টী. ৫, পৃ. ৩৫৭-৬১ ও পৃ. ৪৪০ টী. ৩ দ্র.। মনে হয়, বাখতিন কখনোই দস্তয়েভ্স্কি-র নোটবইগুলির সন্ধান পান নি। তাহলেই তিনি দেখতে পেতেন : লেখক কীভাবে তাঁর চরিত্রদের ভাব, ভাষা ইত্যাদি সবকিছুই নিয়ন্ত্রণ করেছেন।

১১. *PDP,* p. 67. পরের উদ্ধৃতিও একই পাতা থেকে। বাঁকা হরফ যোগ করা হয়েছে।

১২. ঐ। মূলেই বাঁকা হরফ আছে।

১৩. ঐ, পৃ. ৬। মূলেই বাঁকা হরফ আছে।

জিউস আর প্রমিথিউস-এর মধ্যে বাখতিন যে-তফাত করেছেন, সে-প্রসঙ্গে গ্যয়টে-র বিখ্যাত ওড-টি মনে পড়ে। জিউস-কে প্রতিস্পর্ধা (চ্যালেন্জ্) জানিয়ে প্রমিথিউস বলেন :

এখানে বসে আছি আমি, গড়ছি মানুষকে
আমার (নিজের) প্রতিচ্ছবিতে।
এ জাতি আমারই মতো,
দুঃখ পাবে, কাঁদবে,
আনন্দ করবে, খুশি হবে,
আর আমার মতোই
তোমার সম্পর্কে কোনো শ্রদ্ধাই (তার) থাকবে না।

অর্থাৎ গ্যয়টে-র প্রমিথিউস-ও, জিউস-এর মতোই, নিজের আদলেই মানুষ গড়েন— জিউস-এর থেকে তা আলাদা হলেও ব্যাপারটা মোনোলোজিক, প্রতিটি মানুষই প্রমিথিউস-এর প্রতিচ্ছবি। Ian Kott, *The Eating of the Gods : An Interpretation of Greek Tragedy,* London : Eyre Methuen, 1974, p. 280 দ্র.। গ্যয়টে-র কবিতাটি ("Prometheus") *The Penguin Book of German Verse,* ed. Leonard Forster, Harmondsworth : Penguin Books, 1957, pp. 201-03-এ পাওয়া যাবে। কবিতাটি মার্কস-এর মুখস্থ ছিল, জানিয়েছেন আয়ান কট।

১৪. 'The dramatic and the pictorial', 'Scenic and Panoramic'. Perci Lubbock, *The Craft of Fiction* (1920), Bombay : B. I. Publication, 1979, pp. 71-72 দ্র.। ওয়েলেক-ও লাবক-এর কথা তুলেছেন (টী. ৫, পৃ. ৩৫৭), যদিও বিস্তৃত তথ্য নির্দেশ করেন নি।

১৫. PDP, pp. 69-73.

১৬. শারদীয় *অর্কিড,* ১৪০৬ ও ১৪০৭-এ যথাক্রমে পৃ. ৬৮-৮৭ ও পৃ. ১২৯-৩৩-এ এ বিষয়ে বিস্তৃত আলোচনা করেছি।

১৭. *অর্কিড,* বৈশাখ ১৪০৬, পৃ. ২৯-৩৫ ও গ্রীষ্ম সংখ্যা, ১৪০৭, পৃ. ২৮-৩৮-এ বিনোদ উকিল ও চাটুজ্যেমশায় সম্পর্কে আমার আলোচনা-দুটি দ্র.।

১৮. René, Wellek, *A History of Modern Criticism (1750-1950),* Vol. 4 (1965), Cambridge : Cambridge University Press, 1983, pp. 17-18; মার্কস-এঙ্গেলস (টী. ৮), পৃ. ৯১-৯২।

১৯. খুব ছোটোবেলায় পড়ার সময়েও বোঝা যায় : *আজব দেশে অ্যালিস* আর *হ য ব র ল*-য় যথাক্রমে রাজা ও পেঁচা, বিচারের প্রহসন করে, আইনকানুন ব্যাপারটাকেই খেলো করে দেয়।

২০. ক্যারল-এর লেখায় অনেক প্যারডি থাকে। তার কিছু কিছু অনেকেই ধরতে পারেন। কিন্তু ধরতে না-পারলে খুবই মজাদার অবস্থা তৈরি হয়। যেমন, "You're old, Father William" কবিতাটি সম্পর্কে জনৈক বিদ্বান লিখেছেন : 'এই বক্তব্যের মধ্যে তথা William-এর প্রচলিত আচার ও নিয়ম না-মানার মধ্যে ছিল ট্র্যাডিশনের জগদ্দল পাথর ভাঙার প্রয়াস। সামাজিক অব্যবস্থার গড্ডালিকা [তথৈব] প্রবাহকে অস্বীকার করার সাহস' ("শিশু সাহিত্যের ধারায় সুকুমার রায়", *সুকুমার পরিক্রমা*, কলকাতা : পশ্চিমবঙ্গ বাংলা আকাদেমি, ১৯৮৯, পৃ.১৬২-৬৩)। লেখকের বোধহয় জানা ছিল না: এটি আদৌ কোনো এক উইলিয়ম-এর বিদ্রোহী কণ্ঠস্বর নয়, রবার্ট সাদি-র একটি কবিতা, "The old man's comforts and how he gained them"-এর ব্যঙ্গরূপ (Martin Gardner (ed.), *The Annotated Alice*, Harmondsworth : Penguin Books, 1970, pp. 69-71 দ্র.)। একজন অনামা কবিও সাদি-র ঐ কবিতাটির আরও একটি ব্যঙ্গরূপ দিয়েছেন (*A Nonsense Anthology* (1902), collected by Carolyn Wells, New York : Dover Publications, 1958, pp. 22-23)।

২১. অ্যালিস-এর প্রথম গল্পটি আরও বাচ্চাদের (যাদের বয়স পাঁচেরও কম) কাছে হাজির করার জন্যে ক্যারল তার আর একটি শিশুসংস্করণ বার করেছিলেন : *The Nursery 'Alice'*, London : Macmillan, 1890. পরে মার্টিন গার্ডনার-এর নতুন ভূমিকা সমেত এটির যথাযথ পুনর্মুদ্রণ হয়েছে (New York : Dover Publications, 1966)। কথার চেয়ে ছবির ওপরেই এই বইটির জোর বেশি।

পরিশিষ্ট

Dialogic শব্দটির এক উদ্ভট বাঙলা করা হয়েছে : 'দ্বিবাচনিক'। গ্রিক ভাষায় *dia* মানে 'দুই' নয়, 'মধ্যে দিয়ে', through। *Dialegomai* মানে হলো 'কথাবার্তা বলা'। সেটা দুজনে না-হয়ে পাঁচ-দশজনের হলেও ক্ষতি নেই : "... a polyphonic novel is one in which *several different voices or points of view interact on more or less equal terms*"(Chris Baldick (টী. ৬), পৃ. ১৭৩; বাঁকা হরফ যোগ করা হয়েছে)। বাখতিন যদি দুটি মাত্র স্বরের কথা বলতেন তবে তার তর্জমা হতো duologic। Duologue শব্দটি ছোটোখাটো অভিধানেও (যেমন, *The Concise Oxford Dictionary of Current English*, 1995) পাওয়া যায়।

কৃতজ্ঞতা স্বীকার : রিঙ্কু চৌধুরী, অনুপ কুণ্ডু, সিদ্ধার্থ দত্ত, শুভেন্দু সরকার।

মিখাইল বাখতিন তত্ত্বের সীমায় প্রয়োগের আকাশে

তাপসী বন্দ্যোপাধ্যায়

যুগটা উদারিকরণের। নিবাস এক অগাধ ভুবনগ্রামে। ভাবনার ডানা যত্রতত্র বিহারী। স্থানিক-দূরত্বকে বেঁধে ফেলি হাতের মুঠোয়, আবার সময় পলায়নপর সেই বন্ধনী খুলে। জীবনের এই আকাশপাতাল অমিল অথবা মিল্‌মিশ্‌ নিয়ত ধরা দিচ্ছে সৃষ্টির বিচিত্র পথে। আর সাহিত্যের ক্ষেত্রটি এপথে সর্বাধিক প্রশস্ত ও ফলন্ত। এই উত্তর-আধুনিক কালে সাহিত্যের মূল্যায়নে নানা 'বাঁধি বোল' আর 'বাঁধা ওজন'-এর বাড়-বাড়ন্ত। ঔপনিবেশিকতার বাঁধনমুক্ত এইসব সাহিত্যের মূল্যায়নকর্তারা আসলে নানা তত্ত্বকথার আধারে প্রত্যাশা করেছেন অবাধ স্বাধীনতা। নির্মাণ থেকে বিনির্মাণ কিংবা পুনর্নির্মাণ এসবই এখন সাহিত্যের উপভোক্তার কুক্ষিগত। এমনকি সাহিত্যের আস্বাদনে স্রষ্টার ওপর নির্ভরতারও দায়মুক্ত আজ পাঠক। একালের পাঠক প্রবল দাপটে সৃষ্টিকর্তার অধিকারকে অস্বীকার করে পুনঃপাঠ প্রক্রিয়ায় নিমগ্ন হয়। কালান্তরে পাঠক পুনঃপাঠের সূত্রে আবিষ্কার করে নতুন তাৎপর্য। সাহিত্যের সত্য আর অনড় থাকে না। পর্বে-পর্বান্তরে ভিন্ন বর্গীয় পর্যবেক্ষকের কাছে জীবনের পাঠ বদলে যায় বারবার। যাদের কথা এতদিন ছিল আধিপত্যবাদীদের আড়ালে সেই অপাংক্তেয়জনেদের ভাষ্য এবার নতুন পাঠ-পরিক্রমাকে নিয়ন্ত্রণ করতে শুরু করেছে। অন্তেবাসীদের কণ্ঠস্বর প্রকট হয়ে উঠছে এখনকার সাহিত্য-বিষয়ক অভিসন্দর্ভে। উত্তর-ঔপনিবেশিক এই ধারাবাহিকতায় এভাবেই আশির দশক চিহ্নিত হল 'বাখতিন দশক' হিসেবে।

যদিও মিখাইল মিখাইলোভিচ বাখতিন— এই রাশিয়ান ভাষাতাত্ত্বিক, নীতিতাত্ত্বিক ও উপন্যাসের বহুমুখী শৈলীবিচারকের জন্ম ১৮৯৫-তে। দস্তয়েভস্কির রচনাকে অবলম্বন করে তিনি উপন্যাস পাঠের নতুন অভিজ্ঞতা আবিষ্কার করলেন ১৯২০-তে। জীবনের ও রাষ্ট্রের এবং রাষ্ট্রনীতির নানা উচ্চাবচতা পেরিয়ে ৬০-এর দশকে তাঁর পুরোনো লেখাগুলো আবিষ্কৃত হল। তবে ১৯৭৫-এ তাঁর মৃত্যুর পরে সেইসব রচনা রাশিয়ান ভাষায় এবং ইংরেজিতে প্রকাশ পেতে থাকে। ১৯২০ থেকে ১৯৬৫-র জীবনের বিভিন্ন পর্বে একাধিক গবেষণা সূত্রে মিখাইল বাখতিন সাহিত্য পাঠের ভাষা ও পদ্ধতিতে একাধিক নতুন বাক্‌ভঙ্গী ও শৈলী যোগ করলেন। বিশেষত

তাঁরই দৌলতে উত্তর-আধুনিক যুগে উপন্যাস পড়া কিংবা লেখার ভাষায় এল কতিপয় নতুন শব্দ,— ডায়ালগিজম্, হেটেরোগ্লসিয়া, ক্রনোটোপ, পলিফনি এবং কার্নিভ্যাল। একবিংশ শতকের একটি দশক প্রায় পেরিয়ে এসে এইসব শব্দগুলি এখন বহুচর্চিত ও বহুবিতর্কিত। তাই বলে বহু প্রয়োগে জীর্ণ হয়েও যায়নি। তবে তুল্যমূল্য বিচারে না গিয়েও অভিজ্ঞতার নিরিখে একথা সম্ভবত সর্বৈব স্বীকৃত যে, ধ্রুপদি সাহিত্যতত্ত্বগুলি বহুল প্রয়োগের মধ্যে দিয়েই চিরনতুন হয়ে আছে। এখনও নতুনতর ব্যাখ্যার অপেক্ষায় অম্লান। অথচ ভারতীয় অলঙ্কারশাস্ত্রের তত্ত্বকথা কেবল ব্যবহারের অভাবে সিন্দুকধৃত রত্নতুল্য সসম্মানে সাহিত্যের ব্যবহারিক জগত থেকে বর্জিত। তাই প্রথম আধুনিক বাঙালি সাহিত্যসমালোচক বঙ্কিমচন্দ্রকেও ভবভূতির রচনা বিচারকালে আলঙ্কারিকগণকে দূর হতে নমস্কার জানাতে দেখা যায়। এমনকি রবীন্দ্রনাথও অগণন 'রস'-এর কথা বললেও রসতত্ত্বের কথা তেমন করে বলেন না। একারণেই বলা যে, সাহিত্যতত্ত্বের প্রাণভোমরাটি গচ্ছিত তার প্রয়োগ-বহুলতায়। আরও কি, যদি তাত্ত্বিকের আদি নির্দেশকে অপহার না করে তার বিবিধ কৌণিকতা, ভিন্ন ভিন্ন প্রয়োগমাত্রা আবিষ্কার করা যায় তবে বহু বছরের সাহিত্যসূত্রগুলো আরও শানানো, আরও যেন উপযুক্ত হয়ে ওঠে। একথাও মনে হয় যে, সংস্কৃতির আদানপ্রদানের মতোই অন্য দেশের, অন্য ভাষার, অন্য সামাজিকতার সাহিত্যতত্ত্ব ভিন্ন পরিমণ্ডলে যখন গৃহীত ও প্রযুক্ত হয় তখন সেখানেও একপ্রকার এ্যাকালচারেশন ঘটে থাকে। চল্লিশ-পঞ্চাশ-ষাটের দশকের রাশিয়াব সাহিত্যতাত্ত্বিক বাখতিনের তত্ত্বকথাকে যখন একবিংশ শতকে তৃতীয় বিশ্বের কোনো গণতান্ত্রিক রাষ্ট্রের বঙ্গভাষী পাঠক তাঁর পাঠসীমায় প্রয়োগের চেষ্টা করেন তখন তা বাখতিনের নির্দেশের হুবহু প্রতিবিম্ব নাও হতে পারে। কিন্তু তাতে বোধহয় মহাভারত অশুদ্ধ হয় না। কেবল সাধ্য আর সাধনের যুগলবন্দিতে ফাঁক না থাকলেই হল। সুতরাং সাধ্যের ক্ষেত্রটিকে প্রথমে যথোপযুক্ততায় তুলে ধরা আবশ্যক। অর্থাৎ বাখতিন-তত্ত্বের আদত চেহারাটি কেমন তার একটি রেখা-অবয়ব দেখে নেওয়া সঙ্গত।

স্বভাবতই তত্ত্বের পরিচিতি দেওয়ার পরিপ্রেক্ষিতে তত্ত্বগুলির উৎস তথা মূল রচনাগুলির উল্লেখও প্রয়োজনীয় হয়ে পড়ে। সেইসূত্রে আমরা, পৃথিবীর যে-কোনো প্রান্তের বাখতিন-পাঠকরাই আজ অন্তর্জাল মাধ্যমে জানতে পারি—

- সম্ভবত ১৯২০-র মধ্যেই প্রথম বিশ্বযুদ্ধের ঘাত-প্রতিঘাতের ভিতরেও রক্ষা পেয়েছিল বাখতিনের প্রথম রচনা— "Author and hero in aesthetic activity"।
- তবে ১৯১৯—১৯২১-এর মধ্যে রচিত যে পাণ্ডুলিপিটি পরে ১৯৮৬-তে প্রথম প্রকাশিত হয় সেটি ছিল দর্শন বিষয়ক রচনা। লেখাটির শীর্ষনাম "Toward a Philosophy of the Act"। নীতিবাদ ও সৌন্দর্যতত্ত্বের সম্পর্কসন্ধানী কান্ট-বলয়ের এক তরুণ দর্শন-আলোচকের পরিচয় পাওয়া যায় এই লেখাটির মধ্যে।
- উপন্যাস সম্পর্কিত যে কাজটির জন্য বাখতিনের তত্ত্ব সব থেকে বেশি আলোচিত হয়ে থাকে সেটি শুরু হয়েছিল ১৯২০ নাগাদ কিন্তু ১৯২৯-এ যখন সম্পূর্ণতা পেল তখন তার শিরোনাম হল *Problem of Dostoevsky's Poetics* । এই আলোচনাটিকেই বাখতিনের সারাজীবনের গবেষণাকর্মের মধ্যমণি অথবা ভিত্তিস্থানীয় বলা যেতে পারে। এই লেখাটির মধ্যে বাখতিন তিনটি তত্ত্বকে তুলে ধরেছিলেন—

  এক, ব্যক্তিসত্তার অসম্পূর্ণতা বিষয়ক ধারণা।

  দুই, একক ব্যক্তিসত্তার সঙ্গে অন্যান্য সামাজিকসত্তার সম্পর্ক বিষয়ক ধারণা।

  আর তিন, উপন্যাসের Polyphony বা বহুস্বরের ধারণা।

- ১৯৩০ সালটা ছিল বাখতিন প্রতিভার সব থেকে ফলবতী বছর। এই সময়ে তিনি "Rabelais and Folk Culture of the Middle Ages and Renaissance" বিষয়ক একটি গবেষণা পত্র প্রস্তুত করেন। যার জন্য তাঁকে ১৯৫২-তে ক্যান্ডিটেড ডিগ্রীও দেওয়া হয়। কিন্তু গ্রন্থাকারে লেখাটি ১৯৬৫-তে যখন প্রথম প্রকাশের সুযোগ পেল, তখন নতুন শিরোনাম দেওয়া হল— *Rabelais and His World*। এই লেখাটিতে বাখতিন পৃথিবীর কথাসাহিত্যে আদি মাইলফলকতুল্য রাবলের গাঁর্গাতুয়া ও পাঁতাগ্রুয়েলের গল্পের আলোচনার মধ্যে দিয়ে দুটি নতুন তত্ত্বকথা শুনিয়েছিলেন,—
  এক, কার্নিভাল সম্পর্কিত তত্ত্ব।
  দুই, Grotesque বা হাস্যময় বীভৎস রস সম্পর্কিত আলোচনা।
- *The Dialogic Imagination* বাখতিনের ভাষা ও উপন্যাস বিষয়ক চারটি প্রবন্ধের সংকলন। প্রবন্ধ চারটি হল, "Epic and Novel", "From the Prehistory of Novelistic Discourse", "Forms of Time and of the Chronotope in the Novel" এবং "Discourse in the Novel"। এই সংকলন গ্রন্থটিতে উপন্যাস সম্পর্কে বাখতিনের অত্যন্ত জরুরী তিনটি তত্ত্ব আলোচিত—
  এক, হেটেরোগ্লাসিয়া।
  দুই, ডায়ালগিজম।
  এবং তিন, ক্রনোটোপ-এর তত্ত্ব।
- *In speech Genres and Other Late Essays* গ্রন্থে প্রধানত সংস্কৃতি এবং ভাষাতত্ত্বের সম্পর্ক নিয়ে আলোচনা করেছেন। যার সঙ্গে বিজ্ঞান প্রবাহের যোগসূত্রও খুঁজেছেন। এই বইটিতেই বাখতিন ভাষাতত্ত্ব ও ব্যবহারিক জীবনে ভাষার প্রয়োগের পারস্পরিক ক্রিয়া-প্রতিক্রিয়াকে ব্যাখ্যা করেছেন। বইটির ছয়টি রচনার মধ্যে সব থেকে গুরুত্বপূর্ণ লেখা— "The Problem of Speech Genre"।

আমাদের উপন্যাস পড়া, লেখা কিংবা সমালোচনার শিক্ষা গড়ে উঠেছে প্রধানত ইংরেজি উপন্যাসের ধারাকে অনুসরণ করে। এমনকি আমাদের জ্ঞানচেতনায় উপন্যাসের ইতিহাস শুরু হয়েছে অষ্টাদশ শতাব্দীতে ফিল্ডিং-রিচার্ডসনের রচনার মধ্যে দিয়ে। বাখতিন উপন্যাস চর্চার শুরুর বিন্দুটি আরও পিছনের দিকে সরিয়ে নিয়ে গিয়েছেন। তিনি উপন্যাসের চর্চাকে এমন একটি প্রক্রিয়া হিসেবে দেখেছেন, যার কালসীমা প্রাচীন মধ্যযুগ থেকে আধুনিক যুগ পর্যন্ত বিস্তৃত। বাখতিনের কাছে উপন্যাস সমাজের বহু কণ্ঠস্বর ও ভাবাদর্শের ঘাতপ্রতিঘাতের একটা জটিল নক্‌শা। সেই বহু স্বরসঙ্গতির আড়াল থেকে লেখকের আত্মসচেতন স্বর ষোড়শ-সপ্তদশ শতকে উপন্যাসের জন্ম দিয়েছিল বলে মনে করেন বাখতিন।

স্বর বা সংলাপিকতা— যাকে বাখতিনের অনুবাদক বলেছেন ডায়ালগিজম-ই হল গদ্যচর্চা তথা উপন্যাসের গতিশক্তি। ডায়ালগিজম এখানে নিতান্ত উক্তি-প্রত্যুক্তিকে বোঝায় না। সমাজের বিভিন্ন স্তরের কণ্ঠস্বরের অভিঘাতকে এখানে বোঝানো হয়েছে। একই কালসীমার অন্তর্ভুক্ত একের সঙ্গে অপরের স্বরের বিনিময়কেও বোঝানো হচ্ছে না। একটি সময়ের সঙ্গে অন্য বা পরবর্তী সময়ের অথবা পরিসরের অন্যের সঙ্গেও মোকাবিলাকে বোঝানো হয়েছে। এই অনবরত স্বরের দ্বন্দ্ব বা ডায়ালগিজম্ উপন্যাসের প্রাণশক্তি।

ডায়ালগিজম্-এরই দুটি ক্ষেত্র— পলিফনি আর হেটেরোগ্লসিয়া। পলিফনির প্রচলিত বঙ্গীয় রূপান্তর কণ্ঠস্বরের বহুত্ব বা বহুস্বর। দস্তয়েভস্কির উপন্যাস বিশ্লেষণ করতে গিয়ে বাখতিন এই

বহুস্বরসঙ্গতিকে লক্ষ ও ব্যাখ্যা করেন। ঔপনিবেশিক পর্বের সব উপন্যাসই একপক্ষে একস্বরবিশিষ্ট। লেখকের কণ্ঠই প্রধান। তিনিই চালিকাশক্তি সব চরিত্রের। বাখতিন তাঁর বহুস্বরের তত্ত্বে একথাই প্রতিষ্ঠিত করতে চেয়েছেন যে উপন্যাসের প্রতিটি চরিত্র তাদের নিজস্ব অবস্থান, শ্রেণী এবং বর্গ থেকে বক্তব্য রাখবে। তাদের বক্তব্য স্বাধীন, স্বয়ম্ভর। লেখকের ধার করা বা ছদ্মবেশী হবে না। এমনকি অন্তিম বিশ্লেষণেও লেখকের বক্তব্য প্রাধান্য নাও পেতে পারে। তবে সমস্ত কণ্ঠস্বরের মধ্যে এক বিশেষ কণ্ঠস্বরের উপস্থিতি থাকতে পারে যা কোন উচ্চতর জীবনসত্যের আভাস দেবে। কিন্তু সেই কণ্ঠস্বর যে লেখকেরই হবে এমন বাধ্যবাধকতা নেই, এবং লেখকের মধ্যে এমন জাহির করার কোনো প্রয়াসও থাকবে না তবে যদি তেমন কোনো বিশিষ্ট ভঙ্গী থাকে তবে তার মধ্যে পাঠক স্রষ্টার হৃদ্‌স্পন্দনটুকু ঠিকই অনুভব করতে পারবে। জীবনের এই বিচিত্র অবস্থান থেকে উঠে আসা বিভিন্ন স্বর বা মতাদর্শের সমন্বয় বা ঐকতানকে বাখতিন পলিফনিক ডিসকোর্স বলেছিলেন। বস্তুত ভাষাবিজ্ঞানে ডিসকোর্স বলতে বাক্যের গণ্ডির বাইরে ভাষার যে সংগঠিত ব্যবহারকে বোঝায়, বাখতিন তাকেই এখানে ব্যাপক অর্থে ব্যবহার করেছেন।

বাখতিনের তত্ত্ববিশ্বে পলিফনির পাশাপাশি উচ্চারিত হয়েছে হেটেরোগ্লসিয়া বা দ্বিবাচনিকতার সূত্র। দ্বিবাচনিকতার দর্শন অনুযায়ী ভিন্নগোত্রীয় কোনো অস্তিত্বের প্রেক্ষিতে রেখে না দেখলে কিছুই সম্পূর্ণভাবে পর্যবেক্ষণ করা সম্ভব হয় না। অর্থাৎ পর্যবেক্ষণের প্রাথমিক শর্তই হল, প্রেক্ষিত আর অপরতার উপলব্ধি। জগৎ ও জীবনকে দেখা কখনো একটি অবস্থান থেকে সম্পূর্ণ হয় না। সর্বদাই প্রয়োজন বিপরীত মেরুর অবস্থান। জীবন ও সমাজের সমস্ত উপাদানেরই দুই প্রান্তীয় অবস্থান রয়েছে। দুই প্রান্তের দর্শন বা ভাষ্যই এই দ্বিবাচনিকতাকে প্রতিষ্ঠা দেয়। উপন্যাসে যেমন আধিপত্যবাদী বর্গের উল্টোদিকে থাকে অপরসত্তা। তার অবস্থান ভিন্নবর্গে। দুই বর্গের সংঘাতই উপন্যাস পাঠে পাঠককে সম্ভাব্য পরিণতির দিকে চালিত করে। লেখক যে-কোনো উপন্যাসের আদি প্রস্তাবক মাত্র। তাঁরও একটি অপরাশক্তি থাকে। তা হল পাঠক। পাঠকের অবস্থান ভিন্ন বর্গে, আলাদা সময়ে এমনকি কালান্তরেও হতে পারে। কালান্তরের এই পাঠক বা গ্রহীতাকেই পুনঃপাঠের দায়িত্ব নিতে হয়। যে পুনঃপাঠের সূত্রে আদি প্রস্তাবনাটির সমস্ত মানবিক নির্মিতি অর্থাৎ ভাষা-সমাজ-সংস্কৃতি নতুন তাৎপর্য খুঁজে পায়। সুতরাং দ্বিবাচনিকতা উপন্যাসের ভেতরে এবং বাইরে দুভাবেই থাকে। এভাবেই ক্রমশ নিম্নবর্গ, নারীবাদ প্রভৃতি অপরাশক্তির বাচিকতা বা অপরসত্তার অভিব্যক্তি উপন্যাসে ঠাঁই পাচ্ছে এবং আগেকার রচনায় যেখানে যেখানে তা আছে, বাখতিনের সূত্রাধারে তা নতুন করে ব্যাখ্যাত হচ্ছে।

হেটেরোগ্লসিয়া সূত্রেই এসে পড়ে বাখতিনের কার্নিভাল তত্ত্বের কথা। রাবলে ও তাঁর জগৎ সম্পর্কিত আলোচনায় বাখতিন কার্নিভাল প্রসঙ্গকে বিস্তারিত করেন। য়ুরোপীয় লোকসংস্কৃতির একটি বিশেষ উপাদান এই কার্নিভাল লোকউৎসব। ধর্মীয় এবং ঋতুকালীন উৎসবের অঙ্গ ছিল কার্নিভাল। সুদীর্ঘ শোভাযাত্রা এবং বিভিন্ন পৌরাণিক দেবতা বা ঘটনার রূপক এখানে প্রদর্শিত হত, যার মাধ্যমে হাস্য উদ্রেকের উদ্দেশ্যও থাকত। হাস্যরসের সূত্রে যে ধরনের রঙ্গব্যঙ্গ, অদ্ভুত-অসম্ভব এবং বীভৎসতামিশ্রিত রঙ্গ পরিবেশিত হত তাকেই বাখতিনের শিল্পতত্ত্বে grotesque বলা হয়েছে। যা ছিল কার্নিভালের সঙ্গে সম্পৃক্ত। কার্নিভাল প্রধানত লোকসমাজ তথা নিম্নবর্গীয়দের উৎসব। লোকসাধারণ এই উৎসবের মধ্যে দিয়ে সামাজিক, রাষ্ট্রিক বা ধর্মীয় ভীতিকে জয় করার উদ্দীপনা অর্জন করে। কার্নিভাল মুক্তির জগৎ। শাসকের শেকল সেখানে উন্মুক্ত। লাঞ্ছনার বিরুদ্ধে অবদমিত পীড়িতচিত্তের এখানে মোক্ষণ ঘটে, উৎসবের

উন্মাদনা যেন শাসকের নিপীড়নকে ব্যঙ্গ করে কার্নিভালের মধ্যে উচ্চকিত হয় অত্যাচারিত, শোষিতের প্রতিবাদী স্বর। এইভাবে অপাংক্তেয়, অন্তেবাসীদের বাচনিকতা কার্নিভালের মধ্যে দিয়ে উপন্যাসে দ্বিবাচনিকতা এনে দেয়। কার্নিভালের মাধ্যমে বহুজনের স্বর বহুস্বরসঙ্গতি বা পলিফনিক ডিসকোর্সকে রূপায়িত করে তোলে। বাখতিন দস্তয়েভস্কির উপন্যাসে কার্নিভালের এজাতীয় প্রয়োগ লক্ষ করেছিলেন,— কার্নিভাল মানুষের মুক্তির প্রয়াস, জীবনের প্রাচুর্যকে উদ্ভাসিত করে।

দস্তয়েভস্কির সাহিত্য সমস্যা বিশ্লেষণ করতে গিয়ে বাখতিন কণ্ঠস্বরের বহুত্ব প্রসঙ্গে ক্রনোটোপের কথা উল্লেখ করেন। আইনস্টাইনের আপেক্ষিকতাবাদের সূত্রে বাখতিন উপন্যাসে time এবং space বা সময় ও স্থানের সংশ্লিষ্টতার নান্দনিক তাৎপর্যকে ব্যাখ্যা করেন। ব্যক্তিজীবনের সময়-অনুক্রম আর সমাজ, জাতি ও রাষ্ট্রের ঐতিহাসিক সময় বীক্ষার মধ্যে সেতু রচনার যে প্রয়াস চলে উপন্যাসে তাকেই ক্রনোটোপ বলে উল্লেখ করেছেন বাখতিন। উপন্যাসের মধ্যে এভাবেই মানবসভ্যতার ইতিহাসের পর্ব-পর্বান্তরের ধারাবাহিক প্রবহমানতার যে প্রতিক্রিয়া ধরা পড়ে তাকেই বাখতিন ক্রনোটোপ হিসেবে উপন্যাসে সন্ধান করেছেন।

মিখাইল বাখতিন এভাবেই উপন্যাস সৃষ্টি এবং পাঠের সাম্রাজ্যবাদী ঔপনিবেশিকতায় লালিত বহুকালের অভ্যাসে আমূল পরিবর্তনের হাওয়া আনলেন। উত্তর-ঔপনিবেশিক উপন্যাসের বিশ্বে নানাস্তরে বাখতিন অনুসারী নতুনত্ব ধরা পড়তে লাগল। আজকের ল্যাটিন আমেরিকা কিংবা আফ্রিকার উপন্যাসে অনিবার্যভাবে শাসকদের ঔপনিবেশিকতা এবং তাদের উত্তরাধিকারী দেশীয় শাসকগোষ্ঠীর নয়া-ঔপনিবেশিকতার স্বরূপ উদঘাটনে বহুস্বরসঙ্গতির উদ্ভাস দেখা যায়। নিম্নবর্গীয় অপরাশক্তি এবং লোকসংস্কৃতি ও দেশজ গল্পকথনভঙ্গী আজ এসব দেশের উপন্যাস রচনার সচেতন শিল্পপ্রকরণ। লোককথার এপিসোডিক্যাল পরিবেশন শৈলী আফ্রিকান উপন্যাসের গঠন পরিকল্পনার আধার। ঔপনিবেশিক সময়ের প্রচলিত প্লট-নির্মিতিকে প্রতিস্থাপিত করেছে আফ্রিকা, ল্যাতিন আমেরিকার লোক-ঐতিহ্যজাত নিজস্ব প্রকরণ। প্রচলিত উপন্যাস পরিকল্পনার সমান্তরাল আরও একধরনের উপন্যাসশৈলী আজ পাঠকের সীমা-অধিগত। বাখতিন যেমন উপন্যাসের Genre বা গোত্রটির চেহারা সম্পর্কে ভাবিত ছিলেন, সেই ভাবনার অনুসরণেই আজ উত্তর-ঔপনিবেশিক এসব রচনার গোত্র নির্ণয়ে তাত্ত্বিকদের ভাবতে হচ্ছে। তবে বাখতিন যেমন বলেছিলেন, উপন্যাসের প্রচলিত নির্মিতিই যে তার চূড়ান্ত পরিচিতি এমন নয়। উপন্যাস এখনও হয়ে ওঠার পথে। কালান্তরে পাঠকও এক অভিযাত্রী, তিনিও পুনঃপাঠের নিরিখে উপন্যাসের নতুন রূপকল্প তৈরি করে নিতে পারেন। উপন্যাসের এমন নতুন প্রকরণ দেখি সলমন রুশদির লেখায়। দ্বিবাচনিকতায় অপরাশক্তির প্রাধান্যে গড়ে ওঠে অমিতাভ ঘোষের সাম্প্রতিককালের *সি অফ পপিস্*। আবার অরবিন্দ আদিগা *হোয়াইট টাইগার*-এ হালের আধিপত্যবাদীদের নস্যাৎ করে আদ্যন্ত এক প্রান্তিক মানুষ বলরাম হালুয়াই-এর বাচনিকতাকেই উপন্যাসের ভাষ্য করে তোলেন।

সত্যি বলতে কি, বাখতিনের উপন্যাস-দর্শন আমাদের সাহিত্যের ইতিহাসের পুনঃপাঠের এক শক্তিশালী আয়ুধ হয়ে উঠতে পারে। পৃথিবীর উল্টোপিঠে যাওয়ার দরকারই হয় না যদি তাকাই আমাদের বঙ্গীয় সাহিত্যের ইতিহাসে। এখনো দেখা হল না দুই পা ফেলিয়া কতকিছুই। হাজার বছর আগের চর্যাপদ লেখা হয়েছিল আধিপত্যবাদীদের প্রতিস্পর্ধী প্রান্তীয় উচ্চারণে। অথচ ব্রাহ্মণ্য সমাজ-প্রতিনিধি মুণিদত্ত সন্ধ্যা ভাষার আড়ালে ভিন্নবর্গীয় সামাজিক ব্যাখ্যায় হারিয়ে যেতে দিলেন সেইসব অন্তেবাসী পদকর্তাদের। আমরাও অনুসন্ধান করলাম না সেইসব

লুইপাদ, ভুসুকুপাদ, কাহ্নপাদের নেপথ্যে প্রকৃত স্রষ্টার অবস্থান। আদিমধ্যযুগের *শ্রীকৃষ্ণকীর্তন*-এ যে নিম্নবর্গীয় লোকসংস্কৃতির এবং লোকায়ত জীবনের ব্যাখ্যা গড়ে উঠেছিল, পৌরাণিক ভক্তিবাদ এসে ক্রমশ তাকে উচ্চবর্গের সম্পত্তি করে তুললো। ঔপনিবেশিক আধুনিকতা উনিশ শতকের বাঙালি লেখকদের বর্গস্বার্থকে পুষ্ট করে, তাই প্যারীচাঁদ মিত্রের *আলালের ঘরের দুলাল*-এ ঠকচাচারা নেপথ্যচারী হয়ে থাকে। তবুও *নীলদর্পণ*-এ গোলক বসুর পরিবারকে নিষ্প্রভ করে তোরাপ আদুরি জ্যোতির্বর্ণ হয়ে ওঠে। মধুসূদনের *বুড় শালিকের ঘাড়ে রোঁ*-এ হানিফ মিঞা-ফতিমা বিবি, গদাধররাই আলো হয়ে থাকে। ভবানীচরণ বন্দ্যোপাধ্যায়ের *কলিকাতা কমলালয়* কিংবা *নববিবি বিলাস*-এ প্রতিস্পর্ধী নারীচরিত্রের অবস্থান পাঠককে বহুস্বর সম্বন্ধে সচেতন করে। বিশেষত ত্রৈলোক্যনাথের *কঙ্কাবতী* আধিপত্যবাদীদের বিরুদ্ধে নিম্নবর্গ তথা নারী সমাজের প্রতিবাদী অভিব্যক্তিকে প্রাধান্য দেয় ব্যতিক্রমী ভাবে।

এমনকি যদি আরও একটু অভিনিবেশে তাকানো যায় তবে দেখা যায় *হুতোম প্যাঁচার নক্সা*, *একেই কি বলে সভ্যতা*, *সধবার একাদশী*-র মধ্যে বাখতিনের কার্নিভালের উদ্ঘাটন। কার্নিভালে যেমন লোকসংস্কৃতির প্রয়োগের মধ্যে দিয়ে নানা অসঙ্গতি নির্মাণে হাসির উদ্রেক করানো হয় এইসব রচনাগুলিতেও তেমনই হাস্য-উদ্রেককারী লোকায়তিক জীবনের প্রতিনিধি চরিত্রের শোভাযাত্রা দেখা যায় কার্নিভালের মতোই। যে শোভাযাত্রায় হুতোমের জেলেপাড়ার সঙ, স্নানযাত্রার বাবু, বারোয়ারি পুজোর শ্রমিক, *একেই কি বলে সভ্যতা*-র বৈষ্ণববাবাজী, পুলিশ-কনস্টেবল, বেশ্যাগণ কিংবা *সধবার একাদশী*-র ঘটিরাম ডেপুটিরা সামিল হয় বাখতিনের গ্রোটেস্ক-রিয়ালিজমের সার্থক প্রতিনিধি হিসেবেই। কিন্তু এইসব দেশীয় ভাবনার প্রায়োগিক অবস্থান থেকে বিখ্যাত রচনাগুলির মূল্যায়নে আমরা এখনো অভ্যস্থ নই।

আসলে আমরা এখনও সেভাবে বাংলা উপন্যাসের দেশজ চেহারা তৈরি করে উঠতে পারিনি। এখনো আমরা উপন্যাসের নির্মাণ এবং মূল্যায়ন দুক্ষেত্রেই মুখ্যত ধার করা পথেই চলি। নিম্নবর্গ এবং লোকায়ত সংস্কৃতি থেকে বিচ্ছিন্ন উচ্চবর্গীয় বঙ্গজ লেখকরা নিজেদের জীবন ও ভাবনার পরিধির মধ্যে থেকে ইংরেজি উপন্যাসের মডেলকে আশ্রয় করে যেভাবে বাংলা উপন্যাসের চেহারাটি গড়ে তুলেছেন এবং পাঠকও তাতে দীর্ঘকাল ধরে অভ্যস্থ হয়ে আছে সেখান থেকে বাংলা উপন্যাসের নিজস্বতাকে আবিষ্কার করা কঠিন। তবু তারই মধ্যে তারাশঙ্করের আঞ্চলিক উপন্যাসগুলিতে, কল্লোলীয়দের কিছু উপাখ্যানে, মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়ের *পদ্মানদীর মাঝি* কিংবা বিভূতিভূষণের *আরণ্যক*-এ, সতীনাথ ভাদুড়ীর *ঢোঁড়াই চরিতামানস*-এ লোকসমাজের বহু কণ্ঠস্বর শোনা যায়। যদিও সেই বহু স্বরসঙ্গতির মধ্যে প্রতিবেদনের মূল প্রস্তাবকের কণ্ঠস্বর একেবারে হারিয়ে যেতে দেওয়া হয় না। এবং এসব লেখাতেও নিম্নবর্গের কণ্ঠস্বর শেষ পর্যন্ত স্তিমিত হয়ে গিয়ে উচ্চকিত হয়েছে আধিপত্যবাদীদের একক কণ্ঠস্বর।

তবে অন্য বাচনিকতা বা পরাভাষ্য অনেকখানি মাথা তুলেছিল রবীন্দ্রনাথের *চতুরঙ্গ* কিংবা মানিকের *দিবারাত্রির কাব্য*-তে। উপন্যাসে এ জাতীয় কণ্ঠস্বরে বাঙালি পাঠক অভ্যস্থ ছিল না। এমন অভ্যাসের বিপ্রতীপে দাঁড়িয়ে পলিফনিক ডিসকোর্সকে অনেকখানি গুরুত্ব দিয়েছে অদ্বৈত মল্লবর্মণের *তিতাস একটি নদীর নাম*, কমলকুমার মজুমদারের *নিম অন্নপূর্ণা*, অমিয়ভূষণ মজুমদারের *চাঁদ বেনে*, মহাশ্বেতা দেবীর *অরণ্যের অধিকার*। সাম্প্রতিককালের দেবেশ রায়ের *তিস্তাপারের বৃত্তান্ত*, স্বপ্নময় চক্রবর্তীর *চতুষ্পাঠী*, সৈকত রক্ষিতের *আকরিক*, জয়া মিত্রের *ন হন্যমান* ইত্যাদি। এইসব উপন্যাসের লেখকদের রাজনৈতিক-সামাজিক-সাংস্কৃতিক সংগ্রামের ও শিল্পের গোত্রীয় রূপনির্মাণের সচেতনতার ভিত্তিতে সমাজের বিবিধ স্তরের মানুষের বহুস্বর

ও আঞ্চলিক এবং বর্গীয় ভাষাবৈশিষ্ট্য; ভিন্ন জীবনবোধ উপন্যাসের অন্যতর ভাষ্য তৈরি করে। প্রসঙ্গত লিখি, যেকথা আগে বলেছিলাম, সেই সূত্রে— যখন এসব উপন্যাস বাখতিনের তাত্ত্বিক রশ্মির নিচে ধরি তখন প্রতিটি তত্ত্বেরই যে হুবহু ভূমিকা পালিত হতে দেখি, এমন নয়। কিন্তু তাতে সত্যিই মহাভারত অশুদ্ধ হয় না। বরং তত্ত্বের প্রয়োগের মধ্যে তার একাধিক মাত্রা ধরা দেয়। যেমন *তিতাস একটি নদীর নাম*-এ রাঙা নাও-এর যাত্রা, অমিয়ভূষণের *চাঁদ বেনে*-তে চাঁদের সপ্তডিঙার অভিযান কিংবা সমরেশ বসুর *গঙ্গা*-তে তেঁতুলে বিলাসের কলকাতামুখী স্রোতে ইলিশ মারার মৃগয়া যাত্রা অথবা *তিস্তাপারের বৃত্তান্ত*-তে তিস্তার ভাঙন থেকে জীবনরক্ষার তাগিদে সমবেত আশ্রয়সন্ধান— এসবই বাখতিনের কার্নিভাল তত্ত্বকে মনে করায়। লক্ষণীয় উল্লিখিত প্রতিটি যাত্রাই ছিল নদীনির্ভর— বাখতিন যে কার্নিভালের ব্যাখ্যা করেছিলেন সেখানে নদীর অস্তিত্ব ছিল না কিন্তু স্থলভূমির জায়গা যদি জলভূমি নেয় তাতে ক্ষতি কিছু হয় না বরং কার্নিভালের আরও একধরনের প্রয়োগ-পরিচিতি ধরা দেয়।

একথা তো মানতেই হবে, সাহিত্য বিজ্ঞান নয়। আর বিজ্ঞানের ক্ষেত্রেও একথা মনে রাখতে হয় যে, তত্ত্ব অনুযায়ী প্রয়োগকে যদি যথাযথ হতে হয় তবে উপাদানের হেরফের হলে চলে না। কিন্তু সাহিত্যের তত্ত্বের ক্ষেত্রে এমন পান থেকে চুন না খসার প্রতিজ্ঞা না করাই ভাল। কেননা তত্ত্ব রচনার পরিপ্রেক্ষিত আর প্রয়োগের ক্ষেত্র সঠিক মাপে নাও মিলতে পারে। সেক্ষেত্রে তত্ত্ব আর প্রয়োগের মধ্যে বৈচিত্র্য বাড়ে কিন্তু ব্যবধান বা দূরত্ব তৈরি হয় না। বরং তত্ত্ব-সম্বন্ধীয় ভাবনার অবকাশ আরও বেড়ে যায়। আর সাহিত্যতত্ত্বের প্রয়োগের দায় সাহিত্য বিচারকের, স্রষ্টার নয়। স্রষ্টা যদি বাখতিনের উপন্যাস-বিশ্বকে মাথায় নিয়ে উপন্যাস সৃষ্টি করেন তবে তা উপন্যাস শিল্প হয়ে উঠবে না, হবে তত্ত্বের ল্যাবরেটরি। সুতরাং দায়িত্ব পাঠক-বিচারকের। পাঠক এবং বিচারক উভয়েই গ্রহীতা শ্রেণীভুক্ত। বাখতিনের দ্বিবাচনিকতার সূত্রানুযায়ী প্রত্যেক লেখকই সৃষ্টির আদি প্রস্তাবক মাত্র। গ্রহীতা সেই প্রস্তাবনার সমস্ত উচ্চারণই নিষ্ক্রিয়ভাবে গ্রহণ করেন না। বরং তিনি তাতে তাৎপর্যপূর্ণভাবে হস্তক্ষেপ করেন এবং তাঁর পুনঃপাঠের ভিত্তিতে আদি পাঠ ধীরে ধীরে বদলাতে শুরু করে। এভাবেই একটি উপন্যাস যতক্ষণ লেখকের হস্তগত ততক্ষণ যেন অসম্পূর্ণ থেকে যায়। যখন তা পাঠক-বিচারক তথা গ্রহীতার হস্তধৃত হয় তখন লেখকের উপস্থাপনা আর গ্রহীতার অনুসন্ধানের পারস্পরিক আদান প্রদানের মধ্যে দিয়ে লেখাটি সম্ভাব্য পূর্ণতার দিকে এগিয়ে যায়। এভাবেই যে-কোনো সাহিত্যকলাই পুনঃপাঠের মধ্যে দিয়ে পূর্ণতা অর্জনের অপেক্ষায় থাকে।

এমনই পুনঃপাঠের অভিপ্রায়ে যদি বাখতিন-বিশ্বে আমন্ত্রণ জানাই মহাশ্বেতা দেবীর *অরণ্যের অধিকার*-কে তবে দেখতে পাই বাখতিনের উপন্যাস-তত্ত্বের প্রয়োগে মহাশ্বেতার উপন্যাস আরও নতুনতর পূর্ণতার দিকে এগিয়ে যায়।

মহাশ্বেতার এই উপন্যাস যথার্থই বহুস্বরের ঐক্যতানকে বহন করে। লেখক এখানে মৌলিকভাবে আদি প্রস্তাবকের ভূমিকা পালন করেন। এ উপন্যাসে কাহিনী গ্রথিত হয় বহু কথকের কণ্ঠস্বরের সমন্বয়ের ভিত্তিতে। একাধিক উপাদান এখানে কথকের ভূমিকা নিয়েছে। ধানীমুণ্ডা, অমূল্যর ডায়েরি আর অনেকগুলো পুলিশ ফাইল, রিপোর্ট, সরকারি বিজ্ঞপ্তি এবং চিঠি। এদের কথনের মধ্যে দিয়ে ধাপে ধাপে এগিয়ে যায় *অরণ্যের অধিকার*-এর গল্প— বীরসামুণ্ডার স্বাধীনতা সংগ্রামের ইতিকথা— বীরসার উলগুলান তথা বিদ্রোহের কাহিনী।

ধানী মুণ্ডার অনেক চাঁদ পেরনো বয়স, সে অনেক পুরোনো কথার সাক্ষী। একটু একটু করে ধানী লোককথার এপিসোডিক্যাল ধাঁচে পাঠককে শোনায় মুণ্ডাদের ইতিকথা— যাযাবর মুণ্ডাদের

বন কেটে বসত করার আদিকথা, খুটকাট্টি গ্রামের কথা, মুণ্ডাদের চা বাগানে কুলিকামিন হয়ে দেশান্তরী হওয়ার কথা, আবার দিকুদের চক্রান্তে নিজভূমে পরবাসী হবার বৃত্তান্ত। কখনো কখনো ধানীর সহযোগী কথক হয় ভরমী মুণ্ডা। ধানী বীরসাকে উদ্দীপ্ত করে উলগুলানের আগুন জ্বালানোর জন্য। ইন্ধন জোগানোর জন্য শোনায় সিধু কানুর বিদ্রোহের কথা, হুল বিদ্রোহের কাহিনী, সর্দারদের মুলকি লড়াই-এর ইতিকথা। বীরসার সময়ের গণ্ডী এইভাবে জায়গা করে নেয় ইতিহাসের সময়-পরিধিতে। বীরসার সময় ও প্রেক্ষিত অনেক বৃহত্তর সময়ের প্রেক্ষিতে প্রবেশের জন্য প্রস্তুত হতে থাকে।

একাধিক সরকারি নোটিশ, সংবাদপত্রের রিপোর্ট, উচ্চপদস্থ পুলিশকর্তাদের চিঠি আর ডায়েরি এ উপন্যাসের কাহিনী কথক হয়ে উঠেছে। সরকারি নোটিশগুলো জানিয়ে দেয় বিদ্রোহী বীরসার বিরুদ্ধে ব্রিটিশ প্রশাসনের ভূমিকা। একাধিক চিঠির মধ্যে দিয়ে পাঠক জানতে পারে বীরসা কীভাবে ধীরে ধীরে মুণ্ডা জনমানসে 'ধরতি আবা' তথা জীবন্ত ভগবানে পরিণত হয়েছে। বীরসা শুধু মুণ্ডাদের বিদ্রোহী নেতা নয়, বীরসা একটা মিথে পরিণত হয়েছে মুণ্ডাদের লোকবিশ্বাসে। এসব তথ্য পরিবেশিত হয় চিঠির মধ্যে একাধিক পুলিশকর্তা বা প্রশাসনিক ব্যক্তিত্বের কথোপকথনের মধ্যে দিয়ে।

অরণ্যের অধিকার এমন এক উপন্যাস, যেখানে কথকের ভূমিকা পালন করে গান। প্রায় চোদ্দটা গানের ব্যবহারের মধ্যে দিয়ে বীরসার এক মুণ্ডা কিশোর থেকে 'ধরতি আবা' হয়ে ওঠার ইতিকথা বিবৃত হয় লোকসঙ্গীতের ভঙ্গীতে। লোকসংস্কৃতির এই বিশিষ্ট উপাদান এখানে বহুজনের স্বরকে ধারণ করে রাখে। বিশেষ করে যেদিন প্রথম আশপাশের সব গ্রাম ও অঞ্চল থেকে সব শ্রেণীর মানুষ বীরসাকে নেতা হিসেবে বরণ করার জন্য এবং বীরসাইত হিসেবে দীক্ষিত হবার জন্য সমবেত হতে আসে শোভাযাত্রা করে আর তাদের গলায় থাকে গান— "জিলিবা জিলিবা/জোলোবা জোলোবা/পানতিয়াকানালে বীরসা হে!" গানসহ এই শোভাযাত্রা মুণ্ডাদের লোকজীবনের অঙ্গ— যা কার্নিভালের ধাঁচ মনে করিয়ে দেয়। মিছিলের মধ্যে তাদের উক্তি-প্রত্যুক্তি— বীরসার কাছে মুণ্ডাদের অনুগত্য প্রকাশের ভঙ্গী কখনো কখনো কার্নিভালের হাস্যরসের কথাও মনে করিয়ে দেয়।

গান এ উপন্যাসে বহুস্বরের মধ্যে একটি বিশেষ স্বর হয়ে ওঠে। লোকজীবনের সমস্ত প্রত্যাশার সুর লেগে থাকে উপন্যাসের সব ক'টি গানে। উপন্যাসে গান এবং সংলাপ সমস্তই রচিত আঞ্চলিক ভাষায়। নিম্নবর্গীয়দের বাচনিকতার চিহ্ন উপন্যাসের সর্বাঙ্গে। একদিকে দিকু বা দেশীয় মহাজন, অন্যদিকে ব্রিটিশ প্রশাসন ও বিচারব্যবস্থার কর্তারা আর সেইসঙ্গে খ্রিস্টান মিশনারিরা— এই আধিপত্যবাদীদের প্রতিপক্ষে রয়েছে বীরসার নেতৃত্বে যেন সমস্ত কৃষ্ণভারত— যদিও তার প্রতিনিধিত্ব করে শুধু মুণ্ডা সম্প্রদায়। গল্প কথক তাই বলে— "মুণ্ডাদের অরণ্যে অধিকার চাই, সেই আদিম যুগের মত। ... বাঁচার মত করে বাঁচার উপায় চাই। ...তাই বীরসা ভগবান হয়ে ওদের বিপ্লবে নামিয়েছে।" গল্প কথক আরও বলেছে— এই মুণ্ডারা কৃষ্ণ ভারতের সন্তান। এইভাবে প্রতিপক্ষ হয়ে জেগে ওঠে এ উপন্যাসে অন্তেবাসীদের বহুস্বর। বহুস্বরীয় সেই ঐকতানের মধ্যে গ্রহীতা পাঠক শুনতে পায় শোষক-শাসকহীন সমাজের বহুকণ্ঠের জীবনের উল্লাস।

বাখতিন যেমন বলেন বহুস্বরের মধ্যে একসময় শোনা যায় একটি বিশিষ্ট একক স্বর, যে কণ্ঠস্বর কোন উচ্চতর সত্যের আভাস দেয়, তা যে লেখকের আদি স্বর হবে এমনও নয়, কোন বিশেষ কথকই হয়তো তার ধারক হবে। ঠিক তেমনই এ উপন্যাসে দেখি অমূল্যর ডায়েরির

কণ্ঠ। যা উপন্যাসের উচ্চতর সত্যকে ঘোষণা করে। উপন্যাসের সমাপ্তিতে অমূল্যর ডায়েরি লেখে— সমস্ত প্রাকৃতিক সংগ্রামের সঙ্গে একীভূত হয়ে যাচ্ছে বীরসার উলগুলান। বীরসার মরণ নেই, উলগুলানের শেষ নেই। কেননা— "কিছুই ফুরোয় না পৃথিবীতে— মুণ্ডারী দেশ-মাটি-পাথর-পাহাড়-বন-নদী— ঋতুর পর ঋতুর আগমন— সংগ্রামও ফুরোয় না, শেষ হতে পারে না। থেকে যায়, কেননা মানুষ থাকে, আমরা থাকি।" উপন্যাসের শেষে তাই সমস্ত পৃথিবী বীরসার জরতীবুড়ি সুলভ বৃদ্ধা মায়ের প্রত্নপ্রতিমায় যেন অপেক্ষারত থাকে বীরসার পুনরাগমনের জন্য, উলগুলানের-বিপ্লবের আগুনের জন্য। উপন্যাসের কথনকে তার সংকীর্ণ সময় ও ভৌগোলিক সীমা থেকে উত্তীর্ণ করে কালোত্তর পাঠকের কর্ণগোচর করার জন্য এই বিশিষ্ট স্বরের প্রয়োজন থাকে, সে প্রয়োজন সিদ্ধ হয়েছে বলেই উপন্যাসের শেষ লাইনে লেখা হয়— "আমাকে শুনতে দাও। শুনতে না শিখলে আমি বিশ্বাস করব কেমন করে।" এই ভাষ্য অমূল্যর ডায়েরির সমাপ্তি-চরণ মাত্র নয়। এই ভাষণ কালান্তরে শোনার জন্য অপেক্ষারত গ্রহীতা পাঠকের। উলগুলানের কথা না শুনলে সে আগুন জ্বালাবে কি করে?— এভাবে বহু স্বরসঙ্গতির প্রেক্ষিতে প্রস্তাবক ও গ্রহীতার দ্বিবাচনিকতার মধ্যে দিয়ে উপন্যাস পূর্ণতার সীমাকে, তার লক্ষ্যবিন্দুকে স্পর্শ করে।

অরণ্যের অধিকার দ্বিবাচনিকতার প্রগাঢ় লক্ষণকে বহন করে বীরসার চিত্রায়ণে। বীরসা ধরতি-আবা আর করমীপুত্র সাধারণ মুণ্ডারি যুবক বীরসা। দুই সত্তার ভাষ্য, তাদের সংঘাতের মধ্যে দিয়েই বীরসা মুণ্ডা সমাজের দেবতা হয়ে ওঠে। বীরসার ধরতী-আবা সত্তার মূলে রয়েছে অরণ্য জননী বা আদি মাতার প্রত্নপ্রতিমা। তাই অরণ্যভূমিও এ উপন্যাসের অন্যতম কথক। মুণ্ডারি মা করমী জন্ম দেয় মুণ্ডা সন্তান বীরসাকে আর অরণ্য জননী জন্ম দেয় ধরতী আবা বীরসাকে। অরণ্য জননীর সঙ্গে একাধিক উক্তি বিনিময়ের সিকোয়েন্স বীরসার অপরাশক্তিকে দ্বিবাচনিকতার মধ্যে দিয়ে উপস্থাপিত করে।

অরণ্যভূমির সঙ্গে বীরসার কথোপকথন আর ধানী-ভরমী-মূলকী সর্দারদের কথন এ উপন্যাসের সময় ও প্রেক্ষিতকে প্রলম্বিত করে দেয়। time আর space-এর ক্রনোটোপ বীরসার সময়কে ১৯০০ সালের ৯ই জুন-এর মধ্যে থেমে থাকতে দেয় না। বীরসার বিদ্রোহের আঁচ কখনো ছুঁয়ে আসে ১৮৫৬-কে আবার লোকবিশ্বাসের মাধুর্যে কখনো তা যীশুর জন্মলগ্নের তিন ভবিষ্যৎদ্রষ্টা পণ্ডিতের যাত্রালগ্নকে। আবার কখনো মুণ্ডাগৃহে শিশু বীরসার আবির্ভাব মনে করিয়ে দেয় দেবকী গর্ভজাত ভগবান কৃষ্ণকে। এভাবেই সময় ও স্থানিক ক্রনোটোপ বীরসাকে মুণ্ডাসমাজের মিথে পরিণত করে।

অরণ্যের অধিকার যে কতখানি ভিন্ন পরিকল্পনাজাত তা প্রতিফলিত তার আদ্যন্ত গঠনভঙ্গির মধ্যে। উপন্যাসের শুরু ৯ই জুন ১৯০০। রাঁচি জেল। সকাল আটটা। উপন্যাসের শেষ একুশটি পরিচ্ছেদ পরে— ৯ই জুন ১৯০০ সাল। রাঁচি জেল। সকাল ন-টা দশ। উপন্যাসের প্রচলিত বাচনিকতাকে প্রবল ধাক্কা দেয় উপন্যাসের শুরু ও শেষে সময়ের এই স্থির ভূমিকায়। উপন্যাসটি যেন সেই প্রাচীন বালি-ঘড়ি। ঘড়ি উল্টে দিতে হয় তাহলেই ওপর থেকে নীচে বালির অবিরাম প্রবাহ।— এও ঠিক তাই। পড়তে পড়তে পাঠক অনুভব করবে— প্রান্তীয় লোককথার বাচনিকতা সমস্ত উপন্যাসের শরীরকে ছুঁয়ে রয়েছে। এ যেন সেই প্রাচীন শিকলি কথা— আমার কথাটি ফুরোলো/নটে গাছটি মুড়োলো। গল্প এখানেই শেষ হবার কথা ছিল কিন্তু তা হয় না। নটে গাছটি মুড়োনোর পরেই নটে গাছকে শুধানো হয় কেন রে নটে মুড়োলি? তারপর চলে নতুন চাপান উতোরের পালা। এ উপন্যাসও তেমনই। শেষের পরে আরম্ভ হয় শুরুর কথা। অথবা

যেখানেই শুরু সেখানেই শেষ— মাঝখানে শুধু বহমান বহু কণ্ঠধ্বনির ঘাতপ্রতিঘাতময় প্রবাহ— যা যে-কোনো কালসীমার পাঠকের কানে শুনিয়ে যায় আবহমানকালের নিজভূমে পরবাসী মানুষের অধিকার পুনরুদ্ধারের সংগ্রামী ইতিকথা।

অরণ্যের অধিকার-এর এই পাঠক্রিয়াটিও যেন এক বালিঘড়ি। দুদিক দিয়েই পরিমাপ করা যায়। *অরণ্যের অধিকার* পুনঃপাঠের মধ্যে দিয়ে বাখতিনের উপন্যাস-বিশ্বে যেমন প্রবেশ করা যেতে পারে তেমনি বাখতিনের উপন্যাস-তত্ত্বের নিরিখে *অরণ্যের অধিকার*-এর পুনঃপাঠ সম্পন্নও হতে পারে। যেদিক দিয়েই যাই না কেন পাঠক হিসেবে ফলবান হবই। কেননা বাখতিনের তত্ত্ব একথাই শেখায়, উপন্যাস শুধু চোখ বন্ধ করা আয়েশি মনোরঞ্জন নয়, বরং চেতনাকে জাগ্রত রেখে, বুদ্ধিকে শানিয়ে তুলে নিজেকে সমৃদ্ধ করার খোলা জমি।

যেসব বই-এর সাহায্য নিয়েছি—

১. *সাহিত্যের মানচিত্র : দ্বীপ থেকে মহাদেশ*— বিমলকুমার মুখোপাধ্যায়
২. *আধুনিকতা : পর্ব থেকে পর্বান্তর*— তপোধীর ভট্টাচার্য
৩. *আধুনিকতা ও উত্তর-আধুনিকতার অভিজ্ঞতা*— বোরহানউদ্দিন খান জাহাঙ্গীর
৪. *বাঙলা সাহিত্য সমালোচনা*— আফজালুল বাসার
৫. *এবং এই সময়* (বাখতিন বিশেষ সংখ্যা) পত্রিকা— অরুণ বন্দ্যোপাধ্যায় সম্পাদিত
৬. *অরণ্যের অধিকার*— মহাশ্বেতা দেবী
৭. *Modern Criticism and Theory* — Edited by David Lodge

Ainoam

সংবর্তন সঞ্জনন ব্যাকরণ

রমাপ্রসাদ দে

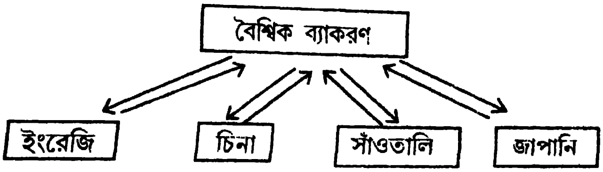
বিংশ শতকের ভাষাতত্ত্বে নোয়াম চমস্কির (Abraham Noam Chomsky 1928) অবদান সবচেয়ে বেশি প্রভাবসঞ্চারী। একালের চিন্তাচেতনাকে তিনি গভীরভাবে প্রভাবিত করেছেন। তাঁকে আমরা স্বীকার করি বা না করি, কখনই বাদ দিতে পারি না। ১৯৫৭ সালে চমস্কির (Syntactic structures) প্রকাশিত হয়। ১৯৬৫ সালে (Aspects of the Theory of Syntax)-এর প্রকাশ। মূলত এই দুটি গ্রন্থের উপর ভিত্তি করেই গড়ে উঠেছে Generative Transformational Grammar বা সঞ্জনন সংবর্তন ব্যাকরণ। দুটি বইতেই চমস্কি ভাষার সৃজনশীলতার উপর গুরুত্ব দিলেন। জানালেন, আধুনিক ব্যাকরণের কাজ হবে কিভাবে মানুষ ভাষার সীমিত সংখ্যক উপাদান নিয়ে অসংখ্য বাক্য রচনা করে তার অনুধাবন। ভিন্ন পরিস্থিতির সামনে কোনো মানুষ যে-সব নূতন বাক্য বলতে পারে, যা সে আগে কখনও বলেনি বা শোনেনি, সেটাই তার সৃজনশীলতার দিক। আর এটা সম্ভব হয় তার কারণ, চমস্কি জানালেন, প্রত্যেক মানুষের মধ্যেই প্রচ্ছন্ন একটা ভাষাবোধ থাকে যাকে তিনি বলেছেন Competence। আমরা বলতে পারি ভাষা-সামর্থ্য। প্রতিদিনের কথা বার্তায় এই ভাষাবোধের যে প্রয়োগ তাকে তিনি বলেছেন performance বা ভাষা-ব্যবহার। সাংগঠনিক ভাষাতত্ত্বে ভাষা-ব্যবহারের উপরেই গুরুত্ব ছিল বেশি। ভাষার বিচিত্র ব্যবহার থেকে তারা তত্ত্বে পৌঁছাতে চেয়েছিলেন। চমস্কি এই আচরণবাদী দৃষ্টিভঙ্গি থেকে ভাষাতত্ত্বকে মুক্তি দিলেন। তাঁর কাছে ভাষা-ব্যবহার নয়, ভাষা-সামর্থ্যই হল ভাষাতত্ত্বের আলোচ্য বিষয়। ভাষায় যে বাক্যগুলি আমরা ব্যবহার করি, তা কতকগুলি নিয়ম-নিয়ন্ত্রিত হয়েই প্রকাশ পায়। ভাষা-সামর্থ্যের কারণেই আমরা বুঝতে পারি কোন বাক্যটি নিয়ম-নিয়ন্ত্রিত তথা ব্যাকরণিক, আর কোনটি নয়। যেমন নীচের এই দুটি বাক্য—

গ্রামের পাশে নদী আছে

*নদী পাশে গ্রামের আছে

দ্বিতীয় *চিহ্নিত বাক্যটি যে অব্যাকরণিক, একজন বাংলাভাষী তা সহজেই বুঝতে পারেন। বর্ণনামূলক গঠনবাদী ব্যাকরণ বাক্যগঠনে সহায়ক ভূমিকা নেই ঠিকই, কিন্তু সে গঠনে একটি ভাষার সঙ্গে আর একটি ভাষার মূলগত ঐক্য উদঘাটিত হয় না। চমস্কির দৃষ্টি ছিল ভাষা-সার্বিকতার। তিনি লক্ষ করলেন একটি ভাষার বাক্যগঠনের সঙ্গে ভিন্ন একটি ভাষার গঠনে যে পার্থক্য তা নিতান্তই

উপরিতলের, গভীরতলে ভাষায় ভাষায় এই পার্থক্য লুপ্ত হয়ে যায়। সব ভাষাতেই বিশেষ্য পদগুচ্ছ (NP) ও ক্রিয়া পদগুচ্ছ (VP) যুক্ত হয়ে বাক্য রচিত হয়। সব ভাষাতেই আছে বিশেষ্য বিশেষণ ক্রিয়া প্রভৃতি আন্বয়িক উপাদান। সব ভাষার বাক্যেই আছে উদ্দেশ্য বিধেয় বিভাজন। তাই বিশেষ ভাষার বিশেষত্বকে সরিয়ে রেখে যেমন সার্বজনীন ভাষান্তরে বা বৈশ্বিক ব্যাকরণে (Universal Grammar) পৌঁছানো সম্ভব, তেমনি বৈশ্বিক ব্যাকরণ থেকে বিশেষ ভাষায় আসাও অসম্ভব নয়। রেখাচিত্রে বিষয়টা এভাবে দেখানো যায়—



বলাবাহুল্য, বৈশ্বিক ব্যাকরণের ধারণাও চমস্কির একটি বড়ো অবদান।

Aspects of the Theory of Syntax নামের বইটিতে চমস্কি বাক্যের দুটি সুস্পষ্ট স্তর নির্দেশ করলেন—অধোগঠন (deep structure) ও অধিগঠন (surface structure)। এই দুই-এর পার্থক্য বোঝাতে গিয়ে William G. Moulton লিখেছেন 'a Deep structure .... represents the way we understand the sentence ; and a surface structure .... represents the way we say the sentence.' চমস্কি প্রথম বইতে Kernel sentence বা অন্তঃসার বাক্যের রূপান্তরের যে ধারণা উপস্থিত করেছিলেন তা এখানে পরিত্যক্ত হল। অধোগঠন থেকে কিভাবে বাক্য অধিগঠনে উঠে আসে অর্থান্তর না ঘটিয়ে, এখানে তা আমরা লক্ষ করলাম। যেমন নীচের এই বাক্যটিতে—

অধোগঠন ঃ [বাড়িটা [বাড়িটা ছিল পুরনো] ভেঙে পড়ল]

সম্বন্ধ সংবর্তন

↓

[বাড়িটা [যা ছিল পুরনো] ভেঙে পড়ল]

ক্রিয়া-বিলোপ সংবর্তন

↓

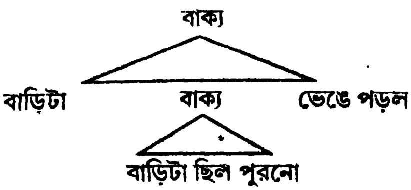
[বাড়িটা [পুরনো] ভেঙে পড়ল]

বিশেষণ স্থানান্তরণ সংবর্তন

↓

অধিগঠন ঃ পুরনো বাড়িটা ভেঙে পড়ল

অধোগঠন বাক্যের বিমূর্ত গড়ন যা আমরা বাস্তবে ব্যবহার করি না। আর অধিগঠনে পাই বাস্তবে ব্যবহৃত বাক্য। অধোগঠনের সঙ্গে অধিগঠনের সম্পর্ক রচনা করে সংবর্তন। যেহেতু এই সম্পর্ক জটিল, তাই তার পদ্ধতিগত দিকটা দেখা দরকার।



উল্লিখিত অধোগঠনের সঞ্জনন (Generation) ঘটছে নিম্নরূপ সূত্রাবলির সাহায্যে—

বাক্য → বিশেষ্য পদগুচ্ছ + ক্রিয়া পদগুচ্ছ

ক্রিয়াপদগুচ্ছ → অকর্মক ক্রিয়া

হওয়া + বিশেষণ

বিশেষ্য পদগুচ্ছ → বিশেষ্য পদগুচ্ছ + (বাক্য)

বিশেষ পদগুচ্ছ → বিশেষ্য + নির্দেশক বিভক্তি

বিশেষ্য → বাড়ি

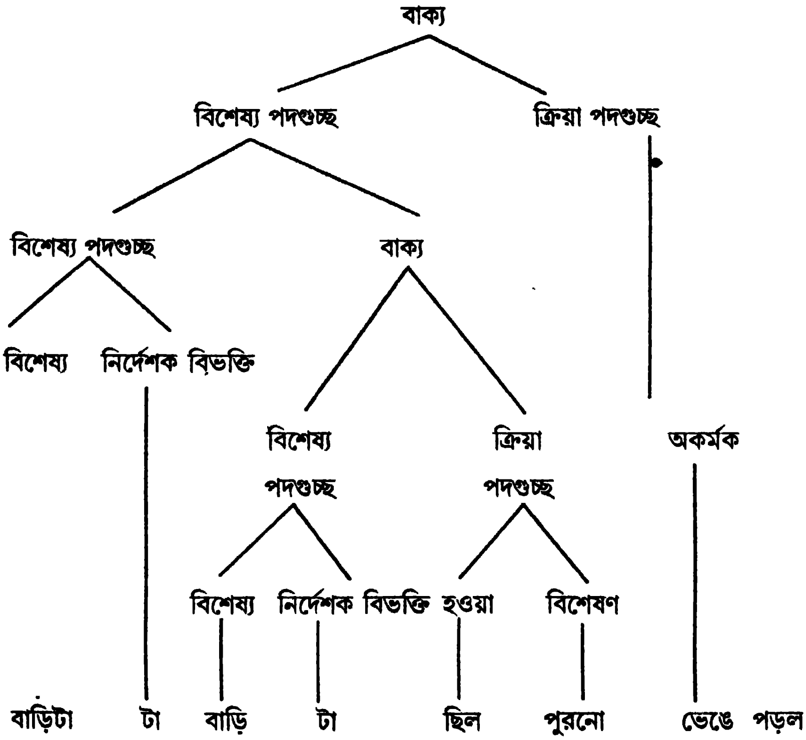
নির্দেশক → টা

অকর্মক ক্রিয়া → ভেঙে পড়ল

বিশেষণ → পুরনো

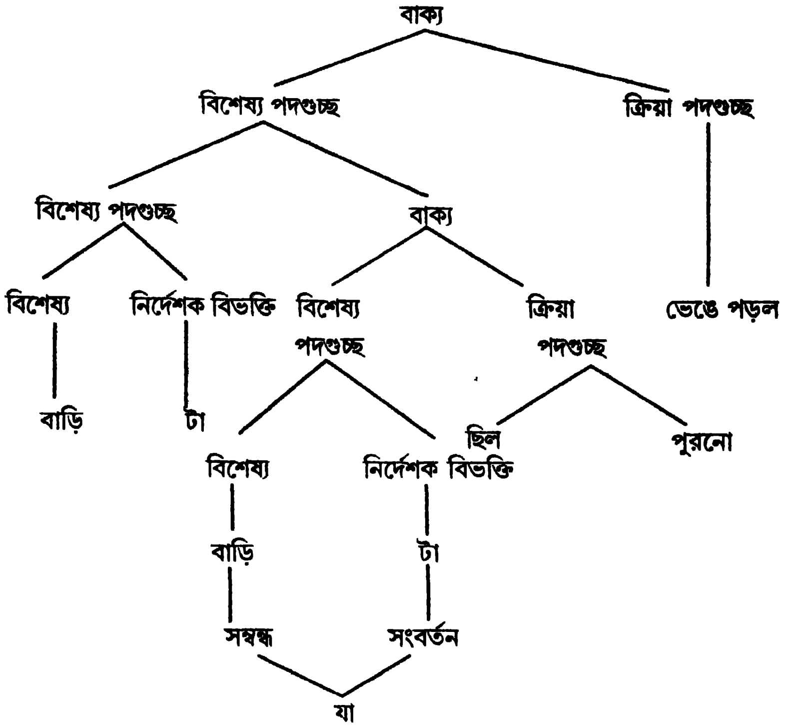
হওয়া → ছিল

ওপরের রেখাচিত্রটিকে এবার আমরা এভাবে অধোগঠনে বদলে নিতে পারি—



ভাষার ব্যাকরণে যেমন পদসজ্জার নিয়মাবলি আছে তেমনি আছে সংবর্তন নিয়মাবলি। পদসজ্জার নিয়মাবলি অধোগঠনে ক্রিয়াশীল, যেমন [বাড়িটা [বাড়িটা ছিল পুরনো] ভেঙে পড়ল]। আর সংবর্তনের নিয়ম অধোগঠনকে বদলে দেয় অধিগঠনে। এখানে যেমন সংবর্তনের একটি নিয়ম আমাদের বলে দিচ্ছে 'বিশেষ্য পদগুচ্ছ + বাক্য' পরম্পরায় যদি বিশেষ্য পদগুচ্ছের আধিপত্য থাকে আর তারপর যদি 'বাক্য' আধিপত্য করে 'বিশেষ্য পদগুচ্ছের'

উপর, যার উদ্দিষ্ট সেই একই 'বিশেষ্য পদগুচ্ছ', তা হলে সেই আধিপত্যকারী 'বিশেষ্য পদগুচ্ছ' শেষ পর্যায়ে 'যে, যিনি বা যাহা'-য় পরিণত হবে। এই নিয়মের নাম সম্বন্ধ সংবর্তন। যেমন,



বাড়িটা যা ছিল পুরনো ভেঙে পড়ল।

এভাবেই অন্যান্য সংবর্তন সূত্রের মাধ্যমে অধোগঠনের বিমূর্ত বাক্য পৌঁছে যায় অধিগঠনের মূর্ত স্বাভাবিক উচ্চারণে। পরবর্তী সময়ে চমস্কিতত্ত্বের আরও পরিবর্তন ঘটেছে। কিন্তু যেটা বড়ো কথা তা হল ভাষাতাত্ত্বিক গুরুত্বের স্থানান্তরণ। ঐতিহাসিক ও বর্ণনামূলক ভাষাবিজ্ঞানে যেখানে ধ্বনি ও রূপ প্রধান আলোচ্য হয়ে উঠত, সেখানে আলোচনার কেন্দ্রে এল বাক্য।

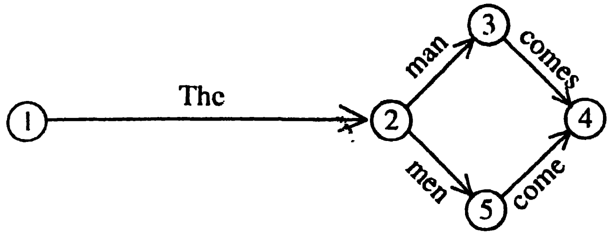
ভাষা চিন্তার নবদিগন্তের উন্মোচন হল ১৯৫৭ সালে প্রকাশিত চমস্কির syntactic structures বইটিকে কেন্দ্র করে। সংবর্তন সঞ্জনন ব্যাকরণ প্রকৃতপক্ষে বাক্য গঠনের ব্যাকরণ। সীমিত সংখ্যক সূত্র প্রয়োগ করে কিভাবে অসীম সংখ্যক বাক্যের নির্মাণ সম্ভব হতে পারে, ভাষার সেই আশ্চর্য সৃজনশক্তিকেই গুরুত্ব দিলেন চমস্কি, আভাসিত হল সীমার মধ্যে সীমাহীনতা। এই বইতে বাক্যগঠনের তিনটি রূপাদর্শ উপস্থিত করলেন তিনি।

সীমিত পর্যায় ব্যাকরণ (Finite State Grammar)
পদসংগঠন ব্যাকরণ (Phrase Structure Grammar)
সংবর্তন ব্যাকরণ (Transformational Grammar)

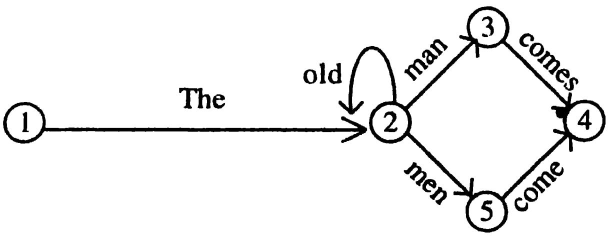
সীমিত পর্যায় ব্যাকরণ :

দৃষ্টান্ত সংকলন করা যাক Syntactic Structures বইটির ১৯ পৃষ্ঠা থেকে। ভাবা যাক আমাদের সামনে একটি মেশিন—বাক্‌যন্ত্র, যা থেকে বাক্য বেরিয়ে আসছে। মেশিনটার পাঁচটি

পর্যায়। তীরচিহ্নে বদলের সংকেত। (1) থেকে সূচনা আর (4)-এ গিয়ে থামা। যখনই বদল ঘটছে, বদলের মুখে তীরচিহ্নের উপর পাচ্ছি পরিবর্তনের প্রতীক একটি শব্দ—:প্রথম ও দ্বিতীয় পর্যায়ের মধ্যবর্তী প্রতীক যেমন The।

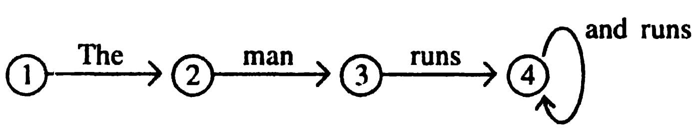


সীমিত পর্যায়ের এই রূপাদর্শ থেকে মাত্র দুটি বাক্যই সম্ভব হচ্ছে— The man comes আর The men come। কিন্তু আমরা অসীমে উৎসাহী। কোনো কি পথ আছে এই সীমিত ব্যবস্থার করণকৌশলে সীমাহীনতায় পৌঁছানোর? তাকানো যাক নীচের রেখাঙ্কনে



আগে যে দুটি বাক্য পেয়েছি এ ব্যাকরণ ব্যবস্থা থেকেও সে দুটি বাক্য পাচ্ছি, অধিকন্তু পাচ্ছি এমন বাক্য— The old man/men ....আর The old old old man/men..... আমরা অবশ্যই প্রসারিত হবার সুযোগ পাচ্ছি এখানে। আর একটি দৃষ্টান্ত—

The man runs and runs and runs and runs. রেখাঙ্কণে—



এই পর্যায়ে আমরা পাচ্ছি এমন সব বাক্য—

The man runs

The man runs and runs

The man runs and runs and runs....

—এই দৌড়ানোর আর শেষ নেই। পুনরাবর্তন সূত্রের (Recursive Rule) সাহায্যে এ রকম বহু বাক্যই তৈরি হতে পারে, তবু এ ব্যাকরণ যে অসম্পূর্ণতা বলার অপেক্ষা রাখে না। এই ব্যাকরণের কাঠামোর মধ্যে বাক্য প্রকরণের সব রকম ব্যাখ্যা সম্ভব হয়ে ওঠে না। শব্দে শব্দে পারস্পরিক নির্ভরতা যে সর্বদাই শব্দ সংলগ্ন হবে এমনও নয়। যথা—

হয় তুমি বাড়িতে থাকবে নয় আমি থাকব।

—এ বাক্যের দুটি অংশে একটা নির্ভরশীলতা সহজেই অনুমেয়। 'হয়' এবং 'নয়'— সম্পর্কিত এই শব্দ দুটি পরস্পর নির্ভরশীল। এই নির্ভরশীলতার ব্যাখ্যা নেই সরল এই রূপাদর্শে। 'So this simple model must be abandoned'— এমন সিদ্ধান্ত অনিবার্য হয়ে উঠল।

পদগুচ্ছ সংগঠন ব্যাকরণ :

সীমিত পর্যায় ব্যাকরণ অপর্যাপ্ত বিবেচনায় চমস্কি আরও প্রাগ্রসর একটি রূপাদর্শ উপস্থিত করলেন— পদসজ্জার ব্যাকরণ। একাধিক পদগুচ্ছ (Phrase) রৈখিক বিন্যাসে সমন্বিত হয়ে কিভাবে ব্যাকরণিক একটি বাক্য গড়ে তোলে, এখানে তার পরীক্ষা-নিরীক্ষা করলেন তিনি। চমস্কি উদ্ভাবিত এই দ্বিতীয় রূপাদর্শ প্রথমটির তুলনায় অধিক ক্ষমতাসম্পন্ন, কারণ সীমিত পর্যায় ব্যাকরণ যে ধরনের বাক্য সৃজন করে, পদসংগঠন ব্যাকরণে তা সম্ভব, অধিকন্তু এখানে আমরা আরও বিচিত্র বাক্যের নির্মাণ পাই, যা সীমিত পর্যায় ব্যাকরণে পাওয়া যায় না।

শুরু করা যাক অন্ত্য উপাদানের (অন্বয়স্তরে যে উপাদানগুলি বিশ্লেষণযোগ্য নয়) একটি বাক্য নিয়ে। অন্বয় বলতে আমরা বুঝি বাক্যের অন্তর্গত সংগঠনগুলির (বিশেষ্য পদগুচ্ছ, ক্রিয়া পদগুচ্ছ, অনুসর্গ পদগুচ্ছ ইত্যাদির) সম্পর্কের অনুধাবন। বাংলার মতো বহু ভাষাতে রূপিম থেকে এই সম্পর্ক বোঝা যায়, কিন্তু ইংরেজিতে শব্দের বিন্যাসই প্রধানত এই সম্পর্কের নির্ধারক।

বাক্য ঃ সুবেশ পুরুষ ও মহিলারা আসছেন।

এই বাক্যটির মধ্যে যে অংক লুকিয়ে আছে, এমন মনে হয় না আমাদের। কিন্তু চমস্কি বাক্য নির্মাণে লক্ষ করলেন অঙ্কশাস্ত্রের প্রতিফলন। ধরা যাক এই অঙ্কটি :

$$x \times (y + z)$$

নিয়ম অনুযায়ী $(y + z)$— এই বন্ধনীর কাজ আগে, তারপর গুণের কাজ। আবার অঙ্কটি যদি হয়

$$x \times y + z$$

তাহলে গুণের কাজ যোগের আগেই করতে হবে। অর্থাৎ

$$(x \times y) + z$$

ধরা যাক $x = 2, y = 3$ এবং $z = 5$,

তাহলে,

১. $x \times (y + z)$
$= x \times (3 + 5)$
$= x \times 8$
$= 2 \times 8$
$= 16$

২. $x \times y + z$
$= (x \times y) + z$
$= (2 \times 3) + z$
$= 6 + z$
$= 6 + 5$
$= 11$

বন্ধনীর ব্যবহারে আমরা দু'রকম উত্তর পাচ্ছি। এবার আসি বাক্যটিতে। 'সুবেশ পুরুষ ও মহিলা' বাক্যাংশটিকে এভাবে দেখা যেতে পারে—

সুবেশ = x, পুরুষ = y, মহিলা = z
শুধুমাত্র পুরুষ সুসজ্জিত হলে বিন্যাসক্রম হবে এই রকম।

$$xy + z$$

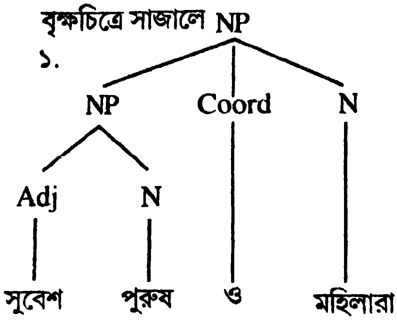
আর পুরুষ ও মহিলা দুপক্ষই সজ্জিত হলে বিন্যাসক্রম হবে এই রকম

$$xy + xz$$

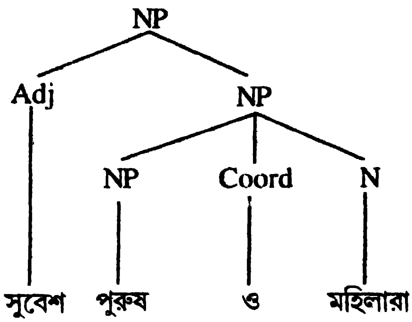
অর্থাৎ ভাষার মধ্যেও আমরা পাচ্ছি অঙ্কের অন্তর্লীন বিন্যাস।

বৃক্ষচিত্রে সাজালে

১.



২.



NP—Noun Phrase

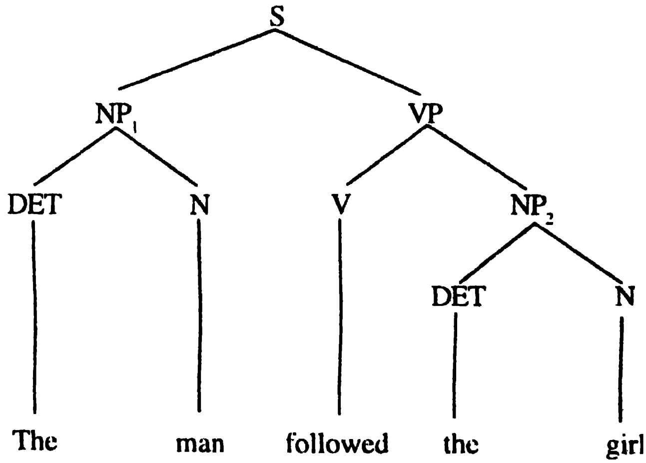
Coord—Coordinator

N—Noun

A—Adjective

বৃক্ষচিত্রের সাহায্যে এভাবে আমরা সাংগঠনিক দ্ব্যর্থকতা (Structural Ambiguity) এড়াতে পারি, ব্লুমফিল্ডপন্থীদের অব্যবহিত উপাদান বিশ্লেষণে যা অনেকক্ষেত্রেই সম্ভব হয়নি।

এবার একটি সম্পূর্ণ বাক্যের বৃক্ষচিত্র উপস্থিত করি— The man followed the girl.



বাক্যের এই সংগঠনে দেখা যাচ্ছে S আধিপত্য করছে NP এবং VP-র উপর। NP আধিপত্য করছে N এবং DET-এর উপর, VP আধিপত্য করছে V এবং NP তথা ক্রিয়া

ও বিশেষ্যগুচ্ছের উপর। বাক্যে NP_1-এর ভূমিকা Subject-এর, রেখাচিত্রে S-এর সঙ্গে তার প্রত্যক্ষ সংযোগ, কিন্তু NP_2-এর ভূমিকা object-এর কারণ S-এর সঙ্গে নয় VP-র সঙ্গেই তার সংযোগ প্রত্যক্ষ। বাক্যটি র সংগঠন সম্ভব হচ্ছে ছয়টি সূত্রের সাহায্যে। যেমন S পুনর্লিখিত হচ্ছে NP VP

১. S → NP	VP	৪. V → followed
২. VP → V	NP	৫. DET → the, a
৩. NP → DET	N	৬. N → man, girl

বাক্যটি নির্মাণে যে সূত্রাবলি প্রযুক্ত হয়েছে, তার মধ্যে স্পষ্ট একটি বিভাজন আছে। প্রথম তিনটি নিয়ম বাক্যগঠন সম্পর্কিত, আর শেষ তিনটি শব্দাবলি সম্পর্কিত, অর্থাৎ বাক্য নির্মাণে phrase structure-এর সঙ্গে Lexical দিকটিও গুরুত্বপূর্ণ। ধরা যাক বাক্যের অন্তর্গত ক্রিয়াপদের কথা। ক্রিয়াটি যদি সকর্মক হয় তাহলে আমরা আশা করব ক্রিয়ার অর্থকে পূর্ণতা দিতে আসবে একটি বিশেষ্য পদগুচ্ছ (NP), আর যদি ক্রিয়াটি অকর্মক হয় তাহলে সেখানে এই NP-র প্রয়োজন থাকবে না। যেমন এই দুটি ক্রিয়া—

follow : V + {NP}

Smile : V – NP

আবার এই বিশেষ্য পদগুচ্ছ কি জাতীয় হবে, সেটাও বোঝা যায় ঐ ক্রিয়া থেকেই। ধরা যাক Drink ও Admire এই দুটি ক্রিয়া। Drink-এর ক্ষেত্রে বিশেষ্য পদগুচ্ছের অন্তর্গত যে বিশেষ্য পদটি তা হবে [+ তরল] আর Admire-এর অনুষঙ্গে যে বিশেষ্য পদগুচ্ছ আসবে তার স্বলক্ষণ [+ মানবিক]।

আমরা যদি ভাবি ওপরের বৃক্ষচিত্র একটিমাত্র বাক্য সংগঠনের প্রতিফলন, তাহলে ভুল করব। এই একটি নিয়ম থেকে আমরা গঠন করতে পারি অনেকগুলি বাক্য। যেমন—

The girl followed a man.

The girl followed the young man.

The young man with a paper followed the girl in a blue dress.

The girl in a blue dress followed the young man with a paper. ইত্যাদি।

এখানে যে বাক্যটির সংগঠন বিশ্লেষণ করা হল তা Context free বা প্রসঙ্গমুক্ত x→y সংগঠন, যেখানে x একটিমাত্র উপাদান, y এক বা একাধিক উপাদানের পদগুচ্ছ। বাক্য যদি প্রসঙ্গ-সংবেদী (context sensative) হয়, তবে তার সূত্রায়ণ হবে

x → y / w — v [অর্থাৎ বাঁদিকে w এবং ডানদিকে v-র প্রতিবেশেই শুধুমাত্র x পুনর্লিখিত হবে y রূপে]

বলাবাহুল্য, প্রসঙ্গ-সংবেদী ব্যাকরণ প্রসঙ্গমুক্ত ব্যাকরণের তুলনায় অধিকতর শক্তিশালী। কারণ প্রসঙ্গমুক্ত ব্যাকরণে যে সকল বাক্য সৃজন সম্ভব হয়, প্রসঙ্গ সংবেদী ব্যাকরণেও তা সম্ভব। কিন্তু তার বিপরীত সম্ভব নয়।

সংবর্তন ব্যাকরণ :

সংবর্তন ব্যাকরণের কেন্দ্রীয় ব্যক্তিত্ব নোয়াম আব্রাম চমস্কি (১৯২৮)। নিকট অতীতে ভাষাতত্ত্ব আলোচনার দুটি ধারা— একটির নাম সাংগঠনিক ভাষাতত্ত্ব অন্যটি সংবর্তন

সঞ্জনন ব্যাকরণ। প্রথমটি প্রধানত ব্লুমফিল্ডপন্থী, দ্বিতীয় ধারার পথিকৃৎ নোয়াম চমস্কি। দ্বিতীয় ধারার সূচনা চমস্কির syntactic structures (১৯৫৭) বইটির প্রকাশকাল থেকে। প্রথম ধারার উৎস ১৯৩৩ সাল, ব্লুমফিল্ডের Language বইটির প্রকাশকাল, যদিও দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের আগে পর্যন্ত তার স্বীকৃতি ব্যাপক ছিল না। সাংগঠনিক ভাষাতত্ত্বের অনুধাবন থেকে সরে এসে চমস্কি কী নতুন সংযোজন ঘটালেন, বর্তমান প্রসঙ্গে তা আমরা কিছুটা বুঝে নেবার চেষ্টা করব।

বাক্যের অন্তর্গত শব্দের দুরকম অর্থ থাকে। এক ধরনের অর্থ আভিধানিক। যেমন ছাগল শব্দটি বলার সাথে সাথে বাস্তবজগতে একটা ছাগলের উপস্থিতির কথা আমাদের মনে আসে। আর এক ধরনের অর্থ সাংগঠনিক। অভিধান আমাদের বলে দেয় না বাক্যের মধ্যে অবস্থান-ভেদে শব্দ কী ভূমিকা নেবে। যেমন এই দুটি বাক্যে—

ছাগল ঘাস খায়

রাম ছাগলকে ঘাস খাওয়াচ্ছে।

প্রথম বাক্যে ছাগল শব্দের অবস্থান দ্বিতীয় বাক্য থেকে আলাদা। অবস্থান-ভেদে ভূমিকাও বদলে গেছে। প্রথম বাক্যে ছাগল কর্তা, দ্বিতীয় বাক্যে কর্ম। শব্দের এই ব্যাকরণগত বিন্যাসের মধ্যে আমরা পাই সাংগঠনিক অর্থ। একটি বাক্য বুঝতে হলে বাক্যের অন্তর্গত শব্দগুলির আভিধানিক অর্থ যেমন জানা দরকার তেমনি সাংগঠনিক অর্থ বোঝাটাও জরুরি।

চার্লস কারপেনটার ফ্রিজ সাংগঠনিক অর্থ প্রসঙ্গে বলেছেন The grammar of the language consists of the devices that signal structural meanings। বাক্যে structural signal বা ব্যাকরণগত সংকেত যদি অনুপস্থিত থাকে তাহলে অভিপ্রেত অর্থ স্পষ্ট হয় না। উল্লিখিত দ্বিতীয় বাক্যে ছাগল শব্দটির সঙ্গে যে 'কে' বিভক্তি যুক্ত আছে সেটা যদি না থাকে তাহলে বাক্যটি দাঁড়াবে— রাম ছাগল ঘাস খাওয়াচ্ছে যা অর্থহীন। ফ্রিজ দৃষ্টান্ত দিয়েছেন—

Ships sails today

বাক্যটি দ্ব্যর্থক। Ship এবং Sails উভয়েই বিশেষ্য হতে পারে, আবার ক্রিয়াও হতে পারে। অবশ্য ব্যাকরণগত সংকেত যদি থাকে তবে এই দ্ব্যর্থকতা থাকবে না। যেমন—

The ship sails today

Ship the sails today

The একটি ব্যাকরণিক সংকেত। প্রথম বাক্যে তা Ship-কে বিশেষ্যের ভূমিকা দিচ্ছে, দ্বিতীয় বাতেক্য sails-কে। ব্যাকরণিক সংকেত উপস্থিত থাকায় দুটি বাক্যের অর্থও এক থাকছে না। বোঝা যাচ্ছে আভিধানিক অর্থ থেকে সাংগঠনিক অর্থ আলাদা। ফ্রিজ ভিন্ন একটি দৃষ্টান্তে দেখিয়েছেন আভিধানিক অর্থ ছাড়াই ব্যাকরণিক বা সাংগঠনিক অর্থ থাকতে পারে। যেমন—

Woggles ugged diggles

বাক্যে শব্দের অবস্থান থেকে, শব্দের চেহারা থেকে আমরা বুঝতে পারি woggles এবং diggles হচ্ছে বিশেষ্য এবং ugged হল ক্রিয়া। অর্থাৎ অর্থ-নিরপেক্ষভাবে বাক্যের পদভাগের একটা ধারণা আমরা পেতে পারি। ফ্রিজের ধারণা অনুযায়ী দ্ব্যর্থকতা আসে ব্যাকরণগত সংকেতের অনুপস্থিতিতে। নোয়াম চমস্কি দেখালেন গঠনগত সংকেত থাকলেও বাক্য বা

বাক্যাংশ দ্ব্যর্থক হতে পারে। তাঁর syntactic structures থেকে সংকলিত একটি দৃষ্টান্ত এইরকম—

The shooting of the hunters.

এই ব্যাকাংশের অর্থ হতে পারে (১) the hunters shot something, অথবা (২) someone shot the hunters। এখানে আমরা পাচ্ছি একই বাক্যাংশের দুটি অর্থ। বোঝা যায় ship sails today-র দ্ব্যর্থকতা থেকে এটা ভিন্ন রকমের। সংগঠনবাদীরা বলতে পারেন ব্যাকরণিক শব্দ 'of' থাকার জন্যই এই দ্ব্যর্থকতা। যেখানে শব্দ পরম্পরা gerund-of-noun, সেখানে অর্থের এই অস্পষ্টতা আসতেই পারে। কিন্তু এ ধারণাও ঠিক নয়। চমস্কি একই গড়নের আরও দুটি বাক্যাংশের দৃষ্টান্ত দিলেন—

The growling of lions.

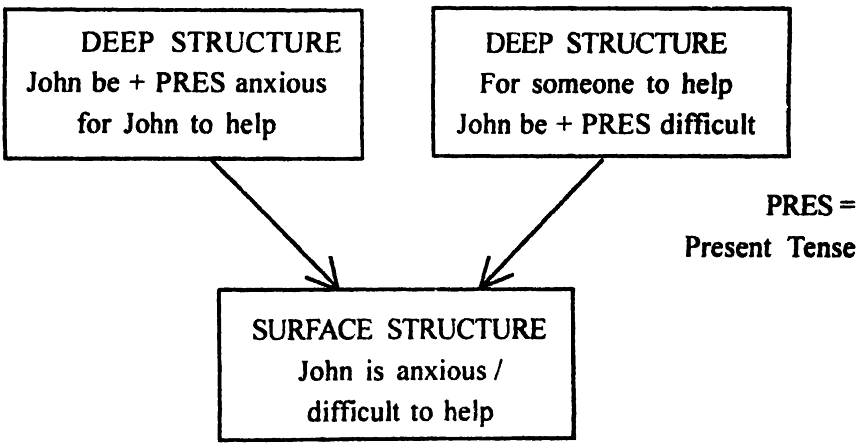
The raising of flowers.

এক্ষেত্রে কোনো বাক্যাংশই দ্ব্যর্থক নয়। প্রসঙ্গত আরও দুটি দৃষ্টান্ত :

John is anxious to help.

John is difficult to help.

সমগঠনের দুটি বাক্য। কিন্তু বাক্য দুটি যে মূলত পৃথক তা বুঝতে অসুবিধে হয় না। প্রথম বাক্যে John নিয়ন্ত্রক, দ্বিতীয় বাক্যে John নিয়ন্ত্রিত। রেখাচিত্রে এভাবে দেখানো যায়—

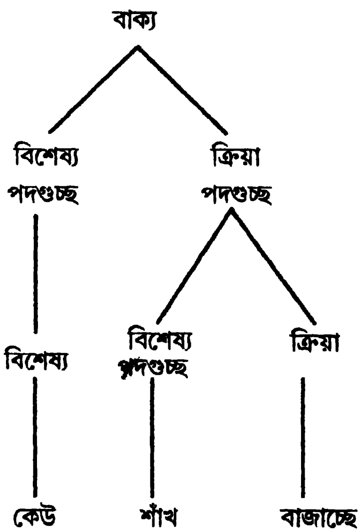


চমস্কি তাঁর *Aspects of the Theory of Syntax* (1965) বইটিতে আনলেন এই নতুন ধারণা। এখানে অধোগঠনের (Deep structure) যে বাক্যটি থেকে অধিগঠনে (Surface structure) সংবর্তন ঘটছে, অধোগঠনের সেই বাক্যটি আমরা মুখে বলি না, কারণ বাক্যটি বিমূর্ত, আমরা ব্যবহার করি অধিগঠনের মূর্ত বাক্যটিকে। অধোগঠনে সাজানো থাকছে অর্থের উপাদান, অধিগঠনে তা সঞ্জাত হচ্ছে সুগঠিত ব্যাকরণিক বাক্যে। অর্থাৎ বাক্যেরও যে দুটি স্তর থাকে— অধিতল ও অধোতল, তথ্য হিসেবে এটা এতই চমকপ্রদ যে প্রথমত বিশ্বাস হতে চায় না। কিন্তু যখন নিজের ভাষাতেই একটু তলিয়ে বুঝি, তখন আর অস্বীকার

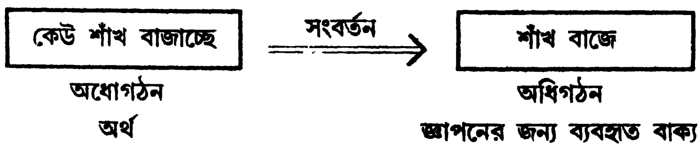
করা যায় না। যেমন এই দুটি বাক্য— পাখি ডাকে, শাঁখ বাজে। গড়নের দিক থেকে দুটি বাক্যই একইরকম—

বিশেষ্য	ক্রিয়া
পাখি	ডাকে
শাঁখ	বাজে

একটু ভেতরে গেলে বুঝতে পারি বাক্য দুটি এক নয়। পাখি নিজে ডাকছে। কিন্তু শাঁখ কি নিজে বাজছে, না কি কেউ তাকে বাজাচ্ছে? অর্থ সন্ধানে শেষ পর্যন্ত বাক্যটির অধোতলে আমাদের যেতেই হয়। অধোতলে বাক্যটি হবে এইরকম—

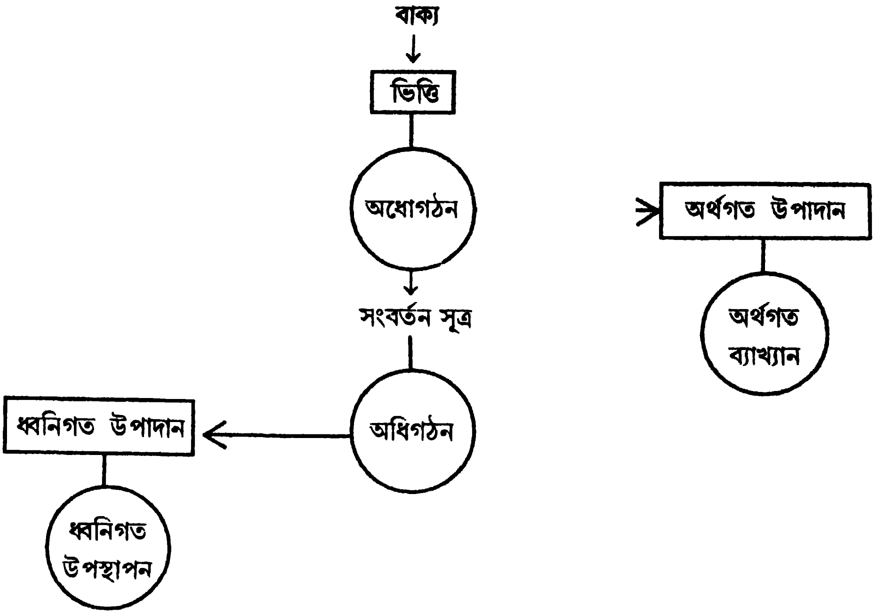


রেখাচিত্রে স্পষ্ট— শাঁখের ভূমিকা কর্মের অর্থাৎ যার উপর 'বাজাচ্ছে' ক্রিয়াটি আরোপিত হচ্ছে। সংবর্তনের পরিণতি এইরকম—



সংবর্তনের ফলে অধোগঠনের কর্তা অনুক্ত থাকছে, কর্ম আসছে কর্তার অবস্থানে, ক্রিয়ার সাযুজ্য-সংবর্তন ঘটছে।

চমস্কির ধারণা অনুযায়ী পূর্ণাঙ্গ একটি বাক্যের সংগঠন কী হতে পারে এখন তার একটি চিত্ররূপ উপস্থিত করা যাক—



দেখা যাচ্ছে বাক্যের মূল বিষয়টা হল অধোগঠন থেকে সংবর্তনের মাধ্যমে অধিগঠনের সঞ্জনন (Generation)। অধোগঠনের সঙ্গে সম্পর্কিত অর্থগত উপাদান আর অধিগঠনের সঙ্গে সম্পর্কিত ধ্বনিগত উপাদান।

Aspects-এর আদর্শ তত্ত্বে বাক্যের ভিত্তি হিসেবে অধোগঠন সংরচনায় ক্রিয়াশীল থাকে পদগুচ্ছ সংগঠনসূত্র এবং শব্দকোষ, যা থেকে শব্দাবলি বিন্যাস পায় বহির্বৃত (output) পরিণতি হিসাবে। যেমন সরলীকৃত এই রেখাচিত্রে—

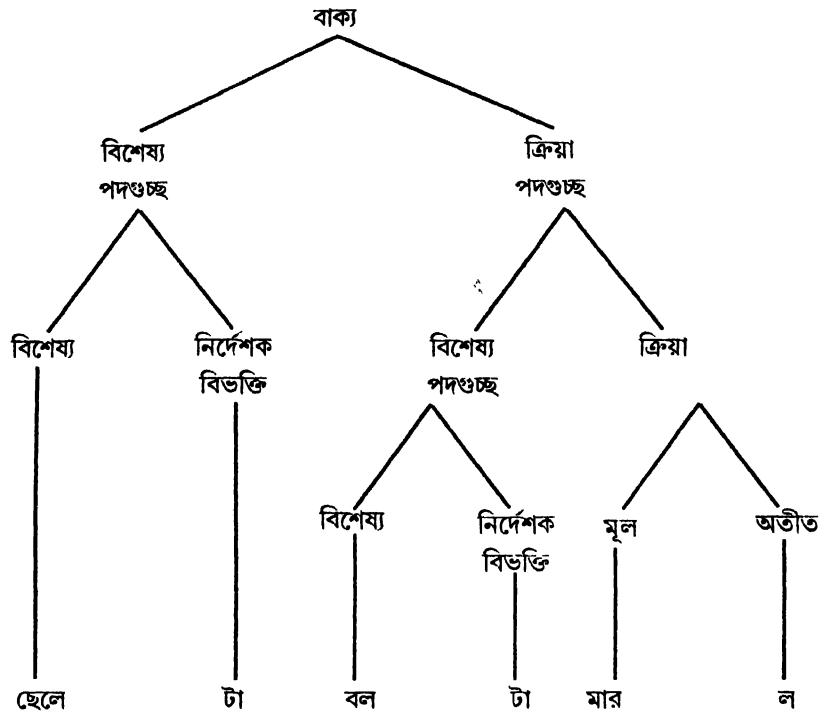
ভিত্তি

পদগুচ্ছ সংগঠন সূত্র			শব্দকোষ	
বাক্য →	বিশেষ্য পদগুচ্ছ	ক্রিয়া পদগুচ্ছ	ছেলে	বিশেষ্য
ক্রিয়া পদগুচ্ছ →	ক্রিয়া পদগুচ্ছ	বিশেষ্য পদগুচ্ছ	বল	বিশেষ্য
			মারল	ক্রিয়া
বিশেষ্য পদগুচ্ছ →	বিশেষ্য	নির্দেশক বিভক্তি	নির্দেশক বিভক্তি	টা

অধি গঠন

বাক্য

[বাক্য চিত্র পরের পৃষ্ঠায়]



এই অধোগঠন, অতঃপর, সংবর্তিত হয়ে পরিণত হবে অধিগঠনে। তখনও তা বিমূর্ত, তখনও তা পায়নি ধ্বনিরূপ। এখানেই ধ্বনিগত উপাদানের ভূমিকা যা অধিগঠনকে দেয় ধ্বনিগত উপস্থাপন। আবার আদর্শতত্ত্বে অধিগঠনে অর্থান্তর সম্ভব নয়। অর্থ অধোগঠনে সম্পৃক্ত। এখানে তাই অর্থগত উপাদানের ভূমিকা অধোগঠনে অর্থগত ব্যাখ্যান। আমরা বলতে পারি একটি বাক্য তখনই সঞ্জাত হল যখন সেখানে থাকে অন্বয়গত, অর্থগত ও ধ্বনিগত উপস্থাপনা। পৃথিবীর সব ভাষাতেই আছে দুটি স্তর— অধোগঠন ও অধিগঠন। অধোগঠন বাক্যকে দেয় অর্থ, অধিগঠন দেয় জ্ঞাপনের উপযোগী বিন্যাস। অধোগঠন বিমূর্ত, এটা এমন একটা বিন্যাস যা বাক্যের অর্থ ও অন্বয়ের ভিত্তি। অধিগঠনে পাই শ্রুতি-পদার্থিক বাস্তবতা যা বিন্যস্ত শব্দের উচ্চারণে ধরা দেয়। অধিগঠন ও অধোগঠনের মধ্যে সম্পর্ক স্থাপন করে সংবর্তন, একটি গঠনকে তা রূপান্তরিত করে অন্য একটি গঠনে। কী প্রক্রিয়ায় সংবর্তন একটি গঠনকে অন্য একটি গঠনে বদলে দেয় এখানে তার কয়েকটি সূত্র আমরা লক্ষ করব।

॥ চার রকম সংবর্তন সূত্র ॥

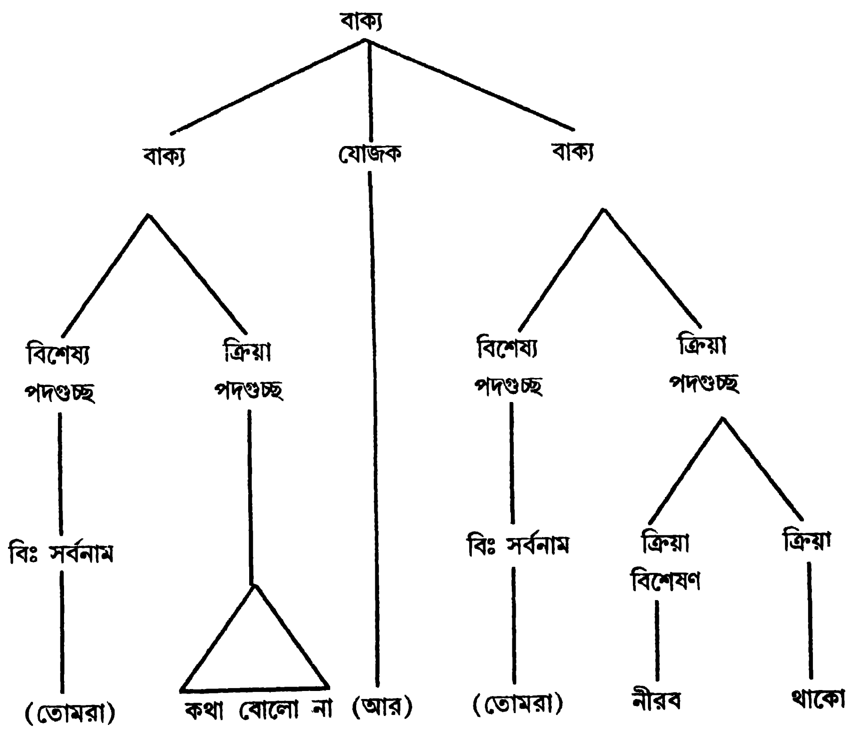
মানব ভাষায় সংবর্তন সূত্র হতে পারে চার রকমের— বিলোপন (deletion), সংযোজন (insertion), বিকল্পন (substitution) এবং স্থানান্তরণ (movement)।

বিলোপন

সংবর্তন ব্যাকরণের প্রাথমিক স্তরে (১৯৫৭) চমস্কি বীজবাক্য বা অন্তঃসার বাক্য (kernel sentence) থেকে সংবর্তনের মাধ্যমে নতুন নতুন বাক্য উদ্ভাবনের কথা বলেছিলেন। যেমন

একটি অন্তঃসার বাক্য— বিল্টু অসুস্থ। এই বাক্য থেকে নেতি সংবর্তনে পাই— বিল্টু অসুস্থ নয়, প্রশ্ন সংবর্তনে— বিল্টু কি অসুস্থ? প্রশ্ন ও নেতি সংবর্তনে— বিল্টু কি অসুস্থ নয়? এভাবে অসংখ্য বাক্য তৈরি হতে পারে। আর এই স্বাধীনতাকে ব্যবহার করে এরকম বাক্যরচনাও অসম্ভব নয়— বিল্টু লম্বা আর মিন্টু ব্যস্ত। তাই কোথাও একটা অন্তরায় (constraint) থাকা দরকার যার সীমানা পেরিয়ে বাক্য গঠন করা যাবে না। আর তাই দেখা দিল সংবর্তনে অর্থ সংরক্ষণের এই ভাবনা— 'No transformational rule is allowed to change meaning।'

সংবর্তনে অর্থ যথাযথ বজায় রেখে দুরকম বিলোপন ঘটতে পারে— একটি সুস্থিত (constant), অন্যটি অভিন্ন (identical) উপাদানের বিলোপন। সুস্থিত বিলোপনের দৃষ্টান্ত বাংলা অনুজ্ঞা বাক্য। যেমন 'তুমি বসে থাকো' বাক্যে আমরা 'তুমি' বাদ দিই, বলি— বসে থাকো। 'তোমরা কথা বোলো না' বাক্যটিতে বাদ দিই— 'তোমরা'। প্রথাগত ব্যাকরণে একে বলা হয় 'অনুক্ত কর্তা'।



এই বৃক্ষচিত্রে কর্তা 'তোমরা' যেমন বাদ যাচ্ছে তেমনি বাদ যাচ্ছে যোজক 'আর'।

অভিন্ন বিলোপনে কোন্ শব্দটি বাদ যাবে সেটা স্থির নির্ধারিত নয়, তবে যেটা লক্ষণীয় তা হল অভিন্ন প্রতিপক্ষের একটি বাদ যায়, অন্যটি থাকে। যেমন এই দৃষ্টান্তে—

If anything can go wrong, it will go wrong.

If anything can go wrong, it will.

কোনো স্বভাষী কথক দুটি বাক্যের অর্থগত অভিন্নতা নিয়ে প্রশ্ন তুলবেন না। বাক্য দুটি মূলত একই। দ্বিতীয় বাক্যের বিলোপিত অংশ 'go wrong', যা বিলুপ্ত হয়েছে সহায়ক will-এর অব্যবহিত পরেই। সংবর্তন ব্যাকরণের রূপাদর্শে আমরা পাই মগ্ন গঠন থেকে উদ্ভাবিত একটি অধিগঠন। মগ্ন গঠন থেকে অধিগঠনে বাক্যের উদ্ভাবন (derivation) ঘটাতে প্রযুক্ত হয় সংবর্তনসূত্র। এই বিষয়ে McCawley (1974)-এর মন্তব্য স্মরণযোগ্য—

'A grammar...would be transformational if it involves the notion of a derivation, consisting of some kind of underlying structure and steps leading from it to a surface structure, where all steps of the derivation are represented as trees, and it involves a system of rules that specify how the different stages of a derivation are related to each other.'

নিম্নরূপ যুগ্মবাক্যে বিলোপনের আরও কিছু দৃষ্টান্ত—

(১) ক. আমি জানি যে বিল্টু দেরিতে আসে।
খ. আমি জানি বিল্টু দেরিতে আসে।

(২) ক. যাবার আগে আমাদের কিছু খেতে হবে।
খ. যাবার আগে আমাদের খেতে হবে।

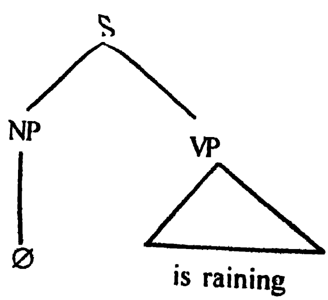
(৩) ক. বিল্টু খেলছিল ডাংগুলি, বিলু খেলছিল হাডুডু।
খ. বিল্টু খেলছিল ডাংগুলি, বিলু হাডুডু।

লক্ষণীয় সংবর্তিত প্রতিটি 'খ'-বাক্যে 'ক' বাক্যের বিলুপ্ত অংশের উদ্ধার কিছু কঠিন নয়।

॥ সংযোজন ॥

বিলোপন সূত্রে আমরা লক্ষ করেছি অর্থের অভিন্নতা। সংযোজনের ক্ষেত্রে লক্ষ করব সংযোজিত অংশের অর্থহীনতা। বৃষ্টি হলে ইংরেজিতে বলা হয়— it is raining। এই 'it' শব্দের অর্থ কি? যদি বলা যায় *Mina picked up a snake and it bit her* তাহলে it শব্দটা যে snake-এর সমার্থক সেটা বোঝা যায়। কিন্তু *it* আর raining সমার্থক কিংবা *it* বৃষ্টি দেয় *এমনটা ভাবা যায় না।*

বাংলায় সমধর্মী বাক্য— বৃষ্টি হচ্ছে। ইংরেজির নিয়ম— অনুজ্ঞা ভিন্ন একটি অধিতল কর্তা বাক্যে অবশ্যই রাখতে হবে, তার অস্তিত্বের কোনো যৌক্তিকতা থাক বা না থাক।



ইংরেজির অধিতল বাক্য এরকম হতে পারে না, তাই শূন্যায়তনে 'it' সংযোজিত হয়। আর এই 'it' যে অর্থহীন একটা শূন্যকর্তা তা সহজেই বোঝা যায়। নীচের বাক্যগুলিতেও আমরা

অনুরূপ দৃষ্টান্ত পাই—

a. It is ten past twelve.
b. It is two miles to the beach.
c. It is long time since they left.
d. It is quite warm in the momet.

এরকম আর একটি রীতি 'there' সংযোজন—

There are two people waiting outside.

এখানে there শব্দটির কোনো নিজস্ব অর্থ আছে কি? তুলনা করা যাক নীচের বাক্যটির সঙ্গে।

We went on to Paris and stayed there eleven days. এখানে there অর্থবহ, প্রথম বাক্যটির মতো অর্থহীন 'অতিরিক্ত' নয় আমরা ইচ্ছে করলে there বাদ দিয়েও প্রথম বাক্যটি লিখতে পারি

Two peoples are waiting outside.

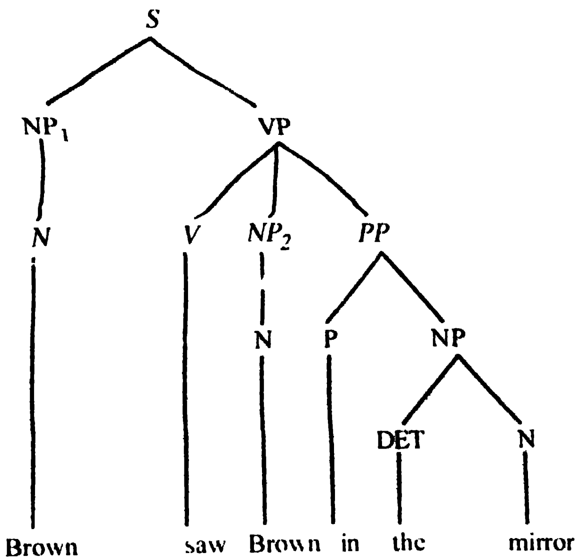
দেখা যাচ্ছে সংযোজন সূত্র দুরকম হতে পারে— বাধ্যতামূলক ও ঐচ্ছিক। বাধ্যতামূলক সূত্র প্রয়োজন হয় অধিতল বাক্যটির ব্যাকরণগত রূপ দিতে। It সংযোজন বাধ্যতামূলক, কারণ ইংরেজির ব্যাকরণসম্মত বাক্য is raining হতে পারে না। ঐচ্ছিক সূত্রে প্রাধান্য পায় কথক/ লেখকের নির্বাচন। সেক্ষেত্রে ব্যবহারগত দিকটাই বিবেচ্য।

॥ বিকল্পন ॥

বিকল্পন সূত্রে আমরা লক্ষ করি বাক্যের একটি অংশ বদলে যায় বিকল্পের মাধ্যমে।

Brown saw Brown in the mirror.

এরকম বাক্য গ্রহণযোগ্য নয়। বৃক্ষচিত্রে বাক্যটি এইরকম—



দুটি NP এখানে অভিন্ন। তাই প্রয়োজন আত্মবাচক সর্বনাম (Reflexive pronoun)। আত্মবাচক সংবর্তন তখনই প্রযুক্ত হয় যখন মগ্ন কর্তা ও কর্ম থাকে একই। মগ্ন কর্তা ও কর্ম যদি ভিন্ন হয়, সেখানে অবশ্য এই সংবর্তন সম্ভব নয়।

Brown$_1$ saw Brown$_1$

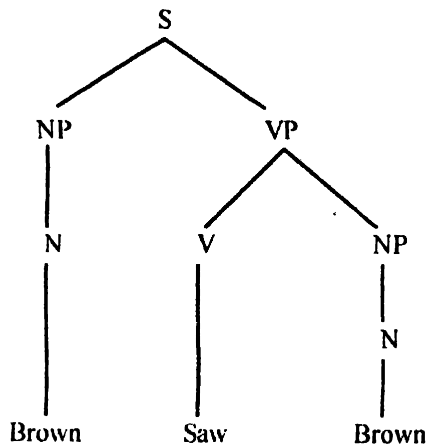
সংবর্তন

আত্মবাচক

↓

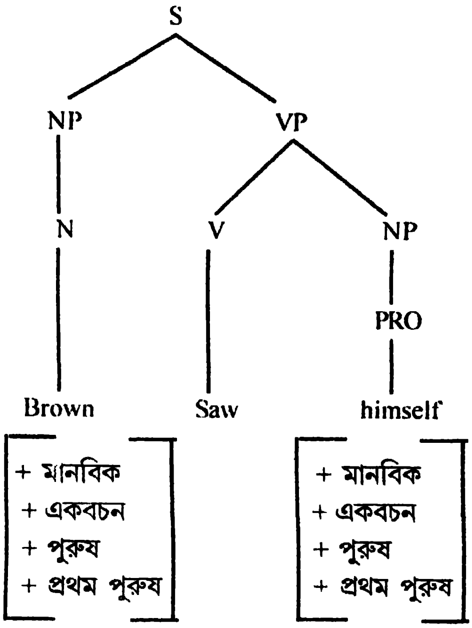
Brown saw himself

কিন্তু বাক্যটি যদি হয় Brown saw John, আত্মবাচক সংবর্তন সূত্র প্রযুক্ত হবে না। সংবর্তনে স্বলক্ষণগত সমধর্মিতাও লক্ষণীয়—



+ মানবি	+ মানবিক
+ একবচন	+ একবচন
+ পুরুষ	+ পুরুষ
+ প্রথম পুরুষ	+ প্রথম পুরুষ

এই মগ্ন বা গহন গড়ন থেকে আত্মবাচক সংবর্তনে যে বাক্য পাচ্ছি, সেখানেও আছে স্বলক্ষণগত সমতা :



কিন্তু Brown saw John-এর মতো কোনো সংগঠন যেখানে ক্রিয়ার কর্তা ও কর্ম ভিন্ন সেখানে কি বিকল্পন আদৌ সম্ভব নয়? সেখানে বিকল্পন আসতে পারে সর্বনামীয়করণে। যেমন Brown saw him অথবা he saw Brown।

সংবর্তন তত্ত্বে সূত্র-পরম্পরা একটি গুরুত্বপূর্ণ দিক। কোন্ সূত্র আগে আর কোন্‌টি পরে প্রযুক্ত হবে সে সম্পর্কে সচেতন না হলে এমন অধিগঠন তৈরি হতে পারে যা ব্যাকরণগত ভাবে গ্রহণযোগ্য নয়। উদাহরণ স্বরূপ আমরা দেখব আত্মবাচক সূত্র ও অনুজ্ঞা বিলোপনে একটি বিন্যাসগত সম্পর্ক ক্রিয়াশীল। যেমন নীচের এই বাক্যগুলি—

ক. Yow see yourself.

খ. See yourself.

গ. *See you.

অন্যদিকে আত্মবাচক এবং অনুজ্ঞা বিলোপনের বিন্যাস বদলে গেলে আমরা আর বেশি দূর এগোতে পারি না। যেমন,

মগ্ন গঠন : # অনুজ্ঞা you$_1$ behave you$_1$

অনুজ্ঞা বিলোপনে : # অনুজ্ঞা Ø behave you$_1$ #

এরপর আত্মবাচক সূত্র আর আরোপ করা যাচ্ছে না। আমরা এমন কোনো ক্রিয়া পাচ্ছি না যার কর্তা ও কর্ম অভিন্ন যেহেতু কর্তা আগেই বিলোপিত। ইংরেজি যাদের মাতৃভাষা তাদের কাছে behave you গ্রহণযোগ্য নয়। তাই প্রয়োজন হয় একটা বিপরীত বিন্যাস—

মগ্ন গঠন : # অনুজ্ঞা you$_1$ behave you$_1$ #

আত্মবাচকতা : # অনুজ্ঞা you behave yourself #

অনুজ্ঞা বিলোপনে : # অনুজ্ঞা Ø behave yourself #

এবার পাওয়া যাচ্ছে স্বাভাবিক বাক্যটি, সূত্রায়ণের বিন্যাসে যেহেতু প্রথমে এল আত্মবাচকতা আর তারপর অনুজ্ঞার বিলোপন।

॥ স্থানান্তরণ ॥

একটা সরল স্থানান্তরণ সূত্র হল প্রসঙ্গায়ন (Topicalization)। বাক্যে যে উপাদানগুলি আছে তার মধ্যে কোনো একটিকে যদি গুরুত্ব দিতে চাই, তাকে আমরা বাক্যের প্রথমেই বসাই। যেমন—

তোমার দাদা কোথায় গেলেন

তোমার কথাটা প্রথমেই এসেছে তার কারণ এ বাক্যে এই কথাটাই বোঝানো হচ্ছে— অন্যের দাদা নয়, তোমার দাদার কথাই বক্তা জানতে চাইছেন। আর যখন বলা হচ্ছে—

কোথায় তোমার দাদা গেলেন

তখন গন্তব্যটাই গুরুত্বপূর্ণ হয়ে উঠছে। কিংবা

গেলেন কোথায় তোমার দাদা

ক্রিয়াপদের এই সম্মুখনে যাওয়ার ব্যাপারটাই গুরুত্ব পাচ্ছে।

প্রসঙ্গায়ন অবশ্য একটি ঐচ্ছিক নিয়ম। ইংরেজি প্রশ্নবাক্য গঠনে স্থানান্তরণ বাধ্যতামূলক, ঐচ্ছিক নয়। এই নিয়ম আমাদের বলে দেয়— সহায়ক ক্রিয়াকে তার অবস্থান থেকে সরিয়ে আনতে হবে কর্তা NP-র বাঁ দিকে। যেমন—

মগ্ন গঠন : # Q John will bring the book #

প্রশ্ন গঠনে : # Q will John bring the book #

সহায়ক ক্রিয়ার অনুপস্থিতে প্রয়োজন হয় Do-সংযোজনের (Do-insertion)

Q you speak English

প্রশ্ন সংগঠনে : # Q Do you speak English #

আর একটি স্থানান্তরণ সূত্র হল— Extraposition বা অধিসংস্থাপন, যেখানে একটি বাক্যের কর্তা হিসেবে দেখা দেয় অন্য একটি বাক্য আর এভাবেই কর্তা-বাক্যের গ্রথনে রচিত হয় একটি পূর্ণাঙ্গ বাক্য। উদ্ভাবন (derivation) পদ্ধতি এইরকম—

a. # that you are tired upsets me #

b. # ∅ upsets me that you are tired #

c. It upsets me that you are tired.

পদসংগঠন সূত্র এবং সংবর্তন সূত্রের পার্থক্যও এ প্রসঙ্গে অনুধাবনযোগ্য। বৃক্ষচিত্রে প্রতিফলিত পদসংগঠন সূত্র বাক্যের অন্তর্গত শব্দগুলির পারস্পরিক সম্পর্ক নির্দেশ করে। পক্ষান্তরে সংবর্তন সূত্রের কাজ পদগুচ্ছ সংগঠন সূত্রের সাহায্যে গঠিত বাক্যের বিমূর্ত উপস্থাপনকে অধিসংগঠনের মূর্ত অবয়বে রূপান্তরিত করা। এক্ষেত্রে পদসংগঠন সূত্রের যা output, সংবর্তনে তাই input হিসেবে দেখা দেয়। নতুন উপাদানের সংযোজন, অধোগঠনের কোন একটি উপাদানের বিলোপন কিংবা অধোগঠনের উপাদানসমূহের পুনর্বিন্যাস— ইত্যাদি সংবর্তন সূত্রের করণীয়। পদসংগঠন সূত্র আবশ্যিক অর্থাৎ যেখানে তা প্রয়োগের সুযোগ থাকে সেখানে অবশ্যই প্রযুক্ত হবে। অন্যদিকে কিছু সংবর্তন সূত্র আবশ্যিক, কিছু ঐচ্ছিক। একজন আলোচক যথার্থই লিখেছেন—

'Phrase structure rules and transformational rules have quite different functions. Basically, phrase structure rules account for the grammatical relations that are inherent in the sentence. The deep structure contains both the words and their grammatical relations. In other words, the deep structure

accounts for the basic meaning of a sentence. The transformational rules, on the other hand, play only a marginal role in determining meaning. Their main function is to determine the from of the surface sentence... By the application of these transformational rules the deep structure is considerably altered in form, but not in basic meaning.'

সৃজনশীলতা ও অন্তঃস্থকরণ

ভাষার অধিকার আমাদের শেখায় শব্দ দিয়ে শব্দবন্ধ তৈরি করতে, শব্দবন্ধ দিয়ে বাক্য। যে-কোনো একটি ভাষার অভিধান থেকে আমরা সে ভাষার সব বাক্য শিখে নিতে পারি না। একটি ভাষা জানা মানেই আগে কখনও বলা হয়নি, এমন বাক্য ব্যবহার করার ক্ষমতা, আগে কখনও শোনা হয়নি, এমন বাক্য বোঝার ক্ষমতা। এই সামর্থ্যকে নোয়াম চমস্কি বলেছেন ভাষা ব্যবহারে মানুষের সৃজনীশক্তি। ভাষার প্রধান বৈশিষ্ট্য এই সৃজনশীলতার মধ্যে।

সাংগঠনিক ভাষা বিজ্ঞানীরা বিশেভাবে গুরুত্ব দিয়েছিলেন ভাষার স্বনিম ও রূপিমের উপর। কিন্তু যে কোনো ভাষায় স্বনিম সীমিত সংখ্যক আর রূপিমও অসংখ্য নয়। ভাষার সৃষ্টিশীলতায় স্বনিম ও রূপিমের ভূমিকা গুরুত্বপূর্ণ নয়। কিন্তু স্বনিম রূপিম ও শব্দবিন্যাসে যখন আমরা বাক্যে পৌঁছাই তখন যেন একটা অনন্ত অভিজ্ঞতার জগৎ আমাদের হাতছানি দিয়ে ডাকে। মনোগহনের অনুভূতি ভাষায় ব্যক্ত হতে চায়, অসংখ্য মানুষের সীমাহীন অভিজ্ঞতা বাক্যে রূপলাভ করে। চমস্কির ব্যাকরণ ঠিক এখানেই আমাদের আমন্ত্রণ জানায়। কারণ চমস্কির ব্যাকরণের কেন্দ্রে বাক্য, কেন্দ্রে সৃজনশীলতা। আচরণবাদীরা ভাষাকে দেখেছিলেন উদ্দীপক ও প্রতিক্রিয়ার যান্ত্রিক নিয়মের সমাহার হিসাবে। চমস্কি দেখালেন প্রকৃত ব্যাকরণ যান্ত্রিকতার উর্ধ্বে এই সৃজনশীলতাকেই ব্যাখ্যা করে। তাঁর ব্যাকরণের নাম সঞ্জনন সংবর্তন ব্যাকরণ। অধোতলের পদসংগঠন সংবর্তনের মাধ্যমে কীভাবে অধিতলে ব্যবহারযোগ্য বিন্যাস পায়, চমস্কির ব্যাকরণে ভাষার সেই সংবত৩ন-সঞ্জাত বাক্যের রহস্য জানলাম আমরা। সংবর্তনের দুটি দিক— একটি বাধ্যতামূলক, অন্যটি ঐচ্ছিক। ঐচ্ছিক সংবর্তনের মধ্যেই একজন কথক/লেখকের সৃষ্টিশীল স্বকীয়তা।

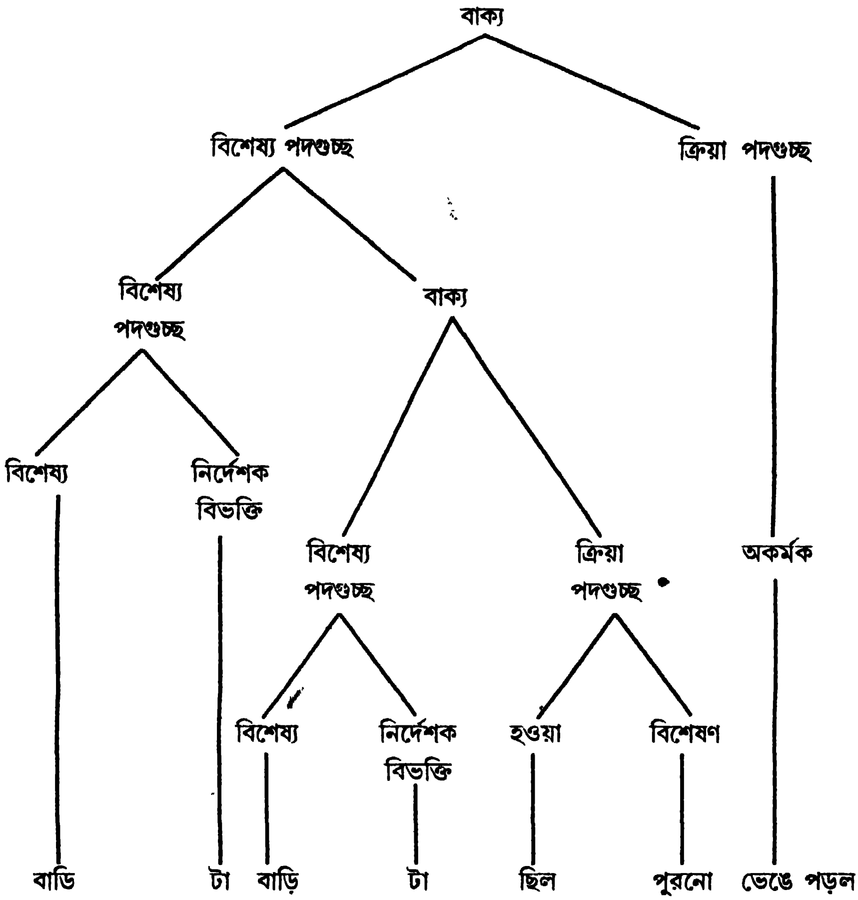
মানুষের ভাষায় সৃজনশীলতার একটি দিক— একাধিক বাক্যকে একটি বাক্যে নিয়ে আসা। এই প্রক্রিয়ায় সংযোজকের (conjuction) একটি ভূমিকা আছে। যেমন, তোমরা এলে আর বৃষ্টিও নামল। আমরা দেখেছি Extraposition বা অধিসংস্থাপনেও একাধিক বাক্য একটি বাক্যে সংহত হতে পারে। তৃতীয় পদ্ধতি সম্পর্কায়ন (relativization), যেখানে আমরা প্রত্যক্ষ করি একাধিক সংবর্তন সূত্রের সক্রিয়তা। এক্ষেত্রে অন্তঃস্থকরণেরও (embedding) যে একটি ভূমিকা আছে তা বলাই বাহুল্য।

যখন সম্বন্ধবাচক একটি অঙ্গবাক্য (clause) উচ্চতর বাক্যে গ্রথিত হয়, তখন তার ক্রিয়াপদের সঙ্গে অঙ্গবাক্যের সাক্ষাৎ সম্পর্ক থাকে না। বরং তা কাজ করে বিশেষণের মতো, উচ্চতর বাক্যের বিশেষ্য পদগুচ্ছ সম্পর্কে কিছু তথ্য জানায়। বোঝা যাচ্ছে এরকম সম্পর্কায়নের ক্ষেত্রে দুটি বাক্যের আশ্রয় একই অভিন্ন NP, যে বিশেষ্যগুচ্ছ দুটি ক্ষেত্রেই মগ্নগঠনে উপস্থিত থাকে। যেমন আমরা এই দৃষ্টান্তে দেখেছি—

ক. বাড়িটা ভেঙে পড়ল।

খ. বাড়িটা ছিল পুরনো।

বাক্য দুটি সমন্বিত হতে পারে নিম্নরূপ মগ্ন গঠনে—



আমাদের ভাষায় যেহেতু এ ধরনের বাক্য (বাড়িটা বাড়ি টা ছিল পুরনো ভেঙে পড়ল) গ্রহণযোগ্য নয়, তাই প্রয়োজন হয় দ্বিতীয় সহনির্দেশক (coreferential) বিশেষ্য পদগুচ্ছের বিকল্পে একটি সম্পর্কসূচক সর্বনাম (relative pronoun)।

বাড়িটা [যা ছিল পুরনো] ভেঙে পড়ল

বাক্যের গ্রহণযোগ্য অধিগঠন নির্মাণে এই নিয়ম বাধ্যতামূলক। এখানেই আমরা থেমে যেতে পারি অথবা সম্বন্ধ সংকোচন সূত্রের সাহায্যে বাক্যটির চেহারা আবারও বদলাতে পারি। ঐচ্ছিক এই সূত্রের সাহায্যে সম্বন্ধসূচক সর্বনাম বাদ যাবে, বাদ যাবে অনুসারী ক্রিয়াপদও। যেমন—

বাড়িটা [Ø Ø পুরনো] ভেঙে পড়ল

বাড়িটা পুরনো ভেঙে পড়ল— এরকম বাক্যও গ্রহণযোগ্য হতে পারে না। তাই প্রয়োজন হয় বাধ্যতামূলক একটি সূত্র— বিশেষণের সম্মুখায়ন—

পুরনো বাড়িটা ভেঙে পড়ল।

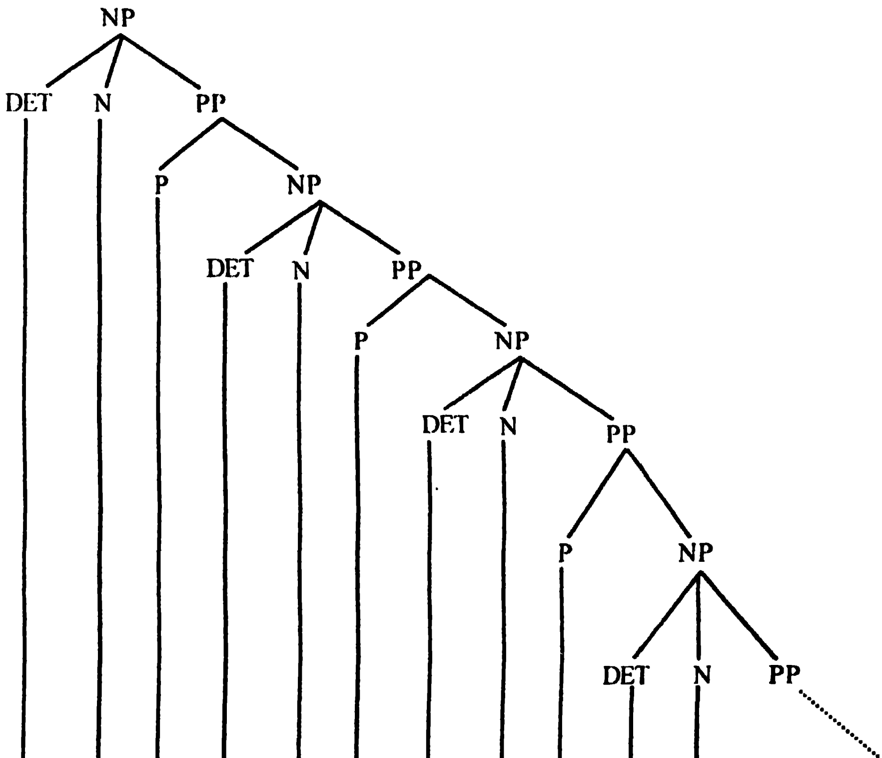
অন্তঃস্থকরণ (Embedding)

দুটি সূত্র উল্লেখ করি—

NP → (DET) N (PP)

এবং PP → P NP

সূত্র দুটির সমন্বয়ে রচিত হতে পারে অসংখ্য বিশেষ্য পদগুচ্ছ। নীচের NP সংগঠন লক্ষ করা যাক—



দেখা যাচ্ছে, NP প্রসারিত হয়ে PP-কে অন্তর্গত করছে, PP আবার NP-কে, NP পুনরায় PP-কে আর এইভাবেই চলছে পুনরাবর্তন (recursive)। পদগুচ্ছ দীর্ঘ কিন্তু অব্যাকরণিক নয়।

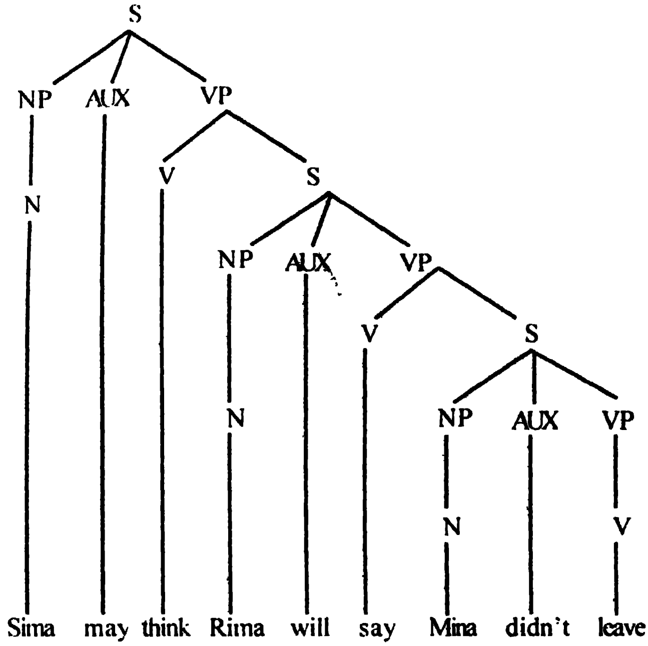
বাক্য এভাবে পুনরাবর্তনে দীর্ঘ হয়, একটি বাক্য অন্তঃস্থ (embedded) হতে পারে আর একটি বাক্যে, তৈরি হতে পারে নতুন নতুন বাক্য। ধরা যাক ক্রিয়া পদগুচ্ছের (VP) অন্তর্গত একটি বাক্য (S)

VP → V (S)

আমরা যদি এই সূত্র অনুসরণ করি, দেখব বাক্যের পদসংগঠন সূত্রে আসছে VP, আর VP-র পদসংগঠন সূত্রে অন্তর্গত হচ্ছে S,

S → NP Aux VP

VP → V (S)



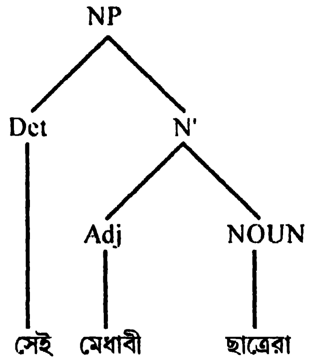
পুনরাবর্তনের একটি দৃষ্টান্ত। বৃক্ষচিত্রের ডানদিকের প্রান্তিক যে বাক্যটি— S, Mina didn't leave তা অন্তঃস্থ হয়ে আছে VP বা ক্রিয়াবন্ধনের একটি দীর্ঘবাক্যে Rima will say Mina didn't leave যা পুনরায় আরও দীর্ঘ একটি বাক্যে অন্তঃস্থ— Sima may think Rima will say Mina didn't leave। যে বাক্য এইভাবে দীর্ঘবাক্যে অন্তঃস্থ হয়, তাকে বলা যায় অন্তঃস্থ অঙ্গবাক্য (embedded clasue) আর অঙ্গবাক্য যে দীর্ঘবাক্যে গ্রথিত হয় তার নাম অন্তঃস্থক বাক্য (matrix sentence), এখানে যেমন Rina will say Mina didn't leave একটি অন্তঃস্থক বাক্য কারণ তা Mina didn't say অঙ্গবাক্যটিকে গ্রথিত করেছে। আবার Sima may think Rima will say Mina didn't leave আরও দীর্ঘ একটি অন্তঃস্থক বাক্য কারণ তা দুটি অঙ্গ বাক্যকে গ্রথিত করেছে। অন্তঃস্থক বাক্যগুলি জটিল বাক্য বা complex Sentence। ডানদিকের প্রান্তিক তথা সবচেয়ে নীচু অবস্থানে Mina didn't leave অঙ্গবাক্যটি আর বাঁ দিকের প্রান্তিক তথা সবচেয়ে উঁচু অবস্থানে Sima may think অঙ্গবাক্যটি। বৃক্ষচিত্রে এই উঁচু অবস্থানের বাক্যই প্রধান অঙ্গবাক্য (main clause)।

X' তত্ত্ব

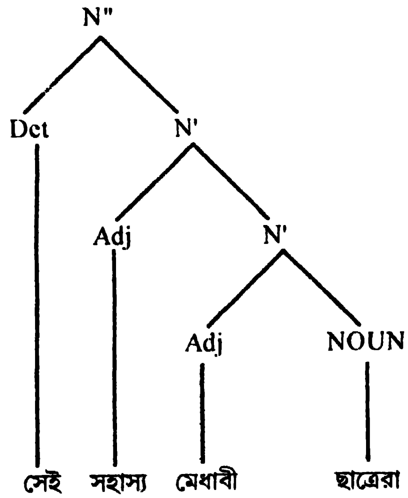
বাক্যতত্ত্ব পরবর্তী পর্যায়ে আরও বিকশিত হয়েছে। প্রসঙ্গত আমরা X' bar theory বা X´-তত্ত্বের কথা বলছি। শীর্ষপদ রূপে বিশেষ্য, ক্রিয়া, বিশেষণ, ক্রিয়া-বিশেষণ ইত্যাদির বদলে যদি শুধু X ব্যবহার করা যায়, এদের আলাদা আলাদা পদগুচ্ছকে যদি একই সংগঠনে তুলে ধরতে পারি, তাহলে বাক্য বিশ্লেষণে যে মিতায়ন ঘটে, তা অবশ্যই গুরুত্বপূর্ণ।

পদ সংগঠনের যে একটি অন্তর্বর্তী স্তর আছে এই বিশ্লেষণে তাতে আলো এসে পড়েছে। দৃষ্টান্ত হিসেবে আমরা একটি পদগুচ্ছ নিতে পারি— সেই মেধাবী ছাত্রেরা। ছাত্র কী সেটা

বলতে অসুবিধে নেই, ছাত্র একটি বিশেষ্য পদ, আর আমাদের আলোচ্য দৃষ্টান্ত যে একটি বিশেষ্য পদগুচ্ছ, সেটাও সহজবোধ্য। কিন্তু 'মেধাবী ছাত্রেরা'— এই বিন্যাসকে কী বলা যাবে? phrase-এর তুলনায় তা ছোটো, পদের তুলনায় বড়ো। একে সনাক্ত করার জন্য চাই একটি নতুন শব্দ— noun bar বা বিশেষ্য খণ্ড। নীচের ছবিটি লক্ষ করা যাক—

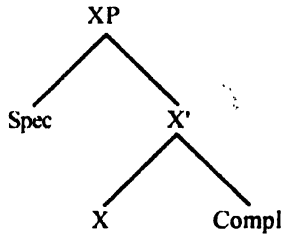


এই পদগুচ্ছে আমরা পাচ্ছি নির্দেশক 'সেই' এবং একটি বিশেষ্যখণ্ড— মেধাবী ছাত্রেরা। এই পদগুচ্ছকে যদি আর একটু প্রসারিত করি— সেই সহাস্য মেধাবী ছাত্রেরা, তাহলে আমরা পাব অন্তর্বর্তী আরও একটি বিন্যাস— সহাস্য মেধাবী ছাত্রেরা। এক্ষেত্রে আগের শীর্ষপদগুচ্ছ NP-র অবস্থানে পাচ্ছি একটি দ্বৈত বিশেষ্যখণ্ড N"। নীচের বৃক্ষচিত্রে তার দৃশ্যরূপ এইরকম— আমরা জানি প্রতিটি পদগুচ্ছে এমন একটি উপাদান থাকে যার নামে পদগুচ্ছটি নির্দেশিত হয়।



প্রত্যেক VP বা ক্রিয়া-পদগুচ্ছে থাকে একটি V বা একটি ক্রিয়া, প্রত্যেক NP-তে থাকে একটি N, প্রত্যেক PP-তে থাকে একটি P। এই সব প্রয়োজনীয় উপাদানকে (V, N, P) আমরা বলি পদগুচ্ছের শীর্ষ। অঙ্কে যেমন X ধরা হয়, এই শীর্ষগুলিকেও (VP, NP, PP ইত্যাদি) আমরা XP রূপে চিহ্নিত করতে পারি অর্থাৎ N, V, P ইত্যাদির বদলে শুধু X। এখানে একটি সূত্র পাচ্ছি :

সূত্র ১. প্রত্যেক XP-তে থাকবে একটি X (শীর্ষপদ)। XP-কে আবার দুটি অংশেষ ভাগ করতে পারি— বিশেষায়ক (specifier) এবং সম্পূরক (complement)। এই উপাদানগুলির বিন্যাসে একটি স্তরায়ন লক্ষ করা যায়। প্রথমত, XP-তে পাচ্ছি একটি বিশেষায়ক এবং একটি X', পরবর্তী অবনত স্তরে শীর্ষ X এবং একটি সম্পূরক। সমস্ত পদগুচ্ছের বিন্যাস তাহলে দাঁড়াল :



এখন আমরা আরও দুটি সাধারণীকরণে যেতে পারি।

সূত্র ২. প্রত্যেক XP একটি বিশেষায়ক নিতে পারে। এবং অবশ্যই একটি অন্তর্বর্তী স্তর X' থাকবে।

সূত্র ৩. X'-এর অন্তর্গত হবে X, এবং সম্ভবত একটি সম্পূরক।

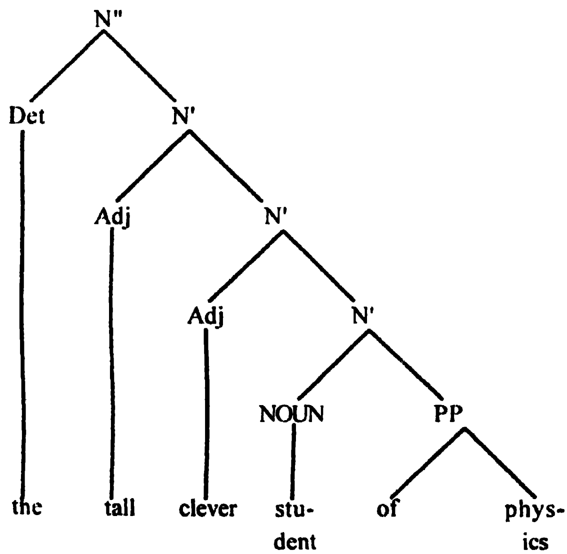
পদসংগঠন সূত্র আলোচনার এই পর্যায়টিকে আমরা এভাবে প্রকাশ করতে পারি—

ক. XP → (Spec) X'

খ. X' → X (Compl)

পদসংগঠনের এই পরিকল্প X' তত্ত্বের মূল ভিত্তি। ইংরেজি পদগুচ্ছের সংগঠন যে এত সংক্ষেপে বর্ণনা করা যায় তা আগে ভাবা হয়নি।

সম্পূরকের সঙ্গে শীর্ষপদের সম্পর্ক ঘনিষ্ঠ। একটি দৃষ্টান্ত অনুধাবন করা যাক— The tall clever student of physics। বৃক্ষচিত্রে—



Tall ও Clever বিশেষক (modifier), of student সম্পূরক। Tall ও Clever সরাসরি Student-কে বিশেষিত করছে না, বিশেষিত করছে student of physics-কে। *পারিবারিব* পরিভাষা ব্যবহার করে বলা যায় সম্পূরক হল শীর্ষ শব্দের ভগিনী আর বিশেষক হল বিশেষ্য খণ্ডের ভগিনী। বৃক্ষশীর্ষের সঙ্গে যুক্ত নির্দেশক বিশেষায়ক রূপে বিশেষ্য খণ্ডকে বিশেষ্য দ্বৈত খণ্ডে প্রসারিত করছে। লক্ষণীয়, শুধু বিশেষ্য পদগুচ্ছ নয়, অন্যান্য পদগুচ্ছ এই একই গঠনের অন্তর্গত। সংক্ষেপে এই গঠন হল—

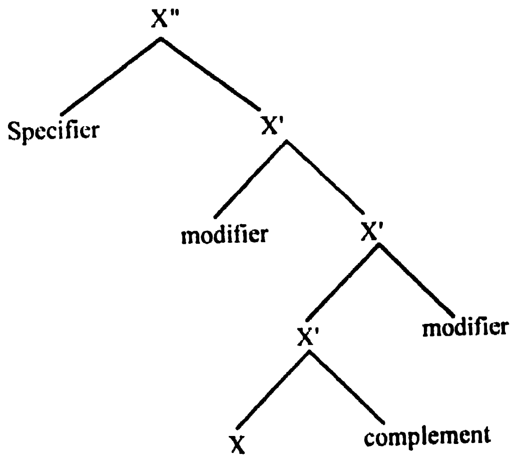
১. পদগুচ্ছের শীর্ষ X, যেখানে X বিশেষ্য, ক্রিয়া, ক্রিয়া বিশেষণ, বিশেষণ অথবা Preposition-এর বিকল্প।

২. সম্পূরক X-কে প্রসারিত করে X খণ্ডে।

৩. বিশেষক X খণ্ডকে X খণ্ডে প্রসারিত করে।

৪. বিশেষায়ক X খণ্ডকে প্রসারিত করে X দ্বৈত খণ্ডে।

— এই সংক্ষিপ্তসার বৃক্ষচিত্রে এভাবে দেখানো যায়—



বোঝা যাচ্ছে X bar তত্ত্বের এই বিন্যাসক্রম তুলে ধরা হয়েছে ইংরেজি বাক্যকে সামনে রেখে। কিন্তু ভাষাতাত্ত্বিকরা শুধুমাত্র ইংরেজি ভাষাতেই খুশি থাকেন না, তারা চান এমন একটি বিন্যাস যা পৃথিবীর সব ভাষাতেই গ্রহণযোগ্য। বাংলা, তুর্কি কিংবা জাপানি ভাষার সঙ্গে তুলনায় বোঝা যায় X' তত্ত্বে বাক্যবিন্যাসের এই সাধারণীকরণ অবিকল মেলে না। ইংরেজি ভাষা যেখানে শীর্ষ-আদ্য, বাংলা, তুর্কি জাপানি সেখানে শীর্ষ-অন্ত্য ভাষা। আমরা তিনটি ভাষা থেকেই দৃষ্টান্ত রাখছি—

Ben Newcastleda Otoruyorum. (তুর্কি)
I Newcastle-in live-1st sg. pres.
'I live in Newcastle'.

Watashi-wa Newcastle-ni sunde-iru. (জাপানি)
I-subj Newcastle-in live present
'I live in Newcastle.'

বাংলাতেও এই একই বিন্যাস—

আমি নিউকাসেলের মধ্যেই থাকি।

ইংরেজি 'students of physics' (শীর্ষ + সম্পূরক) বাংলায় 'পদার্থ বিদ্যার ছাত্র' (সম্পূরক + শীর্ষ)। শীর্ষ-অন্ত্য ভাষাগুলির এই বৈশিষ্ট্য কি সার্বিক ব্যাকরণ (Universal Grammar) রচনার অন্তরায়? চমস্কি ও তাঁর অনুগামীদের ভাষাতত্ত্বের চূড়ান্ত লক্ষ যেখানে সার্বিক ব্যাকরণ, সেখানে এ প্রশ্ন গুরুত্বপূর্ণ অবশ্যই। ভাষাতাত্ত্বিকরা অবশ্য অন্বয়গত এই সমস্যারও সমাধান করেছেন নিম্নরূপে :

পার্থক্য : ইংরেজি : PP → P NP

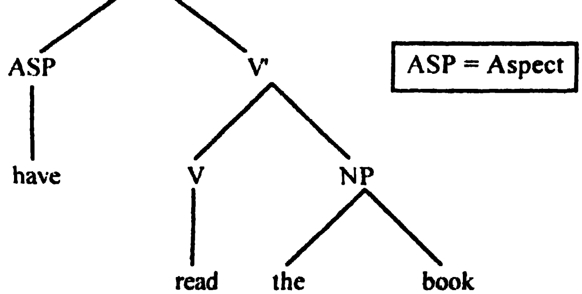
জাপানি/তুর্কি/বাংলা : PP → NP P

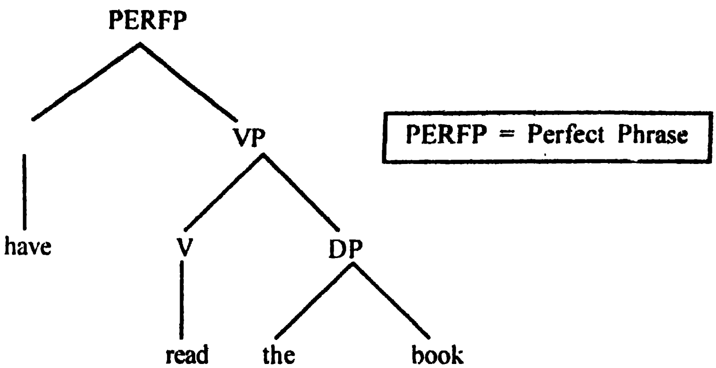
সাধারণীকরণ :

ইংরেজি/তুর্কি/জাপানি/বাংলা → PP → P, NP

একটি কমাই এখানে সমস্যার নিরসন করেছে। ইংরেজিতে বাক্য ক্রিয়ামধ্য কিন্তু তুর্কি জাপানি বাংলায় ক্রিয়া-অন্ত্য। দেখা যায়, পৃথিবীর যে ভাষাগুলিতে ক্রিয়া শেষে আসে সে সব ভাষায় Preposition থাকে না, থাকে Postposition। এই পার্থক্য বাগর্থগত নয়, অন্বয়গত। উল্লিখিত সাধারণীকরণে আমরা দেখছি ইংরেজি ও বাংলা তুর্কি জাপানি অন্বয়ের পার্থক্যগত সমস্যা থাকছে না আর। কারণ Preposition বা Postposition তৈরি হচ্ছে P এবং একটি NP-র সমন্বয়ে। ভাষাবিশেষের পদগুচ্ছ সংগঠন অনুযায়ী P NP অথবা NP P-র বিন্যাসক্রম নির্ধারিত হবে। আর তার ফলে শীর্ষ-পূর্ব ও শীর্ষ-অন্ত্য ভাষার গঠনগত আয়না-প্রতিবিম্ব ব্যবধান নিয়েও সার্বিকতায় পৌঁছনো সম্ভব হবে।

X' তত্ত্বের প্রাথমিক ধারণাই আমরা এখানে উপস্থিত করলাম। পরবর্তী সময়ে এই তত্ত্ব আরও পরিশীলিত হয়েছে। পদগুচ্ছের ধারণারও তাৎপর্যপূর্ণ বিস্তার ঘটেছে। পরিচিত ক্রিয়া, বিশেষ্য, বিশেষণ, ক্রিয়া-বিশেষণ পদগুচ্ছের বদলে ইংরেজি ভাষার ক্ষেত্রে এখন বলা হচ্ছে নির্দেশক পদগুচ্ছ, প্রকার পদগুচ্ছ, সম্পূরক পদগুচ্ছ ইত্যাদি। The book এখন আর noun phrase নয়, determiner phrase, the-কে আর specifier বলা হচ্ছে না, বলা হচ্ছে পদগুচ্ছের head বা শীর্ষ। have read the book শব্দ বিন্যাসের রেখাচিত্র হবে এইরকম—





Verb Phrase-এর মধ্যে have বিশেষায়ক বা specifier হিসেবে গণ্য হচ্ছে না, গণ্য হচ্ছে perfect phrase-এর শীর্ষ হিসেবে। v-bar সম্পূর্ণ ভাবে অনুপস্থিত, আমরা সরাসরি যেতে পারছি V থেকে VP-তে। চমস্কির এই নতুন অন্বয়তত্ত্ব, 'minimalist' অনুধাবনের সঙ্গে তা সামঞ্জস্যপূর্ণ। অন্বয়ের এই নতুন উপস্থাপনা 'required to be minimal...with no superfluous steps in derivations and no superfluous symbols in representations'.

বাংলা ভাষায় চমস্কি তত্ত্ব :

'বাংলার চমস্কি' এমন একটা কথার চল আছে ড. পবিত্র সরকার সম্পর্কে। কথাটা কতটা যুক্তিযুক্ত সে বিচারে আমরা যাচ্ছি না। তবে বাংলা ভাষায় চমস্কি তত্ত্বের প্রয়োগে তিনি প্রধান ব্যক্তিত্ব উল্লিখিত অভিধা থেকে তা বুঝে নেওয়া যায়। এপার বাংলায় চমস্কি তত্ত্বের প্রথম প্রয়োগ করেন তিনি। রবীন্দ্র ভারতী পত্রিকায় (১৯৭৮) প্রকাশিত তাঁর সেই প্রবন্ধের নাম—'সং বর্তনী-সঞ্জননী ভাষাতত্ত্ব ও বাংলা ভাষাবিচারে তার প্রয়োগ'। এই প্রয়োগের ক্ষেত্র কতটা সম্ভাবনাময়, তিনি তার আভাস দিয়েছেন।

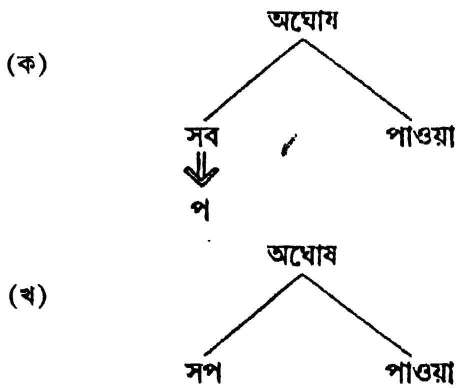
ভাষাতাত্ত্বিক পবিত্র সরকার বাংলাভাষার রূপ ও রহস্যের নানা দিক উদ্‌ঘাটন করেছেন। তাঁর ভাষাভাবনার একটি বৈশিষ্ট্য বিশ্বমুখীনতা। বাংলাভাষার এক একটি দিক আলোচনায় তিনি বিশ্বের দিকে জানলা খুলে দেন, যার ফলে নতুন চিন্তার আলোকে আলোচ্য বিষয় আমাদের কাছে পুনর্ণব হয়ে ওঠে।

পবিত্র সরকার দুজাতের সমীভবনের কথা বলেছেন—:আস্ত ধ্বনির সমীভবন (Phoneme assimilation) ও ধ্বনিলক্ষণের সমীভবন (feature assimilation)। 'আর না কালী' থেকে 'আন্নাকালী' প্রথমটির দৃষ্টান্ত। আর দ্বিতীয়টির দৃষ্টান্ত তিনি দিয়েছেন 'ভাত দাও' থেকে 'ভাদ্‌দাও'। ধ্বনিলক্ষণের সমীভবনের ধারণাটি বাংলা সমীভবন বিশ্লেষণে অভিনব। Distinctive feature বা বৈশেষিক লক্ষণের উপর দৃষ্টি রেখে যে সমীভবন ব্যাপারটি বুঝে নেওয়া যায়, বাংলা ভাষায় সমীভবনের আলোচনায় সম্ভবত তাঁর লেখাতেই প্রথম সে ইঙ্গিত পাওয়া গেল। তিনি লিখেছেন 'ইংরেজি pill আর bill এই দুটি কথার /P/ আর /b/-এর মধ্যে যে তফাত তা পুরোপুরিভাবে দুটো আস্ত ধ্বনির তফাত নয়। /P/ আর /b/-র মধ্যে অনেকটাই মিল আছে : দুটিই স্পৃষ্ট ব্যঞ্জন, দুটিই অল্পপ্রাণ, দুয়েরই উচ্চারণস্থান ওষ্ঠদ্বয় : তফাত শুধু এই যে, /P/-এর

উচ্চারণে ঘোষবত্তা (voicing) নেই, আর /b/-এর উচ্চারণে তা আছে। উচ্চারণের এই একটি মাত্র লক্ষণই ধ্বনি দুটিকে পৃথক (distinct) করে দিচ্ছে, দুয়ের মধ্যে বিরোধ (contrast, opposition) তৈরি করেছে। সমীভবনেও যে ধ্বনিগত পার্থক্য তার মূলে অনেকক্ষেত্রেই এই ধ্বনি লক্ষণের পার্থক্য। যেমন এই দৃষ্টান্তে—



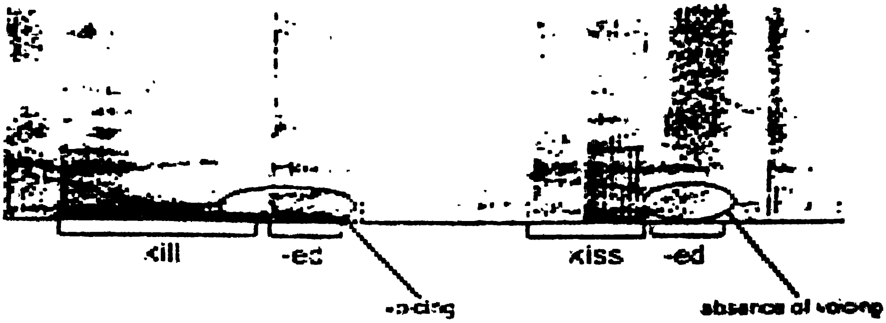
ব এবং প-এর মধ্যে যে বিরোধ, তা ঘোষতার কারণে। প অঘোষ, ব ঘোষ ধ্বনি। এখানে প থেকে ব-ধ্বনিতে [- ঘোষতা] লক্ষণটির প্রসারণ (spreading) ঘটছে, আর তার ফলে ব-ধ্বনিতে ঘোষতা বাধা পাচ্ছে।



রেখাঙ্কনে দেখা যাচ্ছে আগের ব-ধ্বনি প-রূপে প্রতিভাত। ফলে দুটি ধ্বনিখণ্ডের বিরোধ অপসৃত।

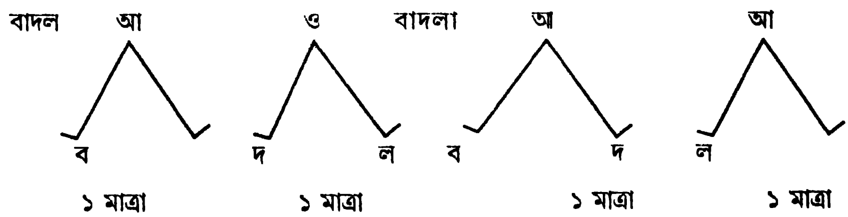
একালে ধ্বনির ছবি তোলার নানা যন্ত্র উদ্ভাবিত হয়েছে। Spectrograph নামক যন্ত্রে উচ্চারিত ধ্বনির যেসব formant বা রূপছায়া পাওয়া যায় তার সাহায্যে ধ্বনির প্রকৃতি ও উদ্ভব স্থান সম্পর্কে নির্ভুল তথ্য আমরা পাই। রূপছায়া মুখবিবরের অনুনাদের চিত্ররূপ। ইংরেজি ভাষায় অতীতকালের ক্রিয়ারূপে 'ed' যুক্ত হয় যেমন kill + ed এবং kiss + ed। দুটো ক্ষেত্রে ed-র উচ্চারণ কি সমরূপ? আমরা জানি তা হয় না। তার কারণ অন্ত্য ধ্বনিখণ্ড হিসাবে killed শব্দের অতীতকালের রূপিম একটি ঘোষ ধ্বনি [d] কিন্তু kiss শব্দের অতীতকালের সমান্তর রূপিম অঘোষ [t]। উচ্চারণের দিক থেকে লেখা যায় [kil + d] এবং [kis+t]।

এক্ষেত্রেও আমরা পাচ্ছি ধবনিলক্ষণের সমীভবনের দৃষ্টান্ত, স্পেকট্রোগ্রাফ যন্ত্রে যার ছবি এভাবে ধরা পড়ে—



অতীতকালের ক্রিয়ারূপ killed ও kissed-এর স্পেকট্রোগ্রাম

ড. সরকারের 'দ্বিমাত্রিকতা, না দ্বিতীয় স্বরলোপ' শীর্ষক আলোচনাটির প্রতি পাঠকের দৃষ্টি আকর্ষণ করছি। দ্বিমাত্রিক বলতে সুনীতিকুমার বাঙালির একটি উচ্চারণ প্রবণতাকে বুঝিয়েছেন। বাংলা শব্দকে দুই অক্ষর বা দুই-এর গুণিতক অক্ষরে প্রয়োগ করে শব্দের দুই মাত্রা বা দুই-এর গুণিতক মাত্রা বণ্টন করার উচ্চারণ রীতিকে বলা হয়েছে দ্বিমাত্রিকতা (Bimorism/Dimetrism)। দৃষ্টান্ত হিসাবে বলা যায় বাদল শব্দটির অক্ষর বা syllable সংখ্যা দুই। এখানে দুই অক্ষরে দুইমাত্রা। কিন্তু বাদল শব্দের সঙ্গে 'আ' প্রত্যয় যুক্ত করে যে শব্দটি আমরা পাই, তা তিন অক্ষরের না হয়ে মাঝখানে একটা স্বর বিলোপ করে দুই অক্ষরের ' বাদলা' শব্দে পরিণত হয়। এখানেও দুই অক্ষরে দুই মাত্রা। যেমন—



এইভাবে দেখানো যায় তিন অক্ষরের পাগলামি শব্দটিও দ্বিমাত্রিক ২+১+১=৪ মাত্রা, অর্থাৎ দুই-এর গুণিতক। একটি রুদ্ধ বা মুক্ত সিলেবল স্বতন্ত্র প্রসারিত উচ্চারণে দু-মাত্রার সময় নেয়। কিন্তু ড. সরকার লক্ষ করেছেন বাংলা ভাষায় শুধুমাত্র বিজোড় সিলেবলের শব্দ জোড় সিলেবলের শব্দে পরিণতি হয়, তাই নয়, প্রচুর বিজোড় সংখ্যক সিলেবলের শব্দও তৈরি হয়। যেমন—

চার সিলেবল > তিন সিলেব্‌ল

আপনাদের — আপ্‌নাদের

কোথা যাচ্ছ — কোজ্জাচ্ছো

ভরা দুপুর — ভরদুপুর

ছাগল + আমো— ছাগলামো ইত্যাদি।

এইসব দৃষ্টান্ত পর্যালোচনা করে তিনি যে সিদ্ধান্তে এসেছেন, তাকে একটি সূত্রাকারে লেখা যায়—

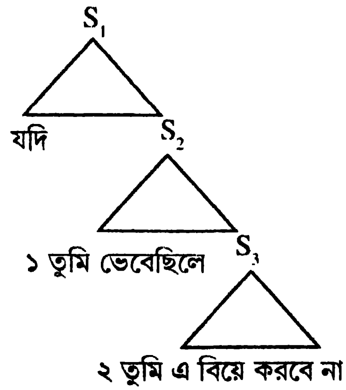
$$V \rightarrow \phi /VC — CV$$

'অর্থাৎ, শব্দের দ্বিতীয় সিলেবলে যে স্বরধবনি থাকে তার আগে ও পিছনে যদি একটি করে, (অযুক্ত) ব্যঞ্জন থাকে, তবে ওই স্বরধবনিটি, অর্থাৎ শব্দের দ্বিতীয় স্বরধবনিটি লুপ্ত হবে'। ড. সরকার তাই দ্বিমাত্রিকতার পরিবর্তে দ্বিতীয় অক্ষরের স্বরলোপের বিশেষ একটি নিয়ম হিসাবে এই প্রক্রিয়াটিকে দেখতে চান এবং তাঁর এই অনুধাবন যে আধুনিক ভাষাবিজ্ঞানসম্মত, তা অস্বীকার করা যায় না।

ঐতিহাসিক পরিমণ্ডলের বাইরে এসে সংস্কৃত প্রভাব মুক্ত বাংলা ব্যাকরণ রচনা করতে চেয়েছেন পবিত্র সরকার। 'বাংলা ব্যাকরণ প্রসঙ্গ' নামে তাঁর যে বইটি সম্প্রতি প্রকাশিত হয়েছে, সেখানে সংকলিত অধিকাংশ প্রবন্ধেই বাংলা ভাষাকে তাঁর নিজস্বতায় তুলে ধরার পরিশ্রমী প্রয়াস লক্ষ করা যায়। বইটিতে বাংলা ভাষার বহু অনালোচিত দিকে সুচিন্তিত আলো এসে পড়েছে। একটি দৃষ্টান্ত দিই— :বাংলায় 'যদি' নিয়ন্ত্রিত বাক্যে নেতিবাচক উপাদান 'না' ক্রিয়ার পুরোগামী হয়। যেমন 'তুমি যদি ওখানে না যাও তো ভালো হয়'। যেখানে প্রকাশ্যে 'যদি' থাকে না, যেমন— 'তুমি ওখানে না গেলে আজ' সেখানেও অন্তরালে (semantic deep structure-এ) ঐ 'যদি'-র উপস্থিতি। কিন্তু এমন 'যদি' বাক্যও পাওয়া যায়, যেখানে ক্রিয়ার পরে না-এর অবস্থান। যেমন—

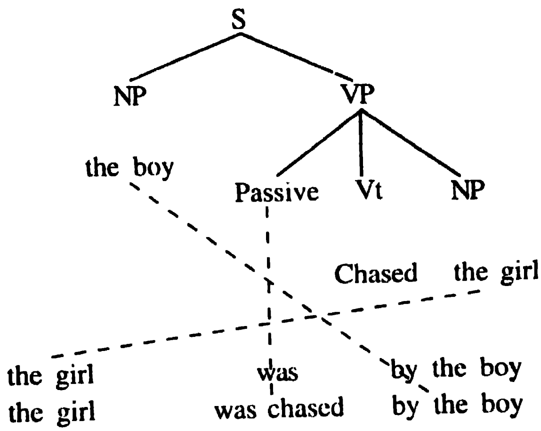
যদি তুমি এ বিয়ে করবে না ভেবেছিলে তাহলে মেয়েটাকে শুধু শুধু ঘোরালে কেন?

—:এখানে ক্রিয়াপদের পরে যে 'না' বসছে, তার বিশেষত্ব কী? পবিত্র সরকার বলেন, এখানে ঐ 'না' 'যদি'-র প্রত্যক্ষ শাসনে নেই। চমস্কি পরবর্তী সঞ্জনন অর্থতত্ত্ব বা Generative Semantics-কে মান্য করে তিনি বাক্যটির একটি অংশের চেহারা এভাবে দেখিয়েছেন—



S [যদি$_S$ [তুমি ভেবেছিলে$_S$ [তুমি এ বিয়ে করবে না]$_S$]$_S$]$_S$.... ইত্যাদি চিত্রে বর্ণিত বাক্যে এটা খুবই স্পষ্ট 'না' যে কাঠামোয় আছে, তার সঙ্গে 'যদি' যে কাঠামোয় আছে তার বেশ ব্যবধান, মাঝখানে তৈরি হয়েছে আর একটা বাক্যের কাঠামো। 'যদি' আছে S_1 (S = Sentence) আর ঐ 'না'-অন্তক ক্রিয়া আছে S_3-তে। এখানে S_2 ক্রিয়াই 'যদি'-র প্রত্যক্ষ শাসনে, আর তাই সেখানে অস্বীকৃতির ক্ষেত্রে 'না' হবে ক্রিয়ার পুরোগামী। কিন্তু S_3-তে 'যদি'-র অধিকার ব্যাপ্ত নয়, তাই সেখানে ক্রিয়ার পরেই আসবে 'না', আগে নয়।

বাংলা বাচ্যের ক্ষেত্রেও পবিত্র সরকারের দৃষ্টিভঙ্গির স্বাতন্ত্র্য লক্ষণীয়। সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায় বাংলা ভাষার জন্য যে চার ধরনের বাক্য নির্দেশ করেছিলেন, সেগুলি হল— কর্তৃবাচ্য, কর্মবাচ্য, ভাববাচ্য এবং কর্মকর্তৃবাচ্য। ড. সরকার দেখিয়েছেন বাংলায় আসলে দুটি বাচ্যই আছে— কর্তৃবাচ্য ও ভাববাচ্য। কর্মকর্তৃবাচ্যকে কর্তৃবাচ্যের অন্তর্গত করে দেখা যায়, আর কর্মবাচ্যকে ভাববাচ্যের। আম পাকে, শাঁখ বাজে, বইটা বেশ বিক্রি হচ্ছে— এরকম বাক্যে ক্রিয়াকে নিয়ন্ত্রণ করছে কর্তা। তাই এগুলি কর্তৃবাচ্য। কাজেই কর্মকর্তৃবাচ্য কথাটা বাংলা ব্যাকরণে রাখার কোনো অর্থই হয় না। তাছাড়া বাক্যগুলিতে ক্রিয়া অকর্মক। কর্মই যেখানে নেই সেখানে বাচ্যের নাম কর্মকর্তৃবাচ্য কেন, এমন প্রশ্ন তুলেছিলেন মনীন্দ্রকুমার ঘোষও। বাংলায় কর্মবাচ্যের দৃষ্টান্ত স্কুলের বইগুলিতে সুপ্রচুর। কর্তৃবাচ্যকে কর্মবাচ্যে কিংবা কর্মবাচ্যকে কর্তৃবাচ্যে পরিণত করার নির্দেশও থাকে প্রশ্নপত্রে। বাংলা কর্মবাচ্যের বাক্য ইংরেজির অনুরূপ। তাই একটি ইংরেজি বাক্যের সাহায্যে কর্মবাচ্যের চেহারাটা লক্ষ করি—



কর্তৃবাচ্য ও কর্মবাচ্য তথা active ও passive voice-এ এই রূপান্তরণকে সূত্রাকারে লেখা যায়—

$$\text{active} : \left[S \left[su^{NP_1} \left[vp^{V} [od^{NP_2}]\right]\right]\right]$$

$$\text{passive} : \left[S\left[NP_2\right]\right]\left[vp^{bev\text{-}ed}\left[pp^{by}\left[NP_1\right]\right]\right]\right]$$

অনুরূপ বাংলা দৃষ্টান্ত—

বইটি আমার দ্বারা পঠিত হয়েছে

প্রহরী কর্তৃক চোর ধৃত হয়েছে।

সুনীতিকুমার লিখেছেন, 'সংস্কৃত 'ত' প্রত্যয়যুক্ত বিশেষণ সংযোগে গঠিত এইরূপ বাক্য-রীতি ভাষায় আধুনিক সৃষ্টি, এবং বইয়ের ভাষার বাহিরে এক রকম অপ্রাপ্ত, কৃত্রিম, পণ্ডিতি সৃষ্টি।' কিন্তু প্রশ্ন হল বাংলার এই কৃত্রিম বাক্যগুলোকে কর্মবাচ্য বলা যায় কি? কর্তার ভূমিকা গৌণ করে ক্রিয়ার ঘটনাকে প্রধান করে তোলাই প্যাসিভ-এর মূলকথা। ড. সরকার লক্ষ করছেন, 'বাংলার প্যাসিভে কর্মপদের কোনো ভূমিকা নেই, তা কখনই ক্রিয়ার কর্তা হয় না।' তাই তাঁর

সিদ্ধান্ত— 'ব্যাকরণে বাক্যের অন্বয় সংগঠন অনুযায়ী বাংলায় বাচ্য মাত্র দুটি—কর্তৃ বাচ্য ও ভাববাচ্য। এবং কর্তৃবাচ্যে কর্তা ক্রিয়াকে নিয়ন্ত্রণ করে, ভাববাচ্যে ভাব (= কাজ, ঘটনা)। এই ভাবের ব্যাকরণগত মূর্তি তৈরি হয় ক্রিয়ার বিশেষ্যীভবনের দ্বারা এবং সেই সূত্রে সম্পাদক-কর্তার (actor বা agent-এর) সম্বন্ধ বা গৌণকর্মরূপ গ্রহণের দ্বারা'। এই প্রক্রিয়া, তিনি লিখেছেন, 'যদি সংবর্তন বা transformation-এর হিসেবে করি, খুব জটিল নয়।' কথা হল অ্যাক্টিভ থেকে প্যাসিভে বাক্যের যে রূপভেদ তাকে আদৌ সংবর্তন বা transformation বলা যায় কি? কর্মবাচ্যের ক্ষেত্রে আমরা লক্ষ করি একটি অধিবাক্য থেকে আর একটি অধিবাক্যে রূপান্তরণ, অধোগঠন থেকে অধিগঠনে রূপান্তরণ নয়। তাই একজন আলোচক লিখেছেন, 'Transformations do not change one sentence into another ; they change one structure into another, often a deep structure into a surface structure.'

সঞ্জনন ব্যাকরণে সঞ্জীবিত লেখকদের কলমে কতিপয় গ্রন্থ ও অগ্রন্থিত বেশ কিছু প্রবন্ধ উপহার পেয়েছি আমরা। দুটি অগ্রগণ্য নাম— উদয় নারায়ণ সিংহ এবং প্রবাল দাশগুপ্ত। প্রবাল দাশগুপ্তের 'কথার ক্রিয়াকর্ম' বইটিতে চমস্কি তত্ত্বের আলোকে কিছু জটিল প্রসঙ্গের সূক্ষ্ম বিশ্লেষণ পাই। 'বৈজ্ঞানিক কল্পনার ভগীরথের ভূমিকায় চমস্কি', 'কারক : দুঃস্বপ্নের অবসান', 'সর্গে গোলযোগ' প্রভৃতি তাঁর উল্লেখযোগ্য লেখা। 'সর্গে গোলযোগ' বাংলা অনুসর্গ নিয়ে আলোচনা। বাংলাদেশের লেখিকা রশিদা বেগমও এ বিষয়ে বিস্তৃত আলোচনা করেছেন। রশিদার গবেষণা গ্রন্থের নাম 'বাংলা অনুসর্গের গঠন-প্রকৃতি ও বাক্যে অনুসর্গের ভূমিকা।' নোয়াম চমস্কির Government Binding Theory (GB) অনুযায়ী শাসক আসছে বাক্যাংশের কেন্দ্রে, যার ওপর ঐ সংগঠনের অন্যান্য উপাদান নির্ভরশীল। অনুসর্গে শাসকের প্রকৃতি নির্ণয়ে ঐ তত্ত্বের গুরুত্ব কতখানি, বাংলা অনুসর্গের বহুবিধ দৃষ্টান্ত সামনে রেখে লেখিকা তা দেখিয়েছিলেন। উদয় নারায়ণ সিংহের লেখাগুলি এখনও গ্রন্থাকারে প্রকাশের অপেক্ষায়। তাঁর অন্বেষু দৃষ্টিতে বাংলা অন্বয়ের বিভিন্ন দিক উদঘাটিত হয়েছে। এখানে তাঁর 'ব্যক্তিগত বর্ণপরিচয়' লেখাটির কথা উল্লেখ করি। ভাষাতাত্ত্বিকের দৃষ্টিকোণ থেকে ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগরের 'বর্ণপরিচয়' বইটির আলোচনা করেছেন লেখক। তিনি লক্ষ করেছেন বাংলা ভাষার বিচিত্র বাক্য সংরচনা (construction) বিদ্যাসাগর মাত্র ২০টি পাঠের মধ্য দিয়ে গেঁথে দিয়েছেন। শুরু করেছেন ক্ষুদ্রতর সংরচনায়, শেষ করেছেন সম্বন্ধায়নের (Relativization) সবিস্তার উদাহরণে। একটি বাক্যের প্রকরণ— 'মাধব কখন পড়িতে গিয়াছে।' বর্ণ পরিচয়ের এই বাক্যেই প্রথম পাওয়া যাচ্ছে নিহিত (embedded) বাক্যের সন্ধান— একটির শরীরে একটি গাঁথা। অপ্রধান বাক্যের 'মাধব' বিলুপ্ত হয়েছে সমবিশেষ্য বিলোপ (Equip NP deletion) সূত্রানুসারে। এছাড়া প্রধান বাক্যের উদ্দেশ্য পদের পরেই আছে একটি কালবাচক ক্রিয়া বিশেষণ। ক্রিয়া বিশেষণ স্থান পরিবর্তন সূত্রের (optional adverb movement transformation) উদাহরণও আছে বিদ্যাসাগরের এই বইটিতে। সূত্রটি এই রকম—

$$\left[\begin{Bmatrix}\text{বিশেষ্য}\\\text{সর্বনাম}\end{Bmatrix} + \text{কালবাচক ক্রিয়া বিশেষণ} + (\text{স্থানবাচক ক্রিয়া বিশেষণ}) + \text{ক্রিয়াপদ} (+ \text{নঞ})\right]$$

১ ২ ৩ ৪ ৫

এই সূত্র থেকে আমরা উপহার পাই আরও একটি সূত্র

২ + ১, ৩, ৪, ৫

এই পরিবর্ত বিন্যাস-ক্রমের দৃষ্টান্তে বিদ্যাসাগর লিখেছেন—

তিনটি বাক্য ঃ

কাল আমরা পড়িতে যাই নাই।
আজ আমি তোমাদের বাড়ি যাইব।
কাল রাম আমাদের বাড়ি আসিবে।

লক্ষণীয়, এই বাক্যগুলি থেকে চলমানতা (Progressive aspect) ও কর্মসমাপ্তির (Perfective aspect) ধারণাও তৈরি হচ্ছে। বর্ণপরিচয়ের সংরচনা যে এত অভিনিবেশ দাবি করে ড. সিংহ দেখিয়ে না দিলে তা হয়ত আমাদের ধারণাতেই আসত না। বাংলা অন্বয় সম্পর্কিত আলোচনার বিস্তার আমরা লক্ষ করি আর একজন লেখকের কলমেও, তিনি হুমায়ুন আজাদ। তাঁর গ্রন্থের নাম 'বাক্যতত্ত্ব' (১৯৮৪)। ড. রামেশ্বর শ লিখেছেন, 'একটিমাত্র গ্রন্থে সর্বদিক থেকে বাক্যতত্ত্বের এমন পূর্ণাঙ্গ অনুপুঙ্খ আলোচনা শুধু বাংলা ভাষায় কেন, অন্য কোনো ভাষায় হয়েছে কিনা সন্দেহ।'

ড. উদয়কুমার চক্রবর্তীর 'বাংলা পদগুচ্ছের সংগঠন' ও 'বাংলা সংবর্তনী ব্যাকরণ'— দুটি গ্রন্থেই বাংলা ভাষার সঞ্জনন সংবর্তন ব্যাকরণ রচনার উদ্ভাবনী প্রয়াস। প্রথম বইটি অধ্যাপক পবিত্র সরকারের তত্ত্বাবধানে এবং নির্দেশনায় রচিত। দ্বিতীয় বইটির সংক্ষিপ্ত পরিসরে চমস্কির পরিচালন ও আবদ্ধীকরণতত্ত্ব (G. B. theory) এবং চমস্কি ঘরাণার বিভিন্ন তত্ত্ব আলোচিত হয়েছে। 'বাংলা পদগুচ্ছের সংগঠন' একটি সুপরিকল্পিত পূর্ণাঙ্গ গ্রন্থ। চমস্কিতত্ত্বের আলোকে আরও বহু প্রবন্ধ/গ্রন্থ রচিত হয়েছে। একটি সাম্প্রতিক সংযোজন— 'বাংলা ভাষা ও চমস্কির তত্ত্ব', লেখিকা ড. নীলিমা চক্রবর্তী।

সংবর্তন ব্যাকরণ : সাহিত্য-শৈলী প্রসঙ্গ

শৈলী লেখার বিশেষ ধরন। শৈলী বিচার ভাষাতত্ত্বের আঙিনা থেকে সাহিত্যকে দেখা। ভাষাতত্ত্বের ক্ষেত্রে বৈপ্লবিক যে সংযোজন, সেই সংবর্তন সঞ্জনন ব্যাকরণ সাহিত্য-অনুধাবনে কতটা সহায়ক, এই প্রশ্নে আমরা যেতে চাই। কেউ কেউ মনে করেন সাহিত্যের ভাষা বিশ্লেষণে সংবর্তন ব্যাকরণ আদৌ সহায়ক নয়। সাহিত্যের ভাষা বিশ্লেষণ সংবর্তন সূত্রাবলির আওতার মধ্যেই আসে না। যে জ্যোতির্বিজ্ঞানী সুদূর কোনো নক্ষত্র নিরীক্ষণ করতে চান সেটা যদি তার টেলিস্কোপের দৃষ্টি পরিধির বাইরে থাকে, তবে বৃথাই সেই চেষ্টা।

আমরা অবশ্য এমন ভাবি না। আমাদের ধারণা সাহিত্যের ভাষা-বিশ্লেষণে সংবর্তন ব্যাকরণের ভূমিকা সদর্থক। সংবর্তন ব্যাকরণ আমাদের জানায় সীমিত সংখ্যক সূত্রের সাহায্যে কিভাবে অসংখ্য বাক্য নির্মিত হতে পারে। ভাষার এই সৃজনশীলতাই যে-ব্যাকরণের লক্ষ্য, তা সৃজনশীল সাহিত্য বিচারেও প্রাসঙ্গিক হবে, সেটাই স্বাভাবিক। সংবর্তন ব্যাকরণে আমরা লক্ষ করি একটি অন্তঃসার বাক্য (kernel Sentence) থেকে অর্থান্তর না ঘটিয়েও ভিন্ন ভিন্ন বাক্যের উদ্ভাবন। ধরা যাক এই বাক্যটি— 'ঋজুকে দেরিতে আসতে দেখে আমি অবাক হলাম'। বাক্যটিকে নানাভাবে বলা যেতে পারে :

ঋজুর দেরিতে আসা আমাকে অবাক করল।
ঋজু যে দেরিতে এল তাতে আমি অবাক হলাম।
ঋজুর দেরিতে আসায় আমি বিস্মিত।
ঋজুর উপস্থিতিতে বিলম্ব সে দিন আমার কাছে অবাক হওয়ার মতোই একটা ঘটনা ছিল।
অবাক হয়েছিলাম ঋজুকে যখন দেরিতে আসতে দেখি।

আমাকে অবাক করে ঋজু এল দেরিতে।
ঋজু দেরিতে এল আর আমি অবাক হলাম।
যেহেতু ঋজু দেরিতে এল, আমিও তাই অবাক হয়েছি।
কী যে অবাক হয়েছিলাম আমি, যখন দেখলাম ঋজুই এল দেরিতে!

— এ বাক্যগুলির মধ্যে তথ্যগত কোনো পার্থক্য ঘটছে না। অথচ একই বক্তব্য যে নানাভাবে বলা যায়, সেটা বুঝতে পারছি আমরা। একজন লেখকের সামনে একটি বাক্যের এরকম বেশ কিছু বিকল্প থাকে। তিনি কোনটি নেবেন, তাঁর সেই নির্বাচনের মধ্যেই শৈলীর ধারণাটি নিহিত। বাক্যটি যদি তাঁর বিষয়ের উপযোগী হয়, যে পরিস্থিতি তিনি তৈরি করছেন, সেখানে বাক্যটিকে যদি সুসংগত মনে হয়, তাহলে ধরে নিতে হবে তাঁর শৈলীগত নির্বাচন ঠিকই আছে।

ভাষাতাত্ত্বিকের কাজ বাক্যের গহন গঠনের (অর্থগত দিকের) সঙ্গে প্রাতিভাসিক সংরচনার যোগসূত্র নির্ধারণ। এ কাজ বিচ্ছিন্ন বাক্যের ক্ষেত্রে যতটা সহজ, বাক্য পরম্পরায় কি ততটা? সাহিত্যের ভাষায় একটি বাক্যের উপর সন্নিকট বাক্যের যে আলোছায়া, ব্যাকরণিক সংবর্তন সূত্রে কি তাকে সনাক্ত করা যায়? তাছাড়া কবিরা প্রয়োজনে বাক্য নির্মানবিধি লঙ্ঘন করতে পারেন, তেমন Poetic license তঁদের আছে। অনুপ্রেরণা নামের একটা রহস্যময় ব্যাপার যখন কবির কলমে কাজ করে, তখন তাঁর আকস্মিকতার মধ্যে ধরা দেয় কবিতার সফল উচ্চারণ। এরকম ক্ষেত্রে কবি ব্যাকরণকে লঙ্ঘন করেন এবং সেটা আমরা মেনেও নিই। দৃষ্টান্তে আসা যাক —

তিনি ছিলেন
নিয়ন আলোর থেকে বহুদূরে
ক্ষীণদ্যুতি লণ্ঠনের ক্লান্ত কুয়াশায়।

চোখে দেখে বোঝা যাচ্ছে এই উদ্ধৃতি কোনো কবিতার অংশ। মার্জিনের দুই প্রান্ত ছুঁয়ে থাকা গদ্যের চেহারা নয়— ছোটো বড়ো পঙ্‌ক্তি। শেষ পঙ্‌ক্তির শেষ শব্দবন্ধে এসে থমকে দাঁড়াতে হয়, যেখানে বলা হল কুয়াশার ক্লান্তির কথা। অধিতলে শব্দ নির্বাচন বিধি লঙ্ঘন করছে এই শব্দযুগল —

ক্লান্ত	কুয়াশা
[– মূর্ত + মানবিক]	[+ মূর্ত – মানবিক]

দুই প্রান্তের অর্থগত উপাদান মিলছে না। বিসদৃশ এই উপস্থাপনের তাৎপর্য বুঝে নিতে আমাদের যেতে হয় অধোতলে। কারণ এখানে যে deviance বা বিসারণ ঘটছে তা অধোগঠনের। অন্বয়ের অধিগঠন ধ্বনির নির্মাণ, অধোগঠন অর্থের নির্মাণ।

অন্বয়ের অধিতলে শব্দের পরম্পরা যখন কবিতায় সংগঠিত হয় তখন তার ব্যাকরণিকতাও কি স্থিতিস্থাপক হবে? ই. ই. কামিংস-এর বহু আলোচিত একটি পংক্তি সামনে আনা যাক — 'he sang his didn't he danced his did'। বাক্যটি কি ব্যাকরণিক? সমান্তরাল দুটি অঙ্গবাক্য —

(১) he sang his didn't
(২) he danced his did

মাঝখানে একটি কমা কিংবা and বসিয়ে নিলেও বাক্য হিসেবে গ্রহণযোগ্য হয়ে উঠছে না। সমগঠনের অনুরূপ বাক্য :

(৩) ক. She cooked her lunch

খ. He painted his house

(৪) ক. S → NP VP

খ. NP → (DET) N

গ. VP → V (NP)

দেখা যাচ্ছে কামিংস-এর পঙ্‌ক্তি ৪. খ-সূত্র অমান্য করেছে। নির্দেশক-অনুগামী did কিংবা didn't কোনোটিই noun নয়।

দুটো দিক লক্ষণীয়। এক, ৪. খ-তে যে সূত্র পাচ্ছি তা প্রচলিত ইংরেজি ভাষার; দুই, আর একটা সূত্র পাচ্ছি কবির ইংরেজির

(৫) NP → DET V

একটি সাহিত্যিক উপভাষা হিসেবে সূত্রটিকে হয়ত সমর্থন করা যায়। মুসকিল হল এ রকম বাক্য ব্যাকরণিক বলে গৃহীত হলে সাধারণ্যে নিম্নরূপ বাক্যকেও স্বীকৃতি দিতে হয় :

(৬) ক. I don't think he remembers his can't

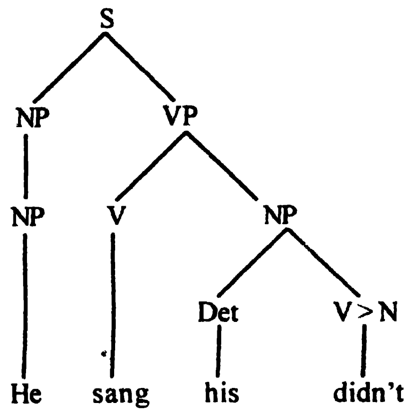
খ. None of us hammered our shouldn't.

তবে সাধারণ মানুষ এধরনের কথা বলবেন না। প্রত্যেকের মধ্যে নিহিত আছে যে ভাষাবোধ (Competence) সেখানে বাধা তৈরি হবে। আবার প্রতিটি কবিতার জন্য স্বতন্ত্র সূত্র প্রণয়ন, সেটাও অকল্পনীয়। একটু তলিয়ে দেখলে বোঝা যায় কবিতার অধিকাংশ শব্দসজ্জাতেই ভাষার সাধারণ সূত্রাবলির সমর্থন। অন্বয়ের নিয়ম থেকে কবি দূরে সরে যান মাত্র, নিয়ম ভাঙেন না। কবিতায় যখন প্রশ্নার্ত হন কবি, ভাষার সাধারণ নিয়ম মেনেই প্রশ্ন করেন। প্রশ্নবাক্যে কোনো স্বতন্ত্র 'শৈলী উপাদান' ব্যবহার করেন না।

কামিংস প্রসঙ্গে ফিরে আসা যাক। আপাতত মনে হতে পারে কবিতার ব্যাকরণে কামিংস আমূল কিছু পরিবর্তন আনছেন। যেমন এখানে

NP— Det V

সূত্রটিতে ব্যাকরণ বিরোধিতার চমক আছে অবশ্যই। আসলে তিনি যে করছেন তা প্রচলিত নিয়মের সম্প্রসারণ মাত্র। he sang his didn't বৃক্ষচিত্রে সাজালে Det V নয়, প্রকৃতপক্ষে Det N বিন্যাসই পাই আমরা। V-কে N-এর অবস্থানে এনে noun-এর কাজ করিয়ে নিচ্ছেন কবি।



didn't ক্রিয়া হলেও বিশেষ্যের অবস্থানে এসে বিশেষ্যের মতোই কাজ করছে। 'সে জানল তার জানি না'— এরকম বললে যেমন শোনায়।

দুটি উদ্ধৃতি নেওয়া যাক —

১. একটা ভাঙা ফ্রায়িং প্যানে
মা ভাজছেন মেয়েকে
বরের পাতে দেবেন
টেস্টি বধূ।

২. .....the town is
so aged the Ocean
wanders the streets are so
ancient the houses enter the
people.....

দুটি অংশই বিসারণের দৃষ্টান্ত। 'ভাজছেন' ক্রিয়াপদের মুখ্য কর্ম হিসেবে 'মেয়ে' আসতে পারে না, তেমনি পাতে দেওয়ার কর্ম হিসেবে 'টেস্টি বধূ'। তাৎপর্য বুঝতে আমাদের যেতে হয় ধ্বনি-নির্ভর অধিতল থেকে অর্থ-নির্ভর অধোতলে। একজন আলোচক যথার্থই লিখেছেন, 'Speaking involves articulating thoughts— going from meanings to sounds; understanding involves extracting meanings from sounds. So, in an intuitive sense, these processes operate in opposit directions'.

দ্বিতীয় দৃষ্টান্তের বিসারণও নির্বাচন বিধিনিষেধ না মানার ফল। আমরা সাধারণত 'বৃদ্ধশহর' বলি না; নদী যদিও ভ্রাম্যমান, সমুদ্রকে সেভাবে দেখা হয় না— আর enter ক্রিয়ার মুখ্য কর্ম হিসেবে the people আসে না, বিশেষত যেখানে the houses বাক্যের কর্তা।

কামিংসের পঙ্‌ক্তি দ্ব্যর্থক। 'Flying planes can be dangerous' বাক্যটি যেমন দ্ব্যর্থক, সেইরকমই। উড়ন্ত প্লেন বিপজ্জনক হতে পারে অথবা প্লেন ওড়ানো বিপজ্জনক হতে পারে— যে-কোনো অর্থই আমরা ভেবে নিতে পারি। কামিংসের কবিতাতেও আছে এই দ্ব্যর্থকতা :

(৭) # the town is so aged that the ocean wanders the streets #
the streets are so ancient that the houses enter the people

(৮) # the town is so aged and the ocean wanders the streets #
the streets are so ancient and the houses enter the people

(৭) কিংবা (৮)— যে কোনো অর্থেই আমরা খুশি হতে পারি। লক্ষণীয় দুটি পঙ্‌ক্তিতে আছে একই অভিন্ন উপাদান— the streets । ভাষার একটি প্রবণতা হল একই উপাদানের পুনরুক্তি থেকে বিরত থাকা। যেমন—

(৯) ক. # I have seen you you have seen me #

খ. # I have seen you ϕ have seen me #

গ. I have seen you have seen me.

কিংবা

(১০) ক. # বাড়িটা বাড়িটা ছিল পুরানো ভেঙে পড়ল #

খ. # বাড়িটা যা ছিল পুরানো ভেঙে পড়ল #

গ. পুরানো বাড়িটা ভেঙে পড়ল।

সংবর্তন-সঞ্জাত বাক্য যে পাঠকেরা নিতে পারেন তার কারণ ভাষাবোধ ও ভাষাব্যবহারের পার্থক্যটা তাঁরা বোঝেন।

চমস্কি ও তাঁর সহযোগীরা সাহিত্যের ভাষাতাত্ত্বিক অনুধাবনে উৎসাহ দেখাননি। তাঁদের কাছে ভাষাশৈলীর বিষয়টা ছিল গৌণ। ভাষাবোধ (competence) ও ভাষা ব্যবহারের (performance) মধ্যে যে পার্থক্য, সম্ভবত সেখানেই এই কারণটা নিহিত ছিল। চমস্কির ধারণা অনুযায়ী বক্তা ও শ্রোতার অন্তর্লীন ভাষাবোধের পর্যালোচনাই ব্যাকরণের বিষয়— A grammar of a language purports to be a description of the ideal speaker-hearer's intrinsic competnce (Chomsky, 1965 : 4) কিন্তু ভাষার নান্দনিকতা ভাষা ব্যবহারের অন্তর্গত। চমস্কি তাই লেখেন— When we say that a sentence has a certain derivation with respect to a particular generative grammar, we say nothing about how the speaker or hearer might proceed, in some practical or efficient way, to construct such a derivation. These questions belong to the theory of language use–the theory of performance.

(Chomsky, 1965: 9)

এটা ঠিকই সাহিত্যের ভাষা সাহিত্যিকের নিজস্বতার বার্তাবহ। আর সে কারণেই সবাই এক রকম লেখেন না, লেখায় আসে বৈচিত্র্য। প্রাগ্‌স্কুলের ভাষাতাত্ত্বিকরা বিশেষত রোমান ইয়াকবসন কবিতার ভাষার বৈচিত্র্য বিশ্লেষণে যে মনোযোগ অর্পন করেছিলেন, তত্ত্বগত কারণেই এম. আই. টি স্কুল তা অনুসরণ করেননি।

শৈলী-সন্ধানীরা অবশ্য নীরব ছিলেন না। চমস্কির Syntactic structures (1957) বইটি প্রকাশের সময় থেকেই সাহিত্যের ভাষা বিশ্লেষণে সংবর্তন ব্যাকরণের উপযোগিতার দিকটি সামনে এসে পড়ে। সংবর্তন ব্যাকরণকে তারা মনে করলেন হঠাৎ-পাওয়া সেই জাদু-চাবি যা দিয়ে সাহিত্য-শৈলীর রুদ্ধ দরজা খোলা যায়। রিচার্ড ওহ্‌মানের প্রাগ্রসর ভূমিকা এ প্রসঙ্গে স্মরণযোগ্য। তাঁর উদ্দীপক প্রবন্ধগুলির প্রকাশকাল ১৯৫৯, ১৯৬৪, ১৯৬৬। প্রথম লেখাটি Syntactic structures প্রকাশের দুবছরের মধ্যেই, দ্বিতীয় লেখাটি Aspects of The Theory of Syntax প্রকাশের এক বছর আগে এবং তৃতীয় লেখা এক বছর পরে। সঞ্জনন ব্যাকরণের যে রূপাদর্শ, তার মধ্যে শৈলীগত দেশনা লক্ষ করেছেন ওহ্‌মান। যেমন VP গ্রন্থির প্রসারণ বা পুনর্লিখন Vt + NP অথবা Be + Adj— এই বিকল্প বিন্যাস সাংগঠনিক অর্থ-পার্থক্য সূচিত করে। Vt + NP সংগঠনে আসে action + receiver of the action-এর প্রসঙ্গ, সেখানে Be + Adj সংগঠনে সে বিধেয় বিশেষণ তা উদ্দেশ্যের সঙ্গে তার সমতার কথা জানাচ্ছে। একজন লেখকের কাছে এধরনের বিকল্পের শৈলীগত উপযোগিতা আছে অবশ্যই। কিন্তু ওহ্‌মানের কাছে আরও গুরুত্বপূর্ণ মনে হয়েছে সংবর্তনের নির্দেশনা। তিনি লক্ষ করেছেন সংবর্তন সূত্রের একটি বড়ো অংশ ঐচ্ছিক। ঐচ্ছিক সংবর্তনে তৈরি প্রতিটি বাক্যই নতুন, যদিও মূল বাক্যের সঙ্গে কিছুটা মিল থাকেই। সংবর্তন আরোপিত এক বা একাধিক সংগঠনের পুরোটাই বদলে যাচ্ছে এমন নয়, অংশত অপরিবর্তিত থাকছে। বলাই বাহুল্য শৈলী বিশ্লেষণে এই মিল ও অমিল সহায়ক ভূমিকা নেয়, এছাড়া জটিল বাক্য যে একাধিক সরল বাক্যের মিলিত সম্প্রসারণ, সংবর্তন ব্যাকরণের প্রযুক্তিতে তার আকর্ষণীয় বিশ্লেষণ সম্ভব। দক্ষিণ শাখায়ন বাম শাখায়ন শব্দবন্ধ, বাক্যের অন্তঃস্থকরণ, কেন্দ্রাতিগ কেন্দ্রাভিগ সংগঠন ইত্যাদির পুনরাবর্তনে লেখকদের রচনাশৈলী ধরা পড়ে। ওহ্‌মান লেখেন 'These deep

grammatical possibilities in a language may well be exploited differently from writer to writer, and if so, the differences will certainly be of stylistic interest.'

ওহ্‌মান তাঁর Generative Grammars and Concept of Literary Style প্রবন্ধে যে চারজন লেখককে বেছে নিয়েছেন তার মধ্যে একজন William Faulkner । এই লেখকের মধ্যে তিনি দেখলেন সম্বন্ধ-অঙ্গবাক্য সংবর্তন, সংযোজন সংবর্তন এবং তুলনায়ন সংবর্তনের আধিক্য। দুটি বাক্য নেওয়া যাক —

The threads were impalpable.

এবং

The threads were frail.

বাক্যদুটি সংযুক্ত হতে পারে তিন রকম সংবর্তনেই

The threads which were impalpable were frail

(সম্বন্ধ সংবর্তন)

The threads were frail and impalpable

(সংযোজন)

The threads were more frail than impalpable.

(তুলনায়ন)

প্রতিক্ষেত্রে দুটি বাক্য সংযুক্ত হচ্ছে এবং তাদের মেলক এক বা একাধিক morpheme । প্রাবন্ধিকের সিদ্ধান্ত 'The three transforms are somewhat similar, both formally and semantically; and it seems reasonable to suppose that a writer whose style is so largely based on just these three semantically related transformations demonstrates in that style a certain conceptual orientation, a preferred way of organizing experience....The possibility of such insight is one of the main justifications for studying style.'

প্রাবন্ধিক দেখাতে চেয়েছেন সংবেদী পাঠকের মধ্যে এমন একটি শৈলীবোধ কাজ করে যার ফলে নাম মুছে দিলেও তাদের বুঝতে অসুবিধে হয় না কোন লেখাটি কোন লেখকের। বিশেষ বিশেষ ব্যাকরণিক বিন্যাস তথা সংবর্তন এক একজন লেখকের সেই স্বক্ষেত্র যাকে পাঠক ব্যক্তিগত শৈলী হিসেবে সনাক্ত করেন। দুজন লেখকের মধ্যে শৈলীগত এই পার্থক্য তাঁদের লেখার গুণগত দিক, কিন্তু পরিমাণগত দিক থেকেও কি শৈলীর পার্থক্য অনুভব করা যায় না? এ প্রশ্নের উত্তর আছে 'A Transformational–Generative Approach To Style : Samuel Johnson and Edward Gibbon' নামক প্রবন্ধে। লেখক Curtis W. Hayes এর কথায় 'GG-TG is a useful tool in measuring quantitative stylistic differences (that is, a larger or smaller number of accurrences of a specific transformation) between two authors who appear to use the same transformational apparatus.' (Hayes, C. 1966/Language and style 1: 41)। Johnson এবং Gibbon-এর সমধর্মী রচনার শৈলীপরিসংখ্যানগত (stylostatistic) বিশ্লেষণে লেখক দেখিয়েছেন একই ধরনের সংবর্তন-নির্ভর বাক্য নির্মাণেও দুজন লেখক কি ভাবে পৃথক হয়ে যান। সাহিত্য-শৈলী অনুধাবনে সংবর্তন ব্যাকরণের প্রাসঙ্গিকতকা নিয়ে প্রথম লেখেন Richard Ohmann । সমীপ সময়ে Curtis W. Hayes, Gordon M. Missing, Samuel R. Levin, Aarts J প্রমুখ আলোচক প্রাসঙ্গিক সম্প্রসারণ ঘটান।

পরিশেষে সাহিত্যিক সার্বিকতার (Literary Universals) প্রসঙ্গ। আমরা জানি সঞ্জনন ব্যাকরণের লক্ষ্য সার্বিকতা বা বিশ্বজনীনতা। সাহিত্য শৈলীর ক্ষেত্রেও কি সেটা সম্ভব? এই ভাবনার অত্যন্ত প্রাথমিক স্তরেও একটা সদর্থক উত্তর আমরা খুঁজে পাই। পৃথিবীতে এমন কোনো সমাজ নেই যেখানে সাহিত্যিক ভাষার চল হয়নি। আবার এমন কোনো ভাষাও নেই যেখানে কখনও ছন্দের স্পন্দন জাগে নি। যেমন প্রতিটি ভাষায় নেতিবাচক বাক্য আছে যদিও তার সংগঠন আলাদা, তেমনি ছন্দের বিন্যাসও ভিন্ন ভাষার উপরিতলে ভিন্ন রকম অনুভূত হয়।

সব ভাষার লিখিত রূপ নেই। কিংবা লিখিত রূপ থাকলেও যাঁরা সাক্ষর নন, তাঁরা মুখে মুখেই সাহিত্য রচনা করেন। মৌখিক সাহিত্যের একটা বৈশিষ্ট্য পুনরুক্তি। যেহেতু চোখে দেখার সুবিধে নেই তাই স্মৃতি-সহায়ক পুনরুক্তি সেখানে অত্যাবশ্যক। এটা মৌখিক সাহিত্য শৈলীর একটি সার্বজনীন বৈশিষ্ট্য। তাছাড়া ধ্বন্যাত্মক শব্দ পৃথিবীর সব ভাষাতেই আছে। Ullmann ধ্বন্যাত্মক শব্দে বিশ্বজনীন অভিব্যক্তি লক্ষ করেছেন। লেকফ ও জনসন চমস্কির অসচেতন অভিজ্ঞান (Cagnition) পদ্ধতির ও কিছু পরিমাণে সার্বিকতার ভাবাদর্শে অনুপ্রাণিত। অবশ্য তাঁদের ভাষাতাত্ত্বিক সন্ধিৎসা অন্বয়কে ঘিরে ততটা নয়, যতটা বাগর্থে। চমস্কি সন্ধান করেছিলেন অধোতলের সেই অসচেতন আন্বয়িক ধারণা যে কারণে একজন স্বভাষী অতি সহজেই time flies like an arrow বাক্যটিকে একভাবে নেয় আর fruit flies like a banana অন্যভাবে। লেকফ ও জনসন প্রথম দৃষ্টান্ত থেকে প্রশ্ন তুললেন— মানুষ কেন বিমূর্ত ধারণা গঠন করে রূপকার্থে। মানুষের ভাষায় বিমূর্ত ধারণার একটা সমঞ্জস নির্মাণ তাঁরা লক্ষ করলেন। মানুষের বিমূর্ত ভাবনা গড়ে ওঠে বিশ্বজনীন কতগুলি মূল ভাবনা অবলম্বন করে। দেখা, ধরা, দাঁড়ানো, হাঁটা প্রভৃতি দৃষ্টিগ্রাহ্য ও শারীরিক ক্রিয়াকলাপ থেকে মানুষ বিমূর্ত ধারণা তৈরি করে নেয়। সময় যেন চোখে দেখার বিষয়— তীরতীক্ষ্ণ গতিতে কোনো একটি স্থানের দিকে এগিয়ে যাচ্ছে। আমরা সামনের দিকে এগিয়ে যাই, পিছনের দিকে নয়। ভবিষ্যৎ আমাদের সামনের দিক, অতীত আমাদের পিছনের দিক— শারীরিক অভিজ্ঞতার এই বিমূর্তায়ন ভাষায় রূপকাশ্রিত হয়। একজন আলোচকের ভাষায় 'Human conceptual and linguistic systems are, therefore, not only pervasively metaphorical but reflect elementary facts of human embodiment accounting for the prevalence accross diverse languages and cultures of many of the same basic conceptual metaphors.' (Cognitive literary criticism–Alan Rechardson in Literary Theory and Criticism–edited by Patrica Waugh. Oxford 2006)।

বিশ্বজনীন শৈলীস্বরূপ ভবিষ্যতে আলোচকদের অনুধাবনে আরও আলোকিত হয়ে উঠবে, এ প্রত্যাশা আমরা রাখতেই পারি।

লেখক পরিচিতি

অচিন্ত্য বিশ্বাস : অধ্যাপক, বাংলা বিভাগ, যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়। প্রকাশিত উল্লেখযোগ্য গ্রন্থ : বিপ্রদাস পিপিলাইয়ের মনসামঙ্গল, বাংলা পুথির কথা, প্রসঙ্গ তিতাস একটি নদীর নাম, তারাশঙ্করের কবি, তারাশঙ্করের রাধা, সমর্থ পঞ্চম: তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায়ের হাঁসুলীবাঁকের উপকথা প্রভৃতি।

অমিত কুমার: অধ্যাপক, গোবিন্দপ্রসাদ মহাবিদ্যালয়। বর্ধমান বিশ্ববিদ্যালয়ে গবেষণারত। 'খ' শীর্ষক একটি অনিয়মিত সাহিত্য পত্রিকার যুগ্ম সম্পাদক।

অমিতাভ চক্রবর্তী : অধ্যাপক, আধুনিক ভারতীয় ভাষা ও সাহিত্যবিদ্যা বিভাগ। দিল্লি বিশ্ববিদ্যালয়।

অর্ক চট্টোপাধ্যায় : ছাত্র, যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয় স্নাতোকত্তর ইংরেজি বিভাগ, দ্বিতীয় বর্ষ।

অচ্যুত মণ্ডল : অধ্যাপক, আধুনিক ভারতীয় ভাষা ও সাহিত্যবিদ্যা বিভাগ, দিল্লি বিশ্ববিদ্যালয়।

ইন্দ্রনীল আচার্য : অধ্যাপক ইংরেজি বিভাগ, বিদ্যাসাগর বিশ্ববিদ্যালয়।

কুন্তল চট্টোপাধ্যায় : অধ্যাপক, ইংরেজি বিভাগ, নরসিংহ দত্ত কলেজে। উল্লেখযোগ্য প্রকাশনা : মৃত্যুর পরেও যেন হেঁটে যেতে পারি ● শক্তি চট্টোপাধ্যায়ের কবিতা : বিষয় প্রসঙ্গ ও প্রকরণ। ইংরাজী সাহিত্যের ইতিহাস, সাহিত্যের রূপরীতি ও অন্যান্য প্রসঙ্গ, দহনবেলার কৌতুক (কাব্যগ্রন্থ) প্রভৃতি।

কল্যাণ চট্টোপাধায় : অধ্যাপক, ইংরেজি বিভাগ, ঝাড়গ্রাম রাজ কলেজ। বিদ্যাসাগর বিশ্ববিদ্যালয়ে অতিথি অধ্যাপক। বেশ কিছু প্রবন্ধ বিভিন্ন জার্নাল ও প্রবন্ধ-পত্রিকায় প্রকাশিত।

গিনি ভট্টাচার্য : অধ্যাপিকা, বাংলা বিভাগ, উইমেন্স খ্রিশ্চান কলেজ, কলকাতা।

তাপসী বন্দ্যোপাধ্যায় : অধ্যাপিকা, বাংলা বিভাগ, ভিক্টোরিয়া ইনস্টিটিউশন (কলেজ), কলকাতা, বিশিষ্ট প্রাবন্ধিক।

তপোমন ঘোষ : শিক্ষক, গবেষক ও প্রাবন্ধিক এবং 'সাঁকো হাইলাইটস '৯০' শীর্ষক নব্বই ও পরবর্তী নব্বইয়ের কবিতা সংকলন-গ্রন্থের অন্যতম সংকলক ও সম্পাদক।

দত্তাত্রেয় দত্ত : অধ্যাপক, নাট্য বিভাগ রবীন্দ্রভারতী বিশ্ববিদ্যালয়। ট্র্যাজেডি প্রসঙ্গে অ্যারিস্টটল তাঁর উল্লেযোগ্য গ্রন্থ। এ ছাড়া শেক্সপীয়রের নাটকের অনুবাদ করেছেন।

দিলীপকুমার বসু : অধ্যাপক, ইংরেজি বিভাগ, রাজধানী কলেজ, দিল্লি বিশ্ববিদ্যালয়।

দেবাঞ্জন দাশ : অধ্যাপক, বাংলা বিভাগ, বেলদা কলেজ।

নবেন্দু সেন : ১৯৬৪—২০০৪ অধ্যাপনা স্নাতক ও স্নাতকোত্তর স্তরে দিল্লি বিশ্ববিদ্যালয়-এ ও তৎসংযুক্ত জাকির হুসেন স্নাতকোত্তর কলেজে। ১৯৮৪—১৯৮৯ অধ্যাপনা জে. এন. ইউ. দিল্লি। শতাধিক প্রবন্ধ প্রকাশিত ইংরেজি ও বাংলা ভাষায় বিভিন্ন পত্র পত্রিকায়। কয়েকটি নির্বাচিত গ্রন্থ : সাহিত্য অ্যাকাদেমির ই. আই. এল্-এর (E.I.L.) ৫টি খণ্ডেরই অন্যতম লেখক, গদ্য শিল্পী অক্ষয়কুমার দত্ত ও দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর, শিশু সাহিত্য : তথ্য তত্ত্ব ও বিশ্লেষণ, পোস্ট মডার্নইজম্ এবং অন্যান্য, বাংলা গদ্য : স্টাইলিস্টিক্স, আখ্যানক : নির্মাণে বিনির্মাণে, রবীন্দ্রবিশ্বে এবং অষ্টাদশ শতকের বাংলা সাহিত্য : পুনর্পাঠ ও পুনর্বিবেচনা (সম্পাদিত)।

পবিত্র সরকার : বিশিষ্ট শিক্ষাবিদ এবং প্রাক্তন উপাচার্য রবীন্দ্রভারতী বিশ্ববিদ্যালয়।

পরিচয় পাত্র : ছাত্র, যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয় স্নাতোকত্তর ইংরেজি বিভাগ, দ্বিতীয় বর্ষ।

প্রসূন ঘোষ : অধ্যাপক, বাংলা বিভাগ, কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়। সাহিত্যের নানা বিষয়ে প্রবন্ধ রচনা করেছেন।

মুন্সী মহম্মদ ইউনুস : অধ্যাপক, জাকির হোসেন পোস্ট গ্র্যাজুয়েট ইভনিং কলেজ, নিউ দিল্লি।

মৃদুলা কুণ্ডু : অধ্যাপিকা, বাংলা বিভাগ, তাম্রলিপ্ত মহাবিদ্যালয়।

মহুয়া দে : অধ্যাপিকা, বাংলা বিভাগ, বিজয়কৃষ্ণ গার্লস কলেজ, হাওড়া।

রবিন পাল : প্রাক্তন অধ্যাপক, বিশ্বভারতী বিশ্ববিদ্যালয়। প্রকাশিত গ্রন্থ: কল্লোলিত কল্লোল, র‍্যালফ ফক্স : রাজনীতি-সংস্কৃতি-সমাজনীতি, বি. টি. রোডের ধারে : স্বপ্ন ও স্বপ্নভঙ্গের আখ্যান প্রভৃতি।

রমাপ্রসাদ দে : কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় (শিক্ষা) ও যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়ের অতিথি অধ্যাপক। প্রকাশিত গ্রন্থ: প্রবন্ধ সংকলন-ডিরোজিও, মার্কসবাদ, কবিতার উৎস সন্ধানে প্রভৃতি।

রাজীব চৌধুরী : অধ্যাপক, বাংলা বিভাগ, সেন্ট জেভিয়ার্স কলেজ, কলকাতা। প্রকাশিত গ্রন্থ : অপ্রকাশিত জগদীশ গুপ্ত।

রামকৃষ্ণ ভট্টাচার্য : প্রাক্তন অধ্যাপক, বাংলা বিভাগ, আনন্দমোহন কলেজ, কলকাতা।

শান্তনু গঙ্গোপাধ্যায় : প্রাবন্ধিক, গল্প লেখক এবং উপন্যাস-রচয়িতা। প্রকাশিত গ্রন্থ: সাহিত্য সমালোচনা ও সমালোচনা সাহিত্য, প্রথম প্রত্যুষ, সোনালী ডানার চিল প্রভৃতি।

শুভঙ্কর ঘোষ : প্রাক্তন অধ্যাপক, বাংলা বিভাগ, স্কটিশ চার্চ কলেজ, কলকাতা। প্রকাশিত গ্রন্থ : দর্পণে রেখেছো মুখ (উনিশ শতকের বাংলা সাহিত্যে কলকাতা), কথাশিল্পের বহু মাত্রিকতা, কথাশিল্পের দিনকাল প্রভৃতি।

শুভেন্দু দাশমুন্সী : অধ্যাপক, বাংলা বিভাগ, বসিরহাট কলেজ। প্রকাশিত গ্রন্থ (সম্পাদিত)—বুদ্ধদেব বসুর কিশোর রচনা সমগ্র, শৈলজানন্দের কিশোর রচনা সমগ্র। শিশুসাহিত্য ও বাংলা মুদ্রণশিল্পের প্রতি বিশেষ আকর্ষণ। গবেষণার বিষয়— রবীন্দ্রনাথ।

সংলাপ সরকার : অধ্যাপক, বাংলা বিভাগ, ব্রহ্মানন্দ কেশবচন্দ্র কলেজ।

সঞ্চিতা বসু : অধ্যাপিকা, বাংলা বিভাগ, বঙ্গবাসী কলেজ (প্রাতঃকালীন), কলকাতা।

সুরশ্রী কুণ্ডু : গবেষক (যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়) ও প্রাবন্ধিক।

সুবোধ সেনগুপ্ত : প্রয়াত সুবোধ সেনগুপ্ত কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের ইংরেজি ভাষা ও সাহিত্যের অধ্যাপক ছিলেন। বাংলা ভাষায় রচিত তাঁর উল্লেখযোগ্য গ্রন্থ: বঙ্কিমচন্দ্র, রবীন্দ্রনাথ, শরৎচন্দ্র প্রভৃতি।

সুমিতা চক্রবর্তী : প্রাক্তন অধ্যাপিকা, বাংলা বিভাগ, বর্ধমান বিশ্ববিদ্যালয়। বিশিষ্ট সাহিত্য সমালোচক ও প্রাবন্ধিক। প্রকাশিত গ্রন্থ : কবি অমিয় চক্রবর্তী, আধুনিক বাংলা কবিতার দ্বিতীয় পর্যায়, ছোটোগল্পের বিষয় আশয়, উপন্যাসের বর্ণমালা প্রভৃতি।

সুজিৎ ঘোষ : প্রাক্তন অধ্যাপক, বাংলা বিভাগ, বিধাননগর কলেজ, বিধাননগর, কলকাতা।

সৈকত সরকার : অধ্যাপক, ইংরেজি বিভাগ, বাঁকুড়া খ্রিশ্চান কলেজ। বর্ধমান বিশ্ববিদ্যালয়ে ব্ল্যাক আমেরিকান লেখক টনি মরিসনের ওপর গবেষণারত। আধুনিক সাহিত্য ও সাহিত্যতত্ত্ব নিয়ে তাঁর আগ্রহ ও লেখালেখি।

হিমাদ্রি লাহিড়ী : অধ্যাপক, ইংরেজি বিভাগ, বর্ধমান বিশ্ববিদ্যালয়। ভারতীয় ইংরেজি সাহিত্য, আমেরিকান সাহিত্য— ডায়াস্ফোরাস স্টাডিজ-এর ওপর প্রবন্ধ দেশ-বিদেশের জার্নাল ও বই-এ প্রকাশিত হয়েছে।

সোমা মুখোপাধ্যায় : গবেষক (যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়) ও প্রাবন্ধিক।

রত্নাবলী

প্রচ্ছদ : রাজীব চৌধুরী
প্রচ্ছদ আলোকচিত্র : সঞ্জয় মুখোটী
প্রচ্ছদ রূপায়ণ : রাজীব চৌধুরী